
THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"



মাঘ ১৩৮৯

৮৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

উদ্বোধন

৮৫তম

(মাঘ, ১৩৮৯ হইতে পৌষ, ১৩৯০ ; ইংরেজী : ১৯৮৩)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী অজজানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩



বার্ষিক মূল্য ১৮·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৮৫তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮৯ হইতে পৌষ, ১৩৯০)

সমালোচনা

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।



৮৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৮৯

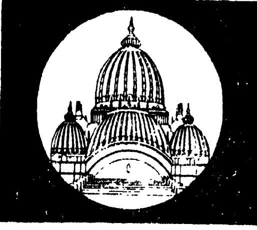
দিব্য বাণী

'উদ্বোধনে' সাধারণকে কেবল positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thoughts (নেতিবাচক ভাব) মানুষকে weak (দুর্বল) ক'রে দেয়।··· ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, Children in the region of higher thoughts (ভাবরাজ্যের উচ্চস্তরে যারা শিশু, তাদের) সম্বন্ধেও তাই।···ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্প সকল বিষয়ে যা চিন্তা ও চেষ্টা মানুষ করছে, তাতে ভুল না দেখিয়ে ঐ-সব বিষয় কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই ব'লে দিতে হবে।···ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত।···Physical, mental, spiritual (শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক) সকল ব্যাপারেই মানুষকে positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে।···প্রথমে ঐরূপে সমস্ত হিঁদুজাতটাকে তুলতে হবে, তারপর জগৎটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই এই। তিনি জগতে কারও ভাব নষ্ট করেননি। মহা-অধঃপতিত মানুষকেও তিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদানুসরণ ক'রে সকলকে তুলতে হবে, জাগাতে হবে।

···বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলি সাদা কথায় মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। 'উদ্বোধন' কাগজে এই সব লিখে আবালবৃদ্ধবনিতাকে তোল্ দেখি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদে 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রসঙ্গ—'বাণী ও রচনা' ৯ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ১৭৬-৭৭]



কথাপ্রসঙ্গে

উদ্বোধন : জাগরণ ও সমর্পণের প্রতীক

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছায় ও অনুপ্রেরণায় 'উদ্বোধন' তাহার যাত্রাপথের আরও একটি বৎসর পূর্ণ করিয়া পঞ্চাশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিল। বর্ষারম্ভের এই শুভ ক্ষণে আমরা প্রণত হইতেছি, তাঁহাদেরই পদপ্রান্তে, যাঁহাদের নিরন্তর আশীর্বাদ 'উদ্বোধন'-কে উহার লক্ষ্য-সাধনের শক্তি সঞ্চারণ করিয়া আসিতেছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর অমোঘ আশিস্-ধারায় 'উদ্বোধন'-এর জীবন অভিষিক্ত থাকুক চিরকাল। ইহাই তাঁহাদের নিকট আমাদের আজিকার প্রার্থনা। শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করিতেছি, 'উদ্বোধন'-এর নবীন-প্রাচীন সকল পাঠক-পাঠিকার, প্রত্যেক লেখক-লেখিকার এবং সকল হিতৈষী সুহৃদ্‌গণের। দেশব্যাপী নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে —আত্মপ্রত্যয়হীনতার নিবিড় দুর্যোগের মাঝে 'উদ্বোধন' যেন মানুষের কাছে আশা ও আত্ম-বিশ্বাসের আলোক বহনের সামর্থ্য কদাপি না হারায়,—স্ব-লক্ষ্যের পথে যেন সে সুনিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারে—স্বামীজী-সমীপে ইহাই আমাদের অন্তরের আকুতি।

আজ হইতে চুরাশী বৎসর পূর্বে (১৩০৫ সনে) মাঘের প্রথম দিবসে এই 'উদ্বোধন'-এর যাত্রারম্ভ হইয়াছিল। যাত্রাকালে তাহার ললাটে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ—মাঙ্গলিক তিলক আঁকিয়া দিয়াছিলেন—"তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো!" অবশ্য প্রথম বর্ষের কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরেই, 'উদ্বোধন'-কে আজীবন বহনের জন্য উহার প্রচ্ছদপটে তিনিই আবার উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন—অনবদ্য এক জাগরণী মন্ত্র—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

পত্রিকার সর্ব প্রথম সংখ্যার অঙ্গাবরণে মুদ্রিত ছিল: "স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক। স্বামী ত্রিগুণাতীত সম্পাদক।" আর সূচীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল—স্বামী বিবেকানন্দ-রচিত 'উদ্বোধনের প্রস্তাবনা' এবং তাঁহার 'রাজযোগ'। ইহা ছাড়াও ছিল, স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত 'পরমহংসদেবের উপদেশ', 'শ্রীশ্রীমুকুন্দমালা স্তোত্রম্'– স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অনূদিত, রামকৃষ্ণ মিশন সভায় প্রদত্ত 'স্বামী সারদানন্দের বক্তৃতার সারাংশ' এবং 'বিবিধ', যাহাতে পরিবেশিত হইয়াছিল দর্শন, গণিত ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমকালীন নানা তথ্য। স্বামী ত্রিগুণাতীত-সম্পাদিত ঐ 'উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্র রূপেই প্রথমে প্রকাশিত হইতেছিল, পরে স্বামী শুদ্ধানন্দের সম্পাদনা-কালে উহার দশম বর্ষ হইতে বর্ধিত কলেবরে মাসিক পত্রে রূপান্তর ঘটে।

কঠিন যাত্রাপথে মাঝে মাঝে থামিয়া পশ্চাতে অবলোকনের প্রয়োজন হয়—সম্মুখবর্তী লক্ষ্যকে সুনির্ধারণের উদ্দেশ্যে,—অবশিষ্ট পথের দূরত্ব বুঝিয়া চলার গতিকেও সুনিয়ন্ত্রণের জন্য। আমরাও এই অবকাশে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি—আমাদের আদর্শ ও উপায়কে আরও একবার পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষায়। 'উদ্বোধন'-

এর ঐতিহ্যকে স্মরণ করিতেছি—আমাদের পথের শ্রান্তিকে লাঘব করিতে,—আকাশের ধ্রুবতারাকে দৃষ্টিপথে সুস্থির ও অবিচল রাখিতে। স্বামী বিবেকানন্দই আমাদের দিঙ্‌নির্ণায়ক ধ্রুবতারা। তাঁহারই জ্যোতিঃ আমাদের পথের আলো। তাঁহারই শক্তিতে আমাদের পথ-চলা। 'উদ্বোধন'-এর এই পঞ্চাশীতি বর্ষারম্ভের শুভক্ষণে আমাদের প্রাসঙ্গিক কথা ইহাই।

*

স্বামীজীর আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া 'উদ্বোধন' যখন যাত্রা শুরু করিয়াছিল তখন দেশ ছিল বিদেশীর শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ,—জাতীয় চেতনার প্রকাশ-পথে ছিল বহুবিধ অন্তরায়। কিন্তু আজ? পঁয়ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল অতিক্রান্ত হইয়াছে,—দেশ এখন বিদেশের শাসন-মুক্ত, প্রচলিত কথায় আমরা এখন স্বাধীন। কিন্তু বলিতেও বেদনা বোধ হয়, দীর্ঘ এই তিন দশক কাল ধরিয়া স্বাধীন পদক্ষেপে চলিবার চেষ্টা যতই করা যাইতেছে, বারে বারে ততই আছাড় খাইতে হইতেছে। ফলে পতনাঘাতে জাতির সর্বাঙ্গ আজ জর্জর, আঘাতের কৃষ্ণশিরায় সারা দেহ পরিলিপ্ত! তবে কি সব অচল হইয়া আছে? না, চলিতেছে সব কিছুই,—কিন্তু সহজ ছন্দে বা স্বাভাবিক গতিতে নয়; চলা হইতেছে—বড়ই বেতালে ও বিপথে। যতই দিন যাইতেছে, নিরাশার অন্ধকারই যেন নিবিড়তর বোধ হইতেছে। অসহায় বিরক্তি প্রকাশ, অথবা বিমূঢ় আস্ফালন,—কিংবা বিক্ষুব্ধ গণরোষ, না-হয় তামসিক নিষ্ক্রিয়তা,—একটা স্বাধীন জাতির প্রাণ-পরিচয় বুঝি ইহাতেই? ইহাই নাকি জনজাগরণের লক্ষণ? সমাজ বা রাষ্ট্রের সর্বস্তরে,—সর্বোচ্চ স্তর হইতে একেবারে নিম্নতল অবধি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অসাধুতা ও চাতুরী দীর্ঘদিন প্রশ্রয় পাইতে থাকিলে, উহার পরিণতি কোন্ দিকে, তাহা ক্ষণেকের জন্যও ভাবিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। দলীয় স্বার্থানুসন্ধানের নাম যদি হয় দেশপ্রীতি, চালাকীকে যদি বলা হয় সংগঠন-কুশলতা, ক্ষমতা-মদে উন্মত্ততার নাম যদি হয় প্রশাসন-দক্ষতা, দলাদলির প্রমত্ত তাণ্ডবকে যদি বলা হয় রাজনীতি, তবে তো স্বাধীনতার অর্থও করিতে হইবে যথেচ্ছাচার। ন্যায়-নীতি-শৃঙ্খলার উচ্চতম অধিকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া পবিত্র বিদ্যাতীর্থ, শিল্পনিকেতন, কর্মশালা, বিপণন-কেন্দ্র, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ক্ষেত-খামার,—আলো-বাতাস-জল-অন্ন-বস্ত্রের সরবরাহ,—পথ-ঘাট-স্টেশন মায় গৃহান্তঃপুর পর্যন্ত সমাজের সকল স্তরেই আজ দেখা যায় সর্বসংহারক ঐ তথাকথিত 'স্বাধীনতা' কেমন স্বচ্ছন্দে ও মজবুতভাবে দ্রুত বেগে বহাল হইতে চলিয়াছে! চতুর্দিকেই কেবল 'না',—না-না-না। এক অভূতপূর্ব না-ধর্মী সংস্কৃতির মোহাবেশে সারা দেশ মাতিয়া উঠিয়াছে! 'স্বাধীন' জনগণ-তান্ত্রিক বর্তমান সমাজচিত্র আমাদিগকে মনে করাইয়া দেয় সেই পুরাণোক্ত যদুকুলের ইতিহাসকে।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সর্বাগ্রে মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান এবং মাথা গুঁজিবার ঠাঁইটুকুর ব্যবস্থা একান্তই অপরিহার্য উদ্যোগ সন্দেহ নাই। তবুও একটি জাতিকে মানুষরূপে গড়িয়া উঠিয়া, মানুষেরই মতো বাঁচিতে হইলে, শুধুমাত্র ইহাই শেষ কথা হইতে পারে না। দরিদ্র ক্ষুধিত নর-নারীর ভোগ চরিতার্থ ও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সমারোহপূর্ণ আয়োজন-চেষ্টার মাঝে বেশ একটা মনোহারিতা আছে বটে! কিন্তু লক্ষণীয় যে, ঐ-সকল উদ্যোগের ছলে,—জনগণের দারিদ্র্য-মোচন ও তাহাদের জীবনধারণের মানোন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান-সূচীগুলির অন্তরালে, ক্ষুধিত মানুষের

বুকে আরও বেশী ভোগতৃষ্ণা জাগাইয়া তুলিবার কিছু প্ররোচনাও যেন লুকানো থাকে। মানুষের লোভ, হিংসা ও উত্তেজনাকর আদিম প্রবৃত্তি-গুলিকেই যেন সুকৌশলে উৎসাহ দেওয়া হয় ঐ সকল বিজাতীয় ঢঙের তথাকথিত জনকল্যাণের মাধ্যমে! পাশ্চাত্য সমাজের ভোগলোলুপতা—উহার স্নায়ুচেতন (sensate) ষড়রিপু-উত্তেজক সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অঢেল মূল্য দিয়া আমদানি করিবার একটি উগ্র প্রবণতা আমাদের অনেককেই যেন পাইয়া বসিয়াছে। দেশময় এই যে দুর্বার গড্ডলিকা স্রোত বহিয়া চলিয়াছে,—ইহাকে বর্তমান ধারাতেই অধিককাল বহিতে দিলে—বিজাতীয় সমাজচেতনার দ্বারা তাড়িত এই কর্মোন্মাদনা যদি অব্যাহতই থাকে, তাহা হইলে এই জাতির মধ্যে ক্রমে 'মানুষ' অবলুপ্ত হইয়া যাইবে,—নর-দানবের অবাধ সঞ্চরণে দেশের সকল শুভ তিরোহিত হইয়া যাইবে,—সকল কল্যাণ-সূচী তছ্-নছ্ হইবে নিঃসন্দেহে। তথাপ্রচলিত গণতন্ত্র ও সমানাধিকারের নামে, এক বীভৎস নারকীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা পাইতেছে কিনা, ইহাই এখন শান্ত-চিত্তে ভাবিবার প্রয়োজন।

*

দেশ জাতি বা সমাজকে পুনরায় উহার স্ব-কক্ষে ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব তাই অতি সুকঠিন। 'উদ্বোধন'-এর আজিকার ব্রত এই কারণেই পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী জটিল ও গুরুতর,—সাধনসাপেক্ষ তো বটেই। পরাধীনতার যুগে যাহা ছিল পুণ্য কর্তব্য,—স্বাধীনতার উত্তর-কালে উহাই এখন দুশ্চর তপস্যা। অলস তামসিকতার ঘোর হইতে দেশের মানুষকে জাগাইয়া তুলিতে ঐ 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' বোধন-মন্ত্রের উপযোগিতা, তথা এই 'উদ্বোধন' পত্রিকার দায় এখন তাই সমধিক অনুভূত হইতেছে। আমাদের অতন্দ্র প্রয়াস চলিতেই থাকিবে;—রথরজ্জুতে সমবেত কর-স্পর্শে এই সুবিশাল জগন্নাথের রথচক্রে একদিন গতি সংযুক্ত হইবেই, ইহা আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রেরণায়, বিক্ষিপ্ত খণ্ড চেষ্টার বিফল অভিনয়ে আর সময় ক্ষেপণ না করিয়া, দেশ-জাতি-সমাজ-বিগ্রহধারী বিরাট ভগবানের উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হইতে আমরা সকলকেই আন্তরিক আহ্বান জানাইতেছি।

কেবলমাত্র লেখনী সহায়ে বা বক্তৃতা মাধ্যমে আমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বকে সুসম্পন্ন করা আদৌ সম্ভবপর নহে,—উহা নিতান্তই অবাস্তব স্বপ্নবিলাস মাত্র। সর্বাগ্রে উপলব্ধি করিতে হইবে, কোন্ শক্তির ক্রিয়াতে আমাদের সমাজের গতি ও পরিচিতি,—কোথায় উহার উদ্ভব ও স্থিতি। যে অত্যাশ্চর্য প্রেরণা-শক্তিতে যুগ যুগ ব্যাপী অজস্র পরিবর্তনের মাঝেও, বহু বিচিত্র বিপ্লব ও বিবর্তনের ঝড় মাথায় বহিয়াও, এই বিপুল সমাজ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অনেক অনেক বার উঠিয়া-পড়িয়া, ভাসিয়া-ডুবিয়া স্বীয় লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার স্বরূপটিকে ধারণার মধ্যে আনিতে হইবে। ভাবিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের নিজ নিজ জীবনে, ঐ সমাজরূপী ঈশ্বরকে সেবা করিবার যোগ্যতা অর্জিত হইয়াছে কিনা,—যথোচিত ত্যাগ ও প্রেমের সাধন-সঞ্চয় কতখানি আছে। অন্যথায় আমাদের এত সব কথা,—শুধুই কথামাত্র হইবে। উল্লিখিত ঐ প্রেরণা-শক্তিকে বাদ দিয়া সমাজ-সেবা, রাষ্ট্র-কল্যাণ, দেশের উন্নতিবিধান নিছকই বিড়ম্বনা! দৃষ্টান্ত, আমাদের চোখের সম্মুখেই—ঘরে-বাহিরে-পথে-ঘাটে,—অফিসে-আদালতে,—শিক্ষায়-শিল্পে সর্বত্র। ঐ প্রেরণা-শক্তিটিই ভারতের চিরন্তন আদর্শ—তাহার পারমার্থিক ধ্যান-ধারণা—অবিতথ আত্ম-সত্য,—জাতির জীবনসঞ্চারী রক্তপ্রবাহ। যতক্ষণ অবধি ঐ রক্তপ্রবাহ শুদ্ধ, অবিকৃত ও চলমান

থাকিবে, ততদিন উহাতে কোনও ব্যাধি-বীজাণুর অনুপ্রবেশ ঘটিলেও, বেশীক্ষণ বাঁচিতে পারিবে না নিশ্চয়ই। 'উদ্বোধন'-এর মুখ্য কাজ হইবে, জাতির জীবনসঞ্চারী এই রক্তপ্রবাহকে শুধু গতিশীল রাখাই নহে, উহাকে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল ও রোগ-বীজাণুমুক্ত রাখা। স্বামীজীর ভাবানুকরণে আমরাও নির্ভয়ে আত্মবিশ্বাস লইয়া বলিতে পারি, "যদি এই রক্তপ্রবাহ বিশুদ্ধ থাকে, তবে সামাজিক বল, রাজনৈতিক বল—ঐহিক জীবনের যাহা কিছু দোষ বা ত্রুটি আছে—এমন কি দেশের ঘোর দারিদ্র্য পর্যন্ত নিবারিত হইয়া যাইবে।"

সমাজের সর্বস্তরের কল্যাণ-সাধনই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষের ঐহিক জীবনের বিকাশ ও উন্নতির দিক-গুলির দিকেও আমাদিগকে তীক্ষ্ণ মনোনিবেশ করিতে হইবে। ইহলোকে জীবন-যুদ্ধে যে প্রতিনিয়ত পরাভূত নিষ্পেষিত হইতেছে,—দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতেই যাহার আয়ু নিঃশেষ হইতেছে,—নিজ পরিজন-পরিবারের লালন-পালনেই যে অপারক,—বন্ধু-প্রতিবেশীর সুখে-দুঃখে অংশভাগী হইতে যে অসমর্থ, তাহাকে কোন আধ্যাত্মিক পথ-নির্দেশ বা উচ্চতর জীবন-লক্ষ্যের সন্ধান-দান নিতান্তই পরিহাস নয় কি? এ-হেন ব্যক্তির কাছে গীতা-কথামৃত অপেক্ষা অন্ন-বস্ত্র ও শিক্ষা-চিকিৎসার সংবাদই অধিক সমাদরণীয়। এই কারণেই ব্যক্তিগত অন্তর্জীবন বিকাশের সহায়ক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও দর্শন ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে, সমষ্টি মানবের বহির্জীবনের উন্নতি বিধায়ক নীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতিরও বহুল চর্চার অপরিহার্যতা স্বীকার করিতেই হইবে। এবং ইহাও সত্য যে, উল্লিখিত ঐহিক সমৃদ্ধির জন্য আমাদের ভারতীয় ভাবসম্পদের সহিত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সাদরে সমন্বিত করা প্রয়োজন। ভারতের মোক্ষপ্রবণ সত্ত্বভাব-প্রবাহকে, পাশ্চাত্যের ঐহিক কল্যাণপ্রদ রজঃ শক্তির দ্বারা পরিপুষ্ট করিতে না পারিলে বর্তমান যুগোপযোগী আদর্শ সমাজ-গঠন সম্ভবপর হইতে পারে না। ত্যাগ-মোক্ষ, জ্ঞান-ভক্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণগুলিকে, ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে ক্রিয়াশীল এবং প্রয়োগ-দৃপ্ত করিতে হইলে উহাদিগকে উপযুক্ত সতর্কতার সহিত রজোগুণ-মণ্ডিত করিতেই হইবে। অন্যথায় উচ্চতম আদর্শেরও ব্যাবহারিক দিকটি একেবারেই শূন্য থাকিয়া যাইবে। আদর্শকে তখন কেবলমাত্র সযত্নে পেটিকাবদ্ধ করিয়াই রাখিতে হইবে—নিছক আভিজাত্য ঘোষণার জন্য, বাস্তবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নহে। কেবল তাহাই নহে, উচ্চ ভাবাদর্শকে জীবনে অব্যবহার্য রাখিয়া, কুলঙ্গিগত করার আরও অবশ্যম্ভাবী কুফল এই যে,—ঐ ভাস্বর সত্ত্ব-গুণাবলীও ক্রমে ধূলিমলিন হইয়া ঘোর তমোগুণে পরিণত হইতে থাকে। নিজেদের অপদার্থতা ও জাড্যকে তখন বৈরাগ্যের বা জ্ঞানের চাকচিক্যময় মোড়কে মুড়িয়া বাহিরে প্রচার করার প্রবণতা পাইয়া বসে। আত্মম্ভরিতাকে তখন আত্মমর্যাদা বলিয়া জাহির করিতে ইচ্ছা জাগে,—অকর্মণ্যতাকে ঢাকিবার উহাই কৌশল হইয়া দাঁড়ায়। কারণে অকারণে অপরের দোষ দর্শন ও সকল মন্দ ব্যাপারের দায়-দায়িত্ব অন্যের স্কন্ধে অর্পণ তখন সহজ স্বভাব হয়।

আমরা প্রাচ্য ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-প্রবাহের স্বাস্থ্যকর, সুন্দর ও মাধুর্য-প্রদায়ী মিলনের কথাই বলিতে চাহিতেছি। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগের জন্য এই আদর্শকেই সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রস্তাবনায় তিনি লিখিয়াছেন: "ভারতে রজোগুণের প্রায় একান্ত অভাব; পাশ্চাত্যে সেই প্রকার সত্ত্বগুণের।…এই দুই

শক্তির সম্মিলনের ও মিশ্রণের যথাসাধ্য সহায়তা করা উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য।"

অবশ্য নির্বিচারে এই রজো-প্রবণতাকে বরণের বিপদও আছে,—স্বামীজী সেদিকেও যে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া না দিয়াছেন, তাহা নহে। ঐ প্রস্তাবনাতেই তিনি সাবধান-বাণী রাখিয়া গিয়াছেন: "যদ্যপি ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্য বীর্য তরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারত ভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্মহারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই।" ভাবিতে বিস্ময় লাগে, আমাদের আজিকার সমাজ-চিত্রখানি সেই ত্রিকালদর্শী ঋষিদৃষ্টিতে কী অপূর্ব নিখুঁত ও জীবন্ত হইয়া ধরা দিয়াছিল—আজ হইতে প্রায় শতাব্দ কাল পূর্বে! যুগকর্তা স্বামীজী তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে অনুসরণীয় পন্থার নির্দেশও রাখিয়া যাইতে ভুলেন নাই। উল্লিখিত প্রস্তাবনাতেই তাহা দেখিতে পাই:

"...ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে; যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে, তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্ব দ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে। আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্য কিরণ। যাহা দুর্বল ও দোষযুক্ত, তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে। যাহা বীর্যবান্ বলপ্রদ, তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?"

'উদ্বোধন'-এর দায় ও কর্তব্যকে সবিশেষ বুঝা যায়, উহার প্রথম আত্মপ্রকাশের কালে স্বামীজীর ঐ প্রস্তাবনা—তথা আশীর্বাণী হইতে। উহার উপসংহারে তিনি ওজঃপূর্ণ লেখনীমুখে আরও বলিয়াছেন:

"সত্য কি বাস্তবিক শক্তিহীন? 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্'—এই বেদবাণী কি মিথ্যা? অথবা যে-গুলি পাশ্চাত্য রাজশক্তি বা শিক্ষশক্তির উপপ্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই আচারগুলিই অনাচার ছিল? ইহাও বিশেষ বিচারের বিষয়। 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' নিঃস্বার্থভাবে ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 'উদ্বোধন' সহৃদয় প্রেমিক বুধমণ্ডলীকে আহ্বান করিতেছে এবং দ্বেষ-বুদ্ধি বিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্য প্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্যই আপনার শরীর অর্পণ করিতেছে।

"কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; আমরা কেবল বলি—হে ওজঃ স্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান্ কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান্ কর।"

'উদ্বোধন'-এর জীবন 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' উৎসর্গীকৃত এবং সমাজ-সমষ্টিরূপধারী ঈশ্বরের চরণে সেটি উৎসর্গ করিয়াছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। তাই 'উদ্বোধন' যেমন জাগরণের মন্ত্রগ্রন্থ, তেমনই ইহা মহা সমর্পণেরও স্মৃতিবহ,—বোধন ও উৎসর্জন উভয়েরই প্রতীক। নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা এই 'উদ্বোধন'-মন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষি বীরেশ্বর বিবেকানন্দের শ্রীপদেই মুহুর্মুহু প্রণাম জানাইতেছি। তাঁহার প্রসাদে আমরা যেন সকল অবস্থাতেই উদ্দেশ্য স্থির রাখিয়া চলিতে পারি।

হরি মহারাজের স্মৃতিতে স্বামীজী

[সংকলন]

যখন স্বামীজী প্রথমবার আমেরিকায় যান তখন আমি তাঁর সঙ্গে বোম্বাইয়ের পথে কতদূর গিয়েছিলাম। ট্রেনে যেতে যেতে তিনি আমাকে গম্ভীরভাবে বললেন, 'এই যে আমেরিকায় এই সব যোগাড় যন্ত্র হচ্ছে শুনেছ, তা সব এইটের (নিজের শরীর দেখাইয়া) জন্য। আমার মন আমায় এ-কথা বলছে শীঘ্রই দেখতে পাবে।'

স্বামীজী আমাদের বলতেন, 'তোমরা কি মনে কর, আমি শুধু লেকচার দিই? I know, I give them something solid. They know that they receive something solid.' (আমি জানি, আমি তাদের কিছু দিলুম, তারা জানলে তারা কিছু পেলে)। নিউইয়র্কে স্বামীজী একদিন ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন···। কা—বলেছিল, ধ্যানের সময় নীচের কুলকুণ্ডলিনীকে যেমন উপর থেকে একটা শক্তি আকর্ষণ করে, স্বামীজীর লেকচার শুনতে শুনতে সেই রকমটা হচ্ছিল। এক ঘণ্টা লেকচারের পর কা—announce (শ্রোতাদের জানিয়ে দিলে) করলে এখন প্রশ্নোত্তর হবে। স্বামীজীর লেকচারের পরই প্রায় সব লোক উঠে গিয়েছিল। স্বামীজী একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এর পর আর প্রশ্নোত্তর কিরে? বক্তৃতা শুনে লোকের মনে যে উচ্চ ভাব জেগে উঠেছে ওতে যে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে।' বোঝ একবার ব্যাপার। গোবিন্দ! গোবিন্দ!! কি একটা শক্তি ঠাকুর তৈরি করে রেখে গেলেন! জগৎটার চিন্তার গতি একেবারে বদলে গেল। যাকে কেউ টানতে পারে না, যে সকলকে টানে তার কত শক্তি একবার বোঝ!

স্বামীজী একবার স্পর্শ করে কিডির* মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। কিডি ভারি নাস্তিক ছিল। কখনও কখনও স্বামীজীর একটা খুব শক্তি এসে যেত। তখন কাউকে স্পর্শ করে তার ভেতর যেন ধর্ম ভাবটা প্রবেশ করিয়ে দিতেন।

স্বামীজী সত্যই পরকে সাহায্য করতে পারতেন। তাঁর এমন কিছু গোপন জিনিস ছিল না, যা তিনি অপরকে দিতে না পারতেন— আমাদের তো ঐখানেই মুশকিল। যদি কেউ আমাদের থেকে বড় হয়ে যায় ঐ ভয়। তিনি কিন্তু এত উপরে ছিলেন যে তাঁর ও ভয় ছিল না। তাঁর ঈর্ষা ছিল না। তিনি বলতেন, 'যে যে-জায়গায় আছে, তাকে সে-জায়গায় সাহায্য কর। তার যেখানে অভাব সে-জায়গাটা তার পুরিয়ে দাও। না পার জোর করে তাকে তোমার মতো করতে চেষ্টা করো না।'

তাঁর অদ্ভুত শক্তি ছিল! অনেকের উপর তিনি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কিন্তু খুব কম লোকেই তা স্বীকার করে। অনেকে স্বামীজীর বাণীকেই নিজের বাণীরূপে প্রচার করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নির্ভীক।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক। তিনি কোন আপস না করেই সর্বোচ্চ সত্য প্রচার করেছিলেন। তিনি কেবল দিতেন, প্রতিদানে কিছু চাইতেন না। অপরে এক ফোঁটা দেয় এবং তার পরিবর্তে এক বালতি চায়।

*

Personality (ব্যক্তিত্বই) হচ্ছে আসল জিনিস। গোটা কতক মানুষই জগৎটা চালাচ্ছে, আর সব ভেড়া। স্বামীজী পৃথিবীটা ঘুরে এসে

* সিঙ্গার ভেলু মুদালিয়ার নামক মাদ্রাজী অধ্যাপক। ইনি অনেক সময় ফলমূল খাইয়া থাকিতেন বলিয়া স্বামীজী ইঁহাকে রহস্য করিয়া কিডি বলিয়া ডাকিতেন। তামিল ভাষায় কিডি বলিতে পক্ষী বুঝায়।

বললেন, 'Democracy-র (গণতন্ত্রের) মাথা মুণ্ড নেই—দু-চার জন লোকই কাজ চালাচ্ছে। দেশ যখন কাজ চালাবার উপযুক্ত লোক দিতে না পারে, তখনই গোল্লায় যায়। আমাদের তো ধর্ম-প্রাণ দেশ। আমাদের বরাবর saints produce (সাধুপুরুষ প্রসব) করে আসছে। ইতিহাসে এমন একটা সময় দেখিয়ে দাও, যখন আমাদের দেশে এটি হয়নি। এক-একটা জীবন কত শত বৎসর কত লোককে চালাচ্ছে। দেখ না, নানক, কবীর। দেখ, তুলসীদাস কতদিন থেকে এ দেশটা চালাচ্ছে।'

স্বামীজী বলতেন ধর্মই ভারতের প্রাণ, ভারতের সেই ভাব এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভারতে চিরকাল ধরে ধর্মবীর সাধুপুরুষ জন্মে আসছেন। ভারতকে সমগ্র জগতে এই ধর্ম বিস্তার করতে হবে। স্বামীজীর কথা ফলবেই, দেশ আবার উঠবে। স্বামীজী একবার বলেছিলেন, এবার আর কিছু বলতে বাকি রেখে গেলাম না। তিনি সব বলে গেছেন। এখন তাঁর সেই সব ভাবই নানাবিধ প্রণালীর মধ্য দিয়ে কার্যে পরিণত হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী তারই একটি প্রণালী মাত্র। স্বামীজীর সেবা ধর্মের প্রবর্তন এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমার বিশ্বাস ভারতের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। আমাদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে না পারি, পরে নিশ্চিত হবে। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আরম্ভ হয়েছে। এই অভ্যুত্থান ব্যতীত ঠাকুর স্বামীজীর মতো ব্যক্তির আগমনের কোন মানেই থাকে না। স্বামীজী কতবার উজ্জ্বল ভাষায় ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরব-চিত্র অঙ্কিত করে গেছেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কথনও মিথ্যা হতে পারে না।

সংশয় রেখো না। তাঁর কাজ জেনে সবটা শরীর মন প্রাণ তাতে ঢেলে দাও। এ থেকেই সব হয়ে যাবে। সমাধি-টমাধি যা কিছু ভাবছ সব এর থেকেই হবে। সংশয় রেখো না। কাজে লেগে যাও। স্বামীজী আমায় দার্জিলিঙে বলেছিলেন, 'হরি ভাই, এবার নূতন একটা পথ করে দিয়ে গেলুম। এতদিন লোকে জানত, ধ্যান, জপ, বিচার প্রভৃতি দ্বারাই মুক্তি হয়। এবারে এখানকার ছেলেরা মেয়েরা তাঁর কাজ করে জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে। তাঁর আদেশ সত্য, তাতে সংশয় রেখো না।'

সেবাশ্রমে রোগীর সেবায় সাক্ষাৎ নারায়ণের সেবা হয়। শিবতুল্য স্বামীজীর বাক্যে বিশ্বাস কর, সেবাশ্রমে শিবের সেবায় লাগ, মুক্ত হয়ে যাবি। পূর্ব-পূর্ব জন্মের কর্ম এতে ক্ষয় হয়ে যায়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। নারায়ণজ্ঞানে সেবাই এই যুগের উপযোগী সাধনা। আমি ঠাকুরের কাজ এড়িয়ে ছিলাম বলে আমাকে এত ভুগতে হল।

আমার স্বামীজীর একটা কথা মনে পড়ছে। স্বামীজী প্রায়ই বলতেন, 'We agree to differ'. অর্থাৎ আমাদের শত শত মতভেদ থাকলেও পরস্পরের মতভেদ স্বীকার করে নিয়েও এক যোগে আমরা কাজ করব।

স্বামীজী কি সত্ত্বগুণী ছিলেন না? তাঁর মতো সত্ত্বগুণী কে ছিল? সঙ্গে থেকে তো দেখেছি। এ তো শোনা কথা নয়। রাত ৯টায় ধ্যানে বসে ভোর ৫টায় উঠে স্নান করতে গেলেন। মশায় গা ছেয়ে ফেলেছে, যেন গায়ে একখানা কালো কম্বল বিছিয়ে দিয়েছে। তবু হুঁশ নেই। যেন শিব ধ্যানে বসেছেন। এই সত্ত্বগুণের লক্ষণ—ইন্দ্রিয় মনের সম্পূর্ণ সংযম—সম্পূর্ণ সাম্য ভাব। তিনি দেখেছিলেন যে রজোর মধ্য দিয়ে না গেলে ভারতের কল্যাণ নেই। সেইজন্যই নিষ্কাম কর্মের ব্যবস্থা করেছেন। এ সত্ত্বের রজঃ।

স্বামীজীঃ আমার স্মৃতিপটে

স্বামী অতুলানন্দ

[স্বামী অতুলানন্দজী (গুরুদাস মহারাজ) একদা একান্ত ঘরোয়া আলাপ-প্রসঙ্গে স্বামীজী সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, উহাই সমীপবর্তী জনৈক সন্ন্যাসী লিখিয়া লইয়াছিলেন। শ্রুতলিখিত কথাগুলি পরে মহারাজকে দেখানো হইয়াছিল এবং তিনি উহাতে কিছু সংশোধনাদিও করিয়া দিয়াছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধটি সেই মূল ইংরেজী লিখনেরই সরল বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক : ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য।—সঃ]

যা আমাকে প্রথম মুগ্ধ করেছিল, তা হচ্ছে তাঁর দুটি চোখ

সেটা ছিল ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, যখন স্বামীজী দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যান। নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে তাঁকে যেতে হয়েছিল। যখন তাঁর আসার খবরটা শুনলাম, স্বভাবতই ভারী খুশী হয়েছিলাম। আমিও বেদান্ত সোসাইটির একজন সদস্য ছিলাম। বেদান্ত সোসাইটিতে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকেই তিনি মেঝের ওপর বসে পড়েন। ঘরে কিন্তু চেয়ার ছিল—সোসাইটির সদস্যরা তাঁর জন্য সব ব্যবস্থাই ঠিক রেখেছিল। সুতরাং যখন তাঁকে অমনি মেঝের উপর বসে পড়তে দেখলাম, তখন কিছুটা তাজ্জব ও বিস্মিত হয়েছিলাম। তারপর দেখি তিনি সহসা উঠে দাঁড়ালেন এবং উপস্থিত সবার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ ও ঘোরা-ফেরা করতে লাগলেন, যেন কতদিনের চেনা-জানা। সেদিন যা আমাকে প্রথম মুগ্ধ করেছিল, তা হচ্ছে তাঁর দুটি চোখ। চোখ দুটি ছিল উজ্জ্বল এবং আয়ত। তাঁর দৃষ্টি ছিল গভীর একাগ্রতার। যখন তিনি যে-বিষয়ে কথা বলতেন, তখন যেন সেই বিষয়ের উপরই তাঁর সমগ্র মনটি নিয়োজিত থাকত। সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি কথা বলতেন। মুখে যা বলতেন, সত্যি সত্যি মনেও করতেন তাই। এটাও আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন দিতে এবং নিতেও বটে। তিনি ও-দেশে দিতেন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব—আর জানতে চাইতেন, কেমন করে আমেরিকায় উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্যবাসীদের প্রয়োজন ছিল ধ্যান-ধারণার। তাদের হওয়া উচিত আরও সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন; এবং হিন্দুদের দরকার আরও খানিকটা রজোগুণের।···

খুব সামান্য জিনিসেও তিনি মনকে পূর্ণ একাগ্র করতে পারতেন

তিনি প্রায়ই একাগ্রতা সম্বন্ধে বলতেন। জীবনে সাফল্যের রহস্য এটাই। তুমি যা কর, তাতেই তোমার মনের সবটুকু নিয়োজিত কর। একটা ভাব আশ্রয় করা চাই। সেটি চিন্তা কর এবং তার উপরই তোমার মনটি একাগ্র কর। যদি তুমি তা করতে পার, তাহলে তোমার মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ হবেই। রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ নামে নানা পথ আছে। যে কোন একটি বা একের অধিক পথ অবলম্বন কর এবং তাতেই একাগ্র হও। একটি ভাব ধরে থাক, কারণ এটাই জীবনে সাফল্যের রহস্য।

স্বামীজী সব সময় তন্ময় হয়ে থাকতেন। এমনকি অতি সামান্য ব্যাপারেও তিনি গভীর মনোযোগী হতেন। একটি ঘটনা বলছি তোমাদের। একবার তিনি নিউইয়র্কে এক ভক্ত পরিবারের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর উপস্থিতি ও কথাবার্তায় বাড়ির সবাইকে তিনি অচিরে মুগ্ধ করেছিলেন। বাড়ির গৃহিণী তো দারুণভাবে

তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর সেবার জন্য কিছু করতে সর্বদাই ইচ্ছুক থাকতেন। একদিন সকালে ঐ মহিলা স্বামীজীর ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিতে থাকেন, কিন্তু ভিতরে স্বামীজীর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে তিনি ফিরে চলে যান। কিছু সময় বাদে আবার তিনি ঘুরে এসে স্বামীজীর ঘরে ঢোকেন এবং আসবাব-পত্র সাফাই করতে লেগে যান। তিনি দেখতে পেলেন যে, স্বামীজী সেই তখন থেকেই কী একটা বই পড়ে চলেছেন। তিনি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, তাঁর দরজায় ধাক্কা-দেওয়া, সশব্দে ঘরে-ঢোকা ও চলা-ফেরা সত্ত্বেও স্বামীজী তাঁকে আদৌ খেয়াল করেননি! মনে করলেন যে, স্বামীজী নিশ্চয়ই কোন কঠিন দার্শনিক বই পড়ায় ডুবে আছেন। স্বামীজীকে তাই তিনি পরে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন। শুনে স্বামীজী হেসে উঠেছিলেন এবং বলেছিলেন, তিনি কিপলিঙের জঙ্গলের গল্পমালা (Jungle Stories of Kipling) পড়ছিলেন। মজার ব্যাপার! একটা তুচ্ছ জিনিসের উপরও তিনি সম্পূর্ণরূপে মন একাগ্র করতে পারতেন। এই ঘটনাটি সেই মহিলাটির মনে গভীর ছাপ রেখেছিল।

স্বামীজীর প্রধান শিক্ষাই ছিল —মানুষের দেবত্ব

প্রধান যে-জিনিসটা স্বামীজী শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা হল মানুষের দেবত্ব। মানুষ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং পূর্ণ। বলতে গেলে, এই ব্রহ্মত্ব বা পূর্ণতা মেঘাচ্ছন্ন। তোমাকে এই মেঘ অপসারণ করতে হবে এবং তখনই দেখবে সূর্যকিরণে সব উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। একজন মনোবিজ্ঞানীকে মনে পড়ছে, তিনি সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বামীজীকে বলেছিলেন, রাজযোগ শিক্ষা দিয়ে আপনি পাশ্চাত্য মানুষদের অনেক কিছু দিয়েছেন। এতে অনেক মানুষের চোখ খুলে গেছে এবং পশ্চিমী পণ্ডিতমহলে এটি খুব প্রশংসিত হয়েছে।

যীশুর ছবির সম্মুখে: শুদ্ধাত্মা শুদ্ধাত্মাকে নতি জানাচ্ছেন

একটি ছোট্ট ছবির ঘটনা আমার স্মৃতির কোঠায় লুকিয়ে আছে, যা পুনরায় চিন্তা করলে মনে হয় যেন এক্ষুণি ঘটনাটি ঘটেছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় নিউইয়র্কে ঘটনাটি ঘটেছিল, যখন স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় এসেছিলেন। আমি যে অফিসে কাজ করতাম, তার শনিবার দুপুরগুলি বন্ধ থাকত এবং আমার একটা অভ্যাস ছিল যে, এই দিনগুলিতে অফিস ছুটির পর বেদান্ত সোসাইটিতে গিয়ে সেখানে যদি কোন কাজ থাকে তা করা। এক শনিবার বিকালে যখন আমি বেদান্ত সোসাইটিতে এলাম, তখন সেখানে কয়েকটি বেদান্তের ছাত্রের সঙ্গে আমার দেখা হল, তারা বৈঠকখানায় যীশুর বড় একটি ছবি টাঙাবার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে বড়ই ব্যস্ত। ছবিটি বেদান্ত সোসাইটির একজন ভক্ত সোসাইটিকে উপহার দিয়েছিলেন। ছবিটি আঁকা—যীশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কয়েক দিন আগে গেৎশিমানীতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়ে প্রার্থনা করছেন: 'পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এই ব্যথার পানপাত্র আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও, তবুও আমার নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' আমরা যখন ছবিটি টাঙাবার জন্য এইরকম ব্যস্ত, তখন স্বামীজী হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং আমাদের দেখে বলে উঠলেন: 'ওহে, তোমরা কি করছ?' আমরা ছবিটি টাঙাবার কথা বললাম এবং তাঁকে ছবিটি দেখালাম। স্বামীজী ছবিটির সামনে শ্রদ্ধা-অবনতমস্তকে হাতজোড় করে কিছু সময় দাঁড়ালেন। এবং খুব নিম্নস্বরে, প্রায় ফিসফিস

করে যীশুর নাম উচ্চারণ করলেন এবং তিনি যেন তাঁর নিজের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন: 'তিনি যীশু, মহান্ ত্যাগী—খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী। কী মহত্ত্ব! কী মহান্ হৃদয়! তাঁকে ইতর জনসাধারণ বিদ্রূপ করেছিল, ক্রুশবিদ্ধ করে তাঁকে রক্তাক্ত করেছিল, তবুও সেই মহান্ পুরুষ তাঁর শত্রুদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন: "পিতা, ওদের ক্ষমা কর, জানে না, ওরা কি করছে।"' তারপর তিনি চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে নীরবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এই ছোট্ট কাহিনীটি আমাদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। আমরা সেদিন যা দেখেছিলাম এবং অনুভব করেছিলাম তা হল—শুদ্ধাত্মা শুদ্ধাত্মাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। এই ঘটনায় স্বামীজীর স্বভাবের ভক্তির দিকটিও আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছিল।

বিবেকানন্দকে

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ শীল

যখন এসেছিল ধর্মের গ্লানি,
সমাজ পরিণত হয়েছিল জীর্ণ ভগ্নস্তূপে,
তখন সকল অবক্ষয়ের অন্ধকার বিদীর্ণ করে
এসেছিলে তুমি, সত্যান্বেষী।
তুমি বিশ্ববিজয়ী, বীরেশ্বর।
শিরে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী করেছিলে প্রচার
স্বদেশের সনাতন ধর্মকে প্রাচ্যে, প্রতীচ্যে।
দিয়েছিলে প্রেরণা দেশবাসীর নব-চেতনার মূলে।
বীর্যদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলে সংগ্রাম—
অধর্ম আর অসত্যের সাথে।
শুনিয়েছিলে পৃথিবীকে জীবপ্রেমের—অমর বার্তা:
'জীবসেবাই ঈশ্বর সেবা'।
তোমার শাশ্বত বাণী আজ হোক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।
তোমার প্রদীপ্ত চিন্তা করুক বিকশিত দুর্বলতায়
অপলিপ্ত চিত্ত।
তোমার কঠিন আদেশ মুক্ত চেতনার আলোকময়
স্বর্গে করুক জাগ্রত।

বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী প্রেমেশানন্দ

[প্রবন্ধটি লিখিত রচনা নহে,—ভক্তলিখিত প্রসঙ্গোক্তি হইতে সংকলিত।—সঃ]

শ্রীশ্রীঠাকুর বৈষ্ণবদের জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবন—এই কথাটি বলিতে গিয়া, জীবে দয়ার কথায় বলিয়াছিলেন, একজন মানুষের পক্ষে অন্য মানুষকে দয়া করিতে যাওয়াতে অহংকারের ভাব রহিয়াছে। অতএব, জীবে দয়া না বলিয়া শিবজ্ঞানে জীবসেবা বলাই কর্তব্য। কিন্তু কথাটার গভীরতা সৌন্দর্য মাধুর্য শ্রোতারা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কেবল স্বামীজী ঠাকুরের নিকট হইতে আসিয়া ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি আজ একটি খুব আশ্চর্য নূতন কথা শুনিলাম; যদি কোনদিন সুযোগ হয়, আমি সর্বত্র প্রচার করিবার চেষ্টা করিব।"

আমাদের মতো সাধারণ লোকের নিকট অতি আশ্চর্য কথা কেহ বলিলে, আমরা তাহার কোন মূল্য দিতে পারি না। যখন যে হুজুক উঠে জনসাধারণ তাহাতেই মাতিয়া যায়। মহাপ্রভু শুদ্ধাভক্তির কথা বলিয়াছিলেন, এখনও বাংলা-দেশের অতিশয় মূর্খও শুদ্ধাভক্তির কথা বলিয়া থাকে। ব্যাপারটা যে কি গুরুতর, তাহা যেন কেহই বুঝে না। পাঞ্জাবে সন্ন্যাসীদের প্রভাব খুব বেশী থাকায় সেইখানে সকল লোকই জ্ঞানীর মতন কথা বলিয়া থাকেন। বাংলাদেশে দরিদ্র-নারায়ণ সেবা নামক কথাটা একটা নিতান্ত হুজুকে পরিণত হইয়াছে। এমনকি ইহা একটি লাভজনক ব্যবসায় বলিয়াও কেহ কেহ ভাবিয়া থাকে মনে হয়।

কিন্তু শিবজ্ঞানে জীবসেবা এই তত্ত্বটি একটি আশ্চর্য জিনিস। প্রথম যখন ইহা প্রচারিত হয়, তখন অনেক প্রাচীন জ্ঞানীব্যক্তিও কথাটা অদ্ভুত বলিয়াই মনে করিতেন। আমার প্রত্যক্ষ একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিলে কথাটা বেশ পরিষ্কার হইবে, আশা করি। একসময়ে আমি কিছুকাল হৃষীকেশের নিকটবর্তী স্বর্গাশ্রম নামক স্থানে বাস করিয়াছিলাম। সেই সময়ে হঠাৎ একদিন দেখি, বাংলাদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত রাজেন ঘোষ সেইখানে গিয়া উপস্থিত। রাজেন ঘোষ কঠোর অদ্বৈতবাদী, বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ, শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী ছিলেন। রামকৃষ্ণ-সংঘের সন্ন্যাসিগণ বেদান্ত চর্চা না করিয়া জনসেবায় সময় নষ্ট করেন বলিয়া তিনি আমাদিগকে বেশ একটু অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। বেলুড় মঠে একদিন কথায় কথায় তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন স্বামীজী নাকি শঙ্করাচার্যের অবতার। তাঁহার মতো লোকের সঙ্গে তর্ক করিবার সাহস আমার ছিল না বলিয়া সেদিন আমি চুপ করিয়া ছিলাম। স্বর্গাশ্রমে আজ তিনি খুব বন্ধুভাবে নানাভাবে শাস্ত্রের কথা আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, একজন তত্ত্বজ্ঞ সাধুর সন্ধানে উত্তরাখণ্ডে আসিয়া তিনি বহু স্থানে অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার মনোমত একটি সাধুও দেখিতে পান নাই। তাহার পর আমাদের সঙ্ঘের কথা বলিতে বলিতে আমি বলিলাম, বর্তমানে আমাদের দেশে ধর্মচর্চার অত্যন্ত অভাব। শিক্ষিত ভদ্রলোকের শরীর বড়ই অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্যই স্বামীজী আমাদিগের জন্য এই নূতন ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যতক্ষণ শরীরে মনে সয়, আমরা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিব এবং বাকী সময় পরমাত্মা সর্বজীবের হৃদয়ে আছেন, এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া জীবের সেবা করিব। 'সোঽহং' ভাবিয়া ধ্যান করাও যা, 'তত্ত্বমসি' ভাবিয়া মানুষের সেবা করাও একপ্রকার নিদিধ্যাসন। ঘোষ মহাশয় এই কথা শুনামাত্র হাত দুখানা ঊর্ধ্বে তুলিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া "বাঃ বাঃ"

বলিয়া উঠিলেন।[১] এই কথাটার প্রকৃত রসানুভূতি তাঁহার মধ্যে লক্ষ্য করিয়া, আমিও খুব উৎফুল্ল হইয়াছিলাম আমরা ১৯১৫/১৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টে যখন একটু জীবসেবার চেষ্টা আরম্ভ করি, তখন সেই দেশীয় পণ্ডিতগণ বলিতেছিলেন, সেবা তো শূদ্রের ধর্ম, রামকৃষ্ণের ভক্তরা দেশের সকল লোককে শূদ্রে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে। তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণদের এই কথাটি একেবারে মূল্যহীন ছিল না। যাহারা ব্রহ্মবিত্তার রহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাহারা জীবকে শিবজ্ঞান করিবে কিরূপে ?

ভগবানের সেবার নাম করিয়া দরিদ্র কাঙালের অর্থে এবং পরিশ্রমে ভারতবর্ষে যে মন্দিরের বাহুল্য দেখা যায়, ভারতবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয় যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এই ব্যাপারে মর্মাহত হইয়া থাকেন। সেই দরিদ্র কাঙালদের সেবার দিকে যদি জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহা যে দেশের পক্ষে কত মঙ্গলজনক হইবে, তাহা আমরা বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। সংসারের হাঙ্গাম এড়াইয়া, সংসারত্যাগের নাম করিয়া সমাজের ঘাড়ে চাপিয়া বসা, এই দেশে কি সর্বনাশকর হইয়া উঠিয়াছে, যাঁহারা বৈরাগী-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে কিছু জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন। সংসারত্যাগের নাম শুনিলেই ভারতবাসী না জানিয়াই ঢলিয়া পড়ে—সংসার কি এবং ত্যাগ কি, তাহারা কেহই বুঝে না। যদি দরিদ্রনারায়ণসেবারূপ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া উহারা জীবিকা নির্বাহ করে, তবে তাহাদের ঐ শূদ্রত্ব ভারতবর্ষের তেমন ক্ষতিকর হইবে না। পরন্তু যদি ঠাকুরের কথিত এবং স্বামীজী প্রচারিত এই মহাতথ্যটিকে কোন মুমুক্ষু সাধক একটু বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' অর্পিত তাঁহার জীবন কৃতার্থ হইবে এবং দেশও ধন্য হইবে।

জীবে শিবজ্ঞান এই কথাটিও যদি দেশের সর্বস্তরে প্রচারিত হয়, তাহা হইলে, (ব্রহ্মচারীদের শিক্ষাজীবনে, গৃহস্থদের গার্হস্থ্যাশ্রমে, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসীদের কথা বলাই বাহুল্য) কত যে মহত্ত্ব বিকাশের সম্ভাবনা, যাঁহারা একটু চিন্তা করিতে পারেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিবেন।

আর যদি মুমুক্ষুগণ বেদান্ত-বিজ্ঞানের প্রণালী অনুসারে, বিচারের দ্বারা এই মহাসত্যের একটু আভাস পাইতে পারেন, তাহা হইলে এই জীবনেই মুক্তিলাভ তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। যেহেতু জীবে ব্রহ্মবুদ্ধি করিতে পারিলে, সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্মচিন্তা অবিরাম চলিতে থাকিবে। এখনও ভারতে ব্রহ্মবিদ্যার দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। যদি ভগবানের কৃপায় ভারতে আবার ব্রহ্মতত্ত্ব জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে স্বামীজীর এই অমোঘ মন্ত্র ভারতের অভ্যুদয় সাধন করিবেই করিবে। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বামীজীর 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কি কখনও ব্যর্থ হইতে পারে ?

*　　*

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের রূপ ধরিয়াছিলেন বটে এবং যাঁহারা তাঁহার নিকট ছিলেন, তাঁহারাও ঠাকুরকে মানুষ বলিয়াই মনে করিতেন। আমরা দূর হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যে-সব কথা পুস্তকে পড়িয়াছি এবং তাঁহার শিষ্যদের নিকট শুনিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে আমাদের নিকট, পাঠশালার ছাত্রদিগের কাছে কলেজের অধ্যাপকের মতো মনে হয়। তিনি ছিলেন সনাতন ধর্মের পূর্ণ প্রতিমা। স্বামীজী ব্যাখ্যা করিয়া না বুঝাইলে,

১ পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বামী চিদ্ঘনানন্দ পুরী নামে পরিচিত হন।—সঃ

তাঁহার জীবন আমাদের কাছে কেবল পূজার জিনিস হইয়াই থাকিত—আমরা অনুকরণ বা অনুসরণ করিতে সাহস পাইতাম না।

উচ্চ আদর্শ কোন কালেই popular হইতে পারে না। আমরা গীতা পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত যে আদর্শের কথা জানিতে পারি, পৌরাণিক উদ্ভট গল্পে তাহা একেবারেই আজগুবি হইয়া পড়িয়াছে। বুদ্ধদেবের প্রেরণায় ভারতে যে নির্বাণবাদের ঢেউ উঠিয়াছিল, তাহার পরিণামও শুভকর হয় নাই।

এইবার পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশে জগতে এক নূতন রূপ আসিয়াছে। সারগাছির মতন গ্রামের বিদ্যালয়ে অশিক্ষিত কৃষকের ছেলেরা যে-সব বৈজ্ঞানিক তথ্য শিখিতেছে, তাহা কোন যুগেই মানুষের বিশ্বাস্য ছিল না, বেদ-বেদান্তে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদেরও নহে। একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইবে। একদিন কোন ব্রহ্মচারী শিক্ষক ছাত্রদের নিকট ঠাকুরের হোমাপাখীর গল্পটি বলিয়াছিল। একটি ছাত্র তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের সুরে বলিয়া উঠিল, "অত উপরে তো হাওয়া নাই, পাখী সেখানে অক্সিজেন পাইবে কিরূপে?" পাশ্চাত্য দেশে অধ্যাত্ম বিদ্যার চর্চা নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতিরাজ্যের বিচার-বিশ্লেষণে তাহারা কত দক্ষ হইয়া উঠিয়াছে! তাই তো স্বামীজী ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তিতর্কের অবতারণা না করিয়া বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহায়ে ব্রহ্মবিদ্যাকে একটি Exact Science রূপে প্রচার করিয়াছিলেন। আমেরিকা ও ইওরোপের সর্বত্র মনীষিগণ তাঁহার প্রচারকে খুব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছিলেন। এমনকি আমেরিকা ও আমাদের 'পরমপূজ্য স্বর্গস্থান মহাতীর্থ' ইংলণ্ডের শিক্ষিত লোকেরা পর্যন্ত তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিল।

ভারতের যে দুঃসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই সময়ের লোক তাঁহাকে বড় জোর এক মহাপুরুষের কোঠায় স্বর্ণসিংহাসনে তুলিয়া রাখিত আর জিলাপীভোগ দিয়া তাঁহার পূজা করিয়া কাজ সারিত। যখন এই দেশের লোক দেখিল, আমেরিকার, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের শুভ্রমূর্তি দেবদেবীগণ সপ্তম স্বর্গস্বরূপ তাঁহাদের নিজেদের দেশ ছাড়িয়া এই দেশে স্বামীজীর সেবক-সেবিকারূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন অন্ততঃ তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা স্বামীজীকে অবজ্ঞা করিতে পারিল না। স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশ হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহাকে নিয়া দেশে যে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মূলে ঐ—'পাশ্চাত্য বিজয়', তাঁহার প্রচারিত অদ্ভুত নবীন ধর্মমতের জন্য নহে। ঠাকুর তাই তো স্বামীজীকে দিয়া সর্বাগ্রে পশ্চিমে তাঁহার সুসমাচার (message) প্রচার করাইয়াছিলেন।

ভারতের কি যে দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেশ স্বাধীন হইবার পর হয়তো কেহ কেহ এক আধটু অনুভব করিতেছেন। এই সেদিন ভাষা সমস্যা নিয়া দেশে মনীষিগণ যে সুমতির পরিচয় দিলেন, তাহা তো আমাদের নিকট মর্মপীড়াদায়ক বলিয়া বোধ হয়। দেশের অবস্থা স্বাধীনতা লাভের পর উন্নতির দিকে চলিতেছে বটে, কিন্তু খুব আশাজনক নহে।

চিন্তাপ্রণালী ভারতে ব্যাপকভাবে প্রচার না করিলে বহুপুরুষপরম্পরা অভ্যস্ত পশ্চিমমুখী দৃষ্টিকে পূর্বমুখী করা সম্ভব হইবে না। নিজের দেশের সংস্কৃতি গৌরব সম্বন্ধে সচেতন না হইলে দেশের লোককে ঠাকুরের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাই সর্বাগ্রে স্বামীজীর উপদেশ মতো Man Making Education দেশে প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক। ভারতের বিষয়ে সারাজীবন চিন্তা করিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, এখন স্বামীজীই আমাদের জাতির একমাত্র ভরসা।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ স্মৃতি-তর্পণ

রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন

আজ যাঁর স্মৃতি তর্পণ করব, জগতের শিক্ষিত জনগণের কাছে তাঁর পরিচয় দেওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক। তিনি সর্বজনপরিচিত ছিলেন, এবং এখনও অসংখ্য জনগণের পূজা গ্রহণ করছেন।—তিনি সর্বজন-শ্রদ্ধেয় যুগমানব—মহামানব (Superman), ভারতের উজ্জ্বলরত্ন স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের কথা মনে হলেই আমার হিমালয়ের কথা মনে পড়ে। নগরাজ হিমালয়ের যেমন তুলনা নেই—মানবশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দও তেমনই তুলনার অতীত।

উনবিংশ শতাব্দের শেষার্ধে যে কয়টি জ্যোতিষ্ক ভারতগগন আলোকিত ও উদ্ভাসিত করেছিলেন—শুধু ভারতবর্ষ কেন—সমগ্র সভ্যজগৎ যাঁদের অবদানে উন্নতশীর্ষ হয়েছিল—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম। নিতান্ত অযোগ্য ভক্ত হলেও আজ বহুদিন পরে তাঁর স্মৃতির তর্পণ করতে বসেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি নরলোকে আমাকে ভাই বলে আলিঙ্গন করেছিলেন, আজ ত্রিদিবধামে অবস্থিত হলেও তাকে তিনি ভুলতে পারেননি, তার শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করবেনই।

আমার বন্ধুগণের অনেকের ধারণা—নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) আমার সহপাঠী ছিলেন।—তা ঠিক নয়। আমি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৭৯ অব্দে এপ্রিল কি মে মাসে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ্ (অধুনা স্কটীশ চার্চেস্) কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করি। আমার সহপাঠী ছিলেন—বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়। আর কে কে আমার সহপাঠী ছিলেন তা এখন আর মনে নেই। এতকাল পরে তাঁদের মধ্যে আর একজনের নামই আমার মনে পড়ছে—তিনি বর্দ্ধমান রাজস্টেটের সহযোগী ম্যানেজার ছিলেন—নাম হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়। আমার সেই কলেজ সময়ের বন্ধু হৃষীকেশ আজ কয়েকমাস হল পরলোকগত হয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৭৯ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮০ অব্দে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করেন। কয়েকমাস অধ্যয়নের পরই শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করেন। সে বৎসরটি তাঁর বৃথা যায়। ১৮৮১ অব্দে তিনি জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৮০ অব্দের শেষে এফ্., এ, পরীক্ষা দিয়ে আমি কলেজ থেকে বের হই। ১৮৮১ অব্দে আমি ঐ কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করি। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ আমার সহপাঠী ছিলেন না। আমার কলেজ ত্যাগের ০পর বৎসর তিনি কলেজে প্রবেশ করেন। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়েন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, হবার সম্ভাবনাও ছিল না; তবে তাঁকে আমি অনেক দিন দেখেছি এবং তিনিই যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাও জানতাম।

বাল্যকাল থেকেই আমি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতাম। আমাদের গ্রামে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের আমলে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হয়; তারপর যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের ব্রাহ্মসমাজও

"সাধারণ" দলভুক্ত হয়। স্কুলে পাঠের সময় থেকে কলেজের পাঠ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমি যথা-নিয়মে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতাম। কলেজ ত্যাগের পরও যখনই কলকাতায় আসতাম তখনই কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রবি-বাসরীয় উপাসনায় যোগদান করতাম এবং সে সময় যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই আমাদের গ্রামের সমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে যেতেন। সেই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারপর কলকাতাতেও তাঁরা আমাকে যথেষ্ট ভাল-বাসতেন। ব্রাহ্মসমাজের এই রবি-বাসরীয় উপাসনা উপলক্ষে একটি যুবক মধ্যে মধ্যে ব্রহ্ম-সঙ্গীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। আমরা ব্রাহ্ম বন্ধুদের কাছে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করেননি, কিন্তু ঐ ধর্মমতের প্রতি তাঁর আস্থা জন্মেছিল।

বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমি তাঁর গান শুনেছিলাম—তাঁর পরিচয়ও পেয়েছিলাম—কিন্তু সে সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার কথাও আমার মনে হয়নি এবং তিনি যে ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দ হবেন, এ কথাও তাঁর হাবভাবে আমি বুঝতে পারিনি। কথাবার্তা হলেও না হয়, হয় তো কিছু জানতে পারতাম, কিন্তু তাও তো হয়নি। আমার তখনকার স্মৃতি একটি সুন্দর-কায় আয়ত-চক্ষু সু-গায়ক নবীন যুবকেই পর্যবসিত হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ একযুগ চলে গেল। সংসার-নাট্যমঞ্চে কত নাটকের কত ভূমিকাই গ্রহণ করলাম। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। কত আশা আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুমের মত আকাশেই বিলীন হয়ে গেল। কত ক্ষণস্থায়ী সুখ জীবনান্ত-স্থায়ী গভীর মর্ম্ম-বেদনায় পরিণত হয়ে রইল। কত আনন্দের সংসার গড়তে গেলাম। দেখতে দেখতে সে সকল শ্মশান-ভস্মে পরিণত হয়ে গেল। আমার জীবনের এই ১২ বৎসরের কাহিনী—কি হবে আর সে সকলের আলোচনা করে।

সংবাদপত্রাদিতে শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে নানা কথা পড়তে লাগলাম। দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে অনেক জ্ঞানী গুণী মনীষী যাতায়াত আরম্ভ করলেন। পরমহংসদেবের কৃপা অনেকে লাভ করে ধন্য হয়ে গেলেন। আমিও দু'একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। কত সাধু, কত ভক্তের সমাগম দেখেছিলাম। আমি দুয়ারের কাছ থেকে প্রণাম করেই বিদায় নিয়েছিলাম। কোন-দিন তাঁর দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছিল কিনা সন্দেহ—কৃপা-দৃষ্টি তো মোটেই নয়।

সেই সময় শুনতে পেতাম—নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে খুব বেশী যাতায়াত করছেন। লোকের মুখে আর খবরের কাগজে এই সব সংবাদ পেতাম এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত যে পরমহংসদেবের পরম ভক্ত হয়েছেন এবং কিছুদিন পরে সংসার ত্যাগ করে স্বামী বিবেকানন্দ নাম ধারণ করেছেন, এ সংবাদও বন্ধুবান্ধবগণের মুখে অথবা সংবাদপত্রের মারফত পেয়েছিলাম। সাক্ষাৎ পরিচয় কিন্তু তখনও হয়নি, হবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না।

তারপর এক অভাবনীয় ঘটনায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্ত নহে) দর্শন লাভ করি। দর্শনলাভ মাত্র; পরিচয় হয়নি, আর তখন পরিচয় হবার অবস্থাও তাঁর ছিল না।

এ কিন্তু প্রায় ১২ বৎসর পরের কথা। আমি তখন হিমালয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাইনি। যাবার কল্পনাও মনে হয়নি। কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল জেলাবাসী—এক শিক্ষিত ভদ্রলোক

ডেরাডুনে এক ইংরাজী স্কুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্বপ্রথম ডেরাডুনে এই মাস্টারজীর আশ্রয় লাভ করি।

মাস্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন—হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন যেখানে ইচ্ছা যাবেন—একটা আড্ডার তো দরকার! যখন আমার এখানে এসেছেন, হিমালয়-ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রাম করবেন এবং সেই বিশ্রামসময়ে আমার স্কুলে ছেলেদের পড়াবেন!

ওরে বাবা!—সেই মাস্টারী! এই যে দেশ ত্যাগ করে এলাম—তুমি কিনা বিনা-টিকিটে আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে এই হিমালয়ের সানুদেশে ডেরাডুনেও উপস্থিত! কি করি,—ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন—তার পরিবর্তে যখন ডেরাডুনে থাকব তখন তাঁর স্কুলের ছেলেদের অঙ্কশাস্ত্রে গাধা বানাব।

আমি মাস্টারজীর স্কুলে পড়াই, খাই-দাই থাকি। প্রায় শনিবারেই অপরাহ্ণ দু'টার সময় স্কুল থেকে ফিরে এসে জুতা, পায়জামা, লম্বা কোট এবং প্রকাণ্ড পাগড়ী—আমাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য দেবানন্দের জিম্মা করে দিয়ে একখানি কম্বল ও লাঠি নিয়ে মাস্টারজীকে নমস্কার করে মহানন্দে বেরিয়ে পড়তাম। দুই তিন দিন বনে জঙ্গলে ঘুরে আবার ফিরে এসে পাগড়ী মাথায় দিয়ে ছেলেদের মাথার ভেতর সাইমাল্টেনিয়াস্ ইকোয়েশন্ ঢোকাতে আরম্ভ করতাম।

এই সময়ে এক শনিবারে বেলা একটা কি দুটোর সময় লাঠি আর কম্বল নিয়ে নগ্নপদে বেরিয়ে পড়ি। সেদিন আমার লক্ষ্যস্থান ছিল—হৃষীকেশ।

আমার আর কিছু যোগ্যতা থাকুক আর না-ই থাকুক—সে সময়, এখনকার মত, যদি হাঁটার প্রতিযোগিতা থাকত—তাহলে আমি গর্ব করে বলতে পারি যে, সব প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হতাম। পথে নামলে আমার পা দুখানিতে কে যেন পাখা বেঁধে দিত।

আমি সেদিন এমন হেঁটেছিলাম যে, সন্ধ্যার পূর্বেই হৃষীকেশে পৌঁছাই। অবশ্য তখন গ্রীষ্মকালের দিন—কাজেই খুব বড়।

হৃষীকেশে তখন সন্ন্যাসীদের আহার যোগাবার জন্য গুটি দুই তিন সদাব্রত ছিল। এখন কি হয়েছে জানিনে। সেই সদাব্রতের লোকরা হৃষীকেশের গঙ্গার চড়ার ওপর ঘাস পাতা বাঁশ খড় দিয়ে ছোট ছোট কুটীর তৈরি করে রাখতো। সন্ন্যাসীরা এসে সেই সব কুটীরে বাস করতেন। কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করতে হত না। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে সন্ন্যাসীরা সদাব্রতের সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হতেন। সদাব্রতের লোকরা দুখানি মোটা রুটী, আর খোসা সুদ্ধ কলায়ের ডাল—আর কখন কখন বা তার সঙ্গে একটু নুন আর লঙ্কাও দিতেন। সন্ন্যাসীরা তাই নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে আহার করতেন, তারপর অঞ্জলিপুরে জল পান করতেন। রুটী দুইখানিই বটে—কিন্তু সেই দুইখানিই তৈরী করতে আধ সের তিন পোয়া আটা লাগতো। সুতরাং সদাব্রতওয়ালাদের আর সন্ধ্যাবেলায় আহার যোগাতে হত না, আর তার প্রয়োজনও হত না।

আমার যদিও তখন লম্বা চুল ও দাড়ি, কম্বল ও লাঠিমাত্র সম্বল, তা হলেও আমি কখনও হৃষীকেশের কোন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিনি। সন্ন্যাসীর আসন আমি অধিকার করব কেন?

আমি একটা সদাব্রতের বারান্দাতেই কি শীত কি গ্রীষ্ম পড়ে থাকতাম।

আমার তো আশ্রয়স্থানের ভাবনা ছিল না—কাজেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে হৃষীকেশে পৌঁছে আমি সন্ন্যাসীদের কুটীরগুলি দেখতে গেলাম। সেইখানে

ঘুরতে ঘুরতে একটি কুটীরের সম্মুখে দেখি—জন তিন চার বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মুখে প্রবল উৎকণ্ঠা দেখে আমি হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে। তাঁরা বললেন—স্বামী বিবেকানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী মৃত্যুশয্যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ! হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পরমহংসদেবের পরম স্নেহপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ! আমি সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। কুটীর-মধ্যস্থ ধুনীর অস্পষ্ট আলোকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলাম। তিনি তখন সংজ্ঞাশূন্য।

হিমালয়ের বনজঙ্গলের মধ্যে অনেক অসাধু সন্ন্যাসীও দেখেছি, আবার অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও দর্শনলাভ হয়েছে। তাঁদের কারো কারো বিশেষ ক্ষমতাও দেখেছি। এমনও দেখেছি, কোন সন্ন্যাসী কোন একটা গাছের পাতা দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর কাছে সে পাতার সন্ধানও নিয়েছি। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে এবং তাঁর চিকিৎসার কোন সুবিধাই নাই দেখে আমার সে গাছের কথা মনে হয়েছিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে সেই প্রায়ান্ধকারে গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ পাই। তারি ২।৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে দিলাম। দেখিই না কেন—সন্ন্যাসীর এ গাছ ফলপ্রদ হয় কিনা। তারপর ঔষধের ফলাফল দেখবার জন্য কুটীরের বাইরে বালুকার আসনে বসে রইলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্য লাভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরা তখন কুটীরের ভিতরে ছিলেন। স্বামীজী ধীরে ধীরে বললেন—তোরা ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি মরব না—আমার অনেক কাজ আছে। আমি দুয়ারের কাছ থেকে এই কথা শুনে, ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করে আমার সদাব্রতে এসে উপস্থিত হলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভের, বোধ হয় ১০।১৫ দিন পরে সংবাদ পেলাম, সানুচর বিবেকানন্দ স্বামী ডেরাডুনে এসে সেখানকার কালীবাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সেই কথা শুনে আমি, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ এবং তাঁর খুল্লতাত সার্ভে অফিসের একজন প্রধান কর্মচারী বন্ধুবর শশিভূষণ সোম—এই তিনজন কালী-বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই রাত্রিতেই তাঁদের করণপুরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, তাঁরা পরদিন প্রাতঃকালে আসতে স্বীকার করলেন।

শশিভূষণ সোম মহাশয়ের বাড়ী খুব বড় ও সুন্দর। সেইখানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলাম। শশীবাবুদের সকলেরই অফিস ছিল। কাজেই সন্ন্যাসীদের পরিচর্য্যার ভার—বাইরে আমি এবং ভিতরে শশীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা গ্রহণ করলেন।

স্বামীজী এবং তাঁর সহচরবর্গকে আমরা কয়েক দিন আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বামীজী অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন—দ্বিতীয় তিথি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নেই—সেই জন্যই নাম "অতিথি"। তার পরদিন প্রত্যূষে তাঁরা চলে গেলেন। স্বামীজী বলে গেলেন, তিনি উত্তরাপথ ত্যাগ করে এইবার দক্ষিণাপথে যাবেন।

সেই যে একদিন তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সে কথা আজও মনে আছে।…শুধু গান, শুধু আনন্দ, শুধু স্ফূর্তি, শুধু রহস্যজনক গল্পগুজব। তিনি সেই দিন ও রাতটা আমাদের একেবারে আনন্দের হিল্লোলে আপ্লুত করে রেখেছিলেন। এ স্মৃতি কি ভুলবার!

এই যে আমাদের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘূণাক্ষরেও হৃষীকেশে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজীর দর্শন-লাভের কথার উল্লেখ করিনি। স্বামীজী ত ননই, তাঁর সঙ্গীরাও ডেরাডুনে আমাকে চিনতে পারেননি—পারবার কথাও নয়; তখন আমি নগ্নপদ কম্বল-সম্বল সন্ন্যাসী, আর ডেরাডুনে আমি ভদ্রবেশী, প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী মাস্টারজী। তা ছাড়া হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে প্রায়ান্ধকারে মানুষ চেনাও শক্ত; সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে স্বামীজীর পরলোকগমন উপলক্ষে একদিন মাত্র টাউন হলের শোক-সভায় হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করতে না পেরে হৃষীকেশের ঘটনার সামান্য উল্লেখ মাত্র করেছিলাম। আজ তাঁর স্মৃতির তর্পণ-প্রসঙ্গে কথাটা এতদিন পরে উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না।*

* অধুনালুপ্ত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রের ফাল্গুন, ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপিত।—সঃ

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি*

আজ অতি কষ্টে, অতি কাতর প্রাণে গ্রাহকগণের হৃদয়ে এক অতি প্রবল শোকের উদ্দীপন করিয়া দিতেছি।

কাহার শুনিবার আর বাকি নাই যে, আমাদের পূজ্যপাদ স্বামীজি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ যে দিন তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই দিনের সমুদয় ঘটনার সামান্য বিবরণ দিতেছি। ইচ্ছা রহিল, তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী এক ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে গ্রাহকগণের হস্তে পরে অর্পণ করিব।

বিগত ৪ঠা জুলাই, বাঙ্গালা ২০শে আষাঢ় শুক্রবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

তিনি ইদানীং মাস কতক হইল, তাঁহার ভীষণ "এলবুমেনুরিয়া" (এক প্রকার প্রস্রাবের ব্যায়রাম) রোগে ভুগিতেছিলেন। কবিরাজি চিকিৎসায় সে রোগ হইতে এক প্রকার মুক্তিলাভ করেন। দেহত্যাগের মাসখানেক পূর্ব্ব হইতে তিনি ভালই ছিলেন, বলিতে পারা যায়। যে দিন দেহত্যাগ করেন সেই দিন প্রাতঃকালে যজুর্ব্বেদের একটি মন্ত্র ("সুষুম্নঃ সূর্য্যরশ্মি" ইত্যাদি) ও উহার টীকা একজন সন্ন্যাসী শিষ্যকে পড়িতে বলিলেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, টীকাতে 'সুষুম্নঃ' শব্দের যাহাই অর্থ থাক, পরবর্ত্তী ষট্‌চক্রবাদিগণ সুষুম্না নাড়ীর যে সকল কথা কহিয়া থাকেন, তাহার বীজ (অর্থাৎ ভিত্তি) এই মন্ত্রে রহিয়াছে দেখ।

ইহাতে বোধ হয়, সেদিন তাঁহার মনে ষট্‌চক্রের ভাব ও সাধনা বিশেষ জাগরূক ছিল।

পরে বেলা আটটা হইতে এগারটা পর্য্যন্ত ঠাকুরের ঘরে ধ্যান করিলেন। অন্য অন্য দিন এতক্ষণ ধরিয়া ধ্যানও করিতেন না এবং যাহাও করিতেন, বায়ুশূন্য স্থানে বসিয়া করিতে পারিতেন না। সেদিন কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন।

* ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১লা শ্রাবণ, ১৩০৯ সনের উদ্বোধন হইতে পুনর্মুদ্রিত।—সঃ

ধ্যানান্তে একটী সুন্দর শ্যামা বিষয়ক গান গাইতে লাগিলেন। অনেকেই নীচে হইতে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গানটী এই—'মা কি আমার কালো, কালোরূপা এলোকেশী হৃদি পদ্ম করে আলো।' সেদিন আহারের সময় অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিলেন। আহারান্তে প্রায় ২॥০ ঘণ্টা ধরিয়া শিষ্যগণকে 'লঘুকৌমুদী' ব্যাকরণ পড়াইলেন। পরে বৈকালে জনৈক গুরুভাইয়ের সহিত প্রায় ১॥০ মাইল বেড়াইয়া আসিলেন। অনেক দিন এত বেশী বেড়াইতে পারেন নাই। সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর খুব ভাল ছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে মঠে একটি বেদবিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা বিশেষরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মঠে ফিরিয়া আসিয়া শৌচাদি করিয়া বলিলেন, শরীর খুব হালকা বোধ হইল। পরে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর নিজের ঘরে যাইয়া জনৈক শিষ্যকে বলিলেন, আমার জপের মালা আনিয়া দাও। পরে তিনি শিষ্যটাকে বাহিরে যাইতে বলিয়া সেই ঘরে একান্তে জপ করিতে বসিলেন।

তাহার পরদিন শনিবার অমাবস্যায় শ্যামাপূজা করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে সেদিন অনেক কথাবার্ত্তা কহেন। ঘণ্টাখানেক জপ করিতে করিতে শয়ন করিলেন ও সেই শিষ্যকে ডাকিয়া নিজের মাথায় একটু বাতাস করিতে বলিলেন। তখনও তাঁহার হাতে মালা ছিল। শিষ্য মনে করিলেন, বোধ হয় তাঁহার নিদ্রার আবেশের মত আসিল। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁহার হাত একটু কাঁপিল। পরে দুইবার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। শিষ্য মনে করিল যে, তাঁহার সমাধি হইল। তখন সে নীচে হইতে জনৈক সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া লইয়া যাইল। তিনি গিয়া দেখিলেন, স্বামীজির নাড়ী নাই ও নিশ্বাস বন্ধ। ইতিমধ্যে আর একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে সমাধিস্থ মনে করিয়া ক্রমাগত ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন মতে সমাধি ভঙ্গ আর হইল না। সেই রাত্রে জনৈক বিচক্ষণ ডাক্তারকে আনয়ন করা হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, দেহত্যাগ হইয়াছে।

তাহার পরদিন সকালে দেখা গেল, চক্ষু ঘোর রক্ত বর্ণ এবং নাসিকা ও মুখ দিয়া অল্প রক্ত পড়িয়াছে। অপরাপর ডাক্তারগণ বলিলেন, মস্তিষ্কের ভিতর কোন স্থান ফাটিয়া গিয়াছে। ইহাতে বেশ বোধ হয়, জপ ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়া দেহাবসান হয়।

শতাব্দীর সাধ

শ্রীঅমিয় পাল

লক্ষফণা বিস্তারিত দক্ষ উচ্চশির।
লক্ষ্যহারা লক্ষ দ্বারী বিংশ শতাব্দীর।
শতচ্ছিন্ন পদ্মকোরক হৃদি মর্ম হ'তে;
সীমাহীন তৃপ্তি স্বাদ গড্ডালিকা স্রোতে।
বৃষ-শৃঙ্গে ক্ষুদ্র মশা আস্ফালন কত!
ধর্মের বলদ বলে বশিষ্ঠের ব্রত!

প্রতীচির অট্টহাসি সমাপ্তি ক্রন্দনে।
বিশ্বাসের সূর্য ত্রস্ত জলদ গর্জনে?
প্রচারের আড়ম্বরে মৌনী ভালবাসা
সম্প্রদায় ভাঙাগড়া, প্রপন্না বিপাশা।
দুর্বলের চিত্তে জাগো হে নরেন্দ্র বীর!
অভীমন্ত্রে দাও দীক্ষা সাধ শতাব্দীর।

প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্তের প্রভাব

ডক্টর সীতানাথ গোস্বামী

প্রথমতঃ জানা প্রয়োজন যে, বেদান্ত কাহাকে বলে। বেদের অন্তই বেদান্ত। পূর্বে কর্ম অনুষ্ঠান করিলে তাহার পরে শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করা সম্ভব হয়। এইজন্য জ্ঞানকাণ্ডই বেদের অন্ত বা বেদান্ত।

বেদান্ত শাস্ত্র তিনটি প্রস্থানে বিভক্ত—শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়। পূর্ব পূর্ব প্রস্থানের উপরে উত্তরোত্তর প্রস্থান নির্ভরশীল হওয়ায় শ্রুতিপ্রস্থান বা উপনিষদ্রূপ বেদান্তেরই পরম প্রামাণ্য। অনন্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রামাণ্য; তদনন্তর ন্যায়-প্রস্থানের বা বাদরায়ণরচিত ব্রহ্মসূত্রের।

মুখ্য বেদান্ত উপনিষদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনার দ্বারাই বেদান্তের প্রতিপাদ্যবিষয় পরিস্ফুট হয়। উপ-নি-সদ্ ক্বিপ্। 'উপ' উপসর্গের অর্থ সামীপ্য। সামীপ্য-দূরত্বাদি শব্দ আপেক্ষিক হওয়ায় সামীপ্যের কোনও সীমা নির্ধারিত না করিয়া সমীপতম আত্মাকে বুঝিতে পারা যায়। 'নি' উপসর্গের অর্থ নিশ্চয়। সদ্ ধাতুর তিনটি অর্থ ধাতুপাঠে নির্দিষ্ট থাকিলেও গতি বা অবগতি অর্থ গ্রহণ করিলে এই শব্দের অর্থ সহজবোধ্য হয়। সদ্ ধাতুর সহিত ণিচ্ প্রত্যয় যুক্ত না থাকিলেও ণিচ্ প্রত্যয়ের প্রেরণরূপ অর্থ অন্তর্ভূত আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। ক্বিপ্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা। এখন 'উপনিষৎ' পদের সামগ্রিক অর্থ—যাহা সমীপতম আত্মাকে (উপ) নিশ্চিত-ভাবে (নি) জানাইবার (সদ্) কর্তা (ক্বিপ্)। উক্ত অর্থকেই একটি শব্দে প্রকাশ করিলে দাঁড়ায় যে, 'আত্মবিদ্যা'ই উপনিষদ্। সুতরাং বেদান্ত বলিতে আমরা আত্মবিদ্যাই বুঝিতে পারি। আত্মাকেই ব্রহ্মশব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয় বলিয়া বেদান্ত ব্রহ্মবিদ্যাও বটে।

আত্মা আমাদের সকলের নিকটই সুপরিচিত; এরূপ কেহ নাই যে আত্মাকে জানে না। এই অতি পরিচয়ের জন্যই আমরা আত্মার আসল স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিতে পারি না, একটু জানিয়া, আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়াই তৃপ্ত হই যে, আত্মাকে জানি, অথচ বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারি যে, আত্মাকে যথার্থ রূপে জানা হয় নাই। বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। সুতরাং কোন্ পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিব এবং কাহার মত বর্জন করিব, ইহা নিশ্চিত করাও দুঃসাধ্য। এইজন্য এই বিষয়ে অপৌরুষেয়ী শ্রুতির বক্তব্য বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। আত্মতত্ত্ব বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে উপনিষদে, ইহা স্বয়ং উপনিষদে স্পষ্টতই উক্ত হইয়াছে 'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' (বৃ. উ. ৩।৯।২৬) বাক্যের দ্বারা। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপনিষদ্ যে দিগ্‌দর্শন করিয়াছেন তাহাকে অবলম্বন করিয়া যুক্তিদ্বারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং অনবরত চিন্তন বা আত্মানুসন্ধানের দ্বারা তাহাকে অনুভব করিতে হইবে। তাহাতেই সকল প্রয়াসের সার্থকতা।

প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা আবশ্যক যে, আত্মবিদ্যা প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রের বহু শাখা বা সম্প্রদায় রহিয়াছে, যেমন—অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি। এই সকল মতবাদের পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্যও যেমন আছে তেমনই আবার বৈসাদৃশ্যও আছে যথেষ্ট। যদিও যে-কোনও সম্প্রদায়ের মত অবলম্বন করিয়াই 'প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্তের প্রভাব' প্রদর্শন করা সম্ভব, তথাপি আলোচনার

সুবিধার্থে এই প্রবন্ধে অদ্বৈতবাদই অনুসৃত হইয়াছে। অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্যকে পণ্ডিতগণ সংক্ষেপে এইভাবে নির্দেশ করেন—

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

ব্রহ্ম সত্য, ইহার উৎপত্তি-বিনাশ নাই, ইহা চিরন্তন অবিকারী তত্ত্ব। যাহা সত্য তাহা অজ্ঞাত থাকিলে তাহার সত্যতাই অসিদ্ধ হয়। সুতরাং ব্রহ্ম চিৎস্বরূপও বটে। অজ্ঞানই দুঃখস্বরূপ, জ্ঞানই সুখস্বরূপ। এইজন্য ব্রহ্মকে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ বলা হয়। জগৎ মিথ্যা, কারণ তাহা চিরন্তন নয়; বিকারী ও বিনশ্বর স্বভাব। যাহা ক্ষণিক সত্য তাহাকে সত্য বলা চলে না, তাহাকেও সত্য বলিলে রজ্জুতে যে সর্প দেখি সেই ক্ষণিক সত্য সর্পকেও সত্য বলিতে হয়। জাগতিক পদার্থনিচয়ের নাম ও রূপই অনিত্য, কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় তাহারা নিত্য। জগতের অনিত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব বলিতে নাম-রূপের মিথ্যাত্বই বলিতে চাওয়া হইয়াছে। জীবকে ক্ষুদ্র ও বিনাশী বলিয়া মনে হইলেও জীব চৈতন্যস্বরূপ হওয়ায় তাহা নিত্য ও ব্রহ্মস্বরূপ। জীব-ব্রহ্মৈক্যই বেদান্তের (অদ্বৈত-বেদান্তের) অসাধারণ প্রতিপাদ্য বিষয়। আমরা জীবের পরিগৃহীত অনিত্য শরীরাদির বিনাশ দেখিয়াই জীবকে বিনাশী বলিয়া ভুল করি। জীব ও জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন মনে করা অসঙ্গত, ইহারা সর্বথা অভিন্ন। অনন্ত মহাকাশকে কতকগুলি দেওয়ালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া যেরূপ আমরা ভিন্ন ভিন্ন গৃহাকাশ অনুভব করি, সেইরূপ অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে (ব্রহ্মকে) শরীরাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া বহু জীব বলিয়া চিন্তা করি, এইমাত্র। বস্তুতঃ, গৃহাকাশ যেরূপ মহাকাশ হইতে অভিন্ন সেইরূপ জীবাত্মাও পরমাত্মার সহিত অভিন্ন।

এখন আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আমরা আত্মাকে যেভাবে অনুভব করি, তাহাই কি উপনিষদের অভিপ্রেত আত্মতত্ত্ব? এইরূপ আত্মতত্ত্বকে জানিয়াই কি মৈত্রেয়ী অমৃতত্ব লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন? আমরা আত্মাকে মোটামুটিভাবে জানি এবং কিছু জানি বলিয়াই আমাদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। উপনিষদ্‌ও এইজন্য প্রশ্নোত্তরের আকারেই এই তত্ত্ব বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বুদ্ধিমান্ শিষ্য লক্ষ্য করিয়াছে যে, ঘট চলে না কিন্তু আমি চলি, কারণ ঘট অচেতন, আমি চেতন। তাহার অনুভব যে, আমি বা আত্মা চেতন এবং আত্মভিন্ন অনাত্মপদার্থগুলি অচেতন। অচেতন অনাত্মপদার্থ ঘটাদি নিজেই চলিতে পারে না, কিন্তু চেতন আত্মার দ্বারা চালিত হইতে পারে। আমি চলি বলিলে তো দেখিতে পাই যে, আমার শরীর চলিয়াছে। অচেতন ঘট যদি চলিতে না পারে, তবে অচেতন শরীরেরও স্বয়ং চলিতে পারা অসম্ভব। আমার শরীর তো আর আমি নই। আমি বা আত্মা চেতন হইলেও শরীর অচেতন। সুতরাং শরীরের একজন চালক আবশ্যক। আমি যে শরীর নই তাহার বহু প্রমাণ আছে। মৃত্যুর পরে এই শরীর আর চলে না। অথচ শরীর বা শরীরে যন্ত্রগুলি যে অকেজো হইয়া গিয়াছে এরূপ নয়। ঐ যন্ত্রগুলি যেমন চক্ষু, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক, বস্তি প্রভৃতিকে অন্য চেতন শরীরে যথাযথভাবে সংস্থাপিত করিতে পারিলে তাহারাই আবার পূর্বরূপ কার্য সম্পাদন করিতে পারে। শুধু দেহ কেন, ইন্দ্রিয়গুলি যে স্ব-স্ব কার্য সম্পন্ন করে, তাহাদেরও কোনও চালক থাকা প্রয়োজন, অন্যথা এই জড় আত্মভিন্ন পদার্থগুলি কর্মে প্রবৃত্ত হইবে কিরূপে? এইরূপ

কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন সম্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য ; যেহেতু ইহারা অচেতন অথচ ইহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই প্রশ্নেই কেনোপনিষদের প্রারম্ভ—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥

শিষ্যের এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিলেন যে, অবশ্যই এই ইন্দ্রিয়াদির একজন পরিচালক আছেন এবং তিনিই আত্মা বা ব্রহ্ম। আত্মাই একমাত্র চেতন বলিয়া তিনিই এই জড় ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক হইতে পারেন। কাহারও পরিচয় দিতে হইলে আমরা জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সম্বন্ধের সাহায্যেই তাহা করিয়া থাকি। আত্মা বা ব্রহ্ম একক বলিয়া তাহার জাতি নাই ; ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কোনও সত্যপদার্থ না থাকায় কাহারও সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না ; ব্রহ্ম নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় হওয়ায় গুণক্রিয়ার দ্বারাও তাহার উল্লেখ সম্ভব নয়। এইজন্য গুরু বাধ্য হইয়াই সেই পরিচালকের পরিচয় দিবার জন্য বলিলেন— "শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন" ইত্যাদি। শব্দ যাহার দ্বারা শোনা যায় এই অর্থে করণবাচ্যে শ্রু-ধাতুর উত্তর ত্রল্ প্রত্যয় করিয়া শ্রোত্র শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। জড়শব্দ যাহার দ্বারা শ্রুত বা প্রকাশিত হয়, তাহাকে যদি 'শ্রোত্র' বলা চলে তবে সেই জড় শ্রোত্র আবার যাহার দ্বারা প্রকাশিত এবং পরিচালিত হইবে তাহাকে 'শ্রোত্রের শ্রোত্র' বলিতে হয়। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, শ্রুতি (গুরু) যদি আত্মা বা ব্রহ্মকেই শ্রোত্রাদির পরিচালক বলিয়া উল্লেখ করিতেন, তবে পরিচালকের একটি নাম-মাত্রই বলা হইত, কিন্তু শ্রোত্রাদির স্ব-স্বকার্যে প্রবৃত্তিতে একান্ত অসামর্থ্য প্রকাশ পাইত না। কোনও সময়ে যজ্ঞদত্ত দেবদত্তকে চালিত করিলে তাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, দেবদত্ত স্বয়ং চলিতে অসমর্থ। যাহা হউক, গুরু আরও বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়াদির সাময়িক প্রবৃত্তি দেখিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে আত্মা বলিয়া মনে করিও না, যেহেতু কখনও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি জন্মিলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া (অতিমুচ্য) ধীরব্যক্তি অগ্রসর হইবেন। তিনি সকল লোক অর্থাৎ ভোগ্যপদার্থ (তৎসহিত তাহার জ্ঞান ও ব্যবহার) হইতে নিজেকে বিমুক্ত করিয়া (প্রেত্য অস্মাৎ লোকাৎ) অমৃতত্ব লাভ করেন, শিষ্যেরও তাহাই কর্তব্য। শ্রুতিবাক্যটি নিম্নরূপ—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ (কে. উ. ১।২)

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই পরিচালক যে ইন্দ্রিয়াদিকে প্রেরিত করেন তাহা শরীরের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা প্রেরণ নহে, কিন্তু ইচ্ছামাত্রের দ্বারা প্রেরণ। গৃহস্বামী বা রাজার ইচ্ছামাত্রের দ্বারা অন্যেরা কার্যে প্রেরিত হয়, ইহা সর্বজন-বিদিত। এইজন্য সুযোগ্য শিষ্য তাঁহার প্রশ্নে 'কেনেষিতং পততি প্রেষিতম্' ইত্যাদি বাক্যে 'ইষিতং প্রেষিতম্' বলিয়াছেন। পুনরায় শঙ্কা করা যায় যে, আত্মা তো নির্গুণ, তবে তাঁহাতে ইচ্ছারূপ গুণপদার্থ কিরূপে থাকিবে ? ইহার একটি সহজ উত্তর হইতে পারে যে, এখানে ইচ্ছা-পদের দ্বারা সন্নিধি বা উপস্থিতিমাত্রই বিবক্ষিত। তাঁহার অস্তিত্বেই সকলে অস্তিত্ববান্, তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান্, তাঁহার আনন্দের এক কণা বা মাত্রা লইয়াই অন্যেরা আনন্দ অনুভব করিয়া বাঁচিয়া আছে। শ্রুতি সাক্ষাৎভাবেই ইহা বলিয়াছেন, যেমন "একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" (কঠ উ. ২।২।১২);

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥ (কঠ উ. ২।২।১৫); আবার "এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" (বৃ. উ. ৪।৩।৩২)।

এখন প্রশ্ন জাগে—ব্রহ্মই যদি জীবের শরীরেন্দ্রিয়াদির পরিচালক হন, তবে জীবকে তাহার শুভাশুভকর্মের জন্য ফলভোগ করিতে হইবে কেন? ইহার উত্তর—জীব যদি সত্যই কর্তৃত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে কেবলমাত্র যন্ত্র বলিয়া চিন্তা করিতে পারে অর্থাৎ ফলাসক্তি বর্জন করিয়া নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে, তবে ফলভোগ করিতে হয় না। গীতাতে রহিয়াছে—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥
(৩।১৯)

বস্তুতঃ, আমরা ঈশ্বরার্থ কর্ম সম্পাদন করি না। কিন্তু সেই সেই ফলের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই কার্য করিয়া থাকি। ব্রহ্মই সকল কর্মের পরিচালক, ইহা শুনিলে আমরা আমাদের অশুভ কর্মের ফল হইতে অব্যাহতি পাওয়ার একটি সহজ কৌশল ও কুযুক্তি খাড়া করি এইমাত্র। এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সুন্দর গল্প আছে। এক ব্যক্তির মনোরম উদ্যানে একটি গরু প্রবেশ করিলে এবং সে একটি চারাগাছ খাইয়া ফেলিলে উদ্যানের মালিক সজোরে গরুটিকে প্রহার করে এবং গরুটি মারা যায়। তখন কুযুক্তির আশ্রয় লইয়া সেই অপরাধী বলিতে লাগিল যে, হাত দিয়া গরু মারা হইয়াছে, হাতের দেবতা ইন্দ্র, সুতরাং ইন্দ্রই গোহত্যার অপরাধে অপরাধী। ছদ্মবেশী ইন্দ্র বাগানে আসিয়া খুবই প্রশংসা করিলে সেই ব্যক্তি বলিল যে, বাগানটি সে নিজ হাতে করিয়াছে এবং বাগানের জন্য প্রশংসা তাহারই প্রাপ্য। তখন গরুটিকে মৃত অবস্থায় দেখিয়া ছদ্মবেশী ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—কে গোহত্যা করিয়াছে? একটু দ্বিধার সহিত ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল—হাতের দেবতা ইন্দ্রই গোহত্যাকারী। ইন্দ্র বলিলেন—যে বাগানের কর্তা সেই গোহত্যার কর্তা, আমি গোহত্যার কর্তা নই। তখন বাগানের মালিক ইন্দ্রকে চিনিতে পারিল এবং নিজের যুক্তির অসারতাও বুঝিতে পারিল।

পূর্বোক্ত শঙ্কার অপর একটি উত্তর কঠোপনিষদের রথরূপক হইতে আমরা পাইয়া থাকি, ইহা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অনুভবের সহিত বিশেষভাবে মিলিয়া যায় বলিয়া ইহা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়। রথস্বামী ইচ্ছা করিলে তাঁহার রথ চলে, অন্যথা চলে না। রথস্বামী বা রথী সারথির দ্বারা রথের সঞ্চালন করিয়া থাকেন। সারথি ঘোড়াকে রথে যুক্ত করিয়া ঠিকভাবে লাগাম (রশ্মি, প্রগ্রহ) ধরিয়া থাকেন যাহাতে রথ অভীষ্টপথে যাইতে পারে। রথচলনের সহিত শরীরচলনের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে। আত্মাকে রথী বলিয়া জানিতে হইবে, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ মনে করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়কে রথের বিচরণস্থান বলিয়া জানিতে হইবে। আত্মা যখন শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির সহিত যুক্ত হয়, তখনই তাহাকে ভোক্তা বলিয়া পণ্ডিতেরা উল্লেখ করেন। প্রাসঙ্গিক মন্ত্র দুইটি হইল—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
(কঠ উ. ১।৩।৩-৪)

রথী তাঁহার রথকে নির্দিষ্টস্থানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেও সারথি অনুপযুক্ত হইলে তাহা

সম্ভব হয় না। অযোগ্য সারথি ঠিকভাবে লাগাম ধরিতে পারে না বলিয়া তাহার অশ্ব দুর্দমনীয় হইয়া পড়ে এবং রথকে অনভিপ্রেতস্থানে টানিয়া লইয়া বিপদ ঘটায়। বিপরীতক্রমে সারথি যোগ্য হইলে রথ রথীর স্বাভিপ্রেতস্থানে অবশ্যই যাইতে পারে। এই দৃষ্টান্তে সারথির যোগ্যতার মাপকাঠি তাহার লাগাম ধরিবার ক্ষমতা। তেজস্বী অশ্ব তো দুর্দমনীয় হইবেই এবং সে যে-কোন দিকে যাইতে ইচ্ছা করিবেই, কিন্তু সারথিই তাহার যোগ্যতার দ্বারা তাহাকে অভীষ্ট পথে স্বীয় লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিবে। রথীর ইচ্ছার দ্বারা রথ চলিলেও সারথির একটি বিশেষ অবদান আছে, কারণ তাহাকেই রথটি চালাইয়া লইয়া যাইতে হয়। সেইরূপ ব্রহ্ম শরীরেন্দ্রিয়াদিকে পরিচালিত করিলেও বুদ্ধির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। কৃত্যাকৃত্য নির্ণয়ে বুদ্ধির একটি নিজস্ব ক্ষমতা আছে যাহা মন বা ইন্দ্রিয়ের নাই। যিনি বিজ্ঞানবান্ অর্থাৎ যথার্থ বুদ্ধিমান্ তিনি ন্যায়ান্যায়ের তথা কর্তব্যাকর্তব্যের বিবেককরণে বা পার্থক্য-নির্ণয়ে সুনিপুণ। তিনি শরীর-ইন্দ্রিয়কে অভীষ্টপথে লইয়া যান, তিনি তাঁহার লক্ষ্য মোক্ষে যাইয়া শরীরেন্দ্রিয়াদিজন্য দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন তাঁহার আর জন্ম হয় না। তিনি তাঁহার রথ-যাত্রার শেষ সীমায় পরমাত্মা বা ব্রহ্মে উপনীত হন। এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে উপনিষদ্ তিনটি মন্ত্র বলিয়াছেন—

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮ ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯ ॥

(কঠ উ. ১৷৩৷৬,৮-৯)

যিনি বিবেকবান্ হইতে পারেন না তাঁহার দুঃখের সীমা নাই। যে-রথে আরোহণ করিয়া চরম লক্ষ্যে পৌছান যায়, সেই রথে তিনি চড়িবার সুযোগ পাইলেন অথচ রথটি পথভ্রষ্ট হইয়া দুষ্পরিণাম ডাকিয়া আনিল। যে-মনুষ্যশরীর অবলম্বন করা বহু জন্মের পুণ্যফলেই সম্ভব হয় সেই মনুষ্যশরীর ও তৎসহ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি লাভ করিয়াও তিনি পুনরায় অনন্ত জন্মমৃত্যুর চক্রে বা সংসারে আবর্তিত হইতে থাকিলেন। এই দুর্গতির কথাও শ্রুতির ভাষাতেই বলিতে ইচ্ছা হয়—

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

(কঠ উ. ১৷৩৷৫,৭)

বুদ্ধিকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া জীব শুভকর্ম সম্পাদন করে এবং শুভফল লাভ করে, অশুভপথে পরিচালিত করিয়া অশুভকর্ম করিলে অশুভফল-লাভ অনিবার্য। এই বুদ্ধি বা বিজ্ঞান জীবের অসাধারণ ধর্ম। জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও ব্যবহার-দশায় আমরা জীবকে ভিন্ন বলিয়া অনুভব করি এবং বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের দ্বারাই জীবের জীবভাব সিদ্ধ হওয়ায় বিজ্ঞানময়-কোষকেই শাস্ত্রে ব্যাবহারিক জীব বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ("ইয়ং বুদ্ধির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি। অয়মেব কর্তৃত্বভোক্তৃত্ব-সুখিত্বদুঃখিত্বাদ্যভিমানিত্বেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যাবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে।"— (বেদান্তসার, কালীবর সং ৯০-৯১ পৃঃ)। [ক্রমশঃ]

স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতি

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

আমাদের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনেক অনুরোধ করে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে আমাদের স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ীতেই মহারাজের আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল। একটি বড় পাল্কী ও ৮ জন বাহকের ব্যবস্থা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ৬ জন আগে পিছে কাঁধ দিয়ে ও দুজন পালাক্রমে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে মাস্টার মশায়ের বাড়ী শ্যামবাজারে নিয়ে গিয়েছিল। আমি পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিলাম। আগে থেকে তালিকা করে কত রকমের রান্না যে মাস্টার মশায়ের মা ও স্ত্রী করেছিলেন তার অন্ত নেই। বহু ভক্ত ও অভক্তের সমাবেশ হয়েছিল। কেউ কেউ নানা প্রশ্ন করেছিলেন। মহারাজ ধীরস্থিরভাবে তাঁদের এমন উত্তর দিয়েছিলেন যে, তাঁরা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কেউ কেউ ঠকাবার উদ্দেশ্যেই আজেবাজে প্রশ্নও করেছিলেন। শেষে কিন্তু ভক্তিভরে প্রণাম করে বিদায় নিয়েছিলেন সবাই। শ্যামবাজার থেকে আমাদের স্কুলের দূরত্ব কত, মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, "বড় রাস্তা দিয়ে গেলে এক মাইল ও মাঠ দিয়ে গেলে আধ মাইল।" মহারাজ চুপে চুপে আমাকে বললেন, "তুই আমাকে সঙ্গে করে মাঠের রাস্তায় নিয়ে যাবি। আমি তোর সঙ্গে হেঁটে যাব।" আমি বললাম, "তাহলে মাস্টার মশায় আমাকে বকবেন।" তিনি বললেন, "না তোকে বকবে না। আমি প্রবোধকে বলে দেব, আমি নিজে একটু হেঁটে পাড়াগাঁয়ের মাঠ দেখতে দেখতে যাব বলে এসেছি।" আসল কথাটি পরে জেনেছিলাম যে বাহকেরা খানিকটা রেহাই পাবে। কারণ আবার তাঁকে তো বয়ে নিয়ে জয়রামবাটী ফিরতে হবে তাদের কিছুক্ষণ বেশী বিশ্রামও হবে। স্কুলে বিরাট অভিনন্দনের ব্যবস্থা হয়েছিল। বহুলোক এসেছিলেন। আমাদের স্কুলের সংস্কৃত শিক্ষক মশায় একটি কবিতা সংস্কৃতে রচনা করে হারমোনিয়াম সহযোগে আমাকে ও আর চারজন ছাত্রকে গাইতে শিখিয়েছিলেন। একটু একটু মনে আছে। যথা—"বাসনা গৃহীতমেব যস্য মঙ্গলাগতম্। হর্ষবর্ষণং স দেব এষ মঙ্গলালয়ঃ। জীবনার্পণং বিধায় তং পরং শুভঙ্করম্। লোকতারকং ভজামি রামকৃষ্ণজীবিতম্॥ জীবনার্পণং জীবনার্পণং করোমি সন্ততং প্রভো জীবনার্পণম্।" আটটি শ্লোক রচনা করেছিলেন। আজকাল ৮।১০ বছরের ছেলেমেয়েরা নির্ভয়ে গান, আবৃত্তি ও থিয়েটার করে। কিন্তু লজ্জার কথা আমরা ভয়ে ভয়ে কোন রকমে আবৃত্তিটি করেছিলাম। মহারাজ ফিরে জয়রামবাটীতে ও উদ্বোধনে বলেছিলেন "প্রবোধ বিরাট ব্যবস্থা করেছিল—একেবারে Ovation!"

শরৎ মহারাজ খুব গম্ভীর ছিলেন। কিন্তু রসিকও ছিলেন। একজন আমার চেয়ে বড় ও প্রবীণ সাধু বই কিনবার জন্য মহারাজের কাছ থেকে কিছু টাকা ভিক্ষা চান। মহারাজ কিছু টাকা দিয়ে বলেন, "প্রথমে পাঁচ টাকা দিয়ে একটি গাধা কিনবি। পরে বাকি টাকা দিয়ে বই কিনবি।"

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজের সামনেই শ্রীশ্রীমার নূতন বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে শ্রীশ্রীমার শিষ্য ললিত দা (শ্রীললিত চট্টোপাধ্যায়) কিছু হোমিও-প্যাথিক ঔষধ ও বই কিনে পাঠিয়ে বিনামূল্যে ঔষধ দিবার জন্য ডাক্তারখানা শুরু করেন।

শ্রীসজনীকান্ত রায় (জিবটে গ্রামের) প্রথম বিনা বেতনে চিকিৎসা করতেন। চেয়ার টেবিল কিছুই ছিল না। মাটিতে আসন পেতে বসে ঔষধ দিতেন। ললিত দা আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে বলে কখনও থিয়েটার প্রভৃতি দেখিনি জেনে কলকাতায় গেলে দেখাবেন বলেছিলেন। প্রথম যেবার কলকাতা যাই তাঁকে থিয়েটার দেখাবার কথা বলতে যাব এমন সময়ে কিশোরী দা (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) ও বরদা (আমার চেয়ে বয়সে ছোট—তখন ব্রহ্মচারী) আমার সঙ্গে যেতে চাইলেন। ললিত দা বললেন, "তুই একলা গেলে চিঠি দিতাম। সাধুদের থিয়েটার দেখার জন্য চিঠি দিতে শরৎ মহারাজ বারণ করেছেন।" কাজেই যাওয়া হবে না মনে করে উদ্বোধনে বসে আছি দেখে পূজনীয়া যোগীন-মা বললেন, "রামময়! তুমি আজ থিয়েটার দেখতে যাবে বলেছিলে না? তবে এখনও এখানে বসে আছ কেন? থিয়েটার যে আরম্ভ হয়ে যাবে?" তিনি আমার জন্য এত চিন্তা করায় ও আমি তো তাঁর নাতির বয়সী ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি আমাকে জানেন?" তিনি যেমন টেনে টেনে কথা বলতেন্ তেমনই বললেন, "তো-মা-কে আবার চি-নি-না? তুমি জয়রামবাটীতে মার ডানহাত। সর্বদা মা সব কাজে রামময়কে ডাকেন।" তখন তাঁকে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, "পাড়াগেঁয়ে ছেলে। বোকা ছেলে। বুদ্ধি নেই। থিয়েটার দেখবে তো ললিতের ল্যাজ ধরতে গেলে কেন? শরৎ চিঠি লিখে দিলে অপরেশ তোমাদের গুরুর মতো ভক্তি করে দেখাবে।" শরৎ মহারাজ শুনে বললেন, "ছেলে বোকা নয়। বুদ্ধি খুব আছে। কিন্তু শরৎ মহারাজকে থিয়েটার দেখার কথা বলে কি করে?" তিনি কিরণদাকে (স্বামী অশেষানন্দ) লিখতে বললেন। "প্রিয় অপরেশ, এই তিনজন" বলে মহারাজ চুপ করায় লেখক "পরে কি লিখব বলুন" জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "সাধু, লিখে দে—(রামময় সাধু হবেই) —থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে। এদের দেখার ব্যবস্থা করে দিও।" অপরেশবাবু আমাদের খুব যত্ন করে বেশী দামের জায়গায় বসিয়ে দিলেন। শেষ হলে কিছু জলযোগও করালেন।

একদিন উদ্বোধনে বিশেষ পূজা হচ্ছে। বাসুদেবানন্দ মহারাজ পূজক ও আমি পূজার যোগাড় দিচ্ছি। শরৎ মহারাজ ঠাকুরঘরে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে সব বলে দিচ্ছেন। মধুপর্ক তৈরীর জন্য তাঁর মধুর বোতল আনতে বলে দিলেন, "আমার ঘর থেকে বেরিয়ে দেওয়ালে যে কাঠের তাকগুলি আছে তার মাঝের তাকের বাঁদিক থেকে তৃতীয় বোতলটি মধুর বোতল।" আমি ভাল করে না শুনেই গিয়ে ফিরে এসে বললাম, "মধুর বোতল পেলাম না।" তিনি ধমক দিয়ে বললেন, "তোর কি শোনবার ধৈর্য আছে? বলতে না বলতেই মারলি ছুট! কি করে পাবি?" তিনি আবার ভাল করে বলে দিলেন ও বোতলটি আনতে খুশী হলেন। দই, দুধ, ঘি, মধু ও চিনি কেমন করে মিশাতে হবে বলে, একটু জল দিতে হবে বললেন। শুনেই বাসুদেবানন্দ মহারাজ বললেন, "না জল দিতে হবে না।" মহারাজ তাঁকে জোরে ধমক দিয়ে বললেন, "তুমিই সব জান। আমরা কিছু জানি না।" আমি একটু জল দিলাম। পরে শব্দকল্পদ্রুম বের করে দেখলাম তাতে "কিঞ্চিজ্জলম্" লেখা আছে। একদিন শরৎ মহারাজের জন্মদিনে পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মহারাজ ভোরে উদ্বোধনে এসে মহারাজকে প্রণাম করে হাসতে হাসতে বললেন, "দাদা, আজ আপনার চেলা-চেলিরা আপনাকে অনেক প্রণামী দেবে। সেগুলি সব আমার গরীব আশ্রমের জন্য দিতে হবে।" মহারাজও হাসতে হাসতে

বললেন, "আচ্ছা গঙ্গা, আজ তুই সব টাকা পাবি।" সব টাকা তাঁকে দিলেন।

একবার মা কোয়ালপাড়ায় বেশ কয়মাস ছিলেন। মার জ্বর কয়েকদিন ধরে চলায় শরৎ মহারাজ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, ভক্ত ডাঃ কাঞ্জিলাল ও শরৎ মহারাজের ভাই ডাঃ সতীশ-বাবু প্রভৃতি এসেছিলেন ও কিছুদিন ছিলেন। মা একটু সুস্থ হলে ডাক্তাররা ফিরে গেলেন। মা একটু ভাল বোধ করায় মহারাজ একদিন মাকে কলকাতা যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ ও প্রার্থনা করেন। কিন্তু মা যেতে রাজী হলেন না। তিনি জগদম্বা আশ্রম থেকে বিফল মনোরথ হয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। যোগীন-মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি শরৎ ? মা কি বললেন ?" মহারাজ দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, "না, তিনি যাবেন না। এখানেই দেহ রাখবেন।" তখন যোগীন-মা বললেন, "ছিঃ ছিঃ শরৎ, অমন কথা মুখে আনতে আছে ?" তিনি আবেগভরে বললেন, "তা কি করব ? যাঁকে ভালবাসি, ভক্তি করি, তিনি ভাল কথা না শুনলে এমন কথাই মুখ দিয়ে বেরোয়। এখানে ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, ভীষণ ম্যালেরিয়ার জায়গা। কি করে সারবেন ?" বারবার অনুরোধ করায় এবং যোগীন-মা ও গোলাপ-মা প্রভৃতি বিশেষ জিদ করায় শেষে মা রাজী হওয়ায় সকলের আনন্দ। মা জয়রামবাটী এসে কয়েকদিন থেকে পরে কলকাতা গেলেন। কোয়ালপাড়ায় থাকাকালীন আমি ও গোপেশদা পুণ্যপুকুর থেকে কয়েকটি মাছ ধরেছিলাম। ঐগুলি নিয়ে গিয়ে মাকে দেখাতে খুব খুশী হলেন ও বললেন, "বাবা, আজ নিয়ে এলে ? সতীশ ও কাঞ্জিলাল চলে গেল। আনন্দ করে খেত। তা শরৎ আছে খাবে।" মহারাজ মাছ দেখে খুব খুশী হলেন। মহারাজের অপূর্ব ধৈর্য ! তিনি দিনের পর দিন কোয়ালপাড়ার দাদাদের কি কষ্টে যে "খণ্ডন ভব বন্ধন" প্রভৃতি সুরে ও তালে শিখিয়েছিলেন ভাবলে অবাক হতে হয়। এক একজনের এক একরকম গলা ! কিন্তু তিনি শিখিয়ে তবে ছাড়লেন। একদিন যোগীন-মা এক গেলাস জল চাইলেন। বলে দিলেন, "আধ গেলাস আনবে।" আমি গেলাস বেশ করে মেজে ধুয়ে ভর্তি করে জল দিতেই বললেন, "ছেলের বুদ্ধি নেই। আধ গেলাস আনতে বললুম। গেলাস ভর্তি করে এনেছে। শরৎ, তুমি একটু খেয়ে কমিয়ে দাও।" শরৎ মহারাজ এঁটো না করে কিছু খেয়ে কমিয়ে দিলেন। তখন তিনিও মুখ না ঠেকিয়ে জল খেলেন। আমি বললাম, "আপনি মুখ ঠেকিয়ে আরাম করে খাবেন ও আমি গেলাসটা মেজে ধুয়ে আনব বলে ভর্তি করে আনলাম। আপনি তেমন করে খেলেন না।" তখন মহারাজ বললেন, "দেখলে ? ছেলের বুদ্ধি নেই বলছিলে ? সে তোমার সেবা করতে চায়। তুমি তা দিলে না।"

একদিন কোয়ালপাড়া থেকে জয়রামবাটী ফেরবার সময় মা আমাকে কিছু সবজী দিলেন। তখন জয়রামবাটীতে আমি ও গোপেশ দা থাকি। সবজীগুলি দেখে পূঃ রাসবিহারীদা কেবল পটোল নিয়ে যেতে বললেন,—বাকী চেলো (খেড়ো) প্রভৃতি সাধারণ সবজীগুলি কোয়ালপাড়া মঠের জন্য রাখতে চাইলেন। কিন্তু রাজেনদা (স্বামী বিদ্যানন্দ) ও কিশোরীদা (স্বামী-পরমেশ্বরানন্দ) বললেন, "এসব মা তোমাকে জয়রামবাটী নিয়ে যাবার জন্য দিয়েছেন। আমরা তাই রাখব না।" এই নিয়ে খানিকক্ষণ ঠেলাঠেলি হয়। তখন শরৎ মহারাজ রাসবিহারীদাকে খুব বকেন। যাই হোক, আমি সব জিনিসগুলিই জয়রামবাটীতে নিয়ে আসি। উদ্বোধনেও যখন গোলাপ-মা ও গণেন মহারাজের মধ্যে কোনও তর্ক হত, তখন মহারাজ জোরে ধমক দিতেন

ও বলতেন, "যেমন গোলাপ-মা তেমনি গণেন। দুজনেই সমান।" ব্যস্. উদ্বোধন ঠাণ্ডা! একদিন উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমার তিথিপূজার দিনে,—মনে হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে,—আমরা যারা কাজ করছিলাম তাদের জন্ত মহারাজ আমার হাতে দুটি টাকা দিয়ে বললেন, "রামময়, বাগবাজার স্ট্রীটের অমুক দোকান থেকে খাবার কিনে নিয়ে আয়।" তখন এক পয়সায় বড় বড় কচুরি শিঙাড়া ও দু পয়সায় বড় বড় রসগোল্লা, পান্তুয়া পাওয়া যেত। দু টাকায় এক ঝুড়ি খাবার এনে মহারাজকে দেখাতেই বললেন, "যা, ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে তোরা যারা যারা কাজ করছিস, প্রসাদ ভাগ করে খা।" আমি বললাম, "আমি ভোগ দিতে জানি না।" মহারাজ বললেন, "খাবার ঝুড়িটি ঠাকুরের সামনে রেখে ঢাকনা খুলে ঠাকুরকে প্রণাম করে জোড় হাত করে বলবি, 'ঠাকুর দয়া করে খান।' পরে একটু চোখ মুদে জপ করবি। পরে আবার প্রণাম করে নিয়ে আসবি।" আমি তাই করলাম ও সকলে আনন্দ করে প্রসাদ পেলাম। জয়রামবাটীতে একদিন বিকালে শরৎ মহারাজ জল খেতে চাইলেন। মাকে বলতে তিনি এক গেলাস জল দিলেন। আমি "শুধু জল দিব" বলায় মা বললেন, "শরৎ এখন শুধু জলই খায়।" আমার পা চলছে না দেখে মা একটি ছোট রেকাবীতে একটি সন্দেশ দিলেন। মহারাজ দেখেই বললেন, "তোকে জল আনতে বললাম। তুই আবার মিষ্টি আনলি কেন?" আমি বললাম, "কেউ জল খেতে চাইলে আমরা শুধু জল দিই না। একটু মিষ্টি দিই।" তখন তিনি শুধু জল খেলেন ও মিষ্টিটি আমাকে খেতে বলায় আমি খেয়ে ফেললাম।

মার ভাইঝি মাকুদির ছেলে নেড়া তখন খুব ছোট। আমাকে রাম্মো মামা বলত। মহারাজ আমাকে বললেন, "নেড়ার বগন মামাকে জানিস?" গগন মামা বলতে পারত না। নেড়ার Diphtheria রোগ হওয়ায় বাঁকুড়ার পূঃ ডাক্তার মহারাজ বশীদার ভাইপো কালোকে (ডাকনাম কালু) কলকাতা থেকে Serum কিনে আনতে পাঠালেন। পাঁচ হাজার বা তার চেয়ে বেশী unit-এর আনতে বলেছিলেন। সে বি. কে. পালের দোকান থেকে পাঁচ হাজারের বেশী না পেয়ে তাই কিনে আনে। কিন্তু তখন রোগ বেড়ে গেছে। ওতে কাজ হল না। নেড়া মারা গেল। মা দুঃখ করে বললেন, "কালো কলকাতা গেল আর শরতের সঙ্গে দেখা করেনি জেনেই বুঝেছি ছেলে আমার বাঁচবেনি। নৈলে কালোর এমন বুদ্ধি কেন হল?" পরে জানা গেল মহারাজ কলকাতায় বড় বড় ঔষধের দোকানে আগে থেকেই খোঁজ করিয়ে Frank Ross-এর দোকানে দশ হাজার unit পর্যন্ত ছিল জেনে রেখেছিলেন। একবার আমার একটু পেটে কিছুদিন ধরে ব্যথা হচ্ছিল, (তখন আমি ব্রহ্মচারী গোপালচৈতন্য) উদ্বোধনে গিয়ে কয়েকদিন থেকে চিকিৎসা করাব বলে মহারাজের অনুমতি চেয়েছিলাম ও গণেন মহারাজ আমাদের ওখানে ২।৩ দিনের বেশী থাকা পছন্দ করেন না লিখেছিলাম। তিনি উত্তরে লিখেছিলেন, "তুমি অবশ্যই আসবে ও যতদিন ইচ্ছা থাকবে। আমি তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করাব। গণেন বা অন্ত কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। আমি বলে দিব। আমি জানি তুমি মার কত সেবা করেছ—তারা জানে না।" তিনি আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় কয়দিনেই সেরে যাই। ফেরবার সময়ে যেদিন ভোরে রওনা হব তার আগের দিন রাত্রে মহারাজকে প্রণাম করে বলতেই তিনি বললেন, "তুই তো সেরে গেছিস এই কথা আমাকে বলিসনি। বেশ খুশী হলাম শুনে।" তখন তাঁর সেবক সাতুকে (স্বামী-অসিতানন্দকে) বললেন, "ওরে সাতু, রামময় যে

ভোরে জয়রামবাটী রওনা হবে। মার বাড়ী থেকে খালিমুখে যাবে?" সাতু উত্তর দিল, "না, বাল্যভোগের প্রসাদী সন্দেশ ও পাঁউরুটী দেব।" তিনি শুনে খুব খুশী হলেন।

উদ্বোধনে পূজ্যপাদ সুধীর মহারাজ (স্বামী-শুদ্ধানন্দজী) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পাঠ করবেন। আরম্ভ করার আগে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আরম্ভ থেকেই পাঠ করব? না প্রথম দিকটা বাদ দিয়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ থেকে করব?" মহারাজ বললেন, "তুমি আচার্য। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান দরকার। যাতে সেটি হয় তাই কর।" তিনি তৃতীয় ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করলেন। 124738

মহারাজ যখন স্বামীজীর সঙ্গে লণ্ডনে ছিলেন তখন স্বামীজী বক্তৃতা দিতেন, তিনি রান্না করতেন ও ঘরের কাজ করতেন। স্বামীজী তাঁকে বক্তৃতা দিতে বললে তিনি রাজী হতেন না। একদিন স্বামীজী তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছেন, "স্বামী সারদানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।" কাগজ এনে দেখালেন। মহারাজ তো খুব ভয় পেয়ে গেলেন। বক্তৃতা করতে পারবেন না বলায় স্বামীজী অনেক বুঝালেন ও বললেন, "আমি একা খেটে খেটে মরে যাচ্ছি। তুইও আমার কাজে সাহায্য কর।" তথাপি রাজী না হওয়ায় স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তোকে কিছু করতে হবে না। বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়ে একটু ঠাকুরকে চিন্তা করে নিবি। তার পর তিনিই তোর মুখ দিয়ে যা বলাবার বলাবেন।" একদিন সেই প্রসঙ্গটি শরৎ মহারাজ বলেছিলেন: "বাধ্য হয়ে তখন রাজী হলুম। স্বামীজী ঐ সভার সভাপতি। আমার খুব ভয় করতে লাগল। থতমত খাচ্ছি দেখে স্বামীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর মুখ লাল ও আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তখন আমার দিকে তাকাতেই আমার মনে পড়ল ঠাকুরকে চিন্তা করতেই ভুলে গেছি। তখন চোখ মুদে ঠাকুরকে চিন্তা করার পর আমি বেশ বলতে লাগলাম। স্বামীজী খুশী হলেন ও 'তুই বাসায় যা। আমি একটু বেড়িয়ে ফিরব' বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ওদেশে খবরের কাগজে সব খবর খুব ঝটপট্ বেরিয়ে যায়। স্বামীজী ২।৩ খানা কাগজে আমার বক্তৃতার কিরূপ প্রশংসা করেছে এনে দেখালেন। ব্যস্, আমার সাহস বেড়ে গেল। বেশ বক্তৃতা করতে লাগলাম। স্বামীজীও খুব খুশী হলেন।'

একদিন আমি উদ্বোধনে মহারাজের কলম দোয়াত নিয়ে চিঠি লিখেছি। তখন আজকালকার মতো ফাউন্টেন পেন (fountain pen) বের হয়নি। কাঠের তৈরী কলমের (pen holder-এর) মুখে নিব লাগিয়ে দোয়াতে কালি রেখে লেখা হত। আমরা এক পয়সায় ৬টি "G" মার্কা নিব কিনতাম। মহারাজও ঐ নিব ব্যবহার করতেন। তিনি লেখাপড়া করে ঐ নিবটিও জলে ধুয়ে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে রাখতেন। তিনি লিখতে আরম্ভ করেই বললেন, "কে আমার কলম দোয়াত ঘেঁটেছে রে?" আমি দোষী (culprit) কাছেই বসে ছিলাম। বললাম, "মহারাজ, আপনার কলম আমি ব্যবহার করেছি। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?" তিনি বললেন, "তুই তো আহাম্মকের মতো কলমের মাথা এদিকে ওদিকে রেখেছিস। আমার কালো ও লাল কালির কলমগুলির মাথা একদিকে থাকে। আর তুই কালি সমেত নোংরা কলমই রেখেছিস। কাজেই বুঝলাম, আনাড়ী কেউ কলম না ধুয়েই এদিক ওদিকে রেখেছে।" আমরা মহারাজের কলমে লিখতে ভরসা পেতাম না। কিন্তু গণেন মহারাজের দোয়াত কলমে হাত দিতে ভয় করতাম।

মহারাজ কেমন করে তামাক খাওয়া ধরেছিলেন, তা একদিন বলেছিলেন। তামাক ধরিয়ে দিতে গিয়ে তামাক খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যায়। বলেছিলেন, "তা কার তামাক ধরাতে গিয়েছিলাম —স্বয়ং স্বামীজীর!" কী শ্রদ্ধা স্বামীজীর উপর!! বললেন, "স্বামীজী বলতেন, 'কেউ তামাকটা একটু ধরিয়ে দেয় না!' তাই একটু একটু টেনে ধরাতে ধরাতে তামাক খাওয়ার অভ্যাস হয়ে গেল।" সান্যাল মশায় রোজ সন্ধ্যাবেলা মহারাজের কাছে আসতেন ও অনেকক্ষণ বসে থেকে পরে বাড়ী যেতেন। আমাদের খুবই স্নেহ করতেন। তিনি এলে কেউ তামাক সেজে দিত। মহারাজ একটু দেরিতে নামতেন। একদিন দেখেন তখনও কেউ তামাক দেয়নি। তিনিও তামাক দেবার জন্য কাউকে বলেননি। মহারাজ বললেন, "ওরে তামাক সেজে দে। আমি থাকতেই যে সান্যাল কলকে পাচ্ছে না রে।" একবার মহারাজ তখন কোয়ালপাড়ায় ছিলেন। আমাকে বললেন, "রামময়, তুই তো মায়ের ভাণ্ডারী। কোথায় কি আছে সব জানিস। মায়ের ভাণ্ডারে অনেক মধু আছে না?" আমি বললাম, "হাঁ আছে।" মহারাজ বললেন, "আমি কবিরাজী ওষুধ খাব। একটু মধু লাগবে। তুই মায়ের ভাঁড়ার থেকে এক বোতল মধু চুরি করে আনবি তো।" আমি বললাম, "হাঁ মহারাজ, নিয়ে আসব।" আমি যখন মধু বের করছিলাম মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করছ?" আমি বললাম, "শরৎ মহারাজ মধু দিয়ে কবিরাজী ওষুধ খাবেন, তাই আমাকে বলেছেন এক বোতল মধু চুরি করে নিয়ে যেতে।" মা শুনে বললেন, "চুরি করতে হবে কেন বাবা? শরৎকে কি আমার কিছু অদেয় আছে? আরও নিয়ে যাও। শরৎ আমার দেবের দুর্লভ ধন! সে মধু খাবে। মধুরও ভাগ্য—যে ভক্ত দিয়েছে তারও ভাগ্য। আমি তো গুড়ের মতো খামচা খামচা মুড়ির সঙ্গে ছেলেদের খেতে দিই।" মহারাজ মধু পেয়ে খুব খুশী হলেন। [ক্রমশঃ]

সেদিন কেন আসিনি কো

শ্রীশান্তশীল দাশ

সেদিন কেন আসিনি কো এই ধরণীর 'পরে,
যেদিন তুমি এসেছিলে ভুবন আলো করে!
ছুঁয়ে তোমার রাঙা চরণ
ধন্য হল কত-না জন;
জীবনগুলো রঙিন হয়ে উঠলো তোমার বরে।

আসন 'পরে বসে আছ, কইছ কথা কত;
কথা তো নয়, ঝরছে মধু ঝরনাধারার মতো।
দু-কান ভরে শুনছে তারা
হয়ে গিয়ে আত্মহারা;
ভাবছি যত, দু-চোখ আমার উঠছে জলে ভরে।

সতী ও উমা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

[আশ্বিন, ১৩৮৯ সংখ্যার পর]

পিতা দক্ষের শিবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সতী তো যোগাগ্নিতে দেহত্যাগ করিলেন। শোকবিহ্বল মহাদেব সতীর প্রাণহীন দেহ কাঁধে লইয়া ভয়াবহ নৃত্যে ত্রিলোককে যখন সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন এবং গত্যন্তর না দেখিয়া চক্রধারী নারায়ণ যখন তাঁহার চক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভারতবর্ষের একান্ন স্থানে নিক্ষেপ করিতেছেন তখন স্থূলদেহবিমুক্তা পরমেশ্বরী সূক্ষ্মদেহে তাঁহার পরবর্তী লীলার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

আবার তিনি মর্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিবেন। গিরিরাজ হিমালয় হইবেন তাঁহার পিতা এবং তাঁহার সর্বগুণান্বিতা শিবের একান্ত ভক্ত সহধর্মিণী মেনকা দেবী হইবেন এবারকার লীলায় গর্ভধারিণী মাতা। সৃষ্টিকর্তা বিধাতা পূর্বেই হিমালয়কে শৈলকুলের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং যদিও তিনি মর্ত্যবাসী, তবুও তাঁহার বহুতর সদ্গুণ এবং মহত্ত্বের জন্য তাঁহাকে দেবতাদের সম্মান দিয়া তিনি যজ্ঞে আহুত হোমদ্রব্যের ভাগ পাইবেন এই বিশেষ অধিকার তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। মেনকা দেবী ছিলেন পিতৃগণের দুহিতা। তাঁহার সদ্গুণের অন্ত ছিল না। তিনি শিবগেহিণী সতীর ন্যায় একটি পরম রূপবতী এবং মনোরমা কন্যার জননী হইবেন, হৃদয়ের অন্তস্তলে এই বাসনা বহুকাল হইতে পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং জগন্মাতার কাছে ব্যাকুল প্রার্থনাও জানাইয়াছিলেন। জগন্মাতা তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন, তথাস্তু। পূর্বে গিরিরাজ হিমালয় এবং দেবী মেনকা সন্তানকামনায় অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রথম সন্তান আসিল অতি সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র। নাম হইল মৈনাক।

মৈনাকের জন্মের কিছুকাল পরে সতী-মা সূক্ষ্ম দেহে মেনকার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। যথাকালে মেনকার দ্বিতীয় সন্তানরূপে জগন্মাতা ভূমিষ্ঠ হইলেন এক অপরূপ সুষমাময়ী কন্যার মূর্তিতে। মেনকা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন জগজ্জননী তাঁহার আকুল প্রার্থনা শুনিয়াছেন, শিবগেহিণী সতীই এবার তাঁহার নন্দিনী হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভব কাব্যে দক্ষকন্যা "ভবপূর্বপত্নী" সতীর এই মেনকার কন্যারূপে আবির্ভাবের বর্ণনায় লিখিয়াছেন:

"যেদিন সতী গিরিরাজ হিমালয়ের তনয়া রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন সেদিন স্থাবর জঙ্গম সকলের পক্ষেই অত্যন্ত সুখকর হইয়াছিল। দশদিক আনন্দে ভরিয়া উঠিল। ধূলিবিহীন নির্মল বায়ু বহিতে লাগিল। আকাশমণ্ডল দেবগণের শঙ্খধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। নিরন্তর অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।"[১]

পর্বতে জন্ম বলিয়া কন্যার নাম হইল পার্বতী। কেহ কেহ বলিত 'গিরিজা' বা 'শৈলজা'। পরে বালিকা আর একটি নাম পাইবেন—উমা।

"চন্দ্রলেখা যেমন উদয়ের পর জ্যোৎস্নাদীপ্ত নূতন নূতন কলার সহযোগে বাড়িয়া পূর্ণ হইতে পূর্ণতর সুষমা লাভ করে, এই নবকুমারীও সেইরূপ

---

১ প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং শঙ্খ স্বনানন্তর পুষ্পবৃষ্টি।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব॥ কুমারসম্ভবম্, ১।২৩

দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া অপরূপ লাবণ্যময়ী হইয়া উঠিতে লাগিল।"[২] কুমারী পার্বতীরূপিণী জগন্মাতার আবির্ভাবে হিমালয়ের গিরিকান্তার প্রস্তরনির্ঝর বৃক্ষলতা ফুলফল সব কিছু যেন নূতন দীপ্তি লাভ করিল। সর্বত্র যেন আনন্দের মেলা। বালিকা সখীগণের সঙ্গে নানা খেলাধূলা করিয়া বেড়ায়। বয়স একটু বাড়িলে মেধাবিনী লেখা-পড়াতেও নৈপুণ্য লাভ করিতে লাগিল। পুত্র মৈনাক এবং কন্যা পার্বতী উভয়েই পিতামাতার হৃদয়ের ধন; তবুও গিরিরাজ পার্বতীকে দেখিলে ভাবে আত্মহারা হইয়া যান। কোলে লইয়া বুকে ধরিয়া রাখিলে আর যেন ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। জননী মেনকারও পার্বতীর সান্নিধ্যে ভাববিহ্বলতার সীমা নাই।

এমনি করিয়া বৎসরের পর বৎসর কাটে। একদিন ত্রিকালদর্শী দেবর্ষি নারদ গিরিরাজের কন্যাকে দেখিতে হিমালয়ে উপস্থিত। রাজা হিমালয় পরমসমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সবিনয়ে প্রার্থনা জানাইলেন: "দেবর্ষি, আপনি ভূতভবিষ্যৎদ্রষ্টা, দয়া করিয়া আমার কন্যার দোষগুণ এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ধ্যান-দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পান আমাকে বলুন।"

নারদ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "গিরিবর, আপনার কন্যা সর্বসুলক্ষণযুক্তা। পতির পরম-প্রিয়া সর্বজনবরেণ্যা হইয়া এই কল্যাণী দিকে দিকে মঙ্গল বিকীর্ণ করিবে। আরও বহু নামে বালিকা পরিচিতা হইবে। এই তো গুণের দিক। দোষের দিকে দেখিতেছি, ইহার যিনি স্বামী হইবেন, তিনি গুণহীন, উদাসীন, জটাধারী, সংসারবিরাগী, বেশভূষাহীন, অমঙ্গলসূচক বস্তুপ্রিয় এবং যথাতথা বিচরণকারী।"

হৃদয়দুলালীর ভবিষ্যৎ পতির এই চিত্রে গিরিবর হিমালয় এবং মেনকা উভয়েই বেশ দমিয়া গেলেন। পার্বতীর মুখ কিন্তু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন নারদ হাসিয়া বলিলেন, "গিরিরাজ, আপনার কন্যার ভবিষ্যৎপতির যে সব দোষ বর্ণনা করিলাম সেগুলি দেবদেব মহেশ্বর ছাড়া আর কাহাতে বর্তমান বলুন তো? শুনুন তবে, সতীহীন মহেশ্বরের পার্শ্বে শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্যই আপনার কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। যথাকালে শিব ইহার পাণিগ্রহণ করিবেন।"

নারদের এই আশ্বাসবাণীতে উদ্বিগ্ন মাতা-পিতার হৃদয় শান্ত হইল। পার্বতীর আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমে বালিকা কৈশোরে উপনীত হইল। অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী কিশোরী-রূপে জগন্মাতা হিমালয় আলো করিয়া শিবের সহিত সম্মিলনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণুচক্রে সতীর দেহ বিচ্ছিন্ন হইবার পর শোকোন্মত্ত মহেশ্বর কৈলাসে গিয়া সেই যে ধ্যানে বসিয়াছিলেন তাঁহার সেই ধ্যান আর ভাঙ্গিবার লক্ষণ নাই। চিরবিরাগী মহেশ্বরের উদাসীনতা যেন সহস্র গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে। এদিকে স্বর্গলোকে তুমুল বিপর্যয়। দেবতাবিদ্বেষী তারকাসুর দেবতাদের জয় করিবার উদ্দেশ্যে হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াছিল। সেই তপস্যা-প্রসূত তেজ তাহার মাথা হইতে নির্গত হইয়া এখন দেবতাদের দগ্ধ করিতেছে। দেবতারা নিরুপায় হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করিয়াছিলেন, আপনি তারকাসুরকে যে কোনও প্রকারে নিবৃত্ত করুন। ব্রহ্মা তারকাসুরের কাছে গিয়া বলিয়াছিলেন, বৎস, স্বর্গবাসীদের উপর অত্যাচারে ক্ষান্ত হও। তোমাকে বরং দুটি বর দিব। তারকাসুর এক বরে চাহিয়াছে, তাহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী অপর কেহ যেন

২　দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥　কুমারসম্ভব, ১।২৫

জন্মগ্রহণ না করে। দ্বিতীয় বরে তাহার প্রার্থনা এই যে, মহাদেবের পুত্র ব্যতীত অপর কাহারও হাতে যেন তাহার মৃত্যু না হয়। দেবতারা বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন। সতীর তিরোভাবের পর মহেশ্বর তো একান্ত বিবাগী হইয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তাঁহার পুত্র আসিবে কোথা হইতে?

দেবতারা সকলে পুনরায় পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, শিবগেহিণী সতী গিরিরাজ হিমালয়ের বনিতা মেনকার গর্ভে জন্ম লইয়া এখন ত্রিলোকসুন্দরী পার্বতী রূপে বিরাজিতা। দেবীর সহিত মহাদেবের পুনর্মিলন অবশ্যম্ভাবী জানি। তবে এই ঘটনাকে যদি কোনও উপায়ে ত্বরান্বিত করা যায় সেই চেষ্টা দেখ। শিবের ঔরসে পার্বতীর গর্ভজাত পুত্রই দেব-সেনাপতি হইয়া তারকাসুরকে সংহার করিতে পারিবে

দেবসভা বসিল। ইন্দ্র কামদেবকে ডাকিয়া বলিলেন, বন্ধু মদন, অপ্সরাদের মুখে শুনিয়াছি কৈলাসপতি মহাদেব সতীবিহীন কৈলাসে আর থাকিতে না পারিয়া হিমালয়ের এক রম্য বনানীতে আসিয়া আসন স্থাপন করিয়াছেন। গিরিরাজ হিমালয় কন্যা পার্বতী সহ তাঁহাকে দর্শন করিয়া পার্বতীকে দেবদেবের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। মহেশ্বর আপত্তি করেন নাই, তবে তাঁহার মন আগেকার মতোই উন্মনা। পার্বতী সখীদের সহিত নিত্য আসিয়া পুষ্প পত্র জল ফল শিবকে নিবেদন করিয়া যান; শিব গ্রহণ করেন, কিন্তু এই নিরুপমা ত্রিলোকসুন্দরীর দিকে চাহিয়াও দেখেন না। এখন বন্ধু, তোমার ভুবনবিজয়ী শক্তি ছাড়া শিবের মনকে নামাইবার অন্য উপায় দেখি না। মন্মথ কহিলেন, তথাস্তু। কিন্তু তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। নিজের ক্ষমতার উপর যতই আস্থা থাকুক, মহাযোগী মহেশ্বরের চিত্তকে টলানো কি সহজ কথা?

অপ্সরাদের আনীত খবর সত্য। মহাদেব কৈলাস হইতে সাঙ্গোপাঙ্গ অনুচরদের লইয়া হিমালয়ের একটি মনোরম স্থানে নামিয়া আসিয়াছেন। একটি লতাকুঞ্জের মধ্যে তাঁহার ধ্যানের আসন। নন্দী লতাকুঞ্জের দ্বার পাহারা দেন। কিছুদূরে মুনি ঋষি তপস্বীরাও বাস করেন। পার্বতী নিত্য দুইজন সখী সহ আসিয়া শিবপূজার জন্য পুষ্পচয়ন করেন, মালা গাঁথেন, সমাধিমগ্ন মহাদেবের আসন-বেদি পরিষ্কার করেন, অর্চনা ও অভিষেকাদির জন্য জল আনেন। সমগ্র আশ্রমের পরিবেষ্টনীতে একটি স্তব্ধ শান্তি ছাইয়া থাকে।

কামদেব তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী রতি এবং চিরপ্রিয় বন্ধু বসন্তঋতুকে লইয়া ত্রিলোচনের আশ্রমে উপনীত হইয়া একটি গুপ্ত প্রদেশে আশ্রয় লইলেন। যদিও উহা বসন্তকাল নয় তবুও বসন্ত-ঋতুর উপস্থিতিতে সর্বত্র বসন্তের সাড়া পড়িয়া গেল। অকালে বসন্তের ফুল ফুটিতে লাগিল, আম্রবৃক্ষে কচি কচি পল্লব ও পাতা দেখা দিল, ভ্রমর গুঞ্জনে এবং পাখীদের গানে দিক ভরিয়া গেল। মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল। তপস্বীরাও ধ্যানধারণায় শৈথিল্য দিয়া হৃদয়ে বসন্তের স্পর্শ অনুভব করিয়া একটু যেন বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ত্রিলোচনের লতাগৃহের দ্বাররক্ষী এবং তাঁহার চিরানুরক্ত নন্দী বনস্থলীর এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ বুঝিতে না পারিয়া বিষম বিরক্ত হইলেন। পাছে মহাদেবের ধ্যানের কোনও বিঘ্ন হয় এই আশঙ্কায় তিনি তর্জনী ঠোঁটে লাগাইয়া শিবের অনুচরগণের উদ্দেশে নীরব শাসন জ্ঞাপন করিলেন—"চুপ, কোনও রূপ চপলতা করিও না।" উহার ফলে তপোবনের বসন্ত প্রকৃতির মত্ততা সাময়িকভাবে থামিয়া গেল।

নন্দীর শাসনে সমগ্র বনভূমি ছবিতে আঁকা বস্তুর মতো নিষ্কম্প হইয়া উঠিল।[৩] অদূরে লুক্কায়িত মদন, রতিদেবী ও বসন্তঋতুর বুক সন্ত্রাসে কাঁপিয়া উঠিল। তবে মদন দেবগণের একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ লইয়া আসিয়াছেন, ভয়ে পালাইতে পারেন না। সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সুযোগ আসিল একদিন। পার্বতী সখীদ্বয় সহ শিবের অর্চনা করিতে আসিয়াছেন। নানা বসন্তের ফুল আনিয়াছেন, পদ্মবীজের একটি জপ-মালাও। তিনি নিজে বসন্তকুসুমের আভরণে সজ্জিতা। অনিন্দ্যসুন্দর তাঁহার মূর্তি। মদন একটি গাছের আড়ালে পুষ্পধনু লইয়া দণ্ডায়মান। যেই পার্বতী প্রণতা হইয়া মহাদেবের পায়ে পুষ্প নিবেদনে উদ্যতা সেই মুহূর্তে মদন তাঁহার পুষ্প-শর শিবের প্রতি ছুঁড়িয়া দিলেন। ধ্যানস্থ মহেশ্বর চিত্তে ঈষৎ চাঞ্চল্য অনুভব করিয়া চোখ একটু মেলিয়া মদনকে দেখিতে পাইলেন। মহাযোগীর ক্রোধাগ্নি ধক্‌ ধক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। স্বর্গে দেবতারা কাঁপিয়া উঠিলেন, চিৎকার করিয়া কাতর প্রার্থনা জানাইলেন—ক্রোধং প্রভো সংবর সংবর—হে প্রভু, ক্রোধ সম্বরণ করুন, সম্বরণ করুন। কিন্তু স্বর্গের শব্দ মর্ত্যে পৌঁছিবার আগেই বিরূপাক্ষের তৃতীয় নয়ন হইতে বিচ্ছুরিত অগ্নিশিখা মদনকে ভস্মীভূত করিল। রতির বিলাপে আকাশ ভরিয়া গেল।[৪]

কামদেবের নিপাতসাধন করিয়া মহাদেব স্থির করিলেন নারীজাতির যেখানে গতাগতি সেখানে আর থাকিবেন না। প্রমথগণ সহ তিনি অন্তর্হিত হইলেন। পার্বতীর হৃদয়ে বেদনার সীমা নাই। তিনি বুঝিলেন রূপলাবণ্যের দ্বারা শঙ্করের হৃদয় জয় করা যাইবে না। তাঁহার আত্মাভিমান ক্ষুব্ধ হইল। গিরিরাজ হিমালয় আসিয়া দুঃখক্লিষ্টা কন্যাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

গৃহে ফিরিয়া পার্বতী সকল কাজ ছাড়িয়া মহেশ্বরের ধ্যানচিন্তায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অশন ভূষণ কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। কমনীয় কান্তি শুকাইয়া যাইতে লাগিল। পিতা-মাতা হৃদয়দুলালীর কঠোর তপশ্চর্যা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। জননী মেনকা একদিন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, উ (ওগো মেয়ে)—মা (না—অত কোরো না)। সেই হইতে পার্বতীর নূতন নাম হইল উমা।

হিমালয়ের একটি শিখরে ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করিয়া উমা তপস্যায় ডুবিয়া গেলেন। একটি সখী সঙ্গে আছেন। কুটীর প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখেন। দেহের কোনও প্রকার যত্ন নাই, পানাহার নাই, নিদ্রাও নাই বলিলে চলে। এক একটি গাছের পর্ণের (পাতা) রস উমার আহার্য। এই ব্যাপার স্মরণ করিয়া দেবীকে পরে লোকে অপর্ণা নামে ডাকিবে। কিন্তু পার্বতীর তপঃক্লিষ্ট শরীর হইতে কী অপার্থিব সাত্ত্বিক জ্যোতি বাহির হইতেছে!

দিন যায়, মাস যায়, সম্বৎসর যায়। শিবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য পর্বতনন্দিনীর কী দুঃসাধ্য ব্রত! একদিন তাঁহার কুটীরের সম্মুখে এক জটাজুটধারী ব্রহ্মচারী আসিয়া উপস্থিত। পার্বতী ও সখী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রণাম ও পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া সম্মান করিলেন। ব্রহ্মচারী বসিয়া

৩ তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে।

কুমারসম্ভব, ৩।৪২

৪ ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সঙ্গীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি। রবীন্দ্রনাথ—'মদন ভস্মের পর'

আলাপ জুড়িয়া দিলেন। "বৎসে, কি উদ্দেশ্যে তোমার সুকুমার দেহ নষ্ট করিতেছ? রাজকন্যা তুমি, জীবন যৌবন তোমার এইভাবে ব্যর্থ করা সঙ্গত নয়। কত রাজকুমার, এমন কি দেবকুমার সাদরে তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। যাও বৎসে, ঘরে যাও।"

উমার সখী ব্রহ্মচারীকে জানাইল কেন হিমালয়-দুহিতা এই দুষ্কর তপস্যায় ব্রতী রহিয়াছেন। শুনিয়া ব্রহ্মচারী হাসিয়া উঠিলেন—বিদ্রূপভরা হাসি।

"শিব কি তোমার যোগ্য সুকুমারী? শ্মশান-চারী কুল-মান-ধন-হীন ভিখারীকে পতি করিয়া কোন্ সুখ লাভ করিবে? সংসারের কোন আনন্দই শিব তোমাকে দিতে পারিবেন না।"

ব্রহ্মচারী এইভাবে মহাদেবের উদ্দেশে অনেক শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। উমা অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনি শিবের স্বরূপ কি তাহা জানেন না, তাই মূর্খের ন্যায় কথা বলিতেছেন। দয়া করিয়া থামুন। আপনার কোনও উপদেশ আমি শুনিতে চাই না।"

ব্রহ্মচারী তবুও থামেন না। তখন উমা কান বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ঐ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। উমা দেখিলেন ব্রহ্মচারী চকিতে মহাদেবের মূর্তিতে পরিবর্তিত। উজ্জ্বল প্রশান্ত হাস্যে চন্দ্রশেখরের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। 'কোথায় যাও?' বলিয়া উমার হাত ধরিলেন। বলিলেন, "তুমি তপস্যা দ্বারা আমাকে কিনিয়া লইয়াছ। আজ হইতে আমি তোমার গুণানুরাগী দাস হইলাম।"

*

স্বর্গে মর্ত্যে আনন্দের আলোড়ন উঠিল। উমার স্বয়ম্বর সভা বসিল। অঙ্গিরা, মরীচি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্তর্ষিরা আসিলেন। দেব-প্রতিনিধিরা আসিলেন। সকলের সম্মুখে পার্বতী চন্দ্রশেখরকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

তাহার পর হরপার্বতীর বিবাহ। গিরিরাজ হিমালয় বিপুল উদ্যোগ আয়োজন করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অন্য দেবদেবীগণ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী, অপ্সরা, কিন্নর, ঋষি, মুনি, নরনারী সকলেই এই মহামঙ্গলকর উৎসবে যোগ দিলেন।

হিমালয়ে কিছুকাল কাটাইয়া উমা-মহেশ্বর মলয় পর্বত ও গন্ধমাদন গিরির কয়েকটি সুরম্য স্থানে ভ্রমণ করিলেন। তাহার পর দিব্য দম্পতীর—শিবের চিরন্তন আলয় কৈলাসে প্রত্যাবর্তন। যাঁহাকে হারাইয়াছিলেন তাঁহাকে পুনরায় পাইয়া শম্ভুর সকল শোকের নিবৃত্তি হইল। উমা পরিপূর্ণ হৃদয়ে কৈলাসের ঘরকন্নায় মন দিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাবতিথি

ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া, ১ চৈত্র ১৩৮৯

(১৬ মার্চ, ১৯৮৩)

শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণেশ্বরে মঠ

শ্রীমতী ভারতী রায়

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ, ১লা মে। বাগবাজারে পরম ভক্ত শ্রীবলরাম বসুর বাড়ী। দ্বিতলের বড় ঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর নিকট বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ জানালেন, "নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।" "আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ করে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের আশ্চর্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস। আপনারা একার্যে সহায় হোন।" সঙ্কল্পিত সেই মঠ ও মিশনের লক্ষ্য ও পথ কি, তাও প্রাঞ্জল ভাষায় স্বামীজী প্রকাশ করে বোঝালেন, "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" ও জগতের হিতসাধনই উদ্দেশ্য। 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা।' আমরা এই স্মরণীয় দিনটি থেকে আরো তিন বছর পূর্বেকার দিনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করব। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে বন্ধু ও গুরুভাইদের নিকট লিখিত তাঁর পত্রগুলি স্মরণ করতে চাই। পত্র মানব-মনের বাতায়ন। তাই পত্রের মধ্য দিয়ে শুধু মানুষের অন্তরের নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে না, তার নিকট-সান্নিধ্যও পাওয়া যায়। স্বামীজীর চিন্তাধারার সঠিক পরিচয় পাব তাঁর পত্রাবলী ও অন্যান্য রচনায়।

বিভিন্ন পত্রে বার বার শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর প্রতি কী অগাধ শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণসহ প্রণাম জানিয়েছেন—"মা-ঠাকুরানীকে তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের দাসের পুনঃ পুনঃ ধূল্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দিবে—তাঁহার আশীর্বাদে আমার সর্বতো মঙ্গল।"

প্রণম্য মা-ঠাকুরানীকে কেন্দ্র করে স্বামীজীর স্ত্রী-মঠ স্থাপনের চিন্তাসমূহ উদ্ধৃত করলেই ঐ মঠের আদর্শটি সুপরিস্ফুট হবে। স্বামীজীর উক্তি: "প্রথমে মাতাঠাকুরানীর জন্য একটা জায়গা করবার দৃঢ় সঙ্কল্প করেছি, কারণ মেয়েদের জায়গাই প্রথম দরকার।" "মা-ঠাকুরানী কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে ব'লে। মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। ...এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই।...আমেরিকা ইউরোপে কী দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজানতে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিক-ভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কী কল্যাণ না হবে!...সেইজন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা।" "হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা অগ্নির মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে।" "মা-ঠাকুরানীর জন্য জমি কিনে দিলে আমি আপনাকে ঋণমুক্ত মনে ক'রব। তারপর আমি আর কিছু বুঝিসুঝি না।...এই ঘোর শীতে পর্বত-পাহাড়ে বরফ ঠেলে—এই ঘোর শীতে রাত্তির দুটো একটা পর্যন্ত রাস্তা ঠেলে লেকচার ক'রে দু-চার হাজার টাকা করেছি—মা-ঠাকুরানীর জন্য জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিন্ত।" "জগতের

কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, একপক্ষ পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।··· সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরু গ্রহণ, সেইজন্য নারীভাবে সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব প্রচার, সেইজন্যই আমার স্ত্রী-মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারী-কুলের আকরস্বরূপ হইবে।" "হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্ম বিচারে আহ্বান করেছিলেন। এইসব আদর্শ-স্থানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্ম জ্ঞানে অধিকার ছিল, তখন এখনই বা মেয়েদের সেই অধিকার থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্য ঘটতে পারে। History repeats itself (ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ)।"

উপরের বিভিন্ন পত্রাংশে তৎকালে স্বামীজীর অন্তর-দেশ 'মা ও মায়ের মেয়েদের' জন্য কী গভীর সহানুভূতির স্রোতে আলোড়িত হত, তার আভাস মেলে। কিন্তু তৎকালীন সমাজের কোন্ প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর স্ত্রী-মঠ স্থাপনের মহৎ ইচ্ছা জাগরিত হয়েছিল, তা চিন্তা করলে আমরা বিস্ময়াভিভূত হই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ —যখন সমাজের অর্ধাঙ্গ সমাজপতিদের কঠোর বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অন্তঃপুরের অবরোধে জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছিল তখন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে কেউ ভাবতেই পারত না। তাদেরও যে সত্তা বলে কিছু আছে, চিন্তাশক্তি আছে, শিক্ষা ও সুযোগ পেলে তারাও যে অসীম শক্তির অধিকারিণী হয়ে সমগ্র সমাজকে সেবা ও উন্নত করতে পারে, তা তখন ছিল কল্পনার অতীত। সে-কালে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা স্বামীজীর বক্তব্যগুলি যে কতখানি বৈপ্লবিক তা চিন্তা করবার শক্তি আমাদের নেই। শিষ্য শ্রীশরৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে স্ত্রী-মঠের আলোচনা প্রসঙ্গে বলছেন—"মাকে কেন্দ্রস্থানীয়া করে গঙ্গার পূর্বতটে মেয়েদের জন্য একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। এ মঠে যেমন ব্রহ্মচারী সাধু সব তৈরী হবে, ওপারের মেয়েদের মঠেও তেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধ্বী সব তৈরী হবে।" "এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে, তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল্ দেখি? স্মৃতিফৃতি লিখে নিয়ম-নীতিতে বদ্ধ করে এদেশের মেয়েদের একেবারে manufacturing machine (পুত্র-উৎপাদনের যন্ত্র) করে তুলেছে! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এই সকল মেয়েদের এখন না তুললে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?" আবার বলছেন,—"মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে।··· তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে তার প্রধান কারণ এই সব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।" "যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কখনও উন্নতির আশা নেই।" (মনুসংহিতা)। এইজন্য স্বামীজী বলেছেন আগে এদের তুলতে হবে—এদের জন্য আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে। শিষ্য সংশয় প্রকাশ করলে স্বামীজী বলেন—"এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেয়েরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে স্ত্রী-মঠ start (আরম্ভ) করে দিয়ে যাব। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তাঁদের Central figure (কেন্দ্রস্বরূপ) হয়ে বসবেন। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের স্ত্রী-কন্যারা উহাতে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরূপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজেই বুঝতে পারবে। তারপর, তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকার্যের সহায় হবে।"

তদানীন্তন পরিবারে, সমাজে তিনি দেখেছেন অসহায়া রমণীদের অবমাননা, দুর্দশা। ছয় বছর পরিব্রাজক-জীবন কালে ভারতের সর্বত্রই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, দেশ অজ্ঞানের অন্ধকূপে নিমজ্জিত। প্রেমিক সন্ন্যাসীর হৃদয় দুঃখ-ক্ষোভে বিদীর্ণ হয়েছে। হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হয়ে আমেরিকায় গিয়ে সেখানে ভিন্ন চিত্র দেখে স্বদেশবাসিনীদের জন্য তাঁর হৃদয়-তটে অশ্রু-তরঙ্গ বার বার আছড়ে পড়েছে। বলেছেন—"এদের মেয়েরা কি পবিত্র…আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন।" দেখেছেন ঘর এবং বাইরের অসংখ্য কাজের দায়িত্ব মেয়েরাই বহন করছে। এছাড়া নানাবিধ সমাজ-সংস্কারের কাজে তারা কত আগ্রহী ও তৎপর। তাই ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন—"আর আমরা কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হ'লে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ?…আমাদের পোড়া-দেশের মেয়েছেলেদের পথ চলিবার জো নাই।…আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি; তাহার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।" সেই হেতু স্বামীজী দেশের নারীজাতিকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য গভীর আগ্রহ পোষণ করেছেন। ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন—"তোমাদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না।… মেয়েদের আগে তুলিতে হইবে, আপামর সাধারণকে জাগাইতে হইবে, তবে তো দেশের কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ।…সত্যিকারের কিছু শিক্ষা চাই—যাহাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই।"

ভারতীয় নারীদের ভারতীয় ভাবের দ্বারা কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যায় সেইজন্য তিনি ব্যাকুল। শ্রীরবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী শ্রীমতী সরলাদেবীকে লিখিত দুটি পত্রে এই ভার গ্রহণ করার জন্য কী গভীর আবেদন তিনি জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক এই সন্ন্যাসীর প্রতি সরলাদেবীর অপরিমেয় শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ঐ কাজের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। তখন আইরিশ দুহিতা তেজস্বিনী মিস্ মার্গারেট নোবলকে সেই সুকঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য স্বামীজী আহ্বান জানান—দীক্ষা ও ব্রহ্মচর্যদানের পর যাঁর নাম রাখেন 'নিবেদিতা'—মহৎব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যিনি নিবেদিত।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারা মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সে-যুগ বাল্যবিবাহের যুগ। তাই ভগিনী নিবেদিতা প্রদত্ত শিক্ষাগুণে যে বালিকারা কিছু বিদ্যার্জন করত, তখনই তাদের বিবাহ হওয়ায় নিবেদিতার মন নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ত। নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে এই বিষয়ে নানা আলোচনা করেছেন। স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন বালবিধবাদের শিক্ষিত করে তুলতে। তিনি আশা করতেন, বিধবাদের মধ্য হতে প্রথম শিক্ষয়িত্রীদল সংগৃহীত হবে। তাঁরাই মঠাধিকারিণী হবেন। তাঁদের কাছে কর্মক্ষেত্রই হবে গৃহ, ধর্ম হবে একমাত্র বন্ধন এবং ভালবাসা থাকবে কেবল গুরু, স্বদেশ ও জনসাধারণের প্রতি। তাই আমরা বলতে পারি নিবেদিতা বিদ্যালয়েই স্ত্রী-মঠের অতি ক্ষুদ্র বীজ বপন করা হয়েছিল। ভগিনী সুধীরা দেবী স্বামীজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিদ্যালয়ের সংলগ্ন আশ্রম বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন—যার প্রথমে নাম ছিল 'মাতৃমন্দির',—শ্রীমায়ের দেহাবসানের পর নাম হয় 'সারদা-মন্দির'। স্বামীজীর গুরুভাইয়েরা উৎসর্গীকৃতপ্রাণা নারীদের সারদামন্দিরে থেকে উচ্চাদর্শে জীবন যাপনে নানাভাবে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করে গিয়েছেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে একদল উচ্চশিক্ষিতা

রমণী পরহিতায় সর্বস্ব সমর্পণের জন্য নিবেদিতা বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কর্তৃপক্ষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীর সময়ে স্বামীজীর সংকল্পকে রূপদানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দ—এই এক বৎসর-ব্যাপী শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী সারা দেশে মহা আড়ম্বরে পালিত হয়। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম সাতজন মহিলাকে বেলুড় মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজী ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করেন।

বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীমৃগাঙ্কমোহন সুর পিতৃ-স্মৃতি রক্ষার্থে আনন্দ পালিত রোডে একটি দ্বিতল ভবন দান করেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিতা ও স্নেহধন্যা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার নেতৃত্বে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের কয়েকজন ত্যাগব্রতধারিণী স্বামীজীর স্বপ্নকে সফল করার জন্য ঐ গৃহে মঠজীবন যাপন শুরু করেন। প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা নিবেদিতা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী। তিনি ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী কৃস্টীন ও ভগিনী সুধীরার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ত্যাগ-ব্রতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। শ্রীমায়ের দেহাবসানের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকেই তিনি মায়ের সেবিকারূপে অনলস সেবা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে মায়ের স্নেহ-পাত্রী হন। শ্রীমায়ের দেহাবসানের পর তিনি দীর্ঘ ২৫।২৬ বৎসর কাশীতে গভীর ধ্যান-তপস্যায় আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করেন। এর পূর্বেই তাঁকে শ্রীমৎ সারদানন্দজী তন্ত্রমতে সন্ন্যাস (পূর্ণাভিষেক) দান করেন। স্ত্রী-মঠ স্থাপনের পূর্বে স্বামী শঙ্করানন্দজী তাঁকে জানান যে, স্ত্রী-মঠ স্থাপিত হলে, তাঁকেই তার প্রথম অধ্যক্ষারূপে নেতৃত্ব দান করতে হবে—তাঁকে মঠবাসিনীদের সম্মুখে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শ ধরে সঠিক পথের নির্দেশ দিতে হবে।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ২ ডিসেম্বর, স্ত্রী-মঠের জন্য ক্রীত দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার তীরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরের সন্নিকটে 'সুরধুনি-কানন'-এ শাস্ত্রীয় মতে পূজা-হোম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্ত্রী-মঠ স্থাপিত হয়। সবার মনে সেদিন বয়েছিল আনন্দের জোয়ার। পুরনো ঠাকুরবাড়ীর একতলার ছাদ নীচু, দরজা আরো ছোট। অনভ্যস্ত অনেকে মাথায় আঘাত পান, কিন্তু সহর্ষে স্মরণ করা হচ্ছিল শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে সেই নহবতের কত ক্ষুদ্র গৃহে থাকতেন। আলপনা, ফুল, পাতা ও মালা দিয়ে ঠাকুরঘর ও হলঘরকে সাজানো হয়েছিল। ভোর থেকে গেটের ওপরের নহবতের সানাইয়ের মনমাতানো সুরলহরী আকাশে, বাতাসে, গঙ্গাসলিলে ছড়িয়ে পড়ছিল। যথাসময়ে বেলুড়মঠ থেকে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী ও অন্যান্য প্রবীণ সন্ন্যাসিবৃন্দ এসে উপস্থিত হলেন। উজ্জ্বল গৌরকান্তি অধ্যক্ষ মহারাজ ধীরে ধীরে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজার পাশে বসলেন। নির্ধারিত শুভমুহূর্ত উপস্থিত হলেই দ্বারোদ্ঘাটন করবেন। সম্মুখের চাতালে প্রথম সারিতে ব্রহ্মচারিণীবৃন্দ, তাঁদের পশ্চাতে ভক্ত মহিলা ও পুরুষবৃন্দ। ঠাকুর-বাড়ির উপরের দিকে গৈরিক পতাকা উত্তর বাতাসের স্পর্শে দ্রুত কম্পিত হচ্ছে—যেন এই অননুভূত আনন্দের বার্তা প্রচার করছে। 'ক্রীপার হাউস' ছিল একদা কোন বিত্তশালীর প্রমোদ ভবন। আর আজ সেই প্রমোদ ভবনই রূপান্তরিত হতে চলেছে—স্ত্রী-মঠে। মনে করিয়ে দেয়,—বুদ্ধের অপূর্ব ধর্মোপদেশ শুনে বৈশালীর রূপোপজীবিনী আম্রপালী নিজের বিশাল সম্পদ বিতরণ করে দিয়ে ভিক্ষুণী হয়েছিলেন। তার দেহের মহার্ঘ রত্নখচিত আবরণ ও আভরণ যেন সব তখনো অঙ্গ থেকে স্খলিত হয়নি—কিন্তু অন্তর বৈরাগ্যে মোহমুক্ত। ঠিক সময়টিতে স্বামী শঙ্করানন্দজী চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, দ্বারোদ্ঘাটনের

পর সন্ন্যাসিবৃন্দ ও ব্রহ্মচারিণীরা ঘরে প্রবেশ করলেন। ব্রহ্মচারিণীদের কণ্ঠে বেদ গান। ঠাকুরঘরে একে একে শ্রীঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজীর প্রতিকৃতি স্থাপন করে অধ্যক্ষ মহারাজ আসনে চক্ষু মুদ্রিত করে বসলেন। তিনটি প্রতিকৃতির পায়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করলেন। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ সারদা মঠ ত্যাগ করে চলে গেলেন,—সঙ্গে সঙ্গে গেলেন ভক্ত পুরুষেরাও। সারাদিন ধরে চলেছিল উৎসব—ঠাকুরঘরে পূজো-হোম ইত্যাদি। বাইরে সামিয়ানার নীচে বসে ভক্ত মহিলাদের প্রসাদ গ্রহণ। সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত কয়েক হাজার মহিলা প্রসাদ পেয়েছিলেন।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুআরি, শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথিতে বেলুড় মঠের পুরানো ঠাকুর-ঘরে সাতজন ব্রহ্মচারিণীকে সন্ন্যাস দান করেন মঠাধীশ স্বামী শঙ্করানন্দজী। স্বামীজী বলে গিয়েছেন, যখন ত্যাগী উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা মঠকে চালাবার যোগ্যতা অর্জন করবেন তখন স্ত্রী-মঠ সম্পূর্ণ স্বাধীন সঙ্ঘ হবে, রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে তার কোন সংস্রব থাকবে না, যদিও লক্ষ্য, পথ ও নিয়মাবলী একই থাকবে। এই কারণেই ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের অগস্ট মাসে শ্রীসারদা মঠ একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সঙ্ঘরূপে ঘোষিত হয় এবং রামকৃষ্ণ সারদা মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের যে সব শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যই ছিল, সেগুলির সম্পূর্ণ ভার এবার থেকে রামকৃষ্ণ-সারদা মঠ বা রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের হস্তে সমর্পিত হল।

সেদিনের সেই অঙ্কুর আজ সতেজ সপ্রাণ বৃক্ষে পরিণত হয়েছে,—চারিদিকে শাখা বিস্তার করে চলেছে। কলকাতায়—রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন (মহাবিদ্যালয়), মাতৃভবন (প্রসূতি-সদন), রামকৃষ্ণ-সারদা মিশন আশ্রম (কলেজ স্টুডেন্টস্ হোম, বয়স্কা শিক্ষালয়, গ্রন্থাগার, টেক্সটবুক লাইব্রেরী ইত্যাদি), শিক্ষামন্দির (মাদার্স ট্রেনিং, প্রি-বেসিক ও জুনিয়ার বেসিক স্কুল)। মাদ্রাজে শ্রীসারদা মঠ, কেরালার ত্রিচুরে—বিদ্যার্থিনী মন্দিরম্, কলেজ স্টুডেন্টস্-হোম; ত্রিবেন্দ্রামে কলেজ স্টুডেন্টস্ হোস্টেল, দিল্লীতে—প্রি-প্রাইমারি ও প্রাইমারি বিদ্যালয়। অরুণাচল প্রদেশের খনসায় আদিবাসী বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়; ব্যাঙ্গালোরে ও পুণায় আশ্রম। সব কেন্দ্রে সুনির্দিষ্ট কর্মধারা ও নিয়মিত পঠন-পাঠন ইত্যাদির সঙ্গে আছে বিভিন্ন মহিলা কেন্দ্রে ধর্মপ্রসঙ্গ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচার এবং শ্রীমায়ের পূত জীবনের আলোচনার ব্যবস্থা।

চলমান মহাকালের স্রোতধারায় সাতাশ বছর সাতাশটি বুদ্বুদ। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীসারদা মঠ প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী শ্রীমায়ের মন্দিরের শিলান্যাস করেন। সেই মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটনের দিন ধার্য হয়েছিল বিগত ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের ৩ই নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পূজোর দিন।

এল আর একটি পুণ্য প্রভাত! কিন্তু কত পরিবর্তন,—নেই সেই ক্রীপার হাউস, নেই সেখানে ফোয়ারা। সেই স্থানে উঠেছে মঠ-বাড়ী—শুধু শুভ্র ও গৈরিক বস্ত্র—যা পবিত্রতা ও ত্যাগের প্রতীক। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন,—মা আস্তরণ বিছিয়ে সূর্যকে আড়াল করে রেখেছেন। ৬-৪৫ মিনিটে সবৎসাগাভীসহ সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীদের শ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের পূত ভস্মাধার, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিকৃতি ও নানা প্রকারের মাঙ্গলিক উপচার ও গৈরিক পতাকাসহ মন্দির প্রদক্ষিণ শুরু হল—কণ্ঠে তাঁদের বেদ গান, ঠাকুর ও মায়ের ভজন। বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসিবৃন্দ এসেছেন। এসেছেন অগণিত ভক্ত মহিলা ও পুরুষ।

সমবেত ভক্ত মহিলাদের মধ্যে ছিলেন ভারতের নানা প্রদেশ থেকে আগত মহিলাবৃন্দ। সেদিনও মন্দিরের সম্মুখভাগের চূড়ায় গৈরিক পতাকা বাতাসে আন্দোলিত, পুলকিত হয়ে শ্রীমায়ের শুদ্ধসত্ত্ব ত্যাগী মেয়েদের আহ্বান করছিল যেন দেশ-দেশান্তর থেকে তাঁরা ছুটে আসেন মায়ের কাজ করার জন্য। মন্দির প্রদক্ষিণের সময় অনেক মহিলা ভক্ত পথে ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, হুলুধ্বনি ও সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ছিল চতুর্দিক আলোড়িত করে।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন ৭-৩০ মিনিটে। ৫ই নভেম্বর থেকে ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত যে বিরাট কর্ম-কাণ্ড কী সুশৃঙ্খল-ভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা যাঁরা উপস্থিত থেকে দেখেছেন তাঁরাই জানেন। এত শক্তি এল কোথা থেকে? স্বামীজীর গভীর ইচ্ছা ছিল মাকে কেন্দ্রস্বরূপা করে মঠ স্থাপিত হবে—সেই করুণাময়ী মা-ই 'রাশ ঠেলে' দিয়ে তাঁর প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছেন। কেবলই মনে হয় নারীজাতির প্রতি কৃপাপরবশ স্বামীজী কত বড় একটি পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে গিয়েছেন! যারা সংসারের গতানুগতিক জীবনধারা ত্যাগ করে মহৎ উচ্চাদর্শে আত্মসমর্পণ করতে চায় তাদের জন্য তৈরী হল এই মায়ের মঠ। পৃথিবীর নানাদেশের মেয়েদের জন্য স্নেহকোমলা মা বাহু প্রসারিত করে স্ত্রী-মঠে আসীনা। তাঁর কত মেয়ে এসেছেন! ভবিষ্যতে আরো কত মেয়ে আসবেন! আমরা সেই প্রতীক্ষাতেই রইলাম।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ই. টি. স্টার্ডি

ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য

স্বামীজীর জীবনীর সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কাছে তাঁর ইংরেজ শিষ্য ই. টি. স্টার্ডির নাম অচেনা হওয়ার কথা নয়। ইংলণ্ডে স্বামীজীর বেদান্তপ্রচারের ক্ষেত্রে স্টার্ডি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আমেরিকায় স্বামীজীর সাফল্যের সংবাদে উৎসাহিত হয়ে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন (৩০ মার্চ, ১৮৯৫) এবং স্বামীজীকে ইংলণ্ডে এসে বেদান্তপ্রচার করার জন্য আন্তরিক আমন্ত্রণ জানান। যদিও স্টার্ডির আগেই কেম্ব্রিজের মিস হেনরিয়েটা মূলার স্বামীজীকে ইংলণ্ডে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু স্টার্ডির আমন্ত্রণকে 'দৈব আহ্বান' বলেই স্বামীজী গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৭-র জানুআরিতে . ভারতে প্রত্যাবর্তনের আগে আমেরিকা থেকে স্বামীজী দুবার ইংলণ্ডে এসেছিলেন। প্রথমবার ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর। থাকেন প্রায় আড়াই মাস (২৬ নভেম্বর পর্যন্ত)। দ্বিতীয়বার আসেন ১৮৯৬-র ২০ এপ্রিল এবং ১৬ ডিসেম্বর স্বদেশের পথে রওনা হওয়া পর্যন্ত থাকেন মাস ছয়েক। মাঝে ১৯ জুলাই থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাস দুয়েক সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানি এবং হল্যাণ্ড ভ্রমণ করে এসেছিলেন। দুবারেই স্বামীজীর ইংলণ্ডে আসার পিছনে ছিল স্টার্ডির আগ্রহাতিশয্য এবং সাদর আমন্ত্রণ। উভয়বারেই স্বামীজী বেশ কিছুদিন লণ্ডন থেকে ৩৬ মাইল পশ্চিমে রেডিং-এ স্টার্ডির বাড়ীতেই অতিথি হিসেবে থেকেছেন। পরে কাজের সুবিধার জন্য স্থান পরিবর্তন করেছিলেন। ইংলণ্ডে স্বামীজীর শুধু বাসস্থানের ব্যাপারেই নয়, বক্তৃতার ব্যবস্থাপনার এবং স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে কার্যপরিচালনার দায়িত্ব

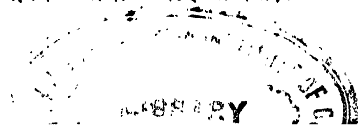
মূলতঃ স্টার্ডিকেই সানন্দে ও সোৎসাহে বহন করতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এই স্টার্ডি স্বামীজী তথা বেদান্ত-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। কিন্তু সে পরের কথা। আমরা আগের কথায় ফিরে যাই।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতার প্রতি স্টার্ডির বরাবর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয়ের কিছুকাল আগে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং হিমালয়ের আলমোড়া অঞ্চলে যোগাভ্যাস, শাস্ত্রচর্চা এবং ভারতীয় মতে কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন। ঐকালে মহাপুরুষ মহারাজ বা স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে স্টার্ডির পরিচয় হয়। সময়টি ছিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল। মহাপুরুষ মহারাজ তখন আলমোড়া অঞ্চলে তপস্যা করছিলেন। তাঁর ঐ সময়ে লেখা কিছু চিঠিতে স্টার্ডির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাতে জানা যায় যে, স্টার্ডি তখন থিওসফি মতে বিশ্বাসী। ৮ মে, ১৮৯৩ তারিখে প্রমদাদাস মিত্রকে আলমোড়া থেকে লেখা চিঠিতে মহাপুরুষ মহারাজ লিখছেন: 'এখানে একজন ইংরেজ—লণ্ডন থিওসফিকেল সোসাইটির সভ্য আসিয়াছেন। ইঁহার আচার-ব্যবহার ও যোগমার্গে নিষ্ঠা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। যথার্থ একটি হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায়। ইনি আলাপ করিবার যোগ্য। যে আশ্রমে আমি বাস করি তাহার অতি নিকটে ইনিও বাস করেন। সর্বদাই সৎপ্রসঙ্গ হয়।' পরবর্তী চিঠিটিতে (১৩ মে) মহাপুরুষ মহারাজ স্টার্ডির কৃচ্ছ্রসাধন সম্পর্কে প্রমদাদাসবাবুকে লিখছেন: 'থিওসফিস্ট সাহেবটির নাম ই. টি. স্টার্ডি। আপনি বোধহয় ইঁহাকে চিনিবেন না। অতি শান্ত, আচার-ব্যবহার ঠিক ব্রাহ্মণের ন্যায়। ব্রাহ্মণের হাতের অন্নগ্রহণ করেন। একবার মাত্র বেলা ১টার সময় মুগের ডাল খিচুড়ি খান। দিবারাত্রের মধ্যে আর কিছুই আহার করেন না। আর অল্পাহারী—ছয় ছটাক মাত্র। নিদ্রা চারি ঘণ্টার অধিক নয়। সত্ত্বগুণ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। মনে জ্ঞানলাভের জন্য খুব অনুরাগ—বয়স ৩৩ বৎসর এবং বালব্রহ্মচারী।' পরবর্তী চিঠিতে (২৩ মে) মহাপুরুষ মহারাজ জানিয়েছেন: 'সাহেবটি রাজযোগ অভ্যাস করেন। তাঁহার সাধনের সময় রাত্রিকাল।' স্টার্ডির জীবনযাত্রাপ্রণালী দেখে স্বামী শিবানন্দ যে বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা তাঁর মাস দশেক পরে লেখা (২৩ ফেব্রুআরি, ১৮৯৪) আর একটি

থেকে জানা যায়। ঐ পত্রটিও প্রমদাবাবুকে লেখা 'ইংরেজ জাতির মধ্যে এখন অনেকেই হিন্দুধর্মের প্রশংসা করিতে শিখিয়াছে। বিশেষতঃ থিওসফিকেল সোসাইটি সংস্থাপনের পর অনেক পুস্তকাদি অনূদিত হইয়া বিলাতে প্রচারিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা অনেকেই হিন্দুধর্মের দিকে মনোযোগ দিতেছে—এমন কি নিরামিষাশী হইয়া বিষয়ত্যাগী হইয়া যোগাদি-সাধনের জন্যও কেহ কেহ তৎপর হইয়াছে।' পত্রটির মধ্যে কোথাও স্টার্ডির নামোল্লেখ না থাকলেও স্টার্ডির কথাই যে তাঁর বিশেষভাবে দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে হয়েছে তা

। অপরপক্ষে স্বামী শিবানন্দের পবিত্র জীবন দর্শন করে স্টার্ডিও অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁকে নিজের কাছে লচ্ছিরাম শা'র বাড়ীতে এনে রেখেছিলেন। স্বামীজীকে লেখা তাঁর প্রথম পত্রেও স্বামী শিবানন্দের উন্নত ও পবিত্র জীবনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা স্টার্ডি লিখেছিলেন।

আলমোড়ায় বাসকালে স্টার্ডি সর্বপ্রথম স্বামীজীর নাম শুনেছিলেন এবং তা শুনেছিলেন স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী শিবানন্দের কাছে। এ তথ্য পাই বেণীশঙ্কর শর্মা সংগৃহীত খেতড়ির রাজার কাছে আলমোড়া থেকে লেখা মহাপুরুষ



মহারাজের একটি চিঠিতে। চিঠির তারিখ ২০ জুলাই, ১৮৯৩। ইংরেজীতে লেখা ঐ চিঠিটিতে তিনি লিখছেন: 'গুজব শোনা যাচ্ছে যে, বিবেকানন্দ ইংলণ্ড যাত্রা করেছেন। আপনি কি অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন গুজবটি সত্যি কিনা? গুজবটি সত্য হলে তাঁর সেখানকার [ইংলণ্ডের] ঠিকানা কি আপনি জানেন?* আমার কিছু ইউরোপীয় বন্ধু একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর [এই] অসাধারণ বিচার-শীলতা এবং প্রগতিশীলতার [সমুদ্রযাত্রা করার জন্য] কথা শুনে অতীব আনন্দিত হয়েছেন। সেজন্য এই বন্ধুদের একজন [অর্থাৎ স্টার্ডি] লণ্ডনে তাঁর বন্ধুদের (যাঁরা লণ্ডন থিওসফিকেল সোসাইটির সভ্য) অনুরোধ করতে চান যাতে তাঁরা বিবেকানন্দের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন এবং একজন সম্মানিত বিদেশীকে সম্ভবমত সব রকম সাহায্য করেন…।'[১]

স্বামীজীকে লেখা তাঁর প্রথম পত্রে স্টার্ডি নিজের পরিচয়প্রদান প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, তিনি স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী শিবানন্দের পূর্বপরিচিত। প্রিয় গুরুভাইয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচিতির সংবাদ স্বামীজীকে স্টার্ডির প্রতি প্রথম পত্রালাপেই সবিশেষ অনুরক্ত করেছিল সন্দেহ নেই। শীঘ্রই পত্র-মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং অনতিবিলম্বেই স্টার্ডির পক্ষ থেকে স্বামীজীর কাছে ইংলণ্ডে আসার উষ্ণ আমন্ত্রণ আসে। থিওসফিস্ট স্টার্ডি স্বামীজীকে জানান যে, তাঁকে ইংলণ্ডে এসে অনেকদিন থাকতে হবে যাতে সেখানে একটি স্থায়ী এবং শক্তিশালী বেদান্ত সমিতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়। স্বামীজীকে লেখা স্টার্ডির প্রথম পত্র এবং পরবর্তী আমন্ত্রণপত্রটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। তবে আমন্ত্রণপত্রের প্রত্যুত্তরে স্টার্ডির আমন্ত্রণকে স্বামীজী কিভাবে গ্রহণ করেছেন, তা আমরা আগে উল্লেখ করে এসেছি।

ইংলণ্ডে এসে পৌছনোর আগেই স্বামীজী স্টার্ডির হৃদয়ে সাড়া জাগিয়েছিলেন। স্টার্ডি বেদান্তের দিকে ক্রমশই আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। আর যখন স্বামীজী সত্যিসত্যিই ইংলণ্ডে এসে পৌছলেন, তখন দেখা গেল তিনি শুধু স্টার্ডির হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করেননি, ইংলণ্ডের উপরও গভীর ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্বামীজী থিওসফি থেকে স্টার্ডিকে বেদান্তে নিয়ে এলেন। ইংলণ্ডে স্বামীজীর বেদান্তপ্রচারের সাফল্য আমেরিকার চেয়েও সন্তোষজনক হয়েছে বলে স্বামীজী নিজেই মত প্রকাশ করেছিলেন। স্বামীজী যে বাস্তবিক ইংলণ্ডে এক গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে নানা তথ্য সহযোগে সেবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সুতরাং সে প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। তবে স্টার্ডির পরবর্তী ভূমিকা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ইংলণ্ডে স্বামীজীর বেদান্তপ্রচারের সাফল্য সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। স্বামীজীর প্রথমবার লণ্ডন ত্যাগের পর 'ব্রহ্মবাদিন্'

* লক্ষ্য করার বিষয়, স্বামীজী এর প্রায় মাস দুয়েক আগে (৩১ মে) আমেরিকা যাত্রা করেছেন এবং আর কয়েকদিন পরেই (২৫ জুলাই) শিকাগোর পথে কানাডার ভাঙ্কুভরে এসে পৌছবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বামী শিবানন্দ স্বামীজীর সম্পর্কে কোন খবর তখনও জানেন না।

১. Swami Vivekananda: A Forgotten Chapter of His Life—Benishankar Sharma (1963), pp. 164-65.

পত্রিকার সম্পাদককে একটি চিঠিতে স্টার্ডি লিখছেন: 'স্বামী বিবেকানন্দের ক্লাস ইংরেজ সমাজের নানা স্তরের যথেষ্ট সংখ্যক মানুষকে আকর্ষণ করেছে। তাদের অধিকাংশই আচার্য হিসাবে স্বামীজীর ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে গিয়েছে।...'[২] দ্বিতীয়বার স্বামীজী যখন ইংলণ্ডে আছেন তখন একটি চিঠিতে ইংলণ্ডে স্বামীজীর প্রভাব সম্পর্কে স্টার্ডি লিখছেন (২২ অক্টোবর, ১৮৯৬): 'এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বামী বিবেকানন্দের মতো বেদান্ত-প্রবক্তার প্রভাব যদি বজায় রাখা এবং বিস্তারিত করা যায়, তাহলে তা পাশ্চাত্যজগতের চিন্তাধারাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করবে—সম্পদ এবং বিলাসের প্রতি দারুণ লালসায় আত্মবিস্মৃত তাদের মনের গতি পরিবর্তনে সহায়তা করবে।'[৩] স্বামীজীর ভারত প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে ১৩ ডিসেম্বর ১৮৯৬ লণ্ডনে যে বিরাট বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল (যে সভায় স্টার্ডিই সভাপতিত্ব করেছিলেন) তার বর্ণনা দিয়ে স্টার্ডি ঘটনার তিনদিন পর ১৬ ডিসেম্বর তাঁর এক আমেরিকান বন্ধুকে লেখেন: 'তাঁর [স্বামীজীর] কাজ নিয়ে সরাসরি এগিয়ে চলেছি। তাঁর গুরুভাই [অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দ যিনি ইতিমধ্যে স্বামীজীর কাজের ভার নেবার জন্য স্বামীজীর আহ্বানে ইংলণ্ডে এসেছেন] —অতি চমৎকার, আকর্ষক এবং তপস্যাপ্রবণ বৈরাগ্যবান যুবক—তিনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন।...তোমার ধারণা ঠিকই। আমার জীবনের মহত্তম বন্ধু ও পবিত্রতম শিক্ষককে বিদায় দিয়ে আজ আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। আমি নিশ্চয়ই গত জীবনে অসাধারণ কোন শুভকর্ম করেছি যার জন্য এমন পুণ্য-সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি সারা জীবন ধরে যা চেয়েছি—সে-সমস্তরই পরিপূর্তি দেখেছি স্বামীজীর মধ্যে।'[৪] আর স্বামীজী যখন লণ্ডন থেকে সত্যিই বিদায় নিচ্ছেন (১৮৯৬, ১৬ ডিসেম্বর) তখন স্টার্ডি স্বীকার করেছেন: 'আমি স্বামীজীর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম।'[৫]

এই ঘটনার বছর দেড়েক পর মিস ম্যাকলাউডের চিঠিতে (২৮ অগস্ট, ১৮৯৮) স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে আসার সম্ভাবনার খবর জেনে স্টার্ডি মিস ম্যাকলাউডকে লিখলেন (১৮ অক্টোবর, ১৮৯৮): '...যদি তিনি (স্বামীজী) লণ্ডনকে কর্মকেন্দ্র করেন, তাহলে আমি সানন্দে আমার বাড়ীকে তাঁর বাসস্থান করব। আর যদি তিনি অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে থাকতে চান, তাহলেও সর্বদাই আমি তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকব এবং তাঁর জন্য সবকিছু করতে পারলে কী যে আনন্দ পাব তা বলে বোঝাতে পারছি না।'[৬] কিন্তু এর প্রায় বছরখানেক পরে যখন ৩১ জুলাই, ১৮৯৯ স্বামীজী লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য স্টার্ডিকে লণ্ডনের টিলবেরি ডকে দেখা গেল না। তিনি তখন তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে ওয়েলসে বেড়াতে গিয়েছেন স্বামীজী লণ্ডনে আসছেন জেনেও। স্বামীজী স্টার্ডির অনুপস্থিতিকে কতখানি গুরুত্বসহকারে দেখেছিলেন জানি না, তবে নিবেদিতা ব্যাপারটিকে হালকাভাবে নিতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল: স্টার্ডি বিশ্বাসঘাতক। [ক্রমশঃ]

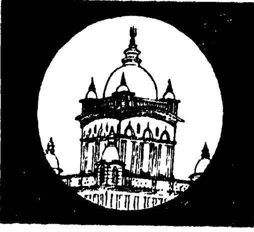
---

২ Brahmavadin, 29 February 1896. ৩ Indian Mirror, 14 November 1896.

৪ The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples, (1965), p. 443.

৫ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা পত্র: ৩ অগস্ট, ১৯০২ (Marie Louise Burke, পৃ: ৫২)

৬ Swami Vivekannada : His Second Visit to the West—New Discoveries —Marie Louise Burke, pp. 56-57.



নানাপ্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

ব্রহ্মই সর্বশক্তির উৎস

পুরাকালে দেবাসুর-সংগ্রামে একবার ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা পরমেশ্বরের কৃপায় অসুরদের পরাজিত করতে পারায় ভারী গর্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা বিজয়োল্লাসে মেতে উঠলেন। আত্মপ্রসাদে তাঁরা ভাবতে লাগলেন: আমরাই নিজেদের তেজে ও বাহুবলে পরাক্রমশালী অসুরদের পরাস্ত করেছি। তারা আমাদেরই ভয়ে পলাতক এখন। আমরাই এখন স্বর্গ ও মর্ত্যের নিরঙ্কুশ অধীশ্বর।

হায়, অহঙ্কৃত দেবতারা তখনও জানতেন না যে, পরমেশ্বরের কৃপাতেই তাঁদের এই জয়—তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে এই বিজয়-গৌরব অর্জন করেছেন তাঁরা।

দেবতাদের প্রতি কৃপাবশতঃ তাঁদের এই অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তিকে দূর করার জন্য ব্রহ্ম স্বয়ং এক অদ্ভুত জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করে তাঁদের সামনে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা সেই আশ্চর্য রূপ আগে কখনও দেখেননি। তাঁরা কেউ বুঝতে পারলেন না—ইনি কে। দেবতারা তাঁদের প্রতিনিধিরূপে অগ্নিদেবকে পাঠালেন ঐ আগন্তুক পুরুষকে জানার জন্য। তাঁরা বললেন: 'হে অগ্নিদেব, আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে তেজস্বী। আপনি দয়া করে জেনে আসুন কে ঐ যক্ষ বা বন্দনীয় পুরুষ।' অগ্নিদেব 'তথাস্তু' বলে অতি উৎসাহ ও গর্বিত মনে যক্ষের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অগ্নিদেব একটু অগ্রসর হওয়া মাত্রই শুভ্র জ্যোতির্ময় ঐ যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কে তুমি?' অগ্নিদেব সগর্বে উত্তর দিলেন: 'আমি জাতবেদা অগ্নি।' যক্ষ বললেন: 'নাম শুনে মনে হচ্ছে তোমার অনেক গুণ আছে। তা তোমার কি শক্তি আছে?' অগ্নিদেব আত্মপ্রশংসা করে অহঙ্কারের সঙ্গে বললেন: 'আমি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ইচ্ছা মাত্রই পুড়িয়ে ভস্মীভূত করতে পারি।' যক্ষরূপী ব্রহ্ম তাঁর অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্য অতি তাচ্ছিল্য সহকারে একখণ্ড তৃণ তাঁর সামনে ফেলে দিয়ে বললেন: 'এই তৃণখণ্ডটা পুড়িয়ে ফেল তো। আর যদি না পার, নিজের শক্তির উপর যে অহঙ্কার তা ত্যাগ করে চলে যাও।' অগ্নিদেব ভাবলেন—এই সামান্য তৃণখণ্ডটা আমি ভস্মীভূত করতে পারব না! আমাকে কি ভেবেছে? এ জানে না আমার শক্তির পরিচয়! আমি সর্বভুক্! যাই হোক, অগ্নিদেব স্ব-শক্তিতে গর্বিত হয়ে, দম্ভের সঙ্গে তৃণখণ্ডটা দগ্ধ করতে গেলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। পুনরায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে অগ্নিদেব তৃণখণ্ডটা দগ্ধ করতে গেলেন, কিন্তু এবারও বিফল হলেন। লজ্জায় নতমস্তকে দেবতাদের কাছে ফিরে গেলেন এবং তাঁদের তিনি বললেন: 'না, আমি জানতে পারলাম না কে এই যক্ষ।' দেবতারা তখন বায়ুকে বললেন: 'হে বায়ুদেব, এবার তাহলে আপনি গিয়ে জেনে

আসুন কে ঐ যক্ষ।' বায়ুদেব 'তথাস্তু' বলে যক্ষের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। যক্ষ তাঁকেও জিজ্ঞাসা করলেন: 'কে তুমি?' বায়ুদেব দম্ভের সঙ্গে বললেন: 'আমি বায়ু, আমি মাতরিশ্বা।' যক্ষ জিজ্ঞাসা করলেন: 'তোমার শক্তি-সামর্থ্য কি?' বায়ুদেব নিজের শক্তির বড়াই করে বললেন: 'আমি পৃথিবীর সব বস্তু গ্রহণ করতে পারি—উড়িয়ে দিতে পারি।' যক্ষ বললেন: 'আচ্ছা, তবে এই তৃণখণ্ডটা উড়িয়ে ফেল তো বাপু।' বায়ুদেব সবেগে তৃণখণ্ডটির দিকে ধাবিত হলেন, কিন্তু তাকে স্পর্শও করতে পারলেন না। যক্ষ তখন তাঁকে বললেন: 'যাও, ফিরে যাও, নিজের শক্তির অহঙ্কার পরিত্যাগ করে ফিরে যাও।' অগত্যা বায়ুদেবও অগ্নিদেবের মতো লজ্জায় অবনতমস্তকে দেবতাদের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন: 'কে এই যক্ষ—জানতে পারলাম না।' দেবতারা ভয় পেয়ে গেলেন। কে এই যক্ষ যাঁকে অগ্নিদেবের মতো তেজস্বী, বায়ুদেবের মতো মহাপরাক্রমশালীরা পর্যন্ত জানতে পারলেন না? দেবতারা সবাই মিলে তখন দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন: 'হে দেবরাজ, আপনিই অনুগ্রহ করে জেনে আসুন কে এই যক্ষ। আপনি ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই যে তাকে জানতে পারেন।' ইন্দ্রদেব 'তথাস্তু' বলে যক্ষের কাছে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। তাঁর সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই পূজনীয় ঐ যক্ষ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ইন্দ্রদেব তাঁকে তন্ন তন্ন করে সন্ধান করতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও পেলেন না। তখন তিনি গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে ভাবতে লাগলেন: 'কে ইনি, যাঁকে কোন দেবতা জানতে পারছেন না? এই অদ্ভুত শক্তিধর পুরুষ কে?' ইন্দ্রদেব প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁকে যে-কোন উপায়ে জানতেই হবে। ইন্দ্রদেব যক্ষকে কোথাও না পেয়ে, ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ধ্যানরত হলেন—নিজেদের হঠকারিতার জন্য অনুতাপও বোধ করলেন।

অন্য দেবতাদের মতো যক্ষরূপী ঐ পুরুষকে জানতে না পেরে অভিমানাহত হয়ে তিনি চলে গেলেন না। ইন্দ্র তাঁকে জানার জন্যই আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলেন। অকস্মাৎ আকাশমণ্ডল আলোকিত করে পরম শোভনা এক জননীমূর্তি—উমা হৈমবতী আবির্ভূত হলেন। অপরূপা সুন্দরী মাতৃমূর্তিকে দর্শন করেই ইন্দ্রদেব ভাবলেন যে, ইনিই হয়তো যক্ষের সঠিক পরিচয় দিতে পারবেন। তাই তিনি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: 'হে দেবী, কিছুক্ষণ আগে যিনি এখানে আগমন করেছিলেন, তিনি কে?' উমা বললেন: 'উনি ব্রহ্ম। ওঁর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তোমরা অসুরদের পরাজিত করেছ। তিনিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তির উৎস। তাঁকে তোমরা অস্বীকার করেছিলে—অহঙ্কারে মত্ত হয়ে উঠেছিলে। তাই তিনি তোমাদের মোহ ভেঙে, অহঙ্কারকে দূর করার জন্য কৃপা করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।' অতঃপর জননী উমা অপার করুণায় ইন্দ্রদেবকে উপদেশ দিলেন—সর্বনিয়ন্তা, সর্বশক্তির উৎস ব্রহ্মেরই প্রেরণায় তোমরা সবকিছু করেছ এবং করবেও। ইন্দ্রদেবও ফিরে গিয়ে দেবতাদের কাছে বললেন: 'তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বান্তর্যামী ব্রহ্ম। তাঁর শক্তিতেই আমরা সকলে বলীয়ান। সর্বজীবের শক্তির উৎস তিনিই। তাঁর শক্তি ছাড়া কারো কিছু করার উপায় নেই।'

[কাহিনীটি কেনোপনিষদের]।

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

শ্রদ্ধা-প্রেম-ধ্যান : একখানি ত্রিবর্ণ চিত্র

একদিন গঙ্গাস্নানান্তে শরৎ মহারাজ ও আমরা অদ্বৈত আশ্রমে মহারাজকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দকে) প্রণাম করিয়া বসিয়াছি। তখন মহারাজ বলিতেছেন, 'দেখ শরৎ, আমার ইচ্ছা হইতেছে হরি মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আসি। এমন মহাপুরুষ দুর্লভ। ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া তিনি কিরূপ স্বস্থ হইয়া রহিয়াছেন! এরূপ দেখা যায় না।'

কিছুক্ষণ পরে শরৎ মহারাজ উঠিলেন, আমরাও সঙ্গে। সিঁড়িতে নামিবার কালে বলিতেছেন, 'এ সুযোগ ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না। হরি মহারাজকে প্রণাম করিয়া আসি। আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। আরও দুই-একজন সঙ্গে ছিলেন। গরমের দিন, হরি মহারাজের ঘরে পর্দা খাটানো। কেবল মাত্র তাঁহার আহার শেষ হইয়াছে তখন। হাতমুখ ধুইয়া চৌকীর উপর বসিয়াছেন মাত্র—নিকটেই মেজেতে কুলকুচি করা জল পড়িয়াছিল, তাহা তখনও পরিষ্কার হয় নাই। শরৎ মহারাজ পশ্চাতে, আমি অগ্রে। পরদা একটু উঠাইতেই হরি মহারাজ বলিলেন —'কে ?' শরৎ মহারাজ আমাকে একটু টিপিয়া দিলেন—সনৎ সম্মুখে—আমি শরৎ মহারাজের ইঙ্গিতে চাপিয়া গেলাম। তিনি নির্বাক্ হইয়া অতি সন্তর্পণে ঘরে প্রবেশ করিয়াই, ঐ এঁটো জলময় স্থানে, একেবারে সাষ্টাঙ্গ হইয়া, হরি মহারাজের পা ধরিয়া প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, 'কে প্রণাম করিতেছে ?' শরৎ মহারাজ তখন বলিলেন, 'আমি শরৎ। তুমি এখানে রহিয়াছ, মহারাজ বলিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইতেছে তোমাকে প্রণাম করিয়া যাইতে। আমিও ভাই, সে লোভ ছাড়িতে পারিলাম না।' হরি মহারাজ অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া বেদনার স্বরে বলিলেন, 'শরৎ-দা, আমি অন্ধ হইয়া আছি (তখন তাঁহার চক্ষে ছানি পড়িতেছিল), তাই তুমি আমাকে এইভাবে অপ্রস্তুত করিলে! আমি কি জানি না, তুমি কে ? নীলকণ্ঠেশ্বর পাহাড়ের কথা কি আমি ভুলিয়া গিয়াছি ?'

নীলকণ্ঠেশ্বর পাহাড়ের বিবরণ অন্য সময়ে হরি মহারাজ নিম্নলিখিতভাবে আমাদের বলিয়াছিলেন। নীলকণ্ঠেশ্বর[১] শিবদর্শনে গিয়া একদিন ফিরিবার সময়ে উভয়ে (হরি মহারাজ ও শরৎ মহারাজ) পথ হারাইয়া যাওয়ায়, গন্তব্যস্থলে পৌছাইবার জন্য দুই স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হরি মহারাজ এক প্রৌঢ়া সন্ন্যাসিনীর কুটীর দেখিতে পাইয়া, উঁহার সহিত কতকক্ষণ শরৎ মহারাজকে খুঁজিয়া বিফলমনোরথ হইয়া কুটীরেই ফিরিয়া আসেন। সন্ন্যাসিনী বলিলেন, 'এখানে বাঘ-ভাল্লুকের অবাধ বিচরণ,—পথহারা পথিকের মৃত্যু অনিবার্য।' যাহা হউক তিনি একটা মশাল তৈয়ারী করিয়া একটি উচ্চভূমির উপর উঠিয়া, উপরে-নিচে আন্দোলিত করিতে লাগিলেন এবং শাঁক বাজাইয়া সঙ্কেত জানাইতে থাকেন। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া আলো দেখানো ও শঙ্খধ্বনি করা সত্ত্বেও, কাহাকেও আসিতে না দেখিয়া বা শব্দ করিতে না শুনিয়া নিরাশ হইয়া তিনি কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। অতি প্রত্যূষে হরি মহারাজ পুনরায় কুটীর হইতে বাহির হইয়া শরৎ মহারাজকে খুঁজিতে লাগিলেন। কতকটা দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, শরৎ মহারাজ একটি উচ্চস্থানে বসিয়া আছেন। হরি মহারাজ মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'মৃত ব্যক্তির শরীরে যদি হঠাৎ

১ গঙ্গা পার হইয়া হৃষীকেশ পশ্চাতে ফেলিয়া স্বর্গাশ্রম হইতে সাত মাইল চড়াই পথে উঠিলে নীলকণ্ঠেশ্বর শিব-মন্দির।

জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহার আত্মীয়েরা যেমন উৎফুল্ল হয়, শরৎ-দাকে দেখিয়া আমার অবস্থা তখন সেই রকম হইয়াছিল। উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। সাড়া না পাইয়া দ্রুতগতিতে তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি রোমাঞ্চিত-কলেবর এবং বাহ্য-স্পন্দনহীন হইয়া গভীর ধ্যানমগ্ন! বার বার ডাকাডাকিতেও সাড়া না পাইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া শরৎ-দা শরৎ-দা বলিতে লাগিলাম। অত্যন্ত শীত, —একখানা মাত্র পাতলা চাদর গায়ে। কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার শরীর বেশ গরম। যাহা হউক, ডাকাডাকিতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের ঈষৎ প্রকাশ হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় বাহ্যসংজ্ঞা-শূন্য হইলেন। এইরূপ দুই-তিনবার হইবার পর পরিষ্কারভাবে বাহ্যস্ফূর্তি হইল। তখন তিনি বলিলেন, 'অন্ধকারে গতি অসম্ভব এবং মানুষের সাহায্য পাইবার সম্ভাবনাও নাই দেখিয়া এই স্থানে বসিয়া পড়িলাম এবং ধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।'

ওঁদের সঙ্গী সান্ন্যাল মহাশয়ের মুখেও শুনিয়াছিলাম: 'একদিন শরৎচন্দ্র উল্লাসভরে আমাকে বলেন—প্রভুর কৃপায় এই পুণ্যক্ষেত্রে আজ আমি মন হইতে পৃথক হইয়াছি। উহার কার্যকলাপ আর আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। এখন আমি মনের দ্রষ্টা।'

[স্বামী গৌরীশানন্দ-কথিত প্রসঙ্গ—প্রয়াত অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্তের সংগ্রহ হইতে]

জ্ঞান-বিজ্ঞান

বিরাট জীবক্ষয়—মহাকাশ হতে আক্রমণ

সাড়ে ছয় কোটি বৎসর পূর্বে এমন একটি বিপর্যয়কারী ঘটনা ঘটেছিল, যা শতকরা পঁচাত্তর ভাগ প্রাণীকে ৫০,০০০ বৎসরে ধ্বংস করেছিল। এর ফলে প্রাগৈতিহাসিক জীব ডাইনোসরস (Dinosaurs)-এর বংশ নির্মূল হয়েছিল, স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং মানব জাতির বংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমন বিরাটভাবে জীবন-নাশের প্রায় ১০০টি কারণ দেখান হয়ে থাকে। তার মধ্যে বর্তমান মতবাদ হচ্ছে যে, ঐ সময় মহাকাশ হতে একটি বিরাট উল্কা (meteorite) বা ধূমকেতু (Comet) পৃথিবীর উপর পড়ার ফলে এরূপ ঘটনা ঘটেছিল। গত ১৬ এপ্রিল ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সায়েন্স' (Science) পত্রিকাতে পাঁচটি দেশের ২০ জন বৈজ্ঞানিক এই ঘটনার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইবিরিয়াতে একটি উল্কার টুকরা পড়েছিল এবং তার ফলে বিস্তৃত জঙ্গল ধ্বংস হয়েছিল এবং আকাশকে কালো করে ধূলি জমেছিল। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন যে, অতীতের ঘটনাও এইরূপ, তবে আরও বিশাল আকারে। মহাকাশের মধ্য দিয়ে উল্কার আসার ফলে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়েছিল; পৃথিবীর উপর এর সংঘাতের ফলে ধূলির মেঘ আকাশে উঠে সূর্যকে ঢেকে দিয়েছিল, যার ফলে গাছপালার সূর্যকিরণ সাহায্যে খাদ্য তৈরীর (Photosynthesis বা সালোক-সংশ্লেষের) কাজ বন্ধ হয়ে যায়। হয়তো নানারূপ বিষাক্ত ধাতুকণাও আকাশ হতে পড়েছিল। এই সবের ফলশ্রুতি হিসাবে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছিল।

চাঁদে যে গহ্বর দেখা যায় সেগুলি ঐরূপ উল্কা বা ধূমকেতুর পতনের ফলে হয়েছে। পৃথিবীর উপর এই গহ্বরগুলি থাকে না, কারণ পৃথিবীর বহির্ভাগের উপর ক্রমশঃ স্তর জমে যাচ্ছে। সে যাই হোক, সাড়ে ছয় কোটি বৎসরের পুরানো ৬০ কিলোমিটারব্যাপী এক গহ্বর সাইবিরিয়াতে আবিষ্কৃত হয়েছে। ধরে নেওয়া হয় যে, প্রতি ১০ কোটি বৎসরে ১০ কিলোমিটার ব্যাসের একটি উল্কা পৃথিবীতে পড়ে। গত ৫০ কোটি বৎসরে যে

পাঁচবার বিশালভাবে জীবলুপ্তি হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে উপরি-উক্ত ধারণাটি বেশ খাপ খায়।

এই সব কথাগুলি অবস্থাঘটিত (Circumstantial) বলে ধরে নেওয়া হত যদি না ইতালি দেশের গুব্বিও (Gubbio)-তে ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিশেষ ধরনের প্রস্তরখণ্ড (Rock) না পাওয়া যেত। এইটি সমুদ্রের তলদেশে গড়ে উঠেছিল এবং এর গঠনকালে এতে উপর হতে বিভিন্ন ধাতু ও মৃত প্ল্যাঙ্কটন (Plankton—নদী বা সমুদ্রে বাসকারী অতি ক্ষুদ্র প্রাণী) পড়েছিল। এই প্রস্তরখণ্ডে আইরিডিয়াম (Iridium) নামক মৌলিক পদার্থ (element) বেশী মাত্রায় পাওয়া গেছে। এর পরের যুগের প্রস্তরগুলিতে আবার আইরিডিয়ামের মাত্রা খুবই কম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পৃথিবীতে আইরিডিয়াম কদাচিৎ পাওয়া যায়, কিন্তু মহাকাশ হতে আগত উল্কার মতো দ্রব্যে এর পরিমাণ প্রচুর। আইরিডিয়ামের তারতম্যের উপর ভিত্তি করেই অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, সাড়ে ছয় কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে বৃহদাকার ধূমকেতু বা উল্কা পড়েছিল। বহু দেশে এবং আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে পাওয়া প্রস্তরে আইরিডিয়ামের তারতম্য পাওয়া গেছে। 'সায়েন্স'-এর এই এপ্রিল সংখ্যাতেও বৈজ্ঞানিকগণ আইরিডিয়ামের উপর ভিত্তি করে সাড়ে ছয় কোটি বৎসর আগে উল্কাপাতের পরের সমস্ত ঘটনাবলী আলোচনা করেছেন।

অনুমান করা যায় যে, উদ্ভিদজাতীয় প্ল্যাঙ্কটনের সালোক-সংশ্লেষ কমে যাওয়ায়, জান্তব প্ল্যাঙ্কটন, যারা উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন খেয়ে থাকে, তাদের সংখ্যাও খুব কমে যায়। এর ফলে সমুদ্রের অম্লতা (acidity) বাড়ে, কার্বন মোনোক্সাইড (Carbon monoxide) যা প্লাঙ্কটনরা তাদের শরীরে নিয়ে নিত, তা বেড়ে গিয়ে সমুদ্রের জলের উপরভাগে জমা হয়, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় কার্বন ডায়োক্সাইড (Carbon dioxide) বেড়ে যায় এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। উচ্চ তাপমাত্রাই ডায়নোসরসদের মৃত্যুর কারণ হয় বৃহদাকার জন্তুরা উচ্চ তাপমাত্রার বিশেষ শিকার হয়। তাদের নড়াচড়ায় ক্ষুদ্র প্রাণীর চেয়ে তাদের শরীরে বেশী তাপ উৎপন্ন করে, কিন্তু তাদের আয়তনের (volume) তুলনায় বহির্গাত্র (surface) কম থাকায় বাইরে সে পরিমাণে তাপ ছাড়তে পারে না। পঁচিশ কিলোগ্রামের বেশী ওজনের সব জন্তুই সাড়ে ছয় কোটি বৎসর পূর্বেকার এই বিরাট দুর্ঘটনায় বেঁচে রইল না।

এইভাবে অর্থ করায় হয় তো কিছুটা কল্পনা আছে, কিন্তু তা একেবারে যে ভিত্তিহীন, তা বলা যায় না। [The Economist, 24-30 April 1982 থেকে সংগৃহীত]।

দেশ-বিদেশ

অরুণাচলের অধিবাসী : মোন্‌পা

পূর্ব সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৮৯) 'কিরাতদের দেশ' শিরনামে অরুণাচল প্রদেশ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। এই সংখ্যায় আমরা ঐ রাজ্যের মোন্‌পা উপজাতির কথা কিছু বলছি।

অরুণাচল প্রদেশের কামেঙ জেলা—আসামের দরং জেলার উত্তরে প্রসারিত পার্বত্য অঞ্চল,—সবুজ বৃক্ষাদিতে ঢাকা। এখানে প্রকৃতি দেবী যেমন নানা সাজে সজ্জিত, তেমনি এখানকার অধিবাসীরাও নানান প্রকৃতির। বিভিন্ন ধরনের রীতিনীতি তাদের। এই জেলার অধিবাসীদের মধ্যে একটি উপজাতির নাম মোন্‌পা।

কামেঙ জেলার পশ্চিমাংশ অবস্থিত ভুটান ও তিব্বতের মাঝখানে। এই জেলার প্রধান শহর বোমডিলা। শহরের উত্তরে তাওয়াং-এ মোন্‌পা উপজাতিরা বাস করে। এই তাওয়াং

অঞ্চলটি চা-চুম, থাকৃপা ও পাংচেন তিন ভাগে বিভক্ত। এই অঞ্চলে বিভিন্ন উচ্চতার পর্বতশ্রেণী আছে। এখানকার পাহাড়গুলির উচ্চতা ৯১৪ থেকে ৩৬৫৮ মিটার পর্যন্ত। এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তাই এখানকার লোকেরা কাঠ ও পাথরের দোতলা মজবুত ঘর-বাড়ি তৈরি করে বসবাস করে।

মোন্‌পা উপজাতিদের সঙ্গে চেহারায় এবং রীতিনীতিতে অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায় ভুটানী ও তিব্বতীদের। এই মোন্‌পা উপজাতিদের স্বভাব ও ব্যবহার দেখলে মনে হয় তারা যেন ভগবান্ বুদ্ধকে আন্তরিকতার'সঙ্গে গ্রহণ করেছে। তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে বুদ্ধের বাণী যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাদের স্বভাব অতি নম্র, ভদ্র ও অতিথিপরায়ণ। গ্রামে অতিথি গেলে তারা ড্রাম বাজিয়ে অভ্যর্থনা করে এবং সুন্দর কারুকার্য করা রঙিন কার্পেটের উপর বসিয়ে লবণ ও মাখনের চা খাওয়াবে নকশা-করা কাপে করে।

প্রচণ্ড শীতের জন্য মোন্‌পারা পোশাক-পরিচ্ছদ পরে খুব গরম এবং টেকসই। পুরুষরা পরে 'চুবা'। চুবা পাছা পর্যন্ত লম্বা একটি ঢিলে-ঢালা কোট— তৈরি মোটা উল ও গাছের লতা দিয়ে। তাদের অন্তর্বাস ঐ একই জিনিস দিয়ে তৈরি। মাথায় পরে সুন্দর কারুকার্য করা টুপি। পায়ে নিজেদের তৈরি বুট জুতা পরে। কোমরে ঝোলায় কাঠের খাপওয়ালা তরোয়াল। তরোয়াল না হলে তাদের সাজসজ্জা যেন পরিপূর্ণ হয় না।

মোন্‌পা মেয়েরা নীল বা সাদা রঙের তুলার একখণ্ড কাপড় গায়ে জড়িয়ে রাখে। এটি তাদের হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পড়ে। তার উপর দিয়ে তারা কোমর পর্যন্ত লম্বা উলেন সোয়েটার পরে। চুল বাঙালী মেয়েদের মতোই বিনুনী করে ঘাড়ের দিকে ঝুলিয়ে রাখে। মাথায় পরে গোল টুপি।

মোন্‌পা মেয়েরা তাঁতশিল্পে সুনিপুণ। তারা নিজেদের জামা-কাপড় নিজেরাই তৈরি করে নেয়। সুন্দর কারুকার্য করা রঙিন কার্পেটও তারা বোনে। ছেলেরা নানা রকমের নানা রঙের মুখোশ তৈরি করে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই মুখোশ পরে তারা নৃত্য করে। সঙ্গীত তাদের খুব প্রিয়।

মোন্‌পারা খুব পরিশ্রমী। তারা খুব ভাল কৃষক। তারা চাষ করে যব, ভুট্টা, গম, চাল, জোয়ার, মটর, বীন, লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি।

মোন্‌পাদের সামাজিক ব্যবস্থা বড় সুন্দর। গ্রামের সবাই হেড-ম্যানের (মোড়লের) তত্ত্বাবধানে থাকলেও তাদের জীবনযাত্রা পরিচালিত হয় তাওয়াং-এ যে বৌদ্ধ লামা-মঠটি আছে তার পুরোহিতদের নির্দেশে। তাদের জাতির সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনযাত্রার প্রণালী ঐ লামা-মঠটিকে কেন্দ্র করে

গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় 'মানে' ও 'চোর্‌তেন' নামে দু-রকমের স্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। মোন্‌পাদের বাড়িতে যে-সব মন্দির থাকে তাকে 'গোম্‌পা'[১] বলে। এই মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের মূর্তি ও ধর্মগ্রন্থ আছে। গোম্‌পার সঙ্গে সব সময় লামা-মঠের দু-একজন পুরোহিত যুক্ত থাকেন। 'মানে'র দেওয়ালে খোদাই করা থাকে 'ওঁ মণি পেমে হুম'[২]—পদ্মের মধ্যে রত্ন (Jewel in the Lotus)। 'মানে' স্তূপটি তৈরি করে অপদেবতাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। ধনী ব্যক্তির মৃত্যুর পর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপও এই স্তূপটি তৈরি করা হয়। এই মন্দিরে বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানে পথচারিদের একটি নিয়ম আছে যে, তারা সব সময় 'মানে'কে ডান দিকে রেখে পথ চলে। 'চোর্‌তেন' স্তূপে মাঝে মাঝে

১ গুম্ফা বা গুফা শব্দের আঞ্চলিক রূপ।
২ "ওঁ মণি পদ্মে হুঁ" এই সংস্কৃত মন্ত্রেরই উচ্চারণ-বিকৃতি।

লামা সন্ন্যাসীরা প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার পর ভক্তরা এই স্তূপটি তিনবার প্রদক্ষিণ করে।

তাওয়াং-এ লামা-মঠটি ভারতবর্ষের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের যে-সব মঠ আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এই মঠটি ৩,০৪৮ মিটার উঁচুতে। এখানে ৫০০ লামা একসঙ্গে থাকতে পারেন। এই মঠের গ্রন্থাগারে বা পুঁথিশালায় ৭০০ প্রাচীন পুঁথি আছে। মোন্‌পা লামারা উচ্চশিক্ষিত না হলেও তাঁদের নিজেদের সাহিত্যের প্রতি প্রচুর অনুরাগী। এই মঠটি বৌদ্ধধর্মের মহাযান সম্প্রদায়ের। তাই এখানকার মোন্‌পা উপজাতিরা মহাযান সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত

মোন্‌পা উপজাতির ছেলে-মেয়েদের ১০ থেকে ২৫ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়। ছেলে-মেয়ের বিবাহ সাধারণতঃ পিতামাতার মতানুসারে হয়ে থাকে এবং তারাই পাত্র-পাত্রী ঠিক করে। বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন বাধা নেই, তবে যে-পক্ষ বিচ্ছেদ চাইবে তাকে অপর পক্ষকে খোরপোশ দিতে হবে। সমাজে বিধবা-বিবাহের প্রচলন আছে। একই পুরুষ বা নারীর একাধিক স্ত্রী বা স্বামী থাকতে কোন আপত্তি নেই।

মোন্‌পাদের মধ্যে একটি মজার জিনিস হচ্ছে—শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে শিশু ও শিশুর মাকে গরম জলে স্নান করানো হয়। তারপর শিশুকে উন্মুক্ত আকাশের তলায় নিয়ে গিয়ে আকাশ ও ভূমি দর্শন করানো হয় এবং ভগবানের আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয় শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন মঙ্গলময় হওয়ার জন্য। তাদের আর একটা নিয়ম আছে যে, জন্মানোর তিনদিন পরে শিশুকে ঘর থেকে বাইরে আনা হয় এবং একজন লামা পুরোহিতকে ডেকে পূজাদি করিয়ে নেওয়া হয় শিশুকে শুদ্ধ করার জন্য। লামা পুরোহিত তখন শিশুর নামকরণ করে এবং তার ভবিষ্যৎ গণনা করে সব বলে থাকে।

মোন্‌পাদের মৃতদেহকে চারভাবে সৎকার করা হয়—(ক) ধনী লোক মারা গেলে তার মৃতদেহকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি পাহাড়ে। যে জায়গাটিতে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে বলে 'খোরপোচাং'। মৃতদেহকে সেখানে নিয়ে গিয়ে একটা পাথরের উপর রাখা হয়। মৃতদেহের একটু দূরে আগুন জ্বালানো হয়। উদ্দেশ্য আগুন দেখে দূর থেকে উড়ে এসে শকুন মৃতদেহটি ঠুকরে-ঠুকরে খাবে। মাথাটা কেটে আলাদা করে রাখা হয়, এবং শকুনের মৃতদেহটা যখন সবটুকু খাওয়া হয়ে যায় তখন মাথাটা তাকে দেওয়া হয়। যদি কোন কারণে শকুন মৃতদেহ খেতে না আসে তাহলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। (খ) প্রচণ্ড শীতের জন্য যদি মৃতদেহকে নিয়ে 'খোরপোচাং'-এ যেতে না পারে, এবং যদি ধনী লোকের মৃতদেহ হয় তখন তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। (গ) যদি সাধারণ-লোকের মৃতদেহ হয় তবে তাকে ১০৮ টুকরা করে কেটে, তারপর জলে ফেলে দেওয়া হয়, সম্ভবতঃ মাছের খাওয়ার জন্য। (ঘ) যদি খারাপ রোগে ভুগে কেউ মারা যায়, তবে তার মৃতদেহকে মাটিতে কবর দেওয়া হয়।

তারা মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়াদি করে মৃত্যুর সাত সপ্তাহ পরে। যে বারে মারা গিয়েছিল ঠিক সেই বারটিতে তারা ক্রিয়াদি করে দেহ-নির্মুক্ত আত্মার শান্তির জন্য। ধনী ব্যক্তি মারা গেলে এক সপ্তাহ পর থেকে ক্রিয়াদি আরম্ভ হয় এবং লামা-মঠের সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজন করানোর ব্যবস্থা হয়। তারপর মৃত ব্যক্তির নামে আকাশে পতাকা উড়ানো হয়।

মৃত-পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয় পুত্র। মা ও বোনের ভার ছেলেকে নিতে হয়। বোনের বিবাহ জাঁকজমক করে ভাইরা দিয়ে থাকে।

সমালোচনা

ধর্ম সমন্বয় ও সম্প্রীতি : প্রকাশক : স্বামী অমৃতত্বানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, বাংলাদেশ। (১৯৮২), পৃ: ৫৪। মূল্য : পাঁচ টাকা।

বর্তমান জগতে মানুষে মানুষে যে সংঘর্ষ—স্বার্থের দ্বন্দ্ব, দ্বেষাদ্বেষি ও ধর্মে ধর্মে বিরোধ—তার থেকে মুক্তিপথের সন্ধান শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের দিয়ে গেছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে একই ভগবানের প্রকাশ—এখানেই নিহিত আছে সব মানুষের একত্ব। ভগবানের প্রকাশরূপ এই একত্বকেই ভিত্তি করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যেকটি ধর্মের সাধন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, যে-কোন ধর্মপথ ধরেই এগিয়ে যাওয়া যাক না কেন, সব পথের শেষ সেই এক ঈশ্বরে। ধর্মমত নিয়ে তাই বিবাদ করার কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমান এই জগৎব্যাপী সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বকে প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের সকলেরই বিশেষ প্রয়োজন শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ী ভাবকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধারণা করার চেষ্টা করা এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে—তথা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও এই সর্বধর্মসমন্বয়ের বাস্তব রূপ দেওয়া।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা প্রভৃতি মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করার সুযোগ ও সময় যাঁরা ঠিকমত করে উঠতে পারেন না, তাঁরা এই পুস্তিকা পাঠে অনেকখানি উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই।

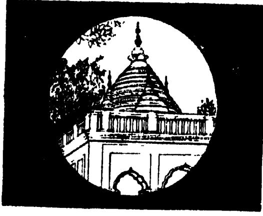
ছোট এই পুস্তকটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়-সম্পর্কিত এবং 'যত মত তত পথ'-রূপ অমিয় বাণী এবং তার ব্যাখ্যানস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দের ভাষণ যেভাবে পরিবেশন করা হয়েছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। সংকলিত অংশগুলির আকর-নির্দেশ থাকায় ভক্ত পাঠক-পাঠিকাবর্গের কাছে পুস্তকের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে। তবে বাণী ও রচনা থেকে উদ্ধৃত স্বামীজীর উক্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। উদ্ধৃত অংশ থেকে যে কথাগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে সেখানে বর্জন-জ্ঞাপক কোন সংকেত দেওয়া নেই। দু-একটি শব্দের বানানে অসঙ্গতি লক্ষিত হয়েছে। একই শব্দের দুটি ভিন্ন বানান হলেও সঙ্গতি রেখে লেখা বাঞ্ছনীয়। আশা করি, পরের সংস্করণে পুস্তিকাটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে সাবধানতা অবলম্বন করা হবে। বইটির ছাপা ও বাঁধাই ভাল। আয়তনের তুলনায় পুস্তিকাটির মূল্য একটু বেশী বলেই বোধ হয় জনকল্যাণে পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কাম্য; কিন্তু মূল্যাধিক্যের জন্য প্রচার কিছুটা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কাও আছে। —**শ্রীপ্রভাতকুমার বিশ্বাস**

সারদা-বিদ্যাপীঠ পত্রিকা (সংযুক্ত সংখ্যা—১৯৮১-৮২)—রামকৃষ্ণ মিশন সারদা-বিদ্যাপীঠ, জয়রামবাটী, বাঁকুড়া।

উত্তিষ্ঠ (১৯৮২)—রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, রহড়া, ২৪ পরগনা।

আমেরিকার স্যাক্রামেন্টো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর 'আশীর্বাদ' নিয়ে জয়রামবাটী থেকে 'সারদা-বিদ্যাপীঠ পত্রিকা' বিভিন্ন প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আর রহড়া বালকাশ্রমের মুখপত্র 'উত্তিষ্ঠ' সুনির্বাচিত বহু কবিতা, প্রবন্ধ ও ভ্রমণ-কাহিনীর সম্ভার সহ আমাদের কাছে এসেছে

রামকৃষ্ণ মিশনের উপরি-উক্ত স্কুলদুটির বার্ষিক পত্রিকা পড়ে মনে হল : স্কুলদুটি যেন দুটি সুন্দর সাজানো ফুলের বাগান। কয়েক হাজার ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে যেন কয়েক হাজার সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল। তারা যেন বাগানদুটি আলো করে রয়েছে দেবতার মালা গাঁথার জন্য মালীরা অর্থাৎ সম্পাদকরা তাঁদের পছন্দ মতো পুষ্প চয়ন করে অর্থাৎ প্রবন্ধ ইত্যাদি সংগ্রহ করে সাজিতে ভরেছেন। পত্রিকা দুখানি যেন দুটি সুন্দর মালা দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত। অবশ্য মালাদুটির সব ফুল সমান আকারের ও বর্ণের নয়, সমান সৌরভও ছড়াচ্ছে না হয়তো, কিন্তু তবুও তাদের রূপে বৈচিত্র্যে আমরা মুগ্ধ। শিশু লেখক-লেখিকাদের অনাবিল মনন-প্রতিভা ও প্রখর প্রকাশ-শৈলী, তাদের ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি বহন করছে। তাদের উদ্দেশে আমাদের সস্নেহ অভিনন্দন রইল। —**অর্যমা**



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে ৯ জানুআরি ১৯৮৩, রবিবার বেলা ৩-৩০ ঘটিকায় বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ৭৩তম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ঐ সভায় পঠিত ১৯৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দের কার্য-বিবরণীতে বলা হয় যে, বিভিন্ন প্রকারের অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মঠ ও মিশনের ত্যাগী কর্মীবৃন্দ তাঁহাদের সেবাদর্শের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া দৃঢ়তার সহিত সঙ্ঘের বহুমুখী সেবাব্রত এবং বন্যা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত অঞ্চলে ত্রাণ ও পুনর্বাসনকার্য পরিচালনা করেন।

আলোচ্য বৎসরে মোট ৪৮, ৭১, ৭২০ টাকা নিম্নলিখিতভাবে ত্রাণ ও পুনর্বাসনকার্যে ব্যয় হইয়াছে :

(ক) বন্যাত্রাণ—রাজস্থানে, (খ) ঘূর্ণিঝড়ত্রাণ—পশ্চিমবঙ্গে, (গ) দুঃস্থত্রাণ—পশ্চিমবঙ্গে, (ঘ) অগ্নিদগ্ধত্রাণ—অরুণাচল প্রদেশে, (ঙ) ঘূর্ণিবাত্যা-ত্রাণ—উড়িষ্যাতে, (চ) শৈত্যত্রাণ—রাজস্থানে, (ছ) খরাত্রাণ—তামিলনাড়ুতে, (জ) দাঙ্গাত্রাণ—বিহারে, (ঝ) অর্ধকুম্ভ মেলাত্রাণ—এলাহাবাদে, (ঞ) চিকিৎসাকার্য—পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলায়, (ট) অধিকন্তু পুনর্বাসনকার্য—অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজকোট ও পশ্চিমবঙ্গে।

ইহা ছাড়া বিতরিত বিভিন্ন দ্রব্যাদির আনুমানিক আর্থিক মূল্য মোট ৯৪, ৯৫২ টাকা।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে পল্লীমঙ্গলের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কৃষি-উন্নয়ন, কুটীরশিল্প, মৎস্যচাষ, গোপালন, মুরগীপালন, ছাগপালন, বিদ্যালয়, ছোট ব্যবসা, কতিপয় ভ্রাম্যমাণ দাতব্য-চিকিৎসালয় ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাহিত হইয়াছে। পল্লীমঙ্গল কর্মসূচী বাবদ মোট ৪, ২৬, ৩৮৩ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত উন্নয়নমূলক সেবা-কার্য পরিচালিত হয় :

বোম্বাই হাসপাতালে একটি ফিজিওথেরাপি বিভাগ, কিষানপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে একটি অ্যালোপ্যাথিক বিভাগ, নরেন্দ্রপুর ব্লাইণ্ড বয়েজ অ্যাকাডেমীর একটি নূতন গৃহ, বারাণসীতে একটি ডাক্তারনিবাস, কামারপুকুরে ৩০টি নন্-ফরমেল স্কুল, চেরাপুঞ্জিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইত্যাদির উদ্বোধন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিনটি মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠা করা হয়—পুরুলিয়াতে, মরিশাসে ও কনখলে।

নত্তরামপল্লীতে মাদ্রাজ মঠের ভ্রাম্যমাণ দাতব্য চিকিৎসালয়ের কাজ আরম্ভ হয়। ওয়াশিংটনে এবছরে একটি বৃহৎ সাধুনিবাস নির্মিত হইয়াছে।

মিশন পরিচালিত ৯টি হাসপাতাল ও ৬২টি দাতব্য চিকিৎসালয়ে যথাক্রমে ৩৭, ৭৮১ ও ৩৮, ৬৮, ১৬১ জন রোগীর সেবা করা হইয়াছে এবং উহার ৬৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯২, ৯০০।

রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত ২৪টি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৮,৩৪,৩২৯ জন রোগী চিকিৎসিত হন এবং উহার ২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭,৫২০।

অনুন্নত ও গ্রামাঞ্চলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দ্বারা ২০৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ৪২টি ভ্রাম্যমাণ সহ দাতব্য চিকিৎসালয় ও বহু গ্রন্থাগার এবং নানা প্রকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণ করা হয়।

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের পরবর্তী কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব প্রচার কমিটি' গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন রাজ্যে কয়েকটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বৈদেশিক কেন্দ্রগুলি যথারীতি শিক্ষা, চিকিৎসা, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সেবানুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিয়াছে।

বেলুড়ে প্রধান কার্যালয় ব্যতীত মিশন ও মঠের বিশ্বব্যাপী শাখার সংখ্যা হইল যথাক্রমে ৭৪ ও ৬৬।

উৎসব

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব গত ৭ ডিসেম্বর ১৯৮২, ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথোপযুক্ত ভাবে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। সারাদিনব্যাপী পূজা, পাঠ, হোম, ভজন-কীর্তনাদি মঠভূমিকে খুবই উদ্দীপনাময় করিয়া রাখিয়াছিল। ১২,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ হাতে-হাতে গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে মঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী বন্দনানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য-জীবনকথা ঐ সভায় আলোচনা করেন স্বামী আত্মস্থানন্দ এবং স্বামী অজজানন্দ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

গত ২৫ হইতে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৮২ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত প্রায় ৭০০ যুবকের উপস্থিতিতে বেলুড় সারদাপীঠের বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে আঞ্চলিক যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ।

উদ্বোধন-সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-উৎসব: শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১৩০তম আবির্ভাবতিথি গত ২১ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ (৭ ডিসেম্বর ১৯৮২), মঙ্গলবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথারীতি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ইত্যাদি হয়। প্রভাতে মঙ্গলারতির সময় হইতেই শত শত ভক্ত নরনারী মায়ের বাড়ীতে আসিতে থাকেন। মঙ্গলারতির পর নাট-মন্দিরে ভজন গান শুরু হয় এবং চলে সকাল ১০টা পর্যন্ত। অগণিত ভক্তসমাগমে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী আনন্দ-উৎসবে মুখরিত হয়। প্রায় সাড়ে তিন হাজার নরনারী হাতে-হাতে প্রসাদ পান।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের নূতন বাড়ীর 'সারদানন্দ হলে' সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। সকাল ১০টা হইতে ১১টা স্বামী অজজানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। পরে কালীকীর্তন করেন 'সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সম্মিলনী'র শিল্পিবৃন্দ। সন্ধ্যায় লীলাগীতি পরিবেশন করেন 'করুণাময়ী আশ্রমে'র ভক্তবৃন্দ।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্ম-জয়ন্তী: পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের বহুস্মৃতিধন্য উদ্বোধন কার্যালয় তথা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে ৫ পৌষ, ১৩৮৯ (২১ ডিসেম্বর ১৯৮২), মঙ্গলবার সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে

তাঁহার জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ ও ভজন-কীর্তনাদি হয় এবং সারাদিন সাধু ও সমাগত ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। নূতন বাড়ীর 'সারদানন্দ হলে' সকাল ১০টা হইতে ১২টা পর্যন্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ সুধা সঙ্ঘে'র শিল্পিবৃন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর উক্ত হলে স্বামী সারদানন্দজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।

শ্রীষ্টোৎসব : ২৪ ডিসেম্বর ১৯৮২, শুক্রবার 'সারদানন্দ হলে' ভগবান্ যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা পালিত হয়। তাঁহার সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে বাইবেল পাঠ করেন স্বামী সগুণানন্দ।

১১ ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দজী ও ২৯ ডিসেম্বর স্বামী তুরীয়ানন্দজীর আবির্ভাবতিথি যথারীতি পালিত হয়।

সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী অজজানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও প্রতি বৃহস্পতিবার ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত একজন সন্ন্যাসী-ভ্রাতার দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী কালেশানন্দ (বীরেন মহারাজ) গত ২০ ডিসেম্বর ১৯৮২ রাত্রি ১২-৩০ মিনিটে ৮০ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠ আরোগ্যভবনে হৃৎপিণ্ডের অংশবিশেষে রক্তচলাচল বন্ধ হওয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত কয়েক বৎসর—প্রথমে রাঁচী স্যানাটোরিয়ামে এবং পরে গত এক বৎসর বেলুড় মঠ আরোগ্যভবনে তিনি অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে যোগদান করেন এবং শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি নারায়ণগঞ্জ আশ্রম ব্যতীত ভুবনেশ্বর, কাঁথি, বেলুড় মঠ, রাঁচী (মোরাবাদী), জামসেদপুর, রাঁচী স্যানাটোরিয়াম এবং পুরী মঠে নানা কার্য করেন। তিনি কয়েক বৎসর স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজের সেবক ছিলেন। সরল ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

পুরস্কার বিতরণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শতবার্ষিকী উপলক্ষে "কৈলাস" আয়োজিত "নিখিল-বঙ্গ প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা"র চূড়ান্ত ফলাফল গত ৫ ডিসেম্বর ১৯৮২, আই. সি. ডব্লিউ. এ প্রেক্ষাগৃহে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের পৌরোহিত্যে ঘোষিত হয়। প্রথম পুরস্কারের সম্মান লাভ করেন একত্রে তিনজন প্রতিযোগী,—শ্রীসরোজ সান্যাল, কাটোয়া কলেজ; শ্রীসারদাপ্রসাদ দে, রামকৃষ্ণ মিশন শিশু বিদ্যাবীথি নরেন্দ্রপুর; শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্কুল অফ্ ল্যাঙ্গুয়েজেস, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচার। একই নম্বর পেয়ে দুজন প্রতিযোগী দ্বিতীয় পুরস্কার পান—শ্রীসুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠ ও শ্রীজগদিন্দ্রনাথ লাহিড়ী, পলাশী হেমাঙ্গিনী সরোজিনী বিদ্যামন্দির। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅর্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মূর্তি-স্থাপনা

১ জানুআরি ১৯৮৩ বনগ্রাম (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ পল্লীস্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে' নূতন মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন স্বামী শিবময়ানন্দ। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ প্রভৃতি হয়।



৮৫তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩৮৯

দিব্য বাণী

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম ভারতের সর্বত্র কোটি কোটি লোকের নিকট পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; যদি আমি জগতের কোথাও সত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি কথাও বলিয়া থাকি, তাহা আমার গুরুদেবের—আর ভুলভ্রান্তিগুলি আমার।**

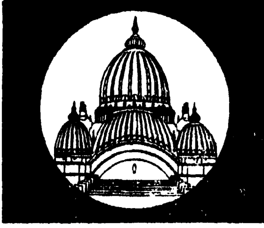
বর্তমান জগতের সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা এই: মতামত, সম্প্রদায়, গির্জা বা মন্দিরের অপেক্ষা রাখিও না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে সারবস্তু অর্থাৎ ধর্ম রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ; আর যতই এই ভাব মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই তাহার ভিতর জগতের কল্যাণ করিবার শক্তি আসিয়া থাকে।…সকল মত—সকল পথই ভাল। তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে, 'ধর্ম' অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, উহার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। **

মানব জাতির নিকট মদীয় আচার্যদেবের উপদেশ এই: 'প্রথমে নিজে ধার্মিক হও এবং সত্য উপলব্ধি কর।' আর তিনি সকল দেশের দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'তোমাদের ত্যাগের সময় আসিয়াছে।' তিনি চান, তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ কর।…যুবকগণের নিকট এখন এই আহ্বান আসিয়াছে, 'কাজ কর, ঝাঁপিয়ে পড়ো, ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার কর।'**

ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় আসিয়াছে। জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, তাহা দেখিতে পাইবে; বুঝিবে—বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই এবং তখনই সমগ্র মানবজাতির সেবা করিতে পারিবে। মদীয় আচার্যদেবের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল—সকল ধর্মের মূলে যে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করা।…উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান্ আচার্য নিজের জন্য কিছুই দাবী করেন নাই। তিনি কোন ধর্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ তিনি সত্য সত্যই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঐ ধর্মগুলি এক সনাতন ধর্মেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৪০৯-১১]



কথাপ্রসঙ্গে

'তুমি এলে ফাল্গুনে'

শীতের জড়তা কাটিয়া ক্রমে বসন্তের আগমন আকাশে-বাতাসে সূচিত হইতেছে। প্রকৃতির সর্বত্রই আভাস মিলিতেছে—নবজীবন ও চেতনার। মলয় বাতাস বহন করিয়া আনিতেছে—জাগরণের মন্ত্রধ্বনিকে। উহার স্পর্শে অনুভূত হইতেছে—নবীন অভ্যুদয়ের রোমাঞ্চ। ফাল্গুনের মৃদুমন্দ বসন্ত পবনে যেন কী এক সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে! প্রকৃতির সর্ব-অঙ্গে আজ নূতন সাজ—নবোদয়ের আলোকাভাস! অন্তঃ বহিঃ উভয় প্রকৃতিতেই এই বসন্ত-সূচনা—নবোত্তম ও প্রেরণার ছন্দ-তরঙ্গ আলস-জড়িত সকল চিত্তকেই জাগাইয়া তুলিতেছে।

শোনা যায়, শীতের প্রারম্ভে গগন-বিহারী বিশেষ কোন হংসশ্রেণী নাকি দলে দলে মানস-সরোবর ছাড়িয়া কোন্ সুদূরে চলিয়া গিয়া আত্ম-গোপন করিয়া থাকে,—ফাল্গুনে আবার বসন্তের আগমন-সংবাদে উহারা সানন্দে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিয়া গলিত-তুষার ঐ মানসেই প্রত্যাবর্তন করে। অনন্তচারী ঐ মানস-হংসের পক্ষ-বিধুনন বুঝি শান্তি-সন্ধানী জীবকুলের অন্তরাকাশকেও স্পন্দিত করিয়া থাকে,—মর্ত্যজনের হৃদয়-গগনেও বুঝি তাই আলোড়ন সৃষ্টি হয়! অপরূপ কোন্ শান্তি-সায়রের দিকে তাহাদিগকেও দুর্বার বেগে আকর্ষণ করিতে থাকে। ফাল্গুনের আলোকোদ্ভাসে তাই বুঝি বিকীর্ণ থাকে অনির্বচনীয় অনিবার এক আকর্ষণী প্রভাব! এই আকর্ষণের কেন্দ্র বা হেতু—কাব্যে, অলঙ্কারে বা কল্পনায় যে-ভাবেই বর্ণিত হউক না কেন,—আসলে উহা কিন্তু এক মহা আবির্ভাব—'সুর মানব মুনি' যাঁহার বন্দনায় মুখর সেই 'ভবশরণ' জগৎপতির। যথার্থই তাঁহার 'আবিঃ ভাব'—কোন রূপক অর্থে নহে। 'আবিঃ' অর্থে আমরা বুঝিয়া থাকি প্রকাশ। যাঁহার প্রকাশে বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে এত রূপান্তর, এমন হর্ষোচ্ছ্বাস অভিব্যক্ত,—জানিতে সাধ হয় কে তিনি,—কী রূপ তাঁহার আবির্ভাব। লীলাপ্রসঙ্গকার সেই বর্ণাঢ্য লেখ-চিত্রই অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার বিশ্রুত গ্রন্থের প্রারম্ভে। স্বামী সারদানন্দজীর সে-বর্ণনা এইরূপ :

"শরৎ, হেমন্ত ও শীত অতীত হইয়া ক্রমে ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হইল। শীত ও গ্রীষ্মের সুখ সম্মিলনে মধুময় ফাল্গুন স্থাবর জঙ্গমের ভিতর নবীন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া আজ ষষ্ঠ দিবস সংসারে সমাগত। জীবজগতে একটা বিশেষ উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেমের প্রেরণা সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে। শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মানন্দের এক কণা সকলের মধ্যে নিহিত থাকিয়া তাহাদিগকে সরস করিয়া রাখিয়াছে—ঐ দিব্যোজ্জ্বল আনন্দ-কণার কিঞ্চিদধিক মাত্রা পাইয়াই কি এই কাল সংসারের সর্বত্র এত উল্লাস আনয়ন করিয়া থাকে?…পূত-গম্ভীর ব্রাহ্ম মুহূর্তে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের তপস্বী দরিদ্র কুটির শুভ শঙ্খারাবে পূর্ণ হইয়া মহাপুরুষের শুভাগমন বার্তা সংসারে প্রচার করিল

সেদিন ছিল ১২৪২ সনের ৬ ফাল্গুন, ইংরেজী ১৮৩৬-এর ১৭ ফেব্রুআরি। ফাল্গুনের সেই পবিত্র উষায় যে-আনন্দ-পুত্তলির ধরাতলে আগমনে

ধ্বনিত শঙ্খারাব সংসারের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছিল,—পরে তাঁহাকেই জাগ্রত বিশ্ব-সংসার প্রকাশিত দেখিয়াছে যুগ-ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে। ফাল্গুনের সূর্যকিরণে আমরা তাঁহারই প্রকাশ-রশ্মিকে অনুভব করি,—আকাশে দেখি তাঁহারই জ্যোতির ছটা,—নক্ষত্রের দীপ্তিতে অবলোকন করিতে পারি সেই তাঁহারই বিমল নয়ন! ফাল্গুন তাই আমাদের কাছে বড়ই পুণ্যস্মৃতিবহ—হৃদয়-উদ্বেলকারী পবিত্র কাল। এই সুখ-স্মৃতিকে সম্মুখে রাখিয়াই একদা মরমী সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ-বন্দনায় গাহিয়াছিলেন:

"তুমি এলে ফাল্গুনে।
ফুল্ল কানন মলয়ানিল কম্পনে।
কোকিল কুল কুঞ্জিত মুখরিত অলি গুঞ্জনে॥
… …
(তব) কুসুম কোমল অঙ্গ, (তাহে) উথলে রূপ তরঙ্গ,
মন্মথ শত নিমেষে নিহত বঙ্কিমায়ত নয়নে।
সাকেতপুরীভূষণ, কৃষ্ণ নন্দ-নন্দন,
বিধি হরিহর সদাই বিভোর চরণপদ্ম ধেয়ানে॥"

*

তিনিই আসিয়াছেন, যাঁহাকে 'সাকেতপুরী-ভূষণ' শ্রীরাম এবং 'কৃষ্ণ নন্দ-নন্দন' রূপে আগেও দেখিয়াছি। সেই সুপরিচিত তিনিই নূতন বেশে আসিয়াছেন,—এবং চলিয়া না যাইয়া ব্যাকুল অপেক্ষায় আজও বসিয়া আছেন। যদি চলিয়াই যাইতেন, তবে তো তিনি ফুরাইয়াই যাইতেন! কিন্তু তিনি ফুরাইয়া যান নাই। স্বরূপেতে তিনি যেমন অনাদি অনন্ত—শাশ্বত অচ্যুত, 'বিধি-হরি-হর'-বন্দিত সেই তাঁহার এই আগমনও তেমনই নিত্য ও সত্য। স্বমহিমায় তিনি চিরঅপেক্ষমান। ফাল্গুনে আসিয়া সেই নূতন নামে ও রূপে, অসীম কালব্যাপী প্রতীক্ষায় থাকিয়া বুঝি-বা এই ফাল্গুনকেও তিনি ভক্ত-মানসে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। প্রশ্ন জাগে,—কিসের জন্য এই আগমন, আর কেনই বা এত প্রতীক্ষা?

*

তিনি আসিয়াছেন! আর সেই আসা অবধিই ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন, আমরা কবে কতক্ষণে তাঁহার কাছে ছুটিয়া যাইব! তিনি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া, 'ওরে আয় আয়' বলিয়া সাদরে ডাকিতেছেন—আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য। লীলাপ্রসঙ্গে চিত্রিত এমন আকুলতার একটি ছবি:

"কথায় কথায় একদিন 'বাবা' বলিলেন, 'দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে; তারা সব আসবে; এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে; প্রেম ভক্তি লাভ করবে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবে, অনেকের উপকার করবে, তাই এ খোলটা এখনও ভেঙ্গে দেয়নি—রেখেছে। তুমি কি বল? এ সব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখছি, বল দেখি?'

"মথুর বলিলেন, 'মাথার ভুল কেন হবে বাবা? মা যখন তোমায় এ পর্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে'

নিজ-জনদের জন্য কী ব্যাকুল

কথা উঠিতে পারে,—এ-প্রতীক্ষা তো মাত্র তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরদের জন্যই ছিল। সত্য বটে। যখন তিনি স্থূল দেহখানির মধ্যেই মাত্র প্রকট ছিলেন, তখন সীমিত সংখ্যক লীলাসহচর অন্তরঙ্গ-গণের জন্যই তাঁহার অপেক্ষা ছিল। সেদিন অবশ্য স্ব-গণ বা নিজ-জন বলিতে ঐ অন্তরঙ্গ পার্ষদগণই শুধু ছিলেন। কিন্তু সেই 'খোল'-টি ভাঙিয়া যাইবার পরে, এখন যে তিনি সর্বব্যাপী—

সর্বহৃদয়চারী রূপে বিরাজমান। অন্তরঙ্গ স্ব-গণও তাই বহু গুণিত—বহু ব্যাপ্ত। কেননা অসীমের অন্তরঙ্গতাও কোন বিশেষ সীমার মাঝে নির্দিষ্ট বা আবদ্ধ থাকিবে কেমন করিয়া?

যথার্থ অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত বা অনুগামী কে,—সে-কথাটিই এখন অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাৎ পার্ষদ বা লীলাসহচরগণই যে তাঁহার অন্তরঙ্গ,—ইহা তো সন্দেহাতীত সত্য। কারণ তাঁহাদের প্রদর্শিত পথই আমাদের সাধন-পথ,—তাঁহাদের নির্দেশিত মনন-প্রণালীই আমাদের উপাসনা-পদ্ধতি। তথাপি, সাধারণ আমরাও যে ঐ সকল লোকাতীত পুরুষগণের উত্তরাধিকার বহন করিতেছি—আমরাও যে সেই অন্তরঙ্গগণ হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত নহি, এই দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়টিও যেন সর্বদা আমাদের মনে জাগরূক থাকে। এই প্রবল আত্ম-বিশ্বাস বা আত্মশ্রদ্ধাও শ্রীরামকৃষ্ণ-উপাসনার বা তাঁহার পথানুগমনের একটি আবশ্যিক শর্ত। বৃক্ষের শাখাসমূহ অবশ্যই মূল কাণ্ডের অন্তরঙ্গ,—কিন্তু অসংখ্য উপশাখা, ডাল-পালা, পত্র-পল্লব-কিশলয়রাজিও তো ঐ অন্তরঙ্গ শাখা-শ্রেণীরই অচ্ছেদ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। সুবিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবরূপী বনস্পতির ক্ষেত্রেও ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বা অনুগামী হইবার গুরুতর দায়িত্ব সম্পর্কেও আমাদিগের সদা অবহিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। স্মরণ রাখিতে হইবে, দেহের প্রতিটি অঙ্গের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, অন্তরঙ্গের সহিত উহাদের সুসঙ্গতি ও সমধর্মিতার উপর। শ্রীরামকৃষ্ণ-সূত্রের মহাভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি সর্বকালের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগীদের উজ্জ্বল দিগ্‌দর্শনস্বরূপ। তিনি সুস্পষ্ট বলিয়া রাখিয়াছেন: "জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্মের পরাকাষ্ঠা সমষ্টিস্বরূপ এরূপ অপূর্ব পুরুষ আর মানব জাতির মধ্যে কখনই সমুদিত হন নাই। ঐ প্রকার সর্বাঙ্গসুন্দর যাঁহার চরিত্র তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যথার্থ শিষ্য ও অনুগামী।"

স্বামীজীর বাণী হইতে আমরা নিঃসংশয়ে জানিয়াছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের যথার্থ শিষ্য, ভক্ত বা অনুগামী হইবার প্রকৃত লক্ষণ ও যোগ্যতা কী। শ্রীরামকৃষ্ণ-রাজ্যের ব্যাপ্তি কত বিশাল—কী বিপুলায়তন তাহাও কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। সুতরাং ভক্ত হইবার উপযুক্ততা অর্জন করিতে—শ্রীভগবানের পদাঙ্ক অনুগমনের পথে যে বহুতর সাধনের অপেক্ষা রহিয়াছে, তাহাও নত শিরে না মানিয়া পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুল প্রতীক্ষার কথাই বলিতেছিলাম। 'ঢের অন্তরঙ্গ আছে, তারা সব আসবে'—শ্রীভগবানের এই যে উক্তি—এই যে অস্থিরতা প্রকাশ, ইহার পরিধি তাই আজ আর সীমিত নহে মোটেই। তাঁহার বর্তমান আকুলতাও তাই আর মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গ লীলাপরিকরগণের জন্যই মাত্র নহে;—তাঁহার ঐ উদ্বেল অপেক্ষার পরিধি আজ দেশ-জাতি-কালের সীমা ছাপাইয়া গিয়াছে। অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গের সূক্ষ্ম বিচার লইয়া চিন্তিত না হইয়া শ্রীভগবানের অঙ্গ-মাত্র হইবার গৌরববোধে জাগ্রত হওয়াই আজিকার শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তের জন্য শ্রীভগবানের ভাবনা ও ব্যাকুলতার প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে: মঠে তৎসমীপে আগত কোন যুবক ভক্তকে মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দজী) একদা বলিয়াছিলেন: 'মঠে এসে প্রথমেই ঠাকুরঘরে যাবে। সেখানে যে তিনি ব্যাকুলভাবে বসে রয়েছেন! ভেবোনা, ভক্তরাই বুঝি শুধু ব্যাকুল হয়, তার দর্শনের জন্য। জানবে, ভক্তের চেয়েও তিনিই ব্যাকুল বেশী হন, ভক্তকে দেখার জন্য।"

কথামৃতকার শ্রীম—(মাস্টার মহাশয়)-ও তাঁহার ভাবোদ্রিক্ত লেখনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ব্যাকুল অপেক্ষাকে প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে

আহ্বান জানাইয়াছেন :

"চল ভাই, আবার তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই।...যিনি আমাদের জন্য দেহ-ধারণ করে এসেছেন—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। চল, চল, তাঁকে দেখব।"

*

ফাল্গুনের প্রবহমান স্নিগ্ধ মলয়ানিল শুধুমাত্র শ্রীভগবানের শুভাগমন সংবাদকেই স্মৃতিতে জাগায় না, সংসার-ক্লান্ত নিরাশ্রয় আমাদের জন্য তাঁহার ব্যাকুল প্রতীক্ষার কথাও কানে কানে বলিয়া যায়। ফাল্গুনের বার্তা তাই তাঁহারই পানে ছুটিয়া চলিতে আমাদিগকে প্রেরণা সঞ্চার করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত বা ভাবানুরাগী হইবার উদ্দেশ্যে যে-পরিমাণ প্রস্তুতি প্রয়োজন—সাধ্য ও সাধন সম্পর্কে যতখানি অবহিত থাকা আবশ্যক, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টিকে ফিরাইয়া দেয় এই নবীন বসন্ত। ফাল্গুনের আকাশে আলোকে বাতাসে ও গন্ধে কেবল উৎসবেরই আমন্ত্রণ নহে,—গভীরতর আত্মানুসন্ধানের অঙ্গীকারেও আমাদিগকে উদ্বোধিত করে।

স্বামীজী-নির্দেশিত সেই জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্মই যেন ফাল্গুন-প্রকৃতির ব্যঞ্জনাময় এই আকাশ, আলো, বাতাস ও গন্ধ। আমরাও তাই বলিতেছি, 'তুমি এলে ফাল্গুনে'। কিন্তু বলিতে পারিতেছি না, 'তুমি এসেছিলে'। তুমি আসিয়াছ, ইহাই সত্য জানি,—তুমি আসিয়াছিলে তাহা আমরা ভাবিতে পারি না। তুমি বর্তমান, ইহাই জানি,—তুমি কখনও অতীত হইয়া যাইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন এবং আছেন। তাঁহার আবির্ভাব নিত্য,—আমাদেরই অপেক্ষায় তাঁহার আকুল প্রতীক্ষাও সত্য। নিত্য সত্য সনাতন সেই পুরুষোত্তমকে সকল হৃদয় দিয়া বরণ করিয়া লইতে আমরা যেন সদা প্রস্তুত থাকি! তাঁহার আসন-তলে প্রণত হইবার মতো উপযুক্ত চারিত্রিক পবিত্রতাই আমাদের সাধিবার বস্তু। ব্যাকুল শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদেরও প্রাণকে আকুল করিয়া তুলুন—যেন তাঁহারই ছাঁচে আমাদের জীবন গঠিত হয়।

'বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি'

আত্মবিস্মৃত বাঙালীর গৃহ-দ্বারে গৌরকান্তি, মুণ্ডিতশির পীতবাস, সৌম্যদর্শন কে এক দেব-প্রতিম পুরুষ সহসা আসিয়া সমুপস্থিত! হায়, আধুনিক বঙ্গসন্তানরা তাঁহাকে] চিনিবে কি? পরিচয়ে জানিলাম, ইনিই সেই মহাভিক্ষু যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একদা বঙ্গ-কবির দরদভরা কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল :

"বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর ॥"

আজ হইতে ঠিক এক সহস্র বৎসর পূর্বে, খ্রীষ্টীয় ৯৮২ অব্দে অখণ্ডিত বাংলার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে সম্ভ্রান্ত গৌড়রাজ বংশে চন্দ্রগর্ভ নামে যে শিশুটির জন্ম হইয়াছিল,—উত্তরকালে যিনি সমগ্র বিশ্বে দ্বিতীয় বুদ্ধ রূপে সম্মানিত হইয়াছেন, যাঁহার জ্ঞান, মনীষা, ত্যাগ ও সেবার দ্যুতি সুদুস্তর হিমালয় পর্বত অতিক্রম করিয়া তিব্বত ও মঙ্গোলিয়ার তুষারাবৃত উপত্যকা ছাড়াইয়া মহাচীনের মরুকান্তার অবধি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল,—ভারতের গৌরব, বাঙালীর গর্ব, সেই বৌদ্ধ মহাচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের প্রতি আজ আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় আনত হইতেছে। সারা বিশ্বে আজ অতীশ দীপঙ্করের আবির্ভাব-সহস্র-বার্ষিকী সসম্ভ্রমে উদ্‌যাপিত হইতেছে। ভারতেও উহার কিঞ্চিৎ আভাস দেখা যাইতেছে, কিন্তু বেদনার বিষয় তেমন সোচ্চারে নহে। দেশ-বিদেশের বৌদ্ধ মনীষী ও সাধু-ভিক্ষুদের পদার্পণে এ-সকল উৎসবস্থলী নিঃসন্দেহে তীর্থরূপ ধারণ

করিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতাতেও কয়েকটি অনুষ্ঠান হইয়া গেল। স্বয়ং পূজ্য দলাই লামাও এই উপলক্ষে মহানগরীতে আগমন করিয়াছিলেন। অনাস্থা, দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভ-চঞ্চল এই নিষ্প্রভ মহাজনপদে ইহা বাস্তবিকই ক্ষণিক বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটি আলোকিত সংবাদ। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমরাও বঙ্গজননীর সুসন্তান দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে সগৌরব শ্রদ্ধায় স্মরণ করিতেছি।

বালক চন্দ্রগর্ভ শৈশব হইতেই মেধাবী ও শাস্ত্রজিজ্ঞাসু। মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে বুদ্ধগয়ায় ওদন্তপুরী-বিহারের মহাউপাধ্যায় আচার্য শীল রক্ষিতের নিকট তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। চন্দ্রগর্ভের নূতন নাম হইল অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ইহার বারো বৎসর পরে তিনি ভিক্ষুব্রতী হন,—আচার্য ধর্মরক্ষিত তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব পদে উপনীত করেন। অতঃপর আরও দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল তিনি সুবর্ণ দ্বীপে আচার্য চন্দ্রকীর্তির নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নানা শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য—বিশেষতঃ বৌদ্ধ দর্শনে অসামান্য অধিকারের ফলে তিনি তদানীন্তন ভারতের বহু ধর্মবিহারের অধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়াছিলেন। এই ভাবে ক্রমে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাচার্যের আসন অলঙ্কৃত করেন। তৎকালে ঐ মহাবিহারের অধিনায়ক ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত আচার্য রত্নাকর। বিহারের ভিক্ষুসঙ্ঘ তখন নানাবিধ নৈতিক ও মানসিক শৈথিল্যে বড়ই পীড়াগ্রস্ত ছিল। বৌদ্ধ সঙ্ঘের সেই ঘোর বিপর্যয়ের দিনে দীপঙ্করের চরিত্রবল, অধ্যাত্মশক্তি ও পরিচালন-কুশলতা সমগ্র বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিমূলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়া, নব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছিল। স্বাভাবিক কারণেই তাই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম বৌদ্ধ জগতের আকাশে ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল প্রভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং চিরদিনই এইরূপ থাকিবে। ধার্মিক তিব্বত-রাজ লাহ্-লামার ইচ্ছাক্রমে তিব্বতী বৌদ্ধ গুরু আচার্য বিনয় ধর, রাজার অন্তিম মনোবাসনাজ্ঞাপক একখানি পত্র সহ ভারতে আসিয়া অনুনয়-বিনয় ও মিনতি সহকারে, তিব্বতী বৌদ্ধগণের শিক্ষা-গুরুরূপে অতীশ দীপঙ্করকে সেখানে যাইতে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। তদানীন্তন তিব্বতের ধর্মীয় কুসংস্কারের ভয়াবহ চিত্রগুলি,—অতীশের হৃদয়কে স্পর্শ করিল। করুণায় দ্রব হইয়া, অবশেষে তিনি তিব্বতে যাইতে সম্মত হইলেন। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জ্ঞানালোক হস্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন বৌদ্ধ-বিশ্বে অচিরেই যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার দেহের বয়স ষাট বৎসর, কিন্তু মনে ছিল অসমসাহসিক তারুণ্যতেজ।

বিক্রমশীলা-মহাবিহারের সর্বাধিনায়ক আচার্য রত্নাকর দীপঙ্করের এই অটল সিদ্ধান্তের কথা জানিয়া তিব্বতী দূত বিনয় ধরের নিকট যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহাই দীপঙ্কর সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি। রত্নাকর বলিয়াছিলেন: "অতীশ না থাকিলে ভারতবর্ষ অন্ধকার। বহু বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চাবি তাঁহারই হাতে; তাঁহার অনুপস্থিতিতে এই সব প্রতিষ্ঠান শূন্য হইয়া যাইবে।"

যাহা হউক, অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতের উদ্দেশে হিমালয়ের পথে যাত্রা করিয়াছেন। নেপালের সুদুর্গম গহনারণ্যে দুই দুই বার তিনি দস্যুর কবলেও পড়িয়াছিলেন, কখন পদব্রজে, কখন অশ্ব-পৃষ্ঠে,—কখন উত্তুঙ্গ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া; আবার কখনও পরিব্রাজক দীপঙ্করের যাত্রা যোজন যোজনব্যাপী ধবল তুষারস্তূপের উপর দিয়া, কখনও বা দুরতিক্রমণীয় হিমবাহ পার হইয়া।

তিব্বতের প্রাক্তন নৃপতির দেহাবসানে নূতন রাজা তখন ধর্মপ্রাণ চান্-চুব। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর তিব্বতের মাটিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতরাজ তাঁহাকে ধর্মগুরুর মর্যাদা প্রদান সহ বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বহু

বিচিত্র তিব্বতী বাদ্যযন্ত্র, গীত, শ্বেত পতাকা, শ্বেত ছত্র ইত্যাদি সহকারে রাজপুরুষ, সম্মানিত লামা এবং বিপুল সংখ্যক ধার্মিক নর-নারী তাঁহাকে অবনত মস্তকে সম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ"—মন্ত্রটি বাদ্য-সহযোগে সুললিত উদার কণ্ঠে গীত হইয়াছিল, অতীশ দীপঙ্করের বরণমন্ত্র হিসাবে। মাঙ্গলিক সে-গীতধ্বনি হিমালয়ের তুষার-গাত্রে যে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল,—উহারই অনুরণন সারা বৌদ্ধ জগতের হৃদয়তন্ত্রীতে আলোড়ন তুলিয়াছিল এবং আজ সহস্র বৎসর পরেও সেই কম্পন-তরঙ্গ থামিয়া যায় নাই।

অতীশ দীপঙ্কর তাঁহার জীবনের শেষ তেরো বৎসর কাল তিব্বতেই অতিবাহিত করেন। তিব্বতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া মহাযান বৌদ্ধমত প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠাকেই তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিব্বতীয় ধর্মাচার্যগণ তথা সেখানকার রাজা ও রাজ-প্রতিনিধিরা দীপঙ্করকে পরম শ্রদ্ধায় ও আত্মীয়তায় একান্তই আপনজন করিয়া লইয়াছিলেন,—নিছক সামাজিক বা লৌকিক, অথবা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক আচারবশেই নহে—আতিথেয়তা বা গুণগ্রাহিতার প্রেরণামাত্রেই নহে। প্রাদুর্ভূত ধর্মীয় কুসংস্কার, গ্লানি ও মালিন্যকে ধুইয়া মুছিয়া নির্মল করিয়া, তিব্বতীয় জনমানসে জ্ঞানালোক প্রজ্বালনের উদ্দেশ্যেই ছিল ঐ আন্তরিক আহ্বান। লামা সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রবর্তক শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করই।

শুধুমাত্র ধর্ম প্রচার ও জ্ঞানের বিস্তারই নহে,—ভাবিলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয়, শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর তিব্বতে সমাজ-কল্যাণ ও জনসেবামূলক কর্মেরও প্রবর্তন করিয়া এক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ হইতে সহস্র বৎসর পূর্বে, তিব্বতের মতো জটিল সমাজ-ব্যবস্থা ও ধর্মীয় পরিবেষ্টনীতে জীবসেবারূপ ব্যবহারিক ধর্মকে অনুশীলন করা এবং ধর্মাচার্যরূপে সমাজে উহা প্রচলন করিতে তৎপর হওয়া যে কতখানি সুসাহসিকতা ও সুমার্জিত প্রগতিশীলতার পরিচায়ক তাহা সত্যই একটি মননযোগ্য বিষয়,—ইতিহাসের বিস্ময়।

দীপঙ্কর সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন,—পালি ও তিব্বতীয় ভাষাতেও তাঁহার বৈদগ্ধ্য বৌদ্ধ-জগতে সুবিদিত। তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন তিব্বতীয় ভাষায়—মহাযান ধর্মমতের উপর। সংস্কৃত ও পালি ভাষাতেও মৌলিক গ্রন্থ যাহা তিনি রচনা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যাও প্রায় পৌনে দুই শত।

১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লাসার নিকটবর্তী ন্যাথাং বিহারে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিয়াত্তর বৎসর বয়সে মহাসমাধি লাভ করেন। তাঁহার পবিত্র পূতাস্থি তিব্বতের বিভিন্ন মঠে মন্দিরে আজও অতিশয় শ্রদ্ধায় সংরক্ষিত।

চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, মনীষায় ও অধ্যাত্ম-গরিমায় বাঙালীর ছেলে দীপঙ্কর সুদূর হিমালয় শিখরের উপরে দেদীপ্যমান একটি শুকতারা যেন! ভারত-বিধাতার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি এই অতীশ দীপঙ্কর। ভারতের জ্ঞান-দীপকে যাঁহারা বিশ্বের সুউচ্চ আকাশে তুলিয়া ধরিয়া উজ্জ্বলিত করিয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে দীপঙ্করের নাম সর্বাগ্রে—সকলের পুরোভাগে স্মরণীয়। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বমানবাকাশে উদিত ততোধিক মহিমান্বিত বিবেকানন্দ-ভাস্করের আগমন-প্রস্তুতিই যেন সূচিত হইয়াছিল সেই সহস্র বর্ষ পূর্বে! আদর্শ-বিমূঢ় আধুনিক বঙ্গীয় যুবশক্তি ক্ষণকালের জন্যও শান্ত দৃষ্টিতে ঘরের দিকে ফিরিয়া দেখিলে তাঁহারা নিঃসন্দেহে গর্বিত হইবেন,—আত্মশ্রদ্ধায় উন্নতশির বোধ করিবেন।

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম-সহস্র-বার্ষিকীতে, বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের সঙ্গে আমরাও সমস্বরে বলিতে পারি, সেদিনের সেই ঘনায়মান মেঘান্ধকারের মধ্যে দীপঙ্করই ছিলেন একমাত্র আলোকধারা। ভারতীয় মনীষীদের চিন্তাতেও ঐ একই ভাব আলোড়িত হইয়াছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষার অনুকরণে এখানে বলিতে চাহিতেছি :

দীপঙ্কর বাঙালী জাতির গৌরব। শ্রীজ্ঞানের নাম বৌদ্ধ জগতের পুরোভাগে। বৌদ্ধ জগতে দীপঙ্করের ন্যায় আর কোনও পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই।

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে লিখিত]

Sri Durga Sahaya

সারগাছী আশ্রম।
২০।৫।৩৬

পরম কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র (9. 5. 36) পাইয়াছি। তোমাদের স্থানীয় শতবার্ষিকী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে, এবং তুমি ঐ উৎসবের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাইয়াছ জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।

মানুষের মনে নীচ প্রলোভনের কথা তখনই জাগে যখন মন শূন্য থাকে। সেই জন্য প্রত্যেক উন্নতিকামী মানুষকেই সর্ব্বক্ষণে মনকে সৎ কাজে, সৎ ও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থাদি পাঠে, এবং সাধু ও ধীর স্বভাব বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ আলোচনায় ব্যস্ত রাখিতে হয়। এমনকি শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে পর্য্যন্ত এই জন্য সৎকাজে ও সৎ কথায় সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখিতেন। সুতরাং তোমার মত অতি সাধারণ লোকের কি কর্ত্তব্য তা ত সহজে বুঝিতে পার। অলসভাবে পড়িয়া থাকা, বা বাজে লোকের সঙ্গে হাল্‌কা আমোদপ্রমোদের কুৎসিৎ কথায় যোগ দেওয়া যেন কিছুতেই না হয়। এমন হইলে তৎক্ষণাৎ সে ভাব এবং সে স্থান ত্যাগ করিবে, এবং উপরোক্ত ভাবে নিজেকে নিযুক্ত রাখিবে। এই আমার উপদেশ এবং আদেশ জানিবে। আর সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিবে, তুমি একজন মহৎ ব্যক্তি, ঠাকুরের মহৎ ইচ্ছা পূরণের জন্যই জন্মলাভ করিয়াছ। তুমি কখনই ছোট হইয়া থাকিতে, ছোট কাজ করিতে বা ছোট কথা ভাবিতে পার না।

গায়ত্রীর সাধারণ অর্থ যে কোন সন্ধ্যাবিধি হইতে এখন পড়িয়া মোটামুটি ভাবে বুঝিয়া লও। পত্রে উহা লিখিয়া জানানো সম্ভব নয়। কারণ, গায়ত্রী-মন্ত্রের অর্থ অতি গভীর ভাবপূর্ণ; এবং উহার অর্থও বহু ঋষি বহু প্রকারে করিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন উপাসক হিসাবে বিভিন্ন অর্থ বলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং যখন তুমি সামনে উপস্থিত থাকিবে, তখনই বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিব।

বর্ত্তমান আমার শরীর বড়ই খারাপ। কাজেও বড় ব্যস্ত আছি। আশা করি তুমি ভালই আছ, এবং এখন তোমার সকল অসুবিধারও লাঘব হইয়াছে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

ইতি—শুভানুধ্যায়ী—
অখণ্ডানন্দ

কথামৃত ও নারদীয় ভক্তি

স্বামী গম্ভীরানন্দ

[১০.১০.১৯৮২ তারিখে রামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে আয়োজিত সাধু-ভক্তদের এক সমাবেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষের প্রসঙ্গালোচনা।—সঃ]

আপনারা যাঁরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পাঠ করেছেন তাঁরা দেখতে পাবেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, 'কলিতে নারদীয় ভক্তি।' কথাটা তিনি একজন নানক-পন্থী সাধুর মুখে শুনেছিলেন এবং তা তাঁর মনে বসে গিয়েছিল। নারদীয় ভক্তি বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন এটা পরিষ্কার করে 'কথামৃতে'র কোথাও বলেননি, যদিও সবটা কথামৃত পড়লে আমাদের ভক্তি সম্বন্ধে একটা ধারণা এসে যায়। আমি নারদীয় ভক্তি সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করছি আজকে। নারদীয় ভক্তি বলতে আমরা ধরে নিতে পারি, নারদের যে ভক্তিসূত্র আছে তাতে তিনি ভক্তির কথা যেরকমভাবে বলে গেছেন, তার কথাই হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন।

ভক্তির স্বরূপ কি? ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ বলতে কি বোঝায়? নারদ বলেছেন: 'সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা'। 'সা' মানে সেই ভক্তি। 'অস্মিন্' কি-না এঁতে, কোন নাম বলেননি—বিষ্ণু, কি শিব, কি নারায়ণ, কি লক্ষ্মী বা দুর্গা—সেরকম নাম করলেন না। বললেন 'অস্মিন্'—সাধারণভাবে, একটু উদারতা দেখিয়ে। ভগবানের বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন রূপ তো থাকতে পারে। 'অস্মিন্' তাঁর প্রতীক। 'পরমপ্রেমরূপা' কি? পরম প্রেম বলতে মানুষের ভেতর যা ভালবাসা আছে, তাকে আমরা বুঝে থাকি। ঠাকুর বলেছেন—সতীর পতির প্রতি টান, মায়ের ছেলের প্রতি টান, কৃপণের অর্থের প্রতি টান—এই তিন টান যদি একসঙ্গে মেশে তবে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। তবে এই যে টান মানুষের ভেতরে, সেটাকে আমরা জানি,—সেটাকেই ভগবৎ-প্রেম বলতে চাইছেন না নারদ। তবে একটা জিনিস আছে যা পরম প্রেমের মতো অর্থাৎ তার চেয়েও বড়। ভক্তি জিনিসটা ভগবানের প্রতি চরম ভালবাসা, তাকে ভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। সুতরাং বললেন মানুষ প্রেম বলতে যা বুঝে সেই প্রেমেরই মতো একটা জিনিস অর্থাৎ তার চেয়ে আরও অনেক উঁচু ও অনেক বড় জিনিস। ভক্তির স্বরূপ বলতে গিয়ে নারদ এ-কথা বললেন।

ভক্তির পরিচয় বা তটস্থ লক্ষণ কি? তা জানতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে কে ভক্ত এবং তার ভক্তি কিরূপ? সেখানে নারদ প্রথমে গর্গ ও ব্যাসের কথা বলেছেন। গর্গ বলেন যে, ভগবানের কথাদিতে যে অনুরাগ—ভগবানের কথা শোনা, বলা, লীলা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা। এই তাঁর প্রতি যে ভালবাসা, যে অনুরাগ তাকেই বলে ভক্তি। আবার ব্যাস বলেন যে, পূজাদি যেমন পূজা-অর্চনা করা, বন্দনা করা এই সব ব্যাপার—তাকেই বলে ভক্তি। তাঁর প্রতি যে অনুরাগ—'আমার পূজা করতে ভাল লাগে ভগবান্‌কে'—এটাই হল ভক্তি। তারপরে তুলেছেন শাণ্ডিল্যের মত। নারদ বলেছেন যে, 'আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ' শাণ্ডিল্যের মতটা কি-না আত্মরতিকে একটুও বাদ না দিয়ে ভগবানের প্রতি যে অনুরাগ, তাকে বলে ভক্তি অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা শাণ্ডিল্য বললেন। জ্ঞান থাকছে, তার সঙ্গে মিশ্রিত

থাকছে ভক্তি। কি রকম? জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা মনে করেন পরব্রহ্ম রয়েছেন—পরমাত্মা—নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনি যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতে চান তখন তিনি সগুণ ঈশ্বর রূপ ধারণ করেন—পরমেশ্বররূপে নিজের শক্তিকে বিকাশ করেন। এই যে পরমেশ্বর তাঁরই প্রতি যে ভালবাসা—তাই ভক্তি। ঠাকুর বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি' বুদ্ধি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত জীব, জগৎ, ঈশ্বর সবই আছে; সবই মানতে হয় অদ্বৈতবাদীরও। ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্তিকে এড়িয়ে আমরা যেতে পারি না। ভক্তি নিয়ে আমাদের থাকতে হবে। তাই বলেছেন, এই যে আত্মজ্ঞান—আমি কে? আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই—তার অতীত যে 'আমি'—'সেই আমি'। সেই আমির স্বরূপটা কি করে জানব—না সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে; বা ঈশ্বরের উপাসনা করে যখন তাঁর কাছে যেতে পারব তখন তিনি বুঝিয়ে দেবেন তাঁর স্বরূপটা কি এবং আমার স্বরূপটা কি। এই হচ্ছে জ্ঞানীভক্তের পথ। এই জ্ঞানমিশ্রা যে ভক্তি এটাকেও নারদ নিলেন না। না নিয়ে তিনি কি বললেন—'নারদস্তু'। কিন্তু নারদের মতে হচ্ছে কি-না 'তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি চ'। যত প্রকারের আচরণ আছে সমস্ত তাঁতে অর্পণ করে দেওয়া এবং ভগবানের সতত স্মরণ থাকছে না বলে পরম ব্যাকুলতা হৃদয়ে জাগা—এটাকে বলে ভক্তি। ভক্তির লক্ষণ, ভক্তির পরিচয় আমরা কিভাবে পাব—তা এই যে তদর্পিত-অখিল-আচারতা—আমরা যত কিছু করছি যেমন গীতাতে বলেছেন :

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

গীতা, ৯।২৭

—'যা তুমি করছ, যা তুমি খাচ্ছ, যা যজ্ঞাদিতে দান করছ, যা কিছু তপস্যা করছ সমস্তই তুমি আমাতে অর্পণ কর।' 'আমাতে অর্পণ কর'—মানেটা কি? কাজ এবং কাজের ফল তাঁতে অর্পণ করা এবং কাজগুলো যে তাঁরই,—এই জেনে কাজ করা। তদর্পিত-অখিল-আচারতা—সমস্ত তাঁকে অর্পিত,—তাঁকে দান করলুম—ভগবান্‌কে দিলুম। তার ফল শুধু দিলুম না, কাজটাও। যেমন ঠাকুরের দৃষ্টান্ত রয়েছে কথামৃতে—এক তাঁতি ছিল, সে তাঁত বুনে তার জীবন পালন করত। সে অতি ভক্ত ছিল। সর্বদা ভগবানের নাম করত। সর্বদা ভগবানে নিজের মন রাখবার চেষ্টা করত। খরিদ্দারেরা কাপড় কিনতে আসত এবং জিজ্ঞাসা করত তার দাম কত? সে বলত সুতোর দাম পড়েছে আমার এক টাকা, আমার মেহনত পড়েছে চার আনা আর আমার মুনাফা দুই আনা। তা কাপড়ের দাম এক টাকা ছয় আনা। তা, লোকেরা জানত এ সত্যবাদী ও সরল। সুতরাং এক টাকা ছয় আনা ফেলে দিয়ে কাপড় নিয়ে যেত। এখন এক রাত্রে হল কি—তার ঘুম হচ্ছে না, সে তখন এক চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বর চিন্তা করছে, এমন সময় একদল ডাকাত সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একজন মুটে দরকার—যে ভার বয়ে নিয়ে যেতে পারে। তা, দেখলে এ তাঁতিটি বসে আছে। তাকে তারা ধরে তাদের সঙ্গে নিয়ে চলল ডাকাতি করতে। ডাকাতি করল, বোঝাটা চাপিয়ে দিল তার ঘাড়ে। তাঁতি সেই বোঝা নিয়ে চলছে এমন সময় পুলিস এসে পড়ল, ডাকাতরা যে যেমন পারে ছুটে পালিয়ে গেল। ধরা পড়ল তাঁতি। তার মাথায় বোঝা। তাকে কোর্টে নিয়ে হাজির করা হল। গ্রামের লোকেরা সকলেই ভাবল এমন সোজা সরল সত্যবাদী লোক কখনও ডাকাতি করতে পারে না। তারা আদালতে গিয়ে বিচারককে বলল, 'হুজুর এ-ব্যক্তি

কখনও ডাকাতি করতে পারে না। কোন একটা ব্যাপার এর ভিতর আছে।' তখন হাকিম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছিল বল তো!' তাঁতি বললে, 'রামের ইচ্ছায় আমার রাত্রে ঘুম হচ্ছিল না, রামের ইচ্ছায় আমি বসে জপ করছিলাম, রামের ইচ্ছায় একদল ডাকাত সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রামের ইচ্ছায় তারা ডাকাতি করল। রামের ইচ্ছায় তারা বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। তারপর রামের ইচ্ছায় পুলিস এসে পড়ল, তারপর রামের ইচ্ছায় তারা আমাকে ধরল, রামের ইচ্ছায় তারা আমাকে আদালতে উপস্থিত করেছে।' হাকিম ভাবলেন এমন সত্যবাদী লোক কখনও ডাকাত হতে পারে না। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। তখন তাঁতি বলছে, 'রামের ইচ্ছায় আমি বেকসুর খালাস হয়ে গেলাম।' এইভাবে সব কিছু ভগবানে অর্পণ করা—যা কিছু কাজকর্ম। যেমন গিরিশ-চন্দ্রের কথা রয়েছে লীলাপ্রসঙ্গে এবং কথামৃতেও আছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ গিয়ে ঠাকুরকে বলেছিলেন—দেখুন, আমি তো কোন সাধন তপস্যা করতে পারছি না, তাহলে আমার কি গতি হবে? ঠাকুর বললেন, দু বেলা বসে বসে একটু ভগবানের নাম জপ করবে। 'মশাই তা আমার সময় কোথায়? তা আমি পারব না। আমার কাজকর্ম রয়েছে, মনটা সব সময় চঞ্চল, আমি তো এমন কথা দিতে পারব না যে, আমি নিয়ম মতো দু-বেলা বসে জপ করব।' ঠাকুর বললেন, তাহলে দু-বেলা হাত তালি দিয়ে হরি নাম কর, আবার গিরিশবাবু বললেন, তাই বা কি করে করি! কথা দিতে পারছি না। আমি পারব না। তারপর ঠাকুর বললেন, 'মনে মনে ভগবানের চিন্তা কর'। তখনও গিরিশবাবু চুপ করে আছেন। তা ঠাকুর বলছেন—তুমি বলবে তাও আমি কথা দিতে পারব না। তাহলে তুমি আমাকে 'বকলমা' দাও। আমায় 'পাওয়ার অব্ এ্যাটর্নি' দাও। আমি তোমার হয়ে সব করব। তোমাকে কিছু করতে হবে না। গিরিশচন্দ্র ভাবলেন—এ তো বড় সহজ পথ, এ পথেই চলা ভাল। তাঁকে বকলমা দিলেন, বললেন, হ্যাঁ, আপনি আমার ভার নিলেন, আপনি সব করবেন। তারপর বাড়ীতে এসে ভাবছেন এ তো ভয়ানক বিপদে পড়া গেল, আর তো 'আমি, আমার' বলা চলবে না। 'আমি কাজ করছি', 'আমার কাজ, আমার ফল' এতো আর কিছুই বলা চলবে না। 'সবই ঠাকুরকে দিয়ে দিয়েছি'।—এই হল 'তদর্পিতাখিলাচারতা'। 'তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা'—ভগবানকে মনে রাখতে পারছি না বলে পরম ব্যাকুলতা এটা হল ভক্তির পরিচয়। ঠাকুরের জীবনে আমরা ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। তিনি দিনের পর সন্ধ্যার সময় সাধন কালে গঙ্গার ধারে বালির উপর মুখ ঘসরাচ্ছেন আর বলছেন—মা, আর একটা দিন গেল দেখা দিলি না। তারপর তাঁর ব্যাকুলতা এত বেশী হল যে একদিন দেখলেন মন্দিরের গায়ে খড়্গ ঝুলছে। তিনি খড়্গ নিয়ে আত্মহত্যা করতে গেলেন। তখন মা এসে তাঁকে দর্শন দিলেন। এই হল 'তদ্‌বিস্মরণে পরম-ব্যাকুলতা।'

ভাগবতে কিন্তু নবধা ভক্তির কথা বলা হয়েছে এবং কথামৃতেও এরূপ ভক্তির কথা নানা জায়গায় ছড়ানো আছে। ভাগবতে আছে—"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।" নয় রকম ভক্তির কথা বললেন—শ্রবণ করা, ভগবানের নাম কীর্তন ইত্যাদি শোনা। তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে পরীক্ষিত। পরীক্ষিত রাজা জানলেন যে, আর কিছুদিন পরেই তাঁকে মরতে হবে। তখন তিনি শুকদেবকে অনুরোধ করলেন—আপনি আমায়

ভগবানের কথা শোনান। শুকদেব বলতে লাগলেন পরীক্ষিত শুনতে লাগলেন, তার থেকে ভাগবত রচনা হয়ে গেল। এই হচ্ছে ভাগবত কথা শ্রবণ। তারপর কীর্তন—নারদ ত্রিভুবনে ভগবানের নাম কীর্তন করে বেড়াচ্ছেন। তিনি হচ্ছেন কীর্তনের প্রকৃত দৃষ্টান্ত। আর ভগবান্ নারদকে বলেছিলেন, 'নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ, মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥'—হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না যোগীদের হৃদয়েও থাকি না, ভক্তরা যেখানে আমার নাম কীর্তন করে আমি সেখানে থাকি। 'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্'—স্মরণ করা, সর্বদা নাম স্মরণ। যেমন পম্পা সরোবরে গিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ। দেখলেন একটি কাক বার বার আসছে জল খেতে, কিন্তু জলের কাছে এসে জল না খেয়ে ফিরে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ তখন রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি ব্যাপার? কাকটি জল খেতে এসে না খেয়ে চলে যাচ্ছে কেন? রামচন্দ্র বললেন, ও সর্বদা রাম নাম জপ করছে, পাছে রাম নাম ভুল হয়ে যায় সেজন্য সে জল খেতে পারছে না।—এ হল সর্বদা তাঁর স্মরণ। তারপর 'পাদসেবনম্'—তাঁর পদসেবা করা। যেমন লক্ষ্মী ভগবানের পদসেবা সর্বদা করছেন। এরকম সর্বদা পদসেবাতে নিরত থাকা হচ্ছে একটা ভক্তির লক্ষণ। তারপর 'অর্চনং বন্দনং দাস্যং' তাঁর অর্চনা করা, পূজা করা। শোনা যায় পৃথু রাজা বলে একজন রাজা ছিলেন। তিনি ভগবানের পূজা করতে বিশেষ আনন্দ পেতেন এবং সর্বদা তিনি ভগবানের পূজাতে নিমগ্ন থাকতেন। তারপর তাঁর 'বন্দনং'। তাঁর বন্দনা করা—স্তবস্তুতি ইত্যাদি পাঠ করা। আমরা সেটা দেখতে পাই গরুড়ের জীবনে। গরুড় সর্বদা করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিষ্ণুর সামনে। সর্বদা যেন তাঁর প্রার্থনা করছেন। সর্বদা যেন স্তবস্তুতি করছেন। তারপর 'দাস্যং'। দাস ভাব অবলম্বন করা। হনুমানের চরিত্রে—মহাবীরের চরিত্রে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দাস রূপে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্রের যা কিছু দরকার, বলবার আগেই সেভাবে সেগুলো করে যাচ্ছেন। তারপর 'সখ্যম্'—সখার ভাব। যেমন শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতির ছিল। তাঁরা ভালবেসে সরলভাবে ভগবান্‌কে পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে তপস্যা করে বা নানা রকম স্তবস্তুতি করে পাননি। তাঁরা ভালবাসার দ্বারা সখারূপে পেয়েছিলেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে—এটি হচ্ছে 'সখ্যম্'। তারপর 'আত্মনিবেদনম্'—নিজেকে সঁপে দেওয়া ভগবানের শ্রীচরণে। যেমন প্রহ্লাদ করেছিলেন। তাঁকে কত কষ্টের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। তাঁর বাবা চেষ্টা করেছেন যাতে তিনি নারায়ণের নাম না করেন। কিন্তু প্রহ্লাদ কিছুতেই ছাড়লেন না। তিনি সর্বদাই ভগবানের নাম করছেন এবং নানারকম যন্ত্রণার মধ্যে, যেমন—আগুনে ফেলে দেওয়া, হাতী দিয়ে মাড়ান ইত্যাদিতেও তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। এই হল ভক্তিলাভের বিভিন্ন উপায়।

নারদীয় ভক্তি বলতে কি বোঝায় মোটামুটি হল। কিন্তু এই কথা বললে ভুল হবে যে, ঠাকুর জ্ঞানকে একেবারে বাদ দিয়েছিলেন। জ্ঞান বলতে যে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা আমি বলেছি সেই জ্ঞানের কথা এখানে নয়। ঠাকুর বলেছেন সদসদ্ বিচার—নিত্যানিত্য বিচার রাখতে হয়, এটা ভাল, এটা মন্দ, এটা নিত্য এটা অনিত্য, এটা করা উচিত এটা করা উচিত নয়—এসব বিচারগুলো রাখতে হয়। তিনি বলেছেন যে, 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?' যোগেন মহারাজ একটা কড়া কিনতে গিয়েছিলেন বাজারে। সেটা যে ফাটা, না লক্ষ্য করেই

তিনি নিয়ে এসেছেন। ঠাকুর তাঁকে বললেন দোকানী তো লাভ করবার জন্য বসে আছে। তোর কাজ হল ভাল করে সেখানি দেখে বাজিয়ে নেওয়া। এরকমভাবে তিনি বলেছেন—ভক্ত হবি তো, বোকা হবি কেন? সেজন্য ভগবান্‌কে ভক্তিভাবে ডাকা আমাদের সর্বপ্রথম জিনিস বটে, তা বলে আমরা সদসদ্‌ বিচার যেন না ভুলে যাই। আর বলেছেন সরলতা। সরলতা সম্বন্ধে নিরঞ্জন মহারাজের কথা বারবার বলতেন,—ও বড় সরল, সরল হলে ভগবান্‌ তাকে ভালবাসেন। আর সরল হলে ভগবান্‌ সেখানে তাঁর আসন পাতেন। আর বলেছেন বিশ্বাস,—বিশ্বাস করা চাই, শ্রদ্ধা। যেমন বলেছেন, আমি যদি 'মা দুর্গা' বলে বাড়ী থেকে বেরুই তাহলে আমার কোন ক্ষতি হতে পারে না এবং এই বিশ্বাস থাকা সর্বদা দরকার যে আমি কালী নাম করেছি আমার আবার ভয়! আমার আবার মৃত্যু ভয়!

যদি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি
আখেরে এ-দীনে না তারো কেমনে
জানা যাবে গো শংকরী॥

এই যে বিশ্বাস—এরকম বিশ্বাস ভক্তির সঙ্গে থাকা দরকার।

এরকম ভক্তির দ্বারা কি হবে আমার? আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি আমরা ভগবান্‌ লাভ করব, আমাদের মুক্তি হবে। কিন্তু ভক্ত যাঁরা, তাঁরা নারদের মতো বলেন—ভক্তি হচ্ছে ভক্তির লক্ষ্য। ভক্তির লক্ষ্য বলে আলাদা একটা জিনিস আছে তা নয়। ভগবান্‌ তো আমাদের হৃদয়ে রয়েছেনই। তিনি সৎ-স্বরূপ, তিনি আনন্দ-স্বরূপ, তিনি সর্বদা হৃদয়ে প্রেমস্বরূপ। তাঁকে ভালবাসা—ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। আর কোন প্রয়োজনে নয়। এখন ভালবাসার ফলে তিনি যদি আমাকে কোন কিছু দেন তো সে আলাদা কথা। ঠাকুর বলেছেন, যে ভক্ত সে মুক্তি পর্যন্ত চায় না। তারা বলে—আমি চিনি খেতে চাই, চিনি হতে চাই না। চিনি খাব কিন্তু চিনি হব না। তাঁরা মুক্তি দিলেও নেন না। চার রকম মুক্তির কথা বলা হয়। সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি। সাযুজ্য—কি-না ভগবানের সাথে মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া। এ-পথ ভক্তদের পথ নয়। সামীপ্য—কি-না তাঁর কাছে গিয়ে থাকা। সালোক্য—কি-না ভগবান্‌ যে বিষ্ণুলোকে আছেন আমি সে বিষ্ণুলোকে গিয়ে থাকব। আর সার্ষ্টি মানে কি? না, তাঁর মতো ঐশ্বর্যশালী হব। এই যে তিনি চতুর্হস্ত—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করে যে বিষ্ণুরূপে আছেন, সেরকম রূপ আমার হবে। তাঁর লোকে আমি চিরকাল বাস করব। এই হচ্ছে সাধারণ ভক্তদের ভাব। কিন্তু তার সাথে ঠাকুর আবার এও বলেছেন যে, ভগবান্‌ যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে জ্ঞানী যে মুক্তি বা পরব্রহ্মজ্ঞান চায় তাও তিনি দিয়ে দিতে পারেন। আমরা যদি ভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করতে পারি আর যদি মুক্তির ইচ্ছা থাকে, তাহলে ভগবান্‌ সে ইচ্ছা পূরণ করেন। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারেন। এ-কথা ঠাকুর বলে গেছেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি যদিও নারদীয় ভক্তির কথা বলেছেন, তাহলেও জ্ঞানকে একেবারে সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলেননি। জ্ঞান বলতে আমি এখানে বিচারের পথ বলছি—সদসদ্‌ বিচার, নিত্যানিত্য বিচার—এই বিচারের পথ। সেই বিচারের পথ ধরে রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও রাখতে হবে। বোকা হলে চলবে না।

আর নারদেরই মতো ঠাকুর বলেছেন যে, ভক্তির পথ সহজ পথ। কেন সহজ পথ? কর্মযোগ কঠিন বলেছেন ঠাকুর। কর্মযোগের

কর্ম বলতে তিনি বলেছেন বেদে যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড যাগযজ্ঞের কথা আছে সে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড। ঐ সব করা এ যুগে মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকে হয়তো কি করে করতে হয় তাও ভুলে গেছেন। সব করা সম্ভব নয়। আর কি? কর্মযোগে—নিষ্কামভাবে কাজ করতে হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্কাম হওয়া মানুষের পক্ষে সহজ নয়। জ্ঞানযোগও কঠিন, কারণ 'আমি ব্রহ্ম' এই বোধ সহজে হয় না। কারণ কলিতে জীব অন্নগতপ্রাণ। পরন্তু মানুষ মানুষকে ভালবাসে। ভালবাসা স্বতই আমাদের হৃদয়ে আছে। সেটাকে ভগবানের দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। আমরা মানুষকে ভালবাসি, সন্তানকে ভালবাসি, টাকাকড়িকে ভালবাসি—এই ভালবাসা জিনিসটা আমাদের কাছে স্বাভাবিকভাবে, সহজভাবে রয়েছে, তাকে মোড় ফিরিয়ে ভগবানের দিকে চালিয়ে দেওয়া—এটা হচ্ছে ভক্তি। এভাবে ভক্তির কথা বলেছেন ঠাকুর। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের মা আছে, যেমন—যদি ক্রোধ করতে হয় তাহলে তার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে মায়ের উপর রাগ করা। "কি মা! আমি তোমাকে বারবার ডাকছি, তুমি আমাকে দেখা দেবে না! তাহলে আমি গলায় ছুরি দেব।" অভিমান যদি করতেই হয়, তাহলে ভগবানের উপর অভিমান করতে হয়। কামনা যদি জাগে তাহলে ভগবান্‌কে চাই, তাঁকে আমি পাবই পাব, টেনে নিয়ে আসবো,—এমনভাবে তাঁকে কামনা করা। এমনিভাবে একটা ডাকাত-পড়া ভাব। 'মারো কাটো লোটো' ইত্যাদি—এমনভাবে মায়ের উপর ক্রোধ করা, অভিমান করা। মায়ের উপর রাগ করা, মায়ের কাছে কামনা করা, মানুষের ভেতর যে সমস্ত ভাবগুলো রয়েছে সবগুলোকে ভগবানের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। সেটা ভক্তিলাভের উপায়। মোদ্দা কথা হচ্ছে—এই ভক্তিই হচ্ছে ভক্তি লাভের উপায়। আর ভক্তির লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তি। আমাকে ভক্তি পেতে হলে ভক্তির পথে চলতে হবে। আর ভক্তির দ্বারা কি পাব?—না, ভক্তিকেই পাব। ভগবান্‌কে ভালবাসা, সত্যি সত্যি ভালবাসা—এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না। আর ভালবাসা যদি সেখানে জাগে, তাহলে ভগবান্ আপনা থেকে এসে দেখা দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারেন। ঠাকুর একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন—একজন চাকর আছে মনিবের বাড়ীতে, সে খুব কাজকর্ম করে। কর্তার খুব সেবা করে। একদিন খুশি হয়ে কর্তা বললেন—আয়, তুই আমার পাশে বোস্। আমিও যা তুইও তা। তাই দেখা যাচ্ছে যে, ভগবানের প্রতি যদি ভক্তিলাভ করা যায়, তাহলে ভক্তির ভেতর দিয়ে জ্ঞানের যেটা চরম আদর্শ—ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া—সেটাও সম্ভবপর হয়। সাধারণভাবে ভক্তির বিষয়ে এই দু-চার কথা বলা হল।

ভারতসভ্যতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত-তত্ত্ব বিভাগে, গত ৮ নভেম্বর ১৯৮১, লেখক কর্তৃক ইংরেজীতে প্রদত্ত ভাষণের সারমর্ম।—সঃ]

ভারত এক বিস্ময়কর দেশ। যেমন সুপ্রাচীন, তেমন নবীন। এর সভ্যতার বয়স যে কত, তা কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। কেউ বলেন খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর, কেউ বলেন তারও বেশি। অন্যান্য দেশে যখন সভ্যতার কোন প্রকাশ হয়নি, মানুষ উলঙ্গ হয়ে থাকত, গুহায় বাস করত, কারণ ঘরবাড়ী তৈরী করতে জানত না, ধাতুদ্রব্যের ব্যবহার জানত না, পারিবারিক গ্রন্থিও ভাল করে গড়ে ওঠেনি, তখনও ভারতে সুসমৃদ্ধ জনপদ দেখতে পাওয়া যায়। সভ্যতার যা-যা লক্ষণ, তা রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। আপনারা মহেঞ্জদারো ও হরপ্পার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। এখানে যে সব প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা থেকে এটা সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এসব জায়গায় যারা বাস করত, তারা সুন্দর নগর গড়ে তুলেছিল যা বর্তমান নগরের সাথে কোন কোন অংশে তুলনীয়। তাদের নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দেখেও বোঝা যায় যে, তারা দেব-দেবীর পূজা করত, কৃষি ও পশুপালন তাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। প্রায় সব রকম ধাতু-দ্রব্যের সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল। মহেঞ্জদারো ও হরপ্পার সভ্যতার সঙ্গে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন সভ্যতা সুমেরিয় সভ্যতার বেশ কিছু সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে হয়তো এভাবের আরও অনেক জনপদ ছিল যা সভ্যতার মাপ-কাঠিতে বেশ উন্নত। সেগুলি হয়তো এখনও পৃথিবীর গর্ভে লুকিয়ে আছে।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ভারতীয় সভ্যতার পেছনে রয়েছে একটি সুগভীর ধর্মচিন্তা। সুসভ্য যে সব জনপদ গড়ে উঠেছিল, তা হয়তো লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু ভারতের যে ধর্মচিন্তা, তা এখনও সজীব, এখনও নূতন। মহেঞ্জদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পশুপতি শিবের মূর্তি পাওয়া যায়, আবার শক্তি পূজার প্রমাণও পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ এখনও সেই শিব-শক্তি বা পুরুষ-প্রকৃতির পূজা করে আসছে। কিন্তু তাঁরা পৃথক নন, দুয়ে এক, একে দুই। কেউ যেন মনে না করে ভারত বহু দেবদেবীর উপাসনা করে। অগ্নি, মিত্র, বরুণ ইত্যাদি বহু দেবদেবীর নাম বেদে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাঁরা একই দেবতা, কেবল বহু নাম। যেমন দেবতা, তেমনই দেবী। দেবীদেরও নাম বহু, কিন্তু তাঁরা এক। বহুদিন আগে ভারতবর্ষ এক আশ্চর্য সত্য আবিষ্কার করেছিল যা ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে সুন্দরভাবে উচ্চারিত—'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' সত্য বা সত্তা এক, পণ্ডিতরা তাকে বহু নাম দিয়ে অভিহিত করে থাকেন। শুধু নাম বহু নয়, রূপও বহু। নাম-রূপ দুই-ই কল্পিত, মূলতঃ এক সত্তা। এই জগতে বহু বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাই। কত রকমের মানুষ, কত রকমের জীবজন্তু, উদ্ভিদ, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি। এই বৈচিত্র্য শুধু নাম-রূপের—এর পেছনে কিন্তু যে সত্তা বিদ্যমান, তা এক। কিভাবে ভারতবর্ষের পণ্ডিতরা এই সত্য আবিষ্কার করলেন, তা কেউ বলতে পারে না, কিন্তু আজ বিজ্ঞানও এই সত্যকে স্বীকার করে।

এই সত্যকে কেন্দ্র করে ভারতের ইতিহাস গড়ে উঠেছে। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশ আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। কত রকমের মানুষ, কত রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ, কত রকমের ভাষা, কত রকমের আহার-বিহার।

কত রকমের ধর্মমত। কিন্তু কি অদ্ভুত সহাবস্থান। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মতে চলছে, কোন বাধা দেবার চেষ্টা নেই, কোন সমালোচনা নেই, প্রত্যেকেই স্বাধীন, প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা। এর মধ্যে ছোট বড় নেই, প্রত্যেকে নিজের রুচিসম্মত পথে চলেছে। এই হচ্ছে ভারতবর্ষ।

এই সহিষ্ণুতা সম্ভব হয়েছে ঐ এক মহামন্ত্র থেকে—'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' এই মহামন্ত্র ভারতকে কতটা সহিষ্ণু করেছে তা বুঝতে পারা যায় এই থেকে যে, বহু জাতি বা সম্প্রদায় নিজের দেশে নির্যাতিত হয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছে, আর ভারত সানন্দে এবং সসম্মানে তাদের স্থান দিয়েছে। এভাবে ইহুদীরা এসেছে, জরথুষ্ট্রীয়রা এসেছে, এমন কি কিছু খৃষ্টানও এসেছে। দলে-দলে এভাবে কত জাতি বা সম্প্রদায় এসেছে অনন্তকাল ধরে। ভারতের জনগণের মধ্যে যে এত বৈচিত্র্য, তা এই কারণেই। যারা বাইরে থেকে এসেছে, তারা তাদের বৈশিষ্ট্য কিছু রক্ষা করেছে, আর বাকি সব এদেশের গ্রহণ করেছে। আজ তাদের আর ভারতের সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক করে চেনা যায় না। সমুদ্রে যেমন বহু নদী এসে মেশে, আর একাকার হয়ে যায়, তাদের পৃথক সত্তা আর থাকে না, ঠিক তেমনই, ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' বিভিন্ন সভ্যতার বিচিত্র ধারা মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। বস্তুতঃ ভারতের সভ্যতা, বহু জাতির মিলিত সভ্যতা। একটা মস্ত ফুলের তোড়া যেমন বহু রঙের ও গন্ধের ফুলের সমষ্টি, এও তাই। সকলে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

একটা বিষয় আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ভারতের ইতিহাস রাজা-রাজড়ার ইতিহাস নয়, সাধু-সন্তের ইতিহাস। অনেক রাজা রাজত্ব করে গেছেন ঠিকই, কিন্তু জনসাধারণের জীবনে তাঁরা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। সাধারণ মানুষের উপর যাঁরা প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন সর্বত্যাগী আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ। তাঁরাই সকলের নমস্য, তাঁরাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। স্বয়ং রাজাও তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার করে নেন। তাঁদের কথাই আইন, কারণ তাঁরা জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ, সকলের কল্যাণকামী ও নিঃস্বার্থপর মানুষ। তাঁদের বাণী ও জীবন জাতির সমস্ত শক্তির উৎস।

এঁদের মধ্যে আবার একশ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁরা জাতির বিশেষ বিশেষ সংকট মুহূর্তে আবির্ভূত হন। তাঁরা যেন ঈশ্বরপ্রেরিত দূত, ঈশ্বরের শক্তি তাঁদের মধ্যে প্রকট। তাঁরা জাতির হতাশা দূর করেন, আত্মবিশ্বাস এনে দেন, নূতন পথের সন্ধান দেন। যত গ্লানি ও কালিমা দূর করে জাতিকে নূতন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা একটা বিশেষ দেশ ও কালে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁরা যে শিক্ষা দেন, তা সকল দেশ ও কালের বেলায় প্রযোজ্য। খৃষ্টান জগতে যীশুকে 'ঈশ্বর পুত্র' বলা হয়। ভারতবর্ষে এই সব পুরুষদের 'অবতার' বলা হয় অর্থাৎ যেন ঈশ্বর স্বয়ং এই সব ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন পথভ্রষ্ট মানুষকে পথ দেখাবার জন্য। 'ঈশ্বর পুত্র' বা 'অবতার' দুটি আলাদা শব্দ হলেও সমার্থক। তাঁদের এক ভূমিকা।

ভারতের বৈচিত্র্যের কথা আগেই বলেছি। এই বৈচিত্র্য নাম-রূপের বৈচিত্র্য, এই বৈচিত্র্যের পেছনে যে সত্তা বিদ্যমান, তা এক। অর্থাৎ একই বস্তু নাম-রূপের গুণে বহু বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ, একই বস্তুর ওপর বহু নাম-রূপ চাপিয়ে বহু বস্তু বলে দেখানো হচ্ছে। এই বহু দেখা ভুল। এটা আমাদের অজ্ঞানতা, জীবনের

উদ্দেশ্য এই অজ্ঞানতা দূর করে এক দেখা। এক দেখা মানে এক হওয়া। এই যে 'এক', তিনিই ঈশ্বর বা আত্মা বা ব্রহ্ম নামে পরিচিত। তাঁকে লাভ করলে বা তাঁর সাথে এক হয়ে যেতে পারলে মানুষ কৃতকৃতার্থ হয়, তার আর পাবার কিছু থাকে না। যো-সো করে তাঁকে লাভ কর, এইটেই ভারতের শাশ্বত বাণী। যুগ-যুগ ধরে বহু সাধক এই বাণীই প্রচার করে এসেছেন। জগৎকে তাঁরা মিথ্যা বলেননি, কিন্তু অনিত্য বলেছেন অর্থাৎ নিত্য সত্য নয়। যা অনিত্য, তার পেছনে না ছুটে যা নিত্য সত্য তা পাবার জন্য চেষ্টা কর। যত দুঃখ এ অনিত্য বস্তুর পেছনে ছোটার জন্য। বুদ্ধদেব বলতেন—সবাই দুঃখী, সমস্ত জগৎটা দুঃখের আগার। এ নির্মম সত্য, এ স্বীকার না করে উপায় নেই। যুগ-যুগ ধরে ঋষিরা শিক্ষা দিয়েছেন কি করে দুঃখকে জয় করা যায়, কি করে এমন আনন্দ লাভ করা যায় যার ক্ষয় নেই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা অমৃতত্ব। আমরা এখন দাস, বহু প্রকারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কি করে এ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করা যায়—এই হচ্ছে জীবনের সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য। বুদ্ধদেব এবং তাঁর পূর্ববর্তী যত ধর্মগুরু এসেছেন, তাঁরা এই মুক্তির বাণী প্রচার করেছেন। তাঁরা শুধু প্রচারই করেননি, হাতেনাতে করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁরা যা প্রচার করেছেন, তা তাঁদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ফলশ্রুতি। বই পড়া বিদ্যা নয়, নিজে যা জেনেছেন, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ভেতর দিয়ে জেনেছেন, তাই প্রচার করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ

এ রকম একজন ঋষি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তিনি জন্মেছিলেন কলকাতা থেকে ৭০ মাইল দূরে, ছোট একটা গ্রামে। তাঁর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর বাবা ছিলেন তেজস্বী এক সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। মিথ্যা বলতে সম্মত হলেন না বলে নিঃস্ব অবস্থায় নিজের গ্রাম ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। পাশের গ্রামে এক বন্ধুর বদান্যতায় একটা কুঁড়ে ঘর করে বাস করতে লাগলেন। অতি কষ্টে তাঁর দিন চলত। কিন্তু তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর সন্তানেরা হাসিমুখে সব কষ্ট সহ্য করতেন। ঈশ্বরই তাঁদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা সমস্ত গ্রামের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি যখন রাস্তা দিয়ে চলতেন, রাস্তার দুধারে লোক হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্ভুত এক প্রতিভা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। তিনি ভাল গাইতে পারতেন, নাচতে পারতেন, ছবি আঁকতে পারতেন, অভিনয়ও করতে পারতেন। প্রকৃতিকে ভালবাসতেন। দূরদিগন্ত বিস্তৃত ময়দানে ও খোলা আকাশের নীচে বেড়াতে তাঁর ভাল লাগতো। একবার ঘন কালো মেঘের গায়ে এক ঝাঁক সাদা বক দেখে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। এই তাঁর প্রথম সমাধি। পরে ঈশ্বরের চিন্তা করলেই তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বইত, রোমাঞ্চ হত এবং সমাধি হত। তিনি অর্থকরী বিদ্যাকে বর্জন করেছিলেন। বলতেন, 'যে বিদ্যা দিয়ে ঈশ্বর লাভ হয়, একমাত্র সেই বিদ্যাই আমি চাই। অন্য বিদ্যায় আমার প্রয়োজন নেই।' আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর না থাকলেও তিনি এমন সব কথা বলতেন, যা শুনে পণ্ডিতেরা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যেতেন। অপর দিকে তিনি অত্যন্ত রঙ্গরসপ্রিয় ছিলেন, যেখানেই যেতেন আনন্দের হাট বসে যেত।

তাঁর এক দাদা কলকাতায় ছোট একটা সংস্কৃত বিদ্যালয় চালাতেন। আবার গৃহস্থ বাড়ীতে দেবদেবীর পূজাও করতেন। এভাবে সামান্য যে অর্থ উপার্জন করতেন, তা দিয়ে অতি কষ্টে তাঁদের সংসার চলত। শ্রীরামকৃষ্ণ বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া শিখছেন না, আবার অর্থোপার্জনের

চেষ্টাও কিছু করছেন না দেখে তাঁর দাদা তাঁকে কলকাতায় এনে তাঁর কাছে রেখেছিলেন। এতেও কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি পড়াশোনা করেন না, অর্থকরী কোন কাজেও তাঁর উৎসাহ নেই, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ান, গান গেয়ে সবাইকে আনন্দ দেন, নিজেও আনন্দে বিভোর।

এর কিছুদিন পরে তাঁর দাদা কলকাতার উপকণ্ঠে এক মন্দিরের পূজারীর পদে অভিষিক্ত হন। কয়েক বছর পরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জায়গায় ঐ পদ গ্রহণ করেন। তিনি পূজা করেন, কিন্তু তাঁর মনে প্রশ্ন, ঈশ্বর যে তাঁর পূজা গ্রহণ করছেন তার কি প্রমাণ? তিনি দিনরাত ঈশ্বরের ধ্যান-চিন্তা করেন, আর দর্শনের জন্য কান্নাকাটি করেন। একদিন ঠিক করলেন আত্মহত্যা করবেন, ঠিক এই সময়ে তিনি অনুভব করলেন যেন এক জ্যোতি-সমুদ্র এসে তাঁকে গ্রাস করে ফেললো। তার পর থেকে তিনি অন্য রকমের মানুষ হয়ে গেলেন। দিনরাত ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন, কেউ খাইয়ে দিলে খেতেন, নচেৎ খেতেন না। লোকে বলত, তিনি উন্মাদ হয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর বিবাহও হল। কিন্তু বিবাহের পরেও ঈশ্বরের মধ্যেই তাঁর মন ডুবে রইল, কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

এর পর দেখা গেল, তিনি হিন্দুধর্মের ঈশ্বরলাভের যত পথ নির্দিষ্ট করা আছে, তার এক একটি ধরে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করছেন। আশ্চর্য এই যে, যথা সময়ে ঐ সব পথের গুরুও তাঁর জুটে যেত। ঐ সব গুরুরা অবাক হয়ে দেখতেন যে, যে-সিদ্ধি লাভ করতে তাঁরা বহু বছর কাটিয়েছেন, তা লাভ করতে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েক দিন মাত্র লাগল। গুরুদের মধ্যে অনেকে আবার কোন কোন বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই ধর্মশিক্ষা লাভ করতেন। এভাবে হিন্দুধর্মের সব পথ একটার পর একটা পরীক্ষা করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম ও খৃষ্টমতেও সাধন করতে শুরু করলেন। তাঁর পথপ্রদর্শকেরও অভাব হল না। কী কৌতূহল তাঁর? ঈশ্বরকে জানতে হবে, পেতে হবে, নানাভাবে অনুভব করতে হবে—এ তাঁর এক অদম্য ইচ্ছা। ঈশ্বরকে নানা ভাবে ও নানা নামে ভক্ত ডাকছে, কিন্তু তিনি যে কি তা ভাষায় বুঝানো যায় না। যে বুঝেছে সে চুপ করে থাকে, যে বোঝেনি সেই অপরকে বোঝাতে চেষ্টা করে। মৌমাছি যতক্ষণ ফুলে বসে মধু পান না করে, ততক্ষণ গুনগুন করে, কিন্তু মধু পান করতে শুরু করলে আর গুনগুন শব্দ করে না।

এতদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ শান্ত হয়েছেন। নানা পথে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, 'যত মত তত পথ'। এখন তিনি আনন্দে ভরপুর। শাস্ত্র পড়েননি, কিন্তু শাস্ত্রের যা সার শিক্ষা, তা অতি সহজ ভাষায় ও ভাবে যে আসে তাঁর কাছে তাকে বুঝিয়ে দেন। এ যে তাঁর উপলব্ধি করা সত্য। কাশী যে দেখেনি, সে কাশীর কথা বললে অস্পষ্টতা থাকে, কিন্তু যে দেখেছে, তার কথা সুস্পষ্ট। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ভারতবর্ষে তখন ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন হয়েছে। যাঁরা ইংরেজী শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁরা নিজেদের ধর্মমত ছেড়ে হয় খৃষ্টধর্মের দিকে ঝুঁকেছেন, না হয় সমস্ত ধর্মেই আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। কেউ-কেউ আবার ধর্ম মানে শুধু আচার-অনুষ্ঠান বুঝতেন, ধর্মের যা একেবারে বাইরের দিক, তাই ছিল তাঁদের কাছে সব। অল্প সময়ের মধ্যেই দেখতে পাই প্রায় সব রকমের এবং সব সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসতে শুরু করেছেন। তিনি যে প্রশ্ন নিয়েই আসুন শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সহজ ভাষায় তার উত্তর দিয়ে দিতেন। আর তার সঙ্গে গান, গল্প, উপমাও থাকত যাতে ধর্ম জিনিসটা যে কি, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হত না। সব চেয়ে অবশ্য বড় কথা হচ্ছে মানুষটা। তিনি এমন

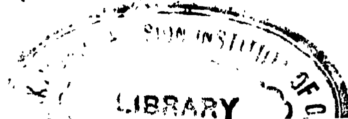
মানুষ ছিলেন যে তাঁকে দেখলে এবং কিছুক্ষণ তাঁর সান্নিধ্যে থাকলে ধর্মের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, যে-সত্য সব ধর্মের সার, তা বুঝতে কারও দেরী হত না। তিনি ধর্মের সাক্ষাৎ প্রতিচ্ছবি। তিনি কোন নূতন ধর্মমত প্রচার করেননি, যে যে-মত নিয়ে আছে, সেই মত নিয়ে সে এগিয়ে যাক—এই ছিল তাঁর শিক্ষা। ধর্ম শুধু কথা নয়, মত নয়, অনুষ্ঠান নয়, ধর্ম হচ্ছে জীবনে প্রতিফলন, বাস্তবে প্রয়োগ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—শুধু 'সিদ্ধি', 'সিদ্ধি' বললে নেশা হয় না, সিদ্ধি বেটে সরবত করে খেলে তবে নেশা হয়। তেমনই ধর্মের সব সত্যকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে, তবে ধর্ম কি বুঝা যাবে

তাঁর কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদেরই একজন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন সব দল ও মতের ঊর্ধ্বে। সত্য ছাড়া তিনি আর কিছু জানতেন না। তার ফলে দলে-দলে ধর্মপিপাসু লোক তাঁর কাছে আসত। যারা আসত, তারা পরম তৃপ্তি নিয়ে ফিরে যেত। তাঁর যে-সব কথা, তার খানিকটা এমন, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' নামে বইতে লিপিবদ্ধ আছে। এই বইটি সংকলন করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণেরই এক শিষ্য শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহেন্দ্রনাথ উচ্চ-শিক্ষিত মানুষ, তিনি যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা যে শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথা সে সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের সহ-ধর্মিণী এবং তাঁর শিষ্যরা সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই 'কথামৃত' এখন বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই বই এখন সমাদৃত।

ভারতের যা শাশ্বত বাণী, তাই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করে গেছেন। ত্যাগের দ্বারাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে, ধনের দ্বারা নয়, সন্তান-সন্ততির দ্বারা নয়, নানা রকমের পূজানুষ্ঠানের দ্বারা নয়। এ যুগে এ বাণী প্রচারের প্রয়োজন ছিল। এ যুগের মানুষ মনে করে বাইরের সম্পদই সব। বাইরের সম্পদের সঙ্গে যদি মনের সম্পদ না থাকে, তাহলে মানুষের পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। পৃথিবীতে যদি শান্তি আনতে হয়, তা হলে চাই প্রেম-প্রীতি, সহিষ্ণুতা অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে মনের সম্পদ। শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছেন কিসে মানুষ মনের সম্পদ বাড়িয়ে দেবতায় পরিণত হতে পারে। আমরা দেখতে পাই মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দও আছে। বুদ্ধও মানুষ, আমরাও মানুষ। আমরা সবাই কেন বুদ্ধ হতে চেষ্টা করি না? ভারতীয় সভ্যতা এইটাই প্রমাণ করে—মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে। জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা। যদি একজন বুদ্ধ সম্ভব হয়ে থাকে, তবে আমরা সবাই বুদ্ধ হতে পারি। এই 'হওয়া'-টাই হচ্ছে বড় কথা। জ্ঞান সার্থক, আমাদের সব প্রচেষ্টা সার্থক যদি তা দিয়ে আমরা মানুষের মতো মানুষ হতে পারি।

বলতেন 'মান হুঁশ' অর্থাৎ 'মান যুক্ত হুঁশ' অর্থাৎ নিজের মহিমা সম্পর্কে, নিজের দেবত্ব সম্পর্কে যে সচেতন, অবহিত সেই 'মানুষ'।

আপনারা লক্ষ্য করবেন, ভারতীয় সভ্যতা সর্বদা এক খাদেই বয়ে চলেছে। এই সভ্যতার প্রবাহ যখনই দুর্বল হয়েছে, তখনই একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়ে সেই প্রবাহকে বেগবান করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এ রকম একজন মহাপুরুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত এক মহাসংকটে পড়েছিল। ভারত মৃতপ্রায় ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। তিনি যেন ভারতাত্মা। নূতন সাজে, নূতন রূপে ভারতাত্মা তার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। যা পুরাতন ও শাশ্বত, তার সংস্কার সাধন করে নূতন ছন্দে ও নূতন ভঙ্গীতে যুগোপযোগী করে জগতের কাছে পরিবেশন করে গেছেন। ভারতের যা মর্মবাণী, সে শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীও সমগ্র মানবজাতির জন্য। তা যেমন পুরাতন, তেমন নূতন, কারণ তা নিত্য সত্য। এ যুগের মানবের যে সমস্যা, তার সমাধান শ্রীরামকৃষ্ণ।



শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র

শ্রীপীযূষকান্তি রায়

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্বের কল্যাণের জন্য ১৮ ফেব্রুআরি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব হয়। উনিশ শতক হল বিজ্ঞানের যুগ এবং এই যুগেই শিল্পবিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতি ও নতুন নতুন আবিষ্ক্রিয়া হয়েছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ আবিষ্কারক উইলিয়ম্ ট্যাল্‌বট্ কাগজের উপর রাসায়নিক দ্রব্য ছড়িয়ে প্রথম ফটো তোলেন[১] এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই ডাগুরে সর্বপ্রথম কাচের প্লেটের উপর সিল্‌ভার নাইট্রেট্ মাখিয়ে ফটো তোলেন। এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র ক্যামেরার সাহায্যে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। অবতারদের মধ্যে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কোন অবতারের ফটো নেই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম কলকাতায় পদার্পণ করেন, তখন চৌরঙ্গীর সাহেব-পাড়া ছাড়া সম্ভবতঃ উত্তর ও মধ্য কলকাতা অঞ্চলে কোন পেশাদারী ফটো প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়নি।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের পঞ্চাশ বছরের মর্ত্যলীলায় তাঁর মাত্র তিনখানি প্রসিদ্ধ ফটো তোলা সম্ভব হয়েছে। প্রথমটিতে শ্রীকেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ—ডানহাত উর্ধ্বে উত্তোলিত—বামহাত বুকের কাছে। দ্বিতীয়টিতে চীনাবাজারে স্টুডিওতে তিনি থামের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে এবং তৃতীয়টিতে দক্ষিণেশ্বর শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরের বারান্দায় বসে আছেন—সাধারণতঃ যে চিত্রপট গৃহে গৃহে পূজিত। এই তিনটি আলোকচিত্রেই তাঁকে গভীর সমাধি অবস্থায় দেখা যায়। এ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরে কাশীপুরে দুখানি গ্রূপ ফটো তোলা হয় অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম ফটো। শেষের দুটি প্রায় একই ধরনের, শুধু পিছনে দাঁড়ান উপস্থিত ত্যাগী সন্তান ও গৃহী ভক্তদের সামান্য স্থান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই দুখানি ফটোর মধ্যে কোন্‌টি প্রথম গৃহীত তার কোন সঠিক বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না; সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের খালি গায়ে ফটোটিকে চার নম্বর আর যেখানে তিনি চাদর গায়ে দাঁড়িয়ে সেটিকে পাঁচ নম্বর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সমাধি অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য না হলে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোগ্রাফ তোলা সম্ভব হত না। ক্যামেরা দেখলেই তাঁর সমাধি হত। শোনা যায় তাঁর একখানা ফটো গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই আলোকচিত্রটি, শুধু তাঁর গুটিকয় সন্ন্যাসী সন্তান ও গৃহী ভক্তেরই দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কয়েকজন লোকান্তরিত এবং কিছু বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী এই আলোকচিত্রের ইতিহাস জানতেন। স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দজীর কাছ থেকে লেখক ১৯৪৫-এ শুনেছেন[২] ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং মঠ ও মিশনের প্রথম সচিব স্বামী সারদানন্দজী তাঁকে বলেছিলেন যে, ভক্তপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি আলোকচিত্র তুলিয়েছিলেন। ঐ ফটো দেখে ঠাকুর সন্তুষ্ট হননি। ফলে রামবাবু ঐ ফটো ও নেগেটিভ গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। মঠ ও মিশনের বর্তমান অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী নির্বাণানন্দজী তাঁর এক প্রবন্ধে অনুরূপ ঘটনার

---

১ Great Inventions by R. Bowood-Wills & Hopworth, London, page 44.

২ বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের তদানীন্তন সচিব।

উল্লেখ করেছেন[৩] যা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কাছ থেকে একদা কথাচ্ছলে শুনেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের এই ফটোটির ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। কবে, কোথায়, কোন্ সময় এবং কোন্ ভঙ্গিমায় ঠাকুরের এই ফটোটি তোলা হয়েছিল, কেই বা আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন তার কোন ইতিহাস কোথাও পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এ ফটো দেখেছেন শুধু মাত্র ফটোগ্রাফার, শ্রীরাম দত্ত, ঠাকুর স্বয়ং এবং ঠাকুরের গুটিকয়েক গৃহীভক্ত ও সন্তান। যেহেতু এই ফটোটির কোথাও কোন চিহ্ন নেই এবং এর ইতিহাস খুব কম লোকই জানেন, তাই ঠাকুরের জীবনের মুষ্টিমেয় যে কয়টি ফটো আছে, তাদের সংখ্যার গুনতি থেকে এটিকে একেবারে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ফটো

কেশবচন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন লাভ করেন ১৫ মার্চ ১৮৭৫-এ বেলঘরিয়া জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে। তারপর ঘন ঘন সশিষ্য ও সপরিবারে কেশবচন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের ফলে ও প্রভুর দর্শনে তিনি ঠাকুরের খুবই ঘনিষ্ঠ হন। ঠাকুরকে তিনি মাঝে মাঝে নিজ গৃহেও নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন। এ সম্পর্কে শ্রীম বলেছেন,[৪] "প্রায় প্রতিবৎসর ব্রাহ্মোৎসবের সময় ও অন্যান্য সময়েও কেশব দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন ও তাঁহাকে কমলকুটীরে লইয়া আসিতেন। কখনো কখনো একাকী কমলকুটীরের দ্বিতলস্থ উপাসনাকক্ষে পরম অন্তরঙ্গজ্ঞানে ভক্তি-ভরে লইয়া যাইতেন ও একান্তে ঈশ্বরের পূজা ও আনন্দ করিতেন।" এমনি একদিন অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মোৎসবের সময় কেশবচন্দ্রের গৃহে শুভাগমন করেন। ঐ দিন কমলকুটীরে (৭২, আপার সারকুলার রোড—বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) ঠাকুরের যে ফটোটি তোলা হয়, সেটিকেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ও এক নম্বর ফটো হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই ফটোটিকে আখ্যা দেওয়া হয় 'কেশবচন্দ্রের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ'। এই ফটোতে দেখা যায় কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে কীর্তনের আসরে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দাঁড়িয়ে। ডানহাত তোলা এবং হাতের আঙুলগুলি মৃগমুদ্রাবদ্ধ, আর বাঁ হাত বুকের উপর রাখা। তিনি সমাধিস্থ। পাছে ঠাকুর পড়ে যান, তাই ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় তাঁকে ধরে আছেন। ঠাকুরের পরনে সাদা পাঞ্জাবী, ধুতি এবং চাদরখানি কোমরে জড়ান। মেঝেতে অন্যান্য ভক্তদের মধ্যে ত্রৈলোক্য সান্যালকেও দেখা যায়। পিছনের খোলা জানালায় ভেনিসীয় পাখিদার খড়খড়ি। ঠাকুরের পায়ের কাছে ফুল আঁকা গালিচার আসন। এই ফটো সম্পর্কে শ্রীম ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২ এপ্রিল যে বর্ণনা দিয়েছেন[৫] তা থেকে জানা যায়—"১৮৭৯ ভাদ্রোৎসবের সময় আবার কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেলঘরের তপোবনে লইয়া যান। ···আবার ২১শে সেপ্টেম্বর কমল-কুটীরে উৎসবে যোগদান করিতে লইয়া যান। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলে ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে তাঁর ফটো লওয়া হয়। ঠাকুর দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ। হৃদয় ধরিয়া আছেন।" মনে হয় ফটোটি কেশবচন্দ্র নিজস্ব প্রয়োজনে তাঁর বাড়ি 'কমলকুটীরে' (অধুনা ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউসন্) ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের সময়

৩ উদ্বোধন, পৌষ ১৩৬৯, পৃঃ ৬৫৫
৪ শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত; (১৩৭১) ৫।১।৩, পৃঃ ৯
৫ ঐ, পৃঃ ১০

...য়েছিলেন। কি করে যে তিনি এ ফটো নওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে তথ্য কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। কেশবচন্দ্র ঠাকুরের এই ফটোটি তাঁর বাড়িতে তোলার জন্য কোন্ ফটো প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করেছিলেন, তার সঠিক সংবাদ এতকাল কেউ বিশেষ জানতেন না। সম্প্রতি স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজী লিখিত এক প্রবন্ধ থেকে জানা গিয়েছে[৬] যে, দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ার বেদান্ত সোসাইটিতে ঐ ফটোর যে আদি (Original) প্রতিলিপি বর্তমান, তার পিছনে রবার স্ট্যাম্পে ইংরেজীতে মুদ্রিত আছে—"The Bengal Photographers, Estd. 1862, 19/8, Bow Bazar Street, Calcutta".[৭] এ সম্পর্কে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজী মন্তব্য করেছেন যে, ফটোটির পিছনের রবার স্ট্যাম্প থেকে তাঁর শুধু অনুমান[৮] হয় মাত্র, কিন্তু প্রমাণিত হয় না যে 'দি বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স' দ্বারাই এই ফটোটি গৃহীত হয়েছে। তাঁর এ সংশয়ের প্রতিকূলে ও রবার স্ট্যাম্পের অনুকূলে কিছু যুক্তি প্রদর্শন করা যেতে পারে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশে যখন প্রথম পেশাদারী আলোকচিত্রের ব্যবসায় শুরু হয়, তখন থেকেই প্রতি ফটো প্রতিষ্ঠান তাঁদের তোলা ফটোর পিছনে তাঁদের কোম্পানীর নাম, ঠিকানা, ক্রমিক নম্বর প্রভৃতি ছাপাবার রেওয়াজ চালু করেন। ব্যবসার প্রসার, প্রচার ও নানা প্রকারের সুবিধার জন্যই তাঁরা এই পন্থা অবলম্বন করেন। ভারতবর্ষের পেশাদার ফটো ব্যবসায়ীরাও বহু বছর ধরে ইউরোপের প্রচলিত ঐ নিয়মেই তাঁদের ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রত্যেক সুখ্যাতি-সম্পন্ন ব্যবসায়ীর মধ্যে ব্যবসায়-সাধুতা (Trade-integrity) থাকে এবং সেই নীতিকে ভিত্তি করে এক কোম্পানীর তোলা ফটোতে অন্য কোম্পানী সাধারণতঃ তাঁদের নামের রবার স্ট্যাম্প বা লেবেল ব্যবহার করেন না। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা ধারণা করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, সে আমলের কলকাতার সুবিখ্যাত ফটো ব্যবসায়ী 'দি বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স' কোম্পানীর প্রচলিত নিয়মমাফিক ফটোটির পিছনে তাঁদের নিজেদের তোলা ফটোতেই তাঁদের নামের রবার স্ট্যাম্প ব্যবহার করেছেন। কলকাতার সে আমলের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালী সম্প্রদায় তাঁদের প্রয়োজনে সাধারণতঃ বৌবাজারের এই সুবিখ্যাত ফটো প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই ফটো তোলাতেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্তরা এই কোম্পানীরই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মনোমোহনের বাড়ি থেকে সুরেন্দ্র মিত্র ঠাকুরকে এই ফটো কোম্পানীর স্টুডিওতেই নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়েও দেখা যাবে যে, ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পরে ঐ 'দি বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স' কোম্পানীকেই বৌবাজার থেকে সুদূর কাশীপুরে আনিয়ে দুখানা গ্রূপ ফটো তোলা হয়। যদিও রবার স্ট্যাম্প ছাড়া এই ফটোটির গ্রহীতার আর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে উপরি-উক্ত ঘটনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত

---

৬ বেদান্ত কেশরী, জানুআরি ১৯৭৭, পৃঃ ২৬৭

৭ অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় বর্তমানে ঐ নম্বরের কোন বাড়ির অস্তিত্ব নেই। সম্ভবতঃ কলকাতা পৌর-সংস্থা নানাকালে রাস্তার উন্নতি ও প্রশস্ত করার সময় এবং নূতন নম্বরে বাড়িগুলিকে চিহ্নিত করায় ঐ নম্বরটি বিলুপ্ত হয়েছে।

৮ বেদান্ত কেশরী, জানুআরি ১৯৭৭, পৃঃ ২৬৭

হওয়া যায় যে, পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের এই ফটোটি তোলার সৌভাগ্য হয়েছিল 'দি বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স' কোম্পানীর।

কথামৃতকার যেহেতু স্বীকার করেছেন যে, কমলকুটীরে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলে ব্রাহ্ম ভক্ত সঙ্গে তাঁর ফটো লওয়া হয়, সেইহেতু এটা ঠিক যে, কেশবচন্দ্র তাঁর বাড়িতেই ফটোগ্রাফারকে আনিয়েছিলেন। ঐ ফটো-সংস্থার কোন সন্ধান না পাওয়ায় (বহু বছর আগেই এই কোম্পানী উঠে গেছে) এই ফটোর ক'খানা কপি হয়েছিল তার সঠিক হিসাব মেলে না। তবে অন্ততঃ চারটি প্রতিলিপি যে করা হয়েছিল তার প্রমাণ বিদ্যমান। একটি আদি প্রতিলিপি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বেদান্ত সোসাইটিতে ঠাকুরের পূজার বেদীতে স্থাপিত আছে, দ্বিতীয়টি কেশব সেনের বাড়ি 'লিলি কটেজে' টাঙ্গানো ছিল, তৃতীয় কপি গাজীপুরের পওহারী বাবার গুহায় টাঙ্গানো ছিল (কেশবচন্দ্র কোন এক সময় পওহারী বাবাকে এই কপিটি দিয়েছিলেন[৯]) এবং চতুর্থটি সম্পর্কে সঠিক জানা যায় না। কথামৃতকারের শনিবার ১০ ডিসেম্বর ১৮৮১ তারিখের বিবরণ থেকে জানা যায়[১০]—

"কেশব, রাজেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিচিত্র টাঙ্গানো ছিল।

"রাজেন্দ্র (কেশবের প্রতি) — পরমহংস মহাশয়কে অনেকে বলে চৈতন্যের অবতার।

"কেশব (সমাধিচিত্র দেখাইয়া) — এরূপ সমাধি দেখা যায় না। ', মহম্মদ, চৈতন্য এঁদের হত।"

মাস্টারমশায়ের উপরি-উক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, ঠাকুরের এই সমাধিস্থ ফটোটি (১নং চিত্র) কেশবচন্দ্র সেনের বাড়িতে টাঙ্গানো ছিল এবং সেখানেই উপরি-উক্ত কথোপকথন হয়েছিল। মাস্টারমশাই ২৭ অক্টোবর ১৮৮২ তারিখে এ সম্পর্কে আবার লিপিবদ্ধ করেছেন[১১]—

"ঠাকুরের ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হইতেছে। গাজীপুরের নীলমাধববাবু ও একজন ব্রাহ্ম ভক্ত পওহারী বাবার কথা পাড়িলেন।

"একজন ব্রাহ্ম ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)— মহাশয়, এঁরা সব পওহারী বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজীপুরে থাকেন। আপনার মতো আর একজন।

"ঠাকুর এখনও কথা কহিতে পারিতেছেন না। ঈষৎ হাস্য করিলেন।

"ব্রাহ্ম ভক্ত (ঠাকুরের প্রতি)—মহাশয়, পওহারী বাবা নিজের ঘরে আপনার ফটোগ্রাফ রেখে দিয়েছেন।

"ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজের [দেহের] দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—'খোলটা !'"

শ্রীম-র উপরি-উক্ত বিবরণ ছাড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বর্তমান সহ-অধ্যক্ষ স্বামী গম্ভীরানন্দজীও এই ফটো প্রসঙ্গে তাঁর এক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন[১২]—"বাবাজীর গুহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ফটো ছিল আর তিনি বলিয়াছিলেন— 'ইনি সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার'।" বর্তমানে অদ্বৈত আশ্রমের কর্তৃপক্ষ সাধারণতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায় ও মেঝেতে বসা ব্রাহ্ম ভক্তদের বাদ দিয়ে শুধু ঠাকুরের এই ফটোটি প্রকাশ করে থাকেন।

৯ উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৬৮, পৃঃ ৪৯৮
১০ কথামৃত, (১৩৭১) ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট (ঙ), পৃঃ ২৩৭-৩৮
১১ কথামৃত, (১৩৭০) ১।২।২, পৃঃ ৪১
১২ স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত "যুগনায়ক বিবেকানন্দ", (উদ্বোধন) ১ম খণ্ড (১৩৭৩), পৃঃ ২৬৩

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় ফটো

শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় ফটোটিও "দি বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স" সংস্থা তুলেছিলেন শনিবার ১০ ডিসেম্বর ১৮৮১ তারিখের বিকেল বেলায়। এই ফটোতে দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে, বাঁ হাতখানা প্রায় প্রথম ফটোর ভঙ্গিতে। ধুতি, সাদা পাঞ্জাবীর উপর গলাবন্ধ কালো রঙের হাফ্-কোট, ধুতির কোঁচা বাঁ কাঁধের উপরে, পায়ে বার্নিশ করা ঠন্‌ঠনে চটি, মুখ খোলা, চোখ আধ-বোজা এবং উপরের দাঁত কিঞ্চিৎ দেখা যায়। একটি নকল স্তম্ভের উপর ডানহাত রাখা, মেঝেতে মাদুর পাতা ও পিছনে কালো পর্দা টাঙ্গানো। ঠাকুরের করুণাঘন চাহনি। শ্রীম ১০ ডিসেম্বর ১৮৮১ তারিখের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন[১৩]—

"...বেলা ৩টার সময় মনোমোহনের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন। সেখানে বিশ্রাম করিয়া একটু জলযোগ করিলেন। সুরেন্দ্র বলিতেছেন—আপনি কল দেখবেন বলেছিলেন—চলুন! তাঁহাকে গাড়ি করিয়া সুরেন্দ্র বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্টুডিওতে লইয়া গেলেন। ফটোগ্রাফার দেখাইলেন কিরূপে ছবি তোলা হয়। কাচের পিছনে কালি (Silver Nitrate) মাখানো হয়; তারপর ছবি উঠে।

"ঠাকুরের ছবি লওয়া হইতেছে—অমনি তিনি সমাধিস্থ হইলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের দুই পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দজী ও স্বামী অদ্ভুতানন্দজী এই ফটো তোলার সময় ঐ স্টুডিওতে উপস্থিত ছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দজী মন্তব্য করেছেন[১৪]—"শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বিতীয় ছবি তোলা হয় রাধাবাজারে (কলিকাতা) একটি ফটোগ্রাফারের দোকানে। আমি ও লাটু মহারাজ তাঁর সঙ্গে ছিলাম। সুরেশ মিত্র মহাশয় অনেক অনুরোধ ক'রে সেবার ফটো তোলার জন্য তাঁকে সম্মত করিয়েছিলেন।... থামের ওপর হাত দিয়ে দাঁড়াতেই তিনি সমাধিস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন।" স্বামী অভেদানন্দজী আর এক জায়গায়ও উল্লেখ করেছেন যে, ক্যামেরার মুখোমুখি হলেই ঠাকুরের সমাধি হত আর সেই ফাঁকেই তাঁর ফটো তোলা হত।[১৫] শ্রীম-র বর্ণনা থেকে জানা যায় স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন (১৮৮১) এই দু-নম্বর ফটো তোলা সম্পর্কে কেশব সেনকে বলেছেন[১৬]—

"শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি সহাস্যে)—আজ বেশ কলে ছবি তোলা দেখে এলুম। একটি দেখলুম যে শুধু কাচের উপর ছবি থাকে না। কাচের পিঠে একটা কালি মাখিয়ে দেয়, তবে ছবি থাকে। তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে যাচ্ছি, তাতে কিছু হয় না, আবার তৎক্ষণাৎ ভুলে যায়; যদি ভিতরে অনুরাগ ভক্তিরূপ কালি মাখানো থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়। নচেৎ শুনে আর ভুলে যায়।..." উপরি-উক্ত ঘটনা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে ঠাকুর সুরেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে স্টুডিওতে যাওয়ার কথা আগেই দিয়েছিলেন। 'কল' দেখা (ঠাকুর ক্যামেরাকে 'কল' বলতেন) ও কৌতূহল মেটানোর জন্যই বোধহয় শ্রীরামকৃষ্ণ ফটো তোলাতে রাধাবাজারের স্টুডিওতে যেতে সম্মত হন। এই দু-নম্বর ফটোটিকে সাধারণতঃ বলা হয় "স্টুডিও পোর্ট্রেট্ অব্ শ্রীরামকৃষ্ণ" বা "স্টুডিওতে শ্রীরামকৃষ্ণ"। [ক্রমশঃ]

---

১৩ কথামৃত, (১৩৭১) ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট (ঙ), পৃঃ ২৩৮

১৪ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত 'মন ও মানুষ', (রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা) ভাদ্র ১৩৬৬, পৃঃ ১৫৩-৪

১৫ ঐ, পৃঃ ১৫২ ১৬ কথামৃত, ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট (ঙ), পৃঃ ২৪১

ভক্তমিলন-তীর্থ বাগবাজার

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই পাশ্চাত্য জড়বাদের ঢেউ ভারতের বুকে বারে বারে এসে আঘাত হানতে থাকে। ভারতবর্ষে তখন ইংরেজদের রাজত্ব। কলকাতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্য। তদানীন্তনকালে কলকাতা শিক্ষা-দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে ও পাশ্চাত্যানুকরণে ভারতে অগ্রদূত। ইংরেজরা রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারেও এগিয়ে যাচ্ছিল জোর কদমে। ভারতবাসীদের মধ্যে ক্রমে নিজেদের ধর্মের প্রতি একটা বিরূপভাব ও অনাস্থাসূচক মত পোষণের প্রবণতা দেখা দেয়। দলে দলে লোক খ্রীষ্টধর্মকে সাদরে বরণ করতে থাকে। পক্ষান্তরে ভারতের সনাতন ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্যও স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন দিকে ছোট-বড় অনেক ধর্ম আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল সেই সময়ে। কলকাতা ও তার আশপাশে নানান হরিসভা ও ব্রাহ্ম সমাজের, উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্বামী দয়ানন্দ-প্রবর্তিত আর সমাজের, কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ও রাধাস্বামী মতের, গুজরাতে নারায়ণ স্বামী মতের —এরূপ নানাস্থানে নানা ধর্মমতের আলোড়ন ছোট-বড় আকারে গড়ে উঠছিল। আবার হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের শাখা-প্রশাখার মধ্যে পরস্পর রেষারেষি, হানাহানি তো লেগেই ছিল। ঠিক সেই সময়ে ভোগপূর্ণ জড়বাদসর্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার পীঠভূমি কলকাতার উপকণ্ঠে পুণ্যতোয়া ভাগিরথী তীরে দক্ষিণেশ্বরে এমন একটি নব জাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল, যা মানুষের সকল সংশয় সমাধান করে দিয়ে প্রাণে আনয়ন করতে পেরেছিল অনাবিল শান্তি। ঐ নব চেতনা সকল ধর্মমতের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছিল। জগতের কাছে এক নূতন দিগন্ত খুলে গেল। জগদ্বাসী এক নবীন আশার আলো দেখতে পেল। সেই ভাবান্দোলন ছিল 'ভগবৎ প্রেরণা-প্রসূত' আন্দোলনের স্রষ্টা স্বয়ং ভগবান্,—শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে। শ্রীভগবানের এই ধরাধামে অবতরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, "...তখন আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগ যুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"[১]

দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে দীর্ঘ বার বৎসর কাল নিরন্তর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্তরের ব্যাকুলতা সহায়ে মা জগদম্বার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করেছিলেন তিনি। সিদ্ধিলাভ করেছিলেন গোকুল ব্রত থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশে প্রচলিত চৌষট্টি প্রধান তন্ত্র ও বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত মধুর ভাব সাধনায়। পরিচিত হয়েছিলেন বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সখ্যভাবের, কর্তাভজা ও নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণবমতের অবান্তর সম্প্রদায়-গুলির সাধনমার্গের সঙ্গেও। আচার্য তোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস-দীক্ষা নিয়ে তিনি বেদান্তমতের সর্বোচ্চ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছিলেন। এমন

১ স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, (১৩৮০), গুরুভাব-পূর্বার্ধ, পৃঃ [৭]।

কি, ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা হজরত মহম্মদকে 'এক দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট সুগম্ভীর, জ্যোতির্ময় পুরুষ-প্রবর' রূপে এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রচারক ভগবান্ যীশুকে 'এক অদৃষ্টপূর্ব দেবমানব, সুন্দর গৌরবর্ণ' রূপে তাঁর দর্শন হয়েছিল। এইরূপে সর্বসাধনে সিদ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কতকগুলি অসাধারণ উপলব্ধি হয়েছিল। এই উপলব্ধিগুলির মধ্যে একটি ছিল—"শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষভাবে অধিকারী নব সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রবর্তিত করিতে হইবে।··· শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার নিকট ধর্ম লাভ করিতে অনেক ভক্ত আসিবে।"[২] 'দিব্য ভাবারূঢ়' শ্রীরামকৃষ্ণের সকল কাজ ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হলেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গকার এরই মধ্যে সাতটি প্রধান পর্যায় দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, 'আর্যধর্ম' প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, কালনার সিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক ভগবানদাস বাবাজী, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতিদের কাছে। তিনি তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি সহায়ে এঁদেরও জীবন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এছাড়া, ষড়্‌দর্শনে সুপণ্ডিত রাজপুতনার নারায়ণ শাস্ত্রী, বাঁকুড়ার ইঁদেশের তান্ত্রিক সাধক গৌরী পণ্ডিত, বর্ধমান রাজসভার সভাপণ্ডিত বৈদান্তিক পদ্মলোচন, ভক্ত-সাধক বৈষ্ণব সমাজের নেতা বৈষ্ণবচরণ, পণ্ডিত জয়নারায়ণ প্রভৃতি দক্ষিণেশ্বরে আগত সকল সম্প্রদায়ের পণ্ডিত-সাধকদের 'ধর্মালোক-প্রদানে' শ্রীরামকৃষ্ণ পরিতৃপ্ত করেছিলেন। উপরন্তু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বিখ্যাত সমসাময়িক মনীষীদের সঙ্গে তিনি স্বয়ং দেখা করতে গিয়েছিলেন, না হয়তো তাঁরা এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। পূর্বে উল্লিখিত সাতটি প্রধান পর্যায়ের শেষ দুটিতে—৬ষ্ঠ ও ৭ম বিভাগেতে—লীলাপ্রসঙ্গকার উল্লেখ করেছেন, "কলিকাতা নিবাসী নিজ ভক্তগণের বাটীতে পুনঃ পুনঃ আগমনপূর্বক ধর্মালাপ ও কীর্তনাদি-সহায়ে তাহাদিগের পরিবারবর্গের এবং পল্লীবাসিগণের জীবনে ধর্মভাব বিশেষভাবে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন।" আর "অপূর্ব প্রেমবন্ধনে নিজ ভক্তগণকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে এমন এক অদ্ভুত একপ্রাণতা আনয়ন করিয়াছিলেন যে, উহার ফলে তাহারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া ক্রমে এক উদার ধর্মসঙ্ঘে স্বভাবতঃ পরিণত হইয়াছিল।"[৩] এই কার্য সাধনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ছুটে গেছেন সিমলার রামচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্র মিত্র (সুরেন), বেনিয়াটোলার অধর সেন, শ্যামপুকুরের কালিপদ ঘোষ, কোন্নগরের মনোমোহন মিত্র, বাগবাজারের বলরাম বসু, গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তদের বাড়ীতে। গৃহকর্তাদের বলে দিতেন নরেন, রাখাল, নারাণ, পূর্ণ প্রভৃতি বালক ও অন্যান্য ভক্তদের নিমন্ত্রণ করার জন্য। তাঁদের নিয়ে তিনি লীলা খেলা করেছেন। 'অপূর্ব প্রেমবন্ধনে নিজ ভক্তগণকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ' করে 'এক-প্রাণতা আনয়নের জন্য' এত সব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে লীলাপ্রসঙ্গকার উল্লেখ করেছেন, "ঠাকুর কলিকাতায় কাহারও বাটীতে আগমন করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কথা তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে জানাজানি হইয়া যাইত।

২ লীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, পৃঃ ৩৮০
৩ লীলাপ্রসঙ্গ, (১৩৮০), দিব্যভাব, পৃঃ ৭

কতকগুলি লোক যে ঐ কার্যের বিশেষভাবে ভার লইয়া ঐ কথা সকলকে জানাইয়া আসিতেন তাহা নহে। কিন্তু ভক্তদিগের প্রাণ ঠাকুরকে সর্বদা দর্শন করিবার জন্য এতই উন্মুখ হইয়া থাকিত এবং কার্যগতিকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে না পারিলে পরস্পরের বাটীতে সর্বদা গমনাগমন করিয়া তাঁহার কথাবার্তায় এত আনন্দানুভব করিত যে, তাহাদের ভিতর একজন কোনরূপে ঠাকুরের আগমন সংবাদ জানিতে পারিলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা অনেকের ভিতর বিনা চেষ্টায় মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িত। ঠাকুরের শক্তিতে ভক্তগণ পরস্পরে কি যে এক অনির্বচনীয় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝান দুষ্কর। কলিকাতায় বাগবাজার, সিমলা ও আহিরীটোলা পল্লীতেই ঠাকুরের অনেক ভক্তেরা বাস করিতেন, তজ্জন্য ঐ তিন স্থানেই ঠাকুরের আগমন অধিকাংশ সময়ে হইত। তন্মধ্যে আবার বাগবাজারেই তাঁহার অধিক পরিমাণে আগমন হইত।"[৪]

ভাবতে অবাক লাগে, বাগবাজারের পথে পথে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণ-রজ ওতপ্রোতভাবে ছড়িয়ে আছে। এখানকার পথ নরদেহধারী শ্রীভগবানের পদচিহ্নে পবিত্রীকৃত, শকটচক্রের ঘর্ঘরে ধূলি ধূসরিত এবং ভক্তলীলায় লীলায়িত। বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। তাছাড়া, শ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-শিষ্যগণের চরণধূলিতে রঞ্জিত এই বাগবাজার অঞ্চল।

[ক্রমশঃ]

৪ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, পৃঃ ৭০

'শঙ্করের মত, গৌরাঙ্গের পথ'

ডক্টর রমা চৌধুরী

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ধর্ম-দর্শন-নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাণের কথা : সমন্বয়। এই উপলক্ষে একটি প্রবাদবাক্যতুল্য বাণী আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে—সেটি হল এই :

"শঙ্করের মত, গৌরাঙ্গের পথ।"

অতি সংক্ষেপে এর অর্থ হল :

শঙ্করের মস্তিষ্ক এবং গৌরাঙ্গ বা শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ের একটি সুষ্ঠু সুন্দর সমন্বয়। অর্থাৎ শঙ্করের জ্ঞানবাদ এবং শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদের একীকরণ —যে ভক্তিবাদের মধ্যে নিষ্কাম কর্মবাদও নিহিত হয়ে রয়েছে অঙ্গাঙ্গিভাবে। সুতরাং জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের একটি সুসমন্বিত সুসমঞ্জস মিলিত সাধনই মুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

বর্তমান যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষের এই মহান্ আদর্শের একটি রমণীয় রসঘন রোমাঞ্চকর রূপ দেখে আমরা ধন্যাতিধন্য হয়েছি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁর প্রাণপ্রতিম মন্ত্রশিষ্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের দিব্যজীবনের মধ্যে।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং একস্থানে তাঁর জীবন-স্বরূপ শ্রীগুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আবেগভরে বলছেন :

"The one (Shankara) had a great head, the other a large heart, and the time was ripe for one to be born, the embodiment of both this head and heart ; the time was ripe for one to be

born, who in one body would have the brilliant intellect of Shankara and the wonderfully expansive, infinite heart of Chaitanya ; one who would see in every sect the same spirit working, the same God ; one who would see God in every being, one, whose heart would weep for the poor, for the weak, for the outcast, for the downtrodden, for every one in this world, inside India or outside India ; and at the same time, whose grand brilliant intellect would conceive of such noble thoughts as would harmonise all conflicting sects, not only in India but outside of India, and bring a marvellous harmony, the universal religion of head and heart into existence." (C. W. III, p. 267, Mayavati Edition.)

অর্থাৎ "একজনের, অর্থাৎ শঙ্করের ছিল মহৎ মস্তিষ্ক ; অন্যজনের, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের বৃহৎ হৃদয় ; এবং সময় হয়েছিল এমন একজনের জন্মগ্রহণ করার যিনি এরূপ মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের একটি প্রত্যক্ষ সমন্বয় ও সময় হয়েছিল এমন একজনের জন্মগ্রহণ করার যিনি প্রত্যেক ধর্মে সেই একই আত্মার লীলাখেলা দর্শন করবেন ; সেই একই আত্মার সেই একই পরমেশ্বরের ক্রিয়াকলাপ ; যিনি প্রত্যেক জনের মধ্যেই সেই একই পরমেশ্বরকে দর্শন করবেন ; যাঁর হৃদয় অশ্রুবর্ষণ করবে দরিদ্রদের জন্য, দুর্বলদের জন্য ; পতিতদের জন্য, পদদলিতদের জন্য, ভারতের ভেতরে এবং ভারতের বাইরের প্রত্যেকের জন্য ; অথচ একই সঙ্গে, যাঁর মহতী, দীপ্যমানা প্রজ্ঞা এরূপ উদার-উন্নত চিন্তা করবে যা সকল বিরুদ্ধ সম্প্রদায়কে সমন্বিত করবে—কেবল ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও—এবং আনয়ন করবে একটি অত্যাশ্চর্য সমন্বয়—মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের সমন্বয়রূপী এক বিশ্বজনীন 'ধর্ম'।"

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা এই বিশেষ অর্থেই 'অদ্বৈতবাদী' বলি—অর্থাৎ মস্তিষ্কের জ্ঞান, হৃদয়ের প্রেম এবং তারই ফলস্বরূপ সেবার একটি অপূর্ব মনোরম সমন্বয়মূলক অদ্বৈতবাদ। শঙ্করাদির সাধারণ অদ্বৈতবেদান্তে, প্রেম ও সেবার কোন সত্য-শাশ্বত স্থান নেই—যেহেতু এগুলি সবই কেবল ব্যাবহারিক স্তরগতই মাত্র—পারমার্থিক নয়। বস্তুতঃ শঙ্করাদির অদ্বৈতবাদের একমাত্র সত্য, একমাত্র তত্ত্ব, একমাত্র তথ্য হল একত্ব—সংসারে কেবলমাত্র সেই একই আছেন, অন্য কোন কিছুই নেই, একেবারেই নেই, কোনক্রমেই নেই—জীব নেই, জগৎ নেই, আছেন কেবল সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৬।২।১) সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। অতএব যাতে দ্বিত্বের আভাস বা কণামাত্র আছে—তা কেবল ব্যাবহারিক বা সাংসারিক দিক থেকেই তথাকথিত 'সত্য', আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক দিক কদাপি নয়। কিন্তু প্রেম বা প্রীতি, এবং সেবা বা ত্যাগ ওতপ্রোতভাবে দ্বিত্বমূলক। কারণ প্রেমের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অন্ততঃ দুজনের—প্রীতিকারক এবং প্রীতিপাত্র। একইভাবে সেবা বা পূজার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এস্থলেও দ্বিত্ব আছে সেবক ও সেব্য, পূজক ও পূজ্যের মধ্যে। তাহলে যতই মহতী বৃহতী হোক না কেন—প্রীতি ও সেবাও কেবলমাত্র ব্যাবহারিক স্তর থেকেই মূল্যধারিণী—পারমার্থিক স্তর থেকে কণামাত্রও নয়।

কিন্তু আজন্ম সমন্বয়বাদী শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর, প্রীতি, সেবা প্রমুখকে কেবলমাত্র ব্যাবহারিক

স্বরগত বলে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর এবং স্বামীজীর মতে ঈশ্বর, ভক্তি, প্রীতি, সেবা, পূজাদি সাধারণ অর্থে দ্বৈতমূলক—ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ভেদ, ভগবান্ ও ভক্তের মধ্যে ভেদ, প্রীতিকারক ও প্রীতিপাত্রের মধ্যে ভেদ, সেবক ও সেব্যের মধ্যে ভেদ, পূজক ও পূজ্যের মধ্যে ভেদ প্রভৃতির দ্যোতক, নিঃসন্দেহে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, 'জ্ঞানে'র ন্যায় 'প্রেম'ও অদ্বৈতমূলক। শুনুন স্বামীজীর উদাত্ত ঘোষণা :

"We all have to begin as dualists in the religion of love. God is to us a separate Being, and we feel ourselves to be separate beings also. ··· We all begin with love for ourselves, and the unfair claims of the little self make even love selfish. At last, however, comes the full blaze of light, in which this little self is seen to have become one with the Infinite. Man himself is transfigured in the presence of this Light of Love, and he realises at last the beautiful and inspiring truth that Love, the Lover and the Beloved are One". (C. W. III., p. 100)

অর্থাৎ "প্রেমের ধর্মে, আমাদের আরম্ভ করতে হয় দ্বৈতবাদী রূপে। তখন আমাদের নিকট ঈশ্বর একজন স্বতন্ত্র পুরুষ বলে প্রতিভাত হন; আমাদের নিজেদেরও মনে হয় একইভাবে স্বতন্ত্র। আমরা সকলেই আরম্ভ করি আমাদের নিজেদেরই প্রতি প্রেম নিয়ে; এবং আমাদের ক্ষুদ্র 'আমিত্বে'র অযৌক্তিক দাবী-দাওয়া প্রেমকেও করে তোলে স্বার্থপর। যা হোক, পরিশেষে, আসে পরিপূর্ণ আলোকচ্ছটা, যাতে সেই ক্ষুদ্র 'আমিত্ব'কে দেখা যায় অনন্তের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে। মানব নিজেই রূপান্তরিত বা মহিমান্বিত হয়ে ওঠেন এই প্রেমের আলোকে; এবং পরিশেষে তিনি এই মনোরম এবং অনুপ্রেরণাদায়ক সত্য উপলব্ধি করেন যে—প্রেম, প্রেমিক এবং প্রেমপাত্র সকলেই এক ও অভিন্ন।"

স্মরণ করুন সশ্রদ্ধচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সেই অমৃতবাণী :

"সত্য বলছি, তোমরা সংসার করছ এতে দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম কর, আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে থাকো। কর্ম শেষ হলে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।"

(কথামৃত, ১।২।৫)

"তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়! তা না হ'লে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।" (ঐ, ১।১।৫)

"জল আর বরফ—নিরাকার আর সাকার। যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়—জ্ঞানের গরমীতে বরফ জল হয়; ভক্তির হিমে জল বরফ হয়।"

এরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীসারদামণি দেবী এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদ একটি বিশেষ ধরনের, একটি অত্যাশ্চর্য, একটি অতুলনীয়, একটি অভিনব অদ্বৈতবাদ—যেহেতু এই অদ্বৈতবাদ দ্বৈতকে ব্যাবহারিক বলে, নিম্নস্তরীয় বলে, মায়া—মিথ্যা বলে দূরে সরিয়ে দেয়নি, ত্যাগ করেনি, অস্বীকার করেনি। বরং দ্বৈতকেও সমান আদরে, সমান সম্মানে, সমান মহিমায় গ্রহণ করেও নিজের অদ্বৈতত্ব অটুট রেখেছে। সেজন্য এই শাঙ্করীয় অদ্বৈতবাদের মধ্যে রয়েছে রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও সগৌরবে; ব্রহ্মের সঙ্গে রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড; শিবের সঙ্গে জীব; পরমাত্মার সঙ্গে আত্মা; জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি ও এবং নিষ্কাম কর্ম ও সেবা সমান সৌন্দর্যে

মাধুর্যে ও ঐশ্বর্যে। আরো রয়েছে—গীতার পাশে ফুটবল ; ব্রাহ্মণ-তেজের পাশে ক্ষত্রিয়-বীর্য ; ধর্মের পাশে অন্ন ; আত্মিক বা পারমার্থিক উন্নতির পাশে পার্থিব বা ব্যাবহারিক প্রগতি ; সত্ত্বগুণের পাশে রজোগুণ ; তত্ত্বের বা থিয়োরির পাশে ব্যবহার বা প্র্যাকটিস প্রভৃতি।

স্বামী বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে অম্বুদনিনাদে এই অপরূপ সমন্বয়ের অমৃতবাণীই তো প্রচার করেছেন আজীবন—যার সুগম্ভীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কোনদিনও স্তব্ধ হয়ে যাবে না বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ-বাতাস থেকে :

"First of all, our young men must be strong. Religion will come afterwards. Be strong, my young friends ; that is my advice to you. You will be nearer to Heaven through football than through the study of the Gita"

(C. W. III., p. 242)

"সর্বপ্রথমে আমাদের তরুণ জনদের শক্তিমান হতেই হবে। ধর্ম আসবে তার পরে। শক্তিশালী হও, হে আমার তরুণ বন্ধুরা, এই হল তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। তোমরা গীতাপাঠের অপেক্ষা ফুটবলের মাধ্যমেই ঈশ্বরের অধিকতর নিকটবর্তী হবে।"

"What I want is muscles of iron and nerves of steel, inside which dwells a mind of the same material as that of which the thunderbolt is made. Strength, manhood, Ksatra-Virya plus Brahma-Teja." (C. W. V., p. 117)

"আমি চাই লোহার পেশী এবং ইস্পাতের স্নায়ু—যাদের মধ্যে থাকবে বজ্রের উপাদানে গঠিত মন। শক্তি, মনুষ্যত্ব, ক্ষত্রিয়-বীর্য সহযোগে ব্রাহ্মণ-তেজ।"

"What we want is an immense awakening of Rajasika energy, for the whole country is wrapped up in the shroud of Tamas." (C. W. V., p. 403)

"আমরা চাই রজোশক্তির প্রভূত জাগরণ, যেহেতু সমগ্র দেশই এখন তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে।"

"First bread and then religion."

(C. W. III., p. 432)

"আগে রুটি (অন্ন) ; পরে ধর্ম।"

"Bread ! Bread ! I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven.

(C. W. IV., p. 368)

"রুটি ! রুটি ! আমি এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না যে, যে ঈশ্বর আমাকে এখানে রুটি দিতে পারছেন না, তিনিই হঠাৎ স্বর্গে আমাকে শাশ্বত আনন্দ দিতে পারবেন।"

"I am only the figurehead. I am only a Tyagi monk. I only want one thing. I do not believe in a God or religion which cannot wipe the widow's tears, or bring a piece of bread to the orphan's mouth." (C. W. V., p. 50)

"আমি কেবল একজন প্রতীকই মাত্র ; কেবল একজন ত্যাগী সন্ন্যাসীই মাত্র। আমি কেবল একটি মাত্র জিনিসই চাই, আমি এরূপ ঈশ্বর বা ধর্মে বিশ্বাস করি না, যিনি বা যা বিধবার অশ্রুজল মোছাতে, অথবা অনাথের মুখে এক টুকরো রুটি তুলে দিতে পারে না।"

আজন্ম সন্ন্যাসীর মুখে এ কি অত্যাশ্চর্য বাণী !

প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্তের প্রভাব

ডক্টর সীতানাথ গোস্বামী

[পূর্বানুবৃত্তি]

তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি লক্ষ্য করেন যে, ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট এবং তাহা বহির্মুখী হওয়ায় তাহার দ্বারা আত্মদর্শনের কোন সম্ভাবনা নাই। তীব্র বিষয়রাগবশতঃ যখন ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়, তখন মনও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ে আসক্ত হয়। স্বভাবতঃ আন্তর পদার্থ মন স্বয়ং বাহ্য-বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে না পারিলেও ("পরতন্ত্রং বহির্মনঃ") ইন্দ্রিয়দ্বারা যখন বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে তখন বুদ্ধি ব্যতীত আর কিসের ভরসা? বুদ্ধিও যদি আত্মপদার্থ ও অনাত্মপদার্থের মধ্যে বাহ্য অনাত্মপদার্থ অর্থাৎ বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় এবং শুভাশুভ নির্ণয়ে বিফল হয় তবে আর তত্ত্বদর্শনের কোনও আশা থাকে না। অধিকাংশ মানুষের এই দশাই হইয়া থাকে, যেহেতু বুদ্ধি স্বচ্ছ থাকে না এবং মলিনবুদ্ধিতে অশুভের প্রতিই তীব্র আকর্ষণ অনুভূত হয়। আত্মচিন্তা বা আত্ম-ভাবনাতে বুদ্ধি নিরত থাকিলেও বহু বাধাবিপত্তির জন্য আত্মদর্শন বহুক্ষেত্রে সম্ভব হয় না; আর যদি বুদ্ধি তাহার বিবেকশক্তি প্রয়োগ না করে এবং আত্মদর্শনে প্রবৃত্তই না হয় তবে তো সাক্ষাৎকার-রূপ সিদ্ধির কোনও সম্ভাবনাই নাই। গীতাতে (৭।৩) রহিয়াছে—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির এই বিষয়াভিমুখতা দুঃখের ও বন্ধনের কারণ এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং শ্রেয়োর্থী দুইটি পথ অবলম্বন করিতে পারেন— প্রথমটি, বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে প্রতিনিবৃত্ত করা। তাহাতে আর ইন্দ্রিয়ের সহায়তার অভাবে মন বিষয়ে যাইতে পারিবে না এবং ফলস্বরূপ বুদ্ধিও বাহ্যবিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে, তখন বুদ্ধি অনায়াসে আত্মভাবনা করিতে পারিবে। ইহা একটি পথ সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাতে বিপদ্‌ও আছে। বাঁধ ভাঙিলে রুদ্ধ জলরাশি যেমন প্রবলবেগে ধাবিত হয় সেইরূপ রুদ্ধ ইন্দ্রিয় কোনও সময়ে অসাবধানতাবশতঃ বা অনুকূল পরিবেশে বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়ের বিকার ও প্রচণ্ড আসক্তির সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরও স্খলন হইতে দেখা যায়। অবশ্য ইতিমধ্যে মন সংযত হইয়া গেলে এরূপ সম্ভাবনা থাকে না। অনাদিকালের বিষয়রাগ অতিক্রান্ত চলিয়া যাইবার আশা করা কিঞ্চিৎ অসঙ্গত মনে হয়, যদিও তীব্র চেষ্টা থাকিলে তাহাও সম্ভব হইতে পারে। এই ব্যাপারে পূর্বজন্মের শুভকর্ম, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি, বহুসময়ে সহায়ক হয়। ইহা ছাড়া এই পন্থায় অন্য বিপদ্‌ও আছে। আমরা জানি যে মন অত্যন্ত চঞ্চল, ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিতে পারিলেও মন যে দুর্নিগ্রহ ইহা গীতাতেও অর্জুনের সমস্যারূপে উল্লিখিত হইয়াছে এবং স্বয়ং কৃষ্ণও তাহা নির্দ্বিধায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন (গীতা, ৬।৩৪, ৩৫)। এই চঞ্চল মন তো আর স্থির থাকিবে না, তাহাকে বিভিন্ন বিষয়ে ধাবিত হইতেই হইবে, যেহেতু ইহা তাহার স্বভাব। এইজন্য মন ইন্দ্রিয়দ্বারকে অবলম্বন করিয়া বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইতে না পারিলে বিষয়রতিবশতঃ বিষয়ের স্মরণ করিতে থাকিবে। ইহা প্রচণ্ড বিপদের কারণ, যেহেতু ভোগের দ্বারা বিষয়াকর্ষণ কখনও ক্ষীণ হইবে, কিন্তু স্মরণ ও চিন্তনের দ্বারা বিষয়রতি কখনও

ক্ষীণ হইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য বিষয়-ভোগাসক্ত "বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ"। এই কপট সাধু বিষয়ভোগজন্য তৃপ্তি লাভ করে না। এবং কামনার অগ্নি ক্রমশই প্রজ্বলিত হইয়া তাহার সকল সাধুপ্রয়াসকেও বিঘ্নিত করে। গীতায় (৩।৬) এই শ্রেণীর ব্যক্তির অত্যন্ত নিন্দা করিয়া 'মিথ্যাচার' বলা হইয়াছে—

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

এতাদৃশ ব্যক্তি বিষয়চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় তাহার অন্য উচ্চবিষয়ে চিন্তা করার শক্তিও হ্রাস পায়, ফলে তাহার অন্তঃকরণ ক্রমশঃ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিমূঢ় হইয়া যায় (বিমূঢ়াত্মা)।

এখন শ্রেয়োর্থীর অবলম্বনীয় দ্বিতীয় পথটির আলোচনা করা যায়। তাহা হইল—অনবরত আত্মভাবনা করা। বুদ্ধিদ্বারা যদি ইহা নিশ্চিত করা যায় যে, আত্মাকেই চিন্তা করিতে হইবে, যেহেতু একমাত্র আত্মাই নিত্য পদার্থ এবং যদি ইহাও স্থির করা যায় যে, জড় বিষয়াদির ভাবনা না করিয়া চৈতন্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মাকেই চিন্তা করিয়া সর্ববিধ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে তবে তাহাতেও আকৃষ্ট হওয়া অনায়াসেই সম্ভব। আত্মভাবনার দ্বারা যেরূপ পরমকল্যাণ মোক্ষলাভ সম্ভব সেইরূপ যে-কোনও জাগতিক সুখ, যশ, অভিবৃদ্ধিও সম্ভব, ইহা স্বয়ং শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।" (কে. উ. ২।৫) এই তত্ত্ব জানিলে সর্ববিধ প্রার্থনীয় বস্তুর সত্যতা বা সদ্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব ঘটে আর না জানিলে মহাবিনাশ হয়। এখনই যাহাতে অধ্যেতার প্রবৃত্তি হয় তজ্জন্য শ্রুতি না জানার ফল যে মহাবিনাশ তাহা বলিয়াছেন। অন্যত্রও আছে—"যাহা শুনিলে সকল অশ্রুত বিষয় শোনা হইয়া যায়, না-জানা বিষয় জানা হইয়া যায় এবং না-বুঝা বিষয় বুঝা হইয়া যায়" (ছা. উ. ৬।১।৩)। সুতরাং একবিজ্ঞানের দ্বারা সর্ববিজ্ঞান-রূপ একটি লোভনীয় ফলের উল্লেখ থাকায় বুদ্ধির পক্ষে আত্মভাবনার প্রতি উন্মুখ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

এখানে বিশেষভাবে বুঝা আবশ্যক যে, বুদ্ধি আত্মাতে দৃঢ়সংবদ্ধ থাকিলে মনও ক্রমশঃ তাহার চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থিরবস্তু আত্মার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। মন যদি অনন্ত আনন্দস্বরূপ আত্মাতে চেষ্টা দ্বারা কিছুকাল স্থিত হয় তবে আত্মানন্দেই অনুরক্ত হইয়া পড়িবে এবং ক্রমে মনও আর বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে সহজে প্রবৃত্ত হইবে না, প্রবৃত্ত হইলেও ক্রমশঃ বিষয়কে বিরস বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিবে। এখন হইতেই বিপরীত যাত্রা বা প্রতিস্রোতঃ প্রবর্তনের আরম্ভ। ইন্দ্রিয়ের বিষয়রাগ মনের দ্বারাই পরিপক্বতা লাভ করে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় স্বভাবতই বিষয়ভোগে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, ইহা তো প্রাত্যহিক অনুভব। তৎসত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের বিষয়রাগ প্রবল হয় এইজন্য যে, ইন্দ্রিয়ের শ্রান্তিকালে মনই বিষয়রাগকে ধরিয়া রাখে। এখন মনই বিষয়রতি অনুভব না করায় উপরন্তু বুদ্ধিসংসর্গে আত্মাভিমুখ হওয়ায় ইন্দ্রিয়ও আত্মাভিমুখ হইয়া পড়িবে। যতক্ষণ ভোক্তা পুরুষ ইন্দ্রিয়াদি ভোগ্যের প্রতি আকৃষ্ট থাকে ততক্ষণই ভোগ্য বিষয়ের মর্যাদা ও সমাদর। যখন ইন্দ্রিয়ই বিমুখ হইয়া পড়িল তখন বিষয় সর্বদা ব্যর্থ। যে-বিষয় একদিন ইন্দ্রিয়ের সুখ উৎপাদন করিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছিল সেই বিষয়ই এখন বুদ্ধির নির্দেশে আত্মভাবনার অন্যতম অনুকূল সাধনরূপে ব্যবহৃত হইয়া নূতন সার্থকতা লাভ করিবে। বুদ্ধির বিবেকহীনতার জন্য একদিন বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় সকলেই স্থির পদার্থ আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, আর আজ বুদ্ধির সুবিবেকের ফলে সকলেই বিপরীতযাত্রায় আত্মাভিমুখ হইয়া চরম সার্থকতা

লাভ করিল। এই প্রতিস্রোতঃ প্রবর্তন, 'বিপরীতযাত্রা', 'উজান বেয়ে যাওয়া' প্রতিটি মানুষের প্রতিদিনের অভ্যসনীয় তত্ত্ব। ইহাতে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সকলে সুস্থ থাকে; জীবনের প্রতিটি কার্যে সুবিবেক আসিয়া জীবনকে মধুময় করিয়া তোলে। তখন ক্রোধ, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব চলিয়া যায়, সাময়িকভাবে কখনও বিশেষ পরিস্থিতিতে তাদৃশ বৃত্তি উৎপন্ন হইলেও তাহা মনের ভিতরে গভীর রেখাপাত করিতে পারে না, আল্‌গা ময়লার মতো সহজেই অপগত হয়। এই তত্ত্বটিকে শ্রুতি একটি সুন্দর মন্ত্রে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ (কঠ উ. ২।১।১)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধির সাহায্যে সর্বত্র আত্মভাবনা করিতে হইবে। ইহার প্রতিপাদক বহু শ্রুতি রহিয়াছে—"ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্" (ঈ. উ. ১), "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" (ছা. উ. ৬।৮।৭), "ইদং সর্বং যদয়মাত্মা" (বৃ. উ. ৪।৫।৭) ইত্যাদি। এই শ্রুতিবাক্যগুলিতে বলা হইয়াছে যে, আত্মা বা ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান, আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না, বুদ্ধির সাহায্যে আত্মভাবনার দ্বারা এই তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে হইবে। বুদ্ধি যখন সুবিবেকপূর্বক নিত্যস্থির আত্মপদার্থে সন্নদ্ধ হইবে তখন সেই বুদ্ধির প্রভাবে মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিও আত্মাভিমুখ হইতে হইতে ক্রমশঃ আত্মাতেই সংসক্ত হইয়া পড়িবে। বিষয়ও আত্মভাবনার অনুকূল হইয়া পড়িবে; যেহেতু বিষয়ের গ্রহীতা ইন্দ্রিয়, মন তো পূর্বেই আত্মাভিমুখ হইয়া পড়িয়াছে। সারকথা, বুদ্ধি তাহার সুবিবেকবশতঃ অতি দৃঢ়তা ও তীব্রতার সহিত আত্মভাবনা করার ফলে বুদ্ধি নিজে তো আত্মগত বা আত্মস্থ হইলই, তৎসহিত মন, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়কেও আত্মস্থ করিয়া দিল। এখন সকল পদার্থই আত্মস্বরূপ বা পরমেশ্বরস্বরূপ হইয়া 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্' মন্ত্রের সার্থকতা ঘটাইল। এখন বাহ্য ঘটাদি পদার্থ আত্মভূত হইয়া গিয়াছে, ইহাদের আর ঘটাদিরূপে অস্তিত্ব নাই। রূপরসাদিমৎ-স্বরূপে এখন ঘটাদির অস্তিত্ব নাই বলিয়া তাহারা পরিত্যক্তই হইয়া গেল। কোন সময়ে বুদ্ধি আত্ম-ভাবনা হইতে বিরত থাকিলে আর বিষয়েন্দ্রিয়াদি আত্মস্বরূপে অনুভূত হইবে না। এইজন্য সর্ব-সন্ন্যাসপূর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাকে সংস্থিত করিতে হইলে বুদ্ধিকে সর্বতোভাবে একাগ্র করা আবশ্যক, ইহা উচ্চাধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। বুদ্ধি কর্তৃক এইরূপ একাগ্রভাবে আত্মভাবনাই সমাধি। সমাধি অবস্থায় আত্মভিন্নের ভাবনা থাকিবে না কিন্তু অসমাহিত বা ব্যুত্থিত অবস্থায় বিষয়াদির পুনরায় অনুভব হইবে। এইজন্য যে-উচ্চাবস্থায় আর সমাধিভঙ্গের সম্ভাবনা নাই বলিয়া বিষয়জন্য সুখদুঃখেরও চিরসমাপ্তি ঘটে উহাকেই বলে জীবন্মুক্তি। ইহাই পরম আকাঙ্ক্ষিত—সকল সন্দেহের অবসান এখানেই।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, বুদ্ধিই আত্মার পরম সন্নিহিত, রথরূপকেও আমরা দেখিয়াছি যে, বুদ্ধিই সারথি। রথী সারথিকেই নিযুক্ত করেন এবং সারথিই অশ্বপ্রগ্রহাদিকে যথাযথ-ভাবে প্রবৃত্ত করিয়া রথগতিকে অভীষ্টপথে নিয়ন্ত্রিত করে। আত্মার আলোকে সর্বপ্রথম বুদ্ধিই আলোকিত হয় অর্থাৎ আত্মার সহিত বুদ্ধিরই প্রথম তাদাত্ম্য ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ চিৎ-স্বরূপ আত্মার সহিত জড় বুদ্ধির তাদাত্ম্য হইতে পারে না বলিয়াই এই তাদাত্ম্যকে বাস্তব তাদাত্ম্য বলা যায় না, ইহা আরোপিত তাদাত্ম্য বা তাদাত্ম্যাধ্যাস। বুদ্ধিতাদাত্ম্যাধ্যাস হইতেই

অপরাপর অধ্যাসের সৃষ্টি হয় যেমন আত্মা ও মনের তাদাত্ম্যধ্যাস, আত্মা ও ইন্দ্রিয়ের তাদাত্ম্যাধ্যাস, আত্মা ও শরীরের তাদাত্ম্যাধ্যাস, এমনকি আত্মা ও বিষয়ের তাদাত্ম্যাধ্যাস। আত্মা প্রকাশস্বভাব, বুদ্ধিও স্বচ্ছ এবং সত্ত্বপ্রধান বলিয়া আত্মার সহিত বুদ্ধির তাদাত্ম্যাধ্যাসের সম্ভাবনা বেশী। যাহার বুদ্ধি যত মলিন সে ততই স্থৌল্যের দিকে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়-বিষয়াদিতেও আত্মার সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস করিয়া থাকে এবং এইজন্য তাহারা 'অতিপ্রাকৃত' শব্দের দ্বারা নিন্দিতও হয়।

বুদ্ধিতাদাত্ম্যাধ্যাসেই অহংকারের উৎপত্তি। অহংকার অধ্যাসজন্য হওয়ায় তাহাকে আত্মজ্ঞান বলা যায় না। স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ এই অহংকারকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া নিতান্ত ভ্রমে পতিত হন। এই প্রসঙ্গে অধ্যাসভাষ্যের ভামতী টীকার একটি পূর্বপক্ষগ্রন্থ এবং একটি সিদ্ধান্তগ্রন্থ বিশেষভাবে মনে পড়ে। পূর্বপক্ষী বলিতেছেন—"ন হ্যহমিত্যনুভবাদন্যদাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানমস্তি।" সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"ভবেদেতদেবং যদ্যহমিত্যনুভবে আত্মতত্ত্বং প্রকাশেত, ন ত্বেতদস্তি।" ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্র অহংকারকে একটি আপাতরমণীয় কিন্তু বস্তুতঃ অন্তঃসারশূন্য পূতিকুষ্মাণ্ডের সহিত তুলনা করিয়া এই অহংজ্ঞানের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বুদ্ধি যখন লক্ষ্য করে যে, তাহার এই প্রকাশ নিজস্ব নয় তখন সে স্বপ্রকাশ আত্মার দিকেই ধাবিত হয় এবং তাহাতেই স্থিত থাকে। আর বুদ্ধি যখন ইহা লক্ষ্য করিতে পারে না, তখন সে তাহার ধার করা আলোকেই মুগ্ধ হয় এবং অহংকার করে। বুদ্ধির আলোক লইয়া আবার মন, ইন্দ্রিয়, দেহ, বিষয় আলোকিত হয় এবং তাহাদিগের মধ্যেও অহংকার সঞ্চারিত হয়। তখনই আমরা বলি—অহং সংকল্পয়ামি, বিকল্পয়ামি; অহমন্ধো বধিরঃ, অহং কৃষ্ণো গৌরঃ, ধনে নষ্টে অহং নষ্টঃ ইত্যাদি। যখন এই অহংকারের মহাধূমধামে ধার করা প্রকাশে নিজেকে প্রকাশিত দেখিয়াও লোকে মূঢ়তাবশতঃ নিজেকে দেব বা প্রকাশমান বলিয়া ভাবিতে থাকে তখন অন্তর্যামী স্বপ্রকাশ আত্মা এইরূপ আচরণে হাসিতে থাকেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত ভাবগম্ভীর কবিতাটি এখানে মনে পড়ে—

রথযাত্রা লোকারণ্য মহাধূমধাম।
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি।
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী॥

যাহা হউক, বুদ্ধিকে আত্মাভিমুখ করিয়া দীর্ঘকাল নিরন্তর সমাধিতে যাঁহারা নিমগ্ন থাকিতে পারিবেন না বা জীবন্মুক্তিও যাঁহারা অর্জন করিতে পারিবেন না তাঁহারা তো অহংকার হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। তাঁহাদিগের দুঃখ পরিত্রাণের কোনও উপায় আছে কিনা বিবেচ্য। বুদ্ধি যদি আত্মাভিমুখ হইয়া মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আত্মাভিমুখ করিতে পারে, তাহা হইলে যেমন লক্ষ্যে পৌছানো যায় বলিয়া পূর্বে রথরূপকের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে; সেইরূপ বুদ্ধি যদি তাহার ভাবনাশক্তির দ্বারা মন, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া ভাবিতে পারে, তবে দেহেন্দ্রিয়বিষয় সকলই আত্মা বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। তাহাতে শ্রুত্যুক্ত সর্বত্র আত্মদর্শনও হইল। এই কল্পে সুবিধা এই যে, সেই সেই ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার কঠিন কাজটি করিতে হইল না অথচ সর্বত্র তত্তৎরূপরসাদি বিষয়ে, ইন্দ্রিয়াদিতে আত্ম-প্রতীতি হইল। চিন্তামণি নামক মণির প্রভাবে যেরূপ চিন্তিত বস্তুমাত্রের প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সেইরূপ ভাবনা বা চিন্তা নিজেই এমন একটি মণি যাহার দ্বারা (ভাবনার দ্বারাই) সেই বস্তুর অর্থাৎ চিন্তিত বস্তুর সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে—"যাদৃশী ভাবনা যস্য

সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। এই ভাবনার মধ্যে কোনও প্রকার ফাঁকি থাকিলে চলিবে না। 'ভাবের ঘরে চুরি' চলে না। ভাবনার দ্বারা একটি কঙ্করও শঙ্করে পরিণত হন।

যদিও ঈশোপনিষদে জ্ঞাননিষ্ঠারূপ সর্বসন্ন্যাসের বিকল্পরূপে একটিমাত্র পন্থাই বলা হইয়াছে এবং তাহা হইল নিষ্কামকর্ম তথাপি যথাস্থিত সর্ববস্তুতে ব্রহ্মভাবনার কোন কল্প এই উপনিষদের অনভিপ্রেত নহে। সর্ববস্তুকে আত্মাভিমুখ করিয়া আত্মস্থ করিতে পারিলে যেরূপ পরমেশ্বর কর্তৃক সর্ববস্তু আচ্ছাদনীয় হয় (ঈশা বাস্যম্) তেমনই সকল বস্তুকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করিলেও সর্ববস্তু আত্মার দ্বারা আচ্ছাদনীয় (ঈশা বাস্যম্) হয়। তবে 'পরাঞ্চি খানি' মন্ত্র, রথরূপক প্রভৃতির বিচার করিলে প্রথম কল্পটিই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আরও কথা, এই ঈশোপনিষদের অন্যান্য মন্ত্র অবহিত চিত্তে পাঠ করিলে এই দ্বিতীয় কল্পের উপযোগিতা স্পষ্টতই স্বীকৃত বলিয়া বোধ হয়। ষষ্ঠ মন্ত্রে আছে—

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

এই মন্ত্রের প্রথমার্ধে আছে সকল ভূতকে আত্মাতে দর্শন করার কথা এবং দ্বিতীয়ার্ধে আছে সর্বভূতে আত্মাকে দেখার কথা। অর্থাৎ প্রথমার্ধে প্রথম কল্পের উল্লেখ এবং দ্বিতীয়ার্ধে দ্বিতীয় কল্পের উল্লেখ। অবশ্য সপ্তম মন্ত্রে আবার প্রথম কল্পের উল্লেখ আছে। "যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ" বলার দ্বারা সকল ভূতের আত্মত্বপ্রাপ্তি বলা হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে দ্বিতীয় কল্পেও এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যেহেতু সকল ভূতে আত্মদর্শন করিলেও সকল ভূতের আত্মত্ব ঘটিয়া থাকে।

আলোচনাটি এখন একটু কূটবিচারের দিকে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া দ্বিতীয় কল্পের স্বপক্ষে এইটুকুমাত্র বলিয়া এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটাইতে পারি যে, ভাবনার দ্বারা অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করা যায় এবং ইহা গীতায় শ্রীভগবান্ অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। মৃত্যুকালে যে-ব্যক্তি যে-বিষয় চিন্তা করিবে সে সেইভাব প্রাপ্ত হইবে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥
(গীতা, ৮।৬)

এই চিন্তার দ্বারা তদ্ভাবপ্রাপ্তি কেবল মৃত্যু-কালের জন্য নয়, কিন্তু তাঁহাকে চিন্তা করিলে ভগবান্ যে ধরা দেন এবং চিন্তক তৎস্বরূপতা লাভ করেন ইহা গীতার বহুস্থলে বলা আছে—"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্" (৯।২৯) (এখানেও 'ময়ি তে', 'তেষু অহম্' লক্ষণীয়), "মন্মনা ভব··· মামেবৈষ্যসি" (৯।৩৪, ১৮।৬৫) ইত্যাদি।

সর্বত্র আত্মভাবনার দ্বারা কল্যাণের পথেই যাওয়া যায়। ইহা আধ্যাত্মিক, ধার্মিক, সামাজিক তথা পারিবারিক জীবনে মহৌষধি বলিয়া গণ্য। প্রতিমাকে বিষ্ণু চিন্তা করিয়া, তাহার মধ্য দিয়া চিৎস্বরূপের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন বহু সাধক।

আত্মভাবনা না থাকিলে কেবলমাত্র প্রস্তররূপ জানিলে পূজা ও উপাসনা ব্যর্থ হয়। শঙ্করাচার্যের ন্যায় কঠোর অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও প্রতীত ব্যবহারিক দেবদেবীর মূর্তিকে পরমচৈতন্যভাবনায় পূজা করিয়াছেন। তিনি অসংখ্য দেবদেবীর স্তোত্রাবলী রচনা করিয়াছেন।

বেদান্তী জানেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত শোকদুঃখরোগজরামৃত্যু প্রভৃতি অসংখ্য দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতেই হইবে। সকল প্রবৃত্তি ইচ্ছানুসারী হয় না, বহু বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিলেও নিবৃত্ত হওয়া যায় না। এইজন্য

সকল কর্মকে এক পবিত্র ভাবনার দ্বারা মণ্ডিত করিলে চিত্তের গ্লানি থাকে না, উপরন্তু পবিত্র কার্য সম্পাদন করার তৃপ্তি জাগে। তাই প্রতিদিন সংসারে বহু জ্বালায় দগ্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত পরমেশ্বর শ্রীকান্ত বিষ্ণুর নিকটে প্রার্থনা করি যে, তোমার ইচ্ছায়, তোমার নির্দেশে আমার ইন্দ্রিয়াদি পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয়াদির স্বামী বলিয়া পরিচিত আমি জীবও বাস্তবিকপক্ষে তোমারই অধীন এবং তোমার নির্দেশেই পরিচালিত হইতে ইচ্ছা করি। প্রাতঃকালে বলি—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসার-যাত্রামনুবর্তয়িষ্যে॥

আরও বলি—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

পরমেশ্বর, তুমিই আমার ইন্দ্রিয়াধীশ (হৃষীকেশ), তুমিই আমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছ কারণ হৃদয়েই তোমার পরম অভিব্যক্তি। হৃদয়স্থ দহরাকাশে পরমেশ্বর বিরাজ করেন, ইহা ব্রহ্মপুর বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ (ছা. উ. ৮।১।১)। এই হৃদয়াধীশ পরমেশ্বরের নির্দেশে প্রতিদিন নিষ্কামকর্ম করিয়া কর্মফল হইতে মুক্তি পাইতে প্রত্যেক ভারতীয়ের প্রাত্যহিক প্রার্থনা। সত্য তত্ত্ব একটিই তাহাকে পিতা বলিতে ইচ্ছা হয় পিতা বলিতে পারি, মাতা বলিলে তৃপ্তি হয় মাতা বলি, পুত্র বলিতে ভাল লাগে পুত্র বলি ইহাতে তত্ত্বের কিছু ভেদ হয় না। স্বয়ং শ্রুতিই বলিয়াছেন—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং
জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥
(অথর্ব সং ১০।৪।২৭)

তাই তখন জগন্মাতার নিকটে প্রার্থনা করি যে, সমগ্র দিবসে ও রাত্রিতে যে কর্মই করি না কেন তাহা যেন তোমার পূজাই হয়—

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্তরম্।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদস্তু তব পূজনম্॥

অহোরাত্রের অসংখ্য ক্রিয়াকলাপ যাহাতে ভগবদনুধ্যানের দ্বারা পবিত্রীকৃত হয় তজ্জন্য সম্পূর্ণ দিনচর্যাকে ভগবদারাধনায় রূপান্তরিত করিবার অভিলাষ এই পবিত্র ভারতভূখণ্ডের মানুষের বহু প্রাচীন কাল হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন গীতাতে যাগাদি সমগ্র কৃত্যকে ব্রহ্মস্বরূপে অনুভব করিবার নির্দেশ আছে "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" ইত্যাদি শ্লোকে (৪।২৪) সেইরূপ নিম্নোদ্ধৃত শিবারাধনার শ্লোকটিতে সর্বকার্যকে শিবতাৎপর্যক বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, সমস্ত কর্ম শিবেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে—

আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ
প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা
নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ
স্তোত্রাণি সর্বাগিরো
যদ্ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং
শম্ভো তবারাধনম্॥

[ক্রমশঃ]

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ই. টি. স্টার্ডি

ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে-স্টার্ডিকে স্বামীজী সম্পর্কে এত উচ্ছ্বসিত দেখলাম, যিনি ইংলণ্ডে স্বামীজীর প্রধান সহায়ক ছিলেন, ছিলেন ইংলণ্ডে স্বামীজী প্রবর্তিত বেদান্ত-আন্দোলনের একজন অত্যন্ত 'উৎসাহী কর্মী, তিনি কেন এমন আচরণ করলেন? একি কোন আকস্মিক ঘটনামাত্র, অথবা এর পিছনে কোন ইতিহাস আছে? না। স্টার্ডির পশ্চাদপসরণ কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। যে-বিবেকানন্দ আড়াই বছর আগেও স্টার্ডির সমস্ত আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ, যাঁর মধ্যে তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম সুহৃদ্‌ ও পবিত্রতম আচার্যকে পেয়েছিলেন এবং মাত্র সাড়ে নয় মাস আগেও যাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকলে এবং যাঁর জন্য কিছু করতে পারলে তিনি কৃত-কৃতার্থ হয়ে যেতেন বলেছেন, সেই বিবেকানন্দকে এড়িয়ে চলার, তাঁকে অস্বীকার করার এবং ক্রমশঃ তাঁর মহিমায় নানা অসত্য কালিমা লেপন করার দুর্মতি পোষণেরও একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল স্টার্ডির! মনে হয়, এ প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর নিজের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানিকে গোপন করার জন্য এবং খানিকটা নিজেকে বাঁচাবার জন্যই। আমরা এখন স্টার্ডির সেই মানসিকতার উৎস ও স্বরূপ সন্ধান করব।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর স্বামীজী লণ্ডন ত্যাগ করলেন। রেখে গেলেন পিছনে অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও অনুরাগী ভক্তকে। আর রেখে গেলেন একটি সুসংগঠিত জনপ্রিয় ধর্মীয় আন্দোলনকে যে আন্দোলনের নাম বেদান্ত আন্দোলন। স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে যার পরিচালনার দায়িত্ব ছিল মূলত স্টার্ডির উপর, যে-স্টার্ডি, আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করে এসেছি, স্বামীজীর বিদায় দিবসেই পরম উৎসাহে বলে-ছিলেন 'আমরা তাঁর (স্বামীজীর) কাজ নিয়ে সরাসরি এগিয়ে চলেছি।' কিন্তু অচিরেই দেখা গেল স্বামীজীর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, বরং তাঁর ব্যর্থ নেতৃত্বের জন্য লণ্ডনে বেদান্ত-আন্দোলন ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হল সংগঠক হিসেবে স্টার্ডি এক মূর্তিমান ব্যর্থতা। নিবেদিতা তাই লিখেছিলেন: "স্টার্ডিকে কেউ নেতা হিসেবে গণ্য করলে তা হবে এক বৃহৎ ভ্রান্তি।"[৭]

প্রথমবার ইংলণ্ডে এসে স্বামীজী বেদান্ত-আন্দোলনের সূচনামাত্র করে গিয়েছিলেন। সেই আন্দোলনকে স্বামীজীর মাস পাঁচেক বাদে পুনরায় ফিরে আসা অবধি স্টার্ডি সজীব রেখেছিলেন। কিন্তু সেটা স্টার্ডির কর্মদক্ষতার গুণে সম্ভব হয়েছিল বলে মনে হয় না। স্বামীজী আবার অবিলম্বে ফিরে আসবেন এই ধারণাই মূলত তাঁর আন্দোলনকে সেখানে সক্রিয় রেখেছিল। আর যখন তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে এলেন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের জন্য তখন আন্দোলন সত্যিই খুব জমজমাট হয়ে উঠল—স্বামীজীর নিজের ভাষায়, "The work in London has been a roaring success."।

৭ Letters of Sister Nivedita (Ed: Sankari Prasad Basu, 1982), Vol. I, p. 197

ইংলণ্ডে বেদান্ত-আন্দোলনকে সাফল্যের সেই তুঙ্গে স্থাপন করে স্বামীজী সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ভারতে ফিরতে চাইলেন। ইতিমধ্যে ভারত থেকে তাঁর আহ্বানে এসে গেছেন তাঁর গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ। তিনি যদিও সেখানে নতুন—কিন্তু স্বামীজী ভাবলেন স্টার্ডি তো রয়েছেন সেখানে। আন্দোলনকে জাগিয়ে রাখার কাজে তিনি তো অভেদানন্দকে সাহায্য করবেন, যেমন তাঁকে করেছেন। স্টার্ডির কাছে নিশ্চয়ই স্বামীজী সেই প্রয়োজনীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। তবে স্বামীজীর ওখানকার অনুরাগী বন্ধুরা চাননি যে, স্বামীজী সেই মুহূর্তে ইংলণ্ড ছেড়ে চলে আসেন। কিন্তু দেশের ডাক তখন যে তাঁর কানে এসে পৌঁছে গেছে। তাছাড়া, দেশেও তো তাঁর আন্দোলনকে রূপ দিতে হবে, তাতে গতিসঞ্চার করতে হবে। সুতরাং ভারতে তাঁর ফিরে আসার একান্ত প্রয়োজন ছিল। লণ্ডন ছাড়ার কয়েকদিন আগে একটি চিঠিতে (৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬) মিস্ ম্যাকলাউডকে স্বামীজী লিখছেন: "আমার সেই প্রিয় পুরাতন দেশটি এখন আমাকে ডাকছে। যেতেই হবে আমাকে। সুতরাং সামনের এপ্রিলে রাশিয়া যাবার সমস্ত পরিকল্পনা বাদ দিতে হচ্ছে। ভারতে কাজকর্ম কিছুটা গুছিয়ে দিয়েই আমি আবার আমেরিকা-ইংলণ্ড প্রভৃতির উদ্দেশে রওনা হব।" কিন্তু শুধু কি ভারতের আকর্ষণ আর ভারতের কাজকে সংগঠিত করার জন্যই স্বামীজী ইংলণ্ডে তাঁর প্রবর্তিত আন্দোলনের সেই তুঙ্গ মুহূর্তে ভারতে পাড়ি দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন? মিস্ ম্যাকলাউডকে লেখা ঐ চিঠির শেষে কিন্তু তিনি আরও গূঢ় একটি কারণ নির্দেশ করেছিলেন, যার অর্থ দাঁড়ায় যে, সে-সম্পর্কে তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ পেয়েছিলেন। স্বামীজী লিখছেন: "অবশ্য এখানকার সকলেই মনে করছেন চূড়ান্ত এই সাফল্যের মুখে এখানকার কাজটি ছেড়ে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা হবে, কিন্তু আমার প্রিয় প্রভু যে আমাকে বলছেন: 'ঐ বুড়ো দেশটায় ফিরে চল।' আমি তাঁর আদেশ পালন করছি।"

অবশেষে যাত্রার দিনটি এল—১৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৬। স্বামীজীকে বিদায় দিয়ে স্টার্ডির মনের অবস্থা কি হয়েছিল আর স্বামীজীর মধ্যে তিনি কি পেয়েছিলেন সে-সম্পর্কে তাঁর নিজের কথা আমরা উল্লেখ করে এসেছি। স্বামীজী তাঁর ইংলণ্ডের কাজ সম্পর্কে স্বদেশে ফিরে এসে মাদ্রাজে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন: "যদি আমি আগামী কাল মারাও যাই এবং কোন সন্ন্যাসীকে আর সেখানে পাঠাতে নাও পারি, তাহলেও ইংলণ্ডের কাজ চলবে।"[৮] কলকাতায় ফিরে এসেও তাঁর সেই প্রত্যয় প্রতিধ্বনিত হল।[৯]

স্টার্ডির উপর বড় বেশী ভরসা করেছিলেন স্বামীজী এবং সেই ভরসাই ছিল তাঁর ঐ বিশ্বাসের অন্যতম ভিত্তি। অবশ্য স্বামীজী ভালই জানতেন ইংলণ্ডে ঐ কাজের সাফল্যের মূলে কোন্ শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল। লণ্ডন ছাড়ার মাস দুয়েক[১০] আগে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে সেকথা বুঝা যায়। স্বামীজী লিখেছিলেন: "লণ্ডনের কাজ দিন দিন বেড়েই চলেছে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই ক্লাসে বেশী লোক আসছে।

---

৮ C. W. Vol. V (1973), p. 221.

৯ C. W. Vol. III (1973), p. 312; স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড (১৩৭১), পৃঃ ৬

১০ পত্রটিতে কোন তারিখ দেওয়া নেই। শুধু ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ লেখা আছে। তবে মনে হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে লেখা। কারণ সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি ঘুরে আসার 'প্রায় তিন সপ্তাহ' পর চিঠিটি লিখছেন স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে। স্বামীজী ফিরেছিলেন ১৭ সেপ্টেম্বর।

শ্রোতার সংখ্যা যে ঐ হারে ক্রমশই বাড়তে থাকবে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।... অবশ্য আমি চলে যাওয়ামাত্রই যতটা গাঁথনি হয়েছে তার অধিকাংশই ভেঙ্গে পড়বে।"[১১] স্বামীজী জানতেন ইংলণ্ড থেকে তিনি চলে গেলে তাঁর কাজকে সংগঠিত ও চালু রাখার জন্য নিয়মিত ক্লাস ছাড়াও প্রচারের জন্য অন্য কিছুও ভাবতে হবে। তাই স্বামীজী ইংলণ্ডে বেদান্তের মুখপাত্র হিসাবে একটি উচ্চমানের পত্রিকা প্রকাশের কথাও ভেবেছিলেন। আলাসিঙ্গাকে ২০ নভেম্বর (১৮৯৬) লিখছেন: "আমার অনুপস্থিতিতে এখানকার কর্মীদের কাজ থাকতেই হবে। অন্যথায় সব নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব এখানে একটি পত্রিকা চাই, ক্রমে আমেরিকাতেও চাই।"

'এখানকার কর্মীদের' বলতে মূলত স্টার্ডির কথাই স্বামীজীর মনে হয়েছিল। কারণ স্টার্ডির কর্মক্ষমতা এবং অতি-উৎসাহের সঙ্গে যেমন তিনি পরিচিত ছিলেন, তেমনি আবার তাঁর চঞ্চল চরিত্রের কথাও বেশ জানতেন,—জানতেন তাঁর উৎসাহের পর্দার আকস্মিক দ্রুত ওঠা-নামার কথাও। স্বামীজী জানতেন, এরকম লোককে কোন সুনির্দিষ্ট ছকে-বাঁধা গঠনমূলক কাজের মধ্যে আটকে রাখতে না পারলে, তারা অবিলম্বে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়বেই। তাছাড়া পত্রিকা সম্পর্কে স্টার্ডির উৎসাহের কথাও স্বামীজী অবহিত ছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে পত্রালাপের সূচনাপর্বেই তিনি একটি পত্রিকা চালু করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন—সে-কথা আমরা স্টার্ডিকে লেখা স্বামীজীর ২৪ এপ্রিল, ১৮৯৫ তারিখের চিঠি থেকে জানতে পারি। ইউরোপে থাকাকালেই স্টার্ডিকে লেখা স্বামীজীর পরবর্তী আরও কিছু চিঠিপত্রেও স্টার্ডির পত্রিকা বের করার অভিপ্রায় এবং সে বিষয়ে স্বামীজীর স্টার্ডিকে উৎসাহদানের সংবাদ পাওয়া যায়। স্টার্ডি স্বাভাবিকভাবেই তাতে খুব উদ্দীপিত হয়েছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত স্বামীজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী স্টার্ডির দ্বারা কোন পত্রিকা বেরিয়েছিল কিনা তা সঠিক জানা যায় না। শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন: "স্টার্ডির কাগজ বেরিয়েছিল, যদিও তার আয়ু স্থায়ী হয়নি। স্বামীজী ২০ নভেম্বর [চিঠিটির উল্লেখ আমরা আগে করেছি] লণ্ডন থেকে আলাসিঙ্গাকে যে-পত্র লেখেন তার মধ্যে সেই সংবাদ আছে।" [দ্রঃ 'সমকালীন', ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪১]। কিন্তু পত্রটিতে সেরকম কোন সংবাদ সত্যিই কি আছে? মনে হয় না। চিঠিটিতে প্রাসঙ্গিক সংবাদটি হল: "এখন কথা এই—এরূপ আশা করা চলে না যে, তারা [স্টার্ডি, নিবেদিতা (তখন মিস্ মার্গারেট নোবল) প্রভৃতি] একসঙ্গে অত্যধিক কাজের ভার নেবে। ইংলণ্ডের কাজের জন্য তাঁদের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, বই কিনতে হবে, এখানকার পত্রিকার জন্য গ্রাহক যোগাড় করতে হবে [নিম্নরেখা প্রবন্ধকারের], এবং সর্বশেষে ভারতের পত্রিকার [ব্রহ্মবাদিন্ এবং প্রবুদ্ধভারত] চাঁদা দিতে হবে! এতটা করা চলে না।" এখানে ইংলণ্ডে স্বামীজীর প্রস্তাবিত পত্রিকার কথা বলা হয়েছে ধরে নেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। মাস দেড়েক আগেও একটি চিঠিতে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখেছেন: "স্টার্ডির কাগজ বের করবার মতলব এখনও কাজে পরিণত হয়নি।" (Complete Works, Vol. V, p. 116)। ২০ নভেম্বরের চিঠিতে শেষে স্বামীজী লিখেছেন: "অতএব এখানে (ইংলণ্ডে) একখানি পত্রিকা চাই।" অর্থাৎ পত্রিকাটি তখনও আত্মপ্রকাশ করেনি। সুতরাং

১১ C. W. Vol. V., p. 117

২০ নভেম্বরের চিঠির ভিত্তিতে অন্তত স্টার্ডির কাগজ বেরিয়েছিল—একথা বলা যায় না। এমনকি তার ন'মাস পরে ১৯ অগস্ট, ১৮৯৭ মিসেস ওলিবুলকে আম্বালা থেকে লেখা স্বামীজীর চিঠি থেকেও বোঝা যায় যে, তখনও স্টার্ডির পত্রিকা বের হয়নি। ('Letters' p. 365)

যা হোক আমরা আগের কথায় ফিরে আসছি। স্বামীজী যখন যেখানে থাকতেন তখন তাঁর কাছাকাছি যে-সব মানুষ থাকতেন—তাঁরা শিষ্য হোন বা অনুরাগী হোন অথবা বন্ধু হোন সকলকেই একটি প্রাণময় প্রেরণায় ও উৎসাহে তিনি জাগিয়ে রাখতেন। সকলের মধ্যে একটা কর্মচাঞ্চল্যের জোয়ার বইয়ে দিতেন তিনি। কেউ কেউ সেই উত্তাপকে চিরকালের মতো অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করতে সমর্থ ছিলেন—যেমন মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল (পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতা)। আবার কাউকে দেখা যায়, উত্তাপের উৎস সরে যাওয়া মাত্রই নিস্তেজ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়তে। যেমন স্টার্ডির ক্ষেত্রে হয়েছিল। স্বামীজী যতক্ষণ কাছে ছিলেন স্টার্ডি অনুপ্রাণনায় ভরপুর হয়ে ছিলেন। স্টার্ডি হয়তো ভাবতেন তাঁর নিজের প্রচেষ্টা ও সংগঠন-ক্ষমতা ইংলণ্ডে স্বামীজীর সাফল্যের একটি প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু স্বামীজী লণ্ডন ছাড়ার পর থেকেই তিনি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারছিলেন ইংলণ্ডে বেদান্তের সাফল্য এবং বিবেকানন্দ—এ-দুয়ের সম্পর্ক কি এবং বেদান্ত প্রচারের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ নামক ঐ ব্যক্তিটির প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মূল্য কতখানি। কিন্তু স্বামীজী লণ্ডন ছাড়ার পরে সেখানকার কাজের খবর জানিয়ে স্টার্ডি মিস্ ম্যাকলাউডকে লেখেন (২৫ জানুআরি, ১৮৯৭): "৩৯ নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের ঘরটি আবার আমরা খুলেছি এবং গত ১২ জানুআরি [সেখানে] অভেদানন্দ তাঁর প্রথম ভাষণ দিয়েছেন—ভাষণটি খুবই উচ্চমানের হয়েছে। কিন্তু শ্রোতাদের উপস্থিতি প্রথম থেকেই খুবই কম হয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে [ব্যাপারটা] ব্যক্তির উপর কতখানি নির্ভরশীল। (নিম্নরেখা প্রবন্ধকারের)। অবশ্য সেদিন আবহাওয়া ভাল ছিল না—কখনও কুয়াসায় ছিল ঢাকা, আবার কখনও মেঘলা আকাশ; আর অনেকেই ছিল শহরের বাইরে।...এরই মধ্যে আমরা যা প্রয়োজন তা করার খুবই চেষ্টা করছি। জানি না, আমাদের প্রয়াস সাফল্য অর্জনে সমর্থ হবে কি না, তবে সাফল্য আসা উচিত।" কিন্তু সাফল্য তো আসেই নি; বরং অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কোন কাজ গুছিয়ে তোলার ক্ষমতা স্টার্ডির ছিল না। তাছাড়া তাঁর ছিল মুরুব্বিয়ানা করার স্বভাব এবং নিজের ত্যাগ, বৈরাগ্য, কঠোরতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে একটা অহমিকার মনোভাব। এসব কারণে লণ্ডনে যাঁরা এতদিন বেদান্ত আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাঁরা ক্রমশঃ নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছিলেন। ফলে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হল বেদান্ত-আন্দোলন। স্বামী অভেদানন্দ যোগ্য প্রচারক এবং ভাল বাগ্মী হলেও পাশ্চাত্যে স্বামীজীর অভিজ্ঞতার সম্পদ, পরিচিতির ব্যাপ্তি এবং ব্যক্তিত্বের মাদকতাময় আকর্ষণ তখন তাঁর ছিল না। ফলে লণ্ডনে নবাগত তাঁর বক্তৃতা আকর্ষণীয় হলেও, তাঁর ক্লাসে জনসমাগম তেমন হচ্ছিল না। স্টার্ডির মনে এসবে প্রথমে হতাশা এবং পরে তা থেকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও উদ্যমের অভাব দেখা দিতে থাকল। স্টার্ডি এইসময় একটা বড়রকমের ভুল করলেন। তাড়াহুড়ো করে ৩১ জুলাই (১৮৯৭) তিনি অভেদানন্দজীকে নিউইয়র্কে পাঠিয়ে দিলেন। স্টার্ডির এই হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে কাজ নষ্ট হতে বাকী যেটুকু ছিল তা

ত্বরান্বিত হবার পথটি পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রথমতঃ স্বামীজীর তথা ভারতের প্রতিনিধি আর কেউ সেখানে রইলেন না। দ্বিতীয়তঃ স্বামীজী লণ্ডনের কাজের জন্য যে অর্থ রেখে এসেছিলেন তা থেকেই স্টার্ডি স্বামী অভেদানন্দের জাহাজের টিকিট কেনেন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচপত্রও করেন। সে সময় লণ্ডনের ক্লাসগুলিতে লোকজন বিশেষ না হওয়ায় এমনিতেই ওখানকার কাজ আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল। স্টার্ডি স্বামী অভেদানন্দের লণ্ডনে থাকার প্রয়োজনীয়তার দিকটি চিন্তা করলেন না এবং ভাবলেন না আর্থিক ব্যাপারটিও। ফলে লণ্ডনের কাজ তখন সত্যি সত্যিই প্রায় ভেঙে পড়ল। ভারতে আসার কিছুদিন পর স্বামীজীর কাছেও ইংলণ্ডের কাজের অবনতির সংবাদ এসে পৌঁছেছিল। ৫ মে, ১৮৯৭ তারিখে আলমবাজার মঠ থেকে নিবেদিতাকে তিনি লিখছেন: "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তোমাদের সমিতি এখনও টিকে আছে।... শুনতে পাচ্ছি, লণ্ডনের কাজ আদৌ ভাল চলছে না।" মাসখানেক পর তাঁর আরেক ইংরেজ শিষ্যা মেরী হলবয়েস্টারকে তিনি খুব উদ্বেগ এবং দুঃখের সঙ্গে আলমোড়া থেকে লিখলেন (২ জুন, ১৮৯৭): "লণ্ডনের কাজ কিরকম চলছে? আমার ভয় হচ্ছে, বুঝি সব নষ্ট হয়ে গেল। মাঝে-মধ্যে তুমি লণ্ডনে যাও কি?" দিন কয়েক পরে (২০ জুন) নিবেদিতাকে ব্যাকুল হয়ে লিখলেন: "অনেক দিন হল [ওখানকার] কাজের কোন খবর পাইনি। তুমি কি আমাকে কিছু জানাতে পার?" মাস খানেক পরে (২৫ জুলাই) মেরী হলবয়েস্টারকে লেখা চিঠিতেও আবার লণ্ডনের কাজকর্মের ব্যাপারে তাঁর দুশ্চিন্তার কথা জানালেন: "নানা কারণে লণ্ডনের কাজের গতি মন্থর হয়ে পড়ছে। তার অন্যতম প্রধান কারণ হল—অর্থাভাব। আমি থাকলে অর্থ কোন না কোনভাবে এসে যায় এবং কাজও এগিয়ে চলে। এখন আর কেউ গা করছে না। [তাই] আমাকে আবার যেতেই হবে [সেখানে] এবং কাজটাকে আবার জিইয়ে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।" লণ্ডনের কাজের পড়তির খবর যে নিবেদিতার চিঠিতে স্বামীজী কিছু কিছু পেতেন এবং নিবেদিতাও যে তাঁকে আবার তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফিরে গিয়ে হাল ধরার জন্য অনুরোধ করেছিলেন তা তাঁকে লেখা স্বামীজীর চিঠি (২৩ জুলাই, ১৮৯৭) থেকে অনুমান করা যায়। লণ্ডনের কাজের শোচনীয় অবস্থার জন্য সংগঠক হিসাবে স্টার্ডির ব্যর্থতাই যে দায়ী—এ-কথা সম্ভবত অনেকেই সেখানে তখন বলাবলি করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাতে বিচলিত হয়ে স্টার্ডি তখন স্বামীজীকে তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফিরে আসার জন্য বারংবার লিখতে থাকেন। স্বামীজী নিজেও ভাবছিলেন আসবেন কিনা। নিবেদিতাকে লেখা ২৩ জুলাই-এর চিঠিতে সে-সংবাদ পাই। কিন্তু স্বামীজীর পক্ষে তখন যাওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। কারণ ভারতের কাজকে তখনও তিনি আশানুযায়ী রূপ দিতে পারেননি। নিবেদিতাকে লেখা ঐ চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন সে-কথা: "আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, আমি ইংলণ্ডে গেলে সেখানকার কাজ আবার জমে উঠবে। কিন্তু এখানকার যন্ত্রটি কিছুটা সচল না হলে এবং আমার অনুপস্থিতিতে যন্ত্রটিকে চালু রাখার মতো অনেকে আছে সেবিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে আমার পক্ষে ভারতবর্ষ থেকে যাওয়া উচিত হবে না। 'খোদার মর্জিতে'—মুসলমানরা যেমন বলে—কয়েক মাসের মধ্যেই তা হয়ে যাবে। খেতড়ির রাজা—যিনি আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক—এখন বিলেতে। আশা করছি তিনি শীঘ্রই ভারতে ফিরবেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি আমার কাজে বিরাটভাবে

সাহায্য করবেন।" ভারতের কাজ ছাড়া আরও একটি কারণে স্বামীজীর তখন লণ্ডন যাওয়া সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্যে কয়েক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য তখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থায় সমুদ্রযাত্রার ধকল সহ্য করার মতো সামর্থ্য তাঁর তখন ছিল না। তাছাড়া ঝিমিয়ে-পড়া অথবা ক্ষয়ে-যাওয়া লণ্ডনের কাজকে আবার জাঁকিয়ে তুলতে যে-পরিমাণ স্নায়ু ও দেহের উপর চাপ আসত তাও তাঁর পক্ষে মারাত্মক হত। এ-সব কারণে তাঁর চিকিৎসকগণ তাঁর ইংলণ্ডে যাওয়া স্থগিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ-সব খবর তাঁর ঐকালের বিভিন্ন চিঠিতেই পাওয়া যায়। যেমন নিবেদিতাকে লেখা ৫ মে, ১৮৯৮ তারিখের চিঠিতে দেখি স্বামীজী লিখছেন: "...আমি এখনই লণ্ডনে যেতে চাই না যদিও জুবিলী [রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যশাসনের হীরক জয়ন্তী] উপলক্ষে বিলেতযাত্রী আমাদের কয়েকজন দেশীয় রাজা আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন; ওখানে গেলেই বেদান্ত সম্পর্কে লোকের আগ্রহ পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রচণ্ড খাটতে হত—যার অর্থ হল আরও ভয়ানক রকম শারীরিক কষ্টকে ডেকে আনা।" মেরী হলবয়েস্টারকে লেখা ২৫ জুলাইয়ের চিঠিতে লিখছেন: "আমার শরীরটা কিছুকাল ধরে অত্যন্ত দুর্বল যাচ্ছে। সে-কারণে এবং আরও অন্যান্য কারণেও জুবিলী মরসুমে আমার ইংলণ্ড যাওয়া স্থগিত রাখতে হল।" এ-সব কথা স্বামীজী স্টার্ডিকেও লিখেছিলেন। অবশ্য স্টার্ডিকে লেখা সেই চিঠিগুলি দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। সে চিঠিগুলি আদৌ পাওয়া গিয়েছে কিনা তাও আমাদের জানা নেই। তবে অন্যান্যদের লেখা স্বামীজীর চিঠিপত্র থেকে জানতে পারি যে, স্বামীজী ইংলণ্ডে তখন না আসার যে-সব কারণ দেখিয়েছিলেন তা স্টার্ডির মনঃপূত হয়নি এবং স্বামীজী না আসায় তিনি স্বামীজীর উপর ভীষণ চটে যান। হয়তো না-আসার জন্য স্বামীজীর যুক্তি উনি বিশ্বাসই করেননি। রেগে গিয়ে স্টার্ডি স্বামীজীকে চিঠি লেখাই বন্ধ করে দেন। ১০ জুলাই (১৮৯৭) স্বামীজী মিস্ ম্যাকলাউডকে লেখেন: "ডাক্তাররা আমাকে খেতড়ির রাজার সঙ্গে ইংলণ্ডে যেতে না দেওয়ায় আমি খুবই দুঃখিত, আর তাতে স্টার্ডি গেছে ক্ষেপে।" মেরী হলবয়েস্টারকে লেখা পূর্বোল্লেখিত পত্রেও স্টার্ডির আশাভঙ্গের কথা আছে। স্বামীজী লিখছেন: "মনে হচ্ছে স্টার্ডির থার্মোমিটার এখন শূন্য ডিগ্রীর নীচে। এই গ্রীষ্মে আমার ইংলণ্ডে যাওয়া হল না বলে সে খুব আশাহত হয়েছে। কিন্তু আমারই বা কি করার ছিল?" কিছুদিন নীরব থাকার পর স্টার্ডির একটা চিঠি পান স্বামীজী ২৮ জুলাই যার উল্লেখ করে তিনি নিবেদিতাকে লেখেন (২৯ জুলাই, ১৮৯৭): "শেষ পর্যন্ত স্টার্ডির কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। কিন্তু চিঠিটি বড় রূঢ় এবং শীতল। মনে হচ্ছে লণ্ডনে কাজ ভেঙে পড়ায় সে হতাশ হয়েছে।" স্টার্ডি একটা মানসিক কষ্টে আছেন এবং সেই কষ্ট বেড়ে চলেছে দিন-দিন স্বামীজীর লণ্ডনে না-যাওয়াতে—তা ভেবে স্বামীজী নিজেও কষ্ট পাচ্ছিলেন। আবার ঐ সময় তাঁর কাছে খবর এসে পৌঁছল যে, স্বামী অভেদানন্দকে স্টার্ডি নিউ-ইয়র্কে পাঠাচ্ছেন। স্বামীজী বুঝতে পারছিলেন লণ্ডনের কাজ স্টার্ডি আর চালাতে পারবেন না। সে-কথা আগেও বুঝেছিলেন স্বামীজী। তাই শরীর খারাপ নিয়েও লণ্ডনে যেতে চেয়েছিলেন। আম্বালা থেকে মিসেস ওলি বুলকে ১৯ অগস্ট তিনি লিখলেন: "আমার শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না; যদিও বিশ্রাম খানিকটা পেয়েছি, তবু

আগামী শীতের আগে পূর্বের স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে পাব বলে মনে হয় না।…ইংলণ্ড থেকে সংবাদ পেলাম যে মিঃ স্টার্ডি অভেদানন্দকে নিউইয়র্কে পাঠাচ্ছে। আমাকে ছাড়া ইংলণ্ডের কাজ চলা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। [এখন] মিঃ স্টার্ডি শুধু একটা পত্রিকা বের করবেন এবং সেটা নিয়ে থাকবেন। এই মরসুমেই আমি ইংলণ্ডে যাবার ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তারদের বোকামিতে বাধা পেলাম।" ডাক্তাররা যে বোকামি করেননি তা স্বামীজী জানতেন। কিন্তু শরীরের কষ্টকে তো তিনি এর আগে কখনও গ্রাহ্যই করেননি। অথচ ডাক্তারদের পীড়াপীড়িতে সেই শরীরের জন্যই তাঁকে ইংলণ্ড যাওয়া স্থগিত রাখতে হয়েছে যখন সেখানে যাওয়ার প্রয়োজনের কথা স্টার্ডি অসহায় হয়ে বার বার তাঁকে লিখছেন—এই ভাবনা যে স্বামীজীর পক্ষে কত বেদনাদায়ক ছিল তা আমরা অনুমান করতে পারি। সেই বেদনা থেকেই ডাক্তারদের প্রতি বিরাগের জন্ম হয়েছিল। তাই ডাক্তারদের বাধা দেওয়াকে তিনি 'বোকামি' বলেই ভাবছিলেন।

শুধু ভারতের কাজ এবং শারীরিক প্রতিকূলতা ছাড়া আরও একটি কারণেও স্বামীজীর বিদেশ যাত্রা তখন সম্ভবপর ছিল না বলে আমাদের মনে হয় যদিও তার উল্লেখ স্বামীজী অন্তত প্রকাশ্যে কখনও করেছেন বলে জানি না। স্টার্ডি স্বামীজীকে তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফিরে আসতে ঘন ঘন তাগিদ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং স্বামীজী না যাওয়ায় রেগে আগুন হচ্ছিলেন। কিন্তু বিদেশ-যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কিভাবে একজন সন্ন্যাসী রাতারাতি যোগাড় করবেন সে-কথা স্টার্ডি ভেবেছিলেন কি? এ-সম্পর্কে যদিও কোন তথ্য আমাদের জানা নেই তবে অনুমান করতে পারি যে, লণ্ডনের কাজ বাঁচানোর (আসলে তাঁর নিজের মাথা বাঁচানোর) চিন্তায় ব্যস্ত ও অসহায় স্টার্ডি সম্ভবত তার কোন ব্যবস্থা করেননি অথবা কিভাবে তার যোগাড় হবে সে-সম্পর্কেও কোন কিছু স্বামীজীকে জানাননি। বিদেশযাত্রার আর্থিক সঙ্গতির ব্যাপারটিও স্বাভাবিকভাবেই স্বামীজীর ইংলণ্ডে না যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মেরী হলবয়েস্টারকে লেখা পূর্বোল্লেখিত ২৫ জুলাই-এর চিঠিতে বোধ হয় এরকম একটি ইঙ্গিত আছে যেখানে তিনি লিখেছেন যে, শারীরিক দুর্বলতা এবং 'আরও অন্যান্য কারণেও' তাঁর লণ্ডনে যাওয়া হয়নি।

স্বামীজীর সম্পর্কে স্টার্ডির অসন্তোষকে ধূমায়িত হতে সাহায্য করেছিল তাঁর একটি পারিবারিক কারণও। স্বামীজীর মিসেস ওলি বুলকে চিঠি লেখার (১৯ অগস্ট) কয়েক মাস পরে ৭ ডিসেম্বর স্টার্ডি (সম্ভবত সপরিবারে) বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। স্বামীজী সে-কথা জানতে পেরে (স্টার্ডির কাছ থেকে অথবা অন্য কোন সূত্রে—সঠিক আমাদের জানা নেই) স্টার্ডিকে আমন্ত্রণ জানালেন ভারতে আসতে। ম্যারী লুইস বার্কের অনুমান যে, স্বামীজী সম্ভবত স্টার্ডিকে তাঁর নিবেদিতা প্রভৃতির সঙ্গে আসন্ন কাশ্মীরভ্রমণে সঙ্গী হবার জন্যও আহ্বান জানিয়েছিলেন।[১২] স্টার্ডি ভারতবর্ষের নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে স্বামীজীকে চিঠিতে জানালেন যে, তিনি ভারতে আসছেন না। ভারতের প্রান্তে এসেও ভারতে না আসার কারণ স্টার্ডি কি জানিয়েছিলেন তা জানার এখন কোন উপায় নেই; কারণ স্টার্ডির সেই পত্রটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে মিসেস ওলিবুলকে লেখা স্বামীজীর ৪ এপ্রিল, ১৮৯৮ তারিখের চিঠিতে

১২ Swami Vivekananda: His Second Visit to the West—New Discoveries—Marie Louise Burke, p. 54.

স্টার্ডির সম্পর্কে ঐ প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য থেকে বোঝা যায় স্টার্ডির ভারতে না আসার পিছনে কোন্ ঘটনা কাজ করেছে। স্বামীজী বলতে চেয়েছেন, স্টার্ডির বিবাহ শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের শান্তি ও আনন্দের অনেকখানি ছিনিয়ে নেয়নি, হরণ করে নিয়েছে তাঁর কর্মজীবনের স্বাধীনতার এক বৃহৎ অংশও। স্বামীজী ঐ চিঠিতে লিখছেন: "স্টার্ডির চিঠিটি ইতিমধ্যেই আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। আহা বেচারা! জানি না তার জন্য কি করব! সত্যি কথা বলতে কি সে যে 'নিজের তৈরী মরুভূমিতে বাস করছে'। বুঝতেই পারেন একের পক্ষে যা কল্যাণকর, অন্যের ক্ষেত্রে তা নাও হতে পারে। স্টার্ডির ক্ষেত্রে বিবাহ চরম দুর্গতির ব্যাপার হয়েছে। ভারতের 'কিনারায় এসে পৌঁছলেও' সে ভারতে আসতে পারবে না! ঈশ্বর বেচারাকে সাহায্য করুন। তিনি যেন তার সকল বন্ধন ছিন্ন করে তাকে শীঘ্রই মুক্তি দেন। আহা, তবু ভাল সে এখন বন্ধন অনুভব করছে...।"[১৩]

[ক্রমশঃ]

১৩ Ibid., p. 55

বলরাম-মন্দির

ব্রহ্মচারিণী অজিতা

দাঁড়াও ক্ষণেক পান্থ করি নতশির
এ নহে ভবন তুচ্ছ—নহে ক্ষুদ্র নীড়।
বলরাম-নামাঙ্কিত পুণ্য শ্রীমন্দির
তীর্থোত্তম বলি মানে ভকত সুধীর।
ধন্য বসু বলরাম, প্রণমি তাঁহারে
যাঁর গৃহে ভক্তজন আনন্দে বিহরে।
পরম-পাবন দেব, সত্যময় যিনি
'বলরামের অন্ন শুদ্ধ'—তাঁর বেদবাণী।
নিত্য জগন্নাথ সেবা, শ্রীহরি স্মরণ,
দেহ শুদ্ধ, গেহ শুদ্ধ, শুদ্ধ চিত্ত মন।
অতুলবিভবশালী দীনহীন বেশ,
'ব্যয়কুণ্ঠ' কহে লোকে, নাহি তাহে দ্বেষ।
সর্বব্যয় পরিহার অব্যয়ের তরে
ভক্তসেবা প্রাণ যাঁর, নমি ভক্তবরে।
রঙ্গ রসে হেথা প্রভু কাটাতেন কাল
সংগে লয়ে বাবুরাম, নরেন, রাখাল।
আরও কত ভক্তজন আসিতেন সবে
মাতিতেন নৃত্য-গীত বাদ্য মহোৎসবে।
রথযাত্রা উৎসবে ছোট রথখানি
ভক্ত সঙ্গে টানিতেন 'শ্রীপ্রভু' আপনি।
স্মরিয়া মধুর স্মৃতি শিহরে শরীর
ব্যাকুলিত হৃদি মোর চক্ষে বহে নীর।
বারেক পরশে যাঁর মুক্ত হয় নর
শতাধিক বার পূত পদ-পরশন তাঁর।
করেছেন হেথা বাস মাতা ঠাকুরানী
ধরাতলে অবতীর্ণা জগত-জননী।
শ্রীপ্রভুর লীলা অন্তে তাঁর ভক্তজন
করেছেন হেথা বাস,—পুণ্য এ ভবন।
'রামকৃষ্ণ মিশন'—বিশ্বে অতুলন নাম
দিব্য এ সদন মাঝে তাহার সূচন।
লক্ষ ভক্ত পদধূলি পড়েছে হেথায়
দেবতাবাঞ্ছিত ধাম, সামান্য তো নয়।
এর ধূলি ধূলি নয়,—পূত রজকণা
'তীর্থরাজ' বলি এবে জানে সর্বজনা।
'নবযুগ মহাতীর্থ' সম ব্রজধাম
বলরাম-মন্দিরেতে জানাই প্রণাম।

স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতি

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাংলা ১৩৩০ সালের (১৯২৩ খৃঃ) অক্ষয় তৃতীয়ার দিন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন স্বয়ং পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ। বহু ভক্ত নরনারী ও সাধু-সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। বিরাট উৎসব। সারাদিন ধরে ও রাত্রি ১০টা পর্যন্ত 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' প্রসাদ বিতরণের ধুম চলেছিল।

পূজনীয় কপিল মহারাজ পূজা করেছিলেন। মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী) শ্রীশ্রীমার বিরাট তৈলচিত্র মন্দিরের বেদীতে বসালেন ও অর্ঘ্য, অঞ্জলি দিলেন। বহু ভক্ত নরনারীকে তিনি দীক্ষাও দিয়েছিলেন। রাত্রে কালীপূজা হল। পরে বিরজা হোম করে কয়েকজনকে ঐ রাত্রেই তিনি সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যও দিয়েছিলেন। বিভূতির (হংসেশ্বরানন্দের) প্রার্থনায় তাকে প্রথমে দীক্ষা এবং পরে রাত্রে ব্রহ্মচর্য দানে কৃতার্থ করেছিলেন। মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন "একেবারে ডবল প্রমোশন ?"

ঠাকুর ও মার ভোগের জন্য ভাল চাল আনা হয়নি। সাধারণ চালের ভাত হবে জেনে স্বামী ভূমানন্দজী কিশোরীদা (স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী)-কে বকাবকি করছেন জেনে মহারাজ ভূমানন্দজীকে ধমক দিয়ে বললেন, "এক সপ্তাহ আগে তো এসেছ। আগে থেকে এসব দেখলে না কেন ? কলকাতা থেকে কত লোক এল। ভাল আতপ চাল আনিয়ে নিতে পারলে না ? ঠাকুর, মা এখানে রোজ যে চালের ভাত খান তাই ভোগ হবে।" ব্যস্, সকলে চুপ। শ্রীশ্রীমাও সাধারণ সিদ্ধ চালের ভাত সশরীরে থাকাকালে বরাবর খেতেন। তাই বাসমতী আতপ চাল আনাবার কথা কারও মনে পড়েনি। মহারাজ শুনে খুব হাসলেন। পূজা, হোম প্রভৃতি শেষ হলে মহারাজ প্রায় বিকাল ৩টায় শ্রীশ্রীমার নূতন বাড়ীতে মার ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পেতে বসলেন। সেবক সাতু (স্বামী অসিতানন্দ) নারকেলভাজা, বড়িভাজা, পটোল-ভাজা প্রভৃতি দিয়ে পাতে চেলো (খেড়ো)-র তরকারী দিতেই মহারাজ খুশী হয়ে খেতে লাগলেন ও বললেন, "তোর শুকনো ভাজাভুজি-গুলি খাব না। এই তরকারী বেশ ঠাণ্ডা।" অথচ তখন ঐ সবজী টাকায় পাঁচ মন পাওয়া যেত। অনেকটা লাউয়ের মতো স্বাদ। তবে গরমের দিনে খেতে বেশ লাগে।

কী কষ্টে যে মহারাজ জয়রামবাটীতে কাটাতেন তা ভাবলে দুঃখ হয়। হেঁটে আমোদরে গিয়ে স্নান সেরে, যেখানে আমোদর উত্তরবাহী সেইখানে তীরে একটি আমলকী গাছের তলায় বসে তিনি জপধ্যান করতেন। মহারাজ সেখানে গীতা পাঠও করতেন। ফিরে এসে তিনি জলযোগ করতেন। যোগীন-মা, গোলাপ-মাকেও ঐভাবে আমোদরে গিয়ে স্নানাদি করতে হত। মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে যখন ফিরে যাবেন তখন মেজো মামাকে (কালীমামাকে) মহারাজ নমস্কার করলেন। মামা বললেন, "বাবা, আবার আসবে।" মহারাজ দুই হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, "ঠাকুরের ও মায়ের ইচ্ছা।" যোগীন-মা নমস্কার করতেও মামা আবার আসবার কথা বলায় তিনি বললেন, "না, মামা। আর আসব না। জন্মের মতো মার জন্মভূমি দর্শন করে গেলাম।" মামা বললেন, "ছিছি! মা! ওকথা বলতে আছে ? আবার আসতে হবে।" যোগীন-মা বললেন, "না মামা, আর আসতে পারব না।"



দুখানি গোযান তৈরী ছিল। একখানিতে যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও অপরখানিতে মহারাজ উঠলেন। তাঁরা প্রথমে কামারপুকুর গেলেন। পরে কলকাতা যাবেন। গোযানে বিষ্ণুপুর গিয়ে সেখান থেকে ট্রেনে হাওড়া যাবেন। সেদিন সকালে রওনা হওয়ার জন্য মহারাজ মন্দিরের কাছের কুয়ার জলে স্নান করলেন। আমি বালতী বালতী জল তুলে তাঁর মাথায় গায়ে ঢালতে লাগলাম। তিনি খুব আনন্দ করে স্নান করলেন। সেদিন আমোদরে যাবার সময় ছিল না

মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে মহারাজ সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের এক একখানি বস্ত্রদান করেন। মঠের সাধুরা খুব আনন্দ করেন। সকলকে মিলের ধুতি দিয়েছিলেন। কেবল আমি কংগ্রেসী—মহাত্মা গান্ধীর মতাবলম্বী জেনে আমাকে খদ্দরের কাপড় দিয়েছিলেন। কাপড়ে নিজ হাতে নাম লিখে এনেছিলেন –"রামময়"। একবার উদ্বোধনে আমার পকেট ছুরিটি "pen knife" একটি ছেলে পেন্সিল কাটবার জন্য নিয়ে আমাকে দিতে ভুলে গিয়েছিল। তখন টাকায় চারটি কাঞ্চননগরের ঐরূপ ছুরি পাওয়া যেতো। ঐ ছুরি মহারাজ নিয়ে একটি খামে ভরে উপরে "রামময়—গোপাল-চৈতন্যের ছুরি" লিখে রেখেছিলেন ও এক ভক্তের হাতে মনে করে জয়রামবাটীতে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। কত স্নেহ !! একদিন জয়রাম-বাটীতে মহারাজের কাছে বসে আছি। এমন সময়ে আমার প্রধান শিক্ষক মশায় মহারাজকে বললেন, "পাড়াগাঁয়ে স্কুল চালানো বড়ই কঠিন। ছাত্রসংখ্যা কম। সরকারী সাহায্যও নিতান্ত কম। ছাত্রদের বেতন থেকে শিক্ষকদের বেতন দিতে কুলায় না—ইত্যাদি।" তখন মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রবোধ, তোমার ভাল ভাল ছাত্রদের ধর না। তারা লেখাপড়া শিখে এসে কিছুদিন করে তোমার স্কুলে বিনাবেতনে বা সামান্য বেতনে কাজ করে দেবে।" আমি ঐ কথা শুনেই পরদিন মাষ্টার মশায়ের কাছে লিখে দিয়েছিলাম, "আমি পড়াশুনা করে পাঁচ বৎসর স্কুলে বিনাবেতনে কাজ করব।"

সামান্য কিছুদিন বাকি ছিল এমন সময়ে স্বামীজীর তিথিপূজায় বেলুড় মঠে মহারাজ ব্রহ্মচর্য ও দীক্ষা দেবেন জেনে (পূজ্য মহাপুরুষ মহারাজ তখন দক্ষিণ দেশে গিয়েছিলেন) আমিও কলকাতায় উদ্বোধনে গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করে ব্রহ্মচর্যের প্রার্থনা জানাই। তিনি বললেন, "তুই তো তোর স্কুলে মাষ্টারী করিস্। পাঁচ বছর শেষ হয়েছে?" আমি বললাম, "না, এখনও হয়নি। কিছুদিন বাকি আছে।" তখন তিনি বললেন "তবে সেটা সেরে এসেই ব্রহ্মচর্য নিবি।" আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম আপনি আমাকে ব্রহ্মচর্য দিচ্ছেন—একথা জানিয়ে খুব আগ্রহ দেখাতে থাকি। আমাকে দয়া করে দিতেই হবে বলায় মহারাজ শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। আর বলে দিলেন, "মঠে গিয়ে সুধীরকে (পূজ্যপাদ স্বামী শুদ্ধানন্দজীকে) বলবি যেন সব ঠিক করে রাখে। আমি কাল সকালে মঠে যাব। বিকালে ব্রহ্মচর্য হবে।" আমি ফিরে পূঃ সুধীর মহারাজকে সব বললাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমিও ব্রহ্মচর্য নেবে নাকি?" আমি বললাম, "আজ্ঞা হাঁ। আমি শরৎ মহারাজের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। তিনি মঞ্জুর করেছেন।" আমি সকালে শিখা রেখে মাথা কামিয়ে তৈরী হয়েছি দেখে কেউ কেউ বললেন, "কেবল শরৎ মহারাজ বললেই হবে না। তুমি কি সুধীর মহারাজের অনুমতি নিয়েছ?" আমি বললাম, "তাঁকে বলেছি যে শরৎ মহারাজ রাজী হয়েছেন।" তাঁরা বললেন, "সুধীর মহারাজও রাজী না হলে মহারাজের কাছে তোমার নাম দেবেন না।" আমি বড়ই চিন্তায়

পড়লাম। কেবল অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন মহারাজ মঠে আসেন। তিনি প্রায় ১০টার সময় একজন ভক্তের গাড়ীতে এসে মঠে নামতেই আমি প্রথমে আমার নেড়া মাথা দেখালাম। তিনি ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম করে পূজ্য মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে বসলেন। আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমাকে কেউ দেখতে না পান, এমন জায়গায় ঘড়িটির নীচে দাঁড়ালাম। প্রথমেই আমার কথা উঠল। পূঃ সুধীর মহারাজ, কৃষ্ণলাল মহারাজ, নির্মল মহারাজ প্রভৃতি বললেন, "রামময় ব্রহ্মচর্য চায়। তাকে তো আমরা বহুদিন ধরে জানি। বেশ ভাল ছেলে। শ্রীশ্রীমার অনেক সেবা করেছে। তবে সে নাকি তার স্কুলে মাষ্টারী করে। তাই আমাদের ইচ্ছা সে ঐটি শেষ করে এসে ব্রহ্মচর্য নেবে ও মঠে এসে যোগ দেবে।" মহারাজ বললেন, "রামময়ের কথা ছাড়। সে কাল আমার কাছে গিয়েছিল। আমি তাকে বলে দিয়েছি তার ব্রহ্মচর্য হবে সে তো তার স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষকের কাজ করছে। টাকা রোজগার করার জন্য তো কাজ করছে না? আমাদের দেওঘরের বিদ্যাপীঠেও তো সাধু ব্রহ্মচারীরা স্কুলে পড়ায়। কাজেই সেও পড়ালে কোনও দোষ হবে না।" আর একজনের কথা উঠল। তার সম্বন্ধে পূঃ সুধীর মহারাজ বললেন, "ছেলেটি তো বেশ ভাল। তবে এখনও ছেলেমানুষ। আরও বড় হয়ে নেবে।" মহারাজ বললেন, "ছেলেমানুষ ব্রহ্মচর্য নেবে না তো কি তোমার আমার মতো বুড়োরা ব্রহ্মচর্য নেবে?" পরে একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "কাল যে রামময়ের হাতে সব ঠিক করে রাখতে বলেছিলাম তার কি করেছ? কেবল কি ঘি, কাঠ, বেলপাতা যোগাড় করে রেখেছ?" আর একজন অন্ধের ব্রহ্মচর্যের কথায় পূঃ সুধীর মহারাজ বললেন, "অন্ধ, চোখে দেখে না।" মহারাজ বললেন, "ব্রহ্মচর্যের জন্য চোখের কি দরকার?" যা হোক এই দুইজনের আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য হয়নি। পরে হয়েছিল। পরে অন্যদের কথা উঠতেই আমি নীচে চলে এসে নিশ্চিন্ত হলাম। যথাসময়ে আমার ব্রহ্মচর্য দীক্ষা হয়ে গেল। মহারাজ আমাকে শ্রীশ্রীমার গোপাল জেনে ব্রহ্মচারী গোপালচৈতন্য নাম দিলেন।

পূজ্য রাজা মহারাজের দেহত্যাগের পর প্রেসিডেণ্ট কে হবেন স্থির করার জন্য ভোটে পূজ্য মহাপুরুষ মহারাজ অপেক্ষা শরৎ মহারাজই ভোট বেশী পান। সকলে তাঁকেই প্রেসিডেণ্ট হবার জন্য অনুরোধ করলেও তিনি কিন্তু হলেন না। তিনি বললেন, "তারকদাই প্রেসিডেণ্ট হবেন। স্বামীজী আমাকে সেক্রেটারী করে গেছেন। যতদিন পারব এই কাজই করব।"

উদ্বোধনে মহারাজ আমাদের সঙ্গেই বসে দুপুরে প্রসাদ পেতেন। উপরে ঘণ্টা পড়ে গেছে। মহারাজ তখনও নীচের ঘরে বসে লীলাপ্রসঙ্গ লিখছেন। দেরী দেখে গোলাপ-মা জোরে জোরে বলছেন, "কি শরৎ আবার নিজ মূর্তি ধরছ নাকি?" মহারাজ, "না, গোলাপ-মা, এখনই আসছি" বলেই তাড়াতাড়ি লেখার সরঞ্জাম গুটিয়ে উপরে গিয়ে প্রসাদ পেতে বসলেন। একদিন বাজার থেকে চন্দ্র পচা মাছ কিনে এনেছিল। কেউ খেতে না পারায় মহারাজ চন্দ্রকে এমন ধমক দিলেন যে সারা উদ্বোধন নিস্তব্ধ! বললেন, "ভাল পোনা মাছ বাজারে না পেলে ভেটকী বা অন্য মাছ আনবে। তবু পচা মাছ আনবে না।" আমরা যখন তাঁর সঙ্গে বসে খেয়েছি তখন তিনি বৃদ্ধ। কাজেই খুবই কম খেতেন। একদিন নানারকম তরকারী খাওয়ার কথা চলছে। কেউ বলছেন, "কচি বাঁশের কোঁড়ের ডালনা কেউ খেয়েছেন?" কেউ

বলছেন, "কচি অশ্বত্থ পাতার ঘণ্ট কেউ খেয়েছেন? ইত্যাদি।" তখন মহারাজ "কেউ পোস্তর কালিয়া খেয়েছ?" সকলেই বললেন, "না খাইনি।" তখন মহারাজ বললেন, "আমি খেয়েছি।" জানি না এইটি শ্রীশ্রীমাও খেয়েছিলেন কিনা। কারণ তিনি একদিন বলেছিলেন, "কালী যে পোস্ত রেঁধে খাইয়েছিল তা যেন এখনও আমার জিবে লেগে আছে।" এই কালী কি স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ? অথবা কাঁকুড়গাছির স্বামী যোগবিনোদ মহারাজ? কারণ কালীমামা রাঁধতে জানতেন না। হয়তো বিশেষ অসুবিধায় পড়লে বা বাইরে গেলে দাল-ভাত রেঁধেছিলেন। কিন্তু পাকা রাঁধুনী ছিলেন না। মাকে জিজ্ঞাসাও করিনি—কোন্ কালী? [ক্রমশঃ]

হরি মহারাজের স্মৃতিতে স্বামীজী

(সংকলন)

স্বামীজী একবার আমাদের বললেন, তোমরা আগে আমাকে বোঝ, তারপর তাঁকে (ঠাকুরকে) বোঝবার চেষ্টা করবে। [প্রশ্ন: কেন মশায়, স্বামীজীকে না বুঝলে কি ঠাকুরকে বোঝা যায় না?]

[উত্তর] দেখ, স্বামীজী আর কিছু না হলেও একটা সম্পূর্ণ (perfect) মানব। এইরূপ সম্পূর্ণ মানবের ধারণা যদি না করা যায় তবে ভগবানের ধারণা করা কি সম্ভব? তাই স্বামীজী বলতেন, আগে আমাকে বোঝ, পরে ঠাকুরকে বুঝবে।

*

স্বামীজী খুব রসিক লোক ছিলেন। একদিন একটা ছড়ি দিয়ে কাজ করতে করতে তার আগাটা গেল ভেঙে। ভেঙে যাওয়ায় আমি মন খারাপ করে বসে আছি। স্বামীজী শুনে বললেন, 'ওতো ওরকম করেই যায়, ওর তো আর ওলাওঠা বা বাত শ্লেষ্মা রোগ হবে না।' আমি কথা শুনে হেসে ফেললাম। কি চমৎকার বললেন, দেখ।

একবার সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো থেকে জাহাজে চড়ে একটা দ্বীপে যাবার সময় স্বামীজীর সঙ্গী আমেরিকানরা ছুটতে লাগলো, তিনি কিন্তু গদাই-লস্করি চালে চলছেন। তারা বলতে লাগলো, 'স্বামীজী স্টীমার ছুটে যাবে।' তিনি জবাব দিলেন, 'আবার আসবে', তখন তারা বললে, 'ভারতবাসী! আপনাদের সময়ের মূল্য-জ্ঞান নেই।' স্বামীজী বেপরোয়া চট্ করে উত্তর দিলেন, 'তোমরা কালের অধীন হয়ে কালে বাস করছ, আমরা কালাতীতকে ধরে মহাকালে বাস করছি বলে কালের কোন ধার ধারিনি।'

*

[একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ-সংবাদ উদ্ধব বিদুরকে জানিয়ে বিলাপ করে বলছেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার! তিনি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করলেন, কিন্তু যদু বংশের কেউই তাঁকে বুঝতে পারলেন না। দিবারাত্র একসঙ্গে শোওয়া-বসা, খাওয়া-খেলা প্রভৃতি সত্ত্বেও জগচ্চিন্তামণি পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কেউ বুঝতে পারল না।' শুধু যদুকুল কেন, সমগ্র মনুষ্যসমাজই হতভাগ্য। কেউই তাঁকে চিনতে পারেনি। এক ঘণ্টা ধরে উদ্ধবের আক্ষেপ, বিলাপাদির ব্যাখ্যা হরি মহারাজ শুনলেন। অতঃপর গম্ভীর হয়ে ঘরে ফিরে যান তিনি,—ক্রমে ঐ ভাবটি প্রশমিত হলে অত্যন্ত করুণ-কণ্ঠে তিনি বলতে থাকেন:]

দেখ, উদ্ধব ঠিকই বলেছেন। আমি এতক্ষণ কি ভাবছিলাম জান? আমরাও স্বামীজীর সঙ্গে একসঙ্গে কাটালুম, একসঙ্গে খাওয়া-বসা,

চলা-ফেরা-শোওয়া, গল্প-গুজব, শাস্ত্রপাঠ, হাসিঠাট্টা দিনের পর দিন বছরের পর বছর করেছি, কিন্তু স্বামীজীকে আমরা একটুও চিনতে পারিনি, তাঁর স্বরূপ আদৌ বুঝতে পারিনি। তিনি যে অত বড় মহাপুরুষ ছিলেন, তার বিন্দু-বিসর্গও আমরা বুঝতে পারিনি যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এখন আস্তে আস্তে একটু একটু যেন বুঝতে পারছি। ঠাকুর যে কত বড় মহাপুরুষকে সঙ্গে এনেছিলেন, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য! যতই উদ্ধবের কথা শুনছিলাম ততই মনে হচ্ছিল, উদ্ধব ঠিকই বলেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে আমরা কি-না করেছি! কিন্তু আমরা তাঁকে ধরতে পারিনি। তখন আমরা ভাবতুম তিনি আমাদেরই মতন, তবে খুব উঁচু ঘরের, সব বিষয়ে আমাদের চেয়ে expert (অভিজ্ঞ)—এই পর্যন্ত মনে হত। আমার মনে হয়, এত বড় মহাপুরুষ, একাধারে এত গুণ ইতঃপূর্বে আর জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি কী গুণের আদরই না জানতেন! এতটুকু গুণ দেখলে, তিলকে তাল করে বলবার অভ্যাস তাঁর ছিল। লোককে ঠেলে তুলে দেবার অসীম শক্তি তাঁর ছিল। কী মহাপ্রাণ ছিলেন তিনি! সকলের জন্য কী feel (সমবেদনা অনুভব) করতেন! সকলের জন্য এত প্রীতি, এত সহানুভূতি আর কোন মানুষের মধ্যে দেখিনি, আর দেখবও না। তাঁর কথা শুনলে মরা মানুষ বেঁচে উঠত। তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে ঘুম পেয়ে যায়, কোন উৎসাহ আসে না। কিন্তু স্বামীজীর কথা শুনলে মরা মানুষ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বলত—'দাঁড়াও দাঁড়াও! মরে তো গেছি, কথাটা একবার শুনে যাই।' তাঁর কথার এতই জোর ছিল যে, ভাব ও ভাষা হৃদয়ের অন্তস্তলে তখনই পৌঁছত, একটুও বিলম্ব হত না। সে সময়ের জন্য ভুল হয়ে যেত। লোকে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যেত। সকলের মনকে এক উচ্চ ভাবভূমিতে তিনি তুলে দিতে পারতেন। [হরি মহারাজ প্রায় আধঘণ্টা ধরে স্বামীজীর সম্বন্ধে বলে, শেষে আক্ষেপ করে বললেন :]

স্বামীজী আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। যতই দিন যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে, কেন তাঁর সঙ্গে আরও বেশী করে মিশলুম না, তাঁর কথা আরও কেন শুনলুম না।

গার্গীকে অভিনন্দন

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

[গত • জানুআরি ১৯৮৩, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অফ কালচারের 'বিবেকানন্দ হলে' আয়োজিত 'বিবেকানন্দ পুরস্কার'-বিতরণী সভায় প্রদত্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের ইংরেজী অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক : ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য।—সঃ]

বন্ধুগণ,

আমরা এক্ষুণি গার্গীর* কাছ থেকে পাশ্চাত্য-দেশে বেদান্ত-প্রচারের দ্বারা স্বামীজী যে-সেবা করেছিলেন তার কথা শুনলাম। আমি খুশী এখানে উপস্থিত হতে পেরে এবং অধ্যাপক তারাপদ চৌধুরীকে সাধুবাদ জানাবার সুযোগ গ্রহণ করে, কারণ তাঁরই প্রদত্ত টাকার আয় থেকে (endowment) এই বিবেকানন্দ-পুরস্কার দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এটা একটা মহতী প্রেরণা হবে—আরও মানুষকে বেশী করে স্বামীজী ও রামকৃষ্ণ আন্দোলন সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধিৎসু হতে উৎসাহিত করবে। আমিও আনন্দিত এই পুরস্কারের জন্য প্রথম নির্বাচিতা গার্গীকে অভিনন্দন জানাতে এবং তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দিতে এখানে উপস্থিত হতে পেরে। শেষে, আপনাদের অনুমতি সহ আমি কি এই ব্যক্তিকেও (নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে) অভিনন্দিত করতে পারি, এই পুরস্কারের প্রথম প্রদাতা হিসাবে ?

আপনারা শুনলেন যে, তাঁকে গার্গী নামে সম্বোধন করা হচ্ছে। যখন থেকে তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন, তখন থেকে এই নামেই তিনি পরিচিত হয়েছেন। আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন, 'তাঁকে এই গার্গী নাম কেন দেওয়া হয়েছে?' এই কারণে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর মেধা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় উপনিষদ্ যুগের মহীয়সী নারী গার্গী বাচক্নবীর কথা, যিনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিচার করেছিলেন। সুতরাং সেই স্মৃতি তাঁকে গার্গী নামে অভিহিত করতে আমাদের প্রণোদিত করেছে। এটা তাঁর চিরস্থায়ী নাম হল।

স্বামীজী সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ করেছেন। আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি—তাঁর আবিষ্কারের জন্য আমরা । এই রকম আবিষ্কারের সম্ভাবনা ভারতবর্ষেও রয়েছে, বিশেষ করে স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের ঘটনাবলী। অনেক জিনিস আছে যা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। আমি অবশ্যই অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসুকে অভিনন্দন জানাবো স্বামীজীর ভারতবর্ষীয় জীবনের অপ্রকাশিত তথ্যান্বেষণে তাঁর অধ্যবসায়ের জন্য।

আপনাদের কাছে আমি একটি ছোট ঘটনার উল্লেখ করব। ঘটনাটি যদিও খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবুও বেশ কৌতূহল-উদ্দীপক। স্বামীজী যখন পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ করছিলেন, তখন মহা-বালেশ্বরমের এক উকিলের বাড়িতে তিনি অতিথি হয়েছিলেন। সেই উকিলের একটি ছোট শিশু ছিল। ঐ শিশুটি দারুণ কাঁদত—তাঁর কান্নায় রাত্রে কেউ ঘুমাতে পারত না। একদিন স্বামীজী শিশুর মা-বাবাকে বললেন, 'আচ্ছা, শিশুটিকে কি তোমরা আমার কাছে দেবে? আজ রাত্রে আমি ওর তত্ত্বাবধান করব।' শিশুটির মা বললেন, 'স্বামীজী, দিতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে কি করে আপনি ওর কান্না থামাবেন?

* আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিস্কোর অধিবাসী মনস্বিনী ম্যারী লুইস্ বার্ক।—সঃ

আমি মা হয়ে যেখানে তাকে থামাতে পারছি না, সেখানে আপনি কি করে তা পারবেন?' তখন স্বামীজী বললেন, 'আচ্ছা, আমাকে চেষ্টা করতে দাও।' সুতরাং শিশুটিকে স্বামীজীর কাছে দেওয়া হল। স্বামীজী তাকে নিয়ে কোলের উপর রেখে ধ্যান করতে আরম্ভ করলেন। তিনি সারারাত ধরে ধ্যান করলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, শিশুটি সারারাতের মধ্যে একবারও কাঁদেনি—শান্ত হয়ে স্বামীজীর কোলে শুয়ে ঘুমিয়েছিল। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, স্বামীজীর ধ্যানের প্রভাবেই শিশুও শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

আর একটি ঘটনা খেতড়ির মহারাজার প্রাসাদে ঘটেছিল। স্বামীজী যখন সেখানে গিয়েছিলেন, তখন একদিন খেতড়ির মহারাজ সপার্ষদ তাঁর কাছে বসেছিলেন। সেই সময় একজন দণ্ডধারী সাধু কম্বল গায়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। সাধু পুরুষ, তাই স্বাভাবিকভাবেই খেতড়ির মহারাজ তাঁকে বসার জন্য উপযুক্ত আসন দিলেন। তিনিও আসন গ্রহণ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বসেই তিনি মহারাজকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন। মহারাজ শান্ত হয়ে শুনছিলেন—কিছুই বলছিলেন না। ঐ সাধুটি তখন স্বামীজীর সম্পর্কেও অমর্যাদাকর কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেন। যখন এতখানি এগিয়েছেন, তখন খেতড়ি-রাজ বিরক্ত হয়ে তাঁকে বললেন, 'আর বেশী দূর নয়। যদি আর একটি কথাও আপনি উচ্চারণ করেন, তাহলে আপনাকে এখান থেকে বহিষ্কৃত হতে হবে।' সাধু তখন সেখান থেকে নিচে নেমে, মেঝের উপর গড়াগড়ি খেতে লাগলেন আর খুব হাসতে লাগলেন। কেউ কিন্তু বুঝতে পারলেন না কেন। তারপর ঐ সাধুটি উঠে দাঁড়িয়ে মহারাজকে বললেন, 'আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন, তাই আমি খুশী।' এই বলে সেখান থেকে তিনি চলে যান। এর দ্বারা ঐ সাধু বুঝালেন যে, যখন তিনি মহারাজকে গালাগালি দিচ্ছিলেন, তখন মহারাজ চুপ করে ছিলেন—এটা তাঁর বিনয়। কিন্তু যখন তিনি স্বামীজীর সম্পর্কে, ধর্মের বিরুদ্ধে অসম্মানকর উক্তি করেছেন, তখন যে মহারাজ আর শান্ত হয়ে থাকতে পারেননি, বরং তিনি সাধুর উপর রুষ্ট হয়েছিলেন,—এটাই রাজোচিত কর্তব্য। সেজন্য সাধু বলেছিলেন, 'আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন, তাই আমি খুশী।'

এই রকম অনেক ঘটনার অনুসন্ধান হতে পারে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশে, যদি আমরা সে রকম নিষ্ঠা নিয়ে অন্বেষণ চালাই।

প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ* ছাড়াও গার্গী আরও চারখানি গ্রন্থের উপযোগী যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করেছেন। সুতরাং আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, আপনারা আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করুন—তিনি যেন গার্গীকে কুশলে রাখেন, যাতে তিনি বাকী গ্রন্থগুলির কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সক্ষম হন। আমরা সবাই উদ্‌গ্রীব—ঐ চারখানি গ্রন্থ যেন অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হয়।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

---

* Swami Vivekananda in America: New Discoveries এবং Swami Vivekananda: His Second Visit to the West: New Discoveries প্রকাশিত এই গ্রন্থদুটি এতাবৎ সংগৃহীত আরও নতুন তথ্যাদি সহ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে দু-খণ্ডেই পুনঃপ্রকাশিত হবে। দু-খণ্ডের তৃতীয় গ্রন্থটির কাজও সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বর্তমানে তা প্রকাশক অদ্বৈত আশ্রমের কাছে দেওয়া হয়েছে। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা করা হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্যে প্রথম পরিদর্শন ১৮৯৫ ও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ঠিক পর থেকে। পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ের সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চার-খণ্ড এবং নতুন তৃতীয় গ্রন্থের দু-খণ্ড সর্বসমেত এই ছয়-খণ্ডের একটি গ্রন্থমালা আমরা অচিরেই পাব।—সঃ

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

অধ্যাপক ধর্মপাল মহাথের

বাংলার ও বাঙালীর জীবনে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অতীশ দীপঙ্করের আবির্ভাব এক স্মরণীয় ও বরণীয় অধ্যায়রূপে সুচিহ্নিত।

শুধু বাংলা বা বাঙালী কেন সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির জয়যাত্রায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অবদান বিস্ময়ে হতবাক্‌ করার মতো।

খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বাংলার মাটিতে ঢাকার অন্তর্গত বজ্রযোগিনীর রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজা কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। শৈশব থেকেই ইনি অত্যন্ত মেধাবী ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। অত্যল্পকালের মধ্যে তিনি নানাশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন শিক্ষাগুরুর সংস্পর্শে এসে তিনি একাধারে হয়ে উঠলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ এক বিতর্কিত পণ্ডিত এবং আর একদিকে সাধারণ সুখী ও গৃহী জীবনের প্রতি নিরাসক্ত। সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা করলেন তন্ত্র অধ্যয়ন ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করতে। পরবর্তীকালে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হলেন। সে-সময়ে বিক্রমশীলার নাম ও যশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত। একই সঙ্গে অধ্যক্ষের দায়িত্বপালন এবং সমগ্র বিহারের সুদক্ষ পরিচালনায় তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

যে জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা সঙ্গে নিয়ে অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতের তুষারাবৃত ভূমিতে উপনীত হলেন—তা ছিল বুদ্ধেরই অমূল্য বাণী—দয়া, প্রেম, করুণা, তিতিক্ষা এই সব।

তন্ত্রের প্রাধান্যে ও তার অপপ্রয়োগে তিব্বতের বৌদ্ধ মঠ ও বিহারগুলি তখন ভ্রষ্টাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার লীলাভূমি। সাধারণ নাগরিকরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি যেন বীতশ্রদ্ধ। অনেকেই মনে মনে বুদ্ধের অনুশাসনগুলির ওপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকলেও কেউই অনাচার ও ভ্রষ্টাচারকে একদিনও প্রশ্রয় দিতে উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু তখন উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বুদ্ধের বাণী, তাঁর পরিচিতি এবং তাঁর উপদেশাবলীর সঠিক প্রচার ও প্রসারের সকল দিক অবরুদ্ধ।

দীপঙ্কর ধীরে ধীরে বুদ্ধের উপদেশাবলীর সম্যক্‌ অর্থ এবং জীবনে তার ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা সকলের সামনে প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করলেন—আচারে-আচরণে নৈতিক জীবনযাপনের কথা বললেন—কঠোর সংযমের মধ্য দিয়ে বুদ্ধের প্রকৃত আদর্শকে অনুসরণ করতে উপদেশ দিলেন এবং দুঃস্থ ও আর্তের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করতে উদ্বুদ্ধ করলেন।

এইভাবে দীপঙ্কর একদিকে অধঃপতিত বৌদ্ধধর্মের ও মঠগুলির আভ্যন্তরীণ আমূল সংস্কার সাধন, নূতন বৌদ্ধ বিহারের প্রতিষ্ঠা এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন এক সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করলেন—যা আজ 'লামা' গোষ্ঠীরূপে পরিচিত।

আমাদের কাছে আজ সবকিছুই যেন অকল্পনীয়। ষাট বছর বয়সে প্রভূত দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করে, দুস্তর বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে তিব্বতে পৌঁছে দীপঙ্কর সেখানকার জনগণের মধ্যে যে আশা ও নব উদ্দীপনার প্লাবন এনে দিলেন, ধর্মকে কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করে যে অভূতপূর্ব ধর্মীয় পরিমণ্ডল গড়ে তুললেন—ইতিহাসে তা তুলনারহিত।

মাত্র তেরো বছর, কালের হিসাবে কিছুই নয়। কিন্তু এই তেরো বছরে দীপঙ্কর তিব্বতকে যেন

তেরো হাজার বছর এগিয়ে নিয়ে গেলেন। বৌদ্ধধর্মকে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে, বুদ্ধের আদর্শকে নিজের জীবনে প্রতিনিয়ত আচরণের মধ্য দিয়ে যেভাবে তিব্বতের সকল শ্রেণীর লোকের সামনে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আজও পৃথিবীর সমস্ত বৌদ্ধসম্প্রদায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে ভগবৎতুল্য মনে করেন এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে তাঁর নাম স্মরণ করেন। বাঙালীরা অতীশ দীপঙ্করকে বিস্মৃত হলেও বহির্ভারতে সুদূর সাইবেরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার প্রত্যন্তেও দীপঙ্করের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত।

এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং যে-অভিজ্ঞতা-প্রসূত-চিন্তা-ভাবনার দ্বারা পরিপুষ্ট "অতীশ দীপঙ্কর জন্ম-সহস্রবর্ষ পূর্তি" এক বিরাট উৎসব রূপ পরিগ্রহ করে আড়ম্বরের সঙ্গে কলকাতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার, উদ্যোগে,—সে সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা আমার কর্তব্য মনে করি।

১৯৮১ সালের জুলাই-এর শেষের দিকে সাত সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় বৌদ্ধ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সোবিয়েত রাশিয়ায় উত্তর সাইবেরিয়ার বুরিয়াৎ অঞ্চলে সেখানকার বৌদ্ধদের প্রাণকেন্দ্র 'উলান-উদে'তে দু-দিন থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। সেখানকার বৌদ্ধরা সরল, শ্রদ্ধাশীল, অত্যন্ত অমায়িক এবং ধর্মপরায়ণ।

পরমপূজ্য খাম্বোলামার নেতৃত্বে সেখানে আমাদের যে অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয়, যে সম্মান দেওয়া হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

সাত সদস্যের মধ্যে একমাত্র আমিই ছিলাম বাঙালী। অন্যরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের—হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লী ও পাঞ্জাবের।

ওই মহান্ সংঘারামের প্রবেশপথে প্রায় সহস্রাধিক বুরিয়াতী বৌদ্ধ আমাদের সংবর্ধনার জন্য অপেক্ষারত ছিলেন। মহামান্য খাম্বোলামার নেতৃত্বে প্রধান পূজা-মন্দিরে আমাদের বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়।

প্রশ্নোত্তরকালে আমি বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েসনের প্রতিনিধি এবং বাঙালী বলায় উক্ত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যেন এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হল—প্রত্যেকেই আমার স্পর্শ-লাভের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠল এবং ভাবে-ভঙ্গীতে ও কথায় উচ্ছ্বসিত হয়ে একথাই বারবার জানাতে লাগল—"তুমি অতীশের দেশের লোক, তুমি বাঙালী—সেইজন্যই তুমি নমস্য।" বিস্ময়ে আমি অভিভূত হলাম। তখন আমি এ কথাই চিন্তা করছিলাম—"কিসের আশায় এই ধর্মপ্রাণ মানুষগুলি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে আমার স্পর্শ কামনা করছে? আমি এর বিনিময়ে কি দিতে পারি? আমি তো সাধারণ একজন বৌদ্ধভিক্ষু! কিন্তু এদের কাছে আমার বড় পরিচয়—আমি অতীশের জাতি, আমি অতীশের দেশের লোক, আমি বাঙালী।"

ওই সংঘারামে তৎক্ষণাৎ আমি স্থির সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বাঙালী হিসাবে অতীশ দীপঙ্করের প্রতি আমাদের একটি কর্তব্য আছে এবং সেটি হল তাঁর সহস্র-জন্মবার্ষিকী মর্যাদার সঙ্গে পালন করা।

মঙ্গোলিয়া থেকে ফিরে এসে দীপঙ্করের জন্ম-সহস্রবর্ষ নিষ্ঠা ও মর্যাদা সহকারে পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। বিভিন্ন জনের সঙ্গে পরামর্শ করে বিভিন্ন দেশে আমন্ত্রণ পাঠাতে শুরু করি। আমার কল্পনাতীত ছিল যে এত সুন্দর ও ব্যাপক আকার ধারণ করবে এই উৎসব। রাশিয়া,

কোরিয়া, জাপান, ইংল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা, সিকিম, ভূটান, বাংলাদেশ—সব দেশ থেকেই শ্রদ্ধেয় লামা ও বৌদ্ধ পণ্ডিতরা এই আন্তর্জাতিক উৎসবে যোগদান করে আমাদের ধন্য করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, উৎসবের মধ্যমণিরূপে পেয়েছি মহামান্য দালাই লামাকে। আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের সকল শ্রেণীর মানুষের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা মস্তকে ধারণ করে এই দুর্লভজন্মা বঙ্গজননীর বরেণ্য সন্তানের উদ্দেশে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে অন্তরে গভীর প্রশান্তি লাভ করেছি। এত বড় সুখ ও সৌভাগ্যের অংশীদার হতে পেরে সত্যিই আমি ধন্য ও কৃতার্থ।

সার্থক জীবন

শ্রীসুনীলচন্দ্র পালিত

পথের পথিক মোরা আসি আর যাই,
আপন অন্তরে কভু ফিরে নাহি চাই।
জানি না পথের শেষ কবে বা কোথায়,
কেহ কি বসিয়া আছে সেথা প্রতীক্ষায় ?
সুখ-দুঃখ ফেলে পথে আলো আর ছায়া,
আশা-নিরাশায় রচে অপরূপ মায়া।
নয়নে চকিতে কভু হাসি করে খেলা,
প্রিয়জন স্মরি মন হয়েছে সুরেলা।
কখন বা চলি ধীরে বিষণ্ণ বদন,
রোগ-শোক-তাপ-ভারে ক্লান্ত দেহ-মন।
কভু ঘরে সন্তোষের মধুর গুঞ্জন,
কখন অতৃপ্তি করে কটু সম্ভাষণ।
কভু স্বপ্নলোকে ফিরি খুশি-ভরা মন,
বাস্তব-সংঘাতে কভু দুঃখে নিমগন।
বিচিত্র এ চিত্রে ঢাকা সত্য পরিচয়,
কোথা সুখ—কোথা শান্তি, ব্যাকুল হৃদয়।
ব্যাকুল অন্তরে ঝরে অশ্রুর ঝরনা,
ধুয়ে যায় কালি, আসে জননী করুণা।
আঁধারের বুকে জাগে আলোর স্পন্দন,
মৃত্যু মেলে আঁখি মাখি অমৃত-অঞ্জন।
সত্যের আলোকে দীপ্ত বিশ্ব মধুময়,
স্নেহস্পর্শ লভি মোরা হয়েছি নির্ভয়।
জীবনের পথে কত সার্থক সঞ্চয়,
'অজানা'-পরশ লভি 'জানা'র বিস্ময়।
মোরা নহি ঝরা ফুল সৌরভ-বিহীন,
পূজার ডালায় মোরা চির অমলিন।
মায়ের সন্তান মোরা কেন যাই ভুলে,
আনন্দ-স্বরূপ মোরা আছি মার কোলে।
আপনা ভুলিয়া ভাল বাসিলে সবারে
প্রেমের তরণী পাব দুঃখ-পারাবারে।
এ জীবন-তীর্থ-যাত্রা সার্থক সুন্দর,
মায়ের চরণে সুখ শান্তি নিরন্তর।



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

‘শ্রীরামঃ করুণাকরঃ’

মিথিলাধিপতি জনক রাজার পণ ছিল, যিনি তাঁর কাছে রক্ষিত হরধনুতে জ্যা রোপণ করতে পারবেন, তাঁরই সঙ্গে পরমা সুন্দরী কন্যা সীতার বিবাহ দেবেন। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক রাজা-মহারাজারা এলেন এই হরধনুতে গুণ আরোপ করে সুন্দরী শোভনীয়া সীতাকে স্ত্রীরূপে বরণ করবার জন্য। কিন্তু কেউই সে ধনুতে গুণ আরোপ করতে পারলেন না। একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলার রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন। বিশ্বামিত্র জনক রাজাকে বললেন, “রাজন্, দশরথের পুত্র রামকে তোমার পাশুপত ধনু এনে দেখাও।” মিথিলাধিপতি তাঁর মন্ত্রীকে হুকুম দিলেন পাশুপত ধনু নিয়ে আসার জন্য। পাঁচ হাজার বলবান্ বাহক সেই বিশাল হরধনুকে বয়ে নিয়ে এল রাজসভায়। রামচন্দ্র পাশুপত ধনু দেখে আনন্দে স্মিত হাসলেন। তিনি অবলীলাক্রমে সেই শৈব ধনুকে বাম হস্তে উত্তোলন করে দক্ষিণ হস্তে তাতে গুণ আরোপ করলেন। তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড শব্দে হরধনু ভেঙে গেল। শব্দে আকাশ বাতাস স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কেঁপে উঠল। শ্রীরামচন্দ্রকে হরধনুভঙ্গ করতে দেখে স্বর্গের দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি সহ তাঁকে স্তব-স্তুতি করতে লাগলেন। স্বর্গে-মর্ত্যে শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি উঠল। চতুর্দিকে আনন্দের সাড়া জাগল।

শ্রীরামচন্দ্রের এই অদ্ভুত শক্তিমত্তায় মিথিলাধিপতি জনক অতিশয় আনন্দিত হলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে তিনি অনুরোধ জানিয়ে বললেন, “হে মুনিশ্রেষ্ঠ কৌশিক, শীঘ্র অযোধ্যাধীশ দশরথের কাছে এই শুভ সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তাঁরা যেন সপরিবারে এসে এই আনন্দোৎসবে যোগদান করেন।” দূত মারফতে দশরথের কাছে এই সংবাদ পাঠানো হল। এদিকে আদরের কন্যা জানকীর সঙ্গে শ্রীরামের শুভ পরিণয়ের দিন নির্ধারিত করে এবং অযোধ্যা থেকে রাজ-পরিবারের আগমনের অপেক্ষায় মিথিলাধিপতি উদগ্রীব হয়ে দিন কাটাতে থাকলেন।

রাজা দশরথ ঐ শুভ সংবাদ পেয়ে মহানন্দে সর্বাগ্রে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী মিথিলায় প্রেরণ করলেন। সপরিবারে কুলগুরু মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে তিনি মহতী রক্ষিবাহিনী সহ বীর পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন মানসে এবং তাঁর শুভ পরিণয়ানুষ্ঠানে যোগ দিতে অচিরে মিথিলায় এসে উপস্থিত হলেন। রাজা জনক মহা ধূমধামে রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার এবং লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে অপর কন্যাগণেরও বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন।

মহাড়ম্বরে যথাবিধি বিবাহাদি অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিদায় নিয়ে তাঁর গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন। রাজা দশরথ হর্ষচিত্তে পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়ে প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখতে দেখতে ফিরে আসছেন অযোধ্যায়।

মিথিলা থেকে তিন যোজন পথ অতিক্রম করতে না করতে দশরথ অশুভ লক্ষণ দেখতে পেলেন। ভয় পেয়ে তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রণাম করে বললেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ, চারিদিকে এসব অশুভ লক্ষণ দেখছি কেন?" মহর্ষি বললেন, "হ্যাঁ, আগামী ভয়ংকর বিপদ সূচিত হচ্ছে ঠিকই, তবে শীঘ্র ঐ বিপদ কেটে যাবে।" বলতে না বলতে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। প্রবল বায়ুবেগে ধূলি বর্ষিত হয়ে সবার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দিল। ক্ষণকাল পরে সেখানে উপস্থিত হল প্রচণ্ড তেজরাশি। রাজা দশরথ দেখলেন, তাঁর সম্মুখে উপস্থিত কার্তবীর্য ক্ষত্রিয়মর্দন কালান্তক সদৃশ জামদগ্ন্য পরশুরাম। তাঁর অঙ্গ-কান্তি নীল মেঘের ন্যায়, মস্তকে জটামণ্ডল, হস্তে বৈষ্ণব ধনু ও পরশু। দশরথ দেখলেন, সাক্ষাৎ দ্বিতীয় কালের ন্যায় পরশুরাম তাঁর পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। দশরথ ভয়ে বিহ্বল হয়ে তাঁকে অর্ঘ্যাদি পূজা প্রদান করতে ভুলে গিয়ে, দণ্ডবৎ প্রণাম করতে করতে বার বার বলতে লাগলেন, "হে ব্রাহ্মণ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আমার পুত্রের প্রাণ দান করুন। আপনার কাছে আমার পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাইছি।" পরশুরাম এই করুণ আর্তনাদ ও মিনতিতে আদৌ কর্ণপাত করলেন না। বরং তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে কর্কশ সম্বোধন করে বললেন, "রে ক্ষত্রিয়াধম, তুই আমার রাম নাম নিয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিস। যদি ক্ষত্রিয় বলেই তোর অভিমান থাকে, তবে এক্ষুণি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কর্। একখানা পুরানো কীটজীর্ণ ধনু ভেঙে তুই বৃথা গর্বিত হয়েছিস্। এখন যদি আমার এই বৈষ্ণব ধনুতে জ্যা রোপণ করতে পারিস্ তবে তোর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব, নচেৎ তোদের সবাইকে এখানেই আমি নিধন করব।"

জামদগ্ন্য পরশুরামের এই কথায় ধরাতল কম্পিত হল, ভীষণ অন্ধকারে সকলের দৃষ্টি রুদ্ধ হল। মহাবীর্যবান্ শ্রীরামচন্দ্র তেজোদৃপ্ত নয়নে ঐ উদ্ধত পরশুরামকে এক পলক দর্শন করলেন,—পরে তাঁর হস্ত থেকে ধনু গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ তাতে গুণ আরোপণ করেন। অতঃপর গর্জে ওঠেন: "হে ব্রাহ্মণ, আমার বাক্য শ্রবণ করুন। দয়া করে বলুন আমার এই বাণ এখন কোথায় নিক্ষেপ করব। পরলোকে বা ইহলোকে? কোথায় কোন্ পথ রোধ করব? শীঘ্র আজ্ঞা করুন। এই বাণের দ্বারা যে-লোকের যে-গতিপথ রোধ করব, সেখানে কিন্তু আপনারও প্রবেশ অধিকার থাকবে না।" শ্রীরামচন্দ্রের বজ্রকঠিন এই বাক্য শুনে মহাপরাক্রমশালী, দ্বিতীয় কালের ন্যায় বিরাজকারী পরশুরামের জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল মলিন হয়ে উঠল। তাঁর অহংকার চূর্ণ হল। তাঁর হৃদয়ে ভক্তির উদয় হওয়াতে, করজোড়ে তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে স্তুতি করতে শুরু করলেন। শৈশব-স্মৃতি একে একে তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠতে থাকল। আবেগ-জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকেন: "হে রাম, হে মহাবাহু, আমি জানি, তুমি পরমেশ্বর। তুমি পুরাণপুরুষ বিষ্ণু। তুমিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ। বাল্যকালে যখন আমি তীর্থচক্রে বিষ্ণুর আরাধনা করছিলাম, তখন তুমি আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলে, 'ব্রাহ্মণ, তোমার তপস্যায় আমি খুশি হয়েছি। তুমি তপস্যা ত্যাগ করে তোমার পিতৃহন্তা হৈহয়-শেখর কার্তবীর্যকে সংহার কর। তারপর এক-বিংশতিবার ক্ষত্রিয়মণ্ডলকে বধ করে সমস্ত ভূমি কাশ্যপ মুনিকে প্রদান করে শান্তি লাভ কর। ত্রেতাযুগে আমি দশরথ-পুত্র রামরূপে ধরাতলে আবির্ভূত হব। আমি যে তোমাকে এই তেজ দিলাম, সেই সময়ে হরণ করে নেব।' হে রাম,

তুমিই সেই বিষ্ণু। ব্রহ্মার প্রার্থনায় জগতের কল্যাণের জন্য ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছ। হে প্রভু, তোমাকে দর্শন করে আজ আমার জীবন ধন্য হল। তুমি ব্রহ্মাদিরও অলভ্য, কেন-না তুমি প্রকৃতির পরগামী। তোমার মায়ায়, তুমি জগৎকে মুগ্ধ করে রেখেছ। তোমার কৃপা না হলে কারো সাধ্য নেই তোমার এই ত্রিভুবনমোহিনী মায়ার হাত থেকে নিস্তার পায়। হে প্রভু, তোমার মহিমার কথা আর কি বলব? হে জগন্নাথ, তোমাকে নমস্কার। হে ভক্তিভাবন, তোমাকে নমস্কার। হে কারুণিক অনন্ত রামচন্দ্র, তোমাকে বারবার প্রণাম করি। আমার কর্মরাশিই হোক তোমার বাণের লক্ষ্য—অর্থাৎ আমার সমস্ত কর্মক্ষয় করিয়ে দিয়ে মুক্তি প্রদান কর।"

*

তারপর কত যুগ কেটে গেছে! পরশুরাম-বন্দিত সেই জগন্নাথ শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন অন্য রূপে;—এবার কিন্তু তীর-ধনুক হাতে নিয়ে নয়—সম্পূর্ণ ভিন্ন বেশে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আছে, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে অধ্যাত্মরামায়ণ থেকে রামলাল দাদা এই পরশুরাম-কাহিনী পাঠ করে শোনাচ্ছেন—কাছে মাস্টারমশায়ও বসে আছেন। নিজের কথাই নিজে শুনছেন! কী অপূর্ব দৃশ্য! কথামৃতকার লিখেছেন: "পরশুরামের স্তব শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট! মাঝে মাঝে 'রাম রাম' এই নাম মধুরকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছেন।"

গুরু ও মা

শ্রীমহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) অতুলনীয় স্নেহ-কৃপার কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ডাক্তার মহারাজ (উদ্বোধনের স্বামী পূর্ণানন্দ) বলিয়াছিলেন—"তখন ডাক্তারী পড়ি, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয়লাভের জন্য অন্তরে ইচ্ছারও উদ্রেক হইয়াছে। মহারাজ বলরাম-মন্দিরে আসার সংবাদ পাইলেই সেখানে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করি ও নিজ অন্তরের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করি। মহারাজও স্নেহাদর দেখাইয়া কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের নিকটেই বসিতে বলিতেন। বসিবার পরে কিন্তু আর বিশেষ কিছু বলিতেন না। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীরভাবে তিনি বসিয়াই থাকিতেন,—আর ফরসির নল হাতে লইয়া কখন মুখে টানিতেন—কখনও বা টানিতেন না। আবার কোনদিন হয়তো আমাকে ঐ-ভাবে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া নিজে উঠিয়া বারান্দায় একা বেড়াইতেন। হঠাৎ কেউ আসিয়া পড়িলে, আগন্তুকের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতেই কথাবার্তা বলিতেন। অথচ আমি উঠিতে চাহিলেই বলিতেন, 'বোস আর একটু'! আমিও উহাতে খুব আশ্বস্ত হইয়া তখন ভাবিতাম—এবার হয়তো আমাকে কিছু উপদেশ দিবেন বা কিছু কথা বলিবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কথাই হইত না। আমি আগ্রহ দেখাইলে বলিতেন, 'আজ থাক্ আর একদিন হবে।' এই রকম ভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, কতদিন নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছি! মনে হইয়াছে, মিছামিছি আর এমন ঘোরাফেরা করিব না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মহারাজের কাছে না গিয়াও থাকিতে পারিতাম না। এক-একদিন এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টাও নিঃশব্দে বসিয়া কাটাইয়াছি। মনে কত কথাই তোলপাড় করিত, কত চিন্তার ঢেউ উঠিত! সময় যেন কাটিতে চাহিত না। মহারাজ ঘরে থাকিলে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম, কখনও বা

নিকটে কোন বই বা কাগজপত্র থাকিলে, উহারই উপর শত শত বার চোখ বুলাইয়া সময় কাটাইতে চেষ্টা করিতাম। এইভাবে তখন মহা অশান্তিতে সময় কাটিত, কিন্তু ফিরিবার মুখে মহারাজের প্রসন্ন বদনে মধুর বাণী—শুভাশীর্বাদ শুনিয়া মন আবার আনন্দে ভরিয়া যাইত। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে মহারাজকে কতদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—কিছু উপদেশ দিবার জন্য কতবার অনুনয় জানাইয়াছি!! কিন্তু রোজই এক উত্তর শুনিয়াছি : 'আজ থাক্। আর একদিন আসিও, তখন সব কথা ভাল করিয়া শুনিয়া বলিব।' এইভাবে প্রায় দুই বৎসর যাতায়াতের পর সহসা একদিন মহারাজ কৃপা করেন,—নিজের আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ হয়।"

মহারাজের স্নেহ-মমতার কথা স্মরণপূর্বক ডাক্তার মহারাজ পরবর্তীকালে অতিশয় আবেগ-ভরে বলিতেন—"আমাদের চঞ্চল মনকে স্থির করার উদ্দেশ্যে, ধৈর্য তিতিক্ষা বাড়াইবার জন্য আমাদের অজ্ঞাতসারে মহারাজ কী চেষ্টাই না করিয়াছেন, —এখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।"

মহারাজের শিক্ষাদান বিষয়ে অন্য আর একটি কথাও শুনিয়াছিলাম তাঁহার মুখে। মহারাজ তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, রোজ সন্ধ্যা-সকালে কমপক্ষে দশ হাজার জপ, সংখ্যা রাখিয়া অবশ্যই করিতে হইবে। আর যদি কোনদিন সংখ্যা ভুল হয়, তবে আবার প্রথম হইতে জপ করিতে হইবে—নতুবা জপের ফল রাক্ষসে খাইয়া ফেলিবে। ডাক্তার মহারাজ শ্রীগুরুর এই আদেশ অনুযায়ী খুব নিষ্ঠা সহকারে ও একাগ্রচিত্তে নিত্য জপ করিতেন। কিন্তু কোন কোনদিন ভুলও হইয়া যাইত,—তিনিও গুরুবাক্য অনুসারে তখন আবার প্রথম হইতে জপ আরম্ভ করিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করিতেন। এক-একদিন এমন হইত যে সংখ্যা পূর্ণ হইতে অল্প বাকী,—সহসা ভুল হইয়া পড়িল! কাজেই আবার প্রথম হইতে শুরু হইল। স্বাভাবিক কারণেই ঐ-রকম দিনে, যথা সময়ে খাওয়া হইত না—বেশ দেরী হইয়া যাইত। ফলে, এই কারণে তাঁহাকে অনেকের তিরস্কারও সহ্য করিতে হইত। এই রকম মাঝে মাঝেই হইতে থাকিলে,—একদিন রাত্রে দেরী বড় বেশী হইয়া পড়িল। তাহাতে আশ্রমের সকলেই খুব বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকেন। সেদিন সত্যই অধিক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল।

উদ্বোধনে তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও রহিয়াছেন। ডাক্তার মহারাজকে লইয়া ঐ-রাত্রে গোলযোগ শুনিয়া, মা স্বয়ং তাঁহাকে ডাকিয়া সুমিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন : "রাত্রে খাওয়ার সময়ে আসিতে তোমার কেন দেরী হয়, বাবা?" শ্রীশ্রীমায়ের এই স্নেহমাখা বাক্যে সন্তানের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। মায়ের প্রবোধবাক্যে শান্ত স্থির হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রীগুরুর দশ হাজার জপ সম্পূর্ণ করিবার আদেশের কথা নিবেদন করিলেন। আরও জানাইলেন যে নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ না করিলে জপ-ফল রাক্ষসে বিনষ্ট করিবে এইরূপ ভীতিও মহারাজ তাঁহাকে দেখাইয়াছেন। করুণাময়ী জননী সন্তানের মুখে, রাক্ষসে জপ-ফল খাইয়া ফেলিবে শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অভয় দিয়া ভীত সন্তানকে বলিলেন : "বাবা তোমাদের চঞ্চল মনকে স্থির একাগ্র করিবার উদ্দেশ্যেই রাখাল ঐ-রকম বলিয়াছে। আমি তোমাকে বলিতেছি,—এখন হইতে তুমি আর ও-জন্য ভয় পাইও না। খাবার ঘণ্টা পড়িলেই আসিয়া খাইবে। জপ-সংখ্যা যদি তখনও পূর্ণ না হয়, তবে পরে আবার সুবিধা মতো বসিয়া বাকী সংখ্যা জপ করিবে। ইহাতে কোনও দোষ হইবে না তোমার।"

শ্রীশ্রীমায়ের নিজমুখের আশ্বাস ও অভয়-বাণীতে সন্তানের মনের সকল শঙ্কা মিটিয়া গিয়াছিল চিরতরে—তদবধি ঐ-ভাবেই তিনি জপাদি করিতে থাকেন—এবং পারিপার্শ্বিক সকল বাধাও দূর হইয়া যায় অচিরেই।

[স্বামী সারদেশানন্দ-লিখিত পত্রের অংশ। তারিখ : ২৩।৯।৭০]

জ্ঞান-বিজ্ঞান

রক্তচোষা বাদুড়

কত কাল্পনিক কাহিনীই না চালু আছে এই উড়ন্ত স্তন্যপায়ী জীবটিকে ঘিরে—ইংরেজীতে যাকে বলে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট (vampire bat)। এই রক্তচোষা বাদুড় ভারতে নেই। এদের পাওয়া যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায়। বলা হয়ে থাকে এরা নির্দয়, নির্মম, ভয়ঙ্কর, মানুষের রক্ত শোষণ করে মেরে ফেলে মানুষকে। ধারণাটি সঠিক নয়। রক্তচোষা বাদুড় খুব বড় জীব নয় —মাত্র ইঞ্চি তিনেক লম্বা। এ বাদুড় রক্ত শুষে নেয় না—রক্ত চেটে খায়, যেমন করে বিড়াল-ছানা দুধ চেটে খায় একটি বাটি থেকে। অবশ্য এটা সত্য যে কখন কখন কালেভদ্রে এই ধরনের বাদুড় মানুষের রক্ত খেতে আসে—লেপের বাইরে পা ঢাকা না থাকলে ঐ অনাবৃত পা থেকে রক্ত চেটে নিতে পারে, কিন্তু এর জন্য কোন মানুষ মারা গেছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে ভয় শুধু জলাতঙ্ক রোগগ্রস্ত রক্তচোষা বাদুড়কে—কারণ এরা রক্ত চেটে খেলে মানুষের জলাতঙ্ক হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই এ ধরনের বাদুড় কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ না হবার প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন নিতে হয়।

জন্তুটি ভালবাসে বন্য জন্তুর রক্ত। কখন কখন গোরু, ছাগল এমন কি হাঁসও আক্রান্ত হয়। ধারালো সামনের দাঁতগুলো দিয়ে চামড়া ফুটো করে। তখন রক্ত চুঁয়ে পড়তে থাকে। বাদুড় চাটতে থাকে ঐ রক্ত। ওর লালায় এমন রাসায়নিক পদার্থ আছে, যা রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না, যতক্ষণ এ রক্ত চেটে খায় ততক্ষণ পর্যন্ত। [অবশ্য একবারে মাত্র এক আউন্স রক্তই একটি বাদুড় খেতে পারে তার বেশী নয়।] বহু বাদুড় একসঙ্গে আক্রমণ না করলে কোন জন্তু মারা যায় না। অবশ্য জলাতঙ্কের কথা আলাদা।

কিন্তু কেন এ প্রাণী রক্ত খায়? কেউ জানে না কবে থেকে এটা শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন এর দেহযন্ত্র বিশেষভাবে রূপান্তরিত হয়েছে, যেমন প্রাণীটির কিডনী বা বৃক্ক অত্যন্ত উন্নত ও কার্যকর। এখন রক্তচোষা বাদুড় রক্ত ছাড়া অন্য কিছু খায় না—রক্ত ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থ থেকে প্রাণীটি তার পুষ্টি আর যোগাড় করতে পারে না।

দেশ-বিদেশ

অরুণাচলের অধিবাসী : শেরদুকপেন

বোমডিলা পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে প্রবাহিত তেঙ্গাপানি নদী। এই নদীবিধৌত উপত্যকায় শেরদুকপেন উপজাতিরা বাস করে। উপত্যকাটি কামেঙ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে। রূপা, জিগাঁও ও শেরগাঁও নামে তিনটি গ্রামে এবং আরও কিছু ছোট ছোট গ্রামে শেরদুকপেনরা বসবাস করে। এরাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী এবং মোন্‌পাদের সঙ্গে এদের অনেক সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য রয়েছে।

শেরদুকপেনদের বাড়ি তৈরির কোন নির্দিষ্ট ধরন নেই। তবে সাধারণতঃ দেখা যায়, মাটি থেকে ৫-৭ ফুট উপরে তারা বাড়ি তৈরি করে। মেঝে কাঠের তক্তার পাটাতন, দেওয়াল পাথরের এবং ছাদ তৈরি করে পাতলা তক্তা ও বাঁশ দিয়ে। ছাদ এবং সিলিং-এর ফাঁকা জায়গাটিতে তারা শস্যাদি এবং নানারকম জিনিসপত্র রাখে। বাড়ির নিচে ৫-৭ ফুট খালি জায়গা তারা গোরু, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু রাখার জন্য ব্যবহার করে। বাড়ির একটা অলিন্দ সহ দুটি ঘর থাকে। বাড়ির সামনে সাধারণতঃ কোন খালি জায়গা থাকে না,

তবে 'গাঁওবুড়া'র (গ্রামের মোড়লের) বাড়ির সামনে সভাদি করার জন্য একটুখানি খালি জায়গা রাখা হয়।

শেরদুকপেন উপজাতিদের ভাষা মোন্‌পাদের ভাষা থেকে আলাদা। ভুটানীদের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার অনেক মিল আছে। এই উপজাতিরা থং, ছাও ও যান্‌লো নামে তিনটি দলে বিভক্ত। অনেকে বলেন, ছাও-দলেরই অন্তর্ভুক্ত যান্‌লো। ছাও-রা থংদের বাড়িতে কাজকর্ম করে এবং শবদেহ সৎকারাদি করে।

শেরদুকপেনের পুরুষরা 'সাপো' পরে। সাপো অর্থাৎ একখণ্ড কাপড় বুকের উপর দিয়ে কোণাকুনিভাবে নিয়ে গিয়ে ঘাড়ে গিঁট বাঁধে। সাপোর উপর দিয়ে পাছা পর্যন্ত লম্বা ফুল-হাতা বুক-কাটা সোয়েটার পরে। নিম্নাংশের জন্য সাধারণতঃ তারা ব্যবহার করে লেংটি। যারা ধনী তারা শীতের সময় সোয়েটারের উপর দিয়ে একটি ছোট বা বড় ঢিলে-ঢালা কোট পরে। তারা ছোট করে চুল কাটে এবং মাথায় তিব্বতী চামরী গোরুর লেজের চুল দিয়ে তৈরি টুপি পরে। এই টুপিকে বলে 'গুরদাম'। কোমরে বাঁধে ৬-৭ ফুট লম্বা রঙিন কাপড় এবং তার উপর কোমরে ঝুলায় কাঠের থাপ সমেত তরোয়াল।

শেরদুকপেনের মেয়েরা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হাত-কাটা শার্ট পরে এবং কোমরে ছেলেদের মতো রঙিন কাপড় জড়ায়। কখন কখন তারা মিল-কাপড়ের তৈরি ছোট ফুল-হাতা কোটও পরে। এখানে 'ডিমডাম'-এর খুব উৎপাত। ডিমডাম হচ্ছে এক ধরনের হুলওয়ালা পতঙ্গ। শরীরে খালি জায়গা পেলেই তারা হুল ফুটিয়ে দেয়। হুল ফুটালে শরীরে যন্ত্রণা ও ঘা হয়। তাই দু-পায়ে হাঁটুর নিচে থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ২০ ইঞ্চি লম্বা ও ১২ ইঞ্চি চওড়া এক খণ্ড কাপড় তারা সব সময় জড়িয়ে রাখে। মেয়েদের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মাথার চুল সামনের দিকে মুখের উপর ফেলে রাখে। বিয়ের পর বা একটি সন্তান হলে চুল ঘাড়ের কাছে বেঁধে রাখে। তবে ছোট ছোট মেয়েরা ছোট চুল রাখে। মাথায় তারা টুপি পরে না, তবে উৎসবাদিতে টুপি পরে। শেরদুকপেনদের ছেলে-মেয়েরা পায়ে জুতা পরে না, তবে যারা অবস্থাপন্ন তারা মাঝে মাঝে মোন্‌পা উপজাতিদের তৈরি জুতা পরে। তাদের মধ্যে উল্কির ব্যবহার নেই, তবে মেয়েরা বা শিশুরা পাইনের আঠার সঙ্গে কাঠকয়লার গুঁড়া মিলিয়ে ঠোঁটে এবং গালে জ্যামিতির মতো নকশা আঁকে। তারা মনে করে, এর দ্বারা তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয় এবং তা ছাড়াও শীতের হাত থেকে তাদের ত্বক রক্ষা পায়। মেয়েরা রূপার অলংকারাদি পরতে ভালবাসে।

এই উপজাতির মেয়েরা তাঁতশিল্পে খুব পারদর্শিনী। নকশা দেওয়া ব্যাগ প্রভৃতি তারা খুব সুন্দর তৈরি করে। আর পুরুষরা কাঠের কাজ খুব ভাল জানে। শেরদুকপেনদের প্রধান উপজীবিকা ব্যবসাবাণিজ্য। কারণ পাহাড়ের উপর মাত্র পাতলা একটা লবণ-মাটির স্তর আছে। তার উপর এখানে প্রচণ্ড তুষারপাত ও অল্প বৃষ্টিপাত হয়। আর আছে বন্য জন্তুর উৎপাত। এই সব কারণে তারা ভালভাবে চাষবাস এখানে করতে পারে না। বৌদ্ধধর্মে নিষ্ঠার ফলে গৃহপালিত পশুর মাংস এরা খায় না। অবশ্য গৃহপালিত বাদে অন্য পশুর মাংস তারা যথেষ্টই খায়। শেরদুকপেন উপজাতির লোকেরা উৎসবাদিতে মুখোশ পরে নৃত্য করে। তাদের বিখ্যাত নাচ 'আজিলামু'।

শেরদুকপেন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার কোন বাধা নেই। এইভাবে মেলামেশার ফলে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারপর বিবাহ হয়। তবে বিবাহ না

করে ঘনিষ্ঠভাবে থাকাটা এদের চোখে সামাজিক অপরাধ একটি স্ত্রী থাকতে আর একটি বিবাহ করাও সমাজ সমর্থন করে না। বিধবা-বিবাহের প্রচলন এদের মধ্যে আছে।

শেরডুকপেন উপজাতির সমাজব্যবস্থা গণ-তন্ত্র ভিত্তিতে তৈরি। প্রত্যেক গ্রামে একটা করে সভা আছে। এই সভার নাম 'জুং'। এই জুং-এর সভাপতি হন 'গাঁওবুড়া'। গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণতঃ জুং-এর সদস্য হওয়ার জন্য নির্বাচিত হন। সদস্যদের বলা হয় 'জুং মো'। এই সভার কাজ কোথায়, কখন এবং কি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হবে তা জানিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে। তাকে বলা হয় 'কাচুং'। গ্রামের পরিধি অনুযায়ী দুজন কাচুংও থাকতে পারে। জুং-এ সাধারণ দোষীর বিচার হয়। তবে খুনী প্রভৃতি কোন গুরুতর অপরাধীর বিচার এই সভায় হয় না। সেই সকল অপরাধীর বিচারের ভার তারা সরকারের হাতেই তুলে দেয়।

শেরডুকপেনরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও তারা নানান অপদেবতাকে বিশ্বাস করে এবং পূজা করে। একদিকে তারা যেমন মন্দিরে ('গোম্‌পা'তে) ভগবান্ বুদ্ধের উপাসনা করে, আবার অন্যদিকে ডাইনি এবং বিভিন্ন অপদেব-তাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তাদেরও পূজা করে। অপদেবতাদের পূজা না করলে তারা রুষ্ট হবে। এদের বিশ্বাস, অপদেবতারা রুষ্ট হলে রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি বাড়বে এবং নানাভাবে সংসারের ক্ষতি হবে। এই ভয়ে তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য এই সব পূজা এরা করে থাকে। অপদেবতার হাত থেকে রক্ষার জন্য যারা পূজাদি করে তাদের নাম 'জিজি' (পুরোহিত)। শেরডুকপেনরা তাদের ধর্মগ্রন্থকে খুব শ্রদ্ধা করে এবং ভক্তিসহকারে সযত্নে 'গোম্‌পা'তে তা রাখে।

সমালোচনা

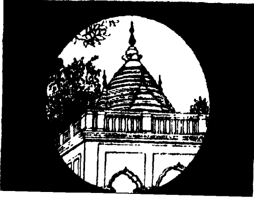
পদ্মের ভিতর আলো—শান্তিকুমার ঘোষ। কবিতা প্রকাশনী, পি-৩৬, সি. আই. টি. স্কীম ১১৪ এ, লেক গার্ডেন্‌স্, কলিকাতা-৪৫ (১৩৮৮), পৃঃ ৮+৬৪ ; মূল্য : পাঁচ টাকা।

সাম্প্রতিক কালে ভাল কবিতা লিখে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন ডক্টর শান্তিকুমার ঘোষ নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর কাব্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উজ্জ্বল উৎকর্ষের গুণে যে-সুনাম তিনি অর্জন করেছেন সেটা তাঁর সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মের ভিতর আলো' যে আরও বৃদ্ধি করবে এ-বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে টি. এস্. এলিয়ট বলেছেন, তা হবে অনবদ্য অবয়বের সঙ্গে ভাবগৌরবের মিলন ('Perfection of form united with a significance of feeling')। শান্তিকুমারের কবিতায় এই মিলন সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এতেই তাঁর কবিতার সার্থকতা। এ-কারণেই তাঁর কবিতা যুগধর্মে দীক্ষিত হয়েও যুগকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছে। সব ভাল কবিতার এই একই লক্ষণ। সমকালীন সুর সেখানে ধ্বনিত হয় কিন্তু তার মাঝে থাকে ঐতিহ্যের মূর্ছনা: 'সব বিলাপ পতনের শব্দ কানে নিয়ে / পদতলে পড়ে থাকে সুন্দর / ভীষণকে চিনবে ত্রিনয়নে।' ("বোধ করি আমাদের") কিংবা, 'জংলা পাহাড়ের মাথায় তুষার / যেন মহাদেবের দেহের উপর চিরকালের সতী' ("যাচ্ছেন চলে তিনি")।

নানা রসের নানা বর্ণের কবিতায় 'পদ্মের ভিতর আলো' সমৃদ্ধ। চিত্তাকর্ষক চিত্রকল্পের ছড়াছড়ি। কখনও দেখি, মোটর বাইক গর্জে চলেছে যুবা, সামনে থেকে ক্ষিপ্র সরে যাচ্ছে খরগোস ; নিটোল ফলের মেয়ে ডালা নিয়ে বসে আছে বিপণি সংসারে ; সাদা পারাবত উড়ছে ধর্মমন্দিরের শীর্ষ ঘিরে ; কিংবা, প্রাচী জুড়ে সূর্য আজ রক্তাংশুক ভাতি। 'জোড়াসাঁকো', 'শান্তিনিকেতন', 'কালিম্পং' এবং 'বুডাপেস্ট', 'প্রাগ', 'সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো' নান্দনিক সুষমায় মণ্ডিত হয়ে আমাদের সমভাবে মনোহরণ করে। গ্রন্থের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা ভগিনী নিবেদিতাকে নিয়ে লেখা। এই মহীয়সী নারী শান্তিকুমারের কবিতায় আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল : '…সব তুচ্ছ ক'রে/আলোকস্তম্ভের মতো নারী / নিজের যৌবন থেকে / অগ্নি জ্বেলে নিয়ে / দাঁড়িয়ে দিশারী।'

—ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ পুরস্কার

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ৩ জানুআরি ১৯৮৩, সন্ধ্যা ৬টায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটুট অফ্ কালচারের 'বিবেকানন্দ হলে' এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দ পুরস্কার তুলিয়া দিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোর গবেষক লেখিকা ম্যারী লুইস্ বার্কের (গার্গী) হাতে। ম্যারী লুইস্ বার্ক এপর্যন্ত দুখানি বই লিখিয়াছেন: 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন আমেরিকা: নিউ ডিস্কভারিজ' (১৯৫৮) এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ: হিজ সেকেণ্ড ভিজিট টু দী ওয়েস্ট: নিউ ডিস্কভারিজ' (১৯৭৩)। আরও কয়েকখানি গ্রন্থের উপযোগী তথ্য ও উপাদান তাঁহার হাতে রহিয়াছে। এই প্রথম বিবেকানন্দ পুরস্কার দেওয়া হইল।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অফ্ কালচার (গোলপার্ক) কমপক্ষে দশ হাজার টাকা মূল্যের এই পুরস্কার এবছরই প্রথম প্রবর্তন করিলেন। পুরস্কার-প্রদান অনুষ্ঠানে ইনস্টিট্যুটের সচিব স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সকলকে স্বাগত জানাইয়া বলিলেন, "স্বামীজীর ভাব প্রচারের জন্য নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তারাপদ চৌধুরী নগদ এক লক্ষ টাকা দান করেছেন। সেই টাকার আয় থেকে বিবেকানন্দ পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ইনস্টিট্যুটের পরিচালন-সমিতি প্রথম বছরের পুরস্কার ম্যারী লুইস্ বার্ককে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।" বেলুড় মঠের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক ও গুণীজনের সমাবেশে এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ভাবোদ্দীপক হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের প্রব্রাজিকা ও ব্রহ্মচারিণীদেরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর কাছে ম্যারী লুইস্ বার্কের কর্মসাফল্যের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া অতি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। ম্যারী লুইস্ বার্কও তাঁহার ভক্তিবিনম্র আবেগময় অভিভাষণে সকলকে অভিভূত করেন। পুরস্কার দশ হাজার টাকার একটি চেক সহ সুদৃশ্য এক কাষ্ঠাধারে ইনস্টিট্যুটের পরিচালন-সমিতির সভাপতি শ্রীভৈরবদত্ত পাণ্ডে (পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল) এবং সচিব স্বামী লোকেশ্বরানন্দের স্বাক্ষরিত একখানি প্রশস্তি-পত্রও ম্যারী লুইস্ বার্ককে প্রদান করা হয়।

উৎসব

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসব গত ৫ জানুআরি ১৯৮৩, ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথোপযুক্তভাবে উদ্‌যাপিত হয়। স্বামীজীর মন্দিরে বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। সারাদিনব্যাপী পূজা, পাঠ, হোম, ভজন-কীর্তনাদি মঠভূমিকে খুবই উদ্দীপনাময় করিয়া রাখিয়াছিল। প্রায় ১২,০০০ নরনারী রন্ধিত প্রসাদ হাতে-হাতে গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে মঠ প্রাঙ্গণে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অনন্যানন্দ। স্বামীজীর বিভিন্ন দিক লইয়া

আলোচনা করেন স্বামী নিত্যবোধানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব স্মরণে গত ৭ হইতে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশেষ পূজা, ভক্তসেবা ও সভাদির মাধ্যমে আশ্রম-মন্দিরে ও জেলার বিভিন্নাংশে উৎসবাদি উদ্‌যাপিত হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

গত ১৯ হইতে ২১ জানুআরি, ১৯৮৩ পর্যন্ত রায়পুর আশ্রম কর্তৃক আয়োজিত ৩ দিনের যুব-সম্মেলনে যোগদানকারী যুবক-যুবতীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০ জন।

গত ২০ জানুআরি, ১৯৮৩ ভুবনেশ্বর মঠ কর্তৃক যুবসম্মেলন আহূত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রায় ১৩৫ জন যুবক-যুবতী যোগদান করে।

ভিত্তিস্থাপন

গৌহাটী আশ্রমের নূতন সংরক্ষিত অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণোদ্দেশ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী কর্তৃক গত ২৫ নভেম্বর ১৯৮২, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়।

উদ্বোধন-সংবাদ

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি উৎসব : স্বামী বিবেকানন্দের ১২১তম আবির্ভাব-তিথি গত ৫ জানুআরি ১৯৮৩, বুধবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজন-কীর্তনাদি হয়। বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামীজী সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।

১৬ জানুআরি স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, ১৮ জানুআরি স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী ও ২৮ জানুআরি স্বামী অদ্ভুতানন্দজীর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে যথাক্রমে তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।

সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী অজজানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত একজন বর্ষীয়ান সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী চণ্ডিকানন্দ (জিতেন মহারাজ) গত ২৭ জানুআরি ১৯৮৩, বেলা ২-১৫ মিনিটে ৯০ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে মূত্রাশয়-সংক্রান্ত পীড়া ও হৃদ্‌পিণ্ডে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হওয়ার ফলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত কয়েক মাস যাবৎ তিনি নানা উপসর্গে ভুগিতেছিলেন এবং একাধিকবার তাঁহাকে চিকিৎসার্থে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হইয়াছিল।

তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দীক্ষিত সন্তান। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সারগাছি আশ্রমে যোগদান করেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কাটিহার কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত তিনি ঢাকা, দেওঘর, শেলা (চেরাপুঞ্জী), সারদাপীঠ (বেলুড়) এবং শিলং আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে সেবা-কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া সুনামগঞ্জের (অবিভক্ত বাংলার) একটি ক্ষুদ্র পল্লীকেন্দ্রে প্রায় ছয় বৎসর কাল বাস করিয়া তিনি ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সুগায়ক এবং সঙ্গীত রচয়িতা। খাসিয়া ভাষাতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন,—ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর উপর বহু গীত তিনি খাসিয়াতেও রচনা করিয়াছেন। সরল ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

গভীর দুঃখের সহিত আমরা আমাদের তিনজন হিতৈষী বন্ধুর ইহলোক ত্যাগের সংবাদ জানাইতেছি। প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং আনন্দবাজার পত্রিকা-গোষ্ঠীর প্রধান সম্পাদক **অশোককুমার সরকার** গত ১৭ ফেব্রুআরি ১৯৮৩, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে ৭০ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় ময়দানে বই মেলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার কালেই আকস্মিক তিনি বক্তৃতামঞ্চে ঢলিয়া পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি আর ফিরিলেন না।

অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত এই প্রয়াণ সাংবাদিক-জগতে এবং জাতীয় জীবনের আরও বহু ক্ষেত্রে এক অপরিসীম শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার একজন একনিষ্ঠ অনুগামী ছিলেন। মঠ ও মিশনের নানাবিধ কর্মসূচীর সঙ্গে তিনি নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রাখিয়াছিলেন। উল্লেখ্য, প্রতিদিন সকালে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের পূজার জন্য তিনি ফুল প্রেরণ করিতেন,—মরলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও, তাঁহার ঈপ্সিত পুষ্পাঞ্জলি পরের দিন ভোরেও মাতৃ-চরণে পৌঁছাইতে ভুল হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী, কঠোর নীতিবাদী, প্রবীণ নেতা **ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষেরও** হৃদ্‌রোগে জীবনাবসান হয় গত ১৮ ফেব্রুআরি সন্ধ্যায় এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৩ বৎসর। অকৃতদার সুপণ্ডিত এই বর্ষীয়ান জননায়কের প্রয়াণে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অতীত ইতিহাসের আরও একটি যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ অনুগামী রূপে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র, প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী, কৃতী অধ্যাপক এবং সেই ইংরেজ আমলেও ভারত সরকারের উচ্চপদাধিকারী রূপেও ডঃ ঘোষ সুবিদিত। কৈশোরে বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজীর (বাবুরাম মহারাজের) ঘনিষ্ঠ স্নেহ-পরিধিতে আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য, তাঁহার জীবনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পরিলক্ষিত হইত। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর উপরে তাঁহার ইংরেজী ও বাংলা মননশীল রচনা এবং গ্রন্থাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রয়াত ডঃ ঘোষ এবং অশোককুমার সরকারের দেহনির্মুক্ত আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করুক।

জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দিরের প্রাচীন একনিষ্ঠ সেবক **শ্রীরমণীরঞ্জন দাশগুপ্ত,** ৮৫ বৎসর বয়সে, গত ২৯ জানুআরি ১৯৮৩, বিকাল ৩-১০ মিনিটে জয়রামবাটী আশ্রমেই মাতৃ-অঙ্কে চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। বার্ধক্য-জনিত উপসর্গই তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ। সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর কাল তিনি জয়রামবাটীতে নানাবিধ কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অকৃতদার রমণীবাবুর বার্ধক্য-জীর্ণ দেহেও জপ ধ্যানাদিতে নিষ্ঠা ও সময়ানুবর্তিতা ছিল বিশেষ লক্ষণীয় গুণ। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষিত। তাঁহার বিদেহ আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে শান্তি লাভ করুক।



৮৫তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা চৈত্র, ১৩৮১

দিব্য বাণী

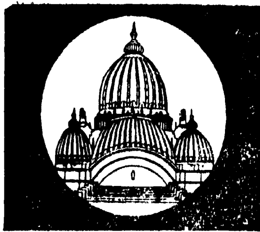
'অদ্যাবধি গৌরলীলা…'

…সুনীল অম্বরতলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, শ্যামল ধান্যক্ষেত্র, বিহগকূজিত শীতল ছায়াময় অশ্বত্থবটবৃক্ষরাজি এবং মধুগন্ধ-কুসুম-ভূষিত তরুলতা প্রভৃতি অবলোকনপূর্বক প্রফুল্লমনে যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহার দেহমধ্য হইতে দুইটি কিশোর-বয়স্ক সুন্দর বালক সহসা বহির্গত হইয়া বনপুষ্পাদির অন্বেষণে কখন প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন, আবার কখন বা…সন্নিকটে আগমনপূর্বক হাস্য, পরিহাস, কথোপকথনাদি নানা চেষ্টা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপ আনন্দে বিহার করিয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ঐ দর্শনের প্রায় দেড় বৎসর পরে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। কথাপ্রসঙ্গে একদিবস ঠাকুরের নিকটে ঐ দর্শনের বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাবা, তুমি ঠিক দেখিয়াছ ; এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে আসিয়া তোমার ভিতরে রহিয়াছেন ; সেইজন্যই তোমার ঐরূপ দর্শন হইয়াছিল।'…ঐ কথা বলিয়া ব্রাহ্মণী চৈতন্য-ভাগবত হইতে নিম্নের শ্লোক দুইটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্তনে আনন্দ রূপ হইবে আমার॥
অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

—স্বামী সারদানন্দ

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ৮/১৬১-৬২]



কথাপ্রসঙ্গে

আন্দোলন : ধর্মীয় এবং সামাজিক

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি বড় বড় উৎসব-অনুষ্ঠান হইয়া গেল। সমস্যা-জর্জর আমাদের জাতীয় চরিত্রের ইহাই বোধ হয় অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, আমরা অভাব অভিযোগের চাপে মরণাপন্ন হইয়া পড়ি, কিন্তু একেবারে মরিয়া যাই না। শ্রীভগবান ভারতকে যেন এই অত্যাশ্চর্য জীবনী-শক্তি দিয়া সম্পূরিত করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন

শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাব স্মরণে দেশব্যাপী উৎসব তো চলিতেছেই, তাহা ছাড়াও সদ্যঃ-সমাপ্ত হইল নানা অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন, যুব-উৎসব, 'বলরাম-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ' শতবার্ষিকী ইত্যাদি আরও কিছু উদ্দীপনাকর পর্বানুষ্ঠান। দেখিতে দেখিতে আবার আসিয়া পড়িল দোল-পূর্ণিমা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্মৃতি লইয়া। প্রায় পাঁচ শতাব্দী পূর্বে ভারত-মৃত্তিকা শ্রীভগবানের পাদস্পর্শে আরও একবার পবিত্রা হইয়াছিল। খুব স্বাভাবিক কারণেই তাই আমাদের এবারকার কথাপ্রসঙ্গে রচনায় চৈতন্য-চিন্তনের রেশও কিছুটা অনুরণিত হইবে। অর্ধ সহস্র বৎসর পূর্বের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমরা ভুলিয়া থাকিব কেমন করিয়া? এ-যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে পুনরাগমন করিয়া তিনি নিজেই যে আমাদিগের বিস্মৃতি-নিদ্রাকে ভাঙাইতে চাহিয়াছেন। বিগত কয়েক শতাব্দী ব্যাপী সমগ্র জাতির বিশেষতঃ বাঙালীর ধ্যান-ধারণা-ভাবনা সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাষা শিল্প-কলা-কৃষ্টি সব কিছুই চৈতন্য-প্রভায় আলোকিত। মোট কথা, চৈতন্য-দেবের আগমনে জাতি যেন নূতন ভাবে নড়িয়া চড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বিখ্যাত মান্দ্রাজ-অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছিলেন :

"সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানেই ভক্তিমার্গ পরিজ্ঞাত, সেখানেই লোকে তাঁহার বিষয়ে সাদরে চর্চা করে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।…তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না, তাঁহার প্রভাব এখনও কি ভাবে সমগ্র ভারতে সক্রিয়।…তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে প্রচার করিয়া ফিরিতেন, আচণ্ডালকে অনুনয় করিতেন, যাহাতে তাহারা ভগবানকে ভালবাসে।"

ইদানীং যে-সকল সম্মেলন-সভা-সমিতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে, সেগুলির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তথা ধর্মজগতের মহাপুরুষগণের জীবন ও বাণীকে আর দূরে সরাইয়া রাখা হইতেছে না—বরং সোচ্চারেই তাঁহাদের অবদানকে জানিবার বুঝিবার একটা প্রয়াস দেখা যাইতেছে। পুঞ্জীভূত হতাশার কালো মেঘ ঠেলিয়া ইহা যেন এক ফালি রৌদ্র ঝলকের মতো। শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। তবে চিন্তা ও চর্চার ঢেউ মাত্র তুলিলেই হইবে না,—উহা যেন প্রকৃত সত্যাভিমুখ হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্যথায় ঔষধের অপপ্রয়োগে ব্যাধি নিরাময়ের পরিবর্তে নূতন বিপদকেই ডাকিয়া আনা হইবে। অন্ধকার কক্ষে প্রদীপ

জ্বালিলেই চলিবে না—উহা কোন্ আধারে, কোন্ কেন্দ্রে স্থাপন করিতে হইবে, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। নচেৎ ঐ দীপালোক গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ অপেক্ষা, চোরকে পলাইবার পথ দেখানোতেই হয়তো বেশি সহায়তা করিতে পারে।

বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা এই কারণেই যে, আমরা যাঁহাদের ভাবের উত্তরাধিকার বহন করিতেছি বলিয়া গর্বিত, তাঁহাদের সঠিক ভাব কী, —ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে তাঁহাদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ, সে-সম্পর্কে আমাদের বিচারের স্পষ্টতা সর্বত্র সমান নহে। আমাদের অনেকেরই মনে যেন এক খটকা: ভারতীয় আদর্শে ধর্ম ও সমাজ দুইটি পৃথক্ রেখা, অথবা একই রেখার দুই দিক মাত্র? যদি উহারা স্বতন্ত্র রেখাই হয়, তবে তো ধর্মীয় আন্দোলন ও সমাজ গড়িবার আন্দোলন দুইটি পৃথক্ কর্মধারা,—উহারা পরস্পর যত সমান্তরালই হউক না কেন। ইদানীং অনেক বিদগ্ধ জনের চিন্তাতেও, এইরূপই প্রকাশ পাইতেছে, আমরা শুনিতেছি। ইহাতে ধর্মকে ও সমাজকে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিবার প্রেরণা জাগে। এই কারণেই বুঝি কোন মহাপুরুষের অবদান স্মরণ করিতে গিয়া আমরা স্বতই দেখিতে প্রয়াসী হই—তাঁহার কীর্তির ক্ষেত্র শুধুমাত্র ধর্ম, কিংবা ঐ সঙ্গে সমাজ-গঠনও। যেন উভয় ক্ষেত্রে যুগপৎ অবদান দেখাইতে পারিলেই তাঁহার মহনীয়তা অধিক প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু ভারতীয় ঋষি-দৃষ্টিতে 'ধর্ম' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ পরিপূর্তি বা বিকাশকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। অতএব সমাজ-গঠনও সেখানে ধর্মেরই অপ্রত্যাখ্যেয় অঙ্গ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যগণের জীবন-চরিত্রে ইহাই সুব্যক্ত। চৈতন্যদেব সম্পর্কে স্বামীজীর উপরি-উদ্ধৃত উক্তিতেও তো আমরা ইহাই লক্ষ্য করিলাম,—ধর্মের পথে সমাজের কল্যাণ-আলোড়নই সেখানে চিত্রিত দেখিলাম। বেদ-উপনিষদ্ হইতে তন্ত্র, পুরাণ, এবং বাইবেল-কোরান পর্যন্ত সকল ধর্মশাস্ত্র এই একই সাক্ষ্য বহন করে। রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-কথামৃত সাধারণ মানবের জীবন-বিকাশোপযোগী যে শিক্ষা দিয়া থাকে, উহা সম্পূর্ণ অর্থে ধর্মীয়,—যে-ধর্ম কদাপি সমাজ-বহির্ভূত নয়,—যাহা মানুষেরই শ্রেয় সাধনের জন্য। '…য এব শ্রেয়স্করঃ, স এব ধর্মশব্দেনোচ্যতে।… অর্থশ্চ ধর্মঃ ন অনর্থ ইতি',—যাহা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণসাধক, তাহাই ধর্ম; সুতরাং প্রকৃত ধর্ম সমাজের পক্ষে অনর্থ নহে—ধর্মই পুরুষার্থ। জৈমিনির মীমাংসা-সূত্রের শবরভাষ্যেও, আমরা এই রকমই ধর্মলক্ষণ জানিতে পারি,—সাম্প্রতিক কালের বিবেকানন্দ-বাণীতেও তো তাহাই আরও ব্যঞ্জনাময়। মোট কথা সর্বমানবের পক্ষে যাহা কল্যাণকর তাহাই ধর্ম। বিপরীত যাহা কিছু, তাহাই অন্যায়—অর্থাৎ অধর্ম। বর্ণাঢ্য রামায়ণ-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে কুটিল সামাজিক প্রেক্ষাপটে। গীতার সৃষ্টি হইয়াছিল সমাজেরই জটিলতম রণক্ষেত্রে। কথামৃতের কুসুমগুলি ঝরিয়াছিল দেবমন্দিরে ভক্ত-গৃহাঙ্গনে রাজপথে, পল্লীর মাঠে-ঘাটে! খ্রীষ্ট-চৈতন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে-যে আন্দোলনে মানব-সমাজকে মাতাইয়াছেন, সেগুলি তো সবই ধর্মীয়—এবং সেই সেই যুগের সমাজের পক্ষে উন্নয়নমূলক ও শ্রেয়স্কর। সুতরাং যুগোপযোগী নূতন সমাজ গড়িবার আন্দোলনও ধর্মীয় আন্দোলনেরই অঙ্গীভূত, অবিচ্ছেদ্য সূত্রে সম্বদ্ধ,—ইহা অতি স্বাভাবিক সত্য। বরং পৃথক্-দৃষ্টি এখানে নিতান্তই কষ্ট-কল্পিত। ধর্মচ্যুত সমাজ যেমন চিন্তা করা চলে না,—সমাজ-নিরপেক্ষ ধর্মও তেমনই আমাদের ভাবনার অতীত। অধুনালুপ্ত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার সম্পাদককে স্বামী বিবেকানন্দ

একদা যাহা লিখিয়াছিলেন, উহা এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য। স্বামীজী জানাইয়াছিলেন :

"আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন—চরিত্র-গঠন যাহাকে 'প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা' বলা যায়। ইহা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক, ব্যক্তির সমষ্টি সমাজেও তদ্রূপ।...ধর্ম প্রচারের নূতন উদ্যমও জগৎ সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া বিরক্ত হইও না। ধর্মের উদ্দেশ্য ধর্ম। যে ধর্ম কেবল সাংসারিক সুখের উপায়স্বরূপ, তাহা আর যাহাই হউক, ধর্ম নয়। আর অবাধে ইন্দ্রিয়সুখভোগ ব্যতীত মনুষ্য-জীবনের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই—এ-কথা বলিলে ধর্মের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এবং মনুষ্য-প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঘোরতর অপরাধ করা হয়।

"যে ব্যক্তিতে সত্য, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা বর্তমান, স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে এমন কোন শক্তি নাই যে, তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে। এইগুলি সম্বল থাকিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিপক্ষে দাঁড়াইলেও একলা এক ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারে।"

একবার আলাসিঙ্গাকেও এক পত্রে স্বামীজী গভীর আবেগের সহিত যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের ভাবরূপ —সমাজের সহিত উহার নিবিড় সম্পর্কের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে খুলিয়া দেয়। তিনি লিখিয়াছিলেন :

"আমি এক্ষণে আমার গুরুদেবের (শ্রীরামকৃষ্ণের) নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহাই লোককে শিক্ষা দিব।...যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না, অথবা অনাথ শিশুর মুখে এক মুঠো খাবার দিতে পারে না, আমি সে-ধর্মে বা সে-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত উচ্চ মতবাদ হউক, যত সুবিন্যস্ত দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি 'ধর্ম' নাম দিই না।...তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও, আর যে-ধর্মকে তোমরা নিজের ধর্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার উপদেশগুলি কার্যে পরিণত কর,—ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য করুন।

"...ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস কর।"

ধর্ম মানুষকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়—মানুষের মাঝে বিরাজিত ভগবানের পূজায় প্রেরণা দিয়া থাকে। ধর্মের চক্ষে সমাজ হইতেছে ঈশ্বরারাধনারই পুণ্যক্ষেত্র। তাই তো দেখি, যুগে যুগে ভগবান দেহধারী হইয়াছেন—জীবকে ধর্মের পথে ফিরাইতে—আপামর সকলকে ভালবাসিয়া সমাজরূপী তাঁহারই বিরাট-মূর্তির সেবায় উদ্বুদ্ধ করিতে,—'প্রেমের সর্বশক্তিমত্তা' প্রমাণ করিতে।

*

সর্বশক্তিরূপ প্রেমের প্রতিমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার অলৌকিক জীবন ও কর্ম আমাদিগকে আর একবার প্রকৃষ্ট শিক্ষা দিয়াছে—সামাজিক সমস্যা-ভার লাঘবের উপায়ও এই ধর্মের অধিকার সম্প্রসারণের মধ্যেই। চৈতন্যদেবের অবদান স্মরণ করিলেও আমাদের এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, ভারত ধর্মপ্রাণ—তাই তাহার সমুদয় বিপ্লবও সার্থকরূপে সংসাধিত হয় ধর্মের মাধ্যমে। সামাজিক সাম্যের কথা আজকাল আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসে বলিয়া থাকি। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে সেই সাম্য-তরঙ্গের বিপুল উত্থান এই জাতির মধ্যে হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। চৈতন্যের প্রেমধর্মের কাছে কুটিল রাজশক্তিরও পরাভব ঘটিয়াছিল। তদানীন্তন সমাজে ব্যাপক ও বহু স্বীকৃত নানাবিধ উচ্চাবচ ভেদ-প্রাচীরকে তিনি একমাত্র ধর্ম-শক্তি দ্বারাই ভাঙিয়া সমান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বক্ষে উদ্বেল যে জীব-প্রেম—আচণ্ডালে তাঁহার যে

উন্মাদ করুণা, উহা যতখানি সামাজিক বিপ্লব, ঠিক ততখানিই বা ততোধিক আকারে উহা ধর্ম-প্লাবনও নহে কি? শ্রীঅদ্বৈতাচার্যকে ঐ-যে অনুজ্ঞা: 'মোর এই বর / মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর ॥' শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট সেই যে আকুল বিলাপ-প্রকাশ: 'প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে / মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে ॥'—ইহা কি শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরিত ও স্বামীজী-প্রবর্তিত সেই 'যত্র জীব তত্র শিব' এবং 'শিবজ্ঞানে জীব-সেবা'-র সঙ্গেই তুলনীয় নহে? এখানে কি ধর্মীয় আন্দোলন যুগানুযায়ী সমাজ গড়িবার ব্রতেই ব্যাপৃত হয় নাই?

তাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চৈতন্য প্রমুখ নরদেবগণ যে-আন্দোলন সহায়ে মানব সমাজে শান্তি, কল্যাণ ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—এবং যাহার প্রভাব উত্তরোত্তর প্রবলতর হইতেছে,—ব্যষ্টি ও সমষ্টি মানব-চিত্তে যাহা আশ্চর্য রূপান্তর ঘটাইতেছে, নিঃসন্দেহে তাহা ধর্মীয় তো বটেই—মানুষের সমাজ-জীবনকেও উহাই সজীব করিয়া রাখিয়াছে। সামাজিক অবস্থার সার্বিক ক্রমোন্নতি ঘটাইবার জন্য সমবেত আগ্রহই নৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের মূল কথা। অতএব মহাপুরুষগণের অবদানের মূল্যায়ন করিতে গিয়া—তাঁহাদের প্রবর্তিত আন্দোলনকে আমরা দ্বিধা করিব কেমন করিয়া?

মনীষি-স্মরণে

বর্তমান বর্ষে ভারত-জননীর চার সুসন্তানের শতাব্দী-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইতেছে। কাল স্মরণীয় হয়, সেই কালের সাক্ষী মানুষের মহিমা লইয়া। ঐ কালের পরিচয়—মানুষেরই আচার অনুষ্ঠানে। মানুষ সকলেই, তথাপি কিছু বিশেষ মানুষও থাকেন—যাঁহাদের মনুষ্যত্বের পরিমিতি হয় তাঁহাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-বিচারে। এমন কয়েকজন অসাধারণ মানুষের জীবনই তাঁহাদের নিজ নিজ যুগের বা কালের জীবনেতিহাস। আমরা ঐ রকম বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকেই বলি মনীষী—যাঁহাদের কর্মে ও অবদানে প্রকাশ পাইয়া থাকে বিশিষ্ট মননশীলতা ও প্রখর প্রজ্ঞা।

বাস্তবিকই ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিকাল ভারত ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়—গৌরবান্বিত যুগ। বোধ হয় এমন আবার একটি শতাব্দ আমাদের জাতি অনেককালই দেখিবে না—অথবা দেখিবার জন্য প্রতীক্ষায় থাকিবে। আলোচ্য শতকের মনীষিগণ যেন দীর্ঘ কয়েক যুগ ব্যবধানে ভারতবর্ষকে পুনরায় নূতন দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে পারিয়াছিলেন,—অথবা বলা চলে, যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো তাঁহারাও এই জাতি ও দেশকে নবীনতর রূপে আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতীয় মনীষীদের এই নব আবিষ্কৃতি সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন জাগিতে পারে, ঐ আবিষ্কারের স্বরূপ লইয়া। আমাদের মনে হয়, উক্ত মনস্বীদের সাধনার গৌরব, তাঁহাদের স্বকীয় ধ্যান-ধারণায় বা উপলব্ধিতে। ভারতাত্মাকে উপলব্ধিই হইতেছে তাঁহাদের সেই গৌরবোজ্জ্বল আবিষ্কার।

আমরা যে চারজন মনীষীকে এখানে স্মরণ করিতেছি, তাঁহাদেরও কীর্তি ঐ ভারতোপলব্ধিতেই। ইঁহাদের কাব্যে, শিল্পে, ভাবে ও অভিব্যক্তিতে সেই অনুভূত ভারতবর্ষকেই তাঁহারা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, যে-ভারত-জননীর মূর্তিকে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগের আরাধ্যা দেবী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—যে-ভারতবর্ষের নাম ভগিনী নিবেদিতা গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় সদা জপ করিতেন। বিশ্রুত তামিল-কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী, ছন্দ-সম্রাট সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, এবং পল্লী-কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক,—বর্তমান বর্ষে এই চারজনেরই জন্ম-শতবর্ষ

পূর্ণ হইতেছে। সমগ্র দেশবাসীর পশ্চাতে থাকিয়া আমরাও ইঁহাদের উদ্দেশে সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

যাঁহার কণ্ঠোদ্‌গীত ছন্দ একদা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে আবেগমুখর করিয়া তুলিয়াছিল; যাঁহার রচিত গীত তামিল-ভাষীদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইত; যাঁহার রচনা ভাষান্তরিত হইয়া সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়কে ভগবদ্-ভক্তিতে ও দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, ভগিনী নিবেদিতার ভাবানুগামী সেই সুব্রহ্মণ্য ভারতী ভারতের জাতীয় ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় নাম—যাহা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। 'কেহ কাহাকেও আঘাত করিও না, ভারতের সন্তান আমরা, সকলে মিলিয়া চলিব সত্যের পথে, আলোকের পথে'—ইহাই ছিল সুব্রহ্মণ্য ভারতীর জীবনব্যাপী সাধনা ও সিদ্ধি। বস্তুতঃ ভারতী ছিলেন স্বামীজীর ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ একজন তেজস্বী কবি। সুব্রহ্মণ্য ভারতীর অনেক রচনার বাংলা কাব্যরূপ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন ছন্দ-সরস্বতীর উপাসক। দেশের সর্বস্তরের মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশকে লক্ষ্য করিয়া, তিনি তাঁহার আরাধ্যা ছন্দ-দেবীকে নানা উপচারের অর্ঘ সাজাইয়া পূজা করিয়াছেন। ছন্দ-শিল্পে সত্যেন্দ্রনাথ আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ছন্দ-বিজ্ঞানে ও ছন্দ-উদ্‌ভাবনে তিনি অনুপম কুশলী। একনিষ্ঠ রবীন্দ্র-শিষ্য হইয়াও সত্যেন্দ্রনাথ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা অর্জনের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের 'Kali the Mother'-এর বাংলা কাব্যানুবাদ 'মৃত্যুরূপা মাতা' সত্যেন্দ্রনাথের অক্ষয় কীর্তি। ছন্দের বৈচিত্র্যে সদা সচেতন সত্যেন্দ্র-কবি তাঁহার অনবদ্য অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের কাব্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারের সঙ্গে বঙ্গ-ভারতীর ঘনিষ্ঠ যোগসাধন করিয়া গিয়াছেন,—ইহাও তাঁহার এক অনন্য বিশেষত্ব।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ভারতের শিল্প-প্রতিভাকাশে একটি চিরকালিক জ্যোতিষ্ক। ভারতের চিরন্তন আদর্শকে—তাহার ধ্যান-ধারণা-ভাবনাকে নন্দলাল স্বীয় ব্যক্তিজীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন,—শিল্পকর্মেও অভিনব ব্যঞ্জনায় উহাই প্রকাশ করিয়া অমর হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ-ধন্য এই শিল্প-সাধকের জীবন একটি উজ্জ্বল আদর্শস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁহার হৃদয়-দেবতা। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি 'রূপপতি' বলিয়াছেন। নন্দলালের শিল্প-প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করিতে ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ অবদানও সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সহায়তা এবং অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষা-সাহচর্য নন্দলালকে জগৎ সভায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ করিয়াছিল। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল যেন উভয় উভয়ের সম্পূরক—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পধারার স্বাস্থ্যপ্রদ সমন্বয়-সাধক। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সঙ্গে—তথা উদ্বোধন কার্যালয়ের যাবতীয় প্রকাশনের সঙ্গে নন্দলালের সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। তাঁহার বহু বিখ্যাত শিল্পকর্মের অনেকগুলিই 'উদ্বোধন'-এর প্রেরণায় সৃষ্ট। ইহার অজস্র নিদর্শন অদ্যাবধিও আমাদের প্রকাশনমালার প্রচ্ছদে ও পৃষ্ঠায় মিলিবে। বেলুড়ের শ্রীমন্দির ও কামারপুকুরের দেব-দেউল দণ্ডায়মান থাকিবে অনাগত কালের বিশ্ববাসীর কাছে নন্দলালের ভক্তি ও সাধনার স্মৃতিকে বহন করিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন অবলম্বনে নন্দলালের রেখাচিত্রগুলি, ভক্ত মানসে ভগবদ্-লীলা চিন্তনের প্রেরণা দান করিবে চিরকাল। অঙ্কনে ও লিখনে, তুলিতে ও লেখনীতে নন্দলাল

ছিলেন সমান নিপুণ। প্রাচীন 'উদ্বোধন' সংখ্যাগুলিতে তাঁহার সুচিন্তিত একাধিক রচনা শিল্প-সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ।

বঙ্গের খাঁটি পল্লী-কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক 'উদ্বোধন'-পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কমপক্ষে তাঁহার উনচল্লিশটি কবিতা পুরাতন 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁহার সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছিলেন, উহাই কবির সম্যক পরিচিতি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাংলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ ও মঙ্গল শঙ্খের কথা মনে পড়ে।'

*

বর্তমান সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ আমরা এই মনীষি-চতুষ্টয়কে স্মরণ করিতে প্রয়াসী হইলাম। কেন এই স্মরণ? যেন কোনও দূর যাত্রাপথে চলিতে চলিতে সহসা অবসাদ-ক্লিষ্ট দেহে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করা। পশ্চাতের পথ-প্রান্তর-পর্বত মনকে টানিয়া লইতে চাহে—কিন্তু চলিবার সামর্থ্য নাই! পূর্ব গরিমা প্রাণকে চঞ্চল করিয়া তোলে, —কিন্তু সেই গরিমার উচ্চ শিখরে পুনরায় উঠিবার মতো দৃঢ় সংকল্প কোথায়? তবুও আমরা দেখি—বার বার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাই। মহত্বের মননেও মহৎ হইবার প্রেরণা জাগে। আমাদের মনীষি-স্মরণের উদ্দেশ্য ইহাই।

শতবর্ষে

শ্রীমতী অপর্ণা রায়

কার আঁখি হয় নিদ্রাহীন
মনুষ্যত্ব লুটালে ধূলায়,
শতাব্দীর সৈকতে কাহার
করুণা বারিধি ছুঁয়ে যায়,
নিদারুণ রণক্ষেত্রে কার
সুকঠিন দিব্য অঙ্গীকার,
মানবে দেবত্ব দিতে আমি
জন্ম নেব কত শত বার।

আজও তুমি সেই ভগবান
জেগে আছ এ মহানগরে,
যেখানে মানুষ দেহধারী
কীট সম কিলবিল করে,
বিষয়ের বিশেষ বেদনা
দারিদ্র্য-আবর্ত-দীর্ণ প্রাণ
অমৃতের প্রতীক্ষা ব্যাকুল
কোথায় রয়েছে পরিত্রাণ।

প্রেমময় দুহাত বাড়িয়ে
সন্তাপ ঘুচাতে জনে জনে,
পথ চেয়ে নিত্য বিরাজিত
সহরের প্রান্তে, এই কোণে।
এইখানে প্রাণভরে শুনি
নূতন বিশ্বের আগমনী
মানবের হৃদে অধিষ্ঠিত
চিরদেবতার জয়ধ্বনি।

বাসগৃহ ভক্তির আলয়,
পরিচয়—মন্দিরের নাম,
বিশ্বের প্রণাম নিল টানি,
ধন্য প্রভু, ধন্য বলরাম।
তুচ্ছধূলি অসামান্য হল,
প্রভু-ভক্ত পদরজ মাখি,
লীলাতীর্থ রচিল ধরায়
আমার প্রণতি সেথা রাখি।

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
সারগাছী, পোঃ মহুলা (মুর্শিদাবাদ)
2. 4. 36

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার ২৭শে মার্চ্চ তারিখের পত্রখানি পাইয়া এবং নিয়মিত ধ্যানজপাদি করিতেছ জানিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। কিন্তু তুমি অসুখের জন্য এবার পরীক্ষা দিতে পারিলে না এবং নানাভাবে তোমার কষ্ট হইতেছে জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। যাহাতে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করিয়া আগামীবারে ভালভাবে পরীক্ষা দিতে পার তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। প্রবল ইচ্ছা থাকিলে স্বাভাবিকভাবে সবদিক হইতেই একটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। নিজের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে—দেখিবে সব অনুকূল হইয়া আসিবে। ভগবান তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আমার শরীর একপ্রকার আছে। আশা করি তোমাদের কুশল। সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—শুভানুধ্যায়ী—
অখণ্ডানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীদুর্গাসহায়

সারগাছী আশ্রম
২১-৯-৩৬

পরম কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র যথা সময়েই পাইয়াছি। বর্ত্তমানে আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। একরকম শয্যাগতই আছি। এই অবস্থায় কাহারও দুঃখের কথা শুনিতে, বেশী লিখিতে বা কথা বলিতে বড়ই কষ্ট বোধ হয়। এখন আমার একটু নিরালায় নিশ্চিন্তে থাকার বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তোমার দুঃখ ও অবসাদের কথা জানিয়া এই কথাই মনে হইল যে, তোমার এখন ঠাকুরের পায়ে নির্ভর করিয়া, অন্য সব ভুলিয়া থাকাই উচিৎ। সর্ব্বদা মনে করিবে, যে কোন কারণেই হউক, তোমার এই অবস্থা একমাত্র তাঁহার ইচ্ছাতেই ঘটিয়াছে। ইহাই যদি সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিয়া প্রার্থনা করিতে পার, তবেই শান্তি পাইবে। এখন আর এ সব আমাকে লিখিও না। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে।

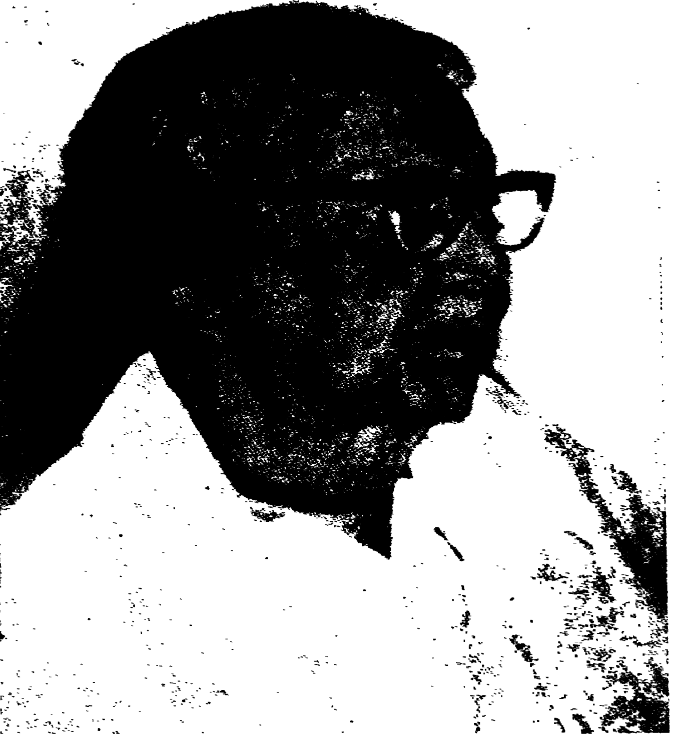
ইতি—শুভানুধ্যায়ী—
অখণ্ডানন্দ



সুব্রহ্মণ্য ভারতী
(১৮৮২—১৯২১)



সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
(১৮৮২—১৯২২)



কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২—১৯৭০)



নন্দলাল বসু (১৮৮২—১৯৬৬)

একটি প্রণাম—মহাকবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে

ডক্টর সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত সুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে!
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।"

জাগ্রত ভগবানের এই দুর্জয় আহ্বানই পৌঁছেছিল তামিলনাদের এক তরুণ তাপসের মন-সাম্রাজ্যে এবং তার গীতিমালার মধ্য দিয়েই তিনি প্রচার করেছিলেন সেই অপূর্ব মন্ত্র ভিদুথলাই, ভিদুথলাই, ভিদুথলাই—স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা শুধু দেশের রাষ্ট্রীয় অধীনতা থেকে বন্ধনমুক্তি নয়, সর্ব রকমের অধীনতা থেকে মুক্তি—আত্মসমর্পণের যোগে।

'ধিম্ তারিকিতা ধিম্, তারিকিতা ধিম' কবিতায়
"পাগলা খেলার হারে জিতে অগ্নি জীবন তাতে
নিত্যকালের ঋতু যাগে মহাকাল মাতে।"

(লেখকের অনুবাদ)

বহুদিন পূর্বে একদিন মীনাক্ষী দেবীকে প্রণাম করে, তিরুমল নায়কের প্রাসাদ পিছনে ফেলে, সহস্র স্তম্ভের সভামণ্ডপকে নমস্কার করে তিরুপ্পরণকুণ্ড্রম্ মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। নমস্কার করেছিলাম কুমারী কন্যাকে, রামেশ্বরম্‌কে, তিরুপতিকে, দক্ষিণকে, তার দাক্ষিণ্যকে, তার শ্রদ্ধাকে, তার নিষ্ঠাকে, এবং পেয়েছিলাম কবীশ্বর সুব্রহ্মণ্য ভারতীকে। আধুনিক কালে তামিলদেশে যে সত্যিকার সাহিত্যসৃষ্টিকে জাতীয় জীবনের স্রোতে প্রথম বৃহত্তর ক্ষেত্রে ডাক দিলেন, তিনিই এই কবি। বাংলায় যেমন, তামিলনাদেও তেমনি পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শন রাষ্ট্রবোধ জাগিয়ে তুলেছিল মনীষিদের চিন্তা ও চেতনা। বাংলার কাছে তাঁর ঋণও অসীম। তিনি গেয়েছিলেন—'বঙ্গভূমি তুমি দীর্ঘজীবী হও।'

প্রাচীন তামিল সাহিত্যের ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য বা বৈদগ্ধ্যের কথা ইতিহাসভুক্ত হলেও তার সম্যক চিত্রটি আমাদের চোখে সব সময়ে পড়ে না। দূরে দক্ষিণে তমালতালী বনরাজিনীলার বেলাভূমি দ্রাবিড় দেশে কোন তামির মুনি সন্ধ্যাবেলায় কার অপেক্ষায় বসেছিলেন কে জানে। কবিবর হেমচন্দ্র তাই বুঝি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ঋষি অগস্ত্য—যিনি উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়েছিলেন আর্যসভ্যতার ও সংস্কৃতির বাহক ধারক ও রসবেত্তা হিসাবে, তিনি কি ফিরেছেন! জনশ্রুতি যে তিনি (এবং ইতিহাস তা সমর্থন করে) সমুদ্র পেরিয়ে সেকালের যবদ্বীপে ও দ্বীপময় ভারতের অন্যত্র ভারত-চেতনার অপূর্ব সন্ধান নিয়ে যান। দক্ষিণে দেখেছি, দ্রাবিড়ে আর্যে ভাবে ভাষায় রূপে রসে অপূর্ব মিশ্রণ, আর্যীকরণের সমীকরণে নূতন প্রাণের সন্ধান, সমাজ জীবনে নূতন চিন্তার বিন্যাস, উত্তরে দক্ষিণে দুটি জীবন্ত জলন্ত প্রাণবন্ত সংস্কৃতির মিলন। তামিল ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস অনেকে মনে করেন, উত্তরাপথের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চেয়েও প্রাচীন। এই যে ঐক্য, এই যে সমন্বয়ের ধারা এই তো ভারত-ইতিহাসের চলন্ত মন্ত্র, অমোঘ বাণী—মনে পড়ে সেই অপরূপ চিত্রের কথা—কন্যাকুমারী থেকে দূরে সমুদ্রের মাঝে এক মগ্ন শৈলে ধ্যানমগ্ন এক তরুণ তাপস যাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে, এক বিরাট দেশের ছায়া—কন্যাকুমারিকা থেকে তুষারতুঙ্গী কেদার বদরী, দ্বারকা থেকে কামাখ্যা আসাম পর্যন্ত, এই চতুঃসীমার মাঝে সেই ভুবনমন-

মোহিনী ভারতজননীর রূপ, তার কত সন্তান, কত সম্প্রদায়, কত ধর্ম, চিন্তা-চেতনা, কত বিভাগ—তবু তিনি এক দেবী সনাতনী—দেবীং স্বমাত্মামহং বৃণুতে। তিনি খুঁজছেন তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষকে, জ্ঞানের ভারতবর্ষকে, প্রেমের সেবার ভারতবর্ষকে। বলছেন—ভুলো না, তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। তাঁর ভারতবর্ষ শুধু সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে বিভাসিত নয়, সাধকের দৃষ্টিতেও পর্যবসিত নয়,—এক অপরূপ সৃষ্টি, যা ফুটে বেরুবে ভুনাওয়ালার চুপড়ি থেকে, মুটে মজুর মুদ্দফরাসের ঝুড়ি থেকে, ভাঙ্গীর ঘর থেকে—ভারত ভুলিও না তোমার উপাস্যদেবতা উমানাথ গৌরপতি শংকর। 'তুমি কোন্ পতাকার নিম্নে থাকিয়া চলিতেছ, তাহাও দেখিও না। তোমার পতাকা নীল, সবুজ বা লাল—তাহা গ্রাহ্য করিও না। সমুদয় রং মিশাইয়া প্রেমের শুভ্র বর্ণের জ্যোতি প্রকাশ কর। কর্মে আমাদের প্রয়োজন, ফল আপনিই হইবে।' ধর্মে মহান্ হতে হবে, কর্মে মহান্ হতে হবে, এও তো আর এক কবির কথা। এঁরই ভাবশিষ্য হচ্ছেন সুব্রহ্মণ্য ভারতী, ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে। পূর্বেই বলেছি, ভারতে উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমের ধাক্কা-খাওয়া মন টয়েনবীয়ান ভাষায় 'চ্যালেঞ্জ, রেসপন্স, এসিমিলেশনে'র মাধ্যমে একটা শক্ত খুঁটি চেয়েছিল এবং তার সমন্বয়ের চেষ্টাও হয়েছিল রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ প্রভৃতি মনীষিদের মাধ্যমে—সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে এক ঐক্যে, যার নাম দেওয়া যায় ভারত-চেতনা—যত মত তত পথ—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—a Society electric with thought and loaded to the brim with passion. এই যুগেই সুব্রহ্মণ্যের জাগরণ। তিনি গাইলেন—

"জনম লভেছি ভারতবর্ষে এই তো মোদের রাজটীকা / বর্ষে বর্ষে হয়েছি ধন্য, পরেছি ভালে তিলকলিখা।" (লেখকের অনুবাদ)

অনেকে বলেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তামিলনাদে সাহিত্যের যে নবযুগ আরম্ভ হয়, ভারতী তার হোতা, কম্বি তার উদ্গাতা, রমণ তার ঋষি, রাজাজী তার ব্যাখ্যাতা। এই প্রসঙ্গে রাজাজীর একটি উক্তি মনে পড়ে—"The body of national thought that he wove into song was that which preceded Gandhi. It was Vivekananda's, Dadabhai's and Tilak's India."

মাদ্রাজ হতে কিছু দূরে তামিলনাড়ুর এক পল্লীগ্রামে অপেক্ষাকৃত দরিদ্রঘরেই এই প্রতিভাবান কবির জন্ম ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। চল্লিশ বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মহাপ্রয়াণ। এরই মধ্যে তাঁর জীবন যৌবন দেশ-চেতনা, সাংস্কৃতিক তপস্যা আর কবিপ্রাণ জেগে উঠেছে, তিনি দেখতে পেয়েছেন, সেই ঘোররূপা মাতাকে, যিনি উন্মাদিনী দিগবসনা,—মা যে আমাদের তরঙ্গবাহিনী—তাঁর ত্রিশূল জয় করে মৃত্যুকে—তিনিই সেই মহাশক্তি, যিনি মহিষাসুরের রক্তে পূরণ করেন তাঁর অদম্য ইচ্ছা (পেরবল কাম্ এঙ্গল আনায়—স্নেহাকর চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদের অনুসরণে)। সুব্রহ্মণ্য ভারতীর উপর প্রাচীন তামিলসাহিত্যের প্রভাব

সেযুগের তামিলসাহিত্যের কথা বলতে গেলে, এই কথাটাই মনে রাখা উচিত যে, সুব্রহ্মণ্য ভারতীই শুধু তার হোতা ও উদ্গাতা নন্ এবং তাঁরই কথা স্মরণ করব "ভারতমাতার ত্রিশকোটি মুখ, তিনি আঠারোটি ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু তাঁর মন একটি।" এই মন খুঁজতেই বেরিয়েছেন একালে ও সেকালে কবিসাহিত্যিক শিল্পীর দল—সেই ঐক্যের ইতিকথাই ভারত-চেতনার দিকে

দিকে পল্লবিত মাতার বন্দনার গান। তামিল-সাহিত্য অতি প্রাচীন সাহিত্য। প্রাক্-চেন তামিজ দ্রাবিড় ভাষাই কালে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী ও মালয়ালমে বিভক্ত হয়ে যায়। শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত ভাষাবিৎ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ভাষা তত্ত্বজ্ঞ Hultseh-এর Remarks on a Papyrus Oxyzhyneus (JBAS Gr Britain I, 1904, pp. 3998) থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, মিশরে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন গ্রীক নাটকে কানাড়ী দ্রাবিড়ী ভাষায় লিখিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। সে যাই হোক্, আমরা প্রাচীন তামিল ভাষায় পেয়েছি এক অপূর্ব সাহিত্য সম্ভার—আমরা পেয়েছি সঙ্ঘম যুগের কত কবিদের, বৈয়াকরণদের, শিল্পীদের, সাধকদের, শৈবসিদ্ধান্তীদের, বৈষ্ণব আড়বারদের, প্রবন্ধকার-দের, দ্বৈতাদ্বৈতবাদীদের, আচার্যদের। আমরা পেয়েছি, সংস্কৃতে লেখা ছাড়াও মূল তামিলে তিরুক্কুরলের মতো সাহিত্য, শিলপ্পদিবকমের মতো রচনা, মণিমেখলই, জীবকচিন্তামণি, ইয়্-ই নাবপতুর মতো (বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব পড়েছে) কত কাব্য ও নাটক, কাম্বানের রামায়ণ, কত শৈবগাথা, কত বৈষ্ণব পদাবলী। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে প্রাচীন তামিলসাহিত্যের ইতিহাস-সঙ্গত দৃষ্টি তৃতীয় সঙ্ঘম যুগের কাব্যাবলী। এই সময় দ্রাবিড় দেশে আর্য সভ্যতা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হচ্ছে। এই সংমিশ্রণ ও সমীকরণের যুগে সাহিত্যের মূল সূত্র নির্ধারণ করতেন বিখ্যাত বৈয়াকরণরা। এর মধ্যে প্রধান ছিলেন তোল কপ্পীয়র। তার বিভাগ ছিল (১) বর্ণ, লিখন উচ্চারণ বা Orthography (এর্ষতু) (২) শব্দ, ধাতুরূপ, বাক্যরীতি, বা Etymology (চেল্লি) (৩) সাহিত্যে আলোচিত ছন্দবিন্যাস বা Matter (পরুল)। এই যুগের নাম হয়েছে কবিপরিষদের যুগ বা সঙ্ঘম যুগ। কিংবদন্তী যে প্রাচীনকালে স্বয়ং শিব ছিলেন সভাপতি, কার্ত্তিগেশ (দ্রাবিড় নাম মুরুগেশ), অগস্ত্য মুনি বা তামির মুনি এর সদস্য। পাণ্ড্যরাজগণ তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দুহাজার বৎসর পূর্বে। মহাকবি নাক্কি-কারের কথা না বললে প্রাচীন তামিলসাহিত্যের কথা কিছু বলাই হয় না ; কারণ এই কবির প্রভাব সুব্রহ্মণ্য ভারতীর উপর বেশ কিছু পড়েছে। কার্ত্তিগেশের নামই সুব্রহ্মণ্য। দ্রাবিড়সাহিত্যে দেবতা সুব্রহ্মণ্যের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল ; তাই একালের সুব্রহ্মণ্য নূতন করে এযুগের সাহিত্যের প্রধান সাধক হবেন, তার বিচিত্রতা কিছু নেই। সঙ্ঘম যুগের বিখ্যাত কবি নাক্কিকারের একটি কাব্য 'পত্তু পাত্তু' বা দশকাব্য স্থান পেয়েছে। এগুলি ভাবের গাম্ভীর্যে, ভাষার লালিত্যে, বর্ণনার কৌশলে যে কোন দেশের প্রথম শ্রেণীর কাব্যের সঙ্গে তুলনীয় এবং সুব্রহ্মণ্য ভারতীর কাব্যপাঠে একথা স্পষ্ট যে, তিনি এই সব কাব্য থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কবি তিরুবল্লুবরের কুরল বা মুপ্পল দক্ষিণে বেদের মতোই আদৃত। 'চিল্লপদ্দিরকম্', 'জীবকচিন্তামণি', 'মণিমেখলই' 'ইয়তু নাবয়াতু' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি মূলতঃ মানবমন ও সমাজধর্মী (Secular), ভক্তিতত্ত্ব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ভাবগদগদতা নেই। বিখ্যাত নূপুর কাব্য—মঞ্জিল মঞ্জীর বাজে—The Lay of the Anklet এই যুগেরই কোবিলন কন্নগীর গল্প (ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী)।

এর পরের যুগে এলেন শৈবসিদ্ধান্তীরা ও বৈষ্ণব আড়বাররা। শৈবসিদ্ধান্তীরা বা নায়ন-মাররা শোনালেন তিরু (শ্রী), নান (জ্ঞান), বাচন (কথা)। এই সিদ্ধান্তের প্রতীক হচ্ছেন পশুপতি অর্থাৎ যিনি একই সঙ্গে পতি, পশু ও পাশ—বা যে পতি বা পরমপুরুষ পাশবদ্ধ জীবদের মুক্ত করে দেন। তিনিই "কৈলতি অণ্ডে কেলতি পিণ্ডে"—অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মাণ্ডেও আছেন, হৃৎ-পিণ্ডেও আছেন। এই দুই সীমানাতেই সেই

নটরাজের নৃত্য—বিবশ বিশ্ব-চেতনায় জাগছে, লীন হচ্ছে, সবিকল্প জ্ঞান নির্বিকল্প সমাধিতে, শিবানুভবে। এই যুগের চারজন বিখ্যাত কবি—তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর, অপ্পর স্বামী, সুন্দরর ও মাণিক্য ভাস্বর। এঁরা সৎপুত্র মার্গী, দাসমার্গী, মহামার্গী ও সন্মার্গী ছিলেন। একাদশ শতাব্দীর চোলরাজ কুলশেখরের আদেশে নাম্বিরাম্ভার গাথা ও স্তোত্র-গুলি একত্রিত করে 'থিরুমুরাই' নামে সংকলন করেন এবং তার নাম দেন 'থেবরম' বা দেবহারম। এই সব নামেই দেখা যায় আর্যভাষা ও ভাব দ্রাবিড় সাহিত্য, ধর্ম ও কর্মপ্রয়াসকে কিভাবে আর্যীকৃত করতে পেরেছিল। এই যুগের আর একটি প্রচলিত পুস্তকের নাম 'পেরিয়াপুরাণ' বা মহাপুরাণ।

সুব্রহ্মণ্য ভারতীর কবিজীবনকে অনেকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর পিতা কোন দিনই চাননি যে, পুত্র প্রাচীন সাহিত্য পড়ে গদগদ হয়ে দেশসেবায় মত্ত হয়। এমনকি পুত্র, কাম্বানের রামায়ণ মূল তামিলে পড়ছে দেখে তিরস্কার করে-ছিলেন। বোধহয় তাঁর ইচ্ছা ছিল যে,'সুপ্পাবাইয়া' (অর্থাৎ সুব্রহ্মণ্যম্) বড় ইংরাজীনবীশ হয়ে কোন একটি উচ্চ আসন অধিকার করবে। তাঁর কাব্যের চারিটি দিক (১) দেশাত্মবোধ—যার ফল তাঁর বিখ্যাত স্বদেশী কবিতা ও গানগুলি—যেমন 'জননী জাগো' কবিতাটি। প্রতিদিন ভোরে দেব-মন্দিরে ভক্তগণ উদ্বোধনী গান গেয়ে দেবতাকে জানায় নূতন দিনের আবির্ভাব—তামিলে একে বলা হয়—'তিরুপল্লী এযুচি'। কবি গাইলেন—

"আলো আলো আলো
পালাল কি গভীর অমার তিমির রাত্রির
কালো

ভোরের ত্বরাদিনের মহিমায়
ধ্যানস্তব্ধ স্নিগ্ধ অমল গরিমায়
ছন্দে ছন্দে নব দিগন্তে নামিল কি উষসী
ক্রন্দসী প্রেয়সী ছন্দসী
নব অরুণের স্বর্ণবর্ণে ছড়িয়ে দিগ্বিদিক
কনক অর্ক মাঙ্গলিক
হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে,
তোমার তরে সন্ততি দল
হে মাতা বন্দিতা চিরনন্দিতা, কেন তুমি
নিদ্রাহতা বিকল

জাগৃহি জননী জাগো
সন্তান মাগে আশীর্বাণী মাগো
পাখীরা করে কলরব গান
মৃদঙ্গে ওঠে রোল দে দোল দে দোল, অপরূপ
সে তান

স্বাধীনতার মন্ত্র কম্বুকণ্ঠে বিরাজি
নব নিনাদে শুভ্রশঙ্খ ওঠে বাজি
পথে পথে ঐ শোনো জনতা
শুদ্ধবুদ্ধ গণচিত্তের মমতা
মঙ্গলময়ের সাথে তব নাম গাঁথি
ওঠে গরজিয়া সিন্ধুসম দিবস রাতি
প্রাণের অধিক প্রিয় বল্লভা তুমি যে দাত্রী
জীবনে মরণে অমৃত ভরণী তুমি মা ধাত্রী
জাগৃহি জননী জাগো
সন্তান ডাকে প্রসীদ মাগো"

আবার তিনি বলছেন—

"তুমি যে দিয়েছ বেদ
জ্ঞান বিজ্ঞান শ্রদ্ধা নির্জ্ঞান কত না নির্বেদ
বাক্যে তোমারে যায় না ধরা তুমি বাক্,
অপরূপবাদিনী
অরাতি দমনে কলুষনাশনে চলেছ
ত্রিশূলধারিণী
তুমি পবিত্রা, অতি বিচিত্রা
জাগো জননী, মরম ভরণী মাতা সুচিত্রা···
হে হৈমবতী তুষারশীর্ষ হিম অচল দিব্যকন্যা
আর কতকাল কাটিবে বল, করিবে মোদের
অগ্নিধন্যা

বীর্য শৌর্য তপ ধৈর্য আর কি চাহ মা বল
ত্বরা করি
ঘুমায়োনা তুমি ভারতজননী, জাগৃহি দেবি,
দয়া করি
সন্তানেরা ডাকে মা তোরে
জানিনা কেমনে ঘুমাও তুমি ছন্দভরা এই
ভোরে
আঠারোটি ভাষার ক্রন্দনে বিচিত্রতম বন্ধনে
ডাকে তোমারে কলকাকলীতে নূতন দিনের
সন্ধান ইন্ধনে
হে মাতা রাজ্ঞী, মন সম্রাজ্ঞী যুগে যুগে বন্দিতা,
জাগো তুমি জাগাও মোদের কল্যাণ মন্ত্রে
ছন্দিতা।"

(পোযুতু পুলার্ন্দাতু—লেখকের অনুবাদ)

স্বদেশীযুগের স্বদেশমন্ত্র 'বন্দেমাতরম'কেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতার তূর্য বাজাবার জন্য। ভগিনী নিবেদিতাই তাঁকে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে তিনি এতই শ্রদ্ধাবান ছিলেন যে, তিনি লিখেছিলেন, যার অগ্নিস্পর্শে পুড়ে যায় যা যা ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট, নিবেদিতা মাতা তোমায় নমস্কার।

(২) তা ছাড়া তিনি শক্তিপূজক—শক্তির ব্যঞ্জনা দেখছেন চারিদিকে। তিনিও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো বলতেন—"ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" বিবেকানন্দের অভী মন্ত্রও তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল -"ভয় নাই ভয় নাই—'আচ্ছা মিল্লাই, আচ্ছা মিল্লাই' বিরুদ্ধ হলেও ভয় নাই ভয় নাই, আকাশ ভেঙে পড়লেও ভয় নাই।" শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল প্রচণ্ড। তাঁর পণ্ডিচারীবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন সুব্রহ্মণ্য ভারতীই।

তাঁর স্বাধীনতা—

"পেবিয়া তিয়া পুলয়ার জগৎ
সুরভ কুবন্ত মারঙ বন্ত"

তিনি গাইলেন—

"ব্রাহ্মণকে 'আয়য়ার' বলবার দিন আর নেই।
ফিরিঙ্গিকে 'তুরাই' বলবার দিন আর নেই।"

কার্লমার্ক্স বা সোশ্যালিজম্ এর প্রকৃত অর্থ তখনও ভারতবর্ষে প্রায় অজ্ঞাত, কিন্তু তার চেয়েও বড় সোশ্যালিজমের মন্ত্র যে ভারতবর্ষের অমিতবিত্ত চিত্তের সাধনায় তপস্যায়। সে মন্ত্র পেয়েছে—ওঁ মধু—মধুমৎ পার্থিবং রজঃ আর মধু দৌরস্তু নঃ পিতা—দুইই মধুমান একসঙ্গেই তিনিই তিনি—সবই যে সেই ব্রহ্মের, বৃহতের, মহতের, বৃহত্তমের, মহত্তমের বিভাস। তাই যীশুকে তিনি যেমন প্রণাম জানিয়েছেন (তাঁর একটি কবিতার নাম—"ঈশন্ বান্দু শিলুবায়িল্ মাণ্ডান")—

"প্রভু এলেন মর্ত্যে এবং মর্ত্যেরই জন্য তিনি
মৃত্যুবরণ করলেন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে
তৃতীয় দিন পরে উজ্জীবিত হয়ে উঠলেন
পুনর্বার
তাঁর প্রতি আত্মোৎসর্গীকৃত পবিত্র মেরিয়া
মেডলেনা
চাক্ষুষ সাক্ষী রইলেন প্রভুর ঐ উত্থান ঘটনার
শোন দেশবাসী এর গোপন রহস্য···
ভগবান আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে
রক্ষা করেন সর্বদা
যদি আমরা আত্ম-অহঙ্কার বিমুক্ত হতে
পারি—"

(স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ)

তেমনি আল্লাহ-পয়গম্বর ও রসুলদের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অটুট। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্যা নিবেদিতার প্রভাব সুব্রহ্মণ্য ভারতীর সমস্ত কবিমানসকে উজ্জ্বল করে তুলেছিল। পণ্ডিচেরীতে থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর বেদ, উপনিষদ, গীতা রামায়ণ মহাভারত নিয়েও আলোচনা হত

এবং তাঁর বিখ্যাত "পাঞ্চালী শপথম্"-এর বিষয়বস্তু মহাভারতকে অবলম্বন করেই লেখা। এই খণ্ড-কাব্যটি নাটক না মহাকাব্য—drama or epic সে নিয়ে বিতর্ক আছে। তাঁর রচনায় দ্বিতীয় প্রভাবের মূর্চ্ছনা পাই শক্তি সাধনায়—

"কবি তুমি গাহ গান,
শানিত গীত কৃপাণহস্তে খণ্ডিত কর
অপমান।"

(লেখকের অনুবাদ)

আবার এই কবিই তাঁর কাব্যের আর এক স্তরে (তৃতীয় স্তর) প্রেমের কবি—একটি কবিতায় দেখি তিনি কল্পনা করেছেন যে, তিনি অভিসারিকা তাঁর কান্নন বা কৃষ্ণ কিন্তু প্রিয় আসছেন না, যেন কন্যাকুমারীতে ভৈরব অনাগত—

"দীঘির ধারে দখিন কোণে
ফোটে ফুল যেথা চাঁপার বনে
সেই কুঞ্জ বিতানে"

দুজনের দেখা ও মিলন হবে এই কথা ছিল—কিন্তু প্রিয়তম অনুপস্থিত—

"কুঞ্জদুয়ারে তোমার দ্বারীরা
রুখিল মোরে সায়কধারীরা
আমি তব দাসী, প্রবেশ নাহি—
একি অনাচার, বিচার চাহি
আশা ছিল যে মনে তোমারি সনে
শয়নে স্বপনে ধেয়ানে মননে
কাটিবে রাতি দেবদুর্লভ মম
দেহবল্লরী পারিজাত সম
উঠিবে ফুটি রস উল্লাসে
পরম মন্ত্রে চরম বিভাসে।"

(লেখকের অনুবাদ)

আবার আর একদিন কবি স্বপ্ন দেখলেন যে, কে যেন এল, কে যেন চলে গেল, সে শুধু হৃদয় স্পর্শ করল। কি আনন্দ কি আনন্দ,—পরমানন্দ মাধব কি এলেন? চিত্ত শীতল হল, মন স্তব্ধ হল, বেদনা মুছে গেল—কবি শান্ত হলেন। ভোগের ইচ্ছা ফিরে এল ভোগমনের স্পর্শে, মনের মন্দিরে জন্ম নিলে সৌন্দর্যের সুর—সত্যের তেজ, কল্যাণের ছন্দ—

তিনি লিখলেন—

তাঁকে নিয়ে মানুষ করে কত ভ্রান্ত ধারণা
কত দার্শনিক ধূম্রজাল বিরচিত, কত অগণিত
কামনা
তাঁর গতিবিধি অদ্ভুত
তিনি বিচিত্রের দূত
...
তিনি কালো, তিনি কৃষ্ণ, করেন আকর্ষণ
চম্পক বরণা কামিনীরা তাঁর প্রেমেতে মগন।
তাঁর গতি অবারিত হাঁ ও না
সময়ের সীমাহীন সীমানায় তার আস্তানা
প্রতি পদে তিনি বুনে চলেছেন বেদ
বিচার বিতর্কের উর্ধ্বে পরম নির্বেদ
মানুষের মনগড়া ভাষা ও ভাষ্যের বাহিরে
তিনিই তিনি, তিনিই তিনি, তিনি আছেন
দাঁড়িয়ে।"

(লেখকের অনুবাদ)

(৪) চতুর্থ স্তরের কাব্যে তিনি শুধু ভোগী ত্যাগী নন, যোগী। যোগসমন্বয়ের চোখ খুলে গেছে তাঁর। এমন কি কৃষ্ণকে তিনি মাতৃভাবে স্ত্রীভাবে সম্বোধন করেছেন—কান্নাম্মা (কান্নন+অম্মা)—

"তুমি আমার ভালবাসা
আমি তোমার অয়স্কান্ত মণি
তুমি আমার বেদ
আমি তোমার বিদ্যা...
তুমি আমার তারা
আমি তোমার শীতল চন্দ্রিকা
তুমি শৌর্য
আমি জয়
ধরণীর তলে গগনের গায়ে

রয়েছে যত আনন্দ
সবই মূর্ত হয়েছে তোমার মধ্যে।
ওগো কান্নাম্মা, তুমি আমার অন্তর-সুধা"
(পায়ুমোলি নীয়েনাক্কু—অনুবাদ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য)

তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশসেবায়; জ্ঞানভানু ও Radical Social Reform নামক কাগজেই তাঁর লেখার সূত্রপাত। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশমিত্রম কাগজের সহ-সম্পাদক (সবএডিটার) ছিলেন তিনি। এল্লাভাপুরমে বাল্যকাল কেটেছে। কাম্বান বা ইলাঙ্গো বল্লুবর ও আভ্ভাই তাঁর মনের খোরাক জুগিয়েছে, অবশ্য ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, শেলী, কীটস প্রভৃতিও তাঁকে কাব্য প্রেরণা জুগিয়েছে। কীটসের Endymion তাঁর প্রিয় ছিল—Its loveliness increases it will never pass into nothingness—ভারতীর কবিতা সম্বন্ধেও এই মন্তব্য করা যায়।

তাঁর শেষ জীবন যোগের জীবন এবং শ্রীঅরবিন্দের অনুপ্রেরণা তাঁকে অন্তর্যোগী করে তুলেছিল—ভগবান হচ্ছেন আদর্শ, চিত্তলক্ষ্য, সত্য শিব সুন্দর। এই সৌন্দর্যের উপাসনাই কবিদের মুখ দিয়ে বলায় Beauty is Truth, Truth beauty.

ভারতী রচিত খণ্ডকাব্য তিনটি "কান্নান পাত্তু" "কুয়িল পাত্তু" ও "পাঞ্চালীশপথম্"—কান্নান পাত্তু সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটি কৃষ্ণ বিষয়ক কবিতাগুলির সংগ্রহ, কুয়িল পাত্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে মানবিক ভাবের তুলনামূলক বিচার ও কৌতুক, পাঞ্চালীশপথম্ মহাভারতের একটি আখ্যানকে প্রাণবন্ত করে তোলার ইতিহাস। এই রসবিদগ্ধ রচনায় অর্জুন চলেছেন দ্রৌপদীকে নিয়ে হস্তিনাপুরে। পথে সন্ধ্যা নামছে, পরাশক্তি চক্র ঘোরাচ্ছেন,—তারই বর্ণনা। অর্জুন দ্রৌপদীকে বলছেন—এই তো মায়ের কাব্য, এসো তাঁকে ডাকি, শপথ গ্রহণ করি। যোগী ভারতীর একটি কবিতা শুনুন—আত্মজয় কি করে হয়—

"শুধু কি চোখে ধরা পড়ে
হাতে কি যায় না ধরা
পৃথিবী থেকে আকাশ যেমন দেখা যায়
স্বীয় পরিধিতে, আমরা পারি না কি তাকে ছুঁতে
সে কি আমাদের এত নাগালের বাইরে?
হে আদিম শক্তি তুমি তাই
দূরে থেকে যা শুধু আকাশ পৃথিবী, নয়ন হৃদয় তৃপ্ত করে।
আর আমরা শুধু স্বপ্ন দেখি, স্বপ্নই দেখি
এবং কঠোর শ্রম
অবশেষে তুচ্ছ অহংকারের স্তূপে হঠাৎ পতন
এই কি আমাদের অনিবার্য পরিণতি?
আমাদের হৃদয় উৎসুক থাকে ঠিকই
যশ-গৌরব, আদর্শ, উদারতার জন্য
আর এ সবই আমাদের হতে পারে
যদি আমরা একমাত্র নিজেকে জয় করতে পারি
আত্মজয়—একদা মনীষিরাও তাই-ই বলেছিলেন
এবং আমরা যারা একথা জানি
তথাপিও উদাসীন অক্ষম দুর্বলতায় ডুবে যাবো?
আর কিছু নয়?
সেই শক্তি কি আমাদের নাগালের বাইরে
যা আমাদের আত্মসংযম ও আপনারে
জয় করতে শেখায়?"
(কাল্লিল তেরিয়ুম্ পোরুলাই—অনুবাদ স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়)

সুব্রহ্মণ্য ভারতীর গল্প লেখার হাতও ছিল বেশ ভাল। তাঁর একটি বিখ্যাত কাহিনী "করোমি"—

বিস্তানগরের রাজা স্থিরচিত্তকে তাঁর শত্রুরা চুরি করে, নিয়ে গিয়ে দূরে এক পর্বতগুহায় আটকে রাখে এবং নিদ্রার ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যায়—ঘুম ভাঙলে তিনি দেখেন যে, সামনে স্বয়ং যমরাজ দাঁড়িয়ে—তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে একটি মন্ত্র পেয়েছিলেন "করোমি"—এই মন্ত্রের তপস্যার ফলে সর্বত্রই তিনি বলতে পারতেন—যে কেউ আসুক শত্রু, মিত্র অমাত্য—কুরু, কুরু, কুরু—করছি, করবো, কর—জীবনের এই মহামন্ত্রের উপাসনা ভারতীও সার করেছিলেন। আর একটি গল্প The fox with the golden tail—সোনার লেজওয়ালা শৃগাল।

যেমন নৃত্যরত নটরাজের মধ্যে আমরা পেয়েছি—কুমারস্বামীর ভাষায় 'a synthesis of science, religion and art' তেমনি ভারতীয় কাব্যেও আমরা পাই শক্তি, শিল্প ও স্বদেশবোধের সমন্বয়। তাই তাঁকে এই শতবার্ষিকীর দিনে প্রণাম জানাই, বলি "গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, নিধিনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে, প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।"

ভয়ের কিছুই নাই*

সুব্রহ্মণ্য ভারতী

[অনুবাদিকা : শ্রীমতী বেলা সরকার]

অখিল ভুবন ভীষণ বিরূপ হয় বা যদি কভু
মাভৈঃ মাভৈঃ ভয় কিছু নেই—ভয় কিছু নেই তবু।
নিন্দা ঘৃণায় জীবনে তোর যদি বা ধিক্কারে
মাভৈঃ মাভৈঃ ভয় কিছু নেই, ভয় কিছু নেই ওরে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাঙ্গা হয় যদিরে ভাগ্যলিপি ভাই
তবুও ওরে। ভয়ের কিছুই নাইরে কিছুই নাই।···
বন্ধু পরম গরল যদি জোর করে পান করায়
মাভৈঃ মাভৈঃ তবুও যেন চিত্ত নাহি ডরায়।
রক্তাক্ত-হাত সৈন্য যদি শাসায় ত্রাসে ভাই
তবুও মাভৈঃ ভয়ের কিছুই নাইরে কিছুই নাই।
মাথার ওপর যদি কভু আকাশ ভেঙ্গেও পড়ে
মাভৈঃ মাভৈঃ নির্ভীক রও সেই প্রলয়ের ঝড়ে।

* ৭৪তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ সনের উদ্বোধন হইতে পুনর্মুদ্রিত।—সঃ

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি কয়েকবার এবং মেলামেশার অবসরে তাঁর আন্তর ও বহির্জীবনের কিছু কিছু কথা ও ঘটনার পরিচয় লাভ করেছিলাম—যে পরিচিতি আমায় মুগ্ধ করেছিল, আনন্দের আস্বাদনে তৃপ্ত করেছিল।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় দার্জিলিঙে যখন তিনি গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অন্তরের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাতে। পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজকে প্রণাম করে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনাদি শেষ করে ভিজিটারস্‌-রুমের বাইরে এলে, আমার ও নরেন মহারাজের (স্বামী সমুদ্ধানন্দ) সঙ্গে হয় আলাপ-পরিচয় এবং সেই সময়ে তিনি আমাদের দুজনকে জানান আমন্ত্রণ একবার সুযোগ করে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য। আমরাও জানিয়েছিলাম শ্রদ্ধা ও ভালবাসাপূর্ণ ইতিবাচক আমাদের সম্মতি।

যতটুকু মনে আছে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হবে—দিন-তারিখ ঠিক মনে নেই—আমরা তিনজনে (আমি, স্বামী সমুদ্ধানন্দ ও স্বামী সদ্রূপানন্দ) রওনা হলাম শান্তিনিকেতনের পথে। অবশ্য পূর্ব থেকেই আমাদের যাওয়ার দিন চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছিলাম শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবুকে। তাই যখনই আমরা উপস্থিত হলাম শান্তিনিকেতন (তখন নাম ছিল বোলপুর) স্টেশনে—আমরা দেখি উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্ল্যাটফর্মে আমাদের অপেক্ষায় নন্দলালবাবু। আমাদের তিনজনেরই থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল শান্তিনিকেতনে চীনা-ভবনে। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক তান্-য়ুন-শান ছিলেন তখন চীনা-ভবনের বাসিন্দা। অধ্যাপক তান্-য়ুন-শান ছিলেন পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের মন্ত্রশিষ্য তিনি স্বামীজী মহারাজের কৃপা লাভ করেছিলেন দার্জিলিঙ-বেদান্ত-আশ্রমেই। মনে হয়, এ সংবাদ অধিকাংশ লোকের কাছেই সুবিদিত ছিল না; কেননা সহজ-সরল-চিত্ত ও নিরহংকার-স্বভাব অধ্যাপক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ সকল কথা কাকেও বলতেন না।

আমরা তিনদিন মাত্র ছিলাম শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক তান্-য়ুন-শানের অতিথি হয়ে এবং শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু সেই সময়ে সকল কাজ ছেড়ে প্রায় সকল সময়েই থাকতেন আমাদের সঙ্গে, সুতরাং নানান বিষয়ের আলোচনা ও নানান কথা শোনার ও বলার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলাম শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবুর সঙ্গে।

প্রতিদিনই কথাবার্তা হত নানান রকম বিষয়ের, তবে তাদের মধ্যে অগ্রাধিকার লাভ করত শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ও রামকৃষ্ণ-মঠ-মিশন-সম্পর্কিত বিষয়ের। কিন্তু সকল সময়েই দেখেছি যে, শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু একান্ত ঔৎসুক্য ও শ্রদ্ধার নিবিড়তা নিয়ে সেই সব কথা শুনতেন এবং মাঝে মাঝে দুটি হাত মাথায় তুলে করজোড়ে প্রণাম জানাতেন কোন দেবতা বা মহিমান্বিত কোন মহামানবের উদ্দেশে। নানান রকমের কথার ও প্রশ্নের মধ্যে আমরা কখনও জিজ্ঞাসা করতাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাহচর্যের ও ভালবাসার কথা, বা জিজ্ঞাসা করতাম চিত্রশিল্প প্রভৃতি ফাইন-আর্টসের ভারতীয় দৃষ্টি ও আদর্শের কথা।

একদিনের কথা। দিনের আলো শেষ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার তখন নেমে এসেছে। সন্ধ্যা ৭টা

হবে। আমরা বিশেষভাবে সেদিন চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর একান্ত অনুরাগ ও আকর্ষণের কারণ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু ওনেই প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে প্রসঙ্গ তুললেন ভগিনী নিবেদিতার ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি প্রদীপ্তভাবে বললেন: "ভগিনী নিবেদিতা পাশ্চাত্যদেশের অধিবাসিনী হলেও আসলে ভারতীয় ভাবধারায়ই উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তাঁর শরীর ছিল ভিন্ন দেশের, কিন্তু মন ও হৃদয় ছিল অধ্যাত্মভাবদীপ্ত ভারতবর্ষের! এই ছবি-আঁকার (চিত্রশিল্পের) জাগ্রত-প্রেরণা পেয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকেই বিশেষভাবে। আর চিত্রে শিক্ষা ও অনুরাগ সৃষ্টি করেছিলেন আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই বিশেষ করে এই দুজনের কাছেই আমার জমা আছে অপরিশোধ্য অপরিসীম ঋণ। ভগিনী নিবেদিতার **Footfalls of Indian History** ও **The Master as I Saw Him** বইদুটি নিষ্ঠার সঙ্গে আমি পড়েছি এবং প্রেরণা পেয়েছি অফুরন্তভাবে। **Footfalls of Indian History**-তে তাঁর **'Some Problems of Indian Research'**-চ্যাপ্টারটি (পরিচ্ছেদ বা বিষয়টি) মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ। ভগিনী নিবেদিতা ঠিকই বলেছেন: **'One of the first tasks before the Indian people is the rewriting of their own history'.** ভারতের ইতিহাসকে ও ভারতের আদর্শকে ভগিনী নিবেদিতা একটি অনন্যদৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন ভারতের সকল-কিছু সম্পদের মধ্যে অধ্যাত্মসম্পদই শ্রেষ্ঠ, মহান্ ও বরণীয়! এই অধ্যাত্মসম্পদকে জাগ্রত করার জন্যই যুগে যুগে ভারতবর্ষে কেন—সমগ্র বিশ্বে অভ্যুদয় ঘটে এক-একজন মহান্ পুরুষের। নিবেদিতা লিখেছেন ঐতিহাসিক মেগস্থেনিস এই রহস্যের কথা প্রকাশ করেছিলেন সাড়ে-সাতশো বৎসর পূর্বে তিন শতকে। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তখন ভারতবর্ষের প্রাণপুরুষ; আর বর্তমান যুগে ভারতের অধ্যাত্ম-জাগরণের মূলে আছেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ! স্বামী বিবেকানন্দ এই পরমসত্য জানিয়েছেন আমাদের। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর প্রেমময় আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন এ রহস্যের সন্ধান। **The Master as I Saw Him**-বইটির ছত্রে ছত্রে স্বামীজীর প্রতি নিবেদিতার অন্তরের শ্রদ্ধা-নিবেদনের চাক্ষুষ নিদর্শন আমরা পাই।" এ সব কথা বলতে বলতে শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবুকে সেদিন দেখলাম যেন একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। শান্ত-শিষ্ট প্রসন্ন-দৃষ্টির মানুষটির মধ্যে সাময়িক-ভাবে একটু উত্তেজনা দেখা দিলেও পরক্ষণেই তিনি সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে বললেন: "না হবেই বা কেন? ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দেরই পরম-স্নেহপালিত মানস-কন্যা ও চিরনিবেদিত-প্রাণ!"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় শ্রদ্ধেয় নন্দলাল-বাবু বললেন: "আমি ভগিনী নিবেদিতার বহুমুখী প্রতিভার কথা ও ভারতীয় ভাবদৃষ্টির কথা বহুপূর্বেই শুনেছিলাম। কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। একদিনের কথা,—আমি আমার সহাধ্যায়ী সুরেন গাঙ্গুলিকে সঙ্গে নিয়ে বোসপাড়া লেনে যেখানে শ্রদ্ধেয়া নিবেদিতা থাকতেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সিস্টার ক্রিশ্চিনও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা যখন তাঁর বোসপাড়ার বাড়ীতে তাঁর দোতালার ঘরে উপস্থিত হলাম, তখন দেখি নিবিষ্ট-মনে তিনি চেয়ারে বসে টেবিলে কাগজ রেখে কি লিখছেন। ধ্যানঘন ভাব। নিবদ্ধ-দৃষ্টি লেখার দিকে। আমাদের দেখে মেজেতে পাতা মাদুরের উপর বসতে ইঙ্গিত করলেন। ভগিনী ক্রিশ্চিন অবশ্য পাশের একটি চেয়ারে গিয়ে বসলেন। আমি ও সুরেন গাঙ্গুলি দুজনে মাদুরে

বসে একটু-আধটু অভিমানের ভাবই মনে নিলাম, —যেটা না বলাই ভাল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমাদের সেই অভিমানের বোঝা কমে গেল যখন তিনি পত্রলেখা শেষ করে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ অনিমেষ নেত্রে চেয়ে থাকার পরে বললেন : 'You are all Buddha'. তারপর স্মিত-হাস্যমুখে বললেন : 'এটা ধ্যানী-বুদ্ধের দেশ। ভগবান্ বুদ্ধ যেমন বদ্ধপদ্মাসনে বসে ধ্যানমগ্ন, তোমরাও বসেছ ঠিক তেমনি। এটাই দেখার জন্য তোমাদের বসতে ইঙ্গিত করেছি মাদুরের উপর। Just remember that India is the Land of Bhagavan Buddha'. আমরা তখন বুঝলাম ভগিনী নিবেদিতার মনোগত ভাব। ভারতবর্ষের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা ও নিষ্ঠা।"[১]

তারপর কথা উঠল রূপ ও ভাবের কথা, পরে আবার রস ও ভাবের কথা। আমি যে সঙ্গীতের কিছুটা আলোচনা করি, দু-চারখানা বইও লিখেছি সঙ্গীতের—সেকথা শিল্পাচার্য নন্দলালবাবু ভালভাবে জানতেন। তাই আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : "এই তো আপনাদের সঙ্গীত—fine arts একটি অন্যতম কলা। এই সঙ্গীতের চাক্ষুষ-রূপ হল রাগ-রাগিণীদের সমাবেশ ও বিকাশ। শিল্পীদের অন্তরের ভাবের উপরই রাগ-রাগিণীদের আসন। এক-একটি রাগ বা রাগিণী, এক-একটি ভাব। এই ভাবের একটা আকার বা form আছে। তেমনি অসংখ্য রাগ-রাগিণী, অসংখ্য তাদের form—pattern বা রূপ। আপনাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে এই সব রূপের ধ্যান ও শ্লোক আছে। ঠিক তেমনি আছে আমাদের চিত্রশিল্পে। শিল্পের গড়ন বা রূপের সৃষ্টি হয় শিল্পীর মনের ভাব-অনুযায়ী। ভাবের তাই রূপ আছে। ভাব আগে—কি রূপ আগে এই নিয়েও বাদানুবাদ আছে। তবে সত্যিকারভাবে ভাব ও রূপ কেউ কারুর আগে বা পিছে নয়, এদের সৃষ্টি একই সঙ্গে। তেমনি রস ও ভাব। ভাব থেকেই রসের সৃষ্টি, আবার একথাও বলা যায় রস থেকেই হয় ভাবের প্রকাশ।"

আমি বললাম : "ঠিকই বলেছেন। নাট্যশাস্ত্রে ভরত এ ধরনের কথাই বলেছেন। ভরত বলেছেন : 'ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ, পরস্পরকৃতা সিদ্ধিস্তয়োরভিনয়ে ভবেৎ।···এবং ভাবা রসশ্চৈব ভাবয়ন্তি পরস্পরম্।' অবশ্য সাধারণভাবে একথাই বলা হয় যে, ভাব থেকে রসের সৃষ্টি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভাব ও রস একই সঙ্গে থাকে,—পরস্পরে অঙ্গাঙ্গিভাব।"

শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু বললেন : "তা হলে আমি ঠিকই বলেছি—ক্যামন।" সকলেই তখন একটু হাসাহাসি করলাম। আমি তখন একটু সুযোগ পেলাম, আমার লেখা 'রাগ ও রূপ'-সঙ্গীতগ্রন্থ-সম্বন্ধে কিছু বলতে। আমি বললাম : "নন্দলালবাবু, আমার একটি সঙ্গীতগ্রন্থ লেখা প্রায় শেষ। কিন্তু ছাপতে দেওয়ার পূর্বে আমার একটি অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে।" তিনি জড়সড় হয়ে জোড়হাত করে বললেন : "আদেশ করুন কি করতে হবে। নিশ্চয়ই করব।"

আমি বললাম : "আমার বইটির নাম 'রাগ ও রূপ'। আমি শাস্ত্রোক্ত রাগ ও রাগিণীগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছি—যেমন ভৈরবরাগ, ভৈরবীরাগিণী প্রভৃতি। রাগ-রাগিণীদের সাধারণতঃ রাগই বলা হয়। তবে সমাজে যেমন স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ আছে, রাগদের সমাজেও তেমনি

১ এখানে বলে রাখা ভাল যে, এই ঘটনাটি প্রয়াত শিল্পী বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী তাঁর 'শিল্প-জিজ্ঞাসায় শিল্প-দীপঙ্কর নন্দলাল'-গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ২৬)। 'দেশ'-বিনোদন ১৩৮৯, নন্দলাল শুভ-শতবার্ষিকী সংখ্যায় কমল সরকার-লিখিত 'নিবেদিতার সান্নিধ্যে নন্দলাল'—প্রবন্ধের সঙ্গে ঐ ঘটনার একটি পেন্সিল-স্কেচ নন্দলাল বসুর স্বাক্ষরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে (পৃঃ ৮৫)। চিত্রের নিচে লেখা আছে : "Sister's house at Bosepara—1908 or 1909."

স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ আছে। অবশ্য রাগদের প্রকৃতি-অনুযায়ীই স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ করা হয়। তাছাড়া কঠোরতা, কোমলতা, রুক্ষতা, কারুণ্য এই সব প্রকৃতিও আছে রাগদের মধ্যে।"

দেখলাম শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু একান্ত আগ্রহের সঙ্গে আমার কথাগুলি শুনছিলেন। তিনি বললেন: "চিত্রশিল্পেও অনেকটা তাই। তবে প্রভেদ আছে।"

আমি বললাম: "বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে চিত্র-লক্ষণে পুরাণকার চিত্রশিল্পের সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। তাই পুরাণকার বলেছেন: 'যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিস্মৃতা'। পুরাণকারের বক্তব্য হল নৃত্য, আতোদ্য বা বাদ্য, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি চারুকলার অনুশীলনে মুক্তির পথ প্রসারিত হয়। তাই এরা নামে ভিন্ন হলেও আদর্শে একই মুক্তির দিশারী।"

শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু বললেন: "পুরাণকারের উক্তি ও কল্পনা প্রশংসনীয়। বেশ ভালকথা।"

আমি বললাম: "এবার আমার অনুরোধ—আপনাকে সঙ্গীতের রাগগুলির আটটি রসরূপ এঁকে দিতে হবে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটি রসের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিক ও রসশাস্ত্রীরা আটটি রসই স্বীকার করেছেন। তবে নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যকার আচার্য অভিনবগুপ্ত শান্তরস স্বীকার করে নটি রসের কথা বলেছেন। বৈষ্ণব-আলঙ্কারিক ও দার্শনিকরা আবার বাৎসল্যরস স্বীকার করে দশটি রসের কথা উল্লেখ করেছেন। যাক্, এই মতভেদের কথা ছেড়ে দিন। আপনি বিজ্ঞানের কথা জানেন। রূপ, রস, শব্দ, আলো সব-কিছুরই সৃষ্টি প্রাণের কম্পন থেকে। কঠোপনিষৎ বলেছে যে, প্রাণের কম্পন থেকেই বিশ্বের সকল-কিছু সৃষ্টি হয়েছে: 'যদিদং কিঞ্চ জগৎসর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'। এজতির অর্থ কম্পতে, অর্থাৎ কম্পন বা vibration. সুতরাং সকল রাগের যখন রূপ আছে, তখন ভাব আছে। সঙ্গীতে ভিন্ন-ভিন্ন রাগের রূপ ভিন্ন ভিন্ন রসের অনুযায়ী। সুতরাং রূপের মতো রসেরও নিশ্চয়ই ছবি বা চিত্র আঁকা যায়।"

শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু বললেন: "হ্যাঁ, রূপ যখন আছে, তখন আকার আছে এবং ঐ আকারের ছবিও আঁকা যায়।"

আমি বললাম: "তাহলে অনুগ্রহ করে আটটি রসের আটটি বা কয়েকটি ছবি আপনাকে এঁকে দিতে হবে। তাতে করে শিল্পীরা রসানুযায়ী রাগের সৃষ্টি ও প্রকাশের সময়ে তাদের ভাবের সম্যক পরিচয় পাবে।"

শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু সানন্দে সম্মত হলেন শৃঙ্গারাদি আটটি রসের চিত্র এঁকে দেওয়ার জন্য এবং এঁকেছিলেনও তিনি আটটি রাগের রেখাচিত্র-গুলি—যেগুলি পরে প্রকাশিত হয়েছে আমার বাঙলা ও ইংরেজী কয়েকটি সঙ্গীতগ্রন্থে।

এ ধরনের আরও কয়েকটি চিত্র অঙ্কন করেছিলেন শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু আমার ও আমাদের (রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-মঠ থেকে) প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য। যেমন তিনি এঁকেছিলেন স্বামী অভেদানন্দের 'How to be a Yogi' ইংরাজী-গ্রন্থের জন্য প্রচ্ছদপটের চিত্র—যোগীশ্বর শিবের মূর্তি; বাংলা 'হিন্দুনারী'-গ্রন্থের জন্য প্রচ্ছদপটের চিত্র—সম্রাট অশোকনন্দিনী সঙ্ঘামিত্রের ছবি। সঙ্ঘামিত্র সিংহলে নিয়ে যাচ্ছেন ভারতবর্ষ থেকে অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা; আমার 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'-গ্রন্থে ত্রিবর্ণ-প্রচ্ছদপটচিত্র—বীণাবাদক ও বীণাবাদিনীর ছবি; স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ইংরেজী 'Bhagavad Gita—The Synthesis'-গ্রন্থের জন্য ত্রিবর্ণ-পার্থ-সারথির ছবি—যে ছবিটি 'দেশ'-বিনোদন ১৩৮৯, নন্দলাল-জন্মশতবার্ষিকী-সংখ্যায়

প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধের অঙ্গীভূত হয়ে (পৃঃ ১০১)। তবে দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় 'পার্থসারথি'-চিত্রটি কেন ও কিসের জন্য আঁকা হয়েছিল তার কোনই আভাস দেননি।

শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবুর কথায়, আচরণে, শিল্পে ও সকল জিনিসের মধ্যেই লক্ষ্য করতাম অধ্যাত্ম-ভাবসুষমার একটি স্নিগ্ধ-প্রলেপ—যে প্রলেপে বা আবেশে পার্থিব ও অপার্থিব দুটি দিকেরই ছিল পরিপূর্ণ প্রকাশ। তাঁর আলাপ-আলোচনার ও কথার প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা-সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা ও অনন্যসাধারণ ভালবাসার একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের বিকাশ আমরা লক্ষ্য করতাম। এবং এর কারণও ছিল যে, শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিলেন বলেই তাঁর জীবনচিন্তায় ও জীবনকর্মে প্রতিফলিত হত শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলেরই ভাব-ধারা! তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের ভাবাদর্শের অপরূপ প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করতাম আমরা তাঁর মধ্যে! ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের প্রভাব-পরিবেশেই শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবু এঁকে ছিলেন 'উদ্বোধন':

শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যার জন্য প্রস্ফুটিত-পদ্মের উপর শ্রীশ্রীমার চরণযুগল; দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর প্রতিচ্ছবি, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে ছোট চৌকিটিতে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানাবিষ্ট মূর্তি, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আগমনের, দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে কলকাতায় আগমনের দৃশ্য, দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে দণ্ডায়মান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূর্তি, ঢেঁকিতে ধানভাঙা ও গড় (গর্ত) থেকে নিবিষ্টমনে চাল বার করা ও সঙ্গে সঙ্গে শিশুপুত্রকে স্তন্যপান করানো, খেলার সাথীদের সঙ্গে মাঠে খেলার ও কীর্তনে মাতোয়ারা হওয়া প্রভৃতি দৃশ্যের চিত্র! গত 'দেশ'-বিনোদন ১৩৮৯, নন্দলাল-জন্ম-শতবার্ষিকী-সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃঃ ৬৫-৮২) শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবুর স্নেহধন্য-শিষ্য রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'নন্দলালের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডল'-প্রবন্ধটিতে প্রকাশিত হয়েছে শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের প্রতি অনন্য-অনুরাগ ও অনবদ্য-আকর্ষণের নিদর্শন! তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ও ভক্তগণের আশীর্বাদধন্য রামানন্দ বন্দ্যোপাধায়কে লিখিত ১০।১।১৯৫৯ তারিখে শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবুর পত্রে উল্লিখিত: "শিল্পীর হৃদয়ে ভগবানের ভক্তি থাকলে চিত্র ভাল আঁকতে পারে—ইতি শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের নন্দলাল বসু" স্বীকারোক্তিটি শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবুর অন্তরের গোপন-কথাই প্রকাশ করে! শ্রদ্ধেয় নন্দলালবাবুর ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কে বেশ কয়েকবার আসার সুযোগ লাভ করায় আমারও সুস্পষ্ট ধারণা যে; শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ছিলেন একাধারে ক্রান্তদর্শী কবি ও শিল্পী, মরমী সাধক, ভক্ত এবং হৃদয়বান মহামনীষী!

ভ্রম-সংশোধন

ফাল্গুন ১৩৮৯ সংখ্যা, ১০৫ পৃষ্ঠার নিম্ন হইতে ৫ম পঙ্‌ক্তিতে 'Swami Vivekananda'-এর স্থলে 'Swami Saradananda' পড়িতে হইবে।—সঃ

শিল্পশিক্ষায় আচার্য নন্দলাল

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা ভাল গান, ভাল লেখা, ভাল ছবি, যে-কোন ভাল টুকরো অনুভব প্রাত্যহিক জীবনের সীমানা পার করিয়ে মানুষকে সব সময় এক ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন বাতাবরণে, ভিন্ন অনুভবে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়।

এমন অনেক স্মৃতি থাকে যা নিজে রোজ ভাবলে জীবন্ত বলে বোধ হয়, আবার তা লেখায় বা কথায় ধরে কাউকে বাড়িয়ে দিলে বা শুনতে দিলে তাকেও সেই ভিন্ন অনুভবের বাতাবরণে সঙ্গী করা যায়। কিছু সঞ্চয় থাকে যা একান্ত নিজের করেও সবার জন্যই সঞ্চিত রাখতে হয়। সেই সঞ্চিত স্মৃতিকে বিছিয়ে দিলে তা একান্ত নিজের হয়েও সবার হয়। এই বিছিয়ে দেওয়া স্মৃতির সঙ্গে অপর হৃদয়ের ঠাঁই পাওয়ার একটা নির্মল পথ পাওয়া যায়—যে পথ কেবলই দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কে যুক্ত নয়।

শান্তিনিকেতন তখনও আজকের মতো এত ঘন বাড়িতে আর গাছেতে সমান্তরাল হয়ে যায়নি। দিগন্ত তখনও খোলা হাওয়ায় দোল খেত। যেমন ইচ্ছে চোখ মেলে তাকালে চোখ আটকাত একেবারে জমির কোলে আকাশের কানায় গিয়ে। সেই কানায় দাঁড়িয়ে পরের অংশটা দেখবার জন্য ঝোঁকবার আর ছুটবার বাসনা হত। আলতো হাওয়াতেই পথের ধারের গাছের পাতায় রাঙাধুলোর পরত জমত। তারা অপেক্ষা করত, বৈশাখের দুরন্ত হাওয়া আর তার সঙ্গে জলের ঝরনায় যাতে পরিষ্কার হয়ে আবার ঝলমলিয়ে ওঠবার জন্য। হয়তো প্রয়োজনে কিংবা নয়—সেই রাঙা পথগুলো গেল হারিয়ে। কিন্তু সে অনুভবের রেশ এখনও পাওয়া যায় কচিৎ কখন কোন কচি গলার দুচার কলি সুর আর কথার মধ্যে।

এখন গ্রীষ্ম তার প্রচণ্ডতা নিয়ে নেশায় মেতে ওঠার উঠোন পায় না। তালে তালে ধাক্কা খেতে খেতে তার ছন্দ কাটে। তাই তেমন ভাবে উচ্ছল বাঁধন-হারা ভাবে তাকে পাওয়াও যায় না। এমন মানুষ আজও অনেকে আছেন, যাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে সেই ছন্দময় লীলায়িত গতি আকাশছায়া করে মিশে-যাওয়া প্রচণ্ড ঝড়ের স্পর্শ এখনও পেয়ে থাকেন। সেই পুরোনো দরজার পাল্লা খুলে তাঁরা বলেন, এই দরজা খুললেই দেখতুম দিগন্তব্যাপী অনন্তকে।

তখন প্রচণ্ড গরম। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। লোক বলতে সামান্য। নইলে নয়-এমন মানুষকে পথে দেখেছি। লাল মাটির কাঁচা রাস্তার উপর দিয়েই পৌঁছেছিলুম শান্তিনিকেতনে। কিছু জানি না—সঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের চিঠি। জিজ্ঞাসাকে ভরসা করে যে মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছিলুম—তিনি নন্দলাল। শান্তিনিকেতনের মাটিতে প্রথম যে মানুষটির সঙ্গে কথা বলেছিলুম, তিনি অত্যন্ত সহজভাবে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শুধু দাঁড়ানো নয়, ঘরের ভেতরে ডেকে বসতে বলে কথা শুনেছিলেন। আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছিলেন, নিজেও প্রশ্ন করেছিলেন। এখন ভাবতেও অবাক লাগে। কোন বিরক্তি ছিল না অথচ আমি যখন পৌঁছেছিলুম, তখন ভরাদুপুর আর নিজের বয়সই বা কত।

আচার্য নন্দলালের প্রান্ত-জীবনে কিন্তু-ভরা অনুভবের সন্ধিক্ষণে এসে তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছি। অকৃপণভাবে আমার সেদিনের পাতা

ভরে দিয়েছেন। সেই হাতে যা দিয়েছিলেন, তাই আজ সাজিয়ে দেখি—তা সারা জীবনের সঞ্চয়।

তাঁর শ্রীপল্লী বাড়ির পেছনের খোলা বারান্দায় মাঝে মাঝে পা ছড়িয়ে বসতেন। তাই দেখে একদিন বলেছিলুম, আপনার পায়ে মাঝে মাঝে কেমন কালো দাগ হয়েছে। এ প্রশ্নে কোন রাগ নয়, অসন্তুষ্ট হওয়া নয়, কেবল খানিক্ষণ চুপ থেকে বললেন "পাকা আমের গা লক্ষ্য করে দেখেছ কখনও? খসবার আগে প্রায় এমনটি ছিটে ফোঁটা দাগ হয়।" এই সেই অনুভবপূর্ণতা আত্মমগ্নতা, যে সময়ে আমি তাঁর সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছি।

আমার এই চয়ন নন্দলালের শিল্পশৈলীর বিশেষ কোন দিককে নির্ণয় করার জন্য নয়। এ কেবল একান্ত দিনাস্তিকার সঙ্গ প্রসঙ্গেরই কিছু প্রাত্যহিক ছবি। ঐ একই কারণে কোন উপমা উদ্ধৃতির অবকাশও থাকছে না। আমার দেখা নন্দলালের সঙ্গে, অন্যের দেখার তফাত ঘটতেই পারে। তবে এটুকু তো সাহস করে বলা যেতেই পারে, প্রথম দেখা আর সঙ্গের দিন থেকে যত দিন যাচ্ছে ততই তার গভীরতা সম্পর্কে একটা বোধ অনুভব করছি। এ কেবল অন্ধ শ্রদ্ধা নয়, নির্বিচার ভক্তি নয়, অকারণে মেনে নেওয়া নয়—নিজেকে নিজের মতো করে দেখে শুনে যতই তাঁর ব্যক্তি-জীবন কর্মজীবন সব মিলিয়ে দেখি—ততই একটি বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে—শিল্পী নন্দলাল আর মানুষ নন্দলালে কোন ভিন্নতা ছিল না—দুটিকে পাশাপাশি রাখলে কোন তফাত ঘটত না—এই দুয়ে মিলেই পূর্ণ নন্দলাল। একথা বলার কারণ—ইদানীং আমরা অনেকে ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে সৃষ্টিজীবনকে ভিন্নভাবে দেখার দুটি দৃষ্টি তৈরি করতে অভ্যস্ত হতে সচেষ্ট হয়েছি।

নন্দলালের শিল্প-সাধনা, নিত্যব্যবহারের, নিত্যবসবাসের জীবন ত্যাগ করে ছিল না। শিল্প তাঁর সাজানো ঘরের প্রদীপ ছিল না—এই শিল্পপ্রদীপই তাঁর সমগ্র জীবনকে আলোকময় করেছিল। এই আলোয় তাঁকে এক ভিন্ন অনুভবের দরজায় পৌঁছে দিয়েছিল, যেখানে তিনি অনায়াসেই বলতে পেরেছেন, "নিত্যনিয়মিত সাধনার ফলে অবশেষে মনটি হবে পরিপূর্ণ কলসের মতো। পরিপূর্ণ কলস একটু হেলিয়ে দিলেই যেমন জল ছল্‌কে পড়ে, তেমনি কোন কারণে মন একটু নাড়া পেলেই মনের অক্ষয় রসানুভূতি রূপানুভূতি ছল্‌কে পড়ে হবে—ছবি, মূর্তি, নৃত্য, কবিতা, গান।" (শিল্পকথা)

তখন সবেমাত্র শান্তিনিকেতনে এসেছি, আমার জানার পরিধির মধ্যে কলাভবনের কয়েকজন। এছাড়া যখন যেমন মনে হয়—অপটু হাতের আঁকা নিয়ে হাজির হই নন্দলালের দরজায়। কি যত্ন কি পরিপাটি করে ধাপে ধাপে দোষগুলি শুধরে দিতেন। কোথাও হল না, পারবে না—এর জায়গা ছিল না!

এখন ভাবি আমার সে সময়ের অজানা অজ্ঞতার ঐশ্বর্যই এই বিরাট মানুষটির কাছে যাবার সুযোগ এনে দিয়েছিল। কত তুচ্ছ সব প্রশ্ন করে তাঁকে বিব্রত করেছি, আর কত সহজেই সে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বেশ মনে আছে, রোজ বিকেলে পাশের সাঁওতাল গ্রামে স্কেচ্‌ করে, ফেরার পথে, তাঁর কাছ হয়ে ফিরতুম। বিকেলের স্কেচ্‌গুলির ওপর পাতলা ট্রেসিং ফেলে শুধরে নিয়ে, পরের দিন সকালে গিয়ে তাঁকে দেখাতুম। স্কেচের ওপর পাতলা ট্রেসিং ফেলে শুধরে নেবার পদ্ধতিটি তিনিই দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

একদিন এমনই বিকেলে স্কেচ্‌ করতে যাবার পথেই গেলুম তাঁর কাছে। জিজ্ঞেস করলেন—কোথায়? আমরা তখন ক্লাশের জন্য নানান জন্তু জানোয়ার আঁকছি—সেই ক্লাশে ছবি আঁকতে হবে জন্তুজানোয়ারকে বিষয় রেখে—সে হিসেবে আমি গরুকেই বিষয় করেছি—তাঁকে বলায়,

আমার খাতায় একটি গরু আঁকতে বললেন। ওঁর সামনে আঁকা, তাছাড়া গরু সামনে নেই কি আঁকব? মাস্টার মশাই (নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে সবাই, বিশেষ করে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা, "মাস্টার মশাই" বলেই সম্মান সম্বোধন করতেন) বললেন—যা মনে আছে সেই ভেবে কর। আমি যতটা সম্ভব ঠিক ঠিক ভেবে কাজ শেষ করলুম। উনি সেটি নিজের কাছে রেখে দিয়ে গরু দেখে গরু আঁকতে যেতে বললেন। ফেরার পথে তাঁর কাছে যাওয়া মাত্রই আমার মন থেকে আঁকা গরুর স্কেচ্‌টি হাতে তুলে দিয়ে দেখতে বলাতে—সে আঁকাটির দিকে আর তাকাতে পারি না। কি অসম্ভব ভুলে ভরা তা তখনই বুঝলুম। নয়, নির্বোধও নই, তবু পারিনি, জানি না—এটা কেমন পরিষ্কার হয়ে গেল। মাস্টার মশাই কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে ভারি চমৎকার একটি কথা বলেছিলেন—এই বলা আর পদ্ধতির ভেতর দিয়ে বস্তুকে দেখার একটা দরজা খুলে গেল আমার কাছে। সেইটাই শোনবার—বললেন, "তোমার মনের ভেতর যে ভুল-গরুর ধারণা বাসা বেঁধেছিল আজকের দেখার ভেতর দিয়ে তা শুধরে গেল। কিন্তু ভুল ছিল চরিত্রে আর প্রকৃতিতে, আজ সত্যি গরুর সামনে তাকে বুঝে জেনে নিয়েছ। এতে করে গরু আঁকতে গেলে আর কোন দিন ভুল হবে না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হলে এমন করে বিষয়ের পাশে দাঁড়ালেই সব সন্দেহ কেটে যাবে।" মাস্টার মশাইয়ের এই বিচিত্র শিল্পশিক্ষার অসাধারণ দিকটির ফল ফলতে কখনও দেরি হয়নি।

নন্দলালের আর একটি শিক্ষাপদ্ধতির ঘটনার কথা উল্লেখ করি—কলাভবনে ভর্তি হয়ে, প্রথম মানুষকে বিষয় করে ছবির ড্রইং করেছি। একটি নয়, বেশ কিছু মানুষ। বিষয় "বৈষ্ণবকীর্তন"—মাস্টার মশাইয়ের কাছে নিয়ে গেছি, মনে মনে আনন্দ। এতগুলো মানুষ দিয়ে ছবি করার খসড়া করেছি। অনেকক্ষণ দেখলেন, দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "বৈষ্ণব পদাবলী পড়েছ?" চৈতন্যচরিতামৃত? আমি তো চুপ। ছবি আঁকার সঙ্গে এসব পড়ার সম্বন্ধ ধরতে পারছি না। এই প্রথম ছবির সঙ্গে লেখাপড়ার সম্পর্কের কথা শুনছি। আমাদের মধ্যে এখনও অনেকে এই মত পোষণ করে থাকেন যে—ছবি আঁকবে, মূর্তি গড়বে তার সঙ্গে আবার লেখাপড়া কেন? দরকারটা কি? বড় বিস্ময় বোধ হয়। এই ধারণাই শিল্পীকুলকে এক অজানা অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। আমাদের শিল্পকর্মের কোন সঠিক যথাযথ সমালোচনা না হলে, তত্ত্বগত ভুল থাকলে আমরা তার প্রতিবাদ করতে পারি না। কারণ আমরা যে কোন কারণেই হোক এ সম্পর্কে যতটা সচেতন হওয়া উচিত ততটা এখনও হয়ে উঠতে পারিনি। শিল্পের সঙ্গে যদি ওই বিষয়ের তত্ত্বালোচনায় যথাযথ হয়ে উঠতে পারি, তা হলে সবদিক থেকেই এর সম্পূর্ণতা আসতে বাধ্য। মাস্টার মশাই সব সময় বলতেন, "শিল্পের ইতিহাস জানবে—শিল্প আন্দোলন তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। সব দেশের শিল্প সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ছাত্রাবস্থায় একে অপরের তুলনামূলক সমালোচনায় ব্যস্ত হলে, অনেক সময় যথাযথ রস গ্রহণে সমর্থ না হবার আশঙ্কা থেকে যায়। কিন্তু জানা দরকার, না জানা শুধু অন্ধতা নয়, অজ্ঞতাও।" তিনি নিজে কলাভবনে এ বিষয়ে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক হরিদাস মিত্র নিয়মিত ক্লাশ নিতেন। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরাও নিজেদের মধ্যে এই পড়াশুনার চর্চা করতেন। নন্দলালের আগ্রহে ও চর্চায় কলাভবনের শিল্প-সংগ্রহশালার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-গ্রন্থাগারেরও পত্তন।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, "এই ধরনের ছবি করার সময় ভালমতো পড়বে, জানবে বিষয় সম্পর্কে। এতে তোমার যেমন জানা হবে, তেমন দেখবে অনেক স্বচ্ছন্দভাবে নিজের ভাবনাকে রূপ দিতে পারছ। কেবল শোনা কথার ওপর ছবি করলে অনেক ভুল থেকে যায়। তত্ত্বগত ভুল ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশেরও আমেজ আনা যায় না। এই কীর্তনের স্থান যদি নবদ্বীপে বা শান্তিপুরে হয়, তা হলে এর প্রকৃতির পরিবেশের ঘরবাড়ির কথাও ভাবতে হবে।" ড্রইংটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ট্রেসিং পেপার আছে?" আমি তো নিয়ে যাইনি—নিজেই টুকরো টুকরো অয়েল ট্রেসিং বার করে আমার ড্রইংটার ওপর ফেলে, শুধরে সেটিকে নিজের চিঠি লেখার সাদা কাগজে আলপিন দিয়ে আটকে দিয়ে আমার হাতে দিলেন। তাঁর কাছে আমি যখনই কোন ড্রইং নিয়ে গেছি, কখনই দেখিনি সে-কাজের ওপর ভুলগুলো রবার দিয়ে মুছে ফেলে নতুন করে করতে। সব সময় পাতলা ট্রেসিং-এ কাজ শুধরে, তা পাশে রেখে বুঝিয়ে দিতেন ভুলভ্রান্তি। এতে শিক্ষার্থীর সুবিধা—সে সব সময় তার ভুলটি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে আবার একই সঙ্গে শিক্ষকের শুধরে দেওয়া কাজটি তার নিজস্ব ড্রইং-এর ভুলগুলি যথাযথ ভাবে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করছে। ভুলটি মুছে শুধরে দিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে তার ভুলের অংশটি ধরা প্রায় সম্ভবই হয় না। আজকে সেসব শুধরে দেওয়া কাজগুলি দেখলে, যেমন তার চমৎকারিত্বের দিকটি ধরতে পারি, তেমন এই বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাগুণটি অনুভব করি।

প্রথম বছরেই নেচার স্টাডি (প্রকৃতি পাঠের) ক্লাশে—বাইরে খোলা আকাশের নিচে, নিবিষ্টমনে একটি পেয়ারা গাছের গুঁড়িকে হুবহু করার জন্য দিনের পর দিন সময় দিয়ে কাজ করছি—তা দেখে একজন অধ্যাপক বললেন, "কেবল গাছের গোড়া আঁকলে চলবে কেন?" তখন বয়স কম—মনে হল গাছের গুঁড়িটাই যদি যথাযথ ভাবে করি, তাহলে গাছ চেনা যাবে না কেন? তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনা বলতে আমার যুক্তিটি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মন থেকে এই জিজ্ঞাসাকে সরাতে পারছি না। গেলুম মাস্টার মশাইয়ের কাছে। ঘটনা বলাতে তিনি চমৎকার করে বুঝিয়ে দিলেন, শিল্প-শিক্ষার্থিদের প্রকৃতিপাঠ কেমন হবে। বলছেন, "প্রথমেই কেবল গোড়ার (গাছের) আকারের খুঁটিনাটি নিয়ে থাকলে, পুরো গাছকে কবে জানবে? গাছকে সারা দিন রাত্রি ধরে দেখতে হবে। সমস্ত গাছটিকে জানতে পারলেই যথাযথ জানা হল। দেখ না, রাত্রের বেলায় চাঁদের আলোয় সারা গাছটা কেমন সম্পূর্ণ আকারে ধরা পড়ে। সে আকারটিকে দেখলেই ধরা যায়—এ গাছ আম, জাম, কুল বা শিশু কিনা। সন্ধ্যেবেলার আবছা আলো আঁধারিতে সেই গাছেরই গোছা গোছা ভাগগুলো চোখে পড়ে। আবার দিনের পরিষ্কার আলোতে তার পাতাটি পর্যন্ত পরিষ্কার। যেমন প্রতিমা গড়ার সময় পরপর ধাপে ধাপে পরিষ্কার থেকে আরো পরিষ্কার হয় ঠিক তেমন ভাবে ধাপে ধাপে প্রত্যেকটা বস্তুকে জানতে হবে। আমি ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এমনভাবে প্রকৃতিকে দেখতে চেষ্টা করেছি। শিল্পী তাইকান নৌকা বেয়ে নদীর বুকে গিয়ে প্রকৃতিকে অনুভব করতেন। গাছের নিচে যে ছায়া পড়ে, তার দিকে দৃষ্টি দিলেও গাছের বিশেষ বিশেষ চরিত্রকে চট করে ধরতে পারবে। অনেক সময় নদীর ধারে কোপাই-এ গিয়ে রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনন্ত আকাশকে দেখেছি, প্রকৃতি এক অনন্ত রূপে ধরা পড়ে। নিশ্চুপ আকাশ যেমন দেখেছি,

তেমন কালবৈশাখীর ঝড়ে খোয়াইয়ের উঁচুনিচু পথ ধরেও কত সময় তাঁর সঙ্গ পেয়েছি। এসব আর কিছুই নয়, যা তুমি করতে যাচ্ছ তাঁকে হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে, নিজের অনুভব দিয়ে গ্রহণ করা আর সেই আবহাওয়ার ভেতর নিজেকে প্রবেশ করানো। এতে ছবিতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

"যে কোন বিষয়ের ছবি আঁকতে গেলেই সেই বিষয় অনুযায়ী নিজেকে প্রবেশ করাতে হবে। প্রকৃতি বলতে কেবল গাছপালা নয়। এই প্রকৃতির ভেতর যেমন গাছ তেমন মানুষ; তেমনই জীবজন্তু জানোয়ার পোকা মাকড় সব। এরা প্রত্যেকেই প্রকৃতির অংশ, আমরা কেবলমাত্র চার দেওয়ালের ভেতর সব দেখতে চাই; তাই অনেক ক্ষেত্রেই এই দেখায় সম্পূর্ণতা থাকে না।"

বস্তুর ছায়ার আকার থেকে ধীরে ধীরে করে দেখার আর এক দৃষ্টান্ত দিলেন চমৎকার করে। সকালে রোজই তাঁর কাছে যাই। মাঝে মাঝে সময়ের ফুল নিয়ে যেতুম। কখন হিমঝুরি কখন শালমঞ্জরী এমন সব নানান ফুল। একদিন সকালে ফুল দেওয়া মাত্রই সেটিকে রোদের কোলে ধরতে বলে, তার ছায়াটা ফেললেন নিচে ধরা সাদা কাগজে। আকারের ছক করে নিয়ে, ফুলটা আমার হাত থেকে নিয়ে নজর দিয়ে দেখে পরতে পরতে পাপড়ি সাজিয়ে ফুলের ঐশ্বর্যের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রটিকেও নিখুঁতভাবে জুড়ে দিলেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন, "প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব চরিত্র আছে। ড্রইং করার সঙ্গে সঙ্গে তার বিশেষ চরিত্রগুণটি সম্পর্কে সচেতন না হলে কেবল যা দেখছ তাই হবে, যাকে পেতে চাইছ, সে ধরা দেবে না। ছবি আঁকা তো কেবল যা দেখছ তাই নয়, এই চাক্ষুষ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিশেষ শিল্পদৃষ্টি খুলে যাবে।" এমন সব নানান শিল্প আলোচনা হয়। সুবিধে ছিল, তাঁকে দেখার প্রথম দিন থেকে কখনও দূরের মনে হয়নি।

এমন ভাবেই একদিন সুজাতা আর বুদ্ধের ছবির খসড়া খানিকটা শেষ হওয়ার পর তাঁর কাছে নিয়ে গেলুম; খানিকক্ষণ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "সুখের গল্প শুনে ছবি এঁকেছ নাকি? এ বিষয়ে কিছু পড়েছ?" আমার ড্রইং-এর মধ্যে সুজাতা পেছন ফিরে, পায়েস নিয়ে বুদ্ধের কাছে যাচ্ছেন। কোন কথারই উত্তর দেবার নেই। "তোমার ছবিতে বুদ্ধ পাকুড় গাছের নিচে বসেছেন —বসার বেদীটি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেই বেদীর কাছে পৌছানোর জন্য ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিতে ভোলোনি। আবার—পাথরের রেলিং-এর গায়ে কারুকাজ করেছ। কিন্তু বুদ্ধজীবনী পড়ে নানান দিকে দেখলে ছবির রূপ এমনটি হত না। সুজাতা পায়েস নিয়ে আসছেন, তাঁর বেশভূষা একেবারে বর্তমানের। সুজাতার পোশাক সে সময়ে কি এরকম ছিল? বুদ্ধজীবনী পড়ে, জাতক পড়ে, তাঁকে উপলব্ধি না করে, সেই ভাবে ভাবান্বিত না হতে পারলে ছবি যথাযথ করা বড় শক্ত।" তাঁর ঘর থেকে 'Light of Asia' বইটি আনার জন্য বললেন। সে বই আমার হাতে দিয়ে পড়তে বললেন ও কলাভবন গ্রন্থাগারে গিয়ে বুদ্ধ সম্বন্ধীয় সব ছবি মূর্তি দেখতে ও তা নকল করতে নির্দেশ দিলেন। ভাল ছবি মূর্তি দেখলে তাকে যথাযথ নকল করলে বুদ্ধের রূপ কল্পনায় কিছু সাহায্য হবে। তার শুধরে দেওয়া কাজগুলি এখন দেখি আর ভাবি কত চমৎকার আর যত্ন নিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কোন তাড়াতাড়ি বা দায়-সারা ভাবে কাজ দেখাতেন না। যখনই কিছু দেখিয়েছেন, সব সময় মগ্ন হয়ে তদ্গত হয়েই।

বুদ্ধ সুজাতার ছবির সঙ্গে সঙ্গে একটি মধুর অমলিন ঘটনার কথা, ভালবাসার কথা এখনও সজীবভাবে আমার কাছে বেঁচে আছে। একা একা বসে একে উপভোগ করি আবার দশজনার

মাঝেও একে বিতরণ করার বাধা নেই বলে মনে হয়।

এই ছবিটি ঠিক করার সময় সুজাতার ডান-হাতে বুড়ো আঙুলটি যেখানে থাকার কথা, সেখানে না হয়ে উল্টো দিকে করেছেন মাস্টার মশাই,—আমি অনেক দ্বিধা নিয়ে আস্তে করে সেকথা বলায় খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "আহাম্মক! তুমি কি বেশি জান?" তাঁর শুধরে দেওয়া ড্রইং নিয়ে ফিরে এসেছি।

পরদিন ভোর বেলায়—হস্টেলের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবছি, এত ভোরে? দরজা খুলেই দেখি 'কেষ্ট' দাঁড়িয়ে। 'কেষ্ট' মাস্টার মশাইকে দেখাশুনার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির নানান কাজ করে থাকে। এত ভোরে? ও কিছু না বলে আমায় একটা খাম বাড়িয়ে বললে—মাস্টার মশাই এটা পাঠিয়েছেন। ঘুম চোখেই খুলে দেখি—কি আনন্দ! ভোরের রোদ ওঠার আগেই এমন অভাবনীয় অবাক করা ব্যাপারটা ঘটবে ভাবতেই পারিনি। খামের ভেতর মাস্টার মশাই পাঠিয়েছেন 'বুদ্ধ ও সুজাতা'র একটি ছবি এঁকে। জানিয়েছেন—তুমি ঠিকই ধরেছিলে।

খুব বড় না হলে এমনটি হতে পারা যায় না। এত সহজে উচ্ছলভাবে একে গ্রহণ করার একটা বিরাট মনের প্রয়োজন হয়। এখন বুঝি সে বড় মনের দরকার। বিস্ময়ের আরও বাকি। সচরাচর আমরা হস্টেলের দু-তিনজন শেষের দিকে খেতে যেতুম। এমন দিনও ছিল যেদিন বেশী দেরী হয়ে গেলে কালীপদ ঠাকুর এসে আমাদের ডেকে নিয়ে যেত—বলত, চল বাবারা, এবার খেতে চল। আবার এমনও দেখা গেছে হস্টেল থেকে সে তার হিসাব অনুযায়ী থালা বাটি গেলাস সব সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে। এখন বসে বসে ভাবলে অবাক লাগে। তখন সে সব থালা বাটি সবই ছিল কাঁসার। কোন বুদ্ধি কাজ করেনি। যেমন আমাদের করেনি, তেমন সেই পরিবেশে যারা বসবাস করেছে তাদেরও করেনি। আমাদেরও আগে যাঁরা এই ছাত্রাবাসে থেকেছেন, তাঁরা তো দরজা, জানলা হাট করে বাইরে চলে গেছেন—ফিরে এসেছেন দু-তিন দিন কিংবা তারও পরে—এসে কেবল প্রকৃতির হাওয়া জলে যেটুকু নড়চড় হওয়া সেইটুকুই হয়েছে মাত্র। কিছু কিছু ছাপ পড়ত ধূলোর ওপর সে কেবল গাছে থাকা কাঠবিড়ালী, পাখি এদের আসা যাওয়ার চরণ চিহ্ন হিসেবে।

কলাভবন কেবলই চিত্র বা ভাস্কর্য শৈলীতে আটকানো ছিল না—নানান সূত্রে সে শিল্পের নানান শাখায় ছড়িয়ে পড়েছিল আজকের যে সব নৃত্যনাট্যের সাজসজ্জা ও মঞ্চ সজ্জার বিশেষ রীতি দেখি তার জন্ম দিয়েছিলেন নন্দলাল, একথা বললে নিশ্চয়ই অতিরিক্ত বলা হবে না। তবে নন্দলাল বলছেন, "শিক্ষার্থিদের নিয়ে যে মনন নিয়ে ছবি, মূর্তি করেছি, নাটকের অঙ্গসজ্জায় বা স্টেজ্ সাজাতে সেই একই মন কাজ করেছে। সব সময় ভাবতুম নতুন ভাবে।"

কি ভাবে রুচিশীল সব কিছু গড়ে তোলা যায়, সেই কথা ভেবেই আমরা সবাই মিলে গুরুদেবের প্রত্যেকটি নাটক নাটিকার জন্য দৃশ্যসজ্জা থেকে শুরু করে নাটক নাটিকার পাত্রপাত্রীর পোশাক-পরিচ্ছদের কথাও ভেবেছি। নিজেরা ড্রইং করে, রঙ দিয়ে তা দেখেছি কেমন তা দেখতে হবে। একথা বলাতে অন্যায় হবে না যে, প্রাক্-নন্দলাল যুগে রবীন্দ্র গীতিনাট্য বা অন্যান্য নাটকের যে গতি ছিল, তা হুবহু করার প্রবণতায় ছিল সমাচ্ছন্ন। নন্দলালই তাঁর চিন্তা-ভাবনার ভেতর দিয়ে এর বিরাট পরিবর্তনই নয় একটি বিশেষ শিল্প আঙ্গিকের সূচনা করেন—যে সূচনার পথ ধরে আজ আমরা অনেকটা সমৃদ্ধ।

শান্তিনিকেতনে নন্দলালের এই শিল্পসাধনা

কেবলই একা ছিল না, তিনি সব সময়ই তাঁর শিক্ষার্থিদের সাথী করেছেন—বলছেন, "যেখানেই গেছি সেখানে ছেলেরা আমার সঙ্গে গেছে। আমার নিজের দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেখবার চোখ তৈরির একটা পথ করে দেবার সব সময় চেষ্টা করেছি। আমার নিজের চর্চার ভেতর দিয়েই তাদের চর্চার অভ্যাস চলত।"

নন্দলালের শিক্ষাগুণের সবচেয়ে মজার ও বিস্ময়ের দিকটি হল শিক্ষার্থীর ক্ষমতা, ধারণা, প্রবণতা মাফিক তাকে শিক্ষাগুণে সমৃদ্ধ করে তোলা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—অনেক ক্ষেত্রে কেন—প্রায়শই দেখা যায়, ছাত্রকুল প্রায় গুরুর ধাঁচে কাজ করার প্রবণতায় সিদ্ধ হতে আগ্রহী, আর অপর পক্ষে গুরুও সে দেখে খুশী হয়ে থাকেন। এই খুশী হবার পেছনে ছাত্রের ভেতরে যে নিজস্ব গড়ে ওঠার ক্ষমতা থেকে থাকে, তা সম্পূর্ণভাবে উন্মেষলগ্নেই শেষ হয়। নন্দলাল ছিলেন সেই গুরু যিনি জানতেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ঐ ক্ষমতার কথা এবং সেই ভাবেই মন্ত্র দিতেন। নন্দলালের শিক্ষার আর একটি হৃদয়ের দিক ছিল। সেটি হল—শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রের একটি অভিন্ন সম্পর্ক। একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি না হতে পারলে শিক্ষা দেওয়া আর গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এই অভাবনীয় দিকটির সার্থক রূপকার ছিলেন নন্দলাল। তাঁর শিক্ষার একটি বড় শর্ত ছিল ভালবাসা। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহে পূর্ণ রাখতেন, অপর পক্ষে শিক্ষার্থী এমন পিতৃসম গুরুকে পেয়ে কৃতার্থ হতেন। তিনি কেবল শিক্ষাগুরুই ছিলেন না—তিনি সুখে-দুঃখে পরম সখা।

নন্দলালের এই চরিত্রগুণটি কেবল আপনা থেকেই আসেনি; এটি তাকে পেতে হয়েছে দীর্ঘ অতন্দ্র অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়েই। তিনি কোনদিন কোন কারণেই নিজেকে অপরিহার্য মনে করতেন না। শিক্ষায় আচার্যের যে গুণগুলি শিক্ষার্থিদের অন্তর দ্রবীভূত করে, আকৃষ্ট করে, নন্দলাল ছিলেন সেই সব দুর্লভ গুণে পূর্ণ। যে শিক্ষায় তিনি বিশ্বাস করতেন—সেই বিশ্বাসের ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি মস্ত মাপের বহু শিল্পীকে। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেকটি ছাত্রই তার নিজস্ব ক্ষমতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং সেই প্রতিষ্ঠার বনেদটিকে তার মতো করেই গড়ে দিতে হবে।

নন্দলালের শিক্ষাদানের আরও মহৎ দিক ছিল। তা হল, তিনি ছিলেন অকৃপণ এবং কখনও প্রত্যাশায় শিক্ষা দিতেন না।

আমার করা সামান্য কিছু কাজের শুধরে দেবার পদ্ধতি সমস্ত মানুষটির ভাব-ভাবনাকে চিনিয়ে দেবে। প্রকৃতির সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকতে বলতেন আর এই থাকতে বলার পেছনে কেবলই মৌখিক উচ্চারণ ছিল না, তাঁর এই বলার ভাবনার কথাটি কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন! যেটি জানলে মানুষটিকে নাগালের মধ্যে পেতে পারব—বলছেন, "আগে কেবল দেবদেবীর চিত্রচিত্রণের মধ্যেই ঈশ্বরের উপস্থিতির ধারণা কাজ করেছে; পরে বুঝতে শিখেছি, প্রকৃতির কোলে পড়ে থাকা ঘাসের ওপর এক বিন্দু শিশিরের মধ্যেও সেই সত্য বিরাজ করছেন।"

এই হচ্ছেন নন্দলাল। এই নন্দলালই শিক্ষার ভেতর দিয়ে ছাত্রদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন যথার্থ সত্যকে—যে সত্য শিল্পীকে এক বিশেষ ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে তোলে। এ ঐশ্বর্য জাগতিক কোন সম্পদ আহরণে পূর্ণ নয়—এর পূর্ণতা অন্তর আলোকে। এই আলো ক্ষুদ্রকে বৃহৎ হতে সাহায্য করে, সঙ্কীর্ণতা থেকে উদারতায় উত্তরণ ঘটায়।

শিল্প সম্পর্কে নন্দলাল বলছেন—

"শিল্পীকে সদা সচেতন হতে হবে। ভাগীরথীতে মৃণাল-সমেত পদ্মফুল পদ্মপাতা ভেসে

যাচ্ছে, ঢেউয়ের তালে তালে উঠে পড়ে। মাছও খেলা করছে সেই জলে; ইচ্ছামতো অনুকূলে বা প্রতিকূলে যাচ্ছে স্রোতের। দুয়ের প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ হল, সাধারণ মানুষে আর শিল্পীতে।"

"ছবি দু-রকম। এক—শিল্পী যে ছবি করছে, আর—শিল্পী যে ছবি হয়েছে। ভাল ছবিতে আছে—বিষয়, পদ্ধতি এবং শিল্পী স্বয়ং।"

"যে আর্টিস্ট, সর্বত্র সকলেই তার বন্ধু, সে কখন নিঃসঙ্গ হয় না।"

"নিত্য অভ্যাস চাই। প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করা চাই। ভয় আর লোভ বর্জনীয়। শিল্পী যেটুকু অনুভব করবে, শুধু সেটুকুই তার প্রকাশ করা উচিত।" "মনে রস না পেলে, ভাল না লাগলে, ভাল লাগা দিনে দিনে বাড়াতে না থাকলে, সেই ভাল লাগার প্রেরণাতেই কাজ না করলে, শুধু কলাকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা নিষ্ফল।"

"শিল্পীর জীবন, শিল্পীর সত্তা, শিল্পের স্বচ্ছ মুকুরে প্রতিভাত হয়; উভয়কে পৃথক করা চলে না।"

"শিল্পীর চোখ তো শিল্পী নয়, মনই শিল্পী। শিল্পের রস গ্রহণও চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে।"

নন্দলালের শিল্পশিক্ষা ও চিন্তার কয়েকটি কথামাত্র তুলে দিলুম। এই কয়েকটি কথাই একজন আচার্যকে তাঁর যথাযথ শিক্ষাভাবনার গভীরতম অনুভূতিতে বুঝতে সাহায্য করবে।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ একটি স্বতন্ত্র জগৎ

ডক্টর উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

১

গত শতাব্দীর একেবারে শেষপর্যায়ে এবং এই শতাব্দীর সূচনায় চল্লিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাচীন ভারতীয় জীবনকে নতুন করে উদ্বোধিত করে ভুবনেশ্বরের চরণে নিজেকে সমর্পণ করছেন, সেই সময় বেশ কিছু কবি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তি ও রোম্যান্টিক ভাষাভঙ্গির অনিবার্য প্রভাবকে আত্মসাৎ করেও নানা কারণে বাঙালী কাব্য পাঠকের মন কেড়ে নিতে পেরেছিলেন। এই সব কবিদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী বোধ হয় বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু আলাদা মনোভঙ্গিতে বিশিষ্ট। অন্য যাঁরা এই সময় বিশেষ বিশেষ মানসিকতার জন্য স্বাতন্ত্র্য দেখাতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতো বিরাট প্রতিভা—যে প্রতিভা যে-কোন দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক-আধবারই আসে—থাকা সত্ত্বেও এঁরা যে বিশিষ্ট হতে পেরেছিলেন, তা কিন্তু কম কৃতিত্বের কথা নয়।

বুদ্ধদেব বসু 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে নজরুল ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভাগত পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সংলগ্ন কিংবা অন্তর্গত। আর নজরুল ইসলামকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি—ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়—কিন্তু নতুন। নজরুল নতুন ঠিকই, যদিও তিনি প্রথমটা রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি 'অগ্নিবীণা' ও 'ধূমকেতু' ('অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে' কিংবা 'আয় চলে আয়রে ধূমকেতু / আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু') থেকেই নিজের সৃষ্টির আগুন জ্বালিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক নজরুলের আগেকার সবচেয়ে প্রভাবশালী কবি হয়েও কেবল রবীন্দ্র-সংলগ্ন বা তাঁর প্রতিভাবলয়ের অন্তর্গত হয়ে আছেন, একথা সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারি না।

একেবারে প্রথম দিকে লেখা সত্যেন্দ্রনাথের তিনটি কবিতার বই 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ' ও 'হোম-শিখা'। এই সংকলন তিনটির অধিকাংশ কবিতাই দেবতা ও দেব-আরাধনাকে কেন্দ্র করে লেখা। কিন্তু এই আরাধনার মূলে ভক্তির চেয়ে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি অনেক প্রবল। সবিতা হল জ্ঞানের ধ্যান। সোম প্রেমের দেবতা, সর্বংসহা শৌর্যের দেবতা, সমীর প্রাণের দেবতা, স্বর্ণগর্ভ আকাশের অধিদেবতা, সাগ্নিক ধর্মতপস্থার দেবতা। বোঝাই যায়, নিষ্প্রাণ স্বজাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যই এই আদি-প্রাকৃতিক শক্তিগুলির বন্দনা। কিন্তু 'হোম শিখা'র 'সাম্য-সাম' কবিতায় দরিদ্রনিপীড়িত খনির শ্রমিক মানুষের প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। সঙ্গে আছে ধনিক শ্রেণীর প্রতি বিদ্রূপও :

> শ্রমের মাতাল পাষাণের চাপে উঠিছে
> পাগল হয়ে,
> রসাতল পানে ছুটে যেতে চায় বোঝার
> বালাই লয়ে ;
> জীবন বিকায়ে ধনের দুয়ারে খাটিয়া খাটিয়া মরে,
> কলঙ্কহীন শ্রমের অন্নে জঠর নাহিক ভরে।
> হেথায় কুবের ফুলিছে ফাঁপিছে—ফুলিছে
> টাকার থলি,
> চিবুকের তলে বাড়িছে তাহার দ্বিতীয়
> পাকস্থলী !

দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ও ধনীর প্রতি বিদ্রূপ হয়তো সমকালীন বয়োজ্যেষ্ঠ কবির কাব্যে আছে (দ্বিজেন্দ্রলালের 'আলেখ্য' কাব্যের 'রাজা' কবিতা স্মরণীয়), কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশ যে মানবরূপ—তারই এক অংশের এই বঞ্চনায় ব্যথিত হওয়ার ভঙ্গিটি নেহাৎই সত্যেন্দ্রীয়। কিন্তু 'সন্ধিক্ষণ' কাব্যটিতে স্বদেশীযুগে আত্মতেজে উদ্দীপ্ত হবার যে প্রকাশভঙ্গি তা অনেকটা 'নৈবেদ্যে'র রবীন্দ্রনাথেরই অনুসারী।

সত্যেন্দ্রনাথের মৌলিক রচনার পরবর্তী স্তরে তিনটি উল্লেখযোগ্য কবিতার বই আছে : 'ফুলের ফসল' (নামকরণে কিংবা ভাবে ফরাসী প্রভাব, বিশেষ করে হাফেজের প্রভাব—ফসল-ই গুল্—সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর মতো কারো কারো ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছিল না), 'কুহু ও কেকা' এবং 'তুলির লিখন'। 'ফুলের ফসলে' (১৯১১) যদিও রবীন্দ্রনাথের পদধ্বনি মাঝে মাঝেই শুনতে পাই গান-জাতীয় কবিতায়, তবু এই কাব্যেই তিনি রবীন্দ্রপ্রভাব এড়িয়ে অনেক ক্ষেত্রেই স্বকীয়তায় পৌঁছেছেন। রঙের নেশা লেগেছে চোখে, ধ্বনির রেশ ঘোর এনে দিয়েছে মনে। ধ্বনিচিত্রের একাত্মতাই সত্যেন্দ্রনাথকে মায়াবী কল্পলোকে পৌঁছে দিয়েছে, যে-লোকের অধিষ্ঠাত্রী রূপকথার পরী—মূলতঃ যে কিশোরী। এ জগৎ একেবারেই অ-রাবীন্দ্রিক। 'শিশু' বা 'শিশু ভোলানাথে'র কবি যখন সাধারণভাবে শৈশব-স্মৃতিতে ডুব দেন, তখন দ্রুত তুলির আঁচড়ে ছবি ফোটান, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মতো ধ্বনি-রূপ-রঙের প্রতি এত সময় দেন না।—

> তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
> অলস হাওয়ায় দীঘির জল,
> তার আলতা-পরা পায়ের লোভে
> কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল।
> করমচা-ডাল আঁচল ধরে,
> ভোমরা তারে পাগল করে,
> মাছ-রাঙা চায় শিকার ভুলে,
> কুহরে পিক অনর্গল।
> তার গঙ্গাজলী ডুরের ডোরা
> বুকে আঁকে দীঘির জল।

কবিতাটির নামই 'কিশোরী'। বাংলা দেশের পল্লীসৌন্দর্যের এমন রূপ, এমন ধ্বনি-চিত্ররূপ, রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম চিত্ররূপ থেকে তো আলাদা

বটেই, জীবনানন্দের রূপসী বাংলার চিত্ররূপময়তা থেকেও আলাদা। অন্যত্র যে ধ্বনির আতিশয্য সত্যেন্দ্রনাথের অনেক কবিতাকেই ঠুন্‌কো করে দিয়েছে, সে ধ্বনিকে এখানে বশে রাখতে পেরেছেন বলেই প্রাকৃতিক ও জীবজগতের আকর্ষণের মূল লক্ষ্য কোথায়, তা বলতে বলতেই একটি কিশোরীর নিটোল রূপসজ্জা ফুটে উঠেছে। লক্ষ্য করবার মতো, সত্যেন্দ্রনাথের 'চিত্র-শরৎ', 'লালপরী', 'নীলপরী', এমন কি 'জ্যৈষ্ঠী মধু' কবিতাটির মধ্যেও একই ধরনের কিশোরী-মূর্তি উঁকি দেয়, যার স্নিগ্ধ-মাধুর্যের স্বাদ একমাত্র তাঁর কবিতাতেই পাওয়া যায়। ধর্ম ও দার্শনিকতা-শূন্য নিছক ধ্বনি-রূপ-রঙের জগৎকে ফুটিয়ে তোলার যে ঐতিহ্য সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যের ক্ষেত্রে নিয়ে আসেন তারই অনুবৃত্তি (প্রভাব হয়তো সব ক্ষেত্রে স্পষ্ট নয়।) তিরিশ-চল্লিশের দশকের কবিদের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণেই দেখতে পাই। অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখা, শোনা এবং বিচিত্র রঙের নেশায় মুগ্ধ হওয়া তো প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর আধুনিকতার একটা লক্ষণ। এ লক্ষণ হাজার তথ্যে ও শব্দক্রীড়ায় ভারাক্রান্ত সত্যেন্দ্রনাথের অনেক কবিতার ভিড়ের মধ্যেও প্রায়শ-ই দেখতে পাওয়া যায়।

ধ্বনি, রূপ ও রঙের মধ্যে আবার বিশেষ করে ধ্বনির ওপর ঝোঁক এই ফুলের ফসলেই দেখতে পাওয়া যায়। এই ধ্বনি গড়ে উঠেছে আবার রূপকথার বিস্ময়রসকে ঘিরে। ছবিতে রয়েছে সূক্ষ্ম তুলির কাজ, তার সঙ্গে জলতরঙ্গের উতলা ধ্বনি :

দেখা হলো ঘুম-নগরীর রাজকুমারীর সঙ্গে
সন্ধ্যাবেলা ঝাপসা-ঝোপের ধারে।
পরণে তার হাওয়ার কাপড় ওড়না ওড়ে অঙ্গে,
দেখলে সে রূপ ভুলতে কি কেউ পারে ?
তুঁত পোকাতে তাঁত বুনে তার জানলাতে
দেয় পর্দা
হুতোম প্যাঁচা প্রহর হাঁকে দ্বারে,
ঝর্ণাগুলি পূর্ণ চাঁদের আলোয় হয়ে জর্দা
জলতরঙ্গ বাজনা শোনায় তারে।

এই সময় থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট। রূপ-রঙের সঙ্গে ধ্বনির টানাপোড়েনে তাঁর কবিতা খোল্‌তাই হচ্ছে। সব সময় যে পরিষ্কার নক্‌শার কাজ ফুটেছে তা নয়। অনেক সময়েই একই ধরনের ছন্দস্পন্দে কিংবা বেয়াড়া শব্দ প্রয়োগের বিচিত্র ঝোঁকে নষ্টই হয়ে গেছে কবিতার ঈপ্সিত শোভনতা। কিন্তু যেখানে সে শোভনতা ফুটেছে, সেখানে স্বকীয়তায় সত্যেন্দ্রনাথ তুলনাহীন।

'কুহু ও কেকা'র অনেক কবিতাতেই দেখি, কবি রঙ ছেড়ে সুরের দিকে ঝুঁকেছেন বা ধ্বনি ছেড়ে সুরের দিকে ঝুঁকেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধ্বনিই তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'পাল্‌কীর গান' কবিতাটির অবিস্মরণীয় সেই স্পন্দিত দৃশ্যগুলির কথা কি এখনো আমরা ভুলতে পেরেছি ? খাঁটি বাঙলা শব্দ ও চল্‌তি বুলির ওপর এতখানি ঝোঁক তখনও পর্যন্ত কেউই দেননি। প্রতিদিনের চল্‌তি বাঙালী সংসারের ঘর-দোর, আলাপ, ভাব-ভঙ্গি, অভিজ্ঞতা, খাদ্যসামগ্রী বা কাপড়-চোপড় এবং প্রাকৃতিক পরিবেশকে এত নিখুঁতভাবে ছন্দস্পন্দনে ধরেছেন, যার পরবর্তী অনুসরণ আছে কিন্তু পূর্ববর্তী কোন প্রেরণার উৎস নেই বলেই মনে হয়। কবির অভিপ্রেত হল এই, কুহু হল সুর আর রঙের প্রতীক। আর কেকা হল ধ্বনি আর গন্ধের প্রতীক। প্রাকৃতিক এই কুহু-র সুর ঋতু-বদল ঘটায়, যৌবনকে যেন চুরি করে নিয়ে আসে, হাওয়ায় কুয়াশা কাটায়, নীলিমা আনে। অন্যদিকে কেকাধ্বনির আওয়াজে ফুল ফোটে, গন্ধ ছড়ায়, উল্লাস আনে। কিন্তু 'পাল্‌কীর গান' কিংবা 'ভাদ্রশ্রী'-র মতো দু-চারটি ধ্বনি-চিত্র বা রূপময় কবিতা ছাড়া বেশির ভাগ কবিতাই সেই 'সাম্য-সামে'র ধারায় চলেছে কিংবা সমকালীন বাঙালীর ভবিষ্যৎ-চিন্তার উদ্বেগে

ভরা। সেখানে তিনি বৈশিষ্ট্যহীন।

কিন্তু 'তুলির লিখনে' স্বগত-সংলাপের ভঙ্গিতে বিভিন্ন কবিতায় কোন অপূর্ণ বাসনা বা ব্যাকুলতা ফুটে উঠলেও একমাত্র 'বিদ্যুৎ-পর্ণা' ছাড়া আর কোন কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের চিত্ররূপময় ভঙ্গি ফুটে ওঠেনি। কাহিনীগুলির মধ্যে বিশেষ করে নারীর অন্তর্দাহ, প্রেমের বেদনা ও আক্ষেপ ফুটেছে। ইতিহাস-পুরাণ বা প্রচলিত সংস্কারের কথাও আছে কোন কোন কবিতায়। কেবল শেষ কবিতা 'শেষ'-এ অতল সমুদ্রের মণিঘরে শেষ নাগের সব কিছু সঞ্চয়ের কল্পনায় পৌরাণিক চরিত্রে রূপকথার ছোঁয়া লেগেছে। কাজেই শেষ নাগের মণিঘর-রক্ষার কল্পনা পরী-অপ্সরী-কিশোরী-মুগ্ধ সত্যেন্দ্রনাথের সমুদ্র-পুরাণ-কৌতূহলের পরিচয় দিয়ে তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যকেই প্রমাণ করে।

'অভ্র-আবীর' সংকলনের মধ্যে অন্যান্য কাব্য-সংকলনের মতোই বিচিত্র বিষয়ের কবিতা আছে। আছে মনীষী-বন্দনা, দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের মতো কিছু সংবাদধর্মী কবিতা, আছে বিজ্ঞান-পুরাণ-মিশ্রিত রূপক কবিতা, আছে প্রকৃতি-বর্ণনা-সূত্রে বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক ইতিহাসের বিবর্তনের আভাস। এছাড়া 'বৈকালী' কিংবা ঊর্ধ্ব বাহুর প্রেমের মতো কিছু ক্ষোভ ও ব্যাকুলতার গীতি-কবিতাও আছে যাতে অতর্কিতে হৃদয়ের প্রকাশও ঘটেছে। কিন্তু এই বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে কিছু কবিতা আছে যা তাঁর বিশেষ ক্ষেত্র। সেই রূপ-রঙ-ধ্বনির জগৎ। স্বর্ণমল্লিকা, সবুজপাতার গান, সবুজপরী, কুঙ্কুম পঞ্চাশৎ, জর্দাপরী, লালপরী, নীলপরী, চিত্র-শরৎ, জাফরানের ফুল, কিংবা সন্ধ্যামণির ডালা সাজাবার চেষ্টা। কিন্তু মাঝে মাঝে শব্দ-ঝোঁকে ধ্বনির সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়ে গেছে। 'সবুজপরী'র প্রাথমিক সূচনাতেই যেমন দেখি:

সব্‌জে তোমার দোব্‌জাখানি আলোছায়ার সঙ্গমে
জলে স্থলে বিশ্বতলে ফুটায় বিভোল বিভ্রমে।

'সব্‌জে' আর 'দোব্‌জা'র ধাক্কায় পরীর সাজ-পোশাকের সূক্ষ্ম কারুকার্য নষ্ট হয়ে গেছে।

কিন্তু আতিশয্য সত্ত্বেও এখানেই সত্যেন্দ্রনাথের স্বক্ষেত্র। এই স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রনাথের পুরাণ-ইতিহাস-রূপকথার জ্ঞান খড়-মাটির কাজ করেছে। কবির ছন্দ-ধ্বনি-সুরজ্ঞান তার রূপ ফুটিয়েছে। রূপে বিভঙ্গ এসেছে দেশজ শব্দ-ভাণ্ডার থেকে, বিদেশী আরবি-ফারসি শব্দ-ভাণ্ডার থেকে, অনেক ক্ষেত্রে মেয়েলি ভাষা থেকেও। ছন্দ-স্পন্দনে লেগেছে লৌকিক তাল ও ঝোঁক। এই বিশিষ্টতার সঙ্গে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আবেগময়তা, প্রকৃতি ও জীবনের বিচিত্র প্রাণ-সম্পদকে ইন্দ্রিয়ানুভবে সমৃদ্ধ করবার অসাধারণ দক্ষতার তুলনা চলে না। নিজের সৃষ্টি-শক্তির প্রবণতাকে বুঝবার মতো অন্তর্দৃষ্টি, অতীত ও বর্তমানকে সমান প্রখরতায় ধরবার চেষ্টা, মহাকাল-প্রবাহে ক্ষণিক আয়ুর এই জীবনকে দুর্লভ করে দেখার প্রগাঢ় মমতা কিংবা হাজার সুরে বেজে ওঠা জীবনের গাথায় ঐশ্বরিক সম্পূর্ণতার আভাসের তুলনা নিশ্চয় সত্যেন্দ্রনাথে মিলবে না। হয়তো দু-চারটি গানে কিংবা কবিতায় প্রায় সমধর্মী কোন ব্যাকুলতা অতর্কিতে ফুটে উঠেছে মাত্র। একথা ঠিক যে, বহু কবিতার ছন্দসর্বস্বতাই সত্যেন্দ্রনাথকে 'ছন্দরাজ' করে তুলেছিল। কিন্তু তাঁর বিশেষ ক্ষেত্রে, বুদ্ধদেব বসুর মতো একথা বলা ঠিক হবে না যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসত্তার প্রতীকী ফুলকে 'কাগজে' করে ফেলেছেন কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'মানস-সুন্দরী'র পরিণাম ঘটিয়েছেন লালপরী, নীলপরীর আমোদ-প্রমোদে।' রবীন্দ্রনাথের দেওয়া বঙ্গ-

জগতের প্রতীকী মর্যাদাকে সত্যেন্দ্রনাথ কখনও অনুকরণ করে ক্ষুণ্ণ করেননি। বরং নিজের প্রবণতা অনুযায়ী চল্‌তি দৃশ্যজগৎকে দেখেছেন, অজস্র ব্যর্থতা সত্ত্বেও নিজের শব্দরুচি ও ইন্দ্রিয়-রুচি দিয়ে নিজের দৃশ্য ও কল্পজগৎটিকে তৈরি করেছেন।—

'বৈরাগী সে/কণ্ঠী বাঁধা,/ঘরের কাঁখে/লেপছে কাদা/মটকা থেকে/চাষার ছেলে/দেখছে ডাগর/চক্ষু মেলে'—এই দৃশ্যছন্দ কারুর অনুসরণ নয়, সঠিক দেশী শব্দচয়নে চল্‌তি দৃশ্যটিকে বরং স্বকীয় ভঙ্গিতে ঘনিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে। তেমনি 'ভাদ্রশ্রী' কবিতায় শারদীয় শান্ত রূপ দেখি তাঁরই নিজস্ব ভঙ্গিতে :

'টোপর পানায় ভরল ডোবা নধর লতায়
　　　　　　নয়ানজুলী
পূজা শেষের পুষ্পে পাতায় ঢাকল যেন
　　　　　　কুঞ্জগলি।
তাজা আতার ক্ষীরের মতো পুবে বাতাস
　　　　　　লাগছে শীতল,
অতল দীঘির নিতল জলে সাঁৎরে বেড়ায়
　　　　　　কাৎলা চিতল।'

বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ বয়স্কদের লক্ষ্য করে এসব কবিতা লিখলেও আসলে এ কবিতাগুলি নাকি নেহাৎ শিশু বা কিশোরপাঠ্য। তাঁর কবিতা যে বয়স্কদের জন্যই লেখা এমন কোন এজাহার সত্যেন্দ্রনাথ লিখে যাননি। বরং পরী-অপ্‌সরী-কিশোরী-বিষয়ক কবিতাগুলি শিশু-কিশোরের দিকে তাকিয়েই লেখা এবং পরী-অপ্‌সরী তো বটেই, শরতের ছবি, গ্রীষ্মের পরিপক্কতা কিংবা বর্ষার ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে মাঝে-মাঝেই কিশোর-কিশোরীর কৌতূহলমুগ্ধ লোভনীয় চোখ উঁকি মারে। 'চিত্রশরৎ' কবিতার মধ্যে পান-খাওয়া শরৎ-রানীর ছবি, 'জ্যৈষ্ঠী মধু'র মধ্যে পাক-ধরা ফলের বাগানে কোন্ ফল পাখি ঠুক্‌রে রস ঝরিয়েছে, কোন্ ফল কতটুকু পাকলো এবং কবে সেটি রসনায় সবচেয়ে আরামপ্রদ হবে, তার অপেক্ষায় কালো ডাগর দুটি চোখের আনাগোনার ছবি, কিংবা ইল্‌শে গুঁড়ি বৃষ্টিতে বারকোশে ঢাকা-দেওয়া তাল-পাটালির মতো মেঘে-ঢাকা সূর্যের ছবিতে শিশু-কিশোরের লোভনীয় খাদ্যের তুলনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বর্ণনা অবশ্যই শিশু-দৃষ্টির প্রমাণ। তেমনি প্রমাণ আছে 'ভাদ্রশ্রী'-তে ভাদ্রের জোলা হাওয়ায় পাতার ক্ষীরের ঠাণ্ডা অনুভূতির মধ্যেও। শিশু-অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে প্রকৃতিকে দেখার এই স্বতন্ত্র দৃষ্টি কী করে বুদ্ধদেব বসুর মতো কবির চোখ এড়িয়ে গেল জানি না। 'কুহু ও কেকা'র 'পাল্‌কীর গান' কিংবা 'বেলাশেষের গান' ও 'বিদায় আরতি'-কাব্যে 'দূরের পাল্লা', 'ডোরাই', 'সাঝাই' ইত্যাদির মতো কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ কল্পনার দূরপাল্লাই যে আদিম শৈশবে পৌঁছেছেন, তার রোমাঞ্চ এখনো ফুরোয়নি। তাছাড়া শিশু-কিশোরের রূপকথার জগৎ বয়স্ক পাঠকেরও জগৎ, কারণ বয়স্ক পাঠকের অন্তর্নিহিত 'শিশু' এ রাজ্যে অন্য মাত্রা পায়। সে মাত্রা অভ্যস্ত দৃষ্টিকে সরিয়ে বিস্ময়-রসকে খুঁজে পাওয়ার মাত্রা।

৩

তাছাড়া সত্যেন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী কৌতূহলী মন একদিকে যেমন আবহমান কালের ইতিহাসের ভাণ্ডার লুঠ করে নিয়ে এসেছে কবিতায়, তেমনি সমসাময়িক রাজনৈতিক কবিতা, সাময়িক ঘটনা উপলক্ষে লেখা কবিতা, 'সাম্যসাম' কিংবা 'মহাসরস্বতী'-র মতো মনন-প্রধান কবিতা কিংবা অনুবাদ-সূত্রে উগোভ্যার্লেন-বেঙ্গল্যার ইয়েটস্- পাউণ্ড- মেটারলিঙ্ক- ভালেরি- ডেহ্‌মেলের কাব্যচর্চার ঐতিহ্যলগ্ন হবার চেষ্টা কিংবা, যথার্থ রসিকের দৃষ্টিতে 'হসন্তিকা'য় সমকালীন নানা প্রগতিবিরোধিতার প্রতি বিদ্রূপ-বাণ-নিক্ষেপ

সত্যেন্দ্রনাথকে যুদ্ধোত্তর আধুনিকতার ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। এই বিচিত্রমুখিতা, ঐতিহাসিক ও সমকালীন চেতনা, সাহিত্যের বিশ্বপ্রেক্ষাপটজ্ঞান কোন স্থির প্রজ্ঞা আনতে পারেনি সত্যেন্দ্রনাথের মনে, কিন্তু এই রকম বিস্তৃত মানসিকতা নিয়েই যে জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের মতো প্রজ্ঞাবান্ কবির জন্ম হয়েছে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সত্যেন্দ্রনাথ ও সমকালীন কবিতা যে বিশিষ্ট ছন্দ-ধ্বনি-স্পন্দনে এবং দেশজ ও আরবি-ফারসি শব্দ-গ্রন্থনে পল্লীভিত্তিক রোম্যান্টিসিজ্‌মের চরিত্র তৈরি করেছিলেন তা প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্যকুমার, অজিত দত্ত ইত্যাদি কবিদের প্রাথমিক পর্বে প্রভাবিত করেছিল। জীবনানন্দের 'ঝরা পালকে'র 'ওরে কিশোর বেঘোর ঘুমের বেহুঁশ হাওয়া ঠেলে' কিংবা 'হিমের ঘুমের বেড়াস খুনের আগুন দাবা জেলে'; অথবা, অচিন্ত্যকুমারের প্রথম দিকের লেখা 'বাদল প্রিয়া মেঘলা-মেয়ে শাঙন সাজি আয় লো আয়' ইত্যাদি সত্যেন্দ্রনাথের অব্যর্থ স্মারক। তেমনি রোম্যান্টিসিজ্‌ম্-এর আরেকটি দিক নগর-সভ্যতার বীভৎস কালিমায় বিলীয়মান প্রকৃতি ও হৃদয়, যাকে অ্যান্টিরোম্যান্টিসিজ্‌ম্ বলা চলে, যা রোম্যান্টিসিজ্‌মের মধ্যেই লুকিয়েছিল, এবং পরবর্তীকালে যা প্রকট হয়ে আধুনিকতার একটা লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাও সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে আভাসিত হয়ে আছে। উদাহরণস্বরূপ সত্যেন্দ্রনাথের 'চরকার আরতি'-কবিতাটির আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

'ভস্মলোচন সব সভ্যতা রুক্ষ
কপ ক'রে গিলে খায় জোয়ানের জোয়ানী,
চুঁয়ে যায় ক্ষেত ভুঁই চিম্‌নির ধোঁয়াতে,
গঙ্গা সে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের ধোয়ানী।
বাস্তুতে ঘুঘু চরে, তার ঠাঁয়ে বস্তি
উবে গেল উড়ে গেল মমতার প্রিয় নীড়,
কুলিনী কোলের শিশু ফেলে' স্বামী রুগ্ণ
ভেগে যায় 'মেট' সাথে, অনাথের করে ভিড়।
পদে পদে বাড়ে শুধু হৃদয়ের লঙ্ঘন—
ময়দানে কাঁদে কচি গোপনের পয়দা,
সহরের বিষ ঢোকে পল্লীর ঘর ঘর—
লালসার লোলশিখা বাড়ে রে বে-ফয়দা।

যে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে এখানে শহর জীবনের লালসা, নিষ্ঠুরতা, চরিত্রহীনতায় ভস্মলোচন রূপ এঁকেছেন, পরে তিরিশের দশকে সমর সেন এবং চল্লিশের দশকে জীবনানন্দ শহরের পরিবেশকে একই তীব্রতার সঙ্গে ফুটিয়েছেন। সমর সেনের স্যাকারিনের মতো মিষ্টি শহরে ভালবাসার ছবি যেমন ভুলবার নয়, তেমনি যুদ্ধকালীন শহরের অন্ধকার রাস্তায় জীবনানন্দের বর্ণিত ব্রায়ার পাইপ-হাতে লোল নিগ্রোর হাসিও ভুলবার নয়। এসবই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে বর্ণিত কুলি-মেয়ের পদস্খলন কিংবা ময়দানে পাপ-ব্যবসায়ের পরবর্তী পদক্ষেপ। যুদ্ধের হাওয়া শিল্প-শহরকে ক্রমশঃ যে বিষাক্ত করতে শুরু করেছে, তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়।

কাজেই রবীন্দ্র-যুগেই সত্যেন্দ্রনাথ একহাতে সৃষ্টিশক্তির বিচিত্র-রূপ-জ্ঞান, প্রেম, প্রাণ, আনন্দ-দুঃখ এবং কর্মতপস্যার স্তুতি করেছেন নিজস্ব ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গিতে, অন্যহাতে রূপ-রঙ-রসের জগতের দরজাটি খুলে ধরেছেন শিশুর মুগ্ধ দৃষ্টিতে, নিপীড়িতের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন, বিশ্ব সাহিত্যের 'চিত্ত-বাণী' সংগ্রহ করেছেন 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', ও 'মণিমঞ্জুষা'য়, আবার সমকালীন আন্দোলন ও ঘটনার সঙ্গেও যুক্ত থেকেছেন। প্রয়োজন মতো ব্যঙ্গ করেছেন পারিপার্শ্বিকের অসঙ্গতিকে, আবার ভবিষ্যৎ নগর-সভ্যতার কদর্যতায় সন্ত্রস্ত হয়েছেন। আত্ম-ভাবনার গভীর-জটিল পথে তিনি যাননি বটে, কিন্তু বিচিত্র কৌতূহলে ও আত্ম-নির্ভর প্রস্তুতি-চেষ্টায়

ঐতিহ্যলগ্ন হয়েও তিনি পৌছে গেছেন আন্তর্জাতিক চেতনায়, যে আন্তর্জাতিকতা আধুনিক কবি মানসিকতার একটা বড় সম্পদ।

কিন্তু এই ব্যাপক ও বিচিত্রমুখী কৌতূহলের মাঝখানে একটি ক্ষেত্র ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব, সে হল তাঁর ওই রূপকথার জগৎ যেখানে 'নিদ্ মহলের দরোজা' খুলে গেলেই তুল্ তুল্ টুক্ টুক্ ধ্বনি ওঠে, পরীর কানের দুলের মতো ইল্‌শে গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, ধূপের ধোঁয়ার পাখ্‌না মেলে নীলপরী কিংবা লালপরী এসে হাজির হয়, ভোরের আলোয় পদ্মকলি হাই তোলে, কিংবা তারার বনে পথ হারিয়ে যায়।

কুমুদরঞ্জন ও সমন্বয়-দর্শন

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

নিজের জীবন সম্বন্ধে কুমুদরঞ্জন বলেন—

"আমার জীবন পল্লীজীবন, কিন্তু নেহাৎ
তুচ্ছ নয়
যে জীবন মোর দেবদেবীদের অপার কৃপার
চিহ্ন বয়।
শিখায়েছে গ্রাম যে দিতে সর্ব ধর্মে মর্যাদা।
জগৎ জোড়া মানবজাতি এক ভাবিতে সর্বদা।"

কত দেবদেবীই গ্রামে পূজিত। পীঠস্থানের মঙ্গলচণ্ডী দেবী, মন্দিরের শিব, পাটের গৌর-নিতাই, গৃহের রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, শিব, কোথাও শিলায় রাধাবল্লভ। সবই ভক্তি ও বিশ্বাসে আরাধ্য। সর্বদা যেন দেবদেবীর চোখের সামনে জীবন।

আবার, " 'বনের বুড়ায়' অর্চনা করি,
জলকুমারী-রে পূজি
'ষষ্ঠী' 'শীতলা' 'মনসা' 'লক্ষ্মী'
সবার মহিমা বুঝি।
কখন কিরূপে দেখা দেন হরি, পথ চাহি বারবার
তাঁহার লাগিয়া সাজাইয়া রাখি এই ঘর-সংসার।
দেবতারে ডাকি দেবতার কথা কহি,
দেবে ও মানুষে প্রতিবেশী হয়ে রহি।"

ভক্তের যে ভগবান সেখানে কোন সংশয় নেই, সংঘাত নেই, দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই, ভেদ নেই। সবই তো একেরই রূপ। পূজা তো এক জনেরই—সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূলমন্ত্র। সর্বরূপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত।

"ভক্ত তোমায় যখন যেরূপ
দেখেছে করেছে ধ্যান,
সেই তব রূপ ভক্তের ভগবান।
ভক্ত সতত সত্য দৃষ্টি অসত্য তাতে নাই,
তিনি যা দেখেন তুমি তাই, তুমি তাই।
তুমিই সাকার, তুমি নিরাকার, অপরূপ রূপবান,
বহু বহু রূপে তোমার অধিষ্ঠান।
সুন্দর তুমি, কুৎসিৎও তুমি, বরাহ কমঠ-মীন।
তুমি লাবণ্য পাথার তুলনাহীন।
ভুবন তুমিই ভুবনেশ্বর ভাবে রূপে ছড়াছড়ি,
যাহা আছে নাই, সকলি যে তুমি হরি।
ভক্ত তোমার যে নাম দিয়াছে,
তাই তো তোমার নাম,
মধুর মধুর মধুর অভিরাম।
নামের ভিতর বসতি তোমার নামে ঝরে সুধাধার
শব্দ ও রূপ হইয়াছে একাকার।
তোমার বিশ্বরূপকে ভক্ত দিবানিশি আহা দেখে,
তুমিই বিশ্ব, তোমারে লইয়া থাকে।"
(ভক্তের ভগবান)

শ্রুতিতে এই এক অদ্বিতীয়েরই কথা, তিনি ব্রহ্মই হন, আর সৃষ্টিকর্তা দেবতা বিশ্বকর্মাই হন।

(ঋগ্বেদ ১০।৮১-৮২)। "যো দেবানাং নামধা এক এব"—যিনি একমাত্র ও সকল দেবের নাম ধারণ করেন। সুতরাং তিন সহস্র তিন শত উনচল্লিশ দেবতাই হন, তেত্রিশই হন, মূলতঃ তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। উপনিষদে আরও স্পষ্ট করে বলা হল যে, সেই এক পুরুষই বিশ্বের বহু রূপ নিয়েছেন। সব রূপেই তিনি। বৃহদারণ্যকে "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়" আর কঠোপনিষদে "অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ" (বৃহ, ২।৫।১৯, কঠ ২।২।৯)। তিনি প্রবিষ্ট হয়ে তাদের সদৃশ হন, আবার তাদের বাইরেও অতিরিক্ত থাকেন। শুধু দেবতার নানারূপে নয়—সৃষ্টিরও রূপে তিনি। তাই অনেক দেবতার রূপের মধ্যে কাকে পূজা করা হচ্ছে এ নিয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ শাস্ত্রে নেই। আর গীতায় ভগবান আরও পরিষ্কার করে বোঝালেন যে, ভক্ত যে মূর্তিতেই শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চনা করেন, সেই দেবমূর্তিতেই তিনি তাকে অচলা ভক্তি দেন। শুধু তাই নয়, অন্য দেবতার উপাসনাও ভগবানেরই উপাসনা। যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্যান্য দেবতাকে পূজা করেন তাঁরাও না জেনেই পরমেশ্বরেরই উপাসনা করেন—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥"

ভগবান সব সময়ই কর্মফলদাতা এবং যাঁকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করা হোক, তিনি ভগবানের কাছ হতেই কাম্যবস্তু লাভ করেন। "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান" (গীতা)। পরমেশ্বরের বিভূতিই অনেকের কাছে অর্চনীয়, কিন্তু সব পূজাই সেই এক পুরুষোত্তমের—যিনি সব শক্তি ও বিভূতির আধার। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির জ্যোতি তাঁরই। ভূত সকলের তিনিই ধারক। ওষধিকে তিনিই পুষ্ট করেন। (গীতা)। ওষধি ও বনস্পতিতে তিনিই এ উপনিষদের ঋষিই দেখেছিলেন। ভক্ত কুমুদরঞ্জনের দৃষ্টিতে বিশ্বনাথের ও বিশ্বের এই রূপই ধরা পড়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ সহজভাবে বলেন, "যাদের উদার-ভাব তারা সব দেবতাকে মানে,—কৃষ্ণ, কালী, শিব, রাম ইত্যাদি। লীলাতেই ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ তিনি সব হয়েছেন। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মে নিরাকার সাকার সব রকম পূজা আছে, জ্ঞানপথ ভক্তিপথ আছে।" (কথামৃত)। ভক্তের ভগবানও একই, শুধু জ্ঞানীর না। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়। সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। স্বপ্নবৎ বলে না, তবে বলে তিনিই এসব হয়েছেন। তবে পাকা ভক্তি হলে এইরূপ বোধ হয়। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত শ্যামময় দেখলেন, আর নিজেকেও শ্যামবোধ হল। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। (কথামৃত)। যে সমন্বয় করেছে সেইই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি সব এক। শাক্ত বৈষ্ণব বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে। তিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। তাঁরই নানা রূপ। (কথামৃত)। কুমুদরঞ্জনের ভগবৎ চিন্তায় এই সমন্বয়ই হয়েছিল।

এই এককেই বহুজন বহুদেশে বহুনামে ডাকে। ভাগবতে ভগবানের কথা, সৃষ্টির পূর্বে আমি একা ছিলাম। সৃষ্টির পরেও আমি আছি। এই যে বর্তমান বিশ্ব তাও আমি। আর প্রলয়-কালে যা অবশিষ্ট থাকবে তাও আমি (ভাগবত)। যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ তাঁরা বলেন যা অদ্বিতীয় জ্ঞান তাই তত্ত্ব, তাই জ্ঞানীদের ব্রহ্ম, যোগীদের পরমাত্মা, ভক্তদের ভগবান (ভাগবত)। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা।

যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। বেদে ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তন্ত্রে ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ শিবঃ কেবলম্। পুরাণে ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। আর বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন। (কথামৃত)।

শক্তির আরাধনাও অতি প্রাচীন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই কালী। ব্রহ্ম জ্ঞান হলে আর দুটা থাকে না, অভেদ। সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন।" (কথামৃত)। "যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। তাঁকেই মা বলে ডাকি। যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি। শক্তি লীলাতেই অবতার।" (কথামৃত)।

কুমুদরঞ্জনের কাব্যে সমন্বয়-দর্শন তাঁর জীবন-সাধনায় সিদ্ধির উপলব্ধির ছন্দোময় প্রকাশ। সেই কাব্যবিচারে তাঁর ভক্তি-সাধনার স্বরূপ না জানলে নানারকম ভ্রমাত্মক জল্পনা জালে সাহিত্য সমালোচক পতিত হতে পারেন। ধর্ম-সাধনার কিছু কথা না জানা থাকলে সাধনার বিষয়ে শুধু কবিতার বিচ্ছিন্ন বাক্য বিচার করে অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক। অনেক সাহিত্যিকের ধারণা, যেহেতু কবি বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্ত, সুতরাং তিনি দুর্গা বা কালীভক্ত হতে পারেন না। যদি কাব্যে দেখা যায় এই রকম, তাহলে মেলাতে না পেরে, সমন্বয়-সূত্র অজ্ঞাত থাকায়, নানারকম উদ্ভট ও উদ্‌ভ্রান্ত ধারণা পেয়ে বসে। সে সব ধারণা ও মত এই সব কবির জীবনচর্যার অবমাননাকর হয়ে উঠতে পারে। হিন্দুর সনাতন ধর্ম সম্পর্কে তাই পূর্বে একটু আলোচনা করে নিতে হল। কুমুদরঞ্জন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব কাব্যপুষ্ট, শ্রীচৈতন্যোত্তর চৈতন্যচরিতামৃতের রসস্নাত, রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের গীতসিক্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয় সাধনার একান্ত অনুগামী সাধক-কবি।

তিনি যুবা বয়সেই সস্ত্রীক নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামী কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হন। তিনি কণ্ঠে আজীবন তুলসীর মালা ধারণ করেছিলেন, যেটি বৈষ্ণবের একটি চিহ্ন। তাঁর ডায়রীতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিই তাঁর উপাস্য বলেছেন। একটি মৃন্ময় যুগলমূর্তি মাথরুণে ছাত্রাবাসে তাঁর ঘরে থাকত। এই মূর্তির কথাই ডায়রীতে। বাড়িতে মৃন্ময় ও ধাতুময় যুগলমূর্তি ছিল। আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরে পূজা তিনি করতেন না। কিন্তু ছাত্রাবাসে থাকা কালেও নিয়মিত তিনি ঠাকুরকে ফুল জল দিতেন। বাড়িতে তাঁর মা মাসীরা ও পরে সহধর্মিণী, কন্যা ও পুত্রবধূরা দৈনন্দিন পূজাদি করতেন—নিয়মমত, কিন্তু আড়ম্বরহীন। শিব ও গোপাল গৃহে পূজিত হত। কালী দুর্গার ছবিও ঘরে থাকত। সকালে প্রতিদিন ভক্তির সঙ্গে দুর্গাস্তব করতেন ও 'শিবমহিম্নঃস্তোত্রম্' আবৃত্তি করতেন। সূর্যস্তব সূর্যোদয়ে। ভোর না হতে মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে, শিবের মন্দিরে ও লোচনের পাটে প্রণাম করে আসতেন। এই সব দেখে ও নানা ভাবের কবিতা পড়ে তন্ত্রসাধক বিচারপতি সমরেন্দ্রনারায়ণ বলেন,"কখনও আপনাকে ভেবেছি ব্রহ্মসাধক, কখনও শক্তিমাতৃসাধক, কখনও আউল বাউল বৈষ্ণব ও সিদ্ধ সাঁইপন্থী বলেও আমার ধারণা হয়েছে। তন্ত্রের বচনটি আপনার মধ্যে মূর্ত প্রকাশ—অন্তরে শক্তিসাধক, বাইরে শৈব-সাধক, সাধারণের দৃষ্টিতে বৈষ্ণবসাধক—নানা ভাবে সাধনপথে যে 'সিদ্ধ' সেই তো কৌলাবধূত।" মোহিতলাল এই ভাবসাধনাকে বলেছেন 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবতন্ত্রের সাধনা'।

বৈষ্ণবতন্ত্র অনুযায়ী রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব একটু জানা থাকলে ভক্ত বৈষ্ণবকে শ্যাম আর শ্যামাকে একই সঙ্গে ডাকতে শুনলে বিভ্রান্ত হতে হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, চিদাত্মা পুরুষ চিৎশক্তি প্রকৃতি। চিদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, চিৎশক্তি শ্রীরাধা।

(কথামৃত)। নামরূপ যেখানেই, সেইখানেই প্রকৃতির ঐশ্বর্য। সীতা হনুমানকে বলেছিলেন, আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা, একরূপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রাণী, একরূপে ব্রহ্ম, একরূপে ব্রহ্মাণী, একরূপে রুদ্র, একরূপে রুদ্রাণী। (কথামৃত)। এই পুরুষ ও প্রকৃতি মূলতঃ এক। যমলার্জুন হতে মুক্ত কুবের তনয়দ্বয়ের কৃষ্ণ-স্তুতিতে এই রূপ পাওয়া যায়—"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্তমাদ্য পুরুষঃ পরঃ।" আবার "ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।" "হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগিন্ আপনি প্রকৃতির পার, গুণাতীত আপনি আদি পুরুষ। আপনি মহত্তত্ত্ব। আপনিই সত্ত্বরজ-তমোময়ী সূক্ষ্মা কারণস্বরূপা প্রকৃতি।" (ভাগবত)। গীতাতেও এই কথা ভগবানের।

তত্ত্বের কথায় বেশি না গিয়েও শুধু মনে রাখলেই হল যে, সব পথ দিয়েই ভগবানকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে-ওঠা নিয়ে বিষয়। তা সিঁড়ি, কাঠের সিঁড়ি, বাঁশের সিঁড়ি, দড়ি কি আছোলা বাঁশ হতে পারে। (কথামৃত)। তবে তাঁকে ডাকবার সময় একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। মধুর ভাবে সব আছে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য। (কথামৃত)। কথাটা এই কোনরকমে তাঁর উপর যাতে ভক্তি হয়, ভালবাসা হয়। একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয়, তা হলেই হল। তারপর যদি দরকার হয়, তিনি সব বুঝিয়ে দেবেন। সব পথের খবর বলে দেবেন। (কথামৃত)। তবে ছাদে ওঠার নানা উপায় হলেও এতে খানিকটা পা ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। (কথামৃত)। সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌছানো যায়। একটা ঠিক জানলে সব জানা যায়। তিনিই জানিয়ে দেন। (কথামৃত)। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই যত মত তত পথ, সব পথই ঠিক বললেও, জানলেও, নিজের সম্পর্কে বলতেন আমার মাতৃভাব। এই মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা—তুমি মা, আমি তোমার ছেলে, এই শেষ কথা। (কথামৃত)।

কুমুদরঞ্জন বৈষ্ণব হিসাবে যুগলমূর্তির আরাধনা করেই সর্বধর্ম সমন্বয়ে পৌছান। সন্তানভাবে শেষে বিভোর হয়ে থাকতেন। আদর্শ বৈষ্ণব সত্তার সঙ্গে মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রতি অনুরক্তির কোন বিরোধ নাই। ভগবৎ সাধনার ও ভাগবত ধর্মের সিদ্ধ-সাধকের এটি নিবিড় উপলব্ধি। "হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব রূপ সার।" হরিভক্তির প্রতি বাৎসল্য রসের অপূর্ব বিকাশ। তাঁর কবিতায় ও ডায়রীতে এই ভাবটি ও পঙ্‌ক্তিটি বারে বারে দেখা দিয়েছে। বাংলার সাধকের শক্তি-সাধনা ও কৃষ্ণ-আরাধনাকে শ্যাম ও শ্যামাকে অভিন্ন দেখা একই ভক্তি ভাবনা হতে উৎসারিত যা তত্ত্বের উপলব্ধিতেও সত্য। ব্রহ্মসিক্ত চিত্ত রবীন্দ্রনাথেরও শেষ ভাবনায় বিশ্বশক্তির, মাতৃ-রূপের, কালীর স্নেহস্পর্শের কথা মনে আসে—

"সন্ধ্যা হল গো—ও মা সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায়
স্নিগ্ধ-করো।"

তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বনতুলসী' শ্রীহরির চরণে নিবেদিত।

"চাহি নাকো কিছু দাও তব প্রেমে দাও হে
হৃদয় উলসি
তোমার চরণে আঁখি ভেজা দিলাম
এ বনতুলসী।"

১০৮টি পাতা তুলসীর। পরে 'সোমনাথ' চরণে ১০৮টি কবিতার বিল্বপত্র নিবেদন করেন। 'বনতুলসী'র সূচনা নরহরি ঠাকুরের একটি বিখ্যাত পদ দিয়ে—

"যা কর নাম দরশ সুখ-সম্পদ
দরশ-পরশ-বনপুর,

পরশে যে সুখ তাহা কি বলিতে পারি গো
সে যে বাণী অনুভব দূর।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের যে শাখা নাগরীভাবে গৌর ভজনা করেন, কুমুদরঞ্জন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও সেভাবে শ্রীগৌরাঙ্গকে ভজনা করেননি, যদিও শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুরের শিষ্য লোচনদাস তাঁর স্বগ্রামবাসী। নাগরীভাবে কাব্যরচনা চোখে পড়ে না। যদিও 'গোস্বামী-বন্দনা' কবিতায় লেখেন—'গোরা গরবিনী তোমাদের আমি পুরুষ বলিতে ডরি।'

রাধাকৃষ্ণের ঐক্যাবতার গৌরভক্তি বার বার তাঁর কাব্যে ঘোষিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের এই ভাবনায় তিনি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 'দ্বারাবতী' কাব্যনাট্যের শেষ রাধাকৃষ্ণের যুগ্ম-রূপে গৌরাঙ্গ দেহে আবির্ভাবের ইঙ্গিতময় সঙ্গীতে।

"সময় হল ডাক পড়েছে নদীয়ায়,
ওই বাঁশরী শোনা যায়।
শুধাই হে শ্যাম কখন চুপে
ঢাকলে ও রূপ রাধার রূপে,
ডুবলো কালো কনক আলোয়
ডুবলো অসীম সুষমায়।"

এই গানটির আগে নাটকের তৃতীয় অঙ্কে প্রথম দৃশ্যে অর্জুনের একটি দর্শন দ্বারকা উপকণ্ঠে কল্পিত হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে গৌররূপে অবতীর্ণ হওয়ার চিত্র ভক্তের চক্ষে—

"নীল উর্মি পরে
ভেসে আসে স্বর্ণতরী, রয়েছে শয়ান
ওই সেই শ্যাম তনু। কোথা স্বর্ণতরী?
ওযে রমণীয় মূর্তি, মেলি স্বর্ণপাখা
সোহাগে আবরি নিল ধীর বক্ষে তার
শ্যাম দ্যুতি কি মধুর ও কি ও মিলন
কোথা কই নারী মূর্তি? ও যে হেমতনু
মোহন নাগরবর চাঁচর চিকুর।
ও কি ও সন্ন্যাসী ও যে পরনে কৌপীন
দণ্ড কমণ্ডলু হাতে। কিন্তু সেই আঁখি
সেই রক্ত বিম্বোধর। বাজিছে মৃদঙ্গ
ওই ওঠে হরিনাম। নাচে বিনোদিয়া
নাচে তরী, তারি সনে নাচে সিন্ধু নীর
উদ্দণ্ড নর্তনে।"

'বৈষ্ণব' নামেক বিতায় লিখলেন—"যুগলরূপে উপাসী যে পিপাসী যে রসের মোরা", আবার "মিশেছে রাই কনকলতা কল্পতরু শ্যামের গায়ে।" 'সোনার স্মৃতি' কবিতায় "দেখাই ব্রজের নৌকা-লীলা দ্বারাবতীর পাথারে।" এটি ভক্ত হৃদয়ের নিগূঢ় বাসনা দ্বারকাধীশ সম্বন্ধে। এই নিমাই নবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলায় তাঁর চোখে ভেসে ওঠে। চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়—

"রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্রের প্রমাণ।"

কৃষ্ণের শক্তি তাঁর সহ একই রূপ। বৃন্দাবনে লীলার জন্য যে দুই দেহ, সেই দুই আবার একঠাঁই হল গৌরাঙ্গ-লীলায়।

'দ্বারাবতী' নাটকের শেষে কবির চক্ষে ভক্ত অর্জুনের দিব্যদর্শন কল্পনায় ভবিষ্যতের চৈতন্য অবতারে রাধাকৃষ্ণের এই একঠাঁই হওয়ারই কথা। চৈতন্যমঙ্গল ও অন্য কিছু গৌড়ীয় বৈষ্ণব নাটকে, বৃন্দাবনেই নারদের কাছে ভগবানের এই অঙ্গীকার নাটকীয় রূপ পেয়েছে। কুমুদরঞ্জন সেই আবির্ভাবের প্রাক্ আস্বাদন বিরহ-কাতর ভক্ত অর্জুনকেই দিয়ে ইঙ্গিত করেন। এই বৈষ্ণব ভাবনার 'শ্রীগৌরাঙ্গ' কবিতায় লেখেন—"প্রকৃতির ভাবে পুরুষ কাঁদিল ধরা হল বিস্মিত।" এ যেন শ্যামের বাঁশরীই আবার বাজল। গৃহ থেকে টেনে বার করে নিয়ে যায়। হরি-অভিলাষী মন সব বন্ধন ছিঁড়ে উধাও হল। 'বাঙ্গালী' কবিতায় লেখেন—

"বাঙ্গালী প্রেমিক রসের ব্যবসা করে
গৌর করেছে সেই শ্যাম-সুন্দরে।

তার ভজনের কজনে নাগাল পাবে
কাঁদিয়া আকুল পুরুষ প্রকৃতি ভাবে

শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণাবতার ও রাধাকৃষ্ণ ঐক্যাবতার ধারণা কবির ভক্তিসাধনাসম্ভূত বিশ্বাস। তাঁর আচরণেও বৈষ্ণব ভাব, দীনতা, মধুর ভাষা, চরিত্রে ভক্তি বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও নির্লোভ। 'অমানিনা মানদেন'—নিজে নিরভিমান হয়ে অপরকে মান দেওয়া এবং সর্বদা ভগবৎ সঙ্গে অন্তর যুক্ত রাখা তাঁর সহজ স্বভাব ছিল। প্রেম তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বব্যাপী। ভক্তজনের ও সাধুদের পদধূলিতে নিজেকে অভিষিক্ত করতে ভালবাসতেন। 'প্রণতি' কবিতায় প্রকৃত বৈষ্ণবের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে।

"মোরা ভকত মহত পদরেণু পিয়াসী
তাই চরণে লুটাতে শির ভাল যে বাসি।
ও যে শ্যাম অনুরাগীদের আবীর কণা,
কলুষ কালিয়া নাগ লুকায় ফণা।"

ভাগবতে প্রহ্লাদের কথা 'মহীয়সাং পাদরজো-তু ভিষেকং' বিনা বিষ্ণুচরণে মতি হয় না মনে আসে। তাঁর সম্প্রদায়িকতা ছিল না, গোঁড়ামি ছিল না, মনে-প্রাণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতায় পূর্ণ ছিলেন।

এই ভক্তি-আপ্লুত বৈষ্ণবসত্তার সঙ্গে চণ্ডী মায়ের প্রতি অনুরক্তি ও সন্তানভাবের কোন বৈপরীত্য নেই। সিদ্ধ সাধকদেরও এ একটি নিবিড় উপলব্ধি। এর উৎস-সন্ধানে এগিয়ে চললে কানে শুনতে পাব—মাতৃভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর: "তুমি মা আমি তোমার ছেলে" যাঁর শেষ কথা, তিনিও সব ভাবেই রস-স্বরূপের রসাস্বাদ করতেন। মধুর নাম উচ্চারণ করতে করতে ভাবাবেশে বলেন, "হরি ওঁ হরি ওঁ হরি ওঁ। মা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করে রাখিস নে। আমি আনন্দ করবো। বিলাস করবো। কৃষ্ণরে! বলবো তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছিস বাপ।" (কথামৃত)। আবার বলেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ কই তোমার রূপ আজকাল দেখি না। এখন তোমায় অন্তরে বাহিরে দেখছি—জীব জগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সবই তুমি। মন বুদ্ধি সবই তুমি। তুমি অখণ্ড। তুমিই আধার, তুমিই আধেয়, প্রাণ কৃষ্ণ মন কৃষ্ণ, বুদ্ধি কৃষ্ণ আত্মা কৃষ্ণ! প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন! ওঁ সচ্চিদানন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! গোবিন্দ! যোগমায়া!" (কথামৃত)। কখন গান করেন, "বাঁচলাম সখি শুনি কৃষ্ণনাম।" কিংবা,

"যশোদা নাচাতো শ্যামা বলে নীলমণি
সে রূপ লুকালে কোথা করালবদনী।"

কুমুদরঞ্জনের অন্তরে চাপা ছিল এই উপলব্ধিরই তৃষ্ণা,—যা তার 'দেখা' কবিতাতেও ফুটে উঠেছে—

"আকাঙ্ক্ষা আর অন্য নাই,
এই জনমে এই নয়নে বারেক তোমায়
দেখতে চাই।
ভুবন তিনি, তিনিই ভুবন, ভুবন রূপ ত নিতুই
দেখছি ঢের,
এখন আমার তৃষ্ণা শুধু রূপ সাগরের অমৃতের।
করছি পঙ্ক পুকুর পাড়ে পঙ্কজেরই
প্রতীক্ষাই।"

শেষের দিকে কবিতায় কেবল মায়ের দর্শন।

'স্বর্ণসন্ধ্যায়' লিখলেন—

"কাঁদিয়া ডাকিনু সার্থক ডাক, কে যেন বলিল
নির্ভয় থাক
ললাটে আমার টিকা পরাইল রাঙায়ে
নভস্থল।
সেই হতে শত ব্যথা অনটন দেয় নাক
পীড়া আর
এ জীবন সুধাসিক্ত করেছে মায়ের স্তন্যধার।
কেশরী কনক কেশর বুলায় মরণের ভয়
যাতনা ভুলায়।
ধরার দুয়ার রুদ্ধ না হতে খুলিছে স্বর্গদ্বার।"

যে মায়ের রূপ তাঁর কাছে প্রকট হল, তা রামপ্রসাদের, কমলাকান্তের, শ্রীরামকৃষ্ণের মা। কুমুদরঞ্জনের কবিতায় বাৎসল্য রসের কন্যা মহামায়া কি বালগোপালের চেয়ে প্রতিবাৎসল্য রসের সন্তানভাবই প্রকট। তাঁর নিজের জননী আর বিশ্বজননীতে প্রভেদ রইল না। "স্বর্গ হতে মূর্তি ধরে মর্ত্যে আসে মা।" 'মাতৃস্তোত্রে' বললেন, তুমিই আমার জগন্মাতা। জন্ম জন্মান্তরের মা। রামপ্রসাদের উদ্দেশে বললেন—

"মায়েরে মা করে নিলে তুমিই প্রথম
ভক্তি আর শক্তি এক নহে ভিন্ন ভেদ।"

এক ভিখারিণী আসে—দাবী করে, ভিক্ষা তো নয় যেন পূজা নিতে আসে। এভাবে ভিক্ষা দিয়ে পূর্ণ তৃপ্তি এল। নিজের মনের কথা বললেন, ঠিক চণ্ডীতে যা আছে, শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলতেন। "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" "মেয়েরা আমার মা-র এক একটি রূপ।"

"কন্যা হোক সে যারই, মূর্তি মা গিরিজারই, সকল মেয়েই উমা কি গৌরী, সবাই ব্রহ্মময়ী।" সাধারণ কৃষকের মুখ দিয়ে তিনি 'ভক্তির যুক্তি' কবিতায় দুনিয়ার মালিকের মাতৃরূপের কথাই বললেন—

"জগৎ-জননী মা না হত যদি
দোপাটি পেত কি ফোঁটা
গোলাপ পেত কি রাঙা চেলি তার,
কদলী গরদ গোটা?"

কবি কৃষককে হাত ধরে বললেন, "তোমার এই মাঠই ধর্মক্ষেত্র, নীরবে হেথায় তুমিই করেছ বুকের চণ্ডীপাঠ।"

"তুমি ভক্তির গরদ পরেছ,
তোমারে প্রণাম কোটি
পাতা খেয়ে খেয়ে ভোঁতা মুখ মোর
এখনো বাঁধছি গুটি।"

এ হচ্ছে ভক্তের দৃষ্টিতে মা-চণ্ডীর নারায়ণী স্তুতির সহজ ব্যাখ্যা। জ্ঞান প্রকৃত হলে ঈশ্বরে অনুরাগ ভালবাসা হয়। ভালবাসা নেই, অনুরাগ নেই, সে মিছে জ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই বলেন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কুমুদরঞ্জনের কথা "ভক্তিকে করিয়া দিলে পূজা উপাচার"। প্রেমাভক্তিই বৈষ্ণব ও শাক্তের সাধন। তন্ত্রে কুণ্ডলিনী, ভাগবতে হ্লাদিনী এক। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি এই সব হয়, এরই নাম ভক্তিযোগ।

সমরেন্দ্রনারায়ণ বলছেন, ভক্তি ও প্রেমের আবীর ও কুঙ্কুমের হোলিখেলায় কুমুদ কবির হৃদকমলমঞ্চ লালে লাল। সেই কমলমঞ্চে দুলিতেছে শ্যাম ও শ্যামা। সমরেন্দ্রনারায়ণ ঠিকই বলেছেন, তিনি শক্তিতান্ত্রিক বা বৈষ্ণবতান্ত্রিক এই দ্বৈতমতের অবসান হল। ভক্তিতে এই সমন্বয়—

"হরি দোলরাসে পূত পূর্ণিমা, পূতা অমানিশি—
শ্যামার বর্ণে
শ্যামের আভায় নবঘন নীল, মাখা শ্যামরূপ
বিটপী-পর্ণে।
জোছনা নিশীথে শ্যামের বাঁশিতে উজান যাহার
বহায় বক্ষে
আঁধার রাশিতে শ্যামার হাসিতে ভীষণ মশান
প্রকটে চক্ষে।"

ভারতের সমন্বয়ের মহিমা ও মাধুর্য তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

"শ্যামের ভারত, শ্যামার ভারত
অসি বাঁশীর দেশ
মধুময় তার চরণরজা, মধুর পরিবেশ।
মোদের শ্যামা চামুণ্ডা নন,
তিনি তো নন ভীমা।
অন্নপূর্ণা তিনি যে তাঁর স্নেহের নাহি সীমা।
করেন নাকো কেবল তিনি দৈত্য দলনই,
'কমলে কামিনী' তিনি গণেশ জননী।

দশ হাতে দশ প্রহরণের রাখবো খবর কী
আমরা দেখি কেবল মায়ের হাতের ঝিনুকই।
নন তো মহাদণ্ডধারী মোদের ভগবান,
অজেয় অগম্য তিনি শুনেই কাঁপে প্রাণ।
আমরা করি ভক্তিভরে তাঁহার আরতি,
নন তো তিনি কংসারি কি পার্থসারথি।
মোদের ঠাকুর দয়াল ঠাকুর
প্রেমের ঠাকুর তিনি
বাঁশী বাজান, পায়ে বাজে নূপুর রিনিঝিনি।"

রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়াও বামাক্ষেপারও সন্তানভাব; মা মা বলা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে—মুগ্ধও করে। বাংলায় ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই বিশিষ্ট অবদান সব স্মরণ করলেন 'বাঙ্গালী' কবিতায়—

"বাঙ্গালী ঘটালো অঘটন দুনিয়ায়
অদল বদল পূজারী ও দেবতায়।
সোনার বাংলা ঘেরা মহাপীঠ দিয়ে
বেড়েছে বাঙ্গালী সতীর স্তন্য পিয়ে
সব সাধনায় করেছে সিদ্ধিলাভ।
হেরেছে কমলে কামিনী আবির্ভাব।
বাঙ্গালী প্রেমিক রসের ব্যবসা করে,
গৌর করেছে সেই শ্যামসুন্দরে।"

'মায়ের সোহাগে' তাঁর জীবন পূর্ণ করে দেখলেন—

"মায়ের সোহাগে সহনীয় হল তীব্র অনেক
যন্ত্রণাই
সব ধূলা মার চরণ-ধূলা যে—ধূসর হয়েছি
তাই দেখে
সবাই আপন, সবেই তৃপ্তি—সদা তাঁর সাড়া
পাই ডেকে
ফুল চেয়ে বেশী কাঁটা পেয়ে থাকি
কাহারও উপর নাইকো রাগ
সুবোধ বালক 'গোপাল' ছিলাম
'বেণী' করিয়াছে মার সোহাগ,
ক্ষীর কই কই মিঠাই কোথায়?
জোগাইতে হয় আজ তাঁরে
জগৎ-জননী ঝালাপালা হল
অকৃতী সুতের আবদারে।"

বাৎসল্য রস আগেও পরিচিত ছিল, কিন্তু প্রতি-বাৎসল্য রসে সন্তানভাবে বিশ্বজননীর সাধনায় তিনি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপার উত্তরাধিকারী।

বন্যার সময় দেখতেন মায়ের ভয়ঙ্করী যা শুভঙ্করীও। বন্যার সময় ডায়রীতে লিখছেন, "রাগ হয় মা কমলে কামিনীর উপর।" এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণের মায়ের সঙ্গে ঝগড়া। কোন দিন লিখছেন, "চারিদিকে জল, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা। / শুভ তবু শুভ মঙ্গলময় সব দিকে।" কোন দিন "তোমার অভয় বাণী শুনি বারংবার রাজরাজেশ্বরী মা আমার"। দীনবন্ধু মাতৃরূপে আশ্বাস দেন। 'কেমন আছি' কবিতায় তাঁর এই পাওয়ার বর্ণনা—

"কাঁপে আমার পর্ণ প্রাসাদ—বৃষ্টি পড়ে
ঝড়ও বহে,
ডাকি কোথায় হে জগদীশ, নিরাশ্রয়ের
আশ্রয় হে।
যে ডাক তাঁহার কর্ণে পশে, সন্দেহ মোর
নাইকো কোনো—
পাই গরুড়ের পাখার বাতাস—ঘোরে
যেন সুদর্শনও
পঙ্কজের এ পঙ্ক গৃহে—রাতে মরি দিনে বাঁচি
আমার মা আনন্দময়ী—দুখেই পরম
সুখে আছি।"

"মা আমাদের দয়াময়ী, মা আমাদের সর্বনাশী" বললেন, 'শাক্ত' কবিতায়। সর্বনাশী পঞ্চক্লেশ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও মৃত্যুভয়নাশিনী। "মা যে কমল কামিনী গো অপার, ভব সিন্ধু বুকে।" 'রামপ্রসাদে' বললেন, "মায়েরে মা করি নিলে

তুমিই প্রথম, চিনাইলে অন্নপূর্ণা ধাত্রী জগতের।

'অবেলায়' ও 'কি পেয়েছি' দুটি কবিতায় কুমুদ-রঞ্জন তাঁর জীবনের নিবিড় ভগবদুপলব্ধির কথা বলতে চেয়েছেন, কিন্তু যা অনির্বচনীয়—যাঁকে কথায় বলে শেষ করা যায় না, সেখানে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শুধু ইঙ্গিত করে গিয়েছেন।

"ভেলকি মায়ের অবোধগম্য
কতক বুঝেছি আঘাত পেয়ে
বড়ই সদয়া বড়ই চতুরা
সত্য সে বাজিকরের মেয়ে।
সে জানায় যারে সেই জানে শুধু
আজ আমি ভাবি অবাক হয়ে
ঘর করিয়াছি এতদিন এই
রহস্যময়ী জননী লয়ে।
গোপন করার ভঙ্গি কতই—ধরিবার কার
সাধ্য আছে ?
তাঁর তারে বাঁধা স্বতঃস্ফূর্ত
জীবন্ত সব পুতুল নাচে
ভেলকির কিছু শিখিতে পারিনি
বিশ্বাস রাজে হৃদয় ছেয়ে
আমি ছেলে দশ মহাবিদ্যার—
মা আমার বাজিকরের মেয়ে।"

বামাক্ষেপা মা মা বলে সিদ্ধিলাভ করেন, মাকে বাজিকরের মেয়ে বলেই সম্বোধন করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন যে, আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে বাজির খেলা দেখা যায়। কুমুদরঞ্জনে বারে বারে এই বাজিকরের মেয়ের কাণ্ড-কারখানায় বিস্ময়ের প্রকাশ। তিনিই বিস্ময়। 'ও গো বিস্ময়, হে অনির্বচনীয়', সবই রহস্যময়—ভগবান যেমন কৃপণ আবার তিনি তেমনি দানী। এ বিরাট ব্যাপার দেখে সন্ধানী কেঁদেই আকুল। কবির আকাঙ্ক্ষা—"যেচে এই জীবন ধরে পেলাম না তাঁর পা দুখানি।"

প্রায় পঁচিশ বছর পরে লেখা 'কি পেয়েছি' কবিতায় বলতে গেলেন তাঁর কথা, তাঁর কৃপার কথা, পাওয়ার কথা, উপলব্ধির কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ বলতে পারলেন না।

"আছে অনটন দুখ দারিদ্র্য
নহে তো বিশেষ কষ্টসহ—
মার খাই পরি, নিন্দাও করি,
হয়ে আছি মার গলগ্রহ।
পুলকিত হই দ্রবীভূত হই,
শুনিয়া কমলে কামিনী কথা—
পদ্ম হইয়া ফোটে চারিপাশে
আমার মনের প্রসন্নতা
জেনেছি না হলে ইচ্ছা মায়ের
জীর্ণ পাতাও পড়ে না ঝরি,
তিনি বিশ্বাস, তিনি নিশ্বাস—
তিনিই মা রাজরাজেশ্বরী।
সুবাসিত হয়ে ওঠে এ ভাল
কতদিন তাঁর অঙ্গবাসে
তাঁহার ভালের খণ্ড চন্দ্র
দেখেছি সহসা আঁধার নাশে।
দেখা দেন তিনি কথা কন তিনি—
তবে প্রতিপদে বিঘ্ন বাধা।
বাজিকরের যে কন্যা তা ঠিক—
ঘোরে সাথে শত গোলক ধাঁধা।
আমি টুনটুনি—সহসা কেমনে
গরুড়ের বল পাই এ বুকে
সব গ্রহ তারা সংবাদ লয়,
হাসে কাঁদে মোর দুঃখে সুখে।
দেখেছি কি তাঁরে ?   চিনেছি কি তাঁরে ?
পেয়েছি কি কৃপা ?
বলি যা জানি—
বলিতে পারিনে—মুখ চেপে ধরে
বাষ্প রুদ্ধ হতেছে বাণী।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই মুখ চেপে ধরার কথাই বলেন, "ওরে আমি তো মনে করি সব কথা

বলি, এতটুকুও লুকাবো না কিন্তু মা কিছুতে বলতে দিলে না—মুখ চেপে ধরলো।"

কবির ভাবের জগতের তন্ময়তার কথা বোঝা যায়। সাধনার স্তরের কথা, এ সম্বন্ধে শুধু সাধু যোগী ভক্ত জ্ঞানীরাই বলতে পারেন। তবে দেখা যাচ্ছে যে, ভগবানের স্বরূপ বা কৃপার উপলব্ধি কথায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে অসমর্থ হলেও তাঁকে আনন্দস্বরূপ বলে তিনি জানতে পারেন। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।" আনন্দময়ীকে মা বলে জানতে পারেন, তাই নিরানন্দ ছিল না, তাই ভয় ছিল না। পুরুষোত্তমই পরমানন্দরূপও। যাঁর ইতি নেই, তাঁর কথা বলে কি শেষ করা যায়। কবি বলছেন—

"প্রকাশ করিতে চাই
অফুরন্তকে ফুরায়ে বলার সাধ্য আমার নাই।
যে রূপে আমার বুক ভরে ওঠে
না বলে কেমনে থাকি ?
যা বলেছি তাহা কোন কথা নহে
অনেক রয়েছে বাকী।
মুখে না বচন স্ফুরে
বাঁশরী কোল আগাইয়া ডাকে
ভুবন ভোলানো সুরে।'

জীবনের 'বিদায় বেলায়' তাঁর অনুভূতির বর্ণনা—

"কাটলো জীবন সুখে দুখে নয়কো নেহাৎ মন্দ
পান করেছি সহস্রদল পদ্ম মকরন্দ।
পেয়েছিলাম মায়ের কৃপায় অমৃতময় দৃষ্টি
দেখেছিলাম অভেদ আমি স্রষ্টা এবং সৃষ্টি।
ক্ষয়তু পূর্ণজন্ম—হে নীল লোহিত কান্ত।
যাত্রাপথটি কর আমার সুন্দর শিব শান্ত
বিরাম বিহীন ব্যাকুল স্বরে জপিয়াছি নাম গো
যজ্ঞ আমার সাঙ্গ এবার—
এবার আমি থামবো।"

এখানে দিবসনিশি জননীকে একান্তে ডাকার কথা। এই ডাকার কথা 'ডাকা' কবিতাতেও। যুগে যুগে জন্মে জন্মান্তরে ডেকেছেন। এই নামে যে তন্ময়তা আসে তাতে দ্বৈতজ্ঞান হারানোরই কথা—

"ও নাম স্মরণে ও নাম করণে
আমি হয়ে যাই পর
আমার বাঁশীতে সুর দেয় আসি স্বয়ং বংশীধর।
আমি গলে যাই আমি ডুবে যাই
আমি নিভে যাই, আমি উবে যাই
ক্ষীণ জলকণা মিলাইয়া যাই
অমৃতের সরোবরে।"

[ক্রমশঃ]

'জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'

শ্রীমতী মানসী বরাট

'কোথা কৃষ্ণ, কোথা বল, মোর প্রাণনাথ,'
রাধাভাবে প্রেমতনু বিবশ বিভোর।
মন্দির-দুয়ারে দ্বারী, ধরি দুটি হাত
কৃষ্ণ-বিরহে কাঁদে গৌর কিশোর।
স্তম্ভিত বিস্মিত দ্বারী,
এ কে এ চিত্তহারী—
বিরহ-ব্যাকুল, করে আকুল ক্রন্দন,
ধীরে কহে এসো সাথে—
দেখাইব প্রাণনাথে—
হেথা আছে তব প্রাণ ব্রজের নন্দন।
ঢল ঢল ভাবতনু, টল মল পায়
আস্বাদিতে রাধাপ্রেম চলে শ্যামরায়।
গরুড়স্তম্ভে রাখি হাত—
প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভু দেখে জগন্নাথ।
জগতের নাথ ঐ মুরলীবদন
পুলক রোমাঞ্চে ভরে তনু-প্রাণ-মন।
গৌরবেশে রাধানাথে ভরিয়া পরাণ
আপনা আপনি দেখে কৃষ্ণ ভগবান।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ঃ মূর্তিমান সন্ন্যাস

স্বামী সর্বদেবানন্দ

শ্রীচৈতন্য অবতারে সন্ন্যাস-গ্রহণের মৌন-গম্ভীর লীলাস্থল কাটোয়া। পাবনী গঙ্গার পশ্চিম তীর ঐ কাটোয়াতে শ্রীমৎ স্বামী কেশবানন্দ ভারতীজীর আশ্রম। পূর্বকূল নবদ্বীপ হইতে নিমাই রাত্রির গভীরে পারাপারের নৌকা না পাইয়া বৈরাগ্যের তীব্র আবেশে সন্তরণ পূর্বক ভারতীজীর আশ্রমে উপস্থিত! তখন ভোর হয় হয়। শ্রীমৎ কেশব ভারতীজী ধ্যানমগ্ন। ভোরের আকাশে উদীয়মান সূর্য যেন নিমাইয়ের অন্তরাকাশের চিৎসূর্যের উদ্বোধন ঘটাইতেছে—জগতের কল্যাণের জন্য। পাখীর কলকাকলী মুখরিত গঙ্গার তট, সন্ন্যাসীর তপোভূমিকে সাধনোন্মুখ করিয়া সবাইকে জাগাইয়া দিতেছে। আর্দ্র বসন, ব্যাকুল চোখে আকুলতা লইয়া নিমাই প্রণত হইয়াছেন ভারতী-চরণে! প্রার্থনা জানাইতেছেন—"হে স্বামিন্, মৃত্যুর কালাকাল নাই, আমার সংসার-পাশ কাটিয়া ভববন্ধন হইতে আমাকে মুক্ত করুন।" ভারতীজী নিমাইয়ের বৃদ্ধা জননী ও তরুণী ভার্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা স্মরণ করিয়া প্রথমে অসম্মত হইলেও, নিমাইয়ের সেই আর্তিতে স্থির থাকিতে পারিলেন না, মুণ্ডন ও আত্মশ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পাদন করিবার অনুমতি দান করিলেন। কিন্তু আজ যেন সকলেই বাধা দিতে চায়। ক্ষৌরকার মধুর কাছে মুণ্ডন প্রস্তাব দিতে, সেও অরাজী! আহা! সেখানেও কী অপূর্ব হৃদয়-বিদারী আকুতি—"ভাই, আমার প্রতি নির্দয় হইও না। আমি অতি দীন হীন, আমাকে দয়া কর।...আমাকে ভগবানের পথের পথিক করিয়া দাও।" মধুর মনেও সেই প্রভাতে নিমাই ক্ষণেকের মধ্যে বৈরাগ্যের আগুন জ্বালিয়া দিলেন—সংসারের অনিত্যতা, ত্যাগের মহিমা বর্ণনা করিয়া। মধু চোখের জলে মুণ্ডনকার্য সম্পাদন করিয়া ক্ষুরটিকে চিরকালের জন্য গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিলেন!

মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানে কাটোয়াবাসী বহু নরনারী সেদিন গঙ্গায় আসিতেছেন। গঙ্গাতীরস্থ ভারতীজীর আশ্রমে পুণ্যদর্শন নিমাই মুণ্ডিত মস্তকে অপেক্ষমান। নদীয়ার নিমাইকে অনেকেই চেনেন—স্ত্রী-পুরুষ-যুবক-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মাত্র চব্বিশ বৎসরের যুবক নিমাইকে মুণ্ডিত মস্তকে দেখিয়া চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রাণের নিমাইকে সন্ন্যাসদানরূপ এই হৃদয়-বিদারী কার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বারংবার ভারতীজীকে অনুরোধ করিতে থাকেন। ভারতীজী মৌন। বৈরাগ্যের প্রদীপ্ত তেজে নিমাই সমাগত কাটোয়াবাসী জনতাকে উদ্দেশ করিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন—"আমি বড় দুর্ভাগা। ভগবানের কৃপাকণা লাভে বঞ্চিত। আপনারা নির্দয় হইয়া তাঁহার চরণ-আশ্রয়ে বাধা জন্মাইবেন না; আপনাদের নিকট এই প্রার্থনা। সংসারে থাকিয়া আমার প্রাণধারণ অসম্ভব। যাহাতে এই দুঃখপূর্ণ সংসার-পাশ ছেদন করিয়া ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারি, আপনারা তাহার সহায় হউন।..." কাটোয়াবাসীরা তখন নিবৃত্ত হইলেন। নিমাই আজ বারংবার বৈরাগ্যের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতেছেন।

নবদ্বীপ হইতে নিমাইয়ের সন্ধান করিতে করিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রশেখর আচার্যসহ অন্যান্য ভক্তরা আসিয়া উপস্থিত—শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মূর্চ্ছাপ্রায় অবস্থার বর্ণনা দিয়া নিমাইকে ঘরে ফিরাইতে। কিন্তু নিমাইয়ের হৃদয় আজ ত্যাগের অসামান্য দ্যুতিতে উদ্ভাসিত—

তাই বড় কঠোর! চন্দ্রশেখরকে বলিলেন—"… সকলের নিকট আমি অপরাধী। কিন্তু, কি করিব! সাধ্য থাকিলে আমি আপনাদের কষ্ট দিতাম না। সংসারের বন্ধন, বিষয় সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হইলে, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে না পারিলে, আমার চিত্তে শান্তি হইবে না।… আপনারা আমায় জোর করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু বাড়ী ফিরিলে আমার প্রাণরক্ষা দায় হইবে।" বারবার করজোড়ে সন্ন্যাসের পথে বাধা না দিবার জন্য চোখের জলে প্রার্থনা জানাইলেন। ফলে চন্দ্রশেখরের মন দ্রবীভূত হইল। জগৎ এমনি করিয়াই পরীক্ষা করে—সকলেই সংসারে রাখিতে চায়। গর্ভধারিণী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের জল, নদীয়াবাসী ভক্তদের প্রেমের বাঁধন, ভারতীজীর পরীক্ষা, মধু ক্ষৌরকারের মুণ্ডনে অনিচ্ছা, কাটোয়াবাসীদের অশ্রু, চন্দ্রশেখর আচার্যের কাতর ডাক—সবকিছুকে অতিক্রম করিয়া নিমাই এখন ভারতীজীর আশ্রমে ভগবৎ তত্ত্বালোচনায় মগ্ন। অলক্ষ্য কোন সূত্র যেন নিমাইকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে নাম-রূপাতীত অখণ্ড কোন আনন্দ-রাজ্যে! ত্যাগ-বৈরাগ্যের এমন পবিত্র দৃশ্য সংসারে বাস্তবিকই বিরল।

চন্দ্রশেখর আচার্যের তত্ত্বাবধানে নিমাই চির-কালের জন্য পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া নিজের পিণ্ডও বিষ্ণুপাদপদ্মে দান করিলেন! ঐ অপূর্ব বৈরাগ্যময় পরিবেশ—গঙ্গাতীরে সমাগত সকলের হৃদয়কে বুঝি ক্ষণেকের জন্যও অনিত্যতা বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করিল।

যুগযুগ হইতে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা যে পবিত্র বিরজা অগ্নিতে তাঁহাদের সকল কিছু 'এষণা' ত্যাগ করিয়া নিজেদের 'জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্মা' বলিয়া সবকিছু আহুতি প্রদান করেন—ভারতীজীর আশ্রমে সমাগত সন্ন্যাসি-পরিবৃত হইয়া নিমাই সেই হোমাগ্নির সম্মুখে আসীন। গভীর রজনী—ধরিত্রীও ধ্যানমৌন—'ধ্যায়তীব পৃথিবী… !' সেই শান্ত ধ্যানস্তব্ধ পরিবেশে, গুরু কেশব ভারতীজীর মুখোচ্চারিত মন্ত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া নিমাইয়ের হৃদয়ে সেই জ্যোতিরও জ্যোতিঃকে মুহুর্মুহু যেন প্রকটিত করিতেছে! ক্রমে ক্রমে নিমাই বিরজা-অগ্নিতে দেহ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইহলোক-পরলোকের বাসনা ও সকল অজ্ঞানকে আহুতিদান পূর্বক ভস্মীভূত করিলেন। গুরু শিখা ছেদন করিয়া দিলেন। শিখা ও যজ্ঞসূত্র (ব্রাহ্মণত্বের অভিমানও) ভস্মীভূত হইল—জলন্ত পাবকের মতো শিখাসূত্রহীন তেজঃপুঞ্জকায় নবীন সন্ন্যাসীর প্রশান্ত গম্ভীর মূর্তি উপস্থিত সকল সাধুদের মনে বৈরাগ্যকে নূতন করিয়া প্রজ্জলিত করিল। ভারতীজী প্রেষ মন্ত্র, পরমহংস গায়ত্রী, মহাবাক্যাদি শ্রবণ করাইলেন—গৈরিক রঞ্জিত কৌপীন বহির্বাস ও দণ্ড-কমণ্ডলু দান করিলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণত শিষ্যের নূতন নামকরণ হইল। নবদ্বীপবাসী শচীনন্দন নিমাই মিশ্রের মৃত্যু হইল—আবির্ভাব হইল শুক-শঙ্করেরই অধুনাতন যুগকল্যাণকারী মূর্তির—আচার্য শঙ্কর প্রবর্তিত পুরী, গিরি, ভারতী প্রমুখ দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীজীর! ধন্য হইল কাটোয়া—তথা জগৎ-সংসার!

যথার্থ সন্ন্যাস কি—ভারতীজীর সম্মুখে সমাসীন নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণের এই দৃশ্যকে মনন-পটে আনিতে পারিলেই তাহা ঈষৎ উপলব্ধি হইবে। 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থের লেখক স্বামী সারদেশানন্দজী অপূর্ব ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন,—যাহা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সমগ্র জীবনব্যাপী বিলাপ, আর্তি ও চোখের জলের ব্যাখ্যাস্বরূপ। তিনি লিখিয়াছেন—"গুরুমুখে মহাবাক্য শ্রবণান্তর মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমাধিস্থ হইয়া

পড়িলেন—দেহ স্পন্দহীন নিথর। মনবুদ্ধি সম্পূর্ণ বিলয় হওয়ায় অন্তর্দশায় নির্বিকল্প সমাধিতে লীন! —(ইহাই সন্ন্যাসের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ।) কিছু পরে ধীরে ধীরে মন একটু নীচে নামিলে অর্ধবাহ্য-দশায় ভাবসমাধি হইল। তখন তাঁহার প্রিয়তম পরমাত্মা পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় বিগ্রহ সর্বব্যাপীরূপে সর্বত্র দর্শন করিয়া অদ্ভুত প্রেমভাবে বিহ্বল হইলেন। ক্রমে ক্রমে মন আরও নীচে নামিয়া আসিলে স্থূল জগতের জ্ঞান উদয় হওয়ায় নিমাই বাহ্যদশায় শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হইয়া মন আবার সমাধিতে লীন হইল,—অন্তর্দশা উপস্থিত হইল। এইরূপে তিনি কখনও অন্তর্দশা (নির্বিকল্প সমাধি), কখনও অর্ধবাহ্যদশা (ভাবসমাধি), আবার মধ্যে মধ্যে বাহ্যদশায় (স্থূল জগতের জ্ঞানে) অবস্থান করিতে লাগিলেন।" (পৃঃ ৫৭-৮)

ন্যাসী চৈতন্যদেব ভারতীজীকে প্রণামান্তে তাঁহার আশিস্ গ্রহণ করিয়া পরদিন উত্তরাখণ্ডের পথে যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি ব্রজধাম দর্শনে যাইবেন—সেই ইচ্ছাতেই বাহ্যদশায় ব্যাকুল হইয়া নবীন সন্ন্যাসী ছুটিয়া চলিয়াছেন! অপূর্ব বৈরাগ্যোজ্জ্বল সে দৃশ্য—মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যঞ্জনাময় সেই মন্ত্র :

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাম-
　　ধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
　　তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"
　　(ভাগবত, ১১।২৩।৫৭)

সুপ্রাচীন পরমাত্মনিষ্ঠ-সেবিত এই বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া মুকুন্দ-চরণসেবার দ্বারা আমিও সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করিব।

*

আমরা এতক্ষণ শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-দৃশ্যে যেন সাক্ষাৎ উপস্থিত ছিলাম। বিরজা অগ্নি-দৃপ্ত একটি অপূর্ব আলেখ্য! তাঁহার সমগ্র জীবনে এত অশ্রু, এত ভগবদ্‌বিরহের জ্বালাবোধ, এত হাহাকার—ভগবানের জন্য এমন ব্যাকুলতা অধ্যাত্ম জগতের এক বিরল দৃষ্টান্ত। দৃষ্টিকে একটু স্থির করিলেই আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই—ত্যাগের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ ভক্তির স্নিগ্ধ মাধুরী সহ কী অপূর্ব শোভাই না ধারণ করিয়াছে! বিরহ কেবল শূন্যতাই নয়—তাহা অন্তরকে সচ্চিদানন্দবোধে পূর্ণ করিয়া দেয়! তাঁহার জীবন যেন এই তত্ত্বেরই ব্যাখ্যা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

"বাহ্যে বিষজ্বালা হয়　　ভিতরে আনন্দময়
　　কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেম আস্বাদন　　তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
　　মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।"
　　(মধ্য. পৃঃ ৮৮)

এই তীব্র বিরহ—কোথা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ—সাধারণ জীবে সম্ভব নয়। শ্রীভগবান স্বয়ং দেহধারী—তাই তো ভগবদ্-ব্যাকুলতার এমন আত্যন্তিক প্রকাশ। জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ে সন্ন্যাসের আদর্শ কী অপূর্ব তেজোমণ্ডিত হয়, তাহা তাঁহার সন্ন্যাসোত্তর জীবনের অজস্র ঘটনাবলীর মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে স্মরণ করিলেই যথেষ্ট উপলব্ধি হইতে পারে। সন্ন্যাসের আদর্শ-সংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর জীবন-বৃত্তের প্রতিটি ঘটনাই জীবকে ত্যাগ-ব্রত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এক অপরূপ কৌশল,—প্রেম-ভক্তি ও ভগবদ্-ব্যাকুলতার নিদর্শন তো বটেই। উদাহরণ-স্বরূপ মাত্র কয়েকটি ঘটনার দিকেই আমাদের দৃষ্টিকে ফিরাইতে চাহিতেছি এখানে।

*

সন্ন্যাসীর জন্মস্থান ও আত্মীয়কুটুম্ব-সঙ্গ ত্যাগ, আহার-সংযম, তীব্র-ভগবদ্-ব্যাকুলতার চিত্র একই সাথে ফুটিয়া উঠিয়াছে বর্তমান দৃশ্যে।

মহাপ্রভু ছুটিয়া চলিয়াছেন সন্ন্যাসান্তে—যাহাকে দেখেন প্রশ্ন করেন—"কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ॥" (পৃঃ ৯২) পরনে কেবল "এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান" ! বন দেখে বৃন্দাবন ভাবেন, গঙ্গা দেখে যমুনা! এমনি ভাবে তিনদিন উন্মত্তের মতো ছুটিয়া চলিয়াছেন—নিত্যানন্দ ভুলাইয়া নবদ্বীপে আনিলেন। অদ্বৈত আচার্যের গৃহে ভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষার বিরাট ব্যবস্থা করিয়াছেন আচার্য, সন্ন্যাসী কিন্তু সচেতন, বলিলেন—

"…সন্ন্যাসীর ভক্ষণ নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারণ ॥
প্রভু কহে এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥"

সদা সচেতন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজ জীবনে আদর্শ স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে যেন সচেতন করিতেছেন। ভিক্ষাগ্রহণ তো হইল, ইহার পরেই কিন্তু—

"প্রেমে উৎকণ্ঠা প্রভুর নাহিক কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল।…
অশ্রু কম্প পুলক স্বেদ গদ্‌গদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন ॥…
জর্জর হইল প্রভু ভাবের প্রহারে।…
ভূমিতে পড়িলা শ্বাস নাহিক শরীরে।
(পৃঃ ২।৩।৯৪)

—সমাধিস্থ অবস্থা—শ্বাস বহিছে কি না বহিছে! এমন সন্ন্যাসিমূর্তি জগৎ কয়জন দেখিয়াছে! আবার গর্ভধারিণীর নিকট হইতে বিদায় লওয়ার জন্যও কী অপূর্ব আকুতি—

"সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ॥" (পৃঃ ৯৬)

আর একদিন চলিয়াছেন যমেশ্বর টোটার পথে। ভাবে বিহ্বল—বাহ্য চেতনা নাই। জঙ্গলের পথ—কণ্টকাকীর্ণ!—তিনি ভাবের আবেশে চলিয়াছেন! এমন সময়ে দূরে গীতগোবিন্দের পদাবলী অত্যন্ত স্বর-মান-তালে গীত হইতেছিল—সেই ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে তিনি আর নিজেকে স্থির রাখিতে পারিলেন না!

'দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী-পুরুষ কে গায় না জানি বিশেষ ॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইল…
অঙ্গে কাঁটা লাগিল কিছু না জানিল।
আস্তে ব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পিছেতে ধাইল ॥"

—গোবিন্দ চিৎকার করিয়া বলিলেন—'স্ত্রী গায়'! তখন সম্বিৎ আসিল। শ্রীচৈতন্য বলিয়া উঠিলেন—

"…গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥
এ-ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।—"

ভাবের আবেশে দেহজ্ঞান নাই—তথাপি চেতনা আসামাত্র কী অসাধারণ সংযম, ত্যাগ! এই সন্ন্যাসমূর্তিই আমাদের ইষ্ট—আরাধ্য

পুরীধামে শ্রীমন্দিরে। এক উড়িষ্যাবাসী মহিলা জগন্নাথ দর্শনের জন্য ব্যাকুলা। মহাপ্রভু গরুড়-স্তম্ভে হস্ত রাখিয়া স্থাণুর মতো দণ্ডায়মান—ঐ মহিলা দর্শনাকুল হৃদয়ে মহাপ্রভুর স্কন্ধেই পা দিয়া জগন্নাথদর্শনে তন্ময়। মহাপ্রভু এতক্ষণ আবিষ্ট ছিলেন, জগন্নাথ-ভাবে বাহ্য চেতনাহীন—সেবকদের চেতনা এতক্ষণে জাগ্রত হইল। চৈতন্যদেব সব দেখিয়া ঐ মহিলার ব্যাকুলতার প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"তোমার এত আর্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা গোবিন্দকে পরে তিনি বলেন—

"জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মন প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে ইহা নাহি জানে ॥
অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমার বা হয় ॥"

দেহাতীত ঐশী চেতনায় অবস্থিতির ফলে সন্ন্যাসীর আর এক মাধুর্যপূর্ণ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাণের

প্রাণ জগন্নাথ—তাঁহাতে আর্তির মহিমাই এখানে প্রকট করিলেন। নিরহঙ্কার ত্যাগী সন্ন্যাসীর উক্তি বড়ই হৃদয়স্পর্শী—"এত আর্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা"!

সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী—তাই কোনরূপ শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের অবকাশ সেখানে নাই। এই সুউচ্চ আদর্শ মহাপ্রভুর জীবনে নিত্যই দেখা যাইত। একদিকে তীব্র বিরহোন্মাদ অবস্থা, অপরদিকে কঠোর জীবন—অপূর্ব স্নিগ্ধ মাধুর্যে তাঁহার জীবনকে সুরভিত করিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

"নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রি নাহি নিদ্রা লব।
ভিত্তে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥" (২।২।৮৬)

একদিকে রোমকূপ হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে, পাগলের প্রায় ব্যাকুল, এই মুখ ঘষিয়া কান্না, অপর দিকে—

"কলার শরলাতে অতি ক্ষীণ কায়।
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা লাগে গায়॥"—

"দেখি সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়"—"জগদানন্দ এক সৃজিল উপায়।" জগদানন্দ প্রভুর কষ্ট ভাবিয়া শিমুল তুলার গদী করাইয়া গোবিন্দকে দিলেন। ইচ্ছা ইহার দ্বারা এই দেবশরীরের সুখবিধান। কিন্তু, "তুলী গাণ্ডু দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা"—গোবিন্দ প্রদত্ত গদী সরাইয়া দিয়া পূর্বের সেই শরলাতেই শয়ন করিলেন। সেবক স্বরূপও মহাপ্রভুকে অনুরোধ জানাইলেন জগদানন্দের মনোবাসনা পূরণ করিবার জন্য! কিন্তু—

"প্রভু কহেন খাট এক আনহ পাড়িতে
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আপনার খাট তুলী বালিশ মস্তক মুণ্ডন॥"

চৈতন্যদেব সন্ন্যাসীর এই কঠিন আদর্শ স্থাপন করিলেন। নরম গদী কোনমতেই অনুমোদন করিলেন না। কলার শুষ্কপত্র নখে চিরিয়া পাতলা করিয়া পুরাতন কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া সেই ওড়ন-পাড়নেই শয়নের ব্যবস্থা হইল। বর্তমান ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা একটু ভাল হইল বটে, কিন্তু তাহাও সহজে গ্রহণ করেন নাই—"অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে"। অনেক অনুনয়ের পর ঐ ওড়ন-পাড়ন ব্যবহার করিয়াছিলেন। [ক্রমশঃ]

রামকৃষ্ণ মিশন

আসাম হাঙ্গামাত্রাণ

আবেদন

সম্প্রতি আসামে নিদারুণ অশান্তির প্রভাবে বিপর্যস্ত অগণিত নরনারীর সেবার্থে রামকৃষ্ণ মিশন প্রাথমিক ত্রাণকার্য শুরু করেছে। এই সেবাকার্য ব্যাপকতর করার জন্য "শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন" নামাংকিত একাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফট অথবা মনিঅর্ডার পোঃ বেলুড় মঠ, জিলা হাওড়া-৭১১২০২ ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করি।

স্বামী বন্দনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

২৫ ফেব্রুআরি, ১৯৮৩
বেলুড় মঠ, হাওড়া

প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্তের প্রভাব

ডক্টর সীতানাথ গোস্বামী

[পূর্বানুবৃত্তি]

বেদান্ত ইহাই প্রতিষ্ঠিত করে যে, এক আত্মাই বহুরূপে প্রকাশিত হন। এই রূপগুলি যেহেতু অন্যান্য সকল রূপের ন্যায় কাল্পনিক, সুতরাং এক আত্মা বা ব্রহ্মই সত্য। ঘট, কলস, কুম্ভ এইরূপ বিভিন্ন নাম বলিলেও বস্তুটি ভিন্ন হয় না এবং একই দেবদত্ত রাজা, ভৃত্য, ভিক্ষুকবেশে মঞ্চে আবির্ভূত হইলেও ব্যক্তি ভিন্ন হইয়া যায় না। অনিত্য নাম-রূপের দ্বারা বস্তুর ভেদ কখনই সিদ্ধ হয় না। শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ইহা বলিয়া এক পরমাত্মারই বিবিধ স্বরূপের কথা বলিয়াছেন—'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (ঋক্ সং ১।১৬৪।৪৬), 'রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানঃ' (ঐ, ৩।৫৩।৮), 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' (ঐ, ৬।৪৭।১৮)। উপনিষদে অতি সরল ভাষায় এই অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে—

'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
(ক. উ. ২।২।৯)

পরবর্তী মন্ত্রটিতে 'অগ্নি' শব্দের স্থানে 'বায়ু' শব্দটিকে স্থাপিত করিয়া শ্রুতি এই একই তত্ত্বকে বিশেষ তাৎপর্য-সমন্বিত বলিয়া অভিপ্রায় করিয়াছেন।

পরমাত্মা তাঁহার মায়া বা অবিদ্যার দ্বারাই বহু দেবতারূপে প্রতিভাত হন, ইহা 'মায়াঃ কৃণ্বানঃ' ও 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ' এই উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের দ্বারা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। পরমাত্মা শুধু দেবতারূপে নয়, কিন্তু অসংখ্য মনুষ্য-পশু-কীট-পতঙ্গাদিরূপে এবং জড় ঘটপটাদিরূপে প্রতিভাত হন ঐ মায়ারই প্রভাবে। যাহা মায়া বা অবিদ্যার দ্বারা সমুদ্ভূত তাহাই মিথ্যা, কাল্পনিক। এইজন্য পণ্ডিতগণ মায়িক, আবিদ্যক স্বরূপের প্রতি বিশেষ আগ্রহ করেন না। তথাপি যতক্ষণ তত্ত্বদর্শন না হয় ততক্ষণ এই আবিদ্যক, অজ্ঞান জন্য স্বরূপের প্রতীতি অপরিহার্য। সূর্য সর্বত্র আলোকরশ্মির সম্পাত করিলেও, তাহা মৃৎপিণ্ডে প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু জলদর্পণাদিতেই হইয়া থাকে। সেইরূপ ব্রহ্ম সকল পদার্থে অর্থাৎ সকল অচেতনস্বরূপে ও চেতনস্বরূপে বিরাজমান থাকিলেও, দেবাদিশরীরে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি হয়। এইজন্যই আমরা দেবাদির উপাসনা করিয়া থাকি। এখানেও সকল দেবতা সমান হইলেও, ব্যক্তিগত রুচি প্রকৃতিকে অস্বীকার করা যায় না বলিয়া একজন এক দেবতার উপাসক, অন্য ব্যক্তি অন্য দেবতাকে ভজনা করেন। ইহার জন্য সাম্প্রদায়িক কলহ করা নিতান্তই মূঢ়তা। ভর্তৃহরি তাঁহার বৈরাগ্যশতকের শেষ ভাগে সকল দেবতারই একত্বের কথা বলিয়াও কোন স্বরূপের প্রতি প্রীতি বা ভক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—

মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে,
জনার্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
ন বস্তুভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে,
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে ॥ ৮৪ ॥

অনুরূপ অপর একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥

অদ্বৈতবাদ যেহেতু একটিই পরমতত্ত্বকে স্বীকার করে সেইজন্য সকল মতবাদে প্রতিপাদিত পরমতত্ত্ব বস্তুতঃ একই হইবে, এই বিষয়ে অদ্বৈতবাদের দৃঢ়

প্রত্যয় উৎপন্ন করিতে কোন অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় বিভিন্ন মত পোষণ করিলেও, কার্যতঃ তাঁহারা সকলে একই তত্ত্বের দিকে ধাবিত হইতেছেন—যেমন সকল জলধারা সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হয়। শিবমহিম্নঃস্তোত্রে পঠিত সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটির উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না।—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

উদ্ধৃত শ্লোকটিতে বিভিন্ন দর্শনসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই অপর একটি শ্লোকে সেই সেই সম্প্রদায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমুল্লেখপূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে—

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি
বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্তেতি
নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্মেতি
মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং
ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

এই আদর্শকে পুরোভাগে রাখিয়া বৈদান্তিক হিন্দু তাঁহাদের সাধনার জীবনে অগ্রসর হইলেও, কিছু গোঁড়া ব্যক্তি অবশ্যই আছেন, যাঁহারা নিজেদের বিচিত্র মনঃস্থিতির জন্য অবাঞ্ছিত অশান্তিকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। গোঁড়ামি থাকিলে ও তাহা মজ্জাগত হইলে, সেই ধার্মিক কুসংস্কার তাহার উন্নতির পথকে প্রচণ্ডভাবে বাধাহত করে। ঘণ্টাকর্ণ নামে এক শিবভক্ত শিবাতিরিক্ত হরি বা অন্য দেবতার স্তুতি শুনিয়া ফেলিবার আশঙ্কায় দুই কর্ণে দুইটি ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিত। যাহা হউক, শিব তাহার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া গোঁড়ামির কুসংস্কার দূর করার জন্য তাহার পূজা ও আরতির কালে সহসা হরিহর (অর্ধ ভাগ হরি, অর্ধ ভাগ হর) মূর্তিতে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, ভক্ত এখন শিব ও বিষ্ণুর মূলগত একত্ব বুঝিতে পারিবে। ঘণ্টাকর্ণ কিন্তু বুঝিল না, উপরন্তু সেই মূর্তির যে অর্ধভাগে বিষ্ণুর প্রকাশ ঘটিয়াছিল, সেই অর্ধভাগের নাসিকায় ও কর্ণে সে তুলা গুঁজিয়া দিল যাহাতে বিষ্ণু ধূপের সুগন্ধ ও ঘণ্টার শুভ ধ্বনি উপভোগ করিতে না পারেন। এই জাতীয় অত্যন্ত গোঁড়া ব্যক্তির মুক্তি নাই; কিন্তু ভারতের জনসাধারণ সর্বধর্মসমন্বয়ের সিদ্ধান্তটিকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছে এবং এতাদৃশ সিদ্ধান্তের প্রবক্তা আচার্য ভারতের সর্বত্র বহুল পরিমাণে সমাদৃত। প্রাচীন ভারতে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মের সহিত কোনও সম্পর্ক ঘটে নাই। এইজন্য তাহাদের উল্লেখও প্রাচীন শ্লোকে নাই। আল্লা যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন, ইহা প্রমাণিত করার জন্য মধ্যযুগে ভারতবর্ষে আল্লোপনিষদ্‌ও রচিত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তো রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সকল ধর্মের সত্যতা ও অভিন্নত্ব নিজের জীবনে আচরণ ও উপাসনার মাধ্যমে প্রমাণিত করিয়াছেন।

বেদান্ত বলে, ব্রহ্ম ব্যতীত সকল পদার্থই অনিত্য, সুতরাং এই জগতে আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় পদার্থ হইল একমাত্র ব্রহ্ম এবং অপর সকল পদার্থই পরিত্যাজ্য। ব্রহ্ম-ভিন্ন পদার্থের অর্থাৎ অনিত্য পদার্থের ত্যাগ করিয়া পরম পদার্থ পরমাত্মাকে যথার্থতঃ লাভ করা যায়। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্' (ঈ. উ. ১)। এই ত্যাগ বৃত্তিকেই সন্ন্যাসবৃত্তি বলা হয়। গৃহত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হয় না, কিন্তু গৃহে থাকিয়াও পুত্র-বিত্ত-যশ প্রভৃতির ত্যাগ করিলে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগের দ্বারা যথার্থ সন্ন্যাসী হওয়া যায়। এই

ত্যাগবৃত্তিকে ধীরে ধীরে উন্মেষিত করিতে হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন—'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' (মহানারায়ণ উ. ১০।৫)। যাজ্ঞিকগণ যে অগ্নিতে ঘৃতপুরোডাশাদি আহুতি দিয়া থাকেন, তাহাও ত্যাগবৃত্তিকে উন্মেষিত করার জন্য। এইজন্য যে কোন আহুতির পরেই যজমান বা যাগকর্তা বা যাগফল-ভোক্তা 'ন মম' এই ত্যাগমন্ত্রটি পাঠ করেন, অন্যথা আহুতি সম্পূর্ণ হয় না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ত্যাগী পুরুষই মহনীয় হইয়া উঠেন। রাষ্ট্রে, সমাজে এমনকি পরিবারে যিনি সর্বাধিক ত্যাগ করেন, তিনিই সর্বাধিক পূজ্য হইয়া থাকেন। বেদান্তী অবশ্যই 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্' নীতি পালন করেন, কারণ তিনি যাঁহাকে দান করেন তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানেই দান করেন। এইজন্য তাঁহার দান বস্তুতঃ দানযজ্ঞ বা পূজা বলিয়া উল্লিখিত হওয়ার যোগ্য। তিনি সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করেন বলিয়া সকলের প্রতি তাঁহার প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা স্বতঃ উৎসারিত।

ত্যাগবৃত্তিকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এক মহান্ জ্ঞানযজ্ঞের অনুশীলন করিয়া বেদান্তী পূর্ণতার পথে অগ্রসর হন। যে-ভোজনকে কেবলমাত্র শরীর-ইন্দ্রিয়ের পোষক একটি সাধারণ ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়, তাহা বেদান্তীর দৃষ্টিতে ভোজনমাত্র নহে, কিন্তু তাহা প্রমাণাগ্নিহোত্র হোম। ছান্দোগ্যোপনিষদে রহিয়াছে যে, ভোজনকালে প্রদত্ত প্রথম গ্রাসটি প্রাণরূপে অগ্নিতে আহুত হয়, দ্বিতীয়টি ব্যানে, অনন্তর ক্রমশঃ অপান-সমান-উদান নামক অগ্নিতে আহুতি দিয়া অগ্নিহোত্র সম্পন্ন করা হয়। "তদ্ যদ্ ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণস্তৃপ্যতি।" (ছা. উ. ৫।১৯।১)। অগ্নিহোত্রহোমের এই স্বরূপটি না জানিয়া কেবলমাত্র অগ্নিতে দুগ্ধাহুতি দিলে তাহা ভস্মে আহুতি দেওয়ার ন্যায় নিষ্ফল হয় এবং ইহা জানিলে এক অগ্নিহোত্রের দ্বারা সকলভূতে আহুতি দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়। (ছা. উ. ৫।২৪।১-২)।

যাহার প্রতি প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা থাকে, তাহার জন্য ত্যাগ করিতে কষ্ট হয় না, বরঞ্চ তাহার জন্য ত্যাগ করিয়া তৃপ্তিবোধ হয়। সর্বত্র ব্রহ্ম আছেন এইরূপ অনুভব করিলে সর্বত্র প্রীতি-ভালবাসা আসে, তখন আর্তপীড়িতের সেবা নিজের তাগিদে করিতে হয়, দরিদ্র মানুষের প্রতি ভালবাসা জন্মিলে তাহাকে নিজের মূল্যবান্ পদার্থ দান করিতে না পারিলে তৃপ্তি হয় না। সর্বত্র আত্মবোধের দ্বারা সর্বত্র নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার শিক্ষা আমরা জীবনে গ্রহণ করিয়াও এখন তাহাকে এক একটি অনুষ্ঠান মাত্রে পর্যবসিত করিয়া ফেলিয়াছি, ইহাই পরিতাপের বিষয়। নবান্নের সময়ে এখনও নূতন অন্ন কাককে ও গাভীকে দান করিয়া পরে খাইয়া থাকি, তর্পণের জল এখনও দেবর্ষি-পিতৃ-মানব প্রভৃতিকে দেওয়ার সহিত স্তম্ব পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়াই নিজে জলগ্রহণ করি, এখনও প্রাতঃকালে ভূমিতে পদার্পণ কালে মাতৃভূমিকে চিন্ময়ীজ্ঞানে প্রণাম করিয়া বলি—'বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে।'

সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন একদিনে আসে না ইহা ঠিকই, কিন্তু ইহার জন্য সতত সচেতন প্রয়াস আবশ্যক। এই কাজ আরম্ভ করিবার জন্য আমরা যে-কোন একটি উপাধি বা আধার বা প্রতীককে গ্রহণ করিতে পারি। রুচি অনুসারে, প্রবৃত্তি অনুসারে যে-কোন দেবতা, যে-কোন ব্যক্তি, যে-কোন বস্তুকে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু তাহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে না পারিলে, তাহা একটি নীরস অনুষ্ঠান বা নিষ্প্রাণ অভ্যাসে দাঁড়াইয়া যাইবে, তাহাতে ফল লাভের কোনও আশা নাই। আর অভ্যাসকে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার দ্বারা প্রাণবান্ করিতে পারিলে তাহাই কামধেনুরূপে পরিণত

হয়। প্রহ্লাদের একাগ্রতায় স্তম্ভে নরসিংহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বামাক্ষ্যাপা রামকৃষ্ণ প্রভৃতির যে বিগ্রহের মাধ্যমে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়াছিল, ইহা আমরা সকলেই জানি।

একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া সকলই অনিত্য হওয়ায় সুখদুঃখ অর্থাৎ বিষয়ভোগজনিত প্রীতি-পরিতাপও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। মহাভারতের বিশাল ঘটনাপরম্পরার বিশাল গ্রন্থে তাই সারসংকলন করিয়া চারটি শ্লোকে ভারতসাবিত্রী পাঠ করা হইয়াছে। তাহাতে বলা আছে যে, জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্র, অনন্তমাতাপিতৃসঙ্গ, হর্ষভয়ের চক্রাকার আবর্তন মূর্খব্যক্তিকে আবিষ্ট করে, পণ্ডিতজন তাহাতে বিচলিত হন না। ধর্মই একমাত্র সত্য, যেহেতু ধর্মই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) উভয়ের প্রদাতা। মোক্ষ ও বন্ধননাশ সমার্থক। জগতে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজমান, তিনি আনন্দস্বরূপ হইলেও, সুখস্বরূপ হইলেও, অসংসারী তথা অবিকারী হইলেও আমরা তাঁহাকে না জানিয়াই দুঃখে নিপতিত হই এবং নিজেকে বিষয়জন্য সুখদুঃখে সুখী দুঃখী, সংসারী, বিকারী, বিনাশী পদার্থ ভাবিয়া চিন্তায় অস্থির হইয়া বন্ধনে আবদ্ধ হই। ভারতসাবিত্রীর শ্লোকগুলি বলিতেছি—

মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
সংসারেষ্বনুভূতানি যান্তি যাস্যন্তি চাপরে॥
হর্ষস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥
ঊর্ধ্ববাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মাম্।
ধর্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥
ন জাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ধর্মং
জহ্যাজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ।
নিত্যো ধর্মঃ সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো
নিত্যো হেতুরস্য ত্বনিত্যঃ॥

মহাভারতের উপসংহারে উক্ত মহাভারতসার ভারতসাবিত্রীর নির্দেশে প্রতিক্ষণে জীবনে মূলতত্ত্বকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া অনিত্য অজ্ঞানজন্য পদার্থগুলি নিঃসার বোধে পরিত্যাগ করিয়া অথবা সর্বত্র এক নিত্যসিদ্ধ অনন্তানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভব করিয়া চলিতে হইবে, ইহাই বেদান্তের শিক্ষা। ইহার অনুসরণে প্রারম্ভেই ক্লেশ বোধ হয়, একটু অগ্রসর হইলে তাহা স্থিরলক্ষ্যে পূর্ণতার দিকে যাইবেই, যেহেতু আনন্দ সকলেরই অভীষ্ট। এই কল্যাণকর প্রয়াসে স্বল্প দূরত্ব অতিক্রম করিলেও মহাভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়। 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (গীতা ২।৪০)। এইরূপ কল্যাণকারী কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। তাহার জীবন সুন্দর হয়, অশন, বসন, ভূষণ প্রভৃতি সকল আচরণই আন্তর ঔজ্জ্বল্যে মধুময় হয়। পূর্ণ অন্তর লইয়া সকলের কল্যাণ কামনা করি, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মানন্দে প্রতিভাত হোক্, জগৎ মধুময় হোক্।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥
(ঋক্, সং ১।৯০।৬-৮)



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

'চৈতন্য-প্রসাদে মনে সব জাড্য গেল'

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ভাবে বিহ্বল হয়ে ছুটে চলেছেন পুরীতে 'দারু-ব্রহ্ম' জগন্নাথদেবের দর্শন মানসে। পুরীতে উপস্থিত হয়েই সোজা মন্দিরে গেলেন। মন্দিরে শ্রীমূর্তি স্পর্শ করে, ভাবে বাহ্য জ্ঞান হারিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। প্রহরীরা দূর থেকে দেখতে পেল, কে একজন সন্ন্যাসী ছুটে এসেই বেদীতে বিগ্রহ স্পর্শ করছে। অমনি তারা বেত হাতে নিয়ে হৈ হৈ করে এগিয়ে গেল। বেত্রাঘাতের জন্য প্রস্তুত। মন্দিরে ঠিক সেই সময় উপস্থিত ছিলেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতির সভাপণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম। তাঁর ইশারায় প্রহরীরা নিরস্ত হল। দিব্যকান্তি নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দেখে তিনি শ্রদ্ধান্বিত হলেন। তাঁর জ্ঞান ফেরার কোন লক্ষণ না দেখে বাসুদেব সার্বভৌম তাঁকে ধরাধরি করে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সঙ্গিগণ সহ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্দিরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মহাপ্রভুকে মন্দিরে না দেখতে পেয়ে তাঁরা অতিশয় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সবাই মিলে মহাপ্রভুকে খোঁজ করতে লাগলেন। পরে নবদ্বীপের অধিবাসী গোপীনাথ আচার্যের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। গোপীনাথের কাছে তাঁরা জানতে পারলেন, রাজপণ্ডিত সার্বভৌম জনৈক সংজ্ঞাহীন সন্ন্যাসীকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। নিত্যানন্দ সঙ্গীদের নিয়ে বাসুদেব সার্বভৌমের বাড়িতে দ্রুতগতিতে ছুটে চলে যান। গিয়ে দেখেন মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এসেছে এবং তিনি ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। উভয় উভয়কে দেখে আনন্দিত হলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে সেবার জন্য সার্বভৌমকে বারবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলেন, তিনি যদি অনুগ্রহ করে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তাঁর বাড়িতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি বাধিত হবেন। চৈতন্যদেব রাজী হলেন। সার্বভৌম পুত্রকে দিয়ে তাঁদের পুরীর সমুদ্রে স্নান এবং মন্দিরাদি দর্শনের সুন্দর ব্যবস্থা করলেন। সবাই মহা খুশি। পুরীতে চৈতন্যদেবের থাকবার জন্য তাঁর বাড়ির কাছে একটি নির্জন জায়গায় কুটিরের ব্যবস্থা করলেন।

ক্রমে সার্বভৌম জানতে পারলেন, নবীন সন্ন্যাসী তাঁর সম্পর্কে আত্মীয় নীলাম্বর চক্রবর্তীর নাতি। তখন চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর স্নেহের উদ্রেক হল। তিনি দুঃখিত হলেন বিধবা মা এবং তরুণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে এই যুবক বয়সে সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য। আরও দুঃখিত হলেন যখন শুনলেন ভারতীনামা সন্ন্যাসীর শিষ্য তিনি। কারণ তখন পুরীতে ভারতী নামধারী সন্ন্যাসীদের থেকে অন্য নামধারী সন্ন্যাসীদের গৌরব বেশি। সার্বভৌম শাস্ত্রে পণ্ডিত হলে কী হবে—বাহ্যিক সম্মান প্রতিপত্তির ঊর্ধ্বে যেতে

পারেননি। তাই তিনি চৈতন্যদেবকে বললেন, তাঁর মত হলে তিনি অধিক গৌরবশালী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর দ্বারা তাঁর পুনরায় সংস্কার করাবেন। কিন্তু চৈতন্যদেব বিনীতভাবে তাঁকে বললেন, 'তাঁর মতো মন্দ অধিকারীর পক্ষে এই-ই যথেষ্ট।' তাঁর কথা শুনে সার্বভৌম খুশি হলেন না, কিন্তু তাঁকে সে-সম্বন্ধে আর কিছু বললেন না। তিনি ভাবলেন—যুবক সন্ন্যাসী বেদান্তশাস্ত্রাদি কিছুই জানে না, শুধু ভাবে বিহ্বল হয়ে থাকে—এই রকমভাবে সন্ন্যাস জীবনযাপন করা যায় না। সার্বভৌম নিজে একজন বড় পণ্ডিত। তাঁর কাছে পুরীর ব্রহ্মচারি-সন্ন্যাসীরা বেদান্তশাস্ত্রাদি পড়েন। চৈতন্যদেবকে একজন সাধারণ সন্ন্যাসী ভেবে, তাঁর প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে সার্বভৌম বললেন: 'সন্ন্যাস ধর্ম ঠিক ঠিক পালন করা অতীব কঠিন, বিশেষতঃ তোমার মতো যুবকের পক্ষে। তুমি আমার কাছে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন কর, তাহলে তোমার বুদ্ধি মার্জিত হবে এবং যথার্থ সন্ন্যাসীর জীবনযাপনে সক্ষম হবে। আমি তোমাকে অতিশয় যত্ন করে সমগ্র বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করাব।' চৈতন্যদেব বিনীতভাবে উত্তর দিলেন: 'আপনি আমার পরম হিতৈষী অভিভাবক, রক্ষাকর্তা আশ্রয়দাতা—আপনার আদেশ আমি যথাসাধ্য পালন করব

সার্বভৌম চৈতন্যদেবকে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে শুরু করেন। তিনি শাঙ্করভাষ্য সহ ব্যাসের ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। চৈতন্যদেব মনোযোগ দিয়ে তাঁর পড়ানো শুনতে লাগলেন। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সার্বভৌম সগুণ ব্রহ্মবাদ, ভক্তি-উপাসনা প্রভৃতি খণ্ডন করে একমাত্র নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়—এই তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। এবং আরও বললেন, এই ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনেরই মাত্র প্রয়োজন। প্রেম-ভক্তির অবতার মহাপ্রভু ভগবদুপাসনার বিরোধী যুক্তিতর্ক শুনে হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পেলেন। তবু তিনি নীরবে শুনে যেতে লাগলেন সার্বভৌমের ব্যাখ্যা। সাতদিন পড়ানোর মধ্যে চৈতন্যদেবকে কোন প্রশ্ন করতে না দেখে, সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর না কেন? কিছুই কি বুঝতে পার না?' চৈতন্যদেব গম্ভীর হয়ে বললেন: 'সূত্রভাষ্য বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যাতে সব গোলমাল হয়ে যায়। আপনার ব্যাখ্যা ঠিক ঠিক মনে লাগে না।' রাজসভা তথা ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের মুখের উপর এই রকম স্পর্ধা করে কেউ কথা বলতে পারে, তাঁর কল্পনায়ও ছিল না। নবীন সন্ন্যাসীর এই ধৃষ্টতার জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন: 'আমি সূত্র বোঝাবার জন্য ব্যাখ্যা করছি, আর তুমি বলছ—আমার ব্যাখ্যায় সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! সূত্রভাষ্য কি বুঝেছ, বল দেখি?'

চৈতন্যদেব সাবলীল ভাষায় সহজ সরল করে সূত্রভাষ্যের অর্থ সকল বলতে লাগলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করার জন্য শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি হতে উদ্ধৃতি দিয়ে চৈতন্যদেবের ব্যাখ্যা খণ্ডন করার চেষ্টা করতে লাগলেন। চৈতন্যদেবও শ্রুতি-স্মৃতি প্রমাণ সহ সার্বভৌমের যুক্তিতর্ক শান্তভাবে সরল ভাষায় খণ্ডন করতে লাগলেন। পণ্ডিতের বিচার-বিতণ্ডা চৈতন্যদেবের যুক্তিতর্কের কাছে তৃণের ন্যায় ভেসে যেতে লাগল। বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতকে তিনি সুস্পষ্টই বোঝাতে পেরেছিলেন যে, শঙ্করের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় তত্ত্বই সমর্থিত। সাধারণ অধিকারীর জন্য ভজন-উপাসনাদিও শাস্ত্র-অনুমোদিত। অতএব ভক্তি-উপাসনার পথও বেদান্ত-নির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী। তাকে নিরর্থক বলা চলে না। বেদান্তে জ্ঞান

ও ভক্তি উভয় পথেরই উপদেশ আছে, অধিকারী-ভেদে। চৈতন্যদেবের অপরিসীম পাণ্ডিত্য ও অপরোক্ষানুভূতির পরিচয় পেয়ে সার্বভৌম বিস্মিত হলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ও যুক্তি-মীমাংসা হৃদয়ঙ্গম করে সার্বভৌম ভাবতে লাগলেন—এ নবীন সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই তত্ত্ববস্তু করতলের আমলকীর মতো অপরোক্ষ অনুভব করেছেন। তাই তাঁর কথা এমন সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী। ধীরে ধীরে পাণ্ডিত্যাভিমানী সার্বভৌমের শুষ্ক জ্ঞানাভিমান দূর হল এবং তিনি অতি মনোযোগ দিয়ে চৈতন্যদেবের শাঙ্করভাষ্যের মর্মানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের অর্থ-ব্যাখ্যা শ্রবণ করলেন।

মহাপ্রভুর প্রেমভক্তিপূর্ণ সরস ব্যাখ্যায় সার্বভৌমের শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তিরস সঞ্চারিত হল। তাঁর বিদ্যার অহঙ্কাররূপ মনের মলিনতা দূর হয়ে গেল। হঠাৎ তিনি যেন এক দিব্যদর্শন লাভ করলেন—অনুভব করলেন, তাঁর সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপ পরিগ্রহ করে আবির্ভূত হয়েছেন স্বয়ং শ্রীভগবান, যিনি শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণরূপে পূর্বে পূর্বে দেহধারী হয়েছিলেন। ধর্মের গ্লানি দূর করবার জন্য এবারও সেই তিনি গৌরবর্ণে গৈরিক বসনে, মুণ্ডিত মস্তকে ধরাধামে এসেছেন। এই অনুভবে তিনি অশ্রুজলে ভাসতে লাগলেন এবং বারবার আবির্ভূত ভগবানকে প্রণাম করতে লাগলেন। ভক্তিতে গদগদ হয়ে ষড়ভুজধারী ভগবানকে স্তুতি করতে লাগলেন পাণ্ডিত্যাভিমান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে চিরদিনের মতো মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন। তর্কনিষ্ঠ সার্বভৌম শ্রীচৈতন্য-কৃপায় মহান ভগবদ্ভক্তে রূপান্তরিত হলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার তাই লিখেছেন, 'চৈতন্য-প্রসাদে মনে সব জাড্য গেল।'

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

'তিনিই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি'

…বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের সঙ্গে তাঁহার জয়রামবাটী দর্শনের বিষয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

"…বৈকালে…জয়রামবাটী গিয়ে পৌঁছলুম। …আমরা মার কাছে যেতেই মা তো খুব খুশী। তার আগে তো মার এমন দর্শন হয়নি। এই ঠিক ঠিক মার দর্শন হল। তখন মা এতখানি ওড়না দিয়ে থাকতেন। কেউ মার মুখ দেখতে পেত না। সে কি আজকালের কথা? তখন বোধ হয় আলমবাজারে মঠ। ঠাকুরের শরীর যাবার চার-পাঁচ বছর পর ১৮৯১।৯২ সাল হবে। সেই মা আমাদের সঙ্গে প্রথম কথা কইলেন। মা সেইবারেই আমাদের বলেছিলেন, 'বাবা, পুরুষ আর কে আছে? একমাত্র তিনিই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি।'

"জয়রামবাটীতে মার কাছে কয় দিন খুব আনন্দেই কেটেছিল। একদিন আমাদের ইচ্ছা হল, আমরা স্বহস্তে রেঁধে মাকে খাওয়াব, মা শুনে প্রথমে কিন্তু রাজী হননি। বললেন, 'না বাবা, তোমরা পারবে না।' আমরা বললুম, 'হ্যাঁ মা, আমরা খুব পারব। ভাত, ডাল, তরকারি রেঁধে আপনাকে খাওয়াতে পারব।' আমাদের খুব আগ্রহ দেখে শেষে মা আর কিছু আপত্তি করলেন না। আমরাও ভাত, ডাল, তরকারি রেঁধে মাকে খাওয়ালুম।

"ওখানে কয়দিন থাকতে থাকতেই আমার খুব জর হল। খুব ক' দিন জরে ভুগলুম। আমার জর হওয়ায় মা তো ভেবে আকুল। একটু ভাল হয়েই আমরা কামারপুকুর এলুম ঠাকুরের

জন্মস্থান দেখতে। সেখানে এসেই আবার জ্বর, তখন সেখানে রামলাল দাদা ছিলেন।... ওখানের এক ডাক্তার আবার ফিবার মিক্সার করে দিলে, তাই খেয়ে সেরে উঠলুম। মা জয়রামবাটী থেকে মাগুর মাছ যোগাড় করে পাঠালেন। আমার জ্বর হয়েছে শুনে মা দেখতে আসতে চেয়েছিলেন, আমি বারণ করে পাঠালুম। ...কামারপুকুরে ঠাকুর ছেলেবেলা যাঁদের সঙ্গে খেলা করতেন, তাঁদের মধ্যে এক বুড়ির সঙ্গে আমার আলাপ হল। সে অনেক কথা বললে। বুড়ি বললে, 'ব্রজে গোপিনীদের সঙ্গে যেমন খেলা করেছিলেন সেই রকম; তারা দুধ দৈ প্রভৃতি আনত আর ঠাকুর তাই খেতেন, গান করতেন, আবার কত রকম অঙ্গভঙ্গি করতেন।' বুড়ি ঠাকুরের সম্বন্ধে এই রকম অনেক কথাই বলত···। সে সব কথা শুনে কি যে আনন্দ হত তা তোমাদের কি বলব।···"

['উদ্বোধন', কার্তিক ১৩৪৮-এ প্রকাশিত "স্বামী শিবানন্দের জয়রামবাটী যাত্রা" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।]

জ্ঞান-বিজ্ঞান

উদ্ভিদে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ

অধিকাংশ উদ্ভিদ্ উভলিঙ্গ—তাদের একই ফুলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জননেন্দ্রিয় থাকে। এই উদ্ভিদ্গুলিতে পরাগ (পুং) কিংবা বীজ (স্ত্রী) তৈরি হতে যে-পরিমাণ শক্তি প্রযুক্ত হয়, তারই কম-বেশির ওপরে লিঙ্গ-পরিবর্তন নির্ভর করে। জন্তুদের মতো পৃথক্ লিঙ্গ খুব অল্পসংখ্যক উদ্ভিদের থাকে। এদের একলিঙ্গ উদ্ভিদ্ বলে।

মনে হয়, পারিপার্শ্বিক কারণই উদ্ভিদের লিঙ্গ-পরিবর্তন ঘটায়; যেমন—আলোর তীব্রতা, মাটির সরসতা ও পুষ্টিকর খাদ্য-পরিমাণ, দিনের দৈর্ঘ্য, কোনও রকম আঘাত কিংবা ব্যাধি। এই কারণগুলির কোন কোনটি উদ্ভিদ্কে নিয়ে যায় পুরুষত্বের দিকে, কোন কোনটি বা নিয়ে যায় স্ত্রীত্বের দিকে। এটা খুবই স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেছে যে, বিরুদ্ধ পরিবেশে পুরুষত্বের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানীদের মতে পুরুষের আধিক্য হয় প্রতিকূল পরিবেশে এবং স্ত্রীজাতির প্রাধান্য দেখা যায় অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থায়।

উদ্ভিদ্-শরীরের হরমোন-ব্যবস্থা থেকেও অনুমিত হতে পারে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই লিঙ্গ-ভেদের কারণ। উদ্ভিদ্-শারীরবৃত্তিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, পরিবেশের পরিবর্তন তাদের শরীরের হরমোনের সমাবেশেও পরিবর্তন আনে এবং এক বিশেষ ধরনের হরমোনের দ্বারা উদ্ভিদের লিঙ্গের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

উদ্ভিদ্ যদি এক পরিবেশে পুরুষ এবং আর এক পরিবেশে স্ত্রী হতে পারে এবং যদি তাতে উদ্ভিদের সংজনন ক্ষমতা উন্নত হয়, তাহলে তা অবশ্যই প্রাকৃতিক মনোনয়নের পক্ষে সুবিধাজনক। এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, আর্দ্র পরিবেশ স্ত্রী-জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে বেশি হিতকারী। কারণ পরাগরেণু তৈরি করতে একটা পুরুষ-জাতীয় উদ্ভিদের যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় তার চেয়ে বেশী জলের প্রয়োজন হয়, একটা স্ত্রী-জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে বীজ তৈরি করতে।

[Science Information, INSA, April 1981-এ প্রকাশিত বিজ্ঞান-বার্তা থেকে সংগৃহীত]

দেশ-বিদেশ

অরুণাচলের অধিবাসী : অকা

কামেঙ জেলার বিভিন্ন গ্রামে অকা উপজাতিরা বাস করে। বর্তমানে তাদের ডিজুঙ্গানিয়া, জামিরি ও বুরাগাঁও তিনটি গ্রামে বসবাস করতে দেখা যায়। এই তিনটি গ্রাম শেরদুক্‌পেন উপজাতিরা যেখানে বাস করে তার ঠিক পূর্বে অবস্থিত। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর পাহাড় আছে। এই পাহাড়গুলির উচ্চতা ৯১ থেকে ১৮৩ মিটার পর্যন্ত। এখানে বহু ঝরনা আছে। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ঝরনা হল—বিচোম্‌, তেঙ্গাপানি ও খেয়াং। এই অঞ্চলে প্রচণ্ড শীত নেই এবং বৃষ্টিপাত হয় বছরে ৪০ থেকে ৫০ ইঞ্চির মধ্যে।

তিব্বত-বার্মার ভাষার সঙ্গে অকাদের ভাষার সাদৃশ্য আছে। তাদের দেখতে মঙ্গোলীয়ানদের মতো। গায়ের রঙ হলুদ। রৌদ্রে পোড়ার জন্য তাদের গায়ের রঙ হয়ে গেছে বাদামী রঙের। এই উপজাতির পুরুষদের সাধারণ উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং মেয়েদের ৫ ফুটের নিচে। অকারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত।

অকা ছেলেরা মোটা তুলোর এক খণ্ড কাপড় শরীরে জড়িয়ে কাঁধের উপর গিঁট দিয়ে বাঁধে। এটা লম্বা হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। কোমরে বাঁধে কুম্মারবুন্দ (উত্তরীয়)। ছেলেরা ও মেয়েরা হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত একটি কাপড়ের পটি বাঁধে বিষাক্ত পোকা 'ডিমডামে'র কামড়ের ভয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। ছেলেরা মাথার চুল লম্বা রাখে এবং মাথার উপর ঝুটির মতো একত্র বেঁধে রাখে। তারা সাধারণতঃ মাথায় টুপি পরে না, তবে বিশেষ উৎসবাদিতে পরে। এরা টুপিকে বলে 'মুসগেরা'। টুপির সম্মুখভাগ বাঁশ-পাতা বা মুরগীর পালক দিয়ে সুসজ্জিত করে। তারা সব সময় সঙ্গে রাখে তীর-ধনুক এবং ধারালো দা। আর থাকে অতি আবশ্যকীয় জিনিস পান, তামাক ও পাইপ। অকা মেয়েদের পোশাক ছেলেদের মতো। শুধু তফাত গায়ের কোটটি ছেলেদের থেকে লম্বা হয়। মেয়েরা চুল মাথার পিছনে বেঁধে রাখে। তারা রুপার তৈরি বিভিন্ন ধরনের অলংকার পরতে ভালবাসে।

অকারা বয়নশিল্পে পারদর্শী নয়। তারা রঙিন ব্যাগ ছাড়া আর কিছু বুনতে পারে না। কাপড়-চোপড়ের জন্য সমতল ভূমির অধিবাসীদের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। তারা নানা রকমের বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করতে পারে। কাঠের ফ্রেম ও পাইপের উপর সুন্দর নক্‌শা তৈরির কাজ তারা ভাল পারে।

অকারা বাড়ি তৈরি করে প্রায় ৬ ফুট উঁচু বাঁশ বা কাঠের খুঁটির উপর। নিচের খালি জায়গায় ছাগল শুয়োর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু রাখে। বাড়িতে সাধারণতঃ তিন-চারটি ঘর থাকে। প্রত্যেক ঘরে এক-একটি করে পরিবার থাকে। এই উপজাতিদের ছেলে-মেয়েদের বিবাহ হয় বাবা-মার সম্মতি অনুসারে।

শেরদুক্‌পেনদের মতো অকা উপজাতিদের সমাজব্যবস্থা গণতন্ত্রভিত্তিক। সমাজ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটি করে সভা আছে। এই সভার নাম 'মেল্লে'। বর্তমানে তারা এই সভাকে অসমীয়া শব্দ 'রাইজ' নামে অভিহিত করে। সভার সদস্যরা খোলা জায়গায় বাঁশের চেয়ার বা পাথরের টুকরার উপর বসে গ্রামের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে। সভাপতি 'গাঁও বুড়া'র মতো 'গিব্বা' নামে একজন আছেন, যিনি গ্রামের মানুষদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেন।

পূর্বে অকাদের মধ্যে দাসপ্রথার প্রচলন ছিল।

যারা খুব অবস্থাপন্ন তারা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে গরীবদের ধরে নিয়ে আসত। দাসদের বলা হত 'খুলা'। তবে ক্রীতদাসের মালিক তাদের সঙ্গে ব্যবহার করত বাড়ির একজন সদস্যের মতো। বর্তমানে আর এই দাসপ্রথা সেখানে নেই।

অকারা চাষ করে জোয়ার, রাঙা আলু, তামাক, লঙ্কা, ধান প্রভৃতি। তাদের প্রিয় জিনিস মাছ-ধরা এবং শিকার করা।

প্রতিবেশী উপজাতিরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে তাদের প্রভাব অকা উপজাতির উপর পড়া খুবই স্বাভাবিক। তবে বর্তমানে আসামের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাধুদের প্রভাব তাদের উপর খুব বেশি পড়েছে। তারা বিভিন্ন অপদেবতাকেও বিশ্বাস করে। 'সিকৃচি' নামে দেবতাকে তারা খুব শক্তিশালী বলে মনে করে। এ ছাড়াও 'তচারো' নামে দেবতাকে তারা মানে। তারা মনে করে, এই দেবতা পৃথিবীর শাসনকর্তা। এই দেবতার কাছে তারা মানুষের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করে। এপ্রিল-মে মাসে যখন ক্ষেতের ফসল ঘরে ওঠে, তখন তারা সাধারণতঃ উৎসবাদিতে মেতে ওঠে। মিথুন বলিদান দেওয়া হলে মহানন্দে উৎসব চলে দশদিন ধরে।

সমালোচনা

রণজয়ী শ্রীরামকৃষ্ণ — সন্তোষকুমার তালুকদার। প্রকাশিকা: মীরা তালুকদার, ২৯ নং মল্লিকপাড়া বাই লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী। অক্ষয় তৃতীয়া, ১২ই বৈশাখ ১৩৮৯। পৃঃ ১৬+২১২, মূল্য: কুড়ি টাকা।

সম্প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন বা বিচার করার আগ্রহের ফলে আকর্ষণীয় কয়েকটি গ্রন্থ পাচ্ছি। 'রণজয়ী শ্রীরামকৃষ্ণ' শ্রীরামকৃষ্ণে অনুরাগী লেখকের সেই আগ্রহের ফলশ্রুতি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মসাধনা সম্পর্কে কিছু কিছু বর্ণনা থাকলেও এ গ্রন্থটি তাঁর সাধন-সমরের ইতিবৃত্ত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সমকালের কয়েকজন বিশিষ্ট পুরুষের সংযোগ, তাঁদের সঙ্গে ভাব-ভাবনার সংঘাত, পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ প্রভাবে তাঁদের মানসিক পরিবর্তন এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

'রণজয়ী শ্রীরামকৃষ্ণ' সাতটি নিবন্ধে বিভক্ত। 'সংসার সমরে' সাধারণভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের পারিবারিক জীবনের পরিচয়—তিনি কী ভাবে আধ্যাত্মিক জগতের সংকট বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এই অংশে তার কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। বাকি ছটি নিবন্ধে উনিশ শতকের কয়েকজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সংযোগ-সংঘাত-সম্মেলনের বর্ণনা। 'ধর্ম সমন্বয়ে'—কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ-সম্পর্ক। 'সংশয়ের সমাধানে'—নরেন্দ্রনাথকে গ্রহণ ও তাঁর মধ্যে শক্তিসঞ্চার। 'পাষণ্ড দলনে'—গিরিশচন্দ্রের রূপান্তর। 'সাগর সন্ধানে', 'বঙ্কিম বাঁকে' যথাক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। 'বিজ্ঞান বিজয়ে'—ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের পরিবর্তন।

লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত মুখ্য কটি গ্রন্থ ছাড়াও অন্য কয়েকটি গ্রন্থ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। পরিশেষে একটি আকরগ্রন্থপঞ্জীও সন্নিবেশ করা হয়েছে। লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই।

গ্রন্থটির বিশেষ গুণ বর্ণনার সরসতা। সূচনায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন, "শ্রীতালুকদারের রচনাভঙ্গিটি নাটকীয় এবং এই নাটকীয়তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনকথাকে অনাস্বাদিত জীবনরসে সমৃদ্ধ

করেছে।" কোথাও কোথাও তরলায়িত হলেও নাটকীয় বর্ণনাভঙ্গির জন্য রচনা সাবলীল স্বচ্ছন্দ হয়েছে।

বহু তথ্য সংগৃহীত হলেও গ্রন্থনা বা পরিবেশনায় শিথিলতা দেখা যায়। কোন কোন বর্ণনায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রামাণ্য দুটি গ্রন্থ (লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত) থেকে পার্থক্য দেখা যায়। ঘটনাবিকৃতিও আছে। যেমন, বৈশাখের এক রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গরমের জন্য 'চোখের পাতা এক করতে পারেন না', 'রাতের অন্ধকারে পাপ প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে ফিরে যাবার পথে গিরিশ হাজির হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।' তখন বরানগরের 'ফাগুর দোকান থেকে কচুরি এনে গিরিশকে জলখাবার দেওয়া হয়েছে'; শ্রীরামকৃষ্ণ ('একে অসুস্থ, তার ওপর দাঁড়াবার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই') 'দিগম্বর হয়ে একান্ত বালকের মত এগিয়ে চলছেন ঘরের কোণের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিতে।' (পৃষ্ঠা ১৮১-৮৩)—বর্ণনার প্রথমাংশের ঐতিহাসিক যাথার্থ্য সন্দেহজনক; গিরিশকে কচুরি খাওয়ানো ও শ্রীরামকৃষ্ণের নিজে গড়িয়ে দেওয়া কাশীপুরের ঘটনা, দক্ষিণেশ্বরের নয়, [কথামৃত, ২।২৬।২]।—কল্পনার এই ধরনের স্বেচ্ছাচার গ্রন্থের স্বগত মর্যাদার পক্ষে হানিকর।

মুদ্রণাদির পারিপাট্য আকর্ষণীয়।

—ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

অমৃতের সন্ধানে: শ্রীমতী মায়ালতা জানা-সংকলিত। প্রকাশক: শ্রীস্বরূপকুমার জানা, কাঁথি, মেদিনীপুর। (১৩৮৯), পৃঃ ২৬২, মূল্য: ১৫'০০ টাকা।

দ্বাপরে যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়ে সনাতন বেদ-সত্যকে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকারে মানবের অশেষ কল্যাণের জন্য রেখে গেছেন, সেই তিনিই আবার ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ পরিগ্রহ করে 'সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ' হয়ে মানব হিতার্থে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত তাই ভগবদ্‌-গীতারই আধুনিক প্রাঞ্জল বোধিকা। উভয় শাস্ত্রই সমানভাবে সংসারতাপ-তপ্ত জীবকে শান্তির নির্ঝরিণীর সন্ধান দেয়।

সমালোচ্য 'অমৃতের সন্ধানে' পুস্তকে সংকলয়িত্রী উক্ত শাস্ত্রদ্বয়কে তাঁর একান্তই নিজস্ব অভিরুচি অনুযায়ী গ্রথিত করেছেন। যথোপযুক্ত মনন ও বিচার অভাবে শাস্ত্রমর্ম হৃদয়ঙ্গম অতি দুঃসাধ্য,—অন্যকে বুঝানো তো ততোধিক কঠিন প্রয়াস। বর্তমান সংকলন-মালিকাটি হয়তো পাঠককে এ-কথাটাই বার বার স্মরণ করাবে। তথাপি বলতে হবে যে, এই গ্রন্থ-মুদ্রণের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু উল্লিখিত ঐ শান্তি-নির্ঝরিণীর দুই এক বিন্দু আস্বাদন করে নিজে ধন্য হওয়া,—এবং অন্যকেও তা পরিবেশন করা। এদিক থেকে দেখলে, পুস্তক-প্রকাশের এই প্রয়াসকে আমরা সাধুবাদ না জানিয়ে পারি না। গীতা-কথামৃত পঠনে ও প্রচারে সংকলয়িত্রীর এই দুঃসাহসিক উদ্যমকে আমরা প্রশংসা করি।

—স্বামী ধ্যানেশানন্দ

পূজ্য-চরিতায়ন—কালীপদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক: নবদ্বীপ হিতৈষী পত্রিকা কার্যালয়, ১৬, সৈয়দ আমির আলি এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০১৭। (১৩৮২-৮৩), পৃষ্ঠা ১৫+২০৮, মূল্য: ষোল টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকায় সুধীরকুমার মিত্র লিখেছেন, "পূজ্য-চরিতায়ন কাব্য ভারতীয়-সাহিত্য-ক্ষেত্রে একাধারে দ্বিতীয় 'ভক্তমাল' এবং অন্তর্মুখীদৃষ্টিতে সাহিত্যের চিরন্তন রস-আত্মার রসোল্লাসের অনুভূতি-দীপন উপাখ্যানমঞ্জরী।" মন্তব্যটি যে যথার্থ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'পূজ্য-চরিতায়ন' কাব্য-গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হল এর

মধ্যে ইতিহাস-পুরাণ-কিংবদন্তীর অনবদ্য সম্মিলন ঘটেছে। গ্রন্থটির মধ্যে প্রবেশ করলে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের ভাবমণ্ডল বাস্তবিক পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। সংস্কৃত স্তোত্র-সাহিত্যের ধারার কলধ্বনিও কবিতাগুলিতে শোনা যায়। এখানেই গ্রন্থটির একটি প্রধান সার্থকতা।

গ্রন্থটিতে মোট চব্বিশটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি কবিতা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তবে প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই কোন না কোন প্রেমভক্তিমূলক কাহিনী বা আখ্যানকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। কবিতাগুলি চতুর্দশপদী—প্রথম স্তবক আট পঙ্‌ক্তির এবং দ্বিতীয় স্তবক ছয় পঙ্‌ক্তির। অধিকাংশ কবিতাতেই ছন্দ ভাবের অভিব্যক্তির পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের বিবরণকে কেন্দ্র করে নানা মত আছে। আধুনিককালে ঐ বিষয়ে বহু গবেষণাও হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান-লীলা' কবিতায় শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথ বিগ্রহে বিলীন হওয়ার কাহিনীকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। যুক্তির বিচারে বিষয়টি যেভাবেই আজকের মানুষ গ্রহণ করুক না কেন, লেখক যেভাবে শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানকাহিনীকে বর্ণনা করেছেন, তাতে বাস্তবিক কবিতাটির মধ্যে এক 'চিন্ময়তার লাবণ্য' ব্যঞ্জিত হয়েছে। লেখক বলেছেন, "শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান-লীলা পৃথিবীতে এমন একটি অলৌকিক ঘটনা যাহা জ্ঞানতত্ত্বে মর্মবোধেই আস্বাদনযোগ্য, বুদ্ধিতে নয়—বোধিপ্রজ্ঞায় দৃশ্য—পরমসত্য ঘটনা শ্রীশ্রীজগন্নাথবিগ্রহে বিলীন হওয়া।"

গ্রন্থটির কাগজ, ছাপা যথেষ্ট উচ্চমানের। তবে গ্রন্থটির মধ্যে কিছু ছাপার ভুল রয়েছে। লেখক সেকথা স্বীকার করে পরিশিষ্টে কিছু সংযোজন ও সংশোধন সূচী ও নির্দেশিকা দিয়েছেন। 'সৎপ্রসঙ্গের লেখমালা' এই গ্রন্থটি ভক্ত পাঠক-পাঠিকার কাছে নিশ্চয়ই আদরণীয় হবে।

—ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে:

সৌরাষ্ট্রে ঘূর্ণিবাত্যা (নভেম্বর: ১৯৮২): সৌরাষ্ট্রের (গুজরাট) অন্তর্গত ভবনগর ও আম্রেলী জেলায় প্রাথমিক ত্রাণকার্য অব্যাহত। রাজকোট মঠকেন্দ্র কর্তৃক গত ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ হইতে ২২ ফেব্রুআরি ১৯৮৩ পর্যন্ত ৪৫টি গ্রামের ২,৮০৯টি পরিবারের মধ্যে পশমী কম্বল, শাড়ী, কাপড়, জামা, চাদর, ব্লাউজ ইত্যাদি এবং বজরা, গম, চাউল, ডাইল, চা, চিনি, গুড়, থালা, বাটি প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্যাদি বিতরিত হয়।

আসামে হাঙ্গামাত্রাণ: সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে নরনারীর মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্য শুরু হইয়াছে।

বাংলাদেশে: ঢাকা, দিনাজপুর ও বাগের-হাট কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও দুগ্ধবিতরণাদি সেবাকার্য যথারীতি চলিতেছে।

পল্লীমঙ্গল

চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির: গত ৭ হইতে ১৩ ফেব্রুআরি, ১৯৮৩ পর্যন্ত সাতদিনের জন্য একটি দাতব্য চক্ষু-অস্ত্রোপচার শিবির কামারপুকুর মঠকেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত হয়। জয়রামবাটী, কামারপুকুর ও বালি-দেওয়ানগঞ্জে গত ২১, ২২ ও ২৩ জানুআরি অনুষ্ঠিত চক্ষু-চিকিৎসা-শিবিরে পরীক্ষিত ৪২০ জন রোগীর মধ্যে ৪৬ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। সকল রোগীকে এক সপ্তাহ কাল শিবিরের তত্ত্বাবধানে সেবা-শুশ্রূষাদির জন্য রাখা হয়। চিকিৎসিত রোগীদের বিনা মূল্যে চশমাও দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত গত ৯ হইতে ১১ ফেব্রুআরি, ১৯৮৩ পর্যন্ত কামারপুকুর এবং জয়রামবাটীর আরও ১৫৭ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষান্তে যথাপ্রয়োজন চিকিৎসা-ব্যবস্থাদিও করা হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

হুগলী জেলার বালি-দেওয়ানগঞ্জে পল্লী-মঙ্গলের উদ্যোগে গত ১৫ হইতে ১৯ ফেব্রুআরি, ১৯৮৩, পাঁচদিনব্যাপী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পল্লী-অঞ্চলের ৭৯৯ জন যুবক-যুবতী সদস্য—উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

গত ২৯ হইতে ৩১ জানুআরি, ১৯৮৩ পর্যন্ত **বোম্বাই** মঠকেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত যুবসম্মেলন ৫৯০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১৩ ফেব্রুআরি ১৯৮৩, **নাগপুর** মঠকেন্দ্র পরিচালিত যুবসম্মেলন প্রায় ২৮৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে দুইটি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়।

গত ২০ ফেব্রুআরি ১৯৮৩, **এলাহাবাদ** মঠকেন্দ্র পরিচালিত যুবসম্মেলনে প্রায় ৩৬৫ জন সদস্য যোগদান করেন।

কলিকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্স্টিট্যুট অব্ কালচারের উদ্যোগে গত ২৬ ও ২৭ ফেব্রুআরি, ১৯৮৩, প্রত্যহ তিনটি করিয়া অধিবেশনে দুই দিনের যুবসম্মেলন রবীন্দ্রসরোবর মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন সঙ্ঘগুরু শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা হইতে আগত প্রায় তিন

হাজার সদস্য উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত কিছু বিশিষ্ট অতিথি এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী ও সারদা মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসিনীরা উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

উদ্বোধন-সংবাদ

সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী অজজানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন।

।য সংবাদ

উৎসব

নব বারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে গত ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮২, শনিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্ণে মঙ্গলারতি, স্তব, প্রার্থনা, ভজন ও বিশেষ পূজার পর উপস্থিত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠের পর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী অনন্যানন্দ এবং ভাষণ দান করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু-উৎসবের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী (৭৫ বৎসর) ৩৮ নং বিডন স্ট্রীটস্থ **নাগ ভবনে** ১ হইতে ৩ জানুআরি পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ১ জানুআরি ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঠাকুরের ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও ঐ সম্বন্ধীয় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন শ্রীমতী শান্তি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীকল্যাণ চৌধুরী ও সম্প্রদায়। বিকালের ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীদেবেশ দাস। শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত ও শ্রীমুরারিমোহন কাব্যবেদান্তাদিতীর্থ, ফাদার ইমানুয়েল, ডঃ শশাঙ্ক-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন প্রমুখ বক্তাগণ কল্পতরু-উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আলোচনার পূর্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের অংশবিশেষ পাঠ করেন শ্রীবীরেশ্বর নাগ চৌধুরী। চারি হাজারেরও অধিক ব্যক্তিকে এই দিন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

২ ও ৩ জানুআরি যথাক্রমে সন্ধ্যায় শ্রীনিমাই মিত্র ও সম্প্রদায়ের কীর্তন এবং শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের সভ্যগণের 'রামকৃষ্ণ' যাত্রার মাধ্যমে উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

শ্যামপুকুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-সংসদে ৮ হইতে ১১ জানুআরি ১৯৮৩, শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উৎসব বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়। পূজা, শ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠান্তে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা ও বিচারপতি মঞ্জুলা বসু শ্রীমা সম্বন্ধে এবং স্বামী অজজানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। রামায়ণ গান, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

স্বামী বিবেকানন্দের ১২১তম জন্মদিনে **পূর্বকলিকাতা** সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক একাডেমীর 'পতত্রি' আয়োজিত 'বিবেকানন্দ অনুধ্যান' অনুষ্ঠানে তিনটি বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও শ্রীমতী মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয় তিনটি ছিল যথাক্রমে 'স্বামীজীর চোখে ধর্ম', 'অধর্ম ও ধর্মীয় শোষণ', 'আজকের প্রয়োজন ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং নারীজাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ'।

পরে স্বামীজীর রচনাবলী থেকে পাঠ, আবৃত্তি ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কাব্য নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উৎসবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—

বসিরহাট (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ।

অশোকনগর (২৪ পরগনা) শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ।

নব বারাকপুর (২৪ পরগনা) বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ।

গোলাঘাট (আসাম) শ্রীরামকৃষ্ণ সভা সমিতি।

অতীশ দীপঙ্কর জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উৎসব

এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও আড়ম্বরের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের এক মহান্ সন্তান—সুদূর তিব্বত, মঙ্গোলিয়ার প্রত্যন্তে বৌদ্ধধর্মের প্রচারক মহাজ্ঞানী বাঙালী বৌদ্ধভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মের সহস্রবার্ষিকী উৎসব বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার উদ্যোগে গত ২৯ হইতে ৩১ জানুআরি পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভায় যোগদান করেন মঙ্গোলিয়া, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, সিকিম, ভুটান, লাদাক, বাংলাদেশ, নেপাল প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধভিক্ষুরা।

রবীন্দ্রসদনে আয়োজিত প্রাতঃকালীন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মহামান্য দালাইলামা সভাপতি রূপে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীলঙ্কার আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীনিশাঙ্কা বিজয়রত্নে সহস্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মহামান্য দালাইলামা অতীশ দীপঙ্করের উদ্দেশে তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, 'অতীশের জীবনে ভগবান্ বুদ্ধের প্রেম, মৈত্রী ও শান্তির পরিপূর্ণ প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। আজকের হিংসা জর্জরিত পৃথিবীতে এই মহাপুরুষের নির্দেশিত পথেই প্রকৃত শান্তি স্থাপন সম্ভব।'

এই দিনই বিকাল ৩টায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা ও উৎসব কমিটির যৌথ উদ্যোগে ১নং বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রীট থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা কলকাতার বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করিয়া ভারতীয় জাদুঘরের সামনে যাত্রার বিরতি ঘটায়।

ঢাকার ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ বিহারের পরিচালনায় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সহস্র জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা, যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল এরশাদ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: 'বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নাগরিকরা সমান অধিকার ভোগ করেন। এটা খুবই গর্বের কথা যে, বিভিন্ন ধর্মের এবং সম্প্রদায়ের নয় কোটি মানুষ এখানে একটি দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত আছেন।'

পরলোকে

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ **সত্যেন্দ্রনাথ সেন** ১৪ মার্চ, ১৯৮৩, সোমবার সকালে কলকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪। কিছুদিন পূর্বে প্রসটেট গ্লানডে অস্ত্রোপচার হয়, তখন হইতেই তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের গোলযোগও প্রবল হয়, এবং সেটাই এই অন্তিম পরিণতি লইয়া আসে। ডঃ সেনের মৃত্যুতে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একজন একনিষ্ঠ সুহৃদকে হারাইল। তিনি আজীবন মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কর্মোদ্যমের একজন ঘনিষ্ঠ হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আদর্শে অনুরক্ত এই প্রবীণ শিক্ষাবিদের অভাব আমরা চিরদিনই গভীরভাবে উপলব্ধি করিব। ডঃ সেনের দেহ-নির্মুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শান্তি লাভ করুক।



৮৫তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৯০

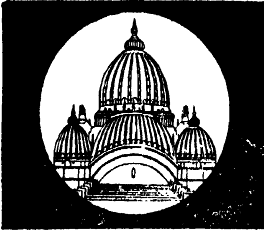
দিব্য বাণী

আমি বলিতেছি, আমাদের এখন চাই বল, চাই বীর্য। এই বীর্যলাভের প্রথম উপায়—উপনিষদে বিশ্বাসী হওয়া এবং বিশ্বাস করা যে, 'আমি আত্মা, তরবারি আমাকে ছেদন করিতে পারে না, কোন অস্ত্র আমাকে ভেদ করিতে পারে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, আমি সর্বশক্তিমান্, আমি সর্বজ্ঞ।'···আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই মহিমময় আত্মা রহিয়াছেন। আত্মায় বিশ্বাসী হইতে হইবে।···তোমাদের প্রত্যেকেই বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্গিতে জগৎ-আলোড়নকারী মহামনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ হও, সর্বপ্রকারে অনন্ত ঈশ্বরতুল্য হও; আমি তোমাদের সকলকেই এইরূপ দেখিতে চাই। উপনিষদ্ হইতে তোমরা এইরূপ শক্তিলাভ করিবে, উহা হইতে তোমরা এই বিশ্বাস পাইবে।···

···প্রাচীনকালে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীরাই কেবল উপনিষদের চর্চা করিতেন। শঙ্কর একটু সদয় হইয়া বলিলেন, গৃহস্থেরাও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে পারে; ইহাতে তাঁহাদের কল্যাণই হইবে, কোন অনিষ্ট হইবে না।···আমি তোমাদিগকে··· বলিয়াছি, যিনি স্বয়ং বেদের প্রকাশ সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই বেদের একমাত্র টীকা—একমাত্র প্রামাণিক টীকা—গীতা চিরকালের মতো রচিত হইয়াছে। ইহার উপর আর কোন টীকা-টিপ্পনী চলিতে পারে না। এই গীতায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বেদান্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। তুমি যে-কাজই কর না কেন, তোমার পক্ষে বেদান্তের প্রয়োজন। বেদান্তের এই-সকল মহান্ তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ থাকিবে না; বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে, ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এই-সকল তত্ত্ব আলোচিত হইবে, কার্যে পরিণত হইবে। প্রত্যেক নরনারী, প্রত্যেক বালকবালিকা—যে যে-কাজ করুক না কেন, যে যে-অবস্থায় থাকুক না কেন—সর্বত্র বেদান্তের প্রভাব বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৩৬-৩৭]



কথাপ্রসঙ্গে

বুদ্ধ ও শঙ্কর

পদ্মাসনে যিনি ভূতলে সমাসীন,—নিয়মিত-প্রাণ নাসাগ্র-দৃষ্টি,—কলিযুগে অবতীর্ণ যোগিশ্রেষ্ঠ সেই পরম জ্ঞানী শ্রীবুদ্ধ আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করুন।

"ধরাবদ্ধপদ্মাসনস্থাঙ্ঘ্রি যষ্টি-
নিয়ম্যানিলং ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ।
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তী
স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু মচ্চিত্তবর্তী॥"

—ইহা উচ্চারিত হইয়াছিল স্বয়ং আচার্য শঙ্করের মুখে। এই স্তোত্রাংশ যাঁহাকে উদ্দিষ্ট এবং যাঁহার কণ্ঠোদ্গীত—আমরা কিন্তু উভয়কেই আমাদের অন্তরের ভক্তি নিবেদন করিতেছি। মন্ত্রের উৎস ও উপলক্ষ উভয়তঃ আমাদের প্রণাম। বৈশাখে আমাদের কথাপ্রসঙ্গের ধারা স্বাভাবিক কারণেই প্রধাবিত হইবে শ্রীশঙ্করাচার্য ও তথাগত বুদ্ধের পাদমূলে।

ভগবান ভাষ্যকার শঙ্কর বেদান্ত-রাজ্যের বরিষ্ঠ আচার্য। আর বোধিসত্ত্ব গৌতম বুদ্ধ মহা মানব-প্রেমিক শান্তিদাতা—যিনি ঈশ্বর বা ভগবান সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। শঙ্করাচার্য সনাতন বৈদিক আদর্শের মহান গুরু ও সংস্থাপক। বুদ্ধদেব কিন্তু প্রচলিত দৃষ্টিতে 'বেদ-বিরোধী' স্বতন্ত্র মানবতা-বাদী। আবার জানি, সনাতনপন্থী কেহ কেহ জ্ঞানদাতা শঙ্করাচার্যকে আখ্যায়িত করিয়াছেন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিয়া। কিন্তু তাঁহারাই গৌতম বুদ্ধের বন্দনা গাহিয়াছেন 'কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর, জয় জগদীশ হরে', কবি জয়দেব-রচিত এই বাণী দিয়া। ততোধিক সুন্দর সংবাদ,—যে-শঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্মের তৎকালীন অবনত গতিকে স্তব্ধ করিয়াছেন স্বয়ং, সেই তিনিই বুদ্ধদেবের উপাসনায় সাগ্রহ অনুমোদন দিয়াছেন। 'স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু মচ্চিত্তবর্তী'—স্ব-কৃত দশাবতার-স্তোত্রে বুদ্ধাবতারকে নিজ চিত্তবর্তী হইতে আবেদন জানাইতেছেন শঙ্করাচার্যই।

বুদ্ধ শুধু বৌদ্ধ জগতেই নহে, বিশ্বমানবের হৃদয়-দেউলে তাঁহার আসন চির-অধিষ্ঠিত;—বৈদিক ভারতের মঠে-মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রাদি অবতারেরই আর এক বিগ্রহরূপে তিনি নিত্য আরাধিত হইতেছেন। ইহাও তো শঙ্করাচার্যেরই তাৎপর্যমণ্ডিত অবদান। শঙ্করের আবির্ভাব বুদ্ধের কয়েক শত বৎসর-কাল পরে। যদি বিপরীত হইত—অর্থাৎ, বুদ্ধ পরে আসিতেন, তাহা হইলে অনুরূপ শঙ্কর-স্তুতি বুদ্ধের কণ্ঠেও উদ্গীত হইত কিনা কে বলিবে?

বুদ্ধ ও শঙ্কর। ভারতের অধ্যাত্ম ইতিহাসে এই দুই অবতার-চরিত যুগ যুগ ধরিয়া যেমন পথের দিশারীস্বরূপ,—তেমনই আবার বিস্ময়কর প্রশ্নোদ্দীপকও বটে! একজন জীব-দুঃখকাতর নির্বাণ-পথদ্রষ্টা, আর একজন জীব-ব্রহ্মবাদী আত্মবিদ্ জগৎগুরু। একজন ব্রহ্ম-ভগবান-ঈশ্বর শব্দ মুখে উচ্চারণও করেন নাই, কিন্তু মানবকে তাহার স্ব-মহিমায় উদ্বোধিত করিয়া পরার্থে জীবন-উৎসর্গ করিতে প্রেরণা দিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্য জন জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, জগৎ ব্রহ্মময়,—জ্ঞান-ভক্তি

সহায়ে এই ব্রহ্মোপলব্ধিকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়াছেন। তথাগত বুদ্ধের অনুশাসন : অত্তদীপা অত্তসরণা বিহরথ'—অর্থাৎ, নিজের মধ্যে দীপ জ্বালো, সেই দীপালোকেই পথ চল, অন্য কাহারও ভরসা রাখিও না। ভগবান শঙ্করের শিক্ষা :

"যত্রৈব জগদাভাসো দর্পণান্তঃপুরং যথা।
তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি॥"

দর্পণে যেমন গৃহাভ্যন্তর প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, জানিবে জগৎও তদ্রূপ ব্রহ্মে প্রতিবিম্বিত। আমিই সেই ব্রহ্ম—এইরূপ জ্ঞান কর, তবেই তুমি কৃতকৃত্য হইবে। এখন প্রশ্ন : এই উভয় মহা-জীবনের মূল সুরে বাস্তবিকই কোথাও পার্থক্য আছে কি? অথবা, বিভেদ শুধু দেশ-কাল ভেদে প্রকাশে ও প্রয়োগে?

বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যের বজ্রনির্ঘোষ : "ব্রহ্মৈবাহং সমঃ শান্তঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ। নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥"—আমি সর্বদেশে সর্বকালে একরূপ—সম, নির্বিকার—শান্ত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ; আমি অন্যরূপ দেহাদি নহি। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। পুনঃ পুনঃ তিনি ভাবিতে শিখাইয়াছেন—আত্মা নিজেই ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। এই আত্মাই চরাচর বিশ্ব। তাই স্বীয় আত্মা ব্যতীত অন্য আর কিছুই নাই।

"স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং তস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন॥"

আমরা জানি মহাপরিনির্বাণের পূর্বক্ষণে ক্রন্দনরত শিষ্য আনন্দকে ভগবান বুদ্ধও বলিয়াছিলেন,—"আনন্দ, কাহারও উপর নির্ভর করিও না—তুমি নিজেই নিজের নিয়ন্তা। অন্য আবার কে নিয়ন্তা? নিজ মনের নিরোধের দ্বারাই সেই দুর্লভ নিয়ন্তৃত্ব লাভ হইয়া থাকে।" "অত্তহি অত্তনো নাথো কোহি নাথো পরোসিয়া? অত্তনা হি সুদন্তেন নাথ লভতি দুল্লভং।"

স্পষ্টতই লক্ষণীয় যে, বুদ্ধোত্তর যুগের বৌদ্ধ মতবাদে যথেষ্ট ভিন্নতা ফুটিয়া উঠিলেও বেদান্তে এবং ভগবান বুদ্ধের স্বানুভূতিতে কোন ভেদ নাই। বেদান্ত-ভাষ্যকার শঙ্করের সিদ্ধান্তই কি ধ্বনিত হয় নাই বুদ্ধ-বাণীতে? স্বামী বিবেকানন্দের 'দেব-বাণী'-তে আমরা পড়িয়াছি—"বুদ্ধ একজন মহা বৈদান্তিক ছিলেন (কারণ বৌদ্ধধর্ম প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের একটি শাখা মাত্র), আর শঙ্করকেও কখন কখন 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলা হয়। বুদ্ধ বিশ্লেষণ করেছিলেন, শঙ্কর সেইগুলি সংশ্লেষণ বা সমন্বয় করলেন।...এরূপ নির্ভীক সত্যানুসন্ধান, আবার সকল প্রাণীর প্রতি এমন ভালবাসা জগতে কেউ কখনও দেখেনি। বুদ্ধ যেন ধর্মজগতের ওয়াশিংটন ছিলেন, তিনি সিংহাসন জয় করেছিলেন শুধু জগৎকে দেবার জন্য...।" স্বামীজী অন্যত্রও বহুবার এইরূপ বলিয়াছেন—"বুদ্ধই সত্যিকার বেদান্তের ঘনীভূত মূর্তি।...প্রভু বুদ্ধই উহা কি প্রকারে ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত করা সম্ভব, তাহা দেখাইয়াছেন। এদিক হইতে তিনি মূর্তিমান্ বেদান্ত! বেদান্ত আপোসের ধর্ম নহে। 'জগৎ মিথ্যা' ইহাই বেদান্তের শিক্ষা।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের আলোকেও বুদ্ধের যে উজ্জ্বল মূর্তিখানি আমরা দর্শন করি, তাহাও এখানে প্রণিধানযোগ্য। 'বেদমূর্তি' শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে শুনিয়া আমরা আরও সংশয়াতীতভাবে জানিয়াছি যে, সম্বোধি লাভের পরের যে-অবস্থা, বুদ্ধ তাহা মুখে বলিতে পারেন নাই। সাধারণ মানুষ এই গূঢ় মর্ম না বুঝিয়াই, তাঁহার মৌনতাকে নাস্তিক্য আখ্যা দিয়া বসিয়াছে। কথামৃতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন : "বুদ্ধ কি জানো? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে তাই হওয়া,—বোধ-স্বরূপ হওয়া।...নাস্তিক কেন হতে যাবে! যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা।" বিশ্বের কোটি কোটি মানবের

বর্ণিত শ্রীবুদ্ধের ইহাই সম্যক্ পরিচয়। বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম যে-কেহ, বুদ্ধ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উল্লিখিত উক্তিনিচয়ের মর্ম অনায়াসে অবধারণ করিবেন। বুদ্ধ ও বুদ্ধের ভাব তাই ভারতবাসীর কাছে কোন আগন্তুক ব্যাপার নহে॥ বরং ঐ আবির্ভাবকে বুঝিতে হইবে, তদানীন্তন ধর্মের অবনতির সংশোধকরূপে।

…তথাপি শ্রীশঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের বড় বেশি প্রয়োজন হইয়াছিল—মানবের হিতের জন্য তো বটেই, বুদ্ধের ভাবকে ঘনিষ্ঠতর পর্যালোচনার সুযোগপ্রদানের উদ্দেশ্যেও যেন। বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-মতবাদ অভিন্ন নহে—ইহাও স্মরণ করাইতে। ভগবান বুদ্ধের তিরোধানের পরে, তাঁহার জীবনের জ্বলন্ত উদাহরণগুলি যতই পুরাতন হইতে লাগিল, সাধারণ মানুষ ততই তাঁহার ত্যাগ-প্রেম এবং জ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল নিষ্ঠা ভুলিয়া গিয়া, সহজ নির্বাণের ঘোর তামসিকতার অন্ধকারে ডুবিতেছিল। রাজপ্রাসাদ হইতে পল্লীর পর্ণকুটির পর্যন্ত অধিকারী-নির্বিশেষে—বুদ্ধ-প্রচারিত নির্বাণের স্রোত তখন সমাজে বন্যা আনিয়াছে। ক্রমে কতগুলি আচার ও নিয়মের অন্ধ অনুশীলন ছাড়া উচ্চতর নির্বাণ-সাধনের আর কিছুই থাকিল না। যে-হেতু বুদ্ধ স্বয়ং ঈশ্বরের কথা কিছু মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করেন নাই, অতএব তাঁহার অনুগামীরা সকলেই ভাবিয়া বসিয়াছিলেন, জগৎ তবে ঈশ্বরবিহীন—সৃষ্টির পশ্চাতে কোন নিত্য বা সৎ কেহ নাই। ফলে ইহাদের ধর্ম হইয়া দাঁড়াইল বেদ-বিরোধী। বৌদ্ধমতাবলম্বীদের প্রভাবে ও উৎসাহে বহিরাগত বেদবহির্ভূত নানা ধর্মাচারে ও ক্রিয়াকাণ্ডে ভারতের আকাশ-বাতাস তখন মুখর ছিল। প্রচণ্ড অবিশ্বাস ও শূন্যগর্ভ আচার-সর্বস্বতার সেই সঙ্কটাপন্ন যুগেই সনাতন বেদ-সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজে তাঁহার এক ভাষণে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথাই এখানে স্মরণযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন :

"বৌদ্ধধর্মের প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, আর চূর্ণ হইবার পর যে ভগ্নাবশেষ রহিল, তাহা অতি বীভৎস।…অতি ভীষণ পাশব অনুষ্ঠান-পদ্ধতিসমূহ—যেগুলি আর কখন ধর্মের নামে চলে নাই—এ-সবই অবনত বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি। কিন্তু ভারতের জীবনীশক্তি তখনও নষ্ট হয় নাই। তাই আবার ভগবানের আবির্ভাব হইল। যিনি বলিয়াছিলেন 'যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, তখনই আমি আসিয়া থাকি', তিনি আবার আবির্ভূত হইলেন।…সেই ব্রাহ্মণ যুবক যাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, ষোড়শ বর্ষে তিনি তাঁহার সকল গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত প্রতিভাশালী শঙ্করাচার্যের অভ্যুদয় হইল। এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের রচনা আধুনিক সভ্য জগতে এক বিস্ময়! আর তিনিও ছিলেন বিস্ময়জনক! তিনি চাহিয়াছিলেন সমগ্র ভারতকে তাঁহার প্রাচীন পবিত্রভাবে লইয়া যাইতে।…মহান্ দার্শনিক শঙ্কর আসিয়া দেখাইলেন, বৌদ্ধধর্ম ও বেদান্তের সারাংশে বিশেষ প্রভেদ নাই। বুদ্ধদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া নিজেরা পতিত হয় এবং আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নাস্তিক হইয়া পড়ে—শঙ্কর ইহাই দেখাইলেন।"

ও শঙ্কর, তথা যুগপ্রবর্তক মহান্ আচার্যগণের জীবন ও সাধন আমাদের মনন-পথে নিয়তই আলোক বর্ষণ করুক, ভারতের সনাতন ভাবধারায় আমাদের জাতীয় চরিত্র পুনরুজ্জীবিত হউক, প্রার্থনা আমাদের ইহাই।

সাহিত্য-সম্মেলন

'উদ্বোধন'-এর চতুর্থ বার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য-সম্মেলন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। তিনদিনের এই সম্মেলনে ইদানীং কালের বেশ কয়েকজন গুণীজনের সান্নিধ্য আমরা লাভ করিয়াছি,—তাঁহাদের চিন্তার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছি। সম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে যাঁহারা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ্, বৈজ্ঞানিক, শিল্প-কলাবিদ্ এবং গবেষক। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য-পরিধির মধ্যে এইরূপ একত্র সমাবেশ নিঃসন্দেহে একটি দ্যোতনাময় ঐকতানস্বরূপ, যাহা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-সঙ্গীতকে উপলব্ধির পথে প্রভূত সহায়তা করিয়া থাকে। এই কারণেই ইহা একটি অভিনন্দনযোগ্য প্রয়াস।

সাহিত্য-সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে সমালোচিত বিষয়গুলির মধ্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল,—সাহিত্যের প্রকৃত অর্থ-ব্যঞ্জক নানা দিক্‌গুলির প্রতি সমান দৃষ্টিপাত। অর্থাৎ, কেবলমাত্র কথা ও কাব্যশাস্ত্র, কিংবা ভাষা ও রচনাশৈলী, অথবা পুরাণ-দর্শন-বিচারাদি মাত্রই সাহিত্যের সীমা বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল না,—সাহিত্যের অঙ্গনকে আরও প্রশস্ততর করিয়া, সেখানে আহ্বান করা হইয়াছিল কলা-শিল্পীকে, সমাজতত্ত্ববিদ্‌কে, দার্শনিককে, প্রযুক্তিবিদ্‌কে ও বৈজ্ঞানিককে। মনে হয়, সাহিত্যের সহিতত্বই সম্মানিত হইয়াছে ইহাতে। 'সহিত'—মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা—মানবের সংস্কার ও সংস্কৃতির সহিত যাহা কিছু অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাহাই সাহিত্য। গদ্য-পদ্য-কাব্য-পুরাণ-নাটক-উপাখ্যান, শিল্প-জ্যোতিষ-দর্শন-তন্ত্র-অর্থনীতি-বিজ্ঞান, দেশবৃত্ত-সমাজতত্ত্ব-সুভাষিত, জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্মবিষয়ক শাস্ত্র-গ্রন্থ যাহাই হউক, ব্যষ্টি ও সমষ্টির কৃষ্টি-সাধনার সম্পদই সাহিত্য পদবাচ্য।

সত্য এক। উহাকে ব্যক্ত করিবার ও উপলব্ধিতে আনিবার জন্য কি বিপুল উদ্যম মানুষ করিয়া চলিয়াছে,—কত বিচিত্র ব্যঞ্জনায়! সত্যকে ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টাকেই মাত্র সচরাচর সাহিত্য আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। আর ঐ সত্যকেই যখন রূপদানের প্রয়াস হয়, তখনই সৃষ্টি হইয়া থাকে শিল্পের। আর সেই সত্যকে যুক্তিতে অবধারণের নাম দর্শন। সত্য-প্রকাশের ধারাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে করিতে সৃজন হইয়াছে ইতিবৃত্তের ও নানা নীতি-শাস্ত্রের। সত্য এবং উহার বিচিত্র প্রকাশ-ভঙ্গিগুলির মাঝখানে যে দুর্লঙ্ঘ্য অমোঘ নিয়ম-শৃঙ্খলা রহিয়াছে, উহাকেই প্রণালীবদ্ধভাবে জানিবার চেষ্টাকে বলে বিজ্ঞান। এবং সেগুলিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্যোগের পরিভাষা হইতেছে প্রযুক্তি। সুতরাং একই সত্যের প্রকাশের পথে এই এত প্রকার নামান্তর—আর এইগুলি সহ-ই আমাদের জীবন। তাই সাহিত্য মানে বলা চলে আমাদের জীবন-প্রবাহ। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিতে পারি যুগাচার্য বিবেকানন্দের সেই উক্তি: "চারুকলা বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়।" আর এই উপায়ত্রয় সুবিন্যস্ত থাকে যাহাতে, তাহারই সংক্ষিপ্ত নাম 'সাহিত্য'।

*

সেদিন কথা হইতেছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য-সম্মেলন লইয়া। তখন সম্মেলনের পরিকল্পনামাত্র চলিতেছিল,—অনুষ্ঠেয় সূচী স্থির হয় নাই। জনৈক বন্ধু প্রস্তাবিত আলোচনার বিষয়গুলি শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেও একটি ব্যাপারে কিন্তু তাঁহাকে কিঞ্চিৎ গম্ভীর দেখিয়াছিলাম। সহসা তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন: সাহিত্য-

সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞানের আলোচনার সঙ্গতিটা কোথায় ? রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের আসরে বিজ্ঞানকে আনিবার কি তাৎপর্য ? আর ঐ যে শিল্পের জন্যও একটি অধিবেশন—উহারও বা এমন কি সামঞ্জস্য থাকিবে এই সম্মেলন-সূচীতে ? ইত্যাদি। সাহিত্যের—বিশেষভাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের মর্মার্থ তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করা, আমাদের পক্ষে, নিতান্তই সেই কামারের কাছে সূচ বিক্রয়ের মতোই হাস্যকর প্রয়াস। তথাপি সাহিত্যের উক্ত সহিতত্বগুণের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা গিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিনি প্রসন্নই হইয়াছিলেন।

স্মরণ রাখা দরকার যে, বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান-বিরোধী কোন বিশ্বাস ও আচরণ—কোন ব্যাপার ও শিল্প-রীতি কেবল অসঙ্গতই নহে, সামাজিক দৃষ্টিতেও বিপজ্জনক। তাই সাহিত্যকেও উহার প্রতিটি দ্যোতনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক হইতেই হইবে। আমরা বলিতেছিলাম সত্যের কথা। ঐ সত্য যেমন আন্তর-রাজ্যের সম্পদ, তেমনই উহার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি বাস্তব বহির্জগতেও থাকিতে হইবে। অন্যথায় উহাকে পূর্ণ সত্য বলিব কেমন করিয়া ? 'মানব-সাধারণের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য' সত্যের নামই বিজ্ঞান। ঐ 'অনুমান' আর ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি যখন রঙে ও রেখায় ফুটিয়া উঠিয়া আকারিত হয়, তাহারই নাম হয় শিল্প। অতএব বুঝিতে অসুবিধা হইবার কথা নহে। সত্য-প্রকাশক সাহিত্যের দিগন্ত তাই দূরপ্রসারিত। সেখানে ভাব-ভাষা-চিন্তা, গল্প-পদ্য-কবিতার সঙ্গে শিল্পকলা ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানও অচ্ছেদ্য মর্যাদায় বিরাজমান।

*

সাধারণভাবে সাহিত্যের কথাই বলিতেছিলাম,—কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের প্রসঙ্গটি একটু বিশেষকে লইয়া। বিশেষ এই যে, এখানে আমাদের আলোচ্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য এ-যুগের সাহিত্যাকাশে উদিত একটি বিশিষ্ট জ্যোতির্মণ্ডল,—যাহাতে ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস, শিল্প-কলা-বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা নবীনতর দীপ্তিতে শোভমান রহিয়াছে। এইরূপই হইয়া থাকে—যুগে যুগে ইহাই প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। সেই বাল্মীকির রামায়ণের কাল হইতে,—ব্যাস, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্যের যুগ,—পরে সর্বাধুনিক এই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সময় পর্যন্ত এই ধারাই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রবহমান।

আকাশময় মেঘ, আর পৃথিবীতে অজস্র জলধারা। এই উভয়ের মাঝে দণ্ডায়মান উন্নত পর্বতশ্রেণী,—যাহাকে স্থূল দৃষ্টিতে মেঘ ও জল হইতে স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত বলিয়াই অনুমিত হয়। ঘটনা কিন্তু ঠিক বিপরীত! ভাসমান ঐ মেঘরাশিকে কে চিনিত ? আর কে-ই বা পারিত স্পর্শ করিতে ? যদি না উহা পর্বতগাত্রে আসিয়া ঠেকিত এবং প্রতিহত হইয়া জমাট বাঁধিয়া অবশেষে বিগলিত বর্ষণের বেগে নদ-নদী-নির্ঝরিণীর আকারে পৃথিবীর মাটিতে না নামিত ? অবিকল যেন ঐরূপই—মনুষ্য সমাজে ভাবনা-মেঘ আবহমান কাল হইতেই ভাসিয়া চলিয়াছে,—কিন্তু যুগে যুগে আবির্ভূত সুবিশাল পর্বতসম ব্যক্তিত্বের ভাব-অঙ্গে স্পৃষ্ট হইয়া ঐ মেঘই নব নব আকারে ও ব্যঞ্জনায় আমাদের অতি সন্নিকটবর্তী হইয়া থাকে।

এইভাবেই সৃষ্টি হয় সাহিত্য—যুগ-সাহিত্য। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পুরাণাদি এবং তৎপরবর্তীকালে বুদ্ধ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়া যত রচনা অদ্যাবধি প্রকাশিত, তাহা সবই ঐ-প্রকার যুগ-সাহিত্য। শ্রীবুদ্ধ ও বুদ্ধোত্তর যুগে—কিংবা শ্রীচৈতন্যের সমকালীন ও উত্তরকালীন সকল ধরনের সাহিত্য-ধারায় বুদ্ধ-চৈতন্যের সংস্পর্শ

মিলিবেই। বর্তমান যুগেও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এমনই অত্যুচ্চ মহিমান্বিত সত্তা—যেন অভ্রভেদী হিমালয়! তাঁহাদের চিন্তা ও বাণী মানবজাতির সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ তো করিয়াছেই,—তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব-স্পর্শে চলমান সাহিত্য-মেঘও নূতন ধারা-বর্ষণের সূচনা করিয়াছে। অবশ্যম্ভাবী কারণেই তাই এ-যুগের সর্বপ্রকার সাহিত্য-প্রবাহকে আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য না বলিয়া পারি না। সাম্প্রতিক কালের কাব্য, নাটক, ছন্দ, ইতিবৃত্ত, বিজ্ঞান, প্রবন্ধ, গল্প, সমাজ-নীতি—সাহিত্যের এই বিশাল ব্যাপৃতির সর্বত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব প্রতিফলিত। অর্থাৎ, উহাদের যত প্রকার প্রকাশ দেখিয়া আমরা আজ মুগ্ধ, তাহা ঐ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপী গগনচুম্বী হিমালয়েরই স্পর্শ-সৃষ্ট। যুগ-সাহিত্যের এই সৃজন-রহস্য কোন খামখেয়ালি মতামতের ব্যাপার নহে,—বিশ্বের আরও দশটি বস্তু-সৃষ্টির মতোই ইহাও একটি অব্যর্থ নিয়মের অধীন।

*

এই জাতীয় সম্মেলনের অন্যান্য সুফল বা কল্যাণকর দিকৃগুলির মধ্যে, ইহাও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক যে, এই ধরনের চর্চায় উল্লিখিত সাহিত্য-বিকাশের প্রণালী এবং তাহার অন্তরালে বৃহৎ কার্য-কারণ পরম্পরাগুলি অবলোকনের ও বুঝিবার জন্য আমাদের চিত্তে তৃষ্ণা জাগায়। অধুনা-সমাপ্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য-সম্মেলন সেই তৃষ্ণার উদ্রেক করিতে পারিবে, ইহাই আমাদের প্রত্যাশা। গূঢ়দর্শী ভাবুক, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের অন্তস্তলে নিহিত সত্যটিকেও ঠিক খুঁজিয়া পাইবেন—ইহাও আমাদের বিশ্বাস।

হে শান্তি-দিশারী বুদ্ধ

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

'ভূমার' আনন্দ ভুলি স্বল্পলিপ্সু নর,
পঞ্চেন্দ্রিয়-ভোগাসক্ত-সুখে তৎপর—
আপনারে বাঁধিয়াছে মায়ামোহ-পাশে।
নিত্য তার চিত্ত ধায় দেহ-সুখ আশে।
ব্যাধি-জরা-মৃত্যু আসি শাসায় যখন,
তখনি বুঝিতে পারে এ সুখ-মগন
ক্ষণিকের তরে। চিরশান্তি কাম্য যার—
তাহারে লঙ্ঘিতে হবে জন্মমৃত্যুদ্বার।

হে শান্তি-দিশারী বুদ্ধ! নিজ প্রজ্ঞা-বলে
লভিলে নির্বাণ শান্তি এই ধরাতলে।
শিখাইলে আর্য-সত্য অষ্টমার্গ আর—
নিজকর্ম-বলে যেতে জন্মমৃত্যু-পার।
আত্মদীপ! হে সম্বুদ্ধ, শাস্তা শাক্যমুনি!
তোমার অমরবাণী মর্মে যেন শুনি।

রামকৃষ্ণবন্দনম্

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণভট্টাচার্যবিরচিতম্

বিশ্ববন্দ্য দেবদেব যোগিবৃন্দপূজিতম্
লোকদুঃখ-মোচনায় মর্ত্যভূমিমাগতম্।
পাপরাশি-নাশকারি-দিব্যদৃষ্টিমণ্ডিতম্
ত্বাং নমামি রামকৃষ্ণ সাধনাভিনন্দিতম্ ॥১॥

হে বিশ্ববন্দ্য! দেব দেব! রামকৃষ্ণ! যোগিগণ কর্তৃক পূজিত, মানবের দুঃখ-মোচনের জন্য মর্ত্য-ভূমিতে সমাগত, পাপরাশি বিনাশকারী দিব্যদৃষ্টি-সমন্বিত, সাধনার দ্বারা অভিনন্দিত তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

মোহমুক্তঃ সত্যসার-সম্প্রচারকারণম্
তত্ত্বরত্ন-লম্ভনায় সর্বধর্মসাধনম্।
ভিক্ষুবৃন্দ-মৌলিপুষ্প-দীপ্তপাদপীঠকম্
ত্বাং নমামি রামকৃষ্ণ সর্বসিদ্ধিকারকম্ ॥২॥

হে মোহমুক্ত রামকৃষ্ণ! সকল সত্যের সার-প্রচার ও প্রকৃষ্ট তত্ত্ব লাভের উদ্দেশ্যে সর্বধর্ম-সাধনায় ব্যাপৃত তুমি, সন্ন্যাসিবৃন্দের মস্তকস্থিত পুষ্পের দ্বারা তোমার পাদপীঠ সদারঞ্জিত সর্ব-সিদ্ধিকারক তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

মৌনমূর্তি-শৈলরাজ-তুল্যদেহকন্দরম্
নির্বিকল্প-যোগমগ্ন-নিশ্চলাঙ্গসুন্দরম্।
নির্গতার্চিরিদ্ধকান্তিমংশুমালি-ভাস্বরম্
ত্বাং নমামি রামকৃষ্ণ ভক্তিগীতিসুস্বরম্ ॥৩॥

হে রামকৃষ্ণ! নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন তোমার নিশ্চল শরীর মৌনমূর্তি গিরিরাজ তুল্য নিস্পন্দ সুন্দর! তোমার শরীর হইতে নির্গত জ্যোতি তোমাকে সূর্যের মতো উজ্জ্বল করিয়াছে। মধুর ভক্তিগীতিকার তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

দ্বৈতহীননিত্যতত্ত্ববোধশুদ্ধ-মানসম্
শম্ভুশক্তিযোগজাতমোদমত্তসারসম্।
কামকাঞ্চনাদিসঙ্গবর্জনোপদেশকম্
ত্বাং নমামি রামকৃষ্ণ ভোগতাপনাশকম্ ॥৪॥

দ্বৈতশূন্য নিত্যতত্ত্ববোধেতে তোমার চিত্ত অত্যন্ত বিশুদ্ধ। শিবশক্তি-যোগের আনন্দে বিহ্বল হংসসদৃশ তুমি। কামকাঞ্চনাদি সঙ্গবর্জনের উপদেশক, ভোগ-তাপনাশক হে রামকৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

সর্বদুঃখদূরকারি-শান্তচারুলোচনম্
স্পর্শমাত্র-গাঢ়মোহ-তীব্রবন্ধমোচনম্।
মোক্ষকামিমৃগ্যমান-মুক্তিবীজবিগ্রহম্
ত্বাং নমামি রামকৃষ্ণ সর্বতাপনিগ্রহম্ ॥৫॥*

হে রামকৃষ্ণ! তোমার স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টি সমস্ত দুঃখ দূর করে। তোমার স্পর্শমাত্রে গাঢ় মোহের তীব্র বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তোমার ঐ বিগ্রহ মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রার্থনীয় মুক্তির কারণস্বরূপ, হে রামকৃষ্ণ! সর্বতাপনিগ্রহকারী তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

* তূণক ছন্দ

বুদ্ধপ্রসঙ্গে

স্বামী ধ্যানেশানন্দ

ত্যাগ ও সেবাই ভারতের চিরন্তন আদর্শ। 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' এই মন্ত্রই যুগ যুগ ধরে স্পন্দিত হয়ে চলেছে ভারতের ঘরে ঘরে। তাই আমরা দেখতে পাই, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রাক্‌কালে যখন তাঁর সব বিত্ত-সম্পত্তি দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে ভাগ করে দিতে চাইলেন, তখন মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন, বিষয়-সম্পত্তির দ্বারা তুমি একজন বিত্তবতী নারী হতে পারবে। কিন্তু অমৃতত্ব লাভ করতে পারবে না। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর সংলাপের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐতিহ্যকেই শ্রুতি আমাদের কাছে প্রকট করেছেন। আবার শ্রীভগবান যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তখনও দেখি তাঁর জীবন-বৃত্তের মূল উপাদান ও উপজীব্য হয় ত্যাগ এবং এই ত্যাগ বা নিবৃত্তিমার্গ জগতে শিক্ষা দেওয়াই হয় তাঁর নরলীলার গূঢ় উদ্দেশ্য।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন, ভোগের মধ্যে বর্ধিত হয়েছেন। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, শক্তিসামর্থ্যে সিদ্ধার্থ ছিলেন যথার্থ পুরুষ-সিংহ; উপনিষদ্ যেমন বলেছেন, "যুবা অধ্যায়কঃ আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ।"—যুবক, অধীত-বেদ, সম্রাট, সুদৃঢ় শরীরযুক্ত ও বলবান। পৃথিবীকে ভোগ করার সকল উপকরণ তাঁর ছিল। গৃহে রূপযৌবনবতী স্ত্রী, স্নেহের পুত্তলি শিশুপুত্র; কিন্তু এ-সব কোন কিছুই সিদ্ধার্থকে গৃহাঙ্গনে বদ্ধ করে রাখতে পারেনি। ঘর ছাড়ার উদাস-করা ডাক তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। সুরম্য হর্ম্য থেকে উন্মুক্ত আকাশের নিচে তাঁকে টেনে এনেছিল। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ হয়ে উঠেছিলেন তথাগত বুদ্ধ।

কুমার সিদ্ধার্থ রথে চলেছেন নগর-ভ্রমণে রাজ্যদর্শনে। সুসজ্জিত, সুশোভিত রাজপথ ছেড়ে ক্রমে সিদ্ধার্থ এলেন পল্লীপথে। হঠাৎ কুমারের দৃষ্টি পড়ল এক জরাজীর্ণ বয়োবৃদ্ধ মানুষের প্রতি। হস্তে যষ্টি, চক্ষুযুগল কোটরগত, দেহ শিথিল ও ন্যুব্জ। সারথি ছন্দকের কাছে শুনলেন যে, এমন জরা-বার্ধক্য প্রত্যেক মানবদেহেরই স্বাভাবিক পরিণতি। আরও জানলেন যে, প্রাণ-প্রতিম স্ত্রী, স্নেহ-পুত্তলি শিশুপুত্র সকলকেই একদিন এই জরা এসে গ্রাস করবে। স্বয়ং রাজকুমারেরও এর হাত থেকে রেহাই নেই। বিষণ্ণ মনে ফিরে এলেন সিদ্ধার্থ। দ্বিতীয় দিন ভ্রমণকালে কুমারের চোখে পড়ল ব্যাধিগ্রস্ত, কঙ্কালসার দেহ, রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছে একটি লোক। সারথি জানালেন যে, লোকটি ব্যাধিগ্রস্ত। সকলকেই একদিন ব্যাধিগ্রস্ত হতে হবে, তা সে রাজা বা প্রজা, ধনী বা নির্ধন, উচ্চবর্ণ বা নিম্নবর্ণের লোক হোক। রাজকুমার ফিরে এলেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। তৃতীয় দিন ভ্রমণকালে এক নূতন দৃশ্য কুমারের পড়ল। চারজন লোক একটি শবদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। অনুসরণকারীরা শোকার্ত। শুনলেন, একটি লোক মারা গেছে—আর সে ফিরে আসবে না। প্রিয়জনরা এতদিন যাকে যত্নে, স্নেহ-ভালবাসায় পালন ও রক্ষা করেছে, তাকে আজ চিরতরে ত্যাগ করতে হয়েছে। মরণ অনিবার্য। এ মরণের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। সব জীবেরই এক পরিণাম—মৃত্যু। রাজকুমার এ-সব কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নির্বাক হলেন। ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে। অত্যন্ত বিমনা,—ভাবছেন শিয়রে যার জরা-ব্যাধি-মরণ-রূপ শমন, সে কি করে নিশ্চিন্ত মনে সংসারের ভোগসুখে লিপ্ত

হতে পারে ! মাথায় তখন তাঁর যেন 'তপ্ত কটাহ' জলছে। রাজপ্রাসাদের ভোগৈশ্বর্য-ব্যবস্থা, পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্রাদির স্নেহভালবাসা তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় সংসারকে পাতকুয়া এবং আত্মীয়-পরিজনদের কালসাপ বলে মনে হচ্ছে সিদ্ধার্থের। সংসারের প্রতি অনাসক্তির যে বীজ এতদিন তাঁর হৃদয়ে সুপ্ত ছিল, তা এখন অঙ্কুরিত। সিদ্ধার্থ ক্ষুদ্র গৃহাঙ্গনের প্রাচীর ভেঙে মুক্ত অঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন।

সংসার-অনাসক্ত সিদ্ধার্থকে সংসারে বেঁধে রাখার জন্য পিতা নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর নির্দেশে সুন্দরী পুরনারীরা যুবক রাজপুত্রকে নানাভাবে সংসার-মায়াতে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ললনাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। সিদ্ধার্থের মনে কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তির বীজ তাঁরা বপন করতে পারলেন না। সিদ্ধার্থের মুখ থেকে ত্যাগদৃপ্ত যে বাণী বের হয়েছিল, তা ভাবীকালের বৈরাগ্য-পথযাত্রী মানুষের কাছে আলোক-বর্তিকা স্বরূপ। তিনি বলেছিলেন :

"নাবজানামি বিষয়ান্ জানে লোকং তদাত্মকম্।
অনিত্যং তু জগন্মত্বা নাত্র মে রমতে মনঃ ॥
জরা ব্যাধিশ্চ মৃত্যুশ্চ যদি ন স্যাৎ ইদম্ অয়ম্।
মমাপি হি মনোজ্ঞেষু বিষয়েষু রতির্ভবেৎ ॥
নিত্যং যদ্যপি হি স্ত্রীণাম্ এতদেব বপুর্ভবেৎ।
দোষবৎস্বপি কামেষু কামং রজ্যেত মে মনঃ ॥
যদা তু জরয়া পীতং রূপম্ আসাং ভবিষ্যতি।
আত্মনোঽপি অনভিপ্রেতং মোহাৎ তত্র
রতির্ভবেৎ।"[১]

—আমি বিষয়কে অবজ্ঞা করছি না। জগৎ এতে আসক্ত তাও আমি জানি। কিন্তু জগৎকে অনিত্য মনে করি বলে এতে আমার মন আনন্দিত হচ্ছে না। যদি জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু—এই তিনটি না থাকত, তবে মনোজ্ঞ বিষয়গুলিতে আমি আনন্দ পেতাম। যদি নারীর দেহ চিরকাল এক-রূপই থাকত, তবে নিশ্চয়ই দোষযুক্ত হলেও কামে আমার মন অনুরক্ত হত। কিন্তু যখন জরায় জীর্ণ নারীদের রূপ তাদের নিজেদেরও অবাঞ্ছিত হয়, তখন নারীর রূপে আসক্তি মোহবশতই হবে। সেইজন্য কামে প্রলুব্ধ হওয়া উচিত নয়।

নির্মায়িক সিদ্ধার্থ বৈরাগ্যের প্রেরণায় রাজপ্রাসাদ ছেড়ে যাত্রা করেছেন সর্ববাধাহীন মুক্তির পথে। নগর ছাড়িয়ে গ্রাম, গ্রাম পেরিয়ে বনাঞ্চল—প্রান্তর। তাঁর হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কৃত হচ্ছে বৈরাগ্যের মূর্ছনা। শোকাভিভূত ছন্দককে সান্ত্বনা দেবার ছলে সংসারের মায়া-মমতায় বদ্ধ, ত্যাগে ভীত আমাদের উদ্দেশে বললেন :

"স্বজনং যদ্যপি স্নেহাৎ ন ত্যজেয়ম্ অহং স্বয়ম্।
মৃত্যুরন্যোন্যম্ অবশান্ অস্মান্ সংত্যাজয়িষ্যতি ॥
মহত্যা তৃষ্ণয়া দুঃখৈর্গর্ভেণাস্মি যয়া ধৃতঃ।
তস্যা নিষ্ফলযত্নায়াঃ ক্বাহং মাতুঃ ক্ব সা মম ॥"[২]

—বিচ্ছেদই সংসারের নিয়ম। আমি যদি স্নেহ-বশত স্বজনগণকে পরিত্যাগ নাও করি, শক্তিহীন আমাদিগকে মৃত্যু জোর করে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। বহু দুঃখের সঙ্গে কত আশা করে যিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, আমার সেই মা আজ কোথায় ? আর আমিই বা কোথায় ? জন্মের ব্যাপারটাই বিয়োগান্ত।

ত্যাগ কোন অভাবাত্মক বস্তু নয়, ভাবাত্মক। সঙ্কীর্ণকে ছেড়ে, ক্ষুদ্রকে ছেড়ে ভূমাকে আপন করা। মাতাপিতা-স্ত্রীপুত্র-পরিজনদের ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু জগদ্বাসীকে আপন করে নিয়েছেন, 'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু/পরকে করিলে ভাই।' 'দূর' এবং 'পর'-এর দুঃখ নিবারণ-

১ বুদ্ধচরিতম্—অশ্বঘোষ প্রণীত, (৪।৮৫-৮৮) সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ১ম খণ্ড
২ ঐ ঐ (৬।৪৪-৪৫) ঐ

চিন্তায়, 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' সিদ্ধার্থ অধীর। রাজ-পুরোহিত ও রাজ-অমাত্য তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে তিনি অতি বিনীতভাবে তাঁদের বলেছিলেন :

"অবৈমি ভাবং তনয়ে পিতৃণাং
বিশেষতো যো ময়ি ভূমিপস্য।
জানন্ অপি ব্যাধিজরাবিপদ্ভ্যো
ভীতঃ তু অগত্যা স্বজনং ত্যজামি॥"[৩]

—পুত্রের প্রতি পিতার, বিশেষ করে আমার প্রতি মহারাজের যে কেমন স্নেহ তা আমি জানি। জেনেও আমি সংসার ত্যাগ করে এসেছি জরা ব্যাধি আর মৃত্যু থেকে মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে। আরও বললেন, "ইত্থং চ রাজ্যং ন সুখং ন ধর্মঃ"—আর রাজ্যের কথা বলছেন? রাজ্য সুখেরও নয়, ধর্মেরও নয়।

যারা চরমকে পাবার পরম আকাঙ্ক্ষা করেন, চিরকালই তাদের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নচিকেতা যখন মৃত্যুপতি যমরাজের কাছে আত্মবিদ্যার প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন, তখন যমরাজ নচিকেতাকে নানাভাবে পরীক্ষা না করে ছাড়েননি। তিনি নচিকেতাকে আত্মজ্ঞানের পরিবর্তে ভোগ, ঐশ্বর্য, রাজ্যসুখ সব কিছু দিতে চাইলেন। বৈরাগ্যানলে উদ্দীপিত নচিকেতা যমরাজকে বললেন, "তবৈব বাহাঃ তব নৃত্যগীতে" রথরথী, নৃত্যগীত, ভোগ-ঐশ্বর্য সব আপনারই থাক, আমার প্রয়োজন নেই। জাগতিক প্রলোভন নচিকেতাকে মোহগ্রস্ত করতে পারেনি। নচিকেতা আত্মজ্ঞান লাভের চরম সোপান বৈরাগ্যের উত্তম অধিকারী জেনে যমরাজ আশ্বস্ত হয়েছিলেন। সিদ্ধার্থকেও অনেক কঠিন পরীক্ষা, —তাঁর উপযুক্ততার প্রমাণ দিতে হয়েছিল। সিদ্ধার্থ তথা সন্ন্যাসী গৌতম মগধের রাজধানী রাজগৃহে রয়েছেন। একদিন রাজা বিম্বিসার নবাগত সন্ন্যাসীকে দর্শন করতে এলেন। দেখলেন সন্ন্যাসী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট, ধ্যানমগ্ন। তারপরই রাজা নবীন সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের দৃঢ়তা দেখার জন্যই যেন বললেন, "শ্রমণ, তোমার হস্ত সাম্রাজ্যের রশ্মি গ্রাস করিবার উপযুক্ত, উহা ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্র বহন করিবার জন্য নয়, তোমার তারুণ্য হেতু আমার করুণার সঞ্চার হইতেছে। যাহারা উচ্চ অন্তঃকরণশালী, শক্তির প্রয়াসী হওয়া তাহাদের পক্ষে গৌরবজনক। ধন সম্পদ ঘৃণ্য বস্তু নয়। ধর্মভ্রষ্ট হইয়া ধনশালী হওয়া যথার্থ লাভ নহে, কিন্তু যিনি উচ্চ শক্তি, ধন ও ধর্ম তিনেরই অধিকারী এবং এই ত্রিবিধ সম্পদকে যিনি বিমৃষ্যকারিতা ও প্রজ্ঞা সহকারে উপভোগ করেন আমি তাঁহাকেই মহৎ শিক্ষক বলিব।"[৪] সন্ন্যাসীও বৈরাগ্যের দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়িয়ে রাজার প্রলোভনে কিছুমাত্র লুব্ধ না হয়ে বললেন, "আমি মুক্তিপ্রার্থী হইয়া সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়াছি। সংসারে পুনঃপ্রবেশ আমার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব? যিনি সর্বোত্তম ধন সত্যানুসন্ধানে রত, তিনি সর্বপ্রকার চিত্ত-বিচলিতকারী উদ্বেগ বিসর্জন দিয়া ঐ একমাত্র লক্ষ্য অনুসরণ করিবেন। তিনি লোভ, কাম ও প্রভুত্বের বাসনা হইতে নিজেকে মুক্ত করিবেন। আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিবেন না, ইহাই আমার প্রার্থনা। যাহারা রাজ্য ও অর্থসম্পদের ভারগ্রস্ত, তাহাদের প্রতি করুণা করুন। মৃত রাজা বা মৃত ভিক্ষুকের মধ্যে প্রভেদ কি? অসার লাভের জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, তজ্জন্য আমি রাজমুকুট পরিত্যাগ করিয়া জীবনভার হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াসী।"[৪] ভোগসুখের প্রতি অনীহা, যা সন্ন্যাসীর ভূষণ, তা সংসারত্যাগী

৩ ঐ ঐ (৭।৩১)

৪ বুদ্ধবাণী—ভিক্ষু শীলভদ্র প্রণীত, পৃঃ ১২-৩

সিদ্ধার্থের কথায় প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছে।

ভোগবিমুখ গৌতম রাজা বিম্বিসারকে অতঃপর অতি বিনয়ের সঙ্গে মিত্রভাবে অনেক বৈরাগ্যের কথা শোনালেন। বললেন :

"অহং জরামৃত্যুভয়ং বিদিত্বা মুমুক্ষয়া ধর্মমিমং প্রপন্নঃ।
বন্ধূন্ প্রিয়ানশ্রুমুখান্বিহায় প্রাগেব কামান্ অশুভস্য হেতূন্॥
নাশীবিষেভ্যো হি তথা বিভেমি নৈব অশনিভ্যো গগনাচ্চ্যুতেভ্যঃ।
ন পাবকেভ্যো অনিলসংহিতেভ্যো যথা ভয়ং মে বিষয়েভ্য এব॥
কামা হ্যনিত্যাঃ কুশলার্থচৌরা রিক্তাশ্চ মায়াসদৃশাশ্চ লোকে।
আশাস্যমানা অপি মোহয়ন্তি চিত্তং নৃণাং কিং পুনরাত্মসংস্থাঃ॥"[৫]

—জরা ও মৃত্যুর ভয় জেনে আমি মুক্তি লাভের জন্য প্রথমেই অমঙ্গলের কারণ কামনাবাসনাগুলিকে এবং অশ্রুমুখী প্রিয়জনদের ত্যাগ করে এই ধর্ম আশ্রয় করেছি। বিষয়কে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় করি। বিষাক্ত সাপ, আকাশ থেকে বিচ্যুত বজ্র কিংবা বায়ুযুক্ত অগ্নিকে আমি অত ভয় করি না। জগতে ভোগ্যবিষয়সমূহ অনিত্য। এরা মানুষের কল্যাণ ও অর্থ হরণ করে। শূন্য ও মায়াবৎ বিষয় সকলের সামান্য কামনাতেই মানুষের চিত্ত মোহিত হয়। যদি কারও জীবনে কামনাবাসনা থাকে তাহলে আর কথা কি!

সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী গৌতম উরুবিল্বে কঠোর তপস্যায় রত। বাল্যবন্ধু উদঙ্গী এসেছেন গৌতমের সঙ্গে দেখা করতে। বললেন—আমি তোমার বাল্যবন্ধু উদঙ্গী। তোমার অদর্শনে রাজা শুদ্ধোধন মৃতপ্রায়, মহাদেবী প্রজাবতীরও সেই অবস্থা। তুমি এঁদের একবার দেখতে যাবে না, সিদ্ধার্থ? সন্ন্যাসী একটু বিস্মিত হয়ে বললেন—কে সিদ্ধার্থ, কে শুদ্ধোধন, কে-ই বা উদঙ্গী? সেই সময় গৌতম সিদ্ধার্থ ধ্যানের এত গভীরে ডুবে থাকতেন, মন তাঁর এত উচ্চভূমিতে বিচরণ করত যে, সেই মনকে ক্ষুধাতৃষ্ণা, দেহসুখের স্তরে নামিয়ে আনতে পারছেন না। তাই দেখা যাচ্ছে নিজের নামটাও ভুলে গেছেন, মানুষ জনদেরও স্মৃতি-পথে আনতে পারছেন না। আচার্য শঙ্কর তাঁর 'নির্বাণষট্কম্'-এ এই রকম এক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন :

"পিতা নৈব মে নৈব মাতা চ জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

—আমার পিতা, মাতা বা জন্ম নাই। বন্ধু, মিত্র, গুরু বা শিষ্য নাই। আমি চিদানন্দরূপ শিব, আমি শিব।

গৌতম বিশাল বোধিবৃক্ষমূলে এসে দাঁড়ালেন। দূরে নৈরঞ্জনা নদী কুলু কুলু রবে মধুর ছন্দে বয়ে চলেছে। নির্বাণলাভেচ্ছু গৌতম দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে বসলেন বৃক্ষমূলে—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

সংসারাতীত অবস্থায় যেতে চান গৌতম। 'মার' বা পাপপুরুষ, অর্থাৎ, প্রকৃতি গৌতমকে বেঁধে রাখতে চাচ্ছে। তাই 'মার' সংশয়, আসক্তি, কুসংস্কার, কামনাবাসনাদি সাঙ্গপাঙ্গ সহ গৌতমকে বন্ধন করতে সচেষ্ট হল। কিন্তু ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির ছলাকলায় সুবিদিত গৌতম "বিবেকম্ অনুব্রূহয়ে"[৬] ঐ বন্ধন ছিন্ন করে পর-বৈরাগ্যের পরিচয় দিলেন এবং আপন স্বরূপে

৫ বুদ্ধচরিতম্—অশ্বঘোষ প্রণীত (১১।৭-৯), সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ১ম খণ্ড
৬ ধম্মপদ—ব্রাহ্মণবগ্গো—১৬

প্রতিষ্ঠিত হলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন বলেছেন, "This nature has covered the Self of man, and when nature takes away the covering, the Self appears in Its own glory." (Raja Yoga)—"এই প্রকৃতি মানুষের আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে; যখন প্রকৃতি ঐ আবরণ সরাইয়া লন, তখন আত্মা স্ব-মহিমায় প্রকাশিত হন।" গৌতম বোধে প্রতিষ্ঠিত হলেন। জগতে আবির্ভূত হলেন ভগবান বুদ্ধ।

যে গৌতম গৃহত্যাগ করার পর পিতার বহু চেষ্টায়, আত্মীয়-পরিজনদের অনেক অনুরোধ-উপরোধেও গৃহে ফেরেননি,—সেই গৌতমই বুদ্ধ রূপে সাত বৎসর পরে স্বগৃহ কপিলাবস্তুতে ফিরে এসেছিলেন, শুনলে আশ্চর্যই লাগে। এই রকম ঘটনা পরমহংসশ্রেষ্ঠ শুকদেবের জীবনেও দেখা যায়। আজন্ম সন্ন্যাসী শুক বাল্যেই গৃহত্যাগ করে যাচ্ছেন, পিতা ব্যাসদেব পুত্রকে গৃহে ফেরাবার জন্য 'হা শুক, হা শুক' বলে ডাকতে ডাকতে পিছনে পিছনে ছুটে চলেছেন। সংসারবিরাগী শুক কিন্তু স্নেহময় পিতার আহ্বানে তখন গৃহে ফেরেননি। এই শুককেই পরে পিতার কাছে ফিরে আসতে দেখতে পাই। শুক ও বুদ্ধ উভয়ই প্রথমে ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করেছিলেন, পরে যখন ভূমাকে, সত্যকে লাভ করলেন, তখন সব ঘরই তাঁদের কাছে আপন ঘর হয়ে উঠেছিল,—জগদ্বাসী আপন জনে পরিণত হয়েছিল। জগতের সেবায় তাই তখন তাঁরা আবার জন-সমাজেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

নিজের কিছু সম্পদ থাকলেই তবে তা অন্যকে প্রদান করা যায়। কিন্তু নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী! তিনি তবে অন্যকে কি দিতে পারেন! তাঁর সম্পদ কী!—তাঁর সম্পদ বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা। তাই যখন পুত্র রাহুল পিতার কাছে পিতৃধন চাইলেন, পিতা গৌতম তাঁকে প্রদান করলেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্বল বৈরাগ্যের ঝুলি।

তথাগত বুদ্ধ সম্বোধি লাভ করে স্ব-আত্মাকে সর্বব্যাপী বলেই বোধ করতেন। তাই জীবকে তিনি জীববুদ্ধিতে না দেখে, আত্মবুদ্ধিতে দেখতেন। শ্রুতিও তো তাই-ই বলেছেন, আত্মাই পরম প্রেমাস্পদ; সুতরাং আত্মবুদ্ধিতে দৃষ্ট জীবকে ভালবাসা স্বতঃসিদ্ধ। ধম্মপদে উল্লেখ দেখতে পাই "অত্তানং চে পিয়ং জঞ্ঞা রক্খেয্য তং সুরক্খিতং"[৭] (আত্মানং চেৎ প্রিয়ং জানীয়াৎ তং সুরক্ষিতং রক্ষেৎ—'যদি আত্মাকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর তবে তাহাকে উত্তমরূপে রক্ষা করিবে।')। এইজন্য আমরা দেখতে পাই একটি মেষ শাবকের জন্য গৌতম আপন প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠাবোধ করছেন না। গৌতম বুদ্ধের যে বিশাল হৃদয়-বত্তার কথা শুনি, সর্বপ্রাণীর জন্য যে করুণার প্রস্রবণধারা তাঁর বক্ষে নিত্য প্রবাহিত হত,—সে-সবের মূলে ছিল তাঁর সর্বভূতে আত্মবোধ।

---

৭ ঐ—অত্তবগ্‌গো—১

ভ্রম-সংশোধন

চৈত্র ১৩৮৯ সংখ্যা, ১৮৪ পৃষ্ঠার নিম্ন হইতে ২০তম পঙ্‌ক্তিতে 'জন্ম-শতবর্ষ' স্থলে 'জন্ম-সহস্রবর্ষ' পড়িতে হইবে।—সঃ

নির্বাণ ও মুক্তি

স্বামী পরাশরানন্দ

বৌদ্ধমতের চরম লক্ষ্য যে নির্বাণ তার প্রকৃত তত্ত্ব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহুবিধ মত দেখা যায়।

বৌদ্ধমতের সমালোচক কিছু পণ্ডিত এই অবস্থাটিকে বেদান্তবাদীদের মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সঙ্গে সমপর্যায়ে রাখতে কোনমতেই রাজী নন। মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান হলে জীবের স্বরূপের আবরণ যে অজ্ঞান তা দূর হয়ে যায়। তার এই জগৎ বা অন্য লোকে যাতায়াতের ঘটে পরিসমাপ্তি। সে জন্মমৃত্যুর পারে চলে যায় আর শাশ্বত, অনন্ত ভূমানন্দের অধিকারী হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বাণপ্রাপ্ত সাধকের অবস্থাও অনুরূপ; তার অবিদ্যা বা অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়ে যায় আর সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সেও সেই ভূমানন্দের, অমৃতের অধিকারী হয়।

'প্রতীত্য-সমুৎপাদ' তত্ত্বের কাঠামোর ওপর এই নির্বাণতত্ত্বটি দাঁড়িয়ে আছে; আলোচ্য প্রবন্ধে তাই 'প্রতীত্য-সমুৎপাদ' তত্ত্ব আলোচনা করে আমরা নির্বাণতত্ত্বের বিশ্লেষণে অগ্রসর হব।

'সূত্রপিটকে'র অন্তর্গত 'মহাবগ্গে' আছে—ভগবান তথাগত নৈরঞ্জনা নদীতীরে বুদ্ধত্ব লাভ করবার কালে রাত্রির প্রথম প্রহরে কারণমালার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রতীত্য-সমুৎপাদের তত্ত্বকে অনুলোমক্রমে সাক্ষাৎ করলেন;—[প্রতীত্য-সমুৎপাদের অর্থ হল একটির উপর নির্ভর করে আর একটির উৎপত্তি। পালিভাষায় এ-সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'ইভিইমস্মিং অতি ইদং হোতি। ইমস্স উপ্পাদানা ইদং উপপজ্জতি' অর্থাৎ 'এই হতে এই হয়, এর উৎপাদ হতে এ উৎপন্ন হয়: তিনি জানলেন।] অবিদ্যা হতে সংস্কার আসে, সংস্কার হতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হতে নাম-রূপ, নাম-রূপ হতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হতে আসে স্পর্শ, স্পর্শ হতে বেদনা, বেদনা হতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হতে উপাদান, উপাদান হতে ভব, ভব হতে জন্ম এবং জন্ম হতে শোক, আক্ষেপ, দুঃখ, ভোগ, অবসাদ, নৈরাশ্য, জরা ও মরণ। এই হল কার্য-কারণমালার বারোটি অঙ্গ। এই তালিকায় সংক্ষেপে বুদ্ধের দর্শনের চুম্বক-বর্ণনা পাওয়া যায়।[1] রাত্রির মধ্যযামে ভগবান আবার এই প্রতীত্য-সমুৎপাদের তত্ত্ব উপলব্ধি করলেন প্রতিলোমক্রমে অর্থাৎ 'ইহা না হইলে ইহা হয় না, ইহার নিরোধের দ্বারা ইহার নিরোধ হয়'; যেমন অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয় ইত্যাদি।

উপরে অবিদ্যা হতে আরম্ভ করে জরা-মরণ পর্যন্ত যে বারোটি উৎপাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল বৌদ্ধদের সুপ্রসিদ্ধ ভব-চক্র; এর আরম্ভ অবিদ্যায়—এটাই সব রকম ভবের অনাদি মূল—এখান থেকেই ভব-প্রবাহ শুরু। অবিদ্যাকে আশ্রয় করে দেখা দেয় সংস্কার, সংস্কারের পরিণতি বিজ্ঞানে বা ব্যক্তি-চৈতন্যে; বিজ্ঞান থাকলে থাকে নাম-রূপ; নাম-রূপের মধ্যে রূপ হল 'বাস্তব অস্তিত্ব'; রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞানের মধ্যে রূপ-স্কন্ধ নিয়ে হল নাম-রূপের রূপ; আর বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান হল 'নামে'র অন্তর্গত। নাম-রূপকে আশ্রয় করে দেখা দেয় ষড়ায়তন বা ছয়টি ইন্দ্রিয়,—ইন্দ্রিয় থাকলেই স্পর্শ, আর স্পর্শ থেকে আসে বেদনা বা অনুভূতি। বেদনা জন্ম দেয় তৃষ্ণার—তৃষ্ণা হল উপাদান বা

---

১ ধম্মপদ—হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ২৯

অত্যাশক্তির আশ্রয়। উপাদান থেকে কর্মসম্ভব 'ভব' বা অস্তিত্বাকাঙ্ক্ষা। ভব থেকে জাতি বা জন্ম, আর জন্ম থেকে দুঃখ। সুতরাং দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য প্রথম চাই জাতি নিরোধ, আর এই জাতি নিরোধ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে অবিদ্যা নিরোধের উপর।

অবিদ্যা নিরোধ হলেই বিজ্ঞান নাশ হয় এবং জরা-মরণের চক্র থেকে জীব পায় নিষ্কৃতি, সমুদয় দুঃখের হয় আত্যন্তিক বিনাশ; এটাই নির্বাণ। অতএব নির্বাণে হচ্ছে সব রকম 'আমি' 'আমার' ভাবের লোপ; চিত্ত এখানে হচ্ছে সংস্কারশূন্য,—এককথায় জীবের অবিদ্যা সেখানে থাকছে না, অতএব তার আর জন্মমৃত্যুও নেই।

'আমি' ও 'আমার' ভাবের নাশ হওয়ার অর্থ ক্ষুদ্র 'আমি'র নাশ, বৃহৎ 'আমি'র নয়, সান্ত ভাবের নাশ ও অনন্তে প্রবেশ; তাই ব্যক্তিত্বের বিনাশের অর্থ মহতে প্রবেশ। সেইজন্য ললিতবিস্তরে (২২ অ., ১০ শ্লোক) বলা হচ্ছে—

"নাস্ত্যন্তরেঽস্য নাশো যথা চ বর বোধি লব্ধ॥"

—"উত্তরকালেও ইহার বিনাশ নাই, কেন না ইনি শ্রেষ্ঠ বোধি (বিশুদ্ধ জ্ঞান) লাভ করিয়াছেন।"[2] এই নির্বাণের দ্বারা হয় সকল ভয়ের পরিসমাপ্তি, নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির হয় অভয়-প্রাপ্তি। ললিতবিস্তরে (২৪অ., ৫২ শ্লোক) তথাগতের উক্তি:

"যত্র স্কন্ধৈর্দুঃখমায়তনৈঃ তৃষ্ণসম্ভবং দুঃখম্।
ভূয়ো নচোদ্ভবিষ্যত্যভয়পুরমিহাভ্যুপগতোঽস্মি॥"

—"দুঃখায়তন স্কন্ধসমূহ দ্বারা তৃষ্ণাজনিত দুঃখ আর উৎপন্ন হইবে না, আমি এখানে অভয়পুরী প্রাপ্ত হইয়াছি।"[3] অমৃতপান করে মানব যেমন চিরজীবন লাভ করে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর পারে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করে, নির্বাণের দ্বারাও মানুষ সেই অবস্থায় পৌছায়। এরই ইঙ্গিত (ল. বি. ২৪ অ.) দিয়ে বুদ্ধদেব বলছেন—

"মৈত্রীবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।"
(শ্লোক-৬০)

"করুণাবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ॥"
(শ্লোক-৬১)

"মুদিতাবলেন জিত্বা পীতো মেঽস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।"
(শ্লোক-৬২)

"ভিন্না ময়া হ্যবিদ্যা দীপ্তেন জ্ঞানকঠিনবজ্রেণ।"
শ্লোক-৬৬)

—"আমি এই বোধিমূলে বসিয়া প্রেমবলে জয় করিয়া অমৃতরস পান করিয়াছি, দয়াবলে জয় করিয়া অমৃতরস পান করিয়াছি, আমি প্রদীপ্ত জ্ঞানাশনি দ্বারা অবিদ্যা ছেদন করিয়াছি॥"[3]

মুক্তি অবস্থাটি কিরূপ? যিনি মুক্তিলাভ করেছেন সেই মুক্তপুরুষ বা আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞের লক্ষণগুলি আলোচনা করলেই এ-বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যাবে। বিভিন্ন উপনিষদ্ এই অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করছেন,—"তরতি শোকম্ আত্মবিৎ" (ছা. উ. ৭।১।৩)—আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোক অতিক্রম করেন; "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" (মু. উ. ৩।২।৯)—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান; "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি" (তৈ. উ. ২।৯।৪০)—সেই আনন্দময় ব্রহ্মকে জেনে তিনি কোনও কিছু থেকে ভয় পান না; "যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥" (ক. উ. ২।৩।১৪)—যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা হতে মানুষ মুক্ত হয়, তখন মরণশীল মানুষ অমৃত (অমর) হয় এবং এই দেহেই

---

২ শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব—সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, নববিধান পাব্লিকেশন্ কমিটি, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩

৩ ঐ, পৃঃ ১৫৬

ব্রহ্মসম্ভোগ করে।

বিভিন্ন উপনিষদের উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে মুক্ত পুরুষ সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি তার সকল বাসনা ও শোকের হয়েছে আত্যন্তিক নাশ, তিনি অভয়প্রাপ্ত হয়েছেন আর ক্ষুদ্র সান্তের গণ্ডী অতিক্রম করে অনন্তে প্রবেশ করেছেন। ললিতবিস্তরের উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি পাশাপাশি রাখলে আমরা দেখতে পাই নির্বাণ-অবস্থা আর এই মুক্ত-অবস্থার মধ্যে কোনও ভেদই নেই।

"যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান"—এই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণে বেদান্ত বলছেন, তিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ তাঁর সত্তা বা অস্তিত্ব আছে, চৈতন্য বা জ্ঞান আছে এবং আনন্দ আছে অর্থাৎ এই মুক্তি অবস্থাটিতে অসৎ, অজ্ঞান ও নিরানন্দ ভাবের প্রতিষেধ করা হচ্ছে। এখন নির্বাণ-প্রসঙ্গে আসা যাক।

নির্বাণ-অবস্থাকে বেশ কিছু সমালোচক দীপ নিভে যাওয়ার মতো একটা ব্যাপার বা জীবের নিঃশেষে বিনাশ এই অর্থ করেছেন এবং বুদ্ধের জীবৎ কালেই তাঁকে নাস্তিক বলেছেন এই অর্থে যে, তিনি কোনও প্রকার সত্তার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না। এটি জানতে পেরে বুদ্ধদেব স্বয়ং তার প্রতিবাদকল্পে মন্তব্য করেছেন, "এই শ্রমণ গৌতম একজন নাস্তিক; সে প্রচার করে, 'যাকে মূল সত্তা বলি তা ধ্বংস হয়ে যায়, বিনষ্ট হয়ে যায়, মরে যায়'; আমি যা নই, যা আমার প্রচারিত তত্ত্ব নয়, তাই আমার ওপর আরোপ করে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়।" (মঝ্‌ঝিম নিকায়, ২২)[৪]। প্রকৃতপক্ষে তিনি আপেক্ষিক পরিবর্তনশীল জগতের পশ্চাৎপটে যে নিত্য অপরিণামী সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বেদান্তের যে 'সৎ'—ত্রিকালাবাধিত সত্যবস্তু তাতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সূত্রপিটকের অন্তর্গত উদানে তাঁর এ-প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি, "হে আমার অনুগামিগণ, এমন একটা কিছু আছে যা জন্মায় না, নির্মিত হয় না, বা সৃষ্ট হয় না, বা বিভক্ত হয় না। এমন একটি জন্মবন্ধনমুক্ত সত্তা যদি না থাকত, তা হলে যা জন্মগ্রহণ করে তার নিষ্ক্রমণের পথ থাকত না।" (উদান, ৮।৩)।[৫] সুরঙ্গমসূত্রে বুদ্ধদেব বলছেন, "অনেকের ধারণা যে, নির্বাণের পথ হল ইন্দ্রিয়সহ ব্যক্তি-মনের বিনাশ; তারা জানে না যে নির্বাণ ও বিশ্ব-মন একই বস্তু।"[৬] অতএব এই সিদ্ধান্তেই আমরা আসতে পারি যে, ভগবান বুদ্ধ সকল নাম-রূপাত্মক প্রপঞ্চকে অস্বীকার করে এর পারে যে শান্ত, গম্ভীর, একরসাত্মক মৌলিক সত্তা আছে, তা স্বীকার করেছেন, আর নির্বাণের অর্থই হল এই জীবরূপ ঘট ভেঙে ফেলে সেই মহাসাগরের সাথে এক হয়ে যাওয়া; এ যেন বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞের "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" অবস্থারই অনুরূপ। (মু. উ. ৩।২।৮)।

ললিতবিস্তরে নির্বাণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, "নাস্ত্যন্তরেঽস্য নাশো যথা চ বর বোধি লব্ধা" (ল. বি. ২২ অ. ১০ শ্লোক)—উত্তরকালেও এর বিনাশ নেই, কেননা ইনি শ্রেষ্ঠ বোধি (বিশুদ্ধ জ্ঞান) লাভ করেছেন। অতএব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, জ্ঞান এখানে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আবার ধম্মপদে একাধিকবার "নিব্‌বানং পরমং সুখং" এই বাক্যের দ্বারা নির্বাণে পরম সুখ বা পরম আনন্দ যে আছে তা বোঝানো হচ্ছে।

৪ ধম্মপদ, হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ৩৮
৫ ঐ, পৃঃ ৩৮
৬ ঐ, পৃঃ ৩৭

তাহলে নির্বাণ অবস্থাতেও সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ তিনটি ভাবই থাকছে অর্থাৎ এখানেও অসৎ, অজ্ঞান ও নিরানন্দের প্রতিষেধ করা হচ্ছে।

এখন, যে মুক্তি বা আত্মজ্ঞান লাভ করে, জীব ব্রহ্মই হয়ে যায় বেদান্ত প্রতিপাদ্য সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে শেষ কথা কি? মন-বুদ্ধির পারে অবস্থিত যে অবস্থা সম্পর্কে শ্রুতি বলছেন, "যন্মনসা ন মনুতে" (কে. উ. ১।৬)—যাঁকে মনের দ্বারা লোকে চিন্তা করতে পারে না—তা কি শুধু অস্তি মাত্র না আরও কিছু? কঠোপনিষদের (ক. উ. ২।৩।১৩) শেষ পর্বের একটি শ্লোকে বলা হচ্ছে—

"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥"

—"আত্মাকে, আছেন এইরূপই (সোপাধিকভাবে) এবং তত্ত্বরূপে (নিরুপাধিকভাবে)-ই উপলব্ধি করিবে। সোপাধিক ও নিরুপাধিক স্বরূপের মধ্যে প্রথমে আছেন এইরূপেই উপলব্ধির বিষয়ীভূত আত্মার তত্ত্বভাগ অর্থাৎ নিরুপাধিক স্বরূপ সাধকের নিকট প্রকাশিত হয়।" উপরের শ্লোকের ভাষ্য প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য লিখছেন, "পূর্বম্ অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য আত্মনঃ সৎকার্যোপাধিকৃতাস্তিত্ব-প্রত্যয়েনোপলব্ধস্যেত্যর্থঃ। পশ্চাৎ প্রত্যস্তমিতসর্বোপাধিরূপ-আত্মনঃ তত্ত্বভাবঃ বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যোঽদ্বয়স্বভাবো 'নেতি নেতি' 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্' 'অদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে' ইত্যাদি শ্রুতিনির্দিষ্টঃ প্রসীদতি অভিমুখীভবতি আত্মনঃ প্রকাশনায় পূর্বমস্তীত্যুপলব্ধবত ইত্যেতৎ।" —প্রথমে 'অস্তি'—আছেন এইভাবে আত্মার উপলব্ধি হইলে অর্থাৎ জগদ্রূপকার্য সদ্রূপে প্রতীত হচ্ছে, এই সকল কার্যরূপ উপাধির দ্বারা এর একটি কারণ আছে, সেই কারণই আত্মা, তিনি আছেন এইভাবে প্রথমে আত্মা উপলব্ধ হলে, পরে "এই নয়, এই নয়" "স্থূল নয়, অণু নয়, হ্রস্ব নয়" "দৃশ্যভাবশূন্য" আত্মীয়রহিত, শব্দের অবিষয়, অনাশ্রয় আত্মাতে" ইত্যাদি শ্রুতিনির্দিষ্ট, সমস্ত উপাধিশূন্য, জ্ঞাত হতে ভিন্ন, অজ্ঞাত হতে ভিন্ন এমন যে অদ্বয়স্বরূপ আত্মার তত্ত্বভাব তা প্রসন্ন হয় অর্থাৎ অভিমুখ হয়। আত্মজ্ঞানের জন্য প্রথমে যিনি "আত্মা আছেন" এইরূপ উপলব্ধি করেছেন—তাঁর নিকটই আত্মার তত্ত্বভাব প্রকাশিত হয়। অতএব বেদান্তমতেও সাধকের আত্মজ্ঞানের চরম অবস্থায় অস্তি-নাস্তি, জ্ঞান-অজ্ঞান, আনন্দ-নিরানন্দ কিছুই বলা যায় না; এ-সবই বুদ্ধিকে তত্ত্বাভিমুখী করার প্রয়াস মাত্র। চরম তত্ত্ব উপাধিরহিত, কার্যরহিত, মন-বুদ্ধির পারের অবস্থা,—কোনও কার্য-কারণ সম্বন্ধ এখানে নেই। বুদ্ধ-প্রচারিত নির্বাণ অবস্থাও এটাই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাই ব্রহ্মের চরম তত্ত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে শেষ কথা বলছেন: "অথাত আদেশো নেতি নেতি" (বৃ. উ. ২।৩।৬)—কোন ইতি-বাচক বাক্যের দ্বারাই তাঁর স্বরূপনির্দেশ সম্ভব নয়; এমন কি তিনি 'জ্ঞানস্বরূপ', 'আনন্দস্বরূপ' এর দ্বারাও নয়। এটাই শঙ্করাচার্য উপরের মন্ত্রের ভাষ্যপ্রসঙ্গে বলছেন, "অধ্যারোপিতনামরূপ-কর্মদ্বারেণ ব্রহ্ম নির্দিশ্যতে—'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' 'বিজ্ঞানঘন এব ব্রহ্মাত্মা' ইত্যেবমাদিশব্দৈঃ। যদা পুনঃ স্বরূপমেব নির্দিদিক্ষিতং ভবতি নিরস্তসর্বোপাধিবিশেষম্, তদা ন শক্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ নির্দেষ্টুম্; তদায়মেবাভ্যুপায়ঃ, যদুত প্রাপ্তনির্দেশ-প্রতিষেধদ্বারেণ 'নেতি নেতি' ইতি নির্দেশঃ।"—[ব্রহ্মে কোনও বিশেষ ধর্ম না থাকায় যেহেতু 'এটি ব্রহ্ম' বলে কখনই ব্রহ্মের নির্দেশ করতে পারা যায় না,] এই জন্যই "ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ" "বিজ্ঞানঘন আত্মাই ব্রহ্ম" ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্রহ্মে নাম, রূপ ও কর্ম সমারোপণপূর্বক তার সাহায্যেই ব্রহ্মের নির্দেশ করে থাকে। পক্ষান্তরে, যখন তাঁর সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত নির্বিশেষ স্বরূপের নির্দেশ করাই অভিপ্রেত হয়,

তখন তো কোন প্রকারেই তা নির্দেশ করতে পারা যায় না ; তখন কেবল আরোপিত ধর্মগুলির প্রতিষেধ দ্বারা 'নেতি নেতি' বলে নির্দেশই তাঁর স্বরূপ নির্দেশের একমাত্র উপায়।

বেদান্তপ্রতিপাদ্য নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বকে যেহেতু কোনও 'ইতি' বাক্যের দ্বারা নির্দেশ করা যায় না, সেহেতু ভগবান বুদ্ধদেবও নির্বাণ অবস্থাটির বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা বিশদভাবে কোথাও করেননি, —বরং বলা যেতে পারে ঈশ্বর, সৃষ্টিতত্ত্ব, পরলোক ইত্যাদির ন্যায় এ-প্রসঙ্গও তিনি অনেকটা এড়িয়ে গেছেন। তবে সকল দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের কারণ নির্বাণলাভের উপায় হিসাবে জগদ্‌বাসীর কাছে তাঁর বহু বিখ্যাত অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রচার করে গেছেন।

ভাবমুখ ও অভাবমুখ এই দুদিক থেকে বিচার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছালাম যে, নির্বাণ ও মুক্তি একই অবস্থার ভিন্ন নাম মাত্র। পরিশেষে এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দুটি উক্তি দিয়ে আমরা এই আলোচনার ইতি টানবো—"শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্তিত মতে ও বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।"[৮] "নাস্তিক কেন ? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বুদ্ধ কি জান ? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে ক'রে,—তাই হওয়া,—বোধ-স্বরূপ হওয়া।"[৯]

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, (১৩৭৭), পৃঃ ৩৭৪
৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।২৫।১

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ঃ মূর্তিমান সন্ন্যাস

স্বামী সর্বদেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বৈদ্যকুলতিলক শিবানন্দ সেন জগদানন্দের হাতে বায়ুস্নিগ্ধকর এক কলস সুগন্ধি তৈল মহাপ্রভুর জন্য পাঠান। কিন্তু সুগন্ধি তৈল মাথায় দেওয়া সন্ন্যাসীর আদর্শ নয় বলিয়া মহাপ্রভু তাহা বর্জন করিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে সুন্দর বর্ণনা আছে—

"প্রভু কহে সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার॥···
দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আবার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল প্রভু করে অঙ্গীকার॥"

"শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচনে।
মর্দনিয়া রাখ এক করিতে মর্দনে॥
এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
আমার সর্বনাশ তোমা সবার পরিহাস॥
পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যে পাইবে।
দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে॥"

সন্ন্যাসীর কঠিন আদর্শ—সর্বস্ব ত্যাগ ও জগৎ শিক্ষণ দুটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে এই তীব্র ভর্ৎসনার মধ্য দিয়া—"আমার সর্বনাশ তোমা সবার পরিহাস"! তিনি ঐ তৈল জগন্নাথের দীপের জন্য ব্যবহারের উপদেশ দেন। ঘটনার পরিসমাপ্তি অন্যভাবে হইয়াছে তবুও অনমনীয় সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার আদর্শে অটুটই ছিলেন।

মহাপ্রভুর জীবনের আর একটি মাধুর্যপূর্ণ ঘটনা —মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন দান। আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। সন্ন্যাসী রাজদর্শন করেন না—কামকাঞ্চনাসক্ত বিষয়ি-সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য! উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্র পরম ভক্ত,—চৈতন্য-দর্শন ইচ্ছায় ব্যাকুল।—

বাসুদেব সার্বভৌম মহাপ্রভুকে অনুনয় করিতেছেন কিন্তু—

"কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥
সার্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম॥
প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার॥
ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ হেথা আমা না দেখিবে॥"
—(২।১১।১৪৬)

সন্ন্যাসের এই আদর্শ—রাজা বা বিষয়িদর্শন ত্যজ্য—'স্ত্রী-দর্শনসম বিষের ভক্ষণ'। কারণ ঐ বিষয়ীর সংস্পর্শে সন্ন্যাসীর মনে বিষয়-বাসনা জাগিতে পারে। তাই এই কঠোর আচার জগৎ শিক্ষণের জন্য।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র কিন্তু দর্শনব্যাকুল। রায় রামানন্দ তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া মহাপ্রভুকে সুযোগমতো রাজার ভগবদ্‌ভক্তি, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, প্রজাবাৎসল্য, দয়া ইত্যাদি গুণের কথা বলিতে লাগিলেন। অবশেষে চৈতন্যদেব ঈষৎ স্নেহপ্রবণ হইয়া বলিলেন—

"যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব গুণবান্।
তাহারে মলিন কৈল এক রাজা নাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়
তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয়॥"

পুত্রের প্রতি কৃপায় রাজার হৃদয় ঈষৎ শান্ত হইলেও মহাপ্রভু-দর্শন-স্পর্শনের বাসনা আরও বর্ধিত হইল। 'রাজা নাম', রাজা-অভিমানের বাহ্যরূপও ত্যাগ করার জন্য পুত্রের উপর রাজত্বের ভার দিতেও প্রয়াসী হইলেন প্রতাপরুদ্র। হুসেন শাহের আক্রমণে উড়িষ্যা মুসলমান শাসনে চলিয়া যাইবে এই ভয়ে সার্বভৌম এই সঙ্কল্প হইতে প্রতাপরুদ্রকে নিবৃত্ত করিলেন। ক্রমে রথযাত্রার সময় উপস্থিত হইল। রথযাত্রার দিন ভোরে রথ আসিবার পথ রাজা স্বহস্তে মার্জনী লইয়া পরিষ্কার করিতেছেন।

"উত্তম হইয়া রাজা করে তুচ্ছ সেবন
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন।"

গুণ্ডিচাবাড়ির দিকে রথ আগাইয়া যাইতেছে।—মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে কীর্তনে উন্মত্ত, কখনও বিরহে ব্যাকুল, কখনও ভাবে গর্গর মাতোয়ারা, কভুবা সমাধিস্থ। বাহ্যহারা চৈতন্যদেবের শরীর রক্ষার জন্য কাশীশ্বর, নিত্যানন্দ, গোবিন্দ প্রমুখ ভক্তরা কাছে কাছে চলিতেছেন। কিন্তু একবার ঐ অন্তর্দশায় সেবকরা সামলাইতে না পারায় প্রতাপরুদ্র হাত বাড়াইয়া শ্রীঅঙ্গ ধরিয়া ফেলেন। ইহাতে ভাবভঙ্গ হইল। তখন "রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার। / ছি ছি বিষয়ি-স্পর্শ হইল আমার॥" চৈতন্যদেবের 'ধিক্কার' শ্রবণে রাজা অত্যন্ত ভীত ও সঙ্কুচিত হইলেন। এমনি করিয়া প্রতাপরুদ্রের রাজ-অভিমানকে ধীরে ধীরে চূর্ণ করিয়া তাঁহার কাঁচা অহং-কে শরণাগতির পাকা অহং-এ উত্তীর্ণ করিলেন মহাপ্রভু। রথ গুণ্ডিচাবাড়ির পথে 'বলগণ্ডি' নামক স্থানে আসিলে ভক্তরা জগন্নাথদেবকে ভোগ দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ক্লান্ত দেহে বিশ্রামের জন্য চৈতন্যদেব নিকটবর্তী নরেন্দ্র সরোবরের তীরে এক বৃক্ষতলে শয়ান থাকিয়া গোপীগীতা হইতে আবৃত্তি করিতে করিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন। রামানন্দ ও সার্বভৌমের ইঙ্গিতে প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ এক ভক্তের বেশে তন্দ্রাচ্ছন্ন মহাপ্রভুর চরণ-স্পর্শের দুঃসাহস করেন।—মুখে উচ্চারিত হইতেছিল ভাগবতের গোপী-গীতোক্ত সেই বিখ্যাত শ্লোক—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"

—শ্লোক শ্রবণমাত্রেই মহাপ্রভু চমকিত পুলকে অকস্মাৎ উঠিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন দিলেন। চরিতামৃতকারের অপূর্ব ভাষায় সে বর্ণনা—

"আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ সংবাহন॥
'তব কথামৃতম্' শ্লোক রাজা যেমতি পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু নাই দিনু আলিঙ্গন দান॥"

ভাবের আবেগে মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন—'ভূরিদা জনাঃ'—আহা, কে তুমি আমাকে কৃষ্ণলীলামৃত শোনাইলে, আমাকে জীবন দান করিলে?

"প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত॥"

আশ্চর্য ভাব-গম্ভীর এই দৃশ্য! রাজ-অভিমান-ত্যাগী প্রতাপরুদ্রকে "ভূরিদা" আখ্যা প্রদান সহ কী অপূর্ব কৃপা!—দানবীরদের অন্যতম হইবার সম্মান প্রদান করিয়া, আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন তাঁহাকে, যাঁহাকে এতাবৎ বিষয়ী বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। অপূর্ব সন্ন্যাসাদর্শের ছবি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ত্যাগ-বৈরাগ্যের খুঁটিনাটি আদর্শগুলিকেও কীরূপ সম্মান দেখাইতেন তাহা তাঁহার দৈনন্দিন জীবনচর্যার রীতি পর্যবেক্ষণ করিলেই আমাদের নিকট উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সার্বভৌম স্বহস্তে তাঁহার জিহ্বাতে চিনি প্রদান করিয়াও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রসনা আদৌ সিক্ত হয় নাই।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রতি নন্দোৎসবের সময় মূল্যবান বস্ত্র মহাপ্রভুকে উপহার প্রদান করিতেন। তিনি উহা স্বয়ং ব্যবহার না করিয়া লোক মারফত নবদ্বীপে জননী শচীদেবীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। সর্বদা ভগবদ্ভাবে তন্ময়—তবুও সন্ন্যাসজীবনের বাহ্য আদর্শগুলি পলকের জন্যও তিনি বিস্মৃত হইতেন না। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের আদর্শকে নিজেই শুধু পালন করিতেন তাহা নহে,—অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সেবক সন্তানদের মধ্যেও তাহা সযত্নে উপ্ত করিতেন। আপাতদৃষ্টে উহা অতীব কঠোর মনে হইলেও অন্তর্নিহিত শিক্ষাটি থাকিত যেন ফল্গুর স্নিগ্ধ ধারা। উদাহরণ স্বরূপ এমনই একটি ঘটনা এখানে স্মরণ করা চলে:

পুরীতে একদিন ভক্ত ভাগবতাচার্য চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ভিক্ষা গ্রহণের জন্য। প্রভুর একনিষ্ঠ সেবক ছোট হরিদাসকে আচার্য ডাকিয়া বিশিষ্ট ভক্ত শিখি মাইতির ভগিনী শ্রীমতী মাধুরী দেবীর নিকট হইতে কিছু উত্তম সুগন্ধি মিহি চাউল আনিবার জন্য পাঠান। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে মাধুরী দেবী কিন্তু একজন সাধারণ মহিলা ছিলেন না—'রাধিকার গণ' বলিয়া যে সাড়ে তিন জনকে মহাপ্রভু নির্দেশ করিতেন তাঁহাদের অর্ধজন। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়—

"মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধুরী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥"

স্বরূপ গোসাঞি, রামানন্দ, "শিখিমাইতি তিন আর ভগিনী অর্দ্ধজন"। এ হেন 'বৃদ্ধা তপস্বিনী' 'পরম বৈষ্ণবী'র নিকট হইতে লব্ধ অন্ন অত্যন্ত শুদ্ধ হইবে—এই ভাবই আচার্যের নির্দেশ। ঐ নির্দেশ পালন ও মহাপ্রভুর সন্তোষ-বিধান—এই দুই উদ্দেশ্যে ছোট হরিদাস চাউল ভিক্ষা লইয়া আসিলেন। আচার্য অত্যন্ত

আনন্দিত হইয়া প্রভুসেবার জন্য অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন। মধ্যাহ্নে আহারে বসিয়া চৈতন্যদেব উত্তম 'শাল্যন্ন' দেখিয়া তুষ্ট হইয়া আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথা হইতে এমন সুগন্ধি চাউল সংগ্রহ করিলে? শ্রীমতী মাধুরী দেবীর নিকট হইতে ছোট হরিদাসকে দিয়া তিনি ঐ চাউল সংগ্রহ করিয়াছেন—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু মুখে কিছু না বলিয়া একটু গম্ভীর হইলেন। আচার্যকে অন্নের প্রশংসা করিয়া ভোজনান্তে গম্ভীরায় ফিরিলেন। সুমিষ্টকণ্ঠ ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর ভাব বুঝিয়া নিত্য কীর্তন গাহিয়া শুনাইতেন। উহা ছিল তাঁহার গুরু-সেবা তথা ভগবদ্-ভজনেরই অঙ্গ। সেদিনও আসিয়াছেন—কিন্তু গোবিন্দের মুখ হইতে শুনিলেন যে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন।

প্রভুর এই নিষেধ শুনিয়া ছোট হরিদাস বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেলেন। প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তিনি অন্নজল ত্যাগ করিয়া অবিরাম অশ্রুজলে ভাসিতে থাকেন। চরিতামৃতকারের ভাষায়—

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাইয়া বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

অন্তরঙ্গ প্রিয় ভক্তগণ সকলে মিলিয়া, ছোট হরিদাসের জন্য মিনতি জানাইলে মহাপ্রভু কঠোর উত্তর দিয়াছিলেন—"কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা"! ছোট হরিদাস দূরে দাঁড়াইয়া চৈতন্যদেবকে দর্শন করিতেন—যখন তিনি জগন্নাথ দর্শনে যাইতেন। এক বৎসর এমনি ভাবে চলার পরও ছোট হরিদাসের প্রতি তাঁহার কৃপা হইল না।

তখন—"দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে॥"

—সকল বৈষ্ণব ভক্ত বিশেষতঃ স্বরূপাদি অন্তরঙ্গদের মহাশিক্ষা লাভ হইল।

অবশেষে পুরীধাম ত্যাগ করিয়া ছোট হরিদাস চিরদিনের মতো চলিয়া যান,—এবং জানা যায় যে, প্রয়াগতীর্থে তিনি প্রায়োপবেশনে দেহ বিসর্জন দিয়াছেন।

ত্যাগ ও তপস্যার পূত অগ্নিতে শোধিত না হইলে কেহই আদর্শ সন্ন্যাসী হইতে পারে না। আমরা এমনই একটি জীবন-গঠনের পশ্চাতে আদর্শ শিক্ষাদাতা শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিব। চৈতন্য পরিকরগণের মধ্যে দাস রঘুনাথ বা স্বরূপের রঘু—এই নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। সপ্তগ্রামের রাজার কুমার রঘুনাথের মন শিশুকাল হইতেই বিষয়-বিমুখ। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথকে ঘরে বাঁধিয়া রাখা দুষ্কর হইল। ভজননিষ্ঠ রঘু ত্যাগের আদর্শে নিজেকে সঁপিয়া দিতে চাহিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে 'মর্কট বৈরাগ্য ছাড়ি' বিষয়-বাসনা নির্মূল করিবার সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। রঘুনাথ তখন 'ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব কর্ম'—এই ভাবেই সংসারে রহিলেন বটে,—কিন্তু পানিহাটিতে নিত্যানন্দ প্রভুর আগমন হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ সংস্পর্শ পাইয়া রঘুনাথের অন্তরের বৈরাগ্য-অনল তীব্রতর হইয়া জ্বলিয়া ওঠে। রঘুনাথের মাতা সন্তানকে ঘরে বাঁধিয়া রাখার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু হায়, 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য' 'স্ত্রী অপ্সরাসম' বন্ধনও রঘুনাথকে বাঁধিতে পারে নাই। মহাপ্রভু তখন পুরীধামে। ধনীর গৃহে সুখে লালিত রঘুনাথ ছুটিয়া চলিয়াছেন গৃহ ছাড়িয়া জগন্নাথ ক্ষেত্রে। নগ্নপদে অর্ধাশনে অনশনে দীর্ঘ আড়াই শত মাইল

অতিক্রম করিয়া মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ হইলেন।

"বারো দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন॥"

বৈরাগ্যের এই ভাব দেখিয়া—

"প্রভু কহে 'আইস' তেঁহো ধরিল চরণ।
উঠি প্রভু কৃপায় তারে করিল আলিঙ্গন॥"

মহাপ্রভু আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সেবা হৈতে। / তোমাকে কাঢ়িল বিষম বিষ্ঠা-গর্ত হৈতে॥" কাম-কাঞ্চনের বিষয়-গর্ত হইতে রঘুনাথ রক্ষা পাইলেন—তাই এত আনন্দ মহাপ্রভুর!

শ্রীচৈতন্যদেব পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষীণ, ক্ষুধার্ত রঘুনাথকে স্বরূপের হস্তে অর্পণ করিলেন—তাঁহার ভাবী ত্যাগজীবনকে সুদৃঢ় করিবার দায়িত্ব দিয়া। রঘুনাথ সমুদ্রস্নান সারিয়া জগন্নাথ দর্শনান্তে আসিলে গোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশিষ্ট প্রসাদ খাইতে দিলেন। রঘু আনন্দিত মনে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এমনি ভাবে পাঁচদিন মাত্র গ্রহণ করিবার পরই রঘুর বৈরাগ্যপ্রবণ অন্তর আরও ভজনে ডুবিয়া গেল। সারাদিন নিজ কুটিরে ভজন করিয়া দিনান্তে জগন্নাথ দর্শনে যাইতেন—নীরবে "…পুষ্প-অঞ্জলি দেখিয়া। /সিংহ-দ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া।" আহারের সুব্যবস্থা ছাড়িয়া রঘুনাথ কঠোর বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া চৈতন্যদেব অতীব প্রীত হইলেন—বলিলেন, "ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা।" তীব্র আর্তি মনে—সাধন-তত্ত্ব উপদেশ পাইবার জন্য। তাই রঘুনাথ মহাপ্রভুর কাছে তাঁহার প্রার্থনা স্বরূপ ও গোবিন্দের মারফত জানাইলেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথকে উদ্দেশ করিয়া যে উপদেশ দেন, তাহা সর্বকালের সন্ন্যাসীর নিত্য অবলম্বনীয় ধর্ম—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"

—বিষয় কথা, লৌকিক আলোচনা সন্ন্যাসীর ত্যাজ্য; শরীর ধারণের অতিরিক্ত ভাল খাওয়া-পরা সন্ন্যাসীর আদর্শবিরোধী; নিরহঙ্কার-চিত্তে চৈতন্যদৃষ্টিতে অপরকে সম্মান দান এবং হৃদয়-ব্রজে সচ্চিদানন্দ মনন-ধ্যান—ইহাই সন্ন্যাসীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

মহাপ্রভুর শ্রীমুখে এই নির্দেশ পাইয়া রঘুনাথ আরও ভজনে মগ্ন হইলেন ও তাঁহার সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিলেন। গৌড়ভক্তদের মুখে পুত্রের এই বৈরাগ্যময় জীবনের কঠোরতার কথা শুনিয়া পিতা-মাতা চারিশত মুদ্রাসহ দুই পাচক ও এক ভৃত্য পাঠান রঘুনাথের সেবার জন্য। রঘুনাথ নিজের জন্য কিছুই গ্রহণ করিলেন না। পরে রঘুনাথ মাসে দুইদিন করিয়া মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন—ঐ মুদ্রার সদ্ব্যবহার ও পিতা-মাতার কল্যাণাকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু দুই বৎসর পর রঘুনাথ নিমন্ত্রণ করা ত্যাগ করিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু খুশি হইলেন রঘুনাথের অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়া। চৈতন্যদেব বলিলেন—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল।
ভাল হইল জানিয়া সে (রঘু) আপনি ছাড়িল॥"

ক্রমে রঘুনাথের ভজননিষ্ঠা আরও বর্ধিত হয়। গোবিন্দের নিকট মহাপ্রভু জানিলেন যে, রঘুনাথ সিংহদ্বারে উত্তম ভিক্ষা পান বলিয়া "ছত্রে মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া।" মুখে কোন কথা নাই, ছত্রে যাহা পান তাহাই প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করেন—অবশিষ্ট সময় কেবল ভগবদ্-ভজনে ব্যাপৃত। এই অপূর্ব বৈরাগ্য দেখিয়া—

"প্রভু কহে ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥"

রঘুনাথের অপূর্ব ভজন-নিষ্ঠা চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে—

"সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
সবে চারি দণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে॥"

—ছত্রের ভিক্ষার একটা সময় থাকে—সম্ভবতঃ সে-সময় ভজন ছাড়িয়া তাহার আসা সম্ভব হইত না। ক্রমে ছত্রে ভিক্ষাও ত্যাগ করিলেন। পুরীধামে অবিক্রীত মহাপ্রসাদ পসারীরা ফেলিয়া দেন। গাভীরাও যেগুলি খাইতে পারে না—নর্দমা হইতে সেই পুতি-গন্ধময় মহাপ্রসাদ সবার অলক্ষ্যে তুলিয়া আনিয়া জলে ধুইয়া লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারাই জীবন ধারণ করিতে শুরু করিলেন। স্বরূপ একদিন দেখিয়া ফেলেন—মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া একদিন প্রভাতে রঘুনাথের কুঠিয়ায় আসিয়া হাজির। রঘুনাথ তখন ঐ মহাপ্রসাদ ধুইয়া ইষ্টদেবকে নিবেদন করিতেছেন—চোখ খুলিয়াই মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন। চৈতন্যদেব স্বহস্ত বাড়াইয়া এক মুষ্টি মুখে দিলেন—

"প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদ না পাই॥
এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে॥"

বৈরাগ্যের মূর্তি শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে এমনি আদর্শ সন্ন্যাসী করিয়া গড়িয়া তুলিলেন—যাহা সর্বকালের সন্ন্যাসীর অবলম্বনীয় আদর্শ। ধন্য প্রভু, ধন্য দাস রঘু!

সন্ন্যাসী সর্ববিধ ভালমন্দরূপ দ্বৈতভাবের ঊর্ধ্বে। সন্ন্যাসী জানেন জগৎ মনঃকল্পিত। একটি মাধুর্য-পূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়া মহাপ্রভু স্বয়ং এই ভাবটিকে চমৎকার প্রকট করিয়াছেন। সনাতন গোস্বামী খোস-পাঁচড়ায় ভুগিতেছেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে প্রেমে আলিঙ্গন করেন দেখিয়া সনাতন ভীত হইলেন, পাছে প্রভুর শরীরে এই রোগ প্রবিষ্ট হয়। তাই পুরীধাম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলে চৈতন্যদেব বলিলেন—

"দ্বৈত ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সর্ব মনোধর্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥
আমি তো সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম।...
ঘৃণা বুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম যায়॥"

ঘৃণা-দ্বেষ, ভালমন্দ এই সব মনোধর্ম। তিনি স্বয়ং এসবের ঊর্ধ্বে "আমি তো সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি ধর্ম"—এই অপূর্ব সমদৃষ্টি মুখের কথায় নয়, অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসিপ্রবরের ঘৃণাবুদ্ধি, দ্বৈতবুদ্ধি নাই—তাঁহারই স্বমুখের উদ্ঘোষণ ক্লিন্ন-শরীর সনাতনের কাছে। সন্ন্যাসীর অন্তরের ভাব বাহিরে বুঝা কঠিন—তথাপি এখানে তিনি স্বয়ংই খুলিয়া বলিয়াছেন। অদ্বৈত দৃষ্টিযুক্ত আদর্শ সন্ন্যাসীর রূপটি এখানে আমরা কিঞ্চিৎ-অনুধাবন করিতে পারিলাম।

কমলাকান্ত বিশ্বাস অদ্বৈত আচার্যের ঋণ-মোচনের কথা ভাবিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে তিন শত মুদ্রা ভিক্ষা করিয়া বসেন। মহাপ্রভু এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হন—

"গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ইঁহা আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে॥"

কারণ, বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে মন দুষ্ট হয়—প্রতিগ্রহ না করিয়া কখনও রাজধন স্বীকার করিতে নাই। "মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ"! তাই অত সাবধান। কাঞ্চনত্যাগের এ-এক অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করিলেন, সেদিন কমলাকান্তকে শাসনের মধ্য দিয়া।

নির্মায়া সন্ন্যাসীর আর একটি রূপের অনুধ্যান এখানে করিতে চাই। গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজরোষে পড়িয়াছেন। তিনি রায় রামানন্দের ছোটভাই। তাঁহাকে রাজপুত্ররা চাঙ্গে চড়াইবার আদেশ দিয়াছেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদের গৃহে এই বিপদ দেখিয়া, ভক্তরা চৈতন্যদেবকে প্রার্থনা জানান যাহাতে তিনি রাজাকে বলিয়া

এবারের মতো গোপীনাথের জীবন রক্ষা করান। কিন্তু—

"শুনি মহাপ্রভু কহেন সক্রোধ বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ সব যাই রাজ-স্থানে॥"

তিনি স্পষ্টভাবে বলিলেন—"আমি ভিক্ষু আমা হৈতে কিছু নয়।" সন্ন্যাসী কিন্তু ভক্তদের "জগন্নাথের শরণ লইতে বলিলেন"। তিনি সন্ন্যাস-আদর্শ হইতে চ্যুত হইতে পারেন না। সন্ন্যাস-আদর্শ স্থাপনের জন্য কী কঠোর নিয়ম! এক-দিকে বজ্রের মতো কঠোর হৃদয়—সন্ন্যাস-আদর্শ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, অপর দিকে ভগবৎ-চরণাশ্রয়ের উপদেশ—'কুসুমাদপি কোমল' জীবের প্রতি করুণাময়।

তদানীন্তন ভারতবর্ষ ভুলিয়াছিল তাহার নিজস্ব ত্যাগাদর্শ ও অধ্যাত্মসাধনা। সন্ন্যাসের অর্থ কেবল শুষ্ক বিচার ও বাদানুবাদই মানুষ বুঝিত। ত্যাগের সেই উজ্জ্বল মহিমা যাহা মানুষকে ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত করে, সেই সাধন ও তপস্যা, সেই ব্যাকুলতা ও ভজন-নিষ্ঠা আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীভগবান আবির্ভূত হইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে। তাঁহার জীবন-লীলার প্রতিটি ঘটনাই অধ্যাত্ম-পথিকদের জন্য চিরন্তন দিক্-দর্শন স্বরূপ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী লিখিয়াছেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—'...বাহিরের মধুরভাব সহায়ে তিনি (শ্রীচৈতন্য) লোককল্যাণ সাধন করিতেন এবং অন্তরের অদ্বৈতভাবে প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন।'" সামান্যভাবে মাতৃস্থানীয়াদের প্রতিও আপাতদৃষ্টে নির্মম ছিলেন তিনি,—কিন্তু সাবধান থাকিতে হইবে যে, উহা নারী-বিদ্বেষ হইতে করেন নাই। পরন্তু সন্ন্যাসের সেই সু-উচ্চ আদর্শের দৃষ্টান্ত রক্ষার জন্যই। সামান্য সুগন্ধ তৈল মাথায় দিলে বা একটু কোমল বিছানায় শয়ন করিলে তাঁহার জীবনের ত্যাগ-মহিমা কিছুমাত্র ম্লান হইত না, কিন্তু জগৎ জানিল সন্ন্যাস মানে কেবল মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক বিরজা অগ্নিতে আহুতি প্রদানই নহে,—সর্ব-প্রকার এষণাকে সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ এবং আত্ম-সত্যে প্রতিষ্ঠা! অদ্বৈত আচার্যের জন্য রাজার কাছে অর্থ ভিক্ষা এমন কিছুই নয়—কিন্তু সন্ন্যাসাদর্শের কাছে এটি একটি ভীষণ ব্যাপার—তাই এত কঠোর দেখি তাঁহাকে। সনাতন গোস্বামীর গায়ে একটি ভোট কম্বল থাকা এমন কিছুই নয়—কিন্তু আদর্শ সন্ন্যাস-জীবনের কাছে উহাও ভোগই! ছোট হরিদাস নিজ ইচ্ছায় মাধুরী দেবীর নিকট সুগন্ধি চাউল সংগ্রহে যান নাই; ভাগবতাচার্যের ইচ্ছায় এবং নিজ প্রভুর সেবার জন্য তাঁহারই অন্তরঙ্গ জনের কাছে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে ভাবীকালের সন্ন্যাস-অনুগামীদের জীবনে কোনও রন্ধ্রপথে কামিনী-কাঞ্চনাসক্তি আসিয়া জীবন-লক্ষ্য হইতে তাহাদিগকে সরাইয়া দেয়, সন্ন্যাসিকুলের জন্য সেই অত্যুজ্জ্বল আদর্শ রক্ষার্থই ছোট হরিদাসকে তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন;—যদিও ইহা মূলতঃ ত্যাগ বলিয়া মনে হইলেও শিষ্যকে তাঁহার শুদ্ধ-স্বরূপে গ্রহণই ইহার তাৎপর্য! জগৎ এত বড় ত্যাগের আদর্শ খুব বেশি দেখে নাই।

ভগবান লাভের জন্য পিতামাতা-স্ত্রী-পুত্র-পরিজন অর্থবিত্ত সব ত্যাগ। স্থূল ত্যাগই নহে—মনের সুপ্ত স্তরেও এতটুকু ভোগবাসনা যাহাতে আবার মাথা চাড়া দিতে না পারে—তাই সন্ন্যাসাদর্শকে অপূর্ব চারিটি পঙ্‌ক্তিতে 'স্বরূপের রঘু'কে উপদেশ দিয়াছিলেন। ধনীর আদরের দুলাল রঘুনাথ উত্তরোত্তর যতই কঠোর ত্যাগ-বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন 'সাড়ে সাত প্রহর' পর্যন্ত ভজনে তন্ময় হইতেছেন—মহাপ্রভুও ততই অধিকাধিক উল্লসিত হইতেছেন। চৈতন্য-

দেবের মনোভাবে সন্ন্যাস কি অপূর্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এই ত্যাগোজ্জ্বল জীবনালেখ্যের মাধ্যমে! মহাপ্রভুর জীবন-দর্পণে ভারতবর্ষের যে মহা-মহিমান্বিত ত্যাগ প্রকটিত—সাধারণ মানব তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। গম্ভীরার মধ্যে ঐ স্বল্পপরিসর স্থান, সে যেন এবারের দক্ষিণেশ্বর! —কত ভাব-সমাধি, কত দর্শন-উপলব্ধি সেখানে! কখনও অন্তর্দশায় সমাধির গভীরে দেহে প্রাণস্পন্দনহীন, কখনও অর্ধবাহ্যদশায় ভাবাবস্থায় লীলা আস্বাদন, আবার কখনও বা নর্তন-কীর্তন-ভজনানন্দে মগ্ন। এই তিন ভাব ছাড়া তাঁহার বোধ হয় অন্য কোনও ভাবে অবস্থান সম্ভবই ছিল না। ঠিক যেন 'দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায়'—কয়েক শতাব্দী আগের প্রকাশ! আমরা কেবলমাত্র প্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেবকে দেখিলে তাঁহার সমগ্র জীবনের ইতিবৃত্তের অসম্পূর্ণ অনুধ্যান হইবারই আশঙ্কা,—তাঁহার গৈরিকোজ্জ্বল সমাধি-রস-মগ্ন আনন্দঘন রূপটি যাহা তাঁহার রঘুনাথ, সনাতন, রূপ প্রমুখ অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মানসনয়নে সদা প্রকট থাকিত, তাহাকেও আমাদের নয়ন-পথে আনার আবশ্যকতা রহিয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী—ত্যাগ ও প্রেমের যিনি সাকার বিগ্রহ,—তিনিই আমাদের নিত্যকালের আদর্শ ও উপাস্য।

ভক্তমিলন-তীর্থ বাগবাজার

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[ফাল্গুন, ১৩৮৯ সংখ্যার পর]

কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণের যত ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন, তার মধ্যে সম্ভবতঃ বাগবাজার অঞ্চলে তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন সর্বাধিক এবং এই অঞ্চলের অনেক ভক্তগৃহেও বহুবার তাঁর পদধূলি পড়েছে। রাত্রিযাপনও করেছেন তিনি কোন ভাগ্যবান ভক্তের আলয়ে। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "কোন দিন বাদ নাই, কোন রাত্রি বাদ নাই, ভক্তসঙ্গে সদাই আনন্দে থাকিতেন। প্রতি সপ্তাহের শনিবারে কোন একজন ভক্তের বাটীতে আসিতেন। তথায় কীর্তন, নৃত্য ও উচ্চ হরি-ধ্বনিতে সে বাটী ও পল্লী পুলকার্ণবে ভাসাইয়া যাইতেন। তাঁহার হরিনামসঙ্কীর্তনে যে কত পাষণ্ড দলিত হইয়াছে, তাহার সীমা নাই।"[৫] আমরা এ পর্যন্ত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা থেকে যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে একরকম ধরে নেওয়া চলে যে, বাগবাজারের বিশিষ্ট ভক্তদের সংখ্যা মোট তেত্রিশ। এঁদের পরিবারবর্গের মধ্যে যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছেন, তাঁদের সবার নাম ধরলে এই সংখ্যা হবে আরো বেশী। নামগুলি হল: (১) দীননাথ মুখোপাধ্যায় (২) দীননাথ বসু (৩) কালীনাথ বসু (৪) বলরাম বসু (৫) গিরিশ ঘোষ (৬) নন্দ বসু ও পশুপতি বসু (৭) যোগীন-মা (৮) গোলাপ-মা (৯) শিশির ঘোষ (১০) চুনী-লাল বসু (১১) স্বামী অখণ্ডানন্দ (১২) স্বামী নির্মলানন্দ (১৩) ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ (১৪) স্বামী তুরীয়ানন্দ (১৫) বৈকুণ্ঠ সান্যাল (১৬) মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৭) প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮) ভাই ভূপতি (১৯) দেবেন্দ্রনাথ বসু (২০) তেজচন্দ্র (২১) নারায়ণ (২২) হরিপদ (২৩) পদ্মবিনোদ (২৪) ছোট নরেন (২৫) পল্টু (২৬) মন্মথ গুণ্ডা

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত—রামচন্দ্র দত্ত (৭ম সংস্করণ ১৩৫৭), পৃঃ ১০৭ [এরপর থেকে শুধু 'জীবন বৃত্তান্ত']।

(২৭) অমৃতলাল বসু (২৮) রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২৯) রামদয়াল (৩০) ফকির (৩১) কৃষ্ণভাবিনী (৩২) দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও (৩৩) হরিবাবু। তখনকারদিনে বাগবাজার[৬] অঞ্চলে বিভিন্ন পাড়া ছিল। যথা—বোস পাড়া, রাজবল্লভ পাড়া, নেবু বাগান প্রভৃতি। অদূরে শ্যামপুকুরের বাটী—শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যলীলার স্থান। ওরই আশপাশে ভক্তদের বাড়ী—ক্যাপ্তেন, দানাকালী, মোটা বামুন প্রভৃতি। ক্রমিক সংখ্যা (১) থেকে (১০) পর্যন্ত বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পদধূলি দিয়েছেন। বুঝবার সুবিধার জন্য একটি মানচিত্র[৭] সন্নিবেশিত হল। মানচিত্রে ঐ স্থানগুলি গোলাকার চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত। বাকী অন্য ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পেতেন দক্ষিণেশ্বরে অথবা কলকাতায় কোন ভক্তের বাড়ীতে। মানচিত্রে চতুষ্কোণ রেখাঙ্কিত [১] থেকে [৫] বাড়ীগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণ হয়নি [প্রবন্ধে উল্লিখিত ক্রমিক সংখ্যা (১১) থেকে (১৫)]। কিন্তু বাড়ীগুলির জায়গা এখনও বর্তমান। তবে একটি ছাড়া অন্য বাড়ীগুলি ভেঙে ঠিক সেই জায়গাতে নতুন বাড়ী তৈরী হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা (১৬) থেকে (৩৩) পর্যন্ত বাড়ীগুলির অস্তিত্ব আর নেই—কালগতিতে তা এখন নিশ্চিহ্ন। স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিদের কাছে খোঁজ নিয়েও কোন হদিস করতে পারা গেল না। ক্রমিক সংখ্যা (২৯) এবং (৩০) অর্থাৎ রামদয়াল ও ফকিরের বাসস্থান ছিল বলরাম বসুর বাড়ীতেই। প্রথম দশজনের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাকী সকলের কথাও আনুষঙ্গিক আলোচনায় এসে যাবে।

পাঠকদের সুবিধার জন্য মানচিত্রে প্রদত্ত চিহ্নের বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে থাকছে প্রত্যেকটি নামের পাশে সে-সময়কার ও বর্তমান বাড়ীর নম্বর।

(১) দীননাথ মুখোপাধ্যায়—(বাড়ী নেই)

(২) দীননাথ বসু—(কালীনাথ বসুর বাড়ীর পিছন দিকে)

(৩) কালীনাথ বসু—১৩।১, বোসপাড়া লেন

(৪) বলরাম বসু (বলরাম মন্দির)—৫৭, রামকান্ত বসু স্ট্রীট (বর্তমানে ৭, গিরিশ এভিনিউ)

(৫) গিরিশ ঘোষ—১৩, বোসপাড়া লেন (বর্তমানে গিরিশ এভিনিউর উপর গিরিশ স্মৃতি-মন্দির)

(৬) নন্দ বসু ও পশুপতি বসু—৬৫, বাগবাজার স্ট্রীট (বর্তমান মালিকের বাড়ীর নম্বর—৬৫।৪, বাগবাজার স্ট্রীট)

(৭) যোগীন-মা—৫৯।১, বাগবাজার স্ট্রীট

(৮) গোলাপ-মা—৬এ, নবীন সরকার লেন

(৯) শিশির ঘোষ—পত্রিকা ভবন, বাগবাজার (বর্তমানে ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন)

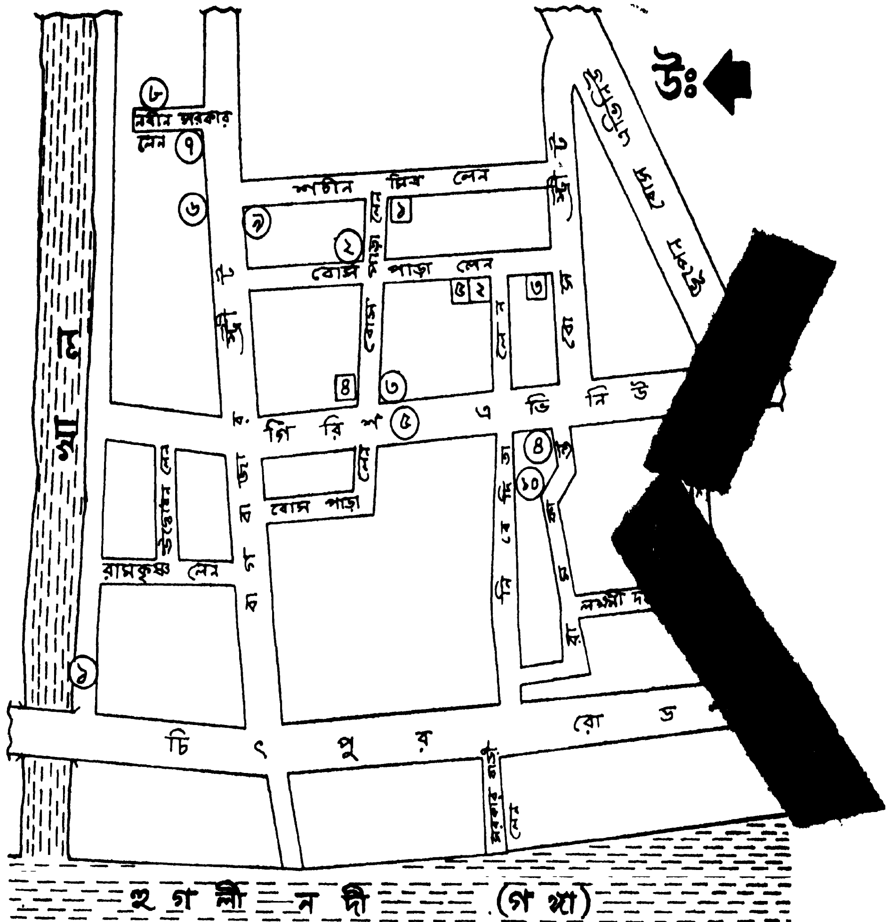
(১০) চুনীলাল বসু—৫৮বি, রামকান্ত বসু স্ট্রীট

[১] স্বামী অখণ্ডানন্দ—৩৮।৪, বোসপাড়া লেন

[২] স্বামী নির্মলানন্দ—নম্বর পাওয়া যায়নি

৬ বাগবাজার নামের উৎপত্তি—এখন যেখানে বাগবাজার সর্বজনীন দুর্গাপূজা হয়, সেখানে সেকালে জাহাজের ক্যাপ্টেন পেরিন সাহেবের বাগান ছিল। এটি ইংরেজদের সখের ভ্রমণের স্থান। বাগানকে ফার্সিতে 'বাগ' বলে। সে যুগে ইংরেজরা সাধ্যমত ফার্সি ব্যবহার করত। পেরিনের বাগানকে বলে পেরিনের বাগ। এই পেরিনের বাগ থেকেই বাগবাজার নামের উৎপত্তি। 'বাঘ' এর সঙ্গে 'বাগ' বাজারের কোন সম্পর্ক নেই। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল সাহেব বাগবাজারের নাম উল্লেখ করেছেন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে বাগবাজার অঞ্চলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রজাবিলি করে।—কলিকাতা-দর্পণ, ১ম পর্ব, রাধারমণ মিত্র (১৯৮২), পৃঃ ২৬৪ এবং কলিকাতা এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস—অতুল সুর (১৯৮১), পৃঃ ২৭০-৭১।

৭ বলরাম মন্দিরের সৌজন্যে প্রাপ্ত



○..... কলিকাতা বাগবাজার অঞ্চলে যে সব ভক্তদের বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ পদার্পণ হ'য়েছিল

- (১) দীননাথ মুখোপাধ্যায়
- (২) দীননাথ বসু
- (৩) কালীনাথ বসু
- (৪) বলরাম বসু (বলরাম মন্দির)
- (৫) গিরিশ ঘোষ
- (৬) নন্দ বসু ও পশুপতি বসু
- (৭) যোগীন মা
- (৮) গোলাপ মা
- (৯) শিশির ঘোষ
- (১০) চুনীলাল বসু

□..... কলিকাতা বাগবাজার অঞ্চলে যে সব ভক্তদের বাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ পদার্পণ হয়নি (এঁরা অন্য ভক্তদের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'য়েছিলেন)

- [১] স্বামী অখণ্ডানন্দ
- [২] স্বামী নির্মলানন্দ
- [৩] ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ
- [৪] স্বামী তুরীয়ানন্দ
- [৫] বৈকুণ্ঠ সান্যাল

[৩] ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ—৫২এ, বোস পাড়া লেন

[৪] স্বামী তুরীয়ানন্দ—১০।১, বোস পাড়া লেন

[৫] বৈকুণ্ঠ সান্যাল—২০, বোস পাড়া লেন

বাগবাজারের যে বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম [illegible] পড়েছিল বলে এখন পর্যন্ত জানা গেছে, [illegible]নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী—কথামৃতে দী[illegible] বলে উল্লিখিত। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দীনন[illegible]লতে গিয়ে বলেছেন দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদেব [illegible] একদিন শুনলুম বাগবাজার পোলের কাছে, [illegible] মুখুয্যে ব'লে একটি ভাল লোক আছে [illegible] সেজোবাবুকে ধ'রলুম দীন মুখুয্যের [illegible] সেজোবাবু কি করে, গাড়ী ক'রে [illegible]। বাড়ীটি ছোট, আবার মস্ত গা[illegible] এক বড় মানুষ এসেছে। তারাও [illegible] আমরাও অপ্রস্তুত। তার আবার [illegible] পৈতে। কোথায় বসায়? আমরা [illegible]র ঘরে যাচ্ছিলুম, তা ব'লে উঠলো ও ঘরে মেয়েরা, যাবেন না। মহা অপ্রস্তুত। সেজোবাবু ফেরবার সময় বল্লে, বাবা! তোমার কথা আর শুনবো না। আমি হাসতে লাগলুম।"[৮] শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি থেকে কয়েকটি কথা অনুমিত হয়। প্রথমতঃ দীনু মুখুজ্জের বাড়ী কলকাতায় বাগবাজার পোলের কাছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি ছিলেন ভক্তসাধক। তাঁর কথা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কর্ণগোচর হয়েছিল। তিনি নিজে যেচে এসেছিলেন ঐ বাড়ীতে। তৃতীয়তঃ তাঁর সঙ্গে ছিল সেজোবাবু অর্থাৎ রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু। মথুরবাবুর দেহত্যাগ হয় ১৬ জুলাই, ১৮৭১ সালে।[৯] সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৭১ সালের আগেই গিয়েছিলেন। আর তাঁর বাড়ী ছিল বাগবাজার পোলের কাছে। এই বাড়ীর কোন অস্তিত্ব নেই এবং কেউ কিছু বলতেও পারেননি। আমরা অনুমান করে চিৎপুর রোড ক্যানেল ও বাগবাজার পোলের কাছে বাড়ীটি চিহ্নিত করেছি।

বাগবাজারে দ্বিতীয় ভাগ্যবানরা হলেন দীননাথ বসু ও কালীনাথ বসু। দীননাথ বড়, কালীনাথ ছোট—এরা দু ভাই। বাড়ী ছিল বোসপাড়া লেনে। দুজনেই ব্রাহ্মসমাজের অনুগামী। দীননাথ কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের এটর্ণী,[১০] কালীনাথ পুলিশের বড় কর্মচারী।[১১] শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের নেতা বাগ্মী কেশব সেনের পরিচয় হয় ১৮৭৫ সালে। কেশববাবুর সঙ্গে কালীনাথের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। কেশববাবুই শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আসেন কালীনাথের বাড়ীতে। খুব সম্ভবতঃ ১৮৭৭ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের দলবল সহ তাঁর বাড়ীতে আগমন করেন।[১২] কালীনাথ বাড়ীতে একটি ছোট রকমের উৎসবের আয়োজন করেন। সেখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণকে পরম আদরে নিজালয়ে নিয়ে আসেন দীননাথ। লোকমুখে চারিদিকে রটে গেল এই সুসংবাদ।

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম-কথিত, দ্বিতীয় ভাগ (১৩৮১), সপ্তম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ। [এরপর থেকে শুধু 'কথামৃত'। উদ্ধৃতি-চিহ্ন থাকবে এইভাবে ২।৭।১ অর্থাৎ ২য় ভাগ ৭ম খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ]

৯ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—স্বামী গম্ভীরানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ (১৩৮০), পৃঃ ১৫৪ [এরপর থেকে শুধু 'ভক্তমালিকা']

১০ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ (১৩৬৭), পৃঃ ৭ [এরপর থেকে 'অখণ্ডানন্দ']

১১ স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ (১৩৭৯), পৃঃ ৩ [এরপর থেকে 'স্মৃতিকথা']

১২ ভক্তমালিকা (২য়), পৃঃ ২৫৭

প্রাচীন ও নবীনের দল একে একে বসুগৃহে সমেবেত; অন্তঃপুরে মহিলারাও একত্রিত।[১৩] এই বসু-বাড়ীতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করবার সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিরা হলেন হরিনাথ (পরবর্তী কালে তুরীয়ানন্দ), গঙ্গাধর (পরবর্তী কালে অখণ্ডানন্দ), ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সুসাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। বোসপাড়াতে এঁদের সকলের বাড়ী। গঙ্গাধরের এই দর্শনের মধুর স্মৃতি মনে চির জাগরূক ছিল। সেই অক্ষয় অমর স্মৃতি নিপুণ হস্তে উপহার দিয়েছেন আমাদের। তিনি স্মৃতিচয়ন করেছেন মনের মণিকোঠা থেকে —"ঠাকুর যখন দীনবাবুর বাড়ীতে আসেন তখন খুব রোগা এবং দু-চার কথা বলতেই ভাবসমাধিতে মগ্ন হতেন। যখন যে নামে যে ভাবে সমাধি হত, তখন প্রণবের সহিত সেই নাম শোনালে মন নেবে আসত। নাড়ীজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সমাধি-কালে তাঁর নাড়ী আর অর্ধনিমিলিত নেত্রে পলক পড়ে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখেন যে নাড়ীর স্পন্দন ও পলক নেই এবং শরীর আড়ষ্ট।

"ঐ দিন 'অসি ত্যজে বাঁশি লয়ে একবার নাচগো শ্যামা'—এই গানটি গেয়ে তাঁর সমাধি হয়। ফলে কিছুদিন ধ'রে সমস্ত পাড়ায় (খেয়াল টুংরীর মধ্যে) এই গান একটা নূতন ভাব দিত। সকলের মুখে 'নাচ গো শ্যামা' শোনা যেত।"[১৪]

স্বামী তুরীয়ানন্দজীও এই প্রথম দর্শনের আনন্দঘন আলাপন সযত্নে সঞ্চিত রেখেছিলেন হৃদয়কন্দরে। অনেককাল পরে সেই হৃদয়কন্দর উজাড় করে দিয়েছিলেন একটি মর্মস্পর্শী চিঠিতে। লিখেছেন—"আমি বাগবাজারে শ্রীযুক্ত দীননাথ বসুর বাটীতে প্রথমে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া-ছিলাম। সে বহুদিনের কথা, তখন অধিকাংশ সময় তিনি সমাধিস্থই থাকিতেন, সবে কেশববাবুর সহিত ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছে। দীননাথ বসুর ভ্রাতা কালীনাথ বসু—কেশববাবুর অনুচর—ঠাকুরকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং আপনার জ্যেষ্ঠকে অনুরোধ করিয়া ঠাকুরকে তাঁহার গৃহে আবাহন করেন। আমরা তখন বালক, তের-চৌদ্দ বৎসরের হইব। পরমহংস আসিবেন, এই কথা পল্লীতে রাষ্ট্র হইলে দর্শনার্থ আমরা তথায় সমবেত হইয়া-ছিলাম। দেখিলাম—একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে করিয়া দুইটি পুরুষ দ্বারে উপস্থিত হইলে সকলেই 'পরমহংস আসিয়াছে', 'পরমহংস আসিয়াছে' বলিয়া সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। প্রথমে একজন অবতরণ করিলেন, বেশ হৃষ্টপুষ্ট বপু, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, দক্ষিণহস্তের বাহুতে স্বর্ণপদক, দেখিলেই খুব বলশালী ও কর্মক্ষম বলিয়া মনে হয়। তিনি নামিয়া আর একজনকে গাড়ী হইতে নামাইতে লাগিলেন। ইনি দেখিতে অত্যন্ত কৃশ। গায়ে একটি পিরান, পরিহিত বস্ত্র কোমরে বাঁধা, এক পা গাড়ীর পা-দানে ও অন্য পা গাড়ীর মধ্যে রহিয়াছে। একেবারে সংজ্ঞাহীন, বোধ হইতেছে যেন মহা মাতালকে ধরিয়া নামাইতেছে। যখন নামিলেন, দেখিলাম— কি অপূর্ব জ্যোতি মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে। মনে হইল, শাস্ত্রে যে শুকদেবের কথা শুনিয়াছি, ইনি কি সেই শুকদেব! ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া যাইলে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা পাইয়া দেয়ালে বৃহৎ কালীমূর্তি দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন ও একটি মনোমুগ্ধকর সংগীতে উপস্থিত সকলের মনে এক অপূর্ব ভক্তিভাব ও সমন্বয়ের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিলেন। গানটি কালীকৃষ্ণের একত্বসূচক —'যশোদা নাচাতো তোমায় বলে নীলমণি। / সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনি (গো মা)।'

"ইহার দ্বারা লোকের মনে কি যে এক অপূর্ব

১৩ অখণ্ডানন্দ—পৃঃ ৭
১৪ স্মৃতিকথা—পৃঃ ৩

ভাবের উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত। তারপর অনেক পরমার্থ-প্রসঙ্গ হইয়াছিল। তিনি আরও একবার দীননাথের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন।"[১৫]

তুরীয়ানন্দজী তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, আরও একবার শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাপদার্পণ হয়েছিল দীননাথের বাড়ীতে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার উল্লেখ করেছেন তাঁর পুঁথিতে—একবার নয়—'লয়ে যায় প্রভুদেবে বারে বারে ঘরে।'[১৬]

অখণ্ডানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজীর বাড়ী আর নেই। তবে অখণ্ডানন্দজীর বাড়ীর জায়গায় নূতন একটি বাড়ী তৈরী হয়েছে।

উপরোক্ত দুটি মনোমুগ্ধকর স্মৃতিচারণে শ্রীরামকৃষ্ণের সদা ভাব-সমাধি-লীন, সর্বদা সংগীত-প্রিয় সুমধুর সংগীতগায়ক এবং অহরহ ভগবৎ-প্রসঙ্গ অবতারক মূর্তি দর্শনে কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন সমাগত দর্শক তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। তাঁদের ছিল এটি প্রথম দর্শন। গিরিশবাবু 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রে দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুন পরমহংসদেবের কথা পড়েছিলেন। সেই সময় আর্ত ও জিজ্ঞাসু গিরিশবাবুর বিসূচিকা রোগ হতে অলৌকিকভাবে জীবনলাভের পর ধর্মে মতি হয়েছে। কিন্তু উচ্চাঙ্গের বিশ্বাস তখনও মনে স্থান পায়নি। 'মিরর' পাঠান্তে তাঁর মনে হল, "ব্রাহ্মরা কি আবার এক পরমহংস খাড়া করিয়াছে!" যা হোক, পাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনবার্তা জেনে কৌতূহলবশে দীননাথের বাড়ীতে চাক্ষুষ দর্শন করলেন পরমহংসদেবকে, শুনলেন ঈশ্বর-প্রসঙ্গ এবং আরও দেখেছিলেন শ্রোতা বাগ্মী-প্রবর কেশব সেনকে। তখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়। জনৈক ব্যক্তি প্রজ্বলিত সেজটি পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "সন্ধ্যা হয়েছে?" শুনে গিরিশ ভাবলেন, "ঢং দেখ, সন্ধ্যা হয়েছে! সম্মুখে সেজ জ্বলছে, তবু ইনি বুঝতে পারছেন না যে সন্ধ্যা হয়েছে কি না।" সুতরাং আর সেখানে থাকা নিষ্প্রয়োজন বুঝে, গিরিশবাবু বাড়ী ফিরে গেলেন।[১৭] প্রথম দর্শনে গিরিশের প্রতিক্রিয়ার এখানেই সমাপ্তি। কিন্তু পরবর্তী কালে গিরিশের রূপ—'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক।

দীননাথের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য-দর্শনকারী বাগবাজারনিবাসী দেবেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন সুসাহিত্যিক এবং লোকসমাজে 'বাং বাবু' নামে বিশেষ পরিচিত। তিনি গিরিশবাবুর নিকট-আত্মীয়। অনেক পরে তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভে ধন্য হন।[১৮] পরে তিনি বহুবার শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গলাভে জীবন-তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন।

এই দেবেন্দ্রনাথ বসু সরকারী চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু করে কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বন্ধু ও প্রাইভেট সেক্রেটারী পর্যন্ত হয়েছিলেন। তাঁর রচিত বহু গল্প, উপন্যাস, জীবনীগ্রন্থ ও নাটকের মধ্যে 'বাসি ফুল', 'বরমাল্য', 'পরমহংসদেব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর অনুবাদগ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। 'নলিনী'

১৫ স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৭০), চিঠির তারিখ ১১।৯।১৭, পৃঃ ৩০৮-৯

১৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন (১৩৮৩), পৃঃ ২১১ [এরপর থেকে পুঁথি]

১৭ ভক্তমালিকা (২য়), পৃঃ ২৫৭-৫৮

১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল (১৩৪৩), পৃঃ ৩৫৩ [এরপর থেকে 'লীলামৃত']

পত্রিকার সম্পাদক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গিরিশ অধ্যাপক'-এর পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ।[১১]

দীননাথ বসুর বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ীর সম্মুখভাগ ছিল বাঘওয়ালা। বর্তমানে বাড়ীটির পিছন দিকের একটুমাত্র অংশ অবশিষ্ট সাক্ষী-গোপালের স্থায় দণ্ডায়মান। লোপ পেয়েছে বংশধরদের অস্তিত্ব। কালীনাথের বাড়ীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। বাস্তবিক পক্ষে, কালীনাথের বাড়ীর অসঙ্কুলানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শুভপদার্পণ উৎসবটি আয়োজিত হয়েছিল দীননাথের বাড়ীতেই। বর্তমানে এই বাড়ীটিও ধরার ধূলায় পর্যবসিত।

[ক্রমশঃ]

১১ সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান (১৯৭৬), পৃঃ ২১৭ [এরপর থেকে চরিতাভিধান']

স্বামী সারদানন্দজীর স্মৃতি

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

[ফাল্গুন, ১৩৮৯ সংখ্যার পর]

প্রথম যুদ্ধের সময় সম্ভবতঃ ইংরেজী ১৯১৬-তে একদিন উদ্বোধনে গণেন মহারাজ হুকুম জারী করলেন, "চিনির দাম অনেক হয়েছে। টাকায় এক সের। কাজেই কাল থেকে সকলকে লবণ দিয়ে চা খেতে হবে। চিনি দেওয়া হবে না।" মহারাজ তামাক খাচ্ছিলেন, ভুড়ুক করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "বাবা, ছোটবেলা থেকে এতখানি বয়স হল, বুড়ো হয়েছি—বরাবর মিষ্টি চা-ই খেয়ে এসেছি। লবণ দিয়ে চা খেতে পারব না দেশী গুড় এখনও সস্তা আছে। চার আনা সের আমাকে একটু গুড় দিয়েই চা করে দিও। আর লবণ দিয়ে চা খাওয়া কারো হল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি প্রণেতা পূজনীয় অক্ষয়-কুমার সেনের কাছে আমি খুবই যেতাম। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন। আমি যতটুকু পারতাম তাঁর সেবা করতাম। একবার তিনি বলেছিলেন, "একদিন উদ্বোধনে গেছি। শরৎ-ঠাকুর (তিনি বয়সে বড় কিন্তু গৃহী—তাই মহারাজকে শরৎ-ঠাকুর বলতেন) কতকগুলি বই যত্ন করে প্যাক করিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'মাস্টার মশায়, আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী—লীলাপ্রসঙ্গ লিখেছি পড়ে দেখবেন।' ভাই, বইগুলি এনে ঘরেই রেখে দিয়েছিলাম। মনে মনে অহঙ্কার হয়েছিল—ঠাকুরের বই লিখেছেন মাস্টার মশায়—শ্রীম এবং আমি লিখেছি। এঁরা আবার কি বই লিখবেন? একদিন হঠাৎ মনে হল সন্ন্যাসী—গুরুভাই। বিনামূল্যে এতগুলি বই দিলেন! আমার এত অহঙ্কার যে বইগুলি একবার খুলেও দেখলাম না। ভাইরে! বই পড়ে মাথা ঘুরে গেল! দেখলাম আমার যে সব কথা শুনে লেখা—তাতে ভুল আছে। আর ইনি প্রমাণ করে করে সব ঘটনা লিখেছেন! তখন আবার এই বুড়ো বয়সে কলম ধরে যতদুর পারলাম সংশোধন করলাম।" আমাকে বললেন, "এই আমার শেষ সংশোধন। আমি আর বেশীদিন বাঁচবনি। আমি এই বইখানি তোমার হাতে সঁপে দিলাম। তোমার উপর ভার—তুমিই এই বই শরৎ-ঠাকুরের হাতে পৌছে দিবে। তিনি ভবিষ্যতে এই বই যেমন ভাবে ইচ্ছা ছাপাবেন। আর এই বই ছাপিয়ে

বিক্রি করে যা net লাভ হবে তার কিছু অংশ, তা শরৎ-ঠাকুর যেমন বিবেচনা করবেন এখানে আমার ঠাকুর সেবার জন্য পাঠাবেন। এখন আমার বড় বৌমা ঠাকুরের সেবা-পূজা করছে। যদি এরা কেউ না করে তবে তোমরা আমার ঠাকুর কোয়ালপাড়ায় বা জয়রামবাটীতে নিয়ে যাবে এবং ঐ টাকা তোমরা নিয়ে ঠাকুরের সেবা করবে। আর তুমি একখানি বই চেয়ে নিবে।" আমি তখন ব্রহ্মচারী। প্রথমে ঐ পুঁথি ৬৲ টাকা দামে বিক্রি হত। আমি বই নিইনি। কারণ গণেন মহারাজ হয়তো চাইলে দিতেন না। অক্ষয় মাস্টার মশায়ও বলতেন, "আমরাও তো সেই রামকৃষ্ণের সেবক। গৃহস্থ হতে পারি। কিন্তু গণেন মহারাজ আমাদের যেন ভাল চোখে দেখেন না।" গণেন মহারাজ উদ্বোধন থেকে চলে যাবার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির বাবদ প্রাপ্য টাকা ৺অক্ষয়কুমার সেনের ছেলেরা না পাওয়ায় তারা খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। একদিন হৃষীকেশে এই কথা গোপেশদার (স্বামী সারদেশানন্দজীর) মুখে শুনে আমি তাদের প্রাপ্য আছে বলায়, তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্বোধনে পূঃ সত্যেন মহারাজের (স্বামী আত্মবোধানন্দের) কাছে বিস্তারিত লিখতে বলেন। আমি তাঁকে লেখার পরে তিনি অক্ষয় মাস্টার মশায়ের দুই পুত্রকে ডাকিয়ে এনে তাদের একসঙ্গে কিছু বেশি টাকা তুলে দেন এবং বইর কপিরাইটও অতঃপর তারা উদ্বোধনকে লিখে দেয়।

একদিন জয়রামবাটীতে বসে ভূমানন্দ মহারাজ বলেন, "মহারাজ, জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়ার দুই আশ্রম গ্রাম থেকে উঠিয়ে নিয়ে আমোদরের ধারে কোনও নতুন জায়গায় একটি আশ্রম করলে ঠিক হবে।" মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন? তাতে কি সুবিধা হবে?" ভূমানন্দজী বললেন, "গ্রামে আশ্রম না থাকাই ভাল। তাতে সাধুরা ভাল থাকবে না।" মহারাজ বললেন, "যারা ভাল থাকবার তারা গ্রামেও ভাল থাকবে। আর যারা ভাল থাকবার নয়, তারা হিমালয়ে থাকলেও খারাপ হবে।" শ্রীশ্রীমার মহাসমাধির পর থেকে মহারাজ যেন ধীরে ধীরে অন্তর্মুখী হতে আরম্ভ করেছিলেন। আমরা দেখেছি, তিনি ভোরে স্নান করে ধ্যান জপে বসতেন এবং প্রায় ১১টায় উঠতেন। একদিন ভূমানন্দজী পূজনীয় শরৎ মহারাজকে বললেন, "মহারাজ, আপনি তো ধ্যান জপে ডুবে থাকছেন। আপনার আধ্যাত্মিকতা যত বাড়ছে আমাদের বাঁদরামীও সেই পরিমাণেই বেড়ে চলেছে।" মহারাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, "বেশ কথা!" সেবক সাতু (স্বামী অসিতানন্দ) মহারাজকে এক গেলাস কমলা লেবুর রস খেতে দিত। আমাকে সাহায্য করতে বলত। আমি করতাম। রস কম হলে একটু জল ও চিনি মিশিয়ে এক গেলাস করে দিত। একদিন গণেন মহারাজ দেখে জল মিশাতে বারণ করলেন ও ৬টা কমলা লেবু হলে এক গেলাস রস হবে জেনে ২টা বেশি দিবার ব্যবস্থা করলেন। একদিন মহারাজের নামে এক বাক্স কমলালেবু রেলওয়ে পার্শ্বেলে এক ভক্ত পাঠিয়ে রেল-রসিদ পাঠিয়েছিলেন। পার্শ্বেলটি শিয়ালদহে এসেছিল। মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন, "এই রসিদটা নিয়ে শিয়ালদহ থেকে কমলালেবুর পার্শ্বেলটা ছাড়িয়ে আনতে পারবি?" আমি পারব বলায় আমার হাতে রসিদটি দিলেন ও খরচের জন্য কিছু টাকা দিলেন। আমি নিয়ে এলে আমাকেই মহারাজ খুলতে বললেন। খোলার পরে দেখে বললেন, "যেগুলি খুব ভাল সেগুলি ঠাকুর ভাঁড়ারে দিয়ে আয়। আর যেগুলি একটু খারাপ সেগুলি সাধুদের ঘরে ঘরে কিছু কিছু করে দিয়ে আয়।" গণেন মহারাজ সবচেয়ে

খারাপগুলি গোলাপ-মার কাছে দিতে বলায়, আমি বললাম, "গোলাপ-মার কাছ থেকে কিছু গালাগাল খেতে পাঠাচ্ছেন বুঝি?" তিনি বললেন, "না, গালাগাল দেবেন না। তুই দিয়ে আয় না।" তাই নিয়ে যেতে তিনি ঐখানে রাখ বলায় আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "গোলাপ-মা, এগুলি তো খারাপ হয়ে গেছে। এগুলি কি কাজে লাগবে?" তিনি বললেন, ঐগুলি থেকে বেছে বেছে যে একটু রস পাবেন তাই দিয়ে কি যেন তৈরি করবেন এবং পাকা খোসাগুলি শুকিয়ে রাখবেন—পানের সঙ্গে দিলে সুগন্ধ হবে। একদিন ভূমানন্দজী মহারাজকে বললেন, "আমাদের সাধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে খদ্দর বিক্রি করা উচিত।" মহারাজ বললেন, "আমি ও বেচতে পারব না। ছেলেদেরও বিক্রি করতে বলতে পারব না। হয়তো জেলেও যেতে হবে। আমি নিজেও যেতে পারব না—ছেলেদেরও যাবার ব্যবস্থা করতে পারব না। তুমি পার কর।"

একবার মহারাজ, যোগীন-মা ও গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে এসেছেন। তখন কিশোরীদা (স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী) জয়রামবাটীতে থাকেন। পুণ্যিপুকুরে মাছ ধরানো হচ্ছে। মেজ মামা (কালী মামা) একটি মাছ নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিশোরীদা তাঁর হাত থেকে মাছটি কাড়িয়ে নেন। যোগীন-মা বললেন, "দেখেছ শরৎ? কিশোরী মেজো মামার হাত থেকে মাছটি নিয়ে নিলে। এটা কি ভাল হল?" মহারাজ কিশোরীদাকে বকলেন। বললেন, "তুই মামার হাত থেকে মাছটা কাড়িয়ে নিলি কেন?" কিশোরীদা বললেন, "মহারাজ, এখন পুণ্যিপুকুর নিয়ে মোকদ্দমা চলছে। মামা চাইলে আমি মাছ দিব। জোর করে নিতে দিব না। তাতে অসুবিধা আছে।" তখন মহারাজ যোগীন-মাকে বললেন, "দেখেছ। আমরা তো দু দিনের জন্য এসেছি। ওদের তো ভুগতে হবে?" পরে কিশোরীদা মামাকে একটি মাছ দিয়ে এলেন। সকলেই খুশি হলেন।

তখনকার দিনে এদিকে ফটো তোলার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একদিন ঘাটাল থেকে একজন ক্যামেরা নিয়ে কয়াপাট, বদনগঞ্জ অঞ্চলে টাকা নিয়ে ফটো তুলছিল। লোকেরা ফটো দেখে খুব খুশি। বলে, "একজন লোক ছবি তুলছে। চমৎকার। একেবারে নাক, চোখ, মুখ ঠিক ঠিক উঠে আসছে। আর দু টাকায় তিন খানা করে ছবি বিক্রি করছে।" আমার মাস্টার মশায় ঐ ভদ্রলোককে জয়রামবাটীতে এনে, শ্রীশ্রীমা উপরে বসবেন ও মাস্টার মশায়, জ্ঞান মহারাজ ও আমি মার পায়ের তলায় বসে একটি ফটো তোলার কথা বলতে মা বললেন, "বাবা, শরৎকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।" বাবা, এমনি তো পাড়াগাঁয়ের মেয়ে! কিছুই বুঝেন না। কিন্তু ফটো তুলতে দিলেন না। মাস্টার মশায় বিফলমনোরথ হয়ে ফটোগ্রাফারকে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় দিলেন।

শ্রীশ্রীমার দেহত্যাগের পরে পূঃ শরৎ মহারাজ নিচের ঘরে বসে কাঁদছেন, এমন সময়ে উপর থেকে যোগীন-মা ডাকলেন, "শরৎ উপরে এসে দেখে যাও।" মহারাজ কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলেন, "আর কি দেখব?" যোগীন-মা বললেন, "জীবনে যা দেখনি, তাই দেখে যাও।" মহারাজ কাঁদতে কাঁদতে উপরে গিয়ে দেখে অবাক হলেন। শ্রীশ্রীমার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল দীপ্তিময়। তিনি মায়ের শ্রীচরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে নিচে গেলেন।

১৯১৬ কিম্বা ১৯১৭-র ১ জানুআরি মহারাজ আমাকে উদ্বোধনে জিজ্ঞাসা করলেন, "রামময়, তুই বশীর (বশীশ্বর সেনের) বাড়ি চিনিস্?" আমি উত্তর দিলাম, "হাঁ মহারাজ চিনি।" তিনি আমাকে কতকগুলি ভাল গোলাপ ফুল ও একটি চিঠি দিয়ে বললেন, "এই ফুলগুলি ও এই চিঠি

বন্দীর বাড়িতে ঢুকেই ডানদিকের ঘরে এক আমেরিকান মহিলাকে (Sister Christineকে) দিয়ে আয়।" আমি গিয়ে তাঁকে দিতেই তিনি খুব খুশি হয়ে মহারাজের নাম করে বললেন, "It is very kind of him to send me such nice flowers." (তাঁর খুবই দয়া যে, আমাকে এমন সুন্দর ফুল পাঠিয়েছেন)। পরে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, "Will you kindly wait for two minutes, I will write a few words giving him thanks?" (তুমি দয়া করে দু মিনিট অপেক্ষা করবে? আমি কয়েকটি কথা লিখে তাঁকে ধন্যবাদ জানাব)। আমি তাঁকে বললাম, "Yes, I will gladly wait, you can write." (হাঁ, আমি আনন্দের সহিত অপেক্ষা করব। আপনি লিখতে পারেন)। তিনি আমার হাতে চিঠি দিলে আমি নিয়ে গিয়ে মহারাজকে দিলাম। তিনি খুশি হলেন।

পূঃ শরৎ মহারাজ বিদেশ থেকে ফিরে আসার পরে শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি শরৎ ওদেশে (আমেরিকায় ও ইউরোপে) কেমন সব দেখলে?" মহারাজ উত্তর দিলেন, "দেখুন G. C. (গিরিশচন্দ্র) ওদের দেশে কোনও বিষয় নিয়ে অনেক তর্ক বিচার হল। কিন্তু যখন ভোট হল তখন সকলে নিজ নিজ মত ছেড়ে একমত হয়ে কাজ করল। আমাদের তিনটি বাঙালীর দুটি মত।" শুনেই গিরিশবাবু বললেন, "এ্যাঁ, তিনটে বাঙালীর দুটো মত কেন হবে? তিনটে বাঙালীর তিনটে মত হবে।"

কামারপুকুরে প্রথম পনেরো কাঠা জমি, "সুখলাল গোস্বামীর ভাঙা ভিটা" লাহাবাবুদের কাছ থেকে মনে হয় তিনশত বিশ টাকায় (৩২০৲) কেনা হয়েছিল। এখন ঐ জমির উপর নাটমন্দির তৈরি হয়েছে এবং বাকি জমি নাটমন্দিরের পশ্চিম দিকের খোলা ময়দান। পূঃ শরৎ মহারাজ আমার প্রধান শিক্ষক মশায়কে লিখলেন, "প্রবোধ, জমিটা তো কেনা হল। এখন দখল নিতে হবে তো? আমি টাকা দিব। তুমি জমিটিকে পরিষ্কার করিয়ে চারদিকে বেড়া দিয়ে কোণায় একটু পাকা pillar গাঁথিয়ে দাও।" মাস্টার মশায় আমাকে বললেন, "তুই তো আই. এ. পরীক্ষা দিয়েছিস্? ফল বেরোতে তিন মাস লাগবে। তখন বি. এ. পড়তে যাবি তো? তুই এই কাজ আমার চেয়ে ভাল পারবি। এবং এই সময়ের মধ্যে সব হয়েও যাবে।" আমি গেলাম। তখন পূঃ শিবুদা, বৌদি ও তাঁদের ছেলে ও মেয়ে কামারপুকুরে থাকতেন। পূঃ শরৎ মহারাজ কাজের জন্য আমার কাছে টাকা পাঠাতেন। আর আমাকে লিখলেন, "তোর খাওয়া খরচের জন্য পূঃ শিবুদাকে মাসে মাসে দশ টাকা (১০৲) দিবি। কিন্তু এক সঙ্গে দশ টাকা দিবি না। ২।১ টাকা করে মাঝে মাঝে দিবি। নতুবা শিবুদা হয়তো দশ টাকার জিলিপি কিনে রঘুবীরকে ভোগ দিয়ে দিবেন। জায়গাটায় অনেক কাঁটা গাছ প্রভৃতি ছিল। একটা বড় গর্তও ছিল। মজুর দিয়ে সব আগাছা ও কাঁটা গাছ কাটিয়ে ও একটি ছোট ছোট ইটের তৈরি ও কাদা দিয়ে গাঁথা ভাঙা বাড়ি ছিল। ঐটিকেও ভাঙিয়ে সব গর্তে ফেলে বাকি জমিটিকেও সমান করিয়ে নিয়ে বেড়া দেওয়ালাম। পূঃ শিবুদা বললেন, "রামময়, কামারপুকুরে ভাল বাঁশ পাবে না, দামও বেশি। তুমি একটু এগিয়ে উমোরপুরে (অমরপুরে) যাও। সেখানে খুব বড় বড় ও পাকা বাঁশ পাবে এবং দামও কম হবে।" আমি গিয়ে যার খুব বেশি ও ভাল বাঁশ তার কাছে বাঁশ কেনার কথা বলতে সে বলল, "সবচেয়ে বড়, মোটা ও লম্বা, পাকা বাঁশ, বেছে বেছে কেটে, ঝুড়ে (কঞ্চি প্রভৃতি কেটে ফেলে পরিষ্কার করে) আমার গরুর গাড়িতে

আপনার জায়গায় পৌঁছে দিব। কিন্তু টাকায় ১৬ খানি বাঁশ দিব। ১৭ খানি চাইলে দিব না। আমি রাজী হলাম। পরে দেখলাম খুব ভাল বাঁশ দিয়েছে। এটি ১৯১৯ সালের কথা। এখন এদেশেই ঐরূপ একখানি বাঁশের দাম দশ টাকা। আমি পূঃ শরৎ মহারাজের কাছে হিসাব দিতাম ও আরও টাকা পাঠাতে লিখতাম। তিনি টাকা পাঠিয়ে দিতেন। যখন বেড়া দিতে আরম্ভ করব, তখন লাহাবাবুদের কেউ কেউ আপত্তি দিলেন যে, জমি বেশি নেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীমা তখন কোয়ালপাড়ায় ছিলেন। আমি দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় কোয়ালপাড়ায় গিয়ে মাকে সব বললাম। তখন সেখানে আমার হেড মাস্টার মশায় ও তাঁর বন্ধু আরামবাগের উকিল মণীন্দ্রবাবুও ছিলেন। মণীন্দ্রবাবু আমাকে বললেন, "তুই দলিল দেখে ঠিক মাপ করে বেড়ার জন্য গর্ত করিয়েছিস তো?" আমি বললাম, "হাঁ।' তখন তিনি আমাকে বললেন, "তুই ফিরে যা গিয়ে ঠিক জমির চেয়ে এক হাত দূরে গর্ত করতে আরম্ভ করে দে। আগের গর্তগুলি মাটি দিয়ে ভরে দিবি। আমরা দুজন একটু পরে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে লাহাবাবুদের ডাকিয়ে মাপ করে জায়গা একটু বেশি নেওয়া হয়েছে বলে সবদিকে একহাত কম করতে হবে বলব। তাতে তাঁরা খুশি হবেন।" আমি দেখালাম আমার আগের গর্তগুলি ঠিকই ছিল। মা মণীন্দ্রবাবুর কথা শুনে হাসলেন ও বললেন, "ছেলের বুদ্ধি দেখ।" অনেক কষ্টে মান্দারণের ভাঙা গড়ের প্রাচীর থেকে ইট আনিয়ে ও চুন সুরকী দিয়ে চারকোণায় ৪টি pillar গাঁথিয়ে কাজ শেষ করলাম। তখন মজুরদের রোজ বেতন ছিল দুই আনা। খেতে দিতে হত না সব কাজ শেষ হলে পূঃ শরৎ মহারাজকে হিসাব পাঠিয়ে দিলাম। তিনি এত কম খরচে কাজটি শেষ হয়েছে জেনে খুবই আনন্দিত হয়ে আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। আমাকে তিন মাস শ্রীশ্রীঠাকুর যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরে থাকতে দিয়েছিলেন। মাঝের বড় ঘরে পূঃ শিবুদা, বৌদি ও ছেলে-মেয়েরা থাকতেন। বৈঠকখানা ঘরটি ভক্তদের জন্য রাখা হত।

একটি আমার বয়সী কলেজের ছাত্র দীক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে পূঃ শরৎ মহারাজের কাছে প্রার্থনা জানাত। মহারাজ বলতেন, "আচ্ছা হবে পরে।" আর একটি কথা বলতেন, "এখন দীক্ষা চাইছিস, পরে আমাকে দীক্ষা দিতে চাইবি।" ছেলেটি ঐ কথার কিছুই অর্থ বুঝতে পারত না। হঠাৎ শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে এসে গেলেন। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে ছেলেটি তাঁর কাছে দীক্ষার প্রার্থনা জানায় ও মা "কাল তোমার দীক্ষা হবে" বলেন। পরের দিন তার দীক্ষা হল। পূঃ শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি বললেন, "তুই অনেকদিন থেকে দীক্ষার কথা বলছিস্। ঐ পঞ্জিকাটা নিয়ে আয় একটা দীক্ষার জন্য ভাল দিন দেখে নিই।" ছেলেটি কিছু বলেও না, পঞ্জিকাও আনে না। পূঃ মহারাজ জানতেন যে, শ্রীশ্রীমা তাকে দীক্ষা দিয়েছেন। তাই তাকে বললেন, "এজন্যই তোকে বলতাম। আজ দীক্ষা চাইছিস, কাল আবার আমাকে দীক্ষা দিতে চাইবি। এখন বুঝলি তো আমার চেয়ে কত বড় আছেন। তাঁর কৃপা পেয়েছিস—খুব আনন্দের কথা।" ছেলেটি মহারাজকে আবার প্রণাম করে চলে গেল।



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

মোক্ষপথের প্রধান বাধা বিষয়াসক্তি

প্রাচীন শ্রাবস্তী-নগরের সম্ভ্রান্ত এক যুবকের নাম ছিল চিত্রহস্ত সারীপুত্র। যুবকটি নিজ হাতে লাঙ্গল চালিয়ে চাষবাস করে জীবিকা নির্বাহ করত। ক্ষেতের তরিতরকারি বাজারে বিক্রি করে কোনরকমে তার দিন অতিবাহিত হত। এর জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। একদিন জমিতে চাষের কাজ সেরে, বাড়ি ফেরার পথে সারীপুত্র ভিক্ষুদের আশ্রমে চলে যায়। সেখানে একজন ভিক্ষুর পাত্র থেকে কিছু সুস্বাদু ভিক্ষা (খাদ্য) গ্রহণ করে সে পরম তৃপ্তিলাভ করে সেদিন। সে ভাবল: ভিক্ষুরা তাহলে এই রকম অমৃত-সমান খাদ্যই রোজ রোজ খায়! আমি যদি ভিক্ষু হই, তবে আমিও তো এমন খাদ্যই খেতে পাব! সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও এই রকম সুখাদ্য কোনদিন ভাগ্যে জোটেনি!

খাওয়ার লোভে যুবকটি ঠিক করল কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। একদিন সত্যি-সত্যি সে ভিক্ষুসঙ্ঘে গিয়ে যোগ দিল ও সঙ্ঘে থেকে প্রথম দু-তিন মাস মনকে সংযত রেখে, ধর্ম-চিন্তা নিয়েই দিন কাটাতে চেষ্টা করল, কিন্তু বেশিদিন পারেনি রিপুগুলিকে সংযত করে রাখতে। রিপুগুলি তাকে ভীষণভাবে উত্যক্ত করতে লাগল। ক্রমে এমনই তাকে বিরক্ত করে তুলল যে, সারীপুত্র ভিক্ষুসঙ্ঘ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

সঙ্ঘ ছেড়ে গৃহে ফিরে এসে সে ভীষণ অন্ন-কষ্টের মধ্যে আবার পড়ল। অন্নকষ্টের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আবার সে ভিক্ষু সাজল, কিন্তু এবারেও সেই একই পরিণতি হল। এইভাবে সারীপুত্র ছবার সঙ্ঘ-ত্যাগী হয়েছে এবং আবার ছবার ভিক্ষু হতে চেষ্টা করেছে। সাতবারের বার সে যখন ভিক্ষু হয়েছে, তখন তার সব ইন্দ্রিয় প্রাকৃতিক কারণেই অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। রিপুগুলিকে বশে আনার মতো কিছুটা ক্ষমতাও সে অর্জন করেছে ততদিনে। এবার তাই ভিক্ষুদের সাহচর্যে বাস করে, ভিক্ষুধর্ম আবৃত্তি করতে করতে সে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে 'অর্হত্ব' লাভে সমর্থ হয়। তারপর একদিন তার ভিক্ষুবন্ধুরা পরিহাস করে তাকে বলেন, "ওহে ভায়া, তোমার রিপুগুলি কি আগের মতোই উত্ত্যক্ত করে?" বিনীতভাবে সারীপুত্র উত্তর দিল: "না, সংসারের কোন লোভ মোহ আর আমাকে উত্ত্যক্ত করে না। ভিক্ষুধর্মের প্রভাবে এখন আমি রিপুগুলিকে জয় করে অর্হত্ব লাভ করেছি।"

ভিক্ষুদের ধর্মসভায় একদিন যুবক চিত্রহস্ত সারীপুত্রের অর্হত্ব লাভ সম্বন্ধে আলোচনা হতে থাকে। অকস্মাৎ সেখানে ভগবান বুদ্ধ এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভিক্ষুদের আলোচনার বিষয়-বস্তু অবহিত হয়ে তিনি স্মিতমুখে বললেন, "শোন বৎসগণ, বিষয়াসক্ত লোকের চিত্ত লঘু ও দুর্দম। লোভ-মোহের দ্বারা সদাই তাড়িত ঐ চিত্ত বিষয়বাসনায় দৃঢ় আবদ্ধ থাকে। কিন্তু যে

ব্যক্তি চিত্তকে বশীকরণ করতে শিখেছে, সেই সংযমী পুরুষই ধন্য—সে-ই সবার শ্রদ্ধাভাজন। চিত্রহস্ত সারীপুত্র ছবার সন্ন্যাসী ও ছবার সংসারী হয়েছিল বলে তাকে তোমাদের উপহাস করা উচিত নয়। সে-যে শেষ পর্যন্ত সংযতেন্দ্রিয় হয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করেছে—এর জন্য সে তোমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।" এই বলে ভগবান বুদ্ধ তাঁর অতীত জীবনের কথা স্মরণ করে একটি সুন্দর কাহিনীর অবতারণা করেন :

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব কৃষিজীবী পর্ণিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। লোকে তাঁকে 'কুদ্দালপণ্ডিত' বলে ডাকত, যেহেতু মাটি কোপাবার কোদালই ছিল তাঁর জীবিকার প্রধান সহায়ক। দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করেও তিনি ভালভাবে খেতে পারতেন না—অতি কষ্টেসৃষ্টে দিন চলত। একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন : এইভাবে দিনপাত করার চেয়ে সন্ন্যাসী হওয়া ঢের ভাল। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। একদিন তিনি সত্যই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। যাবার আগে তাঁর কোদালটি একটা জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন।

পরিব্রাজক সাধুদের সঙ্গে কিছুদিন জীবন-যাপন করার পরেই কিন্তু অন্তরের চাপা আসক্তিগুলি তাঁকে উত্ত্যক্ত করে তুলল। ভোঁতা সেই কোদালটিকে কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। ঐ আসক্তির তাড়নায় তিনি সংসারে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন এবং সেই লুকিয়ে রাখা কোদালটিকে খুঁজে বের করে নিয়ে আবার আগের মতোই চাষবাস করে, কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতে থাকলেন। এইভাবে কিছুদিন সংসারে থাকার পরে আবার তিনি সন্ন্যাসী সেজে চলে যান, কিন্তু কোদালটিকেও তেমনি লুকিয়ে রেখে দেন। এইভাবে তিনি ছবার সন্ন্যাসী হলেন এবং ছবার সংসারে ফিরে গেলেন। সাতবারের বার তিনি সংসার ত্যাগ করে যাচ্ছেন, তখন আর কোদালটা লুকিয়ে রেখে গেলেন না। ভোঁতা এই কোদালটার মোহে তাঁকে বার বার সংসারে ফিরে আসতে হচ্ছে। তাই তিনি এবার ঠিক করলেন, নদীর মাঝখানে কোদালটা ফেলে দেবেন। কোদাল নিয়ে তিনি নদীর ধারে গেলেন। তখন তাঁর মনে হল—চোখ চেয়ে যদি কোদালটা নদীতে ফেলে দেই, তাহলে হয়তো ঐ দেখা-জায়গা থেকে আবার তুলে আনতে ইচ্ছা জাগবে। তাই এবার তিনি ঠিক করলেন দুই চোখ বন্ধ করে কোদালটা নদীতে ফেলে দেবেন ; কোথায় পড়ল যদি না দেখতে পান, তাহলে তুলে আনার আর কোন প্রশ্ন থাকবে না। এই ভেবে তিনি চোখ বন্ধ করে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কোদালটা মাথার উপর দিয়ে তিনবার খুব জোরে ঘুরিয়ে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে দিলেন। ফেলে দেওয়ার সময় তিনি চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—'আমি জিতেছি', 'আমি জিতেছি', 'আমি জিতেছি'।

ঐ সময় নদীর ধার দিয়ে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তাঁর বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করে রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছিলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের ঐ 'আমি জিতেছি' জয়ধ্বনি শুনে অনুচরদের বললেন, "নদীর ধারে দাঁড়ানো ঐ লোকটি 'জিতেছি', 'জিতেছি' বলছে কেন? লোকটি আবার কি জয়লাভ করল? যা হোক, ওকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

অনুচরেরা বোধিসত্ত্বকে রাজার কাছে নিয়ে আসতেই রাজা ব্রহ্মদত্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আমি জয়লাভ করে আমার রাজধানীতে ফিরছি, তুমি আবার কিসে জয়লাভ করলে, বল তো?" স্মিতমুখে বোধিসত্ত্ব বললেন, "মহারাজ, আমাদের মনের মধ্যে অনেক দুষ্ট রিপু আছে। তাদের জয় করা খুবই কঠিন। আর তাদের

যদি জয় করা না যায়, তবে সহস্র সংগ্রাম-জয়ও বৃথা। পৃথিবী জয় করলেও তাতে সত্যিকারের জয় আসে না। আজ আমি আমার চিত্তস্থ দুর্দমনীয় রিপুগুলিকে জয় করেছি। তাই বলছিলাম, 'আমি জিতেছি', 'আমি জিতেছি'…।" এই কথা বলতে বলতে বোধিসত্ত্ব নদীর দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থাকেন, কিছুক্ষণ এই-ভাবে থাকতে থাকতে তাঁর যেন দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল! জিজ্ঞাসু রাজাকে তখন তিনি উপদেশ দিলেন, "যে জয়ের পিছনে পরাজয়ের ভয় আছে, সে-জয় নিষ্ফল। কিন্তু যে-জয়ের পিছনে পরাজয় নেই, সে-জয় সত্যিকারের জয়

বোধিসত্ত্বের এই উপদেশ শুনে রাজার মনে বৈরাগ্যের উদয় হল। রাজার মন থেকে সংসারাসক্তি ও মোহ দূর হয়ে গেল। রাজ্যের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মাল। সর্ব-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার তীব্র ইচ্ছা বারাণসী-রাজকে আকুল করে তুলল। রাজা ব্রহ্মদত্ত বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এখন কোথায় যাবেন?" বোধিসত্ত্ব শান্ত ধীর গলায় বললেন, "আমি হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করব।" রাজা উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আমিও আপনার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করি।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দেন, "বেশ তো, তবে চলুন।"

রাজাকে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে যেতে দেখে অনুচর এবং সৈন্য-সামন্তরা তাঁর পিছন পিছন যেতে থাকে। বারাণসীবাসীরা যখন শুনলে তাঁদের রাজা কুদ্দালপণ্ডিতের উপদেশ শুনে সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর সঙ্গে চলে গেছেন এবং সৈন্য-সামন্তরাও তাঁকে অনুসরণ করছে, তখন তারাও অনুগমন করার জন্য হিমালয়ের পথে যাত্রা করল।

স্বর্গে ইন্দ্রের সিংহাসন টলে উঠল। তিনি দেখলেন, কুদ্দালপণ্ডিত অভিনিষ্ক্রমণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু হিমালয়ে এত লোকের স্থান-সঙ্কুলান হবে কি করে? দেবরাজ তাড়াতাড়ি বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন, "কুদ্দালপণ্ডিত বহু লোককে নিয়ে হিমালয়ে যাচ্ছে, তাদের থাকার জায়গা নেই, তুমি শীঘ্র গিয়ে দৈবশক্তি বলে সেখানে সুপ্রশস্ত একটি আশ্রম তৈরি কর।" 'তথাস্তু' বলে বিশ্বকর্মা তাঁদের বাসস্থানের জন্য হিমালয়ে গেলেন।

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত, তাঁর সৈন্য-সামন্ত ও প্রজারা বোধিসত্ত্বের কৃপায় জাগতিক সুখভোগ পরিত্যাগ করে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

[জাতক অনুযায়ী—অতীতের এই কুদ্দাল-পণ্ডিতই তথাগত বুদ্ধ, রাজা ব্রহ্মদত্ত এসেছেন বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দরূপে এবং ঐ অনুচরবর্গই বুদ্ধশিষ্য-মণ্ডলী। কুদ্দাল-জাতক থেকে আখ্যানটি গৃহীত।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

'তোমরা স্বামীজীর পদাতিক'

আশ্বিনের ঝড়। দুর্গাপূজার ক'দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে তাণ্ডব। বীরভূমে অজয়-নদীর বাঁধ ভেঙে কত গ্রামকে বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! সহসা মধ্যরাত্রে বন্যার প্রলয় কাণ্ড। তার ওপর প্রচণ্ড ঝড় ও প্রবল বর্ষণ। দুর্গামণ্ডপ-গুলিতে থৈ থৈ জল। সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা আনিয়ে, আবাহন না করেই বিসর্জন দিতে হয়েছে বহু জায়গায়। গাছের ডগায়, ঘরের চালে শুধু মানুষ কেন, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, সাপ, ইঁদুর, সর্বপ্রাণীর সহাবস্থান প্রাণরক্ষার দায়ে। সবার বিপদ। বিপদে পড়ে সকলেই হিংসাবৃত্তি ভুলে মিলেমিশে রয়েছে। কত মৃত প্রাণী বন্যার জলে ভেসে ভেসে অদৃশ্য হতে চলেছে।…

একজন মুসলমান ভদ্রলোক বেলুড় মঠে ছুটে এসেছেন স্বামী প্রেমানন্দের কাছে,—এই নিদারুণ

দুঃখ-চিত্রকে নিবেদন করার জন্য,—যদি কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। তখন সকাল সাতটা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে—শোঁ শোঁ রবে প্রবল বেগে ঝড়ও বয়ে চলেছে। গঙ্গার ধারে মঠ-বাড়ির দোতলায় স্বামীজীর ঘরের সামনের বারান্দার টালির ছাউনি বিপর্যস্ত—যুবক সাধুরা সন্তর্পণে সেই ছাউনির টালিগুলি এক-একখানি করে খুলে খুলে নামিয়ে রাখছেন! এদিকে ঐ আগন্তুক ভদ্রলোকের মুখে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে মানুষের দুর্দশার করুণ বিবরণী শুনে স্বামী প্রেমানন্দ অস্থির ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। যেন বিপন্ন সন্তানের আর্ত ক্রন্দনে জননীর বিহ্বলতা! নবীন সাধু সকলের ডাক পড়ল মঠ-বাড়ির একতলার বারান্দায়। বাবুরাম মহারাজ (প্রেমানন্দজী) আবেগজড়ানো কণ্ঠে সারিবদ্ধ দাঁড়ানো সাধুদের লক্ষ্য করে বললেন :

"তোমাদের এক্ষুণি তৈরি হয়ে বেলা ন-টার গাড়িতে গুসকরা যেতে হবে বন্যা-পীড়িতদের সেবায়। ঝট্‌পট্ যা নিতে হয় গুছিয়ে নিয়ে নাওয়া-খাওয়া করে তৈরি হও।"

ক্ষণকালও বিলম্ব হল না। সেনাপতির আদেশে সৈনিকের দল প্রস্তুত হয়ে নিল কিছু সময়ের মধ্যেই। ঐ প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের মধ্যেই তরুণ সেবকদল তৈরি হয়ে নিল—সবার পিঠে কম্বল, এক হাতে লাঠি,অন্য হাতে লণ্ঠন। আর সঙ্গে কিছু কিছু চাল-ডাল ত্রাণ-সামগ্রীর পুঁটলি। বাবুরাম মহারাজও যেন তাঁর সেনাবাহিনীকে 'অ্যাটেন-শান' বলে স্থির হতে আদেশ করলেন! যাত্রা-কালে তাঁদের সঙ্গে দিয়ে দিলেন ঠাকুর-স্বামীজীর অমোঘ আশীর্বাদের রক্ষাকবচ এবং হাতে তুলে দিলেন ত্যাগ ও সেবার মহান পতাকা। প্রস্থানোদ্যত সাধু-সেবকদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁদের সকলেরই চোখে নিজের দৃষ্টিকে স্থাপন করে, উদ্দীপিত কণ্ঠে প্রেমানন্দ স্বামী বলে চলেন :

"তোমরা বীর সৈনিকের মতো যাচ্ছ দেশ জয় করতে, হাতে স্বামীজীর নিশান নিয়ে···। তোমরা শুধু চাল কাপড় দিয়েই ফিরে এসো না। ঠাকুর-স্বামীজীর নারায়ণ জ্ঞানে সেবার ও সমন্বয়ের ভাবে তাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে,—সকলের হৃদ্‌গত নারায়ণকে প্রসন্ন করে,—ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব সেখানকার সবার মধ্যে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে তবে আসবে। স্বামীজীর বিজয়-নিশান গেড়ে, সেই দেশটিকে জয় করে ফিরবে তোমরা। তোমরা স্বামীজীর পদাতিক সৈন্য—স্বামীজীই তোমাদের নেতা, প্রধান সেনাপতি। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও চরিত্র তোমাদের আদর্শ। যাও বীর সৈনিকের মতো এগিয়ে, ঠাকুর-স্বামীজীর সমন্বয়-ভাব প্রচারার্থে নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হও নিজেরা,—কর ধন্য তোমাদের কুল। বিপন্ন ভারতের আর্যকৃষ্টি, আর্য সভ্যতাকে কর উদ্ধার, মুখ উজ্জ্বল কর সেই আর্য ঋষিগণের যাঁদের রক্ত তোমাদের ধমনীতে বইছে। অধঃপতিত মুমূর্ষু ভারতকে কর জাগ্রত, জীবন্ত ও পূর্বাপেক্ষাও শতগুণে গৌরবে সমুজ্জ্বল। তোমরাই স্বামীজীর উত্তরাধিকারী, তোমাদেরই উপর দিয়ে গেছেন স্বামীজী এই ভারতের তথা বিশ্বের উদ্ধারের ভার। তোমরা ভাগ্যবান, এই নারায়ণ-সেবার সুযোগ পেয়েছ, এখানে এসে পড়েছ তাঁর কাজের সহায় হয়ে। কর তাঁর সেই কাজ মন-প্রাণ দিয়ে, বিন্দু বিন্দু করে হৃদয়ের সমস্ত শোণিতপাতে। জীবত্ব ঘুচিয়ে হও শিব, মৃত্যুকে জয় করে হও মৃত্যুঞ্জয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিশ্বপ্রেম-সমুদ্র যেন উচ্ছল হয়ে প্রেমানন্দ-মূর্তিতে সম্মুখে দণ্ডায়মান,—আর সেই তরঙ্গ-ভঙ্গে সমীপবর্তী সেবকমণ্ডলী সেদিন অভিস্নাত ও অনুপ্রাণিত। কিছুক্ষণের জন্য নীরব সব। স্বামী প্রেমানন্দ অকস্মাৎ উচ্চারণ করলেন—"মার্চ"। বিবেকানন্দের পদাতিক বাহিনী অমনি যন্ত্রচালিতবৎ রেল স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করলেন। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হল. "জয় শ্রীগুরুমহারাজজী কি জয়।"

[তদানীন্তন জনৈক সাধুর আত্মস্মৃতি থেকে]

জ্ঞান-বিজ্ঞান

সৌররশ্মি-শীতক (Solar Fridge)

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ অনুসন্ধানে সৌরশক্তিকে যেভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল, সেই কৌশল এখন ১৩টি দেশের পল্লী টিকাবীজ (Vaccine) সংরক্ষণ এবং বরফ তৈরি করার জন্য শীতক (refrigerator) চালানোর কাজেও লাগানো চলে কিনা পরীক্ষা করে দেখার প্রস্তাব হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation) দ্বারা চালিত এই পরীক্ষা সফল হলে, সংস্থার ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিশুদের হাম, পোলিও, যক্ষ্মা, ডিপথিরিয়া, ঘুংরি কাশি এবং ধনুষ্টঙ্কার প্রতিরোধের জন্য যে টিকা দেওয়ার কর্মসূচি আছে, তাতে প্রভূত সহায়তা হবে। এই পরীক্ষা বাবদ যে অর্থব্যয় হবে, আমেরিকার সেণ্টার ফর ডিজিজ কণ্ট্রোল (Centre for Disease Control) এবং ন্যাশনাল এরোনটিক অ্যাণ্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (National Aeronautic And Space Administration) তার সবটাই বহন করবে। কয়েক মাসের মধ্যেই এই পরীক্ষার কাজ হতে চলেছে।

সৌররশ্মি-শীতকের প্রক্রিয়ায় ফটোভোল্টেয়িক প্যানেল (Photovoltaic Panel)-এ সূর্যের রশ্মি পড়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে শীতক (refrigerator) চালাবে। এতে ২৪ ঘণ্টায় এক হতে দুই কিলোগ্রাম বরফ তৈরি হবে। কয়েকটি উন্নত দেশে এই ধরনের শীতক এখনই চালু আছে। গবেষণাগারে কাজ শেষ হয়ে আগামী দুই বৎসরেই কলম্বিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকোয়েডর, গ্যাম্বিয়া, গোয়টিমালা, গায়েনা, হাইটি, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, আইভরি কোস্ট, ম্যালাডাইভ্‌স, মালি এবং পেরুতে পল্লী অঞ্চলে এগুলি চালু হবে।

টিকাবীজের কার্যকারিতা বজায় রাখতে হলে তার তৈরি হওয়ার সময় হতে সুদূর পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত হওয়া পর্যন্ত তাকে ৮° সেন্টিগ্রেড (৪৬° ফারেনহাইট) তাপমাত্রার নিচে রাখতে হবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এটি একটি বিরাট সমস্যা এবং সৌররশ্মি-শীতক এ বিষয়ে খুব উপকারী হবে।

উন্নতিশীল দেশগুলিতে প্রতি বৎসর সাড়ে আট কোটির বেশি শিশু জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ মারা যায় এবং ৫০ লক্ষ শৈশবকালের অসুখে আক্রান্ত হয়। টিকাবীজ থাকা সত্ত্বেও মাত্র শতকরা ২০ জনেরও কম শিশু এই টিকা লয়

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অনেক গ্রামে বিদ্যুতের অভাব বা অনিয়মিত সরবরাহের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সৌরশক্তির দিকে নজর দিয়েছে। অন্য কারণের মধ্যে আছে রিফ্রিজারেটরের জন্য কেরাসিন ও তরল প্রোপেন (Propane) গ্যাসের অভাব বা উচ্চ মূল্য।

যদিও সৌর-শীতক তৈরির ঝামেলা আছে, কিন্তু এগুলি চালানোর এবং চালু রাখার ঝামেলা কম। তা ছাড়া দামের প্রশ্ন আছে। বর্তমানে একটি রিফ্রিজারেটর কেনায় এবং দশ বৎসর চালু রাখতে খরচ পড়ে ১৪০০০ টাকা। সৌর-শীতক তৈরি করতে খরচ পড়ে ৪০,০০০ টাকা, যেটা ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আশা করা যাচ্ছে হবে ১০,০০০ টাকা। কিন্তু এটি চালাতে কোন খরচ নেই বলে সব মিলে শেষ পর্যন্ত এর খরচ রিফ্রিজারেটরের চেয়ে কমই দাঁড়াবে।

[World Health—January 1982-তে প্রকাশিত তথ্য অবলম্বনে]

দেশ-বিদেশ

অরুণাচলের অধিবাসী : খোয়া

কামেঙ জেলার আর একটি উপজাতির নাম 'খোয়া'। অকা উপজাতির মধ্যে 'খোয়া' একটি ছোট উপদল। তা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে না থেকে খোয়ারা আলাদা সাতটি গ্রামে পৃথক্‌ভাবে থাকে। রীতিনীতিতে অকাদের সঙ্গে তাদের খুব সাদৃশ্য। তারা রৌদ্রে মাঠে কাজ করে বলে অকাদের চেয়ে তাদের গায়ের রং কালো। তাদের ভাষায় তাদের 'বুগুন' বলে। ভাষা ছাড়া অকাদের সঙ্গে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে ও ধর্মে কোন বৈসাদৃশ্য নেই।

খোয়া উপজাতিরা গৃহনির্মাণ করে শেরডুক্‌পেন উপজাতিদের মতো। তবে তফাত শুধু তারা ব্যবহার করে বাঁশ, বেত ও কাঠের খুঁটি আর শেরডুক্‌পেনরা দেওয়ালের জন্য ব্যবহার করে পাথর, ছাদের জন্য তক্তা।

খোয়ারা বয়নশিল্প জানে না। বেত ও বাঁশের কাজ ছাড়া এরা আর কিছুই প্রায় জানে না। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য তারা সমতল-ভূমির সঙ্গে কোন যোগাযোগও রাখে না। ফলে তাদের একান্ত প্রয়োজনীয় লবণ প্রভৃতির মতো জিনিসের জন্যও শেরডুক্‌পেন উপজাতির উপর নির্ভর করতে হয়। এই সব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বিনিময়ে প্রতিবেশীদের গৃহে কায়িক শ্রমের কাজ করে দিতে হয় এদের। খোয়ারা ভাল চাষবাসের কাজ জানে। তারা চাষ করে গম, ধান, বার্লি, লঙ্কা, আলু, রাঙা আলু প্রভৃতি। চাষের উৎপন্ন দ্রব্য থেকেই তাদের জীবনযাত্রা চলে যায় এবং যা উদ্‌বৃত্ত হয় তা তারা অন্যদের বিলিয়ে দেয়।

তাদের গৃহপালিত পশু মিথন, ছাগল, শুয়োর ও পাখি। খোয়া উপজাতিরা ছাগলের মাংস খায় না। খোয়া-মেয়েদের ভেড়া ও পাখির মাংস খাওয়া নিষেধ। পণ্য জিনিসের বিনিময়ের জন্য টাকা-পয়সার পরিবর্তে ছাগল ব্যবহার করা হয়। এই উপজাতির কাছে মিথন পশুটি মূল্যবান। বিয়ের পণ হিসাবে মিথন ব্যবহার হয়। তাদের মিথনের মাংস দিয়ে ভোজ হয় বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষে।

খোয়া উপজাতির মধ্যে শিশু-বিবাহের প্রচলন পূর্বে ছিল। বর্তমানে এই শিশু-বিবাহের প্রচলন উঠে গেছে। এই উপজাতির অবস্থাপন্ন লোকদের একাধিক স্ত্রী থাকে। মা-বাবার সম্মতি অনুযায়ী এই উপজাতির ছেলে-মেয়েদের বিবাহ হয়। বিবাহযোগ্যা কন্যার শুভাশুভ বিচার করে 'ডেওরি' (পুরোহিত)। 'ডেওরি' মুরগীর যকৃতের উপর গণনা করে বলে দেয়, বিবাহের জীবন সুখী হবে কিনা। গণনার পর বিবাহের আদান-প্রদান কি হবে, তা ঠিক হয়। বিবাহের দিন পাত্রপক্ষকে পণ হিসাবে দিতে হয় গৃহপালিত পশু বা অন্যান্য জিনিস। এই উপজাতির মধ্যে খুড়তুত ও জেঠতুত ভাইবোনের সঙ্গে বিবাহ হয় না। বড় ভাই মারা গেলে সাধারণতঃ তার স্ত্রীকে বিবাহ করে ছোট ভাই। তবে ছোট ভাই-এর যদি পছন্দ না হয়, তাহলে বড় ভাই-এর বিধবা-স্ত্রী অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারে।

খোয়ারা মারা গেলে শবদেহ কবর দেওয়া সামাজিক ব্যবস্থা। মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে যে-সমস্ত জিনিসপত্র ব্যবহার করত, তাও সব কবরে দেওয়া হয়। কবরের উপর একটি ছাওনির মতো তৈরি করা হয়। মৃত্যুর পর পাঁচদিন সেখানে এক-জনের ভোজন-পরিমাণ খাদ্য ভালভাবে সাজিয়ে দিয়ে আসতে হয়। পাঁচদিনের দিন আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে খুব ধুমধামের সঙ্গে খাওয়ানো হয়।

সঙ্গে চলে সারারাত ধরে নৃত্য।

পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয় পুত্র। কন্যা শুধু পায় অলংকার। তবে বোনের বিবাহের সব দায়-দায়িত্ব ভাই বহন করে এবং যতদিন না বোনের বিবাহ হয়, ততদিন ভাই-এর কাছে সে থাকে।

খোয়ারা বিভিন্ন অপদেবতাকে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে এই সব অপদেবতা রুষ্ট হলে ক্ষতি করে। তাই তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য তাদের উপলক্ষ করে শুয়োর, গরু, ভেড়া প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। এই সব অপদেবতা ছাড়াও তারা বিশ্বাস করে, একজন সর্বশক্তিমান ও কল্যাণময় দেবতা কেউ আছেন। এই সর্বশক্তিমান দেবতার নাম 'চাম্‌রাম'। জানুআরি মাসে পাঁচ দিনব্যাপী অতি আড়ম্বরের সঙ্গে এই দেবতার পূজা হয়। এই পূজা খোয়া উপজাতির সবচেয়ে বড় উৎসব। উৎসবের সময় গ্রামের বাইরে কেউ যায় না, বাইরে কেউ থাকলে উৎসবের আগে গ্রামে ফিরে আসে। এই উৎসবে অন্যান্য উপজাতিরাও ইচ্ছা করলে যোগ দিতে পারে। নৃত্যগীতে, খানা-পিনাতে এই উৎসব মুখর হয়ে ওঠে।

সমালোচনা

সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (৩য় খণ্ড)—ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ। প্রাচী পাবলিকেশনস, ৩/৪ হেয়ার স্ট্রীট (তেতলা), কলি-১। (১৩৮৮), মূল্য ঃ বার টাকা।

মোট ১৮টি প্রবন্ধের সঙ্কলন এই গ্রন্থখানিতে ১৪টি প্রবন্ধে সাধুপ্রসঙ্গ ও ৪টি প্রবন্ধে বিভিন্ন সাধনা সংক্রান্ত লেখকের যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ মনোজ্ঞ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ বিশ্বখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বহু সাধকের সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের জীবন ও সাধনার পরিচয়বাহী প্রথম ১৪টি প্রবন্ধ লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা, গভীর সহমর্মিতা ও স্বচ্ছন্দ বর্ণনায় বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হয়েছে। শেষ চারটি প্রবন্ধে—'শ্রীচক্রের অবতরণ ও বিশ্বসৃষ্টির রহস্য', 'অজপা রহস্য', 'আরোপ সাধন' ও 'তিনজন্ম বিচার'—সাধনপদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা লেখকের পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল।

গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে, "পূজ্যপাদ ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের এই লেখাগুলি সংগৃহীত ও অনূদিত।" কিন্তু ডক্টর কবিরাজের রচনা অনুবাদে যতখানি সতর্কতার প্রয়োজন ছিল, দুঃখের বিষয়, তার অভাব বিশেষ পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। অনুবাদ সুখপাঠ্য হলেও প্রচুর বানান ভুল, ভাষা ও প্রয়োগে অশুদ্ধি দৃষ্টিকটু। পরবর্তী সংস্করণে এগুলির সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

কয়েকটি রেখাচিত্রের সংযোজন গ্রন্থটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। আশা করি বইটি ভক্ত ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সমাদর লাভ করবে।

—অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরা—বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। প্রকাশক: স্বপন চট্টোপাধ্যায়, বনমালী বিশ্বনাথ প্রকাশন, ২২ পঞ্চাননতলা রোড, কলিকাতা-৪১। (১৯৮০), পৃঃ ৯০, মূল্য: আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

প্রাচীন ভারতের কয়েকজন দিক্‌পাল বিজ্ঞানীর কথা এই বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে, যাঁরা বিশ্বের গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় মৌলিক অবদান রেখে গেছেন। অতীত ভারতের বিজ্ঞান-চর্চার গৌরবোজ্জ্বল একটি দিক

লেখক সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বৈদিক যুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর উষাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত কালের মেধাতিথি, লগধ, বৌধায়ন, গর্গ, আর্যভট, শ্রীষেণ, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, শ্রীধরাচার্য, মহাবীরাচার্য, জয়সিংহ প্রমুখ গণিত বিশারদদের জীবন এবং তাঁরা গণিত ও জ্যোতি-বিজ্ঞানের যে-সব আবিষ্কার বা ব্যাখ্যা করেছিলেন, যেমন শূন্য ও দশমিক পদ্ধতি আবিষ্কার, সেই প্রাচীন যুগে পরার্ধ পর্যন্ত বড় সংখ্যার বোধ ও উল্লেখ, ঘটিযন্ত্র, শঙ্কুযন্ত্র প্রভৃতি সময়মাপক যন্ত্রের উদ্ভাবন, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনে ও যজ্ঞের বেদী নির্মাণে ভারতীয় জ্যামিতির সূত্রপাত, নক্ষত্রচর্চা, পৃথিবীর গোলাকৃতি ও আহ্নিকগতির ধারণা, আধুনিক মানমন্দির নির্মাণ প্রভৃতি তথ্যের সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হতে পারা যায়। বিভিন্ন প্রচলিত গ্রন্থ থেকে মালমশলা সংগ্রহ করে মূলতঃ ছোটদের জন্য বইটি লিখলেও বড়দেরও কাজে লাগবে। আলোচনা সরল, তবে বড় বেশি জ্যামিতি ও অঙ্কের উদাহরণে হোঁচট খেতে হয় মাঝে মাঝে, যেগুলো কমালে বইটির দামও একটু কমত। বিজ্ঞানী হয়েও ব্রহ্মগুপ্তের চিন্তাধারা কী পরিবেশে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছিল, তাও ব্যাখ্যা করেছেন। বইটির বহুল প্রচার কাম্য, কারণ প্রাচীন ভারতের প্রতিভার দীপ্তি আধুনিক ও আগামী ভারতের কচি কিশোরদের অনুপ্রাণিত করবে।

—ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

Self-Mastery—Swami Paramananda, Published by Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras-600 004. (1980), P. 82, Price : Rs. 2·50.

বিদেশে বহুল প্রচারিত বেদান্ত প্রকাশনমালার অন্যতম স্বামী পরমানন্দের এই পুস্তকখানির বর্তমান ভারতীয় সংস্করণটি প্রকাশ করে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার স্বামী বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ সন্ন্যাসি-শিষ্যদের একজন। শ্রীগুরুর ভাবাদর্শে সুগঠিত স্বামী পরমানন্দ পাশ্চাত্যে বিশিষ্ট বেদান্ত-প্রবক্তারূপে জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আচার্য বিবেকানন্দেরই প্রিয় গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের শিক্ষায় পরিবর্ধিত। জ্ঞানে ও উপলব্ধিতে, পাণ্ডিত্যে ও মনীষায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিমণ্ডলে একজন মহনীয় ব্যক্তিত্ব। আলোচ্য পুস্তকখানি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও স্বামী পরমানন্দের অলোক-সামান্য আধ্যাত্মিক জীবনের স্নিগ্ধ কিরণধারা-স্বরূপ—অথবা বলা যেতে পারে, যেন সুন্দর একটি স্তবক যাতে আছে সুনির্বাচিত শান্তিকর ছয়টি নিবন্ধ-পুষ্প : নিজের উপর প্রভুত্ব, মানুষ নিজের বন্ধু ও নিজের শত্রু; শরীর ও মনের উপর নিয়ন্ত্রণ, আমাদের নিম্নবৃত্তিগুলিকে জয় করা; কিরূপে আমাদের শক্তিকে রক্ষা করা যায়; স্বাবলম্বন ও আত্মনিবেদন। সব প্রবন্ধগুলিই স্বল্পাকার এবং প্রদত্ত বক্তৃতা হতে সংকলিত ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও কবিত্বময় হওয়ায় এবং বিষয়বস্তুর উপর মনস্বী বক্তার পূর্ণ-কর্তৃত্ব থাকায় তিনি বেদান্তের কাঠিন্যকে অতি কোমল ও হৃদয়গ্রাহী করে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন। কথামৃত বা উপনিষদ্ থেকে অনেক আখ্যান ও উপমার সন্নিবেশ থাকায় পাঠকের পক্ষে পুস্তকের ভাব-গ্রহণ করা অনায়াসসাধ্য হয়েছে। সব প্রবন্ধ-গুলির প্রারম্ভে মহাভারত, কনফুসিয়াস, সেন্ট কেডক, সংহিতা প্রভৃতি হতে উদ্ধৃতিগুলি প্রবন্ধ-গুলিকে আরও সমৃদ্ধিশালী করেছে। পুস্তকটি পাঠে বেদান্তে অনভিজ্ঞ আমাদের মতো সকলেই উপনিষদের তথা বেদান্তের মৌলতত্ত্বগুলির ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু হবেন, এবং তাঁদের শাস্ত্র-পিপাসা বর্ধিত হবে নিশ্চিত। মুদ্রণ পারিপাট্য পুস্তকখানিকে আকর্ষণীয় করেছে সন্দেহ নেই। ইংরেজী জানা অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু সবার পক্ষেই পুস্তকখানি অবশ্য পাঠ্য। আমরা এর বহুল প্রচার কামনা করি।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

আসাম হাঙ্গামা-ত্রাণ : আসামে হাঙ্গামা শুরুর অব্যবহিত পরেই গত ফেব্রুআরি মাসে গৌহাটির চারিপাশে ১১৫ কিলোমিটার দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে চিকিৎসা-সেবাকার্য চলিয়াছিল।

(১) অভয়াপুখরি, চাপাই, ধূলা এবং শান্তিপুর শিবির হইতে পনেরটি গ্রামের ৬,১৮০ জন দুর্গত নরনারীর মধ্যে গত ২৩ মার্চ, ১৯৮৩ পর্যন্ত বিতরিত বস্ত্র ও গৃহস্থালি দ্রব্যাদির তালিকা :

৪৮২টি ধুতি, ৬৩৫টি শাড়ী, চাদর ২১৮টি; পোশাকাদি : ৮৪২টি শার্ট, প্যান্ট ৮৪২টি, ফ্রক ৮৪২টি, ইজার ৮৪২টি ; অ্যালুমিনিয়াম বাসনাদি : হাঁড়ি, কড়াই, থালা, গেলাস, বাটি, খটি, হাতা ও খুন্তি—প্রতিটি ৮৪২ এবং মেখলা চাদর ২০৭টি।

(২) আলিপুরদুয়ার শিবির হইতে ৬,৬১৪ জন দুর্গত নরনারীর মধ্যে গত ১১ মার্চ, ১৯৮৩ পর্যন্ত বিতরিত দ্রব্যাদির তালিকা : অ্যালুমিনিয়ামের গৃহস্থালি দ্রব্যাদি : ঢাকনাসহ হাঁড়ি, ঘটি, বিভিন্ন মাপের গেলাস ও থালা, বাটি এবং কড়াই প্রতিটি দ্রব্য ১২০০। হাতা ও খুন্তি প্রতিটি ১২০১। বস্ত্রাদি : ধুতি ১৩০০টি, শাড়ী ১২০০টি, সূতীর কম্বল ১০০টি এবং পোশাকাদি : শার্ট, প্যান্ট, ফ্রক ও ইজার প্রতিটি ১২০০।

বেলুড় মঠে উৎসব

গত ১৬ মার্চ, ১৯৮৩ এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮০তম আবির্ভাবতিথি উদ্‌যাপিত হয়। ঐ উপলক্ষে উপস্থিত ৩৫,০০০ নরনারীকে হাতে-হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। স্বামী বন্দনানন্দজীর সভাপতিত্বে অপরাহ্নে মঠ প্রাঙ্গণে একটি ধর্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত সভায় স্বামী গহনানন্দ, স্বামী ভাষ্যানন্দ ও শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেন। সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২০ মার্চ, ১৯৮৩। উক্ত দিবস সমাগত ৩০,০০০ নরনারীকে হাতে-হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়। দিনের শেষভাগে জনসমাগমের আধিক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

গত ২৪ ফেব্রুআরি, ১৯৮৩ **মাদ্রাজ বিদ্যাপীঠ** (বিবেকানন্দ কলেজ) কর্তৃক বিভিন্ন কলেজ হইতে আগত ৭০ জন ছাত্রের উপস্থিতিতে সারাদিনব্যাপী এক যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পাটনা কেন্দ্র কর্তৃক গত ১৩ মার্চ, ১৯৮৩ এক যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। উহাতে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৮১।

উদ্বোধন-সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবতিথি-উৎসব

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৮তম আবির্ভাবতিথি গত ১৬ মার্চ ১৯৮৩, বুধবার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে শান্ত উদ্দীপনাময় পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজনসঙ্গীত হয়। সকাল ৯টায় 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং সন্ধ্যারতির পর স্বামী অজজানন্দ উক্ত 'হলে' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী লইয়া আলোচনা করেন। মায়ের বাড়ীতে ঐ দিন বহু ভক্ত নরনারীকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা

সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

আবির্ভাব-তিথি ও পূজাদির সূচী

বাংলা ১৩৯০ সাল, ইংরেজী ১৯৮৩-৮৪ খ্রীঃ

তিথি-কৃত্য

১।	শ্রীরামচন্দ্র	চৈত্র শুক্লা নবমী	৭ বৈশাখ	বৃহস্পতিবার	২১ এপ্রিল ১৯৮৩
২।	শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	২ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	১৭ মে "
৩।	শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	১১ জ্যৈষ্ঠ	বৃহস্পতিবার	২৬ মে "
৪।	স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	২২ শ্রাবণ	রবিবার	৭ অগস্ট "
৫।	স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	৬ ভাদ্র	মঙ্গলবার	২৩ অগস্ট "
৬।	শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১৪ ভাদ্র	বুধবার	৩১ অগস্ট "
৭।	স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২০ ভাদ্র	মঙ্গলবার	৬ সেপ্টেম্বর "
৮।	স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	১৪ আশ্বিন	শনিবার	১ অক্টোবর "
৯।	স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	১৯ আশ্বিন	বৃহস্পতিবার	৬ অক্টোবর "
১০।	স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	১ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতিবার	১৭ নভেম্বর "
১১।	স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৩ অগ্রহায়ণ	শনিবার	১৯ নভেম্বর "
১২।	স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	২৮ অগ্রহায়ণ	বুধবার	১৪ ডিসেম্বর "
১৩।	শ্রীযীশুখৃষ্ট	—	৮ পৌষ	শনিবার	২৪ ডিসেম্বর "
১৪।	**শ্রীশ্রীমা**	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১০ পৌষ	সোমবার	২৬ ডিসেম্বর "
১৫।	স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	১৪ পৌষ	শুক্রবার	৩০ ডিসেম্বর "
১৬।	স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	২৪ পৌষ	সোমবার	৯ জানুআরি ১৯৮৪
১৭।	স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	৩ মাঘ	মঙ্গলবার	১৭ জানুআরি "
১৮।	**শ্রীশ্রীস্বামীজী**	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১০ মাঘ	মঙ্গলবার	২৪ জানুআরি "
১৯।	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২১ মাঘ	শনিবার	৪ ফেব্রুআরি "
২০।	স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৩ মাঘ	সোমবার	৬ ফেব্রুআরি "
২১।	স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘী পূর্ণিমা	৩ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	১৬ ফেব্রুআরি "
২২।	**শ্রীশ্রীঠাকুর**	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২০ ফাল্গুন	রবিবার	৪ মার্চ "
	(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২৭ ফাল্গুন	রবিবার	১১ মার্চ "
২৩।	শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	৩ চৈত্র	শনিবার	১৭ মার্চ "
২৪।	স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	৬ চৈত্র	মঙ্গলবার	২০ মার্চ "
২৫।	শ্রীরামচন্দ্র	চৈত্র শুক্লা নবমী	২৭ চৈত্র	মঙ্গলবার	১০ এপ্রিল "

পূজা-কৃত্য

১।	শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	২৬ জ্যৈষ্ঠ	শুক্রবার	১০ জুন ১৯৮৩
২।	স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	১০ আষাঢ়	শনিবার	২৫ জুন "
৩।	শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২৬ আশ্বিন	বৃহস্পতিবার	১৩ অক্টোবর "
৪।	শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	১৮ কার্তিক	শুক্রবার	৪ নভেম্বর "
৫।	শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	২৪ মাঘ	মঙ্গলবার	৭ ফেব্রুআরি ১৯৮৪
৬।	শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	১৬ ফাল্গুন	বুধবার	২৯ ফেব্রুআরি "

দেহত্যাগ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত সঙ্ঘের একজন বর্ষীয়ান প্রবীণ সন্ন্যাসীর প্রয়াণ সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ (সুরেন মহারাজ) গত ২২ মার্চ ১৯৮৩, মধ্যরাত্রে ৯৩ বৎসর বয়সে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বার্ধক্যজনিত বহুবিধ উপসর্গের পরিণতিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট দীক্ষালাভ করেন এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই দ্বারা সন্ন্যাসপ্রাপ্ত হন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিশনের বরিশাল কেন্দ্রে (অধুনা বাংলাদেশে) যোগদান করেন। জীবনের প্রথমভাগে তিনি যথাক্রমে মাদ্রাজ মঠ, কনখল সেবাশ্রম ও বেলুড় মঠে নানাবিধ সেবাকর্মে নিরত থাকিয়াছেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় হিমালয়ের উত্তরকাশীতে তপস্যায় অতিবাহিত হইয়াছে। বার্ধক্যে দীর্ঘকাল কিষাণপুরেও থাকিয়াছেন। তপস্যা ও শাস্ত্রচর্চাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান অবলম্বন। 'তপস্বী সুরেন মহারাজ' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। নিরলস তপোনিষ্ঠা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও সরল সাধুজীবনের জন্য তিনি সঙ্ঘে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার দেহ-বিমুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে অনন্তকালের জন্য বিলীন হইলেন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **শান্তিরঞ্জন দে সরকার** গত ২৫ জানুআরি ১৯৮৩, ৬৯ বৎসর ১০ মাস বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। মিশনের শাখাকেন্দ্র জামসেদপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরূপে অনেকদিন কাজ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর কৃপাপ্রাপ্ত **শ্রীহেরম্ব-চন্দ্র ভট্টাচার্য** দীর্ঘ রোগভোগান্তে গত ২৩ মার্চ ১৯৮৩, কলিকাতার শেঠ সুখলাল করনানি হাসপাতালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭২ বৎসর। স্বনামধন্য শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য সর্বতোভাবে তাঁহার পিতার হৃদয়বত্তার উত্তরাধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। বিখ্যাত এম. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাইভেট সংস্থার প্রধান পরিচালক ছাড়াও, তিনি আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন। আশৈশব রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকায়, মিশনের সর্ববিধ সেবামূলক কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল তাঁহার জীবনের এক বিশেষ উল্লেখ্য দিক। রামকৃষ্ণ মিশন ব্যতীত কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি, আঁটপুর রামকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ আশ্রম, বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম প্রমুখ আরও অনেক সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সাক্ষাৎ ভাবে যুক্ত ছিলেন, অথবা উহাদের নেতৃত্বেই থাকিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, দানশীলতা এবং সর্বোপরি ভগবদ্‌ভক্তি ও কর্মনিষ্ঠা তাঁহাকে দেশবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত বাগবাজারনিবাসী ৺তেজচন্দ্র মিত্রের পুত্রবধূ শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত ৺মানবকৃষ্ণ মিত্রের সহধর্মিণী শ্রীমতী **রাধারাণী মিত্র** গত ২৯ মার্চ ১৯৮৩, পরলোক গমন করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে শান্তিলাভ করুক।

এই মাসের পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থ

গীতাতত্ত্ব

স্বামী সারদানন্দ

[৯ম সং, পৃঃ ১৭৪, মূল্য ৭'০০]

উদ্বোধন কার্যালয়। ১ উদ্বোধন লেন। কলিকাতা-৩

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।



পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ● আষাঢ়, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ২৯৬-৩০৭)

যে সাধন-ভজন বা অনুভূতি দ্বারা পরের উপকার হয় না, মহামোহগ্রস্ত জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের গণ্ডি থেকে মানুষকে বের হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল কি? তুই বুঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে তোর মুক্তি আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মানুভূতি করাতে। প্রতি জীব যে তোরই অঙ্গ। এই জন্যই পরার্থে কর্ম। তোর স্ত্রী-পুত্রকে আপনার জেনে তুই যেমন তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করিস, প্রতি জীবে যখন তোর ঐরূপ টান হবে, তখন বুঝব—তোর ভেতর ব্রহ্ম জাগরিত হচ্ছেন, not a moment before (তার এক মুহূর্ত আগে নয়)। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে এই সর্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনা জাগরিত হ'লে তবে বুঝব, তুই ideal-এর (আদর্শের) দিকে অগ্রসর হচ্ছিস।

—স্বামী বিবেকানন্দ



১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন পঞ্জাব ইংরাজরাজ্যভুক্ত করা হয়, তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে কোহিনুর উপঢৌকন দিবার কথা হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া বোর্ডের অধিবেশনে মহাত্মা জন্ লরেন্সের উপর কোহিনুর রক্ষার ভার অর্পিত হয়। তিনি ইহা নিজের কোটের পকেটে একটী টিনের কৌটায় রাখিয়া দেন ও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইহার কথা বিস্মৃত হন। কিয়ৎকাল পরে যখন কোহিনুর ইংলণ্ডে পাঠাইবার আদেশ আসিল, তখন সার জন্ তাঁহার ভ্রাতা হেনরি লরেন্সকে উহা পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

কিন্তু, যখন উত্তর পাইলেন যে, কোহিনুর তাঁহাকেই দেওয়া হইয়াছিল, তখন সার জন্ লরেন্স স্বীয় অসাবধানতার জন্য ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কোটের পকেট হইতে তাঁহার ভৃত্য কৌটাটী বাহির করিল। যখন উহার ভিতর কোহিনুর পাওয়া গেল, তখন ভৃত্য উহাকে কাচ খণ্ড বলিয়া আপনার মত প্রকাশ করিল। এইরূপ অবহেলা কোহিনুরের অদৃষ্টে কখন ঘটে নাই। জগতের শ্রেষ্ঠরত্ন কোহিনুর এখন ইংলণ্ডে উইণ্ডসর ক্যাস্‌লে রক্ষিত হইতেছে; কিন্তু ইহার একটী অনুরূপ টাওয়ার-অফ-লণ্ডনে দর্শকবর্গের কৌতূহল নিবারণার্থে রহিয়াছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ প্রদর্শনীতে কোহিনুর প্রদর্শিত হইয়াছিল।

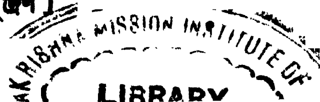
২।—চন্দ্রশেখর।

কোহিনুরের সহিত আর একটী রত্ন নাদির সাহ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হয়। এই রত্নের ভারতবর্ষীয় নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম "Moon of Mountains" (চন্দ্রশেখর)। নাদির সাহ যখন দিল্লি হইতে ভারতের রত্ন সকল লুণ্ঠন করিয়া স্বীয় রাজধানীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিলেন, তখন এই রত্ন ঐ দিগ্বিজয়ীর সিংহাসন হইতে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছিল। যখন ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সৈনিকগণের শানিত অস্ত্রে নাদিরের বক্ষ বিদীর্ণ হয়, তখন অন্যান্য মণিমাণিক্যের সহিত এই হীরকও এক আফ্‌গান সৈন্যের লুণ্ঠিত অংশে পরিণত হয়। একদিন ঐ আফ্‌গান তৎকালিন প্রসিদ্ধ বাসোরা নগরে উপস্থিত হইল। তথায় সে সাফ্‌রাস্ নামক এক আর্ম্মিনিয়ানের নিকট রত্ন সকল বিক্রয়ের জন্য লইয়া গেল। আফ্‌গান ঐ সকল রত্নের মূল্য কিছুই জানিত না। মণিকারেরা রত্ন সকলের মধ্যে অসামান্য জ্যোতিঃ-সম্পন্ন সুবৃহৎ হীরক দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং ঐ হীরক ক্রয় করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহের সময় প্রার্থনা করিল। এ দিকে আফ্‌গান ভাবিল যে, তাহারা তাহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ ভাবিয়া সে সহসা বাসোরা পরিত্যাগ করিয়া, বাগ্‌দাদে উপস্থিত হইল এবং তথায় এক য়িহুদিকে ৬৫০০০ পিয়াস্তায় ও দুইটী অত্যুৎকৃষ্ট আরব অশ্বের বিনিময়ে ঐ সকল রত্ন প্রদান করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, সে অশ্বারোহণ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ না করিয়া, তথায় পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিল। কয়েক দিন পরে, সাফ্‌রাস্ তাহার সম্মুখে উপস্থিত।

আফ্‌গানের বাসোরা ত্যাগের পর সাফ্‌রাস্ ভাবিয়াছিল যে, তাহার অদৃষ্টে আর সৌভাগ্য লাভ ঘটিবে না। সে আফ্‌গানের অনুসন্ধানে বাগ্‌দাদে আসে নাই, কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিল।

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

(বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ২৩০)



এখন তাহাকে দেখিয়া তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু যখন শুনিল যে, এক য়িহুদি ঐ সকল রত্ন ক্রয় করিয়াছে, তখন তাহার দুঃখের অবধি রহিল না। সাফ্‌রাস্ অনন্তর য়িহুদিকে কেবল ঐ হীরকের জন্য দ্বিগুণ মূল্য দিবে বলিল। কিন্তু সে কিছুতেই ঐ হীরক বিক্রয় করিল না।

কয়েক দিবস পরে সাফ্‌রাসের দুই ভ্রাতা বাগ্‌দাদে উপনীত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, অবশেষে তাহারা ঐ য়িহুদি ও আফ্‌গানকে তাহাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ করিল। তাহারা কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া বিষমিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং ঐ তিন আর্ম্মিনিয়ান কর্ত্তৃক টাইগ্রিস্ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু এক্ষণে এই নূতন বিপদ আসিয়া এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিল যে, তিন ভ্রাতার মধ্যে কে ঐ হীরকের প্রকৃত অধিকারী। ধূর্ত্ত সাফ্‌রাস্ স্বীয় ভ্রাতাদ্বয়কে বধ করিয়া টাইগ্রীসের জলে ভাসাইয়া দিল এবং নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। কিন্তু সে ধনলোভে যে সকল লোকের প্রাণবধ করিল, তাহাদের প্রেতাত্মা তাহার সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল।

সাফ্‌রাস্ শীঘ্র বাগ্‌দাদ্ হইতে কন্‌সটান্টিনোপলে ও তথা হইতে হল্যাণ্ডে উপস্থিত হইল। ক্রমে তাহার সেই হীরকের প্রতি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। রুশসম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথেরিন অবশেষে ২০০০০ পাউণ্ড মূল্যে ইহা ক্রয় করেন। এতদ্ভিন্ন সাফ্‌রাস্‌কে বাৎসরিক ৪০০০ পাউণ্ড ও সম্মানসূচক উপাধি প্রদত্ত হইল।

বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও, এই নরপিশাচকে সুখী হইতে হইল না। বাগ্‌দাদ্ হইতে পলায়নের পর, তাহার লোমহর্ষণ কাণ্ড সকলে অবগত হইল। সে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিল না। অষ্ট্রাকানে অবস্থান কালে সে অর্থ লইয়া জামাতাগণের সহিত বিবাদ করে এবং তাহাদের দ্বারা নিহত হয়।

৩।—অর্‌লফ্।

এক্ষণে রুশসম্রাটের অর্‌লফ্ (Orloff) নামক সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ হীরকের সংক্ষিপ্ত কাহিনীর অনুসরণ করা যাউক। পূর্ব্বে এই হীরক ত্রিচিনাপল্লীর নিকটবর্ত্তী এক মন্দিরের দেবতার চক্ষুরূপে বিরাজ করিতেছিল। ঘটনাক্রমে এক দিন ইহার স্বর্গীয় জ্যোতিঃ এক ফরাসী গোলন্দাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই দিন হইতে সে এই মহামূল্য হীরক অপহরণের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। হিন্দুর মন্দিরে খৃষ্টানের প্রবেশ নিষেধ দেখিয়া, সে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তাহার ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া মন্দিরের পুরোহিতবর্গ এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, কিয়ৎকাল পরে সে মন্দিরের ভিতর প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হইল। এক তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে যখন ভীষণ ঝটিকায় চতুর্দ্দিক আলোড়িত হইতেছিল, তখন এই ব্যক্তি মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, ঐ হীরক লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল এবং মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া এক জাহাজের কাপ্তেনকে দুই সহস্র পাউণ্ড মূল্যে ঐ মহামূল্য রত্ন বিক্রয় করিল। ঐ কাপ্তেন বিলাত গিয়া ১২০০০ পাউণ্ড মূল্যে ঐ হীরক এক য়িহুদিকে বিক্রয় করিল। অবশেষে রুশিয়ার সম্রাট্‌পুত্র অর্লফ্

কর্তৃক ৯০০০০ পাউণ্ড মূল্যে ইহা ক্রীত ও সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিনকে প্রদত্ত হইল; সেই দিন হইতে ইহা অর্লফ্ নামে পরিচিত।

৪।—পিট্।

১৭০২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গভার্ণার পিট্ সাহেব প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূল্যে এক বৃহৎ হীরক ক্রয় করেন। তিনি ইউরোপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট্ পঞ্চদশ লুইএর জন্য ডিউক্ অফ্ অরলিন্সকে ঐ হীরক এক লক্ষ ত্রিশ সহস্র পাউণ্ডে বিক্রয় করেন। ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রারম্ভে ঐ মহামূল্য হীরক বার্লিনে প্রেরিত হইয়াছিল। পরে নেপোলিয়নের রাজকীয় তরবারীর শোভা সম্বর্দ্ধিত করে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনৈক পোর্টুগীজ ভদ্রলোক বেলারি ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত বজ্র করুরের আকরে হীরকের অন্বেষণে গমন করেন। বহু অর্থব্যয়ে কৃতকার্য্য হইতে অসমর্থ হইয়া, অবশেষে তিনি পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া শ্রমজীবিগণের শেষ দিনের বেতন পরিশোধ করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন। জীবনে নিরাশ হইয়া আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে ঐ দিন বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু সন্ধ্যাকালে ভৃত্যেরা এক সুবৃহৎ হীরক আনয়ন করিয়া তাঁহার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিল। হীরকটির ওজন ৪৩৪ ক্যারাট অথবা ১৭৩৬ গ্রেণ অপেক্ষা কিছু অধিক ছিল। পিট্ সাহেবের হীরকের ওজন ৪২৬ ক্যারাট হওয়ায় অনেকে অনুমান করেন যে, তিনি এই হীরকই ক্রয় করিয়াছিলেন।

৫।—ম্যাট্রাম্।

ইমানুয়েল সাহেবের হীরক সম্বন্ধীয় পুস্তক ঐ বিষয়ের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বোর্ণিও দ্বীপের অন্তর্গত মাট্রানের রাজার হীরকের আকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ঐ পুস্তকে উল্লেখ দেখা যায়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ঐ দ্বীপের অন্তর্গত লাণ্ডক নামক স্থানে ঐ হীরক পাওয়া যায় এবং ইহার অধিকারের জন্য একটী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। বাটেভিয়ার ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা ঐ হীরক প্রাপ্তির জন্য রাজাকে দুইখানি সুসজ্জিত রণ-তরী ও ৫০ সহস্র পাউণ্ড দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। ক্রফোর্ড সাহেবের মতে এই হীরকের মূল্য ২৬৯৩৭৮ পাউণ্ড।

হিউলো বলেন যে যাঁহারা এই হীরক দর্শনার্থ গমন করেন, তাঁহাদিগকে ঐ হীরকের অনুরূপ এক স্ফটিক খণ্ড প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার পোসেউইট্জ্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ হীরক স্ফটিক ব্যতীত আর কিছুই নহে। [ক্রমশঃ]

———

(বৈশাখ, ১৩৯০, পৃঃ ২৩৫)

আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে।] [৬৩ পৃষ্ঠার পর।

জঙ্গল-পরিবৃত জমি অনাবাদী থাকায় আপন সারে আপনি সারবান হইয়া থাকে, তাহাতে আবার বরাবর জঙ্গলের পাতা লতা, শিকড় পচিয়া মৃত্তিকা অতিশয় সারবান হয়, সুতরাং সে প্রকার জমিতে গাছ খুব তেজাল হয়। গাছ তেজাল হইলে পাতা বড় ও সুপুষ্ট হয়, সুতরাং ফসল অধিক পরিমাণে হইয়া চা-করগণের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করে। যে সকল গাছের কেবল পাতার আবশ্যক, তাহাদিগের জন্য জঙ্গলের অক্ষত মৃত্তিকা (virgin soil) বিশেষ উপযোগী। এ প্রকার জমিতে যবক্ষারজানিক (nitrogenous) এবং প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির দাহ্য পদার্থাংশ (Humus) সমধিক পরিমাণে থাকায়, তদুপরিস্থিত উদ্ভিদের বাহ্য অবয়ব অর্থাৎ পাতা ও ছাল বৃদ্ধির বিশেষ সাহায্য হয়। এই কারণে চা-করগণ জঙ্গলপূর্ণ জমির পক্ষপাতী। নিজের সুবিধা, স্থানীয় আবহাওয়া প্রভৃতি কিছুরই উপরে লক্ষ্য না রাখিয়া, যথায় আবাদের সুবিধা সুযোগ হইবে, এবম্বিধ জায়গা তাহার লক্ষ্য থাকে, এই জন্য জেলার, সহর বা ষ্টেশনের উপর চা-বাগান প্রায় দেখা যায় না। ভীরু, কাপুরুষ, অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী জাতি নিজের সুবিধা অন্বেষণ করিতে তৎপর, ব্যবসায়ের সুবিধা তাহার দ্বিতীয় বিবেচনা। বাঙ্গালীর যে কিছু হয় না, ইহাও তাহার একটী প্রধান কারণ। ব্যবসায়েচ্ছু কোন এক বন্ধুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে আমি তাঁহাকে আসামে যাইতে পরামর্শ দিই। বন্ধুবর আসামের নাম শুনিয়া, শিহরিতকলেবরে কালাজ্বরের নাম করিলেন। কালাজ্বর বাঙ্গালা দেশের ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকারান্তর মাত্র। আসামবাসিগণ কালাজ্বরে ভীত হয় না, কেন না উহা তাহাদিগের দেশীয় রোগ, সুতরাং, তাহারা উহাতে অভ্যস্ত। আর চা-কর সাহেবেরা যে ভীত হয়েন না, তাহার কারণ, সংসারে বিষয়কর্ম্মের প্রতি তাঁহাদিগের প্রধান দৃষ্টি। বাঙ্গালী জাতির পক্ষে আসাম দেশ সুদূর হইতে সুদূর, ইয়ুরোপ বা আমেরিকা বলিলেও হয়, সুতরাং কালাজ্বরে তাঁহাদিগের ভীতি হইবার কথা! দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালী জাতি বিষয় কর্ম্মী বা ব্যবসায়ী নহে, কাযেই আরো ভয়ের কথা। ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাস্থ্য নিকেতনে যে ইংরাজ জাতির বাস, যে সুখস্বচ্ছন্দে তাহারা ভূমিষ্ঠ কাল হইতে লালিত পালিত, সেই ইংরাজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন আব-হাওয়াপন্ন কঠোর উষ্ণ দেশে আসিয়া আসামের জঙ্গলময় দেশে স্বজাতির মুখদর্শনবিবর্জ্জিত হইয়া বাস করিতে পারে, আর তুমি আমি কুয়া-পাতকুয়া ও পচা পুষ্করিণীর জল খাইয়া, ম্যালেরিয়ার শরীর লইয়া, ম্যালেরিয়ার মধ্যে বাস করিয়া ও লালিত পালিত হইয়া, অর্থোপার্জ্জনের জন্য, একদিন দুই দিনের পথ আসাম যাইতে ভাবিয়া অস্থির! ইংরাজ বাঙ্গালীতে এইটুকু প্রভেদ বলিয়া ইংরাজ সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর, ধনকুবের, আর আমরা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীট,—জগতের ঘৃণ্য মানব!

চা আবাদের উপযোগী আব-হাওয়া ও মৃত্তিকার বিশেষত্বের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে ক্ষেত্রের স্থানীয় প্রাকৃতিক গঠনের কথা বলিব। কূর্ম্মপৃষ্ঠ জমি, অর্থাৎ যে জমির পৃষ্ঠদেশ উচ্চ এবং তন্নিবন্ধন যথায় বর্ষার জল অবরুদ্ধ হয় না, তাহাই ইহার পক্ষে প্রকৃষ্ট। চা গাছের জন্য প্রচুর বারিপাতের আবশ্যক বটে, কিন্তু ক্ষেত্রে জল সঞ্চিত হইয়া থাকা উহার পক্ষে অনিষ্টকর।

উচুনিচু বা কূর্ম্মপৃষ্ঠ জমিতে বৃষ্টি হইবা মাত্র, অতিরিক্ত জল নিকাশ হইয়া চলিয়া যায় কিন্তু জল আবদ্ধ থাকিলে, মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত স্বাভাবিক উত্তাপের হ্রাস হয় এবং সূর্য্যোত্তাপও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না; অপরন্তু বায়ুমণ্ডলের মৃত্তিকোপরি যে ভৌতিক ক্রিয়া, তাহা সম্পাদিত হইতে না পারায়, মৃত্তিকা নির্জ্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কূর্ম্মপৃষ্ঠ জমিতে এ সকল অসুবিধা ঘটিতে পায় না। সকল স্থলেই আশানুরূপ জমি প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন, এজন্য সমতল ক্ষেত্রেও ইহার আবাদ হইয়া থাকে। তথাপি, দেখিতে হইবে যে, নির্ব্বাচিত জমি, চতুর্দ্দিকের জমি হইতে কিছুতেই না নিম্নতল হয়, কেন না তাহা হলে চতুর্দ্দিকস্থিত জমির তাবৎ জল আসিয়া এখানে সঞ্চিত হইতে পারে।

সমতল জমিকে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক করিবার জন্য ৩০/৪০ হস্ত ব্যবধানে, ৩/৪ ফুট গভীর, এক বা দেড় ফুট প্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী থাকে। বৃষ্টির সময়, মৃত্তিকার শক্তি অনুসারে উহা যথাসাধ্য জলশোষণ করিয়া লয় এবং অবশিষ্টাংশ সেই নালা দিয়া নির্গত হইয়া যায়; আবার কতক জল মৃত্তিকার ভিতর হইতে চুয়াইয়া, সেই নালায় গিয়া পড়ে। ইহাতে দেখা যায় যে, জমি আদৌ ভিজা বা স্যাঁত-সেঁতে থাকিতে পায় না।

বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হয়। বর্ষার শেষভাগে আবৃত ভাঁটাতে বীজ রোপিত হয়। প্রায় সকল চা-বাগিচার এক একটী নিজস্ব চারা-বাড়ী বা নর্সরী (Nursery) আছে। এখানে প্রতি বৎসরই বীজ বপন করিয়া যথেষ্ট সংখ্যক চারা বারমাস মজুত রাখিতে হয়। চা-বাগান প্রতি বৎসরই আয়তনে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যেমন একদিকের গাছ পুরাতন ও নিস্তেজ হইয়া আইসে, তেমনি অন্যদিকে আর এক ক্ষেতের গাছ পাতা দিবার উপযোগী হইয়া উঠে। সময়ে সময়ে ক্ষেতের মধ্যে কোন গাছ মরিয়া গেলে বা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, চারা-বাড়ী হইতে গাছ আনিয়া খালি জায়গায় বসাইতে হয়। তেজপুর সহর হইতে ৩০/৩৫ মাইল দূরে বালিপাড়া চা-বাগিচায় আমি প্রথম চারা-বাড়ী দেখি। সেই বাগানে আমি আট দশ দিবস বাস করিয়াছিলাম। তথাকার হেড বাবু অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে কেবল যে আশ্রয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, কত যত্নে ও কত রকমে আমার স্বচ্ছন্দতা পরিবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তিনিই আমাকে এক দিবস বৈকালে চারা-বাড়ী দেখাইতে লইয়া যান। চারা-বাড়ীটী সুবিস্তীর্ণ,—৩/৪ বিঘার কম নহে। অহার মধ্যে সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ ভাঁটী,—উলু খড়ের দো-চালার দ্বারা আবৃত। দেখিলাম,—কোন ভাঁটীতে চারা ফুটিয়াছে, কোনটায় বা তখনও ফুটে নাই।

বীজ অঙ্কুরিত হইতে প্রায় একমাস, কখন কখনও ততোধিক সময় লাগে। বীজাঙ্কুরিত হইয়া চারা ঈষৎ বড় হইলে, তাহাদিগকে ফাঁক ফাঁক করিয়া দ্বিরোপণ (Transplant) করিতে হয়। চারাগুলি দুই বৎসরে প্রায় ২/৩ ফুট হইয়া থাকে, এবং তখন তাহাদিগকে আবশ্যক মত ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

বর্ষার প্রাক্কালেই ক্ষেত্রেই চারা-রোপণ করা বিধেয়। দীর্ঘে ও প্রস্থে চারি ফুট ব্যবধান রাখিয়া এক একটি গাছ রোপণ করিতে হয়। ক্ষেত্রে গাছ রোপিত হইবার পরে মধ্যে মধ্যে জমি কোপাইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাট নাই। জমি কোপানকে "কোড়-মারা" কহে।

(বৈশাখ, ১৩০০, পৃঃ ২৩৭)

"কোড়-মারা" দুই-প্রকার,—সিঙ্গেল (Single) ও ডবল (Double)। কোদালের এক আঘাতে যে মাটি কোপান হয়, তাহাকে 'সিঙ্গেল-কোড়', এবং প্রত্যেক স্থানে দুইবার কোপ মারিয়া যে বৃহৎ বৃহৎ মাটির চাপ উল্টাইয়া দেওয়া হয়, তাহাকে 'ডবল-কোড়' কহে।

চা-বাগিচায় যে সমুদায় কোদাল ব্যবহার হয়, তাহা 'দাঁড়া-কোদাল'। এই কোদাল দ্বারা কাজ করিবার সময়, কুলিদিগকে অধিক কোমর ঝুকাইতে হয় না। প্রতি কোপে কোমর ঝুকাইতে হইলে, কোদালধারীকে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয় এবং কোমরেও বেদনা অনুভূত হয়। চা-বাগানের 'কোড়ের' আর একটী বিশেষত্ব এই যে, উহার বাট প্রায় চারি হাত লম্বা হয়, সুতরাং তাহাতেও দাঁড়াইয়া কাজ করিবার আরও সুবিধা হয়। তাহা ব্যতীত এইরূপ কোদাল দ্বারা কাজ করাইলে, আরও একটী বিশেষ সাশ্রয় এই যে উহাতে মাটির বড় বড় চাপ উঠে এবং গভীরভাবে মাটি উল্টাইয়া যায়, ফলতঃ অল্প সময়ে অধিক ও ভাল কাজ হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রে চারা রোপিত হইবার তিন বৎসর, অথবা জমির উর্বরতা হেতু চারা সকল যদি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে দুই বৎসর পরে, পাতা সংগ্রহ হইতে পারে। পাতা সংগ্রহকে ইংরাজিতে Plucking কহে।

চা গাছের পত্র ও পত্রমুকুল হইতে চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। গাছের শাখা প্রশাখার সর্ব্বশেষ যে পত্রমুকুল (terminal bud) এবং তাহারই ঠিক নিম্নে যে সুকোমল ও সুচিক্কন পত্রটী থাকে, তাহাই চার জন্য ভাঙ্গা যায়। অপরাপর পত্র কঠিন হইয়া যায় বলিয়া তাহা সংগৃহীত হয় না এবং তাহা হইতে যদিও চা প্রস্তুত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সে চার তেমন আঘ্রাণ বা উপকারিতা থাকে না, সুতরাং বাজারেও তাহার আদর হয় না। পত্রমুকুল হইতে যে চা প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট Flowery বা Orange pekoe চা নামে বাজারে বিশেষ আদৃত এবং উচ্চ-মূল্যে বিক্রিত হয়। তন্নিম্নস্থিত পত্র হইতে যে চা জন্মে, তাহা দ্বিতীয় ও অন্যান্য শ্রেণীর চা হইয়া থাকে।

বালক বালিকা ও স্ত্রীলোক কুলিগণই সচরাচর পাতা ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে সে সময়ে পুরুষ কুলিদিগের অন্য কাজ না থাকিলে, তাহাদিগকেও পাতা ভাঙ্গিতে হয়। পাতা ভাঙ্গিবার সময়ে চা ক্ষেত্রে একটা নূতন দৃশ্য নয়ন গোচর হয়। শত শত কুলি একদিক হইতে নিঃশব্দে পাতা ভাঙ্গিতেছে, দূর হইতে কেবল তাহাদিগের মস্তক হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। রৌদ্রের সময় ক্ষেত্রময় ছাতা খোলা। প্রায় সকল কুলির এক একটী ছাতা থাকে, বৃষ্টির সময় তাহা ব্যবহৃত হয়। কুলিগণ পাতা ভাঙ্গিতে এমন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, ৪/৫ মিনিটের মধ্যে এক একটী পুরাতন ঝাড়াল গাছের পাতা ভাঙ্গিয়া ফেলে। প্রত্যেক গাছে যত শাখা প্রশাখা থাকে, তাহার শেষ পত্র ও পত্রমুকুল সমেত ডালগুলি অতি খর হাতে ভাঙ্গিয়া প্রত্যেক কুলি নিজ নিজ পৃষ্ঠস্থিত ঝাঁকা মধ্যে জমা করে। যাহাদিগের সঙ্গে ঝাঁকা না থাকে, তাহারা নিজ নিজ কোঁচড়ে রাখে। সকল কুলিকেই একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনে পাতা ভাঙ্গিতে হয় এবং তাহা না পারিলে সে দিনের রোজ বা বেতন মঞ্জুর নহে। কিন্তু, যাহারা সেই নির্দ্দিষ্ট ওজনের পাতা ভাঙ্গিয়াও কিছু অধিক জমা দিতে পারে, তাহাদিগের অতিরিক্ত প্রতি সেরের পাতার জন্য দুই পয়সা হিসাবে পাইবার কথা।

(৮০তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৩৮)

দিনের মধ্যে দুইবার পাতা জমা দিতে হয়, একবার বেলা বারটার সময় অপর, অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়। এই দুই সময়েই 'পাতা-ঘরে' ঘণ্টা পড়ে। ঘণ্টা বাজিবামাত্র ক্ষেত্র হইতে কুলিগণ পিল্ পিল্ করিয়া পিপীলিকার সারির ন্যায় তাড়াতাড়ি তথায় আসিয়া জমা হয়, 'পাতা-ঘরের' বাবু প্রত্যেকের পাতা ওজন করিয়া রোজনামচায় লিখিয়া লয়েন। বাগিচার কুলি সংখ্যার অল্পাধিক্য অনুসারে এক জন হইতে ৪/৫ জন বাবু পাতা ওজন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ওজন করিবার জন্য আমাদিগের মান্ধাতার আমলের দাঁড়ি-পাল্লার পরিবর্ত্তে বিলাতি স্কেল (Scale) ব্যবহার হইয়া থাকে। এই স্কেল দ্বারা ৫।৬ সেকেণ্ডের মধ্যে এক এক জনের পাতা ওজন হইয়া যায়। পাতা ওজন হইয়া গেলে, কুলিগণ যথা নিয়মে, হয় পুনরায় কাজে চলিয়া যায়, না হয় স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়। কুলিদিগের কার্য্যের সময়ের কথা পরে বলিব।

পাতা-ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা কাজ করে।

পাতা-ঘরগুলি খুব লম্বা ও তদনুরূপ চওড়া হয়। তাহা ব্যতীত পাতা-ঘরের উচ্চতাও সাধারণ ঘরের অপেক্ষা অনেক বেশী এবং চারি পার্শ্ব অনাবৃত। চারিদিকে ও মধ্যভাগে rack বা থাক্ আছে।

পাতা আসিয়া পৌঁছিলে পাতা-ঘরের সেই সকল ছোট ছোট ছেলেরা তার বিশিষ্ট চক্রাকার ডালা বা জাল্‌তিতে পাতা ছড়াইয়া পাতা-ঘরের থাকে সাজাইয়া রাখে। জাল্‌তিতে পাতা ছড়াইয়া দিবার নিয়ম খুব পাত্‌লা করিয়া। পাতা ঘন করিয়া দিলে, সকল পাতা সমভাবে শুকাইতে পায় না। পাতা-ঘরে যে পাতা জাল্‌তিতে রাখিতে হয়, তাহার কারণ এই যে, বাতাসে ঐ সকল পাতা শীঘ্র আম্‌লাইয়া যায়। পাতা আম্‌লাইয়া গেলে, রোল (roll) করিবার সময় আর উহা ভাঙ্গিয়া বা চূর্ণ হইয়া যায় না। বর্ষাকালে, অথবা যে সময়ে বাতাসের নিতান্ত অভাব থাকে, তখন পাতা আম্‌লাইতে বিলম্ব হয়। পাতা শীঘ্র না আম্‌লাইলে, কারখানার কাজ বন্ধ থাকে ; ফলতঃ তাহাতে সমূহ ক্ষতি হয়। এই জন্য কৃত্রিম উপায়ে বায়ু পরিচালিত করিবার জন্য, কোন কোন বাগিচায় হাওয়াকল আছে, এবং তখন সেই কলের সাহায্যে গৃহ মধ্যে হাওয়া পরিচালিত করিয়া, পাতাকে আম্‌লান হইয়া থাকে। সচরাচর ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যে পাতা আমলাইয়া যায়। তখন ইহাকে কারখানায় লইয়া গিয়া রোলিং (Rolling) মেশিন মধ্যে পাতাকে ফেলিয়া দিতে হয়। উক্ত কলে পাতা ফেলিয়া দিলে, পাতাগুলি ক্রমাগত ঘুরিতে থাকায় জড়সড় হইয়া যায়। তখন পাতাগুলি পাকাইয়া যায়।

এইরূপে পাতা সকল রোল হইয়া গেলে তাহাদিগকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া উত্তপ্ত হইতে দেওয়া হয়। রোল হইয়া গেলে পাতা সকল ঈষৎ ভিজিয়া উঠে। এই ভিজা পাতাকে ভূমিতে বা মেঝেতে বিস্তৃত করিয়া দিয়া, তদুপরি একখানি ভিজা কাপড় ক্ষণকালের জন্য ঢাকা দিতে হয়। ক্ষণকাল এতদবস্থায় থাকিলে বিস্তৃত পাতা সকল উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এইরূপে উত্তপ্ত হওয়াকে fermentation কহে। পাতা যতই উত্তপ্ত হইতে থাকে, ততই উহার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে ; ক্রমে সেই সবুজ পাতা লালাভ বর্ণ ধারণ করিলে, ছোট ছোট প্লেটে করিয়া পাতা সাজাইয়া ভাজিতে দেওয়া হয়। ইঞ্জিনের উত্তাপ ঘুরিয়া ফিরিয়া কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষীণ তেজ হইয়া পাতাকে

(বৈশাখ, ১৩১০, পৃঃ ২৩৯)

উত্তাপ দেয়। একেবারে অধিক উত্তাপ লাগিলে, পাতা দগ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, এজন্য পরিমিত উত্তাপ দ্বারা পাতাকে ভাজিতে হয়। পাতা ভাজা হইয়া গেলেই চা প্রস্তুত হইল।

চা প্রস্তুত হইয়া গেলে, বৃহৎ বৃহৎ চালনী সাহায্যে উহাকে ছাঁকিয়া ছোট বড় ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভাগ করা হয়। তদনন্তর চা প্যাক হয়।

কুলিদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার ধারণা আছে, তবে সাধারণতঃ লোকে আসাম অথবা চা-বাগিচার নাম শ্রবণ মাত্রেই শিহরিয়া থাকেন, সুতরাং ইহাদিগের বিষয় বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা না করিলে পাঠকদিগের পরিতৃপ্তি বা সন্তোষ হইবে না এবং লেখকেরও আসাম ভ্রমণ লেখা পূর্ণ হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আসামে চা-বাগিচার কাজের জন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আড়কাটী সাহায্যে কুলি সংগ্রহ করিতে হয় এবং এই কুলি সংগ্রহ কার্য্যে বিস্তর লোক নিযুক্ত আছে। চা-বাগিচার তরফ হইতে স্থানে স্থানে কুলি এজেণ্ট আছে,—কোথাও কোথাও বা সাহেব বা বাঙ্গালী বিষয়কর্ম্ম হিসাবে কুলি ডিপো খুলিয়া বসিয়া আছেন। আবার অনেক সময়ে বাগিচার সর্দ্দারগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নিজ নিজ বাগিচার জন্য কুলি সংগ্রহ করিয়া থাকে। কুলি সংগ্রহ কার্য্যে প্রলোভন দেখান আজকাল একটা আবশ্যকের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। প্রলোভন যে দেখাইতে হয়, তাহার একটা কারণ আছে, এবং সে কারণ এই যে, ভদ্রেতরনির্বিশেষে সহজে এবং স্বেচ্ছায় আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করিয়া, স্বদেশ ছাড়িয়া কুত্রাপি যাইতে চাহে না, দ্বিতীয় কথা এই যে, আসাম দেশটা বড়ই অস্বাস্থ্যকর বিধায়, অনেক লোক স্থানীয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, সুতরাং অশিক্ষিতদিগের মধ্যে একটা প্রবাদ উঠিয়াছে যে, আসামে গেলে লোকে আর ফিরিয়া আইসে না। তৃতীয় কথা এই যে, যাহারা কুলি হইয়া আসামে যায়, তাহাদিগের এগ্রিমেণ্ট উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও, জাতি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনেকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহে না, সুতরাং সেই চা-বাগিচার সন্নিকটে অল্পাধিক জমা জমি করিয়া দিনপাত করে। আবার এমন অনেক কুলি ও কুলিনী অবৈধ রূপে প্রণয়াসক্ত হইয়া ঘর-কন্না করিতে থাকে, কাজেই এই সকল লোক কালাজ্বরে না মরিলেও, দেশের লোকে ও আত্মীয় পরিজনগণ কিন্তু ঠিক করিয়া লয় যে, তাহারা মরিয়া গিয়াছে। যে কয়টী কারণের উল্লেখ করা গেল, তাহার কোনটী উপেক্ষণীয় নহে। ইংরাজ ব্যবসায়ীর জাতি, তাহারা ব্যবসায় বুঝে, সুতরাং কি উপায়ে ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহা ইংরাজ যেমন জানে, দুনিয়ার অন্য কোন জাতি জানে না। দেশের বা জাতির ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে তিনটী জিনিষের আবশ্যক, অর্থ বা মূলধন, পরিশ্রম ও জমি। সকল ব্যবসায় বা বাণিজ্যের এই তিনটী, সাক্ষাৎভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক, প্রধান উপকরণ ; কোন একটীর অভাবে অপর দুইটীর কার্য্যকরী শক্তি থাকে না। চা ব্যবসায়ে ইংরাজের টাকার অভাব নাই, আসামে উর্ব্বরা ও অক্ষত জমির অভাব নাই ; এখানে অভাব কেবল মজুরীর (labour)। জমি ও টাকার একত্র সমাবেশ হইলে, যে কোন প্রকারে মজুরী আনিতে হইবেই এবং তাহার ফলে এই কুলি চালানের সৃষ্টি। দেশের লোক যাহাই বলুক, যাহাই প্রচার করুক, অর্থের যখন অভাব নাই যেখান হইতেই হউক, কুলি চালান কার্য্য অপ্রতিহত ভাবে চলিবে।

(৮৩তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৪০)



৮৫তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০

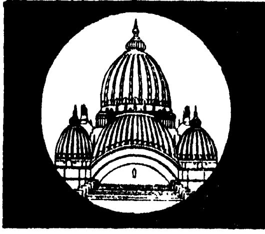
দিব্য বাণী

....এখন এই প্রশ্ন উঠে যে, এই-সকল বিভিন্ন ধর্মের সবগুলিই কি সত্য, না কতকগুলি খাঁটি, আর বাকীগুলি ভুয়া? সব ধর্মই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে —একটি চরম অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব। ধর্মের লক্ষ্য হইল একত্ব। আমরা যে চারিপাশে ঘটনারাশির বৈচিত্র্য দেখি, উহারা একত্বেরই অনন্ত অভিব্যক্তি। ধর্মসমূহকে যদি তলাইয়া বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, মানুষের অভিযান—মিথ্যা হইতে সত্যে নয়, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।

...আমাদের নিজেদের প্রকৃতি, পরস্পরের প্রতি প্রেম এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ—এইগুলি আমাদিগকে প্রশস্ততর শিক্ষা দেয়। নদীর বুকে যে জলস্রোতের আবর্ত, ঐগুলি যেমন নদীর প্রাণের পরিচায়ক, ঐগুলি না থাকিলে নদী যেমন মরিয়া যায়, সেইরূপ ধর্মকে বেড়িয়া নানা বিশ্বাস ও মত ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তিরই ইঙ্গিত। এই মত-বৈচিত্র্য যদি ঘুচিয়া যায়, তাহা হইলে ধর্মচিন্তারও মরণ ঘটিবে। গতি আবশ্যক। চিন্তা হইল মনের গতি, এই গতি থামিয়া যাওয়া মৃত্যুর সূচনা।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৭]



কথাপ্রসঙ্গে

সর্বজনীন ধর্ম

যুগ যুগ ধরিয়া হিমালয় পর্বত দাঁড়াইয়া আছে। উহারই গাত্রচ্যুত সুবিশাল এক শিলাখণ্ড বিচিত্র গতিপথে গড়াইয়া গড়াইয়া কোন্ অনির্দেশ্য লক্ষ্যাভিমুখে চলিয়াছে,—কতকালব্যাপী কেহ জানে না। নানা গিরি-বন-বনস্থলী নির্ঝর-নদ-নদী মরু-কান্তার দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া, কখন বেগে, কখন মন্থরে—উহা ঠিকই চলিতেছে। ধাবমান ঐ প্রস্তরখণ্ডের মসৃণ গাত্রে কত বিচিত্র আস্তরণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, যাহাতে উহার বাহ্য রূপেরও পরিবর্তন ঘটাইয়াছে,—এক এক সময় উহাকে হিমালয়ের অঙ্গ বলিয়াও মনে হয় না,—যেন অন্য কোন কিছু! বাহ্য আবরণজনিত এই রূপান্তর কিন্তু উহার পার্বত্য আন্তর স্বরূপটিকে পালটাইয়া দিতে পারে না। আঙ্গিক বৈচিত্র্য যেমনই ঘটুক, বাস্তবিক পক্ষে উহা যে হিমালয়ের অংশ—তাহারই শিলীভূত এক রূপ।

'ধর্ম' একটি শব্দ, যাহা ঐ গিরিশিখরভ্রষ্ট বিশালায়তন প্রস্তরখণ্ডটির মতোই মানব-কৃষ্টির একটি অপ্রতিরোধ্য চলমান অংশ। যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে চলিতে কতই না বিচিত্র বর্ণের আস্তরণ উহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে, তথাপি তাহার স্বরূপটি কিন্তু সেই সনাতন। ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাউক। বৈদিক যুগ হইতে আজ অবধি সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় চলিয়া আসিতেছে, এমন অল্পসংখ্যক কয়েকটি শব্দের মধ্যে 'ধর্ম' অন্যতম। সমাজ ও সভ্যতার নানা বিবর্তন-পথে চলিয়াও, মানব-চরিত্রের ক্রমবিকাশের অপরিহার্য বাহক ও পরিমাপক রূপে এই জাতীয় শব্দ কিন্তু ঠিকই থাকিয়া যায়। অবশ্য 'ধর্ম' শব্দটির বাহ্য রূপের,—আপেক্ষিক অর্থের কিছু কিছু পরিবর্তন প্রতিনিয়তই হইতেছে, তাহাও অস্বীকার করার উপায় নাই।

প্রাচীনতম ঋগ্বেদ হইতে শুরু করিয়া আধুনিকতম সাহিত্যে পর্যন্ত এই 'ধর্ম' শব্দের উপস্থিতি বিশেষ লক্ষণীয়। শব্দটির ব্যুৎপত্তি 'ধৃ' ধাতু হইতে, ইহা সর্বত্রই স্বীকৃত,—যদিও ক্ষেত্র-ভেদে অর্থের সূক্ষ্ম তারতম্য চোখে পড়ে। যেমন, করণ বাচ্যে অর্থ করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা (অর্থাৎ, যে গুণ বা স্বভাব, কিংবা শক্তি দ্বারা) কিছু ধৃত হয়, উহাই তাহার ধর্ম। আবার কর্তৃবাচ্যে, যাহা (যে-স্বভাব বা শক্তি) কিছুকে ধারণ করে, উহাকেই তাহার 'ধর্ম' বলে।

বেদ এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, ইদানীং কাল পর্যন্ত 'ধর্ম' শব্দের প্রযুক্ত অর্থগুলির ক্রমবিকাশে আমরা প্রধানতঃ চারিটি ধারা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। তদনুযায়ী বলা যাইতে পারে, ভারতীয় দৃষ্টিতে ধর্মের চারিটি প্রধান অর্থ,—যাহাদের মধ্যে পরস্পর আভিধানিক বৈশিষ্ট্য থাকিলেও, মূল তাৎপর্য কিন্তু সমান, অভিন্ন, অথবা পরম্পরাযুক্ত। ধর্মের প্রধান চারিটি অর্থ আমরা পাইয়া আসিতেছি: (১) কর্তব্য কর্ম, (২) কর্মের ফল, (৩) স্বভাব, গুণ বা শক্তি এবং (৪) জগৎ-শৃঙ্খলার অলঙ্ঘ্য নিয়ম—যাহার অপর নাম ঋত

বা সত্য। মানুষের জ্ঞানের গভীরতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার জীবনধারণের অপরিহার্য অবলম্বন এই ধর্মের অর্থ-বিকাশও ততই নিবিড়তর হইতেছে। উল্লিখিত চারি অর্থেই 'ধর্ম' শব্দের বহুল প্রয়োগ বিদ্যমান থাকিলেও, চতুর্থ অর্থ 'সত্য', বৈদিক সাহিত্যে যাহা 'ঋত' বলিয়াও উক্ত হইয়াছে, বিশ্ব-শৃঙ্খলার বিধানকারী সেই অনতিক্রমণীয় নিয়মই যেন সর্বাধিক গৌরবমণ্ডিত অর্থ। অখিল এই জগৎ-ব্যবস্থার মূলে যে মঙ্গল-জনক ঋত বা ন্যায় বিধান রহিয়াছে, সেই পরম সত্যকে স্মরণ রাখিয়া সংসারে চলাই মানুষের পক্ষে শ্রেয়ঃ—উহাই তাহার ধর্মজীবন। সুন্দর একটি রূপক বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে: রাজার সহায়তায় যেমন একজন অন্যজনকে জয় করিতে সক্ষম হয়, তেমনই ধর্মের বলে অপর শক্তিসকলকে জয় করিতে মানুষ অভিলাষী হইয়া থাকে। ঐ যে ধর্ম, উহাই সত্য আবার সত্যই হইতেছে ধর্ম।

মহাভারতের শান্তি-পর্বে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের মুখেও আমরা জানিয়াছি — সত্যেই সব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সত্য কী? মহাভারতেই জানা যায়—সত্যের ত্রয়োদশ লক্ষণ। সাম্য, সংযম, পরশ্রীতে অকাতরতা, ক্ষমা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, অদোষদর্শিতা, ত্যাগ, ধ্যানপ্রিয়তা, আত্মমর্যাদা-বোধ, ধৈর্য, দয়া এবং অহিংসা এইগুলিই সত্যের ত্রয়োদশরূপ। এক কথায় ইহাকেই বলা হয় ধর্ম। সত্য ও ধর্ম, একই বস্তুর দুই নাম। ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ তাই 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ', উপনিষদের মন্ত্ররূপে যাহা সোচ্চারে উদ্‌ঘোষিত—'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্।'

এই অতুলনীয় আদর্শ, কোন দেশ-কালে আবদ্ধ নহে—ভারতের সকল যুগের সকল মানুষের ইহাই ধর্ম,—মূল তাৎপর্যও তাই। যে-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে,—দেশ-কালের বিবর্তন-পথে ধর্মও অবশ্যই গতিশীল। তাহারও বাহ্য রূপে অল্পবিস্তর পরিবর্তন-চিহ্ন দেখা গেলেও মূল কিন্তু অবিকৃতই থাকিয়া গিয়াছে যুগ যুগ ব্যাপী। সনাতন বৈদিক ধর্ম ছাড়াও উত্তরকালীন বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ধর্মগুলিতে এবং ভারতেতর দেশে উদিত খ্রীষ্টান, ইসলাম, পারসী প্রভৃতি বিখ্যাত ধর্মসমূহে পরস্পর বহিরঙ্গের ভেদ বিলক্ষণ থাকিলেও উহাদের অন্তর্নিহিত সত্যে কিন্তু কোন অমিল নাই। জলবায়ু ও পরিবেশ ভেদে, খাদ্যরীতিতে, পরিচ্ছদে ও ভাষায় বহুতর ভিন্নতা যেমন অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু তাই বলিয়া মানুষের শারীর-গঠনতন্ত্রের কিংবা শরীরের পুষ্টি-বিজ্ঞানের মৌল তত্ত্বের কোন রূপ তফাত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না,—হওয়া সম্ভবও নহে। মানুষের মন-বুদ্ধি সমন্বিত যে সূক্ষ্ম শরীর উহারই সংরক্ষণ ও পুরিপুষ্টির প্রয়োজনে ধর্ম হইতেছে একান্ত অপরিহার্য এক তত্ত্ব। উহাকে বাদ দিয়া মানুষের স্থূল শরীর মাত্রের পরিপোষণ নিছকই জৈব উদ্দেশ্য সাধন—মনুষ্যত্বের মহিমা কিছু নাই তাহাতে। ঐ 'ধর্ম'-ই মানুষকে অন্য জীবজন্তু হইতে স্বতন্ত্র গৌরব প্রদান করিয়া থাকে। জীবন হইতে ধর্মকে সযত্নে সরাইয়া রাখিয়া তথাকথিত 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' সমাজ গঠনের স্বপ্নে বিভোর হইলে কালক্রমে ব্যষ্টি জীবন তথা উহাদেরই সমষ্টিতে গড়া সমাজ কী দাঁড়াইতে পারে, সে-সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা ইতিহাস আমাদিগকে বার বার দিয়া আসিতেছে,—সম্প্রতি আরও তীব্রভাবে দিতেছে।

*

'ধর্ম'—প্রকৃত অর্থে মনুষ্যত্ব-প্রকাশক গুণাবলীর নাম। উল্লিখিত ত্রয়োদশটি শিখাবিশিষ্ট একটি দীপ,—যে-দীপালোক মানুষের স্বকীয় মহিমাকে উদ্‌ভাসিত করিতে সক্ষম। অন্যথায় মানুষের পরিচয় কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর জীব-বিশেষ রূপেই।

ধর্ম তাই মানুষকে যথার্থ অর্থেই ধারণ করিয়া রাখিয়াছে—তাহাকে এক বিশিষ্ট মর্যাদায়। সেই মর্যাদাই তাহাকে দেবত্বের নিকটবর্তী করিয়া দেয়—কখন বা পরিপূর্ণ দেবতাই করিয়া তোলে। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ-সাধনই ধর্মের পরিচয়,—স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম-সংজ্ঞা ইহাই।

জীবনের সকল সত্য, শুভ ও সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা সমষ্টিকেই মানুষ দেব বা ঈশ্বর আখ্যা দিয়া আসিতেছে। কখনও বা তাঁহাকে সাকার রূপেও চিন্তা করা হয়—করিতে ভাল লাগে। মানুষ তাঁহাকে নানা নামেও ডাকিয়া থাকে, আপনার সহিত কোন বিশেষ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াও আনন্দ পায়। সংস্কৃত 'দিব্'—বা জ্যোতিঃর ভাবনা হইতেই দেবতার গড়ন হইয়াছে। জ্যোতির্ময় বলিয়াই তাঁহাকে চিন্তা করা হয় দেবরূপে। জীবনের তমসা কাটাইয়া জ্যোতির্লোকে উত্তরণে সহায়তা করে বলিয়াই 'ধর্ম' মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় ও অবলম্বন। পাশ্চাত্য মনীষী পল্ ব্রাণ্টনের অনুরূপ একটি সুন্দর কথা এখানে তুলনীয়। তিনি লিখিয়াছেন—যথার্থ ধর্ম তোমাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ করিবে—আর এই কারণেই উহাকে বলি খাঁটি ধর্ম।

তথাকথিত আধুনিক সমাজে কিন্তু 'ধর্ম' শব্দের এই মর্মার্থ উপলব্ধি করিবার মতো ধৈর্য ও আন্তরিকতা খুবই বিরল। বর্তমানে উহার লোক-প্রচলিত ইংরেজী প্রতিশব্দ 'রিলিজিয়ন' কিন্তু নিতান্তই কোন বিশেষ 'মত' (faith)-কে বুঝাইয়া থাকে, সংস্কৃত শব্দ 'ধর্ম'-কে সঠিক অর্থে ব্যক্ত করিতে পারে না। একটা বিশেষ গোষ্ঠীর বা দলের অনুমোদিত মতে 'হাঁ' বলা—কিংবা বড় জোর ঐ মতাদর্শ মানা বা বিশ্বাস করার নামই এখন 'রিলিজিয়ন'। যে-হেতু ধর্মের এই সুলভ সংস্করণ, কেবলমাত্র কতকগুলি দলীয় মতের বা বিশ্বাসের নির্ধারিত তালিকা মাত্র,—জীবনের অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, তাই তো ঐ-সকল মতাবলম্বী ও মতবিরোধীদের মধ্যে খুব স্বাভাবিক কারণেই এত কলহ দ্বন্দ্ব। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার রাজযোগের অবতরণিকায় সুস্পষ্ট ভাষায় ইহাই বলিয়াছেন :

"পৃথিবীতে সচরাচর যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে বলা হয়—ধর্ম কেবল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত, অধিকাংশ স্থলেই উহা ভিন্ন ভিন্ন মতের সমষ্টি। এই জন্যই দেখিতে পাই, সব ধর্মই পরস্পর বিবাদ করিতেছে। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত…।" কিন্তু এই মতের বা বিশ্বাসের পশ্চাতে অধিকাংশ স্থলেই কোন যুক্তিরূপ কারণ থাকে না। আর এই জন্যই "প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি যেন বলিতে চায়, 'এই সব ধর্ম তো দেখছি কতকগুলি মত মাত্র, এগুলির সত্যাসত্য বিচারের কোন মানদণ্ড নেই, যার যা খুশি সে তাই প্রচার করতে ব্যস্ত'।"

প্রতিদিনের সংবাদ-মাধ্যমগুলিতে আমরা যাহা জানিতেছি, তাহাতে বাস্তবিকই ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষিত মনের উক্ত বিরূপ ভাব,—অথবা ধর্মের পরিহার্যতা সম্পর্কে চিন্তাই উদ্রিক্ত হয়। পৃথিবীর নানা প্রান্তে নিত্যই যাহা ঘটিয়া চলিতেছে, এই ভারতের মাটিতেও উহার কিছু অন্যথা হইতেছে না। ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া যে-সকল বীভৎস কাণ্ড ঘটিতেছে উহা যে-কোন নিরীহ মানুষকে ধর্ম-বিমুখ হইতেই প্ররোচিত করে। ধর্মস্থানগুলিকে দুর্বৃত্তের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত করা, দলীয় ধর্মমতকে সবলে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অবাধে নরহত্যার প্রশ্রয় দান, সব মতের অবলম্বীদের লইয়া পৃথক অঞ্চল দাবী, অন্যের ধর্মমতকে অবজ্ঞা প্রদর্শন, ধর্মান্তরিত করণ ইত্যাদি কার্যক্রমগুলি ধর্মীয় আচরণ-সূচী বলিয়া

সমাজে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা পাইতেছে। পক্ষান্তরে, চোরের ভয়ে গৃহে রন্ধন বন্ধের মতো 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা'র অনুশাসন প্রচার বলবৎ হইতেছে, —যাহার বাস্তব ফলশ্রুতি দেখা যাইতেছে—নীতিবোধহীন, মনুষ্যত্বশূন্য এক কিম্ভূতকিমাকার নবীন সভ্যতার অভ্যুদয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজসেবা ইত্যাদি সকল কিছুরই প্রসার হইতেছে, কিন্তু ঐ ধর্মের স্পর্শটুকু বাঁচাইয়া! যে-হেতু ধর্মই সকল বিভেদ, বিদ্বেষ ও অশান্তির মূল! অদ্ভুত অকাট্য যুক্তি! একজন বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিকের মুখে শুনিয়াছিলাম—হৃদয় হইতে ধর্ম-বোধকে মুছিয়া ফেলিয়া, যতই কেন সংস্কৃতি গড়িতে চেষ্টা কর, উহার ফল দাঁড়াইবে মার্জিত বর্বরতা ('Civilised barbarism') এবং প্রচ্ছন্ন পাশবতা ('disguised animalism')।

ক্রমবর্ধমান এই সব তথাকথিত ধর্মীয় কাণ্ড-কারখানা সমাজের পক্ষে যথেষ্টই উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি আমরা ধৈর্যহারা হইয়া, ভাল মানুষটি সাজিয়া, 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'-নামক সর্বসমস্যা-নিবারক ছত্রতলে আশ্রয় লইয়া, প্রকারান্তরে ধর্মবিমুখ যেন না হইয়া পড়ি। অথবা, ধর্মান্ধতার ব্যাধি-কবলেও যেন না পড়ি আমরা। স্মরণ রাখিতে হইবে, এবং স্মরণ করাইতেও হইবে যে, ধর্মের নাম লইয়া উন্মত্ততা কিছু ধর্মাচরণ নহে,—বিশেষ মত বা সম্প্রদায়ই কিছু প্রকৃত 'ধর্ম' নহে। নিজেও বুঝিতে হইবে, অন্যকেও বুঝাইতে হইবে—'ধর্ম' কাহাকে বলে, ধর্মের লক্ষণ কি—উহার সার্বভৌম ভিত্তিভূমি কোথায়। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের বিকৃতিগুলিকে কঠিন ভাষায় চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াও, অবশেষে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিয়াছেন, "এ-সব সত্ত্বেও ধর্মবিশ্বাসের এক সার্বভৌম মূলভিত্তি আছে—উহাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ববিধ বিভিন্ন ধারণাসমূহের নিয়ামক। ঐগুলির ভিত্তি পর্যন্ত অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐগুলি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।"

•

সকল মত ও বিশ্বাসের মূলে অনুসন্ধান করিলে যে-সত্যকে পাওয়া যাইবে,—সকল ধারণার নিয়ামক যে এক অলঙ্ঘ্য নিয়ম রহিয়াছে—সকল ভাবের ভিত্তিস্বরূপ সেই সর্বজনীন অনুভূতির নামই 'ধর্ম'। একমাত্র উহারই আলোক পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল মানুষের চিত্তকে সমানভাবে বিকাশ করিতে সক্ষম। সকলের মাথার উপর সূর্য রহিয়াছে,—সেই সহজ সূর্যালোককে উপেক্ষা করিয়া, গৃহের বাতায়ন-পথগুলিকে রুদ্ধ রাখিয়া আমরা দিবাভাগেই অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া মরি,—আর সেই সৃষ্ট অন্ধকার দূর করিবার নামে কতই না কেরোসিনের লণ্ঠন বা দীপ শলাকার আয়োজন উদ্দেশ্যে হাঙ্গামা বাঁধাই! সহজকে অকারণ জটিল করিয়া ফেলি এইভাবেই। সহজ স্বাভাবিক ধর্মকে অবজ্ঞা দেখাইয়া কৃত্রিম ধর্মালোক বিতরণ করিতে গিয়া কতই না জটিলতার উদ্ভব হইতেছে। ধর্মালোকশূন্য অন্ধকার সমাজে যতই নূতন নূতন সম্প্রদায় ও দল-মত গজাইয়া উঠিতেছে, ততই সঙ্ঘর্ষ, অশান্তি ও অমঙ্গল বাড়িতেছে। অহঙ্কৃত মানুষ নিজের জীবনকে ধর্মানুগ না করিয়া, ধর্মকে গড়িয়া লইতে চাহে তাহার নিজ অহঙ্কারের মাপে। ব্যাধি ইহাই।

ধর্ম সম্পর্কে অতি সহজ চিন্তাধারাই আমরা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম,—ইহা যুগ যুগ ব্যাপী ভারত-মনীষার সূক্ষ্মতম ভাবনা বা ধ্যান-ধারণার সার নিষ্কর্ষ মাত্র। আধুনিক প্রচলিত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলিম, খ্রীষ্টান প্রভৃতি কোন বিশেষ ধর্মমত ইহার লক্ষ্য নহে। আমরা বলিতেছি সহজ মানব-ধর্মের কথা। স্বামীজীর ঋষি দৃষ্টিতে ভাবী বিশ্বমানবের জন্য যে সর্বজনীন ধর্মরূপ

প্রকট হইয়াছিল,—আমরা সেই সনাতন ধর্মাদর্শই সম্মুখে রাখিয়াছি। ভারতের জনচিত্ত হইতে আজও সে-আদর্শ ম্লান হইয়া মুছিয়া যায় নাই। সত্য, সংযম, ত্যাগ, তপস্যা, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি শব্দগুলি এখনও সকলের সম্ভ্রম আকর্ষণ করে। এগুলি তো সবই ধর্ম-রাজ্যের বিষয়।

'ধর্ম' শব্দের প্রতিশব্দ 'রিলিজিয়ন' সাধারণের কাছে সমার্থক হওয়াতে কিছুটা সাম্প্রদায়িকতার ক্লেদ ধর্মের অঙ্গে লেপিয়া গিয়াছে বটে, তথাপি 'ধর্ম' তাহার স্বকীয় মহিমায় আজও ভাস্বর। কেবল অবোধের চক্ষেই ধর্মের ক্লেদাক্ত রূপ ধরা পড়িতেছে,—মলিন আস্তরণের অধিষ্ঠানকে, মূল সত্যকে দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ধর্মের আদর্শ —তাহা যত পুরাতনই হউক, কাহার না মনকে শ্রদ্ধায় অভিভূত করে? হরিশ্চন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, দধীচের ত্যাগ, রামচন্দ্রের প্রজানুরঞ্জন, সীতার পতিপরায়ণতা, মহাবীরের দাস্য, অর্জুনের তেজ, কৃষ্ণের অলৌকিক চরিত্র ইত্যাদি, আজও অবধি অজস্র মানুষকে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে। নচেৎ ঐ-সকল পৌরাণিক চরিত্রগুলি যাত্রায়, নাটকে, লোক-গাথায়, তরজা গানে, পদাবলীতে এখনও কেন ভারতের জনগণকে এমন উত্তাল করিয়া তোলে?

চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় পঠিত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বিখ্যাত 'হিন্দু ধর্ম' প্রবন্ধের উপসংহারে, তাঁহার ঈপ্সিত সর্বজনীন ধর্মের কথাই কম্বু কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। শঙ্খ-ধ্বনির মতো সে-স্বর আজিও বিশ্বের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে। আমাদেরও হৃদয়-তন্ত্রীতে উহার অনুরণন বাজিয়া উঠিবে না কি? স্বামীজী বলিয়াছিলেন:

"…যদি কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তাহা কখনও কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবে না; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হইবে, ঐ ধর্মকে তাঁহারই মতো অসীম হইতে হইবে; সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত, খ্রীষ্টভক্ত, সাধু-অসাধু—সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকিবে; স্বীয় উদারতা বশতঃ সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে, পশুতুল্য অতি হীন বর্বর মানুষ হইতে শুরু করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণরাশির জন্য যাঁহারা সমগ্র মানব জাতির ঊর্ধ্বে স্থান পাইয়াছেন, সমাজ যাঁহাদিগকে সাধারণ মানুষ বলিতে সাহস না করিয়া সশ্রদ্ধ ভয়ে দণ্ডায়মান—সেই-সকল শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দিবে। সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না; উহাতে প্রত্যেক নরনারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শক্তি মনুষ্য জাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্য সতত নিযুক্ত থাকিবে।"

স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীবিনোদেশ্বর দাশগুপ্তকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

কলিকাতা
২৫-৫-২৫

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইলাম। উৎসবের বিবরণ পাঠে আনন্দিত হইলাম। আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ যোগ দিয়াছিল—সুখের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনই হিন্দু মুসলমান সমস্যার একমাত্র সমাধান। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। এখানকার কুশল। আশ্রমস্থ সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও।

ইতি—শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

*

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া

শ্রীমান বিনোদেশ্বর,

তোমার পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম। তোমরা সকলে ভাল আছ এবং সমিতির কাজকর্ম্ম বেশ চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া আনন্দ হইল [।] প্রভুর কৃপায় আরো উন্নতি হউক এবং তোমরাও আরও ভাল থাক।

দাতব্য ঔষধালয় এখন যেরূপ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহাই হউক [।] পরে অর্থাদি বেশী আসিলে উহা অপেক্ষা আরও ভাল করিয়া করিতে পারিবে। এখন এই ভাবেই চলুক কায লইয়া কথা কায চলিলেই হইল। তারপর তাঁর কৃপায় অভাব হইলেই তাহা পূরণ হইবে। নিঃস্বার্থ কর্ম্মের শক্তি খুব। কাযের দ্বারা তাহা আসে তাঁর নাম করিয়া কায করিয়া যাও বাকি তিনি সব দেখিবেন। বাবুরাম মহারাজের তোমাদের ও ওখানকার কাযের উপর খুব আশীর্ব্বাদ ছিল [।] প্রভুর কৃপা তোমাদের উপরে আছে নিশ্চয়ই জানিবে [।] বাবুরাম মহারাজের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ প্রভুরই কৃপা বলিয়া জানিবে।

আমার ভুবনেশ্বরে যাওয়া এখনও হয় নাই [।] কতকগুলি কায পড়িয়াছে সেইগুলি শেষ হইলে প্রভুর ইচ্ছা যা হয় হবে [।]

বরদার শরীর ভাল না থাকায় তোমার ওখানে কিছু দিনের জন্য এসেছে তাহাতে আমার আপত্তি নাই তবে ঢাকার লোকেরা সে বিষয় যেরূপ বলিবে সেইরূপই করা উচিত।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে।

ইতি—তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র শেঠকে লিখিত]

"শান্তি আশ্রম"

প্রিয় পূর্ণবাবু— 4th Nov., 06

আপনার লিখিত গত ২৫শে সেপ্টেম্বরের ও ৩০শে আগষ্টের পত্র পাইয়াছি। এবং প্রেরিত উপাদেয় দ্রব্য সকলও পাইয়াছি। কম্বেগুলা যে ভাঙেনি এই আশ্চর্য্য। তামাক টামাক খেতে আজও সময় পাই নাই। এখনও মাস দেড়েক সময় পাবও না। আজকাল এই আশ্রমে কতকগুলি ছাত্র লইয়া আসা গেছে। ইহারা যোগ অভ্যাস করিতে আসিয়াছে। ইহা একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। আমাদের নিজদিগকেই ২৫ মাইল দূর থেকে ডাক আনতে হয়। পূর্ব্বে ৫ মাইল দূরে ছিল। আজকাল ২৫ মাইল হইয়াছে। এ অঞ্চলে জনপ্রাণী নাই। এখানে আজকাল আমরা ৯ জন আছি। সুশীল মহারাজও আছেন। তিনি বেশ কাজকর্ম্ম করছেন। একদিন মুগের ডালের খিচুড়ি রাঁধা গিয়েছিল; সে একেবারে উঁ তালতলার জুতো। আবার দেড়মাস পরে সহরে যেয়ে রাঁধা যাবে। এবার থেকে যেয়ে স্বপাকে প্রত্যহই আহুতি দেওয়া যাবে। এখানকার লোকদিগকেও কিছু খাওয়ানো গিয়াছে; তাহারা খেয়ে খুব খুশী। মহাশয় লিখিয়াছেন যে যাহা সব পাঠাইয়াছেন তাহার এক পয়সাও গ্রহণ করিবেন না। মহাশয়গো—সে যে প্রায় ২০০৲ দুইশত টাকা আমার যে মশাই, এত বড় ২ মণ্ডগাত পেলে অহঙ্কার আরও পাবার আশা বেড়ে যাবে মশাই !! আপনার কি মশাই। যাহা হউক আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। যেন ঠাকুর আপনাদিগের সকলকেই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আশাতীত পরিমাণে প্রদান করেন। আপনার ভ্রাতা রামলাল শেঠ মহাশয়কেও আমার শত ২ ধন্যবাদ এবং আশীর্ব্বাদ দিবেন। তাহার প্রদত্ত Lord Gouranga 2 Vols পাইয়া বড়ই উপকৃত হইলাম। এখানে ১ পয়সাও Duty লাগে নাই। হিন্দু মন্দিরের জন্য বলিয়া সব রেহাই হইয়াছে। এইবার হইতে পার্শেলে,আমার ঠিকানা লিখে,"Hindu temple for religious services" এইটুকু বেশীর ভাগ লিখে দিবেন। আর ২ সকলকেও অনুগ্রহ করিয়া উহা বলিয়া দিবেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক অপর পত্র দুইখানিতে দুই পয়সার টিকিট মেরে ডাকে ফেলিয়া দিবেন। সুরেনবাবু, সতীশবাবু, গিরীণবাবু, আপনার ভ্রাতৃগণ, নিতাই ডাক্তারবাবু প্রভৃতি সকলকেই আমার নমস্কার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ দিবেন এবং আপনি ও আপনার পরিবারবর্গ সকলেই পুনঃ ২ জানিবেন। ইতি

আপনাদের শুভানুধ্যায়ী
ত্রিগুণাতীত

পুঃ নিঃ—এবার হইতে Thomas Cook দের মারফৎ না পাঠাইলেই ভাল হয়; উহারা উহাদের Agent-দের উপর Transfer করে দেয়; তাহারা আবার এখানে $ 4'50 অর্থাৎ ১৩া০ টাকা বেশী Charge করে। বোধ হয় অমনি Directly San Francisco via Pacific পাঠালে সস্তা হতে পারে। ইতি ত্রি

আমাকে San Fraacisco র ঠিকানায় লিখবেন। New York দিয়া অর্থাৎ Atlantic Coast দিয়া আসিলে কিন্তু Duty লাগবেই লাগবে, এবং তাতে চুল বিকাইয়া যাবে। ইতি

শ্রীরামকৃষ্ণের মানবতাবাদ

স্বামী আত্মস্থানন্দ

[২০ মার্চ ১৯৮৩, কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত বেতার ভাষণ—আকাশবাণীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সঃ]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত সেই শাশ্বত মন্ত্র—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা : ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনপটে বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখি ঈশ্বরলাভের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা, জীব জগৎ বিস্মরণ, নিজ দেহাভিমান রাহিত্য, ইষ্টলাভের পরম আনন্দ, নানা পথে ও নানা মতে ঈশ্বর আস্বাদন—সমাধি, সবিকল্প—নির্বিকল্প। কাশীপুরে তাঁর আশীর্বাদ "তোমাদের চৈতন্য হোক"—ভগবানলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। সুতরাং এ-হেন ঈশ্বরনিষ্ঠ অথবা ব্রহ্মনিষ্ঠ অলৌকিক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অতিমানব পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও মানবতাবাদ যেন পরস্পরবিরোধী। কিন্তু অশ্রুতপূর্ব জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত ভাবমুখে স্থিত তাঁর জীবনের বাস্তব ঘটনাবলি সাক্ষ্য দেয়—"ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গম্" শ্রীরামকৃষ্ণই "বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তি-প্রশান্তীঃ, প্রণয়গলিত-চিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্","ভঞ্জন-দুঃখগঞ্জন করুণাঘন, কর্ম কঠোর। / প্রাণার্পণ-জগত-তারণ, কৃন্তন-কলিডোর॥"

দক্ষিণেশ্বরের কাছারিবাড়ির ছাতে উঠে কাতর ক্রন্দন-বিহ্বল শ্রীরামকৃষ্ণ,—"তোরা কোথায় আছিস আয়"। মা-গতপ্রাণ ভবতারিণীর পূজারী আজ মানুষকে কাছে পাবার জন্য ব্যাকুল। সাধকজীবনের দিব্যোন্মাদ আজ "ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মদ প্রেম-পাথার।/ভক্তার্জন-যুগলচরণ তারণ-ভব-পার॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন, উপলব্ধি ভবতারিণীকে একভাবে দেখেই শেষ হল না। তাঁর অনুভূতিতে উদ্ভাসিত হল চৈতন্যশক্তি—শুধু ভবতারিণীরূপে নয়, মায়ার সংসারের অন্তর্নিহিত চেতনসত্তারূপে নিয়ত প্রকাশিতা। তাঁর দৃষ্টির সামনে কোশাকুশি, দরজা-চৌকাঠ, গাছ-পাতা, বেড়াল-মানুষ—সবই চৈতন্যসত্তার প্রকাশের বিভিন্নরূপে ধরা দিল।

লোক আর পোক রইল না—জীব ও শিবের অভেদত্ব বোধ হল। শ্রীমন্দিরের ভবতারিণী এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষে একই প্রকাশ এই চরম সত্য-জ্ঞানে তাঁর কাছে মানুষে-দেবতায়, বস্তুতে-প্রাণীতে, নর্দমা-নদীতে কোনও প্রভেদ রইল না। শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি তাঁকে সর্বতোভাবে দ্বন্দ্বময় জগৎ থেকে উত্তীর্ণ করে দিব্য-চেতনার রাজ্যে পৌঁছে দিল। "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করলেন—মন্দিরের মা, নহবতের মা এবং তাঁর পদসম্বাহনরতা সারদা এক; প্রত্যক্ষ করলেন—ভবতারিণী পতিতারূপে, মোহিনীরূপে আরও কত রূপে উঁকি দিচ্ছেন। তাই বলেছিলেন, "প্রতিমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে না ?···তিনি তো সকল ভূতেই আছেন, তবে মানুষের ভিতর বেশী প্রকাশ···।"

অবতার-জীবনের উদ্দেশ্য নিজ উপলব্ধিতেই পরিসমাপ্ত হয় না। অবতার-জীবন-গঙ্গা সহস্র-ধারায় ধাবিত হয় স্বীয় সাধনা ও সিদ্ধির ব্যাপ্তি লোককল্যাণে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে। তাই যিনি ভবতারিণীদর্শনে আকুল হয়েছিলেন, তিনিই তাঁর আবির্ভাব সার্থক করার জন্য দক্ষিণেশ্বরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ থেকে লোকসংগ্রহে সোচ্চার হয়ে বলেছিলেন, "প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না ? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন।" "আর দান ধ্যান দয়া কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ—আর পাশের বাড়ীতে খেতে পাচ্ছে না তাদের দুটি চাল দিতে কষ্ট হয়—অনেক হিসেব করে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে,—তা

আর কি হবে, ও শালারা মরুক আর বাঁচুক, আমি আর আমার বাড়ীর সকলে ভাল থাকলেই হল। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!"

"হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্। প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিম্" দেবমানবের এ কী অপূর্ব মানবদরদ! অভিনব এ মানবতাবাদ—দিব্যভাবে ভরা, বাস্তবকে স্বীকার করা কিন্তু শুদ্ধমনবুদ্ধি দ্বারা। দরদী দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণ মানবকে দেবত্বে উন্নয়ন করেছেন—শিবজ্ঞানে পূজায়, নিকৃষ্ট জীববোধে দয়ায় নয়। এ এক নূতন দৃষ্টি, নূতন বোধ, নূতন অনুভূতি, নূতন ধর্ম, সব মানুষই হল দেবতা আর তার সেবায় মানুষ হল সর্ববন্ধনমুক্ত, অনন্ত আনন্দের অধিকারী, অফুরন্ত ঐশ্বর্যময়, মহিমাময় সাম্রাজ্যের সম্রাট। তাই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে কর্মপরিণত বেদান্ত। এবং সেই জন্যই যে বেদান্ত সাধককে উদার করে না, যে বেদান্তবোধ মানুষের মন ও ইচ্ছাশক্তিকে জৈব ভোগের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায় না, যে বেদান্তজ্ঞান জীবকে ক্ষুদ্রস্বার্থের গণ্ডীর বাইরে পরদুঃখকাতর করে না, মানবমাত্রের কল্যাণে উন্মুখ করে না, সে বেদান্তের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের ধিক্‌কার ও ভর্ৎসনা অত্যন্ত তীব্র এবং অতুলনীয়। পূর্ণ মানবতা বিকাশের অবিসম্বাদিত দৃষ্টান্ত পাই তাঁরই জীবনে ধনী কামারনীকে ভিক্ষামাতা রূপে গ্রহণে, অক্ষয়ের মৃত্যুতে গামছা নেংড়াবার মতো বেদনাহত শ্রীরামকৃষ্ণে, স্নেহময়ী গর্ভধারিণীর কথা স্মরণে তাঁর বৃন্দাবন ত্যাগে, সহধর্মিণী সারদাদেবীর জন্য অলংকার প্রস্তুত করায়, স্বীয় পত্নীকে যথাযথ শিক্ষাদানে, আবার কেশব সেনের দুরারোগ্য পীড়াবস্থায় মা-কালীর কাছে ডাব চিনি মানায়, শিশুর ন্যায় সরলতা ও মাতৃ-নির্ভরশীলতায়, আহত হাতের ব্যথায় অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতন ব্যবহারে, লোকব্যবহারে নানা প্রকারের হাস্য-কৌতুকাদি সৃষ্টি করায়, নরেন্দ্রাদি বালকদের কল্যাণপ্রয়াসে সদা জাগ্রত উৎকণ্ঠায়, কলিকাতাবাসীর তমসাচ্ছন্ন মনবুদ্ধিকে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় রানী রাসমণির শান্ত সুন্দর মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে মহানগরীর অলিতে-গলিতে বারবার ছুটে আসায়, সকলের দরজায় দরজায় গিয়ে বনের বেদান্ত পৌঁছে দেওয়ায় বেদান্তবিগ্রহস্বরূপ হয়ে, গাড়িতে ফেলে রাখা মদের বোতল পানাসক্ত গিরিশের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এবং নটীদের প্রতি কৃপার বিরল শুদ্ধ মানব-প্রেমের উদাহরণে, তীর্থযাত্রায় দুর্ভিক্ষপীড়িত সেবার প্রাধান্যে, কলাইঘাটায় দুঃখী মানুষের অভাব মোচনে তৎপরতায়, মানুষের একত্ববোধে কাঙালীদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করায়, পরিচারকবর্গের শৌচস্থান স্বহস্তে নিজ কেশদ্বারা মুছে দেওয়ায়, মথুরের অনুরোধে জগদম্বা দাসীর রোগ নিজ দেহে ভোগে, নৌকায় মাঝিদ্বয়ের পরস্পর কলহে ঠাকুরের নিজ শরীরে আঘাতানুভবে, ধবলকুষ্ঠরোগ আরোগ্য সাধনে ভীষণ জ্বালা-পীড়িত হওয়ায়, গলায় ক্ষত যন্ত্রণাভোগ সত্ত্বেও সর্বদা আর্তি ও জিজ্ঞাসুর সেবায় এবং সর্বোপরি "লক্ষগুণ কষ্ট পেয়েও যদি এদের মঙ্গল হয়, উদ্ধার হয় তো তা করবো" এই উক্তিতে। সত্যই, এমন মানব-বন্ধু, দরদী, হিতকারী আর কে হতে পারে!

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে বাস্তব করে দেখালেন, প্রতিটি মানুষের ভেতরের আত্মার ঐকসত্য পরস্পরকে আত্মীয় করে রেখেছে; পরমাত্মা দূরের আকাশের কিছু অদ্ভুত বিষয় নন, পরমাত্মা মানুষের পরমাত্মীয়—মানুষে পরমাত্মায় কোনও ভেদ নেই, কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণের মানবতা এককথায় মানুষের অন্তর্নিহিত চিরন্তন চৈতন্য শক্তির স্বীকৃতি।

নির্বাসনোঽপি সততং পরমঙ্গলার্থী
নিষ্কর্মকোঽপি সততং পরকর্মকর্তা।
নির্দুঃখলেশমপি তং সততং পরেষাং
দুঃখেষু কাতরমহো ভজ রামকৃষ্ণম্।

পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[অগ্রহায়ণ, ১৩৮৯ সংখ্যার পর]

ইটালি

এয়ার ইণ্ডিয়ার সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছিল যে, তারা রোমে একটা হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা করবে। আমার জন্য তিনদিনের রিজার্ভেশন ছিল সেই হোটেলে। হোটেলটার নাম আমাকে বলা হয়েছিল : 'হোটেল ভেণ্টো' (Hotel Vento)। রোমে আমার পরিচিত কেউ নেই। রোমের একদল খ্রীষ্টান সাধু চার-পাঁচ বছর আগে ইনস্টিটিউটে একটি সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, আমাদের সাধুরাও করেছিলেন। তখন তাঁদের সাথে আমাদের বেশ আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। মুগ্ধ হয়েছিলাম ওঁদের সঙ্গে মিশে, ওঁদের সঙ্গে চিন্তার আদান-প্রদান করে। রোমে যাবার কথা হতে তাঁদের কথা মনে পড়ল। তাঁদের লিখলাম : 'আমি যাচ্ছি ইউরোপে। রোমে যাবার ইচ্ছে। যদি যাই, ওখানকার কোন হোটেলে উঠব। আপনাদের মঠ দেখারও ইচ্ছা আছে।' চিঠির উত্তর দিলে বার্লিনে মিসেস ইলসে বুশের ঠিকানায় দিতে লিখলাম। কারণ, আমার তখন রওনা হবার আর দু-চারদিন মাত্র বাকি ছিল। যথাসময়ে বার্লিনে তাঁদের চিঠি পেলাম। খুব আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠি। তাঁরা লিখেছেন : 'আপনি রোমে আসছেন জেনে আমরা খুব খুশি হয়েছি। আমাদের মঠেই থাকবেন। আমরা খুব কৃতার্থ বোধ করব। কবে কোন্ প্লেনে আসছেন জানান। আমরা এয়ারপোর্টে থাকব। হোটেলে উঠবেন না। আমাদের কাছেই থাকবেন। তবে আপনি তো নিরামিষ খান, আমরা আমিষ খাই। আপনি কি কি খান জানালে আমরা সেইরকম খাওয়ার ব্যবস্থাই করব।' বার্লিন থেকে আমি ওঁদের লিখলাম : 'ধন্যবাদ! আমি অমুক তারিখে অমুক প্লেনে যাচ্ছি। ওখানে একটা হোটেলে আমার থাকবার ব্যবস্থা করা আছে। তাহলেও আপনাদের ওখানে একবার নিশ্চয়ই যাব। কবে যাব ওখানে গিয়ে ঠিক করব। আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা করার দরকার নেই। টেবিলে যা থাকবে তা থেকে আমার যা যা খাওয়া চলে, তা-ই আমি বেছে নেব।'

রোমে পৌছলাম ডিসেম্বরের ৪ তারিখ দুপুর নাগাদ। এয়ারপোর্টে নেমে আমার জিনিসপত্র সব ট্রলিতে করে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে আসছি, আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—পরিচিত কাউকে দেখি কিনা। পরিচিত থাকলে নিশ্চয়ই সে মাথা নাড়বে। এক জায়গায় দেখি, কতগুলি লোক সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের যার দিকে তাকাই সেই দেখি মাথা নাড়ে, আর হাসে। যেন কত চেনে আমাকে! যেন সে-ই আমাকে নিতে এসেছে। বেশ সমস্যায় পড়ে গেলাম। পরে বুঝলাম : এরা সব বিভিন্ন হোটেলের প্রতিনিধি। খদ্দের জোগাড় করতে এসেছে। এয়ারপোর্ট থেকেই পাকড়াও করে নিয়ে যাবে! চিন্তায় পড়লাম : আমাকে নিতে কি তাহলে কেউ আসেনি! তারপরে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পরে দেখি দুজন দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে খ্রীষ্টান সাধুদের পোশাক, লম্বা কালো গাউন, আর হাতে একটা বিরাট কাগজ, তাতে বড় বড় করে লেখা : INSTITUTE OF CULTURE, CALCUTTA. এগিয়ে গেলাম

সেখানে। এর আগে আমাদের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল। দেখলাম তাঁরা আমাকে দেখে চিনতে পেরেছেন, আমিও তাঁদের চিনতে পেরেছি। কাছে যেতেই তাঁরা আমাকে একেবারে জড়িয়ে ধরে বললেন: 'আপনার জন্ম গাড়ি নিয়ে এসেছি। আমাদের মঠে গিয়ে উঠবেন আপনি।' আর কোন কথা আমাকে বলার সুযোগ না দিয়ে আমার মালপত্র বয়ে নিয়ে চললেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আবার তাঁদের মঠের অধ্যক্ষ স্বয়ং। বৃদ্ধ মানুষ তিনি। তাঁকেও আমার মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে দেখে আমি খুব বিব্রত বোধ করতে থাকলাম। বললাম: 'আমি নিজেই এসব বইতে পারি। বয়ে থাকিও। আপনারা কেন কষ্ট করছেন?' বললেন: 'না, এখন এসব আমরাই বয়ে নিয়ে যাব।' আমার কথা তাঁরা শুনলেন না। সব মালপত্র নিয়ে গিয়ে তাঁদের গাড়িতে তুললেন। আমি বললাম: 'আমার যে একটা হোটেলে তিনদিনের থাকার ব্যবস্থা করা আছে। টাকাও দেওয়া আছে।' তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: 'কি হোটেল?' আমি বললাম: 'হোটেল ভেণ্টো।' 'ভেণ্টো? এটা কোন্ দিশি শব্দ?' আমি বললাম: 'তা তো বলতে পারব না।' আমাকে আবার জেনিভাতে একজন বলেছিলেন, তিনি নাকি ইতালিয়ান জানেন, 'ভেণ্টো' মানে 'বাতাস'। আমি বললাম: 'ভেণ্টো' মানে বাতাস না?' তাঁরা বললেন: 'না তো!' ওখানে টেলিফোনের বই তাঁরা উলটে-পালটে অনেক দেখলেন—কোথাও 'হোটেল ভেণ্টো' নেই। শেষে ওঁরা বললেন: 'হোটেল ভেনিটো' (Hotel Venito) একটা আছে। সেখানে আমরা ফোন করে দেখছি।' ফোন করে জানা গেল, 'হোটেল ভেনিটো'তেই আমার থাকার ব্যবস্থা করা আছে। তখন সাধুরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: 'স্বামীজী, ওখানে যে আপনি থাকবেন, খাবেন কোথায়?' ওখানকার সব হোটেলে ব্যবস্থা হচ্ছে—শুধু থাকা যাবে। আর সকালে একটু ব্রেকফাস্ট দেবে। ব্রেকফাস্ট মানে এক কাপ চা বা কফি, আর একটুকরো রুটি। এর বেশি আর কিছু না। তার জন্যই তারা মোটা টাকা নেয়। কিন্তু দিনের বা রাত্রের খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। তার জন্ম বাইরে কোন রেস্তোরাঁয় যেতে হবে। ওঁরা বললেন: 'স্বামীজী, আপনি জানেন না রেস্তোরাঁয় খাবার-দাবারের কি ভীষণ দাম! কেন আপনি ওখানে খেতে যাবেন? আপনি আমাদের ওখানেই থাকবেন। হয় আমাদের ওখানেই থাকুন, খান, নয়তো—আপনি যখন বলছেন টাকা দেওয়া হয়ে গেছে—ওখানে থাকুন, খাবেন আমাদের এখানে। সকাল থেকে সমস্ত দিন আপনি আমাদের কাছে থাকবেন, খাবেন, ঘুরে-টুরে সব দেখবেন। রাত্রে হোটেলে ফিরে যাবেন। যেমন আপনার সুবিধে। তবে আমরা খুশি হব, যদি আপনি হোটেলে না গিয়ে আমাদের কাছেই থাকেন।' আমার প্রথম প্রথম একটু লজ্জা করছিল ওঁদের ওখানে উঠতে। বললাম: 'আচ্ছা, হোটেলে তো আজকে উঠি। পরে ঠিক করব আপনাদের ওখানে চলে যাব কিনা।' তখন দুপুরবেলা, তাই হোটেলে জিনিস-পত্র রেখে তাঁরা আমাকে তাঁদের মঠে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি 'লাঞ্চ' খেলাম। তাঁদের মঠে গিয়ে, তাঁদের সঙ্গে মিলে মিশে আমার এত ভাল লাগল—আমার সঙ্গে তাঁরা সবাই এত সহৃদয় ব্যবহার করতে লাগলেন যে, আমি মনে মনে ভাবতে শুরু করলাম, হোটেল ছেড়ে চলে আসব কিনা। তবুও একটু দ্বন্দ্ব হচ্ছিল। প্রথম দিন কোন সিদ্ধান্ত করতে পারলাম না। পরদিন সকাল থেকে আমি তাঁদের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরেছি, বেড়িয়েছি, দুপুরবেলা তাঁদের সঙ্গে

খেয়েছি। খাওয়ার পর তাঁরা আমাকে বললেন: 'চলুন, আপনার জন্য যে-ঘরটা আমরা ঠিক করে রেখেছি দেখবেন চলুন।' ঘরটা দেখে আমার খুব ভাল লেগে গেল। হোটেলের ঘর খুব ছোট, পরিবেশও এমন কিছু ভাল না। অথচ এই ঘরটা বিরাট বড়, খোলামেলা। আর এঁদের এত ভালবাসা এখানে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক করলাম: এঁদের এখানেই চলে আসব। চলে এলাম তাঁদের মঠে। ওঁদের যে মঠ, ইতালিয়ানে তার নাম: কনগ্রীগ্যাজোন বেনেডিট্টিনা সিলভেসট্রিবা (Congregazione Benedettina Silvestrina)। এটি খ্রীষ্টপন্থী বেনেডিক্‌টিন সম্প্রদায়ের মূল মঠ বা প্রধান বেনেডিক্‌টিন (Benedictinne) কর্মকেন্দ্র (Head Quarters)। বেনেডিক্‌টিন নামে একজন সাধু ছিলেন। তাঁর নামে এই মঠ। খুব পুরানো মঠ। আমরা যে 'সেণ্ট ফ্রান্সিস অব আসিসি'র (St. Francis of Assisi) কথা শুনি, তিনি প্রথমে এই মঠেই ছিলেন। পরে আলাদা হয়েছেন। 'Assisi' উচ্চারণটা এতদিন আমি জানতাম 'অ্যাসিসি'—কিন্তু ইতালিয়ানে ওর শুদ্ধ উচ্চারণ হল 'আসিসি'। অনেক নতুন নতুন সম্প্রদায় আছেন যাঁরা গোড়াতে এই বেনেডিক্‌টিন সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিলেন। আমি যে-মঠে ছিলাম তার কাজ শুধু পড়াশোনা আর গবেষণা এবং যত শাখা-মঠ আছে সেগুলির দেখাশোনা করা, পরিচালনা করা, আর প্রয়োজনমতো সেগুলিকে সাহায্য করা। তাঁদের আগে বিরাট সম্পত্তি ছিল। তাঁরা বললেন: 'চারপাশে যত বাড়ি দেখছেন, সব আমাদের ছিল। সরকার সব নিয়ে নিয়েছে। এমন কি, এই যে বাড়িটায় আমরা আছি এখন, এটাও সম্পূর্ণ আমাদের নয়।' সরকারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক খুব ভাল নয়। তাঁরা দুঃখ করে বলছিলেন: 'আমরা এই বাড়িতে একটা লিফ্‌ট্ বসাতে চেয়েছিলাম। লিফ্‌ট্ বসানোও হয়ে গেছিল। কিন্তু যেহেতু সরকারের অনুমতি নিইনি, সেইজন্য লিফ্‌ট্ বন্ধ করে দেওয়া হল—এমন কি জরিমানা দিতে হল। আমাদের যত সম্পত্তি ছিল অধিকাংশই সরকার জোর করে কেড়ে নিয়েছে। আমরা এখানে কোনরকমে কষ্ট করে আছি। এর পরিবেশ, দেখতেই পাচ্ছেন, মোটেই ভাল না।' মঠের বাইরের পরিবেশ সত্যিই ভাল নয়। সামনেই দোকানপাট, মানুষজন সেখানে হৈ হৈ করছে, চিৎকার করছে, নানারকম বাজনা বাজাচ্ছে—ইত্যাদি। সাধুদের মঠ বলে সম্মান করা—ওসব কিচ্ছু না। তারা নিজের মনে গান-বাজনা-ফূর্তি—এসব করছে। কেবল যখন সাধুরা ঢুকছেন বা সাধুরা বেরোচ্ছেন, তখন একটু সংযত।

এই মঠে সাধুদের সঙ্গে থেকে, তাঁদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। খুব সকালে ঘুম থেকে ওঁরা ওঠেন। ঘুম থেকে উঠে অনেকেই 'যোগ' অভ্যাস করেন, একটু-আধটু ধ্যানও করেন। এগুলি ওঁদের নিজস্ব। নিজেদের ঘরে এগুলি করেন। আবার সকলে একসঙ্গে গির্জাতে যান; সেখানে প্রার্থনা হয়—'ম্যাস' হয়। 'ম্যাস'-এর কথা আগে বলেছি। এই 'ম্যাস' দিয়ে ওঁদের দিন শুরু হয়। তারপর সারাদিন ঠাসা রুটিন। কখনও কোন স্বাধীন অবসর নেই। প্রার্থনাই হয় কতবার! সকাল-সন্ধ্যায় প্রার্থনা। খেতে বসবার সময় প্রার্থনা। গাড়িতে করে বাইরে কোথাও যাওয়ার সময়ও প্রার্থনা। গাড়িতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি ছাড়বে না। গাড়িতে বসে সবাই প্রথমে প্রার্থনা করবেন, তারপর গাড়ি ছাড়বে। হিন্দুরা যেমন কোথাও বের হবার আগে বলে: দুর্গা দুর্গা। আমরা 'জয়' দিই। অর্থাৎ যাত্রাটা যেন শুভ হয়, নির্বিঘ্ন হয়। আমি যাওয়াতে

কিন্তু ওঁদের রুটিন উলটোপালটা হয়ে গেল। আমাকে নিয়ে তাঁরা সবসময় ব্যস্ত আছেন। আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন, কি কি দেখাবেন, কি করলে অল্প সময়ে বেশি জিনিস আমি দেখতে পাব—এই-ই সবসময় তাঁদের মাথায় ঘুরছে। আমি যখন খাওয়ার ঘরে যেতাম তখন ওঁদের যিনি মঠাধ্যক্ষ তিনি আমাকে তাঁর ঠিক পাশের আসনে বসাতেন। ঐ আসনটা আমার জন্য ছিল নির্দিষ্ট। খেতে বসবার আগে একসঙ্গে প্রথমে প্রার্থনা হবে—তারপরে সবাই বসবে। তারপর একটা বই পড়া হবে—ল্যাটিন ভাষায় কিংবা ইতালিয়ান ভাষায়। তারপরে খাওয়া শুরু। ওঁদের ওখানে দুজন সাধু আছেন যাঁরা বৃত্তি নিয়ে ওখানে এসেছেন গবেষণা করতে। একজন শ্রীলঙ্কা থেকে গেছেন, আর একজন ভারতবর্ষ থেকে। আমি খাওয়ার টেবিলে দই খেতাম গোলমরিচ দিয়ে। শ্রীলঙ্কার সাধুটি আমাকে বললেন: 'স্বামীজী, আপনি এর মধ্যে একটু লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে খান না কেন?' তিনি প্রতিদিন খেতে আসবার সময় ঐ লঙ্কার গুঁড়ো, আরও নানারকম মশলা নিয়ে আসতেন। আমি একদিন ওঁর কথায় একটু লঙ্কার গুঁড়ো নিলাম। কিন্তু সে এত সাংঘাতিক ঝাল—খেতে পারলাম না। খেতে খেতে নানারকম হাসিঠাট্টা গল্পগুজব হত। খাওয়া-দাওয়া খুব ভাল। আমার ঘরে সবসময় ওঁরা প্রচুর ফল আর ফলের রস রেখে দিতেন। এত পরিমাণে রাখতেন যে, আমি খেয়ে শেষ করতে পারিনি। আমার এতটুকু অসুবিধে তাঁরা হতে দেননি। আমাকে কোন সময় ভাবতে দেননি যে, আমি তাঁদেরই একজন নই। ওঁরা নিজেদের মধ্যে ইতালিয়ান বলতেন। আমি তো ইংরেজী ছাড়া কোন বিদেশী ভাষা জানি না। আবার ওঁদের অনেকে ইংরেজী জানেন না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না মাঝে মাঝে অন্যের মাধ্যমে (যাঁরা ইংরেজী জানেন) তাঁদের সঙ্গে কথা হত।

খাওয়ার সময় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে নানারকম প্রসঙ্গ উঠত। খুব খোলাখুলি আলোচনা হত সবার সঙ্গে। আমার ধারণা ছিল না যে, ওঁরা এতটা বদলে গেছেন। দেখলাম যে, হিন্দুধর্মের মূল চিন্তাগুলি প্রায় সবই ওঁরা মেনে নিচ্ছেন। এই যে আমরা শুনি: যীশুখ্রীষ্ট হচ্ছেন 'the only begotten son of God'—'একমাত্র যীশুই ঈশ্বরের সন্তান, তাঁকে না ভজলে হবে না'—ইত্যাদি কথা ওঁরা আর এখন জোর দিয়ে বলেন না। ওঁদের মধ্যে যাঁরা খুব গোঁড়া তাঁরা দু-একজন বললেন: 'যীশুখ্রীষ্ট হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।' আমি বললাম: 'আমরাও তাই বলি। স্বয়ং ভগবানই মাঝে মাঝে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। যেমন, কৃষ্ণ, বুদ্ধ।' ওঁরা বলছেন: 'কৃষ্ণকে তো তোমরা অবতার বল। তিনি কি ভগবান?' আমি বললাম: 'স্বয়ং ভগবানই মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষ হয়ে "অবতরণ" করেন—তাই আমরা তাঁকে অবতার বলি। তাই অবতারই ভগবান।' এইসব প্রসঙ্গ হতে হতে পরিষ্কার বুঝলাম, ওঁরা ক্রমশঃ হিন্দু চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, অনেক নমনীয়তা এসেছে ওঁদের মধ্যে। ওঁরা অবশ্য বললেন: 'এগুলি আমাদের personal view (ব্যক্তিগত মত)—প্রকাশ্যে এগুলি আমরা বলতে পারি না। আমাদের একটা "official view" (সরকারী মত) আছে—সেটা আমরা প্রকাশ্যে উপস্থিত করে থাকি।' ওঁদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে: ভগবান যদি সর্বব্যাপী হয়ে থাকেন, সর্বত্র ছড়িয়ে থাকেন, তাহলে তিনিই কি করে আবার একটা মানুষের মধ্যে নিজেকে সীমিত করতে পারেন। যিনি 'Impersonal' তিনি 'Personal' হবেন কি

করে? যিনি নৈর্ব্যক্তিক তিনি আবার একজন ব্যক্তি হন কি করে? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিচ্ছেন: 'ভক্তিহিমে জল বরফ হয়।' অর্থাৎ নিরাকার জল আকার গ্রহণ করে। আমাদের শাস্ত্র বলছেন: যিনি নিরাকার, নিরঙ্কুশ, তিনিই ভক্তের অনুরোধে, ভক্তের ভক্তিতে সাকার রূপ ধারণ করেন।[১] আবার বলা হচ্ছে: গরুর সমস্ত শরীরেই দুধ ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সেটা আসে বাঁটের ভিতর দিয়ে, একটা বিশেষ জায়গা দিয়ে। তেমনি ভগবান সর্বব্যাপী—বিশ্বচরাচর জুড়ে রয়েছেন তিনি, কিন্তু প্রতিমা প্রভৃতিতে তিনি বিরাজ করেন। আর অবতার হলেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রতিমা। ভগবান সর্বব্যাপী, কিন্তু কখনও কখনও একজন ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে তাঁর বিশেষ প্রকাশ ঘটে। সেখানে যেন তিনি কেন্দ্রীভূত হচ্ছেন।[২] এসব আলোচনা তাঁদের সঙ্গে হত। আসলে ঠাকুর-স্বামীজী যেসব কথা বলেছেন, সেগুলিই ওঁদের কাছে বলতাম। তা ছাড়া আমি নিজে আর কি বলব? নিজের কথা বলতে গেলেই তো ভুল বলব। দেখতাম, ওঁরা সেসব কথা অবাক হয়ে শুনতেন। তাঁদের মুখ-চোখ দেখে মনে হত, যেন নতুন আলো পাচ্ছেন।

মঠের সাধুরা আমাকে রোম খুব ভালভাবে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। কাশী যেমন হিন্দুদের একটি সনাতন শহর, রোমও তেমনি খ্রীষ্টান জগতের এক সনাতন শহর। অবাক কাণ্ড, যুদ্ধের সময় রোমের কোন ক্ষতি হয়নি! বোমা-টোমা পড়েনি—একটু আঁচড়ও লাগেনি। অথচ ইতালি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, মুসোলিনী হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, যুক্ত-শক্তি সমস্ত ইতালি দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু রোমের উপরে কোন হাত পড়েনি। রোমে বিরাট বিরাট পুরানো বাড়ি। দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়েও এইসব বাড়ি করা সহজ নয়। তাহলে সেই যুগে কি করে এঁরা এসব করলেন? এর একটা ব্যাখ্যা এই: সেই সময় রোম এমন একটা শক্তি ছিল যে, বিভিন্ন দেশ জয় করে তারা যেসব যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসত, তাদেরকে এইসব কাজের জন্য খাটাত। তাদের শ্রমের ফলে এইসব বড় বড় অট্টালিকা। আজ যেখানে ক্রেনের সাহায্যে একটা ভারি জিনিস তোলা হচ্ছে, তখন হয়তো অনেক মানুষ মিলে সেটাকে তুলেছে। এইভাবে বহুলোকের বহু দিন ধরে পরিশ্রম করার ফলে এসব বাড়ি গড়ে উঠেছে। কী বিরাট বিরাট সব থাম! আর তাতে কী সব কারুকার্য! মানুষের পক্ষে যে এসব সম্ভব, ভাবা যায় না। অদ্ভুত এক জগৎ এই রোম! এই রোম যেন আধুনিক হয়নি—পুরাতনই রয়ে গেছে। সেই পুরানো বাড়ি, পুরানো গির্জা। নতুন নতুন যে বাড়ি হয়েছে সেও পুরানো ঢঙের। ওদের ওখানে আইনই আছে যে, নতুন বাড়িও পুরানো ঢঙেই করতে হবে। ওখানে মুসোলিনী অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর জিনিস করেছেন। যেমন একটা স্কোয়ার করেছেন তিনি, একটা পাহাড়ের মাথায়, সেখান থেকে সমস্ত রোম শহরটা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। একটা বড় অবেলিস্ক-ও (Obelisk) করেছেন। অর্থাৎ বিরাট উঁচু পাথর একটা—মনুমেণ্টের মতো। কিন্তু সেসবও তিনি করেছেন ঐ পুরানো ধাঁচে। পুরানো যুগটাকে তাঁরা যেন আটকে রেখে দিয়েছেন ওখানে। ঐ সাধুদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি রোম খুব তন্ন তন্ন করে দেখলাম। তাঁদের সঙ্গে না থাকলে রোম

---

১ ভক্তানুরোধাৎ সাকারো নিরাকারো নিরঙ্কুশঃ।—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ: কৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ৭।৫৬

২ গবাং সর্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাৎ যথা।
তথা সর্বগতো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে॥—কুলার্ণবতন্ত্র: ৬।৭৬

এত ভালভাবে দেখা হত না।

তাঁরা আমাকে ভ্যাটিক্যান-এ নিয়ে গেলেন সেণ্ট পিটারস চার্চ, সেণ্ট পিটারস স্কোয়ার, সেণ্ট পিটারস ব্যাসিলিকা দেখাতে। সেণ্ট পিটারস চার্চ না দেখলে ধারণা করা যায় না সে কী জিনিস! আর কী সব মূর্তি সেখানে! তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে মাইকেল এঞ্জেলোর একটি কাজ—যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হয়েছে। তাঁর মৃতদেহ কোলে করে মা-মেরী বসে আছেন। সন্তানের মৃতদেহ কোলে নিয়ে মা বসে আছেন। আর এরকম সন্তান! ক্ষতবিক্ষত দেহ যীশুর। মেরী দেখছেন! সে যে কী দৃশ্য! কী করুণ ভাব মেরীর চোখেমুখে! মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত! আঁকা ছবি হলে তবুও সম্ভব। কিন্তু পাথরেও যে এতটা ভাব ফুটিয়ে তোলা যায়, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ওঁরা বলছিলেন: 'এই মূর্তি করে মাইকেল এঞ্জেলো নিজেই নাকি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মেরীর নিষ্প্রাণ মূর্তি ওটি। তিনি নাকি একটা হাতুড়ি দিয়ে মেরীর হাঁটুতে ঠুকে বলেছিলেন, "Why don't you speak, madam?"—মেরী তুমি কথা বলছো না কেন?' সত্যিই এত সজীব মূর্তি যে, মনে হয় এই মুহূর্তে যেন মেরী কথা বলে উঠবেন!

[ক্রমশঃ]

বুদ্ধত্বের প্রাক্‌মুহূর্তগুলি

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

এতকাল সেধেছি যে সুর—কভু তার পাইনি স্বরূপ।
সাধনায় স্বেদ ঝরে—কৃচ্ছ্রতায় কত অপরূপ
জ্যোতির্ময় নয়নে যে এল! কিন্তু, শান্তি কোথা?
স্বস্তি কোথা হায়! কোথা সেই দুঃখ-শোক-জরা-ত্রাতা?
কোথা অরাগিনী সুর? প্রাণ ভরে চাই—মগ্নতার
সিন্ধু মাঝে নিত্যমুক্ত অবিরাম:অশ্রান্ত সাঁতার!
অন্তরেতে চিতা জ্বলে ধূমে—নিজেরে বিছায়ে দেব—
জড়ে জীবে, দৃশ্যে নিঃস্বে—অনিঃশেষ 'বড় আমি' পাব।

কই সে 'মুহূর্ত-মন্ত্র'? ছিঁড়ে ফেলে জীবের খোলস
প্রাণ ভরে পিয়ে নেব মোচনের মোহন পরশ!
কোথা সেই যজ্ঞ-ভূতি? কোথা সেই অমিয় কলস?
যার পাশে প্রাণ তুচ্ছ—'দেহ-আছে, দেহ-নাই' রস!
আনন্দের অভিসারে ছিন্ন পথ। ভেসে যায় মত্ততায়—
ঘর-পর, ধন-মান, সিদ্ধি-ঋদ্ধি উদ্দাম বন্যায়!
ক্ষোভ নাহি তাই! মোর লুব্ধ হিয়া—শুধু চায়—চায়—
কবে চিত্ত দেখা পাবে চিদানন্দ সাগর-বেলায়!

ভক্তমিলন-তীর্থ বাগবাজার

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাগবাজারে ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটে (বর্তমানে ৭ নম্বর গিরিশ এভিনিউ) বলরাম মন্দির। এই প্রাচীন ধরনের বাড়ীটি আজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-অনুরাগীদের নিকট পরম তীর্থস্থান। বাড়ীটির প্রতিটি স্থান, প্রতিটি ইট শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শুভাগমন হয়েছিল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চে। শুধু একবার নন, দুবার নন—প্রায় 'একশো বার' গিয়েছিলেন তিনি বলরাম মন্দিরে।[২০] ভক্তসঙ্গে লীলাখেলা খেলে ক্ষান্ত হননি শ্রীরামকৃষ্ণ। বলরামের বাড়ীতেই তিনি রাত্রিবাস করেছেন, গ্রহণ করেছেন 'শুদ্ধ অন্ন'। কারণ, তাঁদের বাড়ীতেই ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর নিত্য সেবা ছিল। বলতেন তিনি, "বলরামের শুদ্ধ অন্ন—ওদের পুরুষানুক্রমে ঠাকুর-সেবা ও অতিথি-ফকিরের সেবা—ওর বাপ সব ত্যাগ করে শ্রীবৃন্দাবনে বসে হরিনাম কচ্চে—ওর অন্ন আমি খুব খেতে পারি, মুখে দিলেই যেন আপনা হতে নেমে যায়।"[২১] শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবস্থায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের নগর-সংকীর্তনদর্শনে দেখেছিলেন বলরামকে—'ভক্তি-জ্যোতিঃপূর্ণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল' মুখমণ্ডল। কেশব সেনের সংবাদপত্র 'সুলভ সমাচার' থেকেই বলরাম জানতে পেরেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের কথা। দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনে বলরামকে দেখামাত্র চিনতে পেরেছিলেন তাঁরই ভাবাবস্থায় দৃষ্ট সেই লোক। বলরাম তাঁর রসদ্দার না হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাধিকার যেরূপ পেয়েছিলেন, তা সত্যই অদ্ভুত। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, "বলরামবাবু যেদিন হইতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন, সেইদিন হইতে ঠাকুরের অদর্শন-দিন পর্যন্ত ঠাকুরের নিজের যাহা কিছু আহার্যের প্রয়োজন হইত, প্রায় সে সমস্তই যোগাইতেন—চাল, মিছরি, সুজি, সাগু, বার্লি, ভার্মিসেলি, টেপিওকা ইত্যাদি···।"[২২] 'বিশেষ অধিকার' নিয়েই বলরামের শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় আবির্ভাব। "কত লোকই যে এখানে ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুর কখন কখন রহস্য করিয়া 'মা কালীর কেল্লা' বলিয়া নির্দেশ করিতেন, কলিকাতার বসুপাড়ার এই বাটীকে তাঁহার দ্বিতীয় কেল্লা বলিয়া নির্দেশ করিলে হইবে না। ঠাকুর বলিতেন, 'বলরামের পরিবার সব এক সুরে বাঁধা'—কর্তা গিন্নী হইতে বাটীর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি পর্যন্ত সকলেই ঠাকুরের ভক্ত, ভগবানের নাম না করিয়া জলগ্রহণ করে না এবং পূজা, পাঠ, সাধুসেবা, সদ্বিষয়ে দান প্রভৃতিতে সকলেরই সমান অনুরাগ।···সকলেই একজাতীয় লোক!···কাজেই এই পরিবারবর্গই যে ঠাকুরের দ্বিতীয় কেল্লাস্বরূপ হইবে এবং এখানে আসিয়া যে ঠাকুর বিশেষ আনন্দ পাইবেন ইহা বিচিত্র নহে।"[২৩]—লিখেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার।

শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার শ্রীম বলরাম মন্দিরের

---

২০ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় (১৩৮৩), পৃঃ ৮২ [এর পর থেকে 'লাটু মহারাজ']

২১ লীলাপ্রসঙ্গ (২য়), গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৭৯

২২ ঐ, পৃঃ ২৮১

২৩ ঐ, পৃঃ ২৮৩-৮৪

চিত্র এঁকেছেন—"ধন্য বলরাম! তোমারই আলয় আজ ঠাকুরের প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়াছে। কত নূতন নূতন ভক্তকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমডোরে বাঁধিলেন, ভক্তসঙ্গে কত নাচিলেন, গাইলেন। যেন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসমন্দিরে প্রেমের হাট বসাচ্ছেন!

"দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটীতে ব'সে ব'সে কাঁদেন, নিজের অন্তরঙ্গ দেখিবেন বলে ব্যাকুল! রাত্রে ঘুম নাই। মাকে বলেন, 'মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা ওকে এখানে এনে দাও; যদি সে না আসতে পারে, তা হ'লে মা আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আসি।' তাই বলরামের বাড়ি ছুটে ছুটে আসেন। লোকের কাছে কেবল বলেন, বলরামের ৺জগন্নাথের সেবা আছে, খুব শুদ্ধ অন্ন। যখন আসেন অমনি নিমন্ত্রণ করিতে বলরামকে পাঠান। বলেন, 'যাও—নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখালকে নিমন্ত্রণ করে এসো। এদের খাওয়ালে নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে, এদের খাওয়ালে তোমার খুব ভাল হবে।'

"বলরামের আলয়েই শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষের সঙ্গে বসে প্রথম আলাপ। এইখানেই রথের সময় কীর্তনানন্দ। এইখানেই কতবার 'প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা' হইয়াছে।"[২৪]

বলরাম মন্দিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ: বলরাম বসুর পূর্বপুরুষ বীরেশ্বর বসুর বাস ছিল হুগলী জেলার আঁটপুরের কাছে তড়া গ্রামে। তাঁর চারপুত্রের মধ্যম দয়ারাম হাওড়া জেলার বালিগ্রামে এসে সপরিবারে বাস করতে আরম্ভ করেন। এঁর কনিষ্ঠপুত্র হুগলীর দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু ছিলেন স্বনামধন্য দানশীল। কলকাতার হাটখোলার দত্তবাবুদের বাড়ীতে কৃষ্ণরাম সামান্য কাজ থেকে তাঁদের ব্যবসার অংশীদার হন। নানান কারণে দত্তবাবুদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। অপরদের সাহায্য নিয়ে লবণের ব্যবসাতে অনেক অর্থ উপার্জন করেন কৃষ্ণরাম। স্বীয় অধ্যবসায় ও ও কার্যদক্ষতাগুণে তিনি কলকাতার সম্মানিত ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলে পরিগণিত হন। ইংরেজ সরকার তাঁকে হুগলীর দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন, যদিও তিনি বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না। এই কৃষ্ণরাম বসু ১১৭৮ সনে (১৬৯৩ শকাব্দে) বালি থেকে সপরিবারে চলে আসেন কলকাতায় শ্যামবাজারে স্বনির্মিত বাড়ীতে। আজও শ্যামবাজারের নিকট কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট তাঁর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে। কৃষ্ণরাম বহু জায়গায় মন্দির নির্মাণ, অনেক রাস্তা তৈরী, অজস্র পুষ্করিণী খনন, ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করেন। দানধ্যানে তিনি চিরস্মরণীয়। কৃষ্ণরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনগোপালের অবিমৃষ্যকারিতায় শ্যামবাজারের পৈত্রিক বাড়ীসহ অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র গুরুপ্রসাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরজীকে বৃন্দাবনে সদ্যনির্মিত এক কুঞ্জে স্থানান্তরিত করা হল। এই শ্যামসুন্দরজীর নামানুসারেই আজকের শ্যামবাজারের উৎপত্তি। এই কুঞ্জ কালাবাবুর কুঞ্জ নামে বৃন্দাবনে বিশেষ পরিচিত—যেটি শ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক শিষ্যদের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যস্থান। গুরুপ্রসাদের পাঁচপুত্রের কেউ কালাবাবুর কুঞ্জে বসবাস করতেন, কেউ বা দেখাশুনা করতেন উড়িষ্যার জমিদারী। গুরুপ্রসাদের কনিষ্ঠপুত্র রাধামোহন বৃন্দাবনেই কাল কাটাতেন। আর তাঁর অপর এক পুত্র বিন্দুমাধবের ছিল তিনপুত্র—নিমাইচরণ, হরিবল্লভ ও অচ্যুতানন্দ। রাধামোহনেরও তিন-পুত্র—জগন্নাথ, বলরাম ও সাধুপ্রসাদ। হরিবল্লভ ছিলেন কটকের সরকারী উকিল। বলরামের উপর ভার ছিল উড়িষ্যার জমিদারী। এই হরিবল্লভই বর্তমান ৫৭ নং রামকান্ত বসু স্ট্রীটের সুবৃহৎ

---

২৪ কথামৃত, ১।১৪।১

বাড়ীটি ক্রয় করেন বাগবাজারের দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে—যা বর্তমানে ভক্ত-মণ্ডলী-অনুরাগীদের কাছে 'বলরাম মন্দির'।[২৫]

উল্লিখিত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে থিওসফিস্ট ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেছিলেন তিনি। 'সতী কি কলঙ্কিনী', 'আদর্শ সতী' প্রভৃতি নাটকের লেখক। থিওসফিস্টদের উপর আস্থা হারাবার পর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত আরম্ভ করেন। তাঁর দেবদুর্লভ কণ্ঠে কমলাকান্তের শ্যামাবিষয়ক সংগীত শ্রবণের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথের উপর শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন খুব [২৬]

পিতার আদেশে ও ভ্রাতাদের অনুরোধে বলরামকে উড়িষ্যার জমিদারী ত্যাগ করতে হল। বাধ্য হয়ে সপরিবারে চলে আসতে হল বাগবাজারের এই বাড়ীতে। পুরীর ৺জগন্নাথের নিত্যদর্শনে বঞ্চিত পরমবৈষ্ণব বলরাম পুনরায় উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তন করলেও ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ করে কলকাতাতেই রয়ে গেলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন ৺শ্রীজগন্নাথের বিগ্রহ। ব্যবস্থাদি করলেন নিত্য ভোগরাগ ও সেবা-পূজা।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বলরামের যোগসূত্র রচনা করেন বসু পরিবারেরই পুরোহিতবংশীয় জনৈক রামদয়াল, যদিও 'সুলভ সমাচার'-এর শ্রীরামকৃষ্ণ-সংবাদ বলরামের কর্ণগোচর ছিল। রামদয়ালের পত্রাঘাতে বলরাম কলকাতায় এসে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। তারপর থেকেই সপরিবার বলরাম শ্রীরামকৃষ্ণের 'আপনজন', তাঁর বাড়ী 'দ্বিতীয় কেল্লা'—ভক্তদের 'বলরাম মন্দির'।

বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আগমন একশত বার হলেও কথামৃতে বর্ণনা পাই মাত্র ষোল বার—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে দুবার—১১ মার্চ ও ১৫ নভেম্বর; ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে চারবার—৭ এপ্রিল, ২ ও ২৫ জুন এবং ১৮ অগস্ট; ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র একবার ৩ জুলাই; সবশেষে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নয়বার—১১ মার্চ, ৬, ১২ ও ২৫ এপ্রিল; ৯ মে এবং ১৩, ১৪, ১৫ ও ২৮ জুলাই।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে গলরোগে আক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণের সুচিকিৎসার জন্য ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে কলকাতায় আনবার ব্যবস্থা করলেন। সেই উদ্দেশ্যে বাগবাজারের রাজার ঘাটের পূর্ব গলির ভিতর দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটের একটি ছোট্ট বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। "কিন্তু ভাগীরথীতীরে কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে থাকিতে অভ্যস্ত ঠাকুর ঐ স্বল্পপরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ঐ স্থানে বাস করিতে পারিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে রামকান্ত বসুর স্ট্রীটে বলরাম বসুর ভবনে চলিয়া আসিলেন। বলরাম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং মনোমত বাটী যতদিন না পাওয়া যায়, ততদিন তাঁহার নিকটে থাকিতে অনুরোধ করায় তিনি ঐ-স্থানে থাকিয়া যাইলেন।"[২৭] এই সুযোগে সাতদিন তিনি বলরাম মন্দিরে ছিলেন।[২৮] এই সাতদিনের অর্থাৎ ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত বলরাম মন্দিরের ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়েছে "বিশ্ববাণী" পত্রিকাতে।[২৯] এই সাতদিনের তারিখ ধরলে বলরাম মন্দিরের মোট

২৫ প্রেমানন্দ জীবন-চরিত—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ (১৩৫৭), পৃঃ ৬-১২
২৬ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ২৭-২৯
২৭ লীলাপ্রসঙ্গ (২য়), দিব্যভাব, পৃঃ ২৯৫-৯৬
২৮ লাটু মহারাজ, পৃঃ ১৮২
২৯ বিশ্ববাণী—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক প্রকাশিত, শ্রাবণ, ১৩৮৮ থেকে পৌষ, ১৩৮৮

বিবরণের সংখ্যা দাঁড়ায় তেইশ।

এই দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাস করা হয়নি—পদধূলি দিয়েই ফিরে এসেছেন। লীলাপ্রসঙ্গকারের উপরোক্ত মন্তব্য ছাড়া সেবক লাটু মহারাজ ঐ বাড়ীটি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন—"এত ছোট ঘর, এখানে থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে! তোমরা বাপু! অন্য বাড়ী দেখ।"[৩০] আরো বলেছিলেন, "আমাকে কি এরা গঙ্গাযাত্রা করিয়েছে? এ বাটীতে আমি থাকিতে পারিব না।"[৩১]

বলরাম মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তদের মিলন-স্থান। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভক্তেরা এখানেই ছুটে আসতেন তাঁর অমৃতবাণীরূপ বারিতে তৃষিত হৃদয় জুড়াতে,—তাঁর সুমধুর কণ্ঠে অপূর্ব সংগীত লহরী শ্রবণ করতে। তিনি বিশেষ করে ডেকে পাঠাতেন শুদ্ধসত্ত্ব ছোকরা ভক্তদের। এইভাবে তাঁর পুণ্যসঙ্গসুখ লাভ করেছিলেন নরেন, রাখাল, রাম, মনোমোহন, নিত্যগোপাল, শ্রীম, কালীকৃষ্ণ, ক্ষীরোদ, পল্টু, লাটু, তারাপদ, নারায়ণ, ভবনাথ, বিনোদ, দ্বিজ, হরি, গঙ্গাধর, গিরিশ, অতুল, অমৃত, তেজচন্দ্র, পূর্ণ, ছোট নরেন, সারদা, ত্রৈলোক্য, মহেন্দ্র প্রভৃতি জানা-অজানা অগণিত ভক্তেরা। শ্রীম তাঁর কালজয়ী অমর গ্রন্থ 'কথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্যসুধা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩২] শ্রীরামকৃষ্ণলীলাসহচর অন্যতম পার্ষদ স্বামী সারদানন্দজীও তাঁর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাপূর্ণ লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন। এগুলির পুনরাবৃত্তি না করে এই আনন্দের হাটে যাঁরা উপস্থিত থেকেছেন, তাঁদেরই কয়েকজনের লেখনীগাথা উপস্থাপিত হচ্ছে এখানে।

অখণ্ডানন্দজী বলরাম মন্দিরে একদিনের নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করেছেন—"আর একদিন সকালে ঠাকুর বলরাম বাবুর বাড়ি এসেছেন। উপরে উঠতেই ডানহাতি পশ্চিমদিকে যে ছোট ঘরটি তাতে বসেছেন। আরও কয়েকজন ছিলেন। আমি প্রণাম ক'রে তাঁর পাশেই গিয়ে বসলাম।

"ঠাকুরের অবস্থা সেদিন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীন। দু-চারটি কথা কন আর ভাবস্থ হয়ে যান। ঐ অবস্থায় তিনি রামলালার কথা তুললেন। কেমন ক'রে রামলালাকে স্নান করাতেন, রামলালা কেমন দুরন্তপনা করত ইত্যাদি রামলালার লীলাবৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। একদিন খই খাওয়াতে গিয়ে একটা ধান রামলালার মুখে লেগে যায়। 'যে মুখে মা কৌশল্যা কত ক্ষীর সর ননী দিতেও সঙ্কোচ বোধ করতেন, আজ আমি সেই মুখে ধান দিলাম!' এই বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং ভাবস্থ হয়ে গেলেন। যখন হুঁস হল, আবার সেই রামলালার কথা। আর কত আখর দিয়ে তাঁর সেই প্রাণ-মাতান মন-মাতান কণ্ঠে রামলালার গুণগান করতে লাগলেন।

"এইরূপে বহুক্ষণ রামলালার ভাবে কেটে গেল। পরে ভাবমুখে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকবার পরই মার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন,

মা, তোমাকে আমি মন প্রাণ দিব কি?

তুমিই যে মনোময়ী, তুমিই যে প্রাণময়ী।

এইরূপ মায়ের সঙ্গে কত কথাই না বললেন। আমার কি আর সে সব কথা মনে আছে যে লিখে সকলকে জানাব?

"এই ভাব কেটে যাবার পর ডান হাত মুটো করে সামনে ধরে অর্ধনিমীলিতনেত্রে ভাবমুখে

৩০ লাটু মহারাজ, পৃঃ ১৮২ ৩১ জীবন বৃত্তান্ত, পৃঃ ১৬৫

৩২ কথামৃতে বলরাম মন্দিরের বিবরণ—১।১৪।১-৩, ২।২৪।১-২, ৩।১৩।১, ৩।১৪।১-৭, ৩।১৫।১-৪, ৩।১৮।১, ৩।১৯।৩, ৪।১৫।১-৫, ৪।২৩।১-৯, ৪।৩।১, ৫।১।১, ৫।২।২, ৫।৬।১, ৫।৭।৩, ৫।৭।৪

নিজে নিজেই বলতে লাগলেন, 'থু থু, কামিনী-কাঞ্চনে যাদের মন আসক্ত তাদের তো কিছু হবে না মা'—এই বলে কতবার যে নিজের হাতে থুতু ফেলতে লাগলেন। তাতে জাজিম পর্যন্ত ভিজে গেল।

"সেদিন ঠাকুরের যে অদ্ভুত ভাব দেখেছিলাম তা চিরজীবনের অবলম্বন হয়ে রয়েছে। আমার মতো যাঁরা তখন সেখানে ছিলেন, তাঁদেরও তাই।"৩৩

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথায় বলরাম মন্দিরের চিত্র—"সেখানে লাটু রাখাল মহারাজকে ভাবাবেশে প্রথম নৃত্য করিতে দেখেন।...সেখানে অবধূত নিত্যগোপালকে ভাবে মাতোয়ারা হইয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি দেখিতে পান এবং এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাহার (নিত্য-গোপালের) চৈতন্য সম্পাদন করেন।...সেখানে নরেন্দ্রনাথের গান শুনিয়া ঠাকুরকে সর্বপ্রথম অশ্রু-বিসর্জন করিতে দেখেন।...সেখানে একজন তান্ত্রিক ভক্তের সহিত কথা-প্রসঙ্গে শুনিয়াছিলেন—'হাবাতেগুলোর বিশ্বাস হয় না, সর্বদাই সংশয়। শিষ্য হোতে গেলে গুরুর উপর সংশয় রাখতে পারবে না—তা সে যেমন গুরুই হোক না কেন? ...কলিকালে তান্ত্রিক ক্রিয়া বড় কঠিন, যে-সে লোক ওসব সাধনা পারে না। তন্ত্রের ধর্ম বীরের ধর্ম, সংযমীর ধর্ম। যারা শুদ্ধসত্ত্ব কেবল তারাই তন্ত্রের কাজে (অর্থাৎ ক্রিয়াকাণ্ডে) বা সাধনায় সিদ্ধ হয়।'...সেখানে গিরিশবাবুকে তিনি প্রথম দেখিয়াছিলেন। তুলসী (নির্মলানন্দ) মহারাজের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ বলরাম মন্দিরে হইয়াছিল। সেখানে ছোট নরেন, হরিনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিতেন।"৩৪

এই প্রসঙ্গে থাকছে বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব ছন্দ ভঙ্গিমায় নৃত্য-গীতের বিবরণ। যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণ হয়েছে, সেখানেই বসেছে গানের আসর। নিজে গান গেয়ে যেমন মোহিত করেছেন সকলকে, তেমনি গান শুনেছেন নরেন, ত্রৈলোক্য প্রভৃতি ভক্তদের এবং বহু কীর্তনীয়ার কাছ থেকে। গান শুনে তাঁর ভাব-সমাধি-মূর্তি ভক্তেরা দর্শন করেছেন বহুবার। বলরাম মন্দিরে এরূপ এক গানের আসরে "কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ ধ্যানস্থ, কারও পুলক। অদ্ভুত ব্যাপার।" "যারা এসেছিল তামাসা দেখতে তারা নীচে নামবার সময় বলতে লাগল, 'বাঃ! কি মা নাম করে রে পরমহংস! একেবারে বুকের মধ্যে কড় কড় করে কেটে ঢুকে যায়।'"৩৫ গান-বাজনা নিয়ে বলরামের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের সরস মন্তব্য—"বাজনা নেই। ভাল বাজনা থাকলে গান খুব জমে। (সহাস্যে) বলরামের আয়োজন কি জান,—বামুনের গোড্ডি (গরুটি) খাবে কম,—দুধ দেবে হুড় হুড় ক'রে! (সকলের হাস্য)। বলরামের ভাব,—আপনারা গাও আপনারা বাজাও! (সকলের হাস্য)।"৩৬ "ওরে নাচ, গা, তবে তো বলরাম মালপো দেবে।"৩৭ বলরামকে নিয়ে তিনি এরূপ আমোদ করতেন তাঁর কৃপণতার জন্য। কিন্তু ভক্তের অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ের কথাও জানতেন। তিনি শুধুমাত্র আমোদই করতেন। আর এই অনাবিল রসিকতায় বলরামের প্রতি প্রকাশ পেত তাঁর সমধিক প্রীতি। যেন আপনার স্নেহপাত্রের দোষগুণ নিয়ে আহ্লাদ প্রকাশ মাত্র।

বলরাম মন্দিরে আমাদের প্রাপ্ত মিলনোৎসব-গুলিতে গীত গানের সংখ্যা ষাট। তার মধ্যে নরেন্দ্রনাথের গাওয়া গান সবচেয়ে বেশী—চব্বিশ। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং গান গেয়েছেন উনিশটি। বাকী

৩৩ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ৩৯-৪০ ৩৪ লাটু মহারাজ, পৃঃ ৮৫ ৩৫ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ৩৮
৩৬ কথামৃত, ৩।১৪।৫ ৩৭ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ৩৮-৩৯

গায়কদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের সুকণ্ঠ গায়ক ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা নামে খ্যাত) ছয়টি, কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণ পাঁচটি, ভক্ত তারাপদ তিনটি, ভবনাথ এবং গিরিশ-পূর্ণ-দানাকালীর মিলিত কণ্ঠে একটি করে। কে কোন্ গান শুনিয়েছেন, সে সম্বন্ধে একটু পরিচয় দিলে মন্দ হয় না। তবে শুধুমাত্র গানের প্রথম কলির উল্লেখ থাকছে। শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া গানগুলি—(১) যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে, (২) গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কোরো না, (৩) শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা, (৪) আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি, (৫) যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, তারা তারা দু ভাই এসেছে রে, (৬) নদে টলমল টলমল করে, গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে, (৭) হলাম যার জন্য পাগল, তারে কই পেলাম সই, (৮) আমার গৌর নাচে, (৯) কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন, (১০) দেখে এলাম এক নবীন রাখাল, (১১) এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছ কি কুহক করে, (১২) পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী, (১৩) যশোদা নাচাতো শ্যামা বলে নীলমণি, (১৪) গৌর-নিতাই তোমরা দু' ভাই পরম দয়াল হে প্রভু, (১৫) কে হরি বোল হরি বোল বলিয়ে যায়, (১৬) ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে তবে, (৩), (৫) ও (৬) নম্বর গানগুলি ২ বার করে গাওয়া হয়েছে—সেই হিসাবে উনিশ।

নরেন্দ্রনাথের গান—(১) কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার, (২) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি, (৩) এসো এসো মা, হৃদয় রমা, পরাণ-পুতলি গো, (৪) মা ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণ ধারা পরাৎপরা, (৫) তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, (৬) কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিণি, (৭) কভু কমলে কমলে থাকো মা পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী, (৮) পরবত পাথার, (৯) সুন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে, (১০) বিপদভয় বারণ, যে করে ওরে মন, তাঁরে কেন ডাক না, (১১) দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে, (১২) হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে, (১৩) চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন, (১৪) চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার, (১৫) গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে, (১৬) সেই এক পুরাতন, পুরুষ নিরঞ্জন, চিত্তে সমাধান কর রে, (১৭) এস মা এস মা, ও হৃদয়-রমা, পরাণ-পুতলী গো, (১৮) আমার প্রাণপিঞ্জরে পাখি, গাও না রে, (১৯) বিশ্বভুবনরঞ্জন ব্রহ্ম পরম জ্যোতি, (২০) ওহে রাজরাজেশ্বর, দেখা দাও, (২১) চিদাকাশে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় হে। নরেন্দ্রনাথও তিনটি গান দুবার করে গেয়েছেন—সেগুলি হল—(২), (১২) ও (১৫) নম্বরের।

ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল—(১) কত ভালবাসা গো মা মানব সন্তানে, (২) মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল, (৩) জয় শচী নন্দন, (৪) দে মা পাগল করে, আর কাজ নেই জ্ঞান বিচারে, (৫) কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে। ত্রৈলোক্য 'জয় শচী নন্দন' গানটি দুবার গেয়েছেন। বৈষ্ণব-চরণ—(১) দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার, (২) হরি হরি বল রে বীণে, (৩) বিফলে দিন যায় রে বীণে, শ্রীহরির সাধন বিনে, (৪) শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর তপত কাঞ্চন কায়, (৫) চিনিব কেমনে হে তোমায় (হরি)। তারাপদ—(১) কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জকাননচারী, (২) কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়, (৩) কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে প্রাণ। ভবনাথ—(১) দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী। গিরিশ-পূর্ণ-দানাকালী—(১) আমায় ধর নিতাই।/আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে, বলরাম মন্দিরে

৺শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর নিত্য সেবা-পূজা আছে। প্রতিবছর শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে রথোৎসব সাড়ম্বরে পালিত হত। তিনি স্বয়ং রথের রশ্মি ধরে টান দিয়ে উৎসবের সূচনা করতেন। সেইসঙ্গে কীর্তন ও নৃত্য। এখনও বলরাম মন্দিরে রথোৎসব সাধু-ভক্তবৃন্দ পালন করেন। তবে ৺শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু এখান থেকে উড়িষ্যায় বসু জমিদারীতে স্থানান্তরিত। বস্ত্র-কেতন দ্বারা সজ্জিত ছোট্ট রথে মাল্যভূষিত শ্রীবিগ্রহকে বাইরের বারান্দায় টানা হত। ভক্তগণসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভাবোন্মত্ত আনন্দের হাটের পরিচয় দিয়েছেন লীলাপ্রসঙ্গকার—"··সকলই ভক্তির ব্যাপার, বাহিরের আড়ম্বর কিছুই নাই। বাড়ী সাজান, বাদ্যভাণ্ড, বাজে লোকের হুড়াহুড়ি, গোলমাল, দৌড়াদৌড়ি—এ সবের কিছুই নাই। ছোট একখানি রথ, বাহির বাটীর দোতলার চকমিলান বারাণ্ডায় চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টানা হইত—একদল কীর্তনীয়া আসিত, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন করিত, আর ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণ ঐ কীর্তনে যোগদান করিতেন। কিন্তু সে আনন্দ, সে ভগবদ্ভক্তির ছড়াছড়ি, সে মাতোয়ারা ভাব, ঠাকুরের সে মধুর নৃত্য—সে আর অন্যত্র কোথা পাওয়া যাইবে? সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ ৺জগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে এবং শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে আবির্ভূত—সে অপূর্ব দর্শন আর কোথায় মিলিবে? সে বিশুদ্ধ প্রেমস্রোতে পড়িলে পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া নয়নাশ্রুরূপে বাহির হইত—ভক্তের আর কি কথা! এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কীর্তনের পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ দেওয়া হইত এবং ঠাকুরের সেবা হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ পাইতেন।"[৩৮]

স্বামী অভেদানন্দজীর রথোৎসবের স্মৃতি—"সেই আনন্দোৎসবের আনন্দস্মৃতি আজিও আমার হৃদয়পটে চিরস্মরণীয়ভাবে অঙ্কিত হইয়া আছে।"[৩৯]

ভক্তেরা প্রসাদধারণ করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণের পর। বলরাম মন্দিরের উৎসবে প্রসাদ-ধারণের একটি নমুনা: পুঁথিকারের ভাষায়—

"বারাণ্ডায় পাতা পাতা ভাঁড় খুরি ধারে।
বসাইলা ভক্তবর্গে পীরিতের ভরে॥
আয়োজনে ত্রুটি নাই লুচি তরকারি।
সুঘন ছোলার ডাল ভাজি রকমারি॥
পাঁপড় মোহনভোগ গজা মালপুয়া।
বড় বড় রসগোল্লা লাল পানতুয়া॥
রসের চাটনি মিঠা কিশমিশে করা।
দধি ক্ষীর পরিপূর্ণ কটরা কটরা॥
রসনায় তৃপ্তিকর মনের মতন।
নানা দ্রব্যে কৈলা বসু প্রসাদ বণ্টন॥"[৪০]

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন চিকিৎসার জন্য বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়ী ছেড়ে বলরাম মন্দিরে অবস্থান করছিলেন, তখন এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। যখন-তখন দলে দলে পরিচিত-অপরিচিত বহু লোক, যাঁরা দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দর্শন করতে অক্ষম, তাঁরা তাঁর দর্শন-মানসে বলরাম মন্দিরে উপস্থিত হতে লাগলেন। বলরাম মন্দির পরিণত হল উৎসবক্ষেত্রে। ডাক্তারদের ও ভক্তদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সঙ্গে ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হতেন। "প্রাতঃকাল হইতে ভোজনকাল পর্যন্ত এবং ভোজনান্তে ঘণ্টা দুই আন্দাজ বিশ্রামের পরেই রাত্রির আহার ও শয়নকাল পর্যন্ত প্রতিদিন তিনি ঐ সপ্তাহকাল মধ্যে বহুলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল প্রশ্নসকল সমাধান করিয়া দিয়াছেন, নানাভাবে ঈশ্বরীয় কথার আলোচনায় বহু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন এবং ভজনসঙ্গীতাদি শ্রবণে গভীর সমাধিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু পিপাসুর প্রাণ শান্তি ও আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও উচ্ছলিত করিয়াছিলেন।"[৪১]　[ক্রমশঃ]

৩৮　লীলাপ্রসঙ্গ (২য়)—গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৮৪-৮৫
৩৯　আমার জীবন কথা—স্বামী অভেদানন্দ (১৯৭৩), পৃঃ ৩৬
৪০　পুঁথি, পৃঃ ৫৭৫　৪১　লীলাপ্রসঙ্গ (২য়), দিব্য ভাব, পৃঃ ২৯১

বন্ধন ও মুক্তি

(অষ্টাবক্র সংহিতা হইতে)*

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

চিত্ত যখন চাহিছে কিছু কিংবা হয়েছে শোক-বিধুর
ত্যাগ বা গ্রহণে লিপ্ত অথবা, পুলক-বিভোল ক্রোধে আতুর—
তখনি জানিও বন্ধন-ভর
তোমার পিছনে অগ্রসর।
মুক্তি তাহাই যখন চিত্ত চাহে না কিছুই করে না ক্ষোভ
ছাড়ে না কিছুই ধরেও না কিছু হর্ষে নাচে না নাহিকো কোপ।
ইন্দ্রিয়-বিষয়ে কোনও অনুরাগী চিত্ত যদি হয়
তাহারেই জানিও বন্ধন।
সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানে মন যদি অনাসক্ত রয়
তাহাই তো কাম্য মোক্ষধন।

---

*তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্ণাতি কিঞ্চিদ্ হৃষ্যতি কুপ্যতি॥ ৮।১
তদা মুক্তির্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥ ৮।২
তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তমসক্তং সর্বদৃষ্টিষু॥ ৮।৩

বুদ্ধ-প্রণাম ও সঙ্ঘাশ্রয়

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

কত বর্ষ কত যুগ পার হল সে যে কতকাল
এসেছিলে রাজার দুলাল :
দিকে দিকে প্রাসাদের পুঞ্জ পুঞ্জ ঐশ্বর্যের মত্ত আয়োজন
রূপসীবৃন্দের ঘটা লোভক্লিপ্ত বিলাস-কানন,
পদতলে নতশির সাম্রাজ্য-সম্পদ,
অন্তঃপুরে প্রেয়সীর প্রস্ফুটিত প্রণয়ের যৌবন-সম্পদ,
মৃত্তিকার যত না বৈভব
কী না ছিল তব,—

তবু চিত্ত ভিক্ষু সম কী ক্ষুধায় কোন্ সুধা লাগি
হল যে বিবাগী।

বিশ্বের দুঃসহ ব্যথা রোগশোক কামনার করুণ কল্লোল—
সুখের ভেলারে তব ছিন্নভিন্ন করি দিল সর্বনাশা দোল,
পিছনে রহিল পড়ি স্নেহমূর্তি পিতামাতা রূপ ও রমণী
প্রাণের প্রেয়সী পুত্র নয়নের মণি।
গভীর নিশীথে এক বিরহী রাজার পুত্র দীনভিক্ষুবেশে
তারার ইঙ্গিত চাহি আঁধার অম্বরে
মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে
বাহিরিলে মুক্তিস্নিগ্ধ শান্তির উদ্দেশে।
হে সন্ন্যাসী হে প্রেমিক রাজার কুমার,
লহ নমস্কার তুমি লহ নমস্কার।

আজ আরবার
জর্জরিত লজ্জিত এ ধরণীর মাঝে এসো তুমি প্রাণের কুমার,
সাথে আনি
অহিংসা মৈত্রীর মহাবাণী,
এসো তুমি বেদনা-সুন্দর,
মুক্তিহীন শান্তিহীন নর
শক্তির তাণ্ডবনৃত্যে জঞ্জালেরে করিতেছে জড়ো
যত বিজ্ঞ আর যত মূঢ়,
হিংসার দশন-ঘাতে শতছিদ্র প্রাণের প্রতিমা,
মানুষের রক্তে রক্তে ধরণীতে লেখা হল কলঙ্ক-নিঃসীমা।
তুমি জাগো অমিতাভ, প্রেমের অমৃত করো দান
শক্তিরে শিবের বুকে দাও তুমি স্থান,—
মানবেরে বেঁধে দাও মৈত্রীর বন্ধনে,
ঝঙ্কারো শান্তির বাণী আর্তের ক্রন্দনে।
সব দ্বন্দ্ব যাক যাক থামি,
চিত্ত হতে অন্তহীন উঠুক প্রণামি'
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ধম্মং শরণং গচ্ছামি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতি ও তার কারণ

শ্রীসচ্চিদানন্দ কর

১

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের দেশ থেকে কেউ গেলে সেখানকার ঐশ্বর্য দেখে খুবই অবাক হয়ে যায়। সেখানকার একজন সাধারণ মজুর বা চাষীর ঘরে যে-সব আসবাবপত্র দেখা যায় এবং তারা যে মানের জীবন যাপন করে, তা আমাদের দেশের অনেক ধনীর বাড়িতেও দেখা যায় না। অবশ্য শুধু বাইরের ধন-দৌলত দিয়েই মানুষের জীবনের উৎকর্ষের পরিমাপ হয় না। কিন্তু আবার স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে দেখা যায় যে, অভুক্ত লোককে শুধু ধর্মশিক্ষা দিয়ে লাভ নেই—আগে তার দৈহিক প্রয়োজন মেটানো দরকার। তারপর তাকে ধর্ম ও অন্যান্য উচ্চতর আদর্শের সন্ধান দিতে হবে।

আমেরিকাবাসীদের এই ঐশ্বর্য আমরা অতি সহজেই মেনে নিই, কিন্তু এর কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা আছে যে কি করে তারা বৈষয়িক উন্নতির এত শিখরে এসেছে। হয়তো আমরা তার কিছুটা অনুসরণ করে আমাদের দেশকেও উন্নত করতে পারি। আমাদের এই দুই দেশের মধ্যে অনেক মিল আছে। দুই দেশই বড়—আয়তনে এবং লোকসংখ্যায়। দুই দেশেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু আছে এবং আমরা উভয়েই এককালে ইংরেজের শাসনাধীনে ছিলাম, যদিও যুক্তরাষ্ট্র আমাদের প্রায় পৌনে দুশ বৎসর আগে স্বাধীনতা লাভ করেছিল।

বর্তমান আমেরিকাকে বুঝতে হলে তার ইতিহাস পর্যালোচনা করা দরকার। এই বিরাট দেশটার অস্তিত্ব ৫০০ বৎসর আগেও তৎকালীন সভ্যজগতের কাছে অজানা ছিল। সবাই জানে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তিনি অবশ্য জলপথে ভারতবর্ষে আসবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু এসে নামলেন আমেরিকা মহাদেশের নিকটবর্তী একটি দ্বীপে। সেটা ছিল ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু তিনি ভাবলেন ভারতবর্ষে পৌঁছে গেছেন এবং সেই বিশ্বাসে ওখানকার অধিবাসীদের ইণ্ডিয়ান (Indian) আখ্যা দিলেন। সেই নামে আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা এখনও পরিচিত এবং যে দ্বীপপুঞ্জের সংলগ্ন একটি দ্বীপে তিনি অবতরণ করেছিলেন তাকে বলা হয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (West Indies) অর্থাৎ পশ্চিম ভারত।

অবশ্য কলম্বসের ভুল অচিরেই ধরা পড়েছিল। মাত্র কয়েক বৎসর পরে আমেরিগো ভেপুচি নামে আর একজন ইতালীয় নাবিক মূল দক্ষিণ আমেরিকার ভূখণ্ডে অবতরণ করেন এবং কিছুদিন এর তীর ধরে ঘোরাঘুরি করার পর সিদ্ধান্ত করেন যে, এটি এশিয় মহাদেশের অংশ নয়। একটি সম্পূর্ণ নতুন মহাদেশ। তারই নামের অনুকরণে এই নতুন মহাদেশের নাম হয় আমেরিকা। পরে যখন উত্তর এবং দক্ষিণে দুটি নতুন বিরাট ভূখণ্ডের অস্তিত্বের কথা জানা গেল তখন তাদের আলাদা করে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা নামে অভিহিত করা হল।

এই দুই ভূখণ্ড যদিও প্রাকৃতিক সম্পদে পৃথিবীর অন্যতম ধনী জায়গা, তবুও আগে এখানে মানুষের বসবাস খুব কম ছিল—অন্যান্য জায়গার তুলনাতেও যথেষ্ট কম ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তর এশিয়া থেকে মঙ্গোল জাতীয় লোকেরা বেরিং প্রণালী পার হয়ে উত্তর আমেরিকার

তুষার রাজ্য আলাস্কা হয়ে ক্রমে দক্ষিণ দিকে এগোতে থাকে। এস্কিমোরা এদেরই সগোত্র। ক্রমে তারা সমগ্র উত্তর আমেরিকা এবং পরে দক্ষিণ আমেরিকাতেও বসবাস আরম্ভ করে। অবশ্য কেউ কেউ এও মনে করেন যে, কিছু লোক হয়তো ভেলাতে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে সোজা পূর্ব এশিয়া থেকে দক্ষিণ আমেরিকাতে আসে।

যে ভাবেই আসুক, এটা নিঃসন্দেহ যে এই দুই মহাদেশের তুলনায় তারা সংখ্যায় খুবই কম ছিল। অর্থাৎ বলতে গেলে এই দুই বিরাট ভূখণ্ড প্রায় খালিই ছিল। সংখ্যায় কম হলেও কিন্তু এই প্রথম অধিবাসীরা কোন কোন বিষয়ে বেশ উৎকর্ষ লাভ করেছিল, বিশেষতঃ মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা ভূখণ্ডে। কৃষি, শিল্প এবং স্থাপত্যে এরা বেশ উন্নত ছিল—এদের তৈরি বড় বড় পিরামিড, পাথরের বাড়ি যাতে কোনরকম সংযোগকারী আস্তর ব্যবহার হয়নি, জলসেচের ব্যবস্থা, সোনার অলঙ্কার ইত্যাদি দেখলে সত্যই অবাক হতে হয়। আবার অন্যদিকে এরা চাকা লাগানো গাড়ির ব্যবহার জানত না অথবা এরা লেখার প্রচলন করেনি—এদের সব কিছু ইতিহাস বা সংস্কৃতি মুখে মুখে বংশপরম্পরায় চলে আসত।

উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা কিন্তু ততটা উন্নত ছিল না। এরা সাধারণতঃ শিকার করে এবং ফলমূল আহরণ করেই জীবন নির্বাহ করত—কৃষিকার্য এরা জানত না বললেই চলে—যা জানত তাও খুব আদিম প্রকৃতির। এরা গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই করলেও সাধারণতঃ শান্ত প্রকৃতির ছিল এবং প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে শান্ত নিরুপদ্রব জীবন যাপন করত।

এই অবস্থায় ষোল শতকের প্রথম দিকে এদের মধ্যে এসে পড়ল ইউরোপীয়রা। ইউরোপ তখন মধ্যযুগ থেকে সবে বর্তমান যুগে পদার্পণ করেছে। সারা মহাদেশে একটা নতুন চাঞ্চল্য, নতুন প্রাণবন্তার সাড়া এসেছে। যেমন কলাশিল্পে, বিশেষতঃ ইতালীতে নতুন জাগরণ (Renaissance), তেমনি বিজ্ঞানে, নতুন জ্ঞান আহরণে সর্বত্র বিরাট আগ্রহ এবং আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। সেই সঙ্গে এসেছে যুদ্ধবিদ্যায়, নৌ-বিদ্যায়, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। যুদ্ধে কামান এবং বন্দুকের ব্যবহার একটা বিপ্লব এনেছে, যার কাছে পুরানো দিনের তরোয়াল বা তীরধনুক একেবারেই অকেজো।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, সেই সময় ইউরোপের লোকেরা নতুন কিছু করা বা নতুন আবিষ্কারের আনন্দে মেতে উঠেছে। নৌবিদ্যায় কম্পাসের ব্যবহারের ফলে দূর সাগরে পাড়ি জমাবার সুবিধা হয়েছে এবিষয়ে পর্তুগীজেরা অগ্রগণ্য। তারা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আফ্রিকার কূল ধরে অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং অবশেষে ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার কূল পরিক্রমা করে, ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষের পশ্চিমকূলে এসে উপস্থিত হলেন। সেটা ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের মাত্র ছয় বৎসর পরে।

নতুন নতুন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করার কাজেও পর্তুগীজরা অগ্রগণ্য। অবশ্য তখন এগুলি করা হত সাধারণতঃ ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য। সেই সময় ইউরোপে বণিক মতবাদ অর্থাৎ "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" এ ধারণা খুব প্রাধান্য লাভ করেছে। তখনকার দিনে সেরা বাণিজ্য ছিল ভারতের সঙ্গে। মধ্যপ্রাচ্য এবং পূর্ব ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্য স্থাপনের পর স্থলপথে এ বাণিজ্যে খুব সুবিধা হচ্ছিল না বলেই জলপথের সন্ধান এবং তাই করতে গিয়ে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার এবং ভাস্কো-ডা-গামার আফ্রিকা পরিক্রমা করে জলপথে ভারতে আবির্ভাব।

যাই হোক প্রথম প্রথম বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনা উদ্দেশ্য হলেও ক্রমে অন্যান্য কারণেও এই উপনিবেশগুলি ধীরে ধীরে বড় হতে আরম্ভ করে, বিশেষতঃ নতুন মহাদেশ আমেরিকাতে। কারণ বিভিন্ন: প্রথম, ইউরোপে তখন সাধারণ মানুষের খুব দুরবস্থা, উপরতলার লোকদের চাপে এবং দাপটে তারা খুবই ক্লিষ্ট। সুতরাং নতুন মহাদেশে গিয়ে নতুন জীবন, নতুন সুযোগের সন্ধান করার আকর্ষণ যথেষ্ট। দ্বিতীয়তঃ, তখন ইউরোপে ধর্ম নিয়ে খুবই মারামারি এবং অত্যাচার চলত। এটা অবশ্য খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই হত। যীশুখ্রীষ্ট শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করলেও তাঁর অনুগামীরা সেটা খুব মানতেন না, এমন কি নিজেদের মধ্যেও নয়। এদের দুই সম্প্রদায় ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে তখন খুব বিবাদ এবং সুযোগ পেলেই তারা পরস্পরের গলা কাটত। এই ধর্মীয় অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতেও অনেকে নতুন দেশে যেতেন এই বিশ্বাসে যে, সেখানে তাঁরা অবাধে নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম আচরণ করতে পারবেন। আর যেত অন্য এক শ্রেণীর লোক—নিজের দেশের আইনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। অবশ্য এরা সবাই যে নিকৃষ্ট অপরাধী ছিলেন, তা নয়। তখনকার দিনে লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হত। যেমন সামান্য চুরির অপরাধে প্রাণদণ্ড, অনেক সময় শাসকগোষ্ঠীর কারুর কুনজরে পড়লে বিনা বিচারেও মানুষকে (যেমন ফ্রান্সে) সারাজীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হত। অনেক সময় এই সব অপরাধী অথবা কারাবাসীদের দলে দলে ক্রীতদাস হিসেবে দূরের উপনিবেশগুলিতে চালান দেওয়া হত ওখানকার ক্ষেত-খামারে কাজ করার জন্য। তখন ঐ সব উপনিবেশগুলিতে কাজ করার লোকের খুব অভাব ছিল বলেই এই ব্যবস্থা। অবশ্য পরে আফ্রিকা থেকে দলে দলে ক্রীতদাস আমদানী করে এই সব উপনিবেশগুলিতে বিক্রী এবং কাজে লাগানো হতে থাকে এবং ইউরোপ থেকে ক্রীতদাস আনা বন্ধ হয়ে যায়।

ইউরোপের বাইরে উপনিবেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল উত্তর আমেরিকার মধ্য অঞ্চল যা এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ওখানকার আবহাওয়া ইউরোপের সমতুল্য। তদুপরি চাষের জমি খুব উর্বর এবং প্রায় সারা বৎসর অল্পবিস্তর বৃষ্টি অথবা বরফ পড়ে যাতে চাষের কাজে খুব সুবিধা। এ অঞ্চলে প্রথম উপনিবেশ হয় ভার্জিনিয়াতে (Virginia) ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং তার পার্শ্বে মেরীল্যাণ্ডে (Maryland)। এর কিছু পরে উত্তরে নিউ ইংল্যাণ্ডে উপনিবেশগুলি স্থাপিত হয়। সেখানে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে একদল যাত্রী মে-ফ্লাউয়ার (Mayflower) নামে জাহাজে করে বর্তমান প্লীমাথ শহরের নিকটবর্তী জায়গায় এসে নামে। এদের বলা হয় তীর্থযাত্রীর দল (Pilgrim fathers)। এরা আসে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের আশায়, অর্থাৎ যাতে এরা নতুন দেশে নতুন উপনিবেশ স্থাপন করে নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী খ্রীষ্টীয় ধর্ম আচরণ করতে পারে। এই আরম্ভ থেকে ধীরে ধীরে ওখানে অনেকগুলি উপনিবেশ স্থাপিত হয় যা এখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সাতটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

প্রথম প্রথম আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা এই নতুন আগন্তুকদের বেশ ভালভাবেই গ্রহণ করে এবং তাদের সহজ সরল আতিথেয়তার দ্বারা এদের অভ্যর্থনা করে। এমন কি নিউ ইংল্যাণ্ডে নতুন উপনিবেশ স্থাপনকারীদের প্রথম বোনা ফসল কোন কারণে যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন তারা তাদের নিজেদের খাদ্য দিয়ে সাহায্য করে; পরে আবার ভাল ফসল হলে উপনিবেশকারীরা এবং আদিবাসীরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে

আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরকে তাঁর দয়ার জন্ত ধন্যবাদ দেয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইণ্ডিয়ানরা তাদের সরল বিশ্বাসের প্রতিদান পায়নি। বরং আগন্তুকরা যতই সংখ্যায় বাড়তে আরম্ভ করে, ততই তারা জোর করে এই সরল লোকদের জমি দখল করতে আরম্ভ করে। এর জন্ত তারা নানা কৌশল এবং বল প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেনি। আমেরিকানদের ইতিহাসে এই অধ্যায়টি সত্যই খুব শোচনীয় এবং বেদনাদায়ক। উপনিবেশকারীরা তাদের অপরিমেয় জমির ক্ষুধা মেটাতে বার বার ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় অঙ্গীকৃত চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, জোর করে তাদের জমি দখল করেছে এবং নির্বিচারে তাদের হত্যা করেছে। তীরধনুক এবং অন্যান্য আদিম অস্ত্রে সজ্জিত ইণ্ডিয়ানরা কখনই এদের সঙ্গে যুদ্ধে সমকক্ষ ছিল না। পরে অবশ্য এরা বন্দুক এবং অশ্বের ব্যবহার করতে শেখে এবং শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধে সেগুলি ব্যবহার করত। তবু উন্নত ধরনের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ইউরোপীয়দের সঙ্গে পেরে ওঠা তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল।

সুতরাং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ নতুন এক বিরাট মহাদেশ এমন একদল লোকের অধিকারে এল যারা ইউরোপ থেকে তাদের নতুন আহৃত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে সেদেশে এসেছে জীবনে সাফল্য লাভ করতে। এই সাফল্য লাভ করতে তারা কোন পরিশ্রম বা কৌশল প্রয়োগ করতে পরাঙ্মুখ ছিল না। এবং কি সেই দেশ! শুধু সম্পূর্ণ অব্যবহৃত উর্বরা জমিই নয়—এর মাটির নিচেও এমন সব অভূতপূর্ব সম্পদ ছিল যা পৃথিবীর অন্য কোথাও এভাবে এক জায়গায় ছিল বলে জানা যায় না। প্রকৃতি তার অকৃপণ হাতে ঐ দেশকে সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে, কৃষিজ এবং খনিজ সম্পদে।

বিজ্ঞান এবং ব্যাবহারিক বিদ্যা ছাড়া আর একটি জিনিস এই ইউরোপ হতে আগত উপনিবেশকারীরা তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সেটা হল তাদের উচ্চতর সামাজিক চেতনা। উত্তর আমেরিকার এই অঞ্চলে প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করতে এবং বাস করতে যারা আসে তাদের মধ্যে ইংরেজই প্রধান ছিল। পরের ধাপে আসে ফরাসী, জার্মান, ওলন্দাজ ইত্যাদি পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা। এর পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আসে ইতালীয়, গ্রীক ইত্যাদি দক্ষিণ ইউরোপীয়রা। এবং শেষে, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে এবং পরে আসে পূর্ব ইউরোপীয়রা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আসে প্রধানতঃ ইহুদীরা যারা হিটলারের জার্মানী থেকে উৎখাত হয়েছিল এবং পরে পূর্ব ইউরোপ থেকেও এরা আসে আমেরিকায় নতুন সমৃদ্ধ জীবন যাপনের আশায়। অবশ্য বর্তমানে সারা পৃথিবী থেকেই লোক আসছে আমেরিকায় বসবাস করতে সমৃদ্ধির আশায় অথবা যারা রাজনৈতিক কারণে নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। তার মধ্যে চীন, কিউবা এবং ভিয়েতনামের লোকেরা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে আফ্রিকার নিগ্রোরা বা কালা অধিবাসীরা। এরা অবশ্য স্বেচ্ছায় ওদেশে আসেনি—এদের জোর করে ক্রীতদাস করে আনা হয় প্রধানতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে খামারে কাজ করার জন্য। এখন অবশ্য এরা আর ক্রীতদাস নেই। তবু চামড়ার রঙ্-এর পার্থক্যের জন্যই হোক বা অতীতে ক্রীতদাস থাকার দরুনই হোক এরা কিন্তু আমেরিকার মহাজাতির দেহে লীন হতে পারেনি। এর ফলে এক গুরুতর সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যার সমাধান করতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

প্রথম উপনিবেশকারী হিসাবে ইংরেজদের অবদান সবচেয়ে বেশি। সেই সময় অর্থাৎ সপ্তদশ

ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের সমাজচেতনা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা সবচেয়ে উদার এবং গণতান্ত্রিক ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে ওখানে পিউরিটান বিপ্লব হয়ে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটানো হয় এবং জনসাধারণের শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে অবশ্য ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর নতুন রাজাকে সিংহাসনে এনে বসানো হয়। কিন্তু তখন থেকে ইংল্যাণ্ডের রাজা মোটামুটি শাসনতান্ত্রিক রাজা হিসাবে দেশের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে বিরাজ করছেন এবং শাসনব্যবস্থা চালাচ্ছেন নির্বাচিত মন্ত্রীরা।

শুধু উচ্চতর রাষ্ট্রব্যবস্থাই নয়, ইংরেজদের সদা চেতন ব্যক্তিস্বাধীনতাবোধ সব সময়ই চেষ্টা করেছে দেশের রাজা তথা সরকারকে তাদের সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখতে। এর একটি ফলস্বরূপ তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের প্রয়োজন অথবা অসুবিধা নিজেরাই মেটাতে অথবা দূর করতে চেষ্টা করে। এরই তাগিদে তাদের মধ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের উন্নতি দৃঢ় ভিত্তিতে প্রসার লাভ করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও প্রায় সম্পূর্ণ ব্যক্তিচেষ্টার ফল এবং তাতে সরকারের অবদান খুবই সামান্য।

এ-সব ব্যবস্থাই উপনিবেশকারীরা তাদের সঙ্গে করে নতুন মহাদেশে নিয়ে এল। শুধু তাই নয়, ওখানে কাছাকাছি মাথার উপর সরকারী কর্তৃত্ব না থাকার দরুন এগুলি আরও পূর্ণভাবে বিকশিত হবার সুযোগ পেল। সরকারীভাবে এই উপনিবেশগুলি ইংল্যাণ্ডের রাজার অধীনে বলে গণ্য হলেও কার্যতঃ হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে এদের সেরকমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। তার উপর সে সময় যোগাযোগ ব্যবস্থাও একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল পালতোলা ধীরগামী জাহাজের উপর।

সুতরাং এই উপনিবেশগুলি কার্যতঃ স্বাধীনভাবে তাদের নিজেদের শাসনব্যবস্থা চালাত। এর ফলে যখন মূল ভূমি ইংল্যাণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এদের উপর চোখ রাঙাতে গেল, তখন তারা বিদ্রোহ করল। এই সময় ইংরেজদের পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে এবং এই বিষয়ে তাদের প্রধান প্রতিযোগী ফরাসীরা অনেক বিবাদ বিসম্বাদ ও লড়াই-এর পর তাদের কাছে কার্যত হেরে যায়। তখন তারা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দূরে অবস্থিত উপনিবেশগুলি এবং অধীনস্থ দেশগুলির দিকে একটু নজর দেবার অবকাশ পায় এবং তাদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষের মতো অধীনস্থ দেশগুলিতে সে চেষ্টা অনেকাংশে সফল হলেও আমেরিকায় নিজেদের জাতির লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত উপনিবেশগুলিতে সম্পূর্ণ বিফল হল।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ একত্র হয়ে তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং পাঁচ বৎসর যুদ্ধের পর ইংল্যাণ্ড সে স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হল। এইভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হল। এর পর যত ইউরোপ থেকে নতুন নতুন লোক নতুন জীবনের আশায় এখানে আসতে আরম্ভ করল ততই তারা পশ্চিমে ও দক্ষিণে আদিবাসীদের ঠেলে অগ্রসর হতে থাকে—নতুন নতুন বসতি, জনপদ, শহর গঠিত হতে থাকে। ক্রমশঃ এইসব নতুন বসতি, শহর ইত্যাদি একটা নির্দিষ্ট সীমানায় স্বীকৃত হয়ে এক একটি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করবার অধিকার পায়। এরূপে আজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চাশটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত।

২

আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতিকে সম্যক্ বুঝতে হলে তার ইতিহাস জানা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ সে-দেশের আর্থিক উন্নতির

মূলে হল প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, এবং সেই সঙ্গে যুক্ত বলিষ্ঠ মনোবৃত্তিসম্পন্ন পরিশ্রমী মানুষ। এই দুয়ের সমন্বয় আমেরিকাকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী দেশে পরিণত করেছে।

এটা অবশ্য একদিনেই হয়নি। প্রথম উপনিবেশকারীরা এই নতুন মহাদেশের উর্বরা অথচ অনাবাদী জমিতে শস্য রোপণ করে প্রচুর উৎপাদন লাভ করে। তাতে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও বাইরে রপ্তানি করার মতো যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকত। সেইসঙ্গে ইউরোপ থেকে আনীত তাদের নতুন বিজ্ঞান ও কুশলতার সাহায্যে প্রথমে ছোট ছোট এবং পরে বড় বড় কলকারখানা স্থাপন করতে আরম্ভ করে। আবার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার মাটির নিচে অভাবনীয় সম্পদের সন্ধান পেয়ে সেগুলির সদ্ব্যবহার করতেও আরম্ভ করে। এইসব কাজে তাদের প্রথমে ইউরোপ, বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ড থেকে পুঁজি অর্থের সাহায্য নিতে হয়। সেই সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে, ইংল্যাণ্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় এবং তার ফলে ঐ দেশ কলকারখানা শিল্পে বিশ্বের অগ্রগণ্য হয়ে তার সাহায্যে ক্রমশ পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যে শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহ করে সমৃদ্ধির শীর্ষে আরোহণ করে। যদিও প্রথম দিকে সদ্য তাদের কবলমুক্ত, এই নতুন স্বাধীন দেশের অর্থাৎ আমেরিকার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না। পরে অবশ্য সব তিক্ততা পরিহার করে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর পর আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতিতে ইংল্যাণ্ডের পুঁজি অর্থের একটা বড় অংশ গ্রহণ করে। পরে অবশ্য আমেরিকা ধীরে ধীরে ইংল্যাণ্ডের এই লগ্নী অর্থ এবং ঋণ শোধ করে দেয় এবং পরে ইংল্যাণ্ডকেই আমেরিকার কাছে বহু অর্থ ঋণ করতে হয়। এটা প্রধানতঃ হয় দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন যুদ্ধের খরচ মেটাতে ইংল্যাণ্ডের বহু অর্থ প্রয়োজন হয়। যদিও আমেরিকার অর্থনৈতিক বিকাশে, বিশেষতঃ এর খনিজ সম্পদ আহরণে এবং বিরাট বিরাট কলকারখানা স্থাপনে ইংল্যাণ্ডের পুঁজি এবং লগ্নী অর্থ প্রথম পর্যায়ে অনেক সাহায্য করে বটে কিন্তু এর প্রধান প্রেরণা, প্রচেষ্টা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা আসে প্রধানতঃ আমেরিকানদের নিজেদের মধ্য থেকেই। বিরাট দেশ, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ —তার সঙ্গে যোগ হল এক নতুন মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ, যারা পুরানো জগতের জ্ঞান ও কুশলতা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তার সঙ্গে আনেনি সেই জগতের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা কৃষ্টিগত সঙ্কীর্ণতা। এরা এসেছে এক নতুন দেশে নতুন সমাজ তৈরি করতে যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সমত্ব সর্বাগ্রে স্বীকৃত হবে এবং যেখানে মানুষ অবাধে তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ করতে পূর্ণ সুযোগ লাভ করবে। এরা সব জিনিসই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে এবং নতুন ধারণা নতুন আবিষ্কার পরখ করে দেখতে সব সময়ই এগিয়ে আসে। তারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভিন্ন দেশ এবং ভিন্ন ধর্ম ও সমাজ থেকে আগত স্বামী বিবেকানন্দকে সাদরে গ্রহণ করতে পেরেছিল যা অন্য কোন দেশ এত সহজে পারত কিনা সন্দেহ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি দেশ যেখানে প্রত্যেক মানুষ—তা তার সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা যাই হোক না কেন—নিজের উন্নতি বা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করে উন্নতির শিখরে উঠতে পারে। এখানে কোন শ্রেণীবিভাগ নেই, সামাজিক তো নেই-ই, অর্থনৈতিকও নেই বললেই চলে, ধনবৈষম্য এখানে অবশ্যই আছে, কিন্তু অর্থের অভাব ওখানে মানুষের উন্নতির অন্তরায় হয় না। ছিন্ন বস্ত্র থেকে কোটিপতি হবার দৃষ্টান্ত এখানে অজস্র,—এ

শুধু উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রোমান্টিক যুগেই নয়—এখনও তা অহরহ হচ্ছে। এটি ওখানে খুবই সাধারণ ঘটনা যে গরীবের ছেলে যার ছোটবেলায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ বা সামর্থ্য ছিল না—সে কিছুদিন সাধারণ শ্রমিকের কাজ করে, কিছু অর্থ সঞ্চয় করে আবার পড়াশোনা আরম্ভ করেছে এবং পরে উচ্চশিক্ষায় কৃতী হয়ে নাম যশ লাভ করেছে। এমন কি বিশ্ববিত্যালয়ে পড়ার সময়েও অর্থ উপার্জনের প্রচুর সুবিধাও ঐ দেশে আছে। সে-সব কাজ পড়াশোনা করেও করা যায়। তাছাড়া ওখানকার বিশ্ববিত্যালয়গুলিতে যোগ্য ছাত্রদের নানাপ্রকার বৃত্তি ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থাও আছে। আর একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, ওখানে সব কাজই সমান আদরণীয় এবং সম্মান-যোগ্য—কারখানার শ্রমিক এবং অফিসের কাজের মধ্যে কোন শ্রেণীগত পার্থক্য নেই। এমন কি পারিশ্রমিকের মাপেও খুব বেশি তফাত নেই, যা অন্যান্য দেশে—বিশেষতঃ আমাদের মতো দেশে আছে।

সকলের জন্য সর্বপ্রকার আত্মোন্নতি বা বিকাশের এই যে সুযোগ এটা যে দেশের কত বড় সম্পদ, তা আমেরিকায় গেলে বেশ বোঝা যায়। ওখানকার বহু কোটিপতি, উচ্চশিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিল্পী, রাজনৈতিক নেতাদের বংশ-ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে, মাত্র দুই-এক পুরুষ আগেও তারা ইউরোপীয় কোন দেশের সমাজের সর্বনিম্ন স্তর থেকে এসেছে। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে তারা তাদের এই নিম্ন অবস্থা থেকে আসার জন্য একটুও লজ্জা অনুভব করে না বরং সত্যকারের গর্ব অনুভব করে। কেননা এতে প্রমাণ হয় যে, তারা একমাত্র নিজের চেষ্টাতেই বড় হয়েছে, জন্মসূত্রে পাওয়া কোন বিশেষ সুবিধার বলে নয়। পূর্ব আমেরিকার নিউ ইংল্যাণ্ড, নিউইয়র্ক, নিউ জার্সী ইত্যাদি অঞ্চলে আইরিশ আমেরিকানদের সব বিষয়ে খুব প্রাধান্য। এদের পূর্বপুরুষ বেশির ভাগই আর্যাল্যাণ্ড থেকে ইংরেজদের অত্যাচারে অথবা দুর্ভিক্ষের ঠেলায়, না খেতে পেয়ে দলে দলে নতুন মহাদেশে আসতে বাধ্য হয়েছিল। আজ তারা নিজেদের চেষ্টায় এবং উত্তমে ওখানকার সমাজের শীর্ষে অবস্থান করছে। এবং আমেরিকার ইতিহাসে ওদের অবদান অপরিমেয়। নিজেদের দেশে বাস করলে তারা হয়তো তাদের সেই ছোট্ট গ্রামে চিরাচরিত কষ্টের জীবনযাপন করত। এই সঙ্গে এই কথাটাও মনে আসে যে, আমাদের দেশেও নিম্নশ্রেণীর নিপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে কত সম্ভাবনা, কত প্রতিভা সুযোগের অভাবে বিকশিত হতে পারছে না।

সুতরাং আমেরিকার উন্নতির মূলে শুধু তার অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ-ই নয়, তার চেয়েও বোধ হয় বেশি মূল্যবান তাদের জনসম্পদ, যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং নিজেদের উন্নতির জন্য অশেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে, তার সঙ্গে রয়েছে এমন এক সমাজ ব্যবস্থা যা তাদের সে চেষ্টায় বাধা সৃষ্টি না করে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। এই ভাবে ব্যক্তির উন্নতির সঙ্গে জাতিরও উন্নতি হয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য বর্তমানে আমেরিকায় প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষতঃ খনিজ সম্পদ আর আগের মতো অপর্যাপ্ত নয়। অপরিমিত ব্যবহারে সেগুলি অনেক কমে এসেছে এবং আমেরিকাবাসীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অনেক কাঁচা মালই এখন বাইরে থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম এর মধ্যে প্রধান। এককালে আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তেল উৎপাদন করত এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও বাইরে রপ্তানি করত। এখন তারা পৃথিবীর মধ্যে

সবচেয়ে বড় আমদানিকারক। এছাড়া, খনিজ লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা ইত্যাদি আরও বহু ধাতুর জন্য আমেরিকা এখন পরনির্ভরশীল।

তবুও আমেরিকা তার অর্থনৈতিক উন্নতির হার বজায় রাখতে পেরেছে, শুধু বজায়-ই নয়, সে উন্নতির হার বহুলাংশে বাড়াতেও পেরেছে। দুটি কারণে তা সম্ভব হয়েছে। প্রথমতঃ যদিও দেশের মধ্যে সস্তা ও সহজলভ্য কাঁচামাল যথেষ্ট পরিমাণে আর পাওয়া যায় না, তবুও বাইরে থেকে বিশেষতঃ অনুন্নত দেশগুলি, যেমন—আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়া থেকে সে সমস্ত মাল অত্যন্ত সস্তায় আমদানি করতে পারছে। এটা সম্ভব হচ্ছে এই কারণে যে, আমেরিকা তথা পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশসমূহে তাদের আর্থিক, বিশেষতঃ পুঁজিগত শক্তির জোরে কাঁচামালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজেদের সুবিধামত সেগুলির দাম কম রাখতে পারে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমেরিকা শিল্পক্ষেত্রে উচ্চতর প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করে শিল্প উৎপাদনের ক্ষমতা বহুগুণে বাড়াতে পেরেছে এবং সেই সঙ্গে উৎপাদনের ব্যয়ও কমাতে পেরেছে। এর ফলে তারা শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের হার অনেক গুণ বাড়াতে পেরেছে। বহুলোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছে; এতে আমেরিকার লোকদের জীবনযাত্রার মানও বহুগুণ বেড়ে গেছে। এইসব প্রধানতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে হয়েছে। এর ফলে আমেরিকার শিল্পক্ষেত্রে এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এসেছে বলা চলে।

ইদানীং অবশ্য এই অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এটা হয়েছে প্রধান দুটো কারণে। একটি হল যে, অনুন্নত দেশগুলি থেকে সস্তায় কাঁচামাল আমদানি আর অতটা সহজ হচ্ছে না। বিশেষতঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী দেশগুলি একজোট হয়ে ন্যায্য দাম আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যান্য কাঁচামালের ক্ষেত্রেও সে চেষ্টা হয়েছে এবং হচ্ছে, তবে তাতে এখনও পর্যন্ত বিশেষ সাফল্য আসেনি। কিন্তু এক পেট্রোলিয়ামের দাম বাড়তেই আমেরিকা প্রমুখ শিল্পোন্নত দেশগুলির যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে এবং তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ হল: দেশরক্ষার ব্যাপারে আমেরিকাকে প্রচুর সম্পদ বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। এটা আরম্ভ হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় থেকে। বর্তমানে যদিও ভিয়েতনাম সমস্যা মিটে গেছে, কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য আমেরিকাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

এর ফলে আমেরিকার লোকদের উচ্চ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে বেশ কষ্ট বোধ হচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি এবং জিনিসের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে। অবশ্য এসব সত্ত্বেও আমেরিকার অবস্থা অন্যান্য অনেক দেশ থেকে ভাল, আর আমাদের সঙ্গে তো কোন তুলনাই হয় না। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চললে আমেরিকার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

আমেরিকার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষণীয় কি আছে, তাই আলোচনা করে এ প্রবন্ধ শেষ করব। প্রথম হল যে, যদিও পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ প্রথম অবস্থায় জাতীয় উন্নতির সাহায্য করে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল তার জনসম্পদ। জনসম্পদ বললে লোকসংখ্যা বুঝায় না, বুঝায় তাদের গুণাগুণ, তাদের কর্মক্ষমতা, কাজ করবার ইচ্ছা ও প্রেরণা, দক্ষতা এবং সর্বোপরি তাদের উদ্যম, কর্মপ্রচেষ্টা এবং সংগঠন-শক্তি। এইসবগুলি আমেরিকানদের পূর্ণমাত্রায় আছে বলেই যদিও তাদের প্রাকৃতিক

সম্পদ আর আগের মতো অত অপর্যাপ্ত নেই তবু তারা উন্নতির শিখরে আছে এবং থাকবেও যদি না তারা তাদের এই গুণগুলি হারায় অথবা যুদ্ধ প্রভৃতির মতো নিষ্ফলা কাজে তাদের পরিশ্রম এবং সম্পদ অত্যধিক ব্যয় করে। বর্তমানকালে আর একটি জাতির নাম এইসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, যাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আমেরিকার থেকে অনেক কম তো বটেই, কোনকালে বেশি ছিলও না। গত বিশ্বযুদ্ধে প্রায় বিধ্বস্ত হয়েও কিন্তু তারা আজ উন্নতির উচ্চশিখরে। এই জাতি হচ্ছে জাপান। যদিও তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং জাতীয় চরিত্র আমেরিকানদের হতে সম্পূর্ণ পৃথক তবু তাদের শ্রমশীলতা এবং ব্যক্তিগত সততার জন্য তারা এত দ্রুত উন্নতি করতে পেরেছে।

দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, আমেরিকার সব উন্নতির মূলেই আছে ব্যক্তির প্রচেষ্টা, সরকারের নয়। ওখানকার লোকদের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ স্বাধীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে যা তাদের সরকার বা অন্য কারুর মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বিরত রাখে। নিজেরাই একা অথবা কয়েকজন মিলে তাদের নিজেদের সুবিধা অসুবিধাগুলির নিজেরাই যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করার চেষ্টা করে। ওখানকার সরকারও যতদূর সম্ভব জনসাধারণের জীবনে,—কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বিরত থাকে। এমন কি আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারেও স্থানীয় পৌর বা জনপদ সংস্থার দায়িত্ব এবং কর্তৃত্বই সমধিক। এই বলিষ্ঠ স্বনির্ভরতা আমাদের দেশে বড়ই অভাব। যার জন্য সর্ব বিষয়ে সরকারী কর্তৃত্ব এবং প্রভাব এসে পড়ে। এর ফলে সাধারণের কর্মস্বাধীনতা অনেকাংশে ব্যাহত হয়। এতে দুর্নীতির সুযোগও খুব বৃদ্ধি পায়। দুর্নীতি থেকে আমেরিকাও মুক্ত নয়, কিন্তু সে দুর্নীতির ছোঁয়াচ সাধারণের জীবনে খুব অল্পই লাগে, কারণ সাধারণের সঙ্গে সরকারী যন্ত্রের সংযোগ খুবই কম,—আমাদের মতো প্রতিপদে নয়।

এর আর একটি ফল হল যে, যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি আমাদের রাজনীতির চেয়ে হয়তো খুব বেশি উচ্চ পর্যায়ের, অথবা সেগুলি দুর্নীতিমুক্ত নয়, কিন্তু ওখানকার রাজনীতি দেশের সব ব্যাপারে কর্তৃত্ব করে না। বিশেষতঃ ওখানকার কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে যা সাধারণতঃ রাজনীতি প্রভাবমুক্ত এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের মানকে উচ্চে তুলে রাখে। সেগুলি হচ্ছে : (১) ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং তাদের সংলগ্ন বিদ্বৎমণ্ডলী। এরা বেশির ভাগই স্বনির্ভরশীল এবং স্বাধীন, সরকারী অর্থের মুখাপেক্ষী নয়। (২) সংবাদ সংস্থা অর্থাৎ দেশের সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি। ওখানকার সাংবাদিকেরা অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক। এবং দেশের আইনও এদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে খুব সচেতন এবং সংবাদ সংস্থার স্বাধীনতা সহজে ক্ষুণ্ন হতে দেয় না। (৩) দেশের বিচারালয় এবং আইনজীবিরা। এই বিষয়ে ওখানকার সুপ্রীম কোর্টের অবদানও কম নয়। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ দুর্নীতি ও রাজনীতি প্রভাবমুক্ত এবং দেশকে ঠিকপথে পরিচালিত করতে এদের, বিশেষতঃ প্রথম দুটির অবদান অতুলনীয়।

আগেই বলেছি, আমেরিকার অর্থনৈতিক তথা সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মূলে ব্যক্তিপ্রচেষ্টা ও উদ্যমের অবদান সবচেয়ে বেশি। ওখানকার ছোট-বড় সবরকম শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রায় সবই বেসরকারী মালিকানাধীন এবং এদের পরিচালনাতেও সরকারের কোন হাত নেই। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান খুব ছোট আকারে কোন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় আরম্ভ হয়ে ক্রমে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। এদের স্থাপনকর্তা এবং পরে

যারা এ প্রতিষ্ঠানগুলিকে যোগ্য পরিচালনার দ্বারা অত বড় করে তুলেছেন, তাঁরা সমাজের সব স্তর থেকেই এসেছেন। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁদের সকলের মধ্যে একটা মিল আছে—তা হচ্ছে তাঁদের দূরদৃষ্টি, একটি বিরাট এবং ভাল কিছু তৈরি করার স্বপ্ন এবং সেইসঙ্গে অনন্যসাধারণ পরিচালনক্ষমতা। অর্থ উপার্জন এঁদের কাছে নিশ্চয়ই খুব প্রয়োজনীয়, কিন্তু তার থেকেও প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ, তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিল্পপতিদের সম্বন্ধে একথা অসঙ্কোচে বলা চলে না। এঁদের বেশির ভাগই এসেছেন এমন এক শ্রেণী বা গোষ্ঠী থেকে যাঁদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হল অর্থ আহরণ এবং তা যত শীঘ্র এবং সহজে করা যায়, ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে একটি প্রতিষ্ঠান-গঠনের স্বপ্ন তাঁরা বিশেষ দেখেন না। সৃষ্টির সে আনন্দে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য অর্থ, তাঁরা কুবেরের উপাসক, লক্ষ্মীর নয়। ব্যতিক্রম আমাদের দেশে যে নেই তা নয়, তবে অপেক্ষাকৃত খুবই কম। যাঁরা এর ব্যতিক্রম তাঁরা দেশের লোকের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন যা অন্যরা পান না।

আমেরিকার সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে আমাদের আর একটি বড় প্রভেদ আছে, তা হচ্ছে শ্রমিক সংগঠন। ওখানকার শ্রমিক সংস্থাগুলি সব স্বাধীন, স্বনির্ভর —তারা কোন রাজনৈতিক দলের ধার ধারে না। তারা নিজেদের মধ্য থেকেই কর্মকর্তা নিযুক্ত করে এবং মালিকের সঙ্গে দাবী নিয়ে আলোচনা নিজেরাই করে। যদি প্রয়োজন মনে করে, বাইরে থেকে এইসব ব্যাপারে বিশেষ পেশাদার লোক পারিশ্রমিক দিয়ে নিযুক্ত করে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত বা বিশেষ সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ করে না। তাই বলে এ নয় যে, এরা রাজনীতি সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা ধারণা করে না। নির্বাচনের সময় নিজেরা আলোচনা করে, ঠিক করে কাকে সমর্থন করবে এবং সেইভাবে সদস্যদের উপদেশ দেয়, অবশ্য সে উপদেশ পালন করা না করা সদস্যদের মর্জির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শ্রমিক বিরোধ ওদেশেও আছে এবং স্ট্রাইকও হয়, তবে তা সম্পূর্ণ তাদের নিজেদের দাবীদাওয়ার ব্যাপারে। ওখানে মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের পাওনা ইত্যাদি নিয়ে একটি আইনগত চুক্তি হয় যা কয়েক বৎসর কার্যকরী থাকে। এই চুক্তি বলবৎ থাকাকালীন কাজ বন্ধ করা নিষিদ্ধ, আইনবিরুদ্ধ। চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগে দুই পক্ষ আলোচনা করে একটি নতুন চুক্তি সম্পাদিত করে। আর যদি তা করতে ব্যর্থ হয়, তবে কাজ বন্ধ হয়ে যায়, যত দিন না নতুন চুক্তি আবার সম্পাদিত হচ্ছে।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শ্রমিক মালিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ অন্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম পর্যায়ে মালিকেরা নির্লজ্জভাবে শ্রমিকদের শোষণ ও প্রতারিত করেছে। শ্রমিকরা বেশির ভাগই অশিক্ষিত থাকায় দরুন নিজেরা সংগঠিত হতে পারেনি। দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছু রাজনৈতিক কর্মী এদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে এবং মালিকদের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য পাওনা পেতে সাহায্য করে। তৃতীয় পর্যায়ে এই শ্রমিক সংস্থাগুলি ক্রমশঃ রাজনৈতিক কর্মী এবং তাদের দলের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে এসে যায়। তখন আর সংস্থাগুলি মূলতঃ শ্রমিকদের স্বার্থে পরিচালিত হয় না। রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থে সেগুলি হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়। আরও দুঃখের কথা এই যে, তথাকথিত শ্রমিকনেতারা, যাদের মধ্যে অনেকে নানা অসাধু উপায়ে ঐ সব শ্রমিক সংস্থাগুলির উপরে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখে, তারা ক্রমশঃ শ্রমিকদের এক

নতুন শোষক শ্রেণীতে পরিণত হয়।

আর একটি প্রভেদ আছে—আমেরিকার শ্রমিকদের তাদের মালিকের সঙ্গে যত বিরোধই হোক, একবার কাজে যোগদান করলে তারা পূর্ণ সততার সঙ্গে সাধ্যমত নিজের কাজ করে। তাছাড়া ভাল কাজ না করার দরুন মালিক যদি কোন শ্রমিককে বরখাস্ত করে, তা নিয়ে শ্রমিক সংস্থা মালিকের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে না। দুঃখের বিষয় নিজেদের কাজের প্রতি সততার ঐতিহ্য আমাদের দেশে এখনও স্থাপিত হয়নি। উপরন্তু ভাল কাজ না করার দরুন মালিক কারুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে, সেটা প্রায়ই একটা মালিক-শ্রমিক বিরোধে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, এটাও শ্রমিক সংস্থাগুলির উপর রাজনৈতিক দলের প্রভাবের ফল। সুতরাং শিল্প সংগঠন, পরিচালনা এবং শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে।

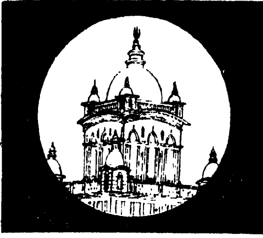
রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

গাইঘাটা ত্রাণকার্য

প্রলয়ংকরী ক্ষণিকের ঘূর্ণিঝড়ে গাইঘাটায় নিষ্ঠুর ও করুণ ধ্বংসের কথা আজ সর্বজনবিদিত। প্রকৃতি বর্ণনাতীত আঘাত হেনেছে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের মানুষ, পশু, গাছপালা এমনকি প্রস্তুত চাষের জমিতে। প্রচণ্ড আঘাতে মুহ্যমান এই গ্রামবাসীদের দ্রুত স্বাভাবিক দিনচর্যায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় সকলেই উদ্‌গ্রীব। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ১৪ এপ্রিল সকাল থেকে এই বিধ্বস্ত অঞ্চলের সেবায় লেগেছে। ত্রাণকাজ চলছে। প্রয়োজন অনেক। তাই উদার দেশবাসীর নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। দান, মনিঅর্ডার অথবা একাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে 'রামকৃষ্ণ মিশন' এই নামে বেলুড় মঠ, হাওড়ায় পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

স্বামী বন্দনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

২৪ এপ্রিল, ১৯৮৩
বেলুড় মঠ, হাওড়া



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

বীরজননী বিদুলা

পুরাকালে বিদুলা নামে ক্ষত্রিয়ধর্মপরায়ণা ও দূরদর্শিনী এক নারী ছিলেন। সঞ্জয় নামে তাঁর একটি পুত্র ছিল। এক সময় সিন্ধুরাজের সঙ্গে সঞ্জয়ের যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে সঞ্জয় পরাজিত হয়ে, রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে রাজপ্রাসাদে এসে বিষণ্ণ মনে শয্যাগ্রহণ করে। বিদুলা তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় নারী। পুত্রের এই হীন মোহাচ্ছন্ন দশা দেখে তিনি পুত্রকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বললেন :

তুমি কার পুত্র! তুমি তো আমার পুত্র নও! তুমি তো তোমার পিতার ঔরসে জন্মাওনি! তুমি কোথা থেকে এসেছ? তুমি ভীরু কাপুরুষ তাই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে আছ। তোমার পুরুষরূপে জন্মানোই বৃথা! রে কাপুরুষ! পুরুষের তেজ তোমার নেই। তুমি হীনবীর্য! তাই ক্লীবের মতো অবসন্ন হয়ে, জীবন-ধারণ করে বেঁচে থাকতে চাও। পুত্র! ওঠ, উদ্যমের সঙ্গে আবার যুদ্ধ কর। যে পুরুষের কীর্তির কথা লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে, সে পুরুষ নয়, স্ত্রীও নয়—সে শুধু মানুষের সংখ্যা বাড়ায়। যে ব্যক্তির দান, তপস্যা, বীরত্ব ও বিদ্যার কথা লোকে কীর্তন না করে, সে ব্যক্তি তার মাতার পরিত্যক্তই বটে। পুত্র! তুষের নির্বাপিত আগুনের মতো শুধু ধূমায়িত হয়ো না, ক্ষণকালের জন্যও জ্বলে ওঠ, শত্রুকে আক্রমণ করে পরাজিত কর।

সঞ্জয় মাতার ক্রুদ্ধা মূর্তি দেখে, শঙ্কিত হয়ে বলল : মাগো! তোমার হৃদয় কি দিয়ে তৈরি? তোমার হৃদয় কী পাষাণ! তোমার হৃদয় ইস্পাতের মতো শক্ত!

বিদুলা উত্তর দিলেন :

পুত্র! আমার জন্ম মহৎ কুলে। বিবাহের পর তোমাদের উচ্চ বংশে আবার এসেছি। আমি রাজ্যের অধীশ্বরী। আমি স্বামীর আদরের পাত্রী ছিলাম। সবাইকে আমরা আশ্রয় দিয়ে এসেছি এতকাল। সবাইকে ভরণপোষণ করে এসেছি। আজ কি আমাকে পরের আশ্রয়ে ক্রীতদাসীর মতো থাকতে হবে? অতিথি-অভ্যাগতদের এতকাল আপ্যায়ন করে এসেছি। আজ কি তাদের দ্বার থেকে ফিরিয়ে দিতে হবে? আর আমাকেও তাই দেখতে হবে? ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকরা আমাদের কাছে কিছু চাইলে তোমার পিতা ও আমি কোন দিন 'না' বলিনি—দু-হাত ভরে তাদের দিয়েছি। আজ কি পুত্র বেঁচে থাকতে তারা চাইলে আমাকে 'না' বলতে হবে? এই 'না' বলার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল। পুত্র! আজ আমি এবং তোমার স্ত্রী যদি চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ি—তা দেখে কি তুমি স্বস্তি পাবে? আমাদের গায়ে যদি কোন অলংকার না থাকে এবং পরিধেয় বস্ত্র যদি শতচ্ছিন্ন থাকে—তা দেখে কি তুমি শান্তিতে থাকবে? তখন আর আমাদের তোমার কি প্রয়োজন? পুত্র! কাপুরুষতা দূর করে, এই অকূল দুঃখ-সাগর থেকে আমাদের

রক্ষা কর। এই ভেলাবিহীন বিপদ-সমুদ্রে তুমি আমাদের ভেলা হও। আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল তো তুমিই। মৃতপ্রায় আমাদের তুমি সঞ্জীবিত কর। পুত্র! তুমি তোমার কাপুরুষ-বৃত্তি বর্জন করে, এই জীবনের মায়া ত্যাগ করে বীরের মতো শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়। শত্রুকে পরাস্ত করে হৃত রাজ্য তুমি আবার জয় কর, নচেৎ আমৃত্যু সংগ্রাম কর!

সঞ্জয় মায়ের তীব্র ভৎর্সনায় ব্যথিত হয়ে বলল :

মা! আমি যদি যুদ্ধে মরি, তুমি অলংকার-আভরণাদি কি করে পরে বেড়াবে? জগতে সুখ ভোগ কি করে করবে? আমি তোমার একমাত্র সন্তান। আমার মৃত্যুতে তোমার জগতে বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা হবে। জগৎ তখন পুত্রহীনা তোমার কাছে অন্ধকার হয়ে যাবে!

বিদুলা আবার ভৎর্সনা করে বললেন :

কাপুরুষ পুত্রের বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। মাতা-পত্নীকে দারিদ্র্যের মধ্যে নিমগ্ন হতে দেখে যে পুত্র কিছু করে না, সে রকম পুত্রের বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল। বীর পুত্র যদি যুদ্ধক্ষেত্রে বিক্রম দেখিয়ে মৃত্যু বরণ করে, তবে সে পুত্রের জন্য জননী গর্ব অনুভব করে। পুত্র! তোমাকে আদর করব সেই দিন, যে দিন তুমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শত্রু নিধন করে ঘরে ফিরে আসবে।

সঞ্জয় মায়ের বাক্যবাণে জর্জরিত হয়ে নিজের কাপুরুষতার জন্য লজ্জিত হল। মায়ের তিরস্কারে বিষণ্ণভাব কাটিয়ে সচকিত হয়ে উঠল। মায়ের তেজস্বিতা ও দূরদর্শিতার উপর তার আস্থা জন্মাল। সে বলল :

মাগো! আমার ধন নেই, লোকবল নেই, কি করে আমি রাজ্য জয় করব? তুমি আমাকে উপদেশ দাও। তোমার আজ্ঞা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

বিদুলা উৎসাহ দিয়ে বললেন :

পুত্র! তুমি জান না, তোমার ধন আছে কিনা। আমাদের ধনাগারে অনেক ধনসম্পদ আছে, তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তোমাকে আমি সে সব দেব। আর তোমার অনেক হিতৈষী বন্ধুও আছেন, যাঁরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধে মরবেন, কিন্তু রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবেন না। তুমি বৃথা সিন্ধুরাজকে ভয় করছ। সিন্ধুরাজ অপরাজেয় হতে পারেন, কিন্তু অমর নন। সিন্ধু-রাজের অনেক শত্রু আছে। তারা সুযোগ পেলে আবার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তুমি তাদের সন্ধান করে তাদের সঙ্গে মিত্রতা কর। তাদের সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াও। দেখবে তারা তোমার অধীনে থাকবে। তোমাকে সাহায্য করার জন্য তারা এগিয়ে আসবে।

মায়ের বীরত্বপূর্ণ কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে সঞ্জয় সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড শক্তিতে যুদ্ধ করল। সঞ্জয় অবশেষে যুদ্ধে জয়লাভ করে হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে মায়ের কাছে ফিরে এল

বীরভোগ্যা ভারত-জননীর মহীয়সী কন্যা বিদুলা। বর্তমান ভারতবর্ষে কি আবার সে রকম সেই মহীয়সী তেজোময়ী নারীর উদ্ভব হবে না? আধুনিক ভারতবর্ষের জননীগণ কি তাঁদের অলস, তামসিক সন্তানদের ঐ ভাবে শিক্ষা দিয়ে, বাক্যবাণে জর্জরিত করে, কঠোর ভাবে শাসন করে মনুষ্যত্বে ও বীরত্বে উদ্দীপিত করতে পারেন না? জননীগণ কি ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তাঁদের দুর্বল নির্জীব সন্তানদের বুকে দুর্জয় সাহস, তেজ ও শক্তি সঞ্চার করতে পারেন না?

[মহাভারতের উদ্যোগপর্বের বিদুলার উপাখ্যান অবলম্বনে।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

দুটি উজ্জ্বল ছবি

পূজ্যপাদ বিরজানন্দজী মহারাজ তখন অসুস্থ হয়ে বেলুড় মঠে আছেন। সেই সময় কিছুদিন ধরে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করে তাঁকে শোনাতেন দিনাজপুর-রাজের সভাপণ্ডিত শ্রদ্ধেয় রামনারায়ণ তর্কতীর্থ। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ··তাঁর পাঠ শুনে মহারাজজীও খুব সন্তুষ্ট হতেন

ঐ সময় বিহারপ্রবাসী জনৈক ব্যক্তি পূজ্যপাদ মহারাজকে দর্শন করার উদ্দেশ্যে মঠে যান। পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। পণ্ডিত মশায়ের ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই পণ্ডিত মশায় তাঁকে সস্নেহে কুশল প্রশ্নাদি করেই আনন্দে আবেগে গদ গদ কণ্ঠে বললেন : "জানিস্ আজ মহারাজজীর ঘরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। আমি সকালে মহারাজকে দর্শন করতে গেছি। ঘরে তখন বাহিরের কেউ ছিল না। আমি মহারাজকে প্রশ্ন করলাম—'···শাস্ত্রে সাধুদের ত্যাগ তপস্যার কথা বলা আছে, তা ত্যাগের মানেই বা কি, আর তপস্যাই বা কাকে বলে?' মহারাজজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'ত্যাগ মানে—অভিমান ত্যাগ, বিষয়াসক্তি ত্যাগ। আর তপস্যা? ভগবানের প্রতি যদি ভালবাসাই না থাকে তবে কিসের তপস্যা, কেনই বা তপস্যা? তাঁকেই জীবনের সর্বস্ব জানা—একমাত্র তাঁকেই ভালবাসা, এই-ই হচ্ছে তপস্যা। সংসারে আসক্তি ত্যাগ এবং ভগবানকে ভালবাসার নামই ত্যাগ-তপস্যা।' আমি আবার প্রশ্ন করলাম—'যাঁকে দেখা যায় না, তাঁকে ভালবাসব কি করে?' শুনেই মহারাজজীর চোখ দুটিতে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে উঠল। বলে উঠলেন—'কে বললে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না? এই যে—এই-ই তো—এখানে।' উত্তেজিত হয়ে এই কথা ক'টি বলতে বলতেই কেমন একটা ভাবান্তর হল তাঁর। একেবারে চুপ—ভাবস্থ। চোখের পাতাও পড়ছিল না—নিশ্চল স্থির। আঃ সে কি উজ্জ্বল প্রশান্ত মূর্তি! কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে তাঁর ঐ অপূর্ব তদ্‌গত ভাব দেখলাম দাঁড়িয়ে। পরে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।"

ঘটনাটির বর্ণনা দিতে দিতে পণ্ডিত মশায় যেন আহ্লাদে ও উদ্দীপনায় মেতে উঠছিলেন। খানিক থেমে, আবার বললেন, "তা বলে বাপু, মহারাজজী রসিকও কিছু কম নন। কয়েকদিন আগে এক মজার কাণ্ড হল। শুনবি? কলকাতার এক তরুণ অথচ নাম-করা ডাক্তার রোজ সকালে আসেন মহারাজকে দেখতে—ইন্‌জেকশন ইত্যাদিও কি দেন। সেদিন কি হয়েছে,—ঐ ডাক্তারের আসতে বেশ বিলম্ব হয়েছে। মহারাজও বালকের মতো,—বার বারই জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছেন, ডাক্তার এল কিনা,—কেন আজ এমন দেরি করছে ইত্যাদি নানা প্রশ্নও করছেন। যা হোক, শেষে নিরস্ত হলেন বটে,—কিন্তু তবুও দু-তিনবার খোঁজও নিয়েছেন ডাক্তারের সম্পর্কে। ডাক্তার সেদিন সত্যিই একটু বেশি বেলায় এসেছেন। ডাক্তার ঘরে ঢুকতেই মহারাজ বেশ গম্ভীর গলায় অনুযোগের সুরে বললেন—'তুমি তো বড় খারাপ লোক হে।' শুনেই তো ডাক্তারের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে! পরক্ষণেই মহারাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি কথায় ডাক্তারকে কি বললেন জানিস্? বললেন—'ছেলে-বেলা থেকে যে-মন ঠাকুরের পাদপদ্মে সমর্পণ করে বসে আছি,—আর তুমি বাপু, আমার সেই মনকে এতক্ষণ ধরে কেড়ে নিতে চেষ্টা করছিলে! সকাল থেকে কেবল তোমারই কথা মনে হচ্ছে,—বার বার বলছি, কই ডাক্তার এখনও এল না!' সে কি দৃশ্য! মহারাজের দিকে তাকিয়ে, তাঁর প্রসন্ন মুখে স্নেহমাখা হাসি দেখে, ডাক্তার বেচারা তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন! হয়তো বা নিজেকে বড় ভাগ্যবান ভেবে গর্বই বোধ করলেন!"

[শ্রীমাধুর্যময় মিত্রের লিখিত সংগ্রহ থেকে।]

জ্ঞান-বিজ্ঞান

আগ্রাসী মরুভূমি

মরুভূমিগুলি কি বিস্তার লাভ করছে? আবাদী জমি, পশুচারণ ক্ষেত্র ও বনভূমিগুলি কি তারা ধীরে ধীরে গ্রাস করে নেবে? সমস্ত পৃথিবীই কি উষর, শুষ্ক, রৌদ্রদগ্ধ, শস্যহীন মরুভূমিতে পরিণত হবে?

ভারতে রাজস্থানের থর মরুভূমির কথা ধরা যাক। থর গরম মরুভূমি। সর্বাধিক তাপমাত্রা জুনে ওঠে ৪৮° সেলসিয়াস, জানুআরিতে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম হলেও থাকে ৪০° সেলসিয়াস। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০-৪০০ মিলিমিটার। ভারতের এই অঞ্চল সম্ভবতঃ পৃথিবীর সব থেকে ধূলি ধূসরিত অঞ্চল। জনবসতি বাড়ছে (উষর ভূমিতে ভারতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬১ জনেরও বেশি লোক বাস করে)। পশুচারণ ভূমি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে, এদিকে বাড়ছে পশুর পাল। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালে পশুচারণ ভূমির আয়তন ১·৩ কোটি হেক্টর থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ১·১ কোটি হেক্টরে। অথচ ঐ সময়ে ছাগল, ভেড়া ও গবাদি পশুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১·৪৪ কোটিতে। বন জঙ্গল কাটা, কাষ্ঠ সংগ্রহও সমানে চলেছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে থর মরুভূমি দ্রুতগতিতে দিল্লীর দিকে এগিয়ে চলেছে। এ কথা সত্য যে ১৯৫৪ সালের তুলনায় ১৯১০ সালে ঐ অঞ্চলে শস্যের গড় উৎপাদন কমে গেছে। কোন কোন ব্লকে গবাদি পশুর খাবার ঘাস প্রভৃতি ১০-১৫ শতাংশ কমেছে। ১৯৫৮ সালে যে লুনি ব্লকের ২৫ শতাংশ বালুকারাশি গ্রাস করেছিল, ১৯৭৬ সালে সেটা বেড়ে হয়েছে ৩৩ শতাংশ, অনেক ঘরবাড়ি চাপা পড়ে গেছে বালির আড়ালে। মরুভূমির বিস্তৃতির জন্য পশ্চিম ও মধ্য ভারতের অনেক অঞ্চল এখন চন্দ্রপৃষ্ঠের মতো শুষ্ক। ভারতের শুষ্ক এলাকা তার মোট ভূমির একের পাঁচ ভাগ। আগ্রাসন এভাবে চলতে থাকলে সারা ভারতই একদিন থর মরুভূমিতে পরিণত হবে।

আফ্রিকার সাহারার সংহার মূর্তি আরও সাংঘাতিক। সাহারার বিস্তৃতি নিয়ে গবেষণা ব্যাপক ভাবেই হয়েছে। সাহারা দক্ষিণ দিকে ক্রমশই এগিয়ে চলেছে। গত পঞ্চাশ বছরে ৬২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা যা একদা কর্ষণযোগ্য বা পশুচারণ ভূমি ছিল তা সাহারা গ্রাস করে নিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মরুভূমি থাবা বাড়াচ্ছে স্তেপ তৃণভূমির দিকে, তৃণভূমি হেরে যাচ্ছে।

শুষ্কভূমি বলতে বোঝায় এমন এলাকা, যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অল্প, বাষ্পীভবন বা বাষ্পীমোচন যেখানে বেশি। এখন পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ—অর্থাৎ ৫ কোটি বর্গ কিলোমিটার এরকম শুষ্কভূমি। এসব ভূমির জন্য যত্ন না নিলে এগুলি অচিরে মরুভূমি হয়ে যাবে। বাস্তবিকই মরুভূমি হয়ে গেছে ২ কোটি বর্গ কিলোমিটার। পৃথিবীতে মরুভূমির গ্রাস এখন প্রায় ৬৩ কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে—যার মধ্যে প্রায় ৮ কোটি লোক প্রত্যক্ষভাবে এখন মরুভূমির আগ্রাসনের কবলে। তাদের জমির উৎপাদনশীলতা কমে গেছে।

সমস্যাসঙ্কুল অঞ্চল হল শুষ্ক ও অর্ধশুষ্ক ভূমি—যার ৯৫ শতাংশ মরুভূমি হয়ে যেতে পারে অচিরেই (তুলনায় নিম্ন আর্দ্র অঞ্চলের ২৮ শতাংশ মরুভূমির রূপ নিতে পারে একদিন)।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, গৃহপালিত পশুর সংখ্যাবৃদ্ধি জনিত চারণভূমির স্বল্পতা, অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও সেচ প্রচেষ্টা, অনাবাদী জমিকে অবৈজ্ঞানিক ভাবে আবাদী করার চেষ্টা ও তজ্জনিত হতাশা, অত্যধিক পরিমাণে জ্বালানী

কাঠ কেটে নেওয়া প্রভৃতির জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চল নেড়া হয়ে পড়ছে, মানুষের দুঃখকষ্ট এতে বাড়ছেই। মাটির এসব সমস্যা ও চাপ ক্রম-বর্ধমান।

সমস্যাটা অজানা নয়—সমাধানের সর্বসম্মত বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচেষ্টারই অভাব। উপরের সমস্যাগুলি মনে রেখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সারা দুনিয়ায় মানুষের পুনর্বাসন প্রকল্প চালু করতে না পারলে মরুভূমিই একদিন মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলবে।

দেশ-বিদেশ

অরুণাচলের অধিবাসী : মিজি

বিচোম নদীর উপত্যকায়, অকা উপজাতিদের বাসস্থলীর ঠিক উত্তরে মিজি উপজাতিরা বসবাস করে। অকাদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য খুবই কম। বরং অকা-মেয়েদের সঙ্গে মিজি-মেয়েদের সাদৃশ্য খুব বেশি। এই দুই উপজাতির মধ্যে বিবাহাদির প্রথা প্রচলিত আছে। পোশাক-পরিচ্ছদে এবং রীতিনীতিতে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন তফাত নেই। মিজিরা অকাদের মতো সব সময় হাঁটুর নিচে কাপড়ের পটি বাঁধে না। কারণ এই অঞ্চলে 'ডিমডামে'র (বিষাক্ত এক ধরনের পোকার) উপদ্রব নেই বললে হয়।

মিজি উপজাতিরা 'ঝুম' চাষী। 'ঝুম' চাষী তাদের বলা হয়, যারা এক জমিতে সব সময় চাষ না করে বিভিন্ন জমিতে চাষ করে। মিজিরা এক জমিতে এক বছরের বেশি চাষ করে না। তবে জমি যদি খুব বেশি উর্বর হয়, তখন অবশ্য এক বছরের বেশিও চাষ করে। তারা দুবার ফসল ঘরে তোলে। নভেম্বর ও মে মাসে এই দুবার তারা শস্য রোপণ করে।

মিজি উপজাতিদের গৃহপালিত পশু মিথন, শুয়োর, ছাগল ও পাখি। খোয়া উপজাতিদের মতো তারাও ছাগলের মাংস খায় না। তারা মিথনকে অন্যান্য পশু-পাখির মতো বেঁধে বা ধরে রাখে না। মিথন ইচ্ছামতো রাস্তাঘাটে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তাদের শুধু ধরা হয় বিবাহের পণস্বরূপ এবং উৎসবাদিতে বলি দেওয়ার জন্য। উৎসবাদিতে অতি আনন্দ করে মিজিরা মিথনের মাংস লবণ দিয়ে খায়।

মিজিরা তাঁতের কাজ জানে না। তাই পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য তাদের উপর নির্ভর করতে হয় প্রতিবেশী উপজাতিদের উপর। হাতের কাজ বলতে তারা শুধু বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি বুনতে পারে।

মিজিরা বিভিন্ন রঙের পুঁথির হার পরতে পছন্দ করে। হাঁটুর নিচে তারা ছোট পুঁথি-দানার হার জড়ায়। মিজি ছেলে-মেয়েরা লম্বা চুল রাখে। মেয়েরা চুল পিছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখে। আর ছেলেরা অকা উপজাতিদের মতো মাথায় ঝুঁটি বেঁধে রাখে। মেয়েরা রূপার অলংকার পরতে খুব ভালবাসে।

মিজি ছেলেদের কোমরে সব সময় তরোয়াল থাকে। তারা ছোট, মাঝারি ও খুব বড় সাইজের —তিন রকমের তরোয়াল ব্যবহার করে। বড় মাপের তরোয়ালটি তারা কোমরের ডানদিকে গলা থেকে ঝোলায়। মিজিরা লোহা গলাতে পারে না বলে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য মোন্‌পা বা শেরদুক্‌পেন উপজাতিদের উপর নির্ভর করে। তারা তীর-ধনুকও ব্যবহার করে। তীরে তীব্র বিষ মাখিয়ে রাখে শত্রু বধ করার জন্য।

মিজি সমাজ দ্যব্দ ও দ্যুল্দ নামে দুটি উপজাতিতে বিভক্ত। সাধারণতঃ বিবাহাদির

সম্পর্ক স্থাপন হয় একই শ্রেণী উপজাতির মধ্যে। ম্যুব্বু ম্যুল্লুদের থেকে উচ্চ জাতি। তাদের জিনিসপত্র বহন করে ম্যুল্লুরা। এই দুই উপজাতির মধ্যে বিবাহাদির সম্পর্ক স্থাপন কখনই হয় না।

মিজি উপজাতির মধ্যে দাসপ্রথার প্রচলন আছে। তারা দাস সংগ্রহ করে নিম্নশ্রেণীর উপজাতি থেকে। মনিব ও ক্রীতদাস একই ঘরে একই সঙ্গে থাকে। মনিবকে ক্রীতদাসের বিবাহাদির ব্যবস্থা সবকিছু করতে হয়। ক্রীতদাসের বিবাহের পরেও মনিব-ক্রীতদাস একই ঘরে থাকে। তবে ম্যুব্বু ও ম্যুল্লুরা মারা গেলে এক জায়গায় কবর দেওয়া হয় না, পৃথক জায়গায় দেওয়া হয় উচ্চ ও নিম্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখার জন্য। পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয় পুত্র। বোনেদের যতদিন বিবাহ না হয়, ততদিন ভাইদের কাছে থাকে।

অশুভের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মিজিরা অনেক রকম দেবতাদের পূজা করে। এই দেবতাদের মধ্যে জাং-লাং-দুই সবচেয়ে শক্তিমান দেবতা। তাঁর পূজা হয় অক্টোবর মাসে। প্রত্যেক গ্রামে পূজা-অর্চা করার জন্য একজন করে ডেওরি (পুরোহিত) থাকে। তারা অক্টোবর মাসের বড় উৎসব পরিচালনা করে। প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট স্থানে নতুন ঘর তৈরি করে তারা জাং-লাং-দুই দেবতার পূজা করে। এই পূজার প্রথম দিন সকালে গোরু এবং রাত্রে শুয়োর বলি দেওয়া হয়। গোরু গ্রামের যে-কেউ বলি দিতে পারে, কিন্তু রাত্রে শুয়োর বলি ডেওরি ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। এই উৎসব চলে সাতদিন ধরে। এই সাতদিন গ্রামবাসীরা নাচে-গানে ও খাওয়া-দাওয়ায় আনন্দে মেতে থাকে

সমালোচনা

A Study of the Philosophy of Vivekananda—Tapas Sankar Dutta, Published by Sribhumi Publishing Company, 79, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9. (1982), pp. 3+314+2 Price : Rs. 50·00

ইংরেজী ভাষায় লিখিত 'বিবেকানন্দ দর্শনের সমীক্ষা' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল লেখকের অনলস সাধনাকে আশ্রয় করে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে লেখক বিবেকানন্দ সাহিত্যের চর্চা করে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার মূলে বুদ্ধ, শংকর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অমিত প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। এই তিনটি জীবন মূর্ত হয়ে উঠেছে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। আবার তারই মধ্যে স্বামীজীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল প্রভা যে জগতে এক নূতন দিগন্ত উদ্ভাসিত করে নূতন যুগের সূচনা করেছে, লেখক আবেগময়ী ভাষায় তা ব্যক্ত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সূক্ষ্মতম জীবনতন্ত্রীর বিস্তারই যে স্বামী বিবেকানন্দের নিবেদিত জীবনে কল্যাণময়, মহিমময়রূপে প্রতিভাত তাও প্রকাশ করতে লেখক ভুলে যাননি।

প্রথম ছটি অধ্যায়ে অদ্বৈত বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। যে মায়া-তত্ত্বের ভিত্তিতে আচার্য শংকর অদ্বৈত বেদান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই মায়া বৈদিক সাহিত্যে ও বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থে বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মায়াবাদ প্রসঙ্গে লেখক আচার্যের অতুলনীয় বৌদ্ধিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন। বুদ্ধদেব ও তাঁর মত সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, ব্যক্তি বা বিশ্বের উৎপত্তি বা লয় সম্বন্ধে তাত্ত্বিক বিচারে যাননি। সুতরাং জীবন-

জিজ্ঞাসায় বৌদ্ধমত তেমন নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়েছিল মানুষের জীবনপথে অসহ্য যন্ত্রণার গুরুভার দেখে। বুদ্ধের প্রেম ও সেবার পথ, অন্তরের অসীম করুণা স্বামী বিবেকানন্দকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। লেখক সার্থকভাবে দেখিয়ে দিলেন শংকরের মেধা এবং বুদ্ধের হৃদয় তথা অদ্বৈত বেদান্ত ও বৌদ্ধ-ধর্মের অসামঞ্জস্য স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনে কেমন সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন ও শংকরের অদ্বৈতবাদ প্রসঙ্গে যে সকল পার্থক্য দেখানো হয়েছে তা সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি ও শংকরের মায়াতে অবশ্যই তফাত আছে, তবে সগুণ ব্রহ্মে ও শক্তিতে প্রভেদ সামান্য। কিন্তু ঐ শক্তিতে আনুগত্য জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের গভীর আগ্রহের কারণ হয়েছে এবং জগৎকে উপহার দিয়েছে সেবারূপ মহান আদর্শ। তা সত্ত্বেও চরম সত্য হিসাবে ব্রহ্ম একমেবা-দ্বিতীয়ম্, গুণাতীত, সীমাতীত—শংকরের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মতের কোন প্রভেদ নেই।

পরের চারটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে: শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমূহ কিভাবে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, কিভাবে তা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্মেলন ঘটিয়ে পরস্পর বিবদমান চিন্তা ও সম্প্রদায়কে এক উদার ভাবধারার অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মধ্যে নিহিত আছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতার কল্যাণময়ী প্রগতি।

লেখকের সুদক্ষ বিশ্লেষণে আরও পাব স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মার্ক্সীয় দর্শনের সাদৃশ্য কতখানি, কোথায় মার্ক্সীয় দর্শনের ব্যর্থতা এবং উপনিষদের চিরন্তন সত্যসকল শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে কিভাবে ভারতীয় সমাজকে সঠিক পথনির্দেশ করে ভারত তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য মঙ্গলময় নবযুগের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবে। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন আচার্য শংকরের অদ্বৈত বেদান্ত থেকে যে-ক্ষেত্রে ভিন্ন বলে লেখক মনে করেন, বিস্তারিত-ভাবে তিনি তা দেখিয়েছেন এবং তাতে বিবেকানন্দের চিন্তায় যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাকে 'নব বেদান্ত' (Neo Vedanta) আখ্যা দেওয়ার যুক্তি আছে। এই আখ্যায় অনেকের সমর্থন না থাকলেও বেদান্তের দৈনন্দিন কার্যে প্রয়োগ এবং সকলভাবই বেদান্তের আধারে সামঞ্জস্য লাভ করতে পারে স্বামীজীর এই অবদানের গুরুত্ব সর্বতোভাবে স্বীকার্য। 'আগামী দিনের মানুষ বিবেকানন্দ' এই অধ্যায়টিতে ভারতচিন্তায় তন্ময় বিবেকানন্দ ভবিষ্যৎ ভারতকে যেন নিজ হাতে হৃদয়ের সমস্ত মমতা ঢেলে গড়ে তোলার কাজে নেমে পড়েছেন—এই অনুভূতি পাঠকের হৃদয়ে শিহরণ জাগাবে। পরের অধ্যায়ের আলোচনায় মানবজাতির শাশ্বত চেতনা বিবেকানন্দের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থখানির যুক্তিনিষ্ঠ অথচ আবেগমিশ্রিত লেখা পড়ে বিবেকানন্দ-অনুরাগী মাত্রেই লেখকের আন্তরিক প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাবেন বলে মনে করি। বিবেকানন্দ সাহিত্যে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন হবার দাবী রাখে।

—স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ (প্রাথমিক) : ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা থানাঞ্চলে ঘূর্ণি-বাত্যার অব্যবহিত পরেই প্রাথমিক ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিশটি বিধ্বস্ত গ্রামের ৩৯৩৫ জন দুর্গত নরনারীর মধ্যে ২৩ এপ্রিল, ১৯৮৩ পর্যন্ত বিতরিত দ্রব্যাদির তালিকা :

চাউল ২৪৪৯ কিলো, গেঞ্জি ১০৫৬টি, লণ্ঠন ৯৮টি ; হাঁড়ি, কড়াই, থালা, গেলাস, ঘটি, হাতা, খুন্তি সর্বসাকুল্যে ২৬৪৮টি ; ১৮২টি খাদিনির্মিত শার্ট ; তদ্ব্যতীত তিন টিন বিস্কুট, ১২২৭ খানি পুরাতন ধৌত পোশাক, এবং আরও বহু পুরাতন ধুতি-শাড়ী ইত্যাদি। গত ১৬ ও ১৭ এপ্রিল, ১৯৮৩ আমাদের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল যথাক্রমে দুর্গত এলাকার ১৪৯ জন এবং কাইগুকুরিয়া ও দীঘা শিবিরের ২৪ জনের চিকিৎসা করে।

আসামে হাঙ্গামাত্রাণ (প্রাথমিক) : গত ৬ মার্চ হইতে ৯ এপ্রিল, ১৯৮৩ পর্যন্ত ডাক্তি শিবিরের (আলিপুরদুয়ার) সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত ১১,৭০৬ জন দুর্গত নরনারীর মধ্যে বিতরিত দ্রব্যাদির তালিকা :

২৩০০ খানি ধুতি, শাড়ী ২২০০টি, তুলার কম্বল ১০০টি, ৪৮০০টি পোশাক ; হাঁড়ি, হাঁড়ির ঢাকনা, ঘটি, বিভিন্ন মাপের (৪½"/৫" ইঞ্চি) গেলাস, বিভিন্ন মাপের (১০"/১১" ইঞ্চি) থালা, বাটি, কড়াই, খুন্তি, হাতা প্রভৃতি এগার প্রকারের ১৩,২০০টি গৃহস্থালী দ্রব্যাদি। আলিপুরদুয়ারের ত্রাণকার্য বর্তমানে সমাপ্ত।

(২) অভয়াপুখ্‌রি, চাপাই, ধোলা, শান্তিপুর এবং খৈরাবাড়ি শিবিরস্থিত ৪৮টি গ্রামের সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত ২১,৩৩২ জন দুর্গত নরনারীকে গত ১৭ এপ্রিল, ১৯৮৩ পর্যন্ত গৌহাটি কেন্দ্রের মাধ্যমে বিতরিত দ্রব্যাদির পরিমাণ :

ধুতি ১৮৯৬টি, শাড়ী ১৬৮৭টি, চাদর ১২৭২টি, ১৮৯৬টি শার্ট, প্যাণ্ট ১৮৯৬টি, ইজার ১৮৯৬টি, ফ্রক ১৮৯৬টি, ২০৭টি মেখলা চাদর ; হাঁড়ি, কড়াই, থালা, গেলাস, বাটি, ঘটি, মগ, হাতা, খুন্তি প্রভৃতি নয় প্রকারের গৃহস্থালি দ্রব্যাদির মোট সংখ্যা ২৪,১৬৮টি। শিশুখাদ্য বিতরণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা

গত ২৫ এপ্রিল, ১৯৮৩ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী কর্তৃক উটকামণ্ড (উটি) মঠের মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের নূতন মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূজ্যপাদ মহারাজ একখানি স্মারক গ্রন্থও এই উপলক্ষে বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে প্রকাশ করেন।

উৎসব

ঢাকা (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ মিশনে গত ১৫ হইতে ১৯ মার্চ, ১৯৮৩ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৪৮তম জন্মোৎসব বিশেষ পূজা, শাস্ত্র-পাঠ, রামায়ণ গান, বাউল গান, চিত্রপ্রদর্শনী, নাট্যানুষ্ঠান, আলোচনা-সভা প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। প্রতিদিন সহস্র সহস্র নরনারী উপস্থিত হইয়াছিল। এই পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আলোচনা-সভায় সভাপতি এবং বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন—স্বামী অক্ষরানন্দ, 'সংবাদ'

পত্রিকার সম্পাদক জনাব আহমদুল কবীর, অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক এ. কে. আহমদুল্লাহ্, অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম, বেগম সুফিয়া কামাল, সমাজকল্যাণ ও মহিলাবিষয়ক মন্ত্রী ডঃ শফিয়া খাতুন, অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহ্সান, ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রীরণধীর সেন, সমবায় ও ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী জনাব মাহ্বুবুর রহমান প্রমুখ।

ইহা ছাড়াও আমাদের নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে :

নারায়ণগঞ্জ (বাংলাদেশ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। **বালিয়াটী** (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। **বাগেরহাট** (বাংলাদেশ) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। **পুরী** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। **মনসাদ্বীপ** (২৪ পরগনা) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। **মেদিনীপুর** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম। **শিলং** (মেঘালয়) রামকৃষ্ণ মিশন।

বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব

গত ২৮ ফেব্রুআরি হইতে ১১ মার্চ, ১৯৮৩ পর্যন্ত, বলরাম মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণের শতবর্ষ-স্মরণোৎসব বহু সাধু ও ভক্তের উপস্থিতিতে দ্বাদশদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ২৮ ফেব্রুআরি কলিকাতার গৌরীমাতা উদ্যানে আয়োজিত মণ্ডপে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। একটি স্মরণিকা গ্রন্থও এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়।

উদ্বোধন-সংবাদ

গত ২১ এপ্রিল শ্রীরামচন্দ্র, ১৭ মে ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য ও ২৬ মে ভগবান বুদ্ধদেবের আবির্ভাবতিথি পালিত হয়।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা

সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার গীতা অথবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ (সুধীর মহারাজ) গত ৭ এপ্রিল ১৯৮৩, ৮৮ বৎসর বয়সে আকস্মিক হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে রাত্রি আট ঘটিকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে কষ্ট পাইতেছিলেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত সন্তান। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। উদ্বোধন, দেওঘর, পাটনা, ঢাকা এবং বরিশাল কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ছাড়াও তিনি বেলুড় মঠ, কনখল, বারাণসী সেবাশ্রম প্রভৃতি কেন্দ্রে নানা সময়ে সেবাকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে দশ বৎসরের অধিককাল তিনি প্রথমে বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে এবং পরে বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন। ঠাকুরের অধিকাংশ সাক্ষাৎ সন্তানদেরই সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন তিনি।

স্বামী অনুরাগানন্দ (ননীগোপাল) গত ২৯ এপ্রিল ১৯৮৩, ৫০ বৎসর বয়সে আকস্মিক গুরুতরভাবে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণহেতু সন্ন্যাসরোগে বিকাল ৪-৪৫ মিনিটে ত্রিবন্দ্রম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ২৫ এপ্রিল উটকামণ্ড (উটি) মঠে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ পূজাদির জন্য তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর

ত্রিবন্দ্রম যাওয়ার পথে ত্রিচুর ও কালাডি ভ্রমণোদ্দেশে যাত্রা করেন এবং যাওয়ার পথেই অসুস্থতা বোধ করেন। কালাডিতে পৌঁছানোর পর প্রথমে তাঁহাকে এর্নাকুলাম হাসপাতালে এবং পরে ত্রিবন্দ্রম হাসপাতালে চিকিসার্থ স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু সর্বপ্রকার সুচিকিৎসা সত্ত্বেও ঐদিনই বৈকালে জীবনের শেষ মুহূর্তটি অকস্মাৎ ঘনাইয়া আসে।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্র-দীক্ষিত। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং তখন হইতে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গুরুসেবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। গত একুশ বৎসর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠের প্রধান মন্দিরের পূজারীর নিত্যকর্ম গভীর নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। সরল এবং কঠোর পরিশ্রমী স্বভাবের জন্য তিনি ছিলেন সবারই প্রিয়।

প্রয়াত দুইজন সন্ন্যাসীর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে চিরশান্তি লাভ করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে গত ২৪ হইতে ২৮ ফেব্রুআরি ১৯৮৩, বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবনির্মিত মন্দিরের শুভ উদ্বোধন ও বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদা ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়া সুসম্পন্ন হয়। সুসজ্জিত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দজী। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধিরূপের আলোকচিত্র যাহা আজ সর্বত্র পূজিত,—তাহার উচ্চ আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তিনি আলোচনা করিয়া বুঝাইয়া দেন। চারিদিনব্যাপী উৎসবে ধর্মসভা, পাঠ, ভজন, যুবসম্মেলন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা

বারাসতের সন্নিকটে বামুনমুড়া গ্রামে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের পৈতৃক ভিটায় রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরে গত ২৪ মার্চ ১৯৮৩, শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে বৈদিক মন্ত্রপাঠ, বিশেষ পূজা, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি হয়। অনুষ্ঠানে বেলুড় মঠের বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। প্রায় আট হাজার ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ত্রিপুরার প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল ও বিশিষ্ট সমাজসেবী **হেমচন্দ্র নাথ** গত ২০ এপ্রিল ১৯৮৩, ভোর ৪-৪৫ মিনিটে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮০ বৎসর তিনি আগরতলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সহিত প্রায় প্রথম হইতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সংযুক্ত ছিলেন। বহু বৎসর তিনি এই আশ্রমের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিতও যুক্ত ছিলেন। ত্রিপুরাবাসী একজন প্রবীণ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তকে হারাইলেন—সরল মধুর ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য যিনি সকলের প্রিয় এবং শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

হেমবাবুর দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণচরণে শান্তি লাভ করুক, ইহাই কামনা।

এই মাসের পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা
৮ম সং, পৃঃ ১২৮, মূল্য : ২.৫০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
৫ম সং, পৃঃ ২৫৮, মূল্য : ১০.০০

কথোপকথন—স্বামী বিবেকানন্দ
৮ম সং, পৃঃ ১৩৫, মূল্য : ৫.০০

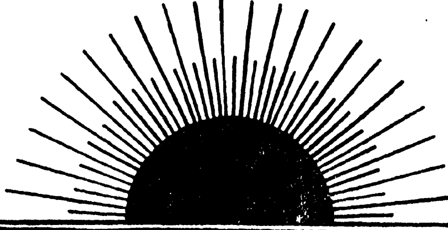
The Master as I Saw Him—Sister Nivedita
13th Ed., Page—336, Price : 15.00

উদ্বোধন কার্যালয়। ১ উদ্বোধন লেন। কলিকাতা-৩

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।



উদ্বোধন

পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১০ম-১১শ সংখ্যা ● আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৩০৭-৩২৬)

পত্রের [উদ্বোধন পত্রিকার] প্রচার তো গৃহীদেরই কল্যাণের জন্য। দেশে নবভাবপ্রচারের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম বুঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করছিস? আমাদের উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় দ্বারা টাকা জমাবার মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, মাগছেলে নেই যে, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে। Success (কাজ হাসিল) হয় তো এর income (আয়টা) সমস্তই জীবসেবাকল্পে ব্যয়িত হবে। স্থানে স্থানে সঙ্ঘ-গঠন সেবাশ্রম-স্থাপন, আরও কত কি হিতকর কাজে এর উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যয় হ'তে পারবে। আমরা তো গৃহীদের মতো নিজেদের রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি না। শুধু পরহিতেই আমাদের সকল movement (কাজকর্ম)—এটা জেনে রাখবি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

●● জনৈক ভক্তের সৌজন্যে ●●

যে সকল কারণে কুলি সংগ্রহ কার্য্যে প্রলোভন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বলা হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বিনা প্রলোভনে কুলি সংগ্রহ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে কিনা, মনে একটা ভয় বা কুসংস্কার জন্মিয়া গেলে, তাহা দূর করা সহজ কথা নহে, আবার সেই ভয় বা সংস্কার অসভ্য, বর্ব্বর ও মূর্খদিগের মধ্যে এতই বদ্ধমূল হইয়া থাকে, যে তাহা বিদূরিত করা একেবারে অসম্ভব। এই জন্যই আড়কাটিদিগকে প্রলোভনের সাহায্য লইতে হয় এবং যতদিন পর্য্যন্ত আসাম দেশে সমূহ পরিমাণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন আড়কাটি দ্বারা স্থানান্তর হইতে লোক আমদানী না করিলে, আসাম দেশে চাষ আবাদ বা কোন বৃহৎ ব্যবসায় চলিবে না। আড়কাটি প্রথা উঠিয়া গেলে দেশের একটা মহা সর্ব্বনাশ হইবে, আসামের চা ব্যবসায় মাটি হইবে, অধিক কি আসাম প্রদেশটাই নষ্ট হইবে। (ক্রমশঃ।)

ভাবদা-অনাথাশ্রম।

[১৬৯ পৃষ্ঠার পর]

কৃতজ্ঞতার সহিত বক্তব্য যে, একা লালগোলাধিপতি উদারচেতা শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় সাহেব মহাশয় উক্ত কয়েক মাসের মধ্যে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা নগদ, ৩৬ মণ রবিশস্য এবং কতকগুলি পরিধেয় বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। আমাদিগকে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, রাও সাহেবের উক্ত সাহায্য না পাইলে আমরা কেবল মাত্র পূর্ব্বোক্ত আর্থিক সাহায্যের দ্বারা অনাথ আশ্রমের ব্যয় সংকুলান করিতে পারিতাম না। মাসিক-সাহায্য স্বরূপ অবশিষ্ট কয়েক টাকা আমরা কলিকাতা ও দারজিলিঙ্গের কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কলিকাতা, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল দেশীয় কতিপয় মহোদয়ের নিকট আমরা এককালীন সাহায্য স্বরূপ ১৪৯৲ একশত উনপঞ্চাশ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদ জেলার কৈঁয়া নিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বসু মহাশয় প্রায় ১০ মণ রবিশস্য এবং আরও কতিপয় সহৃদয় মহোদয় কয়েকখানি পুস্তক ও কিছু বস্ত্রাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত বক্তব্য যে, বসুমতীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকগুলি দান করিয়া আমাদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

লালগোলা হইতে যে রবিশস্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহাতেই অদ্যাপি আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহ চলিতেছে এবং এক্ষণে তাহা প্রায় নিঃশেষিত। কয়েক মণ শস্য ও কতকগুলি বস্ত্রাদি আমাদিগকে আশ্রমের চিকিৎসক ও অন্যান্য কার্য্যকারীগণকে দিতে হইয়াছে।

এই কয়েক মাসে (সূত্রধরের সাহায্যে) বালকগণ পুস্তক রাখিবার একটী র‍্যাক্, একটী সিন্দুক, একটী আলমায়রা এবং একটী টেবল্ প্রস্তুত করিয়াছে; এবং (দরজীর সাহায্যে) কয়েকটী কোট, প্যাণ্ট ও টুপি এবং তন্তুবায়ের সাহায্যে যে কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা আশ্রমেরই ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে।

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০, পৃঃ ২৪৯)

অনাথাশ্রমের বালকগণ এবং কার্যকারীগণের সংখ্যা সময় সময় ১৭ জন পর্য্যন্ত হইয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত ক্ষুধাতুর আগন্তুকদিগকে প্রায়ই আমাদিগকে অন্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে হয়।

আমরা অতিশয় আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, গত এপ্রেল মাসের ২রা তারিখে বহরমপুরের সিভিল্ সারজন্ মেজর জে, এইচ্, ওয়ালস্ মহোদয় এবং বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ রেশম ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ফার্গুসন সাহেব অনাথ আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনাথ বালকদিগের স্বহস্তে প্রস্তুত কয়েকটী কায কর্ম্ম দেখিয়া বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাহা তাঁহারা আমাদিগকে সাধারণে বিক্রয় করিতে অনুরোধ করেন।

উদারচেতা ডাক্তার সাহেব অনাথ আশ্রমের ঐকান্তিক শুভেচ্ছু। তিনি স্বতঃ পরতঃ অনাথ আশ্রমের সাহায্য করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি অনাথ আশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণ-ফণ্ডে এককালীন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ডেঃ, চেয়ারম্যান মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত মিঃ, জে, আর, ব্ল্যাকউড্ মহোদয় অনাথ আশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণ-ফণ্ডে এককালীন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। অনাথ আশ্রমের প্রতি উক্ত রাজপুরুষ মহোদয় দ্বয়ের যে সহানুভূতি—তাহাতে আমরা বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছি এবং এজন্য তাঁহারা কেবল আমাদিগের কেন—সর্ব্বসাধারণেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কলিকাতার বদান্য প্রবর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় গত জানুয়ারী মাসে একটী অনুমান ৮।৯ বর্ষীয় অনাথ বালকের শিক্ষা ও ভরণপোষণের ভার আমাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া আমাদিগের চিরাভিলষিত কার্য্যের সহায়তা করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন এবং তদবধি বরাবর তিনি অনাথ আশ্রমের হিতকল্পে মাসিক ১০৲ দশ টাকা দিয়া সাহায্য করিতেছেন।

অনাথ আশ্রমের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য যে ইট্ পোড়ানো হইয়াছে, সেজন্য আমাদিগের যে কয়েক শত মণ কয়লার আবশ্যক হইয়াছিল, আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, তাহা আমরা কাসিমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।

কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটির শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল মল্লিক মহাশয় অনাথ আশ্রমের হিতকল্পে এককালীন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবং আজিমগঞ্জের রায় মেতাব চাঁদ লাহার বাহাদুর এককালীন ২৫৲ পঁচিশ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতা বাগবাজার বোসপাড়ার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র বসু মহাশয় অনাথ আশ্রম গৃহ-নির্ম্মাণ-ফণ্ডে এককালীন ২০৲ কুড়ি টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

উক্ত সাহায্যকারী মহোদয়গণকে আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং ৺সমীপে আমরা প্রার্থনা করি যে, তাঁহারা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া উত্তরোত্তর স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হউন।

২৭শে মে রবিবার প্রাতে মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ত্তমান সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত ডব্লিউ ম্যাক্সওয়েল মহোদয় অনাথ আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কালেক্টার সাহেবের

(৮৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৫০)

শুভাগমনে এবং মধুর উৎসাহকর বাক্যে আমরা পরমাপ্যায়িত হইয়াছি এবং তাঁহার অমায়িক ব্যবহার দেখিয়া আমাদের আশা হয়, যে তাঁহার মত উদার, ধীর, সদ্বিবেচক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিয়া আমরা নিশ্চয়ই একদিন এই অনাথ আশ্রমটিকে স্থায়ী করিয়া লোক-সমাজের হিতসাধন করিতে সমর্থ হইব। (স্বাক্ষর) অখণ্ডানন্দ।

হিমালয়ে বাঙ্গালীর উপনিবেশ।

(প্রাপ্ত)

১৫ই মাঘের উদ্বোধনে "হিমালয়ে বাঙ্গালীর উপনিবেশ" সম্বন্ধে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়া অবধি অনেকে ঐ প্রস্তাবের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যোগাদি বিষয়ে আগ্রহের সহিত পত্র লিখিয়াছেন। এই সময়ে প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে, যাহা করা আবশ্যক লিখিলে মন্দ হইবে না।

প্রথম প্রবন্ধে বলা হইলেও কথাটি আবার পরীক্ষা করিয়া বলা দরকার যে, এখানে কৃষি বা বাণিজ্য দ্বারা 'রাতারাতি বড় মানুষ' হইবার আশা খুব কম। অর্থোপার্জ্জনই যাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য, এ স্থানে তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়া বোধ হয় না। শীঘ্র ত নহেই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাঁহারা সুস্থ সবল শরীর ও মানসিক স্বাধীনতাকে অর্থাপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সমস্ত নির্জ্জন পার্ব্বত্য প্রদেশ মনোমত হইতে পারে।

আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার উপনিবেশীদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহ ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য কি কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে ও এখনও হয়, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। এংগ্লো স্যাক্সন্ জাতি কষ্টের আতঙ্কে পশ্চাৎপদ হন না, তাই না তাঁহারা আজ এত শক্তিমান? আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ধনকুবেরদিগের গোড়ার খবর পাইলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? কপর্দ্দকশূন্য, সহায়তাশূন্য, বালক বা যুবক কোন বিদেশে বা উপনিবেশে যাইয়া, অদমনীয় সাহস ও অধ্যবসায়ের সহিত দুঃখের পর দুঃখ, কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করিয়া, অপর একটি সামান্য বৃত্তি, কৃষিকার্য্য, পশুপালন বা বাণিজ্য অবলম্বনে ধীরে ধীরে প্রচুর ধনের অধিকারী হইলেন। চরিত্র, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা, কার্য্যক্ষেত্রে না নামিলে, দুঃখ বিপদের সহিত সংগ্রাম না করিলে, কি আপনা হইতে জন্মায়? বুদ্ধি চালনার মধ্যে কি না কলমপেষা, আর সাহসিকতার মধ্যে কিনা চলায়মান ট্রামগাড়ি হইতে নামা বা তাহাতে উঠা; এই করিয়াই ত চিরকালটা যাইতে বসিয়াছে। 'বিদেশে, বিভুঁয়ে, কি হবে',—এই ভয়েই যদি গৃহের কোণ না ছাড়া হয়, যদি পরিশ্রম বা ভাবী বিপদের আতঙ্কেই, এই হীনাৎ হীনতর দশা শুধরাইবার চেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়, ভাবুন দেখি, বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা কখন ঘুচা উচিত কি?*

---

* কেহ যেন ভ্রম না করেন যে, আমাদের মতে হিমালয়ে উপনিবেশ করিলেই বাঙ্গালীর সর্ব্ব দুঃখ দূর হইবে। যদি কেহ এরূপ বুঝেন, তাহা হইলে আমরা নাচার। যে সমস্ত বৃত্তি ও শক্তিলাভ হইলে, একটি জাতি মনুষ্যত্বের উচ্চ সীমায় আরোহণ করিতে পারে, বর্ত্তমান উপনিবেশের প্রস্তাব, সেই সমস্ত বৃত্তি ও শক্তির সামান্য মাত্র চালনার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য। আমরা চাহি, বাঙ্গালী চরিত্রে ঐ গুণ সমষ্টি দেখিতে,—উপনিবেশ একটি সাধন মাত্র।

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০, পৃঃ ২৫১)

জনশূন্য স্থানে উপনিবেশ হইয়া থাকে। এজন্য সেখানে বাটী ঘর, বাজার, দোকান, চাকর প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় না। উপনিবেশীদিগকে ধীরে ধীরে সমস্ত আবশ্যকীয় পদার্থগুলি করিয়া লইতে হয়। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উপনিবেশ করিতে হইলে, আপনার শরীর ও বুদ্ধির উপরই নির্ভর করিতে হয়। পরের ভরসায় কার্য্য চলে না।

তবে এ অঞ্চল একেবারে জনশূন্য নহে। আরও প্রধান কথা, এখানে স্বাস্থ্য ভাল না থাকিবার কোন কারণ নাই। এজন্য পরিশ্রমের লাঘব ও কঠিন পরিশ্রম করিবার শক্তি, এই দুইটি লাভেরই সম্ভাবনা আছে।

যাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম করিতে কাতর, তাঁহারা যে, 'প্রথম উপনিবেশী' হইতে পারেন না, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কোন একটি সামান্য কার্য্য প্রথম আরম্ভ করিতে হইলে, কত পরিশ্রম ও চিন্তার প্রয়োজন হয়। একটি উপনিবেশ স্থাপনে কত চিন্তা, কত দৃঢ়তা, কত শ্রম, লাগিবে সহজেই বুঝা যায়।

একের বোঝা, দশের লাঠি। অতএব প্রথম প্রয়োজন হইতেছে, যাহারা এ প্রস্তাবে উদ্যোগী, তাঁহাদের একত্র মিলিত হওয়া। মাননীয় 'উদ্বোধন' সম্পাদক দয়া করিয়া কিছু কষ্ট স্বীকার করিলে, এ প্রয়োজনটি সহজে সিদ্ধ হইতে পারে। যাঁহারা স্বতঃ বা পরতঃ উপনিবেশ স্থাপনে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উদ্বোধন সম্পাদককে স্বীয় স্বীয় নাম ধাম ও অবসরকাল জ্ঞাত করিয়া পত্র লিখিলে, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া সকলের সুবিধা মত একটি সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কোন স্থানে তাঁহাদের আহ্বান করেন তাহা হইলে, তাঁহারা সকলে তথায় মিলিত হইতে পারেন ও উপনিবেশ স্থাপনের উপায়াদি সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় প্রয়োজন, সকলে মিলিত হইলে, দুই বা তিন জন ব্যক্তি নির্ব্বাচন করা—এই সমস্ত স্থান ও এখানে কৃষি, বাণিজ্য, আবাস প্রভৃতির সুবিধা, অসুবিধা দেখিতে আসিবার জন্য। এটি করা নিতান্ত আবশ্যক।

উত্তমরূপে না দেখিয়া শুনিয়া এত বড় একটা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

যদি উপরোক্ত উপায়গুলি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় এবং কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে সভা হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া, মায়াবতীতে কেহ আসিলে, তাঁহাদিগকে আবশ্যকীয় বিষয়গুলি দেখাইবার শুনাইবার বন্দোবস্ত করান যাইতে পারে।

"সনন্দ।"

ভগবদ্গীতা শঙ্করভাষ্যানুবাদ

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত)

[গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের ভাষ্যের শেষাংশ ও বঙ্গানুবাদ ; ৫—১১ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ এবং ১২ সংখ্যক শ্লোকের মূল, অন্বয়, মূলের অনুবাদ ও ভাষ্যের প্রথমাংশ—বর্ত্তমান সম্পাদক]

(৮৫তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৫২)

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।] ১লা শ্রাবণ। (১৩০৭ সাল) [১১শ সংখ্যা।]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।] [১৭৫ পৃষ্ঠার পর।

এখন চলুক পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের কথা। প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীদের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন, যে নির্ব্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম্ম বন্ধ কর, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু-চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর, আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্ব্বদা কার্য্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু "উল্টা সমঝলি রাম" হ'ল; ওরা, ইউরোপীরা, যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহারজোগুণ, মহাকার্য্যশীল, মহা উৎসাহে দেশ-দেশান্তরের ভোগ সুখ আকর্ষণ ক'রে ভোগ করছে। আর, আমরা কোণে বসে, পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত, মরণের ভাবনা ভাবছি, "নলিনীদলগতজলমতি তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং" গাচ্ছি; আর, যমের ভয়ে হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে, আর পোড়া যমও তাই বাগ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে। গীতার উপদেশ শুনলে কে? না—ইউরোপী। আর, যীশুক্রীষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা!! এ কথাটা বুঝতে হবে। মোক্ষমার্গ ত প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তার পর, বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐখান থেকেই ত যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী, নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ—বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে, জোর করে দুনিয়াশুদ্ধকে ঐ মোক্ষ মার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘসে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে 'আপনার করা' কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বল,—কিছুই নয়। হয় তুমি মোক্ষ পাবে বল, নয় তুমি উৎসন্ন যাও, এ দুই কথা। মোক্ষ ছাড়া যা কিছু চেষ্টা কর্‌বে, সে আট ঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে, তার কোনও রাস্তা নাই, বরং প্রতিপদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্ম্মে এই চতুর্ব্বর্গ সাধনের উপায় আছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্ব্বনাশ; যীশু কর্‌লেন গ্রীস্ রোমের সর্ব্বনাশ!!! তার পর, ভাগ্যফলে ইউরোপীগুলো প্রটেষ্টাণ্ট (Protestant) হয়ে, যীশুর ধর্ম্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্ম্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্ব্বর্গের সমন্বয়রূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্ত্তন কল্লেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হ'ল। তবে ভারতবর্ষে ৩০ ক্রোড় লোক, দেরি হচ্ছে। ৩০ ক্রোড় লোককে চেতানো কি এক দিনে হয়?

বুদ্ধধর্ম্মের আর বৈদিক ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক না। উপায় যদি ঠিক হ'ত, ত আমাদের এ সর্ব্বনাশ কেন হ'ল? 'কালেতে হয়' বল্লে কি চলে। কাল কি, কার্য্যকারণসম্বন্ধ ছেড়ে, কাজ ক'র্ত্তে পারে?

অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও, উপায়হীনতায় বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে। বৌদ্ধবন্ধুরা চটে যাও, যাবে; ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। সত্যটা বলা উচিত। উপায় হচ্ছে

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০, পৃঃ ২৫৩)

বৈদিক উপায়,—"জাতিধর্ম্ম", "স্বধর্ম্ম", যেটি বৈদিক ধর্ম্মের, বৈদিক সমাজের ভিত্তি। আবার, অনেক বন্ধুকে চটালুম, অনেক বন্ধু বলছেন যে, এ দেশের লোকের খোসামুদি হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের জন্ম বলে রাখা যে, দেশের লোকের খোসামোদ করে আমার লাভটা কি? না খেতে পেয়ে মরে গেলে দেশের লোকে একমুঠা অন্ন দেয় না; ভিক্ষে শিক্ষে করে, বাইরে থেকে এনে, দুর্ভিক্ষ অনাথকে যদি খাওয়াই, ত তার ভাগ নেবার জন্ম দেশের লোকের বিশেষ চেষ্টা, যদি না পায়, ত গালাগালির চোটে অস্থির!! হে স্বদেশি-পণ্ডিতমণ্ডলিন্! এই ত আমার দেশের লোক, তাদের আবার কি খোসামোদ? তবে তারা উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদকে যে ঔষধ খাওয়াতে যাবে, তার হাতে দু দশটা কামড় অবশ্যই উন্মাদ দেবে; তা সয়ে যে ঔষধ খাওয়াতে যায়, সেই যথার্থ বন্ধু। "এই জাতিধর্ম্ম", "স্বধর্ম্মই" সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়, মুক্তির সোপান। ঐ "জাতিধর্ম্ম", "স্বধর্ম্ম" নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম সিধুরাম যা জাতিধর্ম্ম স্বধর্ম্ম বলে বুঝছেন, ওটা উল্টো উৎপাত: নিধু জাতিধর্ম্মের সবই বুঝছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা কচ্ছেন, নিজের কোলে ঝোল টানছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন। আমি গুণগত জাতির কথা বলছি না, বংশগত জাতির কথা বলছি, জন্মগত জাতির কথা বলছি। গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি; কিন্তু, গুণ দু-চার পুরুষে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। সেই আসল জায়গায় ঘা পড়েছে, নইলে সর্ব্বনাশ হ'ল কেন? "সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।" কেমন করে এ ঘোর বর্ণসাঙ্কর্য্য উপস্থিত হ'ল, সাদা রং কাল কেন হ'ল, সত্ত্ব গুণ, রজোগুণ প্রধান তমোগুণে, কেন উপস্থিত হ'ল, সে সব অনেক কথা, বারান্তরে বলবার রইল। আপাততঃ এইটি বোঝো যে, জাতিধর্ম্ম যদি ঠিক ঠিক থাকে, ত সে দেশের অধঃপতন হবেই না। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমাদের অধঃপতন কেন হ'ল? অবশ্যই জাতিধর্ম্ম উৎসন্নে গেছে। অতএব, যাকে তোমরা জাতিধর্ম্ম বলছো, সেটা ঠিক উল্টো। প্রথম, পুরাণ পুঁথি পাটা বেশ করে পড়'গে, এখুনিই দেখতে পাবে যে, শাস্ত্রে যাকে জাতিধর্ম্ম বলছে, তা সর্ব্বত্রই প্রায় লোপ হয়েছে। তার পর, কিসে সেইটি ফের আসে, তারি চেষ্টা কর; তা হলেই পরম কল্যাণ নিশ্চিত। আমি যা শিখেছি, যা বুঝেছি, তাই তোমাদের বলছি; আমি ত আর বিদেশ থেকে, তোমাদের হিতের জন্ম আমদানী হইনি যে, তোমাদের আহাম্মকিগুলিকে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে? বিদেশী বন্ধুর কি? বাহবা লাভ হলেই হ'ল। তোমাদের মুখে চুণকালী পড়লে, যে আমার মুখে পড়ে,—তার কি?

পূর্ব্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতিনীতি, সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী করে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবনে ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতিনীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতিনীতিগুলির হ্রাস বৃদ্ধিতে বড় বেশী এসে যায় না; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছ যে, রাক্ষুসীর প্রাণ একটা পাখীর মধ্যে ছিল। সে পাখীটার নাশ না হলে, রাক্ষুসীর কিছুতেই নাশ হয় না, এও তাই। আবার দেখবে যে, যে অধিকারগুলো

জাতীয় জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, সে অধিকারগুলো সব যাক্ না, সে জাতি বড় তাতে আপত্তি করে না ; কিন্তু, যখন যথার্থ জাতীয় জীবনে ঘা পড়ে, তৎক্ষণাৎ মহাবলে প্রতিঘাত করে।

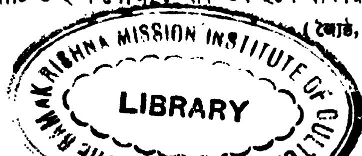
তিন্‌টি বর্ত্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তর জান,—ফরাসী, ইংরেজ, হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসীজাতিচরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয় ; কর-ভারে পিসে দাও, কথা নেই ; দেশশুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নেই ; কিন্তু, যেই সে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারুর উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পাবে না, এইটিই ফরাসী চরিত্রের মূলমন্ত্র। 'জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ বংশ, নীচ বংশ, রাজ্য শাসনে, সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার'। এর উপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হবে।

ইংরাজ চরিত্রে, ব্যবসাবুদ্ধি আদান প্রদান, প্রধান ; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ ইংরেজের আসল কথা। রাজা কুলীনজাতি-অধিকার ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে ; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার কর্ত্তে হয়, ত তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা,—মান্য করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও, ত তার কার্য্য কারণ, হিসাব পত্রে, আমি দু কথা বলবো, বুঝবো তবে দিব। রাজা জোর করে টাকা আদায় কর্ত্তে গিয়ে, মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন ; রাজাকে মেরে ফেললে।

হিন্দু বল্‌ছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা,—'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য ; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল, সব ঐখানে এক মত। ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্ব্বনাশ ; তা ছাড়া যা কর, চুপ করে আছি। লাথি মার, কাল বল, সর্ব্বস্ব কেড়ে লও, বড় এসে যাচ্ছে না ; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ। এই দেখ বর্ত্তমানকালে পাঠানবংশরা আসছিল, যাচ্ছিল, কেহ সুস্থির হয়ে রাজ্য কর্ত্তে পাচ্ছিল না ; কেন না, ঐ হিঁদুর ধর্ম্মে ক্রমাগত আঘাত কচ্ছিল। আর মোগল রাজ্য কেমন সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হ'ল। কেন ? না মোগলরা ঐ যায়গাটায় ঘা দেয়নি। হিঁদুরাই ত মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি ; জাহাঙ্গীর, সাজাহান্, দারাসেকো, এদের সকলের মা যে হিঁদু। আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অম্‌নি এত বড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল। ঐ যে ইংরেজের সুদৃঢ় সিংহাসন, এ কিসের উপর, ঐ ধর্ম্মে হাত কিছুতেই দেয় না বলে। পাদরী পুঙ্গবেরা একটু আদটু চেষ্টা করেই ত, '৫৭ সালের হাঙ্গাম উপস্থিত করেছিল। ইংরাজরা যতক্ষণ এইটি বেশ করে বুঝবে এবং পালন করবে, ততক্ষণ ওদের "তকত তাজ অচল রাজধানী"। বিজ্ঞ বহুদর্শী ইংরেজরাও এ কথা বোঝে, লর্ড রবার্টসের 'ভারতবর্ষে ৪০ বৎসর' নামক পুস্তক পড়ে দেখ।

এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছ ত, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায় ? ধর্ম্মে। সেইটির নাশ কেউ কর্ত্তে পারেনি বলেই, জাতটা এত সয়ে, এখনও বেঁচে আছে। আচ্ছা, এক জন দেশী পণ্ডিত বল্‌ছেন যে, ওখানটায় প্রাণটা রাখবার এত আবশ্যক কি ? সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় রাখনা কেন ?—যেমন অন্যান্য অনেক দেশে। কথাটি ত হ'ল সোজা ; যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে,

(জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০, পৃঃ ২৫৫)



ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিথ্যা, তা হলেও কি দাঁড়ায়, দেখ। অগ্নি ত এক, প্রকাশ বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু, এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দী কতক নানা সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে, ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তাঁরি প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্ত্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা, না তোমার বিদেশীয় দু-পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা? ইংরেজ কেন ধর্ম্মপ্রাণ হ'ক্ না, মারামারি কাটাকাটিগুলো ভুলে শান্ত শিষ্টটি হয়ে বসুক্ না?

আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে, ত ইদিক উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এই মাত্র। সে নদী যেমন করে হ'ক্, সমুদ্রে যাবেই, দু দিন আগে বা পরে, দুটো ভাল যায়গার মধ্য দিয়ে, না হয় দু-একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে, ত তার আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নূতন চরিত্র গড়্‌তে গেলেই মরে যাবে বইত নয়।

কিন্তু, এ বুদ্ধিটি আগা-পাস্তলা ভুল; মাপ করো, অল্পদর্শীর কথা। দেশে দেশে আগে যাও, এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তার পর যদি মাথা থাকে ত ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরাণ পুঁথি পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশদেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চক্ষে নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধ্বক্ ধ্বক্ করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এ দেশের প্রাণ ধর্ম্ম, ভাষা ধর্ম্ম, ভাব ধর্ম্ম;—আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তাঝেটান, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এ সব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ ধর্ম্মের মধ্য দিয়ে হয় ত, হবে; নইলে তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!

তা ছাড়া উপায় ত সব দেশেই সেই এক, অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে; বাকি গুলো খালি "ভেড়িয়া ধসন্" বইত নয়। ও তোমার "পার্লেমেন্ট" দেখলুম, "সেনেট্" দেখলুম, ভোট্, ব্যালট্, মেজরিটি, সব দেখলুম, রামচন্দ্র; সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা, যে দিকে ইচ্ছে, সমাজকে চালাচ্ছে, বাকি গুলা ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে শক্তিমান পুরুষ কে? না ধর্ম্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তাঁরাই সমাজের রীতি-নীতি বদ্‌লাবার দরকার হলে, বদলে দেন। আমরা চুপ করে শুনি, আর করি। তবে এতে তোমার বাড়ার ভাগ, ঐ মেজরিটি ভোট্ প্রভৃতি হাঙ্গামগুলো নেই, এই মাত্র।

অবশ্য ভোট্ ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না; কিন্তু, রাজনীতির নামে যে চোরের দল, দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নাই। সে ঘুষের ধুম্, সে দিনে ডাকাতি যা পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে, ত মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে। "গোরস্ গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠ্ বিকায়", "সতীকো না মিলে ধুতি, কস্‌বিন্ পেছনে খাসা।"

(৮৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৫৩)



৮৫তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৯০

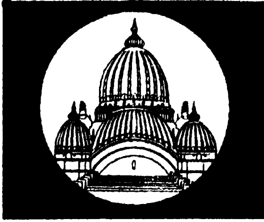
দিব্য বাণী

…পথ ভীষণ কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, তাহা আমরা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শত-শতযুগসঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

তবে এস, ভ্রাতৃগণ! সমস্যাটির অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া দেখ! এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। কিন্তু আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের জয় হউক—আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উহাতে ব্রতী হইতে প্রস্তুত থাকিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে! রোগ কি বুঝিলে, ঔষধ কি তাহাও জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে ও তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্রের প্রবন্ধসমূহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব,—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩৬৭]



কথাপ্রসঙ্গে

রথযাত্রা : বিচিত্র পথে

'শরীরং রথমেব তু'।

শরীর যেন একখানি রথ। জিজ্ঞাসু নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া স্বয়ং ভগবান বৈবস্বত এই রূপক ব্যবহার করিয়াছেন। কঠোপনিষদে সেই রথের বর্ণনা কী অপূর্ব! বিষয়-পথে ধাবমান শরীর-রথখানিকে টানিয়া লইয়া ইন্দ্রিয়-ঘোড়াগুলি ছুটিতেছে। বুদ্ধিরূপ সারথি মন-লাগাম জুড়িয়া তেজী ঘোড়াগুলির গতিকে সবলে নিয়ন্ত্রণরত। আর রথস্বামী আত্মা অচঞ্চল শান্ত মূর্তিতে বিরাজমান,—রথের গতিবেগ তাঁহাকে আদৌ স্পর্শ করিতেছে না। ভারতীয় অধ্যাত্ম-মনীষার এমন ব্যঞ্জনা বিশ্বের যে-কোন উৎকৃষ্ট কাব্যকেও পরাহত করে। চঞ্চলতার পটভূমিতে স্থিরতা, অথবা মুখর পরিবেশে মহামৌনের অবস্থিতি,—এই ভাবটিই আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তার চরম উৎকর্ষ। যেন চলমান সুর-তরঙ্গের মাঝে নিহিত একটি বাণী! বাণী ও সুরের সম্মিলনেই তো সঙ্গীত,—অন্যথায় উহারা অর্থহীন। আমাদের জীবন-সঙ্গীতেরও আদর্শ ইহাই।

শ্রীভগবানকে লইয়া 'রথযাত্রা' মহোৎসবের সমারোহ, মনে হয় ঐ চিরন্তন সূক্ষ্ম আদর্শকেই সর্বজনের হৃদয়-দুয়ারে পৌছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে একটি সুকুশল প্রয়াস,—যাহা পুরাণকারগণ বিশেষ নৈপুণ্য সহ রচনা করিয়াছেন।

কঠ-শ্রুতি আরও বলিয়াছেন : ঊর্ধ্বে অধে প্রবহমান প্রাণ-অপানের নিরন্তর গতির মাঝেও কিন্তু সদা-বন্দিত সেই তিনি স্ব-মহিমায় আসীন রহিয়াছেন,—ইন্দ্রিয়-দেবতারা তাঁহারই উপাসনায় রত,—তাঁহারই প্রেরণায় সকলের সকল কর্ম। 'মধ্যে বামনম্ আসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।' দেহ-মধ্যে সমাসীন এই বামনদেবকে, বন্দনীয় আত্মাকে জানা এবং তাঁহার সংসার-পরিক্রমণের মর্মোপলব্ধি করাই আমাদের জীবনব্যাপী সাধন। রথারূঢ় বামন, নির্বিকার শান্ত আত্মাই জগন্নাথ—তাঁহাকে লইয়াই তো দেহ-রথের এই রহস্যময় সংসারযাত্রা। প্রাচীনগণ তাই বলিয়া থাকেন, দেহ-রথে পরিভ্রমণশীল এই বামনবেশী জগন্নাথকে অন্তরাত্মারূপে, অথবা স্বীয় শরীরস্থ আত্মাকেই জগতের নাথ জগদ্বন্ধু বলিয়া জানিতে পারার নামই জ্ঞানলাভ—যাহা দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর বিড়ম্বনা চিরতরে ঘুচিয়া যায়। 'রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' রথোপরি বামনদেবকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা লইয়া তাই মুমুক্ষু সাধক-সাধিকাগণ যুগ যুগ ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

'রথস্থং বামনং'—স্থূল দৃষ্টিতে তাঁহাকে বামনই দেখায় বটে! অতিশয় খর্বতনু—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন অনুপাতহীন! লৌকিক অর্থেও তিনি বামনরূপধারী। প্রথমেই আমাদের দৃষ্টিকে টানিয়া লয়, তাঁহার সুবিশাল চক্রাকার পলকহীন দুই নয়ন। ত্রিকালের সাক্ষী দ্রষ্টা যিনি, তাঁহার নেত্রে পাতা পড়িবার অবকাশ কোথায়? 'সর্বতো অক্ষি' যিনি তাঁহার আঁখি চক্রাকৃতি,—দৃষ্টিও হইবে সর্বদিক্‌প্রসারী। বামনদেবের হস্ত-পদ

আছে, অথচ নাই। তাঁহার রূপেও যেন অরূপেরই আভাস। সর্বব্যাপী সনাতন সাক্ষী যিনি,—কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি যাঁহাতে আরোপিত মাত্র, তাঁহার অবয়ব-কল্পনা তো এমনটিই স্বাভাবিক।

'তৎ এজতি তৎ ন এজতি'—তিনি চলেন, আবার চলেন না। ঈশ-শ্রুতিও ইহাই বলেন। 'ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ'—শ্রীভগবান স্বয়ং গীতামুখে বলিয়াছেন, জগৎপ্রভু কর্তৃত্ব করেন না, কর্মফলও সৃষ্টি করেন না। অবশ্য পারমার্থিকভাবে তিনি অকর্তা হইলেও তাঁহারই মায়াতে অজ্ঞান-দৃষ্টিপ্রযুক্ত আমরা তাঁহাকে কর্তা বলিয়াই দেখিয়া থাকি। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যকে জলের কম্পনে যেমন কম্পিত দেখায়—অনেকটা যেন ঐরূপ। অসঙ্গ নির্বিকার আত্মা যখন দেহরথস্থ হন এবং বুদ্ধিযুক্ত থাকেন, তখনই তাঁহাকে বোধ হয় যেন তিনি কর্তা ও ভোক্তা! 'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তা-ইত্যাহুর্মনীষিণঃ।' কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি আত্মাকে আদৌ স্পর্শ করে না। বরং তিনিই উহাদের সর্বাবস্থার প্রকাশক। প্রকাশ্য বস্তুর দোষ-গুণে প্রকাশক আত্মার কী আসে যায়? সূর্য যেমন সকল দৃশ্যের প্রকাশক, অথচ উহাদের গুণাগুণে লিপ্ত হয় না কদাপি। ইন্দ্রিয়াদি ঘোড়াগুলি যখন দেহ-রথকে টানিয়া লইয়া ফিরিতেছে, তখন রথের গতির সঙ্গে সঙ্গে রথস্বামী আত্মা বা জগন্নাথও যেন পরিভ্রমণ করিতেছেন বলিয়া প্রতীত হয়—জগন্নাথ কিন্তু চিরকাল শান্ত অচল সনাতন সুস্থির। শুভ্রশির শ্রুতি তাই বলেন, তিনি 'আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্বতঃ'। অর্থাৎ, তিনি আসীন থাকিয়াও দূরে, শয়ান থাকিলেও সর্বত্র বিচরণশীল।

*

রথযাত্রা। রথে চড়িয়া শ্রীজগন্নাথের পরিভ্রমণ, স্থানান্তরে কোথাও কিছুকাল অবস্থান, অতঃপর পুনরাগমন! সমগ্র ব্যাপারটিই রূপক—উচ্চতর বেদান্ত-তত্ত্বের একটি হৃদয়ানন্দী নাট্যরূপ যেন। ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বচালিত, ঘূর্ণমান কালচক্র-বাহিত দেহ-রথে সমারূঢ় হইয়া জগতের নাথ বাহিরে বিচরণ করিতেছেন—সংসার-পথে ঘুরিতেছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে পরিশ্রান্ত জগৎপতি কোথাও একটু ঠাঁই লইয়া সাময়িক বিশ্রাম-সুখে মগ্ন থাকেন। ইহাই বুঝি তাঁহার 'মাসী-বাড়ি'তে অবস্থান! অখণ্ড সচ্চিদানন্দের স্বধাম ছাড়িয়া, এই শোক-দুঃখময় সংসার-আবাস তো যথার্থ অর্থেই 'মাসীর বাড়ি'তে অবস্থান। জ্ঞানস্বরূপের অজ্ঞান-স্বীকার,—মায়াধীশের মায়া অবলম্বন! আবার জ্ঞানের উদয়ে তিনি তাঁহার সংসার-পরিক্রমণ সমাপন করিয়া আনন্দ-নিকেতন নিজ-মন্দিরে, স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন, যেখানে তিনি অসীম অনন্তকালের নির্বিকার সাক্ষী পুরুষোত্তম।

*

'জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।'
একটি হৃদয়-নিঙড়ানো আকুতি! হে জগন্নাথ প্রভো, আমার নয়নই হউক তোমার বিচরণ-পথ

জগন্নাথের রথযাত্রার তাত্ত্বিক চিত্রকে, আমাদের পুরাণকারগণ নাটকীয় মাধুর্য-রঙে বর্ণাঢ্য করিয়াছেন। বিবিধ পুরাণে তাই কত বিচিত্র-ভাবে এই রথ-বর্ণনাকে পাওয়া যায়। পুরাণ তো পুরাতনই। ইতিহাসের পৃষ্ঠাতেও এই জগন্নাথের রথখানি বড় কম চিত্তাকর্ষক নহে। নীলাচল ক্ষেত্রে রথযাত্রার স্মৃতিপটখানি ভাবে ও মাধুরীতে কতকালব্যাপী উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে! শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই এই পটনির্মাতা। সূক্ষ্ম-গভীর তত্ত্বকে সাধারণ জন-মানসে সরস সহজভাবে তুলিয়া ধরিবার জন্য শ্রীভগবানের ইহাও এক অপরূপ ব্যবস্থা।

নীলাচলে রথযাত্রা। সমুদ্রতীরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দির হইতে গুণ্ডিচাবাড়ি (যাহার প্রচলিত লৌকিক নাম 'মাসীর বাড়ি') পর্যন্ত অর্ধক্রোশ দীর্ঘ সুপ্রশস্ত সরল রাজপথ—জগন্নাথের রথ পরিক্রমণের জন্য নির্মিত। লক্ষ লক্ষ নরনারী রাজপথের দুই ধারে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। অকস্মাৎ ঐ সুবিশাল জনসমুদ্র উত্তাল হইয়া উঠিল—লক্ষ কণ্ঠের মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিতে সমুদ্রগর্জনও বুঝি কোথায় মিলাইয়া গেল! শ্রীচৈতন্যদেব পরিকরগণ-বেষ্টিত হইয়া ঐ জন-সমুদ্রের মধ্যস্থলে সহসা আবির্ভূত হওয়াতেই এই বাঁধভাঙা আনন্দ-বন্যা সারা পুরীধামকে কোথায় তলাইয়া দিয়াছে! রাজপথে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেবের দৃপ্ত অঙ্গকান্তি—তাঁহার দিব্যোন্মত্ত নর্তন-কীর্তন রথযাত্রার বিপুলতাকে আরও সহস্র-গুণ প্রভামণ্ডিত করিয়াছিল। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই দৃশ্যের বর্ণনায় লিখিয়াছেন :

'উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্র ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত আকার॥
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগরা শৈল মহী করে টলমল॥
স্তম্ভ স্বেদ পুলকাশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশতা ভক্ত হর্ষ দৈন্য॥
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়।
সুবর্ণ পর্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥
নিত্যানন্দ প্রভু দুই হস্ত প্রসারিয়া।
প্রভুকে ধরিতে বুলে দুই পাশে ধাইয়া॥
প্রভু-পাছে বুলে আচার্য করিয়া হুঙ্কার।
হরিদাস হরিবোল বলে বার বার॥

...

ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন।
আগে নৃত্য করি চলে শচীর নন্দন॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে গায় নাচে।
কীর্তনীয়া সহ প্রভু চলে পাছে পাছে॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন হৃদয়।
শ্রীহস্ত-যুগে করে গীতের অভিনয়॥'

*

'বসাইলা জগন্নাথে রথের উপর।
বাদ্যের উঠিল তবে রোল উচ্চতর॥
তখন কে রাখে আর প্রভু গুণধরে।
ত্বরান্বিত উপনীত রথের গোচরে॥
শ্রীকরে রথের রজ্জু করি আকর্ষণ।
মত্তভাবে ধরিলেন মধুর কীর্তন॥

...

তালে তালে বাদ্য রোল উঠে অনিবার।
প্রভুর নৃত্যান তাহে করিয়া হুঙ্কার॥'

না, সমুদ্রতীরে পুরীধামের দৃশ্য ইহা নহে। এবারের দৃশ্যপট: গঙ্গাতীরে কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে বলরাম-ভবন। রথাগ্রে নর্তন-রত দেখিতেছি শ্রীরামকৃষ্ণকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার শ্রীঅক্ষয় সেন মহাশয় সেই চিত্রই অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীম'র লেখনীতেও উহার প্রাণস্পর্শী বর্ণনা রহিয়াছে। কথামৃতের ভাষা এইরূপ :

'অপরাহ্ণ হইয়াছে। ইতিমধ্যে বারাণ্ডায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেই ছোট রথখানি ধ্বজা পতাকা দিয়া সুসজ্জিত করিয়া আনা হইয়াছে।··· ঠাকুর···বারাণ্ডায় রথাগ্রে গমন করিলেন,—ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রথের রজ্জু ধরিয়া টানিলেন—তৎপরে রথাগ্রে ভক্ত সঙ্গে নৃত্য ও কীর্তন করিতেছেন।···উচ্চ সঙ্কীর্তন ও খোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের লোক অনেকে বারাণ্ডা মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর হরি প্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন।'

বলরামের গৃহে সেই রথযাত্রা স্মরণ করিয়া লীলাপ্রসঙ্গকার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ যথার্থই লিখিয়াছেন—'সাত্ত্বিক পরিবারের বিশুদ্ধ ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া সাক্ষাৎ ৺জগন্নাথদেব রথের বিগ্রহে

এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে আবির্ভূত—সে অপূর্ব দর্শন আর কোথায় মিলিবে? সে বিশুদ্ধ প্রেমস্রোতে পড়িলে পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া নয়নাশ্রু-রূপে বাহির হইত—ভক্তের আর কি কথা!'

আনন্দ-উদ্বেল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসমুদ্রের তট-ভূমিতে এমন রথযাত্রার দৃশ্য, কেবল বলরাম-ভবনেই নহে, কলিকাতার অদূরে মাহেশেও আমরা দেখিয়াছি। মাহেশে শ্রীপ্রভুর সেই রথযাত্রা-লীলার ছবি আমরা বিশদ পাইয়া থাকি শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথির পৃষ্ঠায়। মাহেশের রথাগ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ দেখিয়া পুঁথিকার লিখিয়াছেন:

'আজিকার মহাভাবে প্রভু পরমেশ।
জগন্নাথ জগবন্ধু তাঁহার আবেশ॥
এমন আবেশ যেবা দরশন পায়।
তার নাহি রহে জন্ম-মরণের দায়॥'

*

জগন্নাথের রথ আজিও চলিতেছে,—ঐ রথ-চক্রের ঘূর্ণন কিছু থামিয়া নাই,—উহা অবিরাম। বৎসরান্তে আষাঢ়ের এক বিশেষ তিথিতে যাহার স্থূল প্রকাশ্য অনুষ্ঠানকে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া মানুষ প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে, তাহা কিন্তু নিরন্তর লোকচক্ষুর আড়ালে ঘটিয়াই চলিয়াছে—অহর্নিশ চলিতেছে। জগন্নাথের রথের গতি অনিবার,—বিশাল গণচিত্তের প্রশস্ত বর্ত্মে উহা আবর্তিত হইতেছে। সমাজ-মানসের সমুদ্রতট, অথবা জন-চিত্তের গঙ্গাতীর ধরিয়াই সেই আবর্তনের পথ।

জন-সমষ্টি লইয়াই জগৎ,—উহার সমাজ। জনগণের চিত্তাধিনায়কই জগন্নাথ। ব্যষ্টির ক্ষেত্রেও যাহা সত্য, সমষ্টির বেলায়ও উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সমাজ-শরীরই তাই ব্যাপকতর অর্থে জগন্নাথের রথ। আর যাহাদের হস্তে ঐ রথরজ্জু, সেই জনসমষ্টিই যেন বেগবান রথাশ্বরূপে উহাকে অবিশ্রান্ত গতিমুখর রাখিয়াছে।
বুদ্ধিই এই অতিকায় সমাজ-রথের সারথি।

গণমানসের গতিই যেন আমাদের জগন্নাথের রথযাত্রা। রথের দড়ি ধরিয়া টানিয়া যাহারা উহাকে আগাইয়া লইয়া চলিতেছে, তাহাদের প্রতি জনের চলার ছন্দে যদি বৈষম্য থাকে, লক্ষ্য যদি ভিন্ন হয়, তবে সমগ্র রথখানির অগ্রগমনও বিঘ্নিত হইতে বাধ্য—অচল হইবারও আশঙ্কা থাকিয়া যায়। রথচক্রতলে পড়িয়া প্রাণ হারাইবার সংবাদও কিছু বিরল নহে। দুর্নিবার জনতার পদ-পেষণেও মৃত্যু ঘটে। সমাজ-রথের যাত্রাকে তাই নিরাপদ, অবাধ ও সুষ্ঠু করিতে হইলে যাহাদের লইয়া ঐ সমাজ সেই মানুষগুলির জীবনকে গতিশীল তো রাখিতেই হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ করিবার দিকেও বিশেষ মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। জগন্নাথের রথযাত্রার রহস্যময় তাৎপর্য এখানেই। অন্যথায় যাত্রা-বিপাকে পড়িয়া রথারূঢ় স্বয়ং জগন্নাথই পথে অবস্থান করিবেন,—যেমন আনুষ্ঠানিক রথোৎসবেও প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে।

সমাজের প্রগতি মানুষের গতিতে। সমাজ ব্যষ্টি মানুষকে লইয়া। ব্যষ্টি মানুষের সমাহারেই গড়িয়া ওঠে সমষ্টি—যাহার অপর নাম 'গণ'। এই গণ-চালিত সমাজ-রথের গতি-প্রকৃতি বুঝিতে হইলে, স্বাভাবিক কারণেই কয়েকটি সরল জিজ্ঞাসার সমাধান আগে পাওয়া দরকার। আমরা সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ না হইয়াও, বিষয়টির অবতারণায় দুঃসাহসী হইতেছি,—যে-হেতু বিষয়টি সর্বজনীন ও সরল,—আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা।

মানুষের পরিচয় দ্বিমুখী। এক পরিচয় তাহার নিজ ব্যক্তিত্বে ও বৈশিষ্ট্যে; অন্য পরিচয় তাহার সমাজ-সম্পর্কে—অথবা সমষ্টির সঙ্গে তাহার সংযোগ-সূত্রে, সহমর্মিতায় ও ঐক্যবোধে। প্রথমতঃ তাহার ব্যক্তি-পরিচয়ে বা স্বকীয় সত্তায় সে স্বভাববশেই পূর্ণতার দিকে গতিশীল,—

স্ব-স্বরূপের অভিমুখেই তাহার আকর্ষণ। জানিয়া বা না-জানিয়া সে সেখানেই স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে নিত্য অভিলাষী। পক্ষান্তরে তাহার দ্বিতীয় পরিচয়ে, সে সমাজের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে ইচ্ছুক,—সমষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্যকামী। মানুষের এই দুইটি মৌলিক দিককে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবনধারার এই উভয় দিকের প্রতি যদি সমান মনোযোগ না থাকে,—কিংবা মাত্র একটি দিককেই প্রাধান্য দিয়া, অন্যটিকে উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ মানুষটিকে কোন কালেই পাওয়া যাইবে না,—সহস্র চেষ্টাতেও পূর্ণত্বের সন্ধান মিলিবে না। এই একদেশদর্শিতার বা অস্বীকৃতির পরিণাম কি হইতে পারে,—সমাজকে কোথায় লইয়া যাইতে পারে, তাহাও বিবেচ্য।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজে, মানুষের জীবনের উক্ত দিক দুইটির উপযুক্ত মূল্যায়ন হইতেছে কিনা, সে-সম্পর্কে বহুতর জিজ্ঞাসার অবকাশ রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক দর্শনের অন্তর্নিহিত ভাবটির অপব্যাখ্যায় সমাজে ধর্ম, নীতি, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সুস্থ সমাজের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, সে-সবের মূল্য নিরূপিত হইতেছে পণ্য-শালার নিয়মানুযায়ী। সমষ্টির সুখ-সম্পদের পথ অধুনা হয়তো বা কিছু প্রশস্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তার দিন আসিয়াছে, ব্যষ্টির জীবন-বিকাশ কেন এমন ব্যাহত হইতেছে। প্রচলিত সমাজ-নীতিতে বা তথাকথিত গণতন্ত্রে, ব্যক্তির আত্মবিকাশ এবং মর্যাদা ও স্বাধীনতাবোধ কী কারণে এরূপ ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

ব্যক্তিত্ব প্রকাশক এবং সমাজ-সচেতন মানুষের এই উভয়বিধ সত্তাকেই সসম্মানে মানিয়া লইয়া, তদনুসারী ধারায় সমাজ-রথ চালিত হওয়াই বোধ হয় সকলের পক্ষে হিতকর। সার্থক রথযাত্রা তখনই বলা যাইবে। ঐ দ্বন্দ্ব-সংশ্লেষণেই মানুষকে পাওয়া যাইবে তাহার পূর্ণতায়। সেই পূর্ণত্বই সমাজ-রথের গতিকে করিবে নিশ্চিত ও কল্যাণপ্রদ। ব্যক্তিজীবন অসুস্থ থাকিলে সমষ্টি-জীবনও ছন্নছাড়া হইবে; আবার সমষ্টিকে অবজ্ঞা করিলে ব্যক্তিজীবনের বিকাশে যে ফল আনয়ন করিবে, উহা ধারণ করিবে কে?

আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজ-রথখানি ঘর্ঘর শব্দে চলিতেছে ঠিকই,—কিন্তু কোন্ পথে ও কী-ভাবে, ইহাই এখন আমাদের ব্যথিত জিজ্ঞাসা। এক-একটি গণতান্ত্রিক পর্ব সাড়ম্বরে ও ধুমধামের সহিত সারা দেশ জুড়িয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে,—গণকণ্ঠের উল্লাসে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিতেছে। কিন্তু হায়, পর্বগুলির মূল্যও তো বড় হৃদয়-বিদারক,—তাহাও কি আমরা একটু ভাবিয়া দেখি? 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায়' মহোৎসব-গুলিতে বলি দিতে হইতেছে অনেক প্রাণ সংবাদপত্রগুলির শিরোনামে সে-বলির সংখ্যা দেখিয়া আমরা আতঙ্কিত হইয়া উঠি। তখনই এই সমাজ-রথখানির গতি আমাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে,—রথাশ্বস্বরূপ জনগণের পদক্ষেপে ছন্দ-বৈষম্য আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করে।

রথযাত্রা কুশল এবং উহার যাত্রাপথও সুগম হউক, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা। আমাদের দৃষ্টি যদি জগন্নাথেই নিবদ্ধ রাখিতে পারি, সকলের পদ-সঞ্চালনও যদি বেতাল না হয়,—এবং সকলের বুদ্ধি-বিচারকে নির্মল রাখিতে পারি তবেই আমাদের রথচক্রের ঘূর্ণনও মসৃণ, সঙ্গীতময় এবং লক্ষ্যাভিমুখ থাকিবে সুনিশ্চয়। জন ও গণ—এই দুইটিকেই স্বতন্ত্র-ভাবে বুঝিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের সমাজ-রথখানি প্রকৃত তাৎপর্যার্থেই জগন্নাথের রথরূপে সকলের উপলব্ধিতে আসুক, আকাঙ্ক্ষা আমাদের ইহাই।

সাধন-ধারা : দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে

স্বামী স্বপ্রকাশানন্দ

দ্বৈত ও অদ্বৈত ভেদে সাধনা দুই প্রকার। দ্বৈত সাধনা ব্যতীত অদ্বৈত সাধনা সম্ভবপর নহে। অন্তঃকরণবৃত্তি পরিশোধিত অর্থাৎ একাগ্র না হইলে অদ্বৈত সাধনায় সাধক প্রবৃত্ত হইতে পারে না। দ্বৈত সাধনার দ্বারাই চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা জন্মে। এই চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা বা নিশ্চল পরিস্থিতির জন্যই ইষ্টচিন্তা, ইষ্টধ্যান, মন্ত্রজপ ইত্যাদির নির্দেশ গুরু ও শাস্ত্র দিয়াছেন। দ্বৈত সাধনায় সাধকের ভাব বা সাধনানুসারে, সাধক-হৃদয়ে ইষ্টের দর্শনাদিরূপ নানাপ্রকার অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। এমনকি সঙ্কীর্ণতা-রহিত উদার দ্বৈত-সাধক ইষ্টের সহিত অভেদ বোধও করিয়া থাকেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, যাহা হইতে সাধকের অবস্থা বা ভাবের তারতম্য অবগত হওয়া যাইবে। ভক্তচূড়ামণি সিদ্ধ শ্রীরূপ গোস্বামীজী নিজ স্বানুভবের বিষয় তাঁহার লিখিত পুস্তকে এইরূপ বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা ধ্যানাদিতে চিত্তবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণাকারে পরিণত হইয়া অর্থাৎ তদাকারে আকারিত হইয়া মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদিতে তন্ময় হইয়া পরমানন্দ অনুভব হইতে থাকে। অনন্তর চিত্তবৃত্তি আরও গভীর-ভাবে শ্রীকৃষ্ণাকারে পরিণত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদপ্রাপ্ত হইতে চাহে। হে ভক্ত সাধক, এই অভেদাকার বৃত্তি হইতে সাবধান থাকিও—বৃত্তিকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ হইতে দিও না, উহা হেয় অবস্থা। কারণ ঐ অবস্থায় ইষ্টের রূপ, গুণ, প্রেম, করুণা ইত্যাদির আস্বাদন থাকে না। এই অর্থে,—এই জন্যই ইষ্টের সহিত অভেদ একত্ব অদ্বৈতবোধ হেয় বা নিকৃষ্টাবস্থা। ইহাই ভক্তচূড়ামণি শ্রীরূপের ভাব বা অভিমত। শ্রীরামপ্রসাদও বলিয়াছেন—"চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।" আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু বলিয়াছেন—"আমি সব ভাবই লই।" গীতামুখে শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—"আমি তাঁহাকে, অর্থাৎ শরণাপন্ন সাধককে বুদ্ধিযোগ (জ্ঞানযোগ) প্রদান করি।"—ইত্যাদি।

এক থাকের সাধক আছেন, যাঁহারা মাত্র ঈশ্বরভক্তি—ইষ্টের সহিত বিলাস অর্থাৎ তাঁহার রূপ-গুণাদির আনন্দ লইয়াই বিভোর থাকিতে চাহেন। আর এক থাকের সাধক—ইষ্টের রূপ, গুণ, প্রেম, করুণাদি অতিক্রম করিয়া, তাঁহার সহিত এক ও অভেদভাবে অবস্থান করিতেই ইচ্ছা করেন। প্রথম থাকের সাধক ভক্তির সীমা অতিক্রম করিতে কদাপি বাঞ্ছা করেন না। দ্বিতীয় থাকের যিনি—তিনি ঐ ভক্তিসীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া নিয়ত আকাঙ্ক্ষা রাখেন তাঁহার ইষ্ট অর্থাৎ আত্মার সহিত অভিন্ন ও একত্ববোধ করিতে। এইরূপ দ্বিবিধ সাধকের মধ্যে আপাতদৃষ্টে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও শাস্ত্রাচার্যগণ বলেন, "ত্বমস্মি তবাস্মি ইতি কিঞ্চিৎ বিশেষোঽপি পরিণামং সমং দ্বয়োঃ।" অর্থাৎ, এক শ্রেণীর সাধক বলিতেছেন, "হে প্রভো, তোমারই আমি"; আর অন্য শ্রেণীর সাধক বলেন, "তুমিই আমি",—এই উভয় শ্রেণীতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকিলেও, পরিণাম কিন্তু একই,—সেখানে কোনও পার্থক্য নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, উহাই আমাদের মতে, সাধকগণের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। অদ্বৈততত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া ইষ্টের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্কবোধ করিতে পারিলে বেশ তৃপ্তি হয়,—সাধকগণের এইরূপ উপলব্ধি

প্রায়শঃ জানা যায়। ইহাই অতি সুন্দর দ্বৈত সাধনার ধারা। এই ধারার সম্পূর্ণ উপশম—অদ্বৈতবোধেই। শাস্ত্র ও আচার্যগণ তাহাই বলেন। ইষ্টের সহিত একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ককে অনুভবের উদ্দেশ্যেই দ্বৈত সাধনা। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনা ছাড়া, দ্বৈত সাধনা সম্ভবপর নহে। শ্রীরূপ গোস্বামী-প্রমুখ আচার্যগণের জীবন, এই সাধনা ও সাধনার ক্রমপরিণতি বুঝিতে সাহায্য করে।

দ্বৈতভাবে সাধনপথে অনেক সময় নানা প্রকার বাধা দেখা যায় ঠিকই,—ভক্তি অনেকের পক্ষে নিছক ভাবপ্রবণতা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সাধনমার্গে ভুল-ত্রুটি থাকিলেই মাত্র ভাবপ্রবণতা আসিয়া উপস্থিত হয়। অন্যথায় ভাবপ্রবণতা কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না। দ্বৈত বা অদ্বৈত যে-ভাবকে অবলম্বন করিয়াই সাধনা চলিবে, কিছুটা ভাবুকতা তো থাকিবেই। কিন্তু উহা ভাবপ্রবণতা কেন হইবে? ভাবুকতা আসে চিন্তাশীলতা হইতে। কিন্তু নিছক ভাবপ্রবণতা একপ্রকার কল্পনা-বিলাসমাত্র। ভাবুকতা আনয়ন করে নিষ্ঠা। আর ভাবালু কল্পনাবিলাসী সাধক ক্রমেই হইয়া পড়ে দুর্বলচিত্ত নিষ্ঠা কিন্তু সাধককে করে দৃঢ় ও সবল। নিষ্ঠা ব্যতীত সাধনায় অগ্রসর হওয়া,—লক্ষ্য সাধ্যবস্তু লাভ সুদূর পরাহত।

দ্বৈত ও অদ্বৈতের চুলচেরা পার্থক্য নির্ণয় বা সত্যাসত্য লইয়া চিত্তে বিক্ষেপ উৎপাদন না করাই শ্রেয়ঃ। উদার সরল আন্তরিক সাধকের জীবনে অদ্বৈততত্ত্ব স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়। আমাদের শাস্ত্র সিদ্ধান্ত তাহাই। "ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈত বাসনা"—ঈশ্বর অর্থাৎ ইষ্টের কৃপাতেই সাধকের হৃদয়ে অদ্বৈততত্ত্ব সাক্ষাৎকারের বাসনা জাগ্রত হয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার যে তিনটি স্তর আছে, এগুলি তাহারই মূলসূত্র। আমরা দেখিয়াছি, ইহার আরম্ভ হইয়াছে 'জগদ্‌বহির্ভূত ব্যক্তিভাবাপন্ন ঈশ্বরে'র মতবাদ লইয়া। তারপর বাহির হইতে ভিতরে গিয়া ইহা 'জগতের অন্তর্যামী ঈশ্বরে'র মতবাদে স্থিতি লাভ করে। পরিশেষে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে এক ও অভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়া এবং সেই এক আত্মাকে পৃথিবীর বহুরূপ প্রকাশের ভিত্তি নির্দেশ করিয়া এই আধ্যাত্মিক চিন্তা শেষ হইয়াছে। ইহাই বেদের চরম ও পরম কথা। দ্বৈতবাদের ভাব লইয়া ইহার আরম্ভ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মধ্য দিয়া ইহা অগ্রসর হয়, এবং অদ্বৈতবাদে সমাপ্ত হয়। আমরা জানি, পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায় পৌঁছিতে পারেন, এমন কি ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারেন এবং তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যক্তি এই ভাব অনুসারে কার্য করিতে পারেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পৌষ, ১৩৮৯ সংখ্যার পর]

২০

শ্রীমায়ে ঈশ-মাতৃত্বের সর্বত্র ঈশ-স্ফুরণ

শ্রীমায়ের এই ঈশ-মাতৃত্ব যত্র-তত্র প্রকাশ পেয়েছে সহজ সঞ্চরণে, ঘরে-বাইরে, পথের পাশে, তেঁতুল তলায়।

পতিত মানুষ, ভ্রষ্টা নারী, সামান্যাখ্য পশুপ্রাণী কেহই তাঁর পাবনী ধর্মাশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়নি,—তাই শুধু নয়, সকলে সসম্মানে সপ্রেমে গৃহীত হয়েছে।

একদিন কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে তেঁতুল তলায় চৌকির উপর মা বসে আছেন। এমন সময় পল্লীর এক ডোমের মেয়ে এসে কেঁদে পড়ে মায়ের কাছে নালিশ করলে যে, তার উপপতি তাকে অকস্মাৎ ত্যাগ করেছে। তার জন্য সে সব ছেড়েছিল, কিন্তু এখন সে যে একেবারে অসহায়। মেয়েটির দুঃখের কাহিনী শুনে, মা ডোমটিকে ডাকিয়ে এনে সস্নেহে বললেন, "ও তোমার জন্য সব ফেলে এসেছে; এতদিন তুমি ওর সেবাও নিয়েছ। এখন ওকে ত্যাগ করলে তোমার মহা অধর্ম হবে—নরকেও স্থান পাবে না।"[১২৮]

এক নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন গৃহে ধর্মের কী অভিনব অনির্বাণ সোনালী আলোটি জ্বাললেন মা! পতিতা ও ব্যভিচারিণীকে ধর্মচ্যুতি থেকে রক্ষা করলেন।

শ্রীমায়ের কথায় লোকটির মন বিগলিত হল। তার ধর্মলাভ হল। মেয়েটিকে নিয়ে সে ঘরে ফিরে গেল। নরক থেকে নির্মুক্ত হল তারা। পতিতাকে এমন ধর্ম-সম্মান কে কবে দিয়েছে? যে অধঃগামিতায় গড়িয়ে এসে যেখানেই পড়ুক না কেন, সেখান থেকেই মা তাকে সস্নেহে ও সসম্মানে তুলে এনে, তাকে দিয়েছেন এমন এক অনাস্বাদিত গৌরব, যা পাপীর ভাগ্যে যুগ-যুগান্তে কদাচিৎ মিলে। আর সেই গৌরবের নবালোকে পাপীর জীবনে এক নূতন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়।

এই হল ধর্মজ্ঞ গোপ্তায় ঈশ্বরের মাতৃত্ব প্রকাশ।

এই প্রকাশের করুণা-লহরী বৈষম্য-বিচারে কুণ্ঠিত না হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে সকল জীবের প্রয়োজন-ভূমিতে। সকল জীবের প্রয়োজন বুঝতে পারার মেধা ও হৃদয় শুধু অসাধারণ ব্যক্তিতে সম্ভবে। মা দেখতে ছিলেন সাধারণ নারীর মতো। কিন্তু তাঁতে প্রজ্ঞা ও প্রেমের এমন এক অত্যাশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হয়েছিল যে, সমদর্শন ও সমানুভবতা তাঁর অতি সহজ অবস্থাতে পরিণত হয়েছিল।

দুটো কাক কোত্থেকে দুপুরে এসে গাছের ডালে বসে কা-কা রবে রাধুকে বিরক্ত করত। মা তখন রাধুকে নিয়ে কোয়ালপাড়া আশ্রমে রয়েছেন। কাকের জন্য জগদীশ্বরের কখন কি ভাবনা হয়? মায়ের কিন্তু হয়েছিল। একদিন মা বলছেন, "'সেই কাক দুটি কদিন এসময়ে এসে ঐ গাছে বসে বড় চীৎকার করত, রাধুও বিরক্ত হ'ত। কিন্তু কই, আজ কদিন থেকে সেগুলিকে আর দেখতে পাইনে।' মা ঐ কথা বলতে না বলতে কাক দুটি এসে গাছে ডেকে উঠল।" শ্রীমা হেসে 'হাঁ, বাবা' বলে ওদের শুভাগমন ও শুভ-সম্ভাষণ সমর্থন করলেন।[১২৯]

---

১২৮ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪০২

১২৯ ঐ, পৃঃ ৩২৩

কি করে বলব, কাক দুটো মায়ের ভাষার মর্মার্থ বুঝতে পারেনি ?

কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা আশ্রমে অবস্থান কালে শ্রীমাতে সর্বজননীর ভাবটি এমনভাবে প্রকটিত হয়েছিল যে, তিনি কখন কার জন্য ভাবান্বিত হতেন আর কেন-ই বা, তা সাধারণের বোধের অগম্য ছিল।

১৩২৬ সালের আষাঢ় মাসে কোয়ালপাড়াতে কয়েক দিন খুব বৃষ্টি হয়েছে। একদিন রাত্রি প্রায় দশটায় কয়েকজন গাছতলায় বসে আছেন। সিক্ত ধরণী। আঁধারে ফোটা কেয়া-কেতকীর মৃদু গন্ধে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ঐকতান আমোদিত। শ্রীমা অকস্মাৎ বললেন, "দেখ, সেই শিহড়ের পাগলটা, কই, অনেক দিন আসেনি। বদ্ধ পাগল! গান-টানগুলি কিন্তু বেশ গায়। কিন্তু বড় ভয় করে, বাবা, পাছে এখানে চেঁচিয়ে মেচিয়ে উঠে।" নবাসনের বউ অনুযোগ করলেন, "আর তার নাম কেন, মা? যদি এখন এসে পড়ে, এই রাত্রিবেলায়?" মা বললেন, "কে জানে, মা! হাঁ, তুমিও যেমন, এই বাদলে নদী পার হয়ে কি করে আসবে?" এ-কথা শেষ হতে না হতে পাগল একটা টোকা মাথায় দিয়ে এক বোঝা সজনে শাক বগলে করে এসে হাজির হয়ে মাকে বললে, "তোমার জন্য সজনে শাক নিয়ে এনু।" নবাসনের বউ ভয়ে বাড়ির ভিতরে গিয়ে দরজায় খিল দিলেন। মা বললেন, "যা, যা, এত রাত্রে গোল করিস নে।" সে উত্তর দিলে, "এখন যাব কি করে? নদীতে বান যে?" বরদা মহারাজ প্রশ্ন করলেন, "তবে এলি কি করে?" সে বললে, "সাঁতরে পার হয়ে এসেছি।" মা তখন তাকে অতি মিষ্ট স্বরে বললেন, "লক্ষ্মীটি, গোল করিস নে।"[১৩০] পাগল অমনি ধীরে ধীরে চলে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বিশ্বকুটুম্বে ভরা যাঁর ঘর, তাঁর ছন্নছাড়া আপনজনেরা যখন এই রাত-নিবিড়ে সজনে পাতার নৈবেদ্য নিয়ে হাজির হয়, তখন শ্রীমায়ের এই যে হৃদ্-নিংড়ানো মিষ্টি বাণী, "লক্ষ্মীটি, গোল করিস নে", জগতের সাহিত্যে এই বিশ্ব-ঔদার্যের তুলনা কোথায়?

ঈশ্বরের মাতৃত্ব-প্রকাশ শুধু মহতের লালনে নয়, বাতুলের প্রশ্রয়েতেও। "বদ্ধ পাগল। গান-টানগুলি কিন্তু বেশ গায়।" কী অপূর্ব প্রশস্তি! জগদম্বা কিনা! সৃষ্টির কোন বৈগুণ্যকেই যে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। তাই যে টক্ আমগুলি কেউ মুখে দিতে পারে না, সেগুলিও "ভাল, টক্-টক্, মিষ্টি-মিষ্টি" লাগে। পাগলটা হয়তো এত সব ভাবতে বসেনি। কিন্তু জানত তাকে যেতে হবে এই ক্ষণে, সাপ-ব্যাঙ, ভূত-প্রেত, পেছল পথ, আঁধারে জনশূন্যতা, আষাঢ়ের স্ফীত নদীর বুক সাঁতরে, সজনে পাতার নৈবেদ্য রেখে আসতে ঐ পাবনী পাদমূলে! সে জানত না পূজার এ শুভক্ষণ কি না। নৈবেদ্য রেখে প্রসাদ চায়নি। আঁধার থেকে এসে আঁধারেই আবার ফিরে গেল। কিন্তু দেখে গেল সেই শ্রীমাকে যিনি বিশ্বের কোটি কোটি জীবের মধ্যে, ঐ ক্ষণে ঐ স্থানে শুধু তার জন্যেই বসে ছিলেন! ঐ পাগলটি এই জানা-টুকুর তৃপ্তি নিয়ে যে ফিরে গেল, এ-কথাটি মায়ের কৃপায় হলপ করেই বলা চলে!

রাধু যে একটি বিড়াল পুষেছিল, শ্রীমা তার জন্য এক পোয়া দুধের বন্দোবস্ত করেছিলেন। সে "অভয়ার অভয় পদে" নির্ভয়ে শুয়ে থাকত। অপরের সন্তোষ বিধানার্থ লাঠি নিয়ে মা তাকে কখন ভয় দেখালে সে মায়েরই চরণে আশ্রয় নিত। মা হেসে লাঠি ফেলে দিতেন। উপস্থিত সহাস্য সকলেই এই কৌতুক উপভোগ করতেন

১৩০ ঐ, পৃঃ ৩২৩-২৪

বিড়ালের স্বভাব চুরি করে খাওয়া। যত ভাল খাবারেরই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কর না কেন, কিছু চুরি করে না খেলে তার তুষ্টি কিছুতেই হয় না। এতে মা বিরক্ত হতেন না। বলতেন, "চুরি করা তো ওদের ধর্ম, বাবা! কে আর ওদের আদর করে খেতে দেবে?"

কি অপূর্ব স্বধর্ম ব্যাখ্যা সর্বজননীর!

কিন্তু ন্যায়ের দণ্ড ধরে জ্ঞান মহারাজ বিড়ালটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। একদিন ওকে তুলে এমন আছাড় দিলেন, দেখে মায়ের মুখ বেদনায় কালো হয়ে গেল। অন্যভাবে ঠেঙানো তো লেগেই ছিল। জ্ঞান মহারাজের অত্যাচার সত্ত্বেও, রাধু ও মায়ের সযত্নে লালিত বিড়ালের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকল। মা জ্ঞান মহারাজকে ডেকে বললেন, "জ্ঞান, বেরালগুলোর জন্যে চাল নেবে; যেন কারও বাড়ি না যায়—গাল দেবে, বাবা।" এই লৌকিক যুক্তিতে যে বিড়ালগুলির ভাগ্য ফিরবে না, মা তা জানতেন। তাই তিনি আবার বললেন, "দেখ, জ্ঞান, বেরাল-গুলোকে মেরো না। ওদের ভেতরেও তো আমি আছি।"

তাই তো ঠাকুর ভবতারিণীর ভোগ বিড়ালকে খাইয়েছিলেন। আজ মুখ ফুটে সে-কথা বলতে হল, বিড়ালের ধর্ম রক্ষা, চর্ম রক্ষা, প্রাণ রক্ষা করতে।

এ-কথা শোনার পর জ্ঞান মহারাজের হাতে আর তো লাঠি উঠত-ই না। অধিকন্তু এখন থেকে তাঁকেই প্রাণের তাগিদে বিড়ালের জন্য চুনামাছ ভেজে ভাতের সঙ্গে বিড়ালদের খাওয়াতে হত![১৩১]

রাধুর বিড়াল মিনি একদিন উঠানের ধারে শুয়েছিল। এক মহিলা ভক্ত তাকে পা দিয়ে আদর করছিলেন। ক্রমে তার পা যেই বিড়ালের মাথায় উঠল মা বললেন: ও কি করছ মা, মস্তক যে গুরুর স্থান। পা দিয়ে মস্তক স্পর্শ করতে নেই। বেড়ালটিকে প্রণাম কর। মহিলা ভক্তটি বললেন, "এ আমি মোটেই জানতুম না, মা। আজ একটি নূতন শিক্ষা হল।"[১৩২]

ধর্মসংস্থাপন করতে এসে ভগবান কি করেন? বলে বেড়ান: দেখ, দেখ, এখানে ভগবান, ওখানে ভগবান, সব কিছুতে ভগবান, সর্বত্র ভগবান। তুমিও তাই, সকলে তাই। এ চেতন-চৈতন্যটি শ্রীমা সাধারণের বোধির দুয়ারে অতি সহজলভ্য করে দিতেন।

সকালের দিকে একদিন মা বারান্দায় বসে। একজন উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল। ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেলে সে একদিকে ঝাঁটাটি ছুড়ে ফেললে। দেখে মা বললেন, "এ কি করলে? কাজটি হয়ে যাবার পর ঝাঁটাটি তুমি এমন অশ্রদ্ধার সঙ্গে ছুড়ে ফেললে! ঝাঁটাটিকে ভদ্রভাবে একটি কোণে রেখে দিতেও ততটুকুই সময় লাগে, যতটুকু সময় লাগল এটিকে ছুড়ে ফেলতে। তুমি যদি কোন বস্তুকে শ্রদ্ধা কর, সেও তোমাকে শ্রদ্ধা করবে। এটিকে কি তোমার আর প্রয়োজন হবে না? তা ছাড়া এটি এ-পরিবারের একটি অংশ। এ দিক থেকেও যদি দেখ, এটি শ্রদ্ধার যোগ্য। একটি ঝাড়ুর সঙ্গেও সসম্মানে ব্যবহার করা উচিত। অতি সামান্য কাজও শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করা উচিত।"[১৩৩]

শ্রীমায়ের মুখে তার ঐ আত্মপ্রশস্তি শুনে ঝাড়ুটির প্রাণে কি অননুভূত শিহরণ জেগেছিল সেটি কবির কল্পনার বিষয়। সৃষ্টির আদিকাল

---

১৩১ ঐ, পৃঃ ৩৯২-৯৩

১৩২ দ্রষ্টব্য: স্বামী তপস্যানন্দ প্রণীত 'শ্রীসারদা দেবী' ইংরেজী জীবনী, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ, ১৯৬৯, পৃঃ ৪৩৫

১৩৩ ঐ, পৃঃ ৪৩৪

থেকে কে কবে বলেছে-শুনেছে যে "ঝাড়ুটিও পরিবারভুক্ত। এর সঙ্গে ভদ্রভাবে সসম্মানে ব্যবহার করতে হয়"। ভাবে, কর্মে পরিণত অদ্বৈত বেদান্তের দর্শনকুশলতার ও হৃদয়বত্তার কী অত্যাশ্চর্য সুস্বাদু ফলপ্রকাশ! ঝাড়ুটিই যদি এত মহীয়ান হয়, তবে ঝাড়ুদার কি তার চেয়ে কম হবেন? ঈশ্বরের মাতৃভাবকে শ্রীমা কোন্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে কী গভীর প্রাণবন্ত ভাবে, কী অশ্রুতপূর্ব মৌলিকতার সঙ্গে কত শান্তি-কান্তি ও মাধুর্যের সঙ্গে বিভাসিত করলেন!

চুরির অপরাধে বিতাড়িত বেলুড় মঠের ভৃত্য, ভদ্রঘরের পতিতা, উপপতি-উপেক্ষিতা ডোমের মেয়ে, রাধুর বিড়াল, উঠানের ঝাঁটাটি—সকলকে মা যে অভাবনীয় গৌরবদানে মহীয়ান করলেন, ভেবে দেখলে অবাক্ হতে হয় যে, এই প্রত্যেক ব্যক্তি, জীব ও বস্তুর পেছনে মা যেন দাঁড়িয়ে আছেন উমা হৈমবতীর মতো জগৎ উদ্ভাসিত করে, জ্ঞানদায়িনীরূপে। জ্ঞানাঞ্জনে জীবের দৃষ্টি প্রস্ফুটিত করে যেন বলছেন: চেয়ে দেখ, বাবা, "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"। এই অনুভূত সত্যটি যখন হৃদয়ের গোমুখী থেকে ঘটনা স্রোতে প্রবাহিত হয় নানা কর্মে, তখন এটি হয়ে দাঁড়ায় ঈশ্বরের মাতৃত্ব-প্রকাশ। [ক্রমশঃ]

ভক্তমিলন-তীর্থ বাগবাজার

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বলরাম মন্দিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে হলঘর সংলগ্ন ঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ রাত্রিবাস করতেন। হলঘরটিতে তিনি ভক্ত সঙ্গে গান, নাচ ও সৎপ্রসঙ্গাদি করতেন। বর্তমানে শয়ন ঘরটিকে গর্ভমন্দির ও হলঘরটিকে নাটমন্দিরে রূপায়িত করা হয়েছে। অন্যান্য ঘরগুলি আগের মতোই আছে। শ্রীমা সারদাদেবীও বলরাম মন্দিরে অবস্থান করেছেন বহুবার। স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ১ মে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন গৃহীভক্ত ও সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে এই বলরাম মন্দিরে। শ্রীরামকৃষ্ণ-মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মাঝে মাঝে বাস করতেন দোতলার দক্ষিণ দিকের পশ্চিম পার্শ্বে। এখানেই হয় তাঁর মহাসমাধি। স্বামী প্রেমানন্দজীর শেষ অসুখের সময় তাঁকে বলরাম মন্দিরে রাখা হয়। তাঁরও মহাপ্রয়াণ হয় এখানেই। স্বামী তুরীয়ানন্দজী থাকতেন নীচের তলায় পূর্ব-দক্ষিণ দিকের ঘরে। আর এই ঘরটিতে একাদিক্রমে নয় বৎসর কাটিয়েছেন তপস্বী লাটু মহারাজ। এছাড়া স্বামী শিবানন্দজী, স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী বলরাম মন্দিরে বাস করেছেন। স্বামী যোগানন্দজী ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীও দীর্ঘকাল ছিলেন এখানে। ভক্তপ্রবর নিরভিমানী বলরাম বসুর সুযোগ্য পুত্র রামকৃষ্ণ বসুও ছিলেন পিতার মতন সাধু সেবায় সদা তৎপর। তিনি মৃত্যুর আগে বলরাম মন্দিরকে একটি ট্রাস্ট ডীড্ (Trust Deed) করে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠকে দিয়ে গেছেন। এই মহাপুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বলরাম মন্দির আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত-অনুরাগীদের কাছে পরম তীর্থস্থান।[৪২]

৪২ দ্রষ্টব্য: বলরাম মন্দিরে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বামী জীবানন্দ

বলরামের আত্মীয়-স্বজন অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শনের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বলরামের বহু আত্মীয় শুধুমাত্র ভক্ত ছিলেন না, শ্রীরামকৃষ্ণের অতি ঘনিষ্ঠ পার্ষদও ছিলেন। অন্যতম পার্ষদ ঈশ্বরকোটি স্বামী প্রেমানন্দজী ছিলেন পূর্বাশ্রমে বলরামের শ্যালক। প্রেমানন্দজীর জননী মাতঙ্গিনী দেবী এবং ভাই তুলসীরাম ও বিপিনবিহারী শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। বলরাম-সহধর্মিণী কৃষ্ণভাবিনী দেবী যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'রাধারাণীর অষ্টসখীর প্রধানা', তিনি ছিলেন প্রেমানন্দজীর সহোদরা। বলরাম মন্দিরে সেবাযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হত কৃষ্ণভাবিনীর সুব্যবস্থায়। বলরামের তিন সন্তান—ভুবনমোহিনী, রামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণময়ী এবং পিতা রাধামোহন—সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনলাভে জীবন ধন্য করেছিলেন। বলরামের খুল্লতাত ভ্রাতৃদ্বয় নিমাইচরণ ও হরিবল্লভ প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন না। হরিবল্লভ কটকে সরকারী উকিলের কাজ করতেন। নিমাইচরণ দেখাশুনা করতেন জমিদারী। নাটুকে গিরিশের বন্ধু হরিবল্লভ। কলিকাতায় এলে গিরিশ হরিবল্লভকে নিয়ে গেলেন শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। তাঁর দিব্য সঙ্গ ও পূতস্পর্শে হরিবল্লভ পরিণত হলেন নূতন মানুষে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "...কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা তো নয়, (হরিবল্লভ বসুকে নির্দেশ করিয়া) এ যে বালকের ন্যায় সরল! (গিরিশকে) কেমন চক্ষু দেখিয়াছ? ভক্তিপূর্ণ অন্তর না হইলে অমন চক্ষু কখন হয় না! (হরিবল্লভবাবুকে সহসা স্পর্শ করিয়া) হাঁ গো, ভয় করা দূরে থাকুক, তোমাকে যেন কত আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছে।" হরিবল্লভবাবু প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণপূর্বক বললেন, "সেটা আপনার কৃপা।"[৪৩] ক্রমে নিমাইচরণও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উঠলেন।

বলরামের স্বজন পরিকরের মধ্যে রামদয়াল ও ভক্ত ফকিরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামদয়াল চক্রবর্তী ছিলেন বলরামের পুরোহিত-বংশীয় এবং তাঁর বাড়ীতেই থাকতেন। তিনি নিষ্ঠাচারী, সরল, উদার ও ভক্তিমান। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যকথা তিনিই বলরামের কর্ণগোচর করেছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল। সেখান থেকেই সংগ্রহ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বার্তা। তারপরেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ।[৪৪] বাবুরামের (প্রেমানন্দজী) সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে রাত্রিবাসের দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী এই রামদয়াল চক্রবর্তী।

বলরামের পুরোহিত-বংশজ ফকির অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের অবস্থান ছিল বলরাম মন্দিরে। তিনি ছিলেন বলরাম-পুত্র রামকৃষ্ণবাবুর গৃহ-শিক্ষক এবং নিজেও বিদ্যালয়ে পড়তেন। নিষ্ঠা-পরায়ণ ও ভক্তিমান ফকির শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ফকিরের মুখনিঃসৃত স্তোত্রাদি শ্রবণ করতে ভালবাসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আচার্য শঙ্করের কালীস্তোত্র কিরূপে আবৃত্তি করতে হয় শ্রীরামকৃষ্ণ শিখিয়েছিলেন তাঁকে। এক রথোৎসবে বলরাম মন্দিরের উত্তর দিকের বারান্দায় ফকিরকে নিয়ে গিয়ে তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে স্পর্শ করেন এবং তাঁকে ধ্যান করতে বলেন। এর ফলে ফকিরের অদ্ভুত দর্শনাদি হয়েছিল।[৪৫]

বলরাম বসুর পরিবার ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজন ভক্তেরা ছাড়া আরও কতকগুলি ছোকরা ও বয়স্ক ভক্ত যাঁদের দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা ছিল, বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতেন। 'ছেলেধরা মাস্টার'

৪৩ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৪১-৪২

৪৪ পুঁথি, পৃঃ ২৭২ ৪৫ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব—উত্তরার্ধ, পৃঃ ২৩৮

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—শ্রীম, তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত শ্যামবাজারের মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ঈশ্বরানুগ ছেলেদের তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে যেতেন। এরূপে তেজচন্দ্র, নারায়ণ, হরিপদ, বিনোদ, ছোট নরেন, পল্টু প্রভৃতি ছোকরারা শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে এসেছিলেন। এঁরা সবাই বাগবাজার অঞ্চলের বালক।[৪৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "যাদের বিষয়-বুদ্ধি রয়েছে, তারা উপদেশ ধারণা করতে পারে না। দইপাতা হাঁড়িতে দুধ রাখলে, ঐ দুধ নষ্ট হয়ে যায়।" উপরি-উক্ত বালকেরা ছিলেন বিষয়-বুদ্ধিশূন্য, নির্মলচরিত্র, শুদ্ধ-সত্ত্ব শুভ সংস্কারবান, অতিশয় সরল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ ভালবাসতেন এঁদেরকে। বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সান্নিধ্যে এসেছেন এই সব বালকেরা। তেজচন্দ্রের অনেক কাজ করতে হত বলে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া হয়ে উঠত না। শ্রীরামকৃষ্ণের আপনার জন তেজচন্দ্রকে বাড়ীতে ধ্যান করতে বলতেন। আঠারো বছর বয়সী নারায়ণকে দেখবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। এমন কি বাগবাজারে এলে তিনি গাড়ী থামিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। তাঁকে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসল্যভাবের উদয় হত। নারায়ণের বাড়ীর লোকদের শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গ অপছন্দ হলেও নারায়ণ মিলিত হতেন সুযোগ পেলেই। মেয়েমানুষের হাওয়া গায়ে লাগাতে নারায়ণকে তিনি নিষেধ করেছিলেন। হরিপদ শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি সুর করে কথকতা করতে পারতেন। খুব ধ্যান করতেন বলে হরিপদের চোখ দুটি ছিল আরক্তিম। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলেন হরিপদকে। বালক বিনোদ—বিনোদ বিহারী সোম—স্বামী সারদানন্দজীর 'দোস্ত'। পরে থিয়েটারে যোগ দেন বলে পাড়ার লোকেরা ডাকত পদ্মবিনোদ বলে। অনেক নাটকে সার্থক অভিনয় করেছেন। ছোট নরেন—নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মনে 'জমি, জরু ও রুপেয়া'র আকর্ষণ ছিল না। বাড়ীর গালাগালি সহ্য করেও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করতেন। পরে তিনি এটর্নী হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাকালে ছোট নরেন ছিলেন সম্পাদকের দায়িত্বে। পল্টু—প্রমথনাথ করকেও বাড়ীর অনুযোগ শুনতে হত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাবার জন্য। পরে তিনি আইনজীবী হন। বেলুড় মঠে ট্রাস্ট ডীড্ (Trust Deed) রেজিস্ট্রেশনে পল্টু ছিলেন মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে উকিল। এই সব শ্রীরামকৃষ্ণের বালক-ভক্তদের বাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বলরাম মন্দিরে তুলসীচরণ দত্ত (পরে স্বামী নির্মলানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। তুলসী বাগবাজারের বসুপাড়ার অধিবাসী। প্রায় এক বিঘা জমির উপর তাঁদের প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল। বর্তমানে বাড়ীটি আর নেই। বলরাম মন্দিরে প্রথম দর্শনের পরে দক্ষিণেশ্বরেও তুলসী কয়েকবার শ্রীরামকৃষ্ণের পূতসঙ্গ লাভ করেছিলেন।

কৃষ্ণভাবিনী বলে এক ভক্তিমতী মহিলা বাগবাজারের নেবুবাগানে থাকতেন। সকলে তাঁকে 'ভাবিনী' বলে ডাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে ধন্যা ভাবিনীর রান্না ছিল উপাদেয়। বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন হলেই তিনি এসে রান্না করতেন। কারণ তাঁর হাতের রান্না শ্রীরামকৃষ্ণ খুব ভালবাসতেন।[৪৭]

ভাই ভূপতি নামে আর একজন, রামকৃষ্ণ বসুর গৃহশিক্ষক। বাগবাজারে রাজবল্লভ পাড়ার লোক। আদরের নাম ঝুলন। তিনি মেধাবী ও গণিতে পারদর্শী। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে

৪৬ ঐ, দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৯৪-৯৫

৪৭ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ১১

তাঁর সমাধি হয়েছিল। সাধন-ভজন করে তিনি উচ্চ অবস্থা লাভ করেছিলেন।[৪৮]

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক রসরাজ অমৃতলাল বোসের বাড়ী ছিল বাগবাজারে। অমৃতলাল জেনারেল অ্যাসেমব্লি থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করে মেডিকেল কলেজে দু-বছর ডাক্তারী পড়েন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষালাভ করে কলিকাতায় তা চর্চা করেন কিছুকাল আবার শিক্ষকতা ও পুলিশের চাকরি করেন। এরপর অভিনয়-জগতে আসেন এবং এই সূত্রেই গিরিশের সঙ্গে আলাপ। অনেক গ্রন্থ ও নাটকের রচয়িতা অমৃতলাল হাস্যরসাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলে 'রসরাজ' নামে পরিচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী' পদকের অধিকারী অমৃতলাল গিরিশের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। গিরিশই তাঁকে বারবার শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণপ্রান্তে উপনীত করেছেন। তাঁর আশীর্বাদে ধন্য হয়েছিলেন রসরাজ। 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা' নামে জীবনী কাব্য লিখে অমৃতলাল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন।[৪৯]

বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীর পর যে বাড়ীটি শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণধূলিতে ধন্য, সেটি গিরিশ-ভবন। গিরিশের শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দীননাথ বসুর বাড়ীতে। সে দর্শন তাঁর মনে কোন দাগ কাটেনি। তারপরেই দর্শন বলরাম মন্দিরে। গিরিশের বাড়ী বলরাম মন্দিরের পাশেই ১৩ নম্বর বোসপাড়া লেনে। গিরিশের ধারণা যোগী ও পরমহংসেরা কারুর সঙ্গে কথাও বলেন না এবং কাউকে নমস্কারও করেন না। তবে অনেক সাধ্য-সাধনার পর পদসেবার অনুমতি দেন মাত্র। কিন্তু দেখলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ধারণার বিপরীত পরমহংস। তিনি বন্ধুভাবে কথা বলেন, দীনভাবে ভূমিস্পর্শ করে বারবার প্রণামও করেন। গিরিশ চমকিত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে। কিন্তু পরিচয় ঘনীভূত হল না। সে পরিচয় ঘনীভূত হল স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন উপলক্ষে।

সবেমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে গিরিশের। বোসপাড়ার গলির মোড়ে রকেতে বসেছিলেন গিরিশ। এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ী করে যাচ্ছিলেন। গিরিশের প্রণামের পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখামাত্র প্রণাম করে বসলেন। গিরিশ এবার প্রণাম করলে তিনিও পুনরাবৃত্তি করলেন। বারবার এরূপ হতে থাকায় গিরিশ ক্ষান্ত হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু না থেমে আবার প্রণাম করলেন। গিরিশ মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনটার সঙ্গে আর প্রণাম করা চলে না। ওটা পাগলা বামুন, ওর ঘাড় ব্যথা হয় না।" এই ঘটনাটি উল্লেখ করায় গিরিশ মন্তব্য করেছিলেন, "রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎ-জয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে বাঁশির ধ্বনিতে জগৎ-জয় হয়েছিল, কিন্তু রামকৃষ্ণ অবতারে প্রণাম-অস্ত্র দিয়ে জগৎ-জয় হবে।"[৫০]

আর একবার গিরিশ ঐ বোসপাড়ার রকে বসে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসমভিব্যাহারে

৪৮ শ্রীম-দর্শন ৫ম খণ্ড, (১ম সংস্করণ), পৃঃ ৩৩০

৪৯ সংসদ বাঙলা চরিতাভিধান, পৃঃ ২৫
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ—অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (১ম প্রকাশ), পৃঃ ১৪৯-৫০
সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় (১ম প্রকাশ), পৃঃ ১১৩

৫০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, (৫ম সং—১৩৮৬), পৃঃ ৬৭-৬৮

চলেছেন বলরাম মন্দির অভিমুখে। এবারেও দুজনের দৃষ্টির বিনিময় হতেই তিনি আগে গিরিশকে নমস্কার করলেন। গিরিশ প্রতিনমস্কার করলে আর পুনর্নমস্কার না করেই, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজপথে চলতে থাকলেন। গিরিশের মনে হল, কে যেন অদৃশ্য সূত্রে তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করছে। একটু পরেই জনৈক ভক্ত এল গিরিশের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বান নিয়ে। সেইমতো তিনি বলরাম মন্দিরে গেলে কিছুক্ষণ পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ বলে উঠলেন, "বাবু, আমি ভাল আছি; বাবু, আমি ভাল আছি"—বলতে বলতে কেমন যেন অবস্থা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বলতে লাগলেন, "'না না ঢং নয়, ঢং নয়।' একি গিরিশের সন্দেহের উত্তর? একটু পরে গিরিশের সহিত এরূপ আলাপ হইল—(গিরিশ) 'গুরু কি?' 'গুরু কি জান—যেমন ঘটক। তোমার গুরু হয়ে গেছে।' (গিরিশ 'মন্ত্র কি?' 'ঈশ্বরের নাম।' আরও কথাবার্তার পর প্রত্যাবর্তনকালে গিরিশ অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার দম্ভের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—অবশেষে একদিন দেবমানবের নিকট তাঁহাকে মস্তক নামাইতেই হইবে।"[৫১]

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাতে গিরিশ ছিলেন 'ভৈরব'। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরে ভাবসমাধিতে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ঐরূপে হয়েছিল। গিরিশের সব ভার নিয়ে অর্ধবাহ্যদশায় বলেছিলেন, "...আচ্ছা, তবে আমায় বকলমা দে।" গিরিশের যাতে একটু শক্তি হয়—এজন্য তিনি মা জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। সুতরাং সেই গিরিশ অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শুধুমাত্র মস্তক নোয়ালেন না, শয়নে-স্বপনে-জাগরণে শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে গেলেন তিনি। 'চৈতন্যলীলা' দিয়ে যে অঙ্কুর উদ্গত হয়েছিল, পরম-আশ্রয়দাতা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমবারি-সিঞ্চনে তা দলে-পুষ্পে মহামহীরূহে পরিণত হল। গিরিশ থিয়েটার ছাড়তে চাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ তা করতে নিষেধ করলেন লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে, গিরিশ, শরণাগতি-আত্মসমপর্ণের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। 'বকলমা'র সার্থক প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর অর্থ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, অন্য নানাভাবে সহায়তা প্রদান করে গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে সেবা ও লালন-পালন করে গেছেন। তাই প্রেমানন্দজী বলতেন, "গিরিশবাবুর উপমা গিরিশবাবু।" শ্রীপ্রভুর কথা ছিল—"তোমায় দেখে লোকে অবাক হবে।"[৫২]

এই গিরিশ কলিকাতার ভক্তবাড়ী ছাড়া, দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে বহুবার বহুভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন সম্ভোগ-উপভোগ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজ বাড়ীতে আহ্বান করে এনে গিরিশ ঐ আনন্দকে আরও নিবিড়ভাবে আস্বাদন করেছেন। বর্তমানে বাগবাজারের গিরিশ অ্যাভিনিউ-এর উপর যে 'গিরিশ মেমোরিয়াল' বাড়ীটি রয়েছে, ওখানেই ছিল গিরিশের বাড়ী—১৩ নম্বর বোসপাড়া লেন। মেমোরিয়াল বাড়ীটির দোতলায় একটি পাঠাগার আছে—ঐ অংশটুকু গিরিশভবনের আদি অংশ। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট (Calcutta Improvement Trust —সংক্ষেপে CIT) ঐ অংশটুকু বজায় রেখে এই বাড়ীটি তৈরী করেছেন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জুন অবধি ট্রাস্টের অধীনে ছিল। পরে কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে যায়।[৫৩] [ক্রমশঃ]

৫১ ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৫৯-৬০

৫২ স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—উদ্বোধন কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (২য় সং—১৩৮৬), পৃঃ ১১৯, ১৪৮

৫৩ কলকাতা এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস—অতুল সুর, পৃঃ ২৮২

শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকচিত্র

শ্রীপীযূষকান্তি রায়

[ফাল্গুন, ১৩৮১ সংখ্যার পর]

শ্রীরামকৃষ্ণের তৃতীয় ফটো

শ্রীরামকৃষ্ণের তৃতীয় ফটোটিকে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে "দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ"। ঠাকুরের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ফটোগুলি কিভাবে এবং কোন্ তারিখে তোলা হয় তার যেমন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, এই তৃতীয় ফটোটির ইতিহাস কিন্তু তেমন স্পষ্টভাবে জানা যায় না। কিভাবে এই ফটো তোলা হয় (ঠাকুরের সম্মতি-ক্রমে কিনা) তাও কিঞ্চিৎ বিতর্কিত। এই ফটোতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে পশ্চিমমুখো শ্রীশ্রীরাধাকান্ত মন্দিরের বারান্দায় একটি আসনের উপর খালি গায়ে বসে আছেন ধুতির খুঁট বাঁ কাঁধের উপর, আজানুলম্বিত বাহু, কোলের কাছে দু হাত একত্র করা, ডান পায়ের আঙুল অদৃশ্য, বাঁ পায়ের কয়েকটি আঙুল দেখা যায়। ঠাকুরের হৃষ্টপুষ্ট দেহ। প্রথম ও দ্বিতীয় ফটোতে তাঁকে জামা গায়ে দাঁড়ানো দেখা যায়—কিন্তু এটিতে তিনি বসে আছেন খালি গায়ে।

এই ফটো তোলা প্রসঙ্গে যাঁরা বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীসুরেন্দ্র-নাথ চক্রবর্তী এবং মঠ ও মিশনের বর্তমান সহ-অধ্যক্ষ স্বামী নির্বাণানন্দজী অন্যতম। ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় যে এ ফটোটি তোলা সম্ভব হয়েছিল[১৭] সে বিষয়ে সকলেই একমত। শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ, ভবনাথের কন্যা শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরে (ফেব্রুআরি ১৯৬৮), এক প্রবন্ধে লিখেছেন[১৮]—"ফটো-সংক্রান্ত ব্যাপারেই ভবনাথ রামকৃষ্ণ-লীলায় বিশেষভাবে স্মরণীয়।...ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় উপবিষ্টাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণের যে ফটোচিত্র সর্বত্র সর্বজনের শ্রদ্ধা গ্রহণ করে, সেই ফটোও ভবনাথের উদ্যোগে তোলা হয়েছে।"

ফটোগ্রাফার শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাঁর দুই পুত্রবধূ ও পৌত্রদ্বয়ের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই ফটো প্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়েছেন[১৯] তা থেকে জানা যায় যে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের এক রবিবার সকালে প্রায় সাড়ে নটায় দক্ষিণেশ্বরের রাধাকান্তের মন্দিরের বারান্দায় এই ফটো তোলা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গা ও শিব-মন্দিরের দিকে মুখ করে বসে আছেন। সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ ও জনকয় ভক্ত উপস্থিত। বরাহনগরনিবাসী ভবনাথের পরিচিত শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাঁ বোর্ন্ অ্যান্ড্ শেফার্ড্ কোম্পানিতে চাকরি করতেন। ভবনাথ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসেন ঠাকুরের ফটো তুলতে। ভবনাথ ও নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) সহযোগিতায় এই ফটো তোলা সম্ভব হয়। ভবনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ। ফটো নেওয়ার জন্য ভবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে অনেক অনুরোধ করেন। ভবনাথের পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঠাকুর মৌনভাবে সম্মতি প্রদান করেন। তারপর একখানা কার্পেটের আসন পেতে দেওয়া হয়। ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে ঐ আসনে বসে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হন। ভবনাথ সেই সুযোগে ফটো তুলে নেবার জন্য অবিনাশবাবুকে ইঙ্গিত

---

১৭ উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৬৯, পৃঃ ৫২৯ ১৮ উদ্বোধন, কার্তিক ১৩৭৭, পৃঃ ৫৮৩

১৯ উদ্বোধন, কার্তিক ১৩৬৯, পাদটীকা, পৃঃ ৫৫৮ ও আশ্বিন ১৩৬৯, পৃঃ ৫২৯-৫৩৩

করেন। ফটোগ্রাফার তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হন ও ফটো তোলা হয়। ফটোর কাচের নেগেটিভ্ ক্যামেরা থেকে বের করবার সময় তাড়াহুড়োতে হঠাৎ মাটিতে পড়ে উপরের দিকে সামান্য একটু ভেঙে যায়। ডেভেলপ্ করার পর অবিনাশবাবু সেই ভাঙা জায়গা অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি আকারে কেটে বাদ দিয়ে নতুন করে আবার নেগেটিভ করেন। তাই এই ফটোর কপিতে ঠাকুরের মাথার উপর কালো ছায়ার মতো অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি দাগ দেখা যায়। এই ফটোর নেগেটিভ্ হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাওয়া ও কাচের প্লেটের উপরের দিকটা অর্ধ-গোলাকার করে কেটে নিয়ে তা থেকে আর একটি নেগেটিভ্ করার ঘটনা স্বামী অভেদানন্দজীও সমর্থন করেছেন।[২০]

ফটো তোলা হলে পর—অবিনাশবাবুর অবস্থা সচ্ছল নয় জেনে ঠাকুর ফটোর খরচ বাবদ কিছু টাকা তাঁকে দিতে বলেন। মহেন্দ্র কবিরাজ অবিনাশবাবুকে দশ টাকার একটি নোট দেন। তিন হপ্তার মধ্যে ফটোর কপি না পাওয়ায় ঠাকুর একদিন ভবনাথকে তাগিদ দিয়ে বলেন[২১]—"তোমার ফটোমাষ্টার এল না, তাই তো, তার কি হল?" ভবনাথ অবিনাশবাবুর বাড়ি গিয়ে সুকৌশলে ফটোর কপি সংগ্রহ করেন। ভবনাথ যখন ফটোর কপি ঠাকুরকে দেখান, তখন তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। এই ভাবাবেশে ঠাকুর ঐ ফটো কয়েকবার নিজের মাথায় ছোঁয়ান এবং গদগদ কণ্ঠে বলেন[২২]—"ফটোখানি বেশ তুলেছে, এর ভাব অতি উচ্চ, তাঁতে একেবারে লীন হয়ে গিয়েছে। এতে তাঁরই স্বরূপ ফুটে উঠেছে।" উপরি-উক্ত বিবৃতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মতিক্রমেই এই ফটো তোলা হয়।

বেলুড়ে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দজী কথাচ্ছলে অনেককে বলেছিলেন[২৩]—"ঠাকুরের যে ছবি পূজা হয়, তার সম্বন্ধে কিছু জানিস্?" তারপর তিনি এই ফটোটি সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, স্বামী নির্বাণানন্দজী তাঁর এক প্রবন্ধে তা লিপিবদ্ধ করেন[২৪]। তাঁর এই লেখা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভবনাথের অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ ফটো তোলার প্রস্তাবে সম্মত হননি এবং ভবনাথ যখন বিফলমনোরথে ক্যামেরাম্যান অবিনাশ-বাবুকে সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হন, তখন স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) এ ঘটনা জানতে পেরে ভবনাথকে অপেক্ষা করতে বলেন। তারপর তিনি রাধাকান্তের মন্দিরের বারান্দায় ঠাকুরের কাছে গিয়ে ভগবৎ প্রসঙ্গ আরম্ভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সমাধি হলে ঠাকুরের শরীর একদিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ফটোগ্রাফার ঠাকুরের থুতনি ধরে সোজা করার চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের সমগ্র দেহ কাগজের মতো হাল্কা হয়ে নড়ে ওঠে। এতে নরেন্দ্রনাথ বিরক্তি প্রকাশ করেন ও ভব-নাথকে তাড়াতাড়ি ফটো নিতে ইশারা করেন। নিমেষের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অজান্তে তাঁর জগৎ-বিখ্যাত ফটোটি তোলা হয়। অতএব দেখা যায়, এই তৃতীয় ফটো তোলার ইতিহাস সামান্য বিতর্কমূলক।

বিতর্কের প্রথম বিষয়বস্তু হল—সুরেনবাবুর মতে এই ফটোখানি ঠাকুরের সম্মতি নিয়েই তোলা হয় এবং স্বামী নির্বাণানন্দজীর মতে (তিনি যা স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কাছে শুনেছেন) ঠাকুরের অজ্ঞাতে ও বিনা অনুমতিতেই এ ফটো তোলা হয়। বিতর্কের দ্বিতীয় বিষয় হল—ঠাকুরের এ ফটো তোলার সঠিক সাল, বার ও সময় শ্রীচক্রবর্তীর

২০ মন ও মানুষ, পৃঃ ১৫২-৫৩ ২১ উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৬৯, পৃঃ ৫৩১
২২ ঐ, পৃঃ ৫৩৩ ২৩ উদ্বোধন, পৌষ ১৩৬৯, পৃঃ ৬৫৫ ২৪ ঐ

মতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের এক রবিবার বেলা ৯-৩০ মিনিটে। তার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেছেন[২৫] যে, অবিনাশবাবুর পুত্র মন্মথনাথের জন্মাবার দুদিন আগে যে রবিবার ছিল সেদিন এই ফটো গৃহীত হয়। মন্মথবাবুর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে (আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছরের আগের ঘটনা) সুরেনবাবু জানতে পারেন যে, যদিও তাঁর স্বামীর কোন কোষ্ঠী ছিল না, তবে তিনি তাঁর শ্বশুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাঁর কাছে শুনেছেন, মন্মথবাবুর জন্মাবার দুদিন আগে যে রবিবার ছিল ঐ দিন এ ফটো তোলা হয়। মন্মথবাবু ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের এক মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন।

স্বামী নির্বাণানন্দজীর কাছ থেকে শুনে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজী বলেছেন[২৬] যে, ১৮৮৩-তে এ ফটো তোলা হয়নি এবং ২ ফেব্রুআরি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে যে কোন একদিন এই ফটো নেওয়া হয়। এই মতকে সমর্থন করার জন্য তিনি বলেছেন যে, এই তিন নম্বর ফটোতে ঠাকুরের বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছটা ডান হাতের মতো স্বাভাবিক নয়। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় এ হাতখানা ভাঙা ও কিঞ্চিৎ ফোলা। ঠাকুরের বাঁ হাতখানা যে ভেঙে গিয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মাষ্টার-মশায়ের ২ ফেব্রুআরি ১৮৮৪-র বর্ণনায়[২৭]—"একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন; সঙ্গে কেহ না থাকাতে রেলের কাছে পড়িয়া যান। তাহাতে তাঁহার বাম হাতের হাড় সরিয়া যায় ও খুব আঘাত লাগে।" এ ঘটনা থেকেই সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত ধারণা হয় যে, ঠাকুরের হাত ভাঙবার পরেই এই ফটো নেওয়া হয়। মত যাই হোক না কেন, কার অনুমান পূর্ণ বা আংশিক সত্য সে বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। ভবনাথ ও নরেন্দ্রনাথের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণের যে মনোমুগ্ধকর, বহুল প্রচারিত ও সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত এই ফটোগ্রাফটি সর্বকালের জন্য ক্যামেরায় ধরে রাখা সম্ভবপর হয়েছে, সেটাই আসল কথা।

ভবনাথের সাহায্যে তোলা এই তিন নম্বর ফটো দেখে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নিজেই বলেছিলেন[২৮]—"এটি মহা যোগাবস্থার মূর্তি, এর ভাব অতি উচ্চ। এর ধ্যান-চিন্তা করলেই হয়ে যাবে। একদিন দেখবে ঘরে ঘরে এ ফটোর পূজা হবে।" বাস্তবিক আজ বিশ্বের সর্বত্র এই বিশেষ ফটোখানিই ঘরে ঘরে পূজিত। এই ফটোর আদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণের যাবতীয় মর্মরমূর্তিও গড়া হয়েছে—যা দেশ-বিদেশের মঠ ও মিশনের নানা কেন্দ্রে ও মন্দিরে পূজা করা হয়। যে-সব মন্দিরে মর্মরবিগ্রহ নেই, সেখানে ঠাকুরের শুধু এই ফটোটিরই নিত্যপূজা হয়ে থাকে।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে এই তিন নম্বর ফটোর একখানা আদি প্রতিলিপি টাঙানো ছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকারের রবিবার ১ মার্চ ১৮৮৫-র বিবরণ থেকে জানা যায়[২৯]—

"ঠাকুর আবার পাকা উঠান দিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার ও আর একজন আবিরের থালা হাতে করিয়া আসিতেছেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া সব পটকে ফাগ দিলেন—দু-একটি পট ছাড়া—নিজের ফটোগ্রাফ ও যীশুখৃষ্টের ছবি।"

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে চিকিৎসার জন্য যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথমে শ্যামপুকুর স্ট্রীটে ও পরে কাশীপুরে স্থানান্তরিত করা হয়, সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের ঘর থেকে তাঁর জিনিসপত্রের

২৫ উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৬৯, পাদটীকা, পৃঃ ৫৩১
২৬ বেদান্ত কেশরী, জানুআরি ১৯৭৭, পৃঃ ২৭২
২৭ কথামৃত, ৪।১০।১
২৮ উদ্বোধন, আশ্বিন ১৩৬৯, পৃঃ ৫২৯
২৯ কথামৃত, ২।২৩।৩

সঙ্গে এই ফটোখানিও সরিয়ে আনা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পরে তাঁর ত্যাগী সন্তানগণ এই ফটোখানিই কাশীপুর থেকে ক্রমে বরাহনগর মঠে নিয়ে যান।[৩০]

১৮৮৬-র সেপ্টেম্বর মাসে বরাহনগর পরামানিক ঘাট রোডের ভুবন দত্তের একটি জীর্ণ ভাড়াটে বাড়িতে (মুন্সিদের "পোড়োবাড়ি") যখন প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী এই ফটোখানি প্রতিদিন পূজা করতেন এবং সন্ধ্যায় সকলে ধূপ, ধুনা ও খোলকরতাল বাজিয়ে আরতি করতেন। এ সম্পর্কে শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন বর্ণনা দিয়েছেন[৩১]—

"শ্রীপ্রভুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সকল।
শয্যা বস্ত্র পাদুকাদি হুকাসহ নল॥
সাজাইয়া যথাস্থানে যত্নসহকারে।
শ্রীমূর্তি সহিত শশী নিত্যসেবা করে॥"

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজীকে একদিন বলেছিলেন[৩২]—"তুই কাঁধে করে আমাকে যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটিরই কি।" স্বামীজী প্রভুর এ আদেশ শিরোধার্য করে তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি ও এই ফটোখানিকে বেলুড় মঠের পুরানো মন্দিরে (দোতলায়) প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর তারিখে।[৩৩] ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের নতুন মন্দির তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই ফটোখানি সেখানেই থাকে। ঠাকুরের বর্তমান নতুন মন্দিরে মর্মরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হবার পর (১৪ জানুআরি ১৯৩৮) এই ফটোটি নতুন মন্দিরের দোতলায় (শয়নকক্ষে) স্থানান্তরিত করা হয়। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের দেয়ালে টাঙানো এই তৃতীয় আদি কপিটি নানাস্থানে অবস্থানের পর যে বেলুড় মঠে নিয়ে আসা হয়, সে ঘটনা সমর্থন করেছেন মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ।[৩৪]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই তিন নম্বর ফটো সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর ঘটনা পাওয়া যায়। "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন স্বহস্তে এই ফটোতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজা করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা এই ফটো প্রসঙ্গে বলেছেন[৩৫]—"...আমি এখানি অন্যান্য ঠাকুর দেবতার ছবির সঙ্গে রেখে দিয়েছিলুম—পূজা করতুম। নহবতের নীচের ঘরে থাকতুম। একদিন ঠাকুর গিয়েছেন। ছবি দেখে বলছেন, 'ওগো, তোমাদের আবার এ-সব কি?'... তারপর দেখলুম, বিল্বপত্র আর কি কি, যা পূজার জন্য ছিল, একবার না দুবার ঐ ছবিতে দিলেন—পূজা করলেন। সেই ছবিই এই।" বর্তমানে উদ্বোধন শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে (বাগবাজার) ঠাকুরঘরের বেদীতে সিংহাসনে রক্ষিত এই ফটোর নিত্যপূজা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (উদ্বোধন) প্রকাশিত এক পুস্তিকায় এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে[৩৬]—"...শ্রীশ্রীমায়ের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে ফটোটি সর্বদা থাকিত, মা যেটিকে পূজা করিতেন, যে ফটোটি দক্ষিণেশ্বরে

---

৩০ বেদান্ত কেশরী, জানুআরি ১৯৭৭, পৃঃ ২৭৪
৩১ শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' (উদ্বোধন) ৯ম সং (১৩৮৩), পৃঃ ৬৩২
৩২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (উদ্বোধন) ৯ম খণ্ড (১৩৭১), পৃঃ ১১১
৩৩ ঐ ৩৪ বেদান্ত কেশরী, জানুআরি ১৯৭৭, পৃঃ ২৭৪
৩৫ শ্রীশ্রীমায়ের কথা (উদ্বোধন) ২য় ভাগ, ১৩৬৮, পৃঃ ৫০-৫১
৩৬ শ্রীশ্রীমায়ের বাটী ও উদ্বোধন কার্যালয় (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—বাগবাজার), ১৩৭৫, পৃঃ ২১

থাকাকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেও একদিন পূজা করিয়াছিলেন, সেই ফটোটিও বেদীতে রাখা হইল। পূজা করিতেন শ্রীশ্রীমা নিজেই।" পূর্ববর্তী বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, শ্রীশ্রীমা আজীবন এই ফটো পূজা করেছেন এবং কখনও এই ফটোখানি কাছ-ছাড়া করেননি। কোথাও গেলেও তিনি এই ফটোখানি কাপড়ে মুড়ে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। শ্রীশ্রীমার সন্তান স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী এ-প্রসঙ্গে লেখককে জানিয়েছেন[৩৭]—"শ্রীশ্রীমা ঐ নহবতের ফটোই বরাবর নিজের কাছে রাখতেন ও রোজ পূজা করতেন। এখন ঐ ফটো উদ্বোধনে পূজা হয়। আর ফটো বদ্‌লাননি। জয়রামবাটী থেকেও কলকাতা যাবার সময় পূজা করে ঠাকুরকে আমার সামনেই কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ঐ ছোট টিনের (Steel-এর নয়) বাক্সে রাখতেন। তিনি রওনা হলে আমরা ঠাকুর ও মার আলাদা ফটো রেখে পূজা করতাম। মা ফিরে এসে বলতেন—'তোমাদের ঠাকুর নিয়ে যাও গো'। আমরা সরিয়ে নিলে তিনি তাঁর ঐ ঠাকুরের ফটো বাক্স থেকে বের করে বসাতেন ও পূজা করতেন।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও পুরীতে ৺জগন্নাথ দর্শনে যাননি। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে কিভাবে ৺জগন্নাথ দর্শন করিয়েছিলেন, তার বিবরণ স্বামী গম্ভীরানন্দজী তাঁর এক গ্রন্থে দিয়েছেন[৩৮]—"শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীক্ষেত্রে যান নাই বলিয়া শ্রীমা তাঁহার ছবি বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া লইয়া গিয়া ৺জগন্নাথ দর্শন করাইয়াছিলেন, যেহেতু শ্রীমায়ের বিশ্বাস ছিল, 'ছায়া-কায়া সমান'।" স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর উল্লিখিত স্বীকৃতি অনুযায়ী বলা যায় যে, শ্রীশ্রীমা নহবতের ফটোখানাই সর্বদা সঙ্গে রাখতেন ও প্রতিদিন পূজা করতেন, পুরীতে ৺জগন্নাথদেবকে তিনি ঠাকুরের এই তিন নম্বর ফটোর আদি কপিখানাই দর্শন করিয়েছিলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দজী পরিব্রাজক হয়ে তিব্বতে লামাদের মঠে একদা ছিলেন। স্বামী অন্নদানন্দজী তাঁর গ্রন্থে ঐ সময়ের একদিনের ঘটনায় লিখেছেন[৩৯]—"গঙ্গাধরের সহিত সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি পট থাকিত। থুলিং মঠে অবস্থানকালে জনৈক লামা এই ছবিখানি তাঁহার হাত হইতে লইয়া ভগবান তথাগতের মূর্তির পাশে রাখিয়া পূজা আরতি করেন ও জিজ্ঞাসা করেন 'এ ছবি কোথায় পেলে? ইনি কে? এ চোখ তো সাধারণ মানুষের নয়,—এ ভগবান বুদ্ধ!'" এ ঘটনা ১৮৮৮-র। মনে হয় এ ফটোটিও তিন নম্বর।

মাতৃসেবক স্বামী ঈশানানন্দজীর লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের গোড়ার দিকে শ্রীশ্রীমা কোয়ালপাড়ায় (বাঁকুড়া জেলা) শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাঁর নিজের ফটো পূজা করেছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকে আরও জানা যায়, শ্রীশ্রীমা একদিন বলেছিলেন যে, তিনি কোয়ালপাড়া আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করবেন—বসিয়ে দিয়ে যাবেন। ঠাকুরের ফটোর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি বলেছেন[৪০]—

"শ্রীশ্রীমা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ও তাঁহার নিজের ফটো দুইটি পর পর মাথায় ঠেকাইয়া ঠাকুরঘরে ছোট সিংহাসনে নিজ হাতে পাশাপাশি বসাইয়া ফুল চন্দন দিয়া পূজা করিলেন।" দক্ষিণেশ্বরে নহবতে ঠাকুর তাঁর নিজের ফটো পূজা করেছিলেন, আর কোয়াল-

---

৩৭ স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর পত্র (লেখকের কাছে) তারিখ ২০।৫।৭৮
৩৮ স্বামী গম্ভীরানন্দ রচিত 'শ্রীমা সারদা দেবী' (উদ্বোধন) ১৩৬৯, পৃঃ ২১৬
৩৯ স্বামী অন্নদানন্দ প্রণীত 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' (উদ্বোধন) ১৩৬৭, পৃঃ ৫০
৪০ স্বামী ঈশানানন্দ রচিত 'মাতৃ-সান্নিধ্যে' (উদ্বোধন) ১৩৭৫, পৃঃ ১৬-১৭

পাড়ায় শ্রীশ্রীমা তাঁর নিজের ও ঠাকুরের ফটো প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেছিলেন।

ভবনাথ অবিনাশবাবুকে দিয়ে এই ফটোর কথানা কপি করিয়েছিলেন তার সঠিক হিসেব নেই, তবে আদি কপির (Original) খান পাঁচেকের অস্তিত্ব এখনও বর্তমান। উদ্বোধনে পূজা বেদীতে একখানা আছে, আর একখানা আছে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের বেদীতে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তৃতীয় কপিখানা আছে বেলুড় মঠে ঠাকুরের প্রধান মন্দিরের উপর-তলায়। চতুর্থখানা প্রসঙ্গে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দজী যে বর্ণনা দিয়েছেন,[৪১] তা থেকে জানা যায় যে, আমেরিকা যাওয়ার পূর্বে কোন এক সময় স্বামী বিবেকানন্দ এই কপিটি কাশীর শ্রীপ্রমদাদাস মিত্র মশায়কে দিয়েছিলেন। প্রমদাবাবু ঠাকুরের এই ফটোটি তাঁর একখানা বিশ্বকোষের (Encyclopaedia) ভিতরে রেখে ছিলেন। মঠ ও মিশনের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দজী মিত্র মশায়ের বাড়ি থেকে বহু বছর পরে (সম্ভবতঃ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে) এই কপিটি উদ্ধার করেন। বইয়ের ভিতরে থাকায় ফটোটি বেশ স্পষ্ট ছিল এবং স্বামী শঙ্করানন্দজী কপিটি অদ্বৈত আশ্রমকে কপি তৈরি করার জন্য দেন। স্বামী অভেদানন্দজীর কাছেও এই ফটোর একখানা আদি কপি ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর উক্তিতে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন[৪২]—"শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই অরিজিন্যাল্ ফটো (আসল ছবি) আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের কাছে দেখেছি। অনেক দিনের পুরাতন বলে ঐ ফটোগ্রাফটা একটু অস্পষ্ট (fade) হয়ে গিসল।" আলোচ্য চার-খানা কপি ছাড়া আরও একখানা আদি কপির সন্ধান মিলেছে। তবে এ কপিটি অন্য কপি থেকে অপেক্ষাকৃত বড়। কাশীপুর শ্যামাচরণ মৈত্র লেনে প্রমথনাথ দাঁর গৃহে তাঁর পিতা অবিনাশবাবুর নিজ হাতে প্রিণ্ট করা এই তিন নম্বর ফটোর একখানি ফুল সাইজের কপি এখনও বর্তমান। এই ছখানি আদি কপি ছাড়া (তিন নম্বর ফটোর) আর কোন কপি কোথাও থাকলে, আমরা এখনও তা সঠিক জানতে পারিনি। গোপালের মার কাছে রক্ষিত একখানি আদি কপি, বেলুড় মঠে শ্রীমন্দিরে ঠাকুরের শয়নকক্ষে বর্তমানে সংস্থাপিত বলে শুনেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের চতুর্থ ও পঞ্চম ফটো

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফটো গৃহীত হয় যখন তিনি নরদেহে বিদ্যমান এবং সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় তিনি সমাধিতে মগ্ন। চতুর্থ ও পঞ্চম ফটো তোলা হয় তাঁর মহাপ্রয়াণের পরে অর্থাৎ সোমবার ১৬ অগস্ট ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে (১ ভাদ্র ১২৯৩) বিকেল পাঁচটায় কাশীপুরে গোপাল ঘোষের উদ্যানবাটীতে (অধুনা ৯০, কাশীপুর রোড ও বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখাকেন্দ্র)। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে মাত্র যে কখানি ফটো তোলা হয়েছে, সে-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে এই দুখানি গ্রুপ-ফটোর ইতিহাসও উপেক্ষা করা যায় না। এই ফটোতে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের পার্থিব নরদেহ খাটে শায়িত। খাটটি ফুল ও মালায় সাজানো, ঠাকুরের কপালে চন্দন ও গলায় ফুলের মালা। পিছনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের কতিপয় ত্যাগী সন্তান ও গৃহী ভক্ত। এই দুখানি গ্রুপ-ফটোতে শুধু উপরের অংশ ও ফুলে সাজানো খাটের দুটি ছত্রী মাত্র দেখা যায়। পুষ্পশোভিত খাট, চন্দনে চর্চিত

---

৪১ বেদান্ত কেশরী, জানুআরি '৭৭, পৃঃ ২৭৪

৪২ মন ও মানুষ, পাদটীকা, পৃঃ ১৫৩

ফুলের মালায় বিভূষিত শ্রীরামকৃষ্ণের তনুখানি এই ফটোতে সম্পূর্ণ দেখা যায় না। সাধারণতঃ এই দুখানি গ্রুপ-ফটোর তলার অংশ, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানোত্তর দেহের চিত্র বিশেষ ছাপানো হয় না, কারণ এই করুণ ও মর্মস্পর্শী দৃশ্যে ভক্ত হৃদয় ব্যথিত হয়।

এই দুখানি গ্রুপ-ফটো প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দজী লিখেছেন[৪৩]—"... বেলা দশ ঘটিকার সময় ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার আসিয়া নাড়ী দেখিয়া বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন যে, আর মালিশ করিয়া কোন ফল হইবে না, অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। এইবার মহাসমাধি।...তখন দিব্যদেহের সৎকার করার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। সেই অবস্থার ফটো লইবার জন্য ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার ১০৲ টাকা দিয়া শোকাভিভূত চিত্তে চলিয়া গেলেন।...সেই মহাসমাধির ফটো লইবার জন্য বেঙ্গল ফটোগ্রাফার কোম্পানিকে খবর দিয়া আনানো হইল।...রামবাবু নিজে খাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইতে বলিলেন। আমরা পশ্চাতে সকলে নির্বাক হইয়া সিঁড়ির উপর দাঁড়াইলাম। বেঙ্গল ফটোগ্রাফার কোং দুইখানি গ্রুপ-ফটো তুলিয়া লইলেন।"

সে আমলের কলকাতার সুবিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ফটো তোলার আগ্রহ ও দশ টাকা দেওয়ার আরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্তমান। ঠাকুরের লীলা সংবরণের পরে ডাক্তার সরকার তাঁর ডায়েরীতে (রোজনামচা) যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, লেখকের তা দেখার সৌভাগ্য হয় ১৯৬৮-র জুন মাসে। ঐ সময় স্বামী অভয়ানন্দজী[৪৪] তাঁকে ডাক্তার সরকারের ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের নিজের হাতে ইংরেজীতে লেখা জীর্ণ (গেরুয়া বস্ত্রাবৃত) ডায়েরীটি দেখান। ঠাকুরের মহাসমাধির পর ডাক্তার সরকার লিপিবদ্ধ করেছেন—

Monday, August 16, 1886

...to Paramahansa whom I found dead—he died last night at 1 a.m. He was lying on the left side with legs drawn up, eyes open, mouth partly open. His disciples, some at least, were under the impression that he was in Samadhi, not dead. I dispelled this impression. I asked them to have his photograph taken and gave them Rs. 10/- as my contribution.

একটি নয়, ফটোর জন্য দুটি এক্সপোজার নেওয়া হয়। ভাগ্যক্রমে দুটি আলোকচিত্রই ভাল ওঠে। দুখানায় শুধু এই পার্থক্য, পিছনে দাঁড়ানো উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর কারও ঠাঁই, ভঙ্গিমা ও বেশের বদল হয়েছে। একটিতে নরেন্দ্রনাথকে খালি গায়ে দেখা যায় (চতুর্থ ফটো) এবং অপরটিতে (পঞ্চম ফটো) তিনি সাদা চাদর গায়ে দাঁড়ানো। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দুই ফটোতেই কোন পরিবর্তন নেই। স্বামী অভেদানন্দজীর বিবরণ থেকে এই দুখানি গ্রুপ-ফটো কবে, কোথায় ও কোন্ ফটো কোম্পানির দ্বারা গৃহীত হয়েছিল তার প্রমাণ স্পষ্ট।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশায় মাত্র তিনখানি ও তাঁর মহাসমাধির পরে দুখানি ফটো তোলা সম্ভব হয়।

---

৪৩ স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 'আমার জীবন কথা', রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (১৩৭১), পৃঃ ১২০-১২১

৪৪ কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ

প্রথম তিনখানি প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দজী মন্তব্য করেছেন[৪৫]—"শ্রীশ্রীঠাকুরের যে তিনরকম পশ্চারের (ভঙ্গিমার) ছবি পাওয়া যায়, শরৎ মহারাজ তাঁকে তাই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিনরকমের তিনটি ছাড়া আর কোন ছবি নাই।" ঠাকুরের পার্ষদের এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পূর্বে মাত্র তিনখানি ফটোই তোলা সম্ভব হয়েছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম ফটোতে তিনি (স্বামী অভেদানন্দজী) স্বয়ং উপস্থিত; সুতরাং মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

"শ্রীশ্রীমায়ের কথা" গ্রন্থে এক জায়গায় উল্লেখ আছে যে, স্বামী অরূপানন্দজী একদিন মায়ের বাটীতে (ঠাকুরঘরে) শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন[৪৬] (২৯-১০-১৯১০)—"ছবিতে কি ঠাকুর আছেন?" তদুত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, "আছেন না? ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁর ছায়া।" উপরি-উক্ত কথোপকথন থেকে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীশ্রীমা ফটোর ওপর প্রভূত গুরুত্ব দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদগণও ফটো সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দের কাছ থেকে জেনেছি[৪৭] যে, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি দেখিয়ে তাঁকে বলেছিলেন—"ভেব না এটি ছবি মাত্র। এর ভেতরে তিনি রয়েছেন। সব দেখছেন, সব শুনছেন।"

৪৫ মন ও মানুষ, পৃঃ ১৩৯
৪৬ শ্রীশ্রীমায়ের কথা (উদ্বোধন) ২য় ভাগ, ১৩৬৮, পৃঃ ৫৭-৫৮
৪৭ উদ্বোধন, মাঘ ১৩৮৪, পৃঃ ৪৫

দুর্বোধ্য

শ্রীকালীপদ সরখেল

যে জন আঘাত সইতে নারে
কেন আঘাত হানো তারে
তুমি কি হে এমনি করেই
শেখাও আঘাত সইতে!
যে জন বোঝা বইতে নারে
চাপাও বোঝা তারই শিরে
তুমি কি হে এমনি করেই
শেখাও বোঝা বইতে।

ফোটাও কুসুম কাঁটা দিয়ে
জাগাও জীবন ব্যথা দিয়ে
দয়াল তুমি ভয়াল তুমি
গুণের সীমা নেই,
কোথাও বসাও খুশির মেলা
কোথাও শুধু দুখের জ্বালা
এ যে তোমার কেমন খেলা
পাইনা খুঁজে খেই।

কুমুদরঞ্জন ও সমন্বয়-দর্শন

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

[চৈত্র, ১৩৮৯ সংখ্যার পর]

ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে মানবপ্রেমের কোন দ্বন্দ্ব নেই। 'জীবে দয়া নামে রুচি' কি 'ভক্তিতে হায় চণ্ডাল হলো ব্রাহ্মণ চেয়ে শুচি' বলায় ভাগবত, গীতা, অন্যান্য শাস্ত্র অনুযায়ী ব্রহ্মবিদ্যার কি কৃষ্ণ-ভজনার কি শিব-ভজনার চরম অনুভূতি সর্বভূতে ঈশ্বরোপলব্ধিতে যা অসীম ভালবাসায় জীবজগতে প্রেমে ও সেবাকর্মে প্রকাশ পায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তো আরও স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ এই তত্ত্বে। তিনি তো 'জীবে দয়া' কথাও সইতে পারেননি—বলছেন, 'দয়া' নয়, সেবা। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। এই তো শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফূর্তির' অবস্থা। মমাত্মা সর্বভূতাত্মা হলে আত্মজ্ঞানীর এই অবস্থাই ঘটে। ভাগবতে আছে যে, ভগবান সকল ভূতে আত্মস্বরূপ হয়ে অবস্থিত। কোন কোন ব্যক্তি তা অবজ্ঞা করে পূজা-অর্চনায় বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হয়। এ অর্চনা ভস্মে ঘৃতাহুতির সমান। মানবপ্রেমের দৃঢ় ভিত্তি এই ভগবদ্দর্শনে। অহং কর্তা ভাব নিয়ে সেবা বা দয়া স্থায়ী কল্যাণ আনে না। আমি ভোক্তা নই—তা হলেই হল না। আমি কর্তাও নই—এই শেষ অবস্থা। বহু সন্ন্যাসী ও সদাশয় ব্যক্তি ভ্রষ্ট ও ক্লেশপ্রাপ্ত হন, আমিই কর্তা এই ভাব দূর না হওয়ায়। কুমুদরঞ্জনের সাধুর জীবপ্রেমের আদর্শ 'শ্রীধর' কবিতায়—

"জীবের মাঝারে দেবতা পেয়েছি
বলিতে পারিনে ভয়ে,
আমার চোখে যে এক হয়ে গেছে
জীবনের দেবালয়ে।"

হরির করুণায় হৃদয় দ্রব হলে সাধুর সেবাধর্মেও ভক্ত হৃদয়ের পূজাই ফুটে ওঠে—তা পশু চিকিৎসা-শালা চালালেও—

"সাঁঝে দুইজনে বসে যোগাসনে
স্মরিয়া জীবের জ্বালা
মালিকের পদে ফিরে দেয় আঁখি-
দ্রব-মুকুতার মালা।"

গৃহীর আদর্শও এই নারায়ণ জ্ঞানে অতিথি সেবা, জীবে দয়া। মানবপ্রেম ভগবৎপ্রেমে প্রতিষ্ঠিত হলে, সবদিকে কল্যাণকর হয়, দৃঢ় হয়, দুর্জয় হয়। কর্ম মঙ্গলময় হয়। নিষ্কাম হলে এর পূর্ণতা ঘটে পরাভক্তিতে। ভক্তের রসসিক্ত চিত্তেই অসীম প্রেম সম্ভব। কুমুদরঞ্জন প্রকৃত অর্থে হরিভক্ত গৃহস্থই ছিলেন এবং তাঁর কবিতায় 'প্রকৃত সাধক'—

"সংগ্রামী সংসারে থাকি হিংসাদ্বেষহীন
হৃদিখানি থাকে সদা হরি পদে লীন।
স্বার্থশূন্য পর হিতে রত যার মন,
সেই পঞ্চতপা তার গৃহ-তপোবন।"

অন্য সব দেবদেবী ধর্মমত নিয়ে ভক্তি-ভাবনার সমন্বয়ী দর্শন আগেই কিছু বলা হয়েছে। যে রূপেই আরাধনা করা হোক একমাত্র আরাধ্য ভগবান। পুরুষোত্তমেরই বিভিন্ন রূপ। তন্ত্রের আলোচনায় শিব ও শিবানী; রাধা ও কৃষ্ণ একই তত্ত্ব দেখা গিয়েছে শিব-ভাবনায় কুমুদরঞ্জন বহু সময় অনুপ্রাণিত। তিনি মহাকাল, রুদ্র, পরম বিরাগী পরম ভক্ত শিব গরল পান করে অমৃত পরিবেশন করেন। তন্ত্রে শিবশক্তিরূপা জগন্মাতাই মহামাতৃকা, শক্তি শিব অঘোরেশ্বর। তাঁর নামে যাই গ্রহণ করা যায়, তাই হয় শুচিশুদ্ধ কারণ—সুন্দর ও কুৎসিত তাঁর কাছে সমান। 'অঘোরপন্থী' কবিতায় এই শিব-সাধনার কথা। যাঁরা এই পথের সাধক তাঁদের সম্বন্ধে বলেন,—

"প্রভু যে তাঁহার অঘোরেশ্বর শিব
তিনি জীবন্ত আর সব নির্জীব।
তাঁর নামে যাহা গ্রহণ করে তা শুচি
সম কুৎসিত অকুৎসিতে যে রুচি।"

এখানে আছে কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা। আছে 'পাশবদ্ধ জীব পাশমুক্ত শিবে'র কথা। আছে শিবের সবকিছু সংঘাতের বিষপান করে অমৃত বিতরণের কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "সৃষ্টির সকল বিরোধ বৈষম্যের মধ্যে সুষম ছন্দ আসে শিবশংকরের পরম বিস্ময়কর নৃত্যের বশেই। শিবই হলেন শিক্ষাগুরু, ধ্বংসাত্মকতাকে ধ্বংস করার, বিষপান করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই আছে" (রবীন্দ্রনাথ-এণ্ড্রুজ পত্রাবলী)। শিব হতে হলে শব হতে হবে আগে। উপনিষদের 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'-এ শিবভাব শান্তভাব। চিত্তশুদ্ধি হলে তার পর তো শিবম—মঙ্গলের অভ্যুদয়। 'মহাকাল' কবিতায় রুদ্ররূপের স্তব—

"তুমি চলিয়াছ অনন্ত পথে, নীরব পদক্ষেপে
হে অতন্দ্রিত, যুগ-যুগান্ত ব্যেপে।
কণ্ঠ তোমার বেষ্টিত হাড়-মালে
ধক ধক করে বহ্নি তোমার ভালে,
বাজে ডম্বরু ভুজঙ্গ গরজে
ধরা উঠে কেঁপে কেঁপে।
পরিণামে এক শ্মশানে সবারই ঘর,
সাথে রবে শুধু, তুমি শ্মশানেশ্বর,
দুরাশা আমার পুড়ে যবে হবো ছাই
তোমার অঙ্গে বিভূতি হইতে চাই
হে দেব রজত গিরিসন্নিভ
তোমাকে নমস্কার।"

এই রুদ্রের প্রসন্ন রূপের ছবি উপনিষদেও। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রার্থনা, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' গরল হতে অমৃত আনো। দুঃখের মধ্যে, ধ্বংসের মধ্যে তাঁর প্রসন্নতার প্রকাশের প্রার্থনা। এই মানুষের তপস্যা—শিব সেই তপস্যায় ভারতের প্রতীক—ভারতের এই তপস্যার রক্ষাকর্তা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্তমাখা-পায়ে মানুষকে চলতে হয়েছে, তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেছে; মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেছে, ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেছে এবং রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং, হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ সেই মুখ মানুষ দেখতে চেয়েছে। মানুষ এই দেখা দেখেছে বলেই তো তার সকল কান্নার অশ্রু-জলের উপর তার গৌরবের পথটি ভেসে উঠেছে; তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দ সম্মেলন।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৬, শান্তিনিকেতন, ছোটবড়ো)। হুয়েন সাঙকে কুমুদরঞ্জন সোমনাথ সম্পর্কে বলালেন,—

"উত্থান পতনে এর ভারতের উত্থান পতন,
বৈরাগ্যের ক্ষেত্র এ যে ভারতের সর্বস্ব ঐ ধন।
ভারতের মহাদেব হিন্দুত্বের, হে রসবিগ্রহ।"

আলবেরুনীকে সোমনাথ সম্পর্কে বলালেন—

"তারা বলে এই গোটা বিশ্বের
সবটুকু ভগবান,
সর্বময়ের শিলার সঙ্গে
কেন রবে ব্যবধান।
পাথর সে নয়—দেবতা তাহা তো
হীন জন্তুও জানে,
পাথরে দেবতা দেখে যারা
তারা বহু উন্নত জ্ঞানে।
ভাব ভূয়িষ্ঠ মন ইহাদের,
বুকে অমৃতের ক্ষুধা
পাষাণ নিঙাড়ি ভক্ত চকোর
বাহির করিবে সুধা।"

সোমনাথ নিয়েই তাঁর শতাধিক কবিতা। জন্মান্তরে বিশ্বাসী কবি কত জন্মে কত নামে কত রূপে ডেকেছেন তা বলতেন। সোমনাথের বালক পরিচারক হিসাবে মন্দির আক্রমণে বাধা দিতে গিয়ে প্রাণত্যাগ করেন,—এই অনুভূতি ছিল। তাঁর মনে পড়ত সেই দিনের কথা। লেখেন—'সোমনাথ মোরে করেছে জাতিস্মর।' তিনি

গ্রামে নীললোহিতেশ্বর শিবের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিবলিঙ্গটি নদীগর্ভে কুড়িয়ে পায় গ্রামের একটি ছেলে। পূর্বে বোধ হয় কোন মন্দির অজয়ের প্লাবনে ভগ্ন হয়েছিল। 'ওঁ' লেখা দেখা যায় গায়ে—মাথার কিরীট ছিল তার চিহ্ন। হাতে কিছু টাকা এলে শিবের মন্দির করে দেবেন গ্রামে কবি বলেন। একটি ডায়রী থেকে জানা যায়, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২১ এপ্রিল আনন্দ পুরস্কার-প্রাপ্তি। ৯ মে নীললোহিতের শিবের জন্য জমি ক্রয়, মন্দিরনির্মাণ ও সেবাইতকে অর্পণনামা ও মন্দিরে প্রথম শঙ্খধ্বনি ও বৃক্ষে জলসেচন। পরের পর প্রতিটি কাজের বর্ণনা দেবারতির নিষ্ঠা নিয়ে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লোচন-দাসের মন্দিরনির্মাণের সময় 'কর্মারতি' কবিতায় লিখেছিলেন, তাই এখানেও—

"সাধ্য নাহি প্রেমের বলে
ভগবানকে নামিয়ে আনি
প্রাণ ভরিয়া চাই গড়িতে
তাঁহার বসার আসনখানি।
ওই কাজই মোর ভজন সাধন,
তপস্যা আর উপাসনা,
কাজ করি, তাঁর কাজই করি,
কথায় তাঁহার আর থাকি না।"

'নীললোহিতের সেবক' নামক কবিতায় পাওয়া যায়—

"এ বসুধা ভরা বান্ধব মোর
আমি দীন হীন তুচ্ছ
নীললোহিতের কুপোষ্য আমি
যে সে নই তাতো বুঝছো।"

কবি মা মহামায়ার 'কুপুত্র' হলেন, এখানে মহাদেবেরও 'কুপোষ্য'।

কুমুদরঞ্জন বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, বাউল, কর্তাভজা—সবারই সাধন ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে কাব্য রচনা করেন। বাউল নিয়ে একাধিক কবিতা। কর্তাভজা কবিতায় লিখলেন—

"কর্তাভজারা তোমাকেই প্রভু ভজে,
গড়াগড়ি দেয় তোমার চরণ-রজে।
সামান্য নয় তাদিকে নমস্কার
কত পতিতের করিয়াছে উদ্ধার।"

'খ্রীষ্ট' কবিতায় জানান—

"খ্রীষ্টান নই প্রভু—
তোমার ক্রুশের বেদনা যে আমি
অনুভব করি তবু
প্রসন্নতা ও প্রসাদ তোমার চাই
মোর দেবতার পাশেই তোমার ঠাঁই।
ক্ষমা সুন্দর তোমার মুরতি
ভুলিতে পারি কি কভু!
বৈষ্ণব মোরা বিশ্বাস করি তব পুনরুত্থান
তুমি প্রোজ্জ্বল—পাষণ্ডদল লুণ্ঠিত ধূলিম্লান,
তুমি জাগ্রত—হে অবিস্মরণীয়
প্রণাম আমার, প্রণতি আমার নিয়ো,
অপাপবিদ্ধ হে মূর্ত প্রেম
গাহি তব জয়গান।"

'অমর বিদায়' কবিতায় চিরক্ষমাশীল যীশু নর-দেবতার ক্রুশে তুলে দেওয়ার সময় 'ক্ষমিও পিতা অবোধ সবায়' দিয়ে বিদায়ের কথা। কোরেসের অত্যাচারে মহম্মদের পবিত্র ইসলাম ধর্ম জানাবার জন্য চলে যাওয়ার কথা, যা এখন পূত মদিনায় বসে অশ্রুজলে সবাই স্মরণ করে। এগুলি নিমাইসন্ন্যাস, বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ, রামের বনবাস ও শ্যাম সোহাগিনী রাধাকে ধূলায় লুটিয়ে—হরির মথুরা যাওয়ার সঙ্গে বর্ণিত। 'ইতিহাস স্মৃতিতে' সোমনাথ ধ্বংসের সঙ্গে কারবালার হোসেন হাসান সমভাবে কবিচিত্তকে ব্যথিত ও অশ্রুসিক্ত করে। লিখছেন—'অনুভূতি করে দেয় জগৎ আপন।' কুমুদরঞ্জনের কাব্যপাঠে মনে পড়ে পুষ্পদন্তের সকল আপাতবিরোধের সামঞ্জস্যে 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্'—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

—রুচিভেদে পথ বিচিত্র হলেও নানাপথে ধাবিত নদনদীর জল যেমন শেষে একমাত্র মহাসমুদ্রে মেশে, সেইরকম সাধকগণ যিনি যে পথেই গমন করুন, পরিণামে এক জায়গায় তোমাতেই মিলিত হন। 'সাধক' কবিতায় কুমুদরঞ্জন বললেন—

"যেথায় যত সাধক আছেন
সব সাধকের এক দেবতা
হউক সাকার হোক নিরাকার,
থাকুক যতই স্বতন্ত্রতা।
অসংখ্য সব দেব দেউলে চলছে
একের সেই আরতি,
সকল পূজার বাদ্য ঘণ্টা
মন্ত্র গীতের সেথায় গতি।"

এ হল ভক্তের সাধনা আর ভক্তের ভগবান। ভক্তই তাঁর রূপ নির্ণয় করে—'রূপের কথা' সেই জানে।

"সেই তাঁরে চেনে সেই দেয় নাম
ডাকে জয় জগদীশ,
যোগ যার তাঁর সঙ্গে অহর্নিশ।
পটে ও পাষাণে যে রসমূর্তি আঁকে,
সত্য সে রূপে ভক্ত দেখেছে তাঁকে,
রূপের পরিধি খুঁজিছে যাহার নয়ন নির্ণিমেষ।"

গ্রামবাসী সরল সহজ বিশ্বাসে তাঁকেই নানারূপে ঘরের করে নিয়ে পূজা করে।

ভগবান ভাবের বিষয়, সাধক রামপ্রসাদের কথা। আর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, তাঁকে ডাকবার সময় একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রাখার নামই ভাব। সব ভাব সিদ্ধ অবস্থায় ভাল লাগে। শাক্তমতে সিদ্ধকে বলে কৌল। বেদান্তে বলে পরমহংস। বাউল বৈষ্ণবদের মতে সাঁই। (কথামৃত)। কোনরকমে তাঁর উপর যাতে ভক্তি হয়, ভালবাসা হয়! একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয়, তা হলেই হল। ভালবাসা হলেই তাঁকে লাভ করা যাবে। কুমুদরঞ্জনের এই সমন্বয়ী দর্শন ভক্তি পথেই ঘটে। যে কোন পথেই যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস হৃদয়ে পবিত্রতা ও ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা আসে তাহলেই তাঁকে পাওয়া যায়, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবেই।

'ভয়ের কথায়' লেখেন—

"রূপকথার তো একথাকে রাজা নহেন তিনি,
মূঢ় চাপল্য কি লইয়া খেলে কি ছিনিমিনি।
তিনিই আছেন বলো না নাহি
সে বিশ্বরূপ দেখার কেবল ভাগ্য চাহি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, খুব ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে দেখা যায়। 'ব্যাকুলতা' কবিতায় কুমুদরঞ্জনের কথা—

"মুখেতে ফোটে না কথা—
অনল পসরা-বুকে বহি আমি জ্বালাময়ী ব্যাকুলতা।
শুনেছি বংশীরব—
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ানি করি সদা অনুভব।
শূন্য কুম্ভ কক্ষে আমার
যমুনার পারে যাই বারে বার
মোরে ডাকে কোন প্রভাস যজ্ঞ কোন
মিলনোৎসব।"

কুমুদরঞ্জনের সমন্বয়-সাধনায় গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসের ক্ষেত্র আলাদা হলেও ভগবৎলাভে এই আশ্রম-ভেদে কোন বৈষম্য ছিল না। ইহা সনাতন শাস্ত্রসম্মতও। 'গৃহস্থ' কবিতায় বললেন, তাদের বিশ্বব্যাপী কর্মের ধারা, ধূলায় বাঁধিয়া নীড়, ক্ষিতিকে মহিমময় করে।

"যারা গৃহস্থ, যারা রূপ-জয়-যশ ও ধনস্পৃহ—
তারাও হরির প্রিয়।"

বর্ষার দুর্দমনীয়া ময়ূরাক্ষী নদীর ব্যারেজ দর্শন করে মনে হল তাঁর যোগিনীর সংসারী হওয়ার কথা—

"লোহা পরি তুমি গৃহিণী হয়েছ হে
কপালকুণ্ডলা।
মনে হল মহিষমর্দিনীর অন্নপূর্ণা
হওয়ার কথা।"

'প্রকৃত সাধক' কবিতায় কুমুদরঞ্জন আদর্শ গৃহীর চিত্রই দিয়েছেন। কর্তব্য পালন না করলে জগজ্জননীর কৃপা পাওয়া যায় না।

"কোকিল বলিছে সদা তাঁর নাম গাই
তবু কেন হৃদে মোর শান্তি নাহি পাই।
সারসী বলিছে কর কর্তব্য লঙ্ঘন,
কর না যে তুমি স্বীয় সন্তান পালন।
মাতা হয়ে তনয়ে যে না করে শিক্ষিত,
জগত জননী স্নেহে হয় সে বঞ্চিত।"

সন্ন্যাস আশ্রমের কর্ম সম্বন্ধে যখন সাধারণ পণ্ডিতকুল সংশয়পূর্ণ, তখন 'সাধুসন্ত' কবিতায় কবি লিখলেন—

"যারা নিষ্কাম অফলাকাঙ্ক্ষী
যাহারা চাহে না মোক্ষফলও
শুধু শ্রীহরির প্রীতিকামীদের বাজে
কোন কাজে লাগাবে বলো!
সর্বারম্ভ পরিত্যাগীর কাজ
দিতে করে শাস্ত্রে মানা—
এ হবে গোরুর গাড়ি চালাইতে
গরুড়পক্ষী টানিয়া আনা।
উহারা অকেজো? কেজো তবে কারা?
জাতিকে ঊর্ধ্বে তুলে কে রাখে?
জীবের জন্য অমৃত ভাণ্ড
সঞ্চিত করি কে সবে ডাকে?
কাজ যাহা তাহা তারাই তো করে,
যোগ রাখে ভগবানের সাথে,
তারাই তো শুধু এক করে দেখে
জগৎ এবং জগন্নাথে।
অপার্থিবের তারা কারবারী
অকথিত বাণী তারাই কহে,
পঞ্চতপার আদেশ পালিতে
পঞ্চভূতেরা দাঁড়ায়ে রহে।
যাঁহার কাষ্ঠ পাদুকা বহাও
রাজপদ চেয়ে শ্লাঘ্যতর
কি বিরাটত্ব লুকাইয়া থাকে,
বোঝ না, বোঝার চেষ্টা কর।"

সন্ন্যাসী হোক গৃহীই হোক ভগবানে সর্বকর্ম অর্পণ করে, নিজেকে তাঁর হাতের যন্ত্র মনে করে চলাই আসক্তিহীন কল্যাণ-কর্মের মূলে। এতে অহংকার নেই। তিনিই কর্তা। কবি গৃহেই ভগবানকে গৃহস্বামী জানলেন। 'বিদায় বেলায়' লিখলেন—'রইলো সুখ ও শান্তি ভবন—পরিজনে ভর্তি, / সেবক তারা রইলো মাগো তুমিই গৃহকর্ত্রী।' এই কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ সন্ন্যাসীর ও গৃহীর পরাভক্তির পথ। এই প্রেমভক্তির উদয়ে জগৎ জীব চিন্ময় হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—"আমি যন্ত্র উনি যন্ত্রী, আমি ঘর উনি ঘরণী; আমি রথ উনি রথী।" "তিনিই দেখিয়ে দেন সবই চিন্ময়—কোষাকুষি, বেদী, চৌকাঠ, মানুষ জীবজন্তু। যা দেখি তাই পূজা করি।" (কথামৃত)। ভক্ত কবিরও সব হরিময় হয়ে ওঠে। সব এক হয়ে যায়।

"এক করে দেয় সে যে মোর আঁখিপাতে
প্রতিমা পূজারী জগৎ জগন্নাথে।
ডুবে যায় কোথা রবি শশী গ্রহ তারা,
তাহারি রূপেতে সব হয়ে যায় হারা।"

সমন্বয়ী দর্শনের মূল কথা প্রেমযোগ—প্রেমের সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে যোগ। জীব জগৎ বিশ্ব বিশ্বনাথ—সবই প্রেমের লীলায় এক হয়ে যায়। এই 'সিদ্ধিলাভ' শুধু শব সাধনাতেই নয়, পরাভক্তির অন্য পথেও ঘটে যখন মনে হয় কবির ভাষায়—

"এ কি সে বসুন্ধরা?
মায়ামুগ্ধ সংসারীর প্রিয়?

এ যে মূর্তি মুগ্ধকরী
এ যে শোভা অনির্বচনীয়।
কোথা সেই কর্কশতা ?
পৃথিবীর সে বিদাহী জ্বালা,
এ যে পূর্ণ পুষ্পপাত্র দেবতার
নৈবেদ্যের থালা।"

সব আকাঙ্ক্ষার তখন অবসান। বর চাওয়ার কিছু নেই। দর্শনই পরম সার্থকতা—কিছু কাম্য নেই আর।

কবি সবই হরিময় দেখলেন ভগবন্নিষ্ঠ গৃহস্থ হয়েই। তাঁর আজীবন প্রার্থনা যেন—শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে। (ছান্দোগ্য)। শ্যাম হতে বিচিত্র বর্ণকে প্রাপ্ত হই, বিচিত্র হতে শ্যামকে প্রাপ্ত হই। অবাধ গতায়াত,অবাধ প্রকাশ, অবাধ দর্শন। হৃদয়ে শ্যাম, নাম রূপের অভিব্যক্তি বাহিরে শবল। ভগবানের কৃপার উপলব্ধির কথাই বললেন কবি—

"হে ভগবান তোমায় পেতে
হয় না কোথাও যেতে
গৃহী তাহার গৃহেতে পায়
চাষী তাহার ক্ষেতে।
শিল্পী তাহার শিল্পশালে
ভাবুক ভাবের অন্তরালে,
সতী তাহার রঙমহলে আপন অন্দরেতে।
পাহাড়ী তার পাহাড়ে পায়
ডুবারী তার জলে,
পথিক তাহার পথেতে পায়, কিম্বা তরুতলে।
যে যা করে নিজের পেশা
তাহার সাথেই মেলামেশা,
দিনে তারে সূর্য যে পায়, চন্দ্র যে পায় রাতে।
রাজসূয় ও অশ্বমেধ যে পায় না যোগেশ্বরে,
সে যে দয়াল বিদুর-দেওয়া
খুদের আদর করে।
গুণী জ্ঞানীর সঙ্গেতে বেশ থাকেন—
ব্যাকুল হন মধুরেশ
রাখাল বালক যখন ডাকে গুঞ্জা মালা গেঁথে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, নিত্য দর্শনের পর লীলায় এসে থাকতে হয় ভক্তি ভক্ত নিয়ে। একটি পাকা মত। ব্রহ্মজ্ঞানীও লীলারস আস্বাদ করতে উন্মুখ। ভাগবতে নির্গ্রন্থ আত্মারাম মুনিগণেরও হরিতে অহেতুকী ভক্তির কথা। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে চৈতন্যদেবের কথা—

"ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ বশ॥
ইহো সব রহু কৃষ্ণ চরণ সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥"

কবিরও মুক্তির স্বাদের মধ্যে জাগে লীলারসের পিপাসা। নানা ভগবদ্ভাবে হৃদয় পূর্ণ। বহু লীলার রসাস্বাদ চলে। বন্যার যে-রূপ তাঁর হৃদয়ে জাগে, তার বর্ণনা দিলেন। কমলে কামিনীর রূপ ভেবে আবার—

"বন্যা যে আনে মুক্তির স্বাদ—সুদূরের সংবাদ
নিরঞ্জনের পুণ্যাভিষেক দেখিতে আমার সাধ।
এই ত তরল কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র মাঝে—
কপিধ্বজের ঘর্ঘর শুনি—পাঞ্চজন্য বাজে।
তন্ময় হয়ে দেখি আর শুনি
মনে আমি ঠিক জানি
গোপনে ওখানে কানাকানি হয়
গীত ও গীতার বাণী।
ভীম ও কান্ত ওরূপ নেহারি প্রীত কম্পিত ভীত,
হয় কালিন্দী কুঞ্জের লাগি চিত উৎকণ্ঠিত।"

বিরাট বিশ্বরূপ দর্শনের মাঝে যেন কালিন্দীকুঞ্জের ডাক। জলকল্লোলে মুক্তির সংগীতে ও স্বাদে কবির অন্তরে গোপবধূর ব্যাকুলতা। অদ্বৈত সিদ্ধির সাধক মধুসূদন সরস্বতীর কথা মনে আসে—

"ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো
যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে
অস্মাকং তু তদেব লোচন
চমৎকারায় ভূয়াচ্চিরম্
কালিন্দী পুলিনেষু যৎ কিলপি
তন্নীলং মনো ধাবতি।"

—"ধ্যানাবস্থিত তদ্গতচিত্ত যোগিগণ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্মের জ্যোতিঃ যদি দেখিতে পান, তাঁরা তা দেখুন। আমাদের কিন্তু কালিন্দীকূলে নয়নতৃপ্তিকর যে নীলতনু চিরকাল বিরাজিত তার দিকেই মন ধাবিত হয়।"

অঙ্গুলীমাল

শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়

কোশল রাজ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব
সুখ নাই কারো মনে।
দস্যুপ্রধান অঙ্গুলীমাল
লাগে না তাহার দিন ক্ষণ কাল ;
যখন তখন ঝাঁপায়ে পড়ে সে
হত্যা ও লুণ্ঠনে।

রাজসৈন্যরা ঢুঁড়িয়া বেড়ায়
পথ ঘাট জঙ্গল।
কেউ তো জানে না কোথায় কখন
রয় সে করিয়া আত্মগোপন ;
ব্যর্থ রাজার ফন্দী ফিকির
সব কিছু কৌশল।

হত্যা করিয়া করে সে মৃতের
অঙ্গুলী কর্তন।
পরে সে গলায় অঙ্গুলী হার
অঙ্গুলীমাল তাই নাম তার ;
অতি পাষণ্ড, শুধু নাম শুনে
ভয়ে ভীত সারাক্ষণ।

প্রভু বুদ্ধকে প্রণাম করিল
নৃপতি প্রসেনজিৎ।
দস্যুর কথা করে নিবেদন,
ব্যর্থ নৃপতি করিতে দমন ;
সদা চিন্তিত কেমনে তাহারে
সাজা দিবে সমুচিত।

কহে প্রভু—"তারে কোথায় পাইবে ?
করেছি আত্মসাৎ।
ধরা পড়ে নাই শক্তির কাছে,
ভক্তির ডোরে বাঁধা পড়িয়াছে ;
মোর পাশে পাশে মোর ছায়া সম
কাটে তার দিন রাত।"

মুণ্ডিতকেশ বসিয়া শ্রমণ
প্রভুর চরণমূলে।
কহিলেন প্রভু—"খুঁজিতেছ যারে
চিনিতে পার কি আজ তুমি তারে ?
মোর পদতলে দস্যুপ্রধান
অহিত কর্ম ভুলে।"

বিস্মিত রাজা হে'রি দস্যুর
এ হেন রূপান্তর।
কহিলেন তিনি—"ধন্য জীবন,
দিব সুন্দর বাসের ভবন ;
সেই সাথে দিব অর্থ, ভূষণ
যা তব তৃপ্তিকর।"

জাদুর স্পর্শে সোনা হয়ে গেছে
পাষাণ হৃদয় তার।
কহিল শ্রমণ—"ওগো 'মহারাজ,
নাহি প্রয়োজন কিছু মোর আজ ;
আমি যে প্রভুর শ্রীচরণ তলে
সঁপেছি জীবন-ভার।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন

(চতুর্থ বার্ষিক—১৯৮৩)

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

বিগত তিন বছরের মতো এবারও প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন তিনদিন (১, ২ ও ৩ এপ্রিল) ধরে চলে। গত ১ এপ্রিল ১৯৮৩, শুক্রবার বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতির নিচে মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ, উদ্বোধন পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী অজজানন্দ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারী, বক্তা-আলোচক ও শ্রোতৃমণ্ডলীতে হলঘর পরিপূর্ণ।

এবছর সারা দেশে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর জন্মশতবর্ষ পালিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার তথা উদ্বোধনের সঙ্গে নন্দলালের প্রত্যক্ষ অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল। তাঁর প্রতি উদ্বোধনের শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রতীকস্বরূপ তাঁরই কিছু নির্বাচিত শিল্পকর্ম দ্বারা হলঘরটি সুসজ্জিত হয়েছিল। প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী ও তাঁর সহকারিবৃন্দের ব্যবস্থাপনায় শিল্পাচার্যের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবব্যঞ্জক বেশ কিছু সুনির্বাচিত শিল্পকর্ম হলের বিভিন্ন স্তম্ভে ও দেওয়ালে প্রদর্শিত হয়। বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল শিল্পাচার্য নন্দলালের 'শিবের বিষ পান'-এর মূল ছবিটি।

ডঃ তপনকান্তি ঘোষের পরিবেশিত 'বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে গগনে লোকে লোকে' উদ্বোধন-সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা আরম্ভ হয়। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্বাগত [redacted] জানিয়ে স্বামী নিরাময়ানন্দ বলেন: "আজকের এই সম্মেলনে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মশায়ের উদ্বোধনী ভাষণ দেবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি। আমাদের কথা মনে রেখে তিনি তাঁর লিখিত ভাষণ সম্মেলনে পাঠ করার জন্য পাঠিয়েছেন।" তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে নিত্যস্বরূপানন্দজীর অনুপ্রেরণার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন এবং তাঁর শুভ ইচ্ছা স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের দ্বারা কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত হয়, সে-কথাও শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দেন। স্বামী অজজানন্দ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর লিখিত পত্রসহ প্রেরিত প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: "রামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ চৈতন্যই শিষ্য-প্রবাহে বিগলিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে, অকৃপণ ঔদার্যে একটা সমগ্র দেশকে সিক্ত, সিঞ্চিত, গততৃষ্ণ করিয়াছে। চিরহিমানীকে মানবনিরপেক্ষ, নিষ্ক্রিয় মনে করিলেও বস্তুত তাহা নয়, আত্মবিগলিত ধারায় মর্ত্যজনের তৃষ্ণার ঘাটে ঘাটে সে প্রবাহিত। রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিষ্য-গণকে, বিশেষভাবে বিবেকানন্দকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই তাঁহার লীলার সমগ্র রূপ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা। দুইজনে একই চৈতন্যের অবস্থান্তর···।···ইতিহাসকে নিতান্ত জড়বাদী দৃষ্টিতে না দেখিয়া যদি তাহার ঘটনা-স্রোতে বিধাতার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয়, ইতিহাসের ক্ষেত্রে বাদ ও প্রতিবাদকে বিধাতা একই সময়ে বপন করিয়া থাকেন। বন্য মহিষ আততায়ী ব্যাঘ্রকে যেমন দুই শৃঙ্গের আঘাত-প্রত্যাঘাতে ঠেলিয়া লইয়া চলে, বাদ-প্রতিবাদের ঠেলাতেও ঘটনাপ্রবাহ তেমনি গতি

পায়। ১৮৩৫-এ বাংলাদেশে ইংরেজীশিক্ষার সরকারী সূচনা; ১৮৩৬-এ রামকৃষ্ণদেবের জন্ম; একটা টান বাহিরে, আর একটা টান ভিতরে, আর এই দুই-এর টানাটানির সমন্বয়ের পথে নব্য-বঙ্গের যাত্রা। লক্ষ্য করিবার মতো বিষয় এই যে, নিরক্ষর-প্রায়, ইংরেজী-না-জানা এই সাধকের অধিকাংশ গৃহীভক্ত ও সন্ন্যাসী শিষ্য—তখনকার পরিভাষায় যাহাদের বলিত, 'ইয়ং বেঙ্গল'। 'ইয়ং বেঙ্গলের' অবিশ্বাস, 'ওল্ড ফুলদের' অতি-বিশ্বাস, দুই-এর ঠেলাঠেলিতে নব্যবঙ্গের বিশ্বাসের সূত্রপাত। মধ্যযুগের সাধনপন্থা, আর চিরযুগীয় সাধন-লক্ষ্য, দুই-এর টানাটানিতে নবযুগের সিংহদ্বার খুলিয়া গেল। শিক্ষাভিমানী বাংলাদেশের ভাব-সাধনার গুরু এক নিরক্ষর-প্রায় সাধক।" পঠিত ভাষণের পর উদ্বোধনী সভার সমাপ্তি ঘটে।

স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে এবং ডঃ তপনকান্তি ঘোষের 'ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে মেলেছ যে দৃষ্টি' সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রথম অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৪-১৫ মিনিটে। এই অধিবেশনের বিষয়বস্তু: 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে বাংলা সাহিত্য'। মূলপ্রবন্ধপাঠক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর প্রবন্ধে বিভিন্ন সাহিত্যিকের সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রভাবের কিভাবে অনুপ্রবেশ ঘটে, তার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন: "ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবের যুগে আমাদের দেশ থেকে সন্ন্যাসী চরিত্রের প্রতি বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাভক্তি প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিমসাহিত্যই তার প্রমাণ। রামকৃষ্ণ প্রবর্তিত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় সেই বিশ্বাস আবার ফিরিয়ে এনেছে এবং ত্যাগী ও দরিদ্রসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন সন্ন্যাসীদের পূর্ব-মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সেইজন্য বাংলা-সাহিত্যে পরবর্তী কালে দুইশ্রেণীর সন্ন্যাসী দেখতে পাওয়া যায়—একশ্রেণী পূর্ববর্তী ধারার সন্ন্যাসী, আর একশ্রেণী পরবর্তী ধারার ত্যাগী সন্ন্যাসী—একশ্রেণীর সন্ন্যাসী সমাজ-বিমুখ, আর একশ্রেণীর সন্ন্যাসী পরের সেবাধর্মে উৎসর্গীকৃত জীবন।" অধ্যাপক ভট্টাচার্যের প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, ডঃ সমরেন্দ্রনাথ পাল ও ডঃ তারকনাথ ঘোষ। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দ বলেন: "আমরা বিভিন্ন বক্তার ভাষণে সাহিত্যের একটি সংজ্ঞা পেলাম। হিতের জন্য যা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে। জাতীয় জীবনের অনেক চিত্র সাহিত্য ধরে রেখেছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত চারশত বছর ধরে বাংলা-সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে। অধুনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তাঁর অলৌকিক জীবনচিত্র ধরে রেখেছে। এ-বিষয়ে মূল গ্রন্থ তিনটি—(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, (২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, (৩) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি। বক্তারা প্রথমটির কথা উল্লেখ করেছেন, আমি শেষ দুটির কথা উল্লেখ করলাম।"

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৫-৩০ মিনিটে। 'বিবেকানন্দের দর্শনে মানবসত্তা ও মানবতাবাদ'-এর ওপর প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু ছিল: "বিবেকানন্দের মানবতাবাদ··· তাঁর মানবসত্তা বা মানবদর্শন বিশ্লেষণের এক সহজ ও অনিবার্য অভিপ্রকাশ। এই মানবতাবাদ, বিবেকানন্দের মতে আধ্যাত্মিক। কারণ, এই মানবতত্ত্ব মানুষের নিছক জড়গত, সামাজিক বা ভাবগত আলোচনা নয়। সামগ্রিকভাবে এটি হল মানব অস্তিত্বে বিশ্বমানবিকতা বা ঈশ্বরতত্ত্বের মূল্যায়ন।" ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী ও অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন। অধিবেশনের প্রারম্ভে সভাপতি স্বামী

নিরাময়ানন্দ বলেন: "Humanism-এর বাংলা অর্থ করা হয়েছে মানবতাবাদ। কিন্তু মনে হয় Humanism-এর অর্থ করা উচিত মানববাদ।" তিনি সংক্ষেপে Greek, Roman, Europe Naturalistic, Super Naturalistic এবং Absolutist-দের মতবাদ উল্লেখ করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে তিনি আরও বলেন: "Humanism-এর অর্থ মানববাদ না মানবিকতাবাদ হবে—এ প্রশ্নের সমাধান এখনও হল না। এ দুরূহ প্রশ্নের আরও আলোচনা হবে এই আশা করি। বাংলা ভাষায় এখনও এর সঠিক প্রতিশব্দ হয়নি।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন: "ভারতীয় চিন্তাধারার মূল বেদান্তে আছে ব্রহ্মবাদ, মানবতাবাদ নয়। শেষ সিদ্ধান্ত 'জড়' না 'চেতন'? 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর / জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' স্বামী বিবেকানন্দ তাই সর্বভূতে সেই চেতনসত্তা অনুভব করেছেন। তিনি বলেন, ভগবানকে খুঁজ না, খুঁজলে ভগবানকে পাবে না,—দেখ। প্রত্যেকের মধ্যে জীব, জন্তু, গাছ, পাখি, গাছপালা, মানুষের মনে সেই চেতনসত্তাকে দেখ এবং তাকে জড়ের মধ্যেও দেখ। শ্রীশ্রীঠাকুর এগিয়ে যেতে বলেছেন। গাছপাথরে তাঁর পূজা হয়, মানুষে হয় না? স্বামীজী ঠাকুরের কথা আরও বিস্তারিত করে রাজযোগে বলেছেন, 'Each soul is potentially divine.' তাই শুধু 'মানবতাবাদ' নয়, চাই আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ।" উপসংহারে স্বামী নিরাময়ানন্দজী বক্তা এবং আলোচকবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই দিনটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী যোগানন্দের জন্মতিথি। তাই উপরি-উক্ত অধিবেশনের পর সন্ধ্যায় 'শ্রীশ্রীমা ও সেবক যোগানন্দ' প্রসঙ্গে স্বামী অজজানন্দ আলোচনা করেন।

*

শনিবার, ২ এপ্রিল বিকাল ৩টায় তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয়। শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষের 'তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়' উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশনের পর ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর প্রবন্ধ পাঠ করেন। আজকের বিষয় ছিল 'বৌদ্ধসঙ্ঘ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ'। ডঃ ধর 'লোককল্যাণের জন্যই অবতারের আবির্ভাব' 'মহাকরুণায় লোককল্যাণের ইচ্ছা', 'সুদূরপ্রসারী লোককল্যাণে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা', 'সঙ্ঘই ধর্ম বা আদর্শের মূর্ত রূপ', 'সঙ্ঘ চালনায় গণতন্ত্র', 'সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘের অনুমোদন—ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্কতা', 'সন্ন্যাসিসঙ্ঘে শাসন—নিয়মাবলী' প্রভৃতি আনুষঙ্গিক দিকগুলির ওপর আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনার ওপর বক্তব্য রাখেন ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ডঃ কল্যাণ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন। অতঃপর শ্রীশীলানন্দ ব্রহ্মচারী বক্তা ও সমালোচকবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন: "বস্তুতঃ, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ও বৌদ্ধসঙ্ঘের আদর্শ ও লক্ষ্য অভিন্ন। বর্তমানকালে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত শাখাপল্লবসমৃদ্ধ বটবৃক্ষের মতো দৃঢ়মূল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তার শাখা বিদ্যমান। তার উজ্জ্বল কর্মধারা সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই। কি করে দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে মরুকান্তার অতিক্রম করে, দুস্তর সমুদ্র পার হয়ে, বৌদ্ধসঙ্ঘ এনেছিল এশিয়া ভূখণ্ডে একটি আলোকময় জাগরণ। সামাজিক প্রতিকূলতা, ভাষার দুরূহতা, প্রতিপক্ষের আক্রমণ—কিছুই তাদের গতি প্রতিহত করতে, পারেনি। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ বয়সে নবীন। তার প্রাণশক্তি সতেজ ও সক্রিয়। কিন্তু আড়াই

হাজার বছরের পুরানো বৌদ্ধসঙ্ঘের মধ্যে সেই সক্রিয়তা আর নেই। তাহলেও বৌদ্ধসঙ্ঘ এখনও নিষ্প্রাণ নয়। বৌদ্ধদেশসমূহে পরিভ্রমণ করলে আমরা দেখতে পাব, শৈথিল্য থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘের সেবামূলক কর্ম, সাংস্কৃতিক কর্ম ও আধ্যাত্মিক সেবা বিরাজমান। এখনও সেখানকার নিভৃত মঠ-মন্দিরে, ধ্যানরত শান্ত সমাহিত যোগী ভিক্ষুদের দেখে আমরা মুগ্ধ হই।"

চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষের 'যেদিন তুমি এসেছিলে প্রভু ভুবন আলো করে' সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে বিকাল ৫-৩০ মিনিটে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী অজজানন্দ। আজকের বিষয়বস্তু ছিল: 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজ্ঞান'। মূলপ্রবন্ধপাঠক বৈজ্ঞানিক ডঃ অমিয়কুমার হাটি আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের সহজ সুন্দর ও ব্যবহারিক সংজ্ঞা। ডঃ হাটি বলেছেন: "আধুনিক বিজ্ঞানের সব কটি শাখাই বিস্ময়, বৈচিত্র্য, রূপৈশ্বর্য ও দীপ্তি নিয়ে মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু কজন আমরা তা অনুভব করি? অনুসন্ধিৎসু মন, দেখার মতো দেখার চোখ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং বিজ্ঞান-মনস্কতা থাকে কজনের? নানা শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি মালা গাঁথতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার, তাঁকে অনুসরণ ও অনুধাবন করারও ইচ্ছা জাগে।...আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবনের যোগ বড় নিবিড় এবং শ্রীরামকৃষ্ণও চেয়েছিলেন জীবনে জীবনে যোগ করতে তাঁর প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ডঃ জলধিকুমার সরকার, ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ জগদিন্দ্র মণ্ডল। আলোচনান্তে সভাপতি স্বামী অজজানন্দ বলেন: "বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানবিরোধী কোন বিশ্বাস ও আচরণ কেবল অসঙ্গতই নয়, বিপজ্জনকও বটে। স্বামীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করার তিনটি উপায়। সত্য দুইরকম। যা মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গ্রাহ্য—তা দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে বলা হয় 'বিজ্ঞান'। আর অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য সত্য থেকে যে জ্ঞান, তাই হচ্ছে বেদ। ...শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনলীলায়—তাঁর জীবনচর্যায়, চলা-ফেরায়, কথায়—তাঁর শিক্ষায় ও উপদেশে—বেদসত্য যেমন প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, তেমনই বিজ্ঞানও সর্বত্র প্রকট। অবৈজ্ঞানিক যুক্তি বা মত তাঁর কথায় ও কর্মে পাওয়া যাবে না। বৈজ্ঞানিক কি বলেন? বলেন—প্রকৃতির সর্বস্তরে একটা অদ্বিতীয় অলঙ্ঘ্য নিয়ম রয়েছে। সেই নিয়মটিকে আবিষ্কার করতে পারলেই আমরা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অধীন করব এবং তাতেই আমাদের দুঃখলেশহীন একটা ধারাবাহিক সুখ মিলবে। বৈজ্ঞানিক এই নিয়মটিকেই অনুসন্ধান করে চলেছেন। যেন একটা আশ্রয়ের—একটা বাড়ির ঠিকানা অনুসন্ধান। কিন্তু হায়, ঠিকানাটা মিললেই কি সেই বাড়িতে আশ্রয়ের শান্তিও মেলে? বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে একটি নিশ্চিন্ত স্থির আশ্রয় পেলে তবেই না শান্তি! শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কেবল ঠিকানার খবরই দেননি,—স্বয়ং হাত ধরে সেই ঠিকানাস্থ আশ্রয়ের—আমাদের নিজ নিকেতনের অন্তঃপুরের নিশ্চিন্ত-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়ে দিতেও প্রস্তুত রয়েছেন।" ভাষণের উপসংহারে তিনি আরও বলেন: "বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিও আজ ঊর্ধ্বমুখী। বিজ্ঞানের আদিযুগ প্রবর্তক নিউটন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বলেছেন—আমি বিশাল জ্ঞানসমুদ্রের তীরে বালকের মতো উপলখণ্ডমাত্র কুড়িয়েছি।

আবার এই বিংশ শতাব্দীর যুগান্তরকারী বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন জড়-বিজ্ঞানের তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যেও শান্তস্বরে বলে গেছেন: 'বিশ্বের রহস্যের অনুভূতিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। এই অনুভূতিই শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ধাত্রীস্বরূপা।··· আমি চাই অসীম জীবনের রহস্যবোধ এবং সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য আভাস—এবং প্রকৃতির ভিতরে যে চেতনার প্রকাশ, তাকে জানতে।' বুঝতে কষ্ট হয় না—বিজ্ঞান এখন কোন্ লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর থেকে, আমরা এই ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার বুঝতে সক্ষম হচ্ছি। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁর দুই বাহু বাড়িয়ে দিয়েছেন—আধুনিক বিজ্ঞানকেও তিনি সাদরে আহ্বান করে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে চাইছেন।" অতঃপর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীশৈলেন দাস।

সন্ধ্যারতির পর সাতটায় বিশেষ প্রবন্ধপাঠের আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ প্রবন্ধপাঠকদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী ও শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। 'বর্তমান নারী সমাজ ও শ্রীশ্রীমা' প্রবন্ধে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী বলেন: "আমাদের আজকের সমাজজীবন যেন নোঙর-ছেঁড়া নৌকার লক্ষ্যহীন যাত্রা। অথচ আমাদের সামনেই রয়েছেন পরম কাণ্ডারী শ্রীশ্রীঠাকুর। পরম আদর্শ শ্রীশ্রীমা। বর্তমান নারীসমাজকে তাঁর মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে এইখানেই আসতে হবে। এই প্রশ্নাতীতা পরমা জননীর কাছেই রয়েছে সকল প্রশ্নের উত্তর।

"জীবন তো একটাই। সেই পরম মূল্যবান বস্তুটিকে এলোমেলোভাবে খরচ করে ফেলার মতো লোকসান আর কী আছে? এই লোকসানটি বাঁচাতেই 'মা'। লক্ষ্যহারা যুগকে পথ দেখাতেই শ্রীশ্রীমার আশ্চর্য আবির্ভাব, আশ্চর্য রহস্যময় লীলা। আদি অন্তহীন সেই অপার রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করতে যাওয়াও বাতুলতা। শুধু এইটুকু বুঝতে চেষ্টা করাই ভাল মা কেন এসেছিলেন? কাদের জন্য এসেছিলেন? আর কেন নিয়েছিলেন অমন অতি সাধারণীর আবরণ? ···মা সারদা যুগে যুগে কালে কালে স্থির হয়ে থাকবেন—সমগ্র পৃথিবীর নারীসমাজের ধ্রুব-তারাস্বরূপ। একদিন সমগ্র পৃথিবী এইখানে শরণ নেবে।" এরপর প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। 'বরিষ্ঠ' প্রবন্ধে তিনি বলেন: "নরোত্তমদের মধ্যে যিনি আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছেন—যিনি আমাকে সোজাসুজি ভগবানকে ডাকবার সাহস ও অভয় যুগিয়েছেন, তিনি হলেন—ঐ যা বললাম—বঙ্গদেশের সামান্য এক পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান—গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তথা-কথিত শিক্ষা নেই, বিত্ত নেই, বিত্তের কামনাও নেই। নিজের অহঙ্কার নেই, তেমনি কারও অহঙ্কারের পরোয়াও করেন না। এ এক আশ্চর্য মানুষ!···এই মানুষ সবচেয়ে যে বড় অভয় দিলেন আমাদের মতো অতি সাধারণ মানুষদের—তা হল: সহজ বুদ্ধিতে সহজভাবে অনায়াসে ভগবানকে ডাকা যায়, সকলেই নিজের মতো করে, নিজের ধারণা ও বিশ্বাস মতো তাঁকে ডাকতে পারে—···। তিনি দেখালেন, হাসিতে তামাসায় গানে গল্পে মানুষকে তার নরলোকের স্তর থেকে দিব্য চিন্তার স্তরে উত্তীর্ণ করা যায়।" শ্রীপ্রসাদ সেনের ভক্তিগীতির পরে আজকের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

রবিবার, ৩ এপ্রিল বিকাল ৩টায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে পঞ্চম অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 'শিক্ষাবিদ স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে 'শিক্ষার উদ্দেশ্য', 'শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ', 'স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ

পাঠক্রম', 'শিক্ষার বাহন', 'শিক্ষার পরিবেশ', 'গণশিক্ষার ব্যবস্থা' প্রভৃতি দিকগুলির ওপর আলোচনা করেন। আলোচনা করে আক্ষেপের সঙ্গে উপসংহারে বলেন: "স্বামীজীর শিক্ষা-পরিকল্পনার অনেকখানিটাই আমরা আজও বাস্তবে রূপায়িত করতে পারিনি। অনেক জায়গায় আমরা তাঁর আদর্শের বিপরীত পথে চলেছি। পশ্চিমবঙ্গে আমরা আজ সংস্কৃত ভাষাকে প্রায় বর্জন করতে চলেছি, ভারতের অন্যত্রও এই ভাষার আদর ক্রমশঃ কমছে। এর ফলে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি চর্চার পথ যে অদূর ভবিষ্যতে দুর্গম হয়ে উঠবে, একথা আমরা বোধ হয় মনে রাখছি না। ধর্মশিক্ষাও আমাদের পাঠক্রম থেকে নির্বাসিত। ধর্ম জিনিসটি যে আদৌ রক্ষণশীলতা বা সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক নয়, একথা বোঝাবার জন্য আরেকজন বিবেকানন্দের আবির্ভাব প্রয়োজন।" ডঃ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন অধ্যক্ষ অধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ও ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। সভাপতির ভাষণে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন: "স্বামীজী বলেছেন, পাশ্চাত্য দেশ থেকে নেব তাদের কর্মকুশলতা, কর্মতৎপরতা এবং ভারতের যে আদর্শ 'মূল্যবোধ' সেটাই রাখতে হবে। দুই-এর সমন্বয়। আমাদের মুশকিল হচ্ছে যে, আমাদের কারও ঝোঁক আমেরিকাকে অনুকরণ করা, কারও ঝোঁক রাশিয়াকে অনুকরণ করা। এই অনুকরণ করে করেই আমরা চালাচ্ছি, একে শিক্ষা বলে না। নিজস্ব একটা শিক্ষাব্যবস্থা নিজেদেরই গড়ে তুলতে হবে। এই সমাজ,—একটা চলমান সমাজ। কেউ একটি জায়গায় থেমে থাকেনি। চলেছে, নদীর স্রোতের মতো। স্বামীজী কতকগুলি মৌলিক গুণের ওপর জোর দিয়েছিলেন —এক কথায় 'মানুষ গড়া'। এই মৌলিক লক্ষণগুলি যদি আমাদের থাকে, তাহলে যে-কোন সমস্যা, দারিদ্র্য বলুন, বেকারত্ব বলুন, যত সমস্যা আসুক—যদি মানুষ হয়—সমাধান হয়ে যাবে। সে-যুগে স্বামীজী মহীশূরের রাজাকে বলেছিলেন, আপনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছেন, শুধুমাত্র তাতেই শিক্ষার সমাধান হবে না। শিক্ষাকে মানুষের ঘরের দরজায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যে nonformal education-এর কথাও সভাপতি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন: "অন্য দেশের লোক বই পড়তে পারে হয়তো, কিন্তু তাদের সাধারণ জ্ঞান অত্যন্ত কম। আমাদের দেশের লোক সবাই বই পড়তে পারে না, কিন্তু দেশের সব খবর রাখে। এমন চোখ কান খোলা মানুষ সারা পৃথিবীতে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তাদের ধর্মবুদ্ধি অনেক বেশি। দেশের মাটির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চরিত্র যাতে গঠন হয়, আপনার পায়ে দাঁড়াতে পারে, এমন শিক্ষা দরকার—যা চেয়েছেন স্বামীজী।"

বিকাল ৪-৩০ মিনিটে পুনরায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে ষষ্ঠ অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনের বিষয়বস্তু ছিল: 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনে শিল্পী নন্দলাল বসু'। নন্দলাল বসুর সুযোগ্য ছাত্র ও প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেন: "নন্দলালের সারা জীবনের চিত্র সম্ভারের ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করলেই দেখব এই হৃদয়টি কতটা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনে আন্দোলিত হয়েছিল।…বিবেকানন্দ যে ভারতবর্ষকে হৃদয়ে বসিয়েছিলেন, যে মানুষ জনকে তিনি ডাক দিয়ে বলেছিলেন নতুন ভারত গড়ার জন্য—নন্দলাল তাঁর চিত্রের ভিতর দিয়ে সেই ভারতবর্ষকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের ওপর আলোচনা

করেন বিশিষ্ট শিল্পীদ্বয় শ্রীসুনীল পাল ও ও শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী। সভাপতির ভাষণে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন: "আমরা তিনটি অতি মূল্যবান ভাষণ শুনলাম। এঁরা নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন নিজ নিজ কর্মে। বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, বিদেশ থেকে আমদানী করা কলাকৌশল নয়, স্বতঃস্ফূর্ত—ভারতের মাটি থেকে বেরিয়েছে। কোন সম্প্রদায়ের মতবাদ ফুটিয়ে তোলা হয়নি। উদ্দেশ্য শুধু এই—মানুষকে যা মহত্তম, সুন্দরতম, পবিত্রতম, উদারতম করে এবং যে-সত্যকে চৈতন্য বলি আমরা,—ভগবান বলি আমরা, তারই সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। নন্দলাল বিবেকানন্দের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন সকলের কাছে, জানি না সেই বাণী সকলের কানে পৌঁচেছে কি না? তিনি তাঁর কাজ করেছেন। এটা ভাবতে আনন্দ হয়, গর্ব হয়,—তাঁর কথায় কৃতজ্ঞতা বোধ করি আমরা। আজকের এই ভাষণগুলির বহুল প্রচার দরকার। এর প্রয়োজন এইজন্য, এর ভিতর দিয়ে আমাদের যে শিল্পচেতনা, শিল্পধারণা, শিল্পচিন্তা সেইটা সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া যাবে। আর ব্যক্তি নন্দলাল ও শিল্পী নন্দলাল তাকেও ভালভাবে জানব।"

সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীধ্রুব চৌধুরীর 'দীনদয়াল শ্রীরামকৃষ্ণ তোমারে প্রণাম কোটি প্রণাম' ভক্তিগীতির পর প্রাচীন লেখিকা রবীন্দ্রপুরস্কার-প্রাপ্তা শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবীর সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাটি পাঠ করেন ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। তারপর অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিশেষ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল: 'কথামৃতে ছোটগল্পের রূপরেখা'। প্রবন্ধে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে বলতে চেয়েছেন —কথামৃত কিভাবে বাংলাসাহিত্যে 'জানত' 'অজানত' প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে আলোচনাটি বেশ উপভোগ্য হয়। শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস দরদীকণ্ঠে স্বামীজীর গাওয়া 'তোমারে করেছি জীবনের ধ্রুবতারা' ও 'তাহারে আরতি করে চন্দ্রতারা' সঙ্গীতদুটি এবং আরও কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। অধিবেশনে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। এইসঙ্গে চতুর্থ বর্ষের সাহিত্য-সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। তখন রাত নটা।

রামকৃষ্ণ-ভাবপ্রবাহের আদিশিল্পী নন্দলাল

শ্রীসুনীলকুমার পাল

সববিদ্যারই চরম উৎকর্ষ—আত্মপ্রকাশ আর আত্মনিবেদন। শিল্পীদের কাছে শিল্পও এক রকমের পূজা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ল—I touch God in my song, as the far away hill touches the ocean with its water fall, 'মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই, গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই।'

পৃথিবীতে এক একজন যুগাবতার আসেন—মানুষ তখন জীবনের সবদিক দিয়ে নতুন করে জেগে ওঠে, শিল্পেও সাড়া জাগে।

প্রভু বুদ্ধ এসেছিলেন। বৌদ্ধযুগে শিল্পের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। আমাদের যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে ঘিরে শিল্পের স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটবে এবং এ যুগের শিল্পও একটা বিশেষ তাৎপর্য, বিশেষ character (বৈশিষ্ট্য) নিয়ে বিভাসিত হবে। এক এক যুগের আর্ট এক এক যুগের imagination—কল্পনা

বলা বাহুল্য, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সামান্য। শুধু সৌভাগ্যক্রমে শিল্পের সংসর্গে মিশনের সংস্পর্শে আসতে পেরে ধন্য হয়েছি। পূজ্যপাদ সাধু-সন্ন্যাসীদের মুখ থেকে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কিছু কথা আমি শুনেছি। আমার জীবন-পাত্রে যতটুকু ধরে তাই দিয়ে আমি ভরে আছি, শিল্পী জীবনের নতুন আস্বাদ পেয়েছি।

স্বামী বিবেকানন্দের ঘোষণা শুনেছি—"শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রবাহ হাজার বছর ধরে চলবে।" শিল্পকলার বহুবিধ উপচার নিয়ে ঠাকুরের পূজায় এসেছেন আচার্য নন্দলাল। আমরাও পরে পরে একে একে আসছি। আরও কত নতুন শিল্পী জন্ম নেবে—আমরা সবাই হাজার বছর ধরে চলব।

ঠাকুরের ভাবরাজিকে চিত্রিত করবার 'আর্ট ফর্ম' এখনও আমরা সৃষ্টি করতে পারিনি। বড় শিল্পের মধ্যে একটা message বা বার্তা থাকে, নানান শিল্পীর জীবনে বিচিত্র এর অনুভব, বিচিত্র এর অভিব্যক্তি। মানুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বর—শিল্প যাকে যে রূপে দেখা দেয়, যার কাছে যে ভাবে ধরা দেয়, উদ্ঘাটিত হয়। পথ এক নয়, কিন্তু এক সার্থকতা।

ঠাকুরের যে 'আর্ট সেন্স' বা শিল্পচেতনা তা আর্টের চেয়ে বড়,—তাকে সমগ্ররূপে বোঝবার জ্ঞান আমার হয়নি। তাঁর অজস্র ভাবরাজির মধ্যে যে দু-একটি মাত্রকে নিয়ে আমাদের শিল্পকলার মর্মকথা, আজকের ক্ষয়-ধরা শিল্পবিভ্রমের দিনে তা বলে যাব।

লীলাপ্রসঙ্গে পড়েছিলাম ঠাকুরের কথা। তার ভাষাটা মনে নেই, ভাবটা এই—এই পাহাড় পর্বত, গাছপালা, আকাশ বাতাস—দেখি কি সব মায়ের হাসি। এ শুধু ধর্মের কথা নয় আর্টের কথা।

আমাদের হাল আমলের আর্টের কথা বলি। এখনকার শিল্পচিন্তায় ইলাস্ট্রেশনে আর্টিস্টদের বড় অবজ্ঞা, একে আজ খেলো জ্ঞান করে।

একদিনের একটা ঘটনায় শিল্পে ইলাস্ট্রেশনের আসল মানে আমার কাছে সহজ হল।

একদিন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের সামনে উপস্থিত ছিলাম। এক গায়ক এসে বললেন, অমুকের গান শুনে এলাম, তবে কীর্তন গোছের। মহারাজ ঈষৎ হেসে বলেছিলেন, "সঙ্গীত মানেই কীর্তন"। আমিও বুঝে গেলাম ছবি মানেই ইলাস্ট্রেশন; বিরাটের লীলা কীর্তন বা ইলাস্ট্রেশনই আর্ট। চরাচরে সবই ছবি সবই মায়ের হাসি।

কালো মেঘের গায়ে বলাকার ছবি দেখে ঠাকুরের সমাধি হল। বড় আর্টিস্ট, তাই ছবির মধ্যে অধ্যাত্ম অনুভূতি যোগ হয়ে গেল।

আজকাল শুনছি—ইউরোপে কলারসিকরা আগের মতো আর 'হাউ বিউটিফুল', 'হাউ নাইস্', —এসব কথা বলে না। এখন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে 'হাউ স্পিরিচুয়াল' বলে। এসব শৌখিনতা, না ভাববিলাস জানি না, তবে মনে হয়, সে দেশে আর্টের পুরানো বোধ বদলাচ্ছে। ভারতবর্ষের নন্দনতত্ত্ব শুধু নেচারকে (প্রকৃতিকে) নিয়ে নয়, প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর অনুভূতি নিয়ে। আমাদের শিল্পে—এমন কি গ্রাম্য শিল্পেও স্পিরিচুয়ালিজমের সার্থক চর্চা হয়েছিল। একেই এক কথায় স্বামীজী বলেছেন —"আমাদের আর্ট যে ধর্মের একটা অঙ্গ।"

আজ আমরা আর্টের কথা ভাবছি। কথায় আছে—Education makes a good man better and a bad man worse, এই রকম শিল্পও খুব বড় জিনিস, আবার খুব নোংরা জিনিস। নানান শিল্পী নানান ভাবের ছবি আঁকে। কেউ দিব্য রসের ছবি আঁকে, কেউ 'প্যারিস পিকচার' আঁকে। প্রবৃত্তি অনুযায়ী যে যার বিদ্যাকে কাজে লাগায়। ঠাকুরের কথা মনে পড়ে,—পিদীমের আলোয় কেউ গীতা পাঠ করে, কেউ তমসুক জাল করে। শিল্পবিদ্যাকে আজ আমরা জীবনের কোন্ কাজে লাগাব?

এখনকার দিনে আর্টিস্টদের জ্ঞানের অবধি নেই। বিজ্ঞান, সমাজ, আর্ট ঈসথেটিকস্ (শিল্প-সৌন্দর্য) এসব নিয়ে তাদের কত ভাবনা, কি তোলপাড়। কিন্তু আঁকার বেলায় শুধুই Sex; ঠাকুরের কথা আছে—"শকুন অনেক উপরে ওঠে, কিন্তু নজর থাকে তার ভাগাড়ে।" ছি ছি কি কুৎসিত আজ আর্টিস্টের মন।

ইন্টেলেকচুয়াল হবার উন্মত্ত নেশায় শান্ত হয়ে কোন noble thought বা সৎ চিন্তা, অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তা আজ আর আমাদের আর্টে খুঁজে পাওয়া যায় না। এদিকে জীবনে রাজনীতি প্রবল ও প্রখর হয়ে উঠেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আর্টে মানুষের কথা ভেসে আসছে। তবে ভালবাসার বদলে উথলে উঠছে হিংসা আর দ্বেষ।

মানুষ নিয়ে ভাবনার যুগ সত্যই এসেছে। মানুষের যা সত্য পরিচয় তাই নিয়ে মানুষ জাগবে। দয়া দাক্ষিণ্য অনুকম্পাও নয়, দ্বেষ-হিংসাও নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবাই এ যুগের message (বার্তা), আর্টিস্টদের আঁকবার নতুন subject (বিষয়), "বহুরূপে সম্মুখে তোমার…।"

ঠাকুরের কথায় ও জীবনে আর্টের কত প্রেরণা, কত বীজমন্ত্র ছড়িয়ে আছে—ভবিষ্যৎ শিল্পীরা একে একে তা ফুটিয়ে তুলবে।

এতাবৎ দেশে দেশে যুগে যুগে সভ্যতার অনেক কীর্তি মানুষকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেছে। এ যুগে ঠাকুর এসেছেন সভ্যতার পালা বদল করতে। আর কীর্তি নয়। স্বামীজী জানিয়ে দিয়ে গেলেন, "আধ্যাত্মিকতার বিকাশই মানুষের সভ্যতা।"

আচার্য নন্দলালকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে নিজের অনুভবের কথাই বলছি, শুনতে খারাপ লাগছে। কিন্তু আমি এলাম কোথা থেকে। ঠাকুরকে কেন্দ্র করে শিল্পকলা নিয়ে আমরা যে ভাবতে শিখছি—একশো বছর আগে নন্দলাল জন্মেছেন বলেই আজ তা সম্ভব হচ্ছে। আমরা যা ভাবছি নন্দলাল তাঁর শিল্পকলায় তার প্রয়োগ করে গেছেন। রামকৃষ্ণ-ভাবপ্রবাহের তিনি আদিশিল্পী।

নন্দলাল হাতে-কলমে শিল্পশিক্ষা করেছেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু হারিয়ে যাননি অবনীন্দ্রনাথের বিরাটত্বের মাঝখানে। গুরু এবং শিষ্য দুজনেই যুগন্ধর শিল্পী, কিন্তু দুজনের সৃষ্টির পথ এক ছিল না। তবু, দুজনের একত্বেই প্রবাহিত হল Indian Art (ভারতীয় শিল্প)-এর রসধারা,

তার প্রাণধারা। গুরু এবং শিষ্যের এমন আশ্চর্য সম্পর্ক শিল্পের ইতিহাসে বিরল।

নন্দলাল নিজের পথে বড় হয়ে উঠছেন,—অবনীন্দ্রনাথ নিজের মাস্টারি দিয়ে তা চাপা পড়তে দেননি। তাঁর নিজেরই এই রকম উক্তি আছে—নন্দ অজন্তায় ফিরে গেল আমি মোগলেই রয়ে গেলুম। আমরা অবশ্য জানি যে, তাঁদের মতো মহৎ আর্টিস্টরা কেউই চিরকাল এক ঠাঁই স্থির হয়ে থাকেন না। নন্দলালও অজন্তাতেই আবদ্ধ হয়ে পড়েননি। আর অবনীন্দ্রনাথও মোগল পার্শিয়ানেই নিঃশেষিত হননি। আজীবন শিল্পের নব-নব বার্তা নব-নব প্রেরণা তাঁদের ছুট করিয়েছে। তাঁরা দুজনেই অমর শিল্পী।

আচার্য নন্দলালকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আমরা মিলিত হয়েছি। আমাদেরও অনেক আগে যাঁরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁদের যে কজনের কথা আমি যতটুকু জানি তা উল্লেখ করি। শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শিষ্যের কাছে হার মেনে, বলেছিলেন, "নন্দর মতো দেবদেবীর ছবি আঁকতে আমি পারলুম না।" শিল্পী নীরদ মজুমদারের এক লেখায় জেনেছি, নন্দলালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার তিনটি কথা—"অমন লোক হয় না, অমন মানুষ হয় না, অমন আর্টিস্ট হয় না।" গান্ধীজীর শ্রদ্ধার পরিচয় আমরা পেয়েছি। নন্দলালের শিল্পের স্পর্শ না পেলে তাঁর কংগ্রেসের অধিবেশন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেত না। আর নিজের চোখে দেখেছি নন্দলালের প্রতি শ্রদ্ধার আর এক নির্মল অভিব্যক্তি। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘরের দেয়ালে পাথরের প্লেটে লাইনে ক্ষোদা নন্দলালের শিবের একটি ছবি আছে। সেই ছবি-খানি দেখিয়ে সুনীতিবাবু বলেছিলেন, "এর সামনে দাঁড়ালে আমার উপাসনার কাজ হয়।" এই সব বিবরণ জেনে বুঝতে পারছি, চিত্রকর নন্দলালকে আজকের আমরা খুব সামান্যই চিনেছি।

বর্তমান কালে নন্দলালের শিল্পে অধ্যাত্মরসের প্রথম সঞ্চার হল।

হ্যাভেল, কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ—শিল্প জগতের এই সব প্রকাণ্ড ব্যক্তিরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হবার আগে শিল্প নিয়ে যখন কেউ মাথা ঘামায়নি তখন স্বামীজী শিল্প সম্বন্ধে এমন সব খুঁটি-নাটি কথা বলে গেছেন, রসগ্রাহিতার এমন সব সূক্ষ্ম পরিচয় রেখে গেছেন যে, আশ্চর্য হতে হয় ঐ সব তত্ত্ব ও তথ্য সে সময় তিনি জানলেন কি করে! অবশ্য গোটা মানব জীবনকে যিনি সম্যক্ ভাবে জাগাতে এসেছেন, শিল্পকলাকেও তিনি জাগিয়ে দিয়ে যাবেন এ আর আশ্চর্যের কি। এদেশের শিল্প, নেচারকে (প্রকৃতিকে) সুপার-ন্যাচারাল (অতিপ্রাকৃত) করে সৃষ্টি করতে পেরেছিল, আধ্যাত্মিক ভাবকে প্রকাশ করে শিল্পকলাকে মানসলোকে উন্নীত করেছিল। ভারত শিল্পের এই বৈশিষ্ট্য যে পরম বিস্ময়, স্বামীজীই তা প্রথম ধরেছিলেন।

কিন্তু স্বামীজীর জীবনের এই অলক্ষ্য দিকটি আজকের শিল্পীরা বড় বেশি অবগত নয়। স্বামীজীকে জানার শেষ নেই। তাঁকে জানলে শিল্পীদের নানান সংশয় কেটে যাবে, শিল্পের স্পষ্ট পথ দেখতে পাবে, আজকের মতো হাতড়ে বেড়াতে হবে না। জীবনে আমাদের কি চাওয়া উচিত সে জ্ঞান স্পষ্ট হলে, জীবনে আমাদের কি পাওয়া উচিত তাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। জ্ঞানের অভাবে শিল্পকে আমরা বীর্যের সঙ্গে প্রকাশ করতে পারছি না।

ভারতীয় শিল্পদর্শনের অলৌকিকতা, তার অনির্বচনীয়তা তার আর্ট-ফর্ম সব মিলিয়ে শিল্পদৃষ্টি আর দিব্যদৃষ্টি যে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে আছে—সিস্টার নিবেদিতা ভারত শিল্পের এই মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। স্বামীজীর দেহাবসানের পর সিস্টার নিবেদিতা

হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল, গুরু-শিষ্য-নাতি এই তিন পুরুষকে এক করে সেই আত্মবিস্মৃতির যুগে ভারত শিল্পের ভাবে রসে আপ্লুত ও উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাঁদের দিয়ে আর্ট মুভমেণ্ট শুরু করেন এই বাঙলা দেশে। সিস্টার নিবেদিতা সেদিন শিল্পীদের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেছেন।

শিল্পী নন্দলাল একদিকে যেমন অবনীন্দ্রনাথ, হ্যাভেল, ওকাকুরা, কুমারস্বামী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীর হাতে মানুষ হয়েছেন, আর একদিকে মানুষ হয়েছেন—মার আশীর্বাদ, সিস্টার নিবেদিতার জলন্ত প্রেরণা, পুণ্যদর্শন মহেন্দ্র দত্তের পথনির্দেশ এবং স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ লাভ করে। তাই নন্দলাল সারাজীবন খুব স্বাভাবিক ভাবে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবধারায় diluted হয়েছিলেন, বিভোর হয়েছিলেন। তারই পবিত্র দ্যুতি তাঁর জীবনে ও শিল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। শুধু দেব-দেবীর ছবি বলে নয়—প্রকৃতি, মানুষ, অলঙ্করণ, সজ্জা সব কিছুই তাঁর হাতে সাত্ত্বিক রূপ পেয়েছে।

শান্তিনিকেতনে তাঁর জীবন কেটেছে। শান্তিনিকেতন তাঁর হাতে শিল্পের পুণ্য অঙ্গন হয়ে আছে। শিল্পী নন্দলালের পরম বৈশিষ্ট্য পবিত্রতা।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীপূর্ণচন্দ্র শেঠকে লিখিত পত্র]

১

1027 Maple Ave.
Los Angels
Calif., U. S. A.
The 13th May, 1903.

প্রিয় পূর্ণবাবু—

আপনার ৮ই এপ্রেলের পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। আমি মনে করিতেছিলাম আপনি বোধ হয় একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। আপনাদের ছবি এখানে পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিয়াছি। এখানকার ফটোগ্রাফে আর ও ব্রোমাইডে আর India-র Photograph-এও Bromide কিছু তফাৎ নাই। বরং দামে বেশী। বোধ হয় New York-এ খুব ভাল হয়। আপনি যে জপধ্যান নিয়ম মত করিতেছেন, শুনিয়া যার পর নাই খুশী হইলাম। মহোৎসব প্রভৃতিতে গিয়াছিলেন শুনিয়া সুখী হইলাম। ঠাকুর ছাড়া পথ নাই। তিনি বলবুদ্ধিভরসা—সবই। তাঁকে কোনও মতেই ছাড়িবেন না। খুব পাকড়াইয়া থাকিবেন। সতীশবাবু কোথায় ও কেমন আছেন? সুরেনবাবু কেমন আছেন? আপনার ভাইয়েরা কেমন আছেন? আপনি কেমন আছেন? সব লিখিবেন। আমি আজকাল কেবল দুধ খাইয়া আছি। দিনরেতে দেড়সের মাত্র। বেশ আছি।

তবে শরীর যেমন খারাপ থাকে তেমনই আছে। ঠাকুরের কার্য্য করিতেছি বলিয়া আজও ছাড়ি নাই। শরীর খারাপ হলেও জুঝ্‌তে পারছি। আপনি পত্র 40, Steiner Street, San Francisco, Calif., U. S. A. এই ঠিকানায় লিখিবেন।

মাস দুই বাদে সেখানে ফিরে যাব। এখানে নতুন আর একটি Centre খুলতে এসেছি। বক্তৃতায় খুব লোক হচ্ছে। দাঁড়াবারও জায়গা থাকে না। আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা আপনি জানিবেন ও আর ২ সকলকে জানাইবেন।

ইতি শুভানুধ্যায়ী—
ত্রিগুণাতীত

২

2963 Webster Street
San Francisco, Calif.
U. S. A.
The 5th Sept. 1905.

প্রিয় পূর্ণবাবু—

আপনার লিখিত গত ১৪ই জুলাইয়ের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। এখন হইতে আমাকে বরাবর উপরিউক্ত ঠিকানায় লিখিবেন। ননীবাবু এটর্নি পাশ হইয়াছেন শুনিয়া বড়ই খুশী হইলাম। কন্যার বিবাহের শুভ সংবাদ শুনিয়াও আনন্দিত হইলাম। আপনার মত ঝগড়াটে বেহাই অনেকে পেলেও "বর্ত্তে" যাবে। সুরেনবাবু, সতীশবাবু প্রভৃতি ভাল আছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। আপনার দাদার অসুখ বৃদ্ধি পাইয়াছে বড়ই দুঃখের কথা। সচ্চিদানন্দ স্বামী খুব খাটিতেছেন বেশ কায করিতেছেন ও বেশ ভাল আছেন। মঠ হইতে বিরজানন্দ স্বামী বোধ হয় শীঘ্র আমেরিকা আসিবেন। তাঁহার সঙ্গে বড়ি টড়ি, আচার টাচার প্রভৃতি যা যত পারেন পাঠাইয়া দিবেন অনুগ্রহ করিয়া। মাশুল তার দরুন যা লাগে আমি দিব। আপনারা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। আমি আজকাল ভাল আছি।

ইতি শুভানুধ্যায়ী
ত্রিগুণাতীত

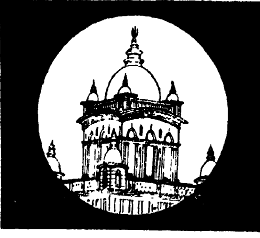
অনুগ্রহ করিয়া অপর চিঠিগুলি ডাকে ফেলাইয়া দিবেন।

মঠস্থ বুড়ো গোপালদা'র (স্বামী অদ্বৈতানন্দর) Photograph যদি আপনার নিকট থাকে ত অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি সুবিধা ও সম্ভব হয় আমাকে এক কপি পাঠাবেন।

ইতি

বিরজানন্দের আসিবার কালীন যদি তাঁহার কিছু অর্থের দরকার হয় ত আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে কিছু দিবেন। পরে আমি এখান হইতে আপনাকে ঐ টাকা পাঠাইয়া দিব।

ইতি
ত্রিগুণাতীত



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

লোককল্যাণে উৎসর্গীকৃত এক মহাজীবন

পুরাকালে যুদ্ধদুর্ধর্ষ কালকেয় নামে দানবদের উৎপাতে দেবতারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। দানবরা বৃত্রাসুরকে তাদের নেতা করে দেবতাদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল। নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তারা দেবতাদের চারদিক থেকে আক্রমণ আরম্ভ করে।

দেবরাজ ইন্দ্র সর্বশক্তি সহ দানবদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করলেন, কিন্তু তাদের রণকৌশলে এবং শক্তির কাছে দেবতারা পরাজয় মানলেন।

পরাজিত হয়ে ইন্দ্র মনের দুঃখে দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতারা তাঁদের বিপদের কথা নিবেদন করলেন—বৃত্রাসুরকে বধের উপায় প্রার্থনা জানালেন। ব্রহ্মা বললেন: 'তোমাদের আগমনের হেতু আমি সব জানতে পেরেছি। তোমরা যদি যুদ্ধে জয়ের অভিলাষী হও, তবে তোমাদের মর্ত্যধামে যেতে হবে। সেখানে এক মহাপ্রাণ উদারচেতা ধর্মাত্মা মুনি আছেন। তাঁর নাম দধীচ। একমাত্র তাঁর কাছেই আছে বৃত্রাসুর বধের অস্ত্র।'—এই বলে ব্রহ্মা দধীচমুনির কাছে কি বর, কিভাবে প্রার্থনা করতে হবে—তা সব শিখিয়ে, যথাকর্তব্য উপদেশ দিলেন।

ইন্দ্র এবং দেবতারা আদিদেব ব্রহ্মাকে নমস্কার করে, মর্ত্যভূমিতে আসার জন্য তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। অতঃপর দেবতারা স্বয়ং নারায়ণকে অগ্রবর্তী করে মর্ত্যভূমিতে দধীচমুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন।

চারদিকে সবুজের সমারোহ। গাছে গাছে ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ করে গান গাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সামগান গেয়ে চলেছেন অবিরাম। আকাশে পাখিরা মনের আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। চকোর-চকোরী ও কোকিল মনের আনন্দে গাছের ডালে বসে ডাকছে। ব্যাঘ্রভয়হীন মহিষ, শূকর, হরিণ প্রভৃতি পশু যত্র-তত্র বিচরণ করছে। এইরূপ প্রাকৃতিক সুন্দর এক মনোরম পরিবেশে দধীচমুনির আশ্রম। আশ্রমে নিমীলিত নেত্রে ধ্যানাসনে বসে আছেন দধীচমুনি। প্রশান্ত বদন। তাঁর অঙ্গকান্তি সূর্যের মতো দেদীপ্যমান, অগ্নির মতো তেজোময়।

দেবগণ সহ ইন্দ্র তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে চরণযুগলে প্রণত হলেন। দেবরাজ কৃতাঞ্জলি হয়ে—ব্রহ্মা ঠিক যেমনটি প্রার্থনা করতে বলে দিয়েছিলেন, সেইভাবেই মুনিবরের কাছে প্রার্থনা করলেন। দেবতারা সমবেত কণ্ঠে দধীচমুনির স্তুতি করে বললেন: হে ভগবন্! আমরা আপনার শরণাগত। আমরা মহা বিপদে পড়েছি। আপনি এই বিপদ থেকে আমাদের ত্রাণ করুন।

মুনিশ্রেষ্ঠ দধীচ চক্ষু উন্মীলিত করে প্রশান্ত দৃষ্টিতে দেবতাদের দিকে তাকালেন। তাঁদের মলিন মুখ দেখে তাঁর হৃদয় করুণার্দ্র হয়ে উঠল। করুণাবিগলিত চিত্তে শান্ত কণ্ঠে মুনিবর উত্তর দিলেন: দেবগণ! বলুন আপনাদের কি বিপদ? সেই বিপদ থেকে কিভাবে আমি আপনাদের রক্ষা করতে পারি?

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন: হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দুর্ধর্ষ যোদ্ধা কালকেয় দানবরা বৃত্রাসুরকে অবলম্বন করে আমাদের নির্মমভাবে নির্যাতিত করছে। তারা প্রচণ্ড শক্তিশালী। তাদের পরাস্ত করা সুকঠিন। তাদের নেতা বৃত্রাসুরকে বধ করতে পারলে, তারা ভয়ে নিরস্ত হতে পারে। কিন্তু ঐ বৃত্রকে বধ করার জন্য যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অস্ত্রের প্রয়োজন তা দেবতাদের আয়ত্তে নেই। হে ভগবন! আপনিই একমাত্র সক্ষম, বৃত্রাসুর বধের জন্য অপরিহার্য সেই শক্তিশালী অস্ত্রকে আমাদের হাতে দিতে।

মুনিবর দধীচ স্মিতহেসে বললেন: দেবগণ! আমার কাছে তো এমন কোন অস্ত্র নেই। আমি বনবাসী তপস্বী। আপনারা কোন্ অস্ত্রের কথা বলছেন—আমাকে পরিষ্কার করে বলুন।

দেবরাজ ইন্দ্র তখন সসম্ভ্রম কণ্ঠে বললেন: হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমরা জানি, আপনি একজন কঠোর তপস্বী, ধর্মাত্মা মহাপুরুষ। আপনার তপস্যাপূত তেজোমণ্ডিত দেহকান্তিই আপনার পরিচয় প্রদান করে। আপনার তেজোদৃপ্ত এই শরীরে যে কয়খানি অস্থি রয়েছে তাই হবে বৃত্রাসুরের মৃত্যুর কারণ। আপনার অস্থি দিয়ে অতি ভয়ঙ্কর বজ্রের উৎপত্তি হবে এবং একমাত্র তার আঘাতেই বৃত্রাসুরের প্রাণ নাশ হবে। বৃত্রের মৃত্যুতে পৃথিবী দানবদের হাত থেকে নিস্তার পাবে, জগৎ শান্তিতে থাকবে।

দেবরাজ ইন্দ্রের কথা শুনে দধীচমুনি আনন্দিত হয়ে বললেন: দেবগণ! আমার অস্থিতে যদি পৃথিবীতে শান্তি আসে, দেবতাদের হিত হয়, কল্যাণ হয়, তবে এক্ষুনি আমি নিজের দেহ নিজেই বিসর্জন দিচ্ছি। 'ত্বক্ষ্যাপি দেহং স্বয়মুৎসৃজামি'।

দেবতারা মহান ঋষি দধীচের আত্মত্যাগের প্রতিজ্ঞা শুনে স্তম্ভিত ও পুলকিত হলেন এবং তাঁর প্রতি অন্তরের স্তবস্তুতি নিবেদন করতে লাগলেন। ধর্মাত্মা ত্যাগিশ্রেষ্ঠ মহান দধীচমুনি ধ্যানাসনে বসে যোগবলে প্রাণবায়ু শরীর থেকে নিষ্ক্রমণ করলেন। অতঃপর দেবতারা মহা হর্ষে ও গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর দেহাস্থিগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে জয়লাভের অভিলাষে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে অনুরোধ করলেন বজ্র তৈরি করতে। বিশ্বকর্মা গৌরবান্বিত হয়ে সযত্নে অতি ভয়ঙ্কর ষট্‌কোণ-আকৃতি বজ্র নির্মাণ করলেন এবং ইন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন বৃত্রাসুরকে নিধন করার জন্য। আনন্দিত দেবতারা প্রচণ্ড বলে বলীয়ান হয়ে বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করলেন। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র দৃঢ় ভীমনাদী বজ্র দিয়ে বৃত্রাসুরকে সংহার করলেন।

এইভাবে দেব-হিতার্থে, পৃথিবী রক্ষার্থে, লোক-কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছিল মহামুনি দধীচের জীবন হাজার হাজার বছর পূর্বের এই কাহিনী আজও পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

[মহাভারতের বনপর্বের দধীচমুনির আখ্যায়িকা অবলম্বনে।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

কৃপাধন্য দুজন

দক্ষিণেশ্বরে তখন একজন বুড়ো মালী ছিল। ঠাকুরের ঘর থেকে পঞ্চবটী হয়ে বেলতলা পর্যন্ত সমকোণী রাস্তাটুকু সে প্রতিদিন নিষ্ঠাভরে পরিষ্কার করত। প্রতিদিন তাকে ঐ একই কাজ এত মনোযোগ দিয়ে করতে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করি। প্রথমে সে কিছু ভাঙতে চায় না। কয়েক দিন জিজ্ঞাসা করায় শেষে তার জীবনের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বললে :

"তখন পরমহংসদেব এখানে রয়েছেন। একদিন গভীর রাত পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসছে না, তাই পঞ্চবটীতে এসেছি ; বেলতলার দিকে নজর পড়তেই মনে হল কে যেন বেলতলা আলো করে বসে আছেন। আমি সাহসে ভর করে ধীরে ধীরে কাছে যেয়ে দেখি,—পরমহংসদেব সেখানে গভীর ধ্যানে ডুবে আছেন, তাঁর শরীর থেকে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ বার হচ্ছে। তাই দেখে আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ি। কতক্ষণ ঐভাবে ছিলুম জানি না, হুঁশ হতেই সেখান থেকে পালিয়ে আসি। ঘুম তো হল না, কি দেখলাম ভাবতে ভাবতে রাত কেটে গেল। ভোর হতেই চলে গেলাম পরমহংসদেবের কাছে। আমার কথা শুনে তিনি হেসে বললেন, 'ছাখ্, এ-সব কথা কাউকে যেন বলিসনি। এক কাজ করবি, রোজ সকালে এই রাস্তাটি খুরপি দিয়ে পরিষ্কার করে রাখবি। কত সব ভক্ত আসবে দেখিস।' সেই থেকে আমি রোজ এই রাস্তাটি পরিষ্কার করি।"

*

রামলাল দাদার কাছে একটি ব্যাপার শুনেছিলাম—তা ঘটেছিল ঠাকুরের মহাসমাধির প্রায় দেড় মাস পরে ; দক্ষিণেশ্বরে। তখন রামলাল দাদা মা ভবতারিণীর পূজারী। একদিন সকালে মন্দিরে যাবার সময় আঙিনার মাঝখানে এক জটাজূটধারী সৌম্য মূর্তি সন্ন্যাসীকে দেখলেন,—পশ্চিমের বলিষ্ঠ দেহ। সন্ন্যাসী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরমহংসজী কাঁহা হ্যয়?' সাধুকে ভাবস্থ দেখে রামলাল দাদা তখনই কিছু না বলে তাঁকে ঠাকুরের ঘরের বারান্দা দেখিয়ে সেখানে বসতে ইশারা করলেন ও ফিরে এসে কথা বলবেন বলে মন্দিরে চলে গেলেন। পূজা সেরে এসে সাধুকে নিয়ে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করলেন ও পরমহংসদেবের ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখিয়ে তাঁর মহাসমাধির কথা প্রকাশ করলেন। ঐ সংবাদ শুনে সাধু একেবারে বসে পড়লেন, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না,—'উয়ো ক্যায়্সে হোগা জী? পরমহংসজীনে মুঝে য়ঁহা পর বোলায়া ; ম্যয় ছে মাহিনা পয়দল চল্ কর্ য়ঁহা পধারা হুঁ', বলে খুব কাঁদতে লাগলেন। উত্তরের বারান্দায় অনাহারে অনিদ্রায় তিনদিন কাটালেন। চতুর্থ দিন ভোরবেলায়, সে আর এক দৃশ্য—সন্ন্যাসীর দেহমন আনন্দে ভরপুর, হাতে একটি মাটির গেলাস রয়েছে, রামলাল দাদাকে বলছেন, 'পরমহংসজীনে মুঝে কৃপা কর্কে দর্শন দিয়া ; পহলে মুঝে গঙ্গাজীমে উৎরা কর্ আশীর্বাদ দিয়া, বাদমে ফিন্ প্রসাদী ভি দিয়া।' রামলাল দাদা দেখলেন সাধুর হাতে মুখে পায়স লেগে আছে, প্রসাদের পাত্রটিও হাতে রয়েছে। ঠাকুরের দিব্যদর্শন ও কৃপালাভ করে সাধু ধন্য হয়ে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন।

[শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর মুখে শ্রুত।]

জ্ঞান-বিজ্ঞান

আইনের দৃষ্টিতে মৃত্যুর সংজ্ঞা

একটি লোককে কখন 'মৃত' ঘোষণা করা হবে, এটি ডাক্তারের পক্ষে এবং আইনের চোখে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মৃত্যুর সংজ্ঞা সব দেশের আইনে এক নয়। ভারতবর্ষে রোগীর হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ দেখলে চিকিৎসক রোগীকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু বর্তমানে, ঠিক কখন রোগীকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করা হবে, এই নিয়ে সারা জগতে প্রশ্ন উঠছে। এই বিষয়ে মতভেদও প্রচুর। প্রচলিত দণ্ড-বিধি (Penal Code) জীবনের আরম্ভ ও শেষ সম্পর্কে খুব একটা সুস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থহীন মত প্রকাশ করে না।

সাধারণভাবে, অপরাধ-আইনের (Criminal law) পুস্তকগুলিতে এটা স্বীকৃত যে, মৃত্যু একটা ঘটনামাত্র নয়, একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। রাশিয়ার একাডেমি অফ সায়েন্স-এর নির্ধারিত নীতি হচ্ছে যে, মানুষের মৃত্যু শুধু তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতেই স্বীকৃত হবে না, স্বীকৃত হবে হৃৎপিণ্ডের ও মস্তিষ্ক-তড়িৎক্রিয়ার এককালীন বিলুপ্তিতে এবং যখন তা হবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাবর্তনীয়। কিন্তু লেলিনগ্রেড ইউনিভার্সিটিতে জোর দেওয়া হয় মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপরে, এমন কি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সক্রিয় থাকলেও। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই একমাত্র মস্তিষ্কের ক্রিয়ার উপরেই জোর দেওয়ার অভিমত পোষণ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস্ যন্ত্রের (Heart-Lung machine) সাহায্যে, মস্তিষ্কের কার্য বন্ধ হওয়ার পরেও, শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকে সাময়িক চালু রাখা যেতে পারে।

সমকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের নির্দেশ ছাড়াও অপরাধ-আইনে মৃত্যুর সময় নিরূপণের নীতি আরও সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত।

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মানুষের হৃৎপিণ্ড বদল করার শল্যচিকিৎসা যখন সম্ভব হল, তখন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে মৃত্যুর সংজ্ঞা-নিরূপণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি মস্তিষ্কের মৃত্যুকেই মানুষের মৃত্যু বলে ঘোষণা করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, 'মস্তিষ্কের মৃত্যু'র অর্থ— (১) অপরিবর্তনীয় ভাবে জ্ঞান হারানো (২) স্থায়ীভাবে নিঃশ্বাসের কাব বন্ধ হওয়া (৩) উত্তেজনা সত্ত্বেও শরীরে প্রতিক্রিয়ার অভাব (৪) সমস্ত মাংসপেশীর স্বাভাবিক সঙ্কোচনের অভাব (৫) ওষুধ ব্যতিরেকে রক্তনালীগুলির সাধারণ চাপ-শক্তির অভাব (৬) শরীরের তাপশক্তির অভাব (৭) মস্তিষ্কের বিশেষাংশের বা তালুর (Cerebral) তড়িৎক্রিয়া সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে স্তব্ধ হওয়া।

[The legal definition of death, World Health, November 1982 অবলম্বনে।]

দেশ-বিদেশ

অরুণাচলের অধিবাসী : দফ্‌লা

অরুণাচলের সুবনসিরি জেলা আসামের দরং, লখীমপুর জেলার উত্তরে পার্বত্য প্রদেশে। সুবনসিরি নদী হিমালয় হতে উৎপন্ন হয়ে সুবনসিরি ও সিয়াং সীমান্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে।

উত্তর-পূর্ব কামেঙ জেলার কাছে সুবনসিরির পূর্ব-দক্ষিণে মিরি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে দফ্‌লা উপজাতিরা বসবাস করে।

ভাষার উপর নির্ভর করে দফ্‌লা উপজাতি দুটি শাখায় বিভক্ত। পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসী দফ্‌লারা সংখ্যায় বেশি বলে তারা নিজেদের

'নিশু' বলে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের শাখার দফ্‌লারা মনে করে তাদের পূর্বপুরুষ 'আবু তেনি' প্রথম ব্যক্তি হতে তাদের উৎপত্তি। 'আবু তেনি' -র পুত্র 'আতুম্ম্যু' এবং তার পুত্র 'হেরিন'। 'হেরিন'-এর পুত্র 'রিংদো'-এর দোতুম্, দোল্ ও দোপুম্ নামে তিন পুত্র। এই তিন পুত্রের নাম অনুসারে দফ্‌লা উপজাতির তিনটি গোষ্ঠীর উৎপত্তি। এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যে দোতুম্ ও দোল্ উপজাতির লোকসংখ্যা খুব বেশি। সে তুলনায় দোপুম্ উপজাতির সংখ্যা খুব কম। বড় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন হয়, তবে অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপনেও সামাজিক স্বাধীনতা আছে।

'নিশু' উপজাতির শারীরিক গঠন : গোল ও চওড়া মুখমণ্ডল, চওড়া চেপ্‌টা মোটা ও উলটানো নাক, চোখ ও গালের মধ্যবর্তী হাড়টি উঁচু, চোখ কোটরগত এবং ছোট চিবুক। অন্যদের শারীরিক গঠন : চওড়া মুখমণ্ডল, ছোট উঁচু নাক, সুন্দর চিবুক, চোখ রক্তিমাভ এবং অন্য উপজাতির চেয়ে লম্বায় উঁচু এবং সুগঠিত শরীর।

দফ্‌লারা বেত বা বাঁশের সরু চটার তৈরি টুপি পরে। টুপিটি শিঙ্‌ওয়ালা পাখির লাল রঙের চঞ্চু ও পাখির পালক দিয়ে সুন্দরভাবে সাজায়। চুল বিনুনী করে তারা খোঁপা বাঁধে। এই খোঁপাকে 'পোতুম্' বলে। এই পোতুম্‌কে এক টুকরো হলুদ রঙের কাপড় দিয়ে জড়িয়ে, তার উপর দিয়ে পাতলা সরু বেত দিয়ে জড়িয়ে এবং ধাতুর বেল্ট দিয়ে টুপির সামনের কপালের উপর বেঁধে রাখে। এই পোতুম্-এর ভিতর দিয়ে একটি তামার শিক আড়াআড়িভাবে ঢুকিয়ে রাখে। বলিষ্ঠ দফ্‌লা পুরুষরা যখন সুসজ্জিত টুপি এবং কপালের উপর পোতুম্ রাখে তখন তাদের খুব সুন্দর দেখায়। প্রায় ষোল বছর বয়স থেকে ছেলেরা পোতুম্ তৈরি করে কপালের উপর বেঁধে রাখে।

দফ্‌লারা কোমর থেকে জানু পর্যন্ত পরিধান করে লম্বা একখণ্ড কাপড়। তুলা বা উলের লম্বা ঢিলে-ঢালা কোট কাঁধের উপর থেকে ঝুলিয়ে দেয়। বুকের কাছে খোলা অংশ লোহা বা বাঁশের পিন দিয়ে বন্ধ রাখে। গলায় নানা রঙের অনেকগুলি পুঁথির মালা পরে। কোমরে, হাতের কবজিতে ও হাঁটুর নিচে বেতের বেড় দিয়ে রাখে। জিনিসপত্র বহন করার জন্য তারা পিঠের উপর একটা থলে রাখে। বাঁ-পাশে আর একটা ছোট ঝুড়িও ঝোলায়। এতেও তাদের সাজ-সজ্জা সম্পূর্ণ হয় না। তরোয়াল কোমরে ঝোলালে তবে তাদের দেহ-সজ্জা সম্পূর্ণ হয়। বৃষ্টির সময় তারা বর্ষাতি (rain coat) ছাড়া বেরোয় না। বিভিন্ন জিনিসের আঁশ দিয়ে তারা বর্ষাতি তৈরি করে।

দফ্‌লা-মেয়েরা মাথার পিছনে খোঁপা বাঁধে, অথবা চুলের মাঝখানে বাঁশের চিরুনি রেখে, তার চারপাশে বিনুনী করে মাথার চারধারে জড়িয়ে রাখে। তারা চুলে কখনও তেল বা ঐ জাতীয় কোন কিছু ব্যবহার করে না। মেয়েরা সাধারণতঃ সবুজ বর্ডার দেওয়া তাঁতের তৈরি ঘাগরা (Skirt) পরে। ছেলেদের মতো মেয়েরাও কম্বল গায়ে দেয়। কম্বলটি ঘাড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। তারা কম্বলটি কাঁধের ডানদিকে এবং কোমরে শক্ত করে ফিতা ('জুসোপুস্') দিয়ে বেঁধে রাখে। কোমরে বেতের বেল্ট ও ধাতুর চাকতি ('হুফি') পরে। গলায় তারা পরে চারকোণা ধাতব খণ্ড এবং নীল রঙের পুঁথির মালা। দু-পায়ের গোড়ালি শক্ত করে বেতের ফিতা (garter) দিয়ে বেঁধে রাখে।

দফ্‌লারা প্রতিবেশী অন্য উপজাতিদের মতো গ্রামে দলবদ্ধভাবে বসবাস করে না। কিন্তু তারা একটি লম্বা বাড়িতে প্রায় কুড়িটি পরিবার একত্র বাস করে। তারা যেন একান্নবর্তী

পরিবার। সবাই সবার আত্মীয়স্বজন। এই বৃহৎ বাড়ির এক-একটি ঘরে স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, চাকর-বাকর, ক্রীতদাস প্রভৃতি নিয়ে একটি পরিবার থাকে। এই ঘরের দেওয়ালের কুলঙ্গিতে ও চালের পাটাতনে তারা চাল-ডাল-জ্বালানি প্রভৃতি জিনিস সাজিয়ে রাখে। একটা বড় বাড়িতে সবাই একসঙ্গে থাকলেও সবাই কিন্তু স্বাধীন। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা চাষের জমি আছে। শূকর, ছাগল ও মুরগি পালনের ব্যবস্থা সবার ঘরেই থাকে। ছেলে-মেয়েদের খাওয়ানোর দায়িত্ব মার, বাবার নয়। উপরন্তু স্ত্রী স্বামীকে খাওয়ায়। তবে স্বামীকে খাওয়ানোটা স্ত্রীর কোন বাধ্যতা নয়। ছেলে-মেয়েদের খাওয়াতে হয় বলে তাদের জমি চাষ করতে হয়, আবার সংসারের সমস্ত কাজকর্মও করতে হয়। তাই ঘরে বয়স্কা স্ত্রীরা সর্বময় কর্ত্রী। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মেয়েরা চোলাই মদ তৈরি ছাড়া আর কিছুতে অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

দফ্‌লা-মেয়েদের সামাজিক অধিকার খুব স্পষ্ট নয়। ছেলে যদি কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, ছেলের বাবাই মেয়ের বাবাকে পণ দেয়। এদিক থেকে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার থাকে। স্বামী স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করতে পারে যদি স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হয়,—অন্যথায় নয়।

দফ্‌লা উপজাতির মধ্যে বহু বিবাহের প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক। মেয়েরা কঠোর পরিশ্রম করে চাষবাস করে এবং ঘরের দৈনন্দিন গৃহস্থালীর সমস্ত কাজকর্ম করে বলে ধনী পুরুষরা বহু বিবাহ করে। অন্য আর এক কারণ—পরিবারের কোন পুরুষ মারা গেলে তার স্ত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবারের অন্য পুরুষের স্ত্রী হয়ে যায়। স্ত্রী বন্ধ্যা হলে স্বামী আবার বিবাহ করে। বন্ধ্যাকে তাদের সমাজ চরম দুর্ভাগ্য বলে মনে করে। বুড়ো বয়সে যাতে খাওয়া-পরার কষ্ট না হয় এবং একটু আরামে থাকা যায় এই জন্যও পুরুষরা বহু বিবাহ করে। বিবাহ সাধারণতঃ পিতা-মাতার সম্মতি অনুসারে হয়। তবে পিতা-মাতার সম্মতি ছাড়া ছেলে-মেয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলেও বিবাহ হয়। এখানে একটি জিনিস লক্ষণীয় যে, মেয়েরা যদি সন্তান প্রসব করার পূর্বে মারা যায়, তাহলে ছেলের বাবা মেয়ের বাবার কাছ থেকে বিবাহের সময় যে পণ দিয়েছিল তা জোর করে আদায় করে নেয়।

দফ্‌লারা প্রধানতঃ আত্মকেন্দ্রিক ও একরোখা। তারা একবার কোন সিদ্ধান্ত নিলে কেউ তাদের সেই সিদ্ধান্ত থেকে নড়াতে পারে না। তাদের কোন গ্রাম-প্রধান বা গ্রাম-সমিতি নেই। কেউ কোন অন্যায় করলে দোষীকে বন্দী করে রাখে। তার আত্মীয়স্বজন যদি ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ মিথন, দা, কাপড়ের টুকরো প্রভৃতি দিতে না পারে তবে দোষীকে সারাজীবন ক্রীতদাস করে রেখে দেয়।

দফ্‌লা উপজাতিদের ধর্মে অপদেবতাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কারণ তারা মনে করে তাদের সন্তুষ্ট না রাখতে পারলে রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি সাংসারিক অনিষ্ট হয়। এই রকম ভয়ঙ্কর ক্ষমতাশালী অপদেবতারা হচ্ছে 'দোজিং' ও 'যাহোম্'। তবে তাদের একজন সর্বশক্তিমান দেবতা আছেন—এ বিশ্বাসও তারা করে। তিনি জগৎকে একবার পরিচালিত করে দ্রষ্টা হিসাবে রয়েছেন। এই দেবতা সূর্যের মা—'আনে ডিউনি'। তাঁর ইচ্ছা মাত্রই এই জগতের সবকিছু চলছে। তবে তিনি উদাসীন হয়ে রয়েছেন বলে জগতে অপদেবতাদের প্রভাব এত বেশি। এই 'আনে ডিউনি' দেবতাকে স্মরণ করে তারা খুব কম। 'যুলো' অর্থাৎ বিবাহ উৎসবে তাঁকে স্মরণ করে ও তাঁর নামে মিথন বলি দেয় এবং গান গায়।

মৃত্যু সম্পর্কে অন্যান্য উপজাতিদের থেকে

দফ্‌লাদের ধারণা আলাদা। তারা মনে করে মানুষ বৃদ্ধ হলে তাদের প্রাণ ('লোচাং') দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। আর বৃদ্ধ হওয়ার আগেই, যদি রোগগ্রস্ত হয়ে বা অপঘাতে কারো মৃত্যু হয়, তাহলে তারা মনে করে অপদেবতার অসন্তুষ্টির কারণের জন্য তার মৃত্যু হয়েছে। দফ্‌লারা মনে করে, মৃত ব্যক্তির আত্মা ('ওরুম্') এই পৃথিবীর নিচে 'নেলি ন্যোকু' নামে একটি জায়গায় গিয়ে বসবাস করে। সেখানে গিয়েও এই জগতের মতো চাষবাস, গৃহকর্ম—সবকিছু করে, দ্বিতীয় বার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত। এই মৃত্যুর পর আত্মার কি অবস্থা হয়, তা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না। তবে তাদের পুরোহিতরা বলে থাকে, দ্বিতীয়বার মৃত্যুর পর আত্মা 'ওরুম ক্যুলু' নামে অন্য একটি জগতে চলে যায়। তারপর সেখান থেকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসে সুন্দর প্রজাপতির রূপ ধরে।

দফ্‌লাদের মৃতদেহ মাটিতে কবর দেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশে জিনিসপত্র রেখে আসে কবরের উপর। শ্রাদ্ধাদির মতো তাদেরও কিছু ক্রিয়ানুষ্ঠান করতে হয় মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

মৃত ব্যক্তির সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ী ঐ সব ক্রিয়ায় জাঁকজমক হয়। অনুষ্ঠান দেখে বোঝা যাবে মৃত ব্যক্তি ধনী না দরিদ্র ছিলেন।

দফ্‌লাদের শিশু জন্মের চোদ্দ দিনের মধ্যে মারা গেলে, তাকে একটি শবাধারের (coffin) মধ্যে রাখা হয়। তারপর সেই শবাধারকে এমনভাবে মাটিতে পোঁতা হবে, যাতে শিশুটির শরীর মাটির উপরের দিকে থাকে। আবার এও শোনা যায় যে, ঐ মৃত শিশুকে আধারসহ ঘরের আড়কাঠে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

সমালোচনা

আনন্দমঠ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ—জীবন মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান : ওরিয়েন্ট বুক এম্পোরিয়াম, ১০৩সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। (১৩৮৯), মূল্য : তিরিশ টাকা।

একটি বহু বিতর্কিত গ্রন্থের সুচিন্তিত আলোচনা। আনন্দমঠ রচনাকালের পর পুরা একটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রকাশের পর থেকেই আনন্দমঠ এবং সাথে সাথে গ্রন্থকারের ভাগ্যে জুটেছে সশ্রদ্ধ প্রশংসা ও বিরূপ সমালোচনা। এমন আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ বাংলাভাষায় বোধ হয় আর নেই। প্রকাশের সাথে সাথেই যে-সমালোচনার শুরু আজ পর্যন্ত তা শেষ হয়নি। ইদানীংকালেও আনন্দমঠ প্রকাশের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। লেখক অবশ্য মুখবন্ধে বলেছেন—এই বিতর্ক শুরু হবার পূর্বেই বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

বিভিন্ন অধ্যায়ের মাধ্যমে লেখক আনন্দমঠের প্রেরণা, রাজরোষ, জাতীয়তাবাদ, বিপ্লববাদ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা করতে যে-সব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—তার উল্লেখ করেছেন সংযোজিত নির্ঘণ্টে—যা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

লেখক আনন্দমঠ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বঙ্কিম-সাহিত্যের পটভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, যা আনন্দমঠের সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করে।

আনন্দমঠের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিমবিদ্বেষ। একটি বিশেষ অধ্যায়ে

লেখক এ-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে আনন্দমঠের আলোচনা করলে হয়তো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু লেখক সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যের পটভূমিকায় এই প্রশ্নের আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তথা আনন্দ-মঠের প্রতি মুসলিমবিদ্বেষের অভিযোগ যুক্তি-নির্ভর নয় বরঞ্চ আবেগপ্রসূত। কারণ, এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময় হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়েছে। লেখকের উদ্ধৃতিসহ আলোচনায় এটাই পরিস্ফুট হয়েছে যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথে বাধা সৃষ্টির জন্যই আনন্দমঠের তথাকথিত মুসলিমবিদ্বেষকে গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

আনন্দমঠের মধ্যে যে মুসলমানবিরোধী কথা আছে, তা আসলে মুসলমানশাসকবিরোধী। সাধারণ মুসলমানের প্রতি কোন বিরূপ মন্তব্য নয়। বিভিন্ন মুসলমান লেখকের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আনন্দমঠ সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশনেতার বক্তব্য সংগ্রহ করে লেখক এই গ্রন্থে সংযোজন করেছেন—যা গ্রন্থটির গুরুত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে।

'পরিশিষ্টে' নরহরি কবিরাজের আলোচনাটি আনন্দমঠের সঠিক মূল্যায়নে সাহায্য করে।

পরিশেষে এ-কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনায় প্রভূত পরিশ্রম করেছেন এবং এই গ্রন্থ 'আনন্দমঠের' বর্তমান বিতর্কে পাঠকদের সংশয় নিরসনে সাহায্য করবে।

সাধারণ পাঠকদের ক্রয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করে গ্রন্থটির বিক্রয়মূল্য (তিরিশ টাকা) কিছু কম রাখলে উপকার হত।

—শ্রীমণিময় দাশগুপ্ত

The Saving Challenge of Religion—Swami Budhananda. Published by Sri Ramakrishna Math, 16, Ramakrishna Math Road, Madras-600004. (1980), pp XVI+272, Price : 28·00.

বর্তমান কালে ও বর্তমান জগতে ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। সুলিখিত গ্রন্থটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও যুক্তিসমন্বিত।

আঠারোটি অধ্যায়ে লেখক তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়াছেন। আলোচনাগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, বর্তমান জগৎ ও বর্তমান মানসিকতাকে সম্মুখে রাখিয়া ধর্মের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহার জন্য লেখক বহু উক্তি ও তীক্ষ্ণ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। 'Religion in the nuclear age', 'The challenge of Religion to modern man,' 'Can one be scientific and yet spiritual' প্রভৃতি অধ্যায় উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। রচনার ধরন বিজ্ঞানসম্মত, পাঠককে ধাপে ধাপে আগাইয়া লইয়া যায়।

প্রতিটি অধ্যায় পাঠককে ধর্ম সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সন্ধান দিবে। আলোচনাগুলি উচ্চ মানের। মনকে একটু উর্ধ্বে তুলিয়া নেয়। উদাহরণ স্বরূপ 'Good life and Great life' প্রবন্ধটি। আবার অভিনব নামকরণ 'Grow more character' নিবন্ধটি আজকের সমস্যায় চরিত্রের প্রয়োজন ও চরিত্রগঠনের গুরুত্ব সম্বন্ধে পাঠককে উদ্দীপিত করিবে।

লেখক গভীর অধ্যয়ন ও সুচারু রচনারীতির অধিকারী। রামকৃষ্ণ মিশনের দুইটি বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ ভারত' ও 'বেদান্ত কেশরী' তিনি সম্পাদনা করিয়াছেন। পরে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে অধ্যয়ন ও রচনার সহিত তাঁহাকে বিশেষভাবে জড়িত হইতে হইয়াছে। আমেরিকায়

বেদান্ত প্রচারেও কয়েক বৎসর নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মিশনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র দিল্লী আশ্রমের অধ্যক্ষ। বইখানি মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত কিন্তু দিল্লীতে মুদ্রিত। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলা যায়। গ্রন্থটি জিজ্ঞাসু পাঠকের নিকট নূতন জ্ঞান ও চিন্তার আকর হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

—শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

কিছু ভক্তি কিছু ভাবনা—নীলিমা লাহিড়ী। প্রকাশক: সান্যাল অ্যাণ্ড কোং, ৮৫, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯। (১৩৮৯), পৃঃ ৫+২২০, মূল্য: ১৬·০০ টাকা।

লেখিকার কথা দিয়েই শুরু করি। ভূমিকায় তাঁর স্বীকারোক্তি: "ভক্তি ছিল, এবার ভাবনা করতে শিখলাম।" যথার্থ। তাঁর সেই ভাবনার ফসল হল—ঈশ্বর-সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার উপর তেরটি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে গ্রথিত আলোচ্য এই গ্রন্থটি।

আলোচ্য গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই তার অন্তর্ধেয় বিষয়বস্তু অনেকখানি অনুনাদিত। আশা করি, পাঠক-সাধারণের কাছে গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হবে। ভক্ত ও ভগবান্, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজীর চিন্তাধারাই তাঁর আলোচনায় মুখ্যতঃ পরিপ্রেক্ষিত উপসংহারে রবীন্দ্রভাবনা আলোচিত।

আলোচ্য গ্রন্থটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মধ্যে বহু অসংগতি, বিতর্কিত ও অসত্য তত্ত্ব এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বর্তমান। তার মধ্যে এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি: "আজকের যুগে মানবতার দিক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা বলতে গেলে মানুষের ভোগ ও লালসাবৃত্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে হয়।" (পৃঃ ১৫৯)। "তাঁর [জয়দেবের] কাব্যেই প্রথম রাধা এবং কৃষ্ণের নাম উল্লেখ রয়েছে।" (পৃঃ ১৬১)। "শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসের এই ভিত্তি উনিশ শতকে শিথিল হয়ে যায়।" (পৃঃ ১৬৬)। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত মুক্তির (?) বাণী প্রসঙ্গে লেখিকা বলছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—[মুক্তির পথ] "এ পথ ব্রহ্মের উপাসনার মধ্য দিয়ে জ্যোতির্লোকের পথ। এ পথের পথিক সবাই হতে পারে, এই ছিল তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] ধ্যান-ধারণা।" (পৃঃ ১৭৪)। "জ্ঞানের সোপান দিয়ে পরমাত্মায় প্রবেশ করার যে সাধনা তা কৃত্রিম কর্মের পথে সাধন করা যায় না, এই কথাই বারে বারে উচ্চারণ করেছেন রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁরই উত্তরাধিকারীসূত্রে স্বামী বিবেকানন্দ।" (পৃঃ ২১৪)। ইত্যাদি ইত্যাদি লেখিকার কাছে আশা রাখি ত্রুটিবিচ্যুতি-মুক্ত পরবর্তী সফল সংস্করণের। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথোপযুক্ত।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

আসাম হাঙ্গামা-ত্রাণ: ফেব্রুআরি, ১৯৮৩ হইতে আসামের অভয়াপুখুরি, চাপাই, ধোলা, শান্তিপুর ও খৈরাবাড়ি শিবিরে আশ্রিত ৪৮টি গ্রামের ২১,৩৩২ জন দুর্গত নরনারীর মধ্যে বিতরিত ত্রাণসামগ্রীর তালিকা :

২০০০টি ধুতি, শাড়ী ৩৫০০টি, চাদর ২২০০টি, ১২,০০০ পোশাকাদি, খাদি শার্ট ৫০০টি, ১,৭০৭টি গেঞ্জি, ৭৭টি লণ্ঠন, কেরোসিনের বাতি ২০০টি, ৩১টি পশমী কম্বল, পুরাতন বস্ত্রাদি ১০০০টি এবং গৃহস্থালীকার্যে ব্যবহারোপযোগী পাত্র ইত্যাদি ২৪,৬৮৯টি।

পশ্চিমবঙ্গে গাইঘাটায় ঘূর্ণিবাত্যা-ত্রাণ: গাইঘাটায় সাম্প্রতিক ঘূর্ণিবাত্যায় আশ্রয়চ্যুত নরনারীর মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্য ২৩ এপ্রিল, ১৯৮৩ হইতে স্থগিত রাখা হইয়াছে। পুনর্বাসনকল্পে সরজমিনে তদন্তাদির কাজ শুরু হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির শিলং আশ্রম পরিদর্শন

ভারতের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং গত ১ মে, ১৯৮৩ মেঘালয়ের রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মেহরোত্রার সমভিব্যাহারে শিলং আশ্রম পরিদর্শন করেন।

নিউ ইটানগর কেন্দ্র পরিদর্শন

মাননীয় দালাই লামা গত ৫ মে, ১৯৮৩ অরুণাচল প্রদেশের পূর্তমন্ত্রী শ্রীটি. তাশীর সহিত নিউ ইটানগর কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছেন।

২২ মে, ১৯৮৩ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনীহাররঞ্জন লস্কর এবং অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগেগং আপাং নিউ ইটানগরস্থ রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

১৮ এপ্রিল, ১৯৮৩ দেওঘর বিদ্যাপীঠ পরিচালিত যুবসম্মেলনে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪০০।

*

২৯-৩০ এপ্রিল, ১৯৮৩, রামহরিপুর আশ্রম পরিচালিত যুবসম্মেলনে ১০৯ জন তরুণ-তরুণী যোগদান করে।

কার্যবিবরণী

দিনাজপুর (বাংলাদেশ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ১৯৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :

মন্দিরে নিত্যপূজা-ভজনাদি এবং প্রতি একাদশীতে রামনাম হইয়াছে। জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ, উপনিষদ্, কথামৃত, চণ্ডী, গীতা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী লইয়া নিয়মিত আলোচনা ও বক্তৃতাদি আশ্রমে এবং বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সারা বৎসরই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, দোলযাত্রা, নবান্ন, মহাষ্টমী এবং বুদ্ধ, শংকর, যীশুর আবির্ভাব-তিথি উৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঠাকুর-স্বামীজী ও মায়ের জন্মোৎসবে প্রায় ছয় হাজার দরিদ্র নারায়ণের সেবা করা হয়। আশ্রমের প্রকাশন বিভাগ কর্তৃক দশখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অ্যালোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৪৬ জন চিকিৎসিত হইয়াছেন। ঐ বৎসর মোট রোগীর সংখ্যা ছিল ৪২,৯৩২। আশ্রম-

ছাত্রাবাসের ২০ জন বিদ্যার্থীর মধ্যে ৬ জনের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার মিশন বহন করিয়াছেন। অবৈতনিক পাঠাগারের পুস্তকসংখ্যা ১,৯৬৯। অন্যান্য সেবামূলক কার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—৫৬ জনকে আর্থিক সাহায্যদান ২৭৫৭.৫০ টাকা; ৯ জন দরিদ্র ছাত্রকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ২,৩২৩.১৫ টাকা। ইহা ছাড়া তিন জনকে জীবিকানির্বাহের উদ্দেশ্যে তিনটি সেলাইয়ের কল, দুইজন তাঁতিকে দুইটি তাঁত এবং একজন রিক্সা-চালককে একটি রিক্সা ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য দুইটি নৈশ বিদ্যালয় এবং তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইউ-এস-সি (কানাডা)-র সহায়তায় একটি দুগ্ধবিতরণ প্রকল্পও আশ্রমে পরিচালিত হইতেছে।

উদ্বোধন-সংবাদ

মায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীফলহারিণীকালীপূজা (১০ জুন ১৯৮৩, শুক্রবার) সারারাত্রব্যাপী এক শান্ত উদ্দীপনাময় পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে স্বামী অজজানন্দ সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' শ্রীশ্রীফলহারিণীকালীপূজার তাৎপর্য আলোচনা করেন।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা

সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার গীতা অথবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী বুধানন্দ গত ১১ জুন ১৯৮৩, সন্ধ্যা ৬টায় আকস্মিক হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৫ বৎসর।

৩ জুন তিনি দিল্লী হইতে বেলুড়ে আসেন মঠাধীশ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। ৭ জুন পর্যন্ত তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন। ৭ জুন সকাল হইতে তিনি অসুস্থবোধ করিতে থাকেন। রক্ত-চাপ খুব বেশি বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহাকে ঐ দিন সন্ধ্যায় সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। ৮ জুন হইতে তাঁহার অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। ঐ দিন সকাল হইতেই তিনি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন এবং ১১ জুন সন্ধ্যা ৬টা—শেষনিঃশ্বাসের পূর্ব পর্যন্ত সংজ্ঞাশূন্যই ছিলেন। পূর্ব হইতে তিনি উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্ররোগ এবং নানা উপসর্গে কষ্ট পাইতেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস লাভ করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। সেখানে মঠের বিভিন্ন কাজ ছাড়াও তিনি 'বেদান্ত কেশরী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মাদ্রাজ হইতে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকাস্থিত নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে স্বামী নিখিলানন্দের সহকারি-রূপে প্রেরিত হন। পরে তিনি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো এবং হলিউড কেন্দ্রেও বেদান্ত-প্রচারে নিরত ছিলেন। ১৯৬৭-তে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। দিল্লী ছাড়াও চণ্ডীগড় ও মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে অতঃপর তিনি সঙ্ঘের সেবা করেন। তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে গিয়াছিলেন ১৯৬৮-এ। পরে তিনি সেখানে অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ১৯৭৬-এ তিনি দিল্লী কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত হন। দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত ঐ কেন্দ্রের সচিব ছিলেন।

তিনি সারাজীবন পড়াশুনা লইয়া কাটাইয়াছেন। সুলেখক ও সুবক্তারূপে তিনি

সকলের পরিচিত ছিলেন। তিনি বহু প্রবন্ধ এবং বেশ কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—'The Mind and Its Control', 'The Saving Challenge of Religion,' 'ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর' প্রভৃতি। বিদ্যানুরাগ ও চিন্তাশীলতার জন্য তিনি সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নিষ্ঠাপরায়ণ অনাড়ম্বর সাধুজীবন এবং মিষ্ট ব্যবহার তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার তিরোধানে সঙ্ঘ একজন মননশীল বিদ্যাচর্চাপরায়ণ সাধুকে হারাইল।

*

গত ১৪ জুন ১৯৮৩, সকাল ৯-০২ মিনিটে ৬৯ বৎসর বয়সে ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমে **স্বামী আদিদেবানন্দজীর** দেহান্ত হয়। সম্প্রতি বৃক্ক-সংক্রান্ত (Kidney) নানা উপসর্গে তিনি কষ্ট পাইতেছিলেন। পূর্বেই সন্ন্যাসরোগাক্রান্ত হইয়া তিনি প্রায় অথর্ব হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি আশ্রমের কাজকর্মের খবরাখবর রাখিতেন। গত মে মাস হইতে তাঁহার বাক্‌শক্তি প্রায় রহিত হইয়া যায়—অবশেষে সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় কয়েক দিন ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করেন। উক্ত কেন্দ্র ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সময়ে বিশাখাপত্তনম্, ম্যাঙ্গালোর ও ব্যাঙ্গালোরের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টী এবং মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য নির্বাচিত হন। কিছুকালের জন্য তিনি মঠ ও মিশনের কোষাধ্যক্ষের পদেও ছিলেন। ১৯৭০ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সহিত পালন করেন।

তাঁহার শাস্ত্র-প্রীতি ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। বিশেষ করিয়া শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দের সহিত যুক্তগ্রন্থকর্তৃত্বে ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যের ইংরেজী অনুবাদের জন্য সুখ্যাত হইয়াছেন। আরও কয়েকখানি শাস্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদ তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

কঠিন রোগগ্রস্ত অক্ষম দেহ লইয়াও তিনি যে অপূর্ব নিষ্ঠার সহিত সঙ্ঘ-সেবা করিয়াছেন, তাহা চিরদিনই স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

প্রয়াত সন্ন্যাসিদ্বয়ের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে অনন্ত শান্তি লাভ করুক—ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

স্যাণ্ডেল বিল (২৪ পরগনা) বিবেকানন্দ পাঠচক্রের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তী উৎসব গত ২৭ ফেব্রুআরি ১৯৮৩, কনকনগর *সৃষ্টিধর* ইন্‌স্টিটুশন-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা প্রভৃতি হয়।

বাঁকুড়া জেলার গদারডিহি অঞ্চলস্থ পুরুনিয়া গ্রামে প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৫ ও ৬ মার্চ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতি হয়। সভায় স্বামী ধৃতাত্মানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চৌধুরী ও অধ্যাপক শ্রীরথীন্দ্রমোহন চৌধুরী

খিদিরপুর (কলিকাতা) 'সুরবিতানে' গত ১৬ মার্চ, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে সংস্থাশিল্পিবৃন্দ কর্তৃক ভক্তিগীতি পরিবেশিত এবং ধর্মসভা আয়োজিত হয়।

বেহালা (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে ১৯ মার্চ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ছায়াচিত্র 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। ধর্মসভায়

স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দের সভাপতিত্বে বক্তৃতা করেন শ্রীঅনাদিনাথ সিংহ ও শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

আলিপুরদুয়ার (জলপাইগুড়ি) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৬ হইতে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ১৪৮তম জন্মোৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী ঋদ্ধানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর ও শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। এই শুভদিনে আশ্রমের 'হোমিও সেবা-চিকিৎসালয়' উদ্বোধন হয়।

খগৌল (পাটনা) শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গত ৩ এপ্রিল, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব-স্মরণোৎসব পালিত হয়। সান্ধ্য অধিবেশনে ভাষণ দেন স্বামী বেদান্তানন্দ প্রভৃতি

লালগড় (মেদিনীপুর) রামকৃষ্ণ স্বর্গাশ্রমের উদ্যোগে গত ২৪ এপ্রিল, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৮তম জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় স্বামী বিশোকাত্মানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন স্বামী অমলানন্দ।

ইহা ছাড়াও নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে: **কুচবিহার** দিনহাটা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। **বসিরহাট** শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ। **চাকদহ** (নদীয়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ। **রামপুরহাট** শ্রীরামকৃষ্ণ তপোবন। **পশ্চিম রাজাপুর** (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। **ঢাকুরিয়া** (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। **দক্ষিণ দিল্লী** স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী লাইব্রেরী।

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে বার্ষিক উৎসব

৩০ এপ্রিল ও ১ মে ১৯৮৩ হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রথমদিনের বক্তা স্বামী ধ্যানেশানন্দ বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন কিভাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহান চরিত্র আকৃষ্ট করিয়াছে জগতের মানুষকে। ঠাকুর শুধু প্রেমাবতার নন, তিনি স্বয়ং প্রেমস্বরূপ। অপর বক্তা ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা বলেন, 'স্বামীজী তাঁর বৈজ্ঞানিক চেতনায় সমগ্র বিশ্বকে ধরেছেন এবং তাকে প্রসারিত করেছেন পরবর্তীকালের জন্য। বর্তমানে ভারতে বিত্তহীনতা ছাপিয়ে উঠেছে চিত্তহীনতা। বিভ্রান্ত যুবসমাজকে সঠিক পথে নিশানা দিতে পারে স্বামীজীর জীবন ও বাণী।' সভাপতির ভাষণে স্বামী প্রভানন্দ বলেন, 'অবতার মানুষকে নিরানন্দ থেকে মুক্তি দেন। প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেন আনন্দ সংবাদ।'

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা ও প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বলেন, 'বিবেকানন্দ-সমুদ্রে অবগাহন না করলে পূজা সম্পূর্ণ হবে না। বিবেকানন্দ মানবত্বকে দেবত্বে উন্নীত করতে চেয়েছেন, দেবত্বকে মানবত্বে নামিয়ে আনতে চাননি। আত্মিক সাম্যই যথার্থ সাম্য, অর্থনৈতিক যথার্থ সাম্য আনে না। বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য তিনি হৃদয়কে উৎপাটিত করতে প্রস্তুত ছিলেন।'

প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন সম্বন্ধে বলেন, 'ধর্মসংস্থাপনের জন্য ঈশ্বর নিয়ে এসেছেন তাঁর নিজ শক্তিকে। ঠাকুরের মাতৃভাব বিকাশের ক্ষেত্রে মায়ের তুলনা নেই। মানুষের পাপকে মা গ্রহণ করেছেন পরম স্নেহে। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা বলেন, 'ঠাকুরের কথা—সত্য কথাই কলির তপস্যা। যা আজকের ব্যাধির হাত থেকে মানুষকে রেহাই দিতে পারে। আজকের অনাচারের যুগে সকলের, বিশেষ করে মেয়েদের ত্যাগের ভাবটি দরকার।' শ্রদ্ধাপ্রাণাজী আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আজ যখন চতুর্দিকে অসত্য ও স্বৈরাচার—তখন ভক্তমণ্ডলী, বিশেষ করে মায়েরা কেন জেগে উঠছেন না? জননী গান্ধারী পুত্র হলেও দুর্যোধনকে ক্ষমা করেননি, তাই আজও গান্ধারী অমর।' সভা শেষে ধন্যবাদ দেন আশ্রম-সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।



৮৫তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৯০

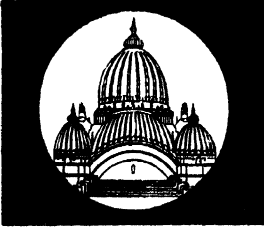
দিব্য বাণী

ঠাকুর···প্রসন্নমুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"গুরুভক্তি কেমন জান? গুরু যা বল্‌বে, তা তখনি দেখতে পাবে—সে ভক্তি ছিল অর্জুনের।···শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁর এত বিশ্বাস-ভক্তি যে, যেমন যেমন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অর্জুনও তখন ঠিক ঠিক তা দেখতে পেলেন।"

শাস্ত্র যাঁহাকে অজ্ঞানান্ধকার-দূরীকরণসমর্থ গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা পূর্বোক্তরূপে ঐশ্বরিক ভাববিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা এই,—গুরু অনেক নহেন, এক। আধার বা যে যে শরীরাবলম্বনে ঈশ্বরের ঐ ভাব প্রকাশিত হয়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, তোমার গুরু আমার গুরু পৃথক্ নহেন—ভাবরূপে এক। মৃন্ময়মূর্তিতে দ্রোণকে আচার্যরূপে গ্রহণ ও ভক্তিপূর্বক একলব্যের ধনুর্বেদলাভ-রূপ মহাভারতীয় কথাটি ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে। অবশ্য একথাটি যুক্তিতে দাঁড়াইলেও ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হওয়া অনেক সময় ও সাধন-সাপেক্ষ; ···যতক্ষণ মানবের নিজের দেহবোধ থাকে, ততক্ষণ যে শরীরের ভিতর দিয়া গুরুশক্তি তাহাকে কৃপা করেন, সেই শরীরাবলম্বনেই শ্রীগুরুর পূজা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ঠাকুর এই কথাটির দৃষ্টান্তে নিষ্ঠা-ভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন হনুমানের কথা আমাদিগকে বলিতেন।

—স্বামী সারদানন্দ

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব—পূর্বার্ধ, তৃতীয় অধ্যায়]



কথাপ্রসঙ্গে

'ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্'

সুপ্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি প্রচারিত মানুষের ধর্মসাহিত্যে যাঁহার চিন্তাধারা সর্বাধিক স্বীকৃত, আমরা তাঁহাকেই আজ স্মরণ করিতেছি। প্রবহমান বাতাসের মতো তাঁহার ভাব বিশ্বের সকল আকাশে, আবার রূপহীন বায়ুর ন্যায়ই তিনিও অধিকাংশের চোখে অদৃশ্য। কয়জন তাঁহার নাম মনে রাখিয়াছেন? বাতাস যেমন সকলের প্রাণ, মানুষকে মানুষরূপে বাঁচিবার জন্যও তেমনই ঐ মহামানবের প্রদত্ত শিক্ষা প্রাণস্বরূপ—মানবের জীবনীশক্তি। ইঁহার নিকট প্রাপ্ত মন্ত্রই মানবজাতির আধ্যাত্মিক বল—ইষ্টপথের আলোক-বর্তিকা। মানবের আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের কথাই বলিতেছি আমরা। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে এমনই আষাঢ়ের এক পূর্ণিমাতে তিনি মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত কত পূর্ণিমাই আসিয়াছে ও গিয়াছে, কিন্তু বিশেষ সেই আষাঢ়-পূর্ণিমাটি কিন্তু মানুষের হৃদয়-পঞ্জিতে আজও চিহ্নিত রহিয়াছে গুরু-পূর্ণিমারূপে। ব্যাস-পূর্ণিমা বলিয়াও ইহা সম্মানিত। মানবধর্মের মহাদীক্ষক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে আমরা এই পুণ্য-তিথিতে গভীর শ্রদ্ধাসহ প্রণতি জানাইতেছি।

মানুষের ইতিহাস যেমন বিশাল, তেমনই বিচিত্র। মানুষেরই মাঝে বেদ আবির্ভূত—অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসমষ্টি মানুষেরই অক্ষয় সম্পদ্। কিন্তু হায়, সেই অনন্ত অত্যুজ্জ্বল বেদও তো ছিল মাত্র ঋষিদের অনুভূতিতে লুক্কায়িত—তাঁহাদেরই শিষ্য-পরম্পরাক্রমে শক্তিমান সুযোগ্য কয়েকজন আধি-কারিক ব্যক্তিদের মহার্ঘ সঞ্চয়রূপে। অযুতকোটি বিশ্বমানবের জন্য কে-ই বা তখন ভাবিয়াছেন,—বিপুলায়তন সমাজের কথা কে চিন্তা করিয়াছেন? শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই ইতিহাসে সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি পরের জন্য চিন্তা করিয়াছেন,—বৃহৎ জন-সমাজের অজ্ঞানান্ধকার মোচনে সর্বাগ্রে অগ্রণী হইয়াছেন। জনগণের নয়নে তিনিই প্রথম জ্ঞানের অঞ্জন লাগাইয়া দৃষ্টি উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন,—তাই তিনিই মানবের প্রথম ও প্রধান গুরু।

আর্য ঋষিগণের ধ্যানলব্ধ জ্ঞানরাশিকে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন মানবহিতার্থে সঙ্কলন ও সুবিভক্ত করিয়া ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই বেদচতুষ্টয়াকারে জগতে প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। নিজের চারজন সুযোগ্য প্রিয় শিষ্যকে চতুর্ধা-বিভক্ত ঐ বেদবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তাঁহাদেরই উপর ভার ন্যস্ত করেন, যাহাতে সর্বসাধারণের নিকট ঐ জ্ঞানালোক অবাধে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা হয়। ঋষিগণের হৃদয়গুহা হইতে সত্যকে সর্বপ্রথম বাহিরে সর্বমানবের গৃহাঙ্গনে আনিয়া দিলেন যিনি—মানবের জ্ঞানদাতা গুরু তিনিই বেদব্যাস। অসীম জ্ঞানরাশি বেদকে মানবের গ্রহণোপযোগী করিয়া বিন্যাস ও বিভাগ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি 'ব্যাস'।

বেদসঙ্কলয়িতা ব্যাস মুমুক্ষু মানবের জন্য ঐ বেদসত্যের সার নিষ্কর্ষও স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া দিলেন, যাহা ব্রহ্মসূত্র নামে সুপরিচিত। মানুষ ব্রহ্মবিদ্যালোক লাভের অধিকারী হইল—জন্ম-জরা-মৃত্যুর অতীত আরও কিছু অস্তিত্ব-বার্তা তাহার ঘরের দরজায় আসিয়া পৌঁছিল। বেদের

অন্ত—বেদের শেষ—পরম ও চরম যে সংবাদ, তাহারই স্বল্পাক্ষর আখ্যা 'বেদান্ত'। এই বেদান্ত বা ব্রহ্মবিদ্যারই আরও সংক্ষিপ্ত কাব্যমণ্ডিত নাম 'উপনিষদ্',—যে-হেতু ইহা দ্বারা অজ্ঞানের নিঃশেষে অবসান হয়,—নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে উপনীত হওয়া যায়। মানব এই ভাবেই বেদ-ব্যাসের করুণায় বেদান্তের বা উপনিষদের জ্ঞান-লাভের সুযোগ পাইল।

বেদব্যাসের তখনও বিশ্রাম মিলে নাই—তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ত্রিতাপ-তাপিত স্বল্পায়ু সামাজিক জীবের জন্য প্রয়োজন সহজ ব্যবহারিক উদাহরণ ও প্রয়োগ-কুশলতা, যাহার মাধ্যমে উক্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে অনায়াসে প্রত্যক্ষ করা চলে। মহর্ষি বেদব্যাস সে-প্রয়োজনের তাৎপর্য উপলব্ধি করিলেন—রচিত হইল পঞ্চম বেদ, সর্বজনবোধ্য জ্ঞান-ভক্তি-ধ্যান ও কর্মের অমৃত নির্ঝর মহাভারত, যাহার সূচনায় তিনি নিজেই বলিয়াছেন :

'ভগবন্! এ আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিলাম, যাহাতে আছে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্, এই সকলের সার সঙ্কলন,—ইতিহাস পুরাণের অনুসরণ—অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ; জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব ইত্যাদির নির্ণয়;—বিবিধ ধর্মকর্ম ও আশ্রমের লক্ষণ নিদর্শন; চাতুর্বর্ণ্য বিধান—তপস্যা ব্রহ্মচর্য—পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতির বর্ণন। ভূতভাবন শ্রীভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য অথচ মনুষ্যরূপে দেহধারণ করিয়া থাকেন তাহার তত্ত্বব্যাখ্যান; অতি পবিত্র দেবক্ষেত্র ও তীর্থস্থানসমূহের মাহাত্ম্যও কীর্তন করিয়াছি।'

এই মহাভারতেই সর্বশাস্ত্রসার, সর্বোপনিষদের মর্মবাণী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সংগ্রথিত। মানব-সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসেরই অপূর্ব জীবপ্রেম ও উদ্বেল লোকহিতাকাঙ্ক্ষা ভগবদ্গীতায় বাণীরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। শ্রীভগবানের মুখ-নিঃসৃত মন্ত্রগুলি তো ব্যাসেরই হৃদয়-নিষ্কাসিত। মানব-সমাজের সকল শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই মুক্তির দ্বার উন্মোচিত হইল। গীতোক্ত মুক্তিমন্ত্রে সন্ন্যাসী-গৃহী, জ্ঞানী-কর্মী, ধ্যানী-ভক্ত সকলকেই সমান অধিকার ও আশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছে। মানুষ তাহার স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে এইভাবেই সর্বপ্রথম প্রেরণা পাইয়াছিল। সর্বাগ্রণী সেই প্রেরয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। সংসারবদ্ধ জীবের মুক্তি-মন্ত্রের আদি গুরু তিনি।

উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—এই তিনের সমন্বয়ে সংগঠিত আমাদের চিরন্তন বৈদিক শাস্ত্র, মানবজীবনের পরম লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে যাহা অপরিহার্য পথস্বরূপ। তাই এই তিন শাস্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত নাম—'প্রস্থানত্রয়'। উপনিষদ্সমূহ শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র ন্যায়প্রস্থান এবং শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা হইতেছে স্মৃতিপ্রস্থান। সনাতন এই প্রস্থান-ত্রয়ের মহান্ প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস।

লোককল্যাণচিকীর্ষু ব্যাসের চিত্ত কিন্তু প্রস্থানত্রয় প্রণয়নের পরেও শান্ত হইতে পারে নাই। সংসারাসক্ত সাধারণ জীবের জন্য মঙ্গল-চিন্তায় তিনি তখনও উন্নিদ্র,—যেন তাঁহার সকল প্রয়াস অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। খিন্নমনা মহর্ষি নিরন্তর মানবের হিতচিন্তায় অস্থির হইয়া আছেন,—এমন সময়ে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয় দেবর্ষি নারদের সহিত। ব্যাসদেবের নিরানন্দ মুখশ্রী নারদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাঁহারই প্রশ্নের জবাবে ব্যাসদেব প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই যে, তাঁহার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল ব্যাকুল হইতেছে কোন অসমাপিত কর্মের গ্লানিবোধে। শ্রীনারদ তখন সবিনয়ে পরামর্শ দিয়াছিলেন—উচ্চতর যে-তত্ত্বকে তিনি প্রস্থানত্রয়ে ব্যক্ত করিয়াছেন, উহাকে শ্রীভগবানের লোকপাবন চরিতকথায়—লীলারসে জারিত করিয়া আরও সুপাচ্য করিতে। ব্রহ্ম-

জ্ঞানকে হরিভক্তির সংমিশ্রণে অধিকতর স্বাদু ও উপাদেয় করিয়া বিশদ না করিলে সাধারণ অল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে উহা অনায়াসসাধ্য হইবে না। ব্যাসদেবকে তিনি আরও বলিলেন: 'যেনৈবাসৌ ন তুষ্যতে মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্।'—আপনার প্রণীত ধর্মদর্শনাদি এই কারণেই অসম্পূর্ণ মনে হইতেছে। হে বিপুলকীর্তে! আপনিও ভগবদ্‌লীলাকথা সংযুক্ত করিয়া জীবের জ্ঞাতব্য তত্ত্বকে পূর্ণতা দান করুন—আপনার আরব্ধ কর্মকে সম্পূর্ণ হইতে দিন। 'ত্বম্ অপি অদভ্রশ্রুত! বিশ্রুতং বিভোঃ সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতং প্রখ্যাহি···।'

শ্রীনারদের যুক্তি মহর্ষি বেদব্যাসের চিত্তকে শান্ত করিয়াছিল—তিনি তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রণার সঠিক হেতু খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। 'বিভু-লীলা বর্ণনা করুন'—'বিভোঃ বিশ্রুতং প্রখ্যাহি', এই নারদবচনই ব্যাসদেবের সর্বশেষ কীর্তিকর অবদান শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণ রচনার সাক্ষাৎ উদ্দীপক কারণ। এই ভাবেই সর্ববেদান্তসার শ্রীভাগবত লাভ করিয়া মানবকুল ধন্য হইল। আর শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নেরও মানবহিত-প্রকল্পের পূর্ণতা সম্পাদিত হইল এখানেই। সমুদ্রের মতো গভীর এবং আকাশের ন্যায় উদার হৃদয় ছিল বলিয়াই তো দেবর্ষি নারদ কর্তৃক 'অদভ্রশ্রুত' বলিয়া তিনি সম্বোধিত,—যুগ যুগব্যাপী মুনি-ঋষি-আচার্যগণ তাঁহাকেই মানব-গুরু বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছেন। আজও অবধি ব্যাসের আবির্ভাব-তিথি আষাঢ়-পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয় ভারতের সর্বত্র,—সকলেরই গুরুপূজার পুণ্যদিন রূপে।

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের উল্লিখিত অবদানগুলি কাহারও অজানা নহে,—মানব-ধর্মের সর্বোত্তম সম্পদ্ আমরা ঐ অবদানরাশির মাধ্যমেই পাইয়াছি। উহা না পাইলে, মনুষ্য সমাজ আজ কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড়াইত, তাহা কল্পনা করাও চলে না। আমাদের যাবতীয় ধর্মপ্রণালী, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাণ, ভূগোল, ইতিহাস—ব্যাসের স্পর্শ-লালিত সকলেই। তাই ভারতে একটি প্রবাদ শোনা যাইত—'ব্যাসোচ্ছিষ্টমিদং সর্বম্'। চিন্তারাজ্যের সকল কিছুই যেন ব্যাসোচ্ছিষ্ট হইয়া আছে,—অর্থাৎ ব্যাসের মুখে উচ্চারিত হয় নাই, এমন কোন ভাবই নাই। উত্তরকালীন শাস্ত্রকারগণ যেন চর্বিত চর্বণ করিয়াছেন মাত্র। এই কারণেই আষাঢ়ের এই ব্যাস-পূর্ণিমাতে গুরুপূজার প্রবর্তন অতি স্বাভাবিক নিয়মেই প্রবর্তিত হইয়াছে,—এবং ততোধিক তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই পূজার প্রবর্তক আর কেহ নহেন, স্বয়ং ভগবান্ শঙ্করাচার্য। পরবর্তী কালে দেখি, গুরু-পূর্ণিমাতে ব্যাসপূজা করিতেছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও। এতাবৎ কাল ভারতবর্ষের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যেই মাত্র—বিশেষতঃ উত্তরাখণ্ডের ত্যাগিমণ্ডলীতেই এই গুরু-পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের ব্যাপারটি নিষ্ঠা সহ পালিত হইতেছিল। কিন্তু ইদানীং লক্ষ্য করা যাইতেছে, উহা হিমালয় ছাড়িয়া ক্রমে সমতলেও পরিবিস্তার লাভ করিতেছে। অর্থাৎ গুরু-পূর্ণিমা এখন আর কেবল সন্ন্যাসিগণেরই নহে, দীক্ষিত গৃহস্থ ভক্তকুলেও ক্রমে অবশ্য-উদ্‌যাপনীয় একটি কৃত্যরূপে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পাইতেছে। যদিও ভক্তগণ ঐ তিথি-উৎসবের তাৎপর্য কতখানি অবহিত, তাহা বুঝা কঠিন। হয়তো বা মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকেরই তেমন স্পষ্ট ধারণা নাই। তবে ভরসা এই যে, ভগবদ্‌বাক্য বৃথা হইবার নহে। তিনি গীতামুখে আশ্বাস দিয়াছেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' উহাও আমরা ব্যাস-প্রসাদেই জানিতে পারিয়াছি।

*

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা, সহজ হইয়াও জটিল আকারে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায়: বেদব্যাসের

যাহা অবদান তাহা তো নিঃসন্দেহে হিন্দু ধর্মেরই সারতত্ত্ব, হিন্দুর জীবন-মান উন্নয়নকর সুনির্দিষ্ট পন্থা। তবে আর তিনি সমগ্র মনুষ্য জাতির গুরু হইলেন কিরূপে? একটি বিশিষ্ট ধর্মকে পরিপুষ্ট তিনি করিয়াছেন,—উহার পরিরক্ষণের জন্যও অতুলনীয় কৃতিত্ব তিনি দেখাইয়াছেন। সবই ঠিক। কিন্তু তাহাতে জগতের কি হইল? উত্তরে বলিতে হয়—না, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কোন ধর্মমতবিশেষকেই মাত্র সঞ্জীবিত করিয়া যান নাই, শুধু উহাতেই কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। তিনি নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্জন করিয়াছেন মানব-হিতার্থে,—মনুষ্য ধর্মের বিকাশকল্পে,—সারা জগতের জীব-কল্যাণে। তিনি একটি ধর্মমতের বা সম্প্রদায়ের প্রণেতা বা পোষক ছিলেন না;—তিনি ছিলেন সনাতন ধর্মাদর্শের সংস্থাপক, প্রাণসঞ্চারক ও নির্দেশক।

ভারত ঋষি-মুনির তপস্যাস্থল,—মহাপুরুষগণের পবিত্র আবাসভূমি। কিন্তু হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে পল্লীর জনপদ পর্যন্ত এমন সহজ বিচরণ—সুবিশাল রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটির অবধি, দেব-দেউল হইতে কৃষি-ক্ষেত পর্যন্ত, তীর্থ হইতে কর্মশালা পর্যন্ত, ধ্যানীর গম্ভীর ধ্যানাসন হইতে গৃহাঙ্গনের তুলসীমঞ্চটি পর্যন্ত, সর্বত্র এরূপ সমান প্রভাব ইতিহাস আর কদাপি দেখিয়াছে কি? বস্তুতঃ ভারতবর্ষের পুরাণ-ইতিহাস তো কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসেরই চরিতকথা—তাঁহারই জীবনকাহিনী। আর সেই জীবনের গতি কোন দেশ-কাল-জাতির সীমায় আবদ্ধ হয় নাই,—উদার উন্মুক্ত ছন্দে সারা পৃথিবীর সকল মানুষের বক্ষ-স্পন্দনের সহিত মিলিয়া এক অভূত-পূর্ব ঐকতান সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে। জানিতে ইচ্ছা হয়, কোথায় ইহার রহস্য।

পৃথিবীতে যত রকম ধর্ম বা ধর্মশাস্ত্র আছে, উহাদিগকে একত্র করিয়া দেখিলে বহুবিচিত্র উপদেশ, নীতি ও অনুশাসন আমাদিগের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি অপূর্ব সংবাদ আমরা পাইতে পারি, তাহা এই যে, বৈদিক বা অবৈদিক সকল ধর্মেরই মূল সুরটি কিন্তু সদা অবিরোধী। সেই সুরের প্রতি কান পাতিলে দুইটি মাত্র ধ্বনি আমরা শুনিব—যাহা সর্বাধিক অনুরণিত: পুণ্য ও পাপ। পাপকে না বুঝিলে পুণ্যকে জানার উপায় নাই—পুণ্যে উপনীত হইবার পন্থাও নির্ণয় হইবে না। তাই সকল ধর্মাচার্যগণই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেশ-কালোপযোগী ভাষায় এই পুণ্য-পাপের অর্থ নিরূপণ করিয়া আসিতেছেন। পাপ হইতে বিরত হইয়া পুণ্যে নিরত থাকিবার অভ্যাসই, সরল কথায় ধর্মাচরণ। এ-সম্পর্কে সকলের অনুশাসনই মোটামুটিভাবে পরস্পর অবিরুদ্ধ;—ভাষায় বা ব্যাখ্যান-রীতিতে আপাত-জটিলতা যতই থাকুক না কেন ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই সর্বপ্রথম আচার্য যিনি ধর্মতত্ত্বের সকল বৈষম্যের সহজ সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ জীবনের সাধন ও কর্মে ইহাই সোচ্চার হইয়াছে যে, পরোপকারই পুণ্য এবং পরপীড়নের নামই পাপ। ব্যাস-প্রণীত সকল শাস্ত্রে ও পুরাণে এই দুইটি শব্দেরই বিচিত্র ব্যঞ্জনা আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করে।

'সর্বশাস্ত্র-পুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥

বর্তমান যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দও পুনঃ পুনঃ এই কথাই উচ্চারণ করিয়াছেন। আমরা তাই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকে মানবগুরু বলিয়া পূজা না করিয়া পারি না। তাঁহার ধর্ম কোন 'মত' নহে, কোন সম্প্রদায়ের 'বাদ' নহে। লোকগুরু ব্যাসের ধর্ম সমগ্র বিশ্বমানবের হিতের জন্য। মানুষকে মানুষরূপে টিকিয়া থাকিবার জন্য—মানুষকে দেবত্বে উন্নীত হইবার জন্য। ইহা

মানুষের আত্মোপলব্ধির ধর্ম।

প্রাচীন যুগের অভিজ্ঞতারাশিকে সম্মুখে রাখিয়া, বর্তমান কালের মনুষ্য সমাজে দাঁড়াইয়া আমরা ইহা আরও জোরের সহিত বলিতে পারি যে, পরহিত বা সেবা অপেক্ষাও উচ্চতর ধর্মানুশীলন এখনকার বহুদ্বন্দ্বিত জীবনযাত্রায় ভাবাই যায় না। এই সর্বমানবিক ধর্মের উদ্‌গাতা হইতেছেন স্বয়ং ব্যাসদেব। আমরা যে-দুইটি ব্যাস-বচন পূর্বে উল্লেখ করিলাম—উহাদের উভয়কেই সমন্বিত করিয়া মাত্র এক-শব্দেও প্রকাশ করা চলে: 'সাহায্য' বা 'দান'। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার জাফ্‌না-অভিনন্দনের উত্তরে আবেগজড়িত কণ্ঠে তাহাই বলিয়াছেন:

'এখন আমি বর্তমান যুগের যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এমন একটি বিষয় তোমাদিগকে বলিব। মহাভারতকার বেদব্যাসের জয় হউক! তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"কলিযুগে দানই একমাত্র ধর্ম।"···এ যুগে বিশেষ প্রয়োজন দান—অপরকে সাহায্য করা।'

অবশ্য ইহাও এখানে সুস্পষ্ট থাকা উচিত যে, এই 'দান' বা 'সাহায্য' অনেক প্রকারেই করা যাইতে পারে। কাহাকেও সাহায্য করার অর্থ তাহার অভাব মিটানো—তাহাকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে সহায়তার হাত বাড়াইয়া দেওয়া। অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা প্রদান অথবা সাংসারিক বিপদে-বিপর্যয়ে পার্শ্বে দাঁড়ানো,—সবই সাহায্য বা সেবা ঠিকই। কিন্তু এই ভাবের সেবায় সাময়িক কিছু কাজ হইলেও, অভাব থাকিয়াই যায়। সুতরাং পরোপকার, দান, সাহায্য বা সেবারও উচ্চাবচ স্তর অবশ্যই রহিয়াছে। স্বামীজী উল্লিখিত বক্তৃতায় তাহাও স্পষ্ট করিয়া জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

'দান শব্দে কি বুঝায়? ধর্ম দানই শ্রেষ্ঠ দান; তারপর বিদ্যা দান, তারপর প্রাণ দান; অন্নবস্ত্র-দান সর্বনিম্নে। যিনি ধর্ম দান করেন, তিনি আত্মাকে অনন্ত জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন।···আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান অপেক্ষা অন্যান্য সব কাজ নিম্নস্তরের। আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিলেই মনুষ্য জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা হয়।'

'ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্'—পরোপকার ও পরদুঃখ-কাতরতা,—যাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে দানে ও সেবায়—তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ মানবধর্ম। সমগ্র ব্যাস-সাহিত্যে এই সুরটিকেই ঝঙ্কৃত শুনিতে পাই আমরা। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাই কেবল-মাত্র অতীত যুগেরই নহে, সর্বাধুনিক কালেরও বরণীয় ধর্মগুরু।

*

বৈদিক ধর্মমতসমূহের উচ্চতম অদ্বৈত হইতে বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত পর্যন্ত সকল ভাবগুলিই এক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের হৃদয়-গোমুখী হইতে উৎসারিত। ইহাও একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যাহার জন্যও তিনি বৈদিক সাধককুলের পরম গুরুরূপে চিরদিন বন্দিত হইবেন। সূত্রাকারে সৃষ্ট ব্রহ্মসূত্রেরই ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাধক তাঁহাদের নিজ নিজ ভাবের সন্ধান ঐ সূত্রমধ্যে পাইয়া তাহাই জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এইভাবেই অধিকারী ভেদে নানা পথের সাধন-সুবিধাও মানুষ পাইতেছে ব্যাসেরই কারুণ্যে। মনে পড়িতেছে, সহস্র দ্বীপোদ্যানে বাসকালে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন খুব দৃপ্ত কণ্ঠে বলিতেছিলেন—'ব্যাসের দর্শন বিশেষভাবে উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি সূত্রাকারে অর্থাৎ যেমন বীজগণিতশাস্ত্রে খুব সংক্ষেপে কয়েকটা অক্ষরে ভাব প্রকাশ করা হয়, তেমনি ভাবে এটা লিখেছিলেন···।···ঐ এক সূত্র থেকেই দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের উৎপত্তি হল। এই অদ্বৈতবাদই বেদান্ত-কেশরী।'

স্বামীজীর ভাবালোকে আমাদের কাছে ব্যাসের চিত্রখানি উজ্জ্বলতর হইল। বুঝিলাম, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই অধ্যাত্ম জগতের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ তত্ত্ব অদ্বৈত-বেদান্তের জনয়িতা পরমর্ষি আচার্য—গুরু। ব্যাস-বাক্যই সনাতন ধর্মশাস্ত্র।

আষাঢ়ের পূর্ণিমা—ব্যাসাবির্ভাবকে স্মরণ করায়। তাই আমাদের গুরু-পূর্ণিমা। ব্যাস-বাক্য আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন-পথের দীপালোক—পথহারার দরদী দিশারী, বিপন্নের রক্ষাকবচ, পীড়িতের মহৌষধ, ত্যাগীর আশ্রয়, ব্যথিতের শান্তি-মন্দাকিনী। ব্যাস অমর। তাঁহার স্থূল-দেহের অন্তর্ধান হইয়াছে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে, তথাপি তিনি চিরজীবী হইয়া বর্তমান আছেন ও ভাবীকালেও থাকিবেন। যতকাল বেদ-বেদান্ত বিদ্যমান ততকাল ব্যাসও বর্তমান। ভারতের হিমালয়-গঙ্গা-যমুনা-নর্মদা নদ-নদী-তীর্থ সকলই বেদব্যাসের স্মৃতি বিমিশ্রিত। মানবের মানবত্ব যতকাল—জ্ঞানপ্রদাতা ব্যাসও ততকাল মানবের প্রাণে অনির্বাণ প্রদীপশিখাটির মতো জাগরূক থাকিবেন। অগণিত বিশ্বমানবের সহিত আমরাও কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরু-প্রণাম করিতেছি :

'নমোঽস্তু তে ব্যাস! বিশালবুদ্ধে!
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র!
যেন ত্বয়া ভারত-তৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥'

কৃপা

ব্রহ্মচারিণী অজিতা

শরতের সুস্নিগ্ধ প্রভাত।
শ্যাম দূর্বাদলের উপর চিক্‌চিক্ করছিল
মুক্তোর মতো কয়েক বিন্দু শিশির,
ক্ষণায়ু জীবন তাদের!
ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই
কেউ গেল শুকিয়ে, কেউ পড়ল ঝরে
কেউ বা দলিত মথিত হল
অচেনা পথিকের পদতলে।
একটা ছোট্টো ফোঁটা তখনও টলটল করছিল
এমন সময় উদয় গিরিচূড়ে
দেখা দিল সোনার রথখানি,
হিরণ্ময়ের অমৃত-কিরণ স্পর্শে
মুছে গেল জড়তার গ্লানি,
সুপ্তা ধরণী আনন্দে উঠল জেগে
বক্ষে তার প্রাণের সম্ভার।
ছোট্টো এক ফোঁটা নগণ্য এক শিশিরকণা,—
না আছে তার হীরক-দ্যুতি,
কিংবা প্রস্তর-কঠিন স্থিতি,
অথবা বায়ুর অবাধ গতি
হায়! তবু বঞ্চিত হল না সে,—
ভাস্করের ভাস্বর জ্যোতিতে
সেও উঠল ঝলমলিয়ে,
তুচ্ছ এক বিন্দু জল
পূর্ণের পুণ্য-পরশনে
সেও পেল অমৃতের স্বাদ;
নীরব মৌন ভাষায় বলে
উঠল—'ধন্য আমি'! 'ধন্য আমি'!
তারপর।—
শেষ হল তার ক্ষণকালের আয়ু
ধীরে অতি ধীরে মিলিয়ে গেল
ছোট্ট শিশিরকণাটুকু,
যেখান থেকে একদিন এসেছিল
এই ধূলার ধরণীতে,
বুঝি আবার ফিরে গেল সেই উৎসে,—
সেই অনন্ত অমৃত-লোকে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার শ্রীঅক্ষয়কুমার সেনকে লিখিত]

ডাকের শীলমোহর-ছাপ : ৬ মে, ১৮৯৭

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মভরসা

Triplicane
Madras

My dear Master,

তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া বড় আনন্দ হইল। তত্ত্বমঞ্জরী বাহির হইতেছে শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। মাঝে ২ লিখিতে চেষ্টা করিব। ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধ ভারত যথাসময়ে যাইবে। তোমরা তাহাদের Office-এ exchange copy পাঠাইয়া দিও। রামদাদা ও মনোমোহন বাবুকে আমার অসংখ্য দণ্ডবৎ নিবেদন করিও এবং তুমি ও অন্যান্য সকল ভক্তে আমার প্রণাম ও ভালবাসা জানিও। এখানে একরকম কায চলিতেছে মন্দ নয়। এখানকার লোকেরা বড় ভক্ত। রামদাদাকে বলিয়া তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের জীবনী ও তাঁহার যাবতীয় lecture এবং শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের উক্তি যদি পাঠাইতে পার তো বড় ভাল হয়। আমি ঐ সকলের কিছু ২ ইং তরজমা করিয়া ব্রহ্মবাদিন্ প্রভৃতি কাগজে লিখিব। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
দাস শশী

Babu Akshaya Kumar Sen
C/o B. Ramchandra Dutt,
@ Yogodyana
Kankurgachi
East of Calcutta.

ভারতের পুনর্গঠনে ব্রতী হও

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

[রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ২৬ হইতে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮২ পর্যন্ত পাঁচদিনের আঞ্চলিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলনের উদ্বোধন-সভায় পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজজীর আশীর্বাণী।—সঃ]

আমার তরুণ বন্ধুগণ :

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে আমরা সকলে এখানে সমবেত হয়েছি। তোমরা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছ স্বামীজীর জীবন-বাণী প্রসঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে, আমাদের দেশের পুনর্গঠনের জন্য কোন্ কোন্ ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন এবং কিভাবে সে-সকল ভাবনাকে সার্বিকভাবে প্রয়োগ করা যায়—তা নির্ধারণ করতে। তোমরা জানো যে, দুবছর আগে ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের মঠে একটি মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল, ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রথম মহাসম্মেলনের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমরা কি কি কাজ করেছি এবং স্বামীজীর জীবনাদর্শকে আমরা কতদূর কার্যে পরিণত করতে পেরেছি, তার হিসাব-নিকাশ করা এবং তার ভিত্তিতে আমাদের ভবিষ্যতের কার্যপন্থা নির্ধারণ করা। বিশেষ করে আমাদের দেশের আজকের এই চরম সঙ্কটকালের কথা স্মরণ করে কোন্ পথে এগোতে হবে, তা স্থির করা। এ-সকল বিষয় আলোচনা করে আমরা কয়েকটি ভাবনা-সূত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম। আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, জগতের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান নিধান শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীকে আমাদের দেশের দূর-দূরান্তের গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে, হাটে-মাঠে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাঁর ভাব প্রচার করতে হবে। ঠাকুর ও স্বামীজীর ভাব দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে সকল মানুষ তাঁদের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে।

এই সিদ্ধান্তও করা হয়েছিল যে, শুধুমাত্র ভাবপ্রচার করলেই হবে না। আমাদের দেশের যারা পদদলিত, নিপীড়িত, বহুবিধ অসাম্যের অভিশাপে জর্জরিত তাদের উন্নতিবিধান করতে হবে। তাদের শিক্ষা দিতে হবে। তাদের ঠিকঠিক বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে হবে, যা আশ্রয় করে তারা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তাদের ধ্যান-ধারণার উন্নতি ঘটাতে পারে। আমরা এইসব সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছিলাম। কিন্তু অনুন্নত মানুষদের উন্নত করার উদ্দেশ্যে সমাজের সর্বত্র সাম্য-সাধনের জন্য উন্নতদের নিচে নামিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল না। লক্ষ্য ছিল, যারা নিচে পড়ে রয়েছে, সমাজে কোন আলোড়ন সৃষ্টি না করেই তাদের মান উন্নত করা। সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করা অকল্যাণকর। লক্ষ্য ছিল এই, যে-সকল মানুষ পিছিয়ে পড়ছে তাদের তুলে ধরা, তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে তাদের উচ্চ মানে সমুত্তীর্ণ করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জাতির আধ্যাত্মিক আদর্শকে ক্ষুণ্ন না করে আমাদের সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করবে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী জীব-শিব তত্ত্ব। মানুষের সর্ববিধ সেবা করে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবানকে দর্শন করে আমরা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হব না, সেই সঙ্গে আমাদের দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে,

সর্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহতী বাণী জগৎকে দিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে শুনে স্বামীজী যে বাণী কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন, সেই জীবন-বাণী আমরা যেন না ভুলে যাই। স্বামীজী বলেছিলেন: সকলকে দেবার জন্য আমার একটি বাণী আছে। আমি যদি কখনও সুযোগ পাই, আমি এই মহৎ ভাব জগতের সর্বত্র প্রচার করব। সেই মহৎ ভাবটি হচ্ছে 'জীব শিবই'। এই ভাবনা শুধুমাত্র ভারতীয়দের উপকার করবে তাই নয়, আজকের পৃথিবীতে যে বিশৃঙ্খলা ও চূড়ান্ত অব্যবস্থা, তা থেকে রেহাই পেতে হলে এই ভাবনাকেই আশ্রয় করতে হবে।

স্বামীজী আশা করেছিলেন, অনুন্নত জনসাধারণের উন্নতির কর্ম-যোজনায় এ-দেশের যুব-সম্প্রদায় এগিয়ে আসবে। তিনি তাঁর অনেক বক্তৃতায় যুব-সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, তাঁর আশা যুব-সম্প্রদায়ের উপর। সুতরাং ভারতের সকল যুবক এই মহাপুরুষের আশা পূরণে ব্রতী হবে। উপরন্তু তাদের প্রথমে জানতে হবে স্বামীজী কি বলেছেন এবং দেশের পুনরুত্থানের জন্য প্রকৃত কি আমাদের করতে হবে।

তোমরা সকলে এখানে কয়েকদিন বাস করে, যাবতীয় সমস্যার আলোচনা করবে, স্বামীজীর বাণী পর্যালোচনা করবে এবং নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছাবে। তোমরা কর্মপদ্ধতিও নির্ধারণ করবে এবং নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে তোমরা সেই কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। আশা করি, তোমরা এই দায়িত্ব পালন করবে। এটি হল এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আজকাল আমরা প্রায়ই শুনি যে, আমাদের দেশের অধঃপতনের জন্য প্রধানতঃ দায়ী আমাদের ধর্ম। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িই দেশের সর্বনাশ করেছে। ধর্মের কিছু কমতি হলেই দেশের কল্যাণ হত। এই দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু যাঁরা এই অভিযোগ তুলেছেন, তাঁরা জানেন না প্রকৃত ধর্ম কি। তাঁরা কোন কোন সামাজিক রীতিনীতি, কিছু কিছু কুসংস্কারকেই ধর্ম বলে মনে করেছেন। কিন্তু এদের ধর্ম বলে না। লৌহ-দণ্ডের উপর মরচের মতো এগুলি হচ্ছে ধর্মের উপর গজানো কিছু নোংরা জঞ্জাল। উপরের মরচে দূর করতে পারলেই লোহা চক্‌চক্ করে ওঠে। এ-কথা ধর্মের ক্ষেত্রেও সত্য। কত কুসংস্কার, কত অধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা জমে উঠেছে এবং সেগুলিকে আমরা ভুলবশতঃ ধর্ম বলে গ্রহণ করেছি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন, স্বামীজী এসেছেন, তাঁরা শস্য ও শস্যের খোসা-ভুষির পার্থক্য আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন প্রকৃত ধর্ম কোন্‌টা এবং অধর্মই বা কোন্‌টা। সত্যিকার ধর্মকে আশ্রয় করতে পারলে কোন অধঃপতন আসতে পারে না। আমরা যদি প্রকৃত ধর্ম অনুসরণ করি আমাদের কোন অধঃপতন হবে না। প্রকৃত ধর্ম আশ্রয় না করার ফলেই বর্তমান জগৎ এই ভীষণ সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের জানতে হবে, ধর্ম বলতে প্রকৃত কি বুঝায় এবং কোন্ কোন্ ধর্মীয় ভাবনা আমাদের উন্নতির পথে সহায়ক। আমাদের আরও বেশি যুক্তিবাদী হতে হবে। 'ধর্ম আমাদের ক্ষতি করেছে',—আমরা জানি না ধর্ম কিভাবে আমাদের ক্ষতি করেছে—শুধুমাত্র এই কথা বললেই চলবে না। তোমরা এই দেশের গত তিন হাজার বছরের ইতিহাস কি পাঠ করেছ? শুধুমাত্র ধর্মকে অবলম্বন করেই দেখবে আমরা বিগত তিন হাজার বছর ধরে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখতে পেরেছি। সেই সময়ের মধ্যে অনেক

বড় জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। ধর্মের মধ্যে কিছু শক্তি নিহিত আছে। স্বামীজী বলেছেন, যদি ধর্ম ঠিক থাকে অপর সব কিছু ঠিক থাকবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ধর্মকে আশ্রয় না করে কিছুই করা যাবে না। 'ধর্ম কিচ্ছু না' এ-ধরনের কথা ঢিলেঢালা কথা, নির্বোধের অর্থহীন বাচালতা। এতকাল পর্যন্ত প্রচলিত তথাকথিত ধর্মের ভ্রান্ত-রূপটি আমাদের ত্যাগ করতে হবে। এই সকল বিপরীত, বিকৃত ভাবনা-চিন্তা ঠিক নয়। আর আমরা এগুলিকে আঁকড়ে ধরে থাকলে ধ্বংস হয়ে যাব। আমাদের ধর্ম বা ধর্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করা চলবে না। ধর্ম হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির মৌল সত্তা।

আমাদের সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটির সঙ্গে এই সম্মেলনের যুবকদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এই ভূখণ্ডের কৃষ্টি সংস্কৃতি গ্রহণ করে তাদের ভারতের নাগরিক রূপেই গড়ে উঠতে হবে, অন্য দেশের নাগরিক হবার চেষ্টা করে লাভ নেই। যে-সকল যুবক এই সম্মেলনে যোগদান করেছে, তাদের এই সকল সমস্যা ভাবতে হবে। তাদের নিজ নিজ সমস্যা সন্ন্যাসী ও অন্যান্য গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করবে। সর্বোপরি তারা স্বামীজীকে হৃদয়ঙ্গম করবে। খুব ভাল করে স্বামীজীর বাণী ও রচনা পড়াশোনা করবে অপরের জন্য জনহিতকর কাজ করার প্রেরণা লাভ করবে। এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপরের জন্য কাজ করেই সুখ। আমরা যদি শুধুমাত্র অপরের জন্য কাজ করতে চেষ্টা করি, সেই কাজ আমাদের সুখ দেবে, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটাবে।

আজ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা, তিনি তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন যেন তোমরা তাঁকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পার, তোমরা তাঁর আদর্শ অনুযায়ী ভারতবর্ষকে পুনর্গঠিত করতে পার।

তোমরা বৈদান্তিক, তোমরা খাঁটি হিন্দু, তোমরা সনাতন পন্থার পক্ষপাতী। আমি তোমাদিগকে সনাতন আদর্শেরই আরও অধিক পক্ষপাতী করিতে চাই। যতই তোমরা সনাতন পন্থার অধিকতর পক্ষপাতী হইবে, ততই অধিকতর বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিবে; আর যতই তোমরা আধুনিক গোঁড়ামির অনুসরণ করিবে, ততই তোমরা অধিক নির্বোধের মতো কাজ করিবে। তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন পন্থা অবলম্বন কর, কারণ তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেকটি বাণী বীর্যবান্ স্থির অকপট হৃদয় হইতে উত্থিত, উহার প্রত্যেকটি সুরই অমোঘ। তার পর জাতীয় অবনতি আসিল—শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম সকল বিষয়েই অবনতি হইল। উহার কারণ-পরম্পরা বিচার করিবার সময় আমাদের নাই, কিন্তু তখনকার লিখিত সকল পুস্তকেই আমাদের এই জাতীয় ব্যাধির, জাতীয় অবনতির প্রমাণ পাওয়া যায়; জাতীয় বীর্যের পরিবর্তে উহাতে কেবল রোদনধ্বনি। সেই প্রাচীনকালের ভাব লইয়া আইস, যখন জাতীয় শরীরে বীর্য ও জীবন ছিল। তোমরা আবার বীর্যবান্ হও, সেই প্রাচীন নির্ঝরিণীর জল আবার প্রাণ ভরিয়া পান কর। ইহা ব্যতীত ভারতের বাঁচিবার আর অন্য উপায় নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ

মন্ত্র প্রসার

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

মন্ত্র যে ইষ্টস্বরূপ, শ্রীভগবান এবং তাঁহার নামে যে কোনও ভেদ নাই এই বিশ্বাস যত বাড়িতে থাকে, নামজপে রুচি যত গভীর হইতে থাকে মন্ত্ররূপী ইষ্টের চৈতন্যজ্যোতি আমাদের হৃদয়কে ততই আলোকিত করিতে আরম্ভ করে। মন্ত্রের মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞানের স্তর হইতে স্তরে উপনীত হইয়া আমরা আনন্দাপ্লুত হই। তত্ত্বজ্ঞানের এইরূপ একটি স্তরের নাম মন্ত্র প্রসার।

সদ্‌গুরুর নিকট যিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছেন তিনি পরম যত্নে মন্ত্রকে হৃদয়ে লুকাইয়া রাখেন। মন্ত্র অতি সুগোপ্য সম্পদ। কোন্ দেবতার মন্ত্র তুমি পাইয়াছ এই প্রশ্ন দীক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করিতে নাই; তিনিও সাধারণতঃ এই প্রসঙ্গ কাহারও সহিত করেন না। স্মরণ মনন বা জপ করিবার সময় সাধক অন্তরের সেই সম্পদকে উপরে টানিয়া আনেন। মন্ত্রের শব্দগুলির উপর মনোনিবেশ করিয়া প্রেমের সহিত অনুচ্চ স্বরে বা সম্পূর্ণ নীরবে আবৃত্তি করিয়া চলেন। এই প্রক্রিয়ার নাম যে জপ তাহা সুবিদিত। 'জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ' এই উক্তিও সাধকমহলে বহুশ্রুত। নিষ্ঠা ও বিশ্বাস সহকারে জপ চালাইয়া গেলে সময়ে ইষ্টদর্শন হয়। দেহ-মনের শুচিতা, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা, বিষয়সুখের উপর বিরক্তি—এইগুলি যে মন্ত্রসিদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক—একথা আমরা শাস্ত্রে এবং সাধু মহাজনদের উপদেশে জানিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উক্তি :

"…নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে, তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি, কিন্তু কামিনীকাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়?…

"তাই নাম কর, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর, যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়, আর যে সব জিনিস দুদিনের জন্য, যেমন টাকা, মান, দেহের সুখ—তাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যায়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।২।৫)

"জপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। নির্জনে গোপনে তাঁর নাম করতে করতে তাঁর কৃপা হয়।" (ঐ, ৪।২১।৫)

"…নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়।" (ঐ, ৪।১০।৩)

"ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।" (ঐ, ১।২।৬)

মহাকবি কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যের প্রারম্ভে হরগৌরীর বন্দনা করিতেছেন :

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ॥

'শব্দ এবং উহার অর্থ (শব্দ দ্বারা নির্ণীত ভাব বা বস্তু) যেমন নিত্যসম্বদ্ধ, উহাদিগকে যেমন আলাদা করা যায় না সেইরূপ জগতের জনকজননী পরমেশ্বর ও পার্বতী পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। শব্দ ও অর্থের সম্যক্ জ্ঞানের জন্য সেই আদিপুরুষ ও আদি প্রকৃতিকে আমি বন্দনা করি।"

অনুরূপধারায় শ্রীভগবানের নাম (শব্দ) নামী (ভাববস্তু শ্রীভগবান)-র সহিত অভিন্ন। এই সত্যটি জপসাধনায় বিশেষভাবে মনে রাখিবার। শ্রীভগবানকে আমরা সচ্চিদানন্দ বলি। যত কিছু অস্তিত্ব, যাহা কিছু জ্ঞান বা প্রকাশ আর যাবতীয় আনন্দ শ্রীভগবানে নিহিত। তিনি সৎ, কেননা তাঁহার অস্তিত্বের কোনও ছেদ নাই; তিনি চিৎ, কেননা তাঁহার প্রকাশের কোনও সীমা নাই; তিনিই অনন্ত আনন্দ যেহেতু

সেই আনন্দে কোনও বাধা নাই। জপসাধকের নিকট যেমন নামী শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দস্বরূপ সেইরূপ তাঁহার নামও সচ্চিদানন্দের স্ফুরক। মন্ত্রজপের সময়ে আমার ক্ষুদ্র সত্তা শব্দব্রহ্মের অসীম সত্তায় নিবিষ্ট হউক, হৃদয় চিদালোকে উদ্ভাসিত এবং ভাগবত আনন্দে পরিপূর্ণ হউক ইহাই সাধকের কামনা। এই কামনা একদিনে সফল হয় না। ধৈর্য, আশা এবং বিশ্বাস লইয়া সাধনা করিয়া যাইতে হয়। যথাসময়ে মন্ত্ররূপী ভগবান জাগিয়া উঠেন।

মন্ত্র জাগিয়া উঠিলে উহাকে আর কণ্ঠে বা হৃদয়ে লুকাইয়া রাখা যায় না। মন্ত্রের প্রসার বা পরিবিস্তার হইতে থাকে। বান আসিলে নদীর জল যেমন দুকূল ছাপাইয়া তীরের বাহিরে মাঠে ও ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি জাগ্রত মন্ত্র-চৈতন্য উচ্চারণের কেন্দ্র ওষ্ঠ, জিহ্বা, কণ্ঠ প্রভৃতি স্থান হইতে দূরদূরান্তরে বিস্তারিত হন।

প্রথম বিস্তার ঘটে দেহের মধ্যেই। মন্ত্র চোখকে স্পর্শ করিলে উহা দৈবচক্ষুতে পরিণত হয়। সকল চাক্ষুষজ্ঞান তখন মন্ত্রধ্বনি বলিয়া বোধ হয়। চোখে যত কিছু রূপ প্রতিফলিত হইতেছে উহা যেন মন্ত্রজপের তুল্য। যখন কণ্ঠে বা মনে মনে জপ হইত তখন মন্ত্র ছিল সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতর 'শব্দ'। এখন সেই 'শব্দ' 'রূপে' পরিণত হইয়াছে। মনে যত ছবি ভাসিতেছে সাধক বোধ করিতেছেন উহা মন্ত্রেরই প্রকাশ। মন্ত্রচৈতন্য চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট যাবতীয় বস্তুতে প্রসারিত হইয়াছেন।

কর্ণেন্দ্রিয় মন্ত্রের স্পর্শে দৈবকর্ণে রূপান্তরিত হয়। সেই কর্ণে যাহা কিছু শব্দ প্রবেশ করে তাহা আর সাধারণ ধ্বনি নয়—তাহারা মন্ত্রের অনুরণন। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"যত শুন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে। কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।"

অপর তিনটি ইন্দ্রিয়—ত্বক, নাসিকা এবং জিহ্বা যাহাদের দ্বারা আমরা স্পর্শ, ঘ্রাণ এবং স্বাদের জ্ঞান লাভ করি মন্ত্রচৈতন্য দ্বারা উজ্জীবিত হইলে সাধনের মন্ত্রসঙ্গী হইয়া দাঁড়ায়। যাবতীয় স্পর্শ, যাবতীয় সুগন্ধ এবং যাবতীয় সুস্বাদ মন্ত্রজপের প্রশান্তি ও আনন্দ বহন করিয়া আনে। ইন্দ্রিয় ছাড়া দেহে অন্য যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে সেগুলিতেও মন্ত্রপ্রসার সম্ভবপর। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, ফুসফুসের সঙ্কোচ-বিস্তার, রক্তস্রোত, স্নায়ুপ্রবাহ—এই সকল ক্রিয়া মন্ত্রচৈতন্য দ্বারা চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হইতে পারে। দেহের প্রত্যেকটি অংশে মন্ত্রসাধন চলিতে থাকে। এক কথায় সমুদয় প্রাণক্রিয়া মন্ত্রজপের সহিত সম্মিলিত হয়।

অন্তঃকরণ তাহার চারটি অবয়ব—যথা মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সহ দূরে দাঁড়াইয়া থাকে না। তাহারাও সাধকের জপে অংশগ্রহণ করে। যে কোনও সঙ্কল্প মনে উদয় হয় সাধক বোধ করেন উহা মন্ত্রেরই স্ফূর্তি। যে কোনও স্মৃতি চিত্তের দ্বারে উপস্থিত হয় সাধক উহাকে মন্ত্রধ্বনি বলিয়া সমাদর করেন। বুদ্ধির যাবতীয় নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি সাধকের নিকট মন্ত্রপ্রতিভাস বলিয়া বোধ হয়। অহঙ্কার তাহার অহং অভিমান ছাড়িয়া বলে 'আমিও মন্ত্রের আশ্রয় চাই'। তখন প্রত্যেকটি অহং বোধ মন্ত্রেরই অভিব্যঞ্জনা হইয়া দাঁড়ায়।

এইভাবে সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ মন্ত্রময় হইয়া যাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, ভক্তের দেহ "চৈতন্যময়"। বিশ্বাস, ভালবাসা এবং নিষ্ঠা সহকারে জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে জড়দেহ সাধকের নিকট চৈতন্যে ভরপুর দেবদেহ বলিয়া প্রতীত হয়। দেহেই স্বর্গ নামিয়া আসে। কেনোপনিষদের বাণী—"প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে" (প্রত্যেকটি জ্ঞানে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা বিভাসিত

—এইটি জানিলে মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে।) সার্থক হয়।

মন্ত্র যদি শব্দব্রহ্ম হন তাহা হইলে মন্ত্রের প্রসার দেহ-মন-প্রাণের বাহিরেও যে ঘটিতে থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। উপনিষদ বলেন, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বানুস্যূত। মন্ত্রকেও সর্বব্যাপী এবং সর্ববস্তুতে ওতপ্রোত বলিয়া অনুভব করা তত্ত্বজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট ধাপ। সাধক মন্ত্রকে আকাশের প্রতি নিয়োজিত করিয়া বলেন, হে পঞ্চভূতের আদি ভূত আকাশ, তুমি যথার্থ চৈতন্যস্বরূপ, সেই চৈতন্যস্বরূপে এখন আমার নিকট প্রতিভাত হও। আমার চৈতন্যময় মন্ত্রে একীভূত হও। তোমার সীমাহীন অস্তিত্বে আমি অনাহত মন্ত্রধ্বনি শুনিব।

পঞ্চভূতের দ্বিতীয় ভূত বায়ুতে মন্ত্রের বিলাস অনুরূপভাবে যখন ঘটে, তখন মৃদুমন্দ সমীরণে, প্রবল বাত্যায়, অতিরুদ্র ঝটিকায় সাধক তাঁহার ইষ্টমন্ত্রের নৃত্য অনুভব করেন। বাকী তিনটি ভূত—তেজ, অপ্, ক্ষিতিও মন্ত্রচৈতন্য দ্বারা মন্ত্রাত্মক হইয়া উঠে। যে কোনও প্রকার তেজ (energy) তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে চৈতন্যেরই অভিস্ফূর্তি বলিয়া সাধক বুঝিতে পারেন। অপ্ বা জলকে আমরা কত ভাবেই না প্রত্যক্ষ করি। বৃষ্টির জল, কুয়াসা, মেঘ, বরফ, ঝর্না, নদী, সাগর, মহাসাগর—সবই অপ্ মূর্তি। এই প্রত্যেক মূর্তিতে মন্ত্রসাধক মন্ত্রের প্রকাশ অনুভব করেন।

অবশেষে পৃথিবী। শ্যামল শস্যক্ষেত্র, লতা গুল্ম বৃক্ষরাজি, নিবিড় বনানী, ঊষর মরুকান্তার পাহাড় পর্বত এই সকলই পঞ্চম ভূত ক্ষিতির বিচিত্র রূপ। যত কোমল বা যত কঠিন হউক, যত ক্ষুদ্র বা যত বৃহৎ হউক, ইহাদের প্রত্যেকটিতে মন্ত্রের প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। সাধকের অনুভূতিতে ইহারা চৈতন্যময় হইয়া যায়।

উপনিষদ্ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কত ভাবেই না পরমাত্মার সর্বব্যাপিত্ব এবং সর্বানুস্যূততার কথা বলিয়াছেন। এমন কোনও বস্তু নাই, এমন কোনও ঘটনা নাই যেখানে পরমাত্মার 'চৈতন্যসত্তা' অনুপস্থিত। মন্ত্র যদি শব্দব্রহ্ম হন, নাম যদি নামীর সহিত অভিন্ন হন তাহা হইলে মন্ত্রও সর্বব্যাপী এবং সর্বাত্মক।

শ্রীভগবান এবং শ্রীগুরুর কৃপায় ভাগ্যবান সাধক-সাধিকা তাঁহাদের জপসাধনার স্তরে স্তরে মন্ত্রের প্রসার অনুভব করিয়া ধন্য হন। মাণ্ডূক্য উপনিষদের বাণী: "ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং··· ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব। যশ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।" "ওম্ এই অক্ষর এই যাহা কিছু সব। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ যাহা কিছু সবই ওঙ্কার। অন্য যাহা ত্রিকালের অতীত তাহাও ওঙ্কারই।"

ইহা স্তোকবাক্য নহে। প্রাচীন কালের তত্ত্বদ্রষ্টা মুনি-ঋষিগণ এবং পরবর্তী কালের বহু সাধক-সাধিকা এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। বেদ যাহা ওঙ্কার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তন্ত্র ও পুরাণে বর্ণিত শ্রীভগবানের অন্যান্য মন্ত্র সম্বন্ধেও ঐ সত্য প্রযোজ্য। শ্রীগুরুর নিকট যে সিদ্ধমন্ত্র লাভ করা যায়, বিশ্বাস, প্রীতি ও ধৈর্য সহ উহা সাধন করিতে করিতে মন্ত্র জাগিয়া উঠেন এবং আমাদের সকল দেহ-মন-প্রাণকে, আমাদের সকল কর্মকে, আমাদের বিশ্বজগৎকে পরিপ্লাবিত করেন। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন কৃত-কৃতার্থ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

২১

শ্রীমায়ের ঈশ-মাতৃত্বে সমন্বিত গুরুশক্তির অভিনব সংবেদ

শ্রীমায়ের ঈশ-মাতৃত্ব বহু রাগবিস্তারে ধর্মের অভ্যন্তরীণ জগৎকে যে সঙ্গীতমুখর করে রেখেছে, বহু বিচিত্র ছোট-খাট ঘটনার মাধ্যমে সে সুরের কিঞ্চিৎ আভাস পেলেও আমাদের জীবন আরও উজ্জীবিত, উন্নততর ও মধুময় হতে পারে। আর জৈবভাবলেশহীন এই ঈশ-মাতৃত্ব অবতীর্ণা জ্ঞানদায়িনীর মহাশক্তিশালিনী গুরুশক্তি দ্বারা মণ্ডিত হয়ে আধ্যাত্মিক জগতে যে এক অতিসূক্ষ্ম ত্রাণবন্যা সমন্ততঃ প্রবাহিত করেছে, তাতে বেপরোয়া গা ভাসান দিলে কত রকমের ঢেউ এসে যে ভেঙে পড়ে উন্মুখ চৈতন্যে!

শ্রীমায়ের লালনাঙ্গনে সকল বিশ্ব এসে যে সমকালে মিলিত হয়েছিল, এ তথ্য ও তত্ত্ব মায়ের অতি ঘনিষ্ঠ ও নিকটবর্তীদেরও ধারণার অতীত ছিল। কয়েকটি আচম্বিতে সংঘটিত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছাড়া মায়ের এই অতি-অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবটির বিষয়ে অবহিত হওয়া ও থাকা সহজসাধ্য ছিল না, কারণ শ্রীমা নিজেকে সব সময়ে অতি-সাধারণতার মায়াবরণে আবৃতা রাখতেন।

আজ যে আমরা এটি ধারণা করতে পারছি, সেটি সম্ভব হচ্ছে দুটি ধারার কৃপা বলে। একটি—শ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বিস্তারিত সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়টি—শ্রীমায়ের সম্বন্ধে উচ্চকোটি সন্ত, সাধকদের অনুভূতি-লব্ধ তত্ত্ব-সত্যের উত্তরাধিকারী আমরা হয়েছি।

এই কৃপালোকে কয়েকটি ঘটনায় শ্রীমায়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার বিদ্যুৎ ঝলকগুলি লক্ষ্য করব।

ডাক্তার কাঞ্জীলাল ছিলেন মায়ের বাড়ির অতি ঘনিষ্ঠ ভক্ত। একদিন, প্রণামান্তে, ডাক্তারের স্ত্রী শ্রীমায়ের নিকট প্রার্থনা জানালেন: "মা, আশীর্বাদ করুন, আপনার ছেলের যাতে উপায় হয়।" মায়ের প্রাণে এই প্রার্থনাটি যেন একটি তীরের মতো বিঁধল। শ্রীমা তাঁর দিকে তাকিয়ে দৃঢ়স্বরে বললেন: "বউ মা, এমন আশীর্বাদ করব আমি—লোকের অসুখ হোক, কষ্ট পাক? তা তো আমি পারব না, মা! সব ভাল থাকুক, জগতের মঙ্গল হোক!"[১৩৪]

কাঞ্জীলাল ছিলেন ডাক্তার। ডাক্তারের আয় বাড়তে আশীর্বাদ করার অর্থ বহুজনের রোগ-দুঃখ-ভোগ কামনা করা। কল্যাণময়ী সর্বজননী এ আশীর্বাদ কেমন করে করেন? এইটি হল বিশ্বজোড়া সকল সন্তানের শিয়রে সদাজাগ্রত ঈশ-মাতৃত্ব।

পাগলী মামীর মুখে শ্রীমায়ের প্রতি গালাগালি লেগেই ছিল; কিন্তু তিনি এ-সব ভ্রূক্ষেপ করতেন না। একদিন মামী বলে বসলেন: "সর্বনাশী!" মা অমনি তাকে সাবধান করে দিলেন: "আর যা বলিস, আমায় সর্বনাশী বলিস নে; জগৎ জুড়ে আমার ছেলেরা রয়েছে তাদের অকল্যাণ হবে।"

সর্বশক্তিময়ী, অথচ কোথাও কোন সন্তানের অকল্যাণ আশংকায় কী কাতর!

এই যে কথাটি "জগৎ জুড়ে আমার ছেলেরা

---

১৩৪ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪২১

রয়েছে" এটি আক্ষরিক ভাবে ও ভাবের অক্ষরে, গোটা জগৎটা হয়েছে যাঁর গৃহের অঙ্গন, সেই মায়ের কথা, অর্থাৎ জগজ্জননীর কথা। এটি কোন ভাবালু মুহূর্তের সাময়িক কাব্যকথা নয়। এটি তাঁর বিশ্বজোড়া চৈতন্যের অনৈচ্ছিক স্পন্দন।

১৩২৪ সালে জয়রামবাটীতে মায়ের নূতন বাটী তৈরি হয়ে যাবার পর, দুর্গাপূজার সময় মা সেখানে আছেন। সেই উৎসব উপলক্ষে মামার পরিবার ভুক্ত পরিজনদের জন্য নূতন কাপড় কিনে আনতে তিনি এক ব্রহ্মচারীকে বলেছেন। ব্রহ্মচারী কোয়ালপাড়া আশ্রমের সাধু ও খুব স্বদেশী ভাবাপন্ন। তিনি সব দেশী কলের কাপড় এনে হাজির করলেন, তা যেমন মোটা, তেমনি তার শ্রীহীন পাড়। সে-সব কাপড় মেয়েদের পছন্দ হল না। সে-সব কাপড় ফেরত দিয়ে মিহি কাপড় আনতে বলায় বিরক্ত বিক্ষুব্ধ ব্রহ্মচারী বললেন: "ও সব বিলিতি হবে, ও আবার কি আনব?" শ্রীমা শুনে একটু হেসে হেসে বললেন: "বাবা, তারাও (বিলেতের লোকেরাও) তো আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়; আমার কি একরোখা হলে চলে? ওরা যেমন বলছে, তাই এনে দাও।"[১৩৫]

শ্রীমায়ের মুখের ঐ হাসিটুকুতে ফুটেছে সনাতন ধর্ম-দর্শনের নির্যাস-সৌরভ। মা ভেবে-চিন্তে ঐ কথাটি বলেননি! যে স্তরে তাঁর স্থিতি-অধিষ্ঠান, সেখানকার ঐ গ্রামীণ ভাব-ভাষা। যাদের কখনও চাক্ষুষ দেখেননি—কিন্তু আত্মিক দেখেছেন—তারা যে কত বহু-বহু পরিচিত, ব্রহ্ম-নাড়ীর সম্পর্ক: "বাবা, তারাও তো আমার ছেলে।" আর কত বড় বিশাল সুরম্য ঐ ঘরখানি, শ্রীমায়ের হৃদয়খানি, "আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়; আমার কি একরোখা হলে চলে?" এ ঘরের বাইরে একটি কেউ নেই—এমনি সার্বিক এর অন্তর্ভুক্তি। এমন ঘর জগতে আর একটিও নেই। শোন ভাই গৃহহীন, এই যে এখানে তোমার ঘর। মা বলেছেন: "জগৎ জুড়ে আমার ছেলেরা রয়েছে…।" আর এই তো সেই জগৎ জোড়া ঘর, এ-কথাগুলি, এ অতি শুভ সংবাদটি, সংবেদটি, জানতে না বলে লক্ষ্মীছাড়ার মতো ঘুরে বেরিয়েছ লাঞ্ছনায়, গঞ্জনায়, অনাদরে, অবজ্ঞায়, অপ্রেমের জঞ্জালময় অলি-গলিতে। কত না কষ্ট পেয়েছ। কিন্তু আজ তো জানলে, আর কষ্ট পাবার প্রয়োজন নেই। এবেলা নিজের ঘরে, মায়ের ঘরে উঠে এসো। মায়ের মুখের কথা: "এখানে খাও, দাও, নিশ্চিন্ত মনে আনন্দ কর।" এমন কি বলেছেন যে, মায়ের বাড়িতে (মায়ের উপস্থিতিতে) জপধ্যান করারও প্রয়োজন নেই!

ভেবে দেখুন জগৎ-জুড়ে অনুরণিত মায়ের ঈশ-মাতৃত্বের এই যে স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা, "বাবা, তারাও তো আমার ছেলে; আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়", এটি যখন নদী-পর্বত, দেশ-দেশান্তর, মরু-বনানী, সাগর-পারাবার লঙ্ঘন করে, নরনারীকে হৃদয়ে-হৃদয়ে স্পর্শ করছে, কী এক নবীন শিহরণ জাগাচ্ছে প্রাণে-প্রাণে! আমরা দেখেছি মায়ের নাম-কথা শুনবামাত্র কেমন করে, যাঁদের বলা হয় 'বিদেশী-বিদেশিনী', তাঁদের মুখমণ্ডল আনন্দে মহিমান্বিত হয়ে উঠে। কেন এমন হয়? তাও কি বলতে হবে? শ্রীমা-ই তো এ যুগে ভগবানের দিক থেকে বেদান্তের সবচেয়ে সরস বাণী, 'অপনান'র প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকার করলেন: "আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়; আমার কি একরোখা হলে চলে?"

পানাপুকুরে সন্তরণশীল কলমি শাকের মতো সহজ-সরল কথা। কিন্তু এ লতার ডগায় ডগায়

১৩৫ ঐ, পৃঃ ২৮১

ফুটেছে ধর্ম-দর্শনের কল্প-কুসুম। তোমার মাটি-লেপা উঠানে ঢলে পড়া নিঃসীম নীল আকাশ-খানির মতো। আশ্চর্য সহজ, পাওয়া বিনামূল্যে, অনায়াসে ; তবু জানা ভাল, এ কল্প-কুসুম যখন-তখন ফোটে না। মুনি-ঋষিদের ধ্যানযোগে জেগে বসে থাকতে হয়, যুগ-যুগ ধরে।

শ্রীমায়ের কাছে দূর-পর বলে কিছু-কেউ ছিল না—সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয় কিনা। মাকে একদিন উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতে দেখে, হদ্দ-হতাশ নলিনী দিদি বলেছিলেন: "মাগো, ছত্রিশ জাতের এঁটো কুড়ুচ্ছে!" মা শুনে বললেন: "সব যে আমার, ছত্রিশ কোথায়?"[১৩৬] এ হচ্ছে নূতন ব্রহ্মসূত্র। অদ্বৈত-সিদ্ধি। মায়ের এই স্বভাব-সিদ্ধ ভাবটিই ছিল স্বামীজীর নব্য বেদান্তের আশা-আশ্রয়, বনিয়াদ ও "নিশ্চিন্ত-নীড়"।

এক বালক ভক্তকে মা বলেছিলেন: "দেখ, ঠাকুরের প্রায়ই সমাধি হ'ত। একদিন অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভাঙলে বললেন, 'দেখ গা, আমি একদেশে গেছলুম—সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। আহা, তাদের কি ভক্তি!' তখন কি বুঝতে পেরেছিলুম, এই গুলি বুলরা সব ভক্ত হবে? আমি তো ভেবে অবাক, সাদা-সাদা মানুষ আবার কি?"[১৩৭]

ঠাকুর যে স্বপ্ন-দেশ থেকে ফিরে এসে তাঁর অনাগত ভক্তদের ভক্তির প্রশস্তি করে রাখলেন মায়ের কাছে, এ বিজ্ঞাপনটি করে তিনি কি মায়ের ঈশ-মাতৃত্বের সীমাহীনতা ইঙ্গিত করে গেলেন? ঠাকুরের এই স্বপ্ন-ইঙ্গিতই পরবর্তী কালে মায়ের প্রাণের বিশ্বসঙ্গীত হয়েছে।

পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার করে স্বামীজী যখন ভারতে ফিরে এলেন, তখন তাঁর অনুগামী হয়ে ভারতে এলেন কয়েকটি নরনারী, যাঁরা পরে আসবেন তাঁদের পুরোগামী হয়ে। স্বামীজীর কম্বুকণ্ঠে উদ্গীথ বেদান্তের মোক্ষ-বাণী শুনে এঁরা উদ্দীপ্ত। এসেছেন গুরুর আদর্শে ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে। স্বামীজীর একটি বিশেষ ভাবনা ছিল এই নিয়ে যে, ভারতের রক্ষণ-শীল সমাজ এদের কিভাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু স্বামীজী যখন দেখলেন যে, তাঁর দুখানি পাবনী হস্ত প্রসারিত করে শ্রীমা এদের নিজ অন্তর-অন্তঃপুরে টেনে নিলেন, করে নিলেন একান্ত-নিছক আপন, তখন স্বামীজী অতি-নিশ্চিন্ত হলেন। কারণ স্বামীজী জানতেন মা-ই হচ্ছেন ভারতের ভাবী ভাব-গতি-প্রাণ নিয়ন্ত্রী। ১৮৯৮ মার্চ মাসে স্বামীজী কলকাতা থেকে মাদ্রাজে অবস্থিত শশী মহারাজকে এক চিঠিতে লিখছেন: "…শ্রীমা এখানে আছেন। ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা সেদিন তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ভাবতে পারো, মা তাহাদের সঙ্গে একসঙ্গে খেয়েছিলেন! …এ কি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?…" মায়ের আকাশ-ভরা উদার দৃষ্টি, হৃদয়ের সপ্রেম ভূমা-সংগ্রহণ ও তাঁর বিশ্বজোড়া সকলকে নিয়ে ঘর করার পরম আন্তরিকতা আস্বাদন করে বিদেশিনীরা বিস্মিত মুগ্ধ স্তম্ভিত হলেন। কারণ এমন মানবী তাঁরা পূর্বে-পরে কখনও দেখেননি। এমন দেবী তাঁদের স্বপ্ন-সম্ভাবনায়ও ছিলেন না। এ যে আদিভূতা সনাতনী। এ যে অনন্ত-সম্ভবা, অভিনবা। এঁর তুলনা যে ভূ-বিশ্বে নেই।

সব সময় একান্ত আত্ম-সচেতন হলেও এক ঝলক বিশ্বতমোনাশী বিদ্যুতের মতো একবার বলেছিলেন: "বের কর দেখি আর একটি আমার মতো!"

বয়ে গেছে আমাদের বের করতে! পণ্ড-শ্রমে গণ্ড বেয়ে ঘাম, লাভের সামিল হব ঐটুকু—তা কি আমরা জানিনে!

আজকের জগতে দেশ-বিদেশে যে বেদান্তের

১৩৬ ঐ, পৃঃ ৩৮৯

১৩৭ ঐ, পৃঃ ৪২২

প্রচার-প্রসার তার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট বাণী হচ্ছে শ্রীমায়ের জীবনখানি। এমন ভয়-কাতুরে জগতে কেউ নেই, শ্রীমাকে দেখে যার ভয় কাটেনি; এমন অপবিত্র জগতে নেই, এই পবিত্রতা-স্বরূপিণীকে দেখে যার চিত্তের মল ফিকে হয়নি; এমন উপেক্ষিত, অবহেলিত, অবজ্ঞাত জগতে কেউ নেই, মাকে দেখে যার মনে হয়নি—আর কেউ না হলেও মা তো আমার আছেন; আর মা যদি আছেন, কি যায়-আসে আর কেউ যদি বা না থাকে। কত অশান্ত, বিক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, মায়ের প্রশান্ত মুখশ্রী দেখে ফিরে পেয়েছে হৃদয়ের স্বস্তি। তার হিসেব কেউ করেনি। প্রয়োজনও নেই। কারণ এ হিসেব মিলবে না। এ বে-হিসেবী ঠাকুরের রেখে যাওয়া মা যে!

শ্রীমা যদিও ছিলেন শ্বেতাম্বরধরা, গৈরিক-বসন পরেননি কোনদিন, তবু তাঁর পবিত্রতার বৈরাগ্যের লেলিহান অনুপ্রেরণায় ভারতে ও পাশ্চাত্যে আধুনিক ভোগবাদী সমাজের তরুণী বিদুষী দুহিতাগণ সংসার ত্যাগ করে হচ্ছেন ব্রতধারিণী, সন্ন্যাসিনী। পুরাকালে বা আজকের প্রবহমান কালে, জগতে নারীসমাজে শ্রীমায়ের মতো এমন শক্তিশালিনী অযুতার্চিঃ সর্বোচ্চ ধর্ম-প্রেরণা আর আবির্ভূতা হয়নি। সেজন্যই স্বামীজী বলতেন: "জ্যান্ত দুর্গা"।

আজকের পৃথিবীর বিজ্ঞান-চর্চা-নিপুণ সেই সব দেশে, যেখানে সকল প্রকার মনন-ধারার রয়েছে অবিমুক্ত প্রবেশাধিকার, সেখানে বেদান্তের যে প্রচার-প্রসার তার প্রধান কারণ হচ্ছে বেদান্ত তত্ত্বের বৌদ্ধিক বিচার-সিদ্ধতা, উদার সর্বগ্রাহিতা ও নির্ভীক পারমার্থিকতা।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সংকীর্ণ ধর্মকলহে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মার্জিত-ধী সুধী ও ব্যাকুল মুমুক্ষুগণ বেদান্তের পুণ্যবাণী শ্রবণ করে যখন আধ্যাত্মিক নবোদয়ের পথে তাঁদের আন্তর যাত্রা শুরু করেন, তখন কিছুকাল বাধাবন্ধনহীন তেপান্তরে পথ চলা এক অর্ধশ্রুত আনন্দ-সঙ্গীতের তালে-তালে বেশ চলে। তারপর যখন নানা জীবন সংঘাত-সমস্যার প্রচণ্ড রোদ উঠতে থাকে, পথশ্রমে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রকোপ বাড়তে থাকে, তখন প্রলম্বিত দৃষ্টি খোঁজে ধূ-ধূ চক্রবালে একটি আশ্রয়-আশা, ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার পানীয়, একটি ছায়া-শীতল জুড়োবার জায়গা।

এই সুতীক্ষ্ণ প্রয়োজনের অসহ ক্ষণে তাঁরা হঠাৎ আবিষ্কার করেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। তাঁর রসমধুর উদার-নিবিড় প্রেম, তাঁর ঈশাস্তিত্ব-সুরভিত প্রত্যক্ষ ধর্ম-প্রতিপাদন, বিশ্বজননীর সঙ্গে তাঁর ঘরোয়া সংলাপ, তাঁর ভাবমুখ অভিমুখী মনের সহসা ব্রহ্মনিমজ্জন—সকল আন্তরিক সাধকের প্রাণে আশা ও উদ্দীপনার জোয়ার আনে। "খালি পেটে ধর্ম হয় না"—তাঁর এই সহমর্মী বাণী শুনে আধুনিক সাধক ধর্মের একটি অতি-আত্মীয় মুখশ্রী দেখে আশ্বস্ত হয়।

অচিরে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূতা হন উমা হৈমবতীর মতো এক অনুপমা নারী—শ্রীমা—শ্রীরামকৃষ্ণের সকল বাণীর সত্যধারিণী, ব্রতচারিণী। তিনি বলেন না, "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" তিনি পরমান্নের থালাখানি, তৃষ্ণা-নিবারণী পানীয়ের পাত্রখানি হাতে নিয়েই আসেন: বাবা, এস, বস, খাবে। কাছে বসে বহু মাতৃস্নেহে অন্নপানীয় পরিবেশন করতে করতে তিনি প্রকাশ করেন: "ঠাকুরই সব—তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।"[১৩৮] "ইনিই সব—পুরুষ, প্রকৃতি; এঁকে ভাবলেই সব হবে।"[১৩৯]

যিনি এমন করে বেদান্তানুরাগীদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিভাত করেন, তিনি বেদান্ত দর্শনকে তত্ত্বের ভূমি থেকে অনুভূতির ভূমিতে নিয়ে আসেন। ঠাকুরকে আবিষ্কারের পর

১৩৮ ঐ, পৃঃ ৪৮৩

১৩৯ ঐ, পৃঃ ৪৮২

বেদান্তবাদী দেখতে পায়, যেখানে ছিল তেপান্তর —সেটিই হল, ঘর। আর ঐ ঘরের ঘরনী হলেন মা স্বয়ং। এখানে আছে সকলের আশা-অন্ন, আশ্রয়-প্রশ্রয়।

জগৎ জুড়ে অতি-নীরবে শ্রীমায়ের যে একটি অত্যাশ্চর্য অতি-নিবিড় অনন্ত উদয় হয়েছে। এই আধ্যাত্মিক-সম্ভাবনা ভূয়িষ্ট ঘটনার মতো অন্য কোন বহুগুরুত্বপূর্ণ ধর্ম-ঘটনা মানুষের আধুনিক ইতিহাসে আর একটিও ঘটেনি, ঠাকুরের আবির্ভাব ছাড়া। আর এই উদয়টি হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপারই মহতী প্রকাশ।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অনেক অনুযোগ-কাকুতি করে ঠাকুর নিজ দেহাবসানের কিছুদিন পূর্বে শ্রীমাকে বলেছিলেন: "হাঁ গা। তুমি কি কিছু করবে না? (নিজদেহ দেখাইয়া) এ-ই সব করবে?" নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভেবে মা বললেন, "আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?" ঠাকুর তখনই উত্তর দিলেন, "না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে।"[১৪০]

ঠাকুরের মিনতি-প্রত্যাদেশকে আধ্যাত্মিক জগতের কোন্ স্তরে বিশ্বজুড়ে শ্রীমা পূর্ণ করে চলেছেন, এ বিষয়ে ধ্যান না করলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা সারদার আন্তর পরিচয় পাওয়া অসম্ভব।

শ্রীমায়ের এই অনন্ত উদয়টি হয়েছে জগৎ-জুড়ে মুমুক্ষু হৃদয়ের প্রত্যাকাশে। সকল দেশের জিজ্ঞাসু নরনারী এই সত্যধৃত মহাশ্বাসটি পেয়ে নিশ্চিত হয়ে আছেন যে, আমাদের একটি মা আছেন যিনি করুণাময়ী, আনন্দময়ী, সর্ব-গ্রাহিকা, পরমার্থদাত্রী, যিনি কাউকে পরিত্যাগ করেন না, যিনি অবিশ্বাস্য সমদর্শন, যাঁর জীবিত চরিত্রের কান্ত মণির শান্ত আলোকে ভাস্বর হয়ে আছে বিশ্বের আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রমাণ।

এর চেয়েও মহত্তর কথা হচ্ছে প্রাচ্যে কিংবা পাশ্চাত্যে ভোগবাদের দুর্মদ উদ্দামতায় ক্লান্ত অবসন্নদের উত্তপ্ত ললাটে পড়েছে তাদের অজ্ঞাতে শ্রীমায়ের অনামিকার শান্তি-তিলক। এই ভব-ঘরে তিনি সমদর্শন-প্রেম-কান্ত বৈরাগ্যের এমন একটি অনির্বাণ শিখা হয়ে বিরাজমানা হয়েছেন যে, অধর্মের প্রলয়ংকর ঝঞ্ঝাবাত্যার মধ্যেও এ প্রদীপের কোন হানি হবার নয়। এটিই হল ঈশ্বরের মাতৃত্ব—দুর্যোগের রাতে উদ্‌ভ্রান্ত সন্তানের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় পরমান্ন আগলে বসে থাকা।

শ্রীমায়ের এই শাশ্বত উদয়টি কারো প্রয়োগ-যোজনার ফলস্বরূপ সংঘটিত হয়নি। হয়েছে তাঁর মধ্যেকার ঈশ-মাতৃত্বের অরোধ্য বিস্তার বিজৃম্ভন দ্বারা। আধ্যাত্মিক মনীষিগণ, যখন মায়ের এ মহিমাটির ধ্যান করবেন, তখন তাঁদের হৃদয়ে প্রতিভাত হবে স্বামীজীর ঐ কথার তাৎপর্য: "...দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম।...মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ও ওই যে বলেছি, ওই খানটাই আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন—যা হয় বলো, দাদা কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও।"[১৪১]

[ক্রমশঃ]

---

১৪০ ঐ, পৃঃ ১৩৩

১৪১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, ১৩৮০, পৃঃ ৭৭

জ্ঞান মহারাজের স্মৃতি

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

১৯২৭ সালে আমি প্রথম মঠে যাই। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ জানালা দিয়ে আমাকে দেখে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠান। আমার পরিচয় নেবার পর তাঁর এক সেবককে বললেন : 'একে জ্ঞান মহারাজের কাছে নিয়ে যাও।' জ্ঞান মহারাজ স্বামীজীর ঘরের ঠিক নিচে যে ঘর, সেই ঘরে থাকতেন। তাঁকে শেষ দিন পর্যন্ত সেই ঘরেই দেখে এসেছি। তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলে তিনিও আমার পরিচয় নিলেন। তাছাড়া আমি কোথায় পড়ি, ব্যায়াম করি কিনা, স্বামীজীর বই কি কি পড়েছি ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন করলেন। প্রথমে আমি আড়ষ্ট হয়ে ছিলাম, পরে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে 'আবার এসো' বলে সেদিনের মতো আমাকে বিদায় দিলেন। আমি খিদিরপুর থেকে সাইকেলে চেপে গিয়েছিলাম, তাই বললেন : 'সাবধানে যেও।' আমি তার পরদিনই আবার মঠে গেলাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তাতে বিরক্ত হয়ে আমাকে ধমক দেন। তাঁর ধারণা হয়, আমি বাড়ি থেকে লুকিয়ে মঠে এসেছি। আমি তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান মহারাজের কাছে এলে তিনি খুব সস্নেহে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কি কথা হল আমার মনে নেই, তবে সেদিন অনেকক্ষণ তাঁর কাছে বসেছিলাম।

এরপর থেকে মঠে গেলেই জ্ঞান মহারাজের কাছে যেতাম। ক্রমে দেখলাম—আমার মতো অনেক ছাত্র ও যুবক তাঁর কাছে যেত। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। আমি কোথায় থাকি জেনে তার কাছাকাছি যেসব ছাত্র বা যুবক থাকত, তাদের ঠিকানা দিয়ে বললেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করে নিতে। এভাবে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। তবে আমি বরাবরই একটু লাজুক, তাই দু-একজন ছাড়া আর কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

জ্ঞান মহারাজের পরিচয় জানবার খুব ইচ্ছা হত, কিন্তু জানবার কোন উপায় ছিল না। তাঁকে তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না। জিজ্ঞাসা করলে হয়তো ধমক দিয়ে বলবেন : 'তোর তাতে কি ?' এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জ্ঞান মহারাজ তখনও 'আপনি' শুরু করেননি। অর্থাৎ পরে যেমন ছোট-বড়, নূতন-পুরাতন নির্বিচারে সবাইকে 'আপনি' বলতেন, তখন তা বলতেন না। অন্তত আমাকে তো 'তুই' বা 'তুমি' ছাড়া আর কিছু বলতেন না। পরে হঠাৎ একদিন দেখলাম আমি 'আপনি' হয়ে গেছি। খারাপ লাগল, কিন্তু তিনি আর 'তুই' বা 'তুমি' বললেন না। জ্ঞান মহারাজের দেখতাম গলায় পৈতে আছে, মাথায় শিখা আছে অথচ তিনি গেরুয়া পরেন। তাঁর নাম : ব্রহ্মচারী জ্ঞান। কেন তিনি 'স্বামী' এবং 'আনন্দ' যুক্ত হননি অর্থাৎ সন্ন্যাস নেননি, তা জানবার খুব কৌতূহল হত। তিনি এমনভাবে আমাদের সঙ্গে মিশতেন যেন তিনি আমাদেরই সমবয়সী একজন। তবু কখনও সাহস হয়নি যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। বেশ কিছুদিন পরে অন্যান্য সাধুদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে, স্বয়ং স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করতে। তাই মাথায় শিখা ও গলায় পৈতে রাখতেন। তবে গেরুয়া পরতেন কেন ? এর পিছনের ইতিহাস একটু মজার। একবার তাঁর কাপড় ছিল না, তাই পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গিয়ে কাপড় চাইলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে নিজের ব্যবহার করা একখানা গেরুয়া কাপড় দিলেন। সেই অবধি জ্ঞান মহারাজ গেরুয়া পরতেন। অবশ্য ব্রহ্মচারীর গেরুয়া পরার বিধিও আছে। হয়তো জ্ঞান মহারাজের মনে একটা সুপ্ত বাসনা ছিল যে গেরুয়া পরেন এবং মহাপুরুষ মহারাজ তা বুঝতে পেরেছিলেন।

জ্ঞান মহারাজের পূর্বাশ্রম ছিল বরানগরে। তাঁর ব্রাহ্মণ শরীর। কলেজে যখন পড়েন স্বামীজীর কথা জানতে পারেন। স্বামীজী আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত' এই বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি যেন গল্পের সেই জীয়নকাঠি। তাঁর ছোঁয়া পেয়ে মৃতপ্রায় ভারতবর্ষে নূতন প্রাণসঞ্চার হয়েছে। যুবকদের তিনি বলেছেন: 'ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্যে বলিপ্রদত্ত।' যুবকরা তাই কোমর বেঁধে লেগেছে দেশের ও দশের সেবায়। নারায়ণ জ্ঞানে পরের সেবাকেই তিনি প্রকৃত ধর্ম বলেছেন। চারিদিকে তাই যুবকরা নানারকমের সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। আর একদল বিদেশী শক্তির কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে মেতেছে। যিনি দেশে এই প্রাণের জোয়ার এনেছেন, তাঁকে দেখার এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার সংকল্প করলেন জ্ঞান মহারাজ। খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, স্বামীজী তখন মায়াবতীতে। স্বামীজীর পরম ভক্ত ক্যাপটেন সেভিয়ার মারা গেছেন, তাই স্বামীজী গেছেন মিসেস্ সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে। মিসেস্ সেভিয়ার একাধারে স্বামীজীর শিষ্যা ও 'মা'। স্বামীজী তাঁকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন। মঠ-মিশনের প্রতি তাঁর দানও প্রচুর। মায়াবতীর ওদিককার পাহাড়ীরা তাঁকে দেবীজ্ঞানে পূজো করত। ছেলে-পুলের অথবা গৃহপালিত পশুর অসুখ করলে, তাঁর কাছে নিয়ে আসত, তিনি ছুঁয়ে দিলে সেরে যাবে এই বিশ্বাসে। স্বামীজীর দেহান্তের পরেও তিনি বহু বৎসর মায়াবতীতে ছিলেন। তাঁকে একবার কেউ জিজ্ঞাসা করেন: 'আপনি কি করে থাকেন ঐ নির্জন জায়গায়?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন: 'কেন, স্বামীজীর চিন্তাই কি আমার মনের পক্ষে যথেষ্ট খোরাক নয়?' স্বামীজী যখন মিসেস্ সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মায়াবতীতে আছেন, তখন হঠাৎ একদিন জ্ঞান মহারাজ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। বাস্তবিক তিনি কিভাবে গিয়েছিলেন তা ভাবতে অবাক লাগে। তখন মায়াবতীর কথা কম লোকেই জানত। জানলেও কোথায় সেই মায়াবতী জানত না। পথ অত্যন্ত দুর্গম, কেবল চড়াই-উতরাই। প্রায় ৬০/৬৫ মাইল আবার হেঁটে যেতে হত। গেলেই যে স্বামীজী তাঁকে গ্রহণ করবেন তার কোন মানে নেই। হয়তো বিরক্ত হয়ে তখনই ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু জ্ঞান মহারাজের এসব বিচার করবার তখন অবস্থা ছিল না। যেতেই হবে—এমনি প্রাণের টান। সুখের বিষয়, স্বামীজী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। দীক্ষাও দিলেন।

এই সময় থেকেই জ্ঞান মহারাজ সাধু। স্বামীজী তাঁকে বললেন মায়াবতীতে থেকে যেতে। তিনি থেকে গেলেন। স্বামীজী মায়াবতী ছেড়ে মঠে নেমে এলেন এবং কিছুদিন পরে ইহধাম ছেড়ে চলে গেলেন। জ্ঞান মহারাজ মায়াবতীতে থেকে সেখানকার বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতে লাগলেন। এই সময়েই বোধ হয় তিনি হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থে ঘুরে বেড়ান। জ্ঞান মহারাজ খুব কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। বরাবর অনাড়ম্বর জীবন যাপন করে গেছেন। তাঁর স্বাস্থ্যও চমৎকার ছিল। অসুখ বলে এমন কিছু তাঁর হয়েছে মনে পড়ে না। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে ব্যায়াম করতে দেখেছি। তাঁর ব্যায়াম করার ভঙ্গীটি ছিল বেশ কৌতুকপ্রদ। কথা বলতে বলতে ঘরের মধ্যে

এবং বারান্দায় পায়চারি করতেন। আর বারান্দায় অর্থাৎ মঠবাড়ির গঙ্গার ধারের দিকে যে বারান্দা আছে, সেখানে যেসব থাম আছে, তাদের সঙ্গে যেন কুস্তি করছেন এমন করতেন। আমি দেখে না হেসে পারতাম না। জ্ঞান মহারাজের স্বাস্থ্য ভাল ছিল ঠিক, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। খুব পুরু চশমা ব্যবহার করতেন। শেষের দিকে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বলা যেতে পারে।

জ্ঞান মহারাজকে যখনই দেখেছি, দেখেছি তিনি একটা না একটা কিছু করছেন। চোখের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না, তবু তাই নিয়ে হয়তো লেখাপড়ার কাজ করছেন। অথবা ছবি আঁকছেন। এক সময়ে তো ছবি আঁকা নিয়ে বেশ মেতে গিয়েছিলেন। যদি কেউ তাঁর সঙ্গে না থাকত, তাহলে হয়তো পায়চারি করছেন। বোধ হয় পায়চারি করতে করতে ভাবতেন। তবে অধিকাংশ সময়েই তাঁর কাছে কেউ না কেউ থাকত। অধিকাংশ সময়েই এক বা একাধিক ছাত্র। ছাত্র বা যুবকদের মধ্যে তখন সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলেন জ্ঞান মহারাজ। তাদের সঙ্গে মিশতেন যেন তিনি তাদেরই একজন। উপদেশ দিতেন না, যাকে বলে 'চর্চা' তাই করতেন। অর্থাৎ একটা প্রসঙ্গ উঠলে তা নিয়ে যত দিক থেকে বিচার করা চলে তাই করতেন। কারও স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দিতেন না—তা সে যত ছোট হোক্, যত অজ্ঞ হোক্। অনেক সময় ছাত্রদের কাঁধে হাত দিয়ে চলতেন। ছাত্ররাই ছিল তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। তাদের তিনি নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। তারা কিছু সেবামূলক কাজ করুক, স্বামীজীর ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে নিজেদের জীবন গড়ে তুলুক—এই ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর প্রেরণাতেই শুনেছি স্বামী নির্বেদানন্দজী ছাত্রাবাস খুলেছিলেন। আজ তা একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন ও শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয় তাঁরই উৎসাহে গড়ে উঠেছে।

জ্ঞান মহারাজের মধ্যে অনেক মৌলিক চিন্তা ছিল। মঠের যে পুরানো বাড়ি অর্থাৎ যে-বাড়িতে স্বামীজী, মহারাজ—এঁরা থাকতেন, ঐ বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণায় গঙ্গার দিকে যে গোল ঘরটি আছে, তা অনেকে দেখে থাকবেন। ঐ ঘরটিকে Visitors' Room বলা হত। মঠে কোন ভক্ত রাত্রিবাস করলে ঐ ঘরেই শুতেন। দুপুরেও অনেক ভক্ত ঐখানে বিশ্রাম করতেন। মেজেতে কারপেট পাতা থাকত, তার উপরে বসে বা শুয়ে সবাই সময় কাটাতেন। ঘরের এক কোণে নানারকমের বাদ্যযন্ত্রও থাকত। মৃদঙ্গ তার মধ্যে ছিল প্রধান। বিখ্যাত মৃদঙ্গী ভগবান সেনের মৃদঙ্গ। ভগবান সেন ছিলেন ঐ ঘরের একরকম স্থায়ী বাসিন্দা। বিয়ে-থা করেননি, বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, মঠেই পড়ে থাকতেন। তাঁর আকর্ষণে অনেক বিখ্যাত গাইয়েরা মঠে আসতেন এবং গান গাইতেন। সুতরাং ঐ ঘরে সবসময়েই লোকের ভিড় লেগে থাকত। ঘরের কোণে আরও লক্ষ্য করার জিনিস ছিল—ছোট ছোট কয়েকটা আলমারি, বই দিয়ে ঠাসা। সব ঠাকুর-স্বামীজীর বই। আলমারির গায়ে তালা-চাবি নেই, লেখা আছে: Free, Open Library, অর্থাৎ এমন লাইব্রেরি যেখান থেকে বই নিতে অনুমতির প্রয়োজন নেই। এর সুযোগও সবাই নিতেন অর্থাৎ ভক্তেরা যাঁর যেমন পছন্দ বই আলমারি থেকে নিয়ে পড়তেন। ভাবটা হচ্ছে এই: মঠে এসেছেন, মঠের সম্বন্ধে কিছু না জেনে চলে যাবেন কেন? অথবা মঠে এসেছেন, শুধু গল্প করে বা ঘুমিয়ে সময় কাটাবেন কেন? এই দেখুন কত ভাল-ভাল বই, নিন, যতক্ষণ পারেন পড়ুন। এইসব বই হয়তো

আপনার কেনবার সামর্থ্য নেই। আপনার বাড়ির কাছেও হয়তো এমন লাইব্রেরি নেই যেখানে এইসব বই পাওয়া যায়। সুতরাং এই সুযোগে এইসব বই কিছু পড়ে নিন্। বলা বাহুল্য, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার সবাই করতেন। প্রায় প্রত্যেকেই বই টেনে নিয়ে নিবিষ্ট মনে পড়ছেন দেখা যেত। সব বই যে আবার আলমারিতে ফিরে যেত, তা মনে করলে ভুল হবে। যিনি এর উদ্যোক্তা, তাতে তিনি যে বিস্মিত বা দুঃখিত হতেন, তা কিন্তু নয়। বোধ হয় এরূপ হলে তিনি খুশিই হতেন। কে এই উদ্যোক্তা? জ্ঞান মহারাজ। আজকাল Free-access Shelf-এর কথা খুব শোনা যায়। অর্থাৎ এমন লাইব্রেরি যেখানে পাঠকেরা পছন্দমতো বই তাক থেকে তুলে নিয়ে একটা জায়গায় বসে পড়তে পারবেন। কেবল একটা মাত্র নিয়ম পালন করতে হয় তাঁদের—পড়ার পর ঐ বই তাঁরা নিজেরাই আবার তাকে রেখে যাবেন না। রেখে যাবেন টেবিলের উপর। তাকে রাখবেন না কারণ রাখতে গেলে তাঁরা হয়তো ভুল জায়গায় রাখবেন। এই ব্যবস্থা আজকাল অনেক জায়গায় চলছে। কিন্তু জ্ঞান মহারাজের আগে এই ব্যবস্থার কথা আমাদের দেশে কেউ ভেবেছেন কিনা সন্দেহ।

জ্ঞান মহারাজ উৎসবের সময়েও ছোট-ছোট বই ছাপিয়ে বিতরণের ব্যবস্থা করতেন। ঐসব বইতে সময়োপযোগী নানা রকমের প্রবন্ধ থাকত। অথবা ঠাকুর-স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত করে দেওয়া থাকত। যাঁরা মঠে আসতেন, কিছু মনের খোরাক নিয়ে ফিরে যাবেন—এই ছিল এই বই বিতরণের উদ্দেশ্য। একবার এক উৎসবে মঠে গিয়ে দেখি, মঠের ময়দানে যেসব গাছ আছে, তাদের ডালে পাতার পাশে-পাশে অসংখ্য ছোট-ছোট বই বেঁধে রেখে দিয়েছেন। ভক্তেরা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সেইসব বই পড়ছেন। কেউ-কেউ ডাল থেকে বই ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পুরছেন। অবশ্য কেউ তাতে আপত্তি করেনি। এইজন্যেই তো বইগুলি ঐভাবে রাখা ছিল।

প্রচারের কত যে অভিনব পন্থা জ্ঞান মহারাজের মাথায় আসত, তা ভাবলে অবাক হই। একবার আমাকে ডেকে বললেন: 'দেখ, তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই। তোমাকে কতকগুলি বই দিচ্ছি, এগুলি তোমাকে তোমার ক্লাসের সব ছাত্রের হাতে পৌঁছে দিতে হবে।' ছোট-ছোট বই, সব বই-এ ঠাকুর-স্বামীজীর বাণী সহপাঠীদের হাতে ঐসব বই দিলে তারা কিভাবে নেবে সে বিষয়ে আমার আশঙ্কা ছিল। এর কিছুদিন আগে আমাদের কলেজে গীতা পড়ানোর ব্যবস্থা হয়। স্বয়ং অধ্যক্ষ এসে ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রদের বলে গেলেন, তাঁর অনুরোধ সবাই যেন গীতার ক্লাসে যোগ দেয়। বিনামূল্যে গীতার বিতরণ করার ব্যবস্থাও হল। তবু কিন্তু ছাত্র হল না। আমি ঠাকুর-স্বামীজীর সম্পর্কে বই বিতরণ করব, সেই বই কেউ হয়তো নেবে না, কেউ নিয়ে হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেবে—এ ভাবতে আমার খারাপ লাগছিল। আমাকে যে অনেক বাক্যবাণ সহ্য করতে হবে, তা জানতাম। কেউ সামনাসামনি কিছু বললে তার সমুচিত উত্তর আমি যে দিতে পারব, সে বিশ্বাস আমার ছিল। তবে আমি একা, আর সমস্ত ক্লাস আমার বিপক্ষে—এমন যদি হয় তাহলে আমি কি করব, তা নিয়ে আমার বেশ ভাবনা ছিল।

যা হোক, জ্ঞান মহারাজের কথামতো বই নিয়ে তো তার পরদিন কলেজে হাজির হলাম। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে অধ্যাপক এসে পড়ায় তখন আর বই বিলি করতে পারলাম না। কিন্তু আমার হাতে একগাদা বই দেখে আমার পাশের দু-একটি ছাত্র তা নিয়ে পড়তে লাগল। অধ্যাপকের

পড়ানো শেষ হলে নূতন অধ্যাপক আসার আগেই আমি বই বিলি করতে শুরু করলাম। আমি আবার কি বই বিলি করছি তা দেখবার জন্যে সকলের চোখ আমার উপরে। দু-একজন এগিয়ে এসে আমার কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে গেল। যারা দূরে বসেছিল, তারা আমার কাছ থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি বই চেয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের মধ্যে তা বিলি করতে লাগল। এতে আমি খুব উৎসাহিত বোধ করতে লাগলাম। এতে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক হয়ে গেল। অবশ্য কেউ-কেউ বই পড়তে পড়তে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসছিল তাও লক্ষ্য করলাম। পরের রবিবারে মঠে গেলে জ্ঞান মহারাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে বইগুলি বিলি করেছি, ছেলেরা কে কি মন্তব্য করল, আমি কোন প্রতিবাদ করেছি কিনা ইত্যাদি। এই দিনেও জ্ঞান মহারাজ আবার কতকগুলি বই দিলেন। সোমবারে বইগুলি নিয়ে হাজির হলে ছেলেরা নিজেরাই এগিয়ে এসে বই চেয়ে নিয়ে গেল। লক্ষ্য করলাম দু-চার জন ছাত্র তাদের জায়গা ছেড়ে এল না। আমি নিজে তাদের বই দিয়ে এলাম, এতে তারা বেশ খুশি হল। খানিকটা সংকোচ, খানিকটা আলসেমি, হয়তো খানিকটা গর্ব—এসব থেকেই তারা এগিয়ে আসেনি। আমি লক্ষ্য করলাম, এদিনে বই নিয়েই সবাই পড়তে লেগে গেল। কেউ আর আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল না। দু-একজন আমার কাছে জানতে চাইল কোথা থেকে এসব বই আমি এনেছি। বেলুড় মঠের কথা শুনে জানতে চাইলে আমি সেখানে থাকি কিনা ইত্যাদি। বেশ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে আমাকে এসব প্রশ্ন করতে লাগল। এইভাবে প্রত্যেক সোমবারই আমি জ্ঞান মহারাজের দেওয়া বই নিয়ে কলেজে যেতাম। দু-এক সপ্তাহ বই না নিয়ে গেলে ছাত্রেরা জিজ্ঞেস করত বই নিয়ে আসিনি কেন এবং আবার কবে নিয়ে আসব। তাদের এ আগ্রহ দেখে আমার খুব ভাল লাগত। তবে সবচেয়ে ভাল লাগত এই ভেবে যে, কে কি বলবে এই ভয়ে একটা ভাল কাজে আমি পিছিয়ে যাইনি।

এর পরেই জ্ঞান মহারাজ আমাকে আদেশ করলেন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বই বিলি করতে হবে। তখন শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বড় বড় রাজনৈতিক সভা হত। ঐরকম একটা সভায় বই নিয়ে গিয়ে বিলি করতে বললেন আমাকে। রাজনৈতিক সভায় ঐ বই বিলি করতে আমি মোটেই উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ওঁর আদেশ আমান্য করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। বই দিলে অনেকেই হাত বাড়িয়ে নিলেন সত্য, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, বই মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কেউ কেউ বোধ হয় বিজ্ঞাপন মনে করে না পড়ে ফেলে দিলেন, কেউ কেউ নীরস ধর্ম-প্রসঙ্গ দেখে ফেলে দিলেন। সবাই ফেলে দিলেন বলছি না, অনেকে পকেটে রেখে দিলেন তাও দেখলাম। বাড়িতে ফিরে পড়বেন এই বোধ হয় উদ্দেশ্য। পার্কের মধ্যে অন্ধকার, তাছাড়া তখন বক্তৃতা চলছে। পরে পড়বেন এই ভেবে তুলে রেখে দিলেন। যা হোক এর পরে কিন্তু জ্ঞান মহারাজ আর কখনও পার্কের মধ্যে ঐসব বই বিলি করতে আমাকে আদেশ করেননি। তবে এর পরে যেখানে বই বিলি করতে আদেশ করলেন, তা আমার পক্ষে চরম পরীক্ষা বলা যেতে পারে। তিনি বললেন শিয়ালদা স্টেশনে ঐসব বই বিলি করতে হবে। কেন জানি না, শিয়ালদায় ঐ বই বিলি করতে আমার অত্যন্ত লজ্জা করছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, লোকে আমাকে কি মনে করবে। ভাববে রেলস্টেশনে যেমন দাঁতের মাজন, দাদের ওষুধ

ইত্যাদি বিক্রি করে যে-সব লোক, আমি তাদেরই একজন। বই পড়লে হয়তো বুঝবে যে, দাঁতের মাজন নয়, আমি ধর্ম-পুস্তিকা প্রচার করছি। কিন্তু পড়বে কয়জন? শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেখেছি, খুব কম লোকেই এইসব বই নিতে চায় বা পড়ে। শিয়ালদাতেও আমার সেই অভিজ্ঞতা হল। অনেকেই ট্রেন ধরার জন্যে ব্যস্ত। বই দিতে চাইলে ফিরেও তাকায় না। তবে একটা ঘটনা আমার মনে খুব আঁকা আছে। একজন সাহেবকে দেখলাম, তিনি খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে দিয়ে ট্রেন ধরতে চলেছেন। আমি তাঁর দিকে একটা ছোট ইংরেজী বই এগিয়ে দিতেই তিনি 'Thank you' বলে বইটা সাগ্রহে নিয়ে নিলেন। তারপর একটা দশ টাকার নোট বের করে আমাকে দিতে চাইলেন। তখন আমার আর লজ্জার শেষ রইল না। আমিও তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম—কিছু দিতে হবে না। তিনি একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেলেন। পরে আমার মনে হল বোধ হয় তিনি ভেবেছিলেন কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অর্থ সাহায্য চেয়ে আমি আবেদনপত্র বিলি করছি। তাই টাকা নিলাম না দেখে অবাক হলেন। জ্ঞান মহারাজকে এসে এসব কথা বলাতে তিনি বেশ উপভোগ করলেন।

কোন কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে বলা হয় তাঁরা যেন এক একটা প্রতিষ্ঠান। জ্ঞান মহারাজ সেই শ্রেণীর একজন ব্যক্তি। কত লোককে না তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন। আমি শেষের দিকে তাঁর কাছে বেশি যেতাম না। কিন্তু দূর থেকে দেখতাম, তাঁকে ঘিরে কিছু লোক সব সময়েই রয়েছে। কি কথা হচ্ছে তা অনুমান করতে কষ্ট হত না। কোথায় কি গঠনমূলক কাজ হচ্ছে, কে তার প্রাণকেন্দ্র, কি তার সমস্যা ইত্যাদি নিয়েই কথা। ব্যক্তিগত কথা গৌণ, মুখ্য হচ্ছে দেশ ও সমাজ। কথার মধ্যে হতাশা নেই, প্রধান সুর হচ্ছে—'এগিয়ে যাও, বাধা-বিঘ্ন দেখে ভয় পেও না, সত্যের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই।'

স্থূল শরীরে জ্ঞান মহারাজ না থাকলেও তাঁর স্মৃতি আজও যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের অনুপ্রাণিত করে।

…'আমি কার সন্তান? তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীন বুদ্ধি, হীন সাহস!' হীন বুদ্ধি, হীন সাহসের মাথায় লাথি মেরে 'আমি বীর্যবান্, আমি মেধাবান্, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান্' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। 'আমি অমুকের চেলা, কামকাঞ্চনজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী'—এইরূপ অভিমান খুব রাখবি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নেই, তার ভেতরে ব্রহ্ম জাগেন না। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি? তিনি বলতেন, 'এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী।' এইরূপ অভিমান সর্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে। তা হ'লে আর হীন বুদ্ধি, হীন ভাব নিকটে আসবে না। কখনও মনে দুর্বলতা আসতে দিবিনি। মহাবীরকে স্মরণ করবি—মহামায়াকে স্মরণ করবি। দেখবি সব দুর্বলতা, সব কাপুরুষতা তখনই চলে যাবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

বাইতুম হিমবাহের পথে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

কেশর সিং-এর সঙ্গে আলাপ—সরস্বতী নদীর ধারে, বদ্রীনারায়ণ ও মানা গ্রাম ছাড়িয়ে প্রাকৃতিক পুলটা পার হবার পরেই।

চলেছি বাইতুম হিমবাহ অনুসন্ধান অভিযানে। বাইতুম বা বৈতুম মানে বিশেষভাবে আলোকিত হিমবাহ। এই অপরূপ হিমবাহের কথা খুব কম হিমালয়প্রেমিকই জানেন। অথচ বদ্রীনারায়ণের কাছেই নির্জন সরস্বতী নদীর গানে নিয়ত অনুরণিত, হিমালয়ের হৃদয়ের দাক্ষিণ্যে অবারিত সুন্দর ঢেউ-খেলানো তুষার-ঢাকা ছোট-বড় শৃঙ্গগুলি বিছিয়ে মনোরম বাইতুম যেন দিনরাত জেগে থাকে মানুষের স্পর্শ পাবার লোভে। গল্প আছে, একবার সাত দেবতা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। ওঁরা ফিরে এলে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "আছে নাকি এমন কোন দেশ, যা স্বর্গের থেকেও সুন্দর?" একবাক্যে বললেন ওঁরা—"বাইতুম, বাইতুম সেই অঞ্চল—যার কাছে স্বর্গও হার মানে।" নস্ট্যালজিয়া (উগ্র ঘর-প্রেমী) পীড়িত ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে চিরনির্বাসন দণ্ড দিলেন ঐ দেবতাদের—বাইতুমে। হেসে তাঁদের দিকে ব্যগ্রবাহু মেলে দিল বাইতুম। পরে—লক্ষ যুগ পরে খোলা রেখেছিল তার অঙ্গন—মানুষজন দিনরাত কলকাকলীতে ভরিয়ে রাখত তার বুক—সরস্বতী নদী ধরে তখন ব্যবসাবাণিজ্য চলত—বদ্রীনারায়ণ—মানা গ্রাম হয়ে এই পথে যাওয়া যেত তিব্বত—সেখান থেকে আসত সৈন্ধব লবণ, সোনাদানা, পশম—আর ভারত থেকে যেত শস্য, কাপড়, মনিহারী দ্রব্য। বড় রমরমা সে-সব দিনের স্মৃতি ভুলতে পারে না বাইতুম—বেদনায় সে কাঁদে বুঝি এখন অহরহ—কারণ এপথে সাধারণ মানুষের আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেছে—বড় নির্জন, একা অসহায় তাই বাইতুম।

বদ্রীনারায়ণ থেকে সোজা উত্তরে ২৫-৩০ কিলোমিটার উপরে সরস্বতী নদীর বাঁদিকে বাইতুম হিমবাহের অবস্থান। এইখানে সরস্বতী নদী প্রবাহিত হচ্ছে ১৬ হাজার ফুটের উপর দিয়ে। নদীর ঠিক ডানদিকে আছে বহু পুরানো ভাঙা "ভূতবাংলো" নামে পাথরের একটি ঘর—এককালে তৈরি হয়েছিল এপথের যাত্রীদের ক্ষণিক বিশ্রামাবাস হিসাবে। জায়গাটাকে বলে চানদুমকা। বলতে পারা যায়, চানদুমকার ঐ ভূতবাংলোই হবে নিশানা, ঐ খানেই স্থাপিত হবে অভিযানের মূল শিবির। তারপর সরাসরি নদী পার হয়ে উঠে যেতে হবে উপরে ৫-১০ কিলোমিটার বিস্তৃত বাইতুম হিমবাহে ১৮০০০—২২০০০ ফুট উঁচু ৮/১০টি জানা অজানা পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে—কোনটা গম্বুজের মতো, কোনটাকে দেখে মনে হয় বরফের পিরামিড। এই হিমবাহটিতে মানুষ কখনও অভিযান চালায়নি। বছরের অর্ধেক সময় টন টন পুরু তুষার দিয়ে ঢাকা থাকে সারা অঞ্চলটি। এখানে অভিযান চালাবার পক্ষে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরই প্রকৃত সময়: মিলিটারী অনুমতি ছাড়া এ অঞ্চলে ঢোকা যায় না।

আজই প্রথম পদযাত্রা বদ্রীনারায়ণ থেকে। আনন্দপ্রবাহিনী অলকানন্দা অনুসরণ করে উঠলে বদ্রীনারায়ণের পর ছোট মানা গ্রাম—এখন এ গ্রামটির গুরুত্ব অনেকখানি—আছে মিলিটারী ছাউনি। এই গ্রামের লোকেরাই বেশির ভাগ

দলভুক্ত হয়েছে আমাদেরই মালবাহক হিসাবে।

মানা গ্রাম পেরিয়ে বিশাল এক প্রাকৃতিক সেতু—পাথরের। তার নিচে সরস্বতী নদীর স্রোতোধারা আছড়ে পড়ে বিলীন হচ্ছে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে বসুধারা জলপ্রপাত থেকে আসা অলকানন্দায়।

মেঘমন্দ্র ধ্বনি—যেন হাজার শাঁখের আওয়াজ যেন সমুদ্র-আহ্বান। রোদ উঠলে লক্ষ রামধনু ফোটে—পাথর ছিটকে ধোঁয়া হওয়া জলরঙ্গে। দাঁড়িয়ে দেখতে গেলে, শুনতে গেলে কূল কাল হারিয়ে যায়। এর বাঁদিকে আরেকটা সেতু—ভীমপুল—সেটা পেরিয়ে বসুধারা হয়ে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথ।

প্রাকৃতিক সেতু পেরিয়ে হাঁটছি। এগিয়ে গেছে সবাই। একা একা চলেছি সবার পিছে। হাল্কা পিঠুয়া একটা পিঠে। হাতে তুষার গাঁইতি। যদিও এখন তার কোন দরকার নেই—স কাজ করা ছাড়া।

কেশর সিং ভেবেছে, এই চার কিলোমিটারেই দম হারিয়ে ফেলেছি। ওর পিঠে ভারী বোঝা। হাতে ঝোলানো ফ্লাস্কে কফি।

—"ডগদর সাব", হিন্দীতে বলতে থাকে ও, "তোমার কি কষ্ট বা অসুবিধা হচ্ছে? তাহলে দাও তোমার বোঝাটা চাপিয়ে আমার পিঠে। কফি আছে আমার কাছে—খাবে কি? তুমি দলের ডাক্তার—তুমি কাহিল হলে তো চলবে না।"

—"কেশর সিং, আমার বোঝা খুব হাল্কা। তা ছাড়া আমাদের দলের অলিখিত নিয়ম, ডাক্তার যাবে সব শেষে। এই তো খেয়ে বেরিয়েছি, কফি একটু পরে সবার সঙ্গেই খাব, কেমন?" বলি কেশরকে।

—"তাহলে আমি তোমার সঙ্গেই থাকি। আমিও সব শেষে চলি।"

—"দেখতেই তো পাচ্ছি।" হেসে উঠি দুজনেই। শিশুর মতো সুন্দর লাগল কেশরের হাসি। নিখুঁত ভাবে কামানো দাড়ি, দশাসই ইয়া বড় কালো তাজা গোঁফ, পাথর কুঁদে খোদাই করা তাগড়াই শরীর—গৌরবর্ণ—যৌবনদীপ্ত।

আলাপ জমে উঠল কেশর সিং-এর সঙ্গে। বয়স খুব জোর ৩৫ বছর। মা-বাবা মারা গেছেন কৈশোরেই। কর্ণপ্রয়াগের কাছে কোথায় আছে নিজের এক চিলতে ঘর—খোঁজ রাখে না তার—যায়ও না সেখানে। লেখাপড়া করেছিল ২ ক্লাশ অবধি। কিন্তু জানত ভাল তিব্বতী ভাষা। দোভাষী হিসাবে কাজ করেছে ভারতীয় মিলিটারীতে। ভাল লাগেনি ও চাকরিটা। ছেড়ে দিয়েছে বছর দুয়েক পরেই। তারপরেই স্বাধীন এক জীবিকা—হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চল থেকে ওষুধ তৈরির জড়িবুটি সংগ্রহের কাজে লেগে পড়ে। জড়িবুটির খুব চাহিদা—যেমন আয়ুর্বেদে, তেমনি ফারমাসিউটিক্যাল কোম্পানী-গুলিতেও। ও অবশ্য কাঁচা মাল সরবরাহক। দেয় সেগুলো তুলে দালালদের হাতে। মার খায় সেখানেও। আসল লাভের কড়ি গোনে দালালরা দুদিক থেকে। তবু একা কেশর সিং-এর কিছু টাকা জমে যায়। একটু জমি কেনে মানা গ্রামে। সেখানকারই একটি মেয়ের সঙ্গে বছর কয়েক আগে বিয়ে হয়েছে তার।

—"জড়িবুটির খোঁজে যাও এখনও?"

—"এখন বেশির ভাগ ক্ষেতীর কাজ করি। আলু চাষ। বৌ সাহায্য করে। তবে জড়িবুটিটা নেশা—মাঝে মাঝে সে নেশায় পেয়ে বসে। ঘরে বসে থাকতে পারি না।"

—"আমাদের সঙ্গে এলে কেন? এখন তো আলু উঠবার সময়!"

—"তোমরা অভিযানে চলেছ, আমি কি লোভ সামলাতে পারি? হারাতে পারি এমন

সুযোগ ? আর ক্ষেতীর কাজ দেখবে আমার বৌ।"

—"কিন্তু ঘরে যে তোমার এক বছরের ছেলে ? তাকে রাখবে কোথায় ?"

—"পাড়ায় তো বুড়ীর অভাব নেই। এক বুড়ী এসে দেখে যাবে মাঝে মাঝে। বাড়িতে আছে কুকুর, সেই আসলে পাহারা দেবে ছেলেকে —ছেলে ঘুমুবে বা খেলবে একটা খাঁচার মতো ঝুপড়ির ভিতর।"

ভাল। ভাবি মনে হিমালয়ে এ এক অভিনব আকর্ষণ! মুখে বলি, "এ পথে তো জড়িবুটি মিলবে না!"

—"ডাক্তার সাহেব, জানি সে কথা। তোমরা চটি চড়নেওয়ালা। আমার তো মনে হয়, রোমাঞ্চ এখানে পদে পদে। তাই তার হাতছানিই আমাকে নিয়ে এসেছে তোমাদের দলে।"

—"তাই কি ? দেখা যাক, কী রোমাঞ্চ, কত রোমাঞ্চ আছে, কী স্বাদ তুমি পাও!" বলি কেশরকে। তবে একথা ঠিক, চটি চড়নে-ওয়ালাদের দেখে এরা খুব বড় চোখে।

প্রথম দিনের পদযাত্রা। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। ২।১ বার বৃষ্টি পড়েছে। কনকনে ঠাণ্ডা হা হা বাতাস বইছে। দু-পাশে রুক্ষ পাথর। গাছপালা কখন মিলিয়ে গেছে। এমন কি ঝোপ-ঝাড়ও বাড়ন্ত। মনে হয়, এখানে বিরাট এক আণবিক যুদ্ধ হয়ে গেছে অতীতে, ছোট-বড়-মাঝারি পাথরের চাঁই ছড়ানো মাইলের পর মাইল। আপাততঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের থেকে তার রূঢ় রুক্ষতাই বেশি নজরে পড়ছে। ব্যতিক্রম শুধু ডানদিকে প্রবাহিত আলোর নদী সরস্বতী—কোথাও সাদা, কোথাও নীল, কোথাও শ্যামলা, কোথাও-বা সবুজ তার জলরাশি। হয়তো লোকে প্রকৃতিকে অকরুণ ভাবতে পারে যাত্রাপথে, তাই গান গাইতে গাইতে পথিকের চোখের সামনে তার এই ঘন ঘন রঙ বদলানোর প্রয়াস।

*

জায়গাটার নাম মুষাপানি—হয়তো হিমালয়ের মূষিকরা এখানে জল খেতে আসে—মাত্র ৬।৭ কিলোমিটার বদ্রীনারায়ণ থেকে। এই জায়গায় নদীর অপর পারে এলাম পাথর ডিঙিয়ে। বেশ বড় সমতল মতো ভূখণ্ড। এখানেই যাত্রা শেষ আজকের। তাঁবুগুলো পড়ল সারি সারি। কেন্নোর মতো আমাদের এই অগ্রগতি দেখে রোমাঞ্চ খুঁজছে যে কেশর সিং, সেও হতাশ হল। তবু হাসিমুখে চটি চড়নেওয়ালা প্রত্যেকের মুখে তুলে দিল কফি।

তখন শেষ বিকেল। চারিদিক কেমন ফিকে সাদা হয়ে গেল। প্রথমে বৃষ্টি, তারপর শুরু হল তুষারপাত। তুলনা করে বলি বটে, সাদা কোন আকাশ-কুসুম ঝরছে—কিন্তু প্রথম দিনেই তুষার-পাত বিশ্রী মানসিক অস্বস্তি জাগিয়েছে দলের সবার মনে। একটি তাঁবুর ভিতর কাতরাচ্ছে আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার আশিস্। বড় কাজের ছেলে। সবার খাওয়া-দাওয়ার দিকে তীক্ষ্ণ নজর সব সময়। শুধু তাই নয়—হৈ-চৈ হাসি ঠাট্টা আমোদ আহ্লাদে জমিয়ে রাখে সবাইকে। কী হল তার ? গিয়ে দেখি, জণ্ডিসের লক্ষণ—বমিভাব সব সময়, চোখ হলদে, পেটে ব্যথা। মুষড়ে পড়ে সবাই এই ছন্দপতনে। ওদিকে যে তাঁবুটিতে দলনেতা বৈদ্যনাথ রক্ষিতের সঙ্গে আমার থাকার ব্যবস্থা, সেটা চুঁয়ে জল পড়ছে। বাতাসে উড়িয়েই নিয়ে গেল সহ দলনেতা সুব্রাহ্মনিয়মের তাঁবু। ঝড় তুষারপাত ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে প্রভাত আর বরুণ তখন বাতাসনিরোধক জামা (wind proof jacket) পরে তাঁবু দুটো ঠিক করছে, সব তাঁবুর উপর পলিথিনের চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে, যাতে আর জল চোঁয়াতে না পারে।

একদিনেই ছন্নছাড়া অবস্থা। মাথায় উঠল খাওয়াদাওয়া। কিন্তু ৭টা ৭॥০ টার সময় অস্থায়ী

কোয়ার্টার মাস্টার বিকাশের মমতামাখা গলা—"বৈদ্যনাথ দা, অমিয়দা, উঠুন—খিচুড়ি—"

ঘুমুনোর থলের ভিতর ঢুকে পড়েছি তখন—বেরুতে মন চাইছিল না। দেখি, পিছনে গরম কফির মগ হাতে কেশর সিং—সে, মালুম হচ্ছে, বিকাশের একনিষ্ঠ সাগরেদ হয়ে উঠেছে। রোমাঞ্চ খুঁজছে—ভাববে বড় শীতকাতুরে অলস এই ডাক্তার সাহেব, তাই বাধ্য হয়ে বেরুলাম। সেলাম জানিয়ে আর্জি পেশ করল, "শির দরদের দাওয়াই দাও—"

হেসে উঠলাম। পকেটেই আছে। বের করে দিলাম। বুঝতে পেরেছে আমার বিদ্রূপাত্মক হাসি। বলল—"আমার জন্তে নয়—আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার সাহেবের জন্তে।"

আমার খাটুনী বাড়ল। বেরুতে হল তাঁবুর বাইরে। কেশরকে বললাম, "চল, দেখে আসি একবার আশিস্‌কে।"

মিটি মিটি হেসে আমার পিছু নিল কেশর সিং।

পরের সকালটা আকাশ মেঘলা হলেও বৃষ্টির চিহ্নমাত্রও ছিল না। প্রথম কাজই হল মালবাহকদের সর্দার পূরণ বাহাদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে একজন বিশ্বস্ত মালবাহকের সঙ্গে আশিস্‌কে বদ্রীনারায়ণে পাঠানো, সেখানে মিলিটারী ডাক্তার রয়েছেন, হাসপাতাল রয়েছে, ত্রুটি হবে না চিকিৎসার। যাবার আগে আশিস্ তখন বারবার বোঝাচ্ছে বিকাশকে (যদিও বিকাশ সবই জানে), কার কত ক্যালরি লাগবে, কী ভাবে খাবার দিয়ে সে ক্যালরি পূর্ণ করতে হবে সদস্যদের, কে ভালবাসে আচার, কে আমসত্ত্ব, কবে খোলা হবে সার্ডিন মাছের টিন—এইসব।

এদিকে কিন্তু নানান অছিলায় খচ্চরের মালিকরা অহেতুক দেরি করছে খচ্চরের পিঠে মাল বোঝাই করতে। মালবাহকদের দুটো দল। একদল আমাদের সঙ্গে থাকবে, এরা পিঠে মাল বয়ে নিয়ে চলেছে। আর একদল নিয়ে চলেছে মালবাহী খচ্চর—বলতে পারা যায় তুষারপথের উট—মাল মূল শিবিরে পৌঁছে দিয়ে খচ্চরগুলোকে নিয়ে ওরা ফিরে আসবে। খচ্চরগুলো খুব সম্ভবতঃ নয়—কিন্তু খচ্চর-ওয়ালারাই যতরকম অসুবিধার ধুয়া তুলছে, কেমন একটা অসহযোগিতা করছে প্রথম থেকেই। কেন? কারণটা অর্থঘটিত। মূল শিবিরে পৌঁছুতে আমরা চাই দুদিনে, ওদের দাবি তিনদিন। তাহলে রোজ মিলবে বেশি। অথচ খোঁজ নিয়েছি, দস্তুর এপথে দুদিনের। যারা পিঠে মাল বইছে, তারাও তাতে রাজি। তারা আবার বেশিরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের দিকে।

বিচিত্র খচ্চরওয়ালাদের টালবাহানা। পথ একটা রয়েছে, তবু বলছে, পথের বরফে খচ্চরের পা যাবে বসে। সে রকম বরফ পড়েনি রাতে। বলছে, কয়েক কিলোমিটার দূরে ঘাসতলী—আজ তার এক ইঞ্চি উপরে উঠবে না। ঘাসতলীর উপর পথে বরফ যদি থাকে, তারা ফিরে আসবে এই ভয়ও দেখাল। অথচ আমরা পৌঁছুতে চাই আজ মূল শিবির চানদুমকা (১৫,২০০ ফুট বা ৪৬৫০ মিটার)।

ওদের কাছে নতি স্বীকার নয়। ওরা যদি খচ্চর নিয়ে ফিরেও আসে, তাহলে যে দশজন মালবাহক আমাদের সঙ্গে আছে এবং থাকবে, তারাই ফেরি করে মাল বইবে—এই ঠিক হল।

[ক্রমশঃ]

ভক্তমিলন-তীর্থ বাগবাজার

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

একবার শ্রীরামকৃষ্ণ গেছেন স্টার থিয়েটারে অভিনয় দেখতে। অভিনয় শেষে গিরিশ এলেন তাঁর কাছে। কথায় কথায় শ্রীরামকৃষ্ণকে অশ্রাব্য কটুবাক্য প্রয়োগে জর্জরিত করলেন। এই গালাগালিতে ভক্তমণ্ডলী ক্রোধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব 'মানসিক ভাব' দেখে সকলেই মনের আবেগ সংবরণ করলেন। সদাহাস্যময় পরমকারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিমুখে প্রত্যাবর্তন করলেন দক্ষিণেশ্বরে। এই ঘটনার পর একদিন দক্ষিণেশ্বরে আগত রামচন্দ্র প্রমুখ ভক্তদের কর্ণগোচর হলে ভক্তেরা বলেছিলেন যে, গিরিশের কোন অপরাধ নেই। কালিয় সর্পের মুখে বিষই থাকে, অমৃত নেই। সুতরাং গিরিশের অন্তরে যা পূর্ণ ছিল, সেই কালকূটসম বাক্যগুলি পরিত্যাগ করবার স্থান তো শ্রীরামকৃষ্ণই উপযুক্ত। এতদিনে অন্তেরা নালিশ করত, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে অঞ্জলি পেতে নিয়েছেন। সাধে কি তিনি 'পতিতপাবন দয়াময়'! ভক্তদের এই কথা শ্রবণমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের মুখমণ্ডল আরক্তিম হয়, নয়ন দুটিতে জল ভরে এল এবং তখনই গিরিশের বাড়ী যাবেন বলে উঠে দাঁড়ালেন। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্যতাপের ক্লেশ উপেক্ষা করে সেই দণ্ডে শকটারোহণে গিরিশের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। এদিকে গিরিশ তাঁর নিজ কীর্তি স্মরণ করে আপনাকে আপনি সহস্র লাঞ্ছনা করছিলেন। ভাবছিলেন, কেমন করে তিনি ভদ্র সমাজে মুখ দেখাবেন।[৫৪] এর পর প্রত্যক্ষদর্শী লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথায়—"সন্ধ্যার কুছু আগে হামরা তাঁর বাড়ীতে গেলুম। ঠাকুর এসেছেন শুনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে নেমে এলেন। তাঁকে দেখেই মাটীতে সটান শুয়ে পড়লেন। ঠাকুর যখন বললেন—'হয়েছে হয়েছে' তখন তিনি মাটী ছেড়ে উঠলেন। পরে কত কথা বললেন। সেদিন গিরিশবাবুকে বলতে শুনেছি—'আজ যদি তুমি না আসতে, ঠাকুর! তাহলে বুঝতুম তুমি এখনো নিন্দা-স্তুতিকে সমান জ্ঞান করতে পারোনি, তোমার পরমহংস-নামে অধিকার আসেনি। তুমি আমাদেরই মতন একজন, লোক ভাঁড়িয়ে খাও। আজ বুঝেছি তুমি সেই, তুমি সেই; আর আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না। এবার আমি আর তোমায় ছাড়ছি না! আমার ভার সব তোমার উপর দিয়ে দিলুম। বল, তুমি আমার ভার নেবে, আমায় উদ্ধার করবে'।"[৫৫] সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এমনভাবে উপদেশ দিতে লাগলেন ও ভক্তগণসহ এমন হরিনাম সংকীর্তন করলেন যে, গিরিশের সকল দুঃখ ও লজ্জা দূর হয়ে গেল।[৫৪]

এ ছাড়া, শ্রীরামকৃষ্ণের গিরিশ ভবনে শুভ পদার্পণ হয়েছিল আরও তিনবার—১৮৮৫

৫৪ ..বনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৪২-৪৩

এই বই-এতে ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন বেলা দ্বিপ্রহরে দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ যাত্রা করেছিলেন গিরিশ ভবনের উদ্দেশে। লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথাতে পাচ্ছি সন্ধ্যার আগে সেখানে পৌছানোর কথা। আর দক্ষিণেশ্বর থেকে বাগবাজার বেশী দূর নয়। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে দ্বিপ্রহরের বেশ কিছু পরে তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে যাত্রা করেছিলেন।

৫৫ লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা, পৃঃ ১১৯-২০

খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুআরি, ১১ মার্চ ও ২৪ এপ্রিল।[৫৬] ২৫ ফেব্রুআরি বেলা তিনটায় গিরিশের বাড়ীতে সৎপ্রসঙ্গ করে স্টার থিয়েটারে 'বৃষকেতু' অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। ১১ মার্চ সকাল দশটায় বলরাম মন্দিরে ভক্তগণসঙ্গে লীলাখেলা করে, রাত নয়টায় গিরিশের বাড়ীতে ভগবৎকথা আলোচনাদি করে অনেক রাতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান। আর ২৫ এপ্রিল সারাদিন বলরাম মন্দিরে অতিবাহিত করে সন্ধ্যায় সদলবলে এলেন গিরিশভবনে। কীর্তনানন্দের ঢেউ আর লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণমাতানো বাক্যসুধা ভক্তেরা আকণ্ঠ পান করলেন। পরিশেষে জলযোগ করে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন।

বলরামের বাড়ী থেকে গিরিশের কাছে যাবার সময় মাস্টার মহাশয় একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন—"বোসপাড়ার তেমাথা পার হ'চ্ছেন—কিছু দূরেই শ্রীযুক্ত গিরিশের বাড়ি। এত শীঘ্র চলেছেন কেন? ভক্তেরা পশ্চাতে প'ড়ে থাকছে। না জানি হৃদয়মধ্যে কি অদ্ভুত দেবভাব হইয়াছে! বেদে যাঁহাকে বাক্য-মনের অতীত বলিয়াছেন, তাঁহাকে চিন্তা করিয়া কি ঠাকুর পাগলের মতো পাদবিক্ষেপ করিতেছেন? এইমাত্র বলরামের বাড়িতে বলিলেন যে, সেই পুরুষ বাক্য-মনের অতীত নহেন; তিনি শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির, শুদ্ধ আত্মার গোচর। তবে বুঝি সেই পুরুষকে সাক্ষাৎকার ক'রছেন! এই কি দেখছেন—'যো কুছ হ্যায়, সো তুঁহি হ্যায়?'

"...জীবজগৎ! ভাবে এসব কি দেখিতেছিলেন? তিনিই জানেন, অবাক হ'য়ে কি দেখছিলেন! দু-একটি কথা উচ্চারিত হইল, যেন বেদবাক্য—যেন দৈববাণী—অথবা, যেন অনন্ত সমুদ্রের তীরে গিয়াছি ও অবাক হ'য়ে দাঁড়াইয়াছি; আর যেন অনন্ততরঙ্গমালোত্থিত অনাহত শব্দের একটি-দুটি ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল।"

"দ্বারদেশে গিরিশ; ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গৃহমধ্যে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে যেই নিকটে এলেন, অমনি গিরিশ দণ্ডের ন্যায় সম্মুখে পড়িলেন। আজ্ঞা পাইয়া উঠিলেন, ঠাকুরের পদধূলা গ্রহণ করিলেন ও সঙ্গে করিয়া দু-তলায় বৈঠকখানা ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তেরা শশব্যস্ত হ'য়ে আসন গ্রহণ করিলেন—সকলের ইচ্ছা, তাঁহার কাছে বসেন ও তাঁহার মধুর কথামৃত পান করেন।"[৫৭]

গিরিশভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করে, ভক্তদের অনেক প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছেন, মনের সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন, তেমনি তিনি সঙ্গীতের সুর মূর্ছনায় সকলকে মোহিত করেছেন। আর অন্যের সঙ্গীত-শ্রবণে তিনি স্বয়ং বিচরণ করেছেন ভাবরাজ্যে। নরেন্দ্রনাথ এবং গিরিশের নিযুক্ত কীর্তনীয়া ছিলেন শেষোক্ত দলে। মোট তিনদিনেতে শ্রীরামকৃষ্ণ গেয়েছেন তিনটি—(১) শ্যামাধন কি সবাই পায়, (২) যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তা'রা তা'রা দু ভাই এসেছে রে (ভক্তগণ সঙ্গে), (৩) নদে টলমল টলমল করে, গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে। নরেন্দ্রনাথের দুটি গান—(১) চিদানন্দ সিন্ধু নীরে প্রেমানন্দ লহরী এবং (২) সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে—মোহিল প্রাণ। এই "গান শুনিতে শুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণের বহির্জগৎ ভুল হইয়া আসিতেছে আবার নিমীলিতনেত্র! স্পন্দনহীন দেহ! সমাধিস্থ!"[৫৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশে কীর্তনীয়া গেয়েছেন ছয়টি

৫৬ কথামৃত ৫।১৭।১-৩, ১।১৪।৫-৯, ২।২৪।৩-৭
৫৭ ঐ, ১।১৪।৫-৬
৫৮ ঐ, ১।১৪।৯

গান তাঁর দলবলসহ—(১) পূর্বরাগ—আরে মোর গোরা দ্বিজমণি, (২) ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার, তিলে তিলে আইসে যায়, (৩) কহ কহ সুবদনী রাধে! কি তোর হইল বিয়াধে, (৪) কদম্বের বনে, থাকে কোন্ জনে, কেমনে শবদ্ আসি, (৫) পহিলে শুনিনু, অপরূপ ধ্বনি, কদম্ব কানন হৈতে। "আহা সকল মাধুর্যময় কৃষ্ণনাম"—এই কথা শ্রবণে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা—"একেবারে বাহ্যশূন্য, দণ্ডায়মান। সমাধিস্থ!"[৫৯] এবং শেষ গানটি—(৬) যে দেখেছি যমুনাতটে সেই দেখি এই চিত্রপটে।

সর্বশেষে গিরিশের আপ্যায়নে সপার্ষদ ও সভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদধারণের দৃশ্য—"ঘরের পশ্চিম দিকের ছাদে পাতা হইয়াছে। এইবার গিরিশ ঠাকুরকে ও ভক্তদিগকে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। বৈশাখ শুক্লা দশমী। জগৎ হাসিতেছে। ছাদ চন্দ্রকিরণে প্লাবিত। এদিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ।"[৬০]

গিরিশের ভাই অতুলের সম্বন্ধে কিছু না বললে গিরিশভবন-প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতুল কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। যখন শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারের পথ দিয়ে ভক্তগণ সঙ্গে গাড়ী করে যেতেন বা হাঁটতেন, তখন অতুল 'রাজহংস' নামে তাঁকে ব্যঙ্গ করতেন। একথা জানতে পেরে একদিন অতুলকে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "সে কিগো, রাজহংস ত ভাল কথা। সে যে হাঁসের রাজা; আবার দুধে জলে এক করে দিলে, দুধটুকু খেয়ে নেয়।" অতুল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গ গুণে অতুলের মতিগতি পরিবর্তিত হয়ে তাঁর কৃপা-লাভের অধিকারী হলেন।[৬১] অতুল নিজ গৃহ ও বলরাম মন্দির ব্যতীত শ্যামপুকুর, দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র ও পূতসঙ্গ করে নিজের জীবন ধন্য করেছিলেন। লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথায় পাই—"একদিন তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) গিরিশবাবুর বাড়ী গেলেন। সেখানে গিরিশবাবুর ভাই অতুলবাবুর (শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ) সাথে তাঁর অনেক কথা হোলো; সেখানে খাবার সময় উনি নোরেনবাবুর পাতে দই প্রসাদ দিয়েছিলেন।"[৬২]

এই গিরিশ ও অতুল কাশীপুরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুআরির কল্পতরু দিবসে শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ-কৃপালাভের অধিকারী হয়েছেন।[৬৩]

[ক্রমশঃ]

৫৯ ঐ, ২।২৪।৪
৬০ ঐ, ২।২৪।৭
৬১ শ্রীরামকৃষ্ণ—সুবোধ দে, পৃঃ ২৮৬
৬২ লাটু মহারাজ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ১২২
৬৩ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব (আত্মপ্রকাশে অভয়-প্রদান), পৃঃ ৩৯৭

নানা ব্যক্তিত্বে আইনস্টাইন

ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য

বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অন্যতম। সত্যান্বেষণের জন্য সারাজীবন কঠোর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনা করেছেন তিনি। এই জ্ঞান-তাপসের ব্যক্তিত্ব ছিল অদ্ভুত ও বৈচিত্র্যময়। কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটি সুরই বেজে চলত— তিনি একজন আপনভোলা সত্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানী। এই মহামনীষীর জীবন থেকে নির্বাচিত কয়েকটি চিত্র আমরা এখানে উপস্থাপনা করছি—নানা ব্যক্তিত্বে তাঁকে দেখব বলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের উপকণ্ঠে প্রিন্সটন্ শহর। রাস্তার ধারে ১১২ নম্বর বাড়িতে একজন পক্ককেশ ব্যক্তি থাকেন। ঐ বাড়িরই পাশের বাড়িতে দশ বছরের একটি ছোট মেয়ে তাঁর কাছে রোজ অঙ্ক শিখতে আসে। মেয়েটির মা কয়েক দিন পর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'হ্যাঁরে, বই-খাতা নিয়ে তুই কোথায় যাস্ রে?' সে নির্দ্বিধায় উত্তর দিল: 'কেন, ঐ বাড়িতে একমাথা সাদা চুলওয়ালা একজন থাকেন। তিনি খুব ভাল অঙ্ক জানেন। আমাদের স্কুলমাস্টারের চেয়ে ভাল অঙ্ক জানেন। তাই ওঁর কাছে অঙ্ক শিখতে যাই।' মেয়েটির কথা শুনে তো তার মার আক্কেল গুড়ুম্! ঐ বাড়িতে তো বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন থাকেন! তাড়াতাড়ি তিনি আইনস্টাইনের কাছে ক্ষমা চাইতে ছুটলেন। মেয়েটির মার সব কথা শুনে আইনস্টাইন স্মিত হেসে বললেন: 'আপনি বিব্রত হচ্ছেন কেন? শিশু আমার কাছে যা শিখেছে, তার চেয়ে ঢের বেশি তার কাছে আমি শিখেছি।'

ছোটদের সঙ্গে মিশবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাদের সঙ্গে যখন মিশতেন, তখন তারা ভাবত যেন তিনি তাদেরই একজন। তাই তারা তাঁর সঙ্গে অবলীলায় মিশতে পারত।

কত বড় বড় বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে আইনস্টাইন যোগ দিয়েছেন। সে-সব সম্মেলনে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা পোশাক-পরিচ্ছদে ফিটফাট হয়ে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি অতি সাধারণ পোশাকে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। পোশাকের দিকে তাঁর মোটেই দৃষ্টি ছিল না। তিনি ঢিলে-ঢালা পোশাক পরতেন। গ্যালিস না পরার জন্য অনেক সময় প্যাণ্ট নিচের দিকে নেমে আসত, ফলে তাঁকে বার বার হাত দিয়ে টেনে প্যাণ্টটাকে ওপরে তুলতে হত।

নতুন জায়গায় গেলে প্রায়ই তিনি রাস্তা ভুলে যেতেন। একবার তিনি কোন্ একটা বড় শহরে রয়েছেন। হোটেল থেকে বেরিয়ে একটু পায়চারি করতে করতে বেশ কিছুটা দূরে এসে পড়েছেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল—ফিরতে হবে। কিন্তু তিনি হোটেলের নাম জানেন না, নম্বরও মনে নেই, রাস্তাঘাটও তাঁর চেনা নেই। তিনি কি করে ফিরবেন—মহামুশকিলে পড়ে গেলেন! কাছে একটি পার্ক ছিল। উঁকি মেরে তিনি দেখলেন, সেখানে কয়েকটি ছেলে খেলা করছে। তাদের মধ্যে একজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: 'আচ্ছা, খোকা, তুমি কি জান অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আজ এসে কোন্ হোটেলে উঠেছে?' ছেলেটি বলল: 'ওঃ! তুমি জান না? আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে।'—এই বলে ছেলেটি পার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আঙুল দিয়ে নির্দেশ

করে তাঁকে হোটেলটি দেখিয়ে দিল। তবে তিনি হোটেলে যেতে পারলেন।

প্রায়ই দেখা যেত গ্রীষ্মকালে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ঢিলে-ঢালা পোশাক পরে, শুধু চপ্পল পরে আইস্‌ক্রীম খেতে খেতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। অবাক বিস্ময়ে ছাত্র-শিক্ষক সবাই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এই আপন-ভোলা বৈজ্ঞানিকের দিকে তাকিয়ে থাকত।

আইনস্টাইন আপনভোলা ছিলেন, কিন্তু যে জিনিসের প্রতি মনোযোগ দিতেন, তা সাংসারিক সামান্য জিনিস হলেও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠত। একটি ঘটনা :

একবার তিনি আমন্ত্রিত হয়ে চেকোশ্লো-ভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে যান। তিনি আগে এখানে অনেকদিন ছিলেন। পুরানো জায়গায় এসে তিনি একজন সহকর্মী বিজ্ঞানীকে নিয়ে পরিচিত জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঐ বিজ্ঞানী আর তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দুপুরের বাজার করে নিয়ে এলেন খানিকটা বাছুরের লিভার—খুব জমিয়ে আনন্দ করে খাবেন বলে বিজ্ঞানীর তরুণী স্ত্রী সবেমাত্র কলেজ ছেড়েছেন এখনও পাকা গিন্নি হতে পারেননি। কিভাবে লিভার রান্না করতে হয় তা তিনি জানেন না।

বিজ্ঞানী আর আইনস্টাইন লিভার এনে দিয়ে যেখানে রান্না হচ্ছে তার পাশে বসে মনের আনন্দে খোশমেজাজে গল্প করছেন। হঠাৎ আইনস্টাইনের দৃষ্টি পড়ল রান্নার দিকে। তিনি দেখেন, ঐ বিজ্ঞানীর তরুণী স্ত্রী লিভার রান্নার জন্য জলে প্রথমে তাকে সিদ্ধ করে নিচ্ছেন। তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন : 'আরে করেন কি! করেন কি! লিভার কি কখনও জলে সিদ্ধ করতে হয়? লিভার কি জলে সিদ্ধ হয়? সিদ্ধ করার জন্য চর্বি বা মাখন ব্যবহার করুন।'

সেদিন দুপুরের আনন্দ-ভোজটি আইনস্টাইনের জন্য নষ্ট হল না। তাহলে দেখা যাচ্ছে—যিনি ভাল বিজ্ঞানী হতে পারেন, তিনি ভাল রাঁধুনীও হতে পারেন।

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য সর্বদা চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতেন। তাই বলে চিন্তার ভারে তাঁর মুখ থেকে সরল হাসিটি কখনও ফুরিয়ে যায়নি। তিনি ছিলেন সদা হাস্যময়। আর তিনি রহস্যও করতে পারতেন খুব। অমন একটি সেরা রহস্য, ইংরেজীতে যাকে ক্ল্যাসিক হিউমার বলা চলে, উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করছি :

আইনস্টাইন বিভিন্ন দেশে আমন্ত্রিত হয়ে সস্ত্রীক ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পথে ইহুদী জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের নেতা ওয়াইজম্যানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাঁকে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে আমেরিকায় যাওয়ার জন্য। আইনস্টাইনও রাজী হলেন। ওয়াইজম্যান তাঁদের নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করলেন। তাঁরা নিউইয়র্ক বন্দরে এসে নামতেই আইনস্টাইন-দম্পতিকে দেখবার জন্য গোটা আমেরিকা ভেঙে পড়ল কোন রাষ্ট্রনায়ক, অভিনেতা বা খেলোয়াড় নয়, একজন বিজ্ঞানীকে দেখার জন্য এমন আগ্রহ আর কখনও আমেরিকাবাসী দেখেনি। দলে দলে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফাররা ছুটে এসেছেন। যে যেখান থেকে পারলেন আইনস্টাইন-দম্পতির ছবি তুললেন। কত রকমভাবে যে ফটো তোলা হল তার ইয়ত্তা নেই। ফটো তোলা শেষ হতে আইনস্টাইন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তিনি মুচকি হেসে বললেন : 'দেখে শুনে মনে হচ্ছে, আমি এখন বিজ্ঞানী নই, আসলে একজন নামকরা নাচুনী।'

*

আইনস্টাইনের চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে,তিনি নিজেকে সব বিবাদ-বিসম্বাদের উর্ধ্বে তুলে রাখতে পারতেন। তাঁর বিরোধী সমালোচনাও তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার ক্ষমতা রাখতেন। শোনার সময় তিনি একটুও উত্তেজিত না হয়ে বরঞ্চ বক্তার বক্তব্যকে হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা জানাতেন। একটি ঘটনা :

আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানে আলোক-বৈদ্যুতিক তত্বের আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। এই পুরস্কার পাওয়ার পর সারাবিশ্বে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর আমন্ত্রণ আসতে লাগল। সবার মুখে মুখে তখন আইনস্টাইনের নাম। জার্মানির জাত শত্রু ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা যখন তাঁকে এই সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান দিলেন, তখন তাঁর বিরোধী দলও সভাসমিতি করে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লেগে গেলেন। জার্মানিতে তখন রাতারাতি আইনস্টাইন-বিরোধী একটি দল গজিয়ে উঠল। এই সংস্থার কাজ : আইনস্টাইন ইহুদী এবং শান্তিবাদী বলে তাঁকে জার্মানির জনসাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা, আর যে-সব পত্র-পত্রিকা এবং সভাসমিতি আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রচার করে তাদের পুষ্টির জন্য অকাতরে অর্থ দেওয়া। এইভাবে জার্মানির বুদ্ধিজীবীমহলকে আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিল ঐ সংস্থাটি।

ওয়েল্যাণ্ড নামে এক ব্যক্তি একটি সভার আহ্বায়ক ছিলেন। একবার তাঁদের এক সভায় খ্যাতনামা ইহুদী বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের সমাবেশ ঘটানো হল। উদ্দেশ্য ছিল—লোককে দেখানো যে, বিজ্ঞানীমহল ও ইহুদীরা আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত তত্বে বিশ্বাসী নন। সভার উদ্যোক্তারা প্রাণ-খুলে আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকেন। মজা এই যে, সেই সভায় স্বয়ং আইনস্টাইনও শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তাদের ঐ সব অশ্রাব্য বক্তব্য খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে-ছিলেন। সব শুনে তিনি পরম ঔদার্যে নিন্দাকারী বক্তাদের আইনস্টাইন-বিরোধী ঐ প্রয়াসকে হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনাও জানিয়েছিলেন।

আইনস্টাইন ছিলেন প্রকৃত অর্থেই শান্তি-বাদী। তাই বলে তিনি কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজীবন তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন। তার জন্য তাঁকে আঘাতের পর আঘাতও সহ্য করতে হয়েছে। তবু তিনি অন্যায়কে কোনদিন বরদাস্ত করেননি। অন্যায়কে চোখের সামনে দেখে নীরব দর্শক হয়ে থাকতে তিনি পারেননি। একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে :

আইনস্টাইন তখন নিউইয়র্কে। প্রচলিত বিবাহপ্রথা ও ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে অনাস্থার জন্য খ্যাতনামা ইংরেজ দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে নিউইয়র্কের সিটি কলেজের অধ্যাপকের পদটি দেওয়া হল না। তখন রাসেলের হয়ে আইনস্টাইন প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন : 'ব্যক্তি-গত ও রাজনৈতিক কারণে একজন অসামান্য অধ্যাপকের নিয়োগ আটকানো অন্যায়।' এর ফল হল—রাসেল-বিরোধীরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখলেন : ' "নগ্নতাবাদে বিশ্বাসী" রাসেল ও "উদ্বাস্তু" আইনস্টাইনের এত স্পর্ধা কি করে হল যে, তাঁরা আমেরিকার পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করে।' আইনস্টাইন কিন্তু তাঁদের এইসব রূঢ় ভাষা অম্লানবদনে সহ্য করলেন।

তিনি ছিলেন প্রিন্সটনের 'ইনস্টিট্যুট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজে'র সদস্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আমেরিকা যখন বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে একের পর এক আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে পরীক্ষামূলকভাবে, তখন সারা বিশ্ব ভয়ে হতবাক,

ঠিক সেই মুহূর্তে আজীবন শান্তিবাদী এই মানুষটি এগিয়ে এলেন প্রতিবাদ জানাতে। মার্কিন বিজ্ঞানীদের 'এমার্জেন্সি কমিটি'র প্রধান হিসাবে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন: 'বন্ধ কর এই মানুষমারা খেলা।' তিনি আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন আণবিক বোমার প্রতিক্রিয়ার কথা। কিন্তু হায়! তখন এই মরমী মানুষটির কথা কেউ শুনল না। আজও সেই বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বীর কথা শুনে মানুষমারা খেলা বন্ধ হল না।

আইনস্টাইন-চরিত্রের আরও এক বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি কাউকে অবহেলা করতেন না। সবাই যাদের উপেক্ষা করত, তিনি তাদেরও প্রত্যাখ্যান করতেন না। তাই তাঁর কাছে সেই সব উপেক্ষিত উদ্ভট চিন্তাশীল ব্যক্তিদের ভীড় লেগেই থাকত। তাঁর কাছে এইসব ব্যক্তিরা এসে তাদের নানারকম উদ্ভট চিন্তা-ভাবনার কথা বলার সুযোগ গ্রহণ করত। এত বড় একজন বিশ্ববিশ্রুত মনীষীর কাছে তাদের ভাব ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়ে, তারা খুব আনন্দ পেত। আইনস্টাইন তাদের প্রত্যেকটি বক্তব্য, যত উদ্ভটই হোক না কেন, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং প্রয়োজন মতো উপদেশ দিয়ে উৎসাহিত করতেন তারাও যে কিছু চিন্তা করে, এইটাই আইনস্টাইনের কাছে বড় জিনিস।

পরদুঃখে সাহায্য করার জন্য তিনি সর্বদা হয়ে থাকতেন। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কারো কারোকে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি অনেক সময় অনেকের বিরাগভাজন হয়েছেন। তবু তিনি কখনও সাহায্য করতে পরাঙ্মুখ হননি। মজা হচ্ছে—যারা তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে তাদের মধ্যে অনেকে আবার তাঁকে পরে গালাগালি দিত। এ-সব জানা সত্ত্বেও তাঁর উদার হস্ত সবার জন্য সর্বদা প্রসারিত থাকত। একবার এক অচেনা যুবক তাঁর কাছে সাহায্য পেয়ে কিরকম অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তারই নিজের অভিজ্ঞতার কথা :

'আইনস্টাইনের পরনে ছিল সকালের পরা জামা আর ডোরাকাটা পাজামা। পাজামার অপরিহার্য বোতাম ছিল না।...তাঁর প্রতিভার কথা, পদার্থবিজ্ঞানের কীর্তির কথা না ভেবে আমি তখন ও পরে ভেবেছি তাঁর মহাপ্রাণতার কথা—(তাঁর চরিত্রে) অতিশয় আন্তরিকতা ও অতীব অসংপৃক্ততার অপূর্ব সংমিশ্রণের কথা।' তাঁর ব্যক্তি-চরিত্রের মাধুর্যে চমৎকৃত হয়ে বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুইস ডে ব্রোগলি বলেছেন: 'তাঁর মধুর প্রকৃতি ও সর্বব্যাপী করুণা, তাঁর সরলতা ও সৌহার্দ বিশেষভাবে আমার হৃদয় জয় করেছিল।' আইনস্টাইনের নিজের উক্তি: 'পরার্থে বাঁচাই বাঁচার মতো বাঁচা; মানুষের কল্যাণকামনা, মানুষের ভবিষ্যতের ভাবনা প্রতিনিয়ত আমাদের সকল প্রয়াসের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।'

আইনস্টাইন ভাল বেহালা বাজাতে পারতেন। তাঁর মার কাছ থেকে তিনি ছোট বেলায় বেহালা বাজানো শিখেছিলেন। এই বিদ্যার চর্চা তিনি সারাজীবন করে গিয়েছেন। দুঃখের দিনে তাঁর একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু ছিল এই বেহালা। জীবনের চরম দুঃখের মুহূর্তে বেহালার শব্দমূর্ছনায় ব্যক্ত হত তাঁর হৃদয়তন্ত্রীর মর্মবেদনা। এইভাবে কিছু সময় বাজিয়ে তিনি সমস্ত দুঃখবেদনা ভুলে যেতেন আর তখন প্রবেশ করতেন এক অপার শান্তির জগতে। অদ্ভুত তাঁর ব্যক্তি-চরিত্র!

বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের চরিত্রের আর একটি

বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। ধর্মকে তিনি অস্বীকারও করেননি। তবে তিনি তথাকথিত আচার-সর্বস্ব ধর্মে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ছিলেন জাতিতে ইহুদী। কিন্তু তিনি ইহুদী সম্প্রদায়ের আচার-বিচার নিয়ে কোনদিনই মাথা ঘামাননি। যৌবনে যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা বলেন: 'কোন প্রচলিত বিশেষ ধর্মবোধে তিনি আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না।' সম্প্রদায়ের স্কুলে তখনকার দিনে ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যিক ছিল। স্কুলে শিশুদের ঈশ্বর সম্বন্ধে যে-সব শিক্ষা দেওয়া হত, তাতে তিনি ঠাট্টা করে বলতেন: 'ঈশ্বর যেন কোন মেরুদণ্ডসম্পন্ন বায়বীয় প্রাণী।'

তিনি বিশ্বাস করতেন সেই ধর্মে, যে-ধর্ম মানুষকে ধারণ করে তার জীবন ও কর্মপ্রবাহকে চালিত করে। অতীন্দ্রিয় সত্তায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন: 'সবচেয়ে বড় অনুভূতি হল অতীন্দ্রিয়ের আস্বাদ। সে অনুভূতির স্বাদ যে পায়নি, বা পেয়েও বিস্ময়ে অভিভূত হয়নি সে তো মৃত ব্যক্তি—তার বাঁচা মরা দুই সমান্।' আইনস্টাইন 'অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অভিজ্ঞতার জন্যই' নিজেকে প্রকৃত অর্থে ধার্মিক বলে মনে করতেন। তাঁর গবেষণার বিষয়ই ছিল জগৎ-রহস্যের সমাধান উদ্ঘাটন করা। দৃশ্যমান জগতের প্রতি তাঁর আগ্রহ তো ছিলই, কিন্তু তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছিল এই দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে যে-শক্তি রয়েছে, যার দ্বারা বিশ্বসংসার একটি সুশৃঙ্খল নিয়মে চলছে। তিনি বলছেন: 'আমি জানতে চাই ঈশ্বর কেমন করে বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন। দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের এ-বস্তু সে-বস্তুর প্রতি আমার আগ্রহ নেই। আমি তাঁর চিন্তার সন্ধান পেতে চাই।' তাঁর কাছে এ-জগৎ নিয়ম বহির্ভূত মোটেই নয়, একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মেই জগৎ চলছে। তাই তিনি বলেছেন: 'ঈশ্বর দুনিয়াকে পাশার ছকে চালান না।' তিনি মনে করতেন, এই জগৎ চলছে অদৃশ্য এক শক্তির পরিচালনায়। এই শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই। এই শক্তির বাইরে কেউ যেতে পারে না। তিনি বলছেন: 'কোন কিছুর জন্যই আমি কোন কৃতিত্ব দাবি করি না। সবকিছু—আদ্যন্ত—আমাদের নিয়ন্ত্রণ-নিরপেক্ষ শক্তিসমূহের দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট।—নির্দিষ্ট যেমন কীট-পতঙ্গের জন্য, তেমনি নক্ষত্ররাজির জন্যও। মনুষ্যসমাজ উদ্ভিদ্-জগৎ বা মহাজাগতিক রেণু—আমরা সকলেই এক অদৃশ্য বাঁশিওয়ালার দূর থেকে বাজানো বাঁশির রহস্যময় স্বরলহরির তালে-তালে নাচি।'

বিশ্ববিশ্রুত এই বৈজ্ঞানিকের কাছে বিজ্ঞান ছিল ধর্মের পরিপূরক এবং ধর্ম বিজ্ঞানের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। তিনি বলছেন: 'বিজ্ঞান শুধু তাঁদেরই দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে, যাঁরা সত্য লাভ ও উপলব্ধির জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষায় অধীর। অবশ্য এই ধরনের মনোবৃত্তির উৎস দেখা যায় ধর্মের ক্ষেত্রে। আবার এই মনোবৃত্তির অঙ্গীভূত হচ্ছে সেই অটল বিশ্বাস—যে-সব নিয়মে এই জগৎ নিয়ন্ত্রিত, সেগুলি যুক্তিসহ অর্থাৎ বিচারের মাধ্যমে আমাদের বুদ্ধিগম্য। এই প্রগাঢ় বিশ্বাস না থাকলে কেউ যে সত্যিকারের বিজ্ঞানী হতে পারেন, এটা আমি ভাবতে পারি না। একটি উপমার দ্বারা ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে: ধর্ম ব্যতিরেকে বিজ্ঞান খোঁড়া, বিজ্ঞান ব্যতিরেকে ধর্ম অন্ধ।' তিনি মনে করতেন, জড়জগতে যাঁরা সত্যিকারের একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, তাঁরাই একমাত্র ধার্মিক।[১]

১ My Views—Albert Einstein, Edited and Compiled by Sailesh kumar Bandopadhyaya (1967), p. 58

কয়েকটি ঘটনা এবং উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের নানা ব্যক্তিত্বের পরিচয় এখানে দেওয়া হল। তিনি কখন সরল শিশুর মতো শিশুদের সঙ্গে মিশছেন, যেন তাদেরই মতো একজন হয়ে। আবার কখন তিনি রাস্তায় আপনভোলা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই মানুষটি আবার নিজেকে নিয়ে কৌতুকও করছেন। বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যে আবার নিজেকে ধীর শান্ত ও উদাসীন রাখছেন। এই মানুষটি আজীবন শান্তিপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনে বজ্রাদপি কঠোর হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেও পারতেন। সবার কাছে যারা উপেক্ষিত অবহেলিত, তিনি তাদের যোগ্য সম্মান দিতেন। পরদুঃখে এই মানুষটির হৃদয় সর্বদা কাতর হয়ে উঠত। নিজে যখন বাইরে থেকে প্রচণ্ড আঘাত পেতেন, মনের ক্ষত ভুলতেন তাঁর প্রিয় চিরসাথী বেহালাটি বাজিয়ে। এই মানুষটি আবার অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতির জন্যও লালায়িত।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ই. টি. স্টার্ডি

ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য

[ফাল্গুন, ১৩৮৯ সংখ্যার পর]

বন্ধনের ভার ক্রমশঃ স্টার্ডির উপর আরও চেপে বসবে আমরা লক্ষ্য করব। কিন্তু এই বন্ধনের রশি, বলা বাহুল্য, স্টার্ডি স্বেচ্ছায় নিজের গলায় পরেছিলেন। সন্ন্যাসের তথা ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে উচ্চ-প্রশংসিত আকুমার ব্রহ্মচর্যের প্রতি ছিল স্টার্ডির একটি বিশেষ আকর্ষণ। জীবনে বিবাহ করবেন না, ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করবেন এই বাসনা নিয়ে তিনি এসেছিলেন ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে এসে কিছুকাল সাধুসঙ্গ করেছেন, হিমালয় অঞ্চলে যোগাভ্যাস করেছেন এবং অত্যন্ত কঠোর জীবন যাপন করেছেন—তার উল্লেখ আমরা প্রবন্ধের প্রথমেই করেছি। স্টার্ডি সে-সময় গভীর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে হয়তো ভাবছিলেন ঐ-সব কঠোরতার ফলে তিনি একজন উঁচুদরের যোগিপুরুষে পরিণত হয়েছেন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ইন্দ্রিয়-সংযমের উচ্চতম ভূমিতে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে সেই স্টার্ডি ভারত থেকে ইংলণ্ডে ফেরার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে শুধু বিবাহই করলেন না, অনতিবিলম্বে দুটি সন্তানের জনকও হলেন এবং লুসি নামে যে মহিলা স্ত্রী হয়ে স্টার্ডির জীবনে এলেন, তাঁর তিরিক্ষি মেজাজ, মুখরা স্বভাব, কর্তৃত্বপরায়ণতা স্টার্ডির জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইদের সঙ্গে স্টার্ডির ঘনিষ্ঠতাকেও লুসি মোটেই ভাল চোখে দেখেননি। তাঁর মনে একটা সন্দেহ হয়তো জেঁকে বসেছিল যে, স্টার্ডি স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইদের প্রভাবে আবার সংসার ছেড়ে চলে যেতে পারেন বৈরাগ্যের জীবনে। এই সন্দেহের বশেই বোধ হয় লুসি স্বামীজীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন যার উল্লেখ আমরা পরে পাব। আমাদের অনুমান যে, স্বামী অভেদানন্দকে স্টার্ডির তাড়াহুড়ো করে আমেরিকা পাঠানোর ব্যাপারে লুসির দিক থেকেও হয়তো প্রবল তাগিদ ছিল। শুনেছি স্বামী অভেদানন্দও এই মহিলার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দের একটি অপ্রকাশিত পত্রে নাকি লুসির দুর্ব্যবহার এবং স্টার্ডির উপর তাঁর প্রচণ্ড প্রভাবের খবর

আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লণ্ডনে আসার পর থেকে নিউইয়র্কে যাওয়া পর্যন্ত স্বামী অভেদানন্দ স্টার্ডির বাড়িতেই অতিথি হিসেবে ছিলেন।

বিবাহোত্তর জীবনে স্টার্ডি ক্রমশঃ উপলব্ধি করেছিলেন বিবাহ তাঁর জীবনের গতিপথকে বিপরীত রেখায় নিয়ে গিয়েছে। স্বামীজীর শরীর ত্যাগের সাড়ে ছ-মাস পরে (১৮ জানুআরি, ১৯০৩) ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে নিজের আকাঙ্ক্ষিত যোগী-জীবনের ব্যর্থতার রূপটি স্টার্ডি তীব্র আত্মবিদ্রূপের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: 'আমার মনে পড়ছে [১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাদে] ভারতবর্ষ থেকে শেষবারের মতো চলে আসার সময় একজন মহিলা জ্যোতিষীর হস্তগণনাকে কী বিদ্রূপ এবং ঘৃণার সঙ্গেই না নিয়েছিলাম যখন তিনি আমার সম্পর্কে বলেছিলেন: "তোমার দুবার বিয়ে হবে, সন্তানাদি হবে এবং রমণীসূত্রে অনেক দুঃখভোগ করবে।" [এই ঘটনার উল্লেখ করছি] এই কারণে যে, এটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমার তখন নিজের উপর যে চূড়ান্ত আস্থা ছিল তার কথা, যে-জীবন [অর্থাৎ সংসারত্যাগী যোগী-জীবন] আমি অবলম্বন করতে চেয়েছিলাম, সেই জীবন সম্পর্কে আমার আত্মবিশ্বাসের কথা এবং আমার সেই নিষ্কম্প ধারণার কথা যে, রমণী-সম্পর্কিত যাবতীয় দুর্বলতা এবং প্রভাবকে আমি সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করতে পেরেছি এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চিতভাবে সেই ভাবটি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব।'[১৪]

স্টার্ডি তাঁর ভবিষ্যৎ শুনে ব্যঙ্গ ও ঘৃণার হাসি দিয়ে জ্যোতিষীর বচনকে যখন উপেক্ষাভরে গ্রহন করছিলেন, তখন স্টার্ডির বিধাতা অলক্ষ্যে হাসছিলেন স্টার্ডির শূন্যগর্ভ আত্মবিশ্বাস আর মিথ্যা আত্মম্ভরিতার মস্ত ফানুসের ছিদ্রটির দিকে তাকিয়ে।

আলেকজাণ্ডার পোপের একটি বিখ্যাত কথা আছে: 'Fools rush in where angels fear to tread.'[১৫]—দেবদূতরাও যেখানে যেতে ভয় পায়, নির্বোধরা সেখানে যাওয়ার জন্য আগ বাড়িয়ে ছোটে। স্টার্ডি তাই করেছিলেন। ম্যারী লুইস বার্ক তাই বলেছেন: 'Cocksure where even saints are prayerful, Mr. Sturdy had tempted the gods.'[১৬] বিধাতার পক্ষ থেকে স্টার্ডির অহঙ্কারের প্রত্যুত্তর স্টার্ডির বিবাহ এবং তাঁর পত্নী লুসি—যাঁর অঙ্গুলি-হেলনে স্টার্ডিকে তাঁর পারিবারিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম ও পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত করতে হত।

মূল প্রসঙ্গ থেকে আমরা কিছুটা সরে গিয়েছিলাম। অবশ্য প্রসঙ্গের প্রয়োজনেই। আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি স্টার্ডি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে ভারতবর্ষের কাছাকাছি এসেও স্বামীজীর আমন্ত্রণ সত্ত্বেও ভারতে আসেননি। স্বামীজী ইংলণ্ডে না যাওয়ায় স্বামীজীর উপর স্টার্ডির অভিমান এর পিছনে নিশ্চয়ই ছিল। স্টার্ডির ভারতে আসা এবং স্বামীজীর সঙ্গে আবার সাক্ষাতের ব্যাপারটি হয়তো বা লুসিরও অভিপ্রেত ছিল না। অতি-মাত্রায় স্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে স্ত্রীর ইচ্ছার বাইরে কিছু করার সাহস স্টার্ডির ছিল না। তবে স্বামীজীর আহ্বানে সাড়া না দিতে পারার বেদনা তাঁর মনে ছিলই। সেটা স্বামীজী স্টার্ডির চিঠি থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই

১৪ Marie Louise Burke, 'Second Visit', p. 49
১৫ An Essay on Criticism, p. 625
১৬ 'Second Visit', p. 49

ওলি বুলকে স্টার্ডির দুরবস্থার জন্য সমবেদনা জানিয়েছিলেন। একদিকে স্বামীজীর আহ্বান, অন্যদিকে স্ত্রীর আপত্তি এই দোটানায় স্টার্ডি শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর ইচ্ছার কাছেই নতি স্বীকার করেছিলেন। অবশ্য স্বামীজীর কাজে সাহায্য করা এবং তাঁকে নিজের আবাসে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে কখন কখন নিজের ইচ্ছাকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা তিনি করেছেন। অন্তত তা করার কথা তিনি ভেবেছেন। পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরে মিস ম্যাকলাউডের চিঠিতে (২৮ অগস্ট, ১৮৯৮) স্টার্ডি জানতে পারলেন যে, স্বামীজী আবার পাশ্চাত্যে আসার কথা ভাবছেন। স্টার্ডিকে খবরটি জানাতে স্বামীজীই ম্যাকলাউডকে অনুরোধ করেছিলেন। ম্যাকলাউড, নিবেদিতা ও ওলি বুল তখন স্বামীজীর সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণ করছেন। ম্যাকলাউডকে চিঠির উত্তর দিতে বেশ দেরী করলেন স্টার্ডি। কারণ ম্যাকলাউডের চিঠিতে স্বামীজীর যে পরিকল্পনার কথা স্টার্ডিকে জানানো হয়েছিল সে-সম্পর্কে সংসারী স্টার্ডি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করছিলেন। যাই হোক, ১৮ অক্টোবর, ১৮৯৮ ম্যাকলাউডকে স্টার্ডি লিখলেন: '...আপনার চিঠিতে স্বামীজী এবং তাঁর [পাশ্চাত্যে আসার] পরিকল্পনা সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি এসেছে সে ব্যাপারে [আমার পক্ষে কতটা স্বামীজীর সাহায্যে আসা সম্ভব হবে] ভাবছিলাম। তাই চিঠির উত্তর দিতে এতটা সময় লেগে গেল।...'[১৭]

কাছাকাছি সময়ে লেখা স্বামীজীর দু-একটি চিঠিতেও তাঁর আমেরিকায় আসার পরিকল্পনার কথা পাওয়া যায়। একটি চিঠি মেরী হেলকে লেখা। তারিখ ২৮ অগস্ট, ১৮৯৮। আগামী মাস কয়েকের মধ্যে চীন এবং জাপান হয়ে আমেরিকা যাবেন বলে জানিয়েছেন সেখানে। আরেকটি চিঠি ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ শ্রীনগর থেকে শিষ্য হরিপদ মিত্রকে লিখেছেন। তাতে বলছেন: 'নভেম্বর বা ডিসেম্বরে চীন ও জাপান হইয়া আমেরিকায় যাইব—এই তো এখন বাসনা। পরে শ্রীপ্রভুর হাত।' ম্যাকলাউডকে লেখা স্টার্ডির চিঠি থেকে মনে হয় যে, স্বামীজী আমেরিকার বস্টন শহরকে তাঁর আগামী পাশ্চাত্য সফরের প্রধান কর্মকেন্দ্র করতে চেয়েছিলেন এবং স্টার্ডিকে তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে সেখানে পেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এমন হতে পারে যে, ইংলণ্ডে মৃতপ্রায় বেদান্ত-আন্দোলনকে পুনরায় উজ্জীবিত করার ব্যাপারে পরিশ্রম (শারীরিক এবং মানসিক) এবং আর্থিক দিকটির কথা ভেবে এবং সে-সময়ে তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী আমেরিকা থেকে কেন্দ্র পরিচালনা করা সহজসাধ্য হবে বলে ভেবেছিলেন। স্টার্ডি ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন: 'ইংলণ্ড থেকে বেশি দিন আমাকে বাইরে থাকতে হয় এমন কোন কাজে নিজেকে যুক্ত রাখার কোন সম্ভাবনা আমি দেখছি না। কাজেই স্বামীজী যদি বস্টনকে কেন্দ্র করে কাজ করা এবং [বই] লেখার কথা ঠিক করে থাকেন তাহলে আমার আশঙ্কা, আমি যতখানি তাঁকে সাহায্য করতে চাই ততখানি করতে পেরে উঠব না। অপরপক্ষে যদি তিনি (স্বামীজী) লণ্ডনকে কর্মকেন্দ্র করা ঠিক করেন, তাহলে আমার বাড়িতে তিনি বাসস্থান করলে আমার পক্ষে তা আনন্দের ব্যাপার হবে। আর যদি তিনি চান আমি তাঁর জন্য [লণ্ডনে] অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানের ব্যবস্থা করি, তাও

১৭ Ibid., p. 56

আমি সানন্দে করব উভয় ব্যবস্থার যে কোনটিতেই আমি সর্বদাই তাঁর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখব এবং তাঁর জন্য সব কিছু করতে পারলে আমি যে কত আনন্দ পাব তা বলে বোঝাতে পারছি না। (নিম্নরেখা প্রবন্ধকারের) কিন্তু তাঁর কাছে [এ-ব্যাপারে] কোন কিছু প্রস্তাব করতে আমার ঠিক সাহস হচ্ছে না, কারণ আমি যখন বাস্তবিক দেখছি এখানকার তুলনায় আমেরিকায় বেদান্ত-আন্দোলনের কাজ কী বিরাটভাবে এগিয়ে চলেছে। এখানে বর্তমানে আন্দোলনের কিছুই নেই, অথবা বলা যেতে পারে এখানে আমরা আন্দোলনকে সেভাবে সংগঠিত করতে পারিনি।···

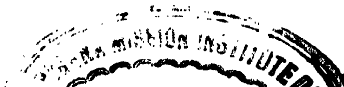
'স্বামীজী সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন তা সমস্তই আমি ভালভাবে বুঝি। আমি ভালভাবেই জানি যে, যাঁরই বাড়িতে তিনি বাস করুন না কেন তাঁকে [থাকা বা কাজকর্মের ব্যাপারে] সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। আমি এও জানি অনুকূল বন্ধুত্বপূর্ণ খোলামেলা পরিবেশ তিনি কত পছন্দ করেন। এ-সমস্ত স্বাধীনতাই তিনি আমার বাড়িতে পাবেন।'[১৮] [নিম্নরেখা প্রবন্ধকারের] শেষের বাক্যটি লেখার পর স্টার্ডির হয়তো হঠাৎ স্মরণে এসেছে যে, সেই 'স্বাধীনতা' দেবার অধিকার এখন আর তাঁর একার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা থাকলেও স্বামীজীকে সম্পূর্ণ সাহায্য করার ব্যাপারে স্টার্ডির কাছে লুসি এখন একটি প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক সেই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়ে এবং বিবাহ যে তাঁর পক্ষে কল্যাণকর না হয়ে বরং উলটোটাই হয়েছে, তা মর্মে মর্মে বুঝে স্টার্ডি অতঃপর ম্যাকলাউডকে লিখলেন: 'আমার জীবনে অনেক জিনিসই এসেছে বড় দেরীতে; একটা সময় ছিল যখন আমি সংসারের যাবতীয় বন্ধন ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলাম, সে-সময় স্বামীজীর গুরুভাইদের* সঙ্গে দেখা না হয়ে স্বয়ং স্বামীজীর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া উচিত ছিল। এবং তা হলে সকলের পক্ষে তা কত যে কল্যাণপ্রদ হত! কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ থেকে কারুর অব্যাহতি পাবার উপায় নেই!—তাই মৃত্যু হল গুডউইনের, আর আমার হল এই দুর্গতি।'[১৯]

লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখনও স্টার্ডি স্বামীজী সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ঘটনাটি যে একটি মহৎ ঘটনা তাঁর জীবনে সে-কথা এখনও স্টার্ডি আন্তরিকভাবেই ভাবছেন। এর পরেও কিছুকাল স্টার্ডির সেই মনোভাবটি থাকবে আমরা লক্ষ্য করব। তবে তা কতখানি অকৃত্রিম ছিল বলা শক্ত। কারণ তাঁর পরবর্তী আচরণ অন্যরকম হবে, আমরা লক্ষ্য করব। ইতিমধ্যে স্বামীজীর প্রস্তাবিত পাশ্চাত্য-যাত্রার সময় পিছিয়ে গিয়েছে। কারণ স্বামীজীর শারীরিক অক্ষমতা। তাঁর ঐ সময়ের কয়েকটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, কাশ্মীরে তাঁর স্বাস্থ্যের খুবই অবনতি হয়েছিল। প্রধানত সেজন্য স্বামী সারদানন্দের উপর নিবেদিতা প্রভৃতিকে উত্তর

১৮ Ibid., pp. 56-57

* 'গুরুভাইদের' বলতে স্টার্ডি এখানে বলতে চেয়েছেন স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী সচ্চিদানন্দের কথা যাঁদের সঙ্গে আলমোড়ায় তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। (দ্রঃ স্বামীজীর নিকট স্টার্ডির পত্র: ৩০ মার্চ, ১৮৯৫: 'Second Visit', p. 49) এখানে উল্লেখ্য, স্বামী সচ্চিদানন্দ স্বামীজীর গুরুভাই ছিলেন না। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'বুড়ো বাবা' নামে পরিচিত স্বামী সচ্চিদানন্দ (পূর্বনাম দীননাথ সেন) স্বামী সারদানন্দের কাছে সন্ন্যাস-দীক্ষা পান। বয়সে অবশ্য স্বামী সারদানন্দের চেয়ে তিনি অনেক বড় ছিলেন।

১৯ Ibid., p. 57



ভারতের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখানোর ভার দিয়ে তিনি মঠে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলেন। স্বামী সারদানন্দকে এজন্য টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তিনি শ্রীনগরে নিয়ে এসেছিলেন। কলকাতা ফেরার পথে লাহোর থেকে ১৬ অক্টোবর হরিপদ মিত্রকে স্বামীজী লিখেছিলেন : 'কাশ্মীরে স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে…এ বিধায় কলিকাতা চলিলাম। আমেরিকা যাইবার সংকল্প এখন পরিত্যাগ করিয়াছি।' কিন্তু মঠে ফিরে এসে যখনই একটু সুস্থ বোধ করেছেন আবার ইউরোপ এবং আমেরিকা যাওয়ার কথা ভেবেছেন স্বামীজী। তাঁর ভাবনার অন্যতম কারণ—লণ্ডনের কাজ ভেঙে পড়ায় স্টার্ডির আশাভঙ্গের জন্য তিনি নিজেকে কতকটা দায়ী মনে করতেন। লণ্ডনের কাজের ব্যর্থতার ব্যাপারে স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে টাকা-পয়সার অভাব একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই লণ্ডন কিংবা আমেরিকা যেখানেই হোক গিয়ে অর্থাদি সংগ্রহ করে লণ্ডনের বেদান্ত-আন্দোলনকে পুনরায় সজীব করে তোলার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন স্বামীজী। এভাবে কখন ভেবেছেন ১৮৯৯-এর জানুআরিতে ম্যাকলাউড ও ওলি বুলের সঙ্গে যাবেন, কখন ভেবেছেন ঐ বছরের গ্রীষ্মে যাবেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর শারীরিক অপটুতা এবং সে কারণে চিকিৎসকদের নিষেধ। তাই বার বার যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়েছে তাঁকে। এ-সম্পর্কে ক্রিস্টিন, ওলি বুল, ম্যাকলাউড, মেরী হেলকে এই সময়ে লেখা তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রে এবং গুরুভাইদের সঙ্গে আলোচনায় আমরা প্রয়োজনীয় সংবাদ পাই।[২০] যাই হোক, ঐ বছর এপ্রিল মাসে স্বামীজী ইংলণ্ডে আসছেন একথা স্টার্ডিকে জানানো হলে (স্বামীজীই স্টার্ডিকে জানিয়েছিলেন অথবা অন্য কোন সূত্রে স্টার্ডি তা জেনেছিলেন তা জানা যায়নি) স্টার্ডি স্বামীজীকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। এ-সম্পর্কে ম্যাকলাউডকে স্টার্ডি ২১ মার্চ তারিখে লেখেন : 'স্বামীজী তাঁর প্রস্তাবিত [পাশ্চাত্য যাত্রার উদ্দেশ্যে] মাদ্রাজ রওনা হবার আগে আমার চিঠি পাবেন না। তবে আশা করছি, ভারত ছাড়ার আগেই চিঠিটি তিনি পেয়ে যাবেন। ডাকে দেবার আগে চিঠিটি আমি মিসেস বুলকে [তখন তিনি স্টার্ডির লণ্ডনের বাড়িতে অতিথি] দেখিয়েছি। আমাদের মধ্যে যেমনটি আলোচনা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই চিঠিটি লেখা হয়েছে তাঁকে। চিঠিটি পেলে এখানে কি করতে পারবেন সে-সম্পর্কে কিছুটা ভরসা নিয়ে স্বামীজী রওনা হতে পারবেন। তাছাড়া, এখানকার বন্ধুরা তাঁকে কিরকম অভ্যর্থনা দেবেন সে-বিষয়ে তাঁর কোনরকম ভাবনা থাকলে চিঠিটি তাঁকে সে-সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত করবে।'[২১] অর্থাৎ স্টার্ডি স্বামীজীকে জানিয়েছিলেন যে, লণ্ডনে স্বামীজী ফিরে এলে সেখানে আন্দোলন আবার শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং লণ্ডনস্থ বন্ধুরা সবাই গভীর আগ্রহে স্বামীজীর অপেক্ষায় আছেন। স্টার্ডি নিজেও যে ব্যাপারটিতে খুবই আগ্রহান্বিত সেটিও তাঁর এই চিঠিতে স্পষ্ট। এর আগে স্বামীজী লণ্ডনে না আসায় তাঁর মনে স্বামীজী সম্পর্কে যে ক্ষোভ জমেছিল মনে হয় তার অনেকটাই তখন চলে গিয়েছে। আমাদের ধারণা, এটি সম্ভব হয়েছিল ম্যাকলাউড এবং ওলি বুলের সঙ্গে তাঁর এই পর্বে সাক্ষাৎ এবং অন্তরঙ্গতার ফলে। ফেব্রুআরিতে ম্যাকলাউড এবং ওলি বুল আমেরিকা যাবার পথে ভারত থেকে লণ্ডনে এসেছিলেন—যে-যাত্রায় স্বামীজী

২০ Life of Swami Vivekananda, Vol. II (1981), pp. 391, 408, 410, 413, 441

২১ 'Seeond Visit', p. 58

তাঁদের সহযাত্রী হবেন বলে ভেবেছিলেন। তাঁদের লণ্ডন হয়ে আসার ব্যাপারটি স্বামীজী জানতেন কিনা ঠিক বোঝা যায় না। এটি পূর্ব-নির্ধারিত ছিল কিনা অথবা হঠাৎ তাঁরা ঠিক করেছিলেন তাও জানা যায় না। হয়তো তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল লণ্ডনের কাজের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে তা স্বচক্ষে দেখা, স্বামীজী লণ্ডনে না আসায় স্বামীজীর উপর স্টার্ডির যে অভিমান হয়েছিল তা দূর করা এবং স্টার্ডিকে বোঝানো যে, বাস্তবিক শারীরিকভাবে স্বামীজী প্রথমবার পাশ্চাত্য থেকে ফেরার পর কত ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েছেন যে-কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও স্বামীজীকে বার বার পাশ্চাত্যে আসা স্থগিত রাখতে হয়েছে। এছাড়া আরও একটি সম্ভাব্য কারণও ভাবা যেতে পারে। ঠিক এই সময়টিতে স্বামীজীর এককালের অনুরাগী মিস হেনরিয়েটা মূলার স্বামীজীর আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ঐ সময় মিস মূলার ভারতেই ছিলেন এবং ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্বামীজী সম্পর্কে অপপ্রচার শুরু করেছিলেন। এর ফলে হয়তো ইংলণ্ডে স্টার্ডি এবং স্বামীজীর অন্যান্য বন্ধুরা বিভ্রান্ত হতে পারেন এই আশঙ্কাতেই তাঁরা (ম্যাকলাউড ও ওলি বুল) লণ্ডন যাবার কথা ঠিক করতে পারেন। লণ্ডনে এলে স্টার্ডির সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব ঐ সময় খুব ঘনিষ্ঠ হয়। ফেব্রুআরির শেষে ম্যাকলাউড নিউইয়র্কে ফিরে যান। কিন্তু ওলি বুল মার্চ মাস (অন্তত মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত) লণ্ডনে থাকেন এবং থাকেন স্টার্ডির অতিথি হয়ে তাঁর কেনসিংটনের বাড়িতে। এর ফলে স্টার্ডির অন্তত স্বামীজীর লণ্ডনে এতদিন আসতে না পারার কারণের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে সুযোগ পেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে মিস মূলার ভারত থেকে ইংলণ্ডে ফিরে গিয়েছেন এবং সেখানে স্বামীজী সম্পর্কে তাঁর অপপ্রচার-অভিযান শুরু করেছেন। কিন্তু ম্যাকলাউডকে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতে স্টার্ডি মিস মূলারের অপপ্রচারে প্রথমদিকে বিশেষ প্রভাবিত হননি অথবা হতে চাননি বলে একটা ধারণা আমাদের হতে পারে। স্টার্ডি লিখছেন : 'মিস মূলার মিসেস ও মিস মেরী নোবলকে [নিবেদিতার মা ও বোন] নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং তাঁদের প্রতি সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং কোনরকম রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। এছাড়া মিস মূলারের আর কোন খবর শুনিনি।' এখানে স্টার্ডি কি সত্য কথা বলেছিলেন? নিবেদিতার মা-বোনের সঙ্গে মিস মূলারের সাক্ষাৎ কখনই সৌজন্যমূলক হতে পারে না। তাঁর নিশ্চিত উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের বোঝানো যে, নিবেদিতা স্বামীজীর কাজে আত্ম-সমর্পণ করে বিরাট ভুল করেছেন। তাঁর মা-বোনের উচিত তাঁকে সে-কথা বুঝিয়ে স্বামীজীর সঙ্গ ত্যাগ করতে পরামর্শ দেওয়া। প্রশ্ন হল : স্টার্ডি কি ইচ্ছাকৃতভাবে ম্যাকলাউডের কাছে মিস মূলারের প্রয়াসকে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছিলেন? স্টার্ডির পরবর্তী আচরণ থেকে মনে হবে স্টার্ডি ঐ সময় মিস মূলারের সমর্থকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। ঐ চিঠিতে তিনি আরও লিখছেন : 'আর হ্যাঁ, আর একটা কথা। আমি মিস ওয়াল্ডোর [স্বামীজীর জনৈকা বিশিষ্টা আমেরিকান শিষ্যা] কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। মিস মূলারের আচরণে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি চিঠিটি লিখেছেন। আমি আজকের ডাকেই তাঁকে উত্তর দিলাম। আমার উত্তর পেলে তাঁর উদ্বেগের অবসান হবে।'[২২]

এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে : মিস মূলার সেরকম আপত্তিকর কিছু না করলে মিস ওয়াল্ডো কেন আমেরিকা থেকে ব্যস্ত হয়ে

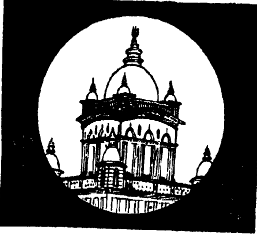
২২ Ibid.

স্টার্ডিকে লিখবেন ? স্টার্ডি মিস ওয়াল্ডোর উদ্বেগ অবসান করার জন্য কি লিখেছিলেন জানি না। সম্ভবত স্টার্ডি মিস ওয়াল্ডোকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, মিস মূলারের অপপ্রচার নিছকই অপপ্রচার, ইংলণ্ডের মানুষ তাতে প্রভাবিত হবে না, অথবা মিস মূলার সেরকম কিছু ক্ষতিকর কথা বলছেনই না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সব বুঝেও কিছু না বোঝার ভান করেছিলেন স্টার্ডি। মিস মূলার ভারত থেকে লণ্ডনে ফেরার আগেই স্টার্ডি জেনেছিলেন মিস মূলারের স্বামীজীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ এবং স্বামীজীর সম্পর্কে তাঁর বিরূপতার সংবাদ। মিস মূলারের আচরণে স্টার্ডি তখন অত্যন্ত শঙ্কিত হয়েছিলেন এবং ইংলণ্ডে ফিরে এসে তিনি একটা গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করবেন এসব ভেবে স্টার্ডি খুব বিচলিত হয়ে নিবেদিতাকে লিখেছিলেন। ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ৭ ফেব্রুআরি ১৮৯৯ তারিখের চিঠি থেকে সে-কথা জানা যায়।[২৩] মিস মূলার যে লণ্ডনে ফিরে আসার পর স্বামীজীর খুব নিন্দে করে বেড়াচ্ছেন এবং স্বামীজীর ইংলণ্ডের বন্ধুদের মন তাঁর সম্পর্কে বিষিয়ে দেবার ব্যাপারে উঠে পড়ে লেগেছেন তার একটি পরোক্ষ স্বীকারোক্তি স্টার্ডির ১৩ এপ্রিল ১৮৯৯ তারিখে মিসেস ওলি বুলকে লেখা চিঠিতেই পাই। স্টার্ডি সেখানে লিখছেন : 'মিস মূলার মিসেস অ্যাসটন জনসনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে এক পত্র লিখেছেন। [কিন্তু] মিসেস জনসন মনে করছেন যে, তাঁর মিস মূলারের সঙ্গে দেখা করার ফল ভাল হবে না। তাঁর আশঙ্কা, মিস মূলার যদি স্বামীজী সম্পর্কে সমালোচনামূলক কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তাহলে মিস মূলারের সঙ্গে তাঁর বচসা হবে যাতে তাঁকে মিস মূলারকে কঠোরভাবে আঘাত দিতে হতে পারে। আমি মিসেস জনসনকে [মিস মূলারের সঙ্গে] দেখা করতে পরামর্শ দিয়েছি এই ভেবে যে, হয়তো ঐ প্রসঙ্গ নাও উঠতে পারে।'[২৪] লণ্ডনের মিসেস জনসন প্রথমে স্বামীজী তথা বেদান্ত-আন্দোলনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। আমরা দেখব, পরে তিনি স্বামীজীর একজন সমালোচক হয়েছিলেন। স্টার্ডির কথায় একটা জিনিস স্পষ্ট যে, মিসেস জনসন ঐ-সময় স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত এবং মিস মূলারের অপপ্রচারকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করার পক্ষপাতী। কিন্তু স্টার্ডির নিজের আচরণ এখানে সন্দেহজনক। স্টার্ডির পরামর্শ অনুযায়ী তিনি মিস মূলারের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কিনা জানি না। তবে মিস মূলার সম্পর্কে স্টার্ডি সব জেনেও যে মিসেস জনসনকে তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিস মূলারের সঙ্গে দেখা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার কারণ স্টার্ডি চাইছিলেন, মিসেস জনসনের মতো স্বামীজীর কিছু বিশেষ অনুরাগীকে তাঁর (প্রকারান্তরে মিস মূলারের) দলে নিয়ে আসতে। লক্ষ্য করার বিষয়, মিসেস জনসন এর অল্প দিনের মধ্যে স্বামীজী সম্পর্কে বিরূপ মনোভাবাপন্ন হবেন।

[ক্রমশঃ]

২৩ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 47 ; নিবেদিতা অবশ্য ভেবেছিলেন স্টার্ডি প্রভৃতির মতো স্বামীজীর বিশ্বস্ত এবং অনুরাগী ভক্ত যেখানে রয়েছেন সেখানে মিস মূলারের অপপ্রচারে লণ্ডনে আন্দোলনের ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এ-কথা নিবেদিতা মিস মূলার লণ্ডন রওনা হবার দিন কয়েক পর মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন। দ্রঃ Letters of Sister Nivedita, Vol. I, p. 32

২৪ 'Second Visit', p. 59



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

সিংহবালক অষ্টাবক্র

সেই কোন্ ত্রেতাযুগের কথা! উদ্দালক নামে এক বেদজ্ঞ মুনি ছিলেন। তাঁর পুত্র শ্বেতকেতু মন্ত্রজ্ঞ বলে সর্বজন খ্যাত। এই উদ্দালকমুনির আশ্রমে দূর-দূরান্ত হতে ব্রাহ্মণ সন্তানরা তাঁর কাছে বেদাধ্যয়ন করতে আসতেন। তরুলতাশোভিত মনোরম আশ্রমটি বেদাধ্যয়নে সর্বদা মুখরিত থাকত।

উদ্দালকমুনির কহোড় নামে এক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। কহোড় পরম নিষ্ঠার সঙ্গে গুরুসেবা ও মনোযোগ দিয়ে বেদাধ্যয়ন করতেন। দীর্ঘকাল ধরে অধ্যয়ন ও গুরুসেবায় গুরুকে প্রসন্ন করতে পেরেছিলেন। গুরু উদ্দালকমুনিও তুষ্ট হয়ে কহোড়কে শাস্ত্রজ্ঞান তো দিয়েছিলেনই, সঙ্গে আপন কন্যা সুজাতাকেও সম্প্রদান করেছিলেন।

যথাকালে সুজাতা সন্তানসম্ভবা হন—অগ্নিতুল্য তেজস্বী কারো আবির্ভাব হয় তাঁর গর্ভে। একদিন কহোড় সতীর্থদের সঙ্গে বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ গর্ভস্থ শিশু মাতৃগর্ভ থেকে বলে উঠল: 'পিতা! সমস্ত রাত্রি ধরে আপনি বেদপাঠ করেন, অথচ আপনার পাঠ ঠিক ঠিক হয় না।' গর্ভ হতে শিশুটি আবার বলে: 'আপনি হয়তো ভাবছেন, আমি কি করে বেদপাঠ জানলাম। পিতা! আপনার অনুগ্রহে আমি মাতৃগর্ভে থেকেই সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নে সক্ষম হয়েছি।'

সতীর্থদের মধ্যে আসীন মহর্ষি কহোড় গর্ভস্থ পুত্রের এই কথায় ভীষণ অপমান বোধ করলেন। গর্ভস্থ পুত্রকে তিনি অভিসম্পাত করলেন: 'ভূমিষ্ঠ না হয়েই পিতাকে নিন্দা করছিস্! তুই শরীরে আট জায়গায় বক্র হবি।'

ওদিকে পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় ক্রমে ঘনিয়ে এল। স্ত্রী সুজাতা একদিন পতি কহোড়কে বললেন: 'আমার অর্থ-কড়ি নেই। আমি কি করে পুত্র মানুষ করব? আর আমার এমন কেউ আত্মীয়ও নেই যে আমাকে অর্থাদি দেবে। আমার এখন কি উপায়?' সহধর্মিণীর কথা শুনে কহোড় ধনলাভের আশায় জনক রাজার কাছে গমন করলেন। জনক রাজার সভায় এসে জলদেবতা বরুণের পুত্র বন্দীর কাছে বিচারে পরাজিত হয়ে কহোড় নদী-জলে নিমগ্ন হলেন।

এই দুঃসংবাদ উদ্দালকমুনির আশ্রমে এসে পৌছাল। দুঃখে সবাই কাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু কী আর করবেন তাঁরা! ভবিতব্যকে মেনে নিতেই হবে।—এই ভেবে সবাই কিছুটা শান্ত হলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে সুজাতার কোলে এল একটি তেজস্বী সন্তান। কিন্তু দেখা গেল তার অঙ্গের আটটি জায়গা বক্র। পিতার অভিসম্পাতে এই অবস্থা হয়েছে—এটা বুঝতে আর কারো বাকী রইল না। সেই থেকে পুত্রের নাম হল অষ্টাবক্র। সুজাতা এবং অন্যান্য সকলকে উদ্দালক বারণ করে দিলেন, অষ্টাবক্র যেন কোন দিনই পিতার জল-নিমগ্নের ঘটনার কথা ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে। এই কারণেই কেউ কখনও কহোড়ের সেই পরাজয়ের কথা অষ্টাবক্রকে বলেনি।

পুত্র শ্বেতকেতু আর দৌহিত্র অষ্টাবক্রই হলেন উদ্দালকের আশ্রমের প্রাণস্বরূপ। মামা-ভাগিনেয় দুজনের বয়স প্রায় একই—বারো বছর। অষ্টাবক্র ছোটবেলা থেকে মাতামহ উদ্দালকমুনিকে পিতার মতো দেখে আসছে। একদিন অষ্টাবক্র উদ্দালকের কোলে বসে আছে। এমন সময় শ্বেতকেতু কোথা থেকে ছুটে এসে বলল: 'তুমি আমার বাবার কোলে বসে আছ কেন? নেমে এসো আমার বাবার কোল থেকে। উনি তোমার বাবা নন, আমার বাবা। তুমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে তাঁর কোলে বস।'—এই বলে শ্বেতকেতু অষ্টাবক্রকে হাত ধরে উদ্দালকমুনির কোল থেকে নামিয়ে দিল। অষ্টাবক্র মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে মা সুজাতার কাছে গিয়ে নালিশ জানাল। পুত্রের মনোবেদনা উপলব্ধি করে এবং রুষ্ট পুত্রের অভিশাপের ভয়ে জননী অগত্যা বললেন: 'পুত্র! তোমার পিতা ধনলাভের আশায় জনক রাজার প্রাসাদে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বন্দীর কাছে বিচারে পরাজিত হয়ে জলে নিমগ্ন হয়েছেন, ঐ বন্দীরই অভিসম্পাতে।'

অষ্টাবক্র সব ঘটনা মায়ের কাছে শুনল। ক্ষুব্ধ পুত্র প্রতিজ্ঞা করল, যে করেই হোক ঐ পাণ্ডিত্যাভিমানী বন্দীকে পরাজিত করতেই হবে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। বালক অষ্টাবক্র মনের ভাব গোপন করে শ্বেতকেতুকে গিয়ে ধরে বসল: 'মামা! চল, আমরা জনক রাজার প্রাসাদে যজ্ঞ-দর্শনে যাই। সেখানে সব কত আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে। কত বড় বড় পণ্ডিতদের শাস্ত্র আলোচনা ও বিচার শুনতে পাব। ফলে আমাদেরও বিচক্ষণতা বাড়বে। আর সেখানে উৎকৃষ্ট ভোজনও পাওয়া যাবে।' মামা-ভাগিনেয় মিলে অনেক রাত পর্যন্ত এই নিয়ে আলোচনা হয়ে ঠিক হল—খুব সকালে উঠেই তারা জনক রাজার যজ্ঞসভার দিকে রওনা হবে।

উদ্দালক ও সুজাতার কাছ থেকে বালকদ্বয় বিদায় নিয়ে রওনা হল জনক রাজার রাজ-প্রাসাদের দিকে। পথ চলতে লাগল। রাজ-প্রাসাদের প্রবেশের মুখে তারা বাধা পেল দারোয়ানের কাছে। অষ্টাবক্র পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। কিন্তু দারোয়ান পথ ছেড়ে দিল না। তখন অষ্টাবক্র তাকে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিতে থাকে। দূর থেকে রাজা জনক ঐ সব কথা শুনে মোহিত হয়ে রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য দারোয়ানকে আদেশ পাঠালেন। আর সেখান থেকে জনক রাজা অষ্টাবক্রকে সম্বোধন করে বললেন: 'ব্রাহ্মণ! আমি আপনার জন্য পথ অবারিত করে দিলাম। সুতরাং আপনারা যেখানে এবং যে পথে ইচ্ছা গমন করুন। কারণ, অগ্নি ক্ষুদ্র হলেও অবজ্ঞেয় নয়, স্বয়ং ইন্দ্রও ব্রাহ্মণদের নিকট অবনত থাকেন।' উত্তরে বালক ব্রাহ্মণ বলল: 'রাজন্! আমরা আপনার যজ্ঞ দেখবার ইচ্ছায় এসেছি। যজ্ঞ দেখবার জন্যই আমাদের প্রচণ্ড কৌতূহল। আমরা রাজপথে প্রবিষ্ট—আপনার অতিথি, সুতরাং এখন যজ্ঞভবনে যাওয়ার জন্য দ্বারপালকে যথাযোগ্য আদেশ করুন।'

দারোয়ান শুনে বলে: 'আমরা বন্দী মশায়ের আজ্ঞাকারী। তোমরা আমার কথা শোন—এখানে বালক ব্রাহ্মণেরা প্রবেশ করতে পারবে না, কেবল বৃদ্ধ ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরাই প্রবেশ করতে পারবেন।'

অষ্টাবক্র ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল: 'দ্বারপাল! এখানে বৃদ্ধদের যদি প্রবেশের অধিকার থাকে, তবে আমাদেরও আছে। কারণ, আমরা যথানিয়মে ব্রতচারণ ও বেদোক্ত তপস্যার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। আমরা জিতেন্দ্রিয় ও বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী। আর শোন দ্বারপাল! জ্ঞানীরা বলে থাকেন, বালক হলেও তাকে অবজ্ঞা করবে না। কারণ, স্পর্শ করলে ক্ষুদ্র অগ্নিশিখাও দগ্ধ করে থাকে।'

দারোয়ান অষ্টাবক্র ও শ্বেতকেতুকে বালক দেখে তাচ্ছিল্য করতে লাগল। অবজ্ঞাভরে পরিহাস করে: 'আচ্ছা বালক! বেদোক্ত, ব্রহ্মবোধক ও বহুবর্ণঘটিত একটি শব্দ সুন্দরভাবে উচ্চারণ কর দেখি—কেমন তোমরা পার। বালক! কেন আত্মশ্লাঘা করছ। জ্ঞানী লোক বড়ই দুর্লভ। তুমি নিজেকে বালক বলেই মনে কর, কখনও বৃদ্ধ পণ্ডিত ভেব না।'

অষ্টাবক্র বুঝতে পারল দারোয়ান তাকে অবহেলা করছে, তবু নীরবে সমস্ত হজম করে, সে সুন্দরভাবে কিছু শাস্ত্রবাক্য আবৃত্তি করে শোনাল। দারোয়ান শুনে তো অবাক। তবু দারোয়ান যজ্ঞভবনে তাদের যেতে দিতে রাজি হল না। তাদের আবার উপদেশ দিয়ে বলল: 'বালকের উচিত বৃদ্ধদের কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করা। কারণ অল্প বয়সে নিজে নিজেই জ্ঞানলাভ করা যায় না। তুমি বালক মাত্র। বৃদ্ধের মতো কথা বলা উচিত নয় তোমার।'

অষ্টাবক্র অতি তেজের সঙ্গে উত্তর দিল: 'দ্বারপাল! মানুষের চুল পাকলেই সে বৃদ্ধ হয় না। কিন্তু বালক হয়েও যে শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করেছে, তাকে দেবতারাও বৃদ্ধ বলেন।

'দ্বারপাল! আমি রাজসভায় বন্দীকে দেখার ইচ্ছায় এসেছি। শুনেছি, সে নাকি মস্ত বড় তার্কিক পণ্ডিত! তার সঙ্গে কেউ বিচারে পেরে ওঠে না। দ্বারপাল! আজ তুমি দেখবে সভাস্থ পণ্ডিতদের মাঝে গুরুতর বিচারে বন্দীকে পরাজিত হতে। দেখবে, সভাস্থ সকল পণ্ডিত এবং সদস্য নীরবে আমাদের বিচার শ্রবণ করবেন এবং আমাকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করবেন।'

বালক অষ্টাবক্রের তেজোদীপ্ত কথা শুনে দ্বারপাল মোহিত হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সে নিজেই তাদের দুজনকে রাজা জনকের কাছে নিয়ে গেল।

অষ্টাবক্র এবং শ্বেতকেতু জনক রাজার সভায় এসে উপস্থিত হল। অষ্টাবক্র সসম্ভ্রমে নিবেদন করল: 'মহারাজ! আপনি সম্রাট। পূর্বকালের রাজা যযাতির মতো আপনিও যজ্ঞকার্য করার যোগ্য অধিকারী। মহারাজ! আমি শুনেছি বন্দীর সঙ্গে বিচারে কেউ পরাজিত হলে, সে পণ্ডিতদের বন্ধন করে, আপনার লোকদের দিয়ে জলে নিমগ্ন করে। আজ আমি তারই সঙ্গে বিচার করতে এসেছি। বন্দী বেটা কোথায়? তাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন। আমি আজ তার বিচারের সাধ মিটিয়ে দেব। সূর্য যেমন নক্ষত্রকে বিনষ্ট—ম্লান করে, তেমনি আজ আমিও তাকে বিনষ্ট করব। নিয়ে আসুন তাকে আমার কাছে।'

স্মিত হেসে জনক রাজা বললেন: 'বালক! তুমি বন্দীর বাক্‌শক্তির পরিচয় পাওনি, তাই তুমি এই রকম বলছ। আগে আগে অনেক পণ্ডিত তাঁর শক্তির পরীক্ষা করতে এসে নিজেরাই পরাজিত হয়ে জলনিমগ্ন হয়েছেন। বালক! তুমি যদি জানতে তিনি অপরাজেয়, তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারে না, তাহলে তুমি তাঁকে নিগৃহীত করার দুরাশা করতে পারতে না। তুমি বালক বলেই তোমার তাঁকে পরাজিত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা।'

অষ্টাবক্র সিংহের ন্যায় গর্জে উঠল: 'সম্রাট! আপনি আমার মতো লোকের সঙ্গে বন্দীকে বিচার করতে দেখেননি ঠিক। তাকে শুধু দেখেছেন বড় বড় পণ্ডিতদের সম্মুখে সিংহের ন্যায় আস্ফালন করতে। কিন্তু আজ সে বিচারে আমার কাছে নিশ্চয়ই পরাজিত হবে। যেমন রাস্তায় ভাঙা গাড়ি পড়ে থাকে, তেমনি সেও আজ রাজসভায় পড়ে থাকবে।'

জনক সিংহতুল্য বিক্রমশালী বালকের পাণ্ডিত্য পরখ করার জন্য শাস্ত্রের কিছু প্রশ্ন করলেন। অষ্টাবক্র অবলীলাক্রমে সে-সব প্রশ্নের উত্তর দিল।

তার ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অদ্ভুত বাক্‌পটুতা দেখে সম্রাট বিস্মিত হয়ে বললেন : 'হে দেবতুল্য-প্রভাবসম্পন্ন বালক! আমি তোমাকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করছি না। তোমার অসাধারণ বাক্‌পটুতা! তুমি অতুলনীয়। তোমাকে আমি যজ্ঞসভায় যাওয়ার দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি। হে বিদ্বান! তুমি স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাও।'

শ্বেতকেতুকে সঙ্গে নিয়ে অষ্টাবক্র যজ্ঞসভায় উপস্থিত হল। দুটি বারো বছরের বালককে দেখে যজ্ঞস্থ পণ্ডিতগণ বিস্মিত—কি করে এরা এখানে এল! এখানে তো কোন বালকের প্রবেশের অধিকার নেই। আবার অনেকে অষ্টাবক্রের কুৎসিত দেহটাকে দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করল। অষ্টাবক্র কিন্তু সভায় উপস্থিত হয়েই বন্দীকে বাগ্‌যুদ্ধে আহ্বান করে বসল। ক্রুদ্ধস্বরে বালক বলতে লাগল : 'বন্দি! নদীর স্রোতের মতো অপ্রতিহতভাবে তুমি পণ রেখে আজ আমার সঙ্গে বিচার চালাতে পারবে না। আমি প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য! আজ আমার সামনে স্থির থাক দেখি—তোমার কেমন ক্ষমতা। তুমি আমাকে মনে করতে পার শায়িত ব্যাঘ্র এবং ওষ্ঠপ্রান্ত লেহনকারী সর্প। আমার মস্তকে পদাঘাত করে, দংশন না পেয়ে তুমি আমার কাছ থেকে মুক্ত হতে পারবে না—জেনে রাখ।'

তারপর সভার মধ্যে অষ্টাবক্র এবং বন্দীর প্রচণ্ড বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। অষ্টাবক্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অদ্ভুত বাক্‌-কুশলতার কাছে বন্দী বেশি সময় স্থির হয়ে বিচার করতে পারলেন না। বন্দী কিছু সময় বাগ্‌যুদ্ধ করার পর অবনতমস্তকে সভার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সমস্ত কথা আজ হারিয়ে গেছে। তাঁর পাণ্ডিত্যভাণ্ডার আজ নিঃস্ব এই দ্বাদশ বৎসরের বালকের কাছে। পাণ্ডিত্যভাণ্ডারে একটি বাণও অবশিষ্ট নেই যে তা দিয়ে তিনি অষ্টাবক্রকে আঘাত করবেন। তূণের সব বাণ আজ নিঃশেষিত। অতএব তিনি অপমানে মাথা নত করলেন। আর এদিকে বীরবিক্রমে অষ্টাবক্র বন্দীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিল এবং নিজের জিজ্ঞাসিত যে প্রশ্নগুলির উত্তর বন্দী দিতে পারলেন না, সেগুলিও এক এক করে তাকে বুঝিয়ে দিল। সভায় হৈ চৈ পড়ে গেল। সভাস্থ পণ্ডিতগণ সাধু, সাধু বলে বালককে প্রশংসা করতে লাগলেন।

অষ্টাবক্র জনক রাজাকে বললেন : 'হে রাজন্‌! আপনার লোক দিয়ে বন্দীকে এবার তাহলে জলে নিমগ্ন করুন। সে আমার কাছে পরাজিত হয়েছে।'

জনক বললেন : 'হে বালক! তোমার বাক্য অলৌকিক ও অতি উত্তম। তুমিও সাক্ষাৎ দেব-তুল্য। বন্দীকে তোমার ইচ্ছাধীন করে দিলাম।'

পরাজিত বন্দী বললেন : 'আমি বরুণের পুত্র। জলে নিমগ্ন হওয়ায় আমার কোন ভয় নেই। অষ্টাবক্র! তুমি তোমার পিতা কহোড়কে এক্ষুণি দেখতে পাবে।'—এই বলে তিনি জলে গিয়ে পিতা বরুণের সঙ্গে মিলিত হলেন।

বিজয়ী অষ্টাবক্রও পিতা কহোড় এবং মাতুল শ্বেতকেতুকে সঙ্গে নিয়ে উদ্দালকমুনির আশ্রমে ফিরে এল। আশ্রমে এসে কহোড় [illegible]বক্রকে বললেন : 'পুত্র! তুমি এই নদীতে সত্বর স্নান করে এসো।' নদীতে নামার সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাবক্রের বক্র-অঙ্গ সমান হয়ে গেল। দিব্যকান্তিপূর্ণ তেজোময় বালক অষ্টাবক্র নদী থেকে উঠে এল। সেই সময় থেকে নদীটি 'সমঙ্গা'-নামে প্রসিদ্ধ হল। এই নদীতে নেমে স্নান করলে সমস্ত পাপ দূর হয়—এই বিশ্বাস আজও মানুষের।

সিংহতুল্য এই বালকই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি অষ্টাবক্র। আজও সাধক পণ্ডিত সবাই তাঁর নামে অবনতমস্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মাতৃগর্ভ থেকেই যাঁর এত তেজ, এত শক্তি—আশৈশব যাঁর অমন বিদ্যাগৌরব, তাঁর জীবনের মূল কোথায়—তেজ, শক্তি ও বিদ্যার উৎসকেন্দ্র কি—এটাই আমাদের প্রশ্ন। উত্তর খুব সহজ—অষ্টাবক্রের অসাধারণ শ্রদ্ধা, আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মজিজ্ঞাসাই তাঁকে মহর্ষি করেছে।

[মহাভারতের বনপর্ব দ্রষ্টব্য]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

একটি বৃত্তান্তের প্রত্যুক্তি

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল-লিখিত একখানি পত্র বাংলা ১৩৪৩-এর 'মাসিক বসুমতী' ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল, শ্রীজলধর সেন-প্রচারিত স্বামীজীর স্মৃতিতে কিছু তথ্যগত অসত্যের প্রতিবাদরূপে। রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেনের 'স্বামী বিবেকানন্দ ; স্মৃতিতর্পণ' অধুনালুপ্ত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিঞ্চিৎ সংক্ষেপাকারে রচনাটি 'উদ্বোধন' মাঘ ১৩৮৯ সংখ্যাতেও মুদ্রিত হয়। সান্ন্যাল মশায়ের উক্ত প্রতিবাদ-পত্রখানিই এবার এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে :

হৃষিকেশের ধুনি প্রজ্জলিত কুটির মধ্যে স্বামিজী মৃতপ্রায় অবস্থায়। আর জলধরবাবু তাঁকে গাছের পাতার রস খাইয়ে পুনর্জীবিত করেন, এবং দেরাদুনে স্বামিজী তাঁহার প্রাণ-দাতাকে চিনতে পারেন নি। সাধু ভাষায় কবি কল্পনা।···হৃষিকেশ ছাড়িয়া প্রথম হরিদ্বার—তারপর সাহারাণপুর হইয়া মিরাটে অনেকদিন অবস্থান। হৃষিকেশে স্বামিজীর সঙ্গে আমরা তিনজন ছিলাম। হরিভাই তুরীয়ানন্দ, শরৎ সারদানন্দ ও আমি সাণ্ডেল কৃপানন্দ।

স্বামিজী চিরদিনই ধ্যাননিষ্ঠ। তারপর অতি নিকটে হৃষিকেশ পেয়ে ত কথাই নাই। একদিন বৈকালে ঝুপড়ির ভিতর কিছুক্ষণ ধ্যান করবার পর অচৈতন্য হয়ে কম্বলাসনে শুয়ে পড়েন। ঘুটি প্রলাপ—তুমি বল আমি মরি। তারপর সব ঠাণ্ডা ও বাক্‌শূন্য—ব্যাপার বুঝতে না পেরে আমরা হতভম্ব। ফকিরাবাদ স্থানে ঔষধ বা চিকিৎসক নাই, হরিভাই আরোগ্য কামনায় আদিত্য-হৃদয় স্তব পড়তে থাকেন, আর আমরা ঠাকুরকে ডাকতে থাকি।

এমন সময় হরিভাইয়ের বন্ধু পরে আমাদেরও বন্ধু ভগবানপুরী নামে এক পাঞ্জাবী স্ফূর্তিবাজ সাধু হরিভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে, তাঁকে স্বামিজীকে দেখবার জন্য অনুরোধ করি ; কারণ ইনি পূর্বে চিকিৎসক ছিলেন, ও কালীভায়ার (অভেদানন্দের) অসুখে পূর্ব্বে একটু ঔষধও দেন।

স্বামিজীকে বেশ করে দেখে বলেন, কি যে রোগ বুঝতে পারছি না, ঔষধও নেই যে দেব। তবে মধুতে পিপুল ঘসে অনবরত জিবে লাগালে দেহ গরম ও চৈতন্য হতেও পারে।

আমি তৎক্ষণাৎ ভরতজীর মোহান্তর নিকট হতে পিপুল মধু আনিয়া পাথরে ঘসিয়া স্বামিজীর মুখে লাগাতে থাকি। তখন কোথায় বা জলধর বা মাথায় পাকড়ী "ওঁ"? সে সময় আমাদের যে কি আকাল-অবস্থা তাহা বর্ণনাতীত। তখন নির্ব্বিকল্প সমাধির কথা ভাবিবারও নয়।

ভোর রাত্রে স্বামিজী আমাদের অতি ক্ষীণ স্বরে বলেন—তোমরা হয়ত ভেবেছ আমার ভারি অসুখ হয়েছে ও আমি মরে যাব। এতকালের পর প্রভুর কৃপায় এই হৃষিকেশ তীর্থে পুনরায় নির্ব্বিকল্প সমাধি পেয়েছি।

কোন্ বাতাসে জলধরবাবু আমাদের বন্ধু ভগবানপুরীর কথা শোনেন, আর কোন্ মায়াতে তিনি ঐ পুরীজীর নাম করে দিনের বেলায় আমাদের চোখে ধূলি দিয়ে নাম জাহির করেন, ইহা ভেল্কি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।···

হিমালয় হতে নামিয়া রাত্রে আমরা গঙ্গা-মন্দিরে রাত্রি যাপন করি, পরদিন প্রাতে একজন ভক্তলালার নবনির্মিত বাটিতে নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠানের সময়, তাঁহার আলয়ে ৪/৫ দিন বাস ও ভিক্ষা করি। একদিন ফরেষ্ট অফিসের কাছে করণপুরায় শশী ও অম্বিকাবাবুর বাটিতে ভিক্ষা করি, তখন জলধর···তথায় ছিল না।

ঝুপড়িতে ধুনি জ্বালান ছিল না—তা সম্ভবও নয়।···

জ্ঞান-বিজ্ঞান

মাতৃদুগ্ধই শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, এবং তাদের অনুকরণে আমাদের দেশের উচ্চস্তরে, মাতৃদুগ্ধের বদলে দোকানের কেনা কৃত্রিম দুগ্ধ পান করানো বেশ চালু হয়ে গেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়েছেন যে, শিশুর কাছে মায়ের দুধের চেয়ে আর কোন খাদ্যই বেশি উপকারী নয়। বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থাও মাতৃদুগ্ধ ব্যবহারের বহুল প্রচারের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, মাতৃদুগ্ধ ব্যবহারে উপকারিতা কি? উপকার এই: (ক) নবজাত শিশুর শরীর গঠনের জন্য যা যা প্রয়োজন মায়ের দুধে তা সবই আছে। চার মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর আর কোন খাবারের প্রয়োজনই নেই। চার কিংবা ছয় মাসের পরে মায়ের দুধের সঙ্গে অন্য খাদ্য যোগ করতে হবে, তবে এক বৎসর বা তার বেশিও মায়ের দুধ খাওয়ানো চলবে। (খ) মায়ের দুধ, মায়ের বুক থেকে সন্তানের মুখে সরাসরি চলে যায় বলে তা জীবাণু-দূষিত হবার অবকাশই পায় না। অন্য দুধ তৈরি করার সময় বা খাওয়ানোর সময় তাতে ময়লা বা জীবাণু-সংস্পর্শের যথেষ্ট অবকাশ থাকে, যার ফলে শিশুর সর্দিজ্বর বা পাতলা পায়খানা ইত্যাদি ব্যাধির আশঙ্কা যথেষ্ট থেকে যায়। (গ) অন্য দুধ কিনতে অর্থ খরচ হয়, কিন্তু মায়ের দুধ বিনা অর্থ খরচে পাওয়া যায়। তা ছাড়া শিশু যত বেশি বার দুধ খাবে, মায়ের দুধও তত বেশি তৈরি হবে। অবশ্য এই সময় মায়ের খাদ্য একটু ভাল ও বেশি হওয়া দরকার, কিন্তু সেই অতিরিক্ত খাদ্যের জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়, তা বাইরের দুধ কেনার চেয়ে অনেক কম। (ঘ) স্তনদুগ্ধ পান করবার সময় শিশু মায়ের অতি নিবিড় সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায়, মায়ের স্নেহ-স্পর্শ, চোখের দৃষ্টি, বক্ষের উষ্ণতা ও অঙ্গের ঘ্রাণ সে উপভোগ করে। শিশুর জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এইরূপ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য হলে উভয়ের সম্বন্ধ আরও নিকট হয় ও সন্তানের প্রতি ভালবাসা বাৎসল্য বৃদ্ধি পায়। (ঙ) স্তন্য-দাত্রী মায়েদের পুনরায় সন্তান সম্ভাবনা বিলম্বিত হয়। ফলে মা শিশুকে আরও বেশিদিন ধরে আদর যত্ন করতে পারে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার ১-২ ঘণ্টার মধ্যেই শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করতে দেওয়া ভাল, যদিও দুধ তখন বিশেষ থাকে না। প্রথম তিন, চার দিন স্তনে যে দুধ আসে, তা অপেক্ষাকৃত ঘন, তার মাধ্যমে মায়ের শরীরে তৈরি রোগপ্রতিরোধক দ্রব্য শিশুর শরীরে যেয়ে তাকে উদরাময় প্রভৃতি অসুখ হতে রক্ষা করে।

অনেক সময় মা মনে করেন যে, তাঁর স্তনের দুধ শিশুর বিশেষ পুষ্টিকর নয়, অথবা সহ্য হবে না। এটি ভুল ধারণা। মায়ের অসুখ না থাকলে তাঁর বুকের দুধই শিশুর সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও পুষ্টিকর খাবার।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা মাতৃদুগ্ধ পান করানো প্রথা বৃদ্ধি করার জন্য এই বিষয়ে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করছেন। এখনও আফ্রিকা, এশিয়া এবং অন্যান্য দেশের বহু অংশে প্রায় সকল শিশুই মাতৃদুগ্ধ পান করে, তবে কোথাও অল্পদিন ধরে, কোথাও বেশি-দিন ধরে। আফ্রিকায় প্রতি বৎসর যে দুই কোটি দশ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের অধিকাংশই অনেক দিন ধরে মায়ের দুধ খায়। মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় জন্মানো তিন কোটি আট লক্ষ শিশুর সম্বন্ধেও সে-কথা খাটে। পূর্ব ও দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ায় নবজাত তিন কোটি চার লক্ষ শিশুর মধ্যে, গ্রামের শিশুরা অধিক দিন ও শহরের শিশুরা অপেক্ষাকৃত অল্পদিন মায়ের দুধ খায়। পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে: পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলিতে প্রায় প্রতি শিশুকেই মাতৃ-দুগ্ধ পান করানো হয়; উন্নত দেশগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশে (যেমন দক্ষিণ ইউরোপে) কম শিশুকেই মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়; উন্নতি-শীল দেশগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ধনী দেশে মায়ের দুধ খাওয়ানো কিছুটা কমেছে; ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ধনশালী দেশগুলিতে মাতৃদুগ্ধ পান করানো, যা আগে কমে গিয়েছিল, তা আবার বাড়তে আরম্ভ করেছে এবং শিক্ষিতা মহিলারাই এবিষয়ে অগ্রগামিনী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক যুগে বাইরে কর্মরতা মহিলাদের অবসরের অভাব এবং কাজের চাপ শিশু-পালনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই কারণেই তাঁদের ভাবতে হচ্ছে, শিশুকে তাঁরা বুকের দুধ খাওয়াবেন কিনা বা কতক্ষণ খাওয়াবেন। এছাড়া কৃত্রিমদুগ্ধ-প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীদের চিত্তা-কর্ষক বিজ্ঞাপনও অনেক ক্ষেত্রে মাতৃদুগ্ধ দেওয়া সম্বন্ধে মতামতকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করছে।

দেশ-বিদেশ

অরুণাচলের অধিবাসীঃ হিল মিরি

দফ্‌লা উপজাতিদের পূর্বাঞ্চলে কম্‌লা নদীর উভয় তীরে হিল মিরি উপজাতিরা বসবাস করে। 'মিরি' শব্দটি অসমীয়া। মিরি শব্দ দ্বারা পাহাড়ী মানুষ, যারা বাস করত রঙ্গা নদীর তীরে দফ্‌লা এবং ডিয়াং নদীর তীরে আবোর উপজাতিদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, তাদের বোঝাত।

হিল মিরিরা যেখানে বসবাস করে সে-অঞ্চলের উচ্চতা ৯১৪ থেকে ১২১৯ মিটারের মধ্যে। এই উঁচু-নিচু পাহাড়টি ঘন জঙ্গলে ঘেরা। শাল, পুমা, টিটা, নাহোর প্রভৃতি মূল্যবান সব বড় বড় গাছ-গাছড়াতে ঘেরা।

হিল মিরিরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। যেমন ঘাইঘাসি বা ঘাসি মিরি, সারাক মিরি, পানি-বোটিয়া এবং টাব্‌বোটিয়া মিরি প্রভৃতি। ঘাইঘাসি মিরিরা বসবাস করে ধোল ও সুবনসিরি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। সারাক মিরিরা বাস করে সুবনসিরি ও রঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের উপরে। আর পানিবোটিয়া ও টাব্‌বোটিয়া মিরিরা বাস করে সুবনসিরি নদীর পশ্চিম পাড়ের পাহাড়ে। টাব্‌বোটিয়াদের গ্রামটি কম্‌লা নদীর দক্ষিণ তীরে। এই উপজাতিদের জলপথে চলাচল না করলেও চলে, কারণ সমতলভূমিতে তাদের আসতে হলে স্থলপথেও আসতে পারে। কিন্তু পানিবোটিয়া-দের নদীপথে যাতায়াত করতে হয়। এছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই।

ঘাইঘাসি মিরিদের দেখতে কুৎসিত, বেঁটে। তারা কোমরে একখণ্ড ছোট কাপড় জড়িয়ে রাখে আর গায়ে ফ্লানেলের হাতকাটা কোট পরে। এই তাদের দেহসজ্জা। আবার যারা সু (Sew) নদীর তীরে বাস করে, তাদের কোমর পর্যন্ত উলঙ্গ, তবে শরীরের উপরের অংশ উলের একটি আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে। এরা চুল ছাঁটে মাথার চারদিক গোল করে।

পানিবোটিয়া মিরিদের সুদৃঢ় মাংসপেশী। শরীর খুব শক্ত, মজবুত। এরা সাধারণতঃ একটু বেঁটে হয়, তবে তাদের মধ্যে আবার অনেকে বেশ লম্বাও আছে। তাদের উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চির মতো হবে। দফ্‌লা উপজাতিদের মতো পানি-বোটিয়া এবং টাব্‌বোটিয়া মিরিদেরও একই পোশাক-পরিচ্ছদ। তারা মাথার সব চুল জড় করে কপালের উপর খোঁপার মতো করে গিঁট দিয়ে

বেঁধে রাখে। খোঁপায় ছোট একটি শিক ঢুকিয়ে রাখে। মাথার চারপাশ দিয়ে চামড়ার ফিতা বাঁধে। তার উপর আবার তামার পিন আটকায়। এক গোছা সরু বেত কোমরে জড়িয়ে রাখে। আর কাঁধে ঝোলায় তালগাছের আঁশ দিয়ে তৈরি ছোট চৌকোনা এক ধরনের থলি। দফ্‌লারা যেমন সুসজ্জিত টুপি পরে, তেমনি এরাও পরে। তবে এরা টুপিটি বাঘ বা শূকরের চামড়া দিয়ে আবৃত রাখে। তাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র হচ্ছে—লম্বা বড় দা, তীর-ধনুক ও লম্বা বর্শা।

এই উপজাতির আধুনিক তরুণ-তরুণীদের কাছে অবশ্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরার ধরন ক্রমে পালটিয়ে যাচ্ছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এদের পোশাকেরও পরিবর্তন হচ্ছে। তবে যারা প্রাচীনপন্থী তারা তাদের পুরানো পোশাক-পরিচ্ছদ আঁকড়িয়ে ধরে আছে।

হিল মিরির বিভিন্ন গোষ্ঠীর পুরুষদের মতো মেয়েদেরও পোশাক-পরিচ্ছদ পৃথক্ পৃথক্। ঘাই-ঘাসি মিরির মেয়েরা বেতের আঁশের তৈরি কোট পরে। কোটটা লম্বা পা পর্যন্ত। কোমরে এটাকে খুব শক্ত করে বেঁধে রাখে। ফলে তারা লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে পারে না, ছোট ছোট ধাপ ফেলে হাঁটে। তারা লম্বা চুল রাখে।

প্রতিবেশী অন্যান্য উপজাতিদের চেয়ে পানি-বোটিয়া মিরির মেয়েদের পোশাক পরার ধরন কিন্তু আলাদা। তারা কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ছোট সায়া পরে। এটাকে কোমরে চামড়ার বেল্ট দিয়ে বেঁধে রাখে। বেল্টের উপর পিতল দিয়ে সজ্জিত করে। তার উপর দিয়ে তারা বেতের কাজ-করা ঘাগরা (crinoline) পরে। কোমরের উপর অংশের জন্য তারা বেতের নকশা-করা জামা পরে। তবে তাদের কাজকর্ম করবার পোশাক খুব সাদাসিধা।

মেয়েরা রুপা বা তামার অলংকার পরতে ভালবাসে। কানে রুপার তৈরি সুন্দর গহনা পরে। তাদের চুলকে বিনুনি করে মাথার পিছনে ঝুলিয়ে রাখে।

হিল মিরি উপজাতিদের গ্রামগুলি খুব ছোট ছোট। ৮/৯ খানা বাড়ি নিয়ে একটি গ্রাম। তারা বসবাস করে সাধারণতঃ ঢালু জায়গায়। কারণ এতে তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে খানিকটা রক্ষা পায়। তারা কোথায় ঘর বাঁধবে বা না বাঁধবে তা সাধারণতঃ গ্রাম-প্রধান ঠিক করে দেয়। গ্রাম-প্রধানের এটা একটা প্রধান দায়িত্ব। তারা তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী ভাল জায়গা খুঁজে বের করে দেয় গ্রামবাসীদের ঘর বাঁধার জন্য। হিল মিরি গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ নিজেদের সম্পদ লোককে দেখাতে চায় না। একসময় তারা তাদের ধনসম্পদ মাটির নিচে পুঁতে লুকিয়ে রাখত, যাতে অপর লোকে জানতে না পারে তাদের কি আছে।

হিল মিরিদের বাড়িগুলি সাধারণতঃ ৬০/৭০ ফুট লম্বা হয়। একটি বাড়ি আর একটি বাড়ির খুব কাছাকাছি। তারা যে-সব ঘরে থাকে সেখানে শস্যাদি মজুত রাখে না, আগুন বাড়িতে লেগে গেলে পুড়ে নষ্ট হওয়ার ভয়ে। তাই তারা বাস-করা ঘর থেকে দূরে সুরক্ষিত একটি ঘরে শস্যাদি রাখে। এক-একটি বাড়িতে ৪০ জনের মতো মানুষ বাস করে।

হিল মিরিরা তাদের চারপাশে যে-সমস্ত চাষের উপযোগী জমি আছে, তাই চাষবাস করে। তারা অনেক বৎসর ধরে একটা জমিতে চাষ করে। তারা ধান, ভুট্টা, রাঙাআলু, তামাক প্রভৃতি চাষ করে। তারা মাছ এবং মাংস শুকিয়ে সঞ্চয় করে রাখে বছরের অকাল মাসগুলির জন্য। ফাঁদ পেতে ছোট ছোট পশু ও মাছ ধরতে এরা খুব পটু।

গৃহপালিত পশুর দিক থেকে হিল মিরিরা অন্যান্য উপজাতিদের থেকে গরীব। এখানে

সবচেয়ে বেশি মূল্যবান পশু হচ্ছে মিথন। তারপর শূকর। একসময়ে স্ত্রী ও ক্রীতদাস লেনদেন হত মিথনের বিনিময়ে। এই পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে মিথনের সংখ্যা দিয়ে বিচার হয় সে ধনী, না গরীব লোক।

হিল মিরিদের বিবাহ ব্যবস্থা নানা রকমের। প্রথম 'নাইদা' বিবাহ প্রথা। 'নাইদা' হচ্ছে যে-বিবাহ পিতামাতার সম্মতি অনুসারে হয়। এই বিবাহ সমাজের চোখে সম্মানকর। এই মতে বিবাহ জাঁকজমকের সঙ্গে হয়, তাই খরচপত্রও খুব হয়। ধনী ব্যক্তির ছেলে-মেয়েদেরই এইভাবে বিবাহ হয়। 'নাইদা' মতে বিবাহ করে যদি কারো স্ত্রী অপর পুরুষের সঙ্গে চলে যায়, তবে স্বামীর কাছে এটা একটা চরম অপমান। হিল মিরিরা বিশ্বাস করে 'নাইদা' মতে বিবাহিত স্ত্রীকে বিক্রি করলে সেই পরিবারের উপর চরম দুর্ভাগ্য নেমে আসে দেবতাদের দ্বারা। 'নাইদা' বিবাহের পর 'টাডো হালে' বিবাহ প্রথা প্রচলিত। এই মতে বিবাহের জন্য পণ হিসাবে একটি বা দুটি মিথনই যথেষ্ট। যৌতুক হিসাবে অন্য কোন জিনিস মেয়ের বাবাকে দিতে হয় না। 'নিম্‌মোলি' প্রথায় আর এক ধরনের বিবাহ আছে। এই মতে পিতামাতার সম্মতি ছাড়াই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠার ফলে বিবাহ হয়। 'নিমো কেদনা' নামে আর এক ধরনের বিবাহ ব্যবস্থা আছে। এই মতে মেয়ে নিজের ইচ্ছা মতো কোন ছেলের বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে একত্র বেশ কিছু দিন থাকে। যদি তার ছেলেকে পছন্দ হয়ে যায়, তবে সে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পাকাপাকিভাবে সেখানে থেকে যায়। পরে সমাজ এই বিবাহ মেনে নেয়।

হিল মিরিরা শবদেহ মাটিতে কবর দেয়। মৃত-ব্যক্তির সঙ্গে তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং দেশী মদ কবরের মধ্যে দিয়ে দেয়। তারপর শবদেহের উপর পাথর চাপা দেয়—শেষে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখে। ঐ কবরের উপর একটা পাথর পুঁতে, তার উপর একটা ছাউনির মতো করে দেয়। তারপর চারপাশে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেয়। ছাউনির সামনে একটা মঞ্চের মতো করে তার উপর পাঁচটি বাঁদরের মূর্তি তৈরি করে রেখে দেয়। তাদের হাতগুলি সামনের দিকে প্রসারিত। তাদের প্রত্যেকের পিঠে একটা করে ছোট ঝাঁকা থাকে, তার মধ্যে ছোট ছোট খাবারের প্যাকেট এবং ছোট শিশিতে মদ দিয়ে দেয়। আবার তাদের মুখে গুঁজে দেয় পাইপ। দেখলে মনে হয়, তারা যেন সত্যি সত্যি পাইপ টানছে। এই উপজাতিরা মনে করে, বাঁদররা মৃতব্যক্তির জন্য তাদের দেওয়া জিনিসগুলি বহন করে নিয়ে যায়।

হিল মিরিদের বিশ্বাস, মানুষ মরে গেলে তার আত্মাকে ('ইয়ালো'কে) দেবতা ('ওয়াইয়ু') একটা বিশেষ জায়গায় নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্দী করে রাখে। তারপর সেখান থেকে আত্মা ('ইয়ালো') 'নেলি' নামে মাটির নিচে একটা স্তরে চলে যায়। অন্যান্য উপজাতিদের মতো হিল মিরিরাও বিভিন্ন দেবতা-অপদেবতাকে বিশ্বাস করে। তারা সূর্য-চন্দ্রকে দেবতা মনে করে। সবথেকে ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতার নাম 'ইয়াপোম্'। ইনি বনদেবতা, বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন। কখনও মানুষের রূপধারণ করে আসেন, তবে সবাই তাঁকে দেখতে পায় না। তারা মনে করে, দেবতাদের সন্তুষ্ট করে অলৌকিক উপায়ে রোগ-ব্যাধি সারানো যায়।

এই সুবনসিরি জেলায় রাউ, রিশি-মশি, নিডু-মোরা, চিকুম্-ডুই নামে কয়েকটি ছোট গোষ্ঠীর উপজাতি আছে। ভাষা ছাড়া এদের মধ্যে আর খুব একটা তফাত নেই।

সমালোচনা

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী—ব্রহ্মচারী অচ্যুতানন্দ। অর্ঘ্য প্রকাশনী, ৬-ডি, ডোভার লেন এক্স্‌টেন্‌শন্‌, কলিকাতা-৭০০০২৯। (১৩৮৮), পৃঃ ৪+১৬৮; মূল্য: বারো টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের ভক্তিমান্‌ লেখক সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর শ্রীদুর্গামাতার সস্নেহ সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং তাঁর ও সারদেশ্বরী আশ্রমের সেবায় নিজেকে নিবেদন করেছেন। সাধিকা দুর্গামা বাল্যকাল থেকেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিবেদিতা। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এছাড়া মায়ের নিজের মুখ থেকেও তিনি অনেক কথা শুনেছেন এবং 'দুর্গামা' গ্রন্থ পাঠ করেও অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। এ-সমস্ত প্রধানত মায়ের সঙ্গে জগন্নাথদেবের অলৌকিক পরিণয়-সম্পর্ক এবং মা যখন যখন পুরীধামে এসেছেন তখন তাঁর জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কিত। প্রভু জগন্নাথের সঙ্গে মায়ের প্রেম-ভক্তির অপূর্ব ও অনন্য সম্পর্ক লেখক পাঠক সাধারণের জন্য সুন্দর ও সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

প্রসঙ্গত লেখক জগন্নাথদেব ও পুরীর মন্দিরের আনুপূর্বিক কাহিনী ও ইতিবৃত্ত নিপুণভাবে গ্রন্থের নানা অংশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। প্রচলিত গল্প, কিংবদন্তী, লোককথা কিছুই বাদ পড়েনি। এগুলির সঙ্গে দেশের জনমনের যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আবেগ জড়িয়ে আছে তা তিনি নিষ্ঠা নিয়ে লক্ষ্য করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব তেমনিই এক দেবতা, যিনি অরূপের লীলায় নীলমাধব ইন্দ্রনীলকান্তমণি, আবার দারুব্রহ্মরূপে বেদান্তের প্রতিপাদ্য।" আমাদের ধর্মজগতে, সমাজে, সাহিত্যে, কাব্যে জগন্নাথদেব ও পুরীধামের যে বিরাট প্রভাব ও ভূমিকা আছে সে-সম্পর্কেও লেখক সচেতন। শ্রীচৈতন্যদেব-সম্পর্কেও তিনি সশ্রদ্ধ ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নামকরণ (যেটি সুন্দর ও সুপ্রযুক্ত) এখানে উল্লেখযোগ্য। পড়াশুনার পরিধিও তাঁর যথেষ্ট বিস্তৃত। বহু উদ্ধৃতি ও সুভাষিতের তিনি সমাবেশ ঘটিয়েছেন এবং সেখানে প্রাচীন কবি জয়দেবের পাশে আছেন আধুনিক কবি মোহিতলাল মজুমদার। দু-এক জায়গায় সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ বাদ পড়ে গেছে; মাঝে মাঝে, বিশেষত গ্রন্থের প্রথম দিকে, উচ্ছ্বাসের আতিশয্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে; কয়েকটি শব্দতে (যেমন, 'ভুঁড়ি', পৃঃ ৫১, 'বিস্তার', পৃঃ ৭০, ইত্যাদি) এবং কিছু মুদ্রণ প্রমাদে দুই-এক ক্ষেত্রে রসভঙ্গ ঘটেছে। কিন্তু এ-সব সামান্য ত্রুটি দ্বিতীয় সংস্করণে সহজেই শুধরে নেওয়া যাবে।

গ্রন্থ-পরিচিতিতে শ্রীমতী গৌরী সিংহ লিখেছেন, "লেখক অপরিসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় মিশিয়ে তাঁর এই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।" এ-বিষয়ে বর্তমান সমালোচক লেখিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ব্রহ্মচারী অচ্যুতানন্দের এই গ্রন্থটি আমাদের ধর্মসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং সকল ধর্মপ্রাণ নরনারী তাঁর পুস্তক পাঠ করে অনাবিল আনন্দ লাভ করবেন।

—ডক্টর বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

সৌরাষ্ট্রে বন্যা: সৌরাষ্ট্রে শত শত মানুষ বন্যাবিধ্বস্ত হইয়া মারা গিয়াছে। হাজার হাজার মানুষ বন্যাকবলিত এলাকায় জলবন্দী। ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জুনাগড় অঞ্চলের জলবন্দী মানুষদের জন্য রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম খাবারের প্যাকেট বিমান হইতে নিক্ষেপ করিতেছে।

আসাম হাঙ্গামার প্রাথমিক ত্রাণকার্য গত ২০ মে শেষ হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে গাইঘাটা ঘূর্ণিবাত্যা: চব্বিশ পরগনা জেলার গাইঘাটায় সাম্প্রতিক ঘূর্ণিবাত্যায় আশ্রয়চ্যুত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনকল্পে সরজমিনের তদন্তাদির কার্য এখন সম্পূর্ণ। কলিকাতা হইতে ৬৪ কিলোমিটার দূরে ঠাকুরপুকুর গ্রামে একটি ত্রাণশিবির স্থাপিত হইয়াছে। গাইঘাটা থানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে কার্যসম্পাদন করিবার জন্য 'নিজের বাড়ি নিজে কর' একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। বাড়িনির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় নকশাসহ যাবতীয় উপকরণাদি এবং মিস্ত্রী-খরচ রামকৃষ্ণ মিশন হইতে সরবরাহ করা হইবে। ৪ হইতে ৫ মাসের মধ্যে ঐরূপ ৫০০টি টিনের চালের বাড়িনির্মাণ সমাপ্ত হইবার কথা। প্রতিটি বাড়ি হইবে ১৫০ বর্গফুট আয়তনের।

দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১১ মে ১৯৮৩, চিংগ্লেপেট মিশন কেন্দ্রের ইন্দুমন্থপুটেরির নবনির্মিত আশ্রম 'সারদা কুটিরে'র দ্বারোদ্ঘাটন করেন পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ।

উদ্বোধন-সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা

সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার গীতা অথবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অক্ষজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দেহত্যাগ

স্বামী মাধুর্যানন্দ (নলিনী মহারাজ) গত ২৬ জুন ১৯৮৩, রাত ৮-৩০ মিনিটে আকস্মিক হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্যের ফলে বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৩ বৎসর। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি কর্মজীবন হইতে অবসর লইয়া বৃন্দাবন আশ্রমে ছিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার শরীর বেশ সুস্থ ছিল। শেষদিনটিতেও তিনি যথানিয়মে প্রাতরাশ, দুপুরের আহার গ্রহণ করেন এবং বিকালে সেবকসহ আশ্রম-বারান্দায় অল্পক্ষণ পাদচারণা করিয়াছেন। তারপর ঘরে আসিয়া একটু জল খাইয়াই বিশ্রামের জন্য শয্যাগ্রহণ করেন—উহাই ছিল তাঁহার অন্তিম শয়ন। নিদ্রার মধ্যেই তিনি শান্তিতে প্রয়াণ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে তিনি যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বরাহনগর আশ্রম ছাড়া তিনি বেলুড় মঠে ছিলেন প্রায় ১০ বৎসর।

১৯৩৭-এর পর হইতে ১৯৪৭ পর্যন্ত তিনি বৃন্দাবন আশ্রমের কর্মী ছিলেন। কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পরও তিনি শেষদিন পর্যন্ত বৃন্দাবনবাসী ছিলেন। তিনি অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি মিশনের ত্রাণকার্যেও অংশগ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্তী জীবনে তিনি দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সুমিষ্ট ব্যবহার, স্বাবলম্বিতা ও অত্যন্ত সরল সাধুজীবনের জন্য তিনি আশ্রমবাসী সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার্হ ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে বিলীন তাঁহার আত্মা অনন্ত শান্তিলাভ করিয়াছে—আমাদের অন্তরের বিশ্বাস

বিবিধ সংবাদ

যুবসম্মেলন

স্বামী বিবেকানন্দ ফোরাম (কলিকাতা)-এর উদ্যোগে গত ২৫ মে সন্ধ্যা ৬টায় কলিকাতার নিজাম প্যালেসে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় অংশগ্রহণ করেন কলিকাতা শহরের বেশ কিছু তরুণ। বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন স্বামী ভবহারানন্দ, স্বামী শিবরূপানন্দ ও শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী। বক্তাগণের প্রত্যেকে স্বামীজীর আদর্শে পশ্চিমবঙ্গে এক ব্যাপক ছাত্র-যুব-আন্দোলন সংগঠিত করিবার জন্য আহ্বান জানান। 'ফোরামে'র উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ডাঃ সমীরকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণ হাজরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীঅমল ব্যানার্জী।

নিবেদিতা-শিল্প পুরস্কার

গত ২৯ মে হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আশ্রমে ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের নিবেদিতা-শিল্প পুরস্কার দেওয়া হয় বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীচিন্তামণি করকে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী দিব্যানন্দ। তিনি বলেন, 'নিবেদিতা ভারতে শিল্প আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ভারতীয় শিল্পে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। স্বামীজী ১৯০০ সালে প্যারীতে শিল্প-প্রদর্শনী দেখেন ও এই সময়ে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মনীষী অগুস্ত রদ্যাঁর সঙ্গেও পরিচিত হন।' পুরস্কারপ্রাপক শ্রীচিন্তামণি কর বলেন, 'এই জাতীয় পুরস্কার শিল্পীকে বিশেষ সম্মান দান করে, কারণ এখানে আছে আন্তরিকতা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।' শিল্পীকে পুরস্কার-ফলক ও 'লেটারস্ অফ সিস্টার নিবেদিতা' দেন আশ্রম-সম্পাদক শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীনিত্যানন্দ ভকত পুরস্কার-ফলক তৈরি করেন। অনুষ্ঠানে ৩০জন শিশু-শিল্পীকেও পুরস্কৃত করা হয়। ডঃ নিমাইসাধন বসু ধন্যবাদ দেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅমিয় ঘোষ। সভায় বহু বিশিষ্ট শিল্পী ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

উৎসব

নিম্নলিখিত স্থান হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—

ঘাটাল (মেদিনীপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। **বিধাননগর** (কলিকাতা) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র। **অপর্ণা হাউস** (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপ।

পরলোকে

গত ২৫ মে ১৯৮৩, সকাল ১০-৩৭ মিনিটে ৮৭ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য **যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী** মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল শহরে স্বীয় বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। ছাত্রজীবনে ঘাটাল হইতে পদব্রজে জয়রামবাটীতে যাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয় লাভে তিনি ধন্য হন। তিনি ছিলেন ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-প্রধান শিক্ষক। তাঁহার আত্মা মাতৃ-অঙ্কে শান্তি-লাভ করুক, আমাদের এই প্রার্থনা।



৮৫তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৯০

দিব্য বাণী

* *

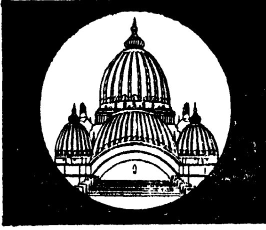
স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতং বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্তব্ধ করি কুরুক্ষেত্র-প্রলয়ের হুহুঙ্কার,
দূর করি সহজাত মহামোহ-অন্ধকার,
সুগভীর উঠেছিল গীতাসিংহনাদ যাঁর,
সেই এবে রামকৃষ্ণ খ্যাতনামা ত্রিসংসার।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী-কৃত পদ্যানুবাদ)

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ২৫৪-৫৫]



কথাপ্রসঙ্গে

একটি তিথি : জন্মহীনের জন্মতিথি

আবার জন্মাষ্টমী ঘুরিয়া আসিল।

সংসারে এই একটি তিথি—জন্মহীনের জন্ম-তিথি, আমাদিগকে এক অনির্বচনীয় স্মৃতিলোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। জন্মাষ্টমী কথাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ—ইহার অর্থ স্বতঃপ্রকাশিত। কাহার জন্ম?—এরূপ পৃথক্ প্রশ্ন আর মনে জাগে না। জন্মরহিত যিনি তাঁহারই জন্ম! 'জায়মানে অজনে'—শ্রীমদ্‌ভাগবতে আমরা এইরূপই শুনিয়াছি। আসন্নমৃত্যু পরীক্ষিৎকে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মকথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বাদরায়ণি শুক ঐ কথাই বলিয়াছিলেন।

জন্ম-মরণহীন সর্বভূতেশ হইয়াও নিজ অঘটন-ঘটনকুশলী মায়া অবলম্বনে তিনি অবিকল মানুষেরই মতো জন্মপরিগ্রহ করেন,—ঠিক যেন জীবের ন্যায় চলিয়া ফিরিয়া নানা বিচিত্র কর্মের অবতারণা করেন,—অবশেষে নাটকের যবনিকা টানিয়া লোকলোচনের বাহিরেও চলিয়া যান। সব ব্যাপারটিই অতি নাটকীয়—অত্যন্ত মায়িক। নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন :

'অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা ভূতানাম্
ঈশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া ॥'

তাঁহার যে-শরীরের জন্ম হয়, উহা একান্তভাবেই মায়াময়। মায়াবৃত তাঁহার ঐ স্বরূপকে অবলোকন তাই মায়াবদ্ধ আমাদিগের পক্ষে সাধ্যাতীত। তিনি স্বয়ংই ইহা বলিয়াছেন। মহাভারতে পাইয়াছি, নারদকে শ্রীভগবান স্পষ্টই জানাইতেছেন—চর্মচক্ষুতে আমার যে শরীর তুমি দেখিতেছ, উহা মায়ারচিত—'মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।'

মায়া-মনুষ্যরূপে লোকহিতায় যাঁহার জন্ম, সেই শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবকেই আমরা স্মরণ করিয়া থাকি জন্মাষ্টমীর পুণ্যাহে। তাঁহার জন্ম-কর্ম-লীলা যুগ-যুগব্যাপী সুবিস্তীর্ণ,—স্থূল দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই উহারও পরিসমাপ্তি ঘটে নাই, সূক্ষ্মতঃ উহা চলিতেছেই। মানুষের মনোবৃন্দাবনে এখনও যমুনার কলধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, এখনও সেথায় গোষ্ঠক্রীড়া অব্যাহত। ভক্তের হৃদয়াকাশে বংশীরব আজিও বিরহীপ্রাণকে আকুল করিয়া তুলে। সংসারের মথুরাপুরীতে উদ্ধত অসুরনিবহ তাঁহারই তেজে আজিও পরাভূত হইয়া থাকে। সমাজের কুরুক্ষেত্র এখনও রণমুখর। মানবাত্মার প্রাণবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবও অদ্যাবধি সমান লীলানিপুণ! স্বামী বিবেকানন্দের ভাষানুকরণে বলিতে হয়, তিনি নানাভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, তিনি আবালবৃদ্ধ ভারতবাসী সকলেরই পরম প্রিয় ইষ্টদেবতা।…ভাগবতকার তাঁহাকে অবতার বলিয়াই তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

*

প্রত্যেক অবতারপুরুষই তাঁহার নিজ উপদেশাবলীর সাকারবিগ্রহস্বরূপ—তাঁহার প্রচারিত শিক্ষামালার জীবন্ত উদাহরণ। গীতাপ্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং ছিলেন গীতারই সচল বিগ্রহ। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বিখ্যাত মাদ্রাজ অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই কথারই

সুস্পষ্ট অনুমোদন আমরা শুনিয়াছি স্বামীজী বলিয়াছেন—'গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চিরজীবন সেই ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহরূপে বর্তমান ছিলেন।' আবার এই গীতার কথাতেও স্বামীজীর মন্তব্য: 'গীতার মতো বেদের ভাষ্য আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য বুঝা বড় কঠিন;···কারণ ভাষ্যকারেরা সকলেই নিজেদের মতানুযায়ী উহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে যিনি স্বয়ং শ্রুতির বক্তা, সেই ভগবান নিজে আসিয়া গীতার প্রচারক-রূপে শ্রুতির অর্থ বুঝাইলেন, আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা-প্রণালীর যেমন প্রয়োজন—সমগ্র জগতে উহার যেমন প্রয়োজন, আর তেমন নহে।'

*

'গীতা সব শাস্ত্রের সার'—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি। কেবলমাত্র বৈদিক ধর্মেরই নহে, পৃথিবীর সকল ধর্মের, সকল শাস্ত্রের নিষ্কর্ষ এই গীতা। গীতা অপেক্ষা সর্বজনীন, সরল, সরস এবং সর্বমানবের সর্বসমস্যার সমাধানকারক অন্য আর কোনও ধর্মগ্রন্থের কথা আমরা জানি না। গীতার পরিচয় প্রতি অধ্যায়ের অন্তে গীতাতেই উক্ত হইয়াছে। গীতাকে বলা যাইতে পারে —শ্রুতিসারসংগ্রহ। গীতা স্বয়ং সমস্ত উপনিষদের উদ্যান হইতে সংকলিত নানা বর্ণাঢ্য ফুলের তৈয়ারি একটি পুষ্পস্তবক যেন। এই কারণে গীতা একখানি উপনিষদ্ও বটে। গীতার প্রতি অধ্যায়-শেষে 'ভগবদ্গীতাসু-উপনিষৎসু' ইত্যাদি পাঠ লক্ষণীয়। উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিজ্ঞানই গীতার মূল বক্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়,—'উপনিষদ্ হইতে আধ্যাত্মিক কুসুমরাশি চয়ন করিয়া গীতারূপ এই সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হইয়াছে।'

গীতা আবার সুবিখ্যাত যোগশাস্ত্র। 'ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে'—অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচক এই মন্ত্রাংশ আমরা আবৃত্তি করিয়া থাকি। উপনিষদ্-নির্দেশিত ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে পূর্ণ বলিয়া ইহা যেমন ব্রহ্মবিদ্যা, সেইরূপ একাধারে যোগশাস্ত্র। ব্রহ্মবিদ্যার অপর নাম আত্মবিজ্ঞান (Science of Reality); এবং সেই ব্রহ্মের বা আত্মার সঙ্গে মিলিত বোধ করিবার যে উপায় বা কৌশল তাহাই হইতেছে যোগ (art of union with Reality)। সাধারণতঃ যোগদর্শনে এই উপায় বা কৌশলকেই চিত্তবৃত্তিনিরোধ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে এবং উহার জন্য কয়েকটি বিশেষ সাধন অথবা অভ্যাস উপদিষ্ট দেখা যায়। কিন্তু এই গীতারূপ যোগশাস্ত্রে চিত্তের সকল বৃত্তিকেই নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি, ধ্যান ও জ্ঞানের অনুগত করিয়া, সর্বতোভাবে তদ্গত বা তন্ময় হইবার এক অপূর্ব যোগকৌশল সহজভাবে উপদেশ করা হইয়াছে। জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান ও ভক্তি—প্রধান এই চারিযোগের সমন্বিত সাধনই গীতার নির্দেশ। ইহাও গীতার এক অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব।

'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা'। স্বামী তুরীয়ানন্দের মুখে ও পত্রে বহুকথিত একটি বাক্য। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত পঞ্চম বেদ মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত ইহা। সমগ্র মহাভারতের শিক্ষার সার-নির্যাস এই গীতাতে ব্যক্ত হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ যথার্থ ই লিখিয়াছেন:

'ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥'

গীতা প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম। যে-শাস্ত্রবিদ্যা সহায়ে আত্মবিদ্যার পথে গমন সম্ভবপর হয়, উহাকেই আমাদের ঋষিগণ 'প্রস্থান' বলিতেন। মানুষের সম্মুখে তিনটি সুপ্রশস্ত রাজপথ—প্রস্থানত্রয়। প্রাচীনকাল হইতে এই প্রস্থানত্রয়ের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনই আত্মজ্ঞানের পথে অপরিহার্য সাধনরূপে গৌরবান্বিত হইয়া

আসিতেছে। সনাতন বৈদিক সমাজের ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ও বহুমানিত রীতি। উপনিষদ্‌কে আখ্যা দেওয়া হয় শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র হইতেছে ন্যায়-প্রস্থান, আর গীতাকে বলা হয় স্মৃতিপ্রস্থান। স্বামী বিবেকানন্দ গীতাকে নির্দেশ করিয়াছেন 'বেদের সর্বোত্তম ভাষ্য' বলিয়া, তাহা তো আমরা পূর্বেই স্মরণ করিয়াছি।

*

গীতার দৃশ্যপটখানিও অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক এবং অপূর্ব দ্যোতনাময়। অথচ ইহাতে কল্পনা ও বাস্তবতার আশ্চর্য সমন্বয় ফুটিয়া উঠিয়াছে—যেন এক সুগম্ভীর মহাকাব্য। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ধর্মশাস্ত্র,—মানবের সর্বোত্তম সমাজ-নীতি উপদিষ্ট ও প্রচারিত হইয়াছে যুদ্ধক্ষেত্রে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহুতর বিস্ময়কর ঘটনার মধ্যে ইহা যেন বিস্ময়েরও বিস্ময়। ঐতিহাসিক পরম্পরাগত কারণ যাহাই থাকুক না কেন, অন্তর্নিহিত ভাবটিকে যদি একটু চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে যুদ্ধক্ষেত্রের দামামা-দুন্দুভি ও রণ-হুঙ্কারের মাঝে গীতার আবির্ভাব অর্থহীন নহে,—বরং বিশেষ ইঙ্গিতময় ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

মানুষের জীবনই তো কুরুক্ষেত্র-সমর। প্রতিটি জীবনের বেলাতেই ইহা প্রযোজ্য। সু এবং কু—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়, এই উভয়ের দ্বন্দ্বই তো জীবন-সংগ্রাম। আর এই সংগ্রামে আমরাও কি অর্জুনের মতো দিশাহারা হইয়া কু-কেই সু বলিয়া মনে করি না? প্রেয়কেই শ্রেয়ের আসনে বসাই না? মোহ-আসক্তি-স্নেহ-মমতা আমাদেরও দৃষ্টিকে সততই আচ্ছন্ন রাখে,—অধর্মকে ধর্ম বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, অকর্মণ্যতাকে শান্তি বলিয়া জ্ঞান করায়, সুলভ নাম-যশঃ-প্রতিষ্ঠাকে গৌরব মনে করায়। সারা জীবনব্যাপী এই সংগ্রামে যে-ব্যক্তি নিজের অহংকেই মাত্র ভরসা করিয়া চলে, পরিণামে তাহার অবস্থা ঐ কৌরবদের মতোই হইয়া থাকে। আর সুকৃতিবশে, হৃদয়বিহারী কৃষ্ণের কাছে,—দেহরথের সেই পরম সারথি বিবেকের নিকট যে নিজেকে সমর্পণ করিতে পারে, এবং তাঁহারই নির্দেশানুযায়ী পুরুষকার বলে অহং-মমতার ঊর্ধ্বে যাইতে সক্ষম হয়,—প্রেয়ের আকর্ষণে মুগ্ধ না হইয়া শ্রেয়ঃকেই জীবনে বরণ করিয়া লয়, সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায় সে-ই পারে জীবন-যুদ্ধে বিজয়ী হইতে।

বাধা অসংখ্য। শ্রেয়ের পথে, সত্যের দিকে চলিতে সহায়তা ও সমর্থন অল্পই মিলিয়া থাকে সংসারে। পক্ষান্তরে সস্তার বাহবা এবং তৎসহ প্রচুর স্তাবকদলের প্রশংসামুখর প্রচারণা ও চাটু-কারিতা অনায়াসেই আসিয়া জুটিয়া যায় অসত্য ও প্রেয়ের পথে। পাণ্ডব-সংখ্যা মাত্র পাঁচ,—কিন্তু কৌরবগণ একশত। শুধু তাহাই নহে, তদানীন্তন সমাজের ও রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা, শক্তিশালী নায়করা, প্রতাপান্বিত রাজন্যবর্গ, প্রায় সকলেই কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদের বিরুদ্ধা-চরণ করিয়াছেন,—অধর্মকেই সক্রিয় সমর্থন জানাইয়াছেন। আর সংখ্যালঘিষ্ঠ পাণ্ডব-পক্ষে সমাজ-শক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু ধর্মাশ্রয়ী পাণ্ডবগণের মাথার উপরে ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। চিরকাল সংসারে যাঁহারাই সৎ ও কল্যাণের পথে চলিতে চাহেন, তাঁহাদের বল-ভরসা ও আশ্রয় হন একমাত্র ভগবান। আর যাহারা অসত্য ও অশুভ পথে বিচরণকারী, তাহাদের জয়-জয়কারে সমাজ মুখরিত থাকে,—উহাদের পশ্চাতে সহস্র করতালির ধ্বনিতে মেদিনী কম্পমান হয়। সংসারের চিরন্তন এই রূঢ় বাস্তবই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে রূপায়িত হইয়াছে সুনিপুণ ভাবে ও ভঙ্গিতে—যেন অনবদ্য একখানি নাটকীয় চিত্ররূপ।

সমাজ-জীবনে যাহা সত্য, এক-একটি ব্যষ্টির ক্ষেত্রেও তাহাই অব্যর্থ। প্রতি হৃদয়ে পার্থ-সারথি

শ্রীভগবান বিরাজ করিতেছেন—তাঁহারই নির্দেশনায় এই জীবন-যুদ্ধ চালিত করিলে শ্রেয়োলাভ অবশ্যম্ভাবী। কুরুক্ষেত্রের পটভূমিকাটি তাই এক অত্যাশ্চর্য রূপক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠোদ্গীত উপদেশের তাৎপর্যটি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য সহ বর্ণিত হইয়াছে এখানে।

*

শ্রীভগবানের জন্মাষ্টমী-উদ্‌যাপনের অর্থ, আমরা বুঝিয়া থাকি, মনে প্রাণে তাঁহার শিক্ষাকে বরণ করিয়া লইবার শুভ সঙ্কল্প-গ্রহণ। সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁহার শিক্ষা ও আশীর্বাদ বিকীর্ণ রহিয়াছে সর্বশাস্ত্রময়ী গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ব্যাপী। গীতা-সিংহনাদকারী কৃষ্ণকেই তো আজ আমাদের বড় বেশি প্রয়োজন,—তাঁহারই সারথ্যকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইলেই আমরা আজিকার ভয়াবহ জীবন-সংগ্রামে বাঁচিবার পথ পাইব। সেদিনের উন্মত্ত কৌরবকুলের ন্যায় সারা পৃথিবী আজও সর্বনাশা তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে। হিংসায় আর হানাহানিতে, রক্ত-স্রোতে আর অশ্রুবন্যায়, অতীতের কুরুক্ষেত্রের স্মৃতিও বুঝি পরাভূত আজ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা আছে—দুঃখকাতরা পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করিয়া করুণ-স্বরে রোদন করিতে করিতে অশ্রুপ্লাবিত বদনে স্বয়ং বিভুর নিকটে আর্তি জানাইয়াছিলেন। 'গৌর্ভূত্বা অশ্রুমুখী খিন্না রুদন্তী করুণং বিভোঃ।' মানুষের অন্তরাত্মার রুদ্ধ ক্রন্দনই তো ধরিত্রীর রোদন। সেদিন আর্ত অবনীর অশ্রুপাতে জগদীশ্বরের আসন টলিয়াছিল সত্যই,—তাঁহাকে এই মাটির পৃথিবীতে নামিতে হইয়াছিল। জন্ম-মরণাতীত হইয়াও জন্ম-মরণের নাগর দোলায় চড়িয়া তিনিও না খেলিয়া পারেন নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা আমাদের ইহাই যে, আমাদের বর্তমানের প্রয়োজন সেই অতীত অপেক্ষাও গুরুতর কিনা,—ক্রমেই অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আমরা আসিয়া পড়িতেছি কিনা। দর্পী কৌরব ও নিষ্ঠুর নর-ঘাতকের অবাধ বিচরণে ও আচরণে বিশ্বের নিরীহ মানব আজও আবার ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিতেছে: কোথায় তুমি ভূভার-হরণ, আমরা যে তোমারই পথ চাহিয়া উন্নিদ্র প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। মত্ত আসুর শক্তির পাষাণ-কারা ভেদ করিয়া, হে কুহকান্তক, তোমার জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আবার কবে আমরা জাগিয়া উঠিব? আর্ত অর্জুনের মতো আমরাও যেন প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারি—'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।' তোমার জন্মতিথিতে ইহাই হউক আমাদের অন্তরোত্থিত প্রার্থনা।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীমতী মানসী বরাট

নিপীড়িত মানবাত্মার মূর্তিময় বিদ্রোহ-শক্তি তুমি—তুমি পরিত্রাতা।
আবির্ভূত কুরুক্ষেত্রে পার্থ-সারথিরূপে হে ভারত ভাগ্যবিধাতা॥
অসত্য পাপ অন্যায় যেথা এনেছে ধর্মবিপর্যয়।
যুগে যুগে সেথা তোমার প্রকাশ হে স্থিতপ্রজ্ঞ মহিমাময়॥
হেথা তুমি নহ রাখাল-রাজ হে কৃষ্ণকিশোর নন্দলালা।
পুরুষোত্তম, বিস্তৃত হেথা তোমার কর্মযজ্ঞশালা॥

প্রতিযুদ্ধের পরিণাম ভাবি ব্যথিত বিমূঢ় ধনঞ্জয়—
গাণ্ডীব ত্যাগি কহিলেন যবে, কেন বৃথা এই লোকক্ষয়।
"ধর্মযুদ্ধে জীবনের হানি নহে কভু, নহে দুখের কারণ।"
ধর্মতত্ত্ব শিখাতে পার্থে, নারায়ণ হলে নরনারায়ণ॥
ক্ষাত্রধর্ম ন্যায়-সংগ্রাম, ফলাফলে নাহি কোন অধিকার।
প্রাজ্ঞ যে জন সুখে-দুখে-শোকে নিত্যনিয়ত নির্বিকার॥
সমর্পিত মন আমাতে যে জন, কামনাশূন্য কর্মে নিরত।
অবারিত তার মোক্ষ-দুয়ার হে সখা পার্থ জানিবে সতত॥
ধর্মসংস্থাপক, হে যোদ্ধা, প্রতিভাদীপ্ত পুরুষোত্তম।
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় তব ইচ্ছায় তুমি—একমেব অদ্বিতীয়ম্॥

কিছু আর চাহি না চাহি না

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

পল দণ্ড মুহূর্তের নৃত্যচ্ছন্দ বহি
কালচক্র ঘুরে অবিরত
সেই চক্রে আবর্তিয়া চলে সাথে সাথে
মানুষের সুখ দুঃখ কত।

শত ইচ্ছা শত চেষ্টা আশা ও নিরাশা
ভালমন্দ ভালবাসা ঘৃণা
দিনে দিনে উঠে পুনঃ সময়ে মিলায়
কোথা যায় নাহিরে ঠিকানা।

এই তো সংসার-রীতি ওরে জীব-পাখী
কালবদ্ধ এ পরিভ্রমণ
ক্ষণে কটু ক্ষণে মিষ্ট ফলের আস্বাদ
জীবনের ব্যর্থ প্রহসন।

এই চক্রাবর্ত হতে যদি মুক্তি চাও
দৃঢ় স্বরে করহ ঘোষণা
"হেথাকার সব মর্ম বুঝিয়াছি আমি
কিছু আর চাহি না চাহি না"

উর্ধ্বে স্থিরদৃষ্টি রাখি তখন দেখিবে
নিত্যমুক্ত স্বরূপ আত্মারে
জন্মহীন মৃত্যুহীন বিশ্বসাক্ষী যিনি
কালচক্র-আবর্তন পারে।

ধারণা করা চাই

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

"শাস্ত্রের কথা বললে বা শুনলে কি হবে?—ধারণা করা চাই"—কথাটি বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্নগর হতে আগত একজন পাণ্ডিত্যাভিমানী সাধককে, যিনি পর পর সংস্কৃত শ্লোক বলছিলেন অথবা তাঁকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন, "সমুদ্রমন্থনের আগে কি চন্দ্র ছিল না? কে এসব মীমাংসা করবে?", "মাখন তোলা—আপনি তুলেছেন?", "কিন্তু শাস্ত্রে আছে 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ—তিনি বাক্য মনের অগোচর'।" সজ্জন ব্যক্তি প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ 'মোটা বামুন' বলতেন এবং যিনি বেদান্ত চর্চা করতেন, তিনি যখন 'সত্য কথা' প্রসঙ্গে মহানির্বাণ তন্ত্র হতে উদ্ধৃত করলেন, "অস্মিন ধর্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। / পরোপকারনিরতো নির্বিকারঃ সদাশয়ঃ॥", তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন "হাঁ, ওগুলি ধারণা করতে হয়।" আবার মণি অর্থাৎ মাস্টারমশাই যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কথাই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "আজ্ঞে, আপনি যেমন বলেন, জ্ঞানী তিন গুণের অতীত হয়। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ কোন গুণেরই বশ নন। এরা তিনজনেই ডাকাত", তখন তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "ঐগুলি ধারণা করা চাই।" নারাণ সম্বন্ধে 'ধারণা' কথাটি আরও পরিষ্কার করে বলছেন, "যেটি বলে দিয়েছি, সেটি বেশ ধারণা করে। পরদা গুটোতে বললাম। তা গুটোলে না। গেরো দেওয়া, সেলাই করা, পরদা গুটোনো, দোর বাক্স চাবি দিয়ে বন্ধ করা—এসব বারণ করেছিলাম—তাই ঠিক ধারণা। যে ত্যাগ করবে তার এই সব সাধন করতে হয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সব সাধন।" জ্ঞানী নাট্যকার-কবি গিরিশ,—যাঁর লেখা নাটকে জ্ঞান ও ভক্তির কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন, তাঁরও মনে হয়েছিল যে ঠিক ধারণা হয়নি; বলছেন, "মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলছেন—"না, তোমার ধারণা আছে। সেদিন ত তোমায় বললাম, ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র-আঁকা যায় না।" সেই সঙ্গে গিরিশকে জনৈক ডিপুটির ঈশ্বরীয় কথা না শুনে, ছেলে নিয়ে ব্যস্ত থাকাকে 'ধারণার' অভাব বললেন।

প্রশ্ন হচ্ছে 'ধারণা' কথাটি কি অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যবহার করেছেন? সাধারণ বাংলায় কথাটির অর্থ অনুভূতি, উপলব্ধি, সিদ্ধান্ত, বা পরিষ্কার-ভাবে বুঝা। উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে কথাটি কিন্তু আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং গিরিশও সেই ব্যাপক অর্থেই বলেছিলেন যে, তাঁর ধারণা নেই। 'ধারণা করা চাই' মত প্রকাশের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝাতে চাননি যে, সাধক বা প্রাণকৃষ্ণ সংস্কৃত শ্লোকগুলির অর্থ জানেন না, বা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইত্যাদির মূলগত ভাব মাস্টারমশাইর উপলব্ধি হয়নি। প্রাণকৃষ্ণকে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "যারা বিষয় কর্ম করে—আফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যেতে থাকা উচিত! সত্য কথা কলির তপস্যা।" নারাণের 'ধারণা ঠিক' বলতে যেয়ে ত্যাগ ও সাধনের কথা এনেছেন এবং ধারণার বিষয়কে জীবনে রূপায়িত করাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গিরিশের 'ধারণা আছে' বলতে গিয়ে ভক্তির কথা এনেছেন এবং সাধককে এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "এসব জানতে গেলে সাধুসঙ্গ দরকার।" অর্থাৎ ঠিক ঠিক ধারণা করতে গেলে সাধনা, ভক্তি, সত্যে

আঁট, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি দরকার। কোন উপদেশ বা শ্লোকের অর্থ করতে পারলেই 'ধারণা' হয়েছে বলা যাবে না। ধারণার আগে প্রস্তুতি—কখনও বা দীর্ঘ প্রস্তুতি দরকার, যেমন আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে জ্ঞানযোগে বর্ণিত নিদিধ্যাসনের পূর্বে শ্রবণ ও মননের প্রয়োজন অথবা রাজযোগে বর্ণিত ধারণার পূর্বে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের প্রয়োজন। এরূপ করলে চিত্তবৃত্তি বিষয়ান্তর হতে প্রত্যাহৃত হয়ে একটি বিষয়ে স্থির হবে এবং মর্মার্থ ধীরে ধীরে ধারণায় পর্যবসিত হবে। তার সঙ্গে ধারণার ভাবটি জীবনে রূপায়িত করার চেষ্টাও থাকবে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, শ্রীরামকৃষ্ণ 'ধারণা'র উপর এত জোর দিয়েছেন কেন। উত্তরে বলা যায় যে, তিনি এমন যুগে এসেছিলেন, যখন প্রকৃত 'ধারণা' না করেই, শাস্ত্রের কথা কেবল মুখস্থ করে বা তার আক্ষরিক অর্থ জেনে নিয়েই গুরুগিরি করা বা লেকচার দেওয়া ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ধর্মের ও শাস্ত্রের কদর্থ করে ঘোষপাড়া, পঞ্চনামী, হঠযোগী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় বা উপ-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল এবং যেখানে সেখানে শুষ্ক বিচারের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। সিঁদুরের টিপ, তিলক-ফোঁটা প্রভৃতি বহিরঙ্গ, গীতা-উপনিষদ্-তন্ত্র হতে উদ্ধৃতি, উদ্ভট কবিতা আওড়ানো—এই সবই যেন ধার্মিকতা ও গুরুগিরির নিদর্শন বলে গণ্য হচ্ছিল। ত্যাগ, সংযম ও চারিত্রিক সততা যে আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান ভিত্তি, এ তথ্য তখন অবহেলিত। অবতাররা আসেন যুগের প্রয়োজনে। তাঁরা এসেই বুঝতে পারেন গলদ কোথায়; মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য যে ভগবান লাভ, সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোথায় বাধার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা কেবল সেই প্রতিবন্ধক দূর করে মানুষকে ঠিক পথ দেখিয়ে চলে যান; খুব প্রয়োজন না হলে ধ্বংস বা বিনাশ কিছু করেন না। তাই আমরা কথামৃতে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ নানা ভাবে নানা জনের ধারণা বদলে দিচ্ছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ অধিকারীকে শাস্ত্র বেশি পড়তে বারণ করতেন এবং শাস্ত্রে নির্দেশিত পথটুকু জেনে নিয়ে সাধন-ভজনের উপরেই জোর দিতে উপদেশ দিতেন। বলতেন, "শাস্ত্র বেশী পড়লে তর্ক বিচার এসে পড়ে।" অবশ্য যোগ্য অধিকারীর ক্ষেত্রে কথামৃতে এর ব্যতিক্রমও দেখি। যেমন, তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলছেন, "তুমি গীতা, ভাগবত, বেদান্ত এসব পড়—তবে এসব বুঝতে পারবে।" শুধুমাত্র অধিকার-বিচার ছাড়াও, প্রয়োজনের দিকও হয়তো আছে এখানে। তাঁদের উভয়ের মধ্যে যে গভীর ভালবাসা ছিল এবং ডাক্তার শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করা সত্ত্বেও তাঁর ও তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে যে প্রচণ্ড তর্ক করতেন, একথা সর্বজনবিদিত। তবে ডাক্তারের বিজ্ঞান, চিকিৎসা বা ইংরেজী দর্শনশাস্ত্রের বই প্রচুর পড়া থাকলেও, মনে হয়, হিন্দুধর্ম বা শাস্ত্রাদি সে-পরিমাণ পড়া ছিল না কিংবা শাস্ত্রজ্ঞ সাধুমুখে শোনার সুযোগও হয়তো তিনি তেমন পাননি। তাঁর পক্ষে তাই কিছুটা এই সব পড়া শোনার দরকার বুঝেই তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ এরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তাঁর ঠিক ঠিক 'ধারণা' জন্মে। মোট কথা—ধারণার জন্যই শাস্ত্র-সহায়তা প্রয়োজন। ধারণাই অধ্যাত্ম পথের অব্যর্থ প্রেরণা সঞ্চারক। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বার বারই বলেছেন, 'ধারণা করা চাই'।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা

স্বামী বুধানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

২২

বিশ্বের অনাদি যজ্ঞে শ্রীমায়ের আত্মাহুতি

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে বর্ণিত সর্বাত্মক পুরুষ যাতে হুত হয়েছিলেন, সৃষ্টির আদিতে সম্পন্ন সেই অনাদি যজ্ঞের উল্লেখ করে স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা দিয়েছেন যে, আত্মাহুতির নীতিই বিশ্বের সর্বোচ্চ সনাতন নীতি। কারণ এই ঈশাত্মাহুতির প্রবাহই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-পালনের নিদান।

বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ নীতিকে তাই অনুরূপা ঈশ্বরের মাতৃত্ব বলে অভিহিতা করা চলে।

এই সর্বোচ্চ নীতি আধুনিক যুগে শ্রীমায়ের জীবন মাধ্যমেই এমন একটি অতি বিস্ময়কর সামগ্রিক প্রকাশ লাভ করেছে যার সামূহিক চর্চা সূচিত হওয়ার সময় সমাগত। আর সুধী, সাধক, মনীষীদের ধ্যানেও এটি হওয়া অতি প্রয়োজনীয় এই কারণে: শ্রীমাতে বৈদিক সনাতন ধর্ম কিভাবে স্পন্দিত-বন্দিত হয়েছে, এবং এই ধর্মকে যুগাবতারের সহধর্মিণী ও সমব্রতধারিণী রূপে তিনি কিভাবে সমৃদ্ধ ও নবগুভান্বিত করে রেখে গেছেন সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারব। ফলে এই হবে যে, আমাদের সকল ভয়, সংশয়, দৈন্য, দুর্বলতা কাটবে। বিশেষ করে ধর্ম ব্যাপারে। এই ভাবাশ্রয়ে শ্রীমায়ের জীবনের 'কয়েকটি অসামান্য-সামান্য' ঘটনা পর্যালোচনা করলেও আমরা অনুভব করব কি এক অননুভূত আনন্দে আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়েছে।

শ্রীমায়ের মনে-মনে সর্বদাই জপ চলত। শেষ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় যখন অনেক সময়েই শুয়ে কাটাতে হত, তখনও সেবক লক্ষ্য করেছেন যে, মায়ের অবিরাম জপ চলছে। রাত্রিতে ঘুম খুব কমই হত। এক ডাকেই সাড়া পাওয়া যেত। সেবক জিজ্ঞেস করতেন: "আপনি কি ঘুমান নাই, বা ঘুম হচ্ছে না?" মা বলতেন: "কি করি, বাবা, ছেলেরা সব ব্যাকুল হয়ে এসে ধরে, আগ্রহ করে তখন দীক্ষা নিয়ে যায়; কিন্তু কই, কেউ নিয়মিত, নিয়মিত কেন, কেউ বা কিছুই করে না। তা যখন ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমাকে দেখতে হবে তো? তাই জপ করি, আর ঠাকুরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, 'হে ঠাকুর ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও, ওদের ইহকাল পরকাল সব তুমিই দেখো। এ সংসারে বড় দুঃখ কষ্ট! আর যেন তাদের না আসতে হয়।'"[১৪২]

শ্রীমায়ের ভক্ত-সদ্গতি-দায়িনী ব্যাকুল প্রার্থনা—এটি ঠাকুরেরই অতন্দ্র সারদা-সাধনার ফল। চক্রাকারে সাগরের জল আকাশ ঘুরে সাগরে ফিরে এল। কথাটি যদি হেঁয়ালির মতো মনে হয়, মনে করতে হবে কাশীপুরের একটি দিনের ঘটনার কথা, যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কথাটির গুরুত্ব এত বেশি যে ফিরে আসতে হচ্ছে ঐ কথায়, অন্য একটি সত্যদ্যুতির আকর্ষণে। ঠাকুর মাকে বলেছিলেন শিশু-নয়নে তাকিয়ে মায়ের দিকে—মা বিনে গতি নেই কিনা—"দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।" মা অনুযোগের স্বরে বললেন, "আমি মেয়েমানুষ! তা কি করে হবে?" ঠাকুর নিজ অঙ্গ দেখিয়ে আপন ভাবেই বলে যেতে থাকলেন, "এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।"[১৪৩]

---

১৪২ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪২৭-২৮

১৪৩ ঐ, পৃঃ ১৩৩-৩৪

মায়ের প্রতি ঠাকুরের এই যে আদেশ-মিনতি —অন্ধকারে কিলবিল-করা পোকাগুলিকে তুমি দেখো, এতে করে ধর্মসংস্থাপনের ঈশদায়িত্ব শুধু যে হস্তান্তরিত হল তাই নয়, ঠাকুর যে ধর্ম-বিজ্ঞানের চর্চার উচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন, তার একটি কর্মে-মর্মে-পরিণত ধারা ইতিহাসে প্রবাহিত করে রেখে গেলেন। নরেনকে বললেন : জীবের দুঃখ দূর করতে, আর শিক্ষা দিতে। তৎপূর্বে মাকে আদেশ-মিনতি দিলেন, "তুমি তাদের দেখো

মাকে যে ঠাকুরের এই তাদের 'দেখতে' বলা আদেশটিতে আছে, প্রশ্নহীন পূর্ণ নির্ভরতার সহিত এমন একটি দায়িত্ব দেওয়া, যা দুঃখ দূর করা ও শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে অনেক বাড়া। আর 'তাদের' মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রইল সকলে। মা যে কিভাবে দেখবেন, এ বিষয়ে ঠাকুরের দুশ্চিন্তা নেই। কারণ জানেন, স্থির জানেন, "সত্যি সত্যি আমার মা আনন্দময়ী" সব পারেন। শুধু এইটুকু বলে একেবারে নিশ্চিন্ত : 'তাদের তুমি দেখো।' "তাদের" জন্য কী প্রশান্ত-গভীর প্রেম! মাকে বলাতে কী নিবিড় নির্ভরতা! বলতে পারাতে কী নিলীন নিশ্চিন্ততা! জানেন কিনা, যাঁকে দেখতে বলা হচ্ছে, তিনি সর্বশক্তিময়ী, বহু বুদ্ধি-মতী, জ্ঞানদায়িনী। তাঁকে অনেক কথা বলে ব্যথা বোঝাতে হয় না। তিনি অন্তর্যামিনী, ভগবানের মনের ব্যথা জানেন, ভক্তের প্রাণের কান্নার অর্থ বোঝেন। ঠাকুরের এই যে সার-সংক্ষেপ আদেশ-মিনতি, এই স্বপ্নভাষণে তিনি মাকে প্রকাশ করলেন একটি অতি গম্ভীর সংবেদনে—'তাদের তুমি দেখো'। যেন তারা অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তীর্ণ হয়, কৃতার্থ হয়। শুধু আলো জ্বালিয়ে অন্ধকার তাড়ানো নয়। তাদের দেখতে হবে, "জ্ঞানাঞ্জন বিমল নয়নে" দেখতে হবে। ঠাকুরের দেখাটিকেই সম্প্রসারণ করে দেখতে হবে যেন অজ্ঞান-জ্ঞান উভয়ের আবদ্ধতা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তারা বিজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়।

এটি সাংসারিক দেখার আদেশ নয়, মোক্ষদায়ী দেখার মিনতি।

শ্রীমাও ঠাকুরকে সম্পূর্ণরূপে ঈশদায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে দিলেন না। সেজন্য ঠাকুরেরই কাছে প্রার্থনা জানালেন : "তুমিই ওদের দেখো।"

ধর্মসংস্থাপনের দায়িত্বে স্বামীজীও অংশভাগী হলেও শ্রীমায়ের দায়িত্ব এই হিসেবে গুরুতর যে, তাঁদের দেখার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানাত্মক ধর্ম-সংস্থাপন করতে করতে তাঁকে চলতে হয়েছে।

তিনি কাউকে ফেলতে পারেন না। সকলকে আপন করে নেবার মন্ত্র দিয়েছেন যে।—ধর্মের সর্বাশ্রয়ী রূপ তিনি এমন কারুণ্যের সঙ্গে নিজ মাধ্যমে প্রকাশ করলেন যে, মানুষ এই অতি মূল্যবান সত্যটি জেনে-বুঝে আশ্বস্ত হল—ধর্ম শুধু দাবী করেন না, দাবী মানেনও।

কোন সহানুভূতিশীল ভক্ত সেবক যখন মাকে আত্যন্তিক ক্লেশদায়ক ভক্তসেবা থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টিত হতেন, তখন তিনি একটি অতি মিষ্টি রসিকতা করে বলতেন : "কেন গো, ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন ?"[১৪৪]

এই রসমধুর হাসি-কথাটির ভাবার্থে হয়েছে দুটি তত্ত্ব প্রকাশ। শিবে যা বর্তায়, শক্তিতে তা অর্সায়! আর তিলে তিলে প্রাণ না দিলে, যে-দেখার আদেশ-মিনতি ঠাকুর মাকে দিয়ে-ছিলেন, সে-দেখা হয় না।

পুরাকাল থেকে সমুদ্রমন্থন সব সময়ে হয়ে আসছে। বিষ ও অমৃত দুই-ই উঠছে। যুগে-যুগে নবনীলকণ্ঠেরা আসেন। অবলীলায় বিষটুকু পান করে, অমৃত বিলিয়ে দিয়ে চলে যান।

ঠাকুর অমৃত বিলালেন জীবন ভরে ; আর

---

১৪৪ ঐ, পৃঃ ৪৩০

কণ্ঠে উঠিয়ে নিলেন বিষ-বহ্নি—ক্যানসার। শ্রীমা যখন তাঁর উত্তর-সাধিকা হয়ে, তাঁর কর্ম নিজের জীবনে উঠিয়ে নিলেন, তখন তাঁর মাঝে সমন্বিত গুরু-মাতৃ শক্তির আধারে বিনা বিচারে গ্রহণ করলেন সকলকে লালন ও উত্তীর্ণ করার দায়িত্ব। ফলে বেদোক্ত আদি পুরুষের আত্মাহুতির ধারাটি প্রবল বেগে প্রবাহিত থাকতে দেখা গেল তাঁর জীবনে এইটিই বুঝিবা ঈশ্বরের মাতৃত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

এস ভাল, এস মন্দ ; এস পণ্ডিত, এস মূর্খ ; এস সতী, এস পতিতা ; এস ডাকাত, এস ব্রহ্মজ্ঞ ; এস খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান ; এস ভারতবাসী, এস জগদ্বাসী ; এস উন্মাদ, এস স্থিতধী ; এস পশু, এস পাখী : মায়ের আকুল আহ্বান সকলের প্রাণের দুয়ারে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকত।

বহু জনের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য শ্রীমা অতি নীরবে নিত্য যে অনাড়ম্বর যজ্ঞে আত্মাহুতির সেবা-বিস্তার জগতে প্রবহমান করে রেখে গেছেন তা অনুপম।

শিষ্যের পাপ গ্রহণ করে দুঃসহ যন্ত্রণায় নিজেকে অনেক কষ্ট পেতে হলেও, পাপীর প্রতি মায়ের দৃষ্টি সদাপ্রসন্ন। পাপীকে তিনি নিজের রুগ্ন সন্তান বলেই জানতেন, গ্রহণ করতেন ও শুশ্রূষা করে নীরোগ করে তুলতেন।

নিজের অনুভূত দুর্বলতার ভারে ভূমিনত ভক্ত যখন নৈরাশ্য ভরে বলতেন : তাঁর ভয় হয়, মায়ের মতো মা পেয়েও বুঝি কিছু হল না। অভয়া শ্রীমা তখনি ভক্তের ভয় বিনাশ করে বলতেন : "ভয় কি, বাবা, সর্বদাই জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাত ধরে নিয়ে যাব।' যে যা খুশী কর না কেন, যেভাবে খুশী চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন ; তারা তো···তাদের খেলা খেলবেই!"[১৪৫]

মাতৃসাধক একদিন হৃদয় ভরে ভজন করেছিলেন : "আমি অভয়ার অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।" আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি।" অভয়া নিজে আজ সাধককে ডেকে বললেন : বাবা আমি সত্যি সত্যি আছি। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে থাক।

দুর্বল-চঞ্চল মানুষকে এই নিশ্চিন্ততা দান করতে, শক্তিরূপিণী মাকেও অনেক শক্তি প্রয়োগ করতে হত।

মন্ত্র-শক্তি ও পাপ গ্রহণ সম্বন্ধে শ্রীমা এক সময়ে বলেছিলেন : "মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শক্তি যায়। গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়, শিষ্যের গুরুতে আসে। তাই তো মন্ত্র দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়। গুরু হওয়া বড় কঠিন—শিষ্যের পাপ নিতে হয় শিষ্য পাপ করলে গুরুরও লাগে ভাল শিষ্য হলে গুরুরও উপকার হয়।"[১৪৬]

এ সত্যটি সম্যগ্‌রূপে জানা থাকা সত্ত্বেও শ্রীমা গুরুরূপে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেননি। দীক্ষার্থী প্রায় সকলকেই তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করতেন, যদিও অন্তর্দৃষ্টিবলে অনায়াসেই জানতে পেতেন কে ঘোর পাপী, কে অল্প-পাপী ও কে পুণ্যাত্মা। তাঁর সদয় সমদর্শন সমীক্ষা এমন ছিল যে, তিনি কাউকে বড় প্রত্যাখ্যান করতেন না। বিষ হলেও তা তিনি গ্রহণ করতেন, যদিও সেজন্য তাঁকে অনেক দৈহিক জ্বালা-যন্ত্রণা পেতে হত।

বলতেন : "দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই। নতুবা আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ গ্রহণ করতে হয়। ভাবি শরীরটা তো যাবেই,

১৪৫ ঐ, পৃঃ ৪৩০ ১৪৬ ঐ, পৃঃ ৪২৯

তবু এদের হোক।"

অতি সাদা-সরল বাংলা কথা। কিন্তু যে ভাবটি এতে প্রকাশ পেয়েছে, তা কিন্তু সৃষ্টির আদিতে বেদোক্ত পুরুষের আত্মাহুতি-প্রোজ্জ্বল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নীতিটি। শুধু তাই নয়, নীতির ঊর্ধ্বেও আধ্যাত্মিকতার আর একটি যে শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ আছে, যাকে বলা হয় প্রেম, এখানে আমরা তার অতি সহজ বিকাশ পেলুম: "ভাবি শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।"

ঐ যে ঠাকুর বলেছিলেন: "তুমি তাদের দেখো" ঐ "তাদের" কথাই হচ্ছে। ঠাকুরের ইষ্টপথে সাহায্য করতে আগতা শ্রীমা ধর্ম-সংস্থাপনের দায়িত্বটিকে তাঁর আপ্ত সৃজনী-প্রবণতার মাধ্যমে "দেখা"কে তাদের "হওয়া"তে প্রবর্তিত করলেন। কঠিন শাস্ত্র বিচার হচ্ছে না এখানে। এটি বিচারোত্তর প্রকাশ। এখানে আমরা চিদগ্নিকুণ্ড-সম্ভূতা, দেবকার্য-সমুদ্যতা, সর্বজননীর হেঁসেলের মাটি-লেপা দাওয়ায় বসে শাল-পাতায় পরমান্ন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত।

তবু যে বললেন: "নতুবা আমার কি লাভ?" এটি হল আমাদের মায়ের একটি ছেলে-ভুলানো ছড়া—যাতে করে ছেলে আর ভুলে না!

কেন ভুলে না?

তা-ও কি বলতে হবে?

সন্তানের মুখে-ফোটা হাসিটুকু মা যখন দেখেন, এটি কি সন্তানের লাভ না মায়ের লাভ? তবু মা বলবেন: "...নতুবা আমার লাভ কি?" জয়রামবাটীতে ভক্তের ভিড় এমন লেগে থাকত যে, মায়ের বিশ্রামের সময় অল্পই মিলত, সারাদিন যেন কর্ম-লড়াই করছেন। কিন্তু কোন দিন ভক্ত না এলে বলতেন: "ভক্তেরা কেউ এল না!" অথচ ভক্তেরা এলেই কিন্তু বরাদ্দ ছিল কঠিন কায়িক শ্রম।

মা তখন জয়রামবাটীতে। পায়ের বাতের ব্যথার বাড়াবাড়িতে চলতে খুব কষ্ট। এমন সময়ে স্বামী গৌরীশানন্দ (নেপাল মহারাজ) একদিন শুনলেন মা ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলছেন: "আজও দিনটা বৃথাই গেল, একজনও তো এল না! তুমি না বলেছিলে, 'তোমাকে নিত্যই কিছু না কিছু করতে হবে?'" এ বলে মা সতৃষ্ণভাবে ঘর-বার করছেন, আর ঠাকুরের ছবির দিকে অনিমেষ তাকিয়ে বলছেন: "কই, ঠাকুর, আজকের দিনটা কি বৃথা যাবে?"[১৪৭]

একটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তে, একটু মানবীয় দুর্বলতার ভান করেই হোক, অতি কষ্টে ক্লান্ত হয়েই হোক, হয়তো বা বলতেন: "উঃ আর পারিনে বাপু!" কিন্তু তার পরক্ষণেই আবার নিজের দিব্য স্বভাবের প্রেরণায় সকলকে আশ্রয় দিতেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে দুর্গাপূজার সময়ে, শ্রীমা বেলুড় মঠে এসেছিলেন। অষ্টমীর দিন বহুলোক তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করেছিল। তারপর দেখা গেল মা বার বার গঙ্গাজলে পা ধুচ্ছেন। যোগীন-মা জিজ্ঞেস করলেন: "মা, ও কি হচ্ছে? সর্দি করবে যে!" মা বললেন, "যোগেন, কি বলব, এক একজন প্রণাম করে, যেন গা ঠাণ্ডা হয়; আবার এক একজন প্রণাম করে, যেন গায়ে আগুন ঢেলে দেয়—গঙ্গাজলে না ধুলে বাঁচি নে।"[১৪৮]

অন্যের কৃত পাপের বৃশ্চিক দংশন মাকে নিজ শরীরে গ্রহণ করতে হত। আত্যন্তিক কষ্ট পেতেন। কষ্টের কারণও জানতেন। কচিৎ কখন হয়তো বলে ফেলতেন: "বাবা, সারাদিন যেন কুস্তি করছি—এই ভক্ত আসছে তো এই ভক্ত আসছে। এ শরীরে আর বয় না। ঠাকুরকে বলে 'রাধু', 'রাধু' করে মনটা রেখেছি।"[১৪৯]

---

১৪৭ ঐ, পৃঃ ৪৩০-৩১ ১৪৮ ঐ, পৃঃ ৪২৯ ১৪৯ ঐ, পৃঃ ৪২৯

এমন উক্তি মায়ের মুখ থেকে কদাচিৎ বের হত। চিত্তে কৃপা, মুখে সংগ্রাম-বিমুখতা!

পরক্ষণেই হয়তো ভক্ত বলছেন: "মা, শুনতে পাই ভক্তদের পাপ গ্রহণ করে তোমার এই ব্যাধি। আমার একটি আন্তরিক নিবেদন—তুমি আমার জন্য ভুগো না; আমার কর্মভোগ আমার দ্বারাই ভোগ করিয়ে নাও

মা আঁৎকে উঠে বলেন: "সে কি, বাবা; সে কি, বাবা, তোমরা ভাল থাক, আমিই ভুগি।"[১৫০]

পাপতাপের বোঝা নিয়ে কত ভক্ত আসতেন। তাঁদের অনেকের স্পর্শে মায়ের চরণে অগ্নিদাহ হলেও তিনি নীরবে সহ্য করতেন বলে কেউ জানতে পারত না। আর একদিন জ্বালা অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে পড়ায় শ্রীমাকে পূর্বের ন্যায় বার বার গঙ্গাজলে পা ধুতে দেখা যায়। রাসবিহারী মহারাজ কারণ জিজ্ঞেস করায় বললেন, "আর কাউকে পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করতে দিও না। যত পাপ এসে ঢোকে, আর পা জ্বলে যায়; পা ধুয়ে ফেলতে হয়। এই জন্যই ব্যাধি। দূর থেকে প্রণাম করতে বলবে।"

বলেই সেবককে সাবধান করে দিলেন: "এ সব কথা শরৎকে বলো না! তা হলে প্রণাম করা বন্ধ করে দিবে।"[১৫১]

নিজে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। তবু বলছেন: বাছার আমার অঙ্গ জুড়াক। আমি তাদের হয়ে ভুগি। কাউকে ফিরিয়ে দিও না। ওরা যে আমার জন্য বড় দুঃসহ অর্ঘ্য নিয়ে এসেছে। আমি যে সকলের মা। আমি যদি না ভুগি, এ বিশ্ব-ভুবনে কে আছে যে তাদের হয়ে ভুগবে?

এই হল আমাদের পতিত-পাবনী মায়ের প্রাণের ভাষা। ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রকাশ।

শিষ্যের দেহে-মনে আহৃত পাপ যদিও মায়ের অঙ্গে বহ্নিমান বিষ ঢেলে দিত, তাঁকে দগ্ধ করত, তবু পাপীকে তিনি গ্রহণ করতেন ব্যগ্র কারুণ্যের ক্ষমা-দাক্ষিণ্যে, কারণ স্বতই অনুভব করতেন যে, এ রুগ্ন সন্তানেরা বিশেষ সেবা-যত্নের অধিকারী।

এক সম্ভ্রান্ত কুলমহিলা পদস্খলনের পর সম্বিৎ ফিরে এলে, অনুতপ্তা হয়ে কম্পমানা কাঙালিনীর মতো, উদ্বোধনে মায়ের দুয়ারে দাঁড়িয়ে সাশ্রু-নয়নে বলে: "মা আমার উপায় কি হবে? আমি যে আপনার পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করবার যোগ্য নই।" তাঁর দুখানি পাবনী হস্ত প্রসারিত করে মা ধাবিত হয়ে গেলেন তাঁর এই পতিতা কন্যার দিকে। অতি স্নেহ ভরে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন: "এস, মা, ঘরে এস, পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দিব—ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও, ভয় কি?"[১৫২]

এক অতি মর্মস্পর্শী উপাখ্যানে যীশুখৃষ্টও একদা বলেছিলেন যে, ব্যভিচারে বিনষ্টপ্রায় উচ্ছৃঙ্খল সন্তান যখন অবশেষে ঘরে ফিরে আসে, তখন স্বর্গে হয় আনন্দ-উৎসব। কারণ, যে সন্তান হয়েছিল মৃত, সে যে আবার পেয়েছে জীবন।

পাপীকে এমনভাবে অভয়াশ্রয় দেওয়া মায়ের ছিল স্বভাবসিদ্ধ। এটি তাঁকে ভেবে-চিন্তে করতে হত না। অন্যথা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাঁর এই একান্ত নিজস্ব স্বভাবজ প্রবণতাটি অনেকটা বুঝিবা তাঁর অজ্ঞাতসারেই অনুশীলিত হতে থাকে, এই কারণে যে ঈশ্বরের মাতৃভাব প্রকাশের এর চেয়ে অধিকতর প্রয়োজনীয় ও উপযোগী ভূমি আর কোথাও ছিল না।

তিনি নিয়মিত ঠাকুর-সেবা এইভাবেই করতেন যাতে তাঁর মাধ্যমে ঠাকুরের সকল আশা-আদেশ-স্বপ্ন সার্থক হয়।

১৫০ ঐ, পৃঃ ৪২৯
১৫১ ঐ, পৃঃ ৩৯৯-৪০০
১৫২ ঐ, পৃঃ ৪৩০

এ জগতের জ্ঞাত অজ্ঞাত যে-কোন সন্তানের কল্যাণমানসে নিঃশেষে আত্মদানের যে সদাব্যগ্র ভাবটি শ্রীমায়ের দৈনন্দিন জীবনে প্রকাশ পেয়েছিল, তাতে ঈশমাতৃত্বের যে একটি উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে, এর চেয়ে প্রাণস্পর্শী ভগবৎ কারুণ্যের কথা মানুষ আর কি ভাবতে পারে? আর এ কথাটি শুনেও যার প্রাণে এ কারুণ্যের স্পর্শ লাগে, সে কি করে আর এ পাপাচরণ করতে পারে, সে কি করে পারে শ্রীমায়ের এই সামূহিক প্রেমের ঊর্ধ্বাকর্ষী শক্তিবেগকে রোধ করতে?

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: "হে অর্জুন, যিনি আমার এই দিব্যজন্ম ও অলৌকিক কর্ম যথার্থত জানেন, তিনি দেহত্যাগ করে পুনরায় সংসারপ্রাপ্ত হন না—জন্মমৃত্যু প্রহেলিকা থেকে চিরমুক্ত হয়ে আমার স্বরূপতাই প্রাপ্ত হন।"[১৫৩]

কোয়ালপাড়া মঠে জনৈক ভক্ত শ্রীমাকে পরামর্শ দিলেন: "ভক্তদের স্পর্শে যখন কষ্ট হয়, তখন স্পর্শ না করাই উচিত।" কথা শুনে মা বললেন: "না, বাবা, আমরা তো ঐ জন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপ-তাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে? পাপী-তাপীদের ভার আর কারা সহ্য করবে?"[১৫৪]

এটি হল শ্রীমায়ের ব্যক্তিগত ইচ্ছামাত্র জারি, বেদোক্ত আদি পুরুষের আত্মাহুতির অগ্নিস্পন্দনে ধ্বনিত। ঠাকুর মায়ের এই ভাবী-প্রকাশটিকেই বন্দনা করে বলেছিলেন: "আমি আর কি করেছি? তোমাকে আরও অনেক কিছু করতে হবে।"

আরও অনেক যা কিছু করবার ছিল, তা পলে-পলে তিলে-তিলে নিজেকে নিঃশেষে আহুতি না দিলে করার উপায় ছিল না। এই আত্মদানেও মা ছিলেন বেহিসেবী ঠাকুরের সহধর্মিণী।

একবার জয়রামবাটীতে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে শরীর অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় স্বামী সারদানন্দজীর ব্যবস্থানুযায়ী কিছুদিন দর্শনাদি বন্ধ আছে। এমন সময় বরিশাল থেকে এক দীক্ষার্থী এসে উপস্থিত হলেন। এ অবস্থাতে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য বাহিরে যে জোর বিতণ্ডা চলছিল, তা শুনতে পেয়ে অসুস্থা মা আলুথালুভাবে দরজার পাশে এসে সেবককে বললেন: "কেন তুমি আসা বন্ধ করছ?" সেবক বললেন: "শরৎ মহারাজ নিষেধ করেছেন।" মা বললেন: "শরৎ কী বলবে? আমাদের ঐ জন্যই আসা। আমি ওকে দীক্ষা দেব।"[১৫৫] ভক্তটির পরদিন দীক্ষা হয়ে গেল।

এমন ছিল আত্মাহুতি দানে মায়ের স্বধর্মনিষ্ঠা। যে শরৎকে এমন সমীহ-স্নেহ করতেন তাঁর ওজর-আপত্তিকেও একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন! সর্বদা তন্ময় হয়ে আছেন অগ্নিমুখী আত্মা। কে রুখবে এ দুর্বার আত্মদানের অভীপ্সা?

তবে কখন এমন কালকূট বিষ আসত, যা দেখে শ্রীমাও ক্ষণেকের জন্য আতঙ্কে যেন শিউরে উঠতেন।

একদিন সকাল বেলায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর পত্র নিয়ে তিনজন ভক্ত জয়রামবাটীতে এসে উপস্থিত হন। শ্রীমা পত্র শুনে ভক্তদিগকে ডাকলেন, কিন্তু পা গুটিয়ে বসলেন যদিও বাতের কষ্টের জন্য সে সময়ে তাঁর পা ছড়িয়ে বসার অভ্যাস ছিল। ভক্তগণের প্রণামের পর খেদোক্তি করে মা বললেন: "শেষে কিনা রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) আমার জন্যে এই পাঠালে? ছেলে বিদেশে গিয়ে কত ভাল জিনিস পাঠায়, আর রাখাল কিনা আমার জন্যে এই পাঠালে?" তিনি এদের দীক্ষা দিতে

১৫৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪।৯

১৫৪ শ্রীমা সারদা দেবী পৃঃ ৪৩২

১৫৫ ঐ, পৃঃ ৪৩২

অসম্মতি প্রকাশ করে বেলুড় মঠে যেতে বললেন। ভক্তগণ বাহিরে এসে বিষণ্ণ হৃদয়ে বসে রইলেন। তাঁরা যখন পুনরায় দ্বিতীয় বার এসে প্রণাম করলেন, তখনও দীক্ষাদানে অসম্মত হলেন ও ঠাকুরের উদ্দেশে স্বগতোক্তি করে বললেন: "ঠাকুর, কালও তোমার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, দিন যেন বৃথা না যায়। শেষে তুমিও কিনা এই আনলে?"[১৫৬]

একান্ত আনুগত্যের, একা ভক্তির, একাঙ্গী প্রেমের একি দুঃসহ প্রতিদান! শ্রীমায়ের আতঙ্ক-ত্রস্ত মন সাময়িক ভাবে উদ্বেলিত হয়ে তাঁর অন্ত-স্তলের স্বকীয় আত্মদানের বৃত্তিতে সুসমাহিত হল।

পরে অনেকক্ষণ চিন্তার পর দীক্ষাদানে সম্মত হয়ে বললেন: "যতক্ষণ শরীর থাকে, ঠাকুর, তোমার কাজ করে যাই।" দীক্ষা হয়ে গেল।[১৫৭]

পূর্ণতার কী এক অবর্ণনীয় উদাস-প্রশান্ত ! জীবন-মৃত্যু হয়েছে পায়ের ভৃত্য। নির্ধূম আয়ুতার্চিঃ হোমাগ্নির স্বর্ণ-জ্যোতিতে দিগন্ত হয়েছে উদ্ভাসিত। বয়ে চলেছে স্বচ্ছ-শান্ত প্রেম-গঙ্গা কালাতীতের মোহনার অভিমুখে।

এই আমাদের শ্রীমা।

ঠাকুর বলেছিলেন: "মহাবুদ্ধিমতী", "জ্ঞান দিতে এসেছে," "ও কি যে সে, ও আমার শক্তি।" বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি সবই গলে গিয়ে হয়েছে প্রেমামৃত ধারা।

আর এটি হল ঠাকুরেরই অতি নিজস্ব আর একটি প্রকাশ।

ঠাকুর বলতেন: "আমি কোন জায়গায় আবদ্ধ নই, কেবল দয়া; সব গেছে, কেবল এক দয়া আছে।...যদি সহস্র বার জন্মগ্রহণ করে একজনের উদ্ধার সাধন করতে পারি, তাহাও সার্থক বোধ করি"[১৫৮]

শ্রীমায়েরও একই ভাষা: "দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে। দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই। নতুবা আমার কি লাভ?"

সব ত্যাগ হয়ে গেছে। শুধু ত্যাগ করতে পারা যায়নি, দয়া।

উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, প্রেমানন্দজী, শিবানন্দজ ও সারদানন্দজী বেলুড় মঠের দোতলায় গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে এ বিবরণ আনুপূর্বিক শুনেছিলেন। শুনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুক্তকরে বললেন: "কৃপা, কৃপা! এই মহিমময় কৃপাধারাই মা আমাদের রক্ষা করছেন সর্বক্ষণ। কি বিষ তিনি নিজে গ্রহণ করলেন, তা আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। যদি এ বিষ আমরা গ্রহণ করতুম তো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতুম।"[১৫৯]

সন্তানগণের উপহৃত সকল বিষই যে শ্রীমা গ্রহণ করেছিলেন, তাই শুধু নয়, তাঁরা যাতে অপ্রস্তুত না হন, সেই জন্য সকৌতুকে বলেও গেলেন: "কেন গো, ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন?"

শ্রীমায়ের এই যে হলাহল পান তাঁর নিজের দৃষ্টিতে, তাঁর অনুপম দৃষ্টিতে এটিই হল শ্রীঠাকুরের এ ধরায় এসে শুধু মিঠাই খেয়ে না বেড়ানো! এমনি ছিলেন আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিলীনা শ্রীশ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা এমনি আমাদের মা-সারদা।

যাঁর কথা স্মরণ করে স্বামীজী পাগলের মতো

১৫৬ ঐ, পৃঃ ৪৩২ ১৫৭ ঐ, পৃঃ ৪৩২

১৫৮ গিরিশ ঘোষের স্মৃতিচারণ, দ্রষ্টব্য: রামকৃষ্ণ মিশনের ২৯ অগস্ট ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ঊনবিংশ অধিবেশনের অনুলিপি।

১৫৯ শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৪৩৩

বলতেন: "দাদা মায়ের কথা মনে পড়লে সময়ে সময়ে বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ও ঐ যে বলছি, ওইখানটায় আমার গোঁড়ামি।

"রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যা হয় বলো দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই, তাকে ধিক্কার দিও।"[১৬০]

শ্রীমায়ের চরণে প্রণত হয়ে স্বামীজী শেষের দিকে মাকে তাঁর প্রাণের নিগূঢ় কথাটি বলেছিলেন: "মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, আর দ্বিতীয় নেই!"[১৬১]

সাধে কি ঠাকুর বলেছেন: ও কি যে সে!

---

১৬০ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন কার্যালয়, সপ্তম খণ্ড, ১৩৮৪, পৃঃ ৭৭

১৬১ উদ্বোধন, বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৭০ পৌষ, পৃঃ ২০৩; স্বামী ঈশানানন্দ লিখিত, "শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান নিদারুণ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। আয়ের তুলনায় ব্যয় অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় সঞ্চিত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য এবং সরকারী কর্মচারীদের হারে এখানকার কর্মচারীদেরও দেয় বাড়তি বেতন ও ভাতার চাপে আর্থিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। এই সংকটের সমাধান না হলে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম বন্ধ করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৫৩৫টি শয্যায় বছরে প্রায় ২০ হাজার রোগীর চিকিৎসা হয়। তাঁদের প্রায় শতকরা ৫০ জন বিনা খরচে বা আংশিক খরচে ঔষধপত্রসহ চিকিৎসার সুযোগ পান। এছাড়া আউট্‌ডোরে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বছরে প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এঁদেরও একটি বড় অংশ বিনা খরচে ও আংশিক খরচে চিকিৎসার সুযোগ পান। তাছাড়া রয়েছে একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র যার মাধ্যমে গ্রামীণ ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের ১ লক্ষেরও বেশি রোগী প্রতি বছর সম্পূর্ণ বিনা খরচে ঔষধসহ চিকিৎসা পেয়ে থাকেন।

আমাদের আশা, অতীতের মতো বর্তমানেও সহৃদয় জনসাধারণ সেবাপ্রতিষ্ঠানকে ঋণমুক্ত করতে এগিয়ে আসবেন। যে-কোন দান সাদরে গৃহীত হবে। আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় এরূপ দান আয়কর মুক্ত। মনি-অর্ডার বা অ্যাকাউন্ট-পেয়ি চেক্ বা ড্রাফট্ 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান'—এই নামে সম্পাদকের কাছে নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

১ জুলাই, ১৯৮৩ — স্বামী গহনানন্দ

৯৯ শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ — সম্পাদক

বাইতুম হিমবাহের পথে

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[পূর্বানুবৃত্তি]

অবশেষে পরের দিন সকাল প্রায় ৯টায় যাত্রা শুরু—মৃষাপানি থেকে রোমাঞ্চসন্ধানী কেশর সিং-এর মুখও বেজার। পাথর ডিঙিয়ে আবার নদী পেরুলাম—সরস্বতী আবার রইল বাঁ দিকে। পেরিয়ে গেলাম বাজখোল বলে একটা জায়গায়। এ নামগুলোর নাম ছাড়া এখন কোন সার্থকতা নেই—পাণ্ডববর্জিত স্থান। অবশ্য একটা অস্থায়ী মিলিটারী তাঁবু চোখে পড়ল—তার ভিতর কয়েকজন সেনার সঙ্গে আলাপ হল। একজন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাদ্রাজী। সুব্রাহ্মনিয়মের সঙ্গে অনেকদিন পর নিজের ভাষায় কথা বলতে পেরে তাঁর কী আনন্দ! তিনি আমাদের গরম চা-পানে আপ্যায়িত করলেন

এদিকে আমার দৃষ্টি এখন ধ্রুবর দিকে। সে আমাদের দলের সব থেকে তরুণ, সতেজ, সবল সদস্য—তার উপর অনেক আশা ভরসা। কিন্তু হল কি ওর? সকাল থেকেই কেমন যেন অসুস্থ। কাল রাতে তো ছিল ভালই। জণ্ডিস সংক্রামক রোগ। তাকেও আক্রমণ করেনি তো? পরীক্ষা করলাম। সে রকম কোন লক্ষণ নেই। গত রাতে ঘুমও হয়েছে। খাওয়া দাওয়াও করেছে ঠিক মতো। তবুও কেন এমন বেহাল?

মৃষাপানি থেকে বাজখোল হয়ে ঘাসতলী কতই বা দূর—বড় জোর ৬ কিলোমিটার। ভূ-প্রকৃতি একই রকম—তবে ধীরে ধীরে উপরে উঠছি—প্রবেশ করছি হিমালয়ের হৃদয়ে—দূরে দু একটা তুষারধবল শৃঙ্গ দেখা যায় কখন সখনো।

ঘাসতলী পৌঁছে গেলাম। ঘাস অবশ্য তেমন চোখে পড়ল না। ১৩৫০০ ফুট (৪০৫০ মি) উপরে বিরাট একটা সমতল ভূমির দুধার ঘিরে আকাশচুম্বী বিশাল বিশাল পাহাড়ের দেওয়াল সরস্বতী নদীর দুধারে যেন তোরণ তৈরি করেছে বাইতুমের পথে।

ঘাসতলীর বিশাল অঙ্গনে দাঁড়িয়ে হিমালয়ের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য কিছুটা অনুভব করা যায়। ঘন নীল আকাশের চন্দ্রাতপা ভাস্বতী ভারতী সরস্বতী অনুসরণ করে যত উপরে দৃষ্টি যায়—আলোকিত অঞ্চল—দ্যুতিময় ভাস্বর হিমালয়ের এ পথটি। সরস্বতী নদীর সঙ্গে এ জায়গায় মিশেছে অরোয়া-নালা—এসেছে অরোয়াতাল হতে। সরস্বতী নদীর বাঁ দিকে সোজা লম্বভাবে তাকালে অরোয়ানালা অনুসরণ করলে দূরে দেখা যায় কালিন্দী খাল বা কালিন্দী গিরিপথ সহ কালিন্দীশৃঙ্গ। ঐ গিরিপথ কিন্তু গঙ্গোত্রী হিমবাহের শেষের দিকে। গঙ্গোত্রী-গোমুখ-নন্দনবন-বাসুকী-শ্বেতা-সুরালয় হিমবাহগুলি অতিক্রম করে কালিন্দী খাল পেরিয়ে নেমে এসে অরোয়ানালা ধরে ঘাসতলী দিয়ে যাওয়া যায় বদ্রীনারায়ণ—সারাপথটা বরফ বিছানো থাকলে এবং স্কী করতে জানলে সময় লাগবে খুবই কম। এ পথে অধুনা কোন অভিযাত্রা হয়েছে বলে জানা নেই। যতদূর মনে হয়, শ্রদ্ধেয় উমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ষাটের দশকের প্রথম দিকে শেষবার গঙ্গোত্রী থেকে এই পথ ধরে বদ্রীনারায়ণ এসেছিলেন। ১৯৭২ সালে গঙ্গোত্রী হয়ে সুরালয় হিমবাহের উপর উঠে এক সকালে যুগলমানা অভিযানের শেষ শিবির থেকে (১৯০০০ ফুট বা ৫৭০০ মিটার) হাতছোঁওয়া দূরে দাঁড়িয়ে কালিন্দী হিমবাহকে দেখেছিলাম। ফুটি-ফাটা চেহারা এখন তার—বরফের উপর দেখা যায় অজস্র অতল গহ্বর। মনে হয়েছিল মারাত্মক। খুব ভাল পথপ্রদর্শক ও সাজসরঞ্জাম ছাড়া এ পথ এখন বেশ দুর্গম।

ঘাসতলীতে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি শিবির। এখানকার অধিকর্তা মেজর সাহেব আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন—গ্রহণ করতেই হল তাঁর চা-পানের আমন্ত্রণ। খচ্চরওয়ালাদের কথা উঠল। মেজর শুনে চটে উঠলেন ওদের উপর। ওঁর বক্তব্য—বদ্রীনারায়ণ থেকে ইচ্ছে করলে একদিনেও চানত্নমকা পৌঁছে দিতে পারে ওরা—বিশেষতঃ পথ যখন রয়েছে। ডেকে পাঠালেন তিনি খচ্চরওয়ালাদের দলনেতা মোহন সিংকে। আমাদের কাছে তার তর্জন গর্জন আর বায়নাক্কার অবধি ছিল না। কিন্তু মেজরের সামনে কী তার বিনয় অবনত মোহন-ভঙ্গী! তবে, ভবী ভুলবার নয়। প্রচণ্ড ধমক দিতে শুরু করলেন মেজর—মোহন সিংকে। এমন কি শাস্তির ভয়ও দেখালেন। মোহন সিং একটা কথাও বলল না—মুখ নিচু করে রইল। একবার দেখলাম, সে রক্ষিতের দিকে চাইছে জলন্ত দৃষ্টিতে—যেন পারলে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু কোন জারিজুরি খাটল না। মেজর বললেন, বরফ—বাজে অজুহাত। ওকে কড়া নির্দেশ দিলেন—আজই যেন সমস্ত মালপত্র পৌঁছে দেওয়া হয় চানত্নমকায়। সবশেষে আমি তুললাম ধ্রুবর কথা। ও অসুস্থ।

—"আজ তাহলে উনি থেকে যান ঘাসতলীতে", বললেন মেজর, "কাল সকালে আমাদের লোক ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসবে চানত্নমকায়।"

ধ্রুব বলল, "চা খেয়ে, বিশ্রাম নিয়ে আমি ভাল আছি এখন। আমি ঠিকই যেতে পারব দলের সঙ্গে।"

ধ্রুব রাজী হল না একা থাকতে।

মেজরকে ধন্যবাদ ও বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে ঘাসতলী থেকে উপরে উঠতে শুরু করলাম। তখন দুপুর দুটো—আকাশ বেশ ফর্সা। মনে আমাদের খুশির আমেজ।

উঠছি ধীরে ধীরে। • চড়াই শুরু হয়েছে। অরোয়া ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল পেরিয়েছি একটি কাঠের সেতুর উপর দিয়ে। তাই সরস্বতী নদী এখন আমাদের বাঁ দিকে। সরস্বতী নদীর অপর পারে বাঁ দিকে অরোয়ানালার অদূরে ভীষণ খাড়া সোজা পাথরের দেওয়াল। যেন হাজার তলা বাড়ি তৈরির জন্যে উঠেছে, অথবা ঐ দুর্ভেদ্য ও অগম্য দেওয়ালের আড়ালে ঢেকে রেখেছে কোন অপরিচিত স্বর্গরাজ্য। আর—ডানদিকে ধনরাও ও চমরাও নামে দুটি হিমবাহ—পিছনে অজানা কয়েকটি উঁচু সাদা শিখর। ধনরাও ও চমরাও দু বোন—নন্দাদেবীর প্রহরী—এ দিকটায়। পিছনে তাকালে দেখা যায় মানা শৃঙ্গ।

এগিয়ে গেছে তামাম দলটা, এগিয়ে গেছে খচ্চরওয়ালারা। পিছনে ধ্রুবর সঙ্গে হাঁটছি প্রভাত, সুব্রাহ্মনিয়ম, শেরপা নিমা এবং আমি। ধ্রুবর ভারী পিঠুয়াটাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে খচ্চরের পিঠে—ও হাল্কা হবে আরেকটু এই ভেবে। ঘাসতলী থেকে চানত্নমকা পৌঁছুতে বড় জোর লাগবে ঘণ্টা তিন-চার।

বেশ চলল কিছুটা গল্প গুজব—দু-একটা গানের কলিও শুনলাম ওর মুখে। তারপর দেখছি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপাত কোন কারণ নেই তার। হয়তো উচ্চতাজনিত এ অসুস্থতা—হাই অলটিচিউড সিক্‌নেস। একেবারেই হাঁটতে পারছে না। মূর্তিমান হতাশা যেন। কত উৎসাহ দিচ্ছি চারজনে, কখন আশার কথা বলছি, কখন দুজনের কাঁধে হাত রেখে ও হাঁটছে—তবু—তবু তার ধীরগতি ধীরতর হচ্ছে। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। শামুকও বোধ হয় এর থেকে জোরে হাঁটে। বাঁচোয়া—আকাশের অবস্থা ভাল। এরকম অবস্থায় এর আগে পড়িনি—পড়ব বলে কল্পনাও করিনি। ভুলই হয়েছে ধ্রুবকে ঘাসতলীতে আজ রেখে না এসে। এরকম হবে

কেই বা ভেবেছিল। এখন ফেরাও মুশকিল। খুব সম্ভব ধনরাও হিমবাহ পার হচ্ছি। পায়ের তলায় এখন শক্ত বরফ। গতি আরও কমল।

কি করা? নিমাকে বলল সুব্রাহ্মনিয়ম, "তুমি এগিয়ে যাও, রক্ষিতদাকে খবর দাও—একটি খচ্চর যেন তাড়াতাড়ি পাঠায় ধ্রুবকে নিয়ে যেতে।"

নিমা দ্রুততালে লঘু পা ফেলে অচিরে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তার চলার ভঙ্গী দেখালাম ধ্রুবকে—যদি ঈর্ষা জাগে। কিন্তু কোথায় কী!

আরো ঘণ্টাখানেক কাটল। চলছি যত, তার থেকে বিশ্রাম নিচ্ছি বেশি। কখন ধ্রুবকে তাতাবার চেষ্টা করছি, দিচ্ছি কখন গালাগালও। যদি তার ভিতরের সুপ্তসিংহ জাগ্রত হয়ে ওঠে। কিন্তু তা বুঝি আজ আর হবার নয়! গ্লুকোজ খাইয়ে, কফি খাইয়েও কিছু সুরাহা হল না দেখছি।

টুং টাং টুং টাং শব্দ—খচ্চরের গলার ঘণ্টার আওয়াজ।

খচ্চর আসছে তাহলে! ধড়ে প্রাণ ফিরে এল যেন। ধ্রুবও কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল একটু—একটু বা চনমনে।

এক-একটি করে চৌদ্দটি খচ্চর আমাদের সামনে দিয়ে নিচে নেমে গেল। ওদের প্রভু মোহন সিং শেষ খচ্চরটি নিয়ে আসছে সবার শেষে। সে যা ব্যবস্থা করবার করবে।

শেষ খচ্চরটির দুপাশে হাঁটতে হাঁটতে আসছে শুধু মোহন সিং নয়—তার চাকর ভগবান সিংও। মোহন সিং বলল, "পথে নিমার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার", অদ্ভুত কঠিন হাসি তার মুখে, "কিন্তু আমি নিরুপায়"—অমায়িকতার গলার স্বর, "আমাকে নিচে নেমে যেতেই হবে আজ—একটা খচ্চরের দাম তিন হাজার টাকা—তাকে তো হারাতে পারি না"—মনে পড়ল আজ দুপুরেই মেজরের দরবারে রক্ষিতের দিকে চাওয়া তার জলন্ত দৃষ্টি! কেঁপে উঠলাম!

কি ইঙ্গিত করতে চাইছে শয়তানটা? সুব্রাহ্মনিয়ম এবং প্রভাত অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল তাকে, মোটা বকশিসের কথাও বলল, মোহন সিং-এর হাসি হাসি মুখের নির্গলিতার্থ কিন্তু ঐ একই—তোমাদের সঙ্গীর থেকে আমার খচ্চরের জীবনের দাম আমার কাছে অনেক বেশি।

সে প্রতিশোধ নিতে চায় মেজরের অপমানের।

এইভাবে? এই পরিবেশে? এই ভর সন্ধ্যায়? এই তুষারাবৃত হিম অঙ্গনে? জীবনের বিনিময়ে? পাহাড়ী হয়েও? তার সাহায্য করার সঙ্গত শক্তি থাকা সত্ত্বেও? পাহাড় পথের অলিখিত নিয়ম ভঙ্গ করেও?

মোহন সিং চলে যাচ্ছে।

—"তাহলে ভগবান সিংকে দাও অন্তত:, ও যতটুকু পারে সাহায্য করবে।"

—"না, তাও সম্ভব না। নিচে ওর কাজ আছে—আমার খচ্চরগুলো দেখবে কে ও ছাড়া? চলে আয় ভগবান"—চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মোহন সিং। ইঙ্গিতে ও ভগবানকে অনুসরণ করতে বলল ওর।

আমাদের তর্কবিতর্ক শুনছিল সবই ভগবান। শেষে দারুণ রেগে উঠেছি আমরা।

এই রাগ হতাশারই নামান্তর!

—"আমি এদের সঙ্গে থাকব। এদের চানদুমকা পৌঁছে দিয়ে তবে আমার কাজ শেষ হবে", মিনমিন করে বলল ভগবান।

"ভগবান!" গর্জে উঠল মোহন সিং। সেও তাহলে রেগেছে এবার—অর্থাৎ সেও হতাশাগ্রস্ত!

তড়পালো অনেক মোহন সিং। রোগা পটকা মিনমিনে ভগবানের এক গোঁ। রাগে গড় গড় করতে করতে নেমে গেল মোহন সিং, তার

খচ্চরটার দড়ি ধরে টানতে টানতে—আমরা দেখলাম, একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল সে—তার মাথা তখন অনেকখানি নিচু হয়ে ঝুলে পড়েছে।

পরক্ষণেই চোখ গেল ভগবানের দিকে। বদ্রীনারায়ণ মন্দিরের বাইরে ক্যাটকেটে রঙটা ভাল লাগেনি, ভাল লাগেনি তার আশপাশে মাইকে চটুল গানের সুর। মন্দিরের ভিতর লক্ষ কোটি তীর্থযাত্রীর মধ্যে কজন ভগবানকে দেখেছেন, জানি না, তবে সাক্ষাৎ ভগবান দেখলাম আজ ভগবান সিং-এর মধ্যে। অসীম কৃতজ্ঞতায় চোখে এল জল। তবু তিক্তস্বরে বলি,—"ভগবান, তোর চাকরীটা খোয়াবি আমাদের বাঁচাতে গিয়ে।"

—"আমাদের মতো গরীব তো চাকরী হামেশাই খোয়ায় সাহেব—হারাবার আমাদের কিছু আছে কি? খাটতে পারলে চাকরী জুটবে। তা ছাড়া পাহাড়ের কানুন মানেনি মোহন সিং—সে বেশি ঘাঁটাতে সাহস করবে না আমাকে—নানা উপায়ে টাকা রোজগার করে যত পয়সা-ওয়ালাই হোক না কেন সে।"

হাড় জিরজিরে ভগবান সিং পারবে কি করে তাগড়াই ধ্রুবকে নিয়ে যেতে? এদিকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের দিকে যাচ্ছে। তবে ঠিক আঁধার নামেনি। বরফ ঠিকরে সাদা কুহেলিকা ছড়ানো যেন চারিদিকে। বেশ ভয়ভয় করছে। সবাই মিলে এভাবে থাকার কোন মানে হয় না। সুব্রাহ্মনিয়ম ও প্রভাতকে এগিয়ে যেতে বললাম—নিমার খবর পেয়ে দলের লোক আসবে ঠিকই, পথে দেখা হলে যেন তাড়াতাড়ি আসতে বলে ওদের।

ওরাও এগিয়ে গেল। ধ্রুবকে একবার পিঠে নিল ভগবান। কিন্তু সাংঘাতিক চড়াই উৎরাই এ জায়গাটায়। শক্ত বরফ পায়ের তলায়। পথও সরু। পিছলে পড়লে সরস্বতীর জলে! পারল না! তবু কোন রকমে ভগবান ও আমার কাঁধে হাত রাখিয়ে ওকে হাঁটাতে চেষ্টা করছি। তাও বেশি দূর পারল না।

রাত বাড়ছে। এখনও কেন দেখা নেই কারুর? কত দূরে আর চানদুমকা? ভগবানকে শুধাই বলে ও—"বেশি দূরে আর নেই সাহেব সেকি ভরসা দেবার জন্যে? "তবে কেউ আসছে না কেন এখনও? খবর তো পৌঁছে যাবার কথা? নিমা তো অনেকক্ষণ গেছে! প্রভাত, সুব্রাহ্মনিয়ম পথ হারায়নি তো বরফের মধ্যে?"—"সে রকম সম্ভাবনা নেই। পথ সোজা। তবে সবাই পরিশ্রমে ক্লান্ত। দেরি সেই জন্যে হয়তো।" ভগবান বোঝাবার চেষ্টা করে।

বড় ধাঁধায় পড়লাম। ধ্রুব একদম চলৎশক্তি-হীন হয়ে পড়েছে। ওকে নিয়ে আর একপাও এগুনো যাবে না। দুজনে মিলে ওকে বইবার চেষ্টা বাতুলতা। ধ্রুব দেখছি কাঁপছে। মনে পড়ল, আমার পিঠুয়াতে ফেদারকোটটা আছে। তার দরকার বোধ করিনি—কারণ পরনে সকাল থেকেই আছে বাতাস-নিরোধক জামা ও ট্রাউজার। পিঠুয়া থেকে ফেদারকোট বের করে ওকে পরিয়ে দিলাম। আরাম পেল ও একটু। সরস্বতী নদীর ধারে একটা পাথরের আড়াল দেখলাম। বিভোক করার মতো নয়। বিভোক কথাটা শুনেইছি। পাহাড় পথে রাতবিরেতে এরকম অসুবিধার মধ্যে পড়লে পাথরের আড়ালে বা বরফ খুঁড়ে মাথা গোঁজার জায়গা করে নেওয়া। সেটা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। পাথরের আড়ালের আশ্রয়টাও তেমন সুবিধার নয়। নিচে খাদ—সরস্বতী বইছে। পায়ের তলায় বরফ। কোন রকমে দুজনের বসার জায়গা হল। তুষার গাঁইতি দুটো পুঁতলাম। বসে ধরে রইলাম শক্ত করে দুজনে। অভয় দিলাম ধ্রুবকে, "ভগবান পথ জানে, ও বলছে চানদুমকা কাছে,

ও ডেকে নিয়ে আসুক সঙ্গীসাথীদের।"

এছাড়া এখন অন্য উপায় নেই কিছু। ভগবানকেও পাঠালাম।

এক-একটা মুহূর্ত যেন এক-একটা যুগ এখন। মাঝে মাঝে দেখছি পরখ করে, ধ্রুব ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা, ওর হাত ঠিকমতো ধরে আছে কিনা তুষার গাঁইতিটা। ভগবান যে পথে গেছে, সে পথের দিকে ঘনঘন চাইছি—প্রত্যাশা করছি পদশব্দের। দুদিন ধরে সরস্বতীর গান চলাপথে যেন সঞ্জীবনী মন্ত্র জুগিয়েছে। আজ, এখন তার কলতান বড় ক্লান্ত, একঘেয়ে লাগছে। অপর পারে ধূসরাভ পর্বতমালা—হয়তো কাছেই বাইতুম! উপরে আকাশ ভরা তারার আলপনা। তারা সারারাত মুখ দেখবে সরস্বতীর সচল আয়নায়। টিকটিক করছে হাতঘড়িটা—শুনছি স্পষ্ট। কিন্তু দেখতে সাহস করছি না একবারও! বরফের রাজ্যে বন্দী—এই তো মানসিক ভারসাম্য হারাবার পক্ষে যথেষ্ট—তায় আবার সময়-ব্যাকুল হয়ে উঠি যদি!

কতক্ষণ বসে আছি? মাপতে চাইছি না, বুঝতে চাইছি না স্থানকাল। এ যেন ভেড়ার মতো চোখ বুঁজে থাকা—বাস্তবকে অস্বীকার করা। হয়তো বা স্বপ্নই দেখছি! সত্যি সত্যিই এমন ঘটনা ঘটে কি?

দূরে ও কি ও? কতকগুলো ঋজু আলো যেন ছোটাছুটি করছে। মরুভূমিতে লোকে মরীচিকা দেখে। তুষারপুরীতে এ কিসের মায়ালোক? ছায়াছায়া ও কারা? ও কাদের কথা শুনছি? সত্যিই দেখছি, সত্যিই শুনছি তো?

চোখে এসে লাগল টর্চের তীব্র আলো। কেটে গেল আচ্ছন্ন ভাব। ঠাণ্ডা চশমাটা পকেটে পুরে চোখ কচলে যখন উঠে দাঁড়ালাম, নজরে এল দুটি মুখ—কেশর সিং এবং ভগবান—পিছনে তাদের আরও কয়েকজন মালবাহক।

কেশর সিং পিঠে ওঠাতে চায় আমাকে। নীরবে ধ্রুবকে দেখিয়ে দিই। ওকে জাপটে ধরে পাথরের আড়াল থেকে বের করে আনি সবাই মিলে।

—"চানদুমকা আর বেশি দূর নয় সাহেব।"

—"জানি। তুষার সাগরে চানদুমকার পাথুরে ঘরটা এখন আমাদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়দ্বীপ।"

ঘড়ির দিকে নজর গেল। চমকে উঠি। রাত ৯৷৷টা। পরে দেখেছিলাম, এই সময় বাইরের তাপাঙ্ক এসব জায়গায় –১০ থেকে –২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীত কি বেশি করতে লাগল? মাথা কি বেশি ধরল? বমি বমি ভাব করছে কেন?

কেশর সিং-এর পাশে পাশে চলছি। দাঁতে দাঁত টিপে।

ভগবানের কাছে শুনলাম আমাদের সব সদস্যই অসুস্থ হয়ে পড়েছে উপরে গিয়ে। সুব্রাহ্মনিয়ম ও প্রভাত এইমাত্র পৌঁছেছে। নিমা আগেই পৌঁছেছিল—কিন্তু প্রথমে তার কথার গুরুত্ব দেয়নি কেউ, ভেবেছিল খচ্চরওয়ালারা আমাদের সাহায্য করবে, আর গুরুত্ব দিলেই বা কি হত? মালবাহকরা পৌঁছায়নি তখন পর্যন্ত কেউই। ভগবান যখন গেল চানদুমকায়, তখন মালবাহকরা একে একে পৌঁছুচ্ছে। কেশর সবে মাত্র পিঠ থেকে ভারী বোঝাটা নামিয়েছে। শুনল। শুনেই আর দু-চারজনকে নিয়ে ছুটে এসেছে। পিছে পিছে এসেছে মেট পূরণ সিং।

হাসছে কেশর সিং। খুশিতে চকচক করছে ওর চোখ দুটো। কালো গোঁফজোড়া সাদাটে আঁধার চিরে বেশ দেখা যাচ্ছে, দু-এক টুকরো তুষারকণাও লেগে আছে—তিরতির করছে ডগাদুটো আনন্দে।

ওর হাসি, ওর খুশিভাব, আনন্দ—সেকি রোমাঞ্চের সন্ধান পেয়েছে বলে? নাকি এই ডিপ ফ্রিজ থেকে জ্যান্ত আমাদের উদ্ধার করেছে বলে? সঠিক জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর পেতাম, তাও জানি না।

ভক্তমিলন-তীর্থ বাগবাজার

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাগবাজারের নন্দ বসু ও পশুপতি বসুর বাড়ী শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র চরণকমল-স্পর্শপূত বাড়ীগুলির মধ্যে অন্যতম। ৬৫ নম্বর বাগবাজার স্ট্রীটে ছিল বসুদের প্রাসাদোপম দোতলা বাড়ী। বসুরা তিন ভাই—জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্র, মেজ নন্দ ও ছোট পশুপতি। জ্যেষ্ঠ মহেন্দ্রের অল্প বয়সে দেহত্যাগ হয়। নন্দ বসু ও পশুপতি বসু শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ করেছিলেন।

নন্দ বসু ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ঊর্ধ্বতম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করার পর নিজ গৃহেতে অধ্যাপকের নিকট ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-আলোচনায় ব্রতী হন। সাধারণের উপযোগী করে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। কায়স্থ সমাজের উন্নয়নকল্পে তিনি 'কায়স্থ কুলরক্ষিণী সভা' প্রতিষ্ঠা ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে 'কায়স্থ-কারিকা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এছাড়া, বহুবিধ দান ও আর্ত-সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নন্দ বসু।[৬৪] পশুপতিও দাদার সহকর্মী ছিলেন সর্বদা। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বসুদের সুউচ্চ বিশাল অট্টালিকা গথিক (Gothic) শৈলীর স্তম্ভে শোভিত। ছত্রিশ বিঘা জমির উপর এই প্রাসাদ। সামনে ছিল পুষ্পশোভিত নয়নাভিরাম বাগিচা, ফোয়ারা আর টেনিস কোর্ট। বাড়ীটি স্বদেশী আন্দোলনের এক স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ। চন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ নেতারা এখানে এসেছিলেন। প্রথম স্বদেশী মেলা হয় বসুদের এই উদ্যানবাটীতে। এখানেই স্বরাজ্য পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রাসাদের দোতলার হলঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণ হয়েছিল। এই হলঘরেই অবস্থান করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর।[৬৫]

এই নন্দ বসুর বাড়ীতে অনেক দেবদেবীর ছবি রয়েছে—নারায়ণ প্রভৃতি ভক্তদের কাছ থেকে জানতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ইচ্ছা এই ছবিগুলি তিনি দেখবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন বলরাম মন্দিরে। তারিখ ২৮ জুলাই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। বলরামের বাড়ীতে শ্রীজগন্নাথের 'শুদ্ধ অন্ন' গ্রহণ করেছেন। ঠিক হল অপরাহ্নে নন্দ বসুর বাড়ীতে ছবি দেখতে যাবেন ভক্তগণ-সঙ্গে। পাল্কি করে যাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সঙ্গে বিনোদ, রাখাল, ছোট নরেন, পরেশ, মাস্টার প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে কালো বার্নিশ করা চটি জুতা, পরনে লাল ফিতাপাড় ধুতি, উত্তরীয় নেই। নন্দ বসুর গেটে পাল্কি প্রবেশ করল। ক্রমে বাটীর সম্মুখে প্রশস্ত ভূমি পার হয়ে পাল্কি বাটীতে এসে উপস্থিত হল। গৃহ-স্বামীর আত্মীয়গণ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। পাল্কি হতে অবতরণ করে উপরের হলঘরে উপস্থিত হলেন। অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হলঘর। দেবদেবীর ছবি ঘরের চতুর্দিকে। গৃহস্বামী নন্দ বসু ও তাঁর ভ্রাতা পশুপতি বসু শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করলেন। পশুপতি সঙ্গে সঙ্গে থেকে ছবিগুলি দেখাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। সঙ্গে ভক্তরাও। হলঘরেতে পরপর যে-সব ছবি

৬৪ চরিতাভিধান, পৃঃ ২৩৬ ৬৫ প্রবন্ধকারকে বসুবংশধরদের বর্তমান বাড়ীর মালিক শ্রীশিবেন বসু কর্তৃক লিখিত পত্র, তারিখ ২১।১২।১৯৮২

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, সেগুলি হল—(১) চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, (২) হনুমানের মাথায় হাত দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র আশীর্বাদ করছেন। হনুমানের দৃষ্টি শ্রীরামের পাদপদ্মে, (৩) বংশীবদন কদমতলায় দাঁড়িয়ে আছেন, (৪) বামনাবতার ছাতি মাথায় বলির যজ্ঞে যাচ্ছেন, (৫) নৃসিংহ-মূর্তি, (৬) গোষ্ঠের ছবি—শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সঙ্গে বৎসগণ চরাচ্ছেন। শ্রীবৃন্দাবন ও যমুনা-পুলিন, (৭) ধূমাবতী, (৮) ষোড়শী, (৯) ভুবনেশ্বরী, (১০) তারা, (১১) কালী। শেষের পাঁচটি মূর্তি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন. "এ-সব উগ্রমূর্তি! এ-সব মূর্তি বাড়ীতে রাখতে নাই। এ-মূর্তি বাড়ীতে রাখলে পূজা দিতে হয়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর আছে, আপনারা রেখেছেন।" (১২) শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা, (১৩) নিকুঞ্জবনে সখী-পরিবৃতা সিংহাসনে উপবিষ্টা রাই রাজা। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের দ্বারে কোটাল সেজে বসে আছেন, (১৪) দোলের ছবি, (১৫) গ্লাসকেসের ভিতর বীণাপাণির মূর্তি—দেবী বীণাহস্তে মাতোয়ারা হয়ে রাগ-রাগিণী আলাপ করছেন। এবং সর্বশেষে দেখেছিলেন: ঘরের দেওয়ালের উপর কেশব সেনের নববিধানের ছবি, যা 'সুরেন্দ্রের পট' নামে পরিচিত। ভক্ত সুরেশ মিত্র ঐ ছবি করিয়েছিলেন। ঐ ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, ভিন্ন পথ দিয়ে সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাচ্ছেন। গন্তব্য স্থান এক, শুধু পথ আলাদা।

উপরি-উক্ত ছবিগুলি দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ "কিয়ৎ-কাল ভাবে আবিষ্ট"। কখন বলছেন—"আহা! আহা!" আবার ভাবে বলছেন—"বা! বা!" সব ছবি দর্শনের পর নন্দ বসুকে বলছেন—"আজ খুব আনন্দ হল। বা! আপনি ত খুব হিন্দু! ইংরাজী ছবি না রেখে যে এই ছবি রেখেছেন—খুব আশ্চর্য!" বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে অনেক ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি'—শ্যামাসংগীত গাইলেন তিনি।

এবার বিদায়ের সময় উপস্থিত এ পর্যন্ত গৃহস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণকে মিষ্টিমুখ করাবার কোনও চেষ্টা করেননি। পাছে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়, সেজন্য পরম কারুণিক শ্রীরামকৃষ্ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গৃহস্বামীর কাছে কিছু আহার্য গ্রহণ করতে চাইলেন। তদনুযায়ী রেকাবিতে মিষ্টি এল। মিষ্টি খাবার পর হাত ধুতে চাইলে ভৃত্য পিকদানি এনে দিল। কিন্তু পিকদানি রজোগুণের চিহ্ন বলে ভৃঙ্গার থেকে জল নিলেন। তাঁদের আনীত পানও তিনি স্পর্শ করলেন না। মোসাহেব থেকে সাবধান করে দিলেন গৃহস্বামীকে। এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ গাত্রোত্থান করলেন। ভক্তরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন। পশুপতি সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করে দ্বারদেশে পৌঁছে দিলেন।[৬৬]

বর্তমানে নন্দ বসুর এই বিশাল অট্টালিকাটি এখন ভাগ হয়ে গেছে। অর্ধেক অংশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিগ্রহণ করে 'রামকৃষ্ণ ডে স্টুডেন্ট্‌স হোম' এবং একটি পাবলিক লাইব্রেরী করেছেন। বাকী অর্ধাংশের দুজন অংশীদার। একজনের অধীনে দোতলার হলঘরের অর্ধেক অংশ সমেত কয়েকটি ঘর আছে। অবশ্য হলঘরের বাকী অংশ সরকারাধীন। আর বাড়ীটির বাকি অর্ধেক ভাগে বাস করেন বসু পরিবারের বর্তমান মালিক শ্রীশিবেন বসু—৬৫।৪, বাগবাজার স্ট্রীট। শ্রীরামকৃষ্ণ হলঘরে যে-ছবিগুলি দেখেন, সেগুলি সব নষ্ট হয়ে গেছে। তবে শিবেনবাবু সেগুলিকে পুনরায় অঙ্কন করাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সুবিধা করে উঠতে পারেননি। শিবেনবাবুর বৈঠকখানা ও অন্যান্য ঘরে রক্ষিত অয়েল পেন্টিং

৬৬ কথামৃত, ৩।১৮।১-৩

ছবিগুলির মধ্যে একটিমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শিত ছবি বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায়। সেটি হল—হনুমানের মাথায় হাত দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র আশীর্বাদ করছেন। হলঘরের যে-সব দশমহাবিদ্যার ছবি ছিল, সেগুলি শিবেনবাবুর (নীচের) বৈঠকখানাতে কাচের দরজার দুপাশে এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাহায্যে অঙ্কিত করা আছে। তবে এ-বৈঠকখানাতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণ হয়নি। পাঠকদের অবগতির জন্য বলা হল। বর্তমানে এই অট্টালিকার দুপাশে নন্দ বসু লেন ও পশুপতি বসু লেন আজও স্মারক চিহ্ন বহন করে চলেছে।[৬৭]

নন্দ বসুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে বাগবাজার স্ট্রীট ধরে শ্যামবাজারের দিকে হাঁটতে থাকলে কয়েক মিনিট পরেই নবীন সরকার লেন—বাগবাজার স্ট্রীট থেকেই লেনটি বের হয়েছে। ঐ নবীন সরকার লেনের ৬এ-র বাড়ীতে শুভ পদার্পণ হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুলাইতে। এসেছিলেন নন্দ বসুর বাড়ী থেকে পাল্কী করেই। ঐ বাড়ীতে থাকেন কথামৃতে উল্লিখিত শোকাতুরা ব্রাহ্মণী—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাঙ্গনে গোলাপ-মা। ঐ দিনই শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছিলেন অপর এক ভক্ত মহিলার বাড়ীতে—গণুর মা অর্থাৎ আমাদের সুপরিচিতা যোগীন-মার বাড়ীতে।

গোলাপ-মা শ্রীমা সারদা দেবীর সঙ্গিনী-সহচরী-সেবিকা। গোলাপ-মা অর্থাৎ গোলাপ-সুন্দরী দেবীর স্বামীর অকাল প্রয়াণ হয়। একমাত্র পুত্রও শৈশবে অকালে দেহত্যাগ করে। এই দুই মৃত্যুতে ব্রাহ্মণী শোকে-দুঃখে দিশেহারা। তার উপর একমাত্র বিবাহিতা কন্যা চণ্ডীর স্বর্গারোহণ ব্রাহ্মণীকে আরও শোকে পাগল করে তুলল। তাই তিনি কথামৃতে 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী' নামে পরিচিতা। প্রতিবেশিনী যোগীন-মার সঙ্গে আলাপ ছিল গোলাপ-মার। শোক অপনোদনের জন্য যোগীন-মা-ই শোকাতুরা ব্রাহ্মণীকে পৌঁছে দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে 'ভঞ্জন-দুঃখগঞ্জন' শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে। চিরতরে দূর হল শোক-তাপ শ্রীরামকৃষ্ণের সুশীতল করস্পর্শে। সেই থেকে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের একজন। তারপর থেকেই শ্রীমায়ের সখী।

এই শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণীরা দুই ভগ্নী—দুজনেই বিধবা। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন-মানসে পুরাতন ইষ্টকনির্মিত ব্রাহ্মণীর বাড়ীর ছাদের উপরে কাতার দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের আসতে দেরী হচ্ছে বলে ব্রাহ্মণী নন্দ বসুর বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। আর এদিকে ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণীর বাড়ী উপস্থিত। বাড়ীর ছাদে সদালাপরত উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণী এসেই তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করে অসীম আনন্দে অধীর হয়ে বলছেন—"ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না, গো! —তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল,—সেপাই-সান্ত্রী সঙ্গে ক'রে, আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল—তখন যে এত আহ্লাদ হয়নি গো!—ওগো চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই। মনে করেছিলাম, তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন করলুম, সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব;—আর ওঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে আলাপ করবো না, যেখানে আসবেন একবার যাব, অন্তর থেকে দেখব, দেখে চলে আসব।

"যাই—সকলকে বলি, আয়রে আমার সুখ দেখে যা!—যাই,—যোগীনকে বলিগে, আমার ভাগ্যি দেখে যা!"

৬৭ শিবেনবাবুর সঙ্গে প্রবন্ধকারের সাক্ষাৎকার—তারিখ ৭।৭।১৯৮২ এবং ৮।১১।১৯৮২

ব্রাহ্মণী আবার আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছেন,—"ওগো খেলাতে (লটারী-তে) একটা টাকা দিয়ে মুটে একলাখ টাকা পেয়েছিল, —সে যেই শুনলে এক লাখ টাকা পেয়েছি, অমনি আহ্লাদে মরে গিছল—সত্য সত্য মরে গিছল!—ওগো আমার যে তাই হল গো! তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, না হ'লে আমি সত্য সত্য মরে যাব।"[৬৮] 'শান্তি-সৌখ্যসদ্ম-জীব-জন্মভীতি-নাশনং' শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং আজ ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে উপস্থিত। তাঁর জীবনের ইহকালের পরকালের জীবন-দেবতা, তাঁর ইষ্টদেব—শ্রীরামকৃষ্ণদেব আজ শুভ পদার্পণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা কইছেন—তাই ব্রাহ্মণীর এই অধীর আনন্দে আত্মহারার দৃশ্যটি কথামৃতকার শ্রীমকে এমনভাবে বিমুগ্ধ করল যে ব্রাহ্মণীকে প্রণাম না করে তিনি থাকতে পারলেন না। "ব্রাহ্মণী আনন্দে বিভোর! ঠাকুর ও ভক্তদের দেখিতেছেন। তাঁদের ছেড়ে যেতে আর পারেন না।" শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের জলযোগের জন্য ব্রাহ্মণীর ভগ্নী ব্যস্ত—পারছেন না একলা। ডাকাডাকি করছেন ব্রাহ্মণীকে। কিন্তু তিনি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

অবশেষে এরূপ কথাবার্তার পর ব্রাহ্মণী অতিশয় ভক্তিসহকারে শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে মিষ্টান্নাদি নিবেদন করলেন। ভক্তরাও ছাদে বসে সকলে মিষ্টমুখ করলেন। আহারাদির পর ভক্তগণসহ শ্রীরামকৃষ্ণ এবার বিদায় নেবেন। ব্রাহ্মণীর বৌ-ঠাকুরাণী ও ভাই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন।

রাত্রি আটটার পর শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণীর বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে উপস্থিত হলেন গণুর মা অর্থাৎ যোগীন-মার বাড়ীর বৈঠকখানায়। বাড়ীটি বাগবাজার স্ট্রীটের উপরেই—একতলা। বাড়ীতে বাদ্যযন্ত্র বাজাবার আখড়া আছে। সেদিনও শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তোষবিধানের জন্য বাজানোর আসর বসেছিল।

যোগীন-মার পুরো নাম যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস। বাড়ীর ঠিকানা ছিল ৫৯।১, বাগবাজার স্ট্রীট। বর্তমানে বাড়ীটি তিনটি ভাগে বিভক্ত—এ, বি, সি। যোগীন্দ্রের বাবা ডাঃ প্রসন্নকুমার মিত্র ছিলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজের ফাউণ্ডেশান কমিটির মেম্বার। বাড়ীটির প্রাঙ্গণ ও বাগান বৃহৎ ছিল—এক্ষণে নিশ্চিহ্ন। তবে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটি এখনও দণ্ডায়মান। যোগীন বাবার আদুরে কন্যা। বিবাহ হয়েছিল খড়দহের বিখ্যাত বিশ্বাস-বংশের অম্বিকাচরণের সঙ্গে।[৬৯] অম্বিকাচরণ ভ্রষ্টচরিত্র ও পানাসক্ত হয়ে ক্রমে খুব হীনদশায় পড়েন। সতী-সাধ্বী যোগীন অনেক চেষ্টা করলেন স্বামীর মতিগতি ফিরাতে। বিফলমনোরথ হয়ে পিতার বাড়ীতে চলে এলেন। তাঁর একমাত্র কন্যার নাম গণু। তাই কথামৃতে তিনি গণুর মা নামে পরিচিতা। তার আগে একমাত্র ছ' মাস বয়সের পুত্রকে হারিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে পিতা ডাঃ প্রসন্ন মিত্রও পরলোকে যাত্রা করেছেন।

ভক্ত বলরামের সঙ্গে বিশ্বাস-বংশের দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা ছিল। বলরাম হলেন যোগীন-মার মামা-শ্বশুর। বলরামের মাধ্যমেই যোগীন-মা শ্রীরামকৃষ্ণের সংবাদ পেয়েছিলেন। যদিও তাঁর মাতামহী শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ হয়নি। খুব সম্ভব ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বলরাম বসুর বাড়ীতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেন।

৬৮ কথামৃত, ৩।১৯।১

৬৯ বর্তমান যোগীনমার বংশধর ডাঃ বীরেন মিত্রের সঙ্গে প্রবন্ধকারের সাক্ষাৎকার তারিখ ৭।৭।১৯৮২ এবং ৮।১১।১৯৮২

প্রথম পরিচয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও, স্ত্রী-ভক্তদের সঙ্গে বারংবার শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যসঙ্গ লাভ করে তাঁর প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন। ক্রমশঃ শ্রীশ্রীমার স্নেহদৃষ্টিতে অভিষিক্তা হলেন। তখন থেকেই গোলাপ-মার মতো যোগীন-মাও শ্রীমায়ের নিত্য সেবিকা-সখী।[৭০]

এই যোগীন-মার বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন। বাড়ীর বৈঠকখানায় সভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ উপবিষ্ট। তাঁকে দর্শন করবার জন্য বৃদ্ধ-ছোকরা বৈঠকখানার দরজা-জানালার কাছে ভিড় করছেন। ছেলেরা গান গাইছেন শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে। "কেশব কুরু করুণাদীনে কুঞ্জকাননচারী" গানের পর "এস মা জীবন উমা" গানটি ছেলেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে শোনাল। গানের পর শুধু মাত্র "কনসার্ট" ছেলেরা বাজাচ্ছিল। গান-বাজনার প্রশংসা করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—"আহা কি গান!—কেমন বেহালা!—কেমন বাজনা!"

এবার জলখাবারের আয়োজন। উপস্থিত শোকাতুরা ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুরোধ করছেন অন্তঃপুরে গিয়ে আহারাদি গ্রহণ করার জন্য। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণী ও বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে অন্তঃপুরে গেলেন।

রাত্রি পৌনে এগারটার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ রাত্রিবাসের জন্য বলরাম মন্দিরে ফিরে গেলেন ভক্তদের আনন্দ দিয়ে।[৭১]

শ্রীরামকৃষ্ণ যে বৈঠকখানা ঘরটিতে ভক্তগণ সঙ্গে বসে ছেলেদের গান-বাজনা শুনেছিলেন, সেটি এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। বর্তমানে বাড়ীর মালিক যোগীন-মার বংশধর ডাঃ বীরেন মিত্রের ৫১।১ নম্বর বাগবাজার স্ট্রীটের উপরে একটি ডাক্তারখানা আছে। তিনি অতি যত্ন সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণ-পবিত্র-চরণ-পূত ঐ বৈঠকখানা বাড়ীটি রক্ষা করে যাচ্ছেন এবং যোগীন-মার দিব্য জীবন-স্মৃতি নিয়ে আজও দিন কাটাচ্ছেন।

যোগীন-মার দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করাটাকে তাঁর ভাই হীরালালের ভাল লাগত না। যখন যোগীন-মার বাড়ীতে তিনি এসেছিলেন, তখন তাঁকে ভয় দেখাবার জন্য হীরালাল বাগবাজারের গোঁসাইপাড়ার বিখ্যাত মল্লবীর ও ব্যায়ামপটু মন্মথকে এনেছিলেন। কিন্তু কোথায় মন্মথ তাঁকে ভয় দেখাবেন—শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে ও তাঁর মুখামৃত-পানে মন্মথ অন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন। দণ্ডবৎ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন—"প্রভু, আমি বড় অপরাধী, আমায় ক্ষমা করুন।" তিনি মন্মথকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে বললেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে মন্মথের পরিচয় ছিল। মন্মথ অখণ্ডানন্দজীকে অনুরোধ করলেন দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যেতে। তাঁর কথামত অখণ্ডানন্দজী ও মন্মথ ঘোড়ার গাড়ী করে এক মালসা নবীন ময়রার রসগোল্লা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। পূর্বে মন্মথ শখের থিয়েটারে ডাকাত সাজতেন। যখন সেজেগুজে স্টেজের উপরে হুঙ্কার দিতেন, দর্শকরা রীতিমত চমকে যেত। তদানীন্তন কালের ধনী কীর্তি মিত্রের একমাত্র পুত্রের নায়েব ছিলেন। আচার-বিচারের ধার ধারতেন না, খাদ্যাখাদ্য-বিচার মানতেন না, পৈতে-টৈতে সব বিসর্জন দিয়েছিলেন। কিন্তু এই গুণ্ডা মন্মথ শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ কৃপায় অতুলনীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় পৈতে ধারণ করলেন। তাঁকে কৃপাও করেছিলেন। এই কৃপার কথা প্রকাশ্যে কাউকে বলতেন না। থাকতেন খুব প্রচ্ছন্নভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত পেলে সঙ্গ করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্পর্শে পরিবর্তিত মন্মথ সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দজী

৭০ ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ পৃঃ ৪৫১-৫৩

৭১ কথামৃত, ৩।১৯।২

একবার অখণ্ডানন্দজীকে বলেছিলেন—"সেই মন্মথ —বাগবাজারের রাস্তায় সিদ্ধেশ্বরীতলার নিকটেই তার মামার বাড়ীতে থাকত। আমরা ঐ পথে গেলে তার মুখে 'মা, মা' শুনে থমকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তা শুনতাম। তুমি তাকে যা দেখেছিলে, সে আর এখন তা নেই। তার সে শরীরও নেই। একমাথা চুল—তাও উকুনে ভরা। উকুনগুলো মাথা থেকে পড়ে গেলে আবার সেগুলিকে তুলে মাথায় রাখে। তুমি গিয়ে তাকে এখন দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যাবে।" মন্মথের মুখে সর্বদা 'প্রিয়নাথ, প্রিয়নাথ' বলতে শোনা যেত। স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য শিষ্যেরা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। অখণ্ডানন্দজী মন্মথের শেষ বয়সের অবস্থা বর্ণনা করেছেন—"সে একদৃষ্টে সূর্যের দিকে তাকিয়ে উন্মনা হয়ে বসে আছে। পরনে কোঁচা-কাছা-দেওয়া গেরুয়া কাপড়, গলায় ধবধবে সাদা যজ্ঞসূত্র, শরীর তপঃক্লিষ্ট, বাহিরের কোন দিকেই তার ভ্রূক্ষেপ নাই।" শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক প্রভাবে বাগবাজারের গুণ্ডা মন্মথের সাধু মন্মথে পরিণত হওয়া অতি বিস্ময়কর ব্যাপার।[৭২] সত্যিই তিনি 'কৃপাসুধাব্ধির্ভুবি রামকৃষ্ণঃ'।

শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র চরণ-রজ পড়েছিল বাগবাজারের চুনীলাল বসু মহাশয়ের বাড়ীতে। এ ছাড়া মহাত্মা শিশির ঘোষের বাড়ীতেও শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণ হয়েছিল কিনা তার কোন নির্ভরযোগ্য সমর্থন পাওয়া যায় না। বলরাম মন্দিরে গিরিশ ঘোষের সঙ্গে শিশিরকুমার শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। সেখানে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন আমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসাবে। সেদিন যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন গিরিশের মনে রেখাপাত করেনি, তেমনি শিশির ঘোষের মানসলোকেও কোন ঔৎসুক্য জন্মায়নি। বরং শিশির ঘোষ "চল, আর কি দেখবে?" বলে গিরিশকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে বলরাম মন্দির থেকে চলে এসেছিলেন।[৭৩]

ইদানীং কেউ কেউ দাবী করছেন যে, বাগবাজারে শিশিরকুমার ঘোষের 'পত্রিকা ভবনে' শ্রীরামকৃষ্ণ বেশ কয়েকবার এসেছিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত শিশিরকুমারের মুখে মহাপ্রভুর চরিত-কথা শুনে ভাবস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এর সত্যতা এখনও যথেষ্ট প্রমাণসাপেক্ষ।[৭৪]

চুনীলাল বসুর বাড়ী ছিল বলরাম মন্দিরের পাশে—পশ্চিম দিকে। বাড়ীটির নম্বর ৫৮-বি, রামকান্ত বসু স্ট্রীট। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন লাভ করেন। তারপর থেকে তিনি তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করেছেন বহু জায়গায় বহু ভাবে। বাল্যকাল থেকেই তিনি । শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন—"এটাতে বিশ্বাস রেখো। তোমার হবে।" চুনীলাল শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ কথাটিকে জীবনের সম্বল করে রেখেছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা ছিল। স্বামীজী তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'নারায়ণ' বলে। শ্রীরামকৃষ্ণ চুনীলালের বাড়ীতে পদধূলি দিয়ে তাঁকে কৃতকৃতার্থ করেছিলেন।[৭৫] তাঁর দারিদ্র্যবশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করতে পারতেন না বলে বিষণ্ণ থাকতেন। তাই তাঁর মনে শান্তি

৭২ স্মৃতি-কথা, পৃঃ ৪০-৪৪   ৭৩ ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৫৮

৭৪ শিশিরকুমারের ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন-সংবাদ প্রবন্ধকারকে জানিয়েছেন বাগবাজার "পত্রিকা ভবনের" স্বামী চিন্ময়ানন্দজী (গৌর মহারাজ) পত্রের মাধ্যমে। প্রবন্ধকারকে লিখিত পত্রের তারিখ ১০।১২।১৯৮২। স্বামী চিন্ময়ানন্দজী এই সংবাদ সংগ্রহ করেছেন "পত্রিকা ভবন"স্থ ঘোষ পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে। এ ছাড়া, শ্রীরামকৃষ্ণের বাগবাজারের "পত্রিকা ভবনে" পদার্পণ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন শ্রীনির্মল রায় তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে' (১৯৮১)তে, পৃঃ ৪০।

৭৫ লীলামৃত, পৃঃ ৩৩৪

দেবার জন্য তিনি একটি কাচের গ্লাস আনতে বলেছিলেন। চুনীলালকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—"তোমার সে গেলাসের কিসমত বড় মানুষের লাখ টাকার চেয়ে বেশী।"[৭৫]

এ ছাড়া মহেন্দ্র ও প্রিয় মুখার্জি, হরিবাবু, বৈকুণ্ঠ সান্ন্যাল এবং ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ—এই চার ভক্তের বাড়ী ছিল বাগবাজার অঞ্চলে। এই চারজনেই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও কৃপালাভে ধন্য হয়েছিলেন।

মহেন্দ্র ও প্রিয় মুখার্জির বাড়ী বাগবাজারে ৺মদনমোহনজীর মন্দিরের কিছু উত্তরে রাজবল্লভপাড়ায়। তাঁর দ্বিতীয় ভাই প্রিয়নাথও ভক্ত ছিলেন। প্রিয়নাথ ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করতেন। সংসারে অভাব নেই বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে উভয় ভ্রাতা ময়দা, সুরকি ও তেলের কলের ব্যবসা করতেন। উভয়েই থিওসফিস্ট ছিলেন। তবে মহেন্দ্র কিছু গোঁড়া রকমের। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মহেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করেছেন ও তাঁর দর্শন ও কৃপা লাভ করেছেন। মহেন্দ্র পূর্বে কেশব সেনের ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের পর সেখানে তিনি আর যান না। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে জগন্মাতার কথোপকথন, তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী ও ঈশ্বর-ব্যাকুলতা মহেন্দ্রকে মুগ্ধ করেছিল। মহেন্দ্র ও প্রিয় যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যেতেন, তখন নবীন ময়রার এক মালসা রসগোল্লা নিয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে মুখার্জি-দ্বয়ের পিতা জানেন না, সেজন্য মহেন্দ্র তাঁকে বাগবাজারের বাড়ীতে নিয়ে যাননি। তবে হাতীবাগানে ময়দাকলের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছিল। স্বামীজীর খুব সঙ্গ করতেন মহেন্দ্র। তাঁর সঙ্গগুণে মহেন্দ্র মঠের একজন বিশিষ্ট ভক্ত হয়ে ওঠেন। মঠের সব আটা ও কাপড় যোগাতেন মহেন্দ্র।[৭৬] মৃত্যুশয্যায় শায়িত প্রিয় মুখার্জি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে দর্শন করতে চাইলে তিনি তাঁর সে প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন। তারপরেই প্রিয় মুখার্জির দেহত্যাগ হয় ৪ ডিসেম্বর, ১৯০২।[৭৭]

মহেন্দ্রের প্রতিবেশী ও আত্মীয় হরিবাবু তখন যুবক। কখন একাকী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনে যেতেন, কখন বা মহেন্দ্রের সঙ্গে। কার্য উপলক্ষে মহেন্দ্রের বাড়ীতেও থাকতেন। হরিবাবুর অকপট ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দিত হতেন এবং ভক্তগণের নিকট প্রশংসা করতেন। হরিবাবু তাঁর কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন।[৭৮]

সান্ন্যাল মহাশয়ের বাড়ী ছিল নদীয়া জেলার বেলপুকুর গ্রামে। কিন্তু তিনি কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে বাস করতেন।[৭৯] বাগবাজারে তাঁর বাসস্থান ছিল ২০ নম্বর বোসপাড়া লেন। বর্তমানে বৈকুণ্ঠের বাড়ীটি ভেঙে ঐ জায়গাতে আবার বাড়ী তৈরী করা হয়েছে। বাড়ীটির গায়ে একটি শ্বেতপাথরে লেখা আছে 'বৈকুণ্ঠ ধাম'। বৈকুণ্ঠের পরিচয় পুঁথিকার সুন্দর ভাবে দিয়েছেন—

"জটিল যুবক এক সাণ্ডেল বামুন।
ভিতরেতে ভরা অনুরাগের আগুন॥
ক্ষিপ্তপ্রায় দ্রুত যেন বারুদের বাজি।
প্রভুরে করুণা মাগে প্রভু নন রাজি॥
অন্তরে অকুতোভয় দস্যুর আচার।
মানস ভাণ্ডার লুটে ভাঙ্গিয়া দুয়ার॥
প্রকৃতি দেখিয়া বড় আনন্দ প্রভুর।
অচিরে করিলা কৃপা দয়াল ঠাকুর॥"[৮০]

৭৬ শ্রীরামকৃষ্ণ—সুবোধ দে, পৃঃ ২৮২, স্মৃতি-কথা, পৃঃ ২৬; কথামৃত, ২।১৪।৪ এবং ৫।৯।২
৭৭ ব্রহ্মানন্দচরিত—স্বামী প্রভানন্দ, ১৯৮২, পৃঃ ২০৬
৭৮ শ্রীরামকৃষ্ণ—সুবোধ দে, পৃঃ ২৮২ ৭৯ ঐ, পৃঃ ২৮০ ৮০ পুঁথি, পৃঃ ৩৯২

নরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ উৎকণ্ঠিত মনের সাক্ষী ছিলেন বৈকুণ্ঠ। সেদিনের 'নরেন্দ্রময়' শ্রীরামকৃষ্ণের মনের পরিচয় লীলা-প্রসঙ্গকার বৈকুণ্ঠের কাছ থেকে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৮১] আবার যেদিন 'নরেন্দ্র কালী মেনেছে', সেই ঘটনার পরের দিন বৈকুণ্ঠ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শুনেছিলেন কিরূপে 'নরেন্দ্র মাকে মেনেছে' এবং '(আমার) মা ত্বং হি তারা' গানটি সারা রাত গেয়েছিলেন।[৮২] শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ অসুখের সময় বৈকুণ্ঠ তাঁর সেবা করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দজীর সঙ্গে বিশেষ সখ্য ছিল। উত্তরকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক 'স্বামী কৃপানন্দ' নামধারণ করেন। স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ গুরুভাইদের সঙ্গে উত্তরাখণ্ডে ও বরাহনগরে তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু পরে, তিনি গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করেন। উদ্বোধন কার্যালয়ে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত যতদিন সারদানন্দজী উদ্বোধনে ছিলেন। এই সূত্রে তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে 'সান্ন্যাল মহাশয়' নামে পরিচিত ছিলেন।[৮৩] ১৩৪৩ সালের ২৭ চৈত্র, শনিবার বিকাল ৪-৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন।[৮৪]

ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে বাস করতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও কৃপালাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন নীরব ভক্ত, প্রাণভরে প্রভুকে দেখতেন ও তাঁর কথা শুনতেন।[৮৫] শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর যে-সকল গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্ত তাঁর শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করেছিলেন, ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলবার সুযোগ লাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণকে আপনার করে নিয়েছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বলরাম মন্দিরে যখন স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এই ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ ছিলেন অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী।[৮৬] ডাঃ ঘোষের বর্তমান বাড়ীর নম্বর ৫২এ, বোসপাড়া লেন।

বাগবাজারের রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন তবে কলিকাতাতে বা দক্ষিণেশ্বরে নয়—কাশীধামের নিকটবর্তী কোন স্টেশনে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন বৈদ্যনাথ, বারাণসী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থদর্শনে জগদম্বার দেওয়ান মথুরবাবুর সঙ্গে রেলযোগে। বৈদ্যনাথদর্শন করে কাশীধামে যাবার পথে কাশীর নিকটবর্তী কোন স্টেশনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাগ্নে হৃদয়রাম কোন কাজের জন্য অবতরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা উঠতে না উঠতেই রেলগাড়ী ছেড়ে দিল। মথুরবাবু কাশী থেকে তার করে পাঠান যাতে তাঁদের পরবর্তী গাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। রেল কোম্পানীর বিশিষ্ট কর্মচারী রাজেন্দ্রলাল কোন কাজের তদারকির জন্য একটি স্পেশাল গাড়ীতে অল্পক্ষণ পরে ঐখানে উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়রামের বিপন্ন অবস্থা দেখে তিনি নিজের গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে কাশীতে পৌঁছিয়ে দেন। এভাবে রাজেন্দ্রবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছিলেন।[৮৭]

৮১ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব (ঠাকুরের অহেতুক ভালবাসা ও নরেন্দ্রনাথ), পৃঃ ১২৩
৮২ ঐ, দিব্যভাব (সংসার ও ঠাকুরের নিকটে নরেন্দ্রনাথের শিক্ষা), পৃঃ ২৪৬-৪৭
৮৩ উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩, পৃঃ ৩০৫ ৮৪ লীলামৃত, পৃঃ ৩৪৫
৮৫ শ্রীরামকৃষ্ণদেব—লেখক স্বয়ং ডাঃ শশীভূষণ ঘোষ, স্বামী সারদানন্দ লিখিত 'পরিচয়' দ্রষ্টব্য।
৮৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড (১৩৮০), পৃঃ ৫৭
৮৭ লীলাপ্রসঙ্গ, ১মভাগ, সাধকভাব (তীর্থদর্শন ও হৃদয়রামের কথা), পৃঃ ৩২৭-২৮

বাগবাজারের শুধুমাত্র ভক্তমণ্ডলীর বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পণ হয়নি, মন্দিরেও তিনি গেছেন। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী ও মদনমোহন মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছিলেন।[৮৮] এই দুটি মন্দিরের বিস্তৃত বিবরণ না পাওয়াতে, বিশেষ কিছু লেখা সম্ভব হয়নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণতঃ বাগবাজারে আসতেন ঘোড়ার গাড়ী করে। লীলাপ্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানতে পারা যাচ্ছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে অবস্থান করে কখন কখন দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেছেন নৌকাযোগে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বলরাম মন্দিরে নবযাত্রা ও পুনর্যাত্রার সময় বলরাম মন্দির থেকে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গিয়েছিলেন নৌকা করে। তবে বাগবাজারের কোন্ ঘাট থেকে তাঁর পুণ্যচরণস্পৃষ্ট নৌকাখানি যাত্রা করেছিল, সে-বিষয়ে লীলাপ্রসঙ্গে কোন উল্লেখ নেই।[৮৯]

শ্রীরামকৃষ্ণকে জগন্মাতা ভবতারিণী বলেছিলেন—"'তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না; অনেক শুদ্ধ কামনাশূন্য ভক্ত আছে, তারা আসবে।' ঠাকুরবাড়ীতে আরতির সময় যখন কাঁসর ঘণ্টা বাজিত, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠিতে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, 'ওরে ভক্তেরা, তোরা কে কোথায় আছিস, শীঘ্র আয়।'"[৯০]

তাঁর এই আকুল আহ্বান কলিকাতার আনাচে-কানাচে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। তাঁর সে আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। তাঁর সেই উদ্বেলিত মর্মস্পর্শী আহ্বানে দলে দলে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁর অগণিত গৃহী ও যুবা ভক্তের দল। তাঁরা তাঁদের হৃদয়বর্তিকা প্রজ্বলিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিকতার হোমশিখা থেকে। তাঁরা তাঁদের জীবন গড়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় ও উপদেশে। সেজন্য তিনি যেমন দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণ সঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গে-নর্তনে-কীর্তনে লীলাখেলা খেলেছেন, তেমনি তিনি ছুটে যেতেন ভক্তদের গৃহে তাঁদের তাপদগ্ধ সংসারের বিষজ্বালা থেকে উদ্ধার করবার জন্য, মুক্তি দেবার জন্য। 'ভক্তমিলন-তীর্থ বাগবাজার' অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের অসংখ্য লীলার মধ্যে একটি লীলা। এই লীলাকথা শেষ করি পুঁথি-কারের লীলাগাথায়—

"ভাবে গদগদ তনু মত্ততার ভরে।
করতালি দিয়া নৃত্য মণ্ডল-আকারে॥
ক্রমে পরে রাতি যবে ঊর্ধ্বে উঠে যায়।
ভক্তদের সঙ্গে কথা ফুরাতে না চায়॥
দিনরাত্রি সমভাবে তত্ত্ব-আলাপন।
বিশ্রাম প্রভুর দেহে জানে না কখন॥
এই ঈশ তত্ত্বালাপ আচরি আপনে।
জগতে দিলেন শিক্ষা যত জীবগণে॥
সেই তত্ত্ব শুন মন পূর্ণ হবে কাম।
মঙ্গলনিদান রামকৃষ্ণ-লীলা-গান॥"[৯১]

৮৮ শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, পঞ্চদশ ভাগ (১ম সং—১৩৮১ সাল), (দ্বাবিংশ অধ্যায়, নবীন তীর্থ), পৃঃ ৪১৫

৮৯ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ (ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-নবযাত্রা, পৃঃ ২৩৩-৩৪, ২৪৪ এবং (পুনর্যাত্রা ও গোপালের মার শেষ কথা), পৃঃ ২৮৫, ২৯০

৯০ কথামৃত, ১ম ভাগ, উপক্রমণিকা, পৃঃ ৪

৯১ পুঁথি, পৃঃ ৪৮৮

পুণ্যস্মৃতি

শ্রীমতী শিবানী মিত্র

সন-তারিখ মনে নেই। এইটুকু বলতে পারি ঘটনাগুলো আমার বিয়ের আগের। আমার জন্ম ১৯০৩ সালে, বিয়ে হয় ১৯১৮ সালে—পনের বছর বয়সে। আমার মা কৃষ্ণময়ী—যাঁর নাম 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'ও উল্লিখিত হয়েছে। আমার বাবা বিপিনকুমার রায়চৌধুরীকে মঠের মহারাজরা 'বিপিন জামাই' বলতেন।

আমার দিদিমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ গৃহী-ভক্ত বলরাম বসুর স্ত্রী। একদিন বিকেল বেলা দিদিমার সঙ্গে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার বাড়ি গেলুম। আমাদের সঙ্গী আর কে কে ছিলেন, তা ঠিক মনে পড়ে না। শ্রীশ্রীমার ঘরে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে-ছিলুম। দিদিমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরে শ্রীশ্রীমা আমায় বললেন, 'শিবু, যা তো ওপরে গিয়ে দেখে আয় রাধু আর তার বর কি করছে।' আমি ছাদে গেলুম। গিয়ে দেখি যে, ছাদের ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। একটি জানালার ফাঁক দিয়ে আমি দেখলুম তাঁরা দুজনে চুপচাপ বসে আছেন। এইটুকু দেখতে আর কত সময় লাগবে! কিন্তু আমি যদি তক্ষুণি নেমে আসি, তাহলে শ্রীশ্রীমা হয়তো ভাববেন আমি কিছুই দেখিনি, এই মনে করে আমি ছাদের এ-পাঁচিল থেকে ও-পাঁচিলে খানিক খানিক দাঁড়িয়ে থেকে তারপরে নেমে শ্রীশ্রীমার কাছে গেলুম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে শিবু, কি দেখলি?' আমি যা দেখেছিলুম, তাই তাঁকে জানালুম। তিনি বললেন, 'ভাল করে দেখেছিস তো?' আমি বললুম 'হাঁ'। শ্রীশ্রীমা কেন যে আমাকে রাধুদের দেখে আসতে বলেছিলেন, তা জানি না।

দিদিমার সঙ্গে শ্রীশ্রীমার বাড়িতে অনেকবার গেছি, তাঁর অনেক কথা শুনেছি। তিনি দুই চরণ ছড়িয়ে বসতেন, মাঝে মাঝে বলতেন, পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে। তাও দিয়েছি। তাঁর কাছে বসে থেকে অনেক গল্প শুনেছি। একবার থিয়েটারে 'কিন্নরী' বই দেখতে যাই শ্রীশ্রীমা ও দিদিমার সঙ্গে, অন্য যাঁরা সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের নাম এখন মনে করতে পারি না। থিয়েটার যে কি জিনিস, তা আমরা জানতুম না। কারণ, বাবা ওসব দেখা মোটেই পছন্দ করতেন না এবং আমাদের কখনও দেখাননি। কাজেই আমি খুবই অবাক হয়ে মনের আনন্দে 'কিন্নরী' থিয়েটার দেখেছিলুম। কিন্নরীদের নানান ভঙ্গিমায় আধাআধি শোয়া-বসার ভাবে দেখে শ্রীশ্রীমা বললেন, 'হাঁগা রামের মা, এরা মানুষ না পুতুল?' তাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্নরীরা একটু একটু হেলে দুলে নড়ে উঠেছে দেখে শ্রীশ্রীমা বললেন, 'না গো রামের মা, পুতুল নয় গো, ওরা যে মানুষ গো!'

আগেই বলেছি, আমি মামার বাড়িতেই থাকতুম বেশি। দিদিমার কাছ থেকে ঠাকুরঘরের কাজ শিখেছিলুম। ঐ সব কাজ আমার বেশ ভালই লাগত। দিদিমা আমাকে অনেকদিন বলেছিলেন দীক্ষা নিতে। কিন্তু আমি তাঁকে কোন উত্তর দিতুম না। কারণ, আমি শুনেছিলুম, আমার মেজদি—দীক্ষা নেবার পর তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে আবার দীক্ষা নিতে বলেছিলেন। কারণ, তাঁদের মতে মেয়েদের একার দীক্ষা নেবার কোন মূল্য নেই। আমার মনে তাই ভয় ছিল—আমায় যদি মেজদির অবস্থায় পড়তে হয়! আমার বিয়ের পরে—খুব সম্ভব এক মাস পরে আমি দিদিমাকে বলি যে, দীক্ষা নেব; তবে আগে শ্বশুরবাড়ির মত আনি। আমার শ্বশুর

ছিলেন না। তাই, শাশুড়িকেই চিঠি লিখলাম, আমি শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা নিতে চাই, আপনার কি মত? আমার শ্বশুরবাড়ির কুলগুরু ছিলেন এবং প্রচলিত নিয়ম এই যে, বিয়ের পরে বউ স্বামীর সঙ্গে কুলগুরুর কাছ থেকেই দীক্ষা নেবে। তাই খুব কাকুতি-মিনতি করেই চিঠিখানি লিখি। যাই হোক, শ্রীশ্রীমার কৃপায় আমি তাঁর কাছেই দীক্ষামন্ত্র পেলুম। যেদিন আমার দীক্ষা হয়, সেদিন মামার বাড়ি থেকে দিদিমার সঙ্গেই গঙ্গাস্নান করে শ্রীশ্রীমার বাড়িতে গিয়েছিলুম। সেখানে তখন কোন ভীড় ছিল না, কারণ সেটা কোন বিশেষ দিন ছিল না। দীক্ষা নিতে গেলে কি করতে হয়, কি খরচা—সে-সব আমি কিছুই জানতুম না। যেমন প্রায়ই শ্রীশ্রীমার বাড়িতে যেতুম, তেমনি গিয়েছিলুম। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে দিদিমার বা বাবার যদি কোন কথা হয়ে থাকে, তা আমি কিছুই জানি না। শ্রীশ্রীমার ঘরের দরজার কাছে মা আমাকে ডাকলেন। আমি ভিতরে গেলুম। তিনি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আমার কানে মুখ দিয়ে মন্ত্র দিলেন। তারপর বললেন, 'আমায় প্রণাম কর।' আমি প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। সেই দিনটি আমার খুবই আনন্দে কেটেছিল। সেটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। এর প্রায় দু বছর পরে শ্রীশ্রীমা দেহরক্ষা করেন। আমি তখন শ্বশুর-বাড়িতে ছিলুম। আমার পঞ্চম বোনের স্বামী আমাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে শ্রীশ্রীমার বাড়িতে এনেছিলেন। আমি নীরবেই বসেছিলুম। আমার তৃতীয় বোন আমায় বললেন, 'মার চরণের ফুল কিছু তুলে নাও।' আমি শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণের ফুল নিয়ে একটি কৌটাতে রেখে দিয়েছিলুম। আজও সেই কৌটাটি আমার কাছে আছে।

*

মামার বাড়িতে—বলরাম-মন্দিরের অন্দর-মহলে—রোজ বিকালে আসতেন গোলাপ-মা ও যোগেন-মা। দেখেছি দিদিমা ও তাঁরা দুজনে বসতেন ঠাকুরঘরের সামনের দালানে; বসে জল খেতেন, পান খেতেন আর তখন নানান রকমের আলোচনা হত। দিদিমার হুকুম ছিল যে, তাঁরা যখন আসবেন, দেখতে পেলেই প্রণাম করতে হবে। সে-প্রণাম যা-তা করে করলে হত না—শ্রদ্ধাভরে ভক্তিভরে করতে হবে! আবার যখন তাঁরা চলে যাবেন, তখনও ঠিক সেইভাবে প্রণাম করতে হবে। তাঁরা যখন আসতেন তখন ছিল আমাদের খেলার সময়। যোগেন-মা আর গোলাপ-মা যখন আসতেন, তখন আমাদের খেলা আরম্ভ হত। তাই প্রণাম করতে বিশেষ অসুবিধা হত না। কিন্তু যখন তাঁরা চলে যেতেন, তখন খেলাটা জমে উঠত। কাজেই তখন প্রণাম করতে গেলে খেলায় বাধা পড়ত। তাই আমি ঠিক করলুম প্রণামটা আসা ও যাওয়ার সময়ে না করে দুবারের প্রণাম আসার সময়েই একেবারে দুবার করে নেব। আমরা খেলুড়ে ছিলুম চার বোন—মামাতো ঐ দুই বোন, আমি ও আমার সহোদরা এক বোন। আমি আর তিন বোনের চেয়ে বয়সে বড় ছিলুম, কাজেই আমি যা বলব, তা তাদের মানতে হবে। আমি গোলাপ-মাকে প্রথমেই দুবার প্রণাম করাতে, তিনি বললেন, 'কেন রে, দুবার প্রণাম করছিস কেন?' আমি বললুম, 'দিদিমা বলে দিয়েছেন আপনারা আসলে প্রণাম করতে হবে এবং আপনারা চলে যাবার সময়েও প্রণাম করতে হবে; কিন্তু আপনারা যখন চলে যান, তখন আমরা খেলি; তাই তখন প্রণাম করতে অসুবিধা হয়। তাই দুবারের প্রণাম আপনাদের আসার সময়েই করে নিলুম।' গোলাপ-মা আমার কথা শুনে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু দিদিমাকে বলে দিলেন। দিদিমা আমাকেই ডাকলেন, কারণ তিনি জানতেন আমিই বড় এবং

আমি যা করি ওরাও তাই করে। দিদিমা বললেন, 'হ্যাঁরে শিবি, তুই একবারেই দুবারের প্রণাম সেরে নিয়েছিস কেন?' আমি উত্তর দিলুম, 'ওঁরা যখন চলে যান, তখন যদি না দেখতে পাই; তাই একবারে দুবারের প্রণাম করে নিয়েছি।' তিনি বললেন, 'কেন, তখন তোরা কোথায় থাকিস যে দেখতে পাবি না?' আমি মনে করেছিলুম যে, আমার এই বুদ্ধির জন্য দিদিমা খুশি হবেন, কিন্তু উল্টো হল। তিনি আমাকে খুব বকলেন। তখন তো বুঝিনি দিদিমা আমাদের জন্য পারের কড়ি-ই যোগাড় করে দিচ্ছেন!

আগেই বলেছি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে 'কিন্নরী' থিয়েটার দেখেছি। একবার শ্রীশ্রীরাজা মহারাজকে থিয়েটার দেখানোর ব্যবস্থা হয়। তখন আমরাও অনেকে সঙ্গে গিয়েছিলুম। আমার মামাতো বোন মাধবীও ছিল। আর যে কে কে ছিলেন, তা মনে করতে পারছি না। থিয়েটার বাড়ির রয়েল বক্সে আমরা বসেছিলুম। বইখানির নাম 'রামানুজ'। লেখক অপরেশ মুখোপাধ্যায়। ঐ বইতে রামনামের কিছু অংশ গাওয়া হয়েছিল। একটি মেয়ে গেয়েছিল। ঐ গানটি কিন্তু অপরেশবাবু আমার মামার বাড়িতে রাজা মহারাজের ঘরে বসে শিখেছিলেন এবং তাঁরই কাছে বসে গেয়েছিলেন।

*

আমার বয়স তখন বারো বা তেরো হবে। মামার বাড়িতে রাজা মহারাজ আছেন। গঙ্গাধর মহারাজও আছেন। আরও অনেকেই আছেন, তাঁদের সবাইকার নাম আমার ঠিক মনে নেই। তবে ভবানী মহারাজ ছিলেন। ভবানী মহারাজের নিয়ম ছিল যে, রোজ সকালে সব মহারাজের ঘুম ভাঙলে তিনি রাজা মহারাজের ঘরে বসে গান গাইতেন। সে-সব গান মায়ের গান। সে-গান শুনে রাজা মহারাজের ঘরে যদি আমরা উপস্থিত না থেকে বিছানায় শুয়ে থাকি, দিদিমার কাছে সেটা আমাদের অমার্জনীয় অপরাধ। গান আরম্ভ হবার আগেই বাইরের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হবার কথা। যদি তখন ঘুম না ভাঙে, তবে গান শোনা মাত্রই ঘুম থেকে উঠে ঐ ঘরে যেতে হবে। এই গান শুনতে আমাদের ভালই লাগত। আমি ভবানী মহারাজের কাছে কিছু কিছু কালীকীর্তন শিখেও ছিলুম। আমরা যখন গান শুনতে যেতুম, তখন আমাদের মুখ ধোওয়া হত না, মুখ ধুতে গেলে গান শেষ হয়ে যাবে—দিদিমার কাছে বকুনি খেতে হবে। গান শুনে এসে মুখ ধুতে হবে, সব গান না শুনলে চলবে না।

একদিন মজা হল কি, সকালে বাসী মুখে কারুর এক চোখ দেখলে গঙ্গাধর মহারাজ খুব চটে যেতেন। যার এক চোখ দেখতেন, তাকে খুব বকাবকি করতেন। আমরা ভয়ে ভয়ে থাকতুম। একদিন রাজা মহারাজ আমাদের শিখিয়ে দিলেন, 'তোরা গঙ্গাধরের কাছে গিয়ে সবাই মিলে এক চোখ দেখা।' আমরা সবাই তাই করেছি। প্রথমে অবশ্য আমরা মহারাজের কথায় রাজী হইনি। আমি যেহেতু বড়, সেইহেতু আমিই বেশি বলা-কওয়া করতুম। আমাদের অরাজীতে মহারাজ বললেন, 'আমি বলছি তোরা যা।' আমরা সবাই মিলে বড় ঘরের (বলরাম-মন্দিরে উপরের হলঘরের) ভিতরে গঙ্গাধর মহারাজের সামনে গিয়ে নাম ধরে ডেকে ডেকে এক চোখ বন্ধ করে আর এক চোখ দেখাতে লাগলুম। আমাদের তো খুবই মজা লাগল, কিন্তু গঙ্গাধর মহারাজ যে কি করে বুঝলেন, আজ এই এক চোখ-দেখানো কাজটা আমাদের নিজেদের ইচ্ছায় হয়নি, তা এ যাবৎ

বুঝতে পারিনি। তিনি আমাদের সকলকার দিকেই তেড়ে এসে বললেন, 'এই যা, যা, এসব কাজ রাখালের। রাখাল, রাখাল, এ তুমি কি করছ!' আমরা তো সবাই ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এসে রাজা মহারাজের কাছে দাঁড়ালুম।

রাজা মহারাজ আমাকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়েছিলেন। আমার ঠিক ওপরের বোনের বাড়ি চন্দননগরে। সেই জায়গাটার নাম হল ফটকগোরা বাগবাজার। সেই বোন আমায় চিঠি দেয়। আমি মহারাজকে চিঠিখানা দেখাই। তিনি চিঠি পড়ে আমায় চিঠির উত্তর বলে দেন, আমি লিখি। অনেক কথাই বলেছিলেন, সব ভুলে গেছি। এইটুকু শুধু মনে আছে, তিনি বলেছিলেন, 'লেখ, এ তোমাদের ফটকগোরা বাগবাজার নয়, এ হচ্ছে কলকাতার গঙ্গার ধারের বাগবাজার।' তাঁদের বাণী কেমন করে মনে রাখতে হবে, দিদিমা সেদিকে নজর দিতেন। কিন্তু আমরা তখন তা বুঝতুম না। ছোটবেলায় জানতুম সাধু-পরিবার মামার বাড়ি। বেলুড় মঠ ও উদ্বোধনকেও আমরা মামার বাড়ি বলেই জানতুম। আমরা যখন ছোট ছিলুম, তখন মঠে প্রায়ই যেতুম; আর যখন ঠাকুরের উৎসব হত, তখন আমরা মামার বাড়ি থেকে দুখানি নৌকা করে একেবারে ভর্তি হয়ে বাগবাজারের ঘাট থেকে মঠে যেতুম। গৃহী-ভক্তদের মধ্যে আমরাই প্রথম যেতুম আর ফিরে আসতুম সবশেষে। মঠের বাড়ির উপরতলার ঘর থেকে কালীকীর্তন শুনতুম। তখন কালীকীর্তন মঠ বাড়ির উঠানে হত।

*

আমার বয়স যখন নয় কি দশ বছর, তখন গঙ্গাধর মহারাজ আমাদের বাবার বাসাবাড়ি বেনেটোলায় বেশ কিছু দিন ছিলেন। তখন আমার ওপর ভার ছিল গঙ্গাধর মহারাজের দেখাশোনা করার। তিনি সকালে ও বিকালে যে চা জলখাবার খাবেন সেই চায়ের যোগাড় চাকরে করে দেবে, কিন্তু তা তৈরি করে দেব আমি। কারণ, আমি তখন ফ্রক-পরা মেয়ে। বাইরের ঘরে বসে চা-জলখাবার তৈরি করবার ভার আমার। যারা শাড়ি পরবে, তারা সব সময়ে সদরে আসতে পাবে না। আমি যখন তাঁকে চা করে দিতুম, তখন তাঁর কাছে কত গল্পই না শুনতুম! উনি কত দেশে ঘুরেছেন তার গল্প, সারগাছিতে আশ্রম করেছিলেন তার গল্প, বহরমপুরে পাগলাগারদ ছিল, সেখানকার পাগলদের গল্প—কত গল্পই যে শুনেছি!

বিকেলে মাস্টার আসতেন পড়াতে। আমরা অনেকেই একসঙ্গে পড়তুম আর সেখানে ইজি-চেয়ারে বসে গঙ্গাধর মহারাজ আমাদের পড়ানো দেখতেন। একদিন এক উটের বিষয়ে পড়ছি। গঙ্গাধর মহারাজ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে শিবু, উট কি তুই দেখেছিস?' আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'না মহারাজ, আমি উট তো কই দেখিনি!' তিনি বললেন, 'সে কি তোরা চিড়িয়াখানা কখনও দেখিসনি?' আমি বললুম, 'না'। আমাদের বাবা কখনও কোথাও কিছুই দেখাননি—একথা মহারাজকে বলবার সাহস আমাদের ছিল না, কারণ কি জানি বাবা যদি রাগ করেন। আমাদের ভাগ্য ভাল, মহারাজ বাবাকে বললেন, 'বিপিন, তুমি এদের চিড়িয়াখানা দেখাওনি?' বাবা বললেন, 'না, মহারাজ, আমি ওদের কিছুই দেখাইনি।' মহারাজ বললেন, 'ওদের চিড়িয়াখানাটা দেখিয়ে দিও।' এর কিছু দিন পরে বাবা আমাদের পিসতুতো ভাইকে দিয়ে চিড়িয়াখানা দেখিয়েছিলেন। চিড়িয়াখানায় সব জন্তুজানোয়ার দেখে যে খুবই আনন্দ হয়েছিল, সে আর না বললেও চলবে।

বাবা কোন বিষয়ে যত রাগারাগি করুন না কেন, গঙ্গাধর মহারাজ কিছু বললে তখুনি জল হয়ে যেতেন। একদিন আমাদের পড়া শেষ হয়েছে, এমন সময়ে বাবার রাগের গলা পেলুম। আমাদের বারুইপুরের জমিদারি থেকে কোন প্রজা হরিণের মাংস এনেছিলেন। তাঁকেই বাবা বকাবকি করছিলেন। বাবার গলা পাচ্ছিলুম, কিন্তু যাঁকে বকাবকি করছিলেন, তাঁর গলা পাচ্ছিলুম না। বাবা যখন বকাবকি শেষ করে ওপরে উঠে এলেন, তখন গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, 'বিপিন, তুমি কাকে বকাবকি করছিলে?' বাবা বললেন, 'দেখুন না মহারাজ, বারুইপুর থেকে হরিণের মাংস এনেছে, তাই রাগ করছিলুম।' গঙ্গাধর মহারাজ বললেন, 'তা তুমি হরিণের মাংস এনেছে বলে রাগ করছ কেন?' বাবা বললেন, 'হরিণের মাংস কি কেউ খায়—ও মাংস এখন কি হবে?' মহারাজ বললেন, 'হরিণের মাংস কেন খাবে না? আগেকার কালে মুনি-ঋষিরা বনে বনে বাস করতেন, সেখানে তো হরিণের মাংসই বেশি খেতেন।' তখন বাবা বললেন, 'আপনি ঐ মাংস খাবেন?' মহারাজ বললেন, 'হ্যাঁ, আমি খাব।' মহারাজের এই কথা শুনে বাবার যা অবস্থা হল, সে আমি লিখে বোঝাতে পারব না—তাঁর চোখ-মুখ ও ব্যস্ততা দেখবার মতন! বাড়ির ভিতরে গিয়ে বললেন, 'ও বুড়ি, ও বিমলা, তোরা কে কে হরিণের মাংস রাঁধতে পারিস আয়।' আমার তৃতীয় বোন বুড়ি (রত্নমালা বসু) তখন আমাদের ওখানেই ছিলেন। তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে বেশি থাকতেন। তাঁর স্বামী সত্যেন্দ্রকুমার বসু কৃষ্ণনগরবাসী ফরেস্টার (Forester) ছিলেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল বনে বনে। আমার সেই বোন বলল যে, সে হরিণের মাংস রেঁধে দেবে। তখন মাংস রাঁধবার যোগাড় হতে লাগল। এদিকে সেই মাংস বাহককে বাবা বখশিশ দিলেন এবং ভিতরে গিয়ে তাঁকে জলখাবার দিতে বললেন।

*

স্মৃতিপটে আরও কিছু আঁকা রয়েছে। সবই আমার কাছে পুণ্যস্মৃতি। নিবেদিতা স্কুল যখন বোসপাড়া লেনে ভাড়া বাড়িতে ছিল, তখন আমি সে স্কুলে পড়েছি—সুধীরাদির কাছে; আমি ও আমার মামাতো বোন মাধবী ও মহামায়া এবং আমার আর এক বোন চিন্ময়ী বসু। আমার স্কুল ছাড়বার অনেক পরে সুধীরাদির তিরোধান হয়

তখন আমি বেনেটোলায় বাপের বাড়িতে। আমার প্রথম সন্তান জন্মাবার এক মাসের মধ্যেই আমার টাইফয়েড হয়েছিল। শুনেছিলুম, খুব বেশি ধরনের অসুখ হয়েছিল। তখন আমার বয়স প্রায় ১৭ বছর—সেটা নাকি আরও ভয়াবহ। তখন আমার সেবা করেছিলেন সরলাদি। তিনি তখন আমাদের বাড়িতে। অসুখের সময়ে তো আমার মাথার ঠিক ছিল না, কাজেই তাঁকে কতই না কষ্ট দিয়েছি। তবু তিনি যে আমায় কত যত্ন করেছেন, কত ভালবেসেছেন, তা এখন বুঝতে পারছি। কতই না তাঁর ওপর অত্যাচার করেছি, কিন্তু সে সবই আমার অজ্ঞান অবস্থাতেই করেছি। পরবর্তী কালে তিনি কত বড় হয়েছিলেন। তাই এখন মনে মনে ভাবি, না জানি কোন্ ভাগ্যফলে তাঁর সেবাযত্ন ও ভালবাসা আমি পেয়েছিলুম!

*

যাঁর কথায় সাহস পেয়ে এই লেখা শুরু করেছিলুম, সেবাপ্রতিষ্ঠানের সেই পূজনীয় নরেশ মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে এইখানেই শেষ করছি।

তাঁকে ভালোবাসাই সাধন

শ্রীমতী লতিকা দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকথার সূত্রপাতেই বলতে হয়—তাঁর জীবনের মর্ম শুধু কথায় ধরা যায় না, অনুভবে ধরতে হয়। গানে যেমন কথার অতিরিক্ত থাকে সুর, মহাপুরুষদের জীবনেও থাকে ঘটনাকে ছাড়িয়ে তার ভাব। সুরের মতো এই ভাব আমাদের অনুভূতিতে ব্যাকুলতার সঞ্চার করে। অর্থাৎ এ-জীবন কেবল ঘটনার পঙ্‌ক্তি নয়, ভাবের সাগর—অতএব কেবল পাঠ করা আর শোনা নয়, ডুব দিতে হয়।

ঘটনা হিসেবে যেমন উল্লেখ করতে পারি—ঠাকুর তখন বালক মাত্র। মাঠের আলপথ ধরে চলতে চলতে অকস্মাৎ আকাশে মেঘের পুঞ্জ দেখে তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন। বিবরণগত এই ঘটনা সম্পর্কে আর কথা নেই—কিন্তু যে-পর্যন্ত না এর মূল ভাবটি অনুভব করছি, যে-পর্যন্ত না সেই ভাবটি আমার ভিতরে অনুরূপ ভাবের উদ্রেক করছে সে-পর্যন্ত ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ জানা হল না। কেন তিনি জ্ঞান হারালেন? কোন রোগ বা ব্যাধির আকস্মিক আক্রমণ? না। অথবা মহাপ্রভুর ভাষায় ব্যাধিই বটে, তবে এই ব্যাধির চিকিৎসক একজনই এবং তাঁর ঠিকানা অনুরাগের দেশ, প্রেমের পরগনা। ঘটনার মূল ভাবটি ভালোবাসাই বটে। মেঘে মায়ের বর্ণসাদৃশ্য দেখে মাকে মনে পড়ে গেছে। শ্রীরাধার জীবনেও দেখি, মেঘ দর্শনমাত্র তাঁর নয়নের তারা আর চলে না। মেঘে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত। কারণ তাঁর মাধবের বর্ণ ঐ মেঘে।

ভালোবাসায় এমনই হয়। মা বা মাধব তাঁদের বড় ভালোবাসার ধন, বুকের মাণিক। এই ভালোবাসা যদি সিন্ধু হয়, তাহলে তার বিন্দু সংস্করণ তো দেখি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে—তার দাপটই বা কম কি? যাকে ভালোবাসি, এমন সময়, বলতে গেলে বেশ ঘন ঘন আসে যখন তার চিন্তায় আর সব ভুলে বসে থাকি। অবশ্য যে ভালোবাসেনি সে কখন ভালোবাসার এই আবেশটি বুঝে উঠতে পারে না, পারার কথাও নয়। ঠেকে আমরা যেমন জানি, তেমন আর কিসে জানি? অতএব আমাদের ভয় হতে পারে যে, মায়ের প্রতি ঠাকুরের ভক্তি-ভালোবাসার আবেদন আমাদের কাছে বুঝি নেই, আমরা বুঝি—এই ভালোবাসার কিছুই বুঝে উঠতে পারব না। কিন্তু এর আবেদন আছে এবং সবটা না বুঝলেও কিছুটা ঠিক বুঝি। বুঝি বলেই রামকৃষ্ণ-সম্পর্কীয় বা অপর কোন মহাপুরুষ-সম্পর্কীয় বক্তৃতা শুনতে আমরা বহু সংখ্যায় সমবেত হই। আসলে আমাদের ভালোবাসাটা মূলেই আধ্যাত্মিক। ভগবানের প্রতি ভালোবাসা নিয়েই আমরা জন্মাই। সেটা এভাবে বুঝতে পারা যায়—উপনিষদ্ বলেন, ব্রহ্মই সকলের মূল। এবং প্রলয়ও তাঁরই মধ্যে। প্রলয়ের অবস্থায় জগৎ তাঁর মধ্যেই লীন থাকে এবং প্রলয়ের অবসান হলে সৃষ্টির উন্মুখতা জাগে, একের বহু প্রজাসৃষ্টির বাসনা হয়। এই সৃষ্টির কামনা বা সিসৃক্ষার দরুণ আবার জগৎ সৃষ্টি।

জগৎ সৃষ্টি করে তিনি তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন। সেই একই বহুতে নিজেকে ব্যক্ত করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমরা সকলে এক ও অবিচ্ছিন্ন ছিলাম। তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিলাম। তাঁর সিসৃক্ষার দরুণ অগ্নিপিণ্ড থেকে স্ফুলিঙ্গের মতো, সাগর থেকে জলকণার মতো তাঁর থেকে ছিটকে পড়েছি। ঐ যে এক হয়ে ছিলাম, ঐ যে নিবিড় মিলনবন্ধন তার থেকে

বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারটা আমাদের স্বস্তি দেয় না। আমাদের ভিতরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে একটা আকুলতা আছে। যেমন যত তীর্থই করি জন্মভূমির মতো তীর্থ কোথাও দেখি না। জীবনে নানা এবং বিচিত্র সম্পর্কে কত লোকই আসে—মায়ের মতো কে? এই তো আমাদের ছাঁচ। তাই তাঁর থেকে বিচ্যুতির বেদনাকে আমরা অহর্নিশ বহন করে বেড়াচ্ছি। এই বেদনায় আমাদের ভিতরে একটা ক্রন্দনের আবেগ দুলছে। আমাদের এই রোদনেই আকাশ ভরা। তাই আকাশের আর এক নাম রোদসী বা ক্রন্দসী।

এই বেদনা আমাদের অনুক্ষণ অনুসরণ করছে তাই ঐহিক বা এই জীবনের ভরা সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যেও আমরা পূর্ণ তৃপ্তি পাই না, চারদিকে একটা অতৃপ্তির তপ্তশ্বাস যেন আমাদের ঘিরে রাখে।

এই বিরহে শুধু আমরা খিন্ন ও উত্তাল, এই মিলনের জন্যে শুধু আমরাই উদ্‌গ্রীব ও উন্মুখ তা নয়, তিনিও তাই। তিনিও আমাদের জন্যে প্রতীক্ষারত, তিনিও গণনা করেন, আমরা কবে পরিপূর্ণভাবে তাঁকেই আশ্রয় করব। যেন 'নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে, সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে।' আমরা অভিসারেই চলেছি, জীবনের সুখ-দুঃখ আন্দোলিত অস্থির গতিতে, নদীর মতো চপল ছন্দে চলেছি। আর তিনি? তিনি সেই অকূল অসীম বিরাম সাগর, আহ্বানের ইঙ্গিতে সেই সাগর জীবন-নদীর পুরোভাগে দুলছে।

দেখা গেল, তাঁর প্রতি ভালোবাসা আমাদের সহজাত। আমাদের রক্তে, আমাদের নাড়ীতে সেই অনুরাগের বিদ্যুৎপ্রবাহ।

এবার ঠাকুরের মেঘ দেখে বাহ্য চেতনা হারানোর ব্যাপারটা একটা গভীর ভালোবাসায় অতল হয়ে উঠেছে, একটা নিগূঢ় অর্থের ঋদ্ধিতে মর্মগ্রাহী হয়ে উঠেছে।

তাঁর জীবনের আর একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। তিনি পূজো করতে বসে ফুল মায়ের চরণে দেওয়ার পরিবর্তে নিজের মাথায় দিতেন। এর তাৎপর্যটা কি? আগেই উল্লেখ করেছি, শ্রীভগবানের সঙ্গে আমরা একাত্ম হয়ে ছিলাম। ঠাকুর ও মা ভিন্ন নন—এই বোধটি যখন তিনি সমগ্র চৈতন্য দিয়ে অনুভব করতেন, তখনই এই কাণ্ডটি ঘটত। মাকে ফুল দিতে গিয়ে নিজের মাথায় দিতেন, মাকে খেতে দিয়ে নিজে খেয়ে ফেলতেন। বলা যায়, নিজের মধ্যে মাকেই অনুভব করতেন। একদিন তো বেড়ালকেই খাওয়ালেন। সেদিন মাকে খেতে দিয়ে তিনি বহু মিনতি করে তাঁকে খেতে বলছেন, 'মা খাও।' অঝোরে কাঁদছেন আর বলছেন, 'মা খাও।' কিন্তু কোথায় মা? এমন সময় চোখে পড়ল একটি কালো বেড়াল। ঠাকুরের মনে হল মা বেড়াল-রূপে এসেছেন। তখন তিনি বেড়ালটিকে অতিশয় যত্নের সঙ্গে খাইয়ে দিলেন।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, বেড়ালেও তিনি। বস্তুতঃ তিনিই আছেন। আমি তুমি এখানে আছি আর তিনি স্বর্গে আছেন—এমন থাকা নয়। তিনি আছেন অর্থ তিনিই আছেন। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনিই সমস্ত ব্যেপে আছেন। সব কিছু তাঁতেই গাঁথা আছে—সুতোয় বাঁধা মণির মতো। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সর্বত্র এ কথারই উল্লেখ। শ্রুতি বলেন, এ সমস্তই ব্রহ্ম, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'; বিষ্ণুপুরাণ বলেন, জগৎ বিষ্ণুময়, 'সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ'; গীতা বলেন, বাসুদেবই সমস্ত, 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'। সর্বত্র বিভিন্ন ভাষায় একই কথা। অতএব বলা যায় ঐ এক সত্তা, এক আত্মা, একই প্রাণের নর্তন। বলা যায়, এক বিরাট প্রাণপ্রবাহ সকলের মধ্যে। সজীবে অজীবে, চেতনে অচেতনে মূলতঃ পার্থক্য নেই। সকলেই চিন্ময়, সকলের

মধ্যে সেই এক তিনিই বিরাজমান। তবে আধারের পার্থক্যে উপাধির পার্থক্যে, প্রকাশেরও পার্থক্য হয়। কোথাও অল্প প্রকাশ, কোথাও বেশি, কোথাও একেবারে অপ্রকাশ। ঐতরেয় আরণ্যকে এবং তার সায়নভাষ্যে পাই, মৃত্তিকা পাষাণাদি অচেতন পদার্থে তাঁর সত্তামাত্রের আবির্ভাব। উদ্ভিদ্ স্থাবর হলেও জীব, এতে তাঁর আরও বেশি আবির্ভাব। গো-অশ্বাদি প্রাণীতে আরও বেশি, মানুষে তাঁর সর্বাধিক আবির্ভাব। আবির্ভাবের তারতম্য আর এক প্রকারেও দেখি—বৃক্ষ তার প্রাণধর্মবলে মাটির অভ্যন্তরে মূল প্রসারিত করে আপনার খাদ্য সংগ্রহ করে, মানুষ তার প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রিত করে, যাকে হঠযোগ প্রভৃতি সাধনা বলে, এই নিয়ন্ত্রণের দ্বারা সে তার সৃষ্টিকর্তাকে জানতে চায়। কবির ভাষায় এই প্রাণৈক্যকে ঐভাবে বলতে পারি—

'এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে, সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে, বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাটায়।'

এই ঐক্যানুভূতি শুধু মানবেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবজন্তু বৃক্ষলতা সবেতেই প্রসারিত। আমাদের সংস্কৃতির এটিই মূল উপাদান। প্রাচীন কাল থেকে এই উপলব্ধিকে আমরা রক্তে লালন করছি। তাই প্রাচীনকাল থেকে আমাদের সাহিত্যেও এর প্রতিফলন দেখি। কারণ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নিয়েই সাহিত্য যাত্রা শুরু করেছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে মানব, পশু, প্রকৃতি একটি সহজ প্রেমে যেন এক গার্হস্থ্যের অঙ্গ হয়ে বিরাজ করছে।

এই সাহিত্যে মৃগয়া আছে কিন্তু সঙ্গে মৃগয়া নিবারণের জন্য বাহুও উদ্যত হয়ে আছে। কবি এই নিষ্ঠুর প্রমোদে অন্তর থেকে যোগ দিতে পারেননি।

কাদম্বরী বইয়ের প্রারম্ভেই দেখি, শুকপাখির মুখে কবি বাণভট্ট ব্যাধদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করছেন। সেই বর্ণনায় পশুদের প্রতি শুধু অহিংসামাত্র নয়, একটি গভীর প্রীতি ঝরে পড়ছে।

কবি কালিদাসের শকুন্তলা কাব্যের প্রথম দৃশ্যে দেখি, সেখানে উদ্যতবাণ রাজা দুষ্মন্তকে শর সংবরণ করতে বলা হচ্ছে—'আহা, হরিণের অতি কোমল জীবন কতটুকুই বা, আর কোথায় তোমার বজ্রসম কঠিন শর—পুষ্পরাশির মধ্যে কি আগুন ধরাতে আছে?' এ তো পশুবৎসল ভারতের ব্যথিত হৃদয়ের ভাষা।

শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যও অনুরূপ প্রীতিতে ভরা। মৃগশিশু গমনোদ্যতা শকুন্তলার অঞ্চল ধরে টানছে। তার স্নেহে শকুন্তলার চোখ ছলছল করছে। শুধু এই নয়, শকুন্তলার পুত্রের সঙ্গে সিংহশিশুর সৌহার্দ স্থাপিত হয়েছে। সমস্ত জীবজগতের প্রতি আমাদের একটি হৃদয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে চায়।

পশুর মতো প্রকৃতিও সংস্কৃত কাব্যে মানুষের সঙ্গে একাসন পেয়েছে। ভবভূতির নাটকে তমসা, মুরলা, বাসন্তী প্রভৃতি নদী এবং আরণ্য প্রকৃতি সীতার দুঃখে দুঃখিত এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর সেবায় রত। প্রেমে, করুণায়, শুশ্রূষাপরায়ণতায় উত্তরচরিত কাব্যের প্রকৃতি মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

শকুন্তলা কাব্যে শকুন্তলার সখী হিসেবে অনসূয়া প্রিয়ংবদার সঙ্গে প্রকৃতিরও উল্লেখ করতে হয়। শকুন্তলাকে বিদায় দিতে মানবী সখী

অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন বেদনা অনুভব করছে, তেমনি প্রকৃতিও তার নির্বাক বেদনা জানিয়ে শাখাবাহু দিয়ে প্রিয় সখীকে বুকভরা আলিঙ্গন দিয়েছে।

কুমারসম্ভবে যেখানে মহাদেবের প্রতি মদন বাণ উদ্যত করেছে,সেখানে সমস্ত প্রকৃতি আনুকূল্যে পূর্ণ হয়ে পত্রপুষ্পে শোভিত হয়ে হরপার্বতীর প্রেমকে পূর্ণ করে তুলছে। এই সাহিত্যে সর্বলোক, সর্বজীব, চেতন, অচেতন, জড়—সকলের মধ্যে একটি প্রীতিশুভ্র পারিবারিকতা স্থাপিত হয়েছে।

আমরাও এই সংস্কৃতি বা অনুভবের উত্তরাধিকারী আধুনিক বাংলাসাহিত্যে এর অনুসরণ দেখি জীবপ্রীতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি স্মরণ করতে পারি। মহেশ নামে গরুটি গফুরের প্রাণতুল্য। মহেশকে অবলম্বন করে গফুরের যে হৃদয়-ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে তা অনুভূতিসাপেক্ষ। আমরা প্রাত্যহিক জীবনেও এ-হেন দুঃখ উপলব্ধি করি। গৃহপালিত জন্তুর প্রতি গভীর মমতায় তার বিয়োগে কখন কখন আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করি। আমরা শত্রুর দুঃখেও দুঃখিত হই বৈকি! শত্রুর দুঃখে আনন্দ হওয়ার কথা, কিন্তু এটা মিথ্যে নয় যে কখন কখন দুঃখও হয়। দুঃখ যখন বড়ই নির্মম রূপে আঘাত করে, তখন আমরা বলি শত্রুরও যেন এ-হেন দুঃখের অভিঘাত সইতে না হয়। তারপর প্রকৃতি—যে-আনন্দে অরণ্যে শ্যাম সমারোহ দেখা দেয়, যে-আনন্দে ফুল লাবণ্যে ভরে ওঠে সে আনন্দে আমরাও যোগ দিই। এই প্রকৃতি-প্রীতি সম্পর্কে রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের উল্লেখ করতে পারি—প্রকৃতি এখানে মানুষের নাভিনালের সঙ্গে জড়িত বলা যায়। প্রকৃতি আমাদের সুখ-দুঃখের মর্মসঙ্গিনী। অর্থাৎ আমাদের ভিতরে মানুষ জীব প্রকৃতি সকলকে নিয়ে একটি বিরাট ঐক্যের বোবা অনুভূতি আছে। তাহলে দেখা গেল, আমরা শ্রীভগবানকে ভালোবাসি। আমাদের মনের মণিকোঠায় তাঁর প্রতি ভালোবাসার মধু সঞ্চিত আছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনিই সব, তিনিই সর্বত্র, তিনিই সবেতে—দ্বিতীয় কেউ নেই। এই ঐক্যানুভূতি অর্থাৎ অদ্বৈতের একাকার অবস্থা—যাকে আমরা ভুমা বলে থাকি তার বীজ আমাদের ভিতরে আছে। কিন্তু সকলই সাধনা সাপেক্ষ। ঐহিক জীবনেও তো দেখি কারও কারও মধ্যে বিশেষ কোন ক্ষমতা বা দক্ষতা থাকে, কিন্তু বিশেষ অনুশীলনের দ্বারাই এই বিশেষ ক্ষমতাকে প্রস্ফুটিত করতে হয়। কারও গানের ক্ষমতা থাকলে সুর আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে তাকে সাধনা করতে হবে বৈকি!

তেমনি ভগবানের প্রতি আমাদের অনুরাগের যে কুঁড়িটি আছে তাকে স্মরণ, মনন, ধ্যান প্রভৃতি দিয়ে ফোটানো চাই। আমাদের এই জীবনের ভালোবাসাও তো একটি তপশ্চর্যার ব্যাপার। ভালোবাসার বৃন্তে সুখ-দুঃখের দুটি ফুল একই সঙ্গে ফোটে। এই পথে দুঃখের তপশ্চর্যাকে বরণ করতে আমাদের এক বিন্দু দ্বিধা জাগে না, কারণ এই পথ বেদনা-গভীর তবে মধুরও বটে। ভগবানকে লাভ করার পথেও সাংসারিক এবং শুধু সাংসারিক নয় আমাদের প্রকৃতিগতও কত বিচিত্র বাধাবিঘ্ন আসে, কত অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। কণ্টকতুল্য এসব বাধার দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়েও তাঁকে চাইতে হবে। সূর্যমুখীর সূর্য-উপাসনার মতো অনুরাগে চিত্ত ভরে মনটাকে তাঁরই অভিমুখে তুলে ধরতে হবে তখন এই একাগ্রতার ফলে, এই আত্মসমর্পণের সাধনার ফলে দেখব সকল কষ্টের মাঝেও একটা অনহুভূত আনন্দের আবেশ আছে।

বস্তুতঃ, ভালোবাসাই তাঁকে পাবার সাধন। মহাপুরুষেরা যুগে যুগে এই কথাই বলছেন। সাহিত্যেও এই কথারই প্রচার।

ভালোবাসা ছাড়া তাঁকে পাওয়া যায় না।

আর আমরা জানি ভালোবাসাটা হল পুরোপুরি ভিতরের জিনিস। অতএব আমাদের ভিতর থেকে তৈরি হতে হবে। এ-বিষয়ে ঠাকুরের যে পথ-নির্দেশ তার তুলনা নেই। তিনি বলছেন—বড় মানুষের বাড়িতে ঝি যেমন! পরের কাজে, পরের ছেলেমেয়ের সেবা শুশ্রূষায় দিন কাটায় কিন্তু মন পড়ে থাকে আপন বাড়িতে ও ছেলেমেয়েতে, অথবা নষ্ট মেয়েমানুষ যেমন! আত্মীয়স্বজন ও সাংসারিক কাজকর্মের মধ্যে থেকেও তার মনটি থাকে উপপতির দিকে। তেমনই আমাদের এই সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল কর্তব্যভারের মধ্যেও মনটাকে কিন্তু তাঁরই পায়ে ফেলে রাখতে হবে। আর মন দিয়েই তো কথা। একথা বুঝাতেও তিনি যে উপমাটি দিয়েছেন তা অব্যর্থ। বাস্তবিক ঠাকুরের উপমার বিদ্যুৎশক্তি অনস্বীকার্য তিনি বলছেন সেই দুই বন্ধুর কথা। একজনের ভাগবত শুনতে শুনতেও মন পড়েছিল খারাপ জায়গায়। আর একজন খারাপ কাজে গিয়েও, মনটি ঠিক ঘুরছিল ভাগবত পাঠের আশেপাশে।

মন নিয়েই কথা। সুখ-দুঃখ সকল কিছুতে অবিচলিত থেকে মনটাতে তাঁরই আসন পাততে হবে। স্মরণ রাখব, স্থির জলেই প্রতিবিম্ব পড়ে। তখন তিনি থাকবেন আমার দক্ষিণে, আমার বামে, আমার সম্মুখে, আমার পশ্চাতে। তিনি থাকবেন আমার নয়নে, আমার বচনে, আমার হৃদয়ে। এই তন্ময় অবস্থা-ই তাঁকে এনে দেবে ঠাকুর বলেন, 'কুমুরে পোকা ভেবে ভেবে আরশুলা নিশ্চল হয়ে যায়। নড়ে না; শেষে কুমুরে পোকা-ই হয়ে যায়।' ঠাকুরকে লাভ করার জন্যে শুধু ভক্তি-ভালোবাসার নয় জ্ঞানের পথও আছে, কিন্তু ঠাকুরের মতে ভক্তিপথই প্রশস্ত। তিনি সুন্দর বলেছেন, 'ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ি পর্যন্ত যায়।' অতএব এই ভক্তি-ভালোবাসাকেই সার করতে হবে। এই ভক্তি-ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে আমরা যেভাবে ইচ্ছা, যে মূর্তিতে ইচ্ছা তাঁকে ভজনা করতে পারি। প্রভু হিসেবে যেমন হনুমান করেছিল, মা হিসেবে যেমন ঠাকুর ও রামপ্রসাদ, সন্তান হিসেবে যেমন নন্দ, যশোদা; সখা হিসেবে যেমন শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি; স্বামী হিসেবে যেমন মীরাবাঈ, প্রণয়ী হিসেবে যেমন গোপীরা, শ্রীরাধা। কথা হল ভালোবাসার গভীরতা নিয়ে।

এই ভক্তি, এমন ঐকান্তিকী ভালোবাসা কি একদিনে হয়? হয় না ঠিকই। কিন্তু আন্তরিকতা থাকলে, এই জীবনেই শুদ্ধা ভক্তিলাভ কিছু অসম্ভব নয়। ভক্তিতেও সবলতা চাই। আমরা যেন বলতে পারি—এ জন্মেই তোমাকে আমি যেন লাভ করি। ব্যাকুলতাই ভালোবাসাকে গভীর হতে গভীরতর করে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখব। আগেই বলেছি তিনিই সর্বময়, তাই তাঁর ইচ্ছা বা কৃপা ব্যতিরেকে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা হয় না। তাই কবি বলেন—

'তোরা কেউ পারবি নে গো, পারবি নে ফুল
ফোটাতে।
যতই বলিস্, যতই করিস,
যতই তারে তুলে ধরিস,
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন
আঘাত করিস্ বোঁটাতে—'

আর তিনি? তিনি কি করে এই প্রেমের ফুলটি ফুটিয়ে দেন?

'সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।'

তাঁর ইচ্ছাই সব, তবু আমাদের চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা আমাদের, ফল তাঁর হাতে। আমাদের চলা—পরিণামে তিনিই অপেক্ষা করছেন।

অতএব আমাদের সর্বান্তঃকরণে এই ভক্তি ভালোবাসা চাইতে হবে। ঠাকুরও আমাদের চাইতে শিখিয়েছেন—'মা আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে।' তাইতো ঠাকুর বলেন, 'আর কিছু না পার, এক ঘটি কাঁদতে তো পার।' ভালোবাসা মানেই তো চোখের জলের কথা-কাহিনী। আর বিশেষ করে তাঁকে ভালোবাসা। তিনি তো প্রেম-সম্ভোগের রাজা বা ওস্তাদ। না কাঁদিয়ে তিনি ছাড়বেন কি? তাঁকে লাভ করতে হলে যে অপরিসীম দুঃখকে বরণ করতে হয়। এ পথে যাঁরা হেঁটেছেন তাঁদের সবার জীবনই তো তার সাক্ষ্য।

অশ্রুসাগরেই তাঁর প্রেমের পদ্মটি ফোটে। তিনি অমনি ভাবেই সকল দুঃখকে সার্থকতায় ভরে দেন, সকল দৈন্যকে পূর্ণ করে তোলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ই. টি. স্টার্ডি

ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজী সম্পর্কে মিস মূলারের অসন্তোষের কারণ ও প্রকৃতি আলোচনার স্থান এ নয়। শুধু এটুকু বলে রাখি যে, মিস মূলারের ভারতে এসে মনে হয়েছিল যে, স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইরা তাঁকে যতটা খাতির-যত্ন করা উচিত ততখানি করেননি। তিনি ভেবেছিলেন কয়েক হাজার টাকা দান করে [তাঁর টাকায় বেলুড়মঠের জমি কেনা হয়েছিল] বিবেকানন্দ সহ তদীয় যাবৎ গুরুভাই তথা সারা ভারতবর্ষের মাথা তিনি কিনে নিয়েছেন। সুতরাং কি মঠ-পরিচালনা, কি সন্ন্যাসীদের ব্যক্তিগত জীবন-যাপন এবং ধর্মপ্রচার—সব ব্যাপারে তাঁর হুকুম ও পরোয়ানা মেনে স্বামীজীদের চলতে হবে। বলা বাহুল্য, স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। সুতরাং মিস মূলার ভগ্নমনোরথ হয়ে স্বামীজীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। কিন্তু এতকাল তাঁর বিভিন্ন আলাপ, বক্তৃতা ও লেখায় তিনি স্বামীজী সম্পর্কে যে-সব চরম প্রশস্তি উচ্চারণ করে এসেছেন, তাঁকে অকস্মাৎ হেয় প্রতিপন্ন করার তো কিছু সুনির্দিষ্ট এবং অপরের কাছে গ্রহণযোগ্য কারণ দেখাতে হয়। সুতরাং তিনি বলতে শুরু করলেন যে, তিনি দেখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভাইরা যথার্থ বৈরাগ্যবান, তপস্বী স্বভাবের মানুষ নন। তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে বিলাসী, বেলুড়মঠে তাঁদের তিন-তিনটে বড় ঘর আছে। মিস মূলার এও রটনা করতে লাগলেন যে, ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বন্ধুরা স্বামীজীকে তাঁর কাজের জন্য যে অর্থ দিয়েছিলেন সেই অর্থ তিনি ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যয় করছেন, ইত্যাদি। তাছাড়া, মিস মূলারের বিবেচনায়, কোন আধ্যাত্মিক মানুষের অসুখ হওয়া উচিত নয় এবং ধূমপান করা পাপ। কিন্তু স্বামীজী একজন ধর্মগুরু হয়েও অন্যান্য মানুষের মতোই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ধূমপান করেন। মজার ব্যাপার, শেষের দুটি অভিযোগে মিসেস জনসন স্বামীজীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন। আর স্টার্ডি পরবর্তী সময়ে যে-সব অভিযোগ আনবেন তা ছিল সম্পূর্ণ মিস মূলারের অভিযোগেরই প্রতিধ্বনি।

আসলে লণ্ডনে বেদান্ত-আন্দোলনের যে হাল করে এনেছিলেন স্টার্ডি তাতে তিনি ভালভাবেই বুঝে গিয়েছিলেন যে, কোনরকমে স্বামীজীর থেকে সরে তাঁকে আসতেই হবে। তাতে তিনি ঐ বিষয়ে লণ্ডনের বন্ধুদের কাছে তাঁর দায়িত্ব এড়াতে

পারবেন। মিস মূলারের অপপ্রচার-অভিযানের ফলে তিনি স্বামীজীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খাড়া করতে পারবেন ভাবছিলেন। কিন্তু এও তাঁকে সেইসঙ্গে ভাবতে হচ্ছিল যে, স্বামীজী সম্পর্কে এতদিন প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে তিনি যে-সব ভাল ভাল কথা বলেছেন সেগুলি রাতারাতি অস্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সুতরাং তাঁকে আরও কয়েকমাস অপেক্ষা করতে হল।

স্টার্ডির ব্যর্থতার গ্লানি একটি কারণে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তা হল: স্বামীজীর তথা ভারতের কাজে নিবেদিতার আত্মোৎসর্গ। স্বামীজী এবং তাঁর কাজে নিবেদিতার দ্বিধাহীন আনুগত্যে স্টার্ডি তাঁর সম্পর্কে ক্রমশঃ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠছিলেন। স্বামীজীর লণ্ডন ত্যাগের পর স্টার্ডি স্বামীজীকে যত চিঠি লিখেছেন তার প্রায় প্রত্যেকটিতে থাকত শুধু অভিযোগ আর হতাশার কথা। অন্যদিকে নিবেদিতা ইংলণ্ড থেকে স্বামীজীকে যে-সব চিঠি লিখতেন, তাতে থাকত একটা প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং উৎসাহের সুর যা স্বামীজীকে আশ্বস্ত করত।[২৫] ভারতে আসার পর নিবেদিতা পরম উৎসাহে স্বামীজীর কাজে নিজেকে যুক্ত করেছেন, কোন সমস্যাকেই সমস্যা বলে গ্রাহ্য করেননি এবং সর্বোপরি স্বামীজীর কাজের জন্য নিজের দেশ, আত্মীয়স্বজনের মায়া ত্যাগ করেছেন, বিসর্জন দিয়েছেন ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং ভবিষ্যতের প্রশ্ন, এককথায় তাঁর সব কিছু। ভারত থেকে নিবেদিতা যত চিঠি লিখেছেন স্টার্ডিকে তাও ছিল আশা ও উৎসাহের সুরে ভরপুর। মিসেস বুলকে স্টার্ডি সেকথা নিজেই লিখেছিলেন।[২৬] ব্যর্থ এবং হতাশাক্লিষ্ট স্টার্ডি নিবেদিতার উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। স্টার্ডি যখন পিছিয়ে পড়ছেন তখন নিবেদিতার অক্লান্ত উদ্যমের কথা এবং তাঁর প্রতি চিঠিতেই স্বামীজী সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রকাশ দেখে সতীর্থ হিসেবে স্টার্ডি একটি হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া লণ্ডনে স্টার্ডি ছিলেন স্বামীজীর দক্ষিণ হস্ত। ক্রমশঃ স্বামীজীর শিষ্যদের মধ্যে নিবেদিতা যেন ভারতবর্ষে সেই স্থানটি গ্রহণ করছেন, কল্পনা করে স্টার্ডি অন্তরে একটা জ্বালা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন।

মার্চ (১৮৯৯) মাসে স্টার্ডি নিবেদিতা এবং ম্যাকলাউডের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, স্বামীজী এপ্রিলে স্বামী তুরীয়ানন্দকে নিয়ে লণ্ডনে আসতে চান। সেকথা জানামাত্র স্টার্ডি স্বামীজীকে সাদর আহ্বান জানালেন। ১৩ এপ্রিল মিসেস ওলি বুলকে লিখলেন যে, ইতিমধ্যে স্বামীজীর একটি ছোট চিঠি তিনি পেয়েছেন। তাতে স্বামীজী তাঁর (স্টার্ডির) লণ্ডনে আসার জন্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। তবে স্বাস্থ্যের কারণে তাঁর রওনা হতে একটু দেরি হবে।[২৭] ঐ চিঠিতে স্টার্ডি উৎসাহভরে একথাও লিখলেন: 'তুরীয়ানন্দ যখনই আসুন না কেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে আমি তৈরি হয়ে আছি। আমার মনে হয়, একথা লেখা বাহুল্যমাত্র। তবু আমি কাল যখন ভারতে চিঠি লিখব তখন আবার তা [স্বামীজীকে] জানাব।'

কিন্তু ঐ চিঠিটি লেখার ঠিক তিনদিন পর (১৬ এপ্রিল) স্টার্ডি মিসেস বুলকে আর একটি চিঠিতে যা লিখলেন তাতে অবাক হতে হয়। কারণ তা ম্যাকলাউড এবং ওলি বুলকে এতদিন

২৫ 'Complete Works', VIII (1971), pp. 399, 405, 407; Prabuddha Bharata, 1977, p. 354

২৬ 'Second Visit', p. 59

২৭ Ibid.

স্টার্ডি স্বামীজী সম্পর্কে যা বলে এসেছেন তার সঙ্গেই যে শুধু মেলে না তাই নয়, স্টার্ডির প্রথমাবধি স্বামীজী সম্পর্কে যে ধারণা আমরা দেখে এসেছি তার সঙ্গে তো বটেই, তিনদিন আগে পর্যন্ত তিনি যা বলেছেন তার সঙ্গেও মোটেই খাপ খায় না। স্টার্ডি লিখলেন: 'আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে, স্বামীজী যেইমাত্র এখানে এসে পৌছবেন সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থের দরকার হবে। আর এবার দুজনের [স্বামীজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দের] খরচ যোগাতে হবে।...

'স্বামীজীর এখানকার বন্ধুবান্ধবদের থেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা তুলতে পারব মনে হয় না। আর তার চেষ্টা করাটাও এখন উচিত হবে না।

'আমার বর্তমানে যা সাংসারিক খরচ তা কমানোও এখন আমার পক্ষে সম্ভব নয়—তা করতে গেলে [আমার পরিবারের] অন্যান্যদের অসুবিধা হবে এবং সম্ভবত তা করাটাও ঠিক হবে না। তাছাড়া, আমার পক্ষে সংসার চালিয়ে এমন কিছু টাকা থাকবে না, যা আমি নিজে স্বামীজীর জন্যে দিতে পারব।...'[২৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্টার্ডি এতদিন ভিতরে ভিতরে স্বামীজীর সম্পর্কে একটি অসন্তোষ পোষণ করে চলেছেন এবং তার কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তবে এখনও তিনি ঝোলা থেকে বেড়ালটি ঠিক বের করলেন না। ম্যারী লুইস বার্কের গবেষণা থেকে বোঝা যায় যে, স্বামীজী সম্পর্কে স্টার্ডির এই অসন্তোষের মূলে বিশেষভাবে কাজ করেছে নিবেদিতা সম্পর্কে স্টার্ডির অকারণ অসূয়াপরতা।[২৯]

ইতিমধ্যে টিকিট পাওয়া না যাওয়ায় এবং আর্থিক কারণে স্বামীজীর যাওয়া পিছিয়ে যায়। টিকিট হয় ২০ জুনের। এই সময় নিবেদিতাকে দিয়ে স্বামীজী যে বালিকা বিদ্যালয় শুরু করেছিলেন সেটি আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে চলছিল। ক্রমশঃ তার তীব্রতা বেড়ে চলায় স্বামীজী নিবেদিতাকে তাঁর সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার জন্য তৈরি হতে বলেন, যাতে নিবেদিতা সেখানে তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য স্বাধীনভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন।[৩০] সুতরাং নিবেদিতাও স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে যাবেন ঠিক হল। প্রয়োজন হলে স্বামীজী নিবেদিতাকে আমেরিকাতেও কোন বক্তৃতা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে অর্থ-সংগ্রহের কথা ভেবেছিলেন।[৩১] যাই হোক, স্বামীজীরা যে ২০ জুন রওনা হচ্ছেন তা স্টার্ডিকে যথাসময়ে জানানো হল। নিবেদিতাও স্বামীজীর সঙ্গে ইংলণ্ডে আসছেন জেনে স্টার্ডি শঙ্কিত হয়ে থাকতে পারেন। তিনি হয়তো ধরেই নিয়েছিলেন স্বামীজী নিবেদিতাকে ইংলণ্ডে নিয়ে আসছেন তাঁকে স্টার্ডির স্থলাভিষিক্ত করতে। সুতরাং স্টার্ডি নিবেদিতাকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে আরম্ভ করলেন এবং নিবেদিতার উপর তাঁর এই রাগটি গিয়ে পড়ল স্বামীজীর উপরে। অথচ স্টার্ডির এই অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের খবরটি স্বামীজী অথবা নিবেদিতা কেউই অবহিত ছিলেন না।

রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে (২০ জুন, ১৮৯৯) স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালেন: 'Started. Wire Sturdy.'[৩২] স্বামীজীর নির্দেশমতো মিস ম্যাকলাউড স্টার্ডিকে

---

২৮ Ibid, p. 60　　২৯ Ibid. pp. 5, 59-61

৩০ Letters of Sister Nivedita, p. 146　　৩১ Ibid. p. 161

৩২ 'Second Visit', p. 61; স্টার্ডিকে স্বামীজীর রওনা হবার সংবাদ দেবার জন্য স্বামী সারদানন্দও মিস ম্যাকলাউডকে একটি আলাদা তার পাঠিয়েছিলেন। (Letters of Sister Nivedita, p. 291)

সে-সংবাদ জানিয়ে দিলেন। রওনা হবার পর স্বামীজী স্টার্ডিকে কোন চিঠি লিখেছিলেন কিনা না জানা গেলেও মাদ্রাজ পৌঁছে তাঁদের রওনা হবার কথা জানিয়ে এবং স্বামীজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দের থাকার ব্যবস্থা করার অনুরোধ করে নিবেদিতা স্টার্ডিকে চিঠি দিয়েছিলেন। ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ২৮ জুনের চিঠিতে দেখি নিবেদিতা আশা করছেন ইতিমধ্যে স্টার্ডি স্বামীজীদের বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থার ব্যাপারে ম্যাকলাউডের পত্রও পেয়ে গিয়েছেন।[৩৩] যাই হোক, স্টার্ডি জাহাজের ঠিকানায় পোর্ট সৈয়দে স্বামীজীকে পত্র লিখলেন। স্টার্ডির এই পত্রটি পাওয়া যায়নি। তবে পত্রটি পেয়ে পোর্ট সৈয়দ থেকে ১৪ জুলাই তারিখে স্টার্ডিকে স্বামীজী যে উত্তর দিয়েছিলেন তা থেকে মনে হয় যে, স্টার্ডি তাঁকে লণ্ডনে কাজ করার জন্য সহৃদয় আমন্ত্রণই জানিয়েছিলেন এবং স্বামীজী স্টার্ডিকে পূর্বের মতো তাঁর অনুবর্তী, স্নেহপরায়ণ ও বেদান্ত-আন্দোলনের ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতায় উন্মুখ দেখবেন বলে আশা করেছিলেন। স্বামীজীর পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশ :

'…তুমি নিশ্চয়ই জান যে, উপস্থিত লণ্ডনে আমার বন্ধুদের অনেকেই নেই। তাছাড়া মিস ম্যাকলাউড আমায় [আমেরিকা] যাবার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডে থাকা যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে না। অধিকন্তু আমার আয়ু ফুরিয়ে এল—অন্তত আমাকে এটা সত্য বলে ধরে নিয়েই চলতে হবে। আমার বক্তব্য এই যে, আমরা যদি আমেরিকায় সত্যই কিছু করতে চাই, তবে এখনি আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত প্রভাবকে যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলেও অন্ততঃ একমুখী করতেই হবে। তারপর মাস কয়েক পরেই আমি ইংলণ্ডে ফিরে আসার অবকাশ পাব এবং ভারতবর্ষে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত একমনে কাজ করতে পারব।

'আমার মনে হয়, আমেরিকার কাজকে গুছিয়ে আমার জন্য তোমার আসা একান্ত প্রয়োজন। অতএব যদি পার তো আমার সঙ্গেই তোমার চলে আসা উচিত। তুরীয়ানন্দ আমার সঙ্গে আছে।…তুমি যদি আমেরিকায় নাও আসতে পার, তবু আমার যাওয়া উচিত—কি বল ?'

আমাদের অনুমান, স্টার্ডি তাঁর চিঠিতে স্বামীজী এবং তুরীয়ানন্দজীর থাকার ব্যাপারে স্বামীজীকে কিছু লেখেননি। কিন্তু স্বামীজী তাতে কোন গুরুত্ব দেননি। কারণ স্টার্ডির মনের পরিবর্তন সম্পর্কে অনবহিত স্বামীজী শিষ্যের প্রতি বেহিসেবী বিশ্বাসে ধরেই নিয়েছিলেন স্টার্ডির সে-সম্পর্কে আলাদাভাবে লেখা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু স্টার্ডি স্বামীজীর লণ্ডনে থাকার কোন ব্যবস্থা না করে এবং সে-সম্পর্কে স্বামীজীকে কিছু না জানিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ওয়েলস-এ সপরিবারে বেড়াতে চলে গেলেন। মিসেস বুলকে স্টার্ডি ৮ জুলাই অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে এবং অভদ্রভাবে লিখলেন : 'আমরা ১০ জুলাই ওয়েলস চলে যাচ্ছি।…স্বামীজীর সম্পর্কে আর কোন খবর জানি না। শুধু জানি মিস নোবল [নিবেদিতা], তুরীয়ানন্দ এবং "চক্রবর্তী" উপাধিধারী সারদানন্দের এক ভাইকে নিয়ে—যিনি, আমার ধারণা, একজন "গৃহস্থ"—রওনা হয়েছেন। স্বামীজী কি করতে চান, কোথায় তিনি উঠবেন ইত্যাদি আবিষ্কার করার দায়িত্ব সময়ের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি।' অর্থাৎ স্টার্ডি যে আর স্বামীজীর কাজে কোন সহযোগিতা করবেন না তা মিসেস বুলকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু স্বামীজীকে সরাসরি তা জানানোর সাহস তথনও তিনি করে

৩৩ Letters of Sister Nivedita, pp. 170, 173

উঠতে পারেননি। তাই তাঁকে ওয়েলস-এ পালিয়ে যেতে হল। স্টার্ডি তো নিবেদিতা এবং ম্যাকলাউডের চিঠিতে জেনেছেন যে, স্বামীজী সরাসরি লণ্ডনেই আসছেন। তা সত্ত্বেও তিনি অতঃপর ঐ চিঠিতে লিখলেন: 'যদি তাঁরা সরাসরি লণ্ডনে আসেন তাহলে ২৭ জুলাই তাঁদের পৌঁছবার কথা—যে-সময়টা এখানে সবচেয়ে বাজে সময় যখন সবাই শহরের বাইরে এবং সমুদ্রের দিকে চলে যাবে।...' এত নিরাসক্তির পর একই পত্রে আবার স্বামীজীর সম্পর্কে কিছুটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন স্টার্ডি। লিখলেন: '[গত ফেব্রুআরি-মার্চে] আপনার এবং মিস ম্যাকলাউডের এখানে আসার ব্যাপারটা আমাদের সকলের অন্তরেই আনন্দদায়ক স্মৃতি হয়ে রয়েছে। ভাবতে ভাল লাগে সেইসব ঘটনা ও সূত্রের কথা যা আমাদের গোল টেবিলে ঘুরে ফিরে এসে আমাদের সবাইকে আত্মিক দিক দিয়ে কাছে নিয়ে আসত যেগুলির কেন্দ্রমণি ছিলেন স্বামীজীই।'[৩৪]

অধ্যাপক রাইট এক সময় স্টার্ডির সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীকে লিখেছিলেন: 'লোকটির চরিত্র বটে!'[৩৫] বাস্তবিক স্টার্ডি এক বিচিত্র চরিত্র। স্টার্ডি জানতেন, মিসেস বুল নামক ঐ মহিলাটি প্রচুর ধনী এবং স্বামীজী সম্পর্কে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। স্টার্ডি হয়তো ভাবছিলেন, তাঁর নিজের স্বার্থে স্বামীজীর সঙ্গে বিচ্ছেদ প্রয়োজনীয় হলেও ঐ ধনী মহিলাকে চটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই স্বামীজী সম্পর্কে শেষে একটু আবেগ প্রকাশ করে তাঁকে খুশি করতে চাইলেন। আসলে স্টার্ডি বুঝতে পারছিলেন না মিসেস বুলের কাছে স্বামীজী সম্পর্কে কতখানি উষ্মা প্রকাশ করা উচিত হবে। হয়তো স্বামীজী সম্পর্কে প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করে দেখছিলেন তাতে মিসেস বুলের কি প্রতিক্রিয়া হয়। প্রতিক্রিয়া তাঁর (স্টার্ডির) অনুকূলে হলে স্বামীজীর একজন বিশিষ্ট ভক্তকে তাঁর দলে পাওয়া যাবে—স্টার্ডির এরকম পরিকল্পনা থাকতে পারে।

স্টার্ডি যে ওয়েলস চলে যাচ্ছেন একথা তিনি স্বামীজীকে সম্ভবতঃ জানাননি। হয়তো জানানোর সাহস সঞ্চয় করতে পারেননি। তবে নিবেদিতাকে তিনি তা জানিয়েছিলেন। একথা নিবেদিতার ২১ জুলাই জাহাজ থেকে ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠিতে পাই। বলা বাহুল্য, খবরটি পেয়ে নিবেদিতা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। স্বামীজী এবং তুরীয়ানন্দজী কোথায় তাহলে উঠবেন, প্রভৃতি চিন্তা তাঁকে পীড়িত করছিল।[৩৬] কিন্তু স্বামীজীকে স্টার্ডির এই চিঠির কথা তিনি জানিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। সম্ভবতঃ জানাননি। কারণ তাতে স্বামীজীর উদ্বেগই শুধু বৃদ্ধি করা হত। সুতরাং ৩১ জুলাই স্বামীজী লণ্ডনে জাহাজঘাটায় পৌঁছে স্টার্ডিকে দেখবেন আশা করেছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন স্টার্ডি শুধু যে উপস্থিত নেই তা নয়, তাঁদের বাসস্থান প্রভৃতির কোন ব্যবস্থাও তিনি করে রাখেননি, তখন লণ্ডনের সেই 'বাজে' সময়ে স্বামী তুরীয়ানন্দকে নিয়ে স্বামীজী যে কিরকম বিব্রতবোধ করেছিলেন তা অনুমান করা যায়। অবশ্য শ্রীনিবেদিতার পরিবারের চেষ্টায় উইম্বলডনে একটি হোটেলে স্বামীজীদের থাকার ব্যবস্থা হল। স্টার্ডির দায়িত্বহীনতায় স্বামীজী যে বিশেষ আহত হয়েছিলেন তা বলা বাহুল্য।

স্বামীজী ইংলণ্ডে পক্ষকাল থেকে ১৬ অগস্ট

৩৪ 'Second Visit', pp. 61-62

৩৫ Prabuddha Bharata, June, 1973, (উদ্ধৃত : 'Swami Vivekananda in Boston, March, 1896' by Marie Louise Burke).

৩৬ Letters of Sister Nivedita, p. 189

আমেরিকা চলে যান। এই সময় স্টার্ডি অবশ্য ওয়েলস থেকে এসেছিলেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে। স্বামীজীর সঙ্গে সামনাসামনি তিনি ভাল ব্যবহারই করেছিলেন। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব। অথচ স্বামীজী লণ্ডনে আসার ঠিক আগেই স্টার্ডি মিসেস বুলকে আরও একটা চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, স্বামীজীকে মিসেস বুল, মিস মূলার, স্টার্ডি প্রভৃতি কাজের জন্য যে অর্থ দিয়েছিলেন স্বামীজী তা যথেচ্ছভাবে খরচ করেছেন, এমনকি সেই টাকাতে নিজের মায়ের জন্য বাড়ি কিনেছেন। মিস মূলারের রটনায় স্টার্ডি কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তা এ থেকে বোঝা যায়। স্বামীজী লণ্ডনে আসার দু-একদিনের মধ্যে মিসেস বুলের যে চিঠি পান তাতে মিসেস বুল স্টার্ডির ঐ অভিযোগের কথা স্বামীজীকে জানিয়েছিলেন। স্টার্ডির উদ্দেশ্য এখানে স্পষ্টতই মিসেস বুলকে স্বামীজীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা। উইম্বলডন থেকে ৬ অগস্ট স্বামীজী মিসেস বুলকে যে উত্তর দেন, তাতে লেখেন :

'স্টার্ডির ঠিকানায় পাঠানো আপনার পত্র পেলাম। আপনার সহৃদয় কথাগুলির জন্য আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।...কাকিমা, যাঁকে আপনি দেখেছেন, আমাকে ঠকানোর এক গভীর ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং তিনি ও তাঁর লোকজন আমাকে ৬০০০ টাকায় অর্থাৎ ৪০০ পাউণ্ডে একটি বাড়ি বিক্রী করার ছল করেছিলেন আর আমি সরল বিশ্বাসে তা আমার মায়ের জন্য কিনি। পরে, তারা আমায় দখল দেয়নি; ভেবেছিল, আমি সন্ন্যাসী, লোকলজ্জার ভয়ে জোর করে দখল করার জন্য কোর্টে যাব না।

'আপনি ও অন্যান্য ব্যক্তিরা যে-টাকা আমাকে কাজের জন্য দিয়েছিলেন, তা থেকে একটি টাকাও খরচ করেছি বলে আমার মনে হয় না। আমার মাকে সাহায্যের সুস্পষ্ট ইচ্ছা জানিয়ে ক্যাপটেন সেভিয়ার আমাকে ৮০০০ টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকাও মনে হয়, জলেই গেছে। এর বাইরে আমার পরিজনের জন্য অথবা এমনকি আমার ব্যক্তিগত খরচের জন্যও আর কিছুই খরচ করা হয়নি। আমার খাওয়া প্রভৃতির খরচ খেতড়ির রাজা দিতেন আর তা থেকে অর্ধেকের বেশি প্রতি মাসে মঠে যেত। একমাত্র যদি ব্রহ্মানন্দ [কাকিমার বিরুদ্ধে] ঐ মামলা বাবদ কিছু খরচ করে থাকে, কারণ এভাবে আমি নিশ্চয়ই লুণ্ঠিত হতে পারি না—যদি সে তা করে থাকে তবে, যেমন করেই হোক আমি তা পূরণ করে দেব, যদি তা করতে বেঁচে থাকি।

'ইউরোপ এবং আমেরিকায় কেবল বক্তৃতা করে যে টাকা পেয়েছি, তা আমি আমার ইচ্ছা-মতো খরচ করেছি, কিন্তু কাজের জন্য যা পেয়েছি তার প্রতিটি পাই-এর হিসাব রাখা হয়েছে ও তা মঠে আছে এবং সমস্ত ব্যাপারটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার থাকাই উচিত।'

১০ অগস্ট স্বামীজী মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখলেন : 'মিসেস বুলকে একটা হিসাব পাঠিয়ে দিও—কত টাকা জমি কিনতে, কত টাকা বাড়ি করা বা মেরামতিতে, কত টাকা অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাতে, ইত্যাদি।' হিসাবপত্রে যাতে কোনক্রমে ভুল না থাকে সেজন্য ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে সুস্পষ্ট-ভাবে নির্দেশ দিলেন ঐ একই পত্রে : 'তুমি টাকা-কড়ির বিষয় কমিটির সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ করে কাজ করবে। কমিটির সই নেবে প্রত্যেক খরচের জন্য। নইলে তুমিও বদনাম নেবে আর কি! লোকে টাকা দিলেই একদিন না একদিন হিসাব চাইবেই—এই তো নিয়ম। প্রতি পদে সেটি তৈরি না থাকা খুবই অন্যায়।...মঠে যারা আছে তাদের সবাইকে নিয়ে একটি কমিটি করবে, আর প্রতি খরচ তারা সই না দিলে হবে না —একদম!' স্বামীজী এর আগেও বার বার হিসাবপত্র যথাযথভাবে রাখার জন্য গুরুভাইদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং গুরুভাইরা সে নির্দেশ পালন করেছেন। [ক্রমশঃ]



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

সনাতন আদর্শ ত্যাগ ও সেবা

ভারতের সনাতন আদর্শ ত্যাগ ও সেবা সেই কোন্ সুপ্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে। শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি মহাভারতে অপূর্ব সেই কাহিনী শুনিয়েছেন আমাদের।

পুরাকালে কুরুক্ষেত্রে মুদ্গল নামে এক ধর্মাত্মা, সত্যপরায়ণ ও সংযতচিত্ত মুনি ছিলেন। তিনি নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান ও অতিথিসেবায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। তিনি কপোতের মতো শিলোঞ্ছ-বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতেন—অর্থাৎ, ফসল তুলে নেবার পরে ক্ষেতে যা কয়েক কণা শস্য পড়ে থাকত, তাই কুড়িয়ে নিয়ে তিনি সংসার চালাতেন। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে পনের দিনে একদিন মাত্র তিনি আহার করতেন। প্রত্যেক অমাবস্যা-পূর্ণিমায় তিনি যাগ এবং অতিথিদের অন্নদানের ব্যবস্থা করতেন। অতিথিসেবার পরে যে অন্ন অবশিষ্ট থাকত, তা নতুন অতিথির আগমন হলেই আবার বৃদ্ধি পেত। তিনি এইভাবেই বছরের পর বছর ব্রতপালন ও অতিথিসেবাদি সেরে, অবশিষ্ট অন্ন নিজ পরিবারের সব্বাইয়ের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন।

দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে এসে এই মহাত্মা মুদ্গলমুনির প্রত্যেক যজ্ঞের ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করতেন। এই সংবাদ ক্রমশঃ দুর্বাসামুনির কাছে গিয়ে পৌছাল। দিগম্বর মুণ্ডিতমস্তক দুর্বাসা একদিন কটুবাক্য বলতে বলতে উন্মত্তের ন্যায় মুদ্গলমুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই তিনি বললেন: মুনিবর! আমি আজ আপনার অতিথি। আমি ক্ষুধার্ত। আমাকে অন্ন দিন।

মুদ্গলমুনি তাঁকে সাদর আপ্যায়ন করে, অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন: হে মুনিবর! আমার সৌভাগ্য যে আজ আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। যা হোক, বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে তিনি ক্ষুধার্ত ও ক্রোধোন্মত্ত দুর্বাসামুনিকে ভোজন করালেন।

দুর্বাসামুনি পরিবেশিত সমস্ত অন্ন তো খেলেনই, পরে থালায় লেগে থাকা সবটুকু উচ্ছিষ্ট অন্নও নিজের গায়ে মেখে ফেললেন। অবশিষ্ট একটা দানা অন্নও আর ঘরে রইল না যা দিয়ে মুদ্গলমুনি ও তাঁর স্ত্রী-পুত্র ক্ষুধার নিবৃত্তি করবেন। দুর্বাসামুনি চলে গেলেন। কিন্তু এতে মুদ্গল-মুনির কোন রকম রাগ বা বিরক্তি হল না। তিনি ছিলেন সদা প্রসন্ন। কোন ঘটনাই তাঁকে বিচলিত করত না। তিনি এইভাবে সপরিবারে অনাহারে থেকে পনের দিন ধরে আবার ধানক্ষেতের পতিত শস্য সংগ্রহ করতে থাকেন। দ্বিতীয় পর্বকাল উপস্থিত হলে সেই দুর্বাসামুনি পুনরায় এসে সমস্ত অন্ন খেয়ে ও গায়ে মেখে চলে গেলেন। মুদ্গল-মুনি এবারও তাঁকে হাসিমুখে খাইয়ে দাইয়ে নিজেরা অভুক্ত রইলেন। দুর্বাসামুনি এই রকম পর্বদিনে মুদ্গলমুনির আশ্রমে এসে ছ-বার সমস্ত অন্ন খেয়ে গিয়েছেন। প্রত্যেক বারই মুদ্গলমুনি হাসিমুখে অতিথিসেবা করেছেন এবং অন্নাভাবে সপরিবারে অভুক্ত থেকেছেন।

ছ-বারের শেষবারে দুর্বাসামুনি যখন দেখলেন—এবারও মুদ্গলমুনি রাগ-দ্বেষ-হিংসা বর্জিত হয়ে, নির্বিকারচিত্তে প্রসন্নবদনে তাঁকে খাওয়ালেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন :

হে মুনিবর! আপনার আতিথেয়তা এবং তিতিক্ষা দেখে আমি মুগ্ধ। আপনার তুল্য সেবা-পরায়ণ ব্যক্তি জগতে আর নেই। এই কর্ম দ্বারা যে পুণ্যার্জন করেছেন, তার দ্বারা আপনি সশরীরে স্বর্গে যাবেন।

এই বলতে না বলতেই স্বর্গ থেকে দেবদূতেরা মুদ্গলমুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা মুদ্গলমুনিকে অভিবাদন করে বললেন :

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি সেবা দ্বারা অসামান্য পুণ্যফল লাভ করেছেন। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এসেছি।

সংযতচিত্ত, বিনয়ী ও সেবাপরায়ণ মুদ্গলমুনি বললেন :

নমস্কার বৎসগণ! আপনারা আমাকে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছেন—জেনে সুখী হলাম। আগে আমাকে স্বর্গের দোষ-গুণ সবিস্তার বলুন

দেবদূতদের মধ্যে একজন তখন উত্তর দিলেন:

হে মুনিবর! তবে প্রথমে শুনুন স্বর্গের গুণের কথা। যাঁরা ধর্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল, যাঁরা ন্যায়-যুদ্ধে নিহত, তাঁরাই স্বর্গবাসের অধিকারী, মর্ত্যবাসী সাধারণ মানুষের মতো তাঁদের সুখ-দুঃখ নেই, মোহ-রাগ-দ্বেষ-হিংসা নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। স্বর্গে শুধু অনাবিল আনন্দ। তাছাড়া তেত্রিশ জন ঋভু আছেন, যাঁদের স্থান আরও উচ্চে, দেবতারাও তাঁদের পূজা করেন।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দান এবং তপস্যার প্রভাবে আপনি ঋভুদের স্থানে যাওয়ার অধিকারী হয়েছেন। এবার শুনুন স্বর্গের দোষের কথা, হে মুনিবর! পুণ্যফল ভোগের জন্য মানুষ স্বর্গে যায়। পুণ্যফল যখন ক্ষয় হয়ে যায়, তখন আবার তাকে এই মর্ত্যভূমিতে ফিরে আসতে হয়। অর্জিত পুণ্য-ফলের দ্বারা যে স্বর্গলাভ হয়, তা চিরস্থায়ী নয়। জগতের মানুষের তুলনায় বহু বৎসর ওখানে সুখ-শান্তিতে বাস করতে পারা যায় বটে, কিন্তু চিরদিন থাকা যায় না। স্বর্গ ভোগভূমি, কর্মভূমি নয়। তাই কর্মের দ্বারা অর্জিত পুণ্যে বেশিদিন স্বর্গবাস হয় না।

দেবদূতের মুখে স্বর্গের দোষ-গুণের কথা শুনে মুদ্গলমুনি বললেন :

দেবদূতগণ! আমি আপনাদের স্বর্গে যেতে চাই না। অনিত্য সুখের কোন প্রয়োজন নেই আমার। আমি এমন স্থানে যেতে চাই, যেখানে গেলে সুখ-দুঃখময় এই পার্থিব জগতে আর ফিরে আসতে হয় না। সেই চেষ্টাই এখন আমি করব।

দেবদূতেরা অবাক হয়ে গেলেন—সাধারণ মানুষের একমাত্র কাম্য স্বর্গসুখকে এই মুদ্গলমুনি অতি তুচ্ছজ্ঞানে ত্যাগ করছেন! তাঁরা ত্যাগিশ্রেষ্ঠ মুদ্গলমুনির দিকে সসম্ভ্রমে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ এবং পরে তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করে তাঁরা ফিরে চলে গেলেন স্বর্গে।

এদিকে ধর্মাত্মা মুদ্গলমুনি অতি নিষ্ঠাসহকারে নিষ্কামভাবে ব্রতপালন এবং দানধ্যানাদি করতে লাগলেন জীবনের বাকী দিনগুলি। এইভাবে হিংসা-রাগ-দ্বেষ বর্জিত হয়ে, নিষ্কামকর্ম করতে করতে নির্মলচিত্ত হয়ে তিনি সেই পরম ধাম লাভ করলেন—যেখানে গেলে আর সুখ-দুঃখময় মর্ত্যভূমিতে ফিরে আসতে হয় না, যেখানে সুখ-দুঃখ নেই, জরা-ব্যাধি নেই—আছে চির আনন্দ। তিনি নির্বাণ লাভ করলেন—যা মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষিত

ভারতের এই-ই হচ্ছে চিরন্তন আদর্শ—সেবা ও ত্যাগ। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ তাই পুনঃ পুনঃ আমাদের স্মরণ করিয়েছেন: 'ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ দুইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত কর, তাহা হইলে অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনা আপনিই উন্নত হইবে।'

[মহাভারতের বনপর্ব দ্রষ্টব্য।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

উপায় : অভ্যাস ও বৈরাগ্য

জনৈক চঞ্চলচিত্ত তরুণ সংসার ছেড়ে এসে কোন সেবাশ্রমে যোগদান করে ত্যাগের পথ অবলম্বনে আগ্রহী হয়। কিন্তু প্রবল সংস্কার-প্রভাবে মনের বিক্ষেপ তাকে সে-পথে চলতে দারুণ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কাছে সেই তরুণ অকপটে তার মনের দুর্বলতাগুলি নিবেদন করলে, তিনি এক চিঠিতে যে উত্তর দিয়েছিলেন তাকে, শিক্ষা ও শক্তিপ্রদ সেই অমূল্য চিঠিটি এখানে প্রকাশিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মঠ : বাগবাজার, কলিকাতা থেকে লেখা পত্রের তারিখ : ১৯. ৭. ২৭। উল্লেখ্য যে বিভ্রান্ত ঐ তরুণ অতঃপর সংসারে ফিরে গিয়ে সৎগৃহস্থ রূপেই বাকী জীবন অতিবাহিত করেন।

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার ১৭ই জুলাইয়ের পত্র পাইলাম। সংসারের সকল প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া সাধুসঙ্গ এবং সাধুজীবন লক্ষ্য করিবার অবসর লাভ করিয়াও যদি ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য না কমে তাহা হইলে উহা আর কিরূপে কমিবে তাহা আমার জানা নাই। শ্রীভগবান গীতাতে বলিয়াছেন অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা মন বশীভূত হয়। যদি নিষ্ঠার সহিত শ্রীভগবানের সাধন ভজন করিয়া থাক এবং সংসারের দোষ দর্শন করিবার অবসর পাইয়া থাক, তাহা হইলে মন কেন বশীভূত হয় না? হয় অভ্যাস, বৈরাগ্য আচরণ কর নাই অথবা সংসারের দোষ দর্শন করিতে যেটুকু ভোগ করা আবশ্যক তাহা তোমার হয় নাই। অপরের কথায় খানিক বৈরাগ্য লাভ করিয়া হঠ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত কিছু হইবার নয়। হঠকারিতা বশতঃ আমাদের যে শক্তি আছে বলিয়া মনে করি তাহা অতি নগণ্য। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য আসিয়া এই কথাই বারংবার স্মরণ করাইয়া দেয়। সংসার ছাড়িবার পূর্ব্বে যে সকল কুঅভ্যাস অনেক দিন ধরিয়া করা যায় এবং ভোগ তৃষ্ণা তৃপ্তি করাই জীবনের উদ্দেশ্য এই ভাব লইয়া যত অধিক দিন জীবন যাপন করা যায়। সহসা সংসার ত্যাগ করিলে সে সব ভাব কি তৎক্ষণাৎ উলটাইয়া যায়? ঐ সব উলটাইতে হইলে চাই প্রবল বিশ্বাস, চাই হৃদয়ের ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার নিকট প্রার্থনা, চাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং তাঁহাকে ধরিয়া বারম্বার চেষ্টা। ঐ সকল যদি করিতে পার তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় পূর্ব্ব সংস্কার সকল শীঘ্রই হটিয়া যাইবে। তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। আর ঐ সকল যদি না করিতে পার তাহা হইলে বাটীতে ফিরিয়া সৎগৃহস্থ হইয়া কিছুদিন থাকাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয়। অধিক আর কি লিখিব, আশীর্ব্বাদ জানিবে। আমার শরীর ভাল আছে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ।

[পত্রের অনুলিপি-সংগ্রাহক—স্বামী দেবানন্দ]

জ্ঞান-বিজ্ঞান

ডায়াবেটিস কি বা কেন ?

আমরা অনেকেই 'ডায়াবেটিস' কথাটির সঙ্গে পরিচিত যার প্রচলিত বাঙলা প্রতিশব্দ 'বহুমূত্র'। ডাক্তারি ভাষায় রোগটির নাম 'ডায়াবেটিস মেলিটাস' (Diabetes melitus) ; এটি জানা ভাল এইজন্য যে, আর একটি অসুখ আছে 'ডায়াবেটিস ইন্সিপিডাস' (Diabetes insipidus) যাতে প্রস্রাব ও তৃষ্ণা বাড়লেও রক্তে শর্করা বাড়ার সঙ্গে কোন সংস্রব নেই।

ডায়াবেটিস কি ধরনের রোগ জানতে হলে আমাদের পরিপাক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটু প্রবেশ করতে হবে। খাদ্যদ্রব্যকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—প্রোটিন (Protein) বা আমিষ জাতীয়, কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) বা শ্বেতসারজাতীয় এবং ফ্যাট (Fat) বা স্নেহজাতীয়। ডায়াবেটিস শ্বেতসার খাদ্যের সঙ্গে অধিকতর সম্পর্কিত। এই খাদ্য অন্ত্রে (Intestine-এ) পরিপক্ক হয়ে গ্লুকোজ-শর্করা আকারে রক্তে ঢুকে সমস্ত দেহকোষে পৌঁছায়। দেহকোষগুলি অক্সিজেনের সাহায্যে গ্লুকোজকে দহন করে শরীরের তাপশক্তি উৎপন্ন করে। কিন্তু শর্করার কোষে প্রবেশ ও দহন নির্ভর করে ইন্সুলিন (Insulin) নামে একটি গ্রান্থ রসের উপর। কোষে শর্করার দহন হতে থাকলেও রক্তে সব সময়েই এটি নির্দিষ্ট পরিমাণে (১০০ মিলিলিটারে ৮০-১২০ মিলিগ্রাম) থাকে। রক্ত যখন বৃক্কে (Kidney) পরিশোধিত হয়, শর্করা রক্ত হতে বার হয়ে গেলেও বৃক্কের অন্য অংশে আবার রক্তে প্রবেশ করে, যার ফলে প্রস্রাবে শর্করা থাকে না।

উদরে পাকস্থলীর পিছনে প্যানক্রিয়াস (Pancreas) বা অগ্ন্যাশয় বলে একটি গ্রন্থি (gland) আছে যার একাংশের 'বিটা' (Beta) নামক কোষসমষ্টি ইন্সুলিন তৈরি করে। তা রক্তের মাধ্যমে দেহকোষে পৌঁছে। ইন্সুলিনের অভাবে দেহকোষগুলি উপরি-উক্ত দহনকার্য করতে পারে না এবং দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে। রক্তে শর্করার পরিমাণ তখন বেড়ে যায়। এই অবস্থায় : (ক) বৃক্কের মধ্যে পরিশোধিত অংশ হতে শর্করা রক্তে এর আধিক্যের (১০০ মিলিলিটারে ১৮০ মিলিগ্রামের অধিক) জন্য পুনঃ প্রবেশ করতে পারে না এবং প্রস্রাবে নির্গত হয়। তবে নির্গত হবার সময় রক্ত হতে জল ও বিভিন্ন প্রকারের লবণ জাতীয় পদার্থও সঙ্গে নিয়ে যায় এর ফলে প্রস্রাবের মাত্রা বাড়ে ও রোগী ঘন ঘন তৃষ্ণার্ত হয়। (খ) দেহকোষগুলির দহন কার্যের জন্য, শরীরের স্নেহজাতীয় পদার্থের ভাঙন শুরু হয়। ভাঙনের ফলস্বরূপ রক্তে ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) নামক রাসায়নিক পদার্থ বেড়ে যেয়ে লিভারে কিটোন (Ketone) বলে এক বিষাক্ত দ্রব্য তৈরি হয়। ব্যাপারটি আরও এগিয়ে গেলে স্নায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়ে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, যে অবস্থাকে 'ডায়াবেটিক কোমা' (Diabetic Coma) বলে। শরীরের জমা থাকা স্নেহজাতীয় পদার্থের ভাঙনের ফলে, রোগী ক্রমে শীর্ণ হতে থাকে। (গ) অন্যান্য উপসর্গ যেমন স্নায়ুর প্রদাহ (Neuritis), চোখে ছানি পড়া (Cataract) প্রভৃতিও দেখা যায়।

এ তো গেল কিভাবে রোগ হয়। কেন হয়, এর উত্তরে বলা যায় : (ক) কয়েক ক্ষেত্রে এটি বংশগত। মা-বাবার ডায়াবেটিস থাকলে, রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। (খ) বর্তমানে ধারণা হচ্ছে যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে জীব-পরমাণু (Virus) (বিশেষতঃ Coxsacki নামক ভাইরাস)-এর আক্রমণে প্যানক্রিয়াসের বিটা কোষ নষ্ট হতে

পারে। (গ) রক্তে ইন্সুলিন কোন কারণে নষ্ট হতে থাকলে, রোগ হতে পারে। (ঘ) কিছু কিছু ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় ও যকৃতের অসুখে এই রোগ হতে পারে। সাধারণতঃ এটি পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সের অসুখ। তবে ৪০ বৎসরের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস দেখা যায়—যাকে বলে জুভেনাইল ডায়াবেটিস (Juvenile Diabetes)। স্ত্রীলোকের মধ্যে, বিশেষতঃ অনেক সন্তান হবার পরে এবং মেদাধিক্য থাকলে, এ রোগ বেশি হয়। অতিভোজনের সঙ্গেও রোগের কিছুটা সম্পর্ক আছে।

ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় খাদ্যনিয়ন্ত্রণ, বিশেষতঃ চিনি, ভাত প্রভৃতি শ্বেতসার খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ, মানসিক উত্তেজনাকর কাজ কমানো, নিয়মিত ভ্রমণ প্রভৃতি করতে বলা হয়। বেশি বয়সে রোগ দেখা দিলে সালফোন-ইউরিয়া বা ঐ ধরনের ওষুধ খাইয়ে প্যানক্রিয়াসের ইন্সুলিন উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো হয়, তবে জুভেনাইল ডায়াবেটিসে ইন্সুলিন অপরিহার্য। চিকিৎসায় যে ইন্সুলিন ইনজেকসন দেওয়া হয়, তা অন্য প্রাণীর প্যানক্রিয়াস থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে কৃত্রিম রাসায়নিক উপায়ে এবং ল্যাবরেটরিতে ব্যাকটিরিয়া (Bacteria)-কে এর উৎপাদনে লাগানোর চেষ্টা চলছে। শেষোক্ত উপায়ে তৈরি ইন্সুলিনের দাম অনেক কম হবে।

পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে অকারণে ওজন হ্রাস, এবং রাত্রে বেশি বার প্রস্রাব হলে সকলেরই এই রোগের সম্ভাবনার কথা ভাবা উচিত।

দেশ-বিদেশ

অরুণাচলের অধিবাসী : সুলুং

সুবনসিরি জেলার আর একটি উপজাতি সুলুং। পূর্বে এই উপজাতি 'সুলু' নামে পরিচিত ছিল। পার্ নদীর উত্তরে গভীর জঙ্গলে এদের বসবাস। এই ঘন জঙ্গলে বাইরে থেকে প্রবেশ করা খুব কঠিন। সুলুং উপজাতিদের দেখলে মনে হয়, এরা এই অঞ্চলের অন্যান্য উপজাতিদের থেকে প্রাচীন। পূর্বে এরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে যাযাবরের মতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াত খাবারের সন্ধানে। কারণ তখন তারা কৃষিকাজ জানত না। ধীরে ধীরে তারা হাতের কাজ শিখে নেয় প্রতিবেশী অন্যান্য উপজাতিদের কাছ থেকে। তারা ভাল জুতো তৈরি করতে এবং পিতলের কাজও শিখে ফেলে।

পূর্বে সুলুংরা দফ্‌লাদের অধীনে বসবাস করত, কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতিকে বজায় রাখার জন্য পরে তারা আলাদা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ভুটান সীমান্ত থেকে সুবনসিরির পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এদের বাস। এই অঞ্চলটির উচ্চতা ৯১৪ থেকে ২১৩৪ মিটার।

সুবনসিরি অঞ্চলে যে-সব উপজাতিরা বাস করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন উপজাতি সুলুংরা হলেও, পরে আগত বসবাসকারী দফ্‌লা, আপ তানি, হিল মিরি প্রভৃতি উপজাতিরা ক্রমশঃ তাদের জায়গা জোর করে দখল করে নিয়ে তাদের ঠেলতে ঠেলতে একটা ছোট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে।

দফ্‌লাদের সঙ্গে সুলুং উপজাতির অনেকাংশে মিল আছে দেখতে পাওয়া যায়। তবে তাদের থেকে দফ্‌লারা একটু বেশি অহঙ্কারী ও উদ্ধত। বুদ্ধিবৃত্তিতে সুলুংরা তাদের থেকে একটু উন্নত, এটা দফ্‌লারা স্বীকার করে, তবু তারা সুলুংদের নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে। তাই দেখা যায়, দফ্‌লাদের প্রভাব তাদের উপর বেশি। দফ্‌লারা

তাদের ক্রীতদাসের মতো দেখে। তাদের দিয়ে জমিজমা চাষ করিয়ে নেয়।

সুলুংরা 'ঝুম' চাষী। একদিকে তারা যেমন বাড়ি তৈরি করে সাজিয়ে-গুছিয়ে বসবাস করে, আবার অন্যদিকে পূর্বের সহজাত অভ্যাসবশে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায় খাবার সংগ্রহ ও শিকারের জন্য।

দফ্‌লা প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিবেশী উপজাতিদের দেখাদেখি তারা চাষবাস করা শিখেছে। এখন তারা ঋতু অনুযায়ী চাষ করার দক্ষতা অর্জন করেছে। তারা দু-রকমের ধান চাষ করে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ধান রোপণ করে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে তা কাটে। ধান ছাড়াও ভুট্টা, বজরা ও কিছু শাক-সবজির চাষও তারা করে। তারা মুরগী ও কুকুর পোষে। শিকারের সময় সাহায্য করে বলে তারা কুকুর পোষে।

অতীতে উত্তর-পূর্ব হিমালয়ের উপজাতিরা যখন ধানের চাষ জানত না, তখন তাদের প্রধান খাদ্য ছিল সাগু। পাহাড়-জঙ্গল ঘুরে ঘুরে এই সাগু সংগ্রহ করে তারা জীবিকানির্বাহ করত। সুলুংরা ঘর ছেড়ে সাগুর সন্ধানে বহুদূর পর্যন্ত যেত। বর্তমানে তারা যেখানে বাস করে তার পাশে সাগুর চাষ করে। এখন তারা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বহু জায়গায় সাগু সরবরাহ করে।

সুলুংদের সাগু তৈরি করার পদ্ধতি এইরূপ :

প্রথমে তারা তালগাছের ছোট গুঁড়ি নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে তার ভিতর থেকে সারাংশটা বের করে নেয়। এ-সব করতে খুব শক্তি-সামর্থ্যওয়ালা লোকের প্রয়োজন। যাই হোক, তালগাছের সারাংশটা বের করে নিয়ে, পাথরের উপর রেখে মুগুর দিয়ে পিষে ফেলে। তারপর পেষা বস্তুটি মেয়েরা একটা পাত্রে ভাল করে ধুয়ে মাদুরের উপর মেলে দেয়। পরিষ্কার-করা পদ্ধতিটি শ্রমসাধ্য। পেষা বস্তুটি বেশ ভাল করে ধুতে হবে যতক্ষণ না বাজে আঁশগুলি আলাদা হয়। তারপর সেটাকে নিয়ে বালির বস্তার মতো দেখতে বেতের ছাঁকনিতে একটা মোটা লাঠি দিয়ে ঘুঁটতে হবে অন্ততপক্ষে তিনবার। শেষ পর্যন্ত রৌদ্রে শুকিয়ে তৈরি হয় মোটা হলুদ রঙের ময়দা। খাওয়ার আগে এটাকে আগুনে ছেঁকে এক রকম চিট্ চিটে পিঠার মতো তৈরি করে।

যখন শস্যের অভাব ঘটে এবং তালগাছ পাওয়া যায় না, তখন সাগু নিষ্কাষণ করে তারা ফার্ণ জাতীয় গাছের সার থেকে। সাগু তৈরি করার পদ্ধতি একই।

সুলুংরা মাঝে মাঝে সপরিবারে বেরিয়ে পড়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খাবার সংগ্রহের অভিযানে। তবে সত্যি কথা বলতে কি তারা সাগুর অনুসন্ধানেই যায়। যে-সব এলাকায় তারা সাগুর সন্ধান পায়, তারই নিকটবর্তী জায়গায় তারা অস্থায়ী শিবির স্থাপন করে বাস করে। মেয়েরা শিকারে বেরোয় না, তারা শিবিরে সন্তানাদি লালনপালন করে এবং পার্শ্ববর্তী জায়গায় শাক-সবজি প্রভৃতির সন্ধান করে। এই অভিযান স্থায়ী হয় যতদিন সাগুর সন্ধান পাওয়া যায় ঐ

দফ্‌লাদের প্রচণ্ড প্রভাবের ফলে ধীরে ধীরে সুলুং উপজাতিদের সংস্কৃতি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে বলা চলে। তারা এখন দফ্‌লাদের সংস্কৃতি মেনে চলে। যেমন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান দফ্‌লাদের মতো একই। তারা মৃতদেহের কবর দেয় বাড়ির নিকটবর্তী জায়গায়। সেই জায়গাটিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখে এবং তার মাঝখানে একটা খুঁটি পুঁতে তার মাথায় পুঁটলি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয় মৃতব্যক্তির জীবিতাবস্থায় ব্যবহৃত জিনিসপত্র।

সুলুং উপজাতির বিস্তৃত বিবরণ এখনও যথেষ্ট অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

সমালোচনা

সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (৪র্থ খণ্ড)—ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ। প্রকাশক: প্রাচী পাব্‌লিকেশন্‌স্‌, ৩ ও ৪ হেয়ার স্ট্রীট (তেতালা), কলিকাতা ৭০০-০০১। প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৮২। পৃষ্ঠা ৮+১৬৪। মূল্য: চোদ্দ টাকা।

চৈতন্যচরিতামৃতে পড়িয়াছি: 'যাঁহারে হেরিলে হৃদে স্ফুরে কৃষ্ণ নাম / তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান।'—তিনিই সাধু, যাঁহার সান্নিধ্য মনে ঈশ্বরভাব উদয় করায়। 'মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।···সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।'—বলিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই দুস্তর শোক-দুঃখময় সংসারকে অতিক্রম করিবার একটি মহত্তম অবলম্বন সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ। সৎসঙ্গ না হইলে ভগবৎ-জ্ঞান, ঈশ্বরে প্রেম হৃদয়ে কখনই উদিত হয় না—'বিনু সতসঙ্গ বিবেক ন হোঈ'! নারদমুনি তাঁহার ভক্তিসূত্রে মহাজন-সঙ্গের মহিমা ব্যাখ্যা করিয়াছেন: 'মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ'! ঐ দুর্লভ অথচ অগম্য ও অমোঘ মহৎজনসঙ্গ জীবকে পরাভক্তির, পরমা শান্তির যোগ্য করিয়া গড়িয়া তোলে সবার অলক্ষ্যে!—'মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব'! সাধকজীবনে তাই সাধু-দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ একটি অত্যাবশ্যক সোপান। শত শাস্ত্রপাঠ করিয়াও যে জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, যথার্থ সাধুসঙ্গ হইতে ততোধিক জ্ঞান সহজে লাভ হয়···তাঁহাদের কৃপার এমনই মহিমা। সাধু যেন নিদাঘের শীতল বারি, যাহার সঙ্গ ও স্পর্শ তৃষিত ও তাপতপ্ত জীবনকে মধুময় করে।

ভারতবিশ্রুত মনীষী মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় এগার জন মহাত্মার সঙ্গ ও ব্যক্তিগত আলাপের বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মুখ্যতঃ 'শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসে'র অলৌকিক শক্তি-প্রকাশের (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম, বিনা মাধ্যমে কাপড় পার্সেল ইত্যাদি) ইতিবৃত্ত তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা জুড়িয়া বর্ণিত। মায়াচৈতন্যজী, সন্তদাস বাবাজী, সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথজী, সত্যসাঁইবাবা প্রমুখ অবশিষ্ট দশ জনের সহিত আলাপাদি ও বিভূতি প্রকাশের কাহিনী সর্বমোট একান্ন পৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত। ইহা ছাড়া ডঃ কবিরাজ লিখিত দুইটি পুস্তকের ভূমিকা 'নাদতত্ত্ব' ও 'বৌদ্ধতন্ত্র' ইহাতে স্থান পাইয়াছে—যাহা পুস্তকের প্রায় অর্ধেক (৭০) পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া আছে। বিষয় দুইটি 'এত জটিল' যে সবিশেষ পাণ্ডিত্য বা জ্ঞান ছাড়া ঐ তথ্যসমৃদ্ধ ও গুরুগম্ভীর আলোচনা হইতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে কিছু বুদ্ধিগম্য করা অতি আয়াসসাপেক্ষ ব্যাপার।

'জ্ঞানগঞ্জে'র অলৌকিক কাহিনী, সূর্য-বিজ্ঞান-রশ্মিবিজ্ঞানের যুক্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও বারংবার উপস্থাপনা পাঠকের মনকে ভগবৎ-প্রেমে বা ঈশ্বর-দর্শনের উদ্দীপনায় মাতাইয়া না দিলেও অলৌকিক শক্তি দর্শনেচ্ছু ও বিভূতিকামী মানুষকে ঐ জগতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহায্য করিবে—যথেষ্ট তৃপ্তি দান করিবে। শাস্ত্রে পারঙ্গম ব্যক্তি ঐ 'বৌদ্ধতন্ত্র' ও 'নাদতত্ত্বে'র আলোচনা হইতে বিশেষ আনন্দ পাইবেন।

পুস্তকটির প্রচ্ছদ মনকে আকর্ষণ করে, যদিও ইহাতে অসংখ্য মুদ্রণ-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে।

—স্বামী সর্বদেবানন্দ

নিখিল মানব নন্দনে—কালীপদ মণ্ডল। বল্মীক প্রকাশন: ৫৭ এফ, গরচা রোড, কলকাতা-১৯। পৃঃ ৮৬; মূল্য: ছয় টাকা।

নয়নাভিরাম প্রচ্ছদে এ গ্রন্থটি ছোট বড় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার উপর পাতার পর পাতা উল্টে তরুণ শিল্পীর আঁকা ছবির সারি—

সেও লক্ষণীয় সৌন্দর্য। সুন্দর এ বইয়ের ভাব, ভাষা, বিষয়। শিক্ষাব্রতী শ্রীকালীপদ মণ্ডল এই গ্রন্থটির মাধ্যমে শ্রদ্ধা, রুচি ও মনুষ্যত্ব-আরাধনার সার্থক পরিচয় দিয়েছেন।

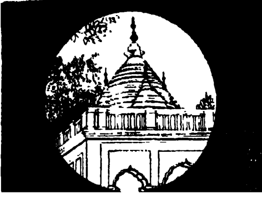
বিষয়বস্তু নানান মহাপুরুষের জীবনকথার প্রথম পর্ব। ভবিষ্যতের বনস্পতিরা কেমন করে প্রথম থেকেই নিজেদের মহিমার আভাস দিতে থাকে, তার সরল সুন্দর ভাষায় প্রকাশ এই কাহিনীমালা পাঠ করতে বড়দের যেমন ভাল লাগবে, ছোটরাও তন্ময় হবে।

বীরসিংহের সিংহশিশু, গাছের প্রাণের খোঁজে, বিদ্রোহী কিশোর (রামমোহন), বিপ্লবী ঋষি (শ্রীঅরবিন্দ), বাংলা মায়ের দামাল ছেলে (সুভাষচন্দ্র), প্রভাত রবির আলো (রবীন্দ্রনাথ), ভবিষ্যতের নেতা (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), নতুন যুগের চারণ (মুকুন্দ দাস), বাগবাজারের গিরিশ, কিশোর সাধক (রামপ্রসাদ), কিশোর মনীষী (হরিনাথ দে)—এই ক'জনের জীবন কথার প্রারম্ভপর্ব চিত্রময় ভাষায় লিপিবদ্ধ।

কালানুক্রমে জীবনকথাগুলি সাজানো হলে আরও শোভন হত। আমাদের মনে হয়, এ গ্রন্থের প্রথমে শ্রীচৈতন্য এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথা থাকলে পরিকল্পনাটি পূর্ণাঙ্গ হত। ঘটনাগত বিবরণ বা মন্তব্য সর্বত্র ইতিহাসসম্মত কিনা, পরবর্তী সংস্করণে তা পুনর্বিচার করা ভাল।

সে যাই হোক, সব মিলিয়ে গ্রন্থটি সাধুবাদের যোগ্য। বাংলার শিশুসাহিত্য লেখকের কাছে আরও প্রত্যাশা করবে।

—ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

মহারাষ্ট্রে বন্যা: বন্যাবিধ্বস্ত কোন্‌কান অঞ্চলে প্রাথমিক ত্রাণকার্য গত ২০ জুলাই হইতে বোম্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন শুরু করিয়াছে।

সৌরাষ্ট্রে বন্যা: বন্যাকবলিত এলাকায় শত শত জলবন্দী মানুষের জন্য গত ২৪ জুন হইতে ২০ জুলাই রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম বিমান হইতে ২০ হাজার খাবারের প্যাকেট নিক্ষেপ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও জুনাগড় ও পোরবন্দর অঞ্চলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫টি গ্রামের ৪,৭১৫টি পরিবারের মধ্যে শাড়ি, ব্লাউজ, কাপড়, কার্পেট, চাদর, বাসনপত্র, গুঁড়া দুধ, মোমবাতি, সাবান, দেশলাই প্রভৃতি বিতরণ করা হয়।

তামিলনাড়ুতে খরাত্রাণ: নট্টরাম্‌পল্লিতে বার মাস জল সরবরাহের জন্য নট্টরাম্‌পল্লি রামকৃষ্ণ মঠের পরিচালনায় ২টি গভীর কূপ খননের কার্য চলিতেছে। পাম্পের সাহায্যে তিন মাইলব্যাপী এলাকায় জল সরবরাহ করা যাইবে। ১৫ জুলাই এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন জেলা-সমাহর্তা।

পশ্চিমবঙ্গে খরাত্রাণ: পুরুলিয়া জেলায় ত্রাণকার্য পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের মাধ্যমে গত ৪ মে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিভাবে কার্য করা হইবে তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। সেই সঙ্গে পুরুলিয়ার ২ নম্বর অঞ্চলের লাদাবেরিয়া, বঙ্গবাড়ি, ছারা, ফোড়্‌লারা, নাদিহা, ভুমভুমি গ্রামে ৪টি পুষ্করিণী খনন ও ২টি গভীর নলকূপ বসানোর এক প্রকল্প হাতে লওয়া হইয়াছে। প্রকল্পটি আনুমানিক ৮০৭২ শ্রমদিবসে সমাপ্য। ইহা ছাড়াও গত জুন মাসে উপরি-উক্ত গ্রামগুলির ২০০ জন কৃষককে ধানের বীজ দেওয়া হইয়াছে।

ছাত্র-কৃতিত্ব

১৯৮৩-র উত্তরপ্রদেশ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হাই স্কুল পরীক্ষায় কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের ৪ জন ছাত্র ১ম, ২য়, ৫ম ও ৭ম স্থান অধিকার করিয়াছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার মিশন-বিদ্যালয়কে রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়রূপে স্বীকৃতির প্রতীকরূপে এক লক্ষ টাকা অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের ৪ জন ছাত্র ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম এবং পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের একটি ছাত্র ২০তম স্থান অধিকার করিয়াছে। মেঘালয় বিদ্যালয় শিক্ষা পর্ষদের এইচ্. এস. এল. সি. পরীক্ষায় চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশনের ২ জন ছাত্র সাধারণ তালিকা অনুসারে ৬ষ্ঠ ও ১০ম স্থান এবং আদিবাসী-তালিকা অনুসারে ১ম ও ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে।

১৯৮৩-র পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কলেজের ছাত্রগণ প্রথম ২০ জনের মধ্যে ১০টি (১ম, ২য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ১০ম, ১১শ, ১৪শ, ১৫শ, ১৭শ ও ১৮শ) স্থান অধিকার করিয়াছে। দিল্লী মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের একটি ছাত্র ১৫শ স্থান লাভ করিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৩-র বি. এসসি. পার্ট-টু পরীক্ষায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ছাত্রগণ পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ১ম, রসায়ন বিভাগে ২য় এবং গণিত বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে।

সুবর্ণজয়ন্তী

রামকৃষ্ণমিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সুবর্ণজয়ন্তীর সমাপ্তি উৎসব ২৪ হইতে ২৬ জুলাই বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্র এবং নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ২৪ জুলাই জয়ন্তী-অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীবি. ডি. পাণ্ডে। তিনি 'বিবেকানন্দ ইনস্টিট্যুট অব মেডিকেল সাইন্স'-এর নবনির্মিত ভবন, 'রামেশ্বর তান্তিয়া গবেষণাকেন্দ্র', একটি Deep X-রে ইউনিটেরও উদ্‌ঘাটন করেন। সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকাও রাজ্যপালের হাতে প্রকাশিত হয়।

উদ্বোধন-সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার গীতা অথবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

হুগলী-চুচুঁড়া শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ উৎসব কমিটির উদ্যোগে গত ১৮ ও ১৯ জুন দুইদিনব্যাপী এক সুচিন্তিত অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে ১৯ জুন এক যুব অধিবেশনেরও আয়োজন হইয়াছিল। স্বামী সত্যঘনানন্দ, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী সর্বাত্মানন্দ, স্বামী বিমলাত্মানন্দ, শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ বক্তাগণ আলোচনাদিতে অংশগ্রহণ করেন। একখানি স্মরণিকাও উৎসব-উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

বালুরঘাট (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা ও সংস্কৃতি তীর্থের উদ্যোগে গত ৯ হইতে ১১ জুলাই ১৯৮৩, তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন স্বামী সুমেধানন্দ, স্বামী বিকাশানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ। মাতৃদিবসে ভাষণ প্রদান করেন প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণা, প্রব্রাজিকা ধৃতিপ্রাণা প্রভৃতি।

যুবসম্মেলন

পশ্চিম রাজাপুর (কলিকাতা) শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৬ জুন এক যুব-শিবির পরিচালিত হয়। ৯২ জন তরুণ শিবিরে যোগদান করেন। ভাষণ প্রদান করেন ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য, শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী, শ্রীশিবশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীঅমিতাভ সান্যাল, প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা প্রভৃতি। উল্লেখ্য, সঙ্ঘের ব্যবস্থাপনায় ২১ জন তরুণ একটি রক্তদানপ্রকল্পও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্তা **শ্রীমতী নির্মলনলিনী দেবী** গত ১২ জুন ১৯৮৩, ৯১ বৎসর বয়সে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে তাঁহাদের 'নির্মলালয়' বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। বার্ধক্যের নানা উপসর্গে তিনি দীর্ঘকাল ভুগিতেছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পরলোকগত পতি উভয়ই শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজেরও পূতসঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। আজীবন ধর্মনিষ্ঠ, সাধু-অতিথিসেবাপরায়ণা এই বর্ষীয়সী মহিলা স্থানীয় সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

*

গত ১৯ জুন ১৯৮৩, শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্যা **শ্রীমতী প্রতিভা বসু** ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হইয়া ৬২ বৎসর বয়সে কলিকাতাস্থ ভবনে পরলোকগমন করেন। শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা, পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী বসুর পুত্রবধূ ছিলেন তিনি। তাঁহার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীঅজয়কুমার বসু।

প্রয়াত দুই মহিলাভক্তের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে শান্তিলাভ করুক—ইহাই প্রার্থনা।



মহিষমর্দিনী

(শ্রীনন্দলাল বসু-অঙ্কিত অপ্রকাশিত চিত্র)

শ্রীবিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে



৮৫তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৯০



আনন্দময়ীর আগমন

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

[পাক্ষিক 'উদ্বোধন' প্রথম বর্ষের অষ্টাদশ সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩০৬) প্রথম সম্পাদকের প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।]

মা আবার আমাদের দেখ্‌তে আস্‌ছেন। প্রিয়তম সন্তানদিগের নিকট স্নেহভরে ধেয়ে ধেয়ে আস্‌ছেন।—স্মরণ কর্‌লে আনন্দে হৃদয় ভোরে যায়। মা আমাদের কত দয়াময়ী! কতই স্নেহময়ী! প্রতি বৎসরেই আমাদিগকে না দেখ্‌তে এসে থাক্‌তে পারেন না। বেশী দিন ছেলেকে না দেখে কি থাক্‌তে পারেন? তাই মায়ের অত সজল নয়ন। স্নেহময়ী স্নেহে এত ভরা না হ'লে কি এ সকল অস্ফুট শুষ্ক সন্তানদিগের ভিতরে স্নেহের উদ্রেক ক'রে দিতে পারেন? মায়ের নিকট হ'তেই এত অবিরত ধারায় স্নেহ পাইয়া ত আমরা অপরকে কিঞ্চিৎ স্নেহের চোখে দেখ্‌তে শিখেছি।

মাকে অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি—কিছুই আশ্চর্য্য নয়; মা ছেলেকে কখনই ভুল্‌তে পারেন না। মা নিজে জানেন ছেলে কি বস্তু। ছেলে জানে না, "মা" কি বস্তু, মায়ের কত গুণ, মায়ের কত মহিমা; যদি জানতুম, আজ আমাদের এরূপ অবস্থা কি হ'ত? মা নিজে ছেলেকে গর্ভে ধরেছেন, প্রসব করেছেন, কত ক'রে মানুষ ক'রেছেন; ছেলে কি বস্তু, মা খুবই জানেন। না থাক্‌তে পেরে, এত হামেশা ছেলেকে মা দেখ্‌তে আসেন! এসে ভালবেসে, কত ভক্তি বিশ্বাস, কত ভালবাসা, উদারতা, কি অদ্ভুতরূপে অন্তরে অন্তরে শিখাইয়া যান। আহা! মায়ের সে ভালবাসার সে ক্ষমাশীলতার এক কণাও যদি পাই, মায়ের ছেলে ব'লে নিজেকে একদিনের তরেও সাধ মিটাইয়া পরিচয় দিই।

আমাদের মাকে ভাল ক'রে ঠাউরে ঠাউরে দেখেছেন? মার চোখ কত স্নেহে ভরা, জলে ছল ছল; মা কত আনন্দে ভরা, কাছে দাঁড়ালেই যেন শরীর মন হৃদয় সমস্ত এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মা আসবেন,—কত শত লোকে কত আনন্দ অনুভব করছেন; মাকে



দেখবো,—কত লোকে সমস্ত কায কর্ম্ম ফেলে ঝেলে দেশ দেশান্তর হ'তে চ'লে আস্‌ছেন। মাকে প্রাণ ভ'রে পূজা ক'র্‌ব—কত লোকে কত প্রকারের দ্রব্যাদি দূর দূর দেশ হ'তে সংগ্রহ ক'রে আন্‌ছেন। আজ ঘরে মা আস্‌বেন—কতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কত নূতন নূতন বেশ-ভূষা, কতই পরস্পর প্রীতিসম্ভাষণ, কত প্রকারেরই আনন্দ-উল্লাস হতেছে। কত লোকে, ঘরের মলা, বস্ত্রের মলা, শরীরের মলা, মনের মলা সব দূর ক'রে দিতেছেন। মা আস্‌বেন ;—দরিদ্র ও ধনী সমভাবে আনন্দে মত্ত হতেছেন। ধনীর প্রতিও যেমন স্নেহ, দরিদ্রের প্রতিও মার তেমনি স্নেহ। ধনীরও কথা যেমন শোনেন, গরীবের কথাও মা তেমনি শোনেন। গরীব, মায়ের কানে কানে ব'লে দিলেন, "মা, আবার আমার ঘরে এসো।" "আমার গরীব ছেলের আমি ছাড়া আর কেহই নাই"—ঠিক বৎসর যেতে না যেতে মা আবার স্নেহভরে এসে উপস্থিত। গরীব খেতে পায় না; তত্রাচ—মায়ের এমনি কৃপা—গরীব, মায়ের সাধের পূজা কেমন সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হন।

মায়ের উন্নত ছেলেরা বলেন, "আমাদের মা—এত ছোট মা নয়। আমাদের মা সর্ব্বব্যাপী। তাঁর আবার আগমন, আবাহন ও বিসর্জ্জন কি ? তাঁর আবার চাল কলা দিয়া পূজা কি ?"

আমাদের কিন্তু এতে মন ওঠে না। আমাদের মা সব রকমই হ'তে পারেন। "তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে, এবং এছাড়া আর কত কি হ'তে পারেন, তা কে জানে ?" তিনি অনন্ত, তাঁহার গুণ অনন্ত, মাহাত্ম্য অনন্ত, রূপও তাঁর অনন্ত। তিনি ভক্ত-বৎসল। অপার তাঁর করুণা। যে ছেলে যেরূপে তাঁকে পেলে আনন্দ পায়, তার নিকট সেই রূপেই প্রকাশিত হন। তিনি না কৃপা ক'রে আমাদের আধার অনুযায়ী প্রকাশিত হ'লে আমাদের সাধ্য কি, সে অসীম অনন্তের স্বরূপ একেবারে বোধগম্য করি। আমরা যখন বড় হব, আমাদের বুদ্ধি যখন খুব মার্জ্জিত হবে, হৃদয় যখন দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হবে ; তখন মা আমাদের নিকট তাঁর অত গম্ভীর ভাব অত উচ্চ অবাঙ্‌মনসোগোচর ভাব ধারণ করলে, কিছু তত ক্ষতি হবে না। এখন আমরা অতি শিশু, এখন থেকে যত মাকে আমরা স্বচক্ষে দেখে নেব, ততই আমাদের হৃদয়ে মায়ের ছবি অঙ্কিত হয়ে যেতে থাকবে, ততই মায়ের গুণ, মায়ের ভাব, অন্তরে অন্তরে গেঁথে যেতে থাকবে। বাল্যকালে যাহা করা যায়, শুনা যায়, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে ; এ সময়ে অনন্ত অসীম ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ ভাব বোঝা বড়ই কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; এদিকে, নানা প্রকারের পার্থিব অনিত্য ভাব সকলের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'তে লাগল ; বড় হয়ে দেখলুম মনের ভিতর কতই আবর্জ্জনা এসে জুটেছে—সাফ করা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। চোখ বুজিয়ে দু'দণ্ড ধ্যান করতে গেলুম—এক প্রকার অন্ধকারই দেখি। বড় হলুম বটে, কিন্তু বিশ্বাস ভক্তিতে বালকের মত—এমন কি সেই নির্ম্মলবুদ্ধি বালকের অপেক্ষাও অধম—রহিলাম। আবার বালকের মত মা ব'লে যখন কিছু জিনিষ চোখে দেখ্‌তে, হাতে স্পর্শ করতে আরম্ভ করলুম, তখন অনেক কষ্টে একটু উন্নতি বোধ করতে লাগলুম। ক্রমশঃ বুঝলুম মায়ের মূর্ত্তি-পূজা দুর্ব্বল মনকে কত সাহায্য করে ; অল্পেই কত ফলপ্রদ হয়।



আমাদের মা ত খালি মাটির বা খেলা-ঘরের মা নয়। শুনেছিলাম, এখন বিশ্বাসও হয়েছে—আমাদের মা শুনতে পায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। আমাদের মা সর্ব্বমঙ্গলা, অন্তর্যামিনী, সর্ব্বশক্তিমতী, সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। একটী সাধক গাহিয়াছিলেন—"আমার মা যদি কালো হ'ত, তবে কি ডাকিতাম এত; যার কালো তার কালো শ্যামা, আমার সে যে ভাল। যদি কালো, তবে কেন হৃদিপদ্ম করে আলো।" আমার মাকে ডেকে, আমার মাকে পূজে, আমার হৃদয় পূর্ণ হচ্ছে—কি ক'রে অস্বীকার করি। মার কাছে যেটা জোর ক'রে অন্তরের সহিত বলি, সেটা যে খেটে যায়—কি করে তা না মানি। "জাননারে মন পরমকারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।" মা কি আমার অমনি যে সে; আমি কি অমনি যাকে তাকে মা বলি।—

দেব্যুপনিষৎ বলছেন—

"সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীম্ উপতস্থুঃ। কাসি ত্বং মহাদেবি। সাব্রবীৎ অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ শূন্যঞ্চাশূন্যঞ্চ অহমানন্দানানন্দাঃ অহং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহং ব্রহ্মাব্রহ্মণী···।"

অর্থাৎ দেবীর নিকট গিয়া দেবতাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে মহাদেবি?" দেবী বলিলেন, "আমি ব্রহ্মস্বরূপা; আমা হইতেই প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ উৎপন্ন; আমি শূন্য অশূন্য, আনন্দ নিরানন্দ, বিজ্ঞান অবিজ্ঞান; আমিই ব্রহ্মা অব্রহ্মা"; ইত্যাদি ইত্যাদি।

বৈদিক দেবীসূক্তে দেবী বলছেন—অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।/ তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥ / ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্। / অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥··· / অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। / ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা··· ॥

অর্থাৎ আমিই জগদীশ্বরী, সকলকে আমিই ধন দিয়া থাকি, সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি, যাবতীয় যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ; আমি সকল স্থানেই বাস করি—সকলের দেহেই অবস্থান করি; দেবগণ যেখানে যাহাই করুন, আমারই উপাসনা করেন। আমারই দ্বারা, অর্থাৎ সকলের ভিতর আমার শক্তি থাকার দরুণই, সকলে আহারাদি করিতে পারে, দেখিতে শুনিতে পারে, আমারই শক্তির দ্বারা সকলে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে পারে। আমাকে যিনি মানেন না তিনি ক্ষয়প্রাপ্ত হন। আমিই কারণের কারণ। পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থে চৈতন্য এবং মায়ারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি।

বহ্বৃচোপনিষৎ প্রচার করিতেছেন—"তস্যা এব ব্রহ্মা অজীজনৎ বিষ্ণুরজীজনৎ রুদ্রোঽজীজনৎ··· সর্ব্বমজীজনৎ সর্ব্বং শাক্তমজীজনৎ।"

অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি সমস্তই শক্তি হইতে উৎপন্ন।

এই শক্তিই নিরাকার সর্ব্বব্যাপী হইয়াও ভক্তের হিতার্থে সাকার রূপ ধারণ করিতেছেন, যথা—সামবেদীয় কেনোপনিষৎ বলিতেছেন, "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীম্"—অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম বহু শোভমানা স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক 'উমা হৈমবতী' রূপে তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন।





মেধস্ ঋষি সুরথ রাজাকে বলিতেছেন, "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততং। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥"—অর্থাৎ সেই জগন্মূর্ত্তি-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী মহামায়া জন্মাদিরহিত ও নিত্য হইলেও প্রায়ই ভক্তদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্ম মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হন। যখন এইরূপ আবির্ভূত হন, তিনি নিত্য হইলেও তখন তাঁহাকে "উৎপন্ন" অথবা "অবতার" বলা যায়।

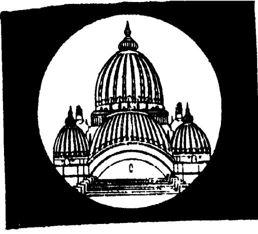
শিশু গর্ভধারিণীকে "মা" ব'লে ডাকে; 'মা যে কি বস্তু' তা কি বুঝিয়া ডাকে? "মা" ব'লে ডাকতে হয়,—ডাকে। জোর মেরে কেটে "মা" বলে ডাকলে, মার কাছে গেলে, মার কোলে উঠলে, একরকম শান্তি পায়; তাই "মা" ব'লে ডাকে। যখন বড় হয় তখন "মা" যে কি বস্তু তা ক্রমশঃ একটু একটু ক'রে বুঝতে পারে। তেমনি আমরাও আগে যখন দশভুজা আনন্দময়ীকে "মা" ব'লে ডাকতুম তখন তত মাকে বুঝতুম না। একটু বড় হলুম, শুনলুম 'সেই মা হচ্ছেন—মা দুর্গা, মা হচ্ছেন—ভগবতী ঈশ্বরী,—মাকে নমো করতে হয়, পুজো করতে হয়'।

আরো একটু বড় হলুম, জানলুম—সেই দশভুজা মা আমাদের দুঃখ মোচন করেন, বিপদ হ'তে উদ্ধার করেন, অন্তরের সহিত ডাকলে কথা শোনেন। এখন একটু জ্ঞান হয়েছে;—সেই দশভুজা দুর্গা সম্বন্ধে বুঝছি "কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিণী। সাধকেরি বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী॥ কভু কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী॥" আরও যখন বুড়ো হবো তখন হয় ত এও উপলব্ধি করতে পারব—"যে অবধি যার অভিসন্ধি হয়, সে অবধি সে পরব্রহ্ম কয়।/ তৎপরে তুরীয় অনির্ব্বচনীয়, সকলি মা তুমি ত্রিলোকব্যাপিনী॥"

আমাদের মা, অপরের চোখে, মাটীর মা হ'তে পারে; ভক্তের চোখে 'সচ্চিদানন্দময়ী'—চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি। মা সর্ব্বব্যাপী;—শূন্যে থাকতে পারেন, মানুষের ভিতরে থাকতে পারেন; গাছের ভিতরে, ইট কাঠের ভিতরে এমনকি সেই ক্ষুদ্র বালুকণার ভিতরেও থাকতে পারেন; আর আমার মা, আমার হাতের গড়া এত সাধের আনন্দময়ী প্রতিমায় থাকবেন না—এ কখনই হ'তে পারে না। আমার যদি ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে; আমি যদি অন্তরের সহিত মাকে ডাকি; প্রাণের সহিত মার কাছে কেঁদে বলি, মার জন্য যদি সত্যই আমার প্রাণ ছট্ ফট্ করে; মাকে না দেখতে পেলে মহা অশান্তি বোধ করি—প্রাণ বেরিয়ে যায় এমন যদি হয়,—নিশ্চয়ই বলছি—মা আসবেনই আসবেন; এই মাটীর প্রতিমার ভিতরেই আসবেন। যেখানে ব'লব সেইখানেই আস্‌বেন। যেমন ক'রে হ'লে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাঁকে বুঝতে পারবে, তেমনি ক'রেই তিনি আমার কাছে আস্‌বেন। মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা সত্যই অন্তর্যামী, সত্যই ভক্ত-বৎসল, সত্যই স্নেহময়ী জননী। ছেলে প্রাণের সহিত ডাকলে মা আস্‌বেনই আস্‌বেন, কোনও সন্দেহ নাই। মা সর্ব্বশক্তিমতী; আমার ক্ষুদ্র আধারের মত হয়েই মা আমার নিকট প্রকাশিত হবেনই হবেন।

"এস মা এস মা ও হৃদয়রমা পরাণ-পুতলি গো।/হৃদয় আসনে একবার হও মা আসীন নিরখি তোমায় গো॥/জন্মাবধি তব মুখপানে চেয়ে,আমি ধরি এ জীবন যে যাতনা সয়ে, (তাত জান গো।)/ একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ' তাহে আনন্দময়ী গো॥"





কথাপ্রসঙ্গে

শারদোৎসব

জলভরা মেঘের আবরণ সরাইয়া শরতের আকাশ অপরূপ আলোর সম্ভার লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। আদিকবি বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণে এই শরৎ ঋতুর যে অনিন্দ্যসুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা সকল যুগের অসাধারণ শিল্পকর্ম—একখানি বর্ণাঢ্য শাশ্বত ঋতুচিত্র। বাল্মীকির ধ্যানদৃষ্ট এই অপূর্ব শরৎ-চিত্রপটের রঙ কিন্তু শুধুই নয়ন-বিমোহন নয়, বিশেষ শক্তি-সঞ্চারীও বটে। সমগ্র রামায়ণের বিপুল ঘটনা-স্রোতকে গতিমুখর করিয়াছে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেরঐ কবিতামালা—যেখানে শরৎ-প্রকৃতির বর্ণনায় মহাকবি আত্মহারা হইয়াছেন। সৌন্দর্য ও তেজ এবং মাধুর্য ও পুরুষকারের এমন সাবলীল সমাবেশ মহাকাব্যের ললিত ছন্দকে প্রকাশ করিয়াছে ওজস্বিনী মন্ত্ররূপে। শরতের প্রকৃতিতে তিনি যেমন খুঁজিয়া পাইয়াছেন কবিতাকে,—তেমনই উদ্দীপনা আহরণ করিয়াছেন মহৎ সংগ্রামের। তাই দেখি, সেখানে শরতের নদ-নদী-ঝর্না, পদ্ম-সুরভিত শীতল বায়ু, কাশফুলের সমারোহ, শুভ্র জ্যোৎস্নার বন্যাধারা ইত্যাদি বিষয়গুলির ব্যঞ্জনা যেমন হৃদয়ানন্দকর, তেমনই আবার সেই আনন্দের কিরণ-সম্পাত প্রভূত চিত্ত-উত্তেজক।

শরতের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু তাঁহার ঐ মুগ্ধ নেত্রের যে অগ্নি-দীপ্তি, যে কঠিন সঙ্কল্প উহাই তো রাক্ষসকুল নিধনের স্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়াছিল। শরতের মেঘমুক্ত উজ্জ্বল আকাশকে তিনি দেখিয়াছিলেন, সুমার্জিত শাণিত অসিরূপে—যাহা অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে উদ্যত ঝলকিত। 'ব্যক্তং নভঃ শস্ত্রবিধৌত বর্ণম্।'

নদীতীরে মৃদুবায়ুতে আন্দোলিত নব-বিকশিত কাশগুচ্ছ শ্রীরামচন্দ্রের চক্ষে নির্মল পট্টবস্ত্র বলিয়া প্রতীত হইতেছিল,—যাহা তেজ ও পবিত্রতার প্রতীক। নদীর স্বচ্ছ স্রোতধারা, বনের হাস্যোজ্জ্বল কুসুমিত রূপ, ক্রৌঞ্চের হর্ষ-রব, পরিপক্ব ধান্যের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, মৃদুমন্দ পবন এবং শারদ চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না—ইহা সবই বর্ষার অন্ত সূচনা করিতেছিল। আকাশের নীলিমা জানাইয়া দিতেছিল, বারি সিঞ্চন করিতে করিতে মেঘের দল এখন সর্বতোভাবে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। 'বিসৃজ্য সলিলং মেঘাঃ পরিশান্তা।'

নয়নবিমোহন শারদপ্রকৃতিকে শ্রীরামচন্দ্র অবলোকন করিতেছিলেন, যেন যুদ্ধযাত্রার অনুকূল পরিবেশরূপে, অনুজ লক্ষ্মণকেও তাই বার বার সজাগ করিয়া দিয়াছেন,—শরৎ-সূর্যের তাপে পথ-ঘাট এখন পঙ্কবিহীন—বহুকাল পরে ঘনীভূত ধূলিজাল উত্থিত দেখা যাইতেছে। শত্রুদমন-কল্পে যুদ্ধযাত্রার ইহাই তো প্রকৃষ্ট কাল। কিন্তু কোথায় সেই প্রস্তুতি? পার্থিব জীবের যুদ্ধোদ্যোগের সময় তো এই-ই। 'উদ্যোগসময়ঃ সৌম্য পার্থিবানামুপস্থিতঃ।'

শরতের আকাশ-আলোক-চন্দ্রিমা—শরতের কাশ-শেফালিকার গন্ধবাহী বাতাস, আমাদেরও মনকে মুগ্ধ করে ঠিকই—কিন্তু যুগপৎ কর্তব্যে সচেতন করিয়াও তোলে কিনা ইহাই চিন্তনীয়। শারদোৎসব এখন আমাদের জাতীয় উৎসব। কিন্তু হায়, শরৎ যে কী গভীর ভাবদ্যোতক প্রকৃতি,—আবেগের সহিত উদ্যোগ, ভাবুকতার সহিত পুরুষার্থের প্রেরণা বহন করিতেছে, সেই কোন্ আদি যুগ হইতে, তাহাই আমরা ভুলিয়া

গিয়াছি। এই কারণেই সাম্প্রতিককালের শারদোৎসব আমাদের মনকে ভুলায়, কিন্তু প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে না,—স্মরণ করায় না যে ইহা শক্তি-আরাধনার শুভ যোগ।

*

শারদোৎসব ইদানীং প্রায় সারা ভারতের উৎসব। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাই এই শরৎকালীন উৎসবের মুখ্য অঙ্গ—যদিও এই পূজা অকালবোধন নামেই প্রসিদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। কালের পূজা বসন্ত কালে, কিন্তু এই অকালের মাতৃ-আরাধনাই সর্বত্র শরৎকালের সর্বমানবের আনন্দোৎসবে পরিণত;—ফলে ইহার গুরুত্ব ও আবেদন অন্য যে-কোন বৃহৎ উৎসবানুষ্ঠান অপেক্ষা অনেক বেশি।

রাম-কথা সহ আমাদের প্রসঙ্গের সূত্রপাত হইয়াছে। ইহা কোন পরিকল্পনাপ্রসূত নহে। শরৎ-প্রকৃতি যেন স্বভাবতঃ রামায়ণের স্মৃতিকেই সর্বাগ্রে মনে জাগাইয়া দেয়। এই শারদীয়া দুর্গোৎসবও রামকাহিনীর একটি পরিচ্ছেদ স্বরূপ। বাল্মীকি-রামায়ণে আদিকবি শরৎ-ঋতুর নিসর্গ চিত্রাঙ্কন ছলে যুদ্ধোদ্যোগের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছেন বহুতর ভাবে,—কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ঐ-কালে দুর্গাদেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন, এমন কাহিনী আমাদিগকে শোনান নাই একবারও। অথচ ইহাও সত্য যে প্রতি পূজা-মণ্ডপেই আমরা শুনিয়া থাকি, উচ্চারিত হইতেছে: 'রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা দেবী।' অর্থাৎ, রাবণ নিধনের জন্যই রামচন্দ্র দুর্গাদেবীকে অকালে (শরৎকালে) আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র-আরব্ধ সেই পূজাই শ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজারূপে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আদিকবি এ-সম্পর্কে নীরব থাকিলেও বঙ্গদেশে বহুল পরিচিত কবি কৃত্তিবাস-কৃত বাংলা রামায়ণে কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের অকাল-বোধনের বর্ণনা রহিয়াছে। অবশ্য দেবীভাগবতে, মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও কালিকা পুরাণেও অকাল-বোধনের সংবাদ পাওয়া যায়—তবে ভিন্নরূপে। বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় হইলেও শরৎকালে দুর্গাপূজার কথা-চিত্র পুরাণাদিতে সুস্পষ্ট। যেমন, মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেন—শরৎকালে সুরথ ও সমাধি দুর্গতি-নাশিনী দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডী এই মার্কণ্ডেয় পুরাণেরই অন্তর্গত। অন্য পুরাণ-গুলিতেও শরৎকালে দুর্গার আরাধনার যে-কাহিনী পাওয়া যায়, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র অনুপস্থিত,—কিন্তু স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাই দেবীর অকালবোধন করিয়া-ছেন। কালিকা পুরাণে আবার চমৎকার একটি সামঞ্জস্য-সূত্র বর্ণিত: রামের দ্বারা রাবণবধ সাধিত করিবেন বলিয়াই শরতের এক রাত্রিকালে ব্রহ্মা নিজে দুর্গার বোধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। অতঃপর প্রবোধিতা মহাশক্তি রামচন্দ্রকে রাবণের বিনাশ সাধনে সহায়তা করেন।

যাহা হউক, রাক্ষসদলনের জন্য মহাশক্তির আরাধনারত শ্রীরামচন্দ্রের যে-চিত্রখানি আমাদের স্মৃতিপটে যুগ যুগ ধরিয়া অঙ্কিত রহিয়াছে, উহা কিন্তু আমাদের নিজ নিজ অধ্যাত্ম তথা সামাজিক জীবনের জন্য এক মহাশিক্ষাপ্রদ অনুশাসন। এক-শত আট নীলপদ্ম সংগৃহীত হইয়াছে জননীর শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলির উদ্দেশ্যে। ভক্তির পরীক্ষা লইতে মহামায়া ছলনা করিয়া একটি পদ্মকে দৃষ্টির অগোচরে লইয়া যান। কমলনয়ন রাম বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না—নিরুদ্যম হইলেন না।—মাতৃ-পূজায় সঙ্কল্পচ্যুতি রাঘবেন্দ্রের পক্ষে অসহনীয়। অগত্যা ঐ হৃত নীলপদ্মের বিকল্পস্বরূপ তিনি আপন নীলনয়নকে উৎপাটন করিতে ধনুকে শর সংযোজন করিলে, চকিতের মধ্যে জগজ্জননী দুর্গার আবির্ভাব ঘটিল। মহাশক্তির বরে দশরথনন্দন হইয়াছিলেন দশাননজয়ী!

অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিছক অঙ্গ-আস্ফালনে বা ভাষা-বিন্যাসে অথবা বাক্যবন্যায় সম্ভবপর হয় না। উহার জন্য প্রয়োজন মহাশক্তির বরলাভ ও অশেষ আত্মত্যাগের। শারদীয়া দুর্গোৎসবের মধ্যে এই মহতী শিক্ষাই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমাদের ব্যষ্টি ও সমাজ জীবনের সর্ব-প্রকার শ্রী আজ পরাক্রান্ত লঙ্কেশ্বরের কবলীকৃত! জাতির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-কল্যাণরূপিণী সীতা ক্রন্দন-রতা বন্দিনী। আমাদের অন্তরাত্মা শ্রীরাম কি এখনও অরণ্যবিহারী হইয়া নিসর্গ শোভাতেই মুগ্ধ থাকিবেন—অথবা কোন ক্ষণিক সুখের আমেজে আত্মপ্রসন্নতা বোধ করিবেন? সর্বজন-অন্তরশায়িনী প্রসুপ্তা মহাশক্তির বোধনকাল কি এখনও সমাগত নহে? তিনি না জাগিলে সকলেই যে ঘুমন্ত থাকিবে! শক্তির বোধনে অকালেও মহোৎসব হইতে পারে। শারদীয়া অকালবোধন কি আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে না?

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

[রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ। বিগত ১০।২।১৯৭৮ তারিখে বোম্বাই রামকৃষ্ণ মঠ-আয়োজিত এক সমাবেশে পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধীশ মহারাজের মূল ইংরেজী প্রসঙ্গের ভাষান্তরিত প্রবন্ধরূপ এখানে প্রকাশিত।]

কোন আনুষ্ঠানিক ভাষণ আমি দিচ্ছি না। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জীবনের ঘটনা, যা আমার স্মৃতিতে সঞ্চিত রয়েছে, মাত্র তারই কিছু বলব ঘটনাগুলো ষাট কি ততোধিককাল পূর্বের।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি বলা হয় গ্রন্থাগার সংস্করণ, রাজা মহারাজ ছিলেন যেন পকেট সংস্করণ। তিনি যেন অনেক দিক থেকে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। এমনকি শরীরের দিক থেকেও—পিছন থেকে দেখে অনেকেই তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে কখন ভুল করতেন। সাদৃশ্য ছিল এতই বেশি!

রাজা মহারাজের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তাঁর মন অধিকাংশ সময়েই কোন্ জগদতীত রাজ্যে বিচরণ করত। তিনি যেন ভিন্ন এক পৃথিবীতে বাস করতেন। বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে তিনি সামান্যই সচেতন ছিলেন। বেশির ভাগ সময়েই তিনি চৈতন্যের সর্বোচ্চস্তরে বিচরণ করতেন। কখন কখন তিনি তাঁর সেবককে হুঁকায় তামাক দিতে বলতেন। সেবক হুঁকা দিয়ে যেত, মহারাজের কিন্তু সেদিকে খেয়ালই থাকত না। ফলে কিছুক্ষণ বাদেই তিনি সেবককে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন, "আমাকে তামাক দিলে না কেন?" বাহ্যজগৎ যেন তাঁর চেতনায় স্থান পেত না। তামাক দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তিনি নিজের ভাবে এতই বুঁদ হয়ে থাকতেন যে, তামাক পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হুঁশ থাকত না। এভাবে দেখতে পাই বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে তাঁর মন খুব সামান্যই জড়িত থাকত।

যদিও তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা কলেজে পড়াশুনা করেননি, কিন্তু অনেক বিষয়েই তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। বিচিত্র নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিধি সবাইকে বিস্মিত করত। আমার মনে আছে, তিনি মাদ্রাজে থাকাকালীন আশ্রম ছিল 'বাণী বিলাস' বাড়িতে, মহারাজ সন্ধ্যারতির পর বাড়িটির খোলা বারান্দায় বসে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতেন। অনেক ভক্ত আসতেন এবং তাঁর নিকটে এসে বসতেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেও, আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে কদাচিৎ আলোচনা করতেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর সান্নিধ্যে বসে থাকাই ছিল সকলের কাছে আকর্ষণীয়, কেউই সেই আকর্ষণ ছেড়ে যেতে চাইত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল তখন। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা ৮টা নাগাদ শিবরাম আয়ার (পরবর্তিকালে যিনি স্বামী অবিনাশানন্দ) রাজা মহারাজের কাছে আসতেন। দক্ষিণভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'হিন্দু'-র তিনি ছিলেন অন্যতম সহ-সম্পাদক। তিনি এলেই মহারাজ জিজ্ঞাসা করতেন, "যুদ্ধের খবর কি? জার্মান-সৈন্যরা আজ কোথায়? গতকাল তো তারা ব্রিটিশ-সৈন্যদের থেকে এত মাইল দূরে ছিল, আজ তারা কোথায়?" এ ধরনের প্রশ্ন তিনি করতেন। তিনি জার্মান ও ব্রিটিশ-সৈন্যদল চলাচলের সব খবর মনে রেখে শিবরাম আয়ারকে প্রশ্ন করতেন এবং সংবাদ সংগ্রহ করতেন।

তখন আরেকজন ভদ্রলোক আসতেন। তিনি কোন সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। রাজা মহারাজ প্রায়ই তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। তাঁকে এমন সব প্রশ্ন করতেন যা থেকে ব্যাঙ্কিং ও সমবায়

ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য জানা যেত। আরেকজন ভদ্রলোক প্রতিদিন আসতেন। তিনি সরকারের কৃষি দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের ফুল ফল এবং তাদের প্রয়োজনীয় সার সম্বন্ধে কথা বলতেন। তদুত্তরে মহারাজও ভদ্রলোকের কাছে গাছপালা সার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করতেন। তিনি নিজে যদিও গাইয়ে ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন গানের একজন উঁচু শ্রেণীর সমঝদার। গানের স্বর, তাল ইত্যাদি তিনি বুঝতেন এবং তাদের রস গ্রহণ করতেন। তিনি এভাবে বহুবিধ বিষয়ে বিপুল জ্ঞান আহরণ করেছিলেন—বইপত্র না পড়ে শুধু লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাপূজা সম্বন্ধে মহারাজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, একজন ব্রহ্মচারী পূজার জন্য বাগান থেকে সব সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি তুলছে। তাকে ডেকে বললেন, "তুমি করছ কি? তুমি কি গাছপালাগুলিকে ফুলশূন্য করে দিতে চাও? তোমার ধারণা বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র ঠাকুরঘরেই বসে আছেন এবং বাগানে বেড়াতে আসেন না। এরকম আর কখনও করো না। পূজোর জন্য কয়েকটা ফুল তুলে অবশিষ্ট সব ফুল বাগানে রেখে দেবে।"

মঠের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মে, বিশেষতঃ ফুলবাগান, ফলের গাছ, সবজিবাগান, গোশালা ইত্যাদি ব্যাপারে মহারাজের খুবই দৃষ্টি ছিল। গোশালায় গোরু বাছুরের জন্য খাবার কি হবে না হবে তাও তিনি ঠিক করে দিতেন। তিনি যে নিজেই শুধু উৎসাহী ছিলেন তাই নয়, তিনি চাইতেন অপর সকলেও তাঁর মতো উৎসাহী হোক। কেউ মাদ্রাজ মঠ থেকে বেলুড় মঠে এলেই রাজা মহারাজ তাকে মাদ্রাজ মঠের ফুলগাছ, ফলগাছ, গোরু ইত্যাদি বিষয়ে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, "গুরু মহারাজের জন্য যে গাইটা কিনেছিলাম তার কয়টি বাছুর হয়েছে? কতটা করে দুধ দিচ্ছে? যে ফুলগাছটা লাগিয়েছিলাম—সেটা সুন্দর ফুল দিচ্ছে তো?" তিনি বারাণসী থেকে বেলগাছের চারা আনিয়ে মাদ্রাজ মঠে লাগিয়েছিলেন। তিনি জানতে চাইতেন, "বেলগাছটা কত বড় হয়েছে।" তিনি তিনটি আমলকী গাছও লাগিয়েছিলেন। এবং তিনি জিজ্ঞাসা করতেন গাছগুলি কেমন বড় হয়েছে, তারা ভাল ফল দিচ্ছে কিনা। তিনি যখন এই গাছ তিনটি প্রথমে লাগিয়েছিলেন সে সময়ে বাগানের প্রাচীরের ধারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "শুধুমাত্র এই গাছগুলির ফল বিক্রি করেই তোমরা শ' খানেক করে টাকা পেয়ে যাবে।" শুনে সবাই আনন্দে হেসে উঠেছিল। গাছপালা সম্পর্কে যারা খবরাখবর সঠিক দিতে পারত না মহারাজ তাদের ধরে নিতেন নিষ্কর্মা।

দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জিনিসপত্রের আদান-প্রদান মহারাজ পছন্দ করতেন। তিনি ব্যাঙ্গালোর ও অন্যান্য জায়গা থেকে কত রকমের গাছ এনে বেলুড় মঠের জমিতে লাগিয়েছেন গুরু মহারাজের সেবার জন্য। এভাবে তিনি দক্ষিণভারত থেকে এনে নাগলিঙ্গম্ গাছ লাগিয়েছিলেন, সেটি এখন বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে সুগন্ধ ফুল দিয়ে যাচ্ছে। এভাবে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভাল ভাল জিনিস বাংলা দেশে আনতেন, আবার বাংলা দেশের ভাল জিনিস অন্যত্র নিয়ে যেতেন। এমনকি যে সকল দক্ষিণভারতীয় রান্না তিনি পছন্দ করতেন সেগুলি বেলুড় মঠে রান্না করিয়ে গুরু মহারাজকে ভোগ দেবার ব্যবস্থা করতেন। নিম ফুল থেকে তৈরি রসম্ ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়।

দক্ষিণদেশের খুবই জনপ্রিয় রামনাম সংকীর্তন

তিনি বেলুড় মঠে প্রবর্তন করেছিলেন। তার সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন কয়েকটি তুলসীদাসের দোঁহা। তিনি সাধুদের প্রত্যেক একাদশী ও রামনবমীর দিনে এই সংকীর্তন করতে বলতেন। আজ পর্যন্ত এই সংকীর্তন শুধু বেলুড় মঠে নয়, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সকল কেন্দ্রে একাদশীর দিন গাওয়া হয়। এভাবে যখনই তিনি দক্ষিণ বা উত্তর-ভারতে পরিভ্রমণে যেতেন তিনি তখনই উত্তর ও দক্ষিণের ভারতীয়দের মধ্যে পরস্পর বোঝাপড়ার জন্য ভাবের আদান-প্রদানের চেষ্টা করতেন। তিনি একবার হরিদ্বারে এবং আর একবার মান্দ্রাজে দুর্গাপূজা করিয়েছিলেন। এভাবে তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সেরা বিষয়গুলি মিলিয়ে মিশিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন।

ভোর চারটার সময় মঙ্গলারাত্রিকের পর রাজা মহারাজ ধ্যান করতে বসতেন। বেলুড়ে মঠবাড়ির দোতলায় গঙ্গার ধারের বারান্দায় তিনি বসতেন। তাঁর সামনে বসে সকলে ধ্যান করত। ধ্যানের পরে তিনি সকাল সাতটা পর্যন্ত ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন। কোন কোন দিন বাবুরাম মহারাজ দেখতেন যে, তরকারী কাটবার কোন লোক নেই। সবাই উপরে মহারাজের কাছে বসে রয়েছে। বাবুরাম মহারাজ নিচে থেকে চেঁচিয়ে বলতেন, "আচ্ছা রাজা, আজ ঠাকুরের ভোগ হবে কিনা?" মহারাজ শুনেই বলতেন, "বাবুরামদা রেগে যাচ্ছে, তোরা যা যা।"

তিনি কোন কোন লোককে পছন্দ করতেন না। তাদের প্রতি তাঁর যেন এলার্জি ছিল। তিনি যখন মান্দ্রাজে ছিলেন, সে সময়ে এই রকমের এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু রাজা মহারাজ সর্বদাই তাকে এড়িয়ে চলতেন। এদিকে ঐ ভদ্রলোকের এক বন্ধু ছিলেন আমাদের মিশনের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের সেক্রেটারী রামস্বামী আয়েঙ্গারেরও ঘনিষ্ঠ। সেই বন্ধু লোকটি যখনই রামস্বামী আয়েঙ্গারের সঙ্গে মঠে আসতেন, মহারাজ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করতেন। একদিন কিন্তু রামস্বামী আয়েঙ্গার যখন মহারাজকে বললেন যে, তাঁর বন্ধুটিও এসেছেন, মহারাজ বললেন, "আজ আমার শরীরটা তত ভাল নেই। ওঁকে অন্য কোন একদিন আসতে বল।" তদনুসারে রামস্বামী আয়েঙ্গার তাঁর বন্ধু ভদ্রলোকটিকে গিয়ে মহারাজের কথা জানালেন এবং তাঁকে অন্য একদিন আসতে বললেন। আশ্চর্য, সেই ভদ্রলোক চলে যাবার ঠিক পরেই একটি গাড়ি এসে হাজির। গাড়িতে বসেছিলেন সেই ব্যক্তি যাকে রাজা মহারাজ এড়িয়ে চলতেন। লোকটি গাড়ি থেকে নেমেই খোঁজ করেন, "অমুক এখানে আছেন কি?" রামস্বামী আয়েঙ্গার বলেন, "হ্যাঁ, তিনি এখানে ছিলেন বটে, কিন্তু এইমাত্র চলে গেলেন।" লোকটি হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। বোধ হয় এরকম ব্যবস্থাই হয়েছিল যে, দুজনে একই সময়ে মঠে উপস্থিত হবেন,—বন্ধু ভক্তটি তো রাজা মহারাজের কাছে যাওয়া আসা করতেন, তিনি ঐ লোকটিকে নিয়ে মহারাজের কাছে হাজির হবেন। তাহলে আর মহারাজ তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থাটি সম্বন্ধে মহারাজ বুঝে ফেলেছিলেন; সেই কারণেই ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদন করে দিয়েছিলেন এবং পূর্বে যা কখনও করেননি সেদিন তাই করেছিলেন, অর্থাৎ সেই ভক্তটির সঙ্গেও দেখা করতে রাজি হননি। *ঐ দিনটি* ছাড়া কিন্তু প্রত্যেক-দিনই মহারাজ ভক্তটিকে সাদরে অভ্যর্থনা করতেন।

আরেকজন ভদ্রলোক ছিলেন—মান্দ্রাজের নয়, এলাহাবাদের- তাঁকেও মহারাজ অমনি এড়িয়ে চলতেন। মহারাজ একদিন কিছু দূরে লক্ষ্য করলেন যে, ঐ ভদ্রলোকটি আশ্রমের দিকে আসছেন। চট্ করে তক্ষুণি আশ্রমের ভিতরে চলে

গেলেন, বিছানায় শুয়ে পড়ে তিনি সেবককে বললেন, "জ্বরে আমি কাঁপছি। আমাকে কম্বল-চাপা দে, আর চেপে ধর।" সেবক মহারাজের শরীর কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। তবুও মহারাজের কাঁপুনি হচ্ছিল। ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো তাঁর সমস্ত শরীর তখন কাঁপছিল। এদিকে ভদ্রলোকটি মহারাজের সঙ্গে দেখা করার জন্য উপস্থিত হলে সেবক তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, "আজ দেখা হবে না। মহারাজ অসুস্থ।" ভদ্রলোককে অগত্যা চলে যেতে হল। চলে যাবার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন: "ঐ ভক্তটি চলে গেছে কি?" যখন শুনলেন যে লোকটি চলে গেছে, মহারাজের জ্বরও ছেড়ে গেল এবং তিনি তামাক খেতে চাইলেন। বাস্তবিকই তাঁর জ্বর এসে গিয়েছিল, দুটো কম্বল দিয়ে শরীর ঢেকে দেবার পরও শরীরের কম্পন হচ্ছিল। তিনি কি করে হঠাৎ জ্বরাক্রান্ত হলেন, আবার কি করেই বা তা থেকে মুক্ত হলেন এটা একটা রহস্যময় ব্যাপার। কিন্তু এটা সত্যি যে ঐ ব্যক্তির উপস্থিতিতেই মহারাজ জ্বরাক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তিনি চলে যেতেই জ্বরের আরাম হয়েছিল।

তিনি যখন কাশীতে বাস করছিলেন সে সময়ে অন্য এক আশ্রমে ভাণ্ডারা হচ্ছিল। সেই আশ্রমের একজন সন্ন্যাসী বিভিন্ন আশ্রমে গিয়ে সমষ্টি ভাণ্ডারার আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন। সমষ্টি ভাণ্ডারাতে সকল আশ্রমের সব সাধুকে আমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। সন্ন্যাসীটি আমাদের রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে এসে স্থানীয় মোহন্তকে দশটি নিমন্ত্রণের কার্ড দেন—কারণ ঐ আশ্রমে সাধারণতঃ দশজনই বাস করতেন। মোহন্ত মহারাজ বললেন, "না, না, আমি পঞ্চাশটা চাই।" মোহন্ত মহারাজ পঞ্চাশটি কার্ড চাইলে আমন্ত্রণকারী সন্ন্যাসী বিস্মিত হন, জিজ্ঞাসা করেন, "এখানে কি এত জন সাধু আছেন?" আমাদের মোহন্ত মহারাজ বলেন, "নিশ্চয়ই আছেন।" আমন্ত্রণকারী সন্ন্যাসী পঞ্চাশটি কার্ড দিয়ে চলে গেলেন। ভাণ্ডারার দিন ঐ মোহন্ত মহারাজ সাধুদের সবাইকে ভাণ্ডারায় যাবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই যেতে অসম্মতি জানায়। রাজা মহারাজ উপস্থিত, সকলেই চায় তাঁর কাছাকাছি থাকতে, ভাণ্ডারায় যেতে সে কারণে আপত্তি। স্থানীয় মোহন্ত বিব্রত বোধ করেন। তিনি তখন রাজা মহারাজকে গিয়ে নিবেদন করেন, "আমি ভাণ্ডারার জন্য পঞ্চাশটা কার্ড নিয়েছিলাম, কারণ এখানে সে রকম সংখ্যক সাধুই রয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই যেতে আপত্তি করেছেন। আমি একজনকেও পাঠাতে পারলাম না। দেখুন, আমার অবস্থাটা কি করুণ দাঁড়িয়েছে।" মহারাজ বললেন, "ঠিক আছে, তুমি ঘণ্টা বাজাও।" যখন মহারাজ চাইতেন যে, সব সাধু তাঁর সামনে হাজির হবে, সে সময়েই ঘণ্টা দেওয়া হত। সুতরাং ঘণ্টা দিতেই মহারাজের ঘরের নিচের উঠানে সাধুরা এসে সমবেত হন। মহারাজ উপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আদেশ করেন, "সব লাইনে দাঁড়াও, লাইনে দাঁড়াও।" সবাই শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতেই মহারাজ আদেশ করেন, "এবার এক দুই তিন করে গোন।" এক, দুই, তিন উচ্চারণ করে গণনা হতে থাকল। ৫০ উচ্চারণ হতেই তিনি বললেন, "ব্যস থাম। ডাইনে ঘোর এবং জোর কদমে চল। ভাণ্ডারায় চলে যাও।" সুতরাং নিমন্ত্রিত পঞ্চাশজনই সমষ্টি ভাণ্ডারায় যোগ দেয়। এ সকল ব্যাপারে মহারাজ ছিলেন খুবই মজার লোক।

মহারাজের জন্মদিনে, তাঁকে ফুলের মালা, ফুলের মুকুট ইত্যাদি দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। পরের দিন তিনি আমাদের সকলকে আদেশ করলেন যে, ঐ মালা, মুকুট ইত্যাদি সব

কিছু দিয়ে স্বামী শুদ্ধানন্দকে সাজিয়ে তাঁর চতুর্দিকে কীর্তন করতে। স্বামী শুদ্ধানন্দ উঠানে বসেছিলেন। আমরা মুকুট, মালা ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে সাজালাম। তারপর খোল করতাল নিয়ে তাঁর চতুর্দিকে কীর্তন গাইতে ও নাচতে শুরু করলাম। সে সময়ে মহারাজ ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলেন, যা সেখানে ঘট'ছ তা দেখে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তিনি এই ধরনের কৌতুক সব করতেন।

মান্দ্রাজ মঠে একদিন জনৈক ভক্ত একটি বড় থালা ভর্তি মিষ্টি নিয়ে শশী মহারাজের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। শশী মহারাজ সেই থালাটি রাজা মহারাজের কাছে নিয়ে বলেছিলেন, "রাজা খাও।" রাজা মহারাজ বলেন, "আমার শরীর ভাল নেই। পেটের গণ্ডগোল হয়েছে। গতকাল থেকে আমি সাগুজল খাচ্ছি। তুমি এসব জেনেও আমাকে এই সব খাবার খেতে বলছ!" শশী মহারাজ তখন বললেন, "রাজা, তুমি তো খাচ্ছ না। তোমার মাধ্যমে ঠাকুর খাবেন। সুতরাং তুমি এই খাবার খাও।" অতঃপর রাজা মহারাজ নীরবে মিষ্টিগুলি খেতে থাকেন এবং প্রায় তিন-চতুর্থাংশ খেয়ে শেষ করেন। এতে কিন্তু তাঁর শরীরের কোন উপদ্রব ঘটেনি

রাজা মহারাজের দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে শশী মহারাজ তাঁকে বিভিন্ন মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন মাদুরাই মন্দিরেও নিয়ে গিয়েছিলেন দক্ষিণভারতে কোথাও মন্দিরের গর্ভ-মন্দিরে—যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, কোন দর্শককে যেতে দেওয়া হয় না। পূজারী ভিন্ন কেউ গর্ভ-মন্দিরে ঢোকে না। এখন, শশী মহারাজের ইচ্ছা হল রাজা মহারাজকে নিয়ে গর্ভমন্দিরে ঢুকবেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, সন্ন্যাসী পর্যন্ত সেখানে ঢুকলে তার জাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। রাজা মহারাজ কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেটাই ছিল সমস্যা। সে কারণে শশী মহারাজ রাজা মহারাজকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন ও চিৎকার করে বলেন, "আলওয়ার! আলওয়ার!" বৈষ্ণব ও শৈবদের মধ্যে খ্যাতনামা সাধুসন্ত আছেন তাঁদের বলা হয় আলওয়ার ও নয়নার। আলওয়াররা বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং নয়নাররা শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত। শশী মহারাজ ও রাজা মহারাজ দুজনেরই ছিল বিশাল বপু। শশী মহারাজ রাজা মহারাজকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে "আলওয়ার, আলওয়ার" বলে চিৎকার করলে মন্দিরের কেউ আর প্রতিবাদ করল না। শশী মহারাজ রাজা মহারাজকে নিয়ে জগন্মাতার মূর্তির সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দেন। মুহূর্ত মধ্যে মহারাজ মায়ের সম্মুখে ভাবস্থ হয়ে পড়েন। এই সব দেখে পূজারী যিনি ভিতরে ছিলেন, তিনি পাথরের মূর্তির মতো স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এই কৌশলে শশী মহারাজ মহারাজকে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমার যতদূর মনে আছে, বারাণসীতে রাজা মহারাজ একবার রামনাম প্রারম্ভের অনেক আগে—অন্যের আগমনের বহু পূর্বেই একজন বৃদ্ধকে আসতে দেখেছিলেন। আবার রামনাম শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের বেরিয়ে যাবার পূর্বেই সেই বৃদ্ধ প্রথমে চলে গিয়েছিলেন। মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই বৃদ্ধই মহাবীর হনুমান। সেদিন থেকে তিনি রাম-নামের সময় অতিথি মহাবীরের জন্য একটি আসন সংরক্ষণের প্রথা প্রবর্তন করেন।

রাজা মহারাজ তিরুপতি মন্দিরের ভিতরে গিয়ে দর্শনাদি করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল রামু। তিনি রামুকে জিজ্ঞাসা করেন, "এটা কার মন্দির?" রামু বলেন, "এটা রামানুজাচার্য-প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির।" রাজা মহারাজ বলেন, "আমি কিন্তু তা বুঝতে পারছি না। আমি ভাব-চক্ষে দেখতে পেলাম জগন্মাতাকে,—বিষ্ণুকে নয়

ব্যাপার কি? এমন কেন হল?” তখন রামু খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন যে, তিরুপতিতে প্রথমে মাতৃমূর্তির মন্দির ছিল। সেখানে প্রচলিত পূজা পদ্ধতির মধ্যেও দেখা যায় যে, মূলবিগ্রহ ছিলেন মাতৃমূর্তি। এমনকি পূজারীও এই সত্য মেনে নেন, তিনি রামুকে বলেন, “ঠিকই, এটি ছিল মাতৃমন্দির। রামানুজ এটিকে বিষ্ণুমন্দিরে রূপান্তরিত করেছিলেন।” এভাবেই চলেছে ইতিহাসের ধারা। ভারতবর্ষে মন্দিরগুলি যেন দুর্গের মতো। সেখানে বিগ্রহের পরিবর্তন হয়, মন্দির এক সম্প্রদায়ের হাত থেকে অন্য সম্প্রদায়ের হাতে চলে যায়। আমাদের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের এই ইতিবৃত্ত। শুধু রাজা মহারাজই তাঁর ভাবচক্ষে জানতে পেরেছিলেন যে, তিরুপতিমন্দির আদিতে ছিল একটি মাতৃমন্দির।

স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির পর শ্রীশ্রীমা দীর্ঘ কয়েক বছর আর মঠে আসেননি। একদিন রাজা মহারাজ তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান মঠে পদার্পণের জন্য।

আমি সঠিক জানি না, কিন্তু কেউ কেউ বলেন যে, দুর্গাপূজার সময়েই দক্ষিণের প্রবেশপথ থেকে মন্দির পর্যন্ত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে অভ্যর্থনা করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তখনকার দিনে ঐটিই ছিল মঠে ঢোকার প্রধান প্রবেশপথ। সেই পথ দিয়ে এসে মা দোতলায় ঠাকুরঘরে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে। তোমাদের অনেকেই বেলুড় মঠে গিয়েছ। তোমরা নিশ্চয়ই জান শিবানন্দজী মহারাজ কোন্ ঘরে থাকতেন। সেই ঘরের বড় জানালার ধারেই একটি ছোট বারান্দা। এটি আগে ছিল না। পরবর্তিকালে মহাপুরুষ মহারাজের সুবিধার জন্য বারান্দা তৈরি হয়েছিল। দরজার মতো বড় সেই জানালাটির কাছে শ্রীশ্রীমা বসেছিলেন এবং সেখান থেকেই মঠের উঠানে অনুষ্ঠিত কীর্তনগান শুনছিলেন। কিছুক্ষণ পরে উঠানে নাচ শুরু হয়ে যায়,—মহারাজও নাচতে থাকেন। ভাবের ঘোরে তিনি বেসামাল হয়ে যাচ্ছিলেন,—তিনি ভাবস্থ অবস্থায় পড়ে যাবার মতো হয়েছিলেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁকে ধরে ফেলেন এবং তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে আসেন। স্বামীজীর ঘরের পশ্চিমে, এখন সূর্য মহারাজ যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরের ঠিক নিচের ঘরটিতে রাজা মহারাজকে এনে শুইয়ে দেওয়া হল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বাহ্যস্ফূর্তি হয় না। একজন গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে এই সংবাদ দিতেই তিনি নিচে নেমে আসেন এবং মহারাজের বক্ষ স্পর্শ করেন। শ্রীশ্রীমা স্পর্শ করতেই, মহারাজের বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসে। অবশ্য কেউ কেউ বলে যে, শ্রীশ্রীমা নিজ হাতে মহারাজকে একটু প্রসাদও দিয়েছিলেন,—প্রসাদ পেয়েই তিনি ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ফিরে পান। যা হোক শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, “রাখাল নাচতে নাচতে ভাবস্থ হয়ে পড়েছিল এতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ আমি তার পিছনেই স্বয়ং ঠাকুরকে নাচতে দেখলাম।”

বুয়েনস-আয়ারসে আমাদের একজন সাধু (স্বামী বিজয়ানন্দ) দীর্ঘদিন ছিলেন, তিনি এখন প্রয়াত। যখন মহারাজ বারাণসীতে ছিলেন, তখন তিনিও সেখানে ছিলেন। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল পশুপতি। একদিন মহারাজ তাঁকে বলেন, “পশুপতি, তুমি তিলভাণ্ডেশ্বর দর্শন করেছ?” পশুপতি মহারাজ প্রথমে এর তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। তিলভাণ্ডেশ্বর হচ্ছেন বৃহৎ আকারের শিবলিঙ্গ এবং পশুপতি মহারাজও বেশ মোটা-সোটা মানুষ ছিলেন। সেজন্য রাজা মহারাজ তাঁকে বলেন, “তুমি কি তিলভাণ্ডেশ্বর দেখেছ?” সবাই একথা শুনে হেসে ওঠে। পরে পশুপতি মহারাজও এর মর্ম বুঝে হেসে ফেলেন। মহারাজ মন্তব্য করেন, “বুঝেছ, তবে দেরিতে।”

'ধর্ম অনুভূতির জিনিস'

স্বামী গম্ভীরানন্দ

[রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ। বর্তমান প্রবন্ধটি ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবতিথিতে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় প্রদত্ত মহারাজজীর ভাষণ হতে অনুলিখিত।]

শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের প্রয়োজন বা কারণ বুঝাবার জন্য নানা কথা বলার শেষে স্বামীজী আরও বলেছেন যে, ঠাকুরের আগমনের পূর্বে মানুষ বৈদিক ধর্মকে ভুলে গিয়ে শুধু আচার-বিচার, লোকব্যবহার ইত্যাদিকেই ধর্মের আসনে বসিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন সেই আসনে অনুভূতিকে স্থাপন করতে—প্রতিষ্ঠিত করতে। কিভাবে কি করেছিলেন তারই একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা আজকে আমরা করতে চাইছি।

আমরা দেখতে পাই যে, একদিন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে বসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশায়ের গ্রন্থ 'দেবী চৌধুরাণী' পাঠ হচ্ছে। মাস্টার মশায় পড়ছেন, ভবানী পাঠক মনে করতেন যে, তিনি দুষ্টের শাসক এবং শিষ্টের পালক। ধনীদের কাছ থেকে টাকা ডাকাতি করে এনে তিনি গরীবদের দিয়ে থাকেন—সাহায্য করেন। ভবানী পাঠক প্রফুল্লকে নানা স্তরের ভিতর দিয়ে, সাধনার ভিতর দিয়ে নিয়ে চলেছেন। প্রফুল্ল লেখাপড়া জানতেন না, যাকে আমরা মূর্খ বলে থাকি তিনি ছিলেন তাই, পাঠক তাঁকে লেখাপড়া শেখালেন, ব্যাকরণ ইত্যাদিও পড়ানো হল। আর বললেন নিষাদ চরিত ইত্যাদি কতকগুলি গ্রন্থ পাঠ করতে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে মন্তব্য করলেন—কি জান! এই বই যারা লিখেছে তাদের মত হচ্ছে ঐ। লেখাপড়া যদি না করা হয়, বই যদি না পড়া হয় তাহলে পরে ধর্মানুভূতি হয় না—ঈশ্বরলাভ হয় না। কিন্তু তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন কোথায়? শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের কথাতে যাই। সেখানে ঠাকুর বলছেন—ওহে শিবনাথ, শুনছি তোমরা নাকি বলছ যে, আমি ভগবান ভগবান করে পাগল হয়ে গেছি! তা তোমরা বিষয়চিন্তা করে মাথা ঠিক রাখতে পারলে, আর আমি ভগবানের চিন্তা করে বেহেড (পাগল) হয়ে গেলুম? এ কেমনতর কথা? ভগবানের নাম করা, ভগবানের চিন্তা করা, সমস্ত জীবন তাঁকে অর্পণ করা—এই যে ভাবটি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তারই কথা স্মরণ করে কবি গেয়েছেন—'তুমি মরণ ভুলে কোন্ অনন্ত প্রাণ-সাগরে আনন্দে ভাস?'—ঠাকুর এই অনুভূতির জিনিসটিকে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের সামনে স্থাপন করার জন্য। ধর্ম শুধু কথার কথা নয়। ধর্ম প্রাণের জিনিস, মাথা দিয়ে বুঝবার জিনিস নয়--হৃদয় দিয়ে অনুভব করা—ভগবানকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসা। সেটাকেই বাস্তবিক বলা হয় 'ধর্ম'। সেই অনুভূতির স্তরে মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

আরও দৃষ্টান্ত দিই। এই যে লোকাচার বা দেশাচার প্রভৃতি, এটা যে শুধু অশিক্ষিত জনগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, সেটা মনে করলে ভুল হবে। আমি বঙ্কিমবাবুর কথা বলেছি, শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের কথা বলেছি। আরও অনেকের কথা বলা যায়, যা নাকি 'লীলাপ্রসঙ্গ'র আর 'কথামৃতে'র ভিতরেই আপনারা পাবেন। তবে আরও দু-একজনের কথা তুলে ধরছি। যেমন ধরুন, হাজরা মশায় ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর বলতেন—তাঁর বাড়িতে কিছু দেনা ছিল। সেই দেনাটা যাতে শোধ হয় কতকটা তারই অভিপ্রায়ে তিনি এসে

দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন—অবশ্য নাম জপ করতেন তিনি, কিন্তু মানুষকে দেখিয়ে এবং তিনি ধার্মিক লোক এটা মানুষকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতেন। একেবারে ধার্মিক তিনি ছিলেন না—ভগবানের নাম করতেন না, তা নয়,—তবে ভাসা ভাসা; ভিতরে ঢুকবার তাঁর তেমন প্রবৃত্তি ছিল না। আর একজনের কথা—ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মশায়। তিনি সৎলোক—ধার্মিক লোক, কিন্তু তাঁর ধর্ম কতখানি? ঐ আনুষ্ঠানিকভাবে চলা পর্যন্ত। শাস্ত্রে যেমন বলে গেছে—সন্ধ্যা বন্দনা করতে হবে ইত্যাদি। এর বেশি তিনি যেন কিছুতেই এগুতে চাচ্ছেন না। সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুর দেখতে পেলেন ঈশান মুখোপাধ্যায় কোশাকুশি ইত্যাদি নিয়ে গঙ্গার ধারে সন্ধ্যা বন্দনায় বসেছেন। ঠাকুর পাশে এসে বসলেন, আর বললেন—ওহে ব্রাহ্মণ, তুমি আর কতদিন এভাবে চলবে? ও ছেড়ে দাও—ডুবে যাও। "ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন।/তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন।" ডুব না দিলে তো পাবে না, শুধু ওপর ওপর ভাসলে কি হবে? ও যে কথার কথা শুধু নয়। মানুষকে কেবল শাস্ত্র পড়ানো বা বুঝানোও নয়। নিজে কতকগুলি শাস্ত্র পড়ে বুঝে নিলাম, কিন্তু তাতে অন্তরের অনুভূতির কি হয়? ধর্মটা হচ্ছে প্রাণের জিনিস। তার ভিতরে ডুবে যেতে হবে। ঠাকুর বললেন স্বামীজীকে যে, "নরেন, ধর একটা পাত্রে মিষ্টি রস রয়েছে। তুই মাছি,—কি করবি বলতো? কোথায় বসে খাবি?"

—"মশায় কানায় বসে।"

—"কেন কানায় বসে?"

—"না হলে যে ডুবে মরব।"

—"না রে, না, ও যে অমৃতের সাগর, ওতে ডুবলে মরে না, ওতে পড়লে পরে মানুষ অমর হয়ে যায়।" "সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে তাঁর ভেতরে ডুবে পড়।"—এই যে চৈতন্যের ভিতর যাওয়ার আকুতি—এইটি ঠাকুর দেখাচ্ছেন বার বার প্রত্যেক ব্যক্তিকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে গিয়েছেন। প্রশংসায় ভরপুর—যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু বিদ্যার সাগর নয়, তিনি দানেরও সাগর, কত সদ্‌গুণ তাঁর রয়েছে। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন—ও ভিতরের মাণিকের সন্ধান এখনও পায়নি। যদি পেতো তাহলে এত কর্মসাগরে ডুবে থাকত না। সেই ভিতরের সন্ধান বিদ্যাসাগরের মতো লোকও তখনও পারেননি নিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মদিগকে বলেছেন—তোমরা এত ভগবানের ঐশ্বর্য প্রভৃতির কথা বল কেন? তোমরা এসেছ আম বাগানে আম খেতে। আম খেয়ে যাও। কটা গাছ আছে, কটা ডাল আছে, কত পাতা আছে—অত তোমার হিসাবের প্রয়োজনটা কি? তুমি যো সো করে যদি যদু মল্লিককে পেতে পার, যদু মল্লিকের বাড়ির ভিতরে যদি যেতে পার, দেওয়াল টপ্‌কেই হোক বা দারোয়ানের গুঁতো খেয়েই হোক যদি একবার যদু মল্লিকের কাছে পৌছতে পার, তাহলে যদু মল্লিককে জিজ্ঞাসা করলেই সে বলে দেবে তার কতখানি কোম্পানির কাগজ আছে, কত টাকা আছে, তার কত বাড়ি আছে—সব খবর পেয়ে যাবে। আগে যদু মল্লিককে জানো, তার কাছে গিয়ে পৌছাও। তা ভগবানের অত ঐশ্বর্য বর্ণনা করে লাভ কি? আগে তাঁকে ভালবাস। তাঁকে বোঝ।—শুধু বুঝে নয় তাঁকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ কর। মাথা দিয়ে বুঝে নয়। ভগবানকে বুঝাবুঝির কথা এখানে হচ্ছে না। এখানে হচ্ছে—অনুভূতির ক্ষেত্রে পৌছে সেখানে তাঁতে মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া। এই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার বলে গেছেন। এটা হচ্ছে বর্তমান যুগে তাঁর মস্তবড়

অবদান। তিনি দেখিয়ে গেছেন—ধর্ম বলতে কি বুঝায়? ধর্ম মানে, ভগবানের অনুভূতি। তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়া। তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা। তিনি হচ্ছেন আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বল—জীবনের ধ্রুবতারা। এইভাবে তাঁকে গ্রহণ করা—এইটি ঠাকুর বার বার বলে গেছেন—নানা দিক থেকে নানা ভাবে। তাঁর ভগবানের নামে উন্মত্ততা দেখে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মশাই বলেছিলেন—"বাবা, এ যেন ভূতে পাওয়া।" নিজের অনুভূতির কথায় তিনি বলেছেন—"এখানকার অনুভূতি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।" কথাটা যখন প্রথম শুনেছিলাম তখন ছেলেমানুষ। ভেবেছিলাম, এ আবার কিরে বাবা! বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে যায় মানুষের অনুভূতি! আমরা তো শুনেছিলাম বেদ-বেদান্ত সকলের ওপরে। তার ওপরে কেউ যেতে পারে না। ইনি আবার কিরকম লোক? বলছেন—'বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে'! কিন্তু এখন ভাবছি—কি ছেলেমানুষই না ছিলাম! শ্রীরাম-কৃষ্ণের অনুভূতি যে কতদূর, সে-কথা লিপিবদ্ধ পংক্তির মধ্য দিয়েই পাব,—সেটা যে সেখানেই আটকে থাকবে, এমন তো কোন কথা হতে পারে না, স্বয়ং ভগবান তিনি, তিনি এসেছিলেন তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করতে মানুষের কাছে—যতটা তারা ধরতে পারে—যতটা যুগোপযোগী। সুতরাং তিনি, যাঁর থেকে বেদ বেরিয়ে এসেছে, বেদান্ত বেরিয়ে এসেছে, যাঁর সম্বন্ধে স্বামীজী বলছেন—"বেদ-বেদান্ত বুঝতে হলে রামকৃষ্ণরূপ অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে দেখতে হবে", সেই শ্রীরামকৃষ্ণ যে বেদ-বেদান্ত অতিক্রম করে আরও উঁচু স্তরে চলে যাবেন এটা কি আশ্চর্য কথা? আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে—ঠাকুর নৌকাতে করে গঙ্গাবক্ষে কাশীতে বেড়াচ্ছেন। অথবা মন্দিরাদি দর্শন করতে যাচ্ছেন। দেখতে পেলেন মনিকার্ণিকায় মৃতদেহকে দাহন করা হচ্ছে। একদিক থেকে শিব এসে মৃত ব্যক্তিকে তারকব্রহ্ম নাম শোনাচ্ছেন, আর একদিকে মা শক্তি তার সমস্ত বন্ধন খুলে দিচ্ছেন। সেই কথা যখন একজন পণ্ডিতকে বললেন, পণ্ডিত বললেন—"মশাই, আপনার অনুভূতি আমাদের শাস্ত্রকে অতিক্রম করে গেছে। আমরা জানতাম যে শিব তারকব্রহ্ম নাম দেন ও জীব মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কিভাবে কি হয় আপনি যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দর্শন করলেন সেটা তো আমরা জানতাম না।"

তাঁর অনুভূতি প্রসঙ্গে আরও দু-একটি কথা বলি। যেমন ধরুন—তিনি দেখছেন—দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গায় মাঝিতে মাঝিতে ঝগড়া হচ্ছে। হঠাৎ তিনি উঃ করে উঠলেন। কি হল? না, একজন মাঝি অপর মাঝির পিঠে চাপড় মেরেছে—জোরে। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের পিঠে সেই চাপড়ের দাগ পড়ে গেল। হৃদয় এসে দেখলেন—সেখানে পাঁচ আঙুলের লাল দাগ পড়ে গেছে। তাই জিজ্ঞাসা করলেন—"মামা, তোমায় মারলে কে?" —মারেনি তো! তবে হ্যাঁ, ওরা দুজনে ঝগড়া করছিল। একজন আর একজনকে মারলে। তখন বোধ হল যেন আমাকেই মেরেছে। এই যে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে, অপরের ব্যথা নিজের বলে বোধ করা, তাদের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া—এই অনুভূতি তাঁর জীবনে ঘটেছিল মাথা দিয়ে নয়—হয়েছিল হৃদয় দিয়ে। তিনি স্বয়ং ভগবান। সকলের সঙ্গে তিনি এক। তিনি অবতার পুরুষ। সকলের ভিতরে তিনি আছেন—সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে তিনি এক হয়ে আছেন। এই জন্যই তাঁতে দুঃখানুভূতি হয়েছিল। তিনি নরেন প্রভৃতিকে বলেছিলেন—"দেখ, তোদের ভালবাসি নরেন রাখাল বলে নয়। তোদের ভিতর নারায়ণকে দেখতে পাই। যেদিন নারায়ণকে দেখতে পাব না, সেদিন তোদের মুখও দেখবো না।" এই

নারায়ণের অনুভূতিটা ছিল বলেই তিনি মানুষকে ভালবাসতেন—নরেন রাখালকে ভালবাসতেন—দরিদ্রনারায়ণকে ভালবাসতেন। তিনি বলেছিলেন—"জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"—মাথা দিয়ে নয়, হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে। শ্রীশ্রীমা যেমন বলেছিলেন—ঠাকুর মতলব করে কিছু করেননি। ঠাকুরের অনুভূতি এবং অনুভূতিজনিত কথা Philosophy নয়। মাথা দিয়ে ভাবলাম—হেগেল্ এই বলে গেছেন, ক্যাণ্ট এই বলে গেছেন, শোপেনহাওয়ার এই বলে গেছেন। আচ্ছা এদের ভিতর একটা সমন্বয় করে আমিও একটি মত চালিয়ে দিলাম। মত চালাবার মতলব নিয়ে ঠাকুর আসেননি। তিনি নিজে যেটা অনুভব করে গেছেন—যে জিনিসটা সত্যি, সেটাকেই তিনি তাঁর জীবন দিয়ে—বাণী দিয়ে প্রচার করে গেছেন

আপনারা ঠাকুরকে ধরেছেন, সকলেই আপনারা ভক্ত। এই অনুভূতির প্রসঙ্গে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন—ঠাকুর তো বক্তৃতা দিতে বলেননি। লেকচার দিতে বলেননি। তা আপনারা মশাই লেকচার দিয়ে বেড়ান কেন? তার উত্তর হচ্ছে—আমি বক্তৃতা দিচ্ছি না মশাই। উপনিষদে বলে—"ইতি শুশ্রুম ধীরানাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।" (ঈশ. ১০) —যে সব জ্ঞানীরা আমাদের কাছে এই সব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের কাছে এই সব কথা আমরা শুনেছি। যাঁরা জ্ঞানী, মানী, গুণী. তাঁরা যে-সব কথা বলে গেলেন, সেই কথাগুলি আপনাদের কাছে আমরা আবার ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার কথা নয়। ঠাকুরের কথা। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে বা তাঁর ভাবে বলতে গেলে—একই গোয়ালের গোরু যখন একসঙ্গে থাকে, পরস্পর গা চাটে আর অপর গোয়ালের গোরু এলে তাড়িয়ে দেয়। তা আমরা সকলে এক গোয়ালের গরু। সকলেই ঠাকুরের লোক, সকলে মিলে ঠাকুরের কথা আলোচনা করছি। শ্রীভগবানই বলে গেছেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

—অর্থাৎ হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না, আমার ভক্তগণ যেখানে আমার কীর্তন করে সেখানেই আমি থাকি। আর গীতায় (১০।৯) আছে—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

-যারা আমাতে মন অর্পণ করেছে যাদের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আমাতে অনুগত হয়েছে, তারা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা বলে ও আমার কথা পরস্পরকে বুঝিয়ে তৃপ্তি পায় ও আনন্দ লাভ করে। আমরা ঠাকুরের কথা আলোচনা করতে সমবেত হয়েছি তাই এ যেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করা হল এতক্ষণ।

আমি আশা করি, আপনারা সর্বদাই এই ভাবটি মনে রাখিবেন যে, বই পড়িলেই ধর্ম হয় না, তর্কবিচার করিতে পারিলেই ধর্ম হয় না, অথবা কতকগুলি মতবাদে সম্মতি প্রকাশ করিলেই ধর্ম হয় না। তর্কযুক্তি, মতামত, শাস্ত্রাদি বা অনুষ্ঠান—এগুলি সবই ধর্মলাভের সহায় মাত্র, ধর্ম কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি।...

আপনারা মনে রাখিবেন, শুধু কথা বলায় ধর্ম নাই, ধর্ম—মতামতে নাই বা গ্রন্থের মধ্যেও নাই; ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। ধর্ম কোনরূপ বিদ্যা অর্জন করা নয়, ধর্ম আদর্শস্বরূপ হইয়া যাওয়া।

—স্বামী বিবেকানন্দ

কাল ও মহাকাল

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

['উদ্বোধন' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, বর্তমানে আমেরিকার স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষ।]

সংসারে যাহা কিছু ঘটে তাহার সহিত কাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। একটি বিন্দুকে যদি এক ইঞ্চি সরাইতে হয় তো কালের সহযোগিতা চাই। কাল ছাড়া কোন পরিবর্তনই কল্পনা করা যায় না। মাতৃগর্ভে আমাদের দেহ আরম্ভ হইয়াছিল একটি পুং-কোষ এবং একটি স্ত্রী-কোষের সম্মিলনে। ঐ সংযুক্ত কোষটি কাহার ইঙ্গিতে বাড়িতে লাগিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিস্তার লাভ করিল, পরিশেষে পূর্ণাবয়ব শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হইল? কালেরই ইঙ্গিতে। আদি কোষটির সঙ্গে সঙ্গে কাল যদি না ছুটিত তাহা হইলে ভ্রূণের বৃদ্ধি সম্ভবপর হইত কি?

ছুটিয়া চলাই কালের ধর্ম। কাল কখনও থামে না। থামিবার জন্ত আমরা যতই কাকুতি-মিনতি করি সে গ্রাহ্য করে না। আমরা বলি, কাল মহাশয়, একটু থামুন; এই নির্মল প্রভাতটি একটু ভাল করিয়া উপভোগ করিয়া লই। এই প্রিয় সম্মিলনটি যেন হঠাৎ শেষ না হয়, এই ভরা যৌবন যেন অতর্কিতে ফুরাইয়া না যায়! কাল হাসে। সে হাসিতে অনুকম্পা আছে কিন্তু শিথিলতা নাই—মৃদু কিন্তু গম্ভীর হাসি। মানুষের হাসি-কান্নার হিসাব রাখিয়া চলিতে গেলে কালের চলা হয় না। কালকে চলিতে হয় আপন নিয়মে।

কাল যখন সুখ সমৃদ্ধি খ্যাতি লইয়া আসে তখন আমরা কালের স্তবগান করি। সেই আনন্দভরা দিনটি যখন নিশীথবাবুর একমাত্র পুত্র তাহার এম-এ ডিগ্রী লইয়া বাড়ি আসিয়াছিল! দরিদ্র নিশীথবাবু কত কষ্টে ছেলেকে স্কুল-কলেজে পড়াইয়াছেন, দিনের পর দিন এই আশা রাখিয়া—যে একদিন বাবলু এম-এ পাস করিবে। বাবলুর এম-এ পাসের দিনটি নিশীথবাবু কি কখন ভুলিতে পারেন? পূজা পার্বণের দিনগুলিকে আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করি। দুর্গাপূজার কয়েকটি দিন আমাদের কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়, বরণীয়।

পক্ষান্তরে কোনও একটি বিশেষ কালে আমরা যদি কোনও মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া থাকি, তাহা হইলে ঐ কালকে আমরা অভিশাপ দেই। প্রিয়-জনের জন্মবার্ষিকীতে আমরা উৎসবের আনন্দ উপভোগ করি, মৃত্যুবার্ষিকীতে হৃদয় বেদনায় ভরিয়া যায়।

জগতের ছোট-বড় প্রত্যেকটি বস্তু ও ঘটনার আবির্ভাব, স্থিতি এবং বিলয় কালেরই আঙ্গিনায় ঘটিতেছে। কালকে আমরা সর্বগ্রাসক বলি। এই পর্যায়ে কালের একটি নাম মৃত্যু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার একাদশ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দেখিয়া ভীত অর্জুনকে বলিতেছেন:

> কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
>
> লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

"আমি লোকসমূহের গ্রাসকর্তা প্রবৃদ্ধ (সমুন্নত) কাল; এখন সকলকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছি।"

মৃত্যুরূপী কাল শ্রীভগবানেরই বিভূতি। সৃষ্টি ও স্থিতি যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়, লয়ও সেইরূপ তাঁহারই ইঙ্গিতে ঘটিয়া থাকে। আমরা যদি এই সত্যকে মনে রাখি তাহা হইলে সর্বগ্রাসী কালের প্রতি ভয় ও বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া আমরা কালকে ভক্তিভরে নমস্কার করিতে শিখি।

ভর্তৃহরি তাঁহার 'বৈরাগ্য শতক' গ্রন্থে কালকে এইভাবে বন্দনা করিয়াছেন :

সা রম্যা নগরী মহান্ স নৃপতিঃ সামন্তচক্রং চ তৎ,
পার্শ্বে তস্য চ সা বিদগ্ধপরিষৎ তাশ্চন্দ্রবিম্বাননাঃ।
উদ্বৃত্তঃ স চ রাজপুত্রনিবহস্তে বন্দিনস্তাঃ কথাঃ,
সর্বং যস্য বশাদগাৎ স্মৃতিপথং কালায় তস্মৈ নমঃ॥

"সেই সুরম্য রাজধানী, সেই পরাক্রান্ত রাজা, তাঁহার সামন্তমণ্ডলী রাজসভার সেই পণ্ডিতবৃন্দ, সুন্দরী নর্তকীগণ, উচ্ছৃঙ্খল সেই রাজপুত্রেরা, স্তুতি-গায়কগণ ও তাহাদের সেই চাটুকথা—এই সবই যাঁহার দ্বারা কবলিত হইয়া এখন দূর অস্পষ্ট স্মৃতি-রূপে পরিণত হইয়াছে সেই কালরূপী শ্রীভগবানকে নমস্কার করি।"

প্রাত্যহিক জীবনে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর, শতাব্দী—এই বিভাগগুলি দিয়া আমরা কালের পরিমাপ করি। সংস্কৃত ভাষায় পল, দণ্ড, প্রহর প্রভৃতি কালখণ্ড-গুলিও সুপ্রচলিত। পূজা পার্বণে কালের এই অংশগুলি ব্যবহৃত হয়। বর্তমান জ্যোতির্বিদ্যা এবং পরমাণুবিদ্যা কালের বিভাগকে এত বৃহৎ এবং এত ক্ষুদ্র পরিমাণে লইয়া আসিয়াছে যে উহারা আমাদের কল্পনাতীত। অসীম নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমালা (galaxy)-র জগতে যে-সব ঘটনা বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং করিতেছেন তাহাদের বুঝিতে হয় লক্ষ লক্ষ বৎসরের পরিমাপে। পক্ষান্তরে পরমাণু জগতের ঘটনাসমূহ বর্ণনা করিতে গেলে মাইক্রো সেকেণ্ড (১ সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগ) এবং ন্যানো সেকেণ্ড (১ সেকেণ্ডের দশ সহস্র কোটি ভাগ)-এর ধারণার প্রয়োজন হয়। বুদ্ধি দিয়া যাহা আমরা ধরিতে পারি না বৈজ্ঞানিক গণিত শাস্ত্রে তাহা সুনির্দিষ্ট সত্য

একটি পরমাণুর মধ্যে যাহা ঘটিতেছে তাহা ভৌতিক জগতের ছোট-বড় প্রত্যেক অংশে ক্রিয়াশীল—কেননা পরমাণুসমূহ যাবতীয় ভৌতিক বস্তুর (Material Substance) উপাদান। অতএব ১ সেকেণ্ডের দশ সহস্র কোটি ভাগ কালখণ্ডে কালপ্রবাহের আরম্ভ যদি আমরা ধরিয়া লই এবং ঐ কল্পনাতীত অতিক্ষুদ্র সময়ে যে পারমাণবিক স্পন্দন ঘটে উহাকে যদি আমরা ঘটনার একক (point-event) বলি, তাহা হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের কাছে বিভিন্ন পরিমাণের স্পন্দনসমষ্টি হইয়া দাঁড়ায় না কি? একটি সামান্য স্থূল ঘটনা অগণিত অনির্বচনীয় অপ্রত্যক্ষ ঘটনাবিন্দুর সংহতি। যে কালকে আমরা এক সেকেণ্ড বা অর্ধ সেকেণ্ড বলিয়া ভাবনা করিতে অভ্যস্ত, তাহার মধ্যে যে কত কোটি ক্ষুদ্র কালখণ্ড রহিয়াছে তাহা আমাদের চিন্তার অগ্রাহ্য হইলেও উহার বৈজ্ঞানিক সত্যতাকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

অনির্বচনীয় ক্ষুদ্র হইতে অকল্পনীয় বৃহতের দিকে কাল ছুটিয়াছে। ইহার সীমা নির্ণয় মানুষের বুদ্ধির বাহিরে। মানুষ যতটুকু কল্পনা করিতে পারে তাহা কালের সমগ্র মহিমার অতি ক্ষুদ্র অংশ—দিন, সপ্তাহ, মাস, ঋতু, বৎসর, সহস্র বৎসর, লক্ষ বৎসর, কল্প ইত্যাদি। কালের বিস্তার, গতি এবং প্রভাব অনুভব করিয়া মানুষ বিস্ময়স্তব্ধ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, কালঃ কলয়তামহম্—"আমি পরিমাণ বা গণনাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাল।" (গীতা ১০।৩০) বাস্তবিক কালের পরিমাপ ক্রিয়ার সহিত মানুষ বা দেব, যক্ষ প্রভৃতি কোনও শক্তিমানের গণনা বা পরিমাপ চেষ্টার তুলনা করা যায় না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চেতন অচেতন ক্ষুদ্র বৃহৎ, নিকট সুদূর সকল বস্তুর আবির্ভাব, গতি ও তিরোধান কাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কালের তুলাদণ্ড নিখুঁত। উহাতে যাহা মাপা হয় তাহাতে একটুও ভুল ভ্রান্তি নাই।

*

কালের কঠোর ও অব্যর্থ নিয়ম ও শাসন অনেক সময়ে মানুষের অসহ্য মনে হয়। তাহার হৃদয়ে একটি তীব্র বিদ্রোহ জন্মিতে থাকে। কালকে জয় করা যায় কি? কালের উর্ধ্বে উঠা কি সম্ভবপর? এইরূপ প্রশ্ন চিত্তে জাগিতে থাকে। মহাকবি শেক্স্পীয়ার তাঁহার একটি নাটকে জনৈক মৃত্যুশয্যাশায়ী সৈনিকের মুখে কালের প্রতি এই শাসন বাক্য শুনাইতেছেন :

"প্রাণের দাসত্ব করে মন
প্রাণ হল কালের কিঙ্কর
কাল—যাহা সমগ্র পৃথ্বীরে
পরিমাপ করি ছুটিতেছে
চাই, চাই তার প্রতিরোধ।"*

আমরা যখন সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হই তখন আমাদের কাছে কাল প্রতিরুদ্ধ হয়। সুষুপ্তিতে কালের জ্ঞান থাকে না। কোন কারণে সংজ্ঞাহীন হইলেও আমরা কালের বোধ হারাই। জাগ্রত অবস্থাতেও আমাদের মনোযোগ কোন একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যাপারে যদি অত্যন্ত নিবিষ্ট হয় তাহা হইলে আমরা সময় ভুলিয়া যাই। কিন্তু এই সকল কাল-প্রতিরোধ প্রকৃতিরই ঘটনা—কালেরই খেলা, কালেরই ইচ্ছায় তাহার প্রভাব হইতে সাময়িক মুক্তি মাত্র; কালের পরাজয় নয়।

কালের যথার্থ নিবৃত্তি ঘটে আধ্যাত্মিক সত্যে—চৈতন্যে। কালের যিনি উর্ধ্বে, কাল যাঁহার কিঙ্কর তাঁহাকে আমাদের শাস্ত্রে **মহাকাল** বলা হইয়াছে। মহাকাল হইলেন ঈশ্বর বা পরমপুরুষ। দেশ (space) কাল (time) নিমিত্ত (causation)-কে একসঙ্গে মায়া বলা হয়। ঈশ্বর এই মায়া সহায়ে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিধান করেন। জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু মায়ার অধীন কিন্তু পরমাত্মা হইলেন মায়ার অধীশ্বর। মায়া তাঁহার হাতের যন্ত্র। যন্ত্র ঘুরিতেছে কিন্তু যন্ত্রী ঈশ্বর এই ঘূর্ণনে নির্লিপ্ত। পরমাত্মা চৈতন্য স্বরূপ। ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ—কালের এই তিন বাহু চৈতন্যকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার দশম অধ্যায়ের ত্রিশ শ্লোকে কাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে—"কালঃ কলয়তামহম্"। এখানে কাল অর্থে পরিণামী কাল—মায়ারূপী মৃত্যুরূপী কাল। এই কাল শ্রীভগবানের এক বিভূতি। গীতার ঐ একই অধ্যায়ের তেত্রিশ শ্লোকে পড়ি—"অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ"। "আমিই অক্ষয় কাল এবং বিশ্বতোমুখ কর্মফল-বিধাতা।" অক্ষয় কাল ও মহাকাল একার্থক।

শ্রীভগবানকে আমরা যে কোন নামে ডাকি এবং যে কোন ভাবে চিন্তা করি তিনি মহাকাল—কালগতির উপরে। শিব বা বিষ্ণু বা কালী সকলেই "অক্ষয়ঃ কালঃ"। ত্রিকালাতীত চৈতন্য-সত্তাই ঈশ্বরের স্বরূপ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (১।৩) বলিতেছেন : "যঃ কারণানি নিখিলানি তানি, কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।" "যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা কাল ও জীব প্রভৃতি নিখিল কারণ-সমূহকে যথানিয়মে পরিচালিত করেন।"

ত্রিকালাতীতত্ব পরমেশ্বরের এক বিশিষ্ট মহিমা। এই মহিমার সহিত সংযুক্ত করিয়া ভক্ত যত উপাস্য ভগবানকে ধ্যান পূজা আরাধনা করিয়া চলেন ততই তিনি কালের প্রভাব হইতে মুক্ত

---

* Thought is the slave of life,
And life time's fool;
And time, that takes survey of all the world,
Must have a stop.

(*King Henry IV Part I, IV*)

হইতে থাকেন। কালপ্রবাহে যে অসংখ্য ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে উহাদের সহিত ভক্ত নিজেকে বেশি জড়াইয়া ফেলেন না। তিনি জানেন, শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় সঙ্কেতে ও শক্তিতে উহারা ঘটিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু' ভক্ত এই ভাবটি তাঁহার জীবনে সাধিয়া চলেন। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে আমরা পড়ি—"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—"জগতে যাহা কিছু কালস্রোতে নিয়ত ধাবমান তাহাদিগকে ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্তা দিয়া আবরণ কর।" অর্থাৎ কালের পিছনে মহাকালকে ধরিতে শিখ। তাহা হইলে কালের সাগরে আর তোমাকে হাবুডুবু খাইতে হইবে না। কালের অন্তিম ভ্রূকুটি মৃত্যু যখন আসিবে তখনও তোমার হৃদয় কাঁপিবে না।

কঠোপনিষদের "ঋতং পিবন্তৌ" এই শ্লোকটি[১] এবং মুণ্ডক উপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রটি[২] জীবাত্মা ও পরমাত্মার একই স্থানে অবস্থানের ইঙ্গিত করে। মর্মার্থ:

আমাদের হৃদয়-গুহায় প্রবেশ করিয়া দুইটি পুরুষ আপন আপন কাজ করিয়া চলিয়াছেন—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই সত্য সম্বন্ধে অবহিত। শাস্ত্রোক্ত কর্ম যাঁরা করেন তাঁহারাও এই কথা বলেন। এই দুই পুরুষ আলো ও ছায়ার মতো আলাদা বলিয়া মনে হয় (যদিও স্বরূপত তাঁহারা এক)।

দেহ যেন একটি বৃক্ষ। উহার উপর এবং নিচু দুইটি ডালে দুটি পাখী বসিয়া। উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব। উহারা দেখিতেও এক প্রকার (উভয়েরই সত্তা চৈতন্যময়)। নিচের ডালের পাখীটি বড় চঞ্চল, বিচিত্র আস্বাদযুক্ত নানা ফল আস্বাদ করিতে ব্যস্ত। উপরের পাখীটি কিন্তু লাফঝাঁপ করিতেছে না, স্থিরভাবে চোখ মেলিয়া দেখিতেছে।

নিচের পাখীটি কালবদ্ধ জীবাত্মার প্রতীক, উপরেরটি পরমাত্মার—মহাকালের। জীবাত্মার কালবশ্যতা ঘুচিয়া যায় যখন সে নিজেকে জানিতে পারে। নিচের পাখীটি যদি উড়িয়া উপরের পাখীর নিকট যায় তাহা হইলে তাহাদের সখ্য বাড়িতে থাকে, অবশেষে নিচের পাখী উপরের পাখীর মধ্যে মিলাইয়া যায়।

মানুষের হৃদয়ে জন্মহীন মৃত্যুহীন চিরশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা মহাকাল বসিয়া আছেন। তিনি সুদূর নন, সুদুর্লভও নন। যতক্ষণ তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি ততক্ষণ আমি কালের ক্রীড়নক জীবাত্মা। ভক্তি দ্বারা, বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞানবিচার দ্বারা মহাকালকে জানিতে পারা যায়। এই জ্ঞানই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। এই জ্ঞান হইলে মানুষের জীবত্ব ঘুচিয়া যায়—সে পরম-শিবত্ব-মহাকালত্ব লাভ করে।

১ ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ (কঠ উঃ ১।৩।১)

২ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥ (মুণ্ডক উঃ ৩।১)

বর্তমান নারীসমাজ ও শ্রীশ্রীমা

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

['পদ্মশ্রী' বিভূষিতা প্রবীণা লেখিকা জ্ঞানপীঠ, রবীন্দ্র, লীলা, সাহিত্য আকাদেমী প্রভৃতি পুরস্কারে সম্মানিতা। বিগত ২ এপ্রিল ১৯৮৩, উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের সান্ধ্য অধিবেশনে লেখিকা কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।]

'বর্তমান নারীসমাজ ও শ্রীশ্রীমা' এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ভাবতে হয়, দেশে আজ নারীসমাজের প্রকৃত অবস্থাটি কী ?

বহু সমস্যা-জর্জরিত বর্তমান সমাজে আজ নারীসমাজের অবস্থা যে অধিকতর জটিল, যন্ত্রণাময় আর সমস্যা-কণ্টকিত, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

তাই আজকের নারীসমাজের মধ্যে দিনে দিনে বেড়ে চলেছে ক্ষোভ, বিক্ষোভ, হতাশা।

অথচ একথা তো ঠিক, দেশে কিছুকাল আগে পর্যন্তও সমাজের অনগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মেয়েদের যে নিরুপায়তার মধ্যে কাটাতে হয়েছে, আজ তার অবসান ঘটেছে।

আইনের চোখে আজ নারী পুরুষ সমান।

অন্তঃপুরের অবরোধ ভেঙেছে।

কর্মক্ষেত্রের সকল ক্ষেত্রেই আজ মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত।···আর সে অধিকারের যোগ্যতাও দেখাচ্ছে মেয়েরা। অবরোধ থেকে বেরিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা জলে স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে শক্তির স্বাক্ষর রাখছে।

জজ ম্যাজিস্ট্রেট মন্ত্রী পুলিশ কোন ভূমিকাই আজ মেয়েদের কাছে নতুন নয়। খেলাধুলায়—এমনকি পর্বত অভিযানেও মেয়েরা পিছিয়ে নেই।

অতএব ধরে নেওয়া যায় নারীসমাজ আজ মুক্ত জীবনের অধিকারিণী।

তবে ?

তবু কেন আজ নারীসমাজে ক্ষোভ, বিক্ষোভ, হতাশা ? কেন দিনে দিনে উত্তাল হতে চায় 'নারীমুক্তি আন্দোলন' ?

এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দায়িত্ব আজ সকলেরই।

পুরুষসমাজকেও আজ সত্যকার সততার সঙ্গে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে। এবং নারী-সমাজকেও তো বটেই।

ভেবে বার করতে হবে কেন শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়, এবং অনেক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েও, আজও সমাজে মেয়েদের প্রকৃত অবস্থা—নিরুপায়ের।

কেন দেশে ক্রমেই বেড়ে চলেছে নারী-নির্যাতন, জঘন্য অত্যাচার, আর ঘরে ঘরে 'পণ' নিয়ে নির্মম নিষ্ঠুরতা, আত্মহত্যা, বধূহত্যা ?

এ ব্যাপারে গ্রাম-গঞ্জের মেয়েদের সঙ্গে শহরের উচ্চ শিক্ষিত সমাজের মেয়েদের অবস্থার বিশেষ পার্থক্য নেই।

খুবই দুঃখের স.ঙ্গ স্বীকার করতে হয় মেয়েদের দুরবস্থার একটা বড় কারণ মেয়েরাই। মেয়েরাই মেয়েদের প্রতি সব থেকে সহানুভূতিহীন।

তা না হলে, দেশে এত বধূ নির্যাতন, আত্ম-হত্যা, বধূহত্যার ঘটনা ঘটতে পারত না। অত্যাচারী পুরুষের সহায়ক হয় তার মা-বোন, মাসি-পিসি।

নিষ্ঠুরতা নৃশংসতায়, অশিক্ষিত সমাজের কথা তো বাদই দিচ্ছি, শিক্ষিত অভিজাত ঘরের মেয়েরাও যে কোথায় পৌঁছতে পারে, তার নমুনা তো আমরা নিত্যই খবরের কাগজে দেখছি।··· তার মানে, শিক্ষা সভ্যতা স্বাধীনতা, কোন কিছুই বর্বরতাকে ঠেকাতে পারছে না।

এর সঙ্গে আছে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান

হার। যা থেকে মেয়েরাই হচ্ছে বেশি বিড়ম্বিত। স্বাধীনভাবে একা থাকার উপায় নেই তাদের, ছেড়ে আসা পিতৃগৃহেও মর্যাদার আসন নেই।

অথচ স্বামিগৃহে অত্যাচারের জ্বালায় বেশি ক্ষেত্রে মেয়েরাই চাইছে বিবাহ-বিচ্ছেদ। অত্যাচার ছাড়াও আরও একটি কারণও আছে। সেটা হচ্ছে দাম্পত্যজীবনে মানিয়ে নিতে পারার ক্ষমতার অভাব। বিশেষ করে শিক্ষিত অভিজাত সমাজে।

অতএব এখন সমাজের একটি বৃহৎ অংশের চেহারা এই, স্বামী স্ত্রী যেন দুটি আলাদা শিবিরের বাসিন্দা। পরস্পরের প্রতি মনোভঙ্গি 'প্রতিপক্ষের'। কেউ এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ।

সুবিধাবাদী ছেলেমেয়ে কোন শিবিরেই নেই, কারণ অহরহ এই দৃশ্যে তারাও মা-বাপের ওপর শ্রদ্ধা হারাচ্ছে।

কাজেই রণাঙ্গনে দুজনে মুখোমুখি।

এর ফলে অসহিষ্ণুতা তুঙ্গে উঠছে, তুচ্ছ মতান্তর উচ্চ পর্যায়ের মনান্তরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। ...আর ক্রমেই যেন এই বিড়ম্বিত দাম্পত্যজীবন থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছে তীব্র হয়ে উঠছে।

বলছি না যে সবাই ওই শেষ পরিণতিতে পৌঁছচ্ছে, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপক হার দেখলে ব্যাপারটাকে স্রেফ 'দাম্পত্য কলহেশ্চৈব' বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না।

অবশ্য দুই শিবিরের বাসিন্দা কিছু আর সকলেই নয়। তবু বর্তমানে, আধুনিক নারীসমাজ নানা কারণেই ক্লান্ত, পীড়িত।

ক্লান্ত তো হবেই, জীবনের দায় যে বড় বেশি ভারী হয়ে উঠেছে তাদের।

কী পারিবারিক, কী সাংসারিক, কী সামাজিক সকল জীবনের সমস্ত দায়িত্বের চাপই আজ মেয়েদের উপর।

অথচ আজকের নারীসমাজ উপার্জনের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই। আর কর্মক্ষেত্রে 'মেয়ে' বলে কিছু রেহাইও নেই।

এর ওপর আছে তার 'ঘর'। সেটা তো সামলাতেই হবে। ঘর আর বার দুই সামলাতে সামলাতে মেয়েরা আজ জেরবার হয়ে যাচ্ছে।

আর সেই সামলানোটি দিব্যি হয়ে যাচ্ছে দেখে, সংসারে পুরুষের ভূমিকা ক্রমেই হয়ে যাচ্ছে নিষ্ক্রিয়।

তাঁদের অবচেতনে যেন এই ভাব, মহিলারা যখন স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, এবং সেই অর্জনের খাজনা জোগাতে অসাধ্য সাধনের সাধনা করছেন, তখন করুন সব। আমি আর ওর মধ্যে নেই।

হয়তো এর পিছনে আরও একটি কারণ আছে। মেয়েদের মধ্যে তাদের এই কর্মক্ষমতার সঙ্গে এসে জুটেছে অতিমাত্রায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য

এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ডেকে আনছে পরমত-
তা। মনোভাব যেন 'আমার কথাই শেষ কথা। তার ওপরে আর কোন কথা নেই।'

এই মনোভাবের ফলে সংসার-ক্ষেত্রে—স্বামী তো দূরস্থান, বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনদের কথারও কোন দাম নেই, নেই তাঁদের দীর্ঘ সংসারজীবনের অভিজ্ঞতার কোনও মূল্য

যেন বয়স্করা সবাই অর্বাচীন।

আজকের প্রথম 'মা' হওয়া মেয়েও মা-ঠাকুমা-শাশুড়ীকে অজ্ঞ আনাড়ি বলে নস্যাৎ করে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। একমাত্র ভরসা ডাক্তার। অতএব কথায় কথায় ডাক্তারের শরণ নেওয়া।

এই মেয়েদের দিক থেকে ভেবে দেখা হয় না, যে কৃতী স্বামীর ওপর ভর করে তার জীবন, সে লোকটা ওই আনাড়ি মায়ের হাতেই মানুষ। আজকের দিনের মতো একটি দুটিই নয়, অনেকগুলি সন্তানের দায়িত্বই থাকত আগের মায়েদের।

তা আজকের ছেলেমেয়েরা যে কেমন 'মানুষ' হচ্ছে তার নমুনাও দেখা যাচ্ছে। আজকের

মায়েদের ছেলেমেয়েদের শাসনে রাখার ক্ষমতা কোথায়? সব তো লাগামছাড়া।

আয়ত্তে রাখার উপায় শুধু তোয়াজ আর প্রশ্রয়। নাঃ, আর কোন উপায় জানা নেই মায়েদের।

গুরুজনকে অবজ্ঞা, আর লঘুজনকে তোয়াজ, এই হচ্ছে আজকের ব্যবস্থা।

'আত্মবিশ্বাস', আর 'আত্মম্ভরিতা' যে এক নয় এইটা ভুলতে বসেছে আজকের মেয়েরা, তাই ওই দুই শিবির।

কিন্তু ভুলে গেলে তো চলবে না, একদা এদেশে অবরোধের আড়ালে থাকা মায়েদের কাছ থেকেই দেশ উপহার পেয়েছে—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষের মতো সন্তান! আর —'সমগ্র পৃথিবী' উপহার পেয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দের মতো মহাজীবন।

সেই মায়েরা 'নারীমুক্তি' শব্দটাই হয়তো জানতেন না, কিন্তু তাঁদের মানসিক উৎকর্ষের গভীরতা মুক্তির দূতদের মানুষের ঘরে নামিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিল।

আজকের দিনের বহু শিক্ষায় শিক্ষিতা মায়েদের কাছ থেকে দেশ কি এমন সব সন্তানের আশা করতে পারবে?

সকল শক্তির প্রধান শক্তি সহ্যশক্তি!

দুঃখের সঙ্গেই দেখা যায়, আজকের বহু শক্তিতে শক্তিময়ী নারীসমাজের মধ্যে এই শক্তিটির একটু অভাব।

তাঁরা 'পরমত-অসহিষ্ণুতার' পরম ব্যাধিতে আক্রান্ত।

অথচ শিক্ষা, সংস্কৃতি আর সভ্যতার প্রথম পাঠই হচ্ছে—'পরমত-সহিষ্ণুতা।'

কিন্তু এখন তো সমাজে দেখা যায়, 'শিক্ষা' মানে ডিগ্রী, 'সভ্যতা' মানে অতি আধুনিকতা, আর 'সংস্কৃতি' মানে নাচগান।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চয় এর জন্যে অনেকাংশেই দায়ী। বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে।

মেয়েদের জীবনে—

কেবলমাত্র 'কেরিয়ার' গড়ার চিন্তা ছাড়াও যে আরও কিছু বিশেষ চিন্তার দরকার, এটা মানা হয় না।

তাদের যে শুধু 'অফিসার' হলেই কর্তব্য ফুরোবে না, হতে হবে বধূ, জননী, গৃহিণী,—একথা কে ভাবছে?

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় চরিত্র-গঠনের শিক্ষা গৌণ, গৌণ নীতিবোধের শিক্ষা, নম্রতার শিক্ষা, লোক-ব্যবহারের শিক্ষা, পরার্থপরতার শিক্ষা, আর দেশের দশের জাতির এবং পরিবারের প্রতি যে একটি দায়িত্ব আছে, সেই বোধটি এনে দেবার শিক্ষা।…কারণ আজ শিক্ষায় রাজনীতি। আর রাজনীতি সমাজের সব নীতিকে বিকৃত করে ছেড়েছে।

যাক এ তো অরণ্যে রোদন, এ রোদনের শেষ নেই।…

তবে আমরা মেয়েরা যদি সত্যিই একটি স্থিতি স্থিরতা শান্তি চাই, তো নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে একটি যথার্থ শিক্ষার আশ্রয়। খুঁজে নিতে হবে কল্যাণের পথটি কী?

যদি 'মুক্তি' চাই তো চেষ্টা করতে হবে মানসিক মুক্তির। যে মুক্তি আসে বাসনা-মুক্তির পথে, আসক্তি-মুক্তির পথে।

এই মুক্তির মূর্তিমতী প্রতিমা আমাদের ঘরেই মজুত। শুধু তাকিয়ে দেখা চাই।

বর্তমান নারীসমাজের এত শক্তি, এত গুণ, এত কৃতিত্ব সত্ত্বেও আজ তাদের অবস্থা এমন ক্ষুব্ধ উত্তাল কেন—এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে এই-খানেই আসতে হবে।

ভাবতে হবে 'মা কেন এসেছিলেন?' আর এসেছিলেন কি শুধু সমকালের জন্যেই? পরবর্তী চিরকালের জন্যে নয়?

মা সেদিন দেশের শিক্ষা-দীক্ষায় অধিকারহীন মেয়েদের জন্যে বলেছিলেন, 'ওরে অন্ধকারে আলো জ্বেলে দে—'

সে আলো যদি আজ বহির্জগতের প্রবল বাতাসে আগুন হয়ে জ্বলে উঠতে চায়, তার ব্যবস্থাও মা-ই করবেন।

তবে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন।

আজ আমাদের আত্মসমীক্ষা করে দেখতে হবে, আমরা মেয়েরা কেবলমাত্র পুরুষশাসিত সমাজের অবহেলার জন্যেই এমন নিরুপায়, না আমাদের মধ্যেও বড় কিছু ভুল আছে।

কেবলমাত্র একপক্ষের অসতর্কতাই সমাজে ভাঙন ডেকে আনতে পারে না। অসতর্ক আজ নারী পুরুষ দুপক্ষই। হয়তো বা নারীসমাজই বেশি।

আমাদের আজকের জীবন ভারতবর্ষের চির-কালীন মূল্যবোধগুলিকে বিসর্জন দিতে দিতে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে পাশ্চাত্যের মতাদর্শে। সমাজ দ্রুত ঢালাই হয়ে চলেছে পাশ্চাত্যের ছাঁচে। যে ছাঁচটি কেবল ভোগবাদের, আর আত্মকেন্দ্রিকতার।

ধরে নেওয়া হচ্ছে এই ছাঁচই শ্রেষ্ঠ, অতএব অনুকরণীয়।

আহারে-বিহারে, আচারে-আচরণে, চিন্তায়-চেতনায় স্বকীয়তা হারাতে হারাতে আমরা যেন ছাঁচের পুতুল হয়ে পড়তে চাইছি।

অথচ যেখানে অনুকরণযোগ্য যে-সব সৎ মহৎ বস্তুগুলি রয়েছে সেগুলি গ্রহণ করায় তৎপরতা নেই।

তৎপরতা শুধু বহিরঙ্গের ছাঁচের দিকে অগ্রসর হওয়ায়। আর এ তৎপরতা যে—আমাদের মেয়েদের মধ্যেই বেশি, সেটা অস্বীকার করা যায় না। ভোগবাদের প্রবণতা আজ মেয়েদের মধ্যেই সমধিক।

কিন্তু যে-ব্যবস্থা ঐশ্বর্যশালী দেশকে মানায়, তা কি দরিদ্র দেশে মানায়?

সেই বেমানান জিনিসকে জীবনে টেনে আনার চেষ্টা, আমাদের অনেক শুভকে বিনষ্ট করছে।

বিনষ্ট করছে শান্তি স্বস্তি নিশ্চিন্ততা। আড়ম্বরের আয়োজনকে আহরণ করাতে উদ্‌ভ্রান্ত করে ছোটাচ্ছে।

আজকাল আর আমাদের মেয়েদের মধ্যে অবস্থার তারতম্যের হিসেব নেই। 'আমার ধনী আত্মীয়ার ঘরকন্নার সমতুল্য সাজসজ্জা, আমার ঘরকন্নার চাই।…আমার ধনী প্রতিবেশিনীর ছেলেমেয়েরা যে স্টাইলে মানুষ হচ্ছে, আমার ছেলেমেয়েদের জন্যেও সেই স্টাইল চাই।'…

না হলেই অসন্তোষের আগুন।

অতএব জোগাড় করতেই হবে তার রসদ। তার জন্যে নীতি-দুর্নীতির প্রশ্নও বাতিল।

ছেলেমেয়েই বা কী শিখছে এ থেকে?

দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আজ দুর্নীতির বাসা, সে কি এই অধিক চাহিদার প্রাবল্যেরই ফলশ্রুতি নয়?

যার গাড়ি নেই, তার গাড়ি চাই; যার আছে, তার দুখানা চাই। চাই চাই অনেক চাই। জীবন বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত, তবু আরও বস্তুপুঞ্জ জমিয়ে তোলা চাই।

এই চাইয়ের চাহিদা মেটাতে মেটাতে—একটা লক্ষ্যবস্তু পাওয়া হয়ে গেলেই আর একটার জন্যে ছুটতে ছুটতে, আমরা চিন্তার সম্পদে দেউলে হতে বসেছি।

তা নইলে এটুকু কেন ভাবতে পারছি না, আমরা আজ অন্ধ হয়ে যাদের সমাজের ছাঁচে ঢালাই হতে চাইছি, তারা কি তাদের—সেই সমাজ নিয়ে সুখী, শান্ত, নিশ্চিন্ত? তারা কি তাদের ভেঙে পড়া পারিবারিক জীবন আর নিরাপত্তাহীন দাম্পত্যজীবন নিয়ে যন্ত্রণা ভোগ করছে না?

অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতা, আর অতিরিক্ত

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কি ক্রমশই তাদের মানবিক 'সমাজ চেতনা' থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে নেহাতই 'জীব জগতে' পেঁছবার পথে ঠেলে দিচ্ছে না ?

আমরা কি দেখে শিখব না ? ঠেকেই শিখতে হবে ?

যুগ যুগান্তরের অনুশীলনে যে সমাজ সংস্কৃতিটি গড়ে উঠেছিল—পূর্ণ মনুষ্যত্বের অঙ্গীকার নিয়ে সেই সংস্কৃতিকে বাতিল করে দিয়ে পশুপক্ষী জীব জগতের মতো কেবলমাত্র যুগল জীবনকে শ্রেয় ভাবাই কি সত্যি শ্রেয় ? অথচ আধুনিক জীবন তো সেই দিকেই ছুটতে চাইছে।

মাত্র যৌবনাশ্রিত দিনগুলি ছাড়া এ জীবনের আশ্রয় কোথায় ?

অবশ্য একথা বলছি না, সবাই একই পথে চলছে, সুস্থ পারিবারিক জীবন কোথাও নেই। আছে অবশ্যই।

একটি বৃহৎ সমাজকে তো একই মাপকাঠিতে মেপে ফেলা যায় না।

জীবন বিচিত্র, মানব চরিত্র বহু বিচিত্র, পরিবেশও নানা রঙের। তাই সমাজে অনেক রঙেরই প্রতিফলন।

খেটে-পিটে হাড়কালি করা সর্বংসহা গৃহিণী মূর্তিও কি দেখতে পাওয়া যায় না ? হয়তো সে বেচারীর সংসারজীবনের সম্বল দায়িত্বে— উদাসীন স্বামী, অবাধ্য পুত্র, উদ্ধত কন্যা, মেজাজী ভৃত্য, আর আকাশছোঁয়া বাজার দর।

তবু সংসারটি তার প্রাণ।

সবকিছু মেনে নিয়ে আর মানিয়ে নিয়েই সকলের সুখ সুবিধার জন্যে প্রাণপাত করে চলেছে সে।

আবার একান্তই বিরল হলেও, সুখী শান্ত একান্নবর্তী পরিবারও যে এখনও একেবারে চোখে পড়ে না তা নয়

সেখানে এখনও দেখতে পাওয়া যায় অতিশয় সংসারনিষ্ঠ কর্তা, আহ্লাদে ভাসা দাপুটে গিন্নী, সেবাপরায়ণা বধূ, কর্তব্য-সচেতন পুত্র, ধুতি-গেঞ্জি পরা পুরাতন ভৃত্য। এবং পারিবারিক বন্ধনের গভীরতা, গুরু-লঘু-জ্ঞান, সহজাত অভ্যাসের মধ্যে ভারতীয় জীবনের মূল্যবোধগুলি সুরক্ষিত।

খুবই বিরল দৃশ্য, তবে দেখা যায়। আর দেখলে প্রাণে আনন্দ আসে।...তবে ও তো 'বিরল'। অধিকাংশকে নিয়েই বিচার।

তা বলে একথা অবশ্যই বলব না, আবার সেই ভেঙে পড়া একান্নবর্তী পরিবারের জীবনকে ফিরিয়ে আনতে পারলেই সকল সমস্যার সমাধান হবে।...

তা হয় না। যুগের সমস্যা যুগকেই বহন করতে হয়।

কিন্তু যুগে যুগে মানবজীবনকে আর তার সমাজজীবনকে রক্ষা করে আসে তার আদর্শ, তার লক্ষ্য।

আজ সেইখানেই আমরা দিশেহারা।

আমাদের আজকের সমাজজীবন যেন নোঙর ছেঁড়া নৌকার লক্ষ্যহীন যাত্রা।

অথচ আমাদের সামনেই রয়েছেন পরম কাণ্ডারী শ্রীশ্রীঠাকুর! পরম আদর্শ শ্রীশ্রীমা!

বর্তমান নারীসমাজকে তার মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে এইখানেই আসতে হবে।

এই প্রশ্নাতীতা পরমা জননীর কাছেই রয়েছে সকল প্রশ্নের উত্তর।

জীবন তো একটাই!

সেই পরম মূল্যবান বস্তুটিকে এলোমেলো ভাবে খরচ করে ফেলার মতো লোকসান আর কী আছে ?

এই লোকসানটি বাঁচাতেই 'মা'। লক্ষ্যহারা যুগকে পথ দেখাতেই শ্রীশ্রীমার আশ্চর্য আবির্ভাব! আশ্চর্য রহস্যময় লীলা।

আদি-অন্তহীন সেই অপার রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করতে যাওয়া বাতুলতা। শুধু এইটুকু

বুঝতে চেষ্টা করাই ভাল, মা কেন এসেছিলেন ?… কাদের জন্যে এসেছিলেন, আর কেন নিয়েছিলেন অমন অতি সাধারণীর আবরণ ?

সেই অতি সাধারণীর আবরণে আবৃতা মার জীবনখানি পর্যালোচনা করতে পারলে ধরা পড়ে শান্তি কোথায়, সন্তোষ কোথায়, মুক্তি কিসে ?

মা সারদা যুগে যুগে কালে কালে—স্থির হয়ে থাকবেন সমগ্র পৃথিবীর নারীসমাজের ধ্রুবতারা-স্বরূপ।

অথচ—

কত ছোট্ট ছোট্ট টুকরো টুকরো ঘরোয়া কথায় তাঁর উপদেশ।

'অপরের দোষ দেখতে যেও না মা, দেখবে তো নিজের দোষ ছাখো।'

শুধু এই একটি কথাই যদি মনের মধ্যে সত্যি গ্রহণ করে নেওয়া যায়, তাহলেই তো সকল সমস্যার সমাধান।

'যখন যেমন, তখন তেমন', এটুকু নিতে পারলেও অনেক অসন্তোষ নির্বাপিত হয়ে যায়।

'জগৎ-কে আপনার করতে শেখো। মনে জেনো তুমি জগতের, জগৎ তোমার।' এই হচ্ছে মার সহজ মন্ত্র।

কিন্তু মানবজীবনে এর চাইতে মহামন্ত্র আর কী আছে ?

এমন কত অজস্র মণি মুক্তো ছড়ানো আছে মার জীবনের ছত্রে ছত্রে। এর থেকে দুটি একটি কুড়িয়ে নিতে পারলেই তো একটা জীবনের কাজ মিটে যায়।

তাঁর বাণীই তাঁর জীবন। তাঁর জীবনই তাঁর বাণী। দুটোয় আলাদা করা যায় না। এক ও অখণ্ড।

চোখ বুজে ছুটে চলাটা একটু থামিয়ে আজ আমাদের একবার ভাবতেই হবে নারীজীবনে কৃতিত্বই শেষ কথা কিনা, স্বাধিকারই পরম প্রাপ্তি কিনা, নারীমুক্তি-আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে ওঠাই মুক্তির প্রকৃত পথ কিনা।

আর তা যদি না হয়, এই অখণ্ড মহিমার কাছে আত্মসমর্পণই শান্তির পথ কিনা।

যাঁরা তেমন সমর্পণ মন্ত্র পাঠ করতে পেরেছেন নারীসমাজের সেই একটি বৃহৎ অংশকে তো আমরা দেখতে পাই। তাঁদের দেখলেই বোঝা যায় কী নিরুদ্বেগ, অচঞ্চল, নিশ্চিন্ততা! তাঁদের মুখের ছবিতেই ফুটে থাকে একটি পরম প্রাপ্তির প্রশান্তি।

'আমার সব ভার মায়ের ওপর।'

এই প্রশান্তির ছবিটিই তো বিশ্বাস এনে দেয়।

এখানে শরণ নিতে আসতে অতি আধুনিকা-দেরও দ্বিধার কিছু থাকার কথা নয়।

সেকালের মেয়ে মা সারদাদেবী তো 'সেকেলে' নয়।

তাঁর মতো এমন উদার আধুনিক, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি আর কোথায় মিলবে ?

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা আর মহৎ ভাবধারাগুলির এক আশ্চর্য সমন্বয় শ্রীশ্রীমা।

বহু সমস্যা-জর্জরিত আজকের উদ্‌ভ্রান্ত আর ভ্রান্ত সমাজকে এই সমন্বয়ের মন্ত্রটি পাঠ করতেই হবে।

আর আমাদের মেয়েদের বলতেই হবে 'মা, আমরা যেন তোমায় মা বলে ডাকবার যোগ্য হতে পারি।'…আর জগৎ সভায় মাথা উঁচু করে বলতে পারি, 'আমরা মায়ের দেশের মেয়ে।'

এ হতেই হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আর শ্রীশ্রীমার আবির্ভাব তো অর্থহীন নয়। ব্যর্থ হবার নয়। জগৎকে উদ্ধার করবার জন্যেই।

একদিন সমগ্র পৃথিবীই এইখানে শরণ নেবে

বরিষ্ঠ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

[সাহিত্য আকাদেমী ও রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত খ্যাতিমান প্রবীণ সাহিত্যিক। বিগত ২ এপ্রিল ১৯৮৩, উদ্বোধন কার্যালয়ের সারদানন্দ হলে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে সান্ধ্য অধিবেশনে লেখক কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ।]

আজ এই সভায় আমাকে আহ্বান করার অর্থ আমাকে সকলের মধ্যে উপহাসাস্পদ করে তোলা। স্বামী অজজানন্দ মহারাজ আমার সম্বন্ধে প্রীতিসম্পন্ন বলেই জানতাম—আজকে ভুল আমার ভাঙল। আমি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলার একান্ত অনধিকারী—এটাই বুঝি আমার যোগ্যতা। বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখে খাই, যথার্থ অর্থেই শিক্ষা-দীক্ষা কিছু নেই। না করেছি কোন দিন শাস্ত্রচর্চা, না পেয়েছি কোন সদ্গুরুর চরণাশ্রয়। আমি এখানে কি বলব?

আপনারা হয়তো এক্ষেত্রে প্রশ্ন করবেন—তবে এ দুঃসাহস কেন? "তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবদ্ কিঞ্চিন্ন ভাষতে"! তার উত্তরে বলব—প্রসঙ্গটা যে রামকৃষ্ণ, আমার একান্ত আপনার লোক। তিনি সব রকমের অপাত্রকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েছেন, আশ্বস্ত করেছেন—সুপাত্র করে তুলেছেন। কাউকে ঘৃণা করেননি, অবহেলা করেননি—তাঁর কাছে তো আমাদের সাতখুন মাপ!

অবশ্য তাঁর সন্তানরা তো এখন কেউ নেই—পৌত্র প্রপৌত্ররা এতটা বেয়াদবি সহ্য করবেন কিনা কে জানে—তবে ভরসা আছে—তিনি স্বয়ং তো আছেন মাথার উপর!

যখনই কোন জাতি বা ধর্মের মধ্যে অনাচার চরমে পৌঁছয়, সাধারণ মানুষ পীড়নে নিগ্রহে জীবন-সংগ্রামের শক্তি এমনকি ইচ্ছাও হারিয়ে ফেলে—তখনই ঈশ্বর নরদেহ ধারণ করেন। "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"—এ শুধু গীতারই কথা নয়—সর্বদেশে সর্বকালেই মানুষ একথা বিশ্বাস করে এসেছে, এই আশ্বাস বুকে নিয়েই সে সর্বপ্রকার রিক্ততা সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করেছে।

ক্রীশ্চানরা মোজেস বা মুসার দৃষ্টান্ত দেন, দেন যীশুর দৃষ্টান্ত। ইহুদীদের মধ্যে এককালে ঘৃণ্য জীবনযাত্রা, দেবপূজার নামে জঘন্য অনাচার চরমে উঠেছিল, ঈশ্বরের রোষবহ্নিতে সোডোম ও গোমরা ধ্বংস হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের চৈতন্য হয়নি। মুসা ও বহু পরবর্তী কালে ঈশা বা যীশু আবির্ভূত হয়ে সেই সব গ্লানি ও কলুষ দূর করে সৎ জীবনযাত্রার পথ দেখিয়েছেন। মুসাকে ঈশ্বরের চিহ্নিত ত্রাণ-কর্তা রূপে দেখলেও—যীশুকে সোজাসুজি ঈশ্বর-পুত্র বলা হয়। এই ভাবেই বুদ্ধ অবতাররূপে গণ্য হয়েছেন। শঙ্করাচার্যকে সাক্ষাৎ শঙ্কর বলে প্রচার করা হয়েছে, শ্রীচৈতন্যও শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বীকৃত হয়েছেন। "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" সেই শ্রীকৃষ্ণই রাধার প্রেম ও বিরহ আস্বাদ করার জন্য কাঞ্চন-কান্তি ধারণ করেছিলেন নাকি!

কিন্তু এই নির্বোধের প্রশ্ন, কেন ঈশ্বর বার বার নরদেহ ধারণ করবেন?

অনেকে বলেন লীলা। নিজের সৃষ্টির সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার আস্বাদ নিতেই জগৎপতির এই লীলা—"লীলা সা জগতঃ পতেঃ!" "প্রলয় সৃজন না জানি এ কার যুক্তি / ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা / বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি / মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

স্রষ্টা বা বিধাতা বা ঈশ্বর—যে নামই দিন সেই জগৎপতির—তিনি যদি সর্বত্র সর্বভূতে বিরাজমান হন—তাহলে এসব পাপ অধর্ম অনাচারের মধ্যেও তিনি আছেন। এও তাঁরই ইচ্ছা বা তাঁরই এক রূপ। নয় কি?

কান্তকবির ভাষায়—

"আছ চির নভোনীলে অনলে অনিলে
ভূধর সলিলে গহনে—
বিটপীলতায় জলদের গায়
শশী-তারকায় তপনে।"

বিশ্বের অণু-পরমাণুতে, লক্ষ কোটি নক্ষত্রে গ্রহে যে শক্তি—সেই শক্তিকেই আমরা বিভিন্ন নামে আখ্যাত করেছি—জিহোবা, জোভ আর লর্ড। তাঁরই ইচ্ছায় বা চিন্তায় এ সৃষ্টি, তাঁরই ইচ্ছায় এই ক্ষুদ্র গ্রহে দিনরাত্রির বিবর্তন!

তবে তাঁকে আবার ব্রহ্মাণ্ডের বোধ করি ক্ষুদ্রতম বিন্দু এই পৃথিবী—তার মাটিতে তাঁকে দেহধারণ করে আসতে হবে কেন? যাঁর ইচ্ছার উদ্ভব মাত্রে নিমেষে এ সৃষ্টি ধ্বংস হতে পারে—আবার এক নিমেষপাতে এমন সহস্র গ্রহ জন্ম নিতে পারে—তিনি কেন এত কাণ্ড করতে যাবেন, কী এত মাথাব্যথা?

পণ্ডিতজন ভক্তমণ্ডলী অবশ্যই নানা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে তার একটা ব্যাখ্যা দেবেন—জ্ঞানের জটিলতায় আমাদের মতো অজ্ঞান মূর্খকে স্তব্ধ করে দেবেন—লীলা শব্দটা তো চমক লাগানো ওস্তাদের মার—তবু আমাদের মনে এ প্রশ্ন থাকবেই। আর সে প্রশ্ন তুলতেও দ্বিধা করব না। সে সাহস সে স্পর্ধা বা শক্তি আমরা পেয়েছি এই বাংলাদেশের এক আপাত নিরক্ষর পল্লীবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের কাছ থেকে। সোজাসুজি তাঁর কথা ভাব, সহজ ভাবে তাঁকে ডাক—এত শাস্ত্র, আচার-অনুষ্ঠান, তর্ক-কচকচির প্রয়োজন নেই।

যদি "পরিত্রাণায় সাধূনাং" ঐ সব মহাপুরুষদের আবির্ভাব হবে, যাঁদের আমরা অবতার বলছি, ঈশ্বর প্রেরিত ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বলছি, ঈশ্বরের পুত্র বলছি—তাঁদের তো তাহলে সেইসব পুঞ্জীভূত পাপ বা অনাচার নির্মূল করার কথা। কিন্তু তা কি হয়েছে—কোন দেশে কোন কালে? ইহুদীদের ঘৃণ্য জীবনযাত্রা থেকে মুক্ত করতে, সাধারণ মানুষের মধ্যে সৎচিন্তা আনয়ন করতে যীশুর আগমন—কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর নামে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসীরা উক্ত ধর্মের নামে যে অত্যাচার করেছেন, যে রক্তপাত নির্যাতনের কারণ হয়েছেন—তেমন বোধ হয় চেঙ্গিজ কুবলাই খাঁর দল, তৈমুর নাদির অ্যাটিলার দলও করতে পারেনি। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের এই কলহ ও তার ফলে অকথ্য অত্যাচার দীর্ঘকাল ধরে চলেছে। একই দেশে অল্পকালের মধ্যে পাত্র বদল হয়েছে যেমন প্রোটেস্ট্যাণ্ট অষ্টম হেনরীর পর ক্যাথলিক মেরী, তারপরই আবার প্রোটেস্ট্যাণ্ট এলিজাবেথের কালের ইতিহাস ইংরেজের ইতিহাসে আজও কলঙ্কস্বরূপ হয়ে নেই কি? এ তো ক্ষুদ্রতম এক উদাহরণ। আজ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের যে মতবিরোধ সে তো মাত্র কিছু আচারে ও অনুষ্ঠানে। বুদ্ধের কথাই ধরুন। বৈদিকধর্মের অধঃপতন হতে—জরাগ্রস্ত অবস্থা বলাই ভাল, জড়বস্তুর মতো ধর্মের প্রথা বিশ্বাস আচার-আচরণেও জরার প্রকোপ দেখা দেয়—ব্রাহ্মণদের বিধিনিষেধ ও প্রতাপ যখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল তখনই নাকি বুদ্ধ অবতার দেখা দেন। পূজা অর্চনা উপলক্ষ করেই ব্রাহ্মণদের অত্যাচার—সেই কারণে তিনি ঈশ্বর তথা দেবদেবীদের এড়িয়ে গিয়ে সৎজীবনযাত্রার আদর্শ স্থাপন করবেন, সেইটেই হল মূলত তাঁর ধর্মমত। কিন্তু সেই ধর্মেই কী পর্যন্ত না অনাচার ঢুকল—তান্ত্রিক সাধনার নাম করে কত বীভৎস দেবদেবীর মূর্তি পরিকল্পিত হল! এবং সেই সাধনার দোহাই দিয়ে

সমাজজীবনেও কম অত্যাচার দেখা দেয়নি।

অংশকলাসম্পন্ন অবতারের কথা বাদই দিই-যিনি বহুলোকের কাছে "ভগবান্ স্বয়ম্" রূপে পরিচিত ও পূজিত—তিনি ভারতের ক্ষাত্রশক্তির বহুপুরুষের পুঞ্জীভূত কলুষ দূর করতে নিজের মাতুল থেকে শুরু করে নিজের পুত্রপৌত্রাদিকে বিনষ্ট করতেও দ্বিধা করেননি—তিনিই কতটা সার্থক হতে পেরেছিলেন ভারতভূমিকে অত্যাচার অবিচার অধর্ম অনাচারের পথ থেকে টেনে তুলতে! অপরিণত মনের সংশয়গুলিকে সরলভাবে নির্ভয়ে প্রকাশ করলাম। আগেই বলেছি,—এসব নির্বোধের প্রশ্ন।

এই মূর্খের ধারণা মানুষের প্রয়োজনে মানুষেরই মাঝে মানুষের আকারে অভ্যুত্থান ঘটবে—সৃষ্টিকর্তার এমনিই অভিরুচি। আর সে অভ্যুত্থান ঘটবে দরিদ্র, বঞ্চিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষদের মধ্য থেকেই। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখি তাই ঘটেছে বারবার। যীশু জন্মেছেন মেষপালকের ঘরে, বৃত্তিতে ছিলেন সূত্রধর। হজরত মোহম্মদও সাধারণ ঘরের মানুষ ছিলেন—কিন্তু তাঁর চরিত্রবলে ও পুণ্য জীবনযাত্রাতে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বাসী ভক্তরা অজেয় হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন কারাগৃহে এবং জন্মাবধি মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হয়ে মানুষ হয়েছিলেন গোয়ালার ঘরে।

তাছাড়া যাদের সাহায্যে তিনি এই পাপ বিতাড়ন কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন—সেই পাণ্ডবরা বাল্যাবধি বিত্তহীন, ভাগ্যতাড়িত, প্রবঞ্চিত, দরিদ্র ভিক্ষুকের জীবন যাপন করেছেন অথচ তাঁরাই একদা শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পিত মৃত্যুযজ্ঞের সমিধ সরবরাহ করতে পেরেছেন।

শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, নানক—এঁরাও সাধারণ ঘরের সন্তান—বুদ্ধি ও মনোবল ব্যতীত কোন অসাধারণত্বের সনদ নিয়ে জন্মাননি তাঁরা। এর একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় বুদ্ধদেব, তিনি রাজবংশের সন্তান। তবে রাজ্যও নগণ্য এবং বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে শাক্যসিংহকে দীর্ঘদিন ভিক্ষুক তপস্বীর জীবন যাপন করতে হয়েছিল।

এইসব মহাপুরুষদের জীবনের শিক্ষা ও সাধনার দিকগুলিকে ভুলে, পরবর্তী কালে কেবল অতি অলৌকিক কাহিনী নিয়ে গল্প সৃষ্টি হয়েছে—সে-ও মানুষেরই কীর্তি। দুঃখের এবং আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করছি—ঠাকুর রামকৃষ্ণ সম্বন্ধেও এক শ্রেণীর তথাকথিত ভক্তদের মধ্যে ঐ ধরনের কিছু প্রবণতা ইদানীং শুরু হয়েছে। তাঁর একটি কথা "যে রাম, সে কৃষ্ণ, ইদানীং এই শরীরে সে-ই রামকৃষ্ণ।" ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ পড়ে আমি যা বুঝেছি তাতে আমার বিশ্বাস যে, ঐ কথার মর্মার্থ যত সহজে আমরা লোককে বলে বেড়াই—ঠিক তত সোজা নয়। আমাদের মতো সাধারণ লোক জটিল শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, তাঁর জীবনে ব্যক্ত যে সত্য ও আদর্শ, সেটাই গ্রহণ করলে ধন্য হবে। নর এবং নরোত্তমকে সর্বাগ্রে নমস্কার করার কথা জেনেছি বাল্যকাল থেকেই—সুতরাং যাঁর মধ্যে নর এবং নরোত্তম উভয়কেই প্রত্যক্ষ করেছি সেই নর-দেবের প্রসঙ্গেই এত কথার অসঙ্কোচ অবতারণা।

নরোত্তমদের মধ্যে যিনি আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছেন—যিনি আমাকে সোজাসুজি ভগবানকে ডাকবার সাহস ও অভয় যুগিয়েছেন তিনি হলেন—ঐ যা বললাম—বঙ্গদেশের সামান্য এক পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান—গদাধর চট্টোপাধ্যায়। তথাকথিত শিক্ষা নেই, বিত্ত নেই, বিত্তের কামনাও নেই। নিজের অহঙ্কার নেই, তেমনি কারও অহঙ্কারের পরোয়াও করেন না। এ এক

আশ্চর্য মানুষ—দেব-মানব!

এই দেব-মানব নিজের প্রখর বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন সাধারণের মনে পৌঁছতে হলে সাধারণের কথ্য ভাষায় বলতে হবে, যা কিছু বলবার। (এ অবশ্য বুদ্ধদেবও বুঝেছিলেন, সংস্কৃত ছেড়ে তাই প্রাকৃতে তাঁর বাণী প্রচার করেছিলেন।)

এই সহজ মানুষটি সবচেয়ে যে বড় অভয় দিলেন আমাদের মতো অতি সাধারণ মানুষদের—তা হল: সহজ বুদ্ধিতে সহজভাবে অনায়াসে ভগবানকে ডাকা যায়, সকলেই নিজের মতো করে, নিজের ধারণা ও বিশ্বাস মতো তাঁকে ডাকতে পারে—তার জন্যে জটিল যুক্তিতর্কের, কেতাবী বিদ্যার প্রয়োজন করে না; পরের মুখের উপদেশে জীবন-গঠন বা পরিচালন করতে হয় না—নিজের চারিদিকে ঊর্ধ্বে অধে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে, তাই থেকেই যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করা যায়; তাঁকে ডাকার জন্য, কি পূজার জন্য আচার অনুষ্ঠানের আড়ম্বর অনর্থক; তাঁকে যে কিভাবে ডাকতে হবে এ নিয়ে কলহ বিবাদ রক্তপাত মূর্খতা, অপ্রকৃতিস্থতা।

দীক্ষা? তারও এমন অপরিহার্য দরকার নেই। যে নামে খুশি ডাক, যে রূপে খুশি ধ্যান কর,—যদি ইচ্ছা হয়, মনে পড়ে, দিনান্তে একবার তাঁকে স্মরণ কর, যে নাম প্রিয় সেই নাম উচ্চারণ কর। তাও না পার—সে ভারটাও ঐ শীর্ণদেহ সরল সোজা ব্রাহ্মণের কাঁধেই চাপিয়ে দাও। যদি যথার্থভাবে কায়েন মনসা বাচা সে ভার বা বকলমা দিতে পার—ব্যস ছুটি, দস্যু রত্নাকর মহর্ষি হয়ে যাবেন যেন কোন্ ইন্দ্রজালে।

এই লোকটি শোনালেন, এই পাঁচ টাকা মাইনের পূজারী—পূজোটা ঠিক মতো না করার জন্যে যাঁর চাকরি যাবার কথা—ঝগড়া বিবাদ করে নয়, অন্য মতাবলম্বীদের যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু উত্তম তাকে অধিগত করে বিরোধীদের অনুগত ও অনুরক্ত করা যায়—যার ফলে শিক্ষা ও জ্ঞানাভিমানী ব্রাহ্ম নেতারা তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করলেন। তিনি শেখালেন শাস্ত্র দিয়ে, সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে নয়, উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত বা শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিতদেরও সরল সহজ ভাষায়, সরস কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, সবার পরিচিত দৃশ্য বা বস্তু বা ঘটনার উদাহরণ দিয়ে নিরস্ত করা যায়—ঘোর তর্কজালের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় না গালভারি শ্লোকের কি উদ্ধৃতির বুকুনির।

তিনি দেখালেন হাসিতে তামাসায় গানে গল্পে মানুষকে তার মরলোকের স্তর থেকে দিব্য চিন্তার স্তরে উত্তীর্ণ করা যায়। কত সহজে কত শক্তিশালী ছেলের দল এসে তাঁর ইচ্ছার দাসে পরিণত হয়ে গেল—যারা পরে তাঁর শিক্ষা আদর্শ দেশ থেকে দেশান্তরে প্রচার করল, জয়ী হয়ে এল।

এই লোকটির আত্মিক বলেই যেন পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করল, মূক মুখর হয়ে উঠল। এই লোকটির জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান, যিনি একদা বিদ্যা ও জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জয় করতে এসে নিজে পরাজিত হয়েছিলেন, তিনিই জগতের ধর্ম-প্রচারকদের সম্মেলনে বিশ্ববাসীকে শোনালেন, মানুষ অমৃতের সন্তান—Children of Immortal Bliss—তাদের আবার পাপ কি, অপরাধ কি? তাদের যে অপরাধী ভাবে সে-ই পাপী, অপরাধী!

কিভাবে যে ঐ আর এক নরশ্রেষ্ঠ, নরসিংহ এই অতি সাধারণ ব্রাহ্মণের পায়ে বিকিয়ে গিয়েছিলেন! তার মহামূল্যবান দলিল—"মদীয় আচার্যদেব"—"My Master"

ঐ আচার্যদেব, ঐ নরোত্তমের পায়ে আমিও আজ আমার সভক্তি প্রণতি জানিয়ে বলছি, যা ভেবেছি, যা বলেছি তা তুমিই জানো, তুমিই বলিয়েছ। আমি কিছু জানি না।

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং তৎপ্রসাদাৎ শ্রীরামকৃষ্ণঃ॥

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে

অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ-গবেষক। সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কৃত 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (ছয় খণ্ডে), 'নিবেদিতা লোকমাতা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।]

বাংলা ও ভারতবর্ষে আন্দোলনমূলক আন্দোলনের পিতা—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'রাষ্ট্রগুরু' অভিধায় সম্মানিত। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সংগঠক, সেকালের ভারতবর্ষের প্রধান বাগ্মী, ভিক্টোরীয় জীবনদর্শনে বিশ্বাসী, মডারেট হয়েও অবিরাম আন্দোলনে উৎসাহী, জাতীয় ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল—এক কথায় তাঁকে তাঁরই আদর্শপুরুষের ভারতীয় সংস্করণ বলা চলে—সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় গ্লাডস্টোন।

সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকার বিষয়ে জাতীয় ইতিহাসে অনেক কিছুই লেখা আছে, এখানে পরিচয়বাহুল্য ঘটাতে চাইছি না এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে—

দীর্ঘজীবনের অধিকারী এই নেতা জীবনের শেষ অবধি কালস্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতে হয়তো পারেননি, সেজন্য নরমপন্থার নরম মাটিতে পা বসে গিয়েছিল বলে তিনি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন—কিন্তু একদিন তিনিই ছিলেন অগ্রগামী দলের নেতা; এবং তিনি সেই পর্যায়ে যে-আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তা তাঁকে অতিক্রম করে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল—আর, সেই চলার পথে পিছন ফিরে বৃদ্ধ পিতার স্থবিরত্বের প্রতি অবজ্ঞার মন্তব্য ছুঁড়ে দেবার মতো শক্তি তা অর্জন করেছিল।

বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর বেঙ্গলীর কিছু কথা আগেই উপস্থিত করেছি। যথা, মেট্রোপলিটান স্কুলে বালক নরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করে সুরেন্দ্রনাথকে চমৎকৃত করেছিলেন [সমকালীন, ১।১০১]; ছাত্রাবস্থায় নরেন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে যেতেন [৪।১৫], বরাহনগর-মঠে জোটবদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যসন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দকে সুরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত করানোর ইচ্ছা বোধ করেছিলেন [১৬৬]। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে টাউন হলে বিবেকানন্দ-ধন্যবাদ সভায় বক্তৃতা করেছিলেন [১।১২৬-৭]; স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলে সুরেন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে যুবকগণ তাঁর গাড়ির ঘোড়া খুলে নিজেরা টেনেছিল [যে-বিলিতি কাণ্ডের জন্য বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার এন. এন. ঘোষ ইণ্ডিয়ান নেশনে ২২ ফেব্রুআরি ১৮৯৭, সম্পাদকীয়তে সুরেন্দ্রনাথকে তিরস্কার করেন]; সুরেন্দ্রনাথের রিপন কলেজে স্বামীজীকে নিয়ে গিয়ে বসানোও হয়। [৩।৪]। আমরা স্বামীজীর ইংরেজী জীবনী থেকে জেনেছি, সুরেন্দ্রনাথ স্বামীজীকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলেছিলেন [৩।১৯]।

[সুরেন্দ্র কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলেছেন, তা ইংরেজী জীবনীতে না থাকলেও প্রামাণিকতায় সন্দেহ করা যাবে না, কারণ বেঙ্গলীতে ঐ গ্রন্থের উপর সম্পাদকীয় বেরোয়, এবং তা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়—সুরেন্দ্রনাথই তা রচনা করেছিলেন।]*

---

* মন্তব্যটি এই :

"Later in his life this gentleman [Mr. Surendra Nath Banerjee], although his reputation as an orator had grown into amazing fame, referred to the Swami Vivekananda as the greatest public speaker India had ever known." [Life, Vol. I, (1912), 106]

বেঙ্গলী পত্রিকায় স্বামীজীর জীবনকালে যে-সব মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে সতর্কতা ও শ্রদ্ধার মিশ্রণ দেখা যায়। সতর্কতা—কেননা সুরেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতা, তাঁকে অনেক হিসাব করে চলতে হত। কিন্তু শ্রদ্ধাও যথেষ্ট—যদিও তা সংযত মর্যাদার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। লক্ষণীয় এই—বিবেকানন্দ বহু বিতর্কের আশ্রয় হলেও সুরেন্দ্রনাথের পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে কোন প্রকার কটাক্ষ কদাপি করা হয়নি।

স্বামীজীর জীবনকালে তাঁর সম্বন্ধে ১৮ মে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গলীর সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় *Swami Vivekananda on the Sea-Voyage Movement* অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই সম্পাদকীয়টি এবং বেঙ্গলীর অন্য কয়েকটি সম্পাদকীয়ের আলোচনা করেছি সমুদ্রযাত্রা আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে। [৩।১৭৯-৮১]।

পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়তে বিবেকানন্দ প্রাচীন যুগের আচার্য ঋষি, যাঁর উক্তি শাস্ত্রবাক্য, তাঁর জন্য সকল হিন্দু গর্বিত, তিনি স্বজাতি ও স্বধর্মকে মহাগৌরব দান করেছেন। সেই বিবেকানন্দের দেহান্ত হয়েছে, বেঙ্গলী ৬ জুলাই লিখল :

"জাতীয় ধর্মের জন্য বিপুল তাঁর সেবা। যদি তাঁর প্রখ্যাত ও পূজ্য গুরুদেব আধুনিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের প্রবর্তক হন, তাহলে বলতে হবে, ইনি নিজ জীবন ও আচরণের দ্বারা সেই গৌরবময় কার্যকে অগ্রসর করে দিয়েছেন। আজ যদি হিন্দুধর্ম তার অনুগামীরূপে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় ও আমেরিকান নরনারীকে লাভ করে থাকে, যদি ভারতের প্রাচীন ধর্ম তাঁদের শ্রদ্ধার আসনে স্থাপিত হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই সেই আনন্দদায়ক ও বাঞ্ছিত ফলাফলের প্রধান কৃতিত্ব স্বর্গত স্বামী বিবেকানন্দের।"

[বেঙ্গলীর এই লেখাটি অনুমান করি, স্বয়ং সম্পাদকের। সুরেন্দ্রনাথই এই কালে বেঙ্গলীর সকল গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় লিখতেন। সন্দেহ নেই বিবেকানন্দের দেহান্তে শোকমন্তব্য তিনিই লিখবেন ; এই রচনার, এবং এর পরে বেঙ্গলীর যে সব রচনা উদ্ধৃত করব, সেগুলি সুরেন্দ্রনাথের বলেই মনে করেছি—ভাষা ও বক্তব্যের বিচার করে।]

আলোচ্য মন্তব্যে বিবেকানন্দের চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব, ঋষিসুলভ মৃত্যুর কথা বলা হয়েছিল, সেই সঙ্গে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে বেঙ্গলীর রচনায় আমরা দেখেছি—প্রায় সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি জানানো হয়েছে।

৮ জুলাই আর একটি সম্পাদকীয়তে [*The Late Swami Vivekananda*] স্বামীজীর কথা বলতে গিয়ে অনেকখানি অংশে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা নিবেদন করা হয় :

"তিনি [পরমহংস] ছিলেন গভীর বিশ্বাসের মানুষ ; অশিক্ষিত হলেও, বিশ্বাসের শক্তিতে মানবসমাজের পক্ষে সর্বাধিক মূল্যবান যে-ঐতিহ্য—আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ—তাই অর্জন করতে পেরেছিলেন। তাঁর সরলতা, ধর্মোন্মাদনা, সম্পূর্ণ নিরাসক্তি, বহুসংখ্যক সমর্থ ও সুশিক্ষিত মানুষকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করেছিল, যাদের কেউ-কেউ তাঁকে সেই নমস্কার জানিয়েছে যা একমাত্র সৃষ্টিকর্তারই প্রাপ্য। এই অত্যাশ্চর্য পুরুষের জীবনের অত্যাশ্চর্য বস্তু হল—ধর্মীয় সমাধি। সমাধির অবস্থায় তাঁর সত্তা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ঈশ্বরের মধ্যে লীন হয়ে যেত—সেই সমাধিকেই তিনি সর্বাধিক উপভোগ করতেন। মরুপুষ্প যেমন সকলের অজ্ঞাতে ফুটে থাকে, তেমনি তিনিও দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে বহু বৎসর ধরে অন্যের অগোচরে প্রস্ফুটিত ছিলেন, যতদিন না কেশবচন্দ্র সেন তাঁকে আবিষ্কার করে, জনচক্ষে স্থাপন করেন।"

এর পরে স্বামীজীর "কিছুটা চড়া কিন্তু অদ্ভুত প্রভাবশালী বাগ্মিতা" এবং পাশ্চাত্যে তাঁর অদ্ভুত

সাফল্যের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলা হয়েছিল। লেখাটি শেষ করা হয় এই বলে, "তাঁর বিদায় সুনিপুণ অভিনেতার প্রস্থানের মতোই অনবদ্য নাটকীয়—যেমন ছিল মঞ্চে তাঁর আবির্ভাব।"

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের পত্রিকার আর দুটি সম্পাদকীয়ের উল্লেখ করব—যেগুলি স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীর উপরে ১৯১৩ সালে লিখিত হয়। পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতে বিবেকানন্দ সম্পর্কে মূল্যবান নানা মন্তব্য বা লেখা বেঙ্গলীতে বেরিয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত সম্পাদকীয় দুটিতে আমরা সম্পাদকের পরিণত চিন্তাশুদ্ধ মূল্যায়ন পাই, কারণ সেগুলি স্বামীজীর 'জীবনী' সূত্রে লিখিত হয়েছিল।

২৯ এপ্রিল ১৯১৩, সম্পাদকীয়তে—শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি "নিজজীবনে মূর্ত করেছিলেন প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অভীপ্সা," যাঁর কাছে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর নববিধানের ভাবাদর্শের জন্য ঋণী ছিলেন—তাঁর কথা আবেগের সঙ্গে বলা হয়, সেটি আগেই উদ্ধৃত হয়েছে [২।২৪৪]। সেখানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও পাই :

"পৃথিবীর মহান অধ্যাত্ম-আচার্যদের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্থান একেবারে প্রথম সারিতে। যে অজ্ঞাত অনির্বচনীয় সত্তা বিশ্ব-জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, তার মধ্যে নিরন্তর সুগভীর নিমজ্জনের দ্বারা তিনি এমন আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন, যা অতি বড় প্রতিভাধর ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না। বিবেকানন্দ তাঁরই নির্বাচিত শিষ্য। রামকৃষ্ণ—আচার্য; বিবেকানন্দ—প্রবক্তা। রামকৃষ্ণ—প্রেরণার উৎস-কুণ্ড—তারই পুণ্যবারি পান করেছেন বিবেকানন্দ। তারপর, বিবেকানন্দ তাঁর আচার্যের আধ্যাত্মিক উন্মাদনার সঙ্গে নিজস্ব মনন-শক্তি মিশ্রিত করেছিলেন। ঐ মননশক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সহযোগে প্রশস্ত ও প্রবল হয়েছিল। কার্লাইল তাঁর চিরজীবিত এক বাণীতে বলেছেন—জাতির ইতিহাস বস্তুতঃপক্ষে তার বৃহৎ ব্যক্তিদেরই ইতিহাস। এই উক্তির মূলে অনেকখানি সত্য আছে। কোন এক যুগের ইতিহাস বলতে বোঝায় সেইকালের সমাজজীবনকে যে-সকল সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে—তারই ইতিহাস। এবং বিরাট পুরুষ হলেন তিনি, যিনি তাঁর কালের মানবজীবনের প্রধান শক্তিসমূহের মূর্ত বিকাশ; ঐ সকল শক্তিকে তিনি সজোরে প্রকাশ করেন; নিজস্ব ভাবে তিনি তাদের পথনির্দেশ করেন; এবং স্বীয় উন্মাদনার দ্বারা তাদের গতিপথে ব্যাপক ও তীব্র গতিবেগ দান করেন। এই অর্থে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বিরাট পুরুষ। তাঁরা ভাবীকালের জন্য জ্যোতির্ময় অধ্যাত্ম-পথনির্দেশক। ভবিষ্যতে তাঁরা আমাদের চিন্তাশীল ও শিক্ষিত দেশবাসীর অধ্যাত্মভাবনাকে প্রভাবিত করে চলবেন। কিন্তু বিবেকানন্দ কেবল অধ্যাত্ম আচার্য ছিলেন না। তিনি আরও কিছু। মানবজীবন যে, সমন্বিত বস্তু, কোন একটি দিকে তার অগ্রগতি মানে সমগ্রেরই গতি, যার আবেগস্পন্দন সমগ্র দেহকেই কম্পান্বিত করে থাকে—এই মহাসত্য সম্বন্ধে বিবেকানন্দ পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সার্থকতম অর্থে তিনি দেশপ্রেমিক।"

সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ গভীরতম অর্থে জাতীয়জীবনের প্রধান নেতা—সংগঠক ও পথনির্দেশক। একই গ্রন্থের উপর ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৩, বেঙ্গলী আর একটি সম্পাদকীয় লেখে। তার সূচনাতে বলা হয়, "বিবেকানন্দ সেই পুরুষ, যিনি হিন্দুদর্শনের সমগ্র গতিপ্রবণতার উপরে সুবিপুল প্রভাব বিস্তার করেছেন।" তারপর বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবনের উপর অনবদ্য গতিময় রেখাঙ্কন

করে, বিবেকানন্দ কিভাবে নিজ অভিজ্ঞতায় সমগ্র ভারতীয় জনজীবনের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করেছিলেন, তাকে স্বীকৃতি জানিয়ে, বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্য প্রেক্ষাপটে দর্শন করার চেষ্টা করা হয়েছে। চিকাগো ধর্মমহাসভায় পঠিত বিবেকানন্দের 'হিন্দুধর্ম' রচনাটি "হিন্দুধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ" বলা হয়েছে। শেষ করা হয়েছে এই বলে: "বিবেকানন্দের এই জীবনী যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।··· আমাদের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের মধ্যে এই ধরনের পুস্তক আমাদের শান্তি দেয়, ঊর্ধ্বতর পরিবেশে উন্নীত করে, এবং আহত সত্তাকে নিরাময় করে।"

যাঁর জীবনী সম্বন্ধে বলা হল—তা যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—সেই মানুষটি যে, যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র—এই পত্রিকার সম্পাদকের মতে, তাতে সন্দেহ ছিল না।*

* বিবেকানন্দ-জননী ভুবনেশ্বরী দেবীর দেহান্তে বেঙ্গলী ২৭ জুলাই ১৯১১, সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিবেকানন্দের স্বীকৃতি অনুযায়ী বিবেকানন্দের জীবনগঠনে তাঁর মাতার গভীর প্রভাবের উল্লেখ করে। ভুবনেশ্বরী দেবীর প্রতি বেঙ্গলীর বিশেষ শ্রদ্ধার কারণ, "আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মহিলার তুল্য প্রতিভাবান ও বিখ্যাত সন্তানের জননী হওয়ার ভাগ্য কম নারীরই হয়েছে।" সুরেন্দ্রনাথ স্বামীজীর মাতার স্মৃতিসভায় পৌরোহিত্য করে ভাবাবেগের সঙ্গে "বিখ্যাত পুত্র ও বিখ্যাত জননীর" প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। [বেঙ্গলী, ১৯ অগস্ট ১৯১১]।

পাশ্চাত্য দেশে কিছুদিন

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০ সংখ্যার পর]

[কলিকাতা 'রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব কালচার'-এর সচিব। লেখকের পাশ্চাত্য ভ্রমণকাহিনীটি গত ৮৪তম বর্ষের ২য় হইতে ৮ম ও ১০ম হইতে ১১শ সংখ্যা এবং ৮৫তম বর্ষের ৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান সংখ্যায় শেষাংশ প্রকাশিত হইল।]

সেণ্ট পিটারস গির্জা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গির্জা। তার বিভিন্ন অংশ। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন দল সেই তীর্থস্থানে আসছে। একদল এসে হয়তো প্রার্থনা করছে। আর একদল এসে হয়তো গান করছে। নিজের নিজের ভাষাতে। আবার এক জায়গায় হয়তো কনফেশন (confession) হচ্ছে। অর্থাৎ কেউ কোন পাপ, কোন অন্যায় করেছে, সে এসে কোন পাদরীর কাছে সে-সব স্বীকার করছে হাঁটু গেড়ে। আমার একটু কনফেশন দেখবার ইচ্ছে ছিল, দেখলাম। এরপর ওঁরা বললেন: 'চলুন, এবার আমরা সেণ্ট পিটারকে যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেই জায়গাটা দেখে আসি।' আমরা সিঁড়ি বেয়ে গির্জার বেসমেণ্ট (basement)-এ নেমে গেলাম। মাটির অনেক নিচে একটা ঘরে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তখন তো গির্জা হয়নি। যেখানে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেখানেই পরে এই গির্জা হয়েছে। ছোট্ট একটা খুপ্‌রিতে লোহার শিকল দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তাঁকে খেতে দেওয়া হত কি করে? খুপ্‌রির উপরে ছাদে একটা ফুটো আছে ঢাকা দেওয়া। ঢাকনা সরিয়ে তার মধ্যে দিয়ে কিছু খাবার ফেলে দেওয়া হত। তা-ই তিনি খেতেন। অসহ্য কষ্ট! কিন্তু তিনি নির্বিকার। দিনরাত

প্রার্থনা করে যাচ্ছেন। প্রহরীদের বলা হয়েছিল: লোকটির উপর কড়া নজর রেখো। এ যেন পালাতে না পারে। প্রহরীরা দিনরাত তাঁকে নজরে রেখেছে, তাঁর সবকিছু খুঁটিনাটি তারা দেখছে। ক্রমশঃ প্রহরীরা তাঁর অনুগত হয়ে পড়ল। তাঁর জীবন দেখে তারা মুগ্ধ। একে একে তারা তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করল, খ্রীষ্টান হতে আরম্ভ করল। এইভাবে সাতচল্লিশ জন প্রহরী তাঁর প্রভাবে খ্রীষ্টান হয়ে গেল। রোমানরা তখন দেখল: এঁকে বাঁচিয়ে রাখা বিপজ্জনক। তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে তারা হত্যা করল। পিটার শুধু একটা অনুরোধ করেছিলেন: 'তোমরা আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মারবে, এ উত্তম কথা। তবে শুধু একটা অনুরোধ—আমার প্রভুকে তোমরা মাথা উপরের দিকে, আর পা নিচের দিকে রেখে মেরেছিলে। ঐ সম্মান তোমরা আমাকে দিও না, আমাকে বরং উলটোভাবে অর্থাৎ মাথা নিচের দিকে এবং পা উপরের দিকে রেখে মেরো।' ঠিক তাই-ই করা হয়েছিল নাকি। তাঁকে যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল সেখানেই সেণ্ট পিটারস গির্জা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গির্জা এটাই।

আমাকে ঐ সাধুরা রোম এবং রোমের কাছাকাছি যত পুরানো মঠ আছে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। আমার খুব ইচ্ছে ছিল 'সেণ্ট ফ্রান্সিস অব আসিসি'র মঠটা দেখব। ওঁদের ওখানে গিয়ে জানলাম, আগেই বলেছি, উচ্চারণ 'অ্যাসিসি' নয়, আসিসি। সেণ্ট ফ্রান্সিস-এর কাহিনী আমরা অনেকেই জানি। প্রথম জীবনে খুব উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির তরুণ ছিলেন। বড়লোকের ছেলে, ব্যবসায়ী। অনেক টাকা-পয়সা। মদ খেতেন, জুয়া খেলতেন। তার পরে হঠাৎ একদিন যীশুখ্রীষ্টের বাণী শুনতে পেলেন। যীশুখ্রীষ্ট তাঁকে বলছেন: 'কেন তুমি নিজের উপরে এরকম পীড়ন করছ?' তারপর ধীরে ধীরে তাঁর পরিবর্তন এল, সন্ন্যাস নিলেন। তিনি গাধার পিঠে চেপে বেড়াতেন। আর বস্তার কাপড়ের জামা পরে থাকতেন। খ্রীষ্টান ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক প্রচারক গাধার পিঠে চেপে বেড়াতেন। বোধ হয় দারিদ্র্য ও বিনয়ের প্রতীক হিসেবে। সেণ্ট ফ্রান্সিস খুব কঠোর জীবন যাপন করতেন। যাঁরা ওঁর মঠের সাধু, তাঁরা এখনও খুব কঠোরতা করেন। সেণ্ট ফ্রান্সিস গাধার পিঠে চড়ে প্রচার করতেন আর নিজেকে বলতেন: যীশুখ্রীষ্টের সেনাপতি। একবার তিনি রাত্রিতে গাধার পিঠে করে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ একদল দস্যু তাঁকে দেখেছে। প্রথমে তারা একটু ভয় পেয়ে গেছিল। পরে তাঁকে একা দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেছে: 'কে তুমি?' উনি উত্তর দিচ্ছেন: 'আমি হচ্ছি যীশুখ্রীষ্টের সেনাপতি—Commander of Jesus Christ.' দস্যুরা হেসে বলল: 'বাঃ! দারুণ কম্যাণ্ডার তো! গাধার পিঠে-চড়া কম্যাণ্ডার!' তাঁকে গাধার পিঠ থেকে নামিয়ে তারা বেশ মারধোর করল। কিন্তু এই দস্যুরাই আবার তাঁর চালচলন, কথাবার্তা, ব্যবহার ইত্যাদি দেখে পালটে গেল। তাঁর শরণাগত হল। সেণ্ট ফ্রান্সিস যখন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতেন, পশুপাখী, গাছপালা সবার কাছে যীশুখ্রীষ্টের কথা বলতে বলতে যেতেন। কিছু ছবিতে দেখেছি এক জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলি পাখী কিচিরমিচির করছে। তিনি তাদের সম্বোধন করছেন: 'Sister birds.' তাদের কাছে যীশুখ্রীষ্টের কথা বলছেন, আর পাখীরা ঘাড় কাত করে তাঁর কথা শুনছে। একজায়গায় একটা নেকড়ে বাঘ ভয়ানক অত্যাচার করত। সে এসে গ্রামের যত মুরগী-টুরগী ধরে নিয়ে যেত, গরুবাছুর খেত, আরও



অনেক ক্ষতি করত সেণ্ট ফ্রান্সিস একদিন জঙ্গলে গিয়ে তাকে ডাকলেন: 'Brother Wolf, কোথায় তুমি?' খুঁজে খুঁজে তিনি 'Brother Wolf'-কে বের করলেন। তারপর তাকে ভৎ'সনা করলেন, উপদেশ দিলেন। সেই 'Brother Wolf' তখন তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছে—অত্যন্ত লজ্জিত যেন। গ্রামে গিয়ে যার যার বাড়িতে সে মুরগী খেয়েছে বা অন্য কিছু ক্ষতি করেছে, তাদের কাছে সে ক্ষমা চাচ্ছে। অর্থাৎ এমন তাঁর প্রেম, এমন তাঁর চরিত্রবল যে, পশুপাখী, হিংস্র জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত তাঁর কথা শুনছে। সত্যিই অদ্ভুত জীবন তাঁর। আমার খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর মঠ দেখবার। রোম থেকে বেশ কিছুটা দূরে আসিসি শহর। একদিন সকালে উঠে ঐ সাধুদের সঙ্গে গাড়ি করে গেলাম। আসিসি পৌছতে পৌছতে বেলা হয়ে গেল। ঘুরে ঘুরে দেখলাম সেণ্ট ফ্রান্সিসের ব্যাসিলিকা (Basilica) ইত্যাদি। সেণ্ট ফ্রান্সিসের বোন সেণ্ট ক্লারা (St. Clara)—তিনিও সন্ন্যাসিনী হয়েছিলেন। তাঁর নামেও একটা গির্জা আছে আসিসিতে—Church of St. Clara. মঠও আছে। আমার কিন্তু সেণ্ট ক্লারার মঠটাই বেশি ভাল লাগল। আমাকে ঐ সাধুরা বলছিলেন সেণ্ট ফ্রান্সিস আর সেণ্ট ক্লারার কথা। কী কঠোর তপস্যা তাঁরা করেছিলেন তার কথা। ঐসব আলোচনা করতে করতে আমরা রোমে ওঁদের মঠে ফিরে এলাম। সেণ্ট ফ্রান্সিস ও সেণ্ট ক্লারার তপস্যার কথা নিয়ে আলোচনা হতে হতে ঐ সাধুদের মাথায় এল—আমাকে সেই মঠে নিয়ে যেতে হবে যেখানে সেণ্ট বেনিডিক্ট (St. Benedict) তপস্যা করেছিলেন। সেণ্ট বেনিডিক্ট অর্থাৎ যাঁর নামে ওঁদের মঠ। রোম থেকে বেশ দূরে সেই মঠ। সেখানে আমাকে ওঁরা পরদিন নিয়ে গেলেন। জায়গাটির নাম স্যান্টিয়াগো (Santiago) প্রথমে সেখানেই সেণ্ট বেনিডিক্ট তপস্যা করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর তপস্যা দেখে বহু লোক গিয়ে তাঁর কাছে ভিড় করতে লাগল। তখন তিনি সেই শহর থেকে আরও দূরে সুবিয়াগো (Suviago) বলে একটা জায়গায় পাহাড়ে চলে গেলেন। একেবারে নেড়া পাহাড়। সেই পাহাড়ের মধ্যে একটা গর্ত খুঁড়ে তিনি থাকতেন। অনেক নিচে। সেখানে কোন লোক যেতে পারে না। আর সত্তর ফুট উপর থেকে তাঁর এক বন্ধু কিছু খাবার মাঝে মাঝে ফেলে দিত। তা-ই তিনি খেতেন। কেউ তাঁকে দেখতে পেত না। সেখানে তিনি সকলের দৃষ্টির আড়ালে তপস্যা করতেন। আমাদের পওহারী বাবার মতো অনেকটা। সেই পাহাড় কেটে এখন একটা মঠ হয়েছে। আমাকে ওঁরা সেই মঠে নিয়ে গেলেন। ওঁরা তো আমাকে খুব একটা কেউকেটা মনে করেছেন। এত ভালবাসা, এত যত্ন পেয়েছি কি বলব! আমাকে নিয়ে গিয়ে ঐ মঠের যিনি অধ্যক্ষ—একজন অস্ট্রেলিয়ান সাধু—তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রকাণ্ড লম্বা চেহারা। তিনি আমাকে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। একটা জায়গায় দেখলাম, তার দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা আর তার মধ্যে একটা বড় কাক চুপচাপ বসে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'একটা কাককে কেন তোমরা এইভাবে আটকে রেখেছ?' তখন তাঁরা কাহিনী বললেন: 'সেণ্ট বেনিডিক্ট তো লোকজনের সংস্পর্শে আসতেন না। তাঁর সঙ্গী ছিল একজোড়া কাক। তাদের সঙ্গে নাকি তিনি কথা বলতেন। তার স্মারক হিসেবে দুটো কাক সব সময় ধরে রেখে দেওয়া হয়। এখনও দুটো কাকই ছিল—একটা কাক দু-একদিন আগে মারা গেছে।' মঠাধ্যক্ষ অস্ট্রেলিয়ান সাধুটি খুব রসিক। তিনি বললেন: 'স্বামীজী, আপনাকে চুপি চুপি একটা কথা বলি।

এই কাকটি আমার সঙ্গেও এখন কথা বলে। কি ভাষায় জানেন? অস্ট্রেলিয়ান ভাষায়! এই মঠটি যেখানে সেটি একটি অপূর্ব জায়গা। পরিবেশটা অনেকটা আমাদের মায়াবতী আশ্রমের মতো। ঐরকম পাহাড়ের উপরে, ঐরকম প্রাকৃতিক দৃশ্য। দূর দূর থেকে অনেক লোক আসে এই মঠ দেখতে। অনেকে দিনকয়েক ওখানে থেকে আসে। সেরকম ব্যবস্থা আছে ওঁদের।

এবার পোপের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলি। বর্তমান পোপ দ্বিতীয় জন পলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়ে আমি কলকাতা থেকেই একটা চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু পোপের উপরে সাম্প্রতিক আক্রমণ হওয়ার পর আজকাল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের খুব কড়াকড়ি। তাঁর সঙ্গে আলাদা ভাবে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হয় না। পোপ থাকেন ভ্যাটিকান সিটিতে। ভ্যাটিকান সিটি একটা আলাদা রাষ্ট্র। ইতালির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমি কিন্তু চিঠিটা ভ্যাটিকান স্টেট-এ লিখিনি, পোপকে বা পোপের অফিসেও লিখিনি, লিখেছিলাম আমার পরিচিত ঐ সাধুদের কাছে। রোমে পৌঁছলে ওঁরা আমাকে বললেন: 'আপনার জন্য পোপের সঙ্গে সাক্ষাতের একটা আলাদা ব্যবস্থা আমরা করেছি। সপ্তাহে একদিন পোপ একটা বড় হল্-এ দর্শনার্থীদের দর্শন দেন। সেই হল্-এ ন-হাজার লোক বসে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক—কেউ ছ-মাস, কেউ হয়তো তারও আগে থেকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করে রেখেছে। তারা সব ঐ হল্-এ সমবেত হবে। ঐ সময় পোপ এসে আপনার সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করবেন, কথা বলবেন।' পোপের একটি সেক্রেটারিয়েট আছে—পোপের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ওঁরা পোপের সচিবদের সঙ্গেও আমার একটা আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রথমে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হল। তাঁদের মধ্যে দেখলাম একজন আমেরিকান আছেন, একজন কোরিয়ান আছেন। আরও অন্যান্য দেশের কয়েকজন আছেন। ওঁদের মধ্যে একজন পোপের খুবই কাছের লোক। আমাকে প্রথমে তাঁরা একটা "Visitors' Book"-এ সই করতে বললেন। তারপরে একটা ঘরে বসে আলোচনা শুরু হল। নানারকম প্রসঙ্গ হল। পাশ্চাত্যে গিয়ে সর্বত্রই আমাকে এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হতে হয়েছে: 'তোমরা হিন্দুরা কেন আশেপাশের দুঃস্থ-দরিদ্রদের সম্বন্ধে উদাসীন? তোমরা সেবা কর না কেন?' এই ধারণা দূর করার জন্য আমাকে অনেক কথাই বলতে হল। তবে তাঁদের দেখলাম, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রতি খুব শ্রদ্ধা। দু-একজন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের দু-একটা কেন্দ্র দেখেওছেন। আমাকেও খুবই সম্মান করলেন ওঁরা। ঐসব আলোচনা হতে হতে জানতে পারলাম যে, তাঁদের (পোপের সচিবদের) মধ্যে একদল মনে করেন: 'আমাদেরও হিন্দুধর্ম থেকেও কিছু শেখবার আছে। হিন্দুধর্ম একটি অতি পুরাতন ধর্ম। হিন্দুদের মধ্যেও অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন। কাজেই হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জানা দরকার।' আজকাল তো অনেক বই বেরিয়েছে। ওঁরা সে-সব কিছু কিছু পড়ছেন। এতদিন ওঁরা শুনে আসছিলেন হিন্দুরা শুধু ভূত প্রেত পূজো করে। এখন দেখছেন: তা তো নয়। এর মধ্যেও তো যথেষ্ট যুক্তি আছে।—একদল সেইজন্য হিন্দুধর্মকে বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা বলেন: 'হিন্দুদের সঙ্গে মেশো, ওদের কাছ থেকে শেখো, জান।' কিন্তু আর একদলের ভাব হল: 'না, না, না। ওদের সঙ্গে খবরদার মিশবে না। এতে আমাদের আদর্শটা "watered down" হয়ে যাবে, ঘোলাটে হয়ে যাবে। আমাদের মধ্যে ভেজাল এসে যাবে।

না, ওদের সঙ্গে আমরা মিশব না। আমাদের ভাব আমরা ধরে থাকব।' যাই হোক আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে গেল। আমার ঠিকানা ওঁরা রেখে দিলেন। বললেন: 'আমরা যদি কখনও ভারতবর্ষে যাই আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

পোপের সঙ্গে আমার দেখা হল ৯ ডিসেম্বর, বুধবার। ঐ হল্-এ গেলাম। সুইশ গার্ডরা সেই হল্ পাহারা দিচ্ছে। অদ্ভুত পোশাক তাদের পরনে। খুব কড়া পাহারা। প্রতি পদক্ষেপে তারা চেক (check) করছে। আমাকে অবশ্য কোন চেক করল না। আমার সঙ্গে একজন সাধু ছিলেন বলেই হয়তো। আমাকে বলা হল যে প্রথম সারির প্রথম আসনটি আমার জন্য সংরক্ষিত আছে। হল্ একেবারে ঠাসা। ন-হাজার লোক বসে আছে। নানা দেশ থেকে তারা এসেছে। পোপ তখনও আসেননি। আমি আমার জায়গায় বসে আছি। সব কিছু দেখছি। সামনে একটা বড় বেদী। সেখানে কার্ডিনালদের বসবার জায়গা—তাঁরা সেখানে এসে বসবেন। কেউ কেউ এর মধ্যেই এসে বসেছেন। আমি যখন অপেক্ষা করছি, তখন হঠাৎ একজন এসে আমাকে ইতালিয়ান ভাষায় কিছু বললেন। আমি ইতালিয়ান জানি না। আমার পাশে যে সাধুটি ছিলেন, তিনি অনুবাদ করে বললেন: 'উনি ভ্যাটিকান রেডিও-র একজন কর্মকর্তা। ওঁরা চাইছেন আপনি ভ্যাটিকান রেডিও থেকে কিছু বলেন। আপনি বলবেন কি?' আমি বললাম: 'কি বিষয়ে বলব?' উনি বললেন: 'একজন হিন্দু হিসেবে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা সেই বিষয়ে আপনি বলবেন।' আমি বললাম: 'আমি তো ইতালিয়ান জানি না। ইংরেজীতে বললে কি হবে?' উনি বললেন: হ্যাঁ, ইংরেজীতে বললেই হবে।' সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ওঁরা প্যালেসের মধ্যে স্টুডিওতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি খ্রীষ্টধর্ম আর যীশুখ্রীষ্টকে আমরা কি দৃষ্টিতে দেখি, সংক্ষেপে বললাম। বললাম: 'আমরা সব ধর্মকেই সত্য বলে মনে করি। আমরা যাঁকে অনুসরণ করি, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের এটা শিখিয়ে গেছেন। খ্রীষ্টধর্মকেও আমরা সত্য বলে মনে করি। আর যীশুখ্রীষ্টকে আমরা আমাদের অবতার পুরুষদের মতো সমান শ্রদ্ধা করি।' ইত্যাদি। ওরা আমার ভাষণ তখনই রেকর্ড করে নিল—পরে প্রচার (broadcast) করবে বলল।

তারপর আবার আমি ঐ হল্-এ এসে আমার আসনে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে পোপ এলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা হল্ জুড়ে সে কী উল্লাস, কী উচ্ছ্বাস! তাদের কাছে পোপ তো স্বয়ং ঈশ্বর! ওরা সবাই চীৎকার করে একসঙ্গে কি একটা কথা বলতে লাগল! কোন্ ভাষায় বলছে, বুঝলাম না। তবে পোপের জয় দিচ্ছে, বুঝতে পারলাম। মজা হচ্ছে, সবাই পোপকে স্পর্শ করতে চায়। কিন্তু সুইশ গার্ড যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা বাধা দেয়। কারণ, সেটা সম্ভব না। সবাই পোপকে স্পর্শ করতে চাইলে হুড়োহুড়ি হবে, বিশৃঙ্খলা হবে, পোপেরও তাতে অসুবিধে হবে। পোপ আবার শিশুদের খুব ভালবাসেন। মায়েরা সেইজন্য কি করেন—পোপ যে প্যাসেজ দিয়ে আসবেন, সেই প্যাসেজের উপরে তাঁদের শিশুদের ছেড়ে দেন। উনি শিশুদের সঙ্গে কথা বলেন, হ্যাণ্ডশেক করেন, গায়ে একটু হাত দেন। সেটাকে ওঁরা তাঁর আশীর্বাদ বলে মনে করেন। ঐ গার্ডরা তা পছন্দ করে না। তারা শিশুদের সরিয়ে পোপের পথ পরিষ্কার করে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু গার্ডরা যেই একটু দূরে সরে যায়, সঙ্গে সঙ্গে আবার মায়েরা শিশুদের পথের উপর ছেড়ে দেন। পোপ এই শিশুদের আদর করতে করতে এগিয়ে এলেন। আমার সামনে আসতেই আমি বললাম: 'আমি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। ভারতবর্ষ থেকে এসেছি।

আমাদের সঙ্ঘের নাম রামকৃষ্ণ মিশন।' উনি বললেন: 'I know, I know, I know.' মনে হয়, আগে থেকেই কেউ ওঁকে জানিয়ে রেখেছিলেন আমার সম্বন্ধে। উনি বললেন: 'আমি জানি আপনার কথা। আপনার কাছে পরে আসছি।' পোপ ভাল ইংরেজী জানেন—সবশুদ্ধ আটটা ভাষা জানেন। উনি তখন মঞ্চে উঠলেন, একটা বক্তৃতা করলেন। ওঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'রেজারেকশন'। রেজারেকশন অর্থাৎ পুনরুত্থান। শেষ বিচারের দিন দেবদূত এসে মৃতকে কবর থেকে ডেকে নিয়ে যায় সেখানে ভগবান তার বিচার করবেন। এখন প্রশ্ন হল: মৃত তো কতদিন ধরে মাটির তলায় আছে—তার শরীরের সব তো মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তাহলে কাকে ডেকে নিয়ে যাবে?—এই একটা বড় প্রশ্ন। ওরা এর কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। কারণ ওরা তো আত্মায় বিশ্বাস করে না। যদিও 'Soul', 'Spirit' ইত্যাদি শব্দ ওদের আছে, কিন্তু 'Soul', 'Spirit'-এর অনেক জায়গায় অর্থ হচ্ছে মন। আমরা হিন্দুরা 'আত্মা' বলতে যা বুঝি—আত্মা বলতে বুঝি দেহ-মন-বুদ্ধি-ব্যতিরিক্ত একটা জিনিস—সেরকম কোন কিছু ওরা স্বীকার করে না। সেইজন্য ঐ প্রশ্নের কোন ভাল উত্তর ওরা দিতে পারে না। কিন্তু দেখলাম রেজারেকশন প্রসঙ্গে পোপ এমন কয়েকটি কথা বললেন, যার সঙ্গে আমাদের হিন্দু চিন্তাধারার বেশ মিল আছে। উনি বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করলেন। আমি হুবহু সেগুলিই উল্লেখ করছি। উনি বললেন: "দেবদূত এসে মৃতের 'spirit'-কে নিয়ে যায়। শরীর থেকে আলাদা হচ্ছে 'Spirit'। 'Body' এবং 'Spirit'-এর মধ্যে যে একটা 'tension' আমরা সব সময় দেখি, মৃত্যুর পর আর সেই 'tension' থাকে না। 'Spirit' তখন 'independent'। এই 'spirit' তখন 'divinized' হয়। 'Divinized' হলে 'like an angel' তার সঙ্গে তখন ভগবানের 'encounter' হয়—তখন তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করেন। অর্থাৎ তিনি তখন আর মানুষ নন—দেবতা হয়ে গেছেন।" আমরা হিন্দুরাও তাই বলি। এই রকম দু-চারটি কথা বলে উনি বক্তৃতা শেষ করলেন। ঐ হল্-এ সেদিন কিছু বিকলাঙ্গ (disabled) ছেলে উপস্থিত ছিল। পোপ এরপর তাদের কাছে গিয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন। তারপর তিনি আবার আমার কাছে এলেন। আমার সঙ্গে আলাপভাবে কিছুক্ষণ কথা বললেন। আমি বললাম: 'আপনি এই বক্তৃতায় "রেজারেকশন"-এর যে ব্যাখ্যা দিলেন তা আমার খুব ভাল লাগল। আমাদের বেদান্তও ঠিক একই রকম বলে।' উনি বললেন: 'ও, তাই নাকি? তাই নাকি?' আমাদের কথাবার্তার ফাঁকে ইতালিয়ান সাধুটি ওঁকে বললেন: 'আমরা কলকাতায় যখন গেছিলাম, এঁদের রামকৃষ্ণ মিশনেও গেছিলাম।' উনি শুনে খুশি হলেন, বললেন: 'Keep this contact—এই যোগাযোগটা রেখো।' আমি বললাম: 'কিছুদিন আগে কাগজে আপনার একটা কথা দেখলাম। তাতে আপনি বলছেন, সন্ন্যাসীদের রাজনীতিতে যোগ দিতে নেই। রামকৃষ্ণ মিশন যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ, তিনিও আমাদের রাজনীতির সঙ্গে যোগ রাখতে বারণ করে গেছেন।' উনি বললেন: 'হ্যাঁ, সন্ন্যাসীদের রাজনীতির সঙ্গে যোগ থাকাটা ভাল নয়।' আমি বললাম: 'আমরা সবচেয়ে জোর দিই ত্যাগের উপরে—Renunciation,' এই কথাটা শুনে পোপ খুব খুশি হলেন। বললেন: 'Yes, renunciation. This is the thing. ত্যাগই হচ্ছে আসল জিনিস।' পোপের একটা অভ্যাস আছে যে, কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে ডান হাতের তর্জনীটি উঁচু করে কথা বলেন। ঐ আঙুল

উঁচু করে বেশ কয়েকবার তিনি এই কথাগুলো বললেন : 'Renunciation. Renunciation is the thing.' আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে যাচ্ছেন—কয়েক পা গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে আবার আমাকে বলছেন : 'Renunciation. Renunciation is our motto.' আমি বললাম : 'আপনার সঙ্গে যে দেখা হল, এটি আমার পক্ষে একটি Privilege.' উনি বললেন : 'The same to me also. Thank you for coming.'—আপনার সঙ্গে দেখা হল, এও তাই আমার কাছে। আপনি যে এসেছেন, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পোপের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি ঐ মঠে চলে এলাম। তার পরদিন (১০।১২।৮১) আমি বিদায় নেব রোম থেকে। আমার ইচ্ছা, ঐ মঠে কিছু টাকা দিই। মঠের যিনি অধ্যক্ষ, তিনি সেদিন প্যারিসে যাচ্ছেন বক্তৃতা করতে। আমি তার আগে তাঁকে বললাম : 'দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলি। আমার খুব তৃপ্তি হবে যদি আপনি সামান্য কিছু অর্থ আমার কাছ থেকে গ্রহণ করেন। এটা আর কিছু না। আপনাদের কাছ থেকে এত ভালবাসা পেলাম, এতটা করলেন আমার জন্য! আমার কৃতজ্ঞতা হিসেবে এটা গ্রহণ করুন।' উনি বলছেন : 'স্বামীজী, যদি একথা বলেন—We will be very much offended, খুব রাগ করব আমরা। দয়া করে একথা আর বলবেন না।' আমি আর কি করি? চুপ করে গেলাম। উনি প্যারিস চলে গেলেন। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, তাঁর অনুপস্থিতিতে ঐ মঠে যিনি অধ্যক্ষ থাকবেন, তাঁর হাতে কিছু টাকা দিয়ে আসব। আমি যেদিন চলে আসব, তার আগে ঐ সাধুটিকে বললাম : 'দেখুন, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আমি সামান্য কিছু টাকা আপনাদের দিতে চাই—আপনি "না" করবেন না।' উনি বলছেন : 'স্বামীজী, আমাদের যিনি মঠাধ্যক্ষ, যাঁর কথায় আমরা উঠি বসি, তিনি প্যারিসে যাবার আগে আমাকে কি বলে গেছেন জানেন? উনি বলে গেছেন, দেখ, স্বামীজী হয়তো কিছু টাকা দিতে চাইবেন। খবরদার নেবে না। এখন আমি কি করে টাকা নিই? নিলে খুব অসন্তুষ্ট হবেন উনি। আপনি কি চান যে, উনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হন?' আমি বললাম : 'এর পরে আমার আর কিছু বলবার নেই।'

তারপরে আমি যখন বিদায় নেব, তখন মঠের সব সাধু একসঙ্গে মিলিত হয়ে বললেন : 'স্বামীজী, এখন আমরা একটা প্রার্থনা করব আপনার জন্যে।' সব একসঙ্গে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভাষায় প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন, গান-টান গাইলেন, কিছুক্ষণ silent meditation (নীরবে ধ্যান) হল। তারপরে সবাই আমাকে কোলাকুলি করলেন, আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। বার বার তাঁরা বলছেন : 'স্বামীজী, আপনি আবার আসবেন। যখনই আসবেন এখানেই উঠবেন। শুধু আপনি নন, আপনাদের সঙ্ঘের যে-কোন সাধু কখনও যদি এখানে আসেন, আমাদের কাছেই উঠতে বলবেন। এখানে আপনাদের অবারিত দ্বার।' কয়েকজন সাধু এয়ার পোর্ট পর্যন্ত এলেন আমাকে বিদায় জানাতে। আমাকে তাঁদের একজন জিজ্ঞেস করলেন : 'আপনার সব জিনিসপত্র দেখে-টেখে নিয়েছেন তো? কিছু ফেলে যাচ্ছেন না তো?' আমি বললাম : 'হ্যাঁ, ফেলে যাচ্ছি। আমার হৃদয়টা। আমার হৃদয়কে আমি এখানে ফেলে যাচ্ছি!'

বাস্তবিক, এই মঠে এই সাধুদের কাছে কয়েকদিন থেকে এঁদের কাছ থেকে যে ভালবাসা পেয়েছি, তা আমি কোনদিনও ভুলব না। এই এক সপ্তাহের স্মৃতি আমার চিরকাল মনে থাকবে।

(উপরে)

'পোপের সঙ্গে আমার দেখা হল
৯ ডিসেম্বর, বুধবার।'

পৃঃ ৫০২



(নীচে)

'তাঁকে যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল
সেখানেই সেণ্ট পিটারস গির্জা।
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গির্জা এটাই।'

পৃঃ ৪৯৯



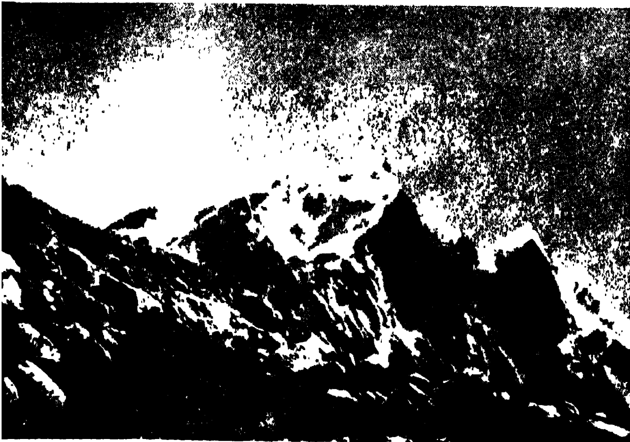
'চারিদিকে অজস্র রকমের ফুল ফুটে রয়েছে।··· মাইল খানেক পরে ঠিক মাঝখানে শিবলিঙ্গ দণ্ডায়মান। যেন তাঁরই পূজাতে এই আয়োজন।'

পৃঃ ৫০৮

সামনেই উচ্চ শিখর শিবলিঙ্গ : শ্বেতশুভ্র বরফাচ্ছাদিত।··· চড়াই ভেঙ্গে এগিয়ে চলি···। প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার ফিট উঁচুতে এক গুহায় নাঙ্গা বাবাজী···। আমরা বাবাজীর সঙ্গে বসে ফটো তুললাম।'

পৃঃ ৫০৮





'সম্মুখে ভাগীরথী শৃঙ্গত্রয়··· শিবের স্তবগান করছে।'

পৃঃ ৫০৮

আমি দিল্লীতে এসে পৌঁছলাম ১০ ডিসেম্বর ১৯৮১। পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ এবং পূজনীয় ভূতপূর্ব মহারাজ তখন দিল্লীতেই ছিলেন। ওঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার পাশ্চাত্য-ভ্রমণের খুঁটিনাটি এবং সব শুনে খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন। আমি ওঁদের বললাম: 'যদি কিছু কৃতিত্ব থাকে তা আপনাদের। আপনাদের আশীর্বাদ নিয়েই তো আমি ওদেশে গিয়েছিলাম। সাফল্য যদি হয়ে থাকে তা হয়েছে আপনাদের আশীর্বাদেই।' কলকাতায় এলাম ১৫ ডিসেম্বর। দুদিন পরে মঠে গেলাম। ঠাকুর-মা-স্বামীজী-মহারাজের মন্দিরে প্রণাম করলাম। অন্যান্য গুরুজনদেরও প্রণাম করলাম। সবাই কুশল প্রশ্ন করলেন, নানারকম কথাবার্তা হল। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়ছে আমাদের সহ-অধ্যক্ষ পূজনীয় সুজি মহারাজের—স্বামী নির্বাণানন্দজীর কথা। উনি আমাকে খুব আশীর্বাদ করলেন। বললেন: 'তোমার জন্য গৌরব বোধ করছি। সমস্ত সঙ্ঘের শক্তি তোমার পিছনে ছিল।' আরও অনেক কথা বললেন—যে-সব কথা অন্যকে বলবার নয়, মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখবার মতো। তাঁর মুখে সে-সব কথা শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমার মনে হল: স্বয়ং ঠাকুরই তাঁর মধ্যে দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করছেন।

এই সেই স্বর্গ 'তপোবন'

স্বামী প্রভাকরানন্দ

[অভিযাত্রী লেখক বর্তমানে বাগবাজারস্থ 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' তথা উদ্বোধন কার্যালয়ে কর্মনিরত।]

গোমুখ দর্শনের পর—মনের সংগোপনে আবাল্যলালিত ইচ্ছাটি জেগে উঠল ফের,—"নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ;—মহাদেবের জটা হইতে"। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর লেখা—'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' ছোটবেলা বার বার যখন পড়তাম, তখনই যেন এক কবিতার ছন্দ সমগ্র হৃদয়-মনে অনুরণিত হত। প্রশ্ন ও উত্তর—একই সঙ্গে গাঁথা একটি কবিতা। মনে মনে ভাবতাম কবে দেখব সেই উৎসধারা।

প্রকটিত গঙ্গাধারাকে গোমুখে দেখলাম ঠিকই, কিন্তু কোথায় সেই মহাদেবের জটা, কোথা হতেই বা আসে এই অনন্তধারা? তাই এগিয়ে চলি আমরা—তপোবনের উদ্দেশে। শিবলিঙ্গ গিরি-শিখর (২১,৪৬৬ ফিট) দণ্ডায়মান তপোবনের উপর, তার চতুর্দিকে আরও অনেক হিমশিখর ধ্যানমগ্ন। পুরাণে বর্ণিত কৈলাসে মহাদেবের জটা থেকে উৎসারিত বারিধারা গঙ্গারূপে অবতীর্ণ এখানেই, ভগীরথের তপস্যায় "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে" মহাদেবের জটা ভেদ করে অবতীর্ণ হন মর্ত্যলোকে, সে স্থান তো তপোবন-ই,—অপর দিকে নন্দনকানন। সার্থক দুই নাম। স্বর্গরাজ্য কিরূপ জানি না, তবে এই নৈসর্গিক পরিবেশ দর্শনে মনের কল্পনাকে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলাম।

গঙ্গোত্রী থেকেই প্রস্তুত হয়ে গেছলাম সকলে; পথ-প্রদর্শক হিসেবে সুরথরামকে সঙ্গী করা হয়েছিল; আমরা তিনজন সন্ন্যাসী আর দুটি তরুণ মিলে ছজন। তরুণ দুটি দুর্গাপুর থেকে গিয়েছিল—নাম অজয় ও স্বপন, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। হিমালয়ের টানে ওরা প্রায়ই যায়। অজয় মাউন্টেনিয়ারিং পাশ করে কয়েকটি ছোট-খাটো অভিযানেও যোগ দিয়েছে পরে। ওদের

সঙ্গে আলাপ হয় উত্তরকাশীর বাসস্ট্যাণ্ডে। আমরা সকলে গোমুখের সামনে দিয়ে ঝুরা পাহাড়কে (অনবরত পাথর ঝরে পড়ছে শিখর হতে) বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলি। ঘড়িতে তখন সকাল আটটা, অথচ ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন চারিদিক, —বোধ হচ্ছিল—প্রভাতের বিলম্ব অনেক। এখান থেকে তপোবনের দূরত্ব সাত-আট কিলোমিটার। কিন্তু পথ কোথায়? ভয়ঙ্কর বরফের খাদ ও গ্ল্যাসিয়ার এড়িয়ে যে যতখানি পথ সংক্ষেপ করতে পারে। গাইড ছাড়া পথ-চেনা অসম্ভব। বরফ-সমুদ্রে ভাসমান পর্বতশিলা ও রাবিশ, পাহাড়ের ভগ্নস্তূপ। এই হিমবাহ শক্ত বরফ—তুষার, বালি ও প্রস্তরে মিশে কঠিন আচ্ছাদন। বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই পথ আগলে রয়েছে যেখানে সেখানে। তারই মধ্যে পাথরগুলো আঁকড়ে-আঁচড়ে এগিয়ে চলি আমরা, হাতে সূচালো লাঠি, কাঁধের ব্যাগে চুরমা ও জলের বোতল। মনে দারুণ উত্তেজনা—গন্তব্যস্থান তপোবন! বামপার্শ্বে অনেক দূরে সুদর্শন শৃঙ্গ (২১,৩৫০ ফিট) প্রহরীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের গাইড সুরথরাম সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে, কয়েক বছর আগে এক জাপানী অভিযাত্রীদল সুদর্শন অভিযানে গিয়ে ঝুরা পাহাড়ের কবলে পড়ে ফিরে এসেছিল। অভিজ্ঞ সুরথরাম প্রতি পদক্ষেপে সাবধান করে আমাদের। কোন্ পাথরটিকে ধরা উচিত কোন্‌টি ধরা চলবে না—নির্দেশ করে। গ্ল্যাসিয়ারের ঢালে কোন-রকমে আটকে আছে মাত্র। সামান্য স্পর্শে সকলকে পোস্তবাটা করে চলে যাবে এই হাজার হাজার টনের চাঁইগুলো। তাই সতর্কতা প্রতি মুহূর্তে। শক্ত বরফের গ্ল্যাসিয়ারের মাঝে আবার চোরাবালির মতো নরম বরফের খাদও আছে। সেখানে পা পড়লে ক্ষণিকের মধ্যে তলিয়ে যেতে হবে। কয়েকশত বছর নিশ্চিন্তে সেই মরকত রাজ্যে বাস করতে হবে। স্বামী কৃষ্ণরূপানন্দ একটি পাহাড়-আকৃতি পাথরে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করছিলেন কিন্তু তখনই লাফিয়ে সরে আসেন, বুঝতে পারেন পাথরটি নড়ছে!

আমাদের সকলেরই আপাদমস্তক গরম কাপড়ে মোড়া ছিল। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের অনেক নিচে। ঠাণ্ডা অকল্পনীয়। তবু চড়াই-উৎরাই-এর পথ-ক্লান্তিতে আমরা ঘর্মাক্ত। প্রত্যেকেই কিছু কিছু গরম কাপড় খুলে সাইড ব্যাগে চালান দিয়েছি। কুয়াশা কেটে গেছে, ঝল্‌মল্ করছে চারিদিক সূর্যকিরণে। গাইডের নির্দেশে সানগ্লাস পরে নিই, বোরোলীন লাগাই সারা মুখে, নতুবা হিমেল হাওয়ায় জলে যাবে। ক্ষত সৃষ্টি হবে ফেটে গিয়ে।

অল্পস্বল্প কথার মাঝে এগিয়ে চলি সকলে, অজয় ও স্বপন পালাক্রমে অনবরত ছবি তুলছে। কখন শৃঙ্গগুলির, কখন আমাদের। এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছবিগুলি ওদের তোলা। দুজনেরই হাত বেশ ভাল। এই অন্যমনস্কতার মাঝে হঠাৎ বজ্রপাতের শব্দে চমকে উঠি সবাই। কিসের শব্দ, মেঘ নেই! ঝল্‌মলে আকাশ, তবে বাজের শব্দ কেন? সুরথরাম মৃদু হেসে ভাগীরথী শৃঙ্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। পাদদেশে অজস্র ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। একেই বলে হিমসম্প্রপাত (Avalanche)। হঠাৎ যখন বরফের ধ্বস নামে শিখরদেশ হতে, তখন এইরকম শব্দ হয়। এই শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে শিখরে শিখরে। মনে হয়, যেন আকাশে "হর হর" রব। স্বর্গীয় অনুভূতি, স্তব্ধ হয়ে উপভোগ করি সেই ধ্বনি। আনন্দে ভরে ওঠে মন প্রাণ!

এগিয়ে চলি সবাই, ক্লান্তিতে অবসন্ন হলেও বসতে দেয় না সুরথরাম, অনুযোগ করে বলে: চড়াই করতে গিয়ে বসে গেলে আর যাওয়া হবে না। পায়ের শিরায় টান ধরবে। তাই ধীর গতিতে

এগোই, গোমুখ সমুদ্রতল হতে ১২,৭৭০ ফিট। আমরা এখন চোদ্দ হাজার ফিটের কাছাকাছি দিয়ে হাঁটছি, প্রায় এক হাজার ফিট উপরে উঠে এসেছি। কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ সুরথরাম পা পিছলে পড়ল, মাথা নিচের দিকে, হাতের আইস অ্যাক্স ছিটকে গেল। নিকটস্থ স্বামী কৃতাত্মানন্দজী তার পা টেনে ধরলেন। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সে ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়াল যেন কিছুই হয়নি, আমরা সকলে স্তম্ভিত।

এক ঘণ্টার উপর হেঁটেছি,—কিন্তু গাইডের কথামতো আমরা নাকি দু মাইলও আসিনি। ভয় পেয়ে গেলাম। সময়ের হিসেবে ৩টার মধ্যে ফিরব কী করে! ৩টা ৪টা থেকে এই অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। সুরথ আশ্বাস দিয়ে বলে আর দেড়-দু মাইল পর চড়াই নেই, সুন্দর রাস্তা, তখন সময় লাগবে না। আশ্বস্ত হই। কাকের মতো দেখতে, রংটা পাংশুটে, চাপা কর্কশ আওয়াজ, দু-তিনটি পাখিকে এই সময় মাথার উপর চক্কর দিতে দেখলাম। তারা মাঝে মাঝে বরফের ফাটলে বসে কিছু খেতে চাইছে, কিন্তু আবার উড়ে যাচ্ছে। জনপ্রাণীশূন্য এই বরফের রাজত্বে কোথা থেকে এল এরা? পম্পা সরোবরের কাক ভূষণ্ডীর কথা মনে পড়ে গেল। রামায়ণের কাহিনী, সেই কাক ভূষণ্ডী সদা সর্বদা রাম নাম করছে, তৃষ্ণার্ত হয়েও সরোবরের জল পান করতে গিয়ে করছে না। যদি রাম নাম করা বন্ধ হয়ে যায়। অপূর্ব সেই উপাখ্যান। এই পাখিগুলিও কি তাই? এরা কি শিব নাম করছে? তা না হলে কেবল উড়ে বেড়াচ্ছে কেন?

এবার আমরা ম্যাসিয়ার ও পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষগুলি ছাড়িয়ে একটি পাহাড়ের শিরদাঁড়া ধরে এগিয়ে চললাম। ডানদিকে অনেক নিচে ভৃগুপন্থ হিমবাহ, ঋষিপ্রতিম ভৃগুপন্থ শৃঙ্গ (২২,২১৮ ফিট) হতে এর উৎপত্তি। শিরদাঁড়া পাহাড়টির ঢাল ঐ হিমবাহ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ঢাল জুড়ে একজাতীয় লাল ঘাস ও জংলী ফুলের গাছ দেখলাম। পথের মধ্যে আর একটি মজার প্রাণী দেখা গেল, ঠিক পুরীর সমুদ্র-বেলায় যেমন দ্রুতগতিসম্পন্ন কাঁকড়া দেখা যায়, এখানে সেই জাতীয় কিছু লাল ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাণী নিমেষে গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। সুরথরাম বলল—একজাতীয় পাহাড়ী মাকড়সা। চলার সময় পাহাড়ী মূষিকের বিষ্ঠাও দেখলাম। এরা কী খায়! এখানে এত ঠাণ্ডায় থাকেই বা কী করে! ঈশ্বরের সৃষ্টি বোঝা ভার। এই সময় তিনজন সামরিক বাহিনীর জওয়ান আগ্নেয় অস্ত্র হাতে শিরদাঁড়া ধরে নেমে আসছিল, আমাদের দেখে জানতে চাইল অনুমতিপত্র আছে কিনা। আমরা এসব নিয়ম কানুন কিছুই জানি না বলাতে, তারা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইল। আমরা এতখানি পথ এসে কিছুতেই ফিরব না। ওরা যেতে দেবে না, তর্ক, কথা কাটাকাটি, ওদের যুক্তি অল্প দূরে চীন সীমান্ত, পাহাড়ের ওদিকেই। তাই সরকারী পরোয়ানা আছে—অনুমতি ছাড়া কেউ যাবে না। আমরা বললাম,এসব কানুন গঙ্গোত্রীতে জানানোর ব্যবস্থা নেই কেন? শেষে বয়স্ক জওয়ানটি মীমাংসা করে, "বাবালোগ মানতে নেহী ভাইয়া, জানে দেও,"—ওরা "হর হর মহাদেও কী জয়" বলে অভিনন্দন করে, আমরাও গলা মিলিয়ে যাত্রা শুরু করি।

বামপার্শ্বে অনেক নিচে চতুরঙ্গী হিমবাহ, রক্তবরণ হিমবাহ। লাল, সাদা, কালো, হলুদে বিভিন্ন রং-এর পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষ নিয়ে যে-সব হিমবাহ গঙ্গোত্রী হিমবাহে মিলেছে, সেইগুলির এরূপ সাদৃশ্য-পূর্ণ নাম হয়েছে। মাতৃশৃঙ্গ (২২,০৪৭ ফিট) রক্তবর্ণ হিমবাহের অনেক পিছনে সুদর্শনের পাশেই অবস্থিত। "চতুরঙ্গী ও মানা" আরও দূরে উত্তর-পূর্বে। এইসব পাহাড়গুলির পিছনেই চীন সীমান্ত। গাইড বলল যে, মিলিটারির লোক টহলে

আসে এই কারণেই। আমরা ক্রমশঃ পাহাড় ছেড়ে সমতল ভূমির ন্যায় বিস্তীর্ণ এক তৃণভূমিতে এসে পড়লাম যেন তরাই অঞ্চল। অথচ আমরা তখন চোদ্দ হাজার ফিটের উপরে পৌঁছে গেছি। চারিদিকে অজস্র রকমের ফুল ফুটে রয়েছে, যেন বিরাটরূপী ঈশ্বরের পূজায় আত্মনিমগ্ন সকলে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি সবাই। এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলটি প্রায় দু মাইল লম্বা হবে। মাইল খানেক পরে, ঠিক মাঝখানে শিবলিঙ্গ দণ্ডায়মান। যেন তাঁরই পূজাতে এই আয়োজন। সম্মুখে ভাগীরথী শৃঙ্গত্রয় (যথাক্রমে ২২,৪৯৫ ফিট/২১,৩৬৪ ফিট/২১,১৭৬ ফিট) শিবের স্তবগান করছে। নিচে ভাগীরথী হিমবাহ ও চতুরঙ্গী হিমবাহের সঙ্গম, একটু উপরে নন্দনকানন। সেটিও একটি মনোরম পুষ্পোদ্যান। এইসব দেখে মুগ্ধ কৃষ্ণরূপানন্দজী গান ধরলেন, 'আপনি করিলে আপনার পূজা আপনার স্তুতিগান…'

হঠাৎ হেলিকপ্টারের শব্দে সচকিত হই। যেন স্বপ্নরাজ্য হতে নেমে আসি বাস্তবে। সত্য সত্যই শিবলিঙ্গের পিছন হতে মেরুর (২১,৫৫২ ফিট) সামনে দিয়ে উড়ে আসে একটি জলপাই রং-এর হেলিকপ্টার। পরে জেনেছিলাম, অস্ট্রেলিয়ার এক অভিযাত্রী দল শিবলিঙ্গ শিখর জয় করে নামতে গিয়ে তুষার ধ্বসে প্রাণ হারিয়েছে একজন। অভিযাত্রী দলের কাছ হতে ভারত সরকার এস. ও. এস. পেয়ে হরসিল্ মিলিটারি ক্যাম্প থেকে হেলিকপ্টারটিকে পাঠিয়েছিল মৃতদেহটি নিতে। এটি সরকারের দায়িত্ব। শিবলিঙ্গের পাদদেশে এই অভিযাত্রী দলকে দেখে আমরা অভিনন্দন জানালাম। ওরাও ঘাড় নেড়ে "নমস্তে" বলল। দেখলাম এক সঙ্গীকে হারিয়ে সকলে বেশ বিষণ্ণ। ফিরে চলল ওরা, এগিয়ে গেলাম আমরা। সামনেই উচ্চ শিখর শিবলিঙ্গ, শ্বেতশুভ্র বরফাচ্ছাদিত। তা হতে নেমে এসেছে বেণীর মতো শত সহস্র ঝরনাধারা। সেই ধারা একত্রিত হয়ে মিলেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহে, অন্তঃসলিলারূপে প্রবাহিত হয়ে আবার প্রকাশ গোমুখে। "ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।"…

সুরথরামের পিছে পিছে চড়াই ভেঙে এগিয়ে চলি আবার। প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার ফিট উঁচুতে এক গুহায় নাঙ্গাবাবাজী—রামদাস বাবা থাকেন। তিনি এবং আরও দুজন সাধু চাতুর্মাস্য করেন এখানে, নবরাত্রির পর বরফ পড়লে নেমে যান গঙ্গোত্রীতে। অভিযাত্রী দলের দেওয়া আটা জলে গুলে খান এই কয়মাস। রামদাসজী অবশ্য ওয়াক্স ফুয়েল জেলে চা খাওয়ালেন আমাদের। গুহার মধ্যে জাপানী ইমার্জেন্সী লাইট, আরও নানা জিনিস,—অবাক লাগছিল ঐ পরিবেশে। বাবাজী বললেন—অভিযাত্রীরা দিয়ে গেছে। এসব পড়ে থাকবে—নবরাত্রিতে দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে চলে যাব। আমরা বাবাজীর সঙ্গে বসে ফটো তুললাম। তারপর নমস্কার ও শ্রদ্ধা সম্ভাষণ জানিয়ে এগিয়ে চলি। বাবাজীর গুহার উপর সাদা পতাকা উড়ছে পত পত করে। গেলাম এবার নিচে সুধীরানন্দজীর গুহায়। ছোট্ট গুহা, কোনরকমে একজন থাকতে পারে, স্বামীজীর বাঙালী শরীর, এক সময় কনখল রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রে ছিলেন। কুড়ি বছরের বেশি গঙ্গোত্রীতে রয়েছেন—এই কয়মাস তপোবনে সাধন ভজন নিয়ে থাকেন। গুহার বাইরে চট বিছিয়ে বসে ভাগবত পাঠ করছিলেন, কম্বলের আলখাল্লা পরা, ভিতরে দু-তিনটি কম্বল ও পুঁথিপত্র, একটি ভিক্ষাপাত্র ও ছোট্ট একটি আটার পুঁটুলি সম্বল। গুহার মুখটি দুটি কাঠের টুকরা দিয়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে।

এবার গেলাম নেপালী বাবা শংকরানন্দজীর গুহায়। তিনিও গুহার সম্মুখে রৌদ্রে বসে 'ব্রহ্ম-সূত্র' পড়ছিলেন। এই চার মাস মৌনী থাকেন। শ্লেটে হিন্দীতে লিখে আমাদের সঙ্গে আলাপ

করলেন। সুন্দর স্বভাব। বাচ্চা ছেলের মতো নিঃশব্দ হাসি সর্বদাই তাঁর মুখে লেগেছিল। বললেন, "একান্তে ভজন ও নিদিধ্যাসন করব বলেই এখানে চলে আসি,—বরফ পড়লে নিচে নেমে যাব।" অজয় ও স্বপন, সকলকেই কিছু কিছু প্রণামী দিতে চাইলে, প্রত্যেকেই হেসে তা ফিরিয়ে দিলেন, "এখানে টাকা কি হবে? কি কিনব? বরফ? ও তো এমনিই পাওয়া যায়! এখানে টাকা ও বরফ একই বস্তু। যদি একান্তই ইচ্ছা হয় সুরথরামের কাছে দু-এক প্যাকেট (আগর-বাত্তি) ধূপ কিনে দিও, ওরা কেউ না কেউ আসে এদিকে, তখন দিয়ে যাবে।" ইনি দেখলাম চট্ (টাট) পরিধান করে আছেন। গায়েও তাই, বিছানাও চটের। কেউ কেউ এঁকে টাট্‌বাবা বলেন।

এবার আমাদের নামার পালা। তপোবন দর্শন, শিবলিঙ্গ দর্শন সবই হল কিন্তু "মহাদেবের জটা" তো দেখা হল না। সে কি কৈলাসে না গেলে হবে না? যে জটা ভেদ করে গঙ্গাধারা মর্ত্যে অবতীর্ণ, তার সন্ধান তো মিলল না! মনটা দমে গেল। সামনের উন্মুক্ত প্রান্তর জুড়ে যে ফুলের মেলা তাই দেখছিলাম যেখানে প্যান্সী হয়েছে সেখানে কেবল প্যান্সী, এইভাবে পপি, ভার্বেনা, ফ্লক্স, ডেইজী নানা ফুলের বেড্, থরে থরে সাজানো, প্রকৃতির কী অপূর্ব রুচি! মানুষ প্রকৃতির কাছেই শিখেছে সবকিছু। আমি আপন মনে আবৃত্তি করতে থাকি—"এই সেই স্বর্গ—এই সেই স্বর্গ তপোবন।" সুরথরাম বলে, হ্যাঁ স্বামীজী, ইন্দ্র রথ নিয়ে এসেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে যেতে এখানেই। আমি মৃদু প্রতিবাদ করে বলি, তা কি করে হবে, সে তো বদরীনাথের দিক হয়ে যেতে হয় স্বর্গারোহিণীর পথে। সুরথ বলে, ঠিক কথা, সেও তো এখান থেকে আরও পূর্বে এগিয়ে। পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে যাত্রা করে যুধিষ্ঠির সে পথেই তো এখানে এসেছিলেন। আমি যুক্তিতর্কে না গিয়ে চুপ করে থাকি। নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখি শিব-লিঙ্গ চূড়া। রোমাঞ্চিত হই, একখণ্ড জলীয় বাষ্প সমগ্র চূড়াকে আচ্ছন্ন করে, ঠিক যেন জটাজুট-লম্বিতরূপে। আর শিবলিঙ্গ হতে প্রবাহিত ঝরনাধারা—সব মিলিয়ে মহাদেবের জটানিঃসৃত গঙ্গাধারাকে যেন খুঁজে পেলাম এখানেই—আমার মানসলোকে। মন প্রাণ তৃপ্তিতে ভরে যায়। আকাশে বাতাসে পুনরায় সেই সুরধ্বনি শুনছিলাম তখন—"নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, মহাদেবের জটা হইতে"। সার্থক হল আমাদের তপোবন যাত্রা। সেদিনটি ছিল ১৯৮১-র ১২ সেপ্টেম্বর।

...উত্তরদিকে হিমালয়ের তুষারাচ্ছাদিত মূর্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। প্রকৃতির সেই অসামান্য রূপরাশি দেখিবামাত্র আমি বসিয়া পড়িলাম। অনিমেষনেত্রে সেই অপার তুষাররাশিপূর্ণ ভূধরশ্রেণী দর্শন করিতে করিতে আমার দেহ রোমাঞ্চিত ও মন উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সকলকে যাহা দেখিবার জন্য উপদেশ দিতেন, এই কি সেই পুণ্যদর্শন হিমালয়? "হিমালয়শৃঙ্গে মহাদেব অঙ্গে প্রকৃতি পার্বতী সতীর মিলন" কি এই? গিরিরাজকন্যা জগন্মাতা উমার কি এই পিত্রালয়? এই কি আমার চিরাভীপ্সিত স্থান হিমালয়!! বহুযোজন বিস্তৃত বিশাল হিমালয়পর্বতের দর্শনমাত্রে আমার হৃদয়ে যে এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইবে তাহা আমি পূর্বে জানিতে পারি নাই। আমার প্রকৃতই মনে হইতে লাগিল যে আমি যেন মর্ত্যলোক ছাড়িয়া কোন এক স্বর্গরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সেই অপার তুষাররাশির মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য আমার হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিস্তব্ধ, গম্ভীর ও নিবিড় অরণ্যানীসমন্বিত পর্বতমালার অপূর্ব শোভা সন্দর্শনে আমি ভগবানের অপার মহিমা ভাবিতে ভাবিতে আনন্দে বিহ্বল হইলাম, এবং বিচিত্র বিহঙ্গমালী [illegible] সৌন্দর্যের আধার গিরিরাজের পাদমূলে বার বার নমস্কার করিতে লাগিলাম।

—স্বামী অখণ্ডানন্দ

'নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা'

ডক্টর রমা চৌধুরী

[রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় মহিলা ডক্টরেট এবং রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যা প্রথম ভারতীয় নারী।]

আজ বৎসরান্তে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার শুভকাল সমাগত। এই আনন্দোৎসবের দিনে, স্বতই আমাদের মনে উদিত হচ্ছে ৺শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর তথাকথিত উৎপত্তির কথা—যা ৺শ্রীশ্রীমাতৃলীলার সর্বজনবিদিত সর্বজন-সমাদৃত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করা আছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত্রে, শ্রীশ্রীচণ্ডীর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পূর্ব-কালে যখন ইন্দ্র দেবগণের এবং মহিষাসুর অসুর-গণের রাজা ছিলেন, তখন পূর্ণ একশ বৎসর দেবাসুর সংগ্রাম হয়; এবং অসুরগণ দেবগণকে পরাজিত ও মহিষাসুরকে স্বর্গের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করে। তখন পরাজিত ও হৃতরাজ্য দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করে, শিব ও বিষ্ণুর নিকট গিয়ে সব কথা নিবেদন করেন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। সেই সঙ্গে তাঁরা হতাশা-ভরে বর্ণনা করেন, কিভাবে দুরাত্মা মহিষাসুর ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ প্রমুখ সকল দেবতার অধিকার হরণ করে, নিজেই তাতে অধিষ্ঠান করছে সদম্ভে। এই কথা শুনে, দেবাদি-দেব মহাদেব ও বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাঁদের বদন থেকে মহাতেজ নিঃসৃত হতে লাগল প্রবল বেগে। সেই সময়ে ইন্দ্রাদি অন্যান্য সকল দেবতার শরীর থেকে একই ভাবে বিপুল তেজ নির্গত হল; এবং সমস্ত দেবতার মহাতেজ একত্রে মিলিত হয়ে জলন্ত পর্বতের ন্যায় প্রতিভাত হতে লাগল। অনন্তর সকল দেবতার দিব্য দেহসঞ্জাত ত্রিলোকব্যাপী সেই অতি প্রচণ্ড তেজ এক অপরূপ নারীমূর্তি ধারণ করল; এবং শিবের তেজে তাঁর মুখ, যমের তেজে তাঁর কেশপাশ, বিষ্ণুর তেজে তাঁর বাহুসমূহ, ব্রহ্মার তেজে তাঁর পদযুগল, সূর্যের তেজে তাঁর পদাঙ্গুলিসমূহ, অষ্টবসুর তেজে তাঁর করাঙ্গুলিসমূহ, কুবেরের তেজে তাঁর নাসিকা, দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তেজে তাঁর দন্তাবলী, অগ্নির তেজে তাঁর ত্রিনয়ন, সন্ধ্যাদেবীদ্বয়ের তেজে তাঁর ভ্রূযুগল, বায়ুর তেজে তাঁর কর্ণদ্বয় এবং বিশ্বকর্মাদি অন্যান্য দেবতার তেজে তাঁর সমগ্র দেহ উৎপন্ন হল।

কেবল তাই নয়—সকল দেবতা দেবীকে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র দিলেন সানন্দে। যেমন, মহাদেব দিলেন শূল; বিষ্ণু সুদর্শন চক্র; বরুণ শঙ্খ; অগ্নি শক্তি; পবন ধনুক ও বাণ; ইন্দ্র বজ্র এবং ঐরাবতের ঘণ্টা; যম দণ্ড; ব্রহ্মা রুদ্রাক্ষ মালা ও কমণ্ডলু; নিমেষাদিকালাভিমানী দেবতা খড়্গ ও ঢাল; ক্ষীরোদসমুদ্র মুক্তাহার, বলয়, নূপুর, কুণ্ডল প্রমুখ অলঙ্কার; বিশ্বকর্মা কুঠার এবং নানাবিধ অস্ত্র ও অভেদ্য কবচ; সমুদ্র নানাবিধ মালা; হিমালয় বাহন স্বরূপ সিংহ; বাসুকি নাগ-হার প্রভৃতি; এবং অন্যান্য সকল দেবতাও অলঙ্কার ও অস্ত্রাদি।

এই ভাবে সকল দেবতার তেজোরাশি থেকে উদ্ভূতা এবং সকল দেবতার অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জিতা শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী অসুরবিনাশের জন্য সানুগ্রহে আবির্ভূতা হলেন।

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ২।১-৩৪)।

তারপর শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতে তিনি ক্রমান্বয়ে এগারোটি অসুর বধ করলেন। যথা—মধু, কৈটভ

(নারায়ণের মাধ্যমে), চিক্ষুর, চামর, মহিষাসুর, ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ, শুম্ভ, নিশুম্ভ।

এদের মধ্যে যার নিধনের জন্যই বিশেষ করে মহাদেবীর উৎপত্তি, সেই মহিষাসুর বধের পর দেবগণ কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর যে স্তব করছেন, তার মধ্যে একটি রমণীয় বন্দনা হল এই—

"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।৩)

—"যে দেবী আত্মশক্তির দ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন, যিনি সমস্ত দেবতার শক্তি-সমূহের মূর্ত প্রতিচ্ছবি, সেই সকল দেবমহর্ষি-পূজ্যা মাতাকে ভক্তি-নম্রভাবে প্রণাম করি। তিনি সকলের মঙ্গল করুন।"

শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই মর্মস্পর্শী বিবরণীর দার্শনিক মর্মার্থ হল এই যে—সাংসারিক দিক থেকে, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারাদি রূপ পাপ অতি প্রচণ্ড বলশালী। তাকে ধ্বংস করতে হলে, আমাদের সর্বশক্তিসমন্বিত, সর্ব-অস্ত্রবিমণ্ডিত হয়ে সাহস-ভরে অগ্রসর হতে হবে। সেই শক্তি জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের শক্তি; সেই অস্ত্র সত্য-শিব-সুন্দরের অস্ত্র; সেই সাহস দেহ-মন-আত্মার বীর্য।

বস্তুতঃ, ভারতীয় শাস্ত্রমতে সকলের মূলে রয়েছে অবিদ্যা বা অজ্ঞান—এক বস্তুকে অন্য বস্তু রূপে জানা। এই অবিদ্যা দূর করে, সব বস্তুর স্বরূপ জানতে হবে—নিজেকে জানতে হবে ব্রহ্ম রূপে: "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ১।৪।১০)—"আমিই ব্রহ্ম" বলে; অন্যদেরও জানতে হবে ব্রহ্মরূপে: "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (ঐ, ২।৫।১৯)—"এই আত্মাই ব্রহ্ম" বলে; ব্রহ্মাণ্ডকেও জানতে হবে ব্রহ্মরূপে: "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্যো-পনিষদ্ ৩।১৪।১)—"সব কিছুই, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম" বলে।

তাহলে? তাহলে মিলিয়ে গেল সব সন্দেহ-অবিশ্বাস; চলে গেল সব হানাহানি-কাটাকাটি; থেমে গেল সব যুদ্ধ-বিগ্রহ। কারণ—

"If you hurt any one, you hurt yourself. For, you and your brother are one". (Swami Vivekananda)

—"যদি তুমি অন্যকে আঘাত কর, তাহলে তুমি নিজেকেই আঘাত করবে। কারণ, তুমি ও তোমার ভাই এক ও অভিন্ন।"

এই সার্বজনীন ভাবই তো ৺শ্রীশ্রীমাতৃপূজার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

মহিষাসুর বধের পরে, এই যে অপূর্ব স্তুতি দেবগণ পরমাদেবীকে করছেন—তার মধ্যে আরেকটি শ্রেষ্ঠ তত্ত্বও নিহিত হয়ে আছে, অন্যান্য বহু বৃহৎ মহৎ তত্ত্বের পাশে। যেমন দেবগণ আবেগভরে এই বন্দনা-গীতি করছেন—

"যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্।

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।৫)

অর্থাৎ—"যিনি স্বয়ং পুণ্যবানগণের গৃহে লক্ষ্মী, পাপিগণের গৃহে অলক্ষ্মী, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্‌বুদ্ধি ও সজ্জনগণের পাপকার্যে এমন কি পাপ-চিন্তামাত্রেই লজ্জা—তাঁকেই আমরা নতমস্তকে প্রণাম করি। হে দেবি! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিপালন করুন।"

এ স্থলে একটি অতি আশা ও অনুপ্রেরণার কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ—পরমাদেবীকে আমরা লাভ করতে পারি স্বপ্রচেষ্টাতেই। সেজন্য পুণ্য-বানগণ তাঁকে লাভ করেন সকল ধনের, কেবল পার্থিব নয়, আধ্যাত্মিক সকল ঐশ্বর্যের কারণরূপে,

সকল মঙ্গলের উৎসরূপে, সকল আনন্দের ভিত্তি-রূপে। কিন্তু পাপিগণ তাদের তমিস্রাচ্ছন্ন ক্লেদাক্ত মন দিয়ে দেবীর প্রকৃত সচ্চিদানন্দ রসঘন সঘন রূপটি দেখতে পায় না। তাদের নিকট সবই তো অলক্ষ্মী—সবই তো ক্লেশ-ক্লেদ, নীচতা-হীনতা, সংকীর্ণতা-স্বার্থপরতার মূর্তরূপ—এমনকি দেবীও তাই। সেজন্য ধর্মের প্রথম সোপানই হল চিত্তশুদ্ধি—যে বিশুদ্ধ চিত্তেই কেবল প্রতিফলিত হন পরমানন্দময়ী, পরমা জননী তাঁর প্রকৃত প্রকৃষ্ট মহিমময়ী মঙ্গলময়ী মধুরিমময়ী মূর্তিতে। ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হল এই মহতী উপলব্ধি।

"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৩।৪, ৪।১, ৪।১২)

—"তিনি (সেই অমৃত-অভয় পুরুষ) আমাদের শুভ বুদ্ধি দিন।" ওঁ শান্তিঃ

একটি স্থানঃ এক অব্যক্ত মুহূর্ত

ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম

[বাংলাদেশের ঢাকা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষা। উভয় বঙ্গের যশস্বিনী সাহিত্যিকা। আন্তর্জাতিক প্রতিভাসম্পন্না বিদুষী সমাজসেবিকা।]

সাত বছর আগে, না তারও কিছু বেশি ১৯৭৫ সালের অগস্ট মাসে Mexico-তে আন্তর্জাতিক নারী মহাসম্মেলনে যোগ দিয়ে ফেরবার পথে যুক্তরাষ্ট্র-ভ্রমণের রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। কয়েকটি নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, মহিলা-প্রতিষ্ঠান ও নামী-দামী মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বক্তব্যপ্রদান ও আলাপের সুযোগ-লাভই ছিল এ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য। ভ্রমণ-তালিকা দেখে খুশি হলাম। ওয়াশিংটন-নিউইয়র্ক থেকে হাওয়াই পর্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য স্থান বাদ পড়েনি। কিন্তু আমার অন্তরে যে একটি বিশেষ স্থান সম্পর্কে ব্যাকুলতা ছিল, তা কি আমার চোখ-মুখের সম্মতির আবরণে ঢাকা পড়েনি? State department-এর কর্তাব্যক্তি যিনি এককালে বাংলাদেশে আমার বন্ধু ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'মনে হচ্ছে তুমি আরও কিছু দেখতে চাও, অসঙ্কোচে বলতে পার।' জড়তা ত্যাগ করে বললাম, 'শিকাগো'। বন্ধুবর উত্তর দিলেন, 'ওঃ! কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিশ্চয়ই তোমার বন্ধুবান্ধব আছে।' হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়লাম। কারণ সত্যিই বন্ধুবান্ধব আছে, কিন্তু আমি সেখানে যেতে চাই কেন তা তো ওঁকে বলতে পারব না। এ যে আমার স্বপ্ন-সাধ। নায়েগ্রা দেখে, ভিজনীল্যাণ্ড দেখে চোখের ক্ষুধা মেটাব, হাওয়াই সমুদ্রে অবগাহন করে দেহ পরিতৃপ্ত হবে!—কিন্তু আমার অতি পিয়াসী মন?

শিকাগো এলাম। রাষ্ট্রীয় অতিথি,—পাঁচতারা হোটেলের ২৬ তলার কক্ষে বসে ভাবছি—রামকৃষ্ণ মিশন তো আগে খুঁজে বের করি, তারপর দেখা যাবে আমার ঈপ্সিত স্থানের, পুণ্যতীর্থের স্পর্শ-সুখের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে কিনা?

সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, ভাবের আদান-প্রদান, গ্রন্থ বিনিময়ের পর বেশ একজন প্রাচীন অধ্যাপককে বললাম, 'শিকাগোতে কোথায় ধর্ম-মহাসম্মেলন হয়েছিল, আর ঠিক কোন্‌খানে স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা করেছিলেন আমাকে দেখাতে পারেন?' উৎসাহী অধ্যাপক বললেন, 'নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু তুমি এখন যাবে না লাঞ্চের পর?' আমার তখন উত্তেজিত মস্তিষ্ক

এবং উদ্বেলিত অন্তর ; বললাম, 'সম্ভব হলে এখন নয় কেন ?' অধ্যাপক আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সহকর্মীদের বললেন একটায় লাঞ্চে এসে মিলিত হবার জন্য।

আকাঙ্ক্ষিত স্থানে এলাম। অধ্যাপক বললেন, 'আমার সব কথা সঠিক নাও হতে পারে ; তবে এই যে পুরানো বিশাল বাড়িটি দেখছ এখানেই সেই ধর্ম-মহাসম্মেলন হয়েছিল। মনে হয়, এরই কোন হলে সেই ঐতিহাসিক সভা বসেছিল। বক্তারা এখান থেকেই বক্তব্য রেখেছিলেন, আর অগণিত শ্রোতা সামনে ডাইনে বাঁয়ে বসে উপভোগ করেছেন সেই সব মহান বাণী।'

চোখ আমার খোলা ছিল কিনা মনে নেই। তবে দেখলাম সামনে সেই দিব্যজ্যোতিঃ তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী দৃপ্তকণ্ঠে তাঁর আমেরিকাবাসী ভাইবোনদের কাছে স্বধর্ম ব্যাখ্যা করে চলেছেন। নির্ঝর-ধারার মতো স্বচ্ছ বেদান্ত-দর্শনে অবগাহন করছেন পাশ্চাত্য গুণিগণ—বিস্মিত, মুগ্ধ তাঁদের দৃষ্টি। স্বামীজীর কিছু বক্তব্য যেন মস্তিষ্কের কোষে আমাকে আঘাত করছিল। পা বোধ হয় কাঁপছিল, দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল। হঠাৎ বন্ধুবর মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, 'নীলিমা, সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে।' লজ্জা পেলাম। ওঁকে কতক্ষণ অপেক্ষমান রেখেছিলাম জানি না। বার বার ক্ষমা চাইলাম। কিন্তু উনি হেসে মাথা নাড়লেন—অর্থাৎ উনি রাগ করেননি।

সন্ধ্যেবেলা রামকৃষ্ণ মিশনের বেদান্ত সোসাইটিতে নিয়ে গেলেন। শুনেছিলাম, আমাদের পূর্ব পরিচিত এক মহারাজ ওখানে আছেন। কিন্তু গিয়ে ওঁকে পেলাম না। সোসাইটির একজন আমাকে ভজনকক্ষে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ রইলাম। তারপর নতমস্তকে বেরিয়ে এলাম।

এরপর কয়েকবার শিকাগো গেছি, কিন্তু ঐ অব্যক্ত অনুভূতিকে তেমনটি আর জাগ্রত করতে পারিনি। আমার অন্তর-দ্বার অবরুদ্ধ হয়ে গেছে, অথবা আমার যা প্রাপ্য ছিল তা আমি পেয়ে গেছি।

ভারত-গৌরব, পৃথিবীর মানবকল্যাণের পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দ, তোমায় শত সহস্র কোটি প্রণাম।

...স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বধর্মসম্মেলনের সহিত অশোকের বৌদ্ধসংগীতি কিংবা সম্রাট্ আকবরের ধর্মসভার তুলনা করিয়া ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে নিজমত সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ জাতির দুঃসাহসই এইরূপ বিশাল উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সমন্বিত কার্যসূচীর পরিকল্পনা করিতে পারিয়াছিল ; নাগরিকগণের শক্তি-প্রাচুর্য এবং উৎসাহই এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিবার পথ আবিষ্কার করিয়াছিল। ধর্মসভার গঠনতন্ত্র ইহাকে হিন্দুধর্মের সর্বধর্মসমন্বয়কারী ভাবগুলি প্রচার করিবার উপযুক্ত একটি অসাধারণ ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত ও বর্জনশীল ধর্মগুলির প্রতিনিধিবর্গ সরল গণতান্ত্রিক সাম্য ও সৌজন্যের ভিত্তিতে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আর কখনও এরূপ বিরাট ভাবে এইজাতীয় অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইবেন বলিয়া মনে হয় না। বহুকাল ধরিয়া চিকাগো ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন ইতিহাসে একক স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। এই অবস্থায় এবং এই পরিবেশেই হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে সর্বপ্রথম নিজমত ব্যক্ত করিয়াছিল।

—ভগিনী নিবেদিতা

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকণা

স্বামী অন্নদানন্দ-সংকলিত

[প্রয়াত সংকলক বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী,—শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের সেবকরূপে তাঁহার পুণ্য সান্নিধ্যলাভে ধন্য।]

ভক্তদের অনুরোধে ১৯২৭/২৮ খৃঃ সারগাছিতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্যের প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলেন, "দেখ, যারা সত্যি সত্যি great man (মহাপুরুষ) তাদের ভুল চাল হবে না। কিছুই ভুল হবে না। স্বামীজী বলতেন, 'এই দেখ না, শঙ্করের—নন্থ, খলু, তু—একটি অব্যয়ের পর্যন্ত ভুল নেই—বৃথা কিছুই লেখেননি—সবেরই importance (আবশ্যকতা) আছে; নেপোলিয়ান নাকি বলেছিলেন একশ বছরের মধ্যে জগৎ থেকে monarchy (রাজতন্ত্র) উঠে যাবে—তা তো ঠিকই হয়েছে—এক শ্যাম আর নেপাল ছাড়া আজকাল monarchy আর কোথাও নেই,—ইংল্যাণ্ডের monarchy তো ঠিক monarchy নয়।'"

অন্য একদিন শ্রীশ্রীবাবা বলিতেছেন, "এই দেখ, বুড়ো হয়েছি, পড়ে গিয়ে পা মচকে গেছে, পায়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, একটু বেশি দূর একসঙ্গে চলতে পারি না; বেলা ১২টার সময় খেয়ে উঠি, তারপর একটু শুই, তিন কোয়াটার গড়িয়েই মনে হয় তিন ঘণ্টা কেটে গেল—সেবক হয়তো বলল, 'এই তো এখনও তিনটে বাজেনি, আর একটু শুয়ে থাকুন'—পাশ ফিরে রইলাম হয়তো, কিন্তু কি আশ্চর্য পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই বলে উঠছি 'দেখতো ঘড়িটা, অনেকক্ষণ হয়ে গেল', সেবক হয়তো বলল, 'বাবা, এই তো পাঁচ মিনিট সবে পাশ ফিরলেন'—'তাই নাকি' বলে আবার চার-পাঁচ মিনিট কাটিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম যেন এক যুগ। বিশ্রামের পর উঠে যদি দেখি যে সবাই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত হবার জন্য তৎপর—তাহলেই মনটায় বেশ ভাল লাগে।"

১৮৯৭ খৃঃ রিলিফের ব্যাপারে শ্রীশ্রীবাবা বলেন, "ব্রহ্মচারী সুরেনকে (স্বামী সুরেশ্বরানন্দ) যখন বলি, 'সাধারণ লোক দুষ্টামি করতে পারে, তা বলে তাদের শাসন বা দণ্ড দেওয়ার কথা তোমার ভাবা উচিত নয়' সে তা মেনে নিতে পারেনি, তখন বিদ্যাসাগরের জীবনের এই ঘটনাটি বলি—'বিদ্যাসাগর মশায় বর্ধমানে একবার দুঃস্থদের কাপড় বিলি করাচ্ছেন। একজন দুঃস্থ একবার কাপড় নিয়ে আবার আসে কাপড় নিতে। বিদ্যাসাগর মশায়ের এক বহু পুরানো ও দৃঢ়কায় ভৃত্য ঐ চালাকি ধরে ফেলে এবং ভৎর্সনা করে। বিদ্যাসাগর মশায় ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সব শুনে সেই ভৃত্যকে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। তার মাসিক দু টাকা পেন্‌সনের ব্যবস্থা করলেন, তথাপি তাকে বহাল রাখলেন না।' এঁদের কাজকর্ম সাধারণ বুদ্ধির মাপকাঠিতে মাপা চলে না।"

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "পৃথিবীতে ভারতেই এখন কলিকাল—কলিকাল মানে মানুষ যখন ঘুমিয়ে কাটায়। দ্বাপরে জাগরণ, ত্রেতায় কার্য, সত্যে বিচরণ।* স্বামীজীও একথায় সায় দিতেন। ভারতেই শুধু inert men (নিশ্চেষ্ট মানুষগুলো), lump of earth (এক তাল কাদার) মতো পড়ে আছে। পশুর মতো লোক জীবন কাটাচ্ছে; নিজেদের ভাল মন্দ বুঝে নেবারও ক্ষমতা নেই।"

শ্রীশ্রীবাবা আলস্য, ঘুম, জড়তা একেবারে

---

* মনু: কলিঃ প্রসুপ্তো ভবতি, স জাগ্রৎ দ্বাপরং যুগম্।
কর্মস্বভ্যুদিতস্ত্রেতা, বিচরংস্তু কৃতং যুগম্॥

দেখিতে পারিতেন না একদিন দুপুরবেলা খুব ঝড়বৃষ্টি হইতেছে। আশ্রমে অনেক লোক। লাইব্রেরি ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া অনেকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য সে-সময়ে বাহিরের কোন কাজ করিবার উপায় ছিল না। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি মহা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "এই ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, আর সব ঘুমুচ্ছে। এই কি ঘুমুবার সময়? ঝড় উঠলে আমি স্থির থাকতে পারি না; কেবলই প্রার্থনা করি—'ঠাকুর ঝড় থামিয়ে দাও, কত লোকের ঘরের চালের খড় উড়ে যাবে, কত গাছপালা পড়ে যাবে, কত ক্ষতি হবে।' লোকহিতে, লোককল্যাণের জন্য জীবন দিয়েছি, আর লোকের যখন ক্ষতি হতে পারে, সেই সময় ঘুমুবো?"

আবার ১৯১৩ খৃঃ একরাত্রিতে প্রচণ্ড ঝড়ের প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি বলিলেন, "ঝড় আরম্ভ হল রাত্রিতে। সকলকে তুলে দিয়ে প্রার্থনা করতে বললাম। আমি ছোট চালাটিতে আছি। আশ্রমে পাকাঘর তখন ছিল না। এত দূর থেকে অন্য ঘরের কারুর খবর নেবারও উপায় নেই। আমার মন তখন কম্পাসের কাঁটার মতো একেবারে ঠাকুরের দিকে হয়ে আছে। মাটিতে বসে প্রার্থনা করছি। জোর প্রার্থনা করছি আর হাওয়া কমছে—প্রার্থনা একটু কমলেই ঝড় যেন বেশি বাড়ে। এমনি করে রাত কাটলো। সকালে একটি ছেলে এসে বলল, 'বাবা, ভাগ্গিস্ ঘুমুতে বারণ করেছিলেন, নইলে মরে যেতাম। যেখানে মাথা রেখে শুয়েছিলাম, ঠিক সেখানে একটা মাটির চাঁই ভেঙে পড়েছে।' তাই বলি, ঘুমিয়ে কাল কাটাবি না। দেখ না আমেরিকার Rockefeller কত বড় ধনী, অথচ ছাতা বগলে এ কারখানা থেকে সে কারখানা করে বেড়াচ্ছেন। জাপান যে এত বড় হয়েছে—তা কি ঘুমিয়ে? জাপানি ছেলেরা কাঁদে না। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময় জাপান সম্বন্ধে পড়েছিলাম। একজন ইংরেজ লিখেছেন: পাথরের উপর থেকে খড়ম্ পায়ে একটি জাপানি ছেলে পড়ে গেল, কী লাগাই লাগল! অথচ উঠে চলে গেল, একটুও কাঁদলে না। জাপানে মা তার কচি ছেলেকে উলঙ্গ করে বরফের ভিতর খেলা করতে পাঠায়। অন্ধকার রাতে হত্যাভূমিতে ছেলেকে একলা পাঠায়—সেখানে মড়ার খুলিতে কালি মাখিয়ে রেখে আসে। ঠিক গিয়েছিল কিনা দিনের আলোয় দেখে আসে। জাপানে কচি কচি ছেলেদের দুদিন রাত্রে ঘুমুতে দেয় না—সারারাত জেগে পড়তে হবে, পরদিনও দিনের বেলা ঘুমুতে পাবে না। এই রকম সব ওদেশে শিক্ষাদীক্ষা। সব মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়—মায় বিজ্ঞানচর্চা পর্যন্ত; সামান্য রিক্সাওয়ালাও ফাঁক পেলেই খবরের কাগজ থেকে পৃথিবীর খবর সংগ্রহ করে। ওখানে শহর পল্লীগ্রামে ভেদ নেই। সব জাপানটাই যেন একটা শহর—সব জায়গাতেই মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থা—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ি সব সাজানো গোছানো, যেন থিয়েটারের সিনের মতো। স্বামীজী যখন জাপানে যান তখন কুক্ কোম্পানির কাছে তাঁর হাজার তিনেক টাকা ছিল। সেখানকার একখানি ছবি দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পুঁজি পাটা দিয়ে ঐ ছবি কিনবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজে বলেছিলেন, 'এমনি মনে হল, আর আমেরিকা গিয়ে কাজ নেই, যা কিছু আছে তা দিয়ে ঐ ছবিখানি কিনে কলকাতায় ফিরে যাই'—জাপানের পরিবেশ এমনই সুন্দর।"

তিনি বলিতেছেন, "আমি স্বামীজীকে বলেছিলাম, 'পুরাণ পড়ে ভারতের কিছু হবে না—তার চেয়ে travelogue (ভ্রমণকাহিনী), ইতিহাস পড়লে ভারতের ঢের বেশি কাজ হবে—সব মানুষ হবে।' স্বামীজী আমার কথার তারিফ করেছিলেন।"

শ্রীশ্রীবাবা সাহেবদের খুব প্রশংসা করিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, "চীনে ভাষা কি শক্ত ভাষা। সেই ভাষা শিখে তারা ফা-হিয়েন, হোয়েং থাসেং প্রভৃতির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত উদ্ধার করেছেন। তবেই তো বুদ্ধযুগের শিক্ষাদীক্ষার কাহিনী জানতে পেরেছি। নইলে পুরাণে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের নামই শুধু পাওয়া যায়—ইতিহাসের আর কি আছে? ম্যাক্সমূলার কত চেষ্টা করে বেদ উদ্ধার করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষার পঙ্ক উদ্ধার করেছে। বিলাতী মনীষীরাই বার বার প্রতারিত হয়েও ঠিক করেছিলেন—জয়পুর লাইব্রেরিতেই বেদের আসল text পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা ঠিক ধারণা করেছিলেন—জয়পুরের সঙ্গে বাদশাদের বিবাহ সম্বন্ধ ছিল। ওখানে অত্যাচার লুঠতরাজ হয় নাই। আসল text ওখানেই মিলবে। রাণা প্রতাপ সিং খুব শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে বেদ আজ বাজারে এসে পড়ছে।

"শূদ্রের বেদ পড়তে নেই। এই এক ধুয়া আমাদের দেশের হাওয়ায়। এই মত খণ্ডনের জন্য স্বামীজী সব শ্লোক সংগ্রহ করতেন। মহাভারত থেকে খুঁজে খুঁজে আমি একটা শ্লোক বার করি। বশিষ্ঠের চার শিষ্য, সবাই প্রচার করতে বেরিয়েছেন। তিনি একলা আশ্রমে আছেন। নারদ এসেছেন। সেখানে একটি শ্লোকে আছে—অন্য সব বর্ণের সভায় দু-একজন ব্রাহ্মণ থাকলেই বেদ পড়ানো যেতে পারে।"

শ্রীশ্রীবাবা আবার বলিলেন, "স্বামীজীর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছিলাম—একজন সাধু ধ্যান করতে বসেছেন, কাপড় দিয়ে মুখ মাথা ঢেকে ধ্যানে বসে ঘুমুচ্ছেন, নাক ডাকছে। স্বামীজী বললেন, 'ধ্যান করতে যখন বসি, কত জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারগুলো সিনেমার ছবির মতো হুড় হুড় করে মনে এসে হাজির হয়—পানা পুকুর গাবানোর মতো কত রকম ফুট্ ওঠে। ধ্যান বললেই ধ্যান! এদের সব লাঙলে জুড়তে হবে।' এখনও পুরানো লোক আছেন, তাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন—শ্রীশ্রীঠাকুর বার বছর ঘুমান নাই। তিনি লোকশিক্ষার জন্যই তো এসেছিলেন। হাতে লাঙল, মাথায় গীতা,—এই নিয়ে যখন ভারতের লোক দাঁড়াবে তখনই ভারতের উন্নতি হবে।"

চায়ের আসরে শ্রীশ্রীবাবা একদিন বলেন, "যারা নিজেই আগে থেকে সব ছেড়ে দেবে, তারাই সুখী হবে। এমন দিন আসতেও পারে, যখন পাশ্চাত্য দেশের বাজে জিনিসগুলো বর্জন করে আমরা তাদের ভালগুলোই নেব, কারণ আমরা যে তাদের চেয়ে বড় হব।"

গুরুনানক-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "গুরু-নানক যখন হিমালয়ে তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য দুজন মহাপুরুষ খুব শিলাবৃষ্টি করালেন। নানকের তবু কোন বিকার হল না, যেমন তপস্যা করছিলেন তেমনি করে যেতে লাগলেন। তাঁরা তখন মহাসন্তুষ্ট হয়ে গুরুনানকের নিকট গিয়ে বললেন, 'তোমার উপর মহাপ্রসন্ন হয়েছি—কি শক্তি চাই, বলো?' গুরু-নানক উত্তরে বলেছিলেন, 'আমার কোন ক্ষমতার দরকার নেই—আমি গরিবী চাই।' তাঁরা তখন মহা আশ্চর্য হয়ে তাঁদের গুরুর কাছে গিয়ে সব বলতে গুরু বললেন, 'মহাপুরুষ, যাও, তোমরা তাঁর পায়ের ধূলা নাও'।"

শ্রীশ্রীবাবা একদিন গল্পচ্ছলে বলিতেছিলেন, "দেখ, লেখাপড়া জানা অনেক লোক পাওয়া যায়। কিন্তু commonsense-ওলা (কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন) লোক খুব কম দেখা যায়। Common-sense হল নিজের ভিতরের বুদ্ধির বিকাশ। বিদ্বান্ হওয়া, সে তো পরের বুদ্ধি। এক রাজা আর তার উজীরের মধ্যে তর্ক হল। রাজা বললেন, 'commonsense-টাই আসল',

উজীর বললেন, 'লেখাপড়ারই দাম বেশি।' উজীর নিজে খুব বিদ্বান্, রাজা কিছুতেই তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারছিলেন না। শেষে রাজা বললেন, 'দেখ, তোমায় তিনটি কাজ আমি দেবো—(১) আকাশেতে কত তারা আমায় গুণে বলবে, (২) পৃথিবীর কেন্দ্র আমায় বার করে দেবে, (৩) পৃথিবীতে কত লোক গুণে, কত নারী আর কত পুরুষ আমায় বলবে।—তুমি সর্ববিদ্যা বিশারদ, তোমায় সাতদিন সময় দিলাম, তোমার কাছে ঐ সময় যথেষ্ট।' উজীর 'যে আজ্ঞা' বলে চলে গেলেন। এদিকে তো তাঁর আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে হৈ চৈ উঠল—উজীর বুঝি ভেবে ভেবে মারা যান। এমন অবস্থায় উজীরের ধোপা এসে উপস্থিত—সে উজীরের সঙ্গে দেখা করতে চায়। বহু কষ্টে উজীরের কাছে যাবার অনুমতি পেল। সেই ধোপা বলল, 'হুজুর, আপনি যখন রাজসভায় যাবেন, আমি সঙ্গে যাব, আর রাজার তিনটি প্রশ্নের উত্তর আমিই দেব।' উজীর তো অবাক্, ধোপা ব্যাটা বলে কি ? উজীর নিজেও কিছু মীমাংসা করতে পারেননি, তাঁর মাথার ঠিক নেই। কাজেই অগত্যা, ধোপা সঙ্গে যাবে ঠিক হল। ধোপার কথামতো রাজার সভা গোল করে সাজানো হল, চারদিকে বড় বড় লোক বসল, আর মধ্যের আঁকা জায়গায় গাধা সমেত ধোপা হাজির হল

"সভার কাজ আরম্ভ হল. আকাশে কত তারা—এর উত্তরে ধোপা বলল, 'আমার এই গাধার গায়ে যত রোঁয়া ততগুলি।' রাজা বললেন, 'কি করে ?' ধোপা বলল, 'গুণে নিন'।

"তারপর পৃথিবীর কেন্দ্র নিরূপণ। ধোপা গাধার পিঠে চড়ে বন্ বন্ করে ঘুরতে লাগলো। কতক্ষণ ঘুরে হাতের ছিপটিটা একটা জায়গায় পুঁতে ফেলে বললে, 'মহারাজ এইখানে'। রাজা বললেন, 'কি রকম'। 'মেপে নিন'—উত্তর দিল ধোপা।

"সকলেই চুপ—পৃথিবীটা মাপা কম কথা নয়। তারপর তৃতীয় প্রশ্নের কথা উঠল। ধোপা বলল, 'ওটাতো কোন প্রশ্নই নয়, কারণ স্ত্রী পুরুষ ছাড়া পৃথিবীতে হিজড়ে আছে। তাদের কোন্ ধারে ফেলব।'

"রাজা খুব তারিফ করলেন। উজীরকে বললেন, 'দেখছ তো commonsense কি রকম দরকার।'"

এবার sincerity-র কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর কথা পাড়িলেন, "আর sincere হতে হবে, শ্রীশ্রীঠাকুর যখন দেহ ছেড়ে দিলেন আমরা তখন ছেলে মানুষ, পাছে বাড়ি চলে যাই, এদিক্ ওদিকে ছটকে পড়ি—এই ভয় হয় স্বামীজীর। তখন তিনি আমাদের বললেন—'sincere হবি। যে কালে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এসে পড়েছিস, আর বাড়ি ফিরে যাসনি। ভগবানকে পাস ভাল কথা, নতুবা যেমন আছিস, তেমনি থাকবি। আবার ফিরে গিয়ে সংসার করবি ? বিয়ে করে মাগ ছেলে নিয়ে থাকবি ? …ভগবানের সঙ্গে যে-সম্বন্ধ তা ঈশ্বর-সৃষ্ট, আর স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে যে-সম্বন্ধ তা জীব-সৃষ্ট।"

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, "স্বামীজী বলতেন, চাকরি করো না—চাকরি শ্ব-বৃত্তি—কুকুরের কাজ। চাকরি আপদ্ ধর্ম, আপৎকালে কেবল চাকরি করা যায়' ফকিরিও ভাল, তবু চাকরি করা উচিত নয়

ভগিনী নিবেদিতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা একদিন বলেন, "স্বামীজী যেদিন শ্রীশ্রীমায়ের নিকট নিবেদিতাকে নিয়ে যান আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নিবেদিতাকে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পরিচয় করিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন, 'মা, একটি আকাশের ফুল এনেছি। পৃথিবীর ধূলিকণা মলিনতা একে স্পর্শ করেনি।' নিবেদিতা যেদিন জাহাজ থেকে ভারতে নেমেছিলেন, সেদিন তাঁর কাছে মাত্র দুটি টাকা ছিল। ওপারের কোন সম্বলই যেন তিনি এপারে আনেননি।…একজন সাহেব তাঁর রূপ-গুণে মুগ্ধ হয়ে যায়, তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়। সেই সাহেব এমন কি মঠ অবধি ধাওয়া করে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নিবেদিতা চটপট্ vow (দীক্ষা) নেন। স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্মচর্য দেন ।

রামলীলা

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস. ; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনসংযোগ বিভাগের ভূতপূর্ব সচিব। বঙ্গসংস্কৃতি ও মন্দিরভাস্কর্য বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং সুখ্যাত গবেষক।]

পুরাকীর্তির খোঁজে, বিশেষ করে প্রাচীন-অর্বাচীন নানাবিধ মন্দিরের সন্ধানে, পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণের সুযোগ আমার হয়েছে। সরজমিনে কয়েক হাজার দেবালয় পর্যবেক্ষণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, শিবমন্দিরের সংখ্যা সর্বাধিক, কৃষ্ণরাধিকা ও শালগ্রামরূপী বিষ্ণু বা নারায়ণমন্দিরের স্থান, যথাক্রমে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এবং অন্যান্য দেবদেবী, যথা—দুর্গা, কালী, রাম, বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী প্রভৃতির আলয়ের সংখ্যা অনেক অনেক কম। আবার, এই শেষ শ্রেণীতে সীতারাম, রঘুনাথ, রামচন্দ্র ইত্যাদি নামে চিহ্নিত দেবগৃহ সংখ্যায় যে প্রায় সর্বনিম্ন তা এক আপাতদুর্বোধ্য ব্যাপার। মেদিনীপুর জেলার রঘুনাথবাড়ির (গড়বেতা থানা) রঘুনাথমন্দির, পিংলার (পিংলা থানা) রামচন্দ্রমন্দির, ডেবরার (সদর : দক্ষিণ থানা) সীতারামমন্দির, উদয়গঞ্জের (ঘাটাল থানা) রঘুনাথমন্দির, হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার (বলাগড় থানা) রামচন্দ্রমন্দির এবং হাওড়া শহরের অন্তর্গত রামরাজাতলার রামমন্দির—মাত্র এই কয়টিই আমাদের চোখে পড়েছে। খুব দূরবর্তী স্থানে আরও দু-একটি থাকলেও থাকতে পারে যেগুলিকে ধরে এ রাজ্যে রামচন্দ্রের মন্দির ছ-সাতটির বেশি না হওয়াই সম্ভব। পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় জগতে রামের অত্যল্প প্রভাব এই পরিসংখ্যান থেকেই পরিস্ফুট। কৃষ্ণ বা শালগ্রামরূপী বিষ্ণুর (বাসুদেব-বিষ্ণুর উপাসনা এ অঞ্চলে এখন লুপ্ত) জনপ্রিয়তা যেখানে এত ব্যাপক, সেখানে বিষ্ণুরই অপর অবতার রামের প্রতি এহেন ঔদাসীন্য এক অনুসন্ধানযোগ্য বিষয়।

শিব সুপ্রাচীন দেবতা। সকলেই জানেন, প্রাগার্য পশুপতি বেদের রুদ্রদেবের স্তর অতিক্রম করে পৌরাণিক শিব বা মহাদেবে পরিণত হয়েছেন। সারা দেশে প্রতিপত্তি বিস্তার করতে তিনি এত দীর্ঘ সময় পেয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গেও তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয়তায় অস্বাভাবিক কিছু নেই। তুলনায়, কৃষ্ণ-রাধিকা বা শালগ্রামরূপী বিষ্ণু (নামান্তরে নারায়ণ) অনেক অর্বাচীন দেবদেবী। শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রীঃ) পূর্বে তাঁদের স্বরূপ জানা থাকলেও বাঙালী ভক্ত-হৃদয়ে তাঁদের ব্যাপক প্রতিষ্ঠা প্রধানতঃ তাঁরই কীর্তি। বাংলার ধর্মজগতে এই যুগান্তর খ্রীষ্টীয় ষোল শতক ও পরবর্তীকালের ঘটনা। কিন্তু চৈতন্যদেব কৃষ্ণ-প্রেমভক্তির যে প্রবল জোয়ার (যাকে প্লাবন বলাই হয়তো অধিকতর সঙ্গত) এনেছিলেন বাংলা ও ওড়িশায়, তার সঙ্গে উপমিত হতে পারে এমন তীব্র কোন শৈব আন্দোলন এ অঞ্চলে কখনও হয়নি। সেজন্য শিবের থেকে অনেক অর্বাচীন হলেও কৃষ্ণ, রাধিকা ও শালগ্রাম-বিষ্ণু তাঁর প্রায় প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠেন যদিও সমকক্ষ হওয়াটা সম্ভব হয়নি।

বাংলা চিরকালই শাক্ত-তান্ত্রিকের দেশ। কিন্তু সেখানে কালী, দুর্গা প্রভৃতি শাক্ত দেবীর পাকা মন্দিরের সংখ্যা এত কম কেন সে আর এক প্রশ্ন। বহুক্ষেত্রে এই মার্গের সাধনায় যে গোপনীয়তা অবশ্য পালনীয় ছিল তা যে অন্যতম কারণ তাতে

সন্দেহ নেই। তা ছাড়া তাঁরা সাধারণতঃ সংবৎসর উপাসিতও হন না ; তাঁদের বার্ষিক মহোৎসবের দিনক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। শিবের ক্ষেত্রে শিবরাত্রি, গাজন, চড়ক প্রভৃতি অনুরূপ অনুষ্ঠানের বিধান থাকলেও বর্ষব্যাপী তাঁর প্রাত্যহিক পূজাই রীতি। এটাও শিবের স্থায়ী মন্দিরের সংখ্যাধিক্যের হেতু। শাক্ত বা লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বর্তমান সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে অবান্তর। সেজন্য আমরা এখন রাম-উপাসনার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যেতে পারি।

রাম অযোধ্যানন্দন হওয়ায় উত্তরপ্রদেশে তাঁর অধিকতর সমাদর স্বাভাবিক। ভাষাগত অভেদের জন্য বিহার, মধ্যপ্রদেশের উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি এলাকাতেও তাঁর জনপ্রিয়তায় আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বাংলার সঙ্গে বংশগত সম্পর্ক না থাকলেও যে চিরায়ত মহাকাব্যের তিনি প্রাণপুরুষ সেই রামায়ণের লোকপ্রিয়তা তো একেবারে হাল আমল ছাড়া অন্য সময়ে এখানে কিছু কম ছিল না। কৃত্তিবাসের জীবদ্দশার কাল সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি ; ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ('বাংলাদেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ') তিনি পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' খুব সম্ভব শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের (১৪৮৬ খ্রী:) পূর্বেই রচিত হয়েছিল। এই মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে ডক্টর মজুমদার লিখেছেন—"কৃত্তিবাস সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তাঁহার মত জনপ্রিয় কবি বাংলাদেশে বোধ হয় আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণকে বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে। কারণ, সমগ্র জাতিই এই কাব্যকে সাদরে বরণ করিয়াছে, কোটিপতির প্রাসাদ হইতে দীন-দরিদ্রের পর্ণকুটির পর্যন্ত, দেশের এ প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, এ কাব্যের সমান জনপ্রিয়তা।" সেকালের অল্পশিক্ষিত সমাজে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে'র সাক্ষাৎ পাঠক হয়তো বেশি ছিলেন না। কিন্তু মধ্যযুগ ও শেষ-মধ্যযুগে যে বাঙালী সম্প্রদায় ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের জন্য অতিশয় তৎপর ছিলেন, সেই কথক, পুরাণ-পাঠক ও পাচালি-গায়কেরা যে রামায়ণের মহান কাহিনী বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতেন তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু এই বিপুল প্রচার সত্ত্বেও রাম-পূজা, অন্ততঃ স্থায়ী মন্দিরে তাঁর আরাধনা, যে একেবারেই প্রসার লাভ করেনি সেকথা সত্য। কারণস্বরূপ বাঙালীর ধর্ম-ভাবনায় শাক্ত-তন্ত্রের চিরাগত প্রভাব ও চৈতন্যদেবের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রচণ্ড উন্মাদনার যে-কথা আগে বলেছি, সে-সম্পর্কে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' রচনার অব্যবহিত পরেই শ্রীগৌরাঙ্গের অমিত শক্তিশালী প্রেমভক্তি-ধর্মের সূত্রপাত। তা ছাড়া গৌর-নিতাইয়ের মতো প্রবল ব্যক্তিত্বশালী প্রবক্তারা স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাঁদের নিজমত যতটা সর্বজনগ্রাহ্য করতে পেরেছেন গ্রাম্য কথকেরা তার শতাংশও করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। ফলে, রামায়ণের কাল-জয়ী আদর্শের ভিত্তিতে রচিত হলেও মহান 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে'র আদর্শ তার শৈশবেই এমন এক পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হয় যে, তা আর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার অবকাশ পায়নি।

কিন্তু হিন্দীভাষী এলাকায় এর বিপরীত অবস্থাই দেখি। সেখানে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে'র তুল্য গ্রন্থ সন্ত্ তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'। তুলসীদাসের জীবদ্দশার কাল ১৫৩২—১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দ। সেজন্য তাঁর রামায়ণ কৃত্তিবাসের কাব্য থেকে একশ বছর বা তারও কিছু বেশি অর্বাচীন। কিন্তু প্রচার-প্রতিপত্তির জন্য শতাধিক বৎসর কম পেলেও হিন্দীভাষী জনসাধারণের কাছে 'রাম-চরিতমানসে'র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 'কৃত্তিবাসী রামায়ণে'র তুলনাই হয় না। হিন্দী এবং বাংলা

ভাষায় পারঙ্গম যে-সব পণ্ডিত উভয় গ্রন্থই যত্ন করে পড়েছেন তাঁদের কাছে শুনেছি, নিবিড় ও নিরন্তর ভক্তিরসে সিঞ্চিত 'রামচরিতমানসে'র জনচিত্তজয়ের ক্ষমতা অনেক বেশি। ভাষা, উপমা প্রভৃতিও মাটির খুব কাছাকাছি। আসলে তুলসীদাস যে উচ্চ স্তরের ভক্তকবি ছিলেন কৃত্তিবাস তা ছিলেন কিনা সন্দেহ। সেজন্য ভারতীয় ভাষার অদ্বিতীয় পণ্ডিত স্যর্ জর্জ গ্রিয়ারসন যে 'রামচরিতমানস'কে লক্ষ-কোটি সাধারণ মানুষের বাইবেল বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। হিন্দীভাষী অঞ্চলে সাক্ষরতার হার পশ্চিমবাংলার থেকে কম বই বেশি নয়। সেজন্য 'রামচরিতমানস' যতই উৎকৃষ্ট কাব্য হোক না কেন, তার পঠনপাঠনের মাধ্যমেই যে সে এলাকায় রামকাহিনীর এত প্রসার তা বলা যায় না। যে উপায়ে তা সম্ভব হয়েছে তা হল, 'রামচরিতমানসে'র বিশ্বস্ত অনুসরণে উপস্থাপিত রামলীলা অভিনয় যা সেখানকার গ্রাম-গঞ্জ-শহরে মহোৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে প্রতি বৎসর। বাংলাদেশেও একদা 'রাম-যাত্রা' নামে এক যাত্রা-পালা প্রচলিত ছিল যা এখন লুপ্তই বলা চলে। আনুমানিক ৫০ বছর আগে এস্. ওয়াজেদ আলী 'ভারতবর্ষ' নামে তাঁর সুপরিচিত প্রবন্ধে কোনও মুদি-দোকানে এক প্রজন্মকালের ব্যবধানে পিতা এবং পুত্র উভয়কেই রামায়ণের সেতুবন্ধ-কাহিনী পড়তে দেখে লিখেছিলেন, গ্রাম-বাংলায় রামায়ণপাঠের "সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে।" মন্তব্যটি এককালে হয়তো সত্য ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। সিনেমা, থিয়েটার ও থিয়েটার-ঘেঁষা আধুনিক যাত্রা-পালার প্রকোপেই যে রামকাহিনীর এহেন ক্রমাবনতি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে, হিন্দীভাষী অঞ্চলে অনুরূপ প্রতিপক্ষের আবির্ভাব ঘটলেও এক আশ্চর্য জীবনীশক্তিবশে 'রামচরিতমানস' ও তার নাট্যরূপ রামলীলা সে এলাকার অধিবাসীদের চিত্তবৃত্তি এখনও অধিকার করে রাখতে পেরেছে।

'দশেরা'র দিন সন্ধ্যায় উল্লসিত জনতার সামনে দাহ্য উপকরণে প্রস্তুত রাবণ, মেঘনাদ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির বিশাল সব মূর্তি আগুন লাগিয়ে পোড়ানোই বুঝি রামলীলা এমন ভ্রান্ত ধারণা দেশের অন্যত্র প্রচলিত থাকা সম্ভব। দিল্লীতে যেখানে এরকম বহ্ন্যুৎসব প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয় তার নাম 'রামলীলা ময়দান' হওয়াতে এ প্রতীতি হয়তো কিছুটা দৃঢ় হয়েছে। কিন্তু গণহর্ষবিধায়ক এই চপল অনুষ্ঠানটি কি বাল্মীকি-রামায়ণ, কি 'রামচরিতমানসে'র কোথাও উল্লিখিত হয়নি। সেজন্য লঘুচিত্ত জনতার মনোরঞ্জনের জন্য এটি যে পরবর্তী কালের সংযোজন তাতে সন্দেহ নেই। তুলসীদাসের মহাকাব্যকে আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করে বিভিন্ন প্রধান অংশে বিভক্ত রামলীলা-নাট্য যে পুরা একমাস ধরে অভিনীত হয় সে তথ্য জানা থাকলে এহেন ভ্রম হয়তো ঘটত না।

হিন্দীভাষী এলাকায় রামলীলার প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার মূলে আছে উচ্চ আদর্শে নিবদ্ধ রামায়ণের কালজয়ী কাহিনী যা ভারতের অমূল্য কৃষ্টিসম্পদ। কৃত্তিবাসের নিজের ভাষায় "সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড।" এহেন উৎকৃষ্ট নাট্যবস্তুকে এক সংকীর্ণ ভূভাগে সীমাবদ্ধ না রেখে সমগ্র দেশে জাতীয় নাট্যরূপে অনুশীলন করা যায় কিনা সে প্রশ্ন নিয়ে একদা উপস্থিত হয়েছিলাম একালের প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্য-প্রযোজক শ্রীশম্ভু মিত্রের কাছে। রামায়ণের দেশব্যাপী ও চিরায়ত প্রতিষ্ঠায় তিনি নিঃসন্দেহ। মহাকাব্যটিতে সত্যরক্ষা, ভ্রাতৃপ্রেম, প্রজানুরঞ্জন প্রভৃতির যে উচ্চ আদর্শ কীর্তিত হয়েছে তাও ভারতীয় জীবনচর্যার অন্তরের জিনিস। কিন্তু কাহিনী মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে জাতীয় নাট্যে পরিণত করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। অন্তত যে অর্থে আমাদের

জাতীয় পশু-পক্ষী বা জাতীয় সংগীত স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে সেইভাবে নয়। কেননা, তাঁর মতে, জীবন প্রবহমান, নিত্যনূতন সংঘাতসংকুল। এবং পরিবর্তনশীল সে-সব নাট্যবস্তুর ভিত্তিতে নব নব নাটকের সৃষ্টি হোক এটাই কাম্য। তবে রামায়ণ, বিশেষ করে মহাভারতের, কোন কোন খণ্ড-কাহিনীকে অবলম্বন করে কিছুদিন আগেও প্রভূত জনপ্রিয় কিছু যাত্রা-পালা বাংলায় প্রচলিত ছিল। যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। কিন্তু স্থানীয়-ভাবে সমাদৃত সেরকম কোন নাট্যবস্তুকে জাতীয় মর্যাদা দেওয়া ঠিক নয়; দিলেও তা টিঁকবে না। অবশ্য হিন্দীভাষী এলাকায় একালেও রামায়ণ-নাট্য বা রামলীলার প্রচণ্ড প্রভাবের কথা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু এই বিরাট উপমহাদেশের সবত্র তো রামায়ণ-কাহিনীর প্রসার ও আবেদন সমান নয়। সেজন্য রামায়ণকে জাতীয় নাট্যে রূপায়িত করা কার্যকর প্রস্তাব নয়।

রামলীলার এই আঞ্চলিক প্রভাবের মূলে যে আছে ভক্তকবি তুলসীদাসের সুললিত 'রামচরিত-মানস' সে-কথা আগেই বলেছি। বাংলা যাত্রা-পালা আগে ছিল সারারাত্রিব্যাপী; এখন তা এক সন্ধ্যাতেই শেষ হয়। পক্ষান্তরে, খানদানী রামলীলা যে পুরা এক মাস ধরে চলে এবং কিছু দূর দূর অন্তর বিভিন্ন স্থানে প্রধান কাহিনীগুলি অভিনীত হবার সময় কাতারে কাতারে দর্শক যে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে অকুস্থলে উপস্থিত হন তাতেও এই নাট্যাভিনয়ের আকর্ষণ বহু গুণে বর্ধিত হয়। কাশীর গঙ্গার অপর তীরে রামনগরে এই সাবেক ঐতিহ্য এখনও অনুসৃত। প্রস্তাবনায় স্বর্গলোক ও অযোধ্যার পালা শেষ হলে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম-সহ অভিনয়ের দলবল গিয়ে হাজির হন দু-তিন কিলোমিটার দূরে চিত্রকূটের নব রচিত রঙ্গমঞ্চে। পর্যায়ক্রমে এহেন স্থানান্তর ঘটে নৈমিষারণ্য, দণ্ডকবন, কিষ্কিন্ধ্যা, রামেশ্বর ও লঙ্কায়, এবং ফিরতি পথে, চিত্রকূট এবং অযোধ্যায়। মাসব্যাপী এই পর্যটনে অসংখ্য দর্শক রাম-লক্ষ্মণ-সীতার সহযাত্রী; কেননা মহাকাব্যের সেই দেবপ্রতিম নায়ক-নায়িকার সঙ্গে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে একাত্ম। জনতার আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এই স্থান পরিবর্তনের প্রথা সাবেককাল থেকেই পূর্ব-পরিকল্পিত হয়ে থাকলে তা উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হয়নি।

এবার অভিনয়ের ক্রমপর্যায়ের কথা বলি। প্রস্তাবনা পর্বে প্রথম দিনে অভিনীত হয় বিষ্ণুর কাছে দেবগণের সমবেত প্রার্থনা যেন তিনি রাম-অবতাররূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে রাক্ষস রাবণের অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেন। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম দিনের অকুস্থল অযোধ্যা: বিষয়বস্তু রামের জন্ম এবং শৈশব ও কৈশোরে তাঁর নানা অসুরবধ। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম দিনে উপস্থিত করা হয় রাজা জনকের আলয়ে স্বয়ংবর-সভায় রামের হরধনু ভঙ্গ, সীতার পাণিগ্রহণ, কৈকেয়ীর চক্রান্তে তাঁর পরিত্যক্ত রাজ্যাভিষেক। নবম থেকে পঞ্চদশ দিবসে বনবাস যাত্রা এবং চিত্রকূট ও পঞ্চবটীতে অবস্থান। ষোড়শ দিনে সীতাহরণ। সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশতিতম দিনে সীতান্বেষণ ও কিষ্কিন্ধ্যাগত বানরবাহিনীসহ রামের লঙ্কায় উত্তরণ। অতঃপর লঙ্কাযুদ্ধের নানান ঘটনা ও রাবণের সবংশে মৃত্যু ঘটে বিংশতি থেকে ষড়্-বিংশতিতম দিনের অভিনয়ে। পরদিন অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা এবং তার পরদিন 'ভরতমিলাপ' অর্থাৎ চিত্রকূটে ভরতের সঙ্গে পুনর্মিলন। শেষ দুদিনে মহা আড়ম্বরে রামের রাজ্যাভিষেক। এই অতি-সংক্ষিপ্ত রোজনামচায় যে বহু উল্লেখ্য ঘটনার স্থান হয়নি তা বলাই বাহুল্য। যে আগ্রহ ও একাত্মতার সঙ্গে বিপুল দর্শকপুঞ্জ এই দীর্ঘ অভিনয় প্রত্যক্ষ করেন তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু তন্ময় স্থৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় 'ভরতমিলাপ'-এর রাত্রে। সেদিনের

নাট্যবস্তু অশুভের উপর শুভের সর্বাঙ্গীণ জয়ের প্রতীক। সেজন্য দর্শকদের আনন্দ-উল্লাসের আর অবধি থাকে না।

রামলীলা সাধারণতঃ অভিনীত হয় বক্সিং রিং-এর মতো উঁচু এক চাঁদোয়া ঢাকা, সুসজ্জিত ও সুআলোকিত মঞ্চে যাতে সমবেত জনতা দূর থেকেও অভিনয় দেখতে পান। পাত্রপাত্রীরা স্বচেষ্টায় অভিনয় বিশেষ করেন না। 'রামচরিত-মানসে'র আদ্যন্ত পাঠের ক্রম অনুযায়ী তাঁরা মঞ্চে উপস্থিত থেকে প্রম্প্‌টারের সাহায্যে অল্পস্বল্প 'পার্ট্‌' মুখস্থ বলে ও অঙ্গভঙ্গি করে সহযোগীর ভূমিকা পালন করেন মাত্র। কাশী ব্রোকেড বা জরি-বস্ত্রের পীঠস্থান হওয়ায় সেখানকার ও রামনগরের কুশীলবদের সাজপোশাক খুবই জমকালো হয়ে থাকে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা প্রমুখ প্রধান চরিত্রের মুখমণ্ডলে প্রথমে উপযুক্ত রঙের প্রলেপ শুখিয়ে নিয়ে তার উপরে বহু বর্ণ অলকা-তিলকা আঁকাই রীতি। মুখোশের ব্যবহার আছে। তবে তা হনুমান, জাম্বুবান, রাক্ষস প্রভৃতি মনুষ্যেতর চরিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

যাত্রা, থিয়েটার ইত্যাদি অন্যান্য নাট্য-মাধ্যমে অভিনয়ক্ষমতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উপযুক্ত চেহারাই ছাড়পত্র। রামলীলায় অভিনয়-কুশলতা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়; কেননা 'রামচরিত-মানসে'র একটানা আবৃত্তি পশ্চাৎপট থেকে সে প্রয়োজন সিদ্ধ করে। কিন্তু কুশীলবরা ধর্মনিষ্ঠ সদ্বংশজাত হওয়া একান্ত আবশ্যক। চরিত্র অনুযায়ী তাদের যথেষ্ট সুদর্শন হওয়াও দরকার। এজন্য ঝাড়াইবাছাইয়ের নিয়ম খুবই কঠোর। প্রসঙ্গত, সীতা প্রভৃতি স্ত্রী-চরিত্রেও বালকদের সাজিয়ে নেওয়াই চিরাচরিত রীতি। কিন্তু রাম প্রমুখ চার ভাই এবং সীতা যেহেতু দেবতার সাক্ষাৎ প্রতিরূপ সেজন্য রিহার্সালের কয়েক সপ্তাহ ও অভিনয়ের মাসাধিককাল তাঁদের লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয় পরম শুদ্ধাচারে। কাশীর এক রামলীলা অনুষ্ঠানে একদা আমি তাঁদের দর্শন লাভ করেছিলাম অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এবং ব্যবস্থাপকদের একজনের (প্রবাসী বাঙালী ও আমার আত্মীয়) সক্রিয় সহযোগিতায়। অভিনয় চলাকালীন তাঁরা 'স্বরূপে' অর্থাৎ সাক্ষাৎ দেবত্বে উন্নীত হন। তখন একবার শুধু তাঁদের চরণ স্পর্শ করবার জন্য দর্শকরা যে কী পরিমাণ হানাহানি করেন তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। 'স্বরূপে' তাঁরা হয়তো কিছুটা প্রতিষ্ঠিতও হন; কেননা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছি, অভিনয়ের সময় তাঁদের অনেকেই 'ভর নামা'র মতো এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হন। অবশেষে, রামলীলার অবসানে কুশীলবরা যে যার ঘরে ফিরে যান যেখানে অভিভাবকেরা সাধারণ কৃষক বা গ্রামীণ বৃত্তিজীবীর পরিচয়ে বাস করেন মাটির খুব কাছাকাছি। বর্ষকাল পরে আবার হয়তো মর্ত্যের ধূলা থেকে দেবত্বে উন্নীত হবার ডাক গিয়ে পৌঁছয় তাঁদের কাছে। তুলসীদাসের সময় থেকে গত চারশ বছর ধরে এই ধারাই চলে আসছে এতাবৎ কাল।

রামলীলা আসলে বিষ্ণুর অবতাররূপী সত্যসন্ধ, ভ্রাতৃবৎসল, প্রজারঞ্জক এক নৃপতি-শ্রেষ্ঠের উদ্দেশে লক্ষ-কোটি সাধারণ মানুষের হৃদয়মথিত বন্দনা-গান। অন্যান্য নাট্যমাধ্যমের সঙ্গে এইখানেই তার মূল পার্থক্য

কবিতা

ঈশ্বরকে অপরোক্ষ কর
কর এই পণ
তাঁরে চাই – তাঁরে চাই –
চাই সর্ব্বক্ষণ
যতক্ষণ নাহি পাই
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
খুঁজিব সদাই।

২৬।৫।৭১ বনফুল

[রবীন্দ্র-পুরস্কার ও জগত্তারিণী পদকে সম্মানিত প্রয়াত ডক্টর বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বাঙলা সাহিত্য জগতে 'বনফুল' রূপে স্বনামখ্যাত। কবি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি। শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা 'বনফুল' ছোট গল্প, নাটক, উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতি সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই সমান দক্ষ। তাঁর নিজ হস্তাক্ষরে অপ্রকাশিত এই কবিতাটি শ্রীমতী মানসী বরাটের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

পণ

'বনফুল'

ঈশ্বরকে অপরোক্ষ কর
কর এই পণ
তাঁরে চাই—তাঁরে চাই
চাই সর্ব্বক্ষণ
যতক্ষণ নাহি পাই
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
খুঁজিব সদাই।

প্রকাশ

'বৈভব'

[উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা সকলেরই সুপরিচিত প্রিয় কবি।]

বিশ্বের বৈচিত্র্যমাঝে ধ্যানমগ্ন মন
খুঁজিতে চাহিছে এক আদিম কারণ।
সকল বিভেদমাঝে অতি সূক্ষ্মরূপে
কী সেই অভেদভাব—হাসে চুপে চুপে—
সকল অস্তিত্ব টানি আপনার মাঝে
প্রকাশি সকল জ্ঞান আপনাতে রাজে—
সর্ব প্রাণ আনন্দের অনন্ত আকর—
তরঙ্গলীলার তলে অতল সাগর।

চিনেছি জেনেছি তারে—আমারি যে রূপ—
যাহার প্রকাশে পূর্ণ—যত কিছু রূপ।
'আমি' 'আমি' 'আমি' সেই প্রথম কারণ
যাহারে সন্ধান করে ধ্যানমগ্ন মন।
তারো পারে যাবে তুমি সাহসী সাধক ?
ওই দেখ, স্বয়ং জ্যোতি আত্মপ্রকাশক।

'আহা'

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

[রবীন্দ্র-পুরস্কারে অলঙ্কৃতা বঙ্গভারতীর প্রবীণা সেবিকাদের অন্যতমা। কাব্য, উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের যশস্বিনী লেখিকা।]

আহা নাম তার।
জীবন ভুবনে 'আহা' কৃপা পারাবার।
যুগান্তর যুগে 'আহা' কৃপার আধার।
কৃষ্ণ-রাম-রামকৃষ্ণ 'আহা' অবতার।
জুড়াতে তাপিতে 'আহা' করুণা অপার।

বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর, জনক,
কবি ঋষি মুনি জ্ঞানী, চৈতন্য, নানক।
দুটি অক্ষরের বাণী 'আহা' তার নাম।
করুণা আশ্বাসে 'আহা' চির বিশ্বধাম।
বিশ্বের প্রসাদ 'আহা' বিশ্ব-প্রাণারাম।
পরম শরণ 'আহা' পরম প্রণাম।

বরণ

শ্রীশান্তশীল দাশ

[শিক্ষাব্রতী, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও গীতিকার।]

ভাসাও আমায় নয়ন জলে,
নইলে তোমায় ডাকবো না-যে ;
ভুলেই থাকি তোমায় আমি
যখন থাকি কাজের মাঝে।
কাজ করি যা অকাজ সে-তো,
মন খুশি নয় তার মাঝে তো ;
দিন রজনী ডুবেই থাকি
কাল করি ক্ষয় সেই অকাজে।

দুঃখ যখন দহন করে,
তখন তোমায় স্মরণ করি ;
স্বজনহারা সেই নিরালায়
চোখের জলে বরণ করি।
নিজন ঘরে একটি পাশে
অন্ধকারে এ-বুক ভাসে ;
আশায় থাকি শুনবো কবে
ওই নূপুরের ধ্বনি বাজে।



পাড়ি

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত রবীন্দ্র-অধ্যাপক। যশস্বী কবি ও সাহিত্যসেবী। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক।]

বকুলে বকুলে ওড়ে ভ্রমরেরা বিকেলে
মনের ভেতরে মন বলে—'বলো কী পেলে?'
ভাবের পাশেই ভাব শুধু ঢেউ ভাঙছেই—
জলের অতলে তল খোঁজবার ইচ্ছেই
কখনো ডোবায় প্রায় মরণের গুহাতে,
বেঁচে ফিরে আসা যেন সোনা পাওয়া দু-হাতে।
সে তো জড় ধাতু নয়,—উজ্জ্বল ফূর্তি।
নিজেরই কিশোরকাল ধরে নিজ মূর্তি।

পাতা-ঝিরিঝিরি কোনো ঝাউ-সারি-ঝালরে
আকাশের বিস্তার ঘোমটার আদরে
ছোটো-বড়ো টুক্‌রোয় ফালি-ফালি নীল্‌চে
সুখস্বপ্নেরা সব মিল্‌তে ও মিশ্‌তে—
এসে ছুঁয়ে যেতো যাকে, সে তো এই 'আমি' হে—
নিজেই জানে না যে সে কোথা তার অন্ত।
ঘটনার পরে ঘটে ঘটনার ধন্দ।
নিজেকে অকস্মাৎ বোঝে সে অনন্ত!

বিকেলের নিরালায় ঘুঘু ডাকে ঘুঘু-কে।
সেই সুরমধুরিমা পান এক-চুমুকে।
তারপরে অনুভবে যে তামসী রাত্রি
ফোটায় তারার ফুল—যারা দূরযাত্রী,
দেশে-কালে-নিমিত্তে আলোকিত বন্ধন—
তবু যেন সুর, যেন উধাও অবন্ধন,
অজানার পারে চির-অজানায় পাড়ি তার।
নিশ্চিত নির্ভয়ে, পূর্ণেরই ধ্যান তার।

কামারপুকুর যাত্রা

স্বামী সারদেশানন্দ

[শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কৃপাধন্য বেলুড় মঠের প্রবীণতম সন্ন্যাসীদের অন্যতম—বিদগ্ধ লেখক।]

চিন্ময় আনন্দধাম,   কামারপুকুর নাম,
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াতীত তুমি।
দেহ-অভিমানী হয়ে   কামনার বোঝা লয়ে
কেমনে যাইবে মন তুমি!

বৈকুণ্ঠের উচ্চস্তরে   গোলকের অভ্যন্তরে
শুদ্ধ মাধুর্যের লীলাধাম।
আপনি আপনা রস   পান করি ইচ্ছাবশ,
যেথা লীলা করে পূর্ণকাম॥

এক 'দুই রূপ' ধরে   পুনঃ তাহা বহু করে
নানা ভাব হয় আস্বাদন।
বহু ভাগ্যবান যেই   দরশন পায় সেই
অনুরাগে করি আরাধন॥

যেথা যশোমতী রানী   সাজি ধনী কামারিনী
পুত্রহীনা বিধবার বেশ।
বৎস তরে গাভীপ্রায়   ব্যাকুলা আকুলা হায়,
উন্মাদিনী আলুথালু কেশ॥

চক্ষু ছেদি প্রেম-নীর   বক্ষ ভেদি স্নেহ-ক্ষীর,
ঝরিতেছে বাৎসল্যের রসে
'পরকীয়া' পুত্র-ভাব   যাতে রস গাঢ় ভাব
সেই রস পিয়ায় গোপেশে॥



ধূলায় ধূসর কায়,　　　ভূমে গড়াগড়ি যায়
　　হামাগুড়ি দিয়ে কভু চলে।
আবার দাঁড়ায়ে উঠি　　　ভূমিতে পড়য়ে লুটি,
　　ধরণী ধরয়ে বক্ষে তুলে॥

ধরণী-ধারণ যেই　　　ধরাতলে লুটে সেই
　　দেহভার ধরিতে অক্ষম।
জননীর মুখ চেয়ে　　　কাঁদিছে ব্যাকুল হয়ে
　　নিজে নহে চলিতে সক্ষম॥

দিগম্বর দীর্ঘ কেশ,　　　বালগোপালের বেশ
　　গলে শোভে বাঘ-নখমালা।
কটিতে কিঙ্কিনি সাজে　　　চলিতে মধুর বাজে,
　　পায়ে হাতে মনোহর বালা॥

আধ-আধ মিঠা বুলি　　　হাস্য-নৃত্য বাহু তুলি,
　　বালরূপে 'যজ্ঞভুক্' খেলে।
যোগমায়া সংঘটন　　　সহ সম শিশুগণ
　　কামারপুকুরে লীলা-ছলে॥

শ্রুতি ছাড়ি নিজ দেশ,　　　ব্রজে যার গোপী বেশ
　　বৈশ্যবধূ হেথায় সাজিল।
হালদারপুকুরেতে　　　জল আনিবার পথে
　　কুম্ভকক্ষে আসিয়া মিলিল॥

আঁচলে যতন করে　　　অতিশয় প্রেমভরে
　　সুরস মিষ্টান্ন ফলমূল।
কতই মনের সাধে　　　গোপনে এনেছে বেঁধে
　　গদায়ে খাওয়াতে প্রাণাকুল॥

পরমাপ্রকৃতি যিনি সাজি দীন কাঙ্গালিনী
শান্ত সৌম্যা পল্লীবালা বেশ।
বস্ত্রে মুখ ঢেকে রাখে কলসি বহিছে কাঁখে
লম্বমান পৃষ্ঠে কৃষ্ণ কেশ॥

কভু ঢেঁকিশালে পশে, কভু রান্না করে বসে,
কভু মাজে ঘাটেতে বাসন।
আপনার গ্রাস লয়ে, সন্তানের মুখে দিয়ে,
মাতৃস্নেহ সদা আস্বাদন॥

জাহ্নবী-যমুনা এসে কামারপুকুরে পশে,
ক্ষীণ করি স্বীয় কলেবর।
লীলারস আস্বাদিয়া পুলকে পূর্ণিত হিয়া,
নাচে-গাহে হয়ে আমোদর॥

ত্যজিয়া ঐশ্বর্যরাশি যত দেব-দেবী আসি
কামারপুকুরে বাস করে।
আম্রকাননের পাশে, কেহ বা রয়েছে বসে
প্রেমলীলা দরশন তরে॥

বক্ষে পরিপূর্ণ ইন্দু, চিন্ময় আনন্দ সিন্ধু,
কামারপুকুরে শোভমান।
উথলিলে একবার সারা বিশ্ব একাকার
ভেদাভেদ চির অবসান॥

এমন আনন্দপুরে বাসনা রাখি অন্তরে
কেমনে পশিবে তুমি মন।
পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়ে যাত্রী-পদ শিরে ধরে
শুভাশিস্ করহ গ্রহণ॥

মন্দির-দ্বারে

শ্রীমতী জবা চট্টোপাধ্যায়

[সাহিত্য-অঙ্গনে নবাগতা—বাঙলা সাহিত্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব পর্যায়ে গবেষিকা।]

আমি এসেছি—
  অসংখ্য ভালবাসার ফুল ফোটাবো বলে।
দরজা খোলো, ওগো প্রভু
  আমার ডাক তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না ?
ওগো, শুনছ !
  হৃদয়ে আমার অসংখ্য রক্তিম কুঁড়ি।
  তাদের সৌরভ পাপড়ির বন্ধ দরজায়
  আঘাত করছে—প্রকাশ করবে নিজের সত্ত্বাকে।
আমিও তো এসেছি—
আমিও তো চাইছি
আমার সত্ত্বাকে, আমার অস্তিত্বকে, আমার স্ফুটমান,
একান্ত নির্বিকল্প প্রেমকে—
তোমার কাছে, সমস্ত জগৎসংসারের কাছে, বিশ্বের
প্রতিটি চিত্তের নিভৃত প্রকোষ্ঠে
প্রকাশ করতে।
প্রভু আমার ! শুনছ !
  কতদিন রাত্রির অতল গভীরতার মধ্যে ডুব দিয়েছি।
  অরূপ রতন—সে তো দুর্জ্ঞেয়—
  তবু তো তাকেই পাওয়ার জন্য
  ডুব দিয়েছি, তলিয়ে যেতে চেয়েছি।
আমি পথ চলেছি—
পূজা দিয়েছি—মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়।
দরজা খোলো,—
আমি এসেছি।
অসংখ্য রক্তিম ফুল নিয়ে—
একটু সময়, একটি মুহূর্ত ভিক্ষা চাইছি ;

ওই সময়ের মধ্যেই আমার আমি
তোমার সঙ্গে শুভদৃষ্টি করব।
তোমার অতলস্পর্শ নীল চোখে ছুটি চোখ রাখব
আমার তৃষিত চোখ।
তারপর চোখ ছুটি আনব নামিয়ে তোমার পায়ে
আর তারও পরে,
আমার চিত্তে ফুটে উঠবে
অসংখ্য রক্তিম কুঁড়ি, প্রস্ফুটিত প্রেমের শতদল হয়ে।
সেগুলি অঞ্জলি হয়ে, প্রণাম হয়ে, ভালবাসা হয়ে
এবং সবশেষে—
কেবল আমি হয়ে ঝরে পড়বে তোমার পায়ে ;
শুধু তোমারই পায়েই।
প্রভু আমার, আমি এসেছি—দ্বার খোলো।

জীবন

শ্রীআনন্দ বাগচী

[খ্যাতনামা কবি, প্রাবন্ধিক ও সংবাদ-সাহিত্যিক—বাঁকুড়া ক্রীশ্চান কলেজের বাঙলা ভাষার ভূতপূর্ব অধ্যাপক। 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিযুক্ত।]

যারা খেলাঘরে খেলে তারা কেউ খেলনা চেনে না,
চেনে না ইটের টুকরো, পোড়ামাটি, কাঠের পালিশ,
রঙীন ছিটের গর্ভে তুষ তুলো ভরে আছে, সঞ্জীবনী খড়।
যে যেখানে আছি এই খেলাঘরে খেলাও চিনি না,
বুঝি না চোখের ভ্রমে ভরে থাকে মায়াবী ছুপুর,
নিকট দূরের ধাঁধা, ফস্কা গেরো অলীক পুতুল
ভোলায় কথার গল্পে। অন্তহীন পথের নাটকে
কেবলি খড়ির গণ্ডি ছোট হয়, রঙ্‌চঙে রাংতার সংসার
দেয়ালায় ঝুঁকে থাকে ক্ষণজীবী নিদ্রাজাগরণ।

যারা খেলাঘরে খেলে তারা কেউ খেলনা চেনে না॥

একটি মন্ত্র: শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

[উদীয়মান তরুণ কবি—রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারের কর্মী।]

মন্ত্রের মতো তোমার নাম
জীবন শ্বেতপদ্মের মতো।
মানুষের জিজ্ঞাসার যখন অন্ত নেই
তখন তোমার আবির্ভাব।
অজানাকে লাভ করার আগ্রহ মানুষের চিরদিনের,
এই মন নিয়ে সে চায় আকাশকে ছুঁতে।
সমুদ্রের অতল গহ্বরে ডুব দিতে।
কিন্তু সব ভাসা ভাসা।
মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই গোটা মানুষটার খোঁজ করেনি।
সবাই একটু একটু করে চাঁদ দেখেছে,
বলেছে—আহা কি সুন্দর।
সৌন্দর্য কী? স্নিগ্ধতা কী, সম্পূর্ণতা কী?
এসব প্রশ্ন যখন মনকে নাড়া দেয়
জপ করি একটি মন্ত্র—শ্রীরামকৃষ্ণ।
যখন অসীমের কথা ভাবি,
ভাবি ভারতাত্মার কথা,
যোগী ভারতবর্ষের ছবি যখন দেখি,
সামনে ভেসে ওঠে হিমালয়,
ফুটে ওঠে একটি রূপ।
সেই রূপ দেখে শান্ত হয়ে যাই
জপ করি একটি মন্ত্র—শ্রীরামকৃষ্ণ।
কত শত শতাব্দী পার হয়ে গেল,
মানুষের মনের ঝড় তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে
এক একটা ঝড়ে মনে হয়
এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেল।
কখনও মনে হয় মরুভূমির ভেতর দিয়ে হাঁটছি,
কোথাও মানুষ নেই।

কখনও মনে হয় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে
চারিদিকে জন্তুজানোয়ার ঘিরে ধরেছে।
সব মানুষের মনের খবর এই।
কেউ বড় একা, কেউ বড় দুর্বল।
সবাই অন্ধকারে সারি দিয়ে হেঁটে চলেছে নিরুদ্দেশের পথে
আমি একটা জ্যোতির কথা ভাবি
যে জ্যোতি উদ্ভাসিত করে জীবনকে,
মানুষকে—মানুষ করে দেয়।
সেই জ্যোতি একটা রূপ নেয়।
জপ করি একটি মন্ত্র—শ্রীরামকৃষ্ণ।

কে যাবে

শ্রীসুনীল বসু

[লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি—'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার সহিত সংযুক্ত।]

ঈশ্বরভক্ত নন যাঁরা
তাঁদের অনেক পথ অনেক মত
চরমে পৌঁছবার তাঁদের অনেক রাস্তা
কোন্ পথে যাবে,—কোন্ মতে ?
হাজার জিজ্ঞাসার কাঁটাতার
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ,
এই কাঁটাতারে জট পাকিয়ে যায়
জট খুলতে খুলতে ধাঁধা আর ধোঁয়া
এই নিয়ে চলতে চলতে, সলতের মতো ক্রমাগত—
জ্বলতে জ্বলতে জীবন কাবার।

ঈশ্বরভক্ত যাঁরা
তাঁদের শুধু একটাই পথ একটাই মত
শুধু সেই তাঁকে খোঁজা সারাক্ষণ
পরমে পৌঁছবার এক অনন্য অন্বেষণ।

কখনো অশ্রুতে নিমগ্ন কখনো আনন্দে ভাসা
এর নামই কি বিন্দুতে সিন্ধু দেখা
এর নামই কি চিদানন্দ !
সব পথ সব মত এক পথে এসে মিলে যায়
সেই পরমানন্দে কে যাবে ?

একটি প্রণাম

ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

[খ্যাতনামা প্রবীণ কবি এবং সাহিত্যসেবী।]

একটি প্রণাম, হে মোর দেবতা, করুণা করি
লহ যদি তাই চরণে আপনা বিছায়ে ধরি।
সকল অঙ্গে তব পদরজ মাখিয়া নিয়া
সব সঞ্চয় আসিব তোমারে সমর্পিয়া,—
প্রাণের পরম পরিতর্পণ প্রসাদ নিয়া।

জলভরা মেঘ, শারদ-আবেগ, পরাণে মম,—
রিক্ত করিয়া আসিব ঢালিয়া হে প্রিয়তম !
একটি প্রণামে বন্দনা রচি একটি ফুলে
তুলিবে তুফান, উথলিবে প্রাণ হৃদয়-কূলে।

আমার গানের সুরের তরণী ছন্দে-তালে
দুলিবে হরষে অনুকূল হাওয়া লাগিলে পালে।
আমার সকল উপঢৌকন
পসরায় ভরা সাধের স্বপন
একটি প্রণামে অর্ঘ্য রচিব গোধূলি কালে,—
(যবে) ঘরে জ্বলে দীপ,—আকাশ-প্রদীপ তারকার টিপ সন্ধ্যাভালে।

তারপরে সব, হইবে নীরব, নিশুতি রাতি,—
তুমি আর আমি, নয়নে শান্ত নিথর ভাতি।
একটি মাটির প্রদীপ শিখায়
করিব আরতি, যদি নিভে যায়,—
ধেয়ানের ধনে, মুদিত নয়নে, আঁকি মনে মনে যাপিব রাতি।



হংস মিথুন উড়ে যায় দূর মানস সরসে মেলিয়া পাখা
আমি চেয়ে রই ঊর্ধ্ব নয়নে মিনতি করুণ বেদনা আঁকা।
উড়িতে পারি না গড়াগড়ি দিই মাটিতে পড়ি
মনে মনোরথ রচনা করি
হে দয়িত মোর! শেষের প্রণামে, প্রাণ সঁপিলাম চরণে ধরি।

অন্য কোন

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

[মেহরু-পুরস্কারে সম্মানিত বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী। কলিকাতা সিটি কলেজের বাঙলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক।]

যা কিছুই চিনি জানি যা কিছুই দেখেছি ভেবেছি
ছোট-বড় বহু বৃত্তে আঁকা অভিজ্ঞতা সব
আত্মকেন্দ্রে মগ্ন হয়, গড়ে তোলে প্রত্যক্ষ জগৎ;
তবুও তো জানার পরিধি বারম্বার অজানার
বৃহত্তর বৃত্ত-মুখে টানে—দিগন্তর-সীমার দীপগুলি
অঙ্গুলি উঁচিয়ে উদ্ভাসিত করে অন্ধকার অদেখাকে।
দূর থেকে ক্রমদূরে অপসৃত নব নব দিগন্তে হারায়।
যত রূপ-রঙ-রেখা—অস্তিত্বের স্থূল যত স্থির পত্রলেখা:
দুই কূলে ঘেরা পরিচিত প্রিয়নদী আত্মবিসর্জনে ধীরে
যেতে চায় অকূল সাগরে। যা কিছুই যুক্তিযুক্ত
বুদ্ধিধৃত হিসাবসম্মত বিবেচনা-গড়া—থামে বাঁধা
সেই সব ইমারৎ কোন্ দূরাকর্ষে ভঙ্গুর খেলেনা যেন
নিরপেক্ষ জগতে মিলায়। যুক্তিসেতু পৌঁছায় না
সেইখানে, বুদ্ধির রকেট ঘুরপাক খেতে খেতে
নিশ্চিহ্ন হারায়, হিসাব সে হার মানে, অভিজ্ঞতা
নিষ্প্রভ তাকায়, অনুমান হয় দিশাহারা; সব অনুভব
সর্ব অভিজ্ঞতা সব অনুমান ভেদ করে অস্তিত্বের
স্থিরজ্যোতি খেলা করে অসীম ব্যাপ্তিতে।

জীবন-দেবতাকে জিজ্ঞাসা

শ্রীঅখিল নিয়োগী

['স্বপনবুড়ো' নামে সমধিক পরিচিত কবি ও সাহিত্যিক। বাঙলা কিশোর-সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ।]

জীবন-দেবতা, তব ইঙ্গিত দেখেছি যে অমারাত্রে
ক্ষত-বিক্ষত পরাণ আমার, অস্ত্র আঘাত গাত্রে!
এ জীবন-রণে রক্তস্রোতে সিক্ত আমার বক্ষ—
কখনো বলিনি, ক্ষমা করো প্রভু, বিপদের মাঝে রক্ষ।
নিশানা দেখিয়া ঊর্ধ্বে উঠেছি, বন্ধুর সে যে পন্থা,
আমার জীবনে ছিল সম্বল শুধুই জীর্ণ কন্থা,
তোমার নিশানা আমার নয়নে ছিল যে দীপ্যমান—
জীবন-দেবতা, পথিকের কভু মিলিবে দিব্যধাম?
সারা জীবনের পাথেয় ছিল না, পথই শুধু সম্বল—
পথেই পেয়েছি জ্ঞানী, মানী, ধনী মিলেছে অসৎ-খল!
পথের নেশায় পথ চলিয়াছি, নিশান ঊর্ধ্বে হেরি—
প্রতি মুহূর্তে ভেবেছি পরাণে আর নাই বুঝি দেরী!
ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় কাঁপেনি চরণ—দুঃখে বরণ করি—
নিশানা আমার ছিল যে নয়নে চলিতে যদি বা মরি!
কত প্রলোভন এসেছে যে পথে আদর্শ বলি দিতে
তোমার নিশানা দিনে ও রাত্রে বল জাগায়েছে চিতে।
ক্ষীণ হয়ে আসে নয়নের জ্যোতি, কম্পিত এ চরণ,
পর্বতশিরে নিশানা তোমার আমার পরম ধন!
যেথায় তোমার জ্বলিছে প্রদীপ মন্দির বাতায়নে—
আমার চরণ সেথায় যেতে যে আগুয়ান ক্ষণে ক্ষণে!
নিশা কেটে গেছে জীবন-দেবতা, তোমার উদ্বোধন,—
এই কি আমার জীবনে জাগিল জাগার পরমক্ষণ?



আমেরিকায় বেদান্তধর্ম্মের প্রভাব ও সমাদর

শ্রীমতী সুষমা দেবী

[শ্রীমতী সুষমা দেবী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ তাঁর পিতা। জননী নীপময়ী দেবী। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মার্চ তাঁর বিবাহ হয় হাওড়া-নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যোগেন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার ছিলেন। শিক্ষা ও নারী-প্রগতির প্রতি সুষমা দেবীর আন্তরিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রথম জীবনে তিনি গৃহকর্ম ব্যতিরেকে অন্য কোন কর্মে মন দিতে পারেননি। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র-কন্যারা কিছুটা বড় হয়ে গেলে সুষমা দেবী 'বালিকা শিক্ষা সংঘ' নামে মেয়েদের জন্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসময় তিনি বুঝতে পারেন ভারতে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন কত বেশি। তিনি ধীরে ধীরে 'উইমেন এডুকেশনাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া'র সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং 'ওয়ার্ল্ড' ফেডারেশন অব ন্যাশানাল এডুকেশনে'র কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে যাত্রা করেন। ১৯২৭-এর ফেব্রুআরি মাসে আমেরিকায় পৌঁছবার পর সুষমা দেবী আটত্রিশটি স্থানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দান করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতীয় নারীর আদর্শ, নারীর শিক্ষা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও ভারতীয় দর্শন। সুষমা দেবী আমেরিকায় যাবার কয়েক বছর আগে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকায় বক্তৃতা সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিচয় নিয়েই সুষমা দেবী সেদেশে পদার্পণ করেন এবং সর্বত্রই পৈত্রিক উপাধি ব্যবহার করতেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বক্তৃতা শোনবার জন্যে সকলেই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সুষমা দেবী দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতে ফিরে সুষমা দেবী তাঁর অভিজ্ঞতাকে বিশেষ কাজে লাগাতে পারেননি। স্বামী ও এক কন্যার আকস্মিক মৃত্যু ও জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয়ের সন্ন্যাসগ্রহণ তাঁকে জটিল সমস্যার সম্মুখীন করে। ভারতের 'গ্রাম নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে নারীশিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর সুষমা দেবীর মৃত্যু হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তথা রামকৃষ্ণ মিশন ও সন্ন্যাসিবৃন্দের প্রতি সুষমা দেবীর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি আমেরিকায় স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, ভগিনী দেবমাতা ও ভগিনী দয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতবর্ষের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকাবাস ও ভ্রমণ সম্পর্কে নানা রকম কুৎসা রটনা করেন। দু-একটি সংবাদপত্রও এব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইচ্ছে করেই এসব কুৎসাকে প্রশ্রয় দিলেও এই সংবাদ অধিকাংশ ভারতবাসীকে দুঃখিত করেছিল। সুষমা দেবীও দুঃখ পেয়েছিলেন। আমেরিকায় গিয়ে তিনি এই পূতচরিত্র বীরসন্ন্যাসীর মিথ্যা দুর্নাম সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান করেন। সুষমা দেবীর অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়নি। ভারতে ফিরে তিনি এই ঘটনাটি প্রবন্ধ আকারে লিখেছিলেন। তার সামান্য অংশ ১৩৩৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে মূল প্রবন্ধটির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ যা এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল, মুদ্রিত হল।]





অতি প্রাচীন কাল হতে ভারতীয় আর্য্যগণ পৃথিবীর নানা স্থানে জলপথে ও স্থলপথে ভ্রমণ করতেন। বর্ত্তমান যুগে যাতায়াতের এত সুবিধাজনক অবস্থায় কেহই যেন আর গৃহে আবদ্ধ থাকতে চান না; সুতরাং পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি প্রায় সর্ব্বত্রই অন্ততঃ দুই চারিটিও ভারতীয়কে দেখা যায়। বিগত শাসনকর্ত্তাদিগের দেশে একরূপ বাধ্য হয়েই বহু ভারতীয়কে গমন করতে হত। তার কারণ বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকলে তখন ভারতে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট কোন ভাল চাকরীর আশা ছিল না। ইহা ব্যতীত ভারতীয় ছাত্রদের দোহন—অর্থাৎ অধিক খরচা দিয়া ভারতীয়গণ লণ্ডনে কিংবা অন্যান্য সহরে থাকলে বৃটীশদের বেশ একটি আর্থিক সমাগমের উপায় হত। সাম্রাজ্যবাদী বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট নিজেদের স্বার্থেই ভারতীয়দের ইংলণ্ডে গিয়া লেখাপড়া, কাজকর্ম্ম শিক্ষা অতি আবশ্যকীয় বলে স্থির করেন। বহু বৃটীশ ল্যাণ্ডলেডী ভারতীয় ছাত্রদের আপন আপন সংসারে রাখিয়া বেশ উপার্জনও করতেন।

বর্ত্তমান কালে গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ, আর্থিক স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন সাধারণ লোক এবং রাজন্যবর্গ বিলাতে গমন না করলে যেন কোনও সুখ পান না। এই গরীব দেশের অর্থ তাহাদের হরির লুটের মত ছড়াইতে দেখলে যেমন ভয়ঙ্কর গাত্রদাহ হয়, সেইরূপ আবার গরীব ছাত্রগণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিদ্যা শিক্ষার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করছেন তা দেখলেও অত্যন্ত আনন্দ হত।

রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের পিতামহ)—এই দুই বন্ধুর একত্রে সর্ব্বপ্রথম বিলাতযাত্রা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। সেই একদিন গিয়াছে যখন সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ঘোর আন্দোলন চলেছিল। ইউরোপীয়ানদের ভারতে আগমনের বহু বহু পূর্ব্বে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সমুদ্রযাত্রা করে পৃথিবীর নানা স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন সে সমুদায় হিন্দুগণ বিস্মৃত হয়ে যান। অবশ্য ইহা নিশ্চিত যে সেকালে আর্য্য ব্যবসায়িগণ নিজেদের জাহাজে স্বীয় রীতিনীতি বজায় রেখেই গমনাগমন করতেন; সুতরাং অনার্য্য-ম্লেচ্ছদের দেশে গমন করলেও জাতিধর্ম্মচ্যুত হতেন না। কিন্তু ক্রমশঃ মুসলমান ও অন্যান্য বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ প্রভৃতির দ্বারা জাহাজনির্ম্মাণ ও বিদেশীর সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য একরূপ বন্ধ হয়েই যায়। এই জন্য বৃটীশদের ভারতে আসিবার জন্য জাহাজেই আসিতে হয় মহাসাগরের উপর দিয়া, এইজন্য ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশে যাইবার জন্য ভারতীয়গণ উহাদের জাহাজেই গমন করিতে বাধ্য হয়। বৃটীশদের জাহাজে আহারাদি অবশ্য হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। সেইজন্যই বোধ হয় সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়। হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন আচার ও প্রথাকে আমাদের চিরস্থায়ী নিয়ম বলিয়া ধারণা করি, পরে দেখা যায় যে কালের করালগ্রাসে কিভাবে কোথায় যেন সব অদৃশ্য হয়ে গিয়াছে। এই ত কালের খেলা। পুরাতনের পরিবর্ত্তে





নূতনের সৃষ্টি, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। রাতের পর দিন, দিনের পর রাত। এইরূপ লক্ষ লক্ষ বৎসরের পুরাতন সূর্য্য নিত্য নূতনভাবে যেমন আমাদের সামনে প্রকাশ হয়, ভারতের প্রাচীন গৌরবও নূতন সাজে যেন পৃথিবীর সম্মুখীন হতে চলেছে। ভারতে মুসলমানদের আগমন কাল হতে, জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য হিন্দুদের বজ্র আঁটনির প্রয়োজন হয়। সেইজন্য হিন্দুসমাজকে কোমরের কাপড় কষে টেনে বাঁধতে হয়েছিল। এখন আর সে আবশ্যকতা নাই; সুতরাং সেই একই ভারতীয় নরনারী সব একই সজ্জায় সজ্জিত হয়ে পটে অবতীর্ণ হয়েছেন।

আজকাল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বস্টন প্রভৃতি বড় ২ সহরগুলি শুদ্ধ ভারতীয় নয় এসিয়ার অন্যান্য দেশের ছাত্রগণেরও শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। বাণিজ্য ও কৃষি-কর্ম্ম সূত্রে ক্যালি-ফর্ণিয়ায় শিখেদের একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। মাননীয় ভগবান সিঙ্গের দ্বারা নিমন্ত্রিত হয়ে আমি প্রথমে স্যান ফ্রান্সিস্কোতে যাই। পরে গুরুগোবিন্দ সিঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে Stockholm নামে আর একটি বড় সহরেও গমন করি। সেখানে প্রায় ৪০০ শিখ জমা হয়। তাহারা অধিকাংশই শ্রমিকের কর্ম্ম করত। যুক্তরাষ্ট্রে স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব্বপ্রথম বেদান্তধর্ম্মের ধ্বজা প্রোথিত করেন। কিন্তু তারও বহু পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মাদাম ব্লাভাটস্কির থিওসফিষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে হিন্দুধর্ম্মের মিশন নিয়ে সেখানে সর্ব্বপ্রথম গমন করেন। মোহিনীমোহনের সম্বন্ধে দু চারি জন মহিলা আমাকে বহু প্রশ্ন করেন ও বলেন যে মোহিনীমোহনের পূর্ব্বে সাধারণ কোনও আমেরিকান "হিন্দু"কে দেখেন নাই। মোহিনীমোহনের পরে শ্রীকেশবচন্দ্র সেনের সহকর্ম্মী শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মধর্ম্মের নিশান নিয়ে আমেরিকায় যান, আর ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধেও বহু বক্তৃতাদি দেন। ইহাও বেদান্তধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে দ্বিতীয় সোপান বলা যায়। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিকাগোতে যে আন্তর্জাতিক ধর্ম্ম মহাসভা "The Parliament of Religion" আহূত হয়, সেখানে স্বামীজি বেদান্তধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সব অতি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন তা যেন একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার হয়। সেই মহাসভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন এইরূপ বহু লোকের নিকট শুনেছিলাম যে স্বামীজির সুন্দর ইংরাজীতে বেদান্তধর্ম্মের প্রাঞ্জল ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা ঐ মহাসভার শ্রোতাদিগকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। বড় ২ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহার বক্তৃতা একাগ্রমনে শ্রবণ করতেন, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারতেন না। এই ভারতীয় বক্তার বক্তৃতা শুনিবার জন্য মার্কিনদিগের এত আগ্রহ ছিল যে তাঁর বলবার সময় সভা লোকে লোকারণ্য থাকত, আর এত নিস্তব্ধ যে একটি কাঁটা ফেলার শব্দও বোধ হয় শোনা যেত, পরে স্বামীজির বক্তৃতা শেষ হলে সভা একপ্রকার লোকশূন্য হয়ে যেত। এই ব্যাপার দেখে স্বামীজিকে সভার অবশিষ্ট কয়েক দিন সব শেষে বলতে দেওয়া হত। তখন শেষ অবধি সভা লোকে পরিপূর্ণ থাকত। বেদান্তধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনতে বহু বাগ্মী দার্শনিকগণ





তাঁহার সহিত আলোচনা করতে আসতেন। স্বামীজি বুঝেছিলেন ঐ মহাদেশে বেদান্তধর্ম্মের বীজ বপনের উত্তম উর্ব্বর ক্ষেত্র আছে, সুতরাং বেদান্তকে দেশ কালের উপযোগী নব সাজে সজ্জিত করে আমেরিকায় আনবার জন্য স্থির করলেন। ইহার পূর্ব্বেও যে গীতা ও বেদান্তধর্ম্ম সম্বন্ধে কেহ কিছুই জানত না তা বলা যায় না। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিক এমার্সনের গ্রন্থ পাঠ করলেই জানা যায় যে তাঁর দার্শনিক মতামত তিনি কোথা হতে সংগ্রহ করেছিলেন। কোনও একটি মিটিং-এর পর কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক এবং নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত অধ্যাপক প্রোফেসর হ্যাবিজ্ এমার্সনের বিষয় বহু প্রকার আলোচনা করছিলেন, সেই সময় প্রোঃ হ্যাবিজ্ আমায় বলেন যে এমার্সনের মৃত্যুর পর তাঁহার লাইব্রেরী সংস্কারের সময় দেখা যায় যে তাঁহার লেখবার ডেস্কের দক্ষিণ দিকে প্রথম আলমারির প্রথম পুস্তকটি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা। আলমারিটা সাংখ্য এবং বেদান্তদর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকে পরিপূর্ণ ছিল, খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি পুস্তকও ছিল না। আমেরিকানদের মধ্যে এমার্সনের স্থান বহু বহু উর্দ্ধে। তাঁহার ন্যায় পাণ্ডিত্য আর কোনও আমেরিকান দেখিয়েছেন বলে আমরা বিশ্বাস করি না। অনুসন্ধান দ্বারা বেশ ভালরূপেই জানা গিয়াছে যে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁর চিত্তবৃত্তির পুষ্টিসাধন এবং বেদান্তদর্শনের প্রভাব তাঁর চিন্তাস্রোতকে চালিত করেছিল। হিন্দুদর্শনের উদার নীতিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি খৃষ্টান সাহিত্যকে তাঁর পুস্তকাগার হতে বিদায় দিয়াছিলেন। দিন দিন আমিও বুঝতে পারছিলাম যে আমেরিকায় খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব বেশ কম। যা কিছু আছে তা অধিকাংশই বাহ্যিক।

মহাসভার বৈঠক শেষ হয়ে যাবার পর স্বামীজি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম অর্থের জন্য তাঁর কিছু কষ্ট হয়। কিন্তু সে বেশী দিনের জন্য নয়। তাঁর তেজস্বী ও প্রাণস্পর্শী বেদান্ত ব্যাখ্যান তথায় শিক্ষিত সমাজে বেশ এক চাঞ্চল্য আনয়ন করে। স্বল্প কাল মধ্যে তথায় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি যশঃতরঙ্গে মুখরিত হয়ে উঠল।

পৃথিবীর এই অর্দ্ধাংশকে স্ত্রীরাজ্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এখানে নারীগণই সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য ও অগ্রগামী। সাহিত্য, ধর্ম্ম ইত্যাদি সকল বিষয়ে বক্তৃতা শুনিতে তাঁহাদের উৎসাহ অধিক। পুরুষগণ ডলারের পূজারী। ধন আহরণেই সর্ব্বদা ব্যস্ত।

যেখানে স্ত্রীলোকগণ যথার্থ গুণ গ্রহণে সমর্থ সেখানে বিবেকানন্দর ন্যায় এক মহাপুরুষ কখন অনাদৃত হয়ে থাকতে পারেন না। দলে দলে মার্কিন নরনারীগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে সুরু করলেন। তাঁহার বহু শিষ্যদের মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতাকে কোহিনূর মণি বলা যায়।

শীঘ্রই নিউইয়র্কে একটি বেদান্ত আশ্রম স্থাপিত হয়। ইহাই ঐ মহাদেশে বেদান্তধর্ম্ম প্রচারের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্রস্থল। বেলুড় মঠ হতে একজন অতি সুদক্ষ প্রচারক স্বামী





যাহা হউক বৈঠক শেষ হয়ে যাবার পর স্বামীজি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচার কার্য আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম অর্থের জন্য তাঁর কিছু কষ্ট হয়। কিন্তু সে কেবল দিনের জন্য নয়। তাঁর তেজস্বিনী ও প্রাণস্পর্শী বেদান্ত ব্যাখ্যা তথায় শিক্ষিত সমাজে যেন এক নূতন আন্দোলন আনয়ন করে। অল্প কাল মধ্যে তথায় এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত অবধি তাঁর যশঃতরঙ্গে মুখরিত হয়ে উঠল।

স্বামীজীর এই অক্লান্ত শক্তিকে [illegible] বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না। এখানে নারীগণই সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য ও অগ্রগামী। সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি সকল বিষয়ে বক্তৃতা শুনিতে তাঁহাদের উৎসাহ অধিক। পুরুষেরা সব ডলারের পিছনে। ধন আহরণেই সর্বদা ব্যস্ত।

যেখানে স্ত্রীলোক এত যথার্থ গুণ গ্রহণে সমর্থ সেখানে বিবেকানন্দের ন্যায় এক মহাপুরুষ কখন অনাদৃত হয়ে থাকতে পারেন না। দলে দলে মার্কিন নর নারীগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে শুরু করলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে ভগ্নী নিবেদিতাকে কোহিনুর মণি বলা যায়।

শীঘ্রই নিউইয়র্কে একটি বেদান্ত আশ্রম স্থাপিত হয়। ইহাই এ মহাদেশে বেদান্ত ধর্ম প্রচারের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্রস্থল। ভারতের মঠ হতে একজন অতি সুদক্ষ প্রচারক স্বামী অভেদানন্দকে আনেন স্বামীজী। তাঁহার উপর আশ্রমের সকল কার্য্যভার অর্পণ করে দৃঢ় ভাবে ইহার ভিত্তি স্থাপন করে তিনি ভারতে ফিরতে যান।

আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে স্বামীজির প্রভাব এত বিস্তৃত হয় যে গৃহস্থ ও সাধারণ প্রত্যেক পুস্তকাগারে তাঁহার বক্তৃতাবলী রাখা আজ অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়। আর তুলনামূলক ধর্ম শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলিতে তাঁহার বক্তৃতা সব পাঠ্য পুস্তক রূপে [illegible] করান হল।

সুষমা দেবীর মূল পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ।



অভেদানন্দকে আনেন আর তাঁহার উপর আশ্রমের সকল কর্ম্মভার অর্পণ করে দৃঢ়ভাবে ইহার ভিত্তি স্থাপন করে তিনি ভারতে ফিরে যান।

আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে স্বামীজির প্রভাব এত বিস্তৃত হয় যে গৃহস্থ ও সাধারণ প্রত্যেক পুস্তকাগারে তাঁহার বক্তৃতাবলী রাখা অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়। আর তুলনামূলক ধর্ম্মশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাঁহার সব বক্তৃতা পাঠ্যপুস্তকরূপে পড়ান হত।

এইখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করে থাকতে পারলাম না। তাহা এই যে যখন স্বামী বিবেকানন্দ যুক্তরাষ্ট্রে এত সমাদৃত হচ্ছেন, তখন বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদীদের গাত্রদাহ হতে সুরু হয়। বৃটীশগণ সব সময় জগতের সম্মুখে ভারতীয়দের অশিক্ষিত, হেয় ও অসভ্য জাতি বলেই উল্লেখ করে এসেছেন। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দর যশ যখন এরূপভাবে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করতে লাগল, তখন যে উহাদের ভয়ঙ্কর গাত্রদাহ হবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অতি শীঘ্র এই জ্বলনের একটি ঔষধ উহারা বার করল।

একদিন প্রাতঃকালে দৈনিক সংবাদপত্রে ভারতীয়, বৃটীশ সকলেই দেখলেন যে বড় বড় অক্ষরে স্বামীজির বিষয়ে লেখা। সংবাদপত্রের ঐ কথা পড়িয়া ভারতীয়দের ভয়ঙ্কর খারাপ বোধ হল। কিন্তু ঐ খবরটি স্বামীজিকে জগতের সম্মুখে অতি হেয় করে দেখাবার যে একটি কুচক্রান্ত তা ভারতীয়গণ তখন বুঝতে পারেন নাই।

আমেরিকায় গমন করে বহু আমেরিকানের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ পরিচয় হয়। স্বামীজিকে যাঁরা বেশ ভালরূপে জানতেন এইরূপ বহু বয়োবৃদ্ধ লোককে তাঁর বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করি, সকলের নিকট হতেই একভাবের উত্তর পাই। ঐ সময় একদিন নিউইয়র্কে একটি দশতলা বাড়ীর একটি বড় কামরায় ৩০/৪০ জন শিক্ষিত স্ত্রী পুরুষ মিলে স্বামীজির সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। সেই সময় একজন মহিলাকে আমি ঐ বিষয় প্রশ্ন করি। তাঁর বেশ বয়স হয়েছিল, আর তিনি স্বামীজিকে ভালরূপে জানতেন। তিনি আমার প্রশ্ন শুনে উত্তেজিত হয়ে বল্লেন, "আপনারা বৃটীশদের চক্রান্ত বোঝেননি! ওরা কি পছন্দ করেছিল যে অত বড় এক মহাসভায়, যেখানে পৃথিবীর, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতের, শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ একত্রিত হয়েছিলেন, সেখানে এক অজ্ঞাতকুলশীল ভারতীয়র নিকট তাঁরা তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করবেন—এ কি বৃটীশগণ সহ্য করতে পারছিল! ওরা বৃটীশগণ ভারতীয়দের জগতের সম্মুখে অসভ্য বর্ব্বর বলে দেখিয়ে এসেছিল তা যে সব মিথ্যা প্রমাণ হবে। জগতের সম্মুখে তাঁকে অতি তুচ্ছভাবে দেখানটি এক অতি জঘন্য কুচক্রান্ত।"

Boston-এ ও California-র La Crescenta সহরে স্বামী পরমানন্দর দ্বারা আরও দুটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিও যেমন সুবক্তা তেমনি সুলেখকও ছিলেন। সেখানে তাঁর যথেষ্ট



সুনাম ও প্রতিপত্তি আছে! গির্জ্জারই ন্যায় প্রত্যেক রবিবারে ঐ আশ্রমে বেদান্ত ব্যাখ্যা হয়। লা ক্রেসেণ্টায় আমি কয়েকদিনের জন্য স্বামীজির আতিথ্য গ্রহণ করি। সেখানে ভগ্নী দেবমাতা, ভগ্নী দয়া প্রভৃতি কয়েকজন আমেরিকান সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। তাঁহারা সংসারের সব বিলাসিতা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করে পরম শান্তি লাভের জন্য আশ্রমেই থাকেন। উঁহারা সকলেই বিশিষ্ট বংশের। সকলেই হিন্দু নাম গ্রহণ করেন এবং নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব আশ্রমকে দান করেন। Message of the East নামক মাসিক পত্রিকা ঐখান হতেই প্রকাশিত হয়। নিয়মিত সভাসমিতি বক্তৃতা ও পুস্তকাদির দ্বারা প্রচারকার্য্য চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হতে লাগল। ভগ্নী "দয়া" একজন অতি বিদুষী, সহৃদয়া ও অত্যন্ত কর্ম্মী মহিলা ছিলেন। তাঁহার সুন্দর অমায়িক স্বভাব আমায় বিশেষ করে মুগ্ধ করে। ইনি আমেরিকার Congress-এর Senator Jones-এর কন্যা। হিন্দুধর্ম্ম বরণ করে ঐ আশ্রমের কার্য্যে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন সংযুক্ত বেদান্ত আশ্রম ব্যতীত আরও কয়েকটি হিন্দু মিশন আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিতরণ দ্বারা মাতৃভূমিকে পশ্চিম জগতের সম্মুখীন রেখেছিল। ইহাদের মধ্যে "যোগোদা মিশন" উল্লেখযোগ্য। স্বামী যোগানন্দ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইনি রাঁচীতে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যাপীঠের একজন অধ্যাপক ছিলেন। এখন ক্যালিফর্ণিয়ার লস এঞ্জেলো সহরে ওয়াশিংটন পর্ব্বতের শিখরোপরি এক সুন্দর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে কাজ করছেন। স্বামী ধীরানন্দও তাঁর সহকারী হয়ে ঐ আশ্রমের কার্যই করেন।

পূর্ব্বেই বলেছি যে মার্কিন স্ত্রীলোক প্রধান দেশ। স্ত্রীলোকের কার্য্য ও প্রতিপত্তি এখানে অধিক।



'জ্ঞানিনামপি চেতাংসি'

স্বামী পরাশরানন্দ

[কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে কর্মনিরত।]

মেধসমুনির আশ্রমে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে এসে প্রায় একই সময়ে উপস্থিত হয়েছেন। শত্রুগণের আক্রমণে রাজা রাজ্য-সম্পত্তি-ঐশ্বর্য সব হারিয়ে নির্জন আশ্রমে শান্তিতে জীবনযাপন করছেন, আর বৈশ্যের স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়স্বজন তাঁর সব ধনসম্পত্তি কেড়ে নেওয়ায় মনের দুঃখে তিনিও বনে এসে এই আশ্রমেই উঠেছেন। তাঁরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে বুঝলেন, দুজনেই বিরক্ত হয়ে নিজ নিজ পরিজন ও আবাস ছেড়ে এলেও সেই গৃহের চিন্তাতেই তাঁদের মন বিক্ষিপ্ত রয়েছে। রাজা ভাবছেন তাঁর অবর্তমানে রাজধানীর অবস্থা কিরূপ, তাঁরই অনুগত ভৃত্যরা নতুন রাজার সেবা আরম্ভ করেছে নিশ্চয়ই ইত্যাদি ইত্যাদি। আর স্ত্রী-পুত্র বৈশ্যের ধনসম্পত্তি কেড়ে নিলেও বৈশ্য তাদেরই শুভাশুভ চিন্তা থেকে কিছুতেই নিজেকে বিরত করতে পারছেন না। তাঁরা নিজেদের মনের এরূপ আচরণ দেখে বিস্মিত হয়ে মুনিবরকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কথাপ্রসঙ্গে রাজা মুনিকে বললেন যে, তাঁরা বিষয়দোষদর্শী ও জ্ঞানী, এই যে মোহ এ বিবেকহীন ব্যক্তিরই হওয়া স্বাভাবিক,—তাঁদের এই মোহ জন্মাবার কারণ কি? মুনিবর এর উত্তর সুন্দরভাবে যা দিলেন তাই 'চণ্ডী'-রূপে বিখ্যাত। তিনি শুরু করলেন: 'অচিন্ত্যমহিমা দেবী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্তকে সবলে বিবেক থেকে আকর্ষণ করে মোহে নিক্ষিপ্ত করেন। সংসারস্থিতিকারী বিষ্ণুর মহামায়াপ্রভাবে মনুষ্যগণ মোহরূপ গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়; এই মহামায়া জগৎকে সংমোহিত করছেন; অতএব এই মোহবিষয়ে বিস্ময় বোধ করো না।'

এ-প্রসঙ্গে একটু বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা করা যাক। ঐতরেয় উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে বলা হচ্ছে: 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।'—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল অর্থাৎ নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ এই জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপেই ছিল; তা ছাড়া সক্রিয় অন্য কিছুই ছিল না। এই আত্মা হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি সর্বপ্রকার সংসারধর্মবর্জিত, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, জরামরণশূন্য, অমৃত, অভয় ও অদ্বয় পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বর তাঁর মায়াশক্তির সাহায্যে এই সবকিছু সৃষ্টি করলেন বা অন্যভাবে বলতে গেলে তিনিই সবকিছু হলেন—'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' (বৃ. উ. ২।৫।১৯)। এই মন্ত্রের ভাষ্যে আচার্যদেব বলছেন: 'ইন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ মায়াভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ, নামরূপভূতকৃত-মিথ্যাভিমানৈর্বা, ন তু পরমার্থতঃ, পুরুরূপ বহুরূপ ঈয়তে গম্যতে—একরূপ এব প্রজ্ঞানঘনঃ সন্ অবিদ্যাপ্রজ্ঞাভিঃ'—ইন্দ্র—পরমেশ্বর মায়া দ্বারা—প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা, অথবা নাম ও রূপাত্মক উপাধিজনিত মিথ্যা অভিমানরাশি দ্বারা পুরুরূপে অর্থাৎ বহুরূপে প্রতীত হন; বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু তিনি প্রজ্ঞানঘনরূপ একমাত্র রূপ। তথাপি তাঁর অবিদ্যা-প্রসূত বিবিধ ভেদ জ্ঞানবশে নানা আকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে মাত্র।

যে অচিন্তনীয় শক্তির সহায়তায় পরমেশ্বর সবকিছু রূপে প্রকাশ পেলেন সেই মায়াশক্তি ঈশ্বরের হাতের এক অমোঘ অস্ত্র,—এই শক্তির সহায়তায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সবকিছু নিমেষে ঘটে যাচ্ছে। এই শক্তি আবার

তাঁর আত্মভূতাও বটে,—'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্তু মহেশ্বরম্' (শ্বে. উ. ৪।১০)—জগৎপ্রকৃতিকেই মায়া এবং মহেশ্বরকেই মায়াধীশ বলে জানবে, গীতাতেও (৭।১৪) শ্রীভগবান বলছেন: 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া'—পরমেশ্বর বিষ্ণুস্বরূপ আমারই আত্মভূতা মায়া (এই কারণে ও) দৈবী; এ গুণময়ী ও দুরতিক্রমণীয়া। ঈশ্বর এই মায়াশক্তির সাহায্যে শুধু যে সবকিছু সৃষ্টিই করলেন তাই নয়, মানুষকে তার স্বরূপও জানতে দিলেন না,—ফলে পঞ্চকোশের মধ্যে আবদ্ধ মানুষ অবস্থাত্রয়ের মধ্যে শুধু যাতায়াতই করতে লাগল, কিন্তু স্বরূপতঃ সে যে পঞ্চকোশবিলক্ষণ, অবস্থাত্রয়সাক্ষী, নির্বিকার, নিরঞ্জন, অস্তিত্ব-জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ তা জানতে পারল না—বিচিত্ররূপা এই মায়া অতি গভীর ও বুদ্ধির অগম্য—এই মায়ার প্রভাবে সকলেই মোহগ্রস্ত হয়—'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ' (গীতা, ৫।১৫)—অজ্ঞানের দ্বারা মানুষের স্বরূপজ্ঞান আবৃত থাকে বলে তারা মোহগ্রস্ত হয়; আর এই মোহগ্রস্ত হওয়ার ফল হচ্ছে সংসারে বহুবিধ জ্বালা-যন্ত্রণা-দুঃখের একশেষ হওয়া আর মৃত্যুর পর পুনরায় দেহধারণ এবং একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি।

যে মায়া বা অবিদ্যাপ্রভাবে জীব তার স্বরূপ ভুলে যায় সেই অবিদ্যার দুটি শক্তি আছে—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি অখণ্ড-নিত্য-অদ্বয় চিৎস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করে রাখে আর বিক্ষেপশক্তি নানারূপ কর্মের দ্বারা জীবকে জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত শৃঙ্খলে বদ্ধ করে। আত্মস্বরূপ জীব আবরণশক্তির প্রভাবে পড়লেই মোহগ্রস্ত হয় আর তখন অনাত্মা দেহকে 'আমি' বলে ভ্রম করে—'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ' অর্থাৎ 'যাহা যাহা নয় তাহাকে তাহা' বলে ভ্রম হয়। এই মোহ বা মায়ার আবরণশক্তি মূঢ়, অজ্ঞান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয় হতে পারে, কিন্তু যারা শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী তাদের কথা তো স্বতন্ত্র; তারাও কি এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত? 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে (১১৪ নং) একটি শ্লোকের মাধ্যমে আচার্যদেব এর উত্তর সুন্দরভাবে দিয়েছেন:

প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্ত-
সূক্ষ্মাত্মদৃগ্-
ব্যালীঢ়স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোঽপি
স্ফুটম্।
ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে
তদ্গুণান্
হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্মহত্যাবৃতিঃ॥

—প্রজ্ঞাবান্, শাস্ত্রজ্ঞ, চতুর, শাস্ত্রসহায়ে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম দেহাদির বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি নানা যুক্তি-সহায়ে উপদিষ্ট হলেও তমোগুণের আবরণশক্তির দ্বারা অভিভূত থাকার জন্যে আত্মতত্ত্ব নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানতে পারে না। ভ্রান্তিবশতঃ দেহ-গেহাদি মিথ্যা-তুচ্ছ পদার্থে গুণের আরোপ করে সেগুলিকে সত্য সুখকর মনে করে। হায়! দুরন্ত তমোগুণের আবরণশক্তি বড়ই প্রবল।

এই মায়ার অদ্ভুত শক্তির কথা এবং কিরূপে তা প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তিদেরও প্রজ্ঞা হরণপূর্বক মোহগ্রস্ত করে পুরাণাদিতে তার বহু উপাখ্যান আছে। আমরা এখানে শ্রীদেবীভাগবতম্-এর অন্তর্গত (ষষ্ঠ স্কন্ধ—২৮-৩১ অধ্যায়) একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করব। পরিভ্রমণরত নারদমুনি একসময়ে সত্যলোক থেকে সামগান করতে করতে শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হন। সেখানে নারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী ছিলেন; নারদকে আসতে দেখে লক্ষ্মীদেবী অন্তর্হিতা হলেন। নারদ শ্রীহরিকে বললেন যে, তিনি তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ ও মায়াকেও জয় করেছেন; অতএব দেবীর এই অন্তর্ধান হওয়ার কারণ কি? মুনির এই গর্বপূর্ণ উক্তি শুনে নারায়ণ ঈষৎ হেসে বললেন:

'নিরাহারী, জিতেন্দ্রিয়, সাংখ্য-শাস্ত্রবেত্তা যোগিগণও দুর্জয় মায়াকে জয় করতে সমর্থ হয় না; বেদবিদ্, যোগবিদ্, সর্বজ্ঞ বা জিতেন্দ্রিয় যাই হোক না কেন, গুণত্রয়যুক্ত কোনও ব্যক্তি মায়াকে জয় করতে পারে না।' এই মায়া কিরূপ তা জানতে চাইলে নারায়ণ তাঁকে এক সরোবরের তীরে নিয়ে এসে স্নান করতে বললেন। স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে নারদ এক সুন্দরী রমণীতে পরিণত হলেন এবং পূর্বদেহের সকল স্মৃতি তাঁর মন থেকে মুছে গেল। রাজা তালধ্বজ সেই পথে তখন যাচ্ছিলেন এবং এই সুন্দরী রমণীর সঙ্গে আলাপাদি করে তাঁকে বিবাহ করলেন। ক্রমে রাজা ও রানীর অনেকগুলি পুত্রসন্তান হল এবং পুত্র-পৌত্রাদি নিয়ে মোহগ্রস্ত নারদ রানীরূপে সুখে দিনযাপন করতে লাগলেন। তিনি রাজপত্নী, বহুপুত্রের জননী এবং পতিব্রতা নারী এই আত্মগর্বে গর্বিতা হয়ে মনে করতে লাগলেন সংসারমধ্যে তিনি ধন্যা রমণী। এই সময়ে হঠাৎ শত্রুরা রাজ্য আক্রমণ করে তাঁর সকল পুত্র-পৌত্রদের বধ করল। এ-খবর শুনে পুত্রশোকে অতি কাতর হয়ে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন। শ্রীহরি তখন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে সেখানে উপস্থিত হয়ে শাস্ত্র-উদ্ধৃতির দ্বারা শোকাতুরা রানীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন এবং নিকটবর্তী এক তীর্থের জলে স্নান করতে উপদেশ দিলেন। তীর্থের জলে স্নান করামাত্র তিনি আবার পুরুষ-শরীর প্রাপ্ত হলেন এবং সমস্ত পূর্বস্মৃতি তাঁর মনে ভেসে উঠল। অবাক হয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন: 'তিনি নারদ, নারায়ণের নিকট মায়া কিরূপ জানতে চেয়েছিলেন; নারায়ণের মায়াপ্রভাবে তাঁর হঠাৎ স্ত্রী-শরীরে রূপান্তর, ঘর-সংসার-পুত্র-পৌত্রাদি প্রাপ্তি, আবার সবের অন্তর্ধান, শেষে আবার পুরুষ-শরীর প্রাপ্তি। এত যুগের ঘটনা, কিন্তু নারায়ণ সেই একই সরোবরের তীরে হেসে তাঁকে উঠে আসতে বলছেন,—যেন কয়েক মিনিটের ঘটনামাত্র।' এই হচ্ছে মায়ার দুর্জয় শক্তি, দেহধারী যে-কোনও ব্যক্তি এই মায়ার প্রকোপে মোহগ্রস্ত হতে বাধ্য। নারদমুনি পরে পিতা ব্রহ্মাকে তাঁর পূর্বরূপ মোহাচ্ছন্ন হওয়ার কারণ কি জিজ্ঞাসা করলেন; কি করে মুনি অতি-সত্বর পূর্বজ্ঞাত শাস্ত্রাদি বিষয়সকল ভুলে গেলেন তাও জানতে চাইলেন,—কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, এই মায়া সমুদয় জ্ঞান নষ্ট করে দেয় আর সকলপ্রকার মোহের যে এ-ই কারণ তা তিনি শুভ-অশুভ বিষয় ভোগ করে জানতে পেরেছেন। ব্রহ্মা একটু হেসে বললেন যে, মহাজ্ঞানী তপস্বীরা এবং যোগিব্যক্তিরাও মায়ার দুর্জয় প্রভাব অতিক্রম করতে সমর্থ নন; অধিক কি, তিনি, বিষ্ণু ও মহেশ্বরও মহাশক্তিমতী মায়াকে যথার্থ বুঝতে সমর্থ নন। তাঁরা সকলেই মায়ার শক্তিতে বিমোহিত হয়ে আছেন। দক্ষ বাজিকর যেমন কাঠের পুতুলকে নিজের ইচ্ছানুসারে নাচায় সেরূপ মায়া ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সকল মানুষ-অসুর-জীব-জগৎকে ইচ্ছামত নাচাচ্ছেন।

গীতাশাস্ত্রেও দেখি অশেষ গুণসম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ অর্জুনের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে শুনে মায়ার আবরণশক্তিজাত শোক ও মোহের উদয় হয়েছিল। এই মোহ সংসারবৃক্ষের বীজস্বরূপ; একমাত্র আত্মজ্ঞান ব্যতীত সংসার-নিমিত্ত এই মোহের নিবৃত্তি অন্য কোন উপায়ে হয় না বলেই ভগবান অর্জুনকে প্রথমেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিতে শুরু করেন। সমগ্র গীতাশাস্ত্র শোনার পর উপসংহারে (১৮।৭৩) অর্জুনকে বলতে শুনি, 'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত'—'হে অচ্যুত, তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ বিনষ্ট হয়েছে, আমি আত্মতত্ত্ববিষয়ক স্মৃতি অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করেছি।' অর্থাৎ ভগবানের অনুগ্রহে তাঁর সমস্ত সংসারানর্থের হেতু

অজ্ঞানজাত মোহ নষ্ট হয়েছে এবং তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করে কৃতকৃত্য হয়েছেন। ফলতঃ এই দাঁড়াচ্ছে যে, মোহ পুরোপুরি চলে যাওয়ার অর্থ মায়ার আবরণশক্তি চলে যাওয়া অর্থাৎ আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান,—এই অপরোক্ষ জ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত মোহ থাকছে। ঈশোপনিষদের মন্ত্রেও (৭ম) একই কথা বলা হচ্ছে—'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'—আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং সর্বত্র আত্মৈকত্বদর্শী ব্যক্তির শোক-মোহ চলে যায় (অর্থাৎ তার আগে পর্যন্ত থেকে যায়)।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, ঈশ্বর তাঁর আত্মভূতা মায়াশক্তির সাহায্যে জীব-জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন; তাঁর এই মায়াশক্তির অন্তর্গত আবরণশক্তি বড়ই প্রবল এবং আবরণশক্তি প্রসূত শোক-মোহ ইত্যাদি একমাত্র 'ব্রহ্মজ্ঞাননাশ্য'।

এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান আর তার ফলস্বরূপ শোক-মোহ ও ভীতিপ্রদ অশেষ দুঃখযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় কি? গীতাতেই (৭।১৪) শ্রীভগবান এর উত্তর দিয়ে গেছেন, 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'—যাঁরা আমার আশ্রয়গ্রহণ করেন একমাত্র তাঁরাই এই দুস্তর, চিত্তমোহিনী মায়া অতিক্রম করতে পারেন। এখানে আমার বলতে মায়াবী ঈশ্বরকে বোঝাচ্ছে, যিনি আবার মায়াবদ্ধ মানুষের আত্মস্বরূপও বটে। একমাত্র তাঁর আশ্রয়গ্রহণেই মানুষের অনাদি অবিদ্যার নাশ ঘটে এবং যাবতীয় দুঃখকষ্টের পরিসমাপ্তি ও অন্তে স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। এই মায়াধীশ পরমেশ্বরই চণ্ডীতে (১।৭৪-৬) মহামায়া রূপে আখ্যাত হয়েছেন,—তাঁর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে :

'অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা॥
ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥'

—'হে দেবি, তুমি অর্ধমাত্রা (নির্গুণ ব্রহ্ম), অব্যক্তরূপা, নিত্যা ব্রহ্মময়ী। তুমি গায়ত্রী, তুমি আদিকারণভূতা প্রকাশরূপা পরমা জননী। তুমি ব্রাহ্মীরূপে এই জগৎ সৃষ্টি কর, বৈষ্ণবীরূপে তা পালন কর এবং রৌদ্রীরূপে তা ভক্ষণ কর।' যে সগুণ ব্রহ্মের কথা উপনিষদে বলা হয়েছে, চণ্ডীতে তিনিই মহামায়ারূপে কীর্তিতা হয়েছেন। তিনি অবিদ্যারূপে সংসারবন্ধনের হেতু এবং বিদ্যারূপে তিনিই আবার মুক্তির কারণ। তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও কারণরূপা অর্থাৎ রজোসত্ত্বতমোগুণের আশ্রয়। তিনি সমস্ত বিশ্ববাসীকে সম্যগ্‌-রূপে মোহিত করছেন আবার 'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ' (চণ্ডী, ১১।৫)—তুমি প্রসন্না হলে নিশ্চয়ই সংসারে মুক্তির হেতুভূতা হয়ে থাক।

এই ঘোর অবিদ্যা মায়া থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় মায়াধীশ্বরী যিনি, তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁকে প্রসন্ন করা। চণ্ডীর শেষ মাহাত্ম্যে দেখতে পাই, সমগ্র চণ্ডী-আখ্যায়িকা শোনার শেষে রাজা ও বৈশ্য সেই মহামায়াস্বরূপা দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য নদীতীরে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি নির্মাণ করে পুষ্প-ধূপ-হোম-তর্পণ সহকারে দেবীর পূজা এবং জিতেন্দ্রিয় ও একাগ্রচিত্ত হয়ে দীর্ঘ তপস্যা করেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী সাক্ষাৎ আবির্ভূতা হয়ে তাঁদের যে-কোনও অভিলষিত বর প্রার্থনা করতে বললেন। বিষয়সুখ-বিরক্তচিত্ত প্রজ্ঞাবান্ বৈশ্য সর্বপ্রকার 'আমি আমার' অভিমানের চির বিনাশসাধক ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করলেন। কিন্তু বিষয় শোভানাধ্যাসে রঞ্জিত-চিত্ত রাজা নষ্ট রাজ্যোদ্ধার এবং আগামী জন্মে চিরস্থায়ী রাজ্য প্রার্থনা করলেন; দেবীও প্রসন্ন চিত্তে তাঁদের প্রার্থিত বরদানে কৃতার্থ করলেন।

পরিশেষে, আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের দুটি উক্তি দিয়ে এ-প্রসঙ্গ শেষ করব। 'কিন্তু হাজার বাজী ত্যাখো, তবু তাঁর অণ্ডরে (অধীন)। পালাবার জো নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান তেমনি করতে হবে। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—তবে বাজীর খেলা দেখা যায়। নচেৎ নয়।' (কথামৃত, ৪।১৪।১)

'তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনি মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়।' (কথামৃত, ৩।২।২)

নিবেদিতা ও ভারতীয় নাটক

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবালোকে বাংলার নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চ তথা নটগুরু গিরিশ সম্পর্কে প্রথিতকীর্তি গবেষক।]

১

নিবেদিতার নাট্যবোধ ও নাটকের প্রতি আকর্ষণ ছিল সহজাত। ছেলেবেলায় তাঁর পুঁজি ছিল একখণ্ড শেক্সপীয়ার রচনাবলী। ভাই রিচমণ্ডকে শোনাতেন তা থেকে আবৃত্তি করে। রিচমণ্ড তাঁর মনোবিকাশের ক্ষেত্রে নিবেদিতার ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন: "শেক্সপীয়ারের নাটকীয় বক্তৃতার আবৃত্তি করতে মার্গারেট ভালবাসত। ম্যাকবেথ থেকে তার আবৃত্তি কী দারুণ হৃদয়গ্রাহী হত, এখনো তা স্পষ্ট মনে আছে:

Is this a dagger which I see before me
The handle toward my hand?

কিংবা জুলিয়াস সীজার থেকে অ্যান্টনির বিখ্যাত ভাষণ:

Friends, Romans, Countrymen,
lend me your ears!

তার ধ্বনিময় কণ্ঠের For Brutus is an honourable man এখনো আমার কানে সুস্পষ্ট বাজছে, যেন আজ সকালেই তা শুনেছি। আমি বিস্ময়ে হাঁ হয়ে থাকতুম।...মার্গারেটই তার অতীব স্বল্প পুঁজি থেকে আমাকে পয়সা দিয়েছিল থিয়েটারে প্রথম শেক্সপীয়ারের নাটক দেখতে—লীসিয়ামে 'কিং হেনরি দি এইটথ্'—আর্ভিং অভিনয় করেছিলেন উলসির ভূমিকায়, এবং ড্যালী-তে 'টুয়েলফথ্ নাইট' দেখতে,—এডা রেহান যাতে ভায়লা সেজেছিলেন। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কেউই মার্গারেটের তুল্য তীব্র শক্তিতে শেক্সপীয়ারের লাইনগুলি বলতে পারেননি।"[১]

সেই মার্গারেট যখন আটাশ বছর বয়সে স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং তারপর বত্রিশ বছর বয়সে ভারতে এসে স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তখন স্বামীজী তাঁকে শুধু বেদান্তে দীক্ষা দেননি—দীক্ষা দিয়েছেন ভারতীয়ত্বে। বিবেকানন্দের সাহিত্যচেতনা, সৌন্দর্য ধারণা, শিল্পবোধ, শিক্ষাচিন্তা—সর্বক্ষেত্রে নিবেদিতা এক নতুন আদর্শের রূপ খুঁজে পেয়েছেন। নিবেদিতা শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে একটি পত্রে লিখেছেন: "আমি এখন বুঝতে পারি, তিনি এমন একজন কাউকে চাইছিলেন যার মধ্যে নিজের অন্তর ও চিন্তাসমূহ ঢেলে দিতে পারেন।"[২]

১৮৯৮ থেকে ১৯০২—মোট সাড়ে চার বছরে নিবেদিতা স্বামীজীর কাছ থেকে পেয়েছেন অমূল্য সম্পদ। বিশেষ করে প্রথম দু-বছর তিনি বেলুড়, উত্তরভারত ও কাশ্মীরে পেয়েছেন স্বামীজীর নিকটসান্নিধ্য। সে সময় তিনি যা কিছু আলোচনা করেছেন তার মোটামুটি বিবরণ নিবেদিতা রেখে গেছেন 'Master As I saw Him', 'Notes on Some Wanderings with The Swami Vivekananda' গ্রন্থদ্বয়ে এবং তাঁর পত্রাবলীতে। সে সময় স্বামীজী ভারতীয় নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—রামায়ণ মহাভারতের আলোচনাতেও নাটকীয় সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। একদিনের কথা। স্বামীজী সেদিন

১ লোকমাতা নিবেদিতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, পৃঃ ৪২৭

২ Letters of Sister Nivedita Vol. II, Ed. S. P. Basu, p. 661

রামায়ণের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন। লঙ্কাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। শবপরিকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে আসছেন মন্দোদরী। শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর পারিষদবর্গ অপেক্ষা করে আছেন সেই মহান সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। মন্দোদরী সকলকে বিস্মিত করে ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালেন—সাধারণ হিন্দুবিধবার পোশাকে আবৃত এক অতি সাধারণ নারীরূপে। বিস্মিত রামচন্দ্র প্রশ্ন করলেন বিভীষণকে, 'কে এই নারী'—উত্তরে বিভীষণ বললেন, 'মহারাজ, ইনিই সেই সিংহিনী যাঁর সিংহ এবং শাবকগুলিকে আপনি হরণ করেছেন।' উচ্ছ্বসিত নিবেদিতার সেই মুহূর্তে যেমন ভারতীয় নারীত্বের মহৎ আদর্শের কথা মনে হয়েছে তেমনি মনে হয়েছে শেক্সপীয়ার এবং গ্রীক নাট্যকারদের কথা। সমগ্র ঘটনাটি উল্লেখ করে তিনি শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে লিখেছেন: "Oh Yum, what ideals of womanhood Swami holds. Surely no one, not even Shakespeare or Aeschylus when he wrote of Antigone or Sophocles when he created Alcestis had such a tremendous conception. As I read over the things he has said to me of them and as I realise that it is all, every word of it, a trust for the woman of the whole world's future".৩

এমনি আলোচনা কালেই স্বামীজী নল-দময়ন্তীর কাহিনী বলেছেন, রানী পদ্মিনী ও চিতোরের গৌরবগাথা শুনিয়েছেন—পরবর্তী কালে নিবেদিতা সেগুলির ইংরেজী নাট্যরূপ অভিনয়ের জন্যে ইংলণ্ডের নাট্যপ্রযোজকদের উৎসাহিত করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্যকুশলতা সম্পর্কে স্বামীজী উচ্চধারণা পোষণ করতেন। গিরিশের নাটকের কিছু কিছু অংশ তিনি নিবেদিতাকে মুখে মুখে অনুবাদ করে শোনাতেন। বাংলাদেশে চৈতন্যের আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 'চৈতন্যলীলা'র একটি পুরো দৃশ্যসংলাপ তিনি তর্জমা করে শুনিয়েছেন। আর একদিন 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের কাহিনী শোনানোর কথাও জানতে পারি নিবেদিতার বিবরণী থেকে।৪ স্বভাবতই এই কাহিনীগুলি এবং ভারতীয় নাট্যকলা ও তার সম্ভাবনা সম্পর্কে নিবেদিতার মনে একটি দৃঢ় ধারণা এর মধ্য হতেই গড়ে ওঠে।

২

স্বামীজীর জীবিতকালেই বাংলাভাষার সঙ্গে পরিচয়ের পর নিবেদিতা হাত দিয়েছেন গিরিশ-চন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অনুবাদে। ৯ জানুআরি ১৮৯৯ নিবেদিতা একটি পত্রে শ্রীমতী ম্যাক-লাউডকে জানাচ্ছেন: "I have begun to translate Mr. Ghose's 'Mad Woman'." নমুনা হিসাবে তিনি 'বিল্বমঙ্গল' (নিবেদিতা নাটকটির একটি প্রধান চরিত্র পাগলিনীর নামেই বোধ হয় নামকরণ করতে চেয়েছিলেন) নাটকের প্রথম গানটি ('ওঠা নামা প্রেমের তুফানে') পাঠিয়েছেন। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই যে তিনি অনুবাদ শুরু করেছিলেন সেটা বোঝা যায় নিবে-দিতার কথায়—"I wish Swami were here to translate it". শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে চিঠি লেখার চারদিন আগে শ্রীমতী এরিক হ্যামণ্ডকে নিবেদিতা লিখেছিলেন: "বাংলায় অগাধ ঐশ্বর্য খুঁজে পাচ্ছি। যদি মিঃ হ্যামণ্ড বাংলাটা শিখে নিতেন তাহলে অনুবাদের কাজে বেশ ভাল উপার্জন করতে পারতেন। আমি একটি নাটক অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছি।…সবদিক থেকে এই নাটকটি ইবসেনের 'ব্র্যাণ্ড' নাটকের সমকক্ষতা

৩ Letters Vol. I, p. 222

৪ Complete Works of S. Nivedita, Vol. I pp. 361-70

দাবী করতে পারে।"[৫] অবশ্য শেষ পর্যন্ত পুরো নাটকটি তাঁর পক্ষে অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর অ্যানিবেশান্ত সম্পাদিত লুসিফার (Lucifer) পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্র থেকে 'বিল্বমঙ্গল' নাটকের অনুবাদ সম্পর্কে জানা যায়—"an able rendering into English by a veteran educationist with kind revision by Late Sister Nivedita." সুতরাং 'বিল্বমঙ্গল' নাটক নিবেদিতা সম্পূর্ণ অনুবাদ না করলেও তা সংশোধন সূত্রে নাটকটির প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ প্রকাশ করে গেছেন।

শুধু অনুবাদই নয় তৎকালীন ইউরোপের নাট্যকলার সঙ্গে নাট্যকারদের পরিচিত করে দেবার ভারও গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ইতিপূর্বে ইবসেনের 'ব্র্যাণ্ড' নাটকটির কথা জেনেছি—যাকে গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে একাসনে স্থাপন করেছেন তিনি। গিরিশচন্দ্রের হাতে 'ব্র্যাণ্ড' নাটকটি তুলে দিয়েছিলেন নিবেদিতা এবং সে নাটক পড়ে অভিভূত গিরিশচন্দ্র খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতীয় চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন যা তাঁকে অতিমাত্রায় বিস্মিত করেছিল।[৬] এর পর ইবসেন-অনুরক্ত গিরিশচন্দ্র নিবেদিতার জন্যে সংগ্রহ করে এনেছেন ইবসেনের 'মাস্টার বিল্ডার'।

ইবসেনের 'ব্র্যাণ্ড' নাটক এবং ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। 'ব্র্যাণ্ড' রচনার পূর্বে ইবসেন অন্ততপক্ষে দশখানি নাটক লিখেছেন, কিন্তু কোনটিতেই সাফল্য লাভ করতে পারেননি। দারিদ্র্য ও হতাশায় তখন তিনি ভেঙে পড়েছেন। ছেঁড়া, ময়লা পোশাক পরা মাতাল ইবসেন তখন সকলের অনুকম্পার পাত্র। এই সময়েই (১৮৬৬) তাঁর 'ব্র্যাণ্ড' প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন তুলল নরওয়ের নাট্যজগতে। তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তাঁর চেহারা, হাবভাবে এল দারুণ পরিবর্তন—এমনকি তাঁর হাতের লেখার ধরনও তিনি পালটে ফেললেন। সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হিসাবে তাঁর জন্ম দিল এই নাটকটি। আর একটি কারণেও 'ব্র্যাণ্ডে'র সমধিক মূল্য—তা হল এই নাটক রচনার পশ্চাতে নাট্যকারের অনুপ্রেরণা। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ডেনমার্ক প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হয় তখন নরওয়ে ও সুইডেন তার সাহায্যার্থে এগিয়ে যায়নি—জাতীয় অক্ষমতা জনিত নাট্যকারের লজ্জা এবং ক্ষোভই এই নাটকটির উৎস। এই পটভূমিকায় নাটকটিতে বিবেক ও নীতির যে নবমূল্যায়ন নাট্যকার করেছেন তাতেই এটি সমকালের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় নাটকরূপে চিহ্নিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই কারণেই নাটকটি নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করেছিল এবং গিরিশচন্দ্র ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়ে অভিভূত হয়েছিলেন। 'ব্র্যাণ্ড' সম্পর্কে ইবসেন তাঁর প্রকাশককে লিখেছিলেন (১৮৬৬, মার্চ ১৬) : "I feel, it was my life's task to use the gifts which God has given me to wake my countrymen out of their lethargy to see the direction in which the great problems of life are pointing."[৭]

নিবেদিতা শুধু গিরিশচন্দ্রকে 'ব্র্যাণ্ড' পাঠ করিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিলেন বলে মনে করি না, কারণ এই ঘটনার দু-বছর পরে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন 'সৎনাম'—স্বামী জগদীশ্বরানন্দের সাক্ষ্য

৫ Letters, Vol. I, p. 36

৬ Letters, Vol. I, p. 39

৭ From Introduction of "Brand"—Translation & introduction by G. M. Gahtorne Hardy.

অনুযায়ী নিবেদিতারই অনুরোধে।[৮] স্মরণ রাখা দরকার 'সৎনাম'-ই গিরিশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক যার মধ্যে দেশচেতনার পুনর্জাগরণই মূল বক্তব্য এবং সে নাটক রচনার প্রেরণাদাত্রী নিবেদিতা।

এই নাটকের মধ্যে 'ব্র্যাণ্ডে'র প্রভাব কতখানি সেটাই বিচার্য।

'সৎনাম' ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হলেও রচিত হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। রিহার্সাল শুরু হবার পর 'গুলসানা' চরিত্রাভিনেত্রীর মৃত্যুতে নাটকটির অভিনয় স্থগিত থাকে এবং ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রিল 'ক্লাসিক' থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।[৯] ইতিহাসাশ্রিত এই নাটকের কাহিনী-উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল আরঙ্গজেবের শাসনকাল অবলম্বন করে। আরঙ্গজেবের তীব্র হিন্দুবিদ্বেষের মূলে ছিল হিন্দুসমাজের অধঃপতন ও জড়তা। 'সৎনামী' সম্প্রদায়ের উদ্ভব এরই প্রতিক্রিয়া। বলা বাহুল্য, উনিশ শতক বা বিশ শতকের প্রারম্ভে সাধারণতঃ দেশাত্মবোধক নাটক বা উপন্যাসে (বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' স্মর্তব্য) ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদ স্বাভাবিক কারণেই মুসলিম শাসনকালকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এবং মুসলিমবিরোধী চেতনার অন্তরালে প্রকৃত-পক্ষে সমকালীন ব্রিটিশ শাসকবর্গ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদই আত্মগোপন করে থাকত। 'সৎনামে' ইতিহাসের যে সময়কে নাট্যকার গ্রহণ করেছেন সে সময়ও হিন্দুর ভ্রান্ত ধর্মবোধ ছিল সামাজিক ঔদাসীন্যের কারণ, যা আমরা দেখতে পাই ইবসেনের 'ব্র্যাণ্ড' নাটকের কাহিনীতে। ইবসেনের নাটকের নায়ক চরিত্রের নাম ব্র্যাণ্ড। জীবনের সঙ্গে ধর্মের সংযোগ সূত্রটিকে সে অন্বেষণ করেছে। অধঃপতিত সমাজে সেই সূত্রটিকে খুঁজে পায়নি বলেই তার চিত্ত বিক্ষোভ। বন্ধু Ejnar-এর ঈশ্বরধারণাকে বিধ্বস্ত করে সে বলেছে :

"I scarcely know whether I am a Christian ; but I am certain of this, I am a Man ; and I am certain I can see the flaw that has drained the marrow out of this country···

"···But this God is not mine ! Mine is a storm where yours is a wind ; inexorable where yours is deaf. All-loving where yours is dull of heart. He is young as Hercules ; not an old God-father of sixty ! His is voice that pealed forth with lightning and terror when he stood before Moses like a fire in the thornbush on Mont Horeb, a giant before dwarfs.···(he) did wonders without number and would do them still, if this generation were not slack like you."

বন্ধু Ejnar ব্যঙ্গ করে বলেছে : "And now this generation is to be regenerated."

এর উত্তরে ব্র্যাণ্ডের সত্যের প্রতি নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ভাসিত তার প্রবল ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাস : "It will, mark you ; I am certain—I know—that I am come into the world to heal the sickness and its flaws."[১০]

'সৎনাম' নাটকে গিরিশ পরিকল্পিত 'ফকীররাম' চরিত্রটি ব্র্যাণ্ড অনুসারী, তবে সে

৮ Girish Ghose And His Dramas—Swami Jagadiswarananda, p. 57

৯ রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত, পৃঃ ৩৬০

১০ Brand—Henrik Ibsen, Act I

চরিত্রের সংলাপ বা ব্যক্তিত্ব পরিচয়ে তাঁকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়নি—তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই তুলে এনেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত গিরিশচন্দ্রের দুখানি নাটকেই ('ভ্রান্তি' ও 'সৎনাম') দেখতে পাই সদ্য লোকান্তরিত বিবেকানন্দের ছায়া। 'সৎনাম' নাটক রচনার অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন নিবেদিতা মারফত ইবসেনের কাছ থেকে কিন্তু উপাদান সংগ্রহ করেছেন 'নিজ অন্তঃপুর' থেকেই। শুধু ফকীররাম নয়, ব্র্যাণ্ডচরিত্রকে গিরিশচন্দ্র দ্বিধাবিভক্ত করেছেন এবং সমাজের পুনরুজ্জীবনে ঈশ্বরপ্রেরিত মানবীরূপে স্থাপন করেছেন বৈষ্ণবীকে—যার কণ্ঠে শুনি :

…নহে মম নিষ্ফল জীবন
কৌমারী কিঙ্করী এই হের উন্মাদিনী
হৃদে মম জাগেন ঈশ্বরী,
শক্তি দান করিবেন শক্তি সঞ্চারিণী·[১১]

এ নিবেদিতা চরিত্রেরই ছায়া।

৩

ভারতের বিজ্ঞান, সাহিত্য, নাটক, চিত্রকলা —এক কথায় ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় স্থাপনা ছিল নিবেদিতার অন্যতম সঙ্কল্প। বিশ্বকে যেমন তিনি ভারতবর্ষের কাছে এনেছেন, ভারতবর্ষকেও নিয়ে যেতে চেয়েছেন বিশ্ববাসীর দরবারে। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের সম্পদ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ছিল সুদৃঢ়। স্যর ফ্রাঙ্ক রবার্ট বেনসন ছিলেন সমকালের শেক্সপীরিয় নাট্যরীতির এক প্রখ্যাত প্রযোজন-অভিনেতা। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর নিবেদিতা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁকে একটি পত্রে লিখেছিলেন :

"ইংলণ্ডে নাটকের জন্য আপনার কার্যাবলী আপনাকে জাতীয় সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে তাই কোনও রকম formality-র রীতি না-মেনেই আপনার সকাশে উপস্থিত হওয়া সঙ্গত মনে করি। তা ছাড়া শ্রীমতী ম্যাকলাউড ও শ্রীলার্জের কাছে শুনেছি, আপনি ভারতীয় নাটক সম্পর্কে অনুসন্ধান করছেন এবং অনেক কিছু সংবাদ পেয়েছেন যা বিশ্বস্ত নয়। এই দুই কারণ আমার এই পত্র প্রেরণের কৈফিয়ৎ।"

পত্রে নিবেদিতা বেনসনকে জানিয়েছেন ইতিপূর্বে ইংলণ্ডে শ্রীলার্জের সঙ্গে আলোচনা কালে তাঁর 'Cradle Tales of Hinduism'-এ বর্ণিত 'নল-দময়ন্তী' কাহিনী নাট্যায়িত করতে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। নিবেদিতা বেনসনকে পাঠিয়েছেন উইলিয়াম জোন্সের অনুবাদ নাটক 'শকুন্তলা'—সেই সঙ্গে 'নল-দময়ন্তী' কাহিনীর মধ্যে যে নাট্যসম্ভাবনা আছে তার উল্লেখ করেছেন। 'শকুন্তলা' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন : "১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের এই old-fashioned translation-টি সম্ভবত জার্মেনীতে অভিনীত হয়েছিল।" 'শকুন্তলা' নাটক অভিনয়ের অসুবিধা সম্পর্কে বলেছেন নাটকটি "rather long-winded and heavy." সাধারণভাবে ভারতীয় নাটক যে পাশ্চাত্য জগতে গ্রহণের অসুবিধা আছে তা উল্লেখ করে নিবেদিতা লিখেছেন : "Nor is it easy for us to feel the charm of characters moulded on social demands so different from our own. Again, a great deal of the fascination of an Indian drama depends on a true suggestion of the charm of Nature, and on beauty of jewels and costume. The last element is extraordinary in its appeal—specially in the palace scenes."

খাঁটি ভারতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতে গিয়ে নিবেদিতা বলেছেন : "ভারতীয় নাটক

১১ সৎনাম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ১ অঙ্ক, ৪ গর্ভাঙ্ক

এই দেশের বিশাল মহাকাব্য থেকে উদ্ভূত, অল্প বিস্তর পূর্বপ্রস্তুতিহীন রচনা, যেগুলি দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যক্রমে অনুভূতিপ্রবণ কবি, অভিনেতা এবং আবৃত্তিকারেরা রচনা করেছেন।

"দেশটি এখনও, যখন গ্রামের সব কিছু ক্ষয়িষ্ণু, নাটকীয় অভিব্যক্তিতে সমৃদ্ধ। কিন্তু এগুলি প্রধানত 'অকেসিন ও নিকোলিট'[১২] ধরনের রচনা যাতে একদল গাইয়ে[১৩] গান গেয়ে বা কথা বলে কাহিনী বর্ণনা করে যান।" নিবেদিতা এই রীতিটির নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করেছেন 'নল-দময়ন্তী'র অন্তর্গত ঘটনাটি, যেখানে নল প্রেরিত ব্রাহ্মণ দময়ন্তীর কাছে সঙ্গীতের মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

বেনসনের কাছে নিবেদিতা গল্পের কাঠামো হিসাবে পাঠিয়েছিলেন স্বরচিত 'ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম' গ্রন্থটি। লিখেছিলেন: "The Ramayana has been prolific of dramatic versions, you will find it summarised here. I don't know whether my book will give you any hint of a fact that to my mind baffles expression, the exquisite beauty of Indian idealism."

ভারতীয় আদর্শবাদের মধ্যে নাট্যরসের যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি: "ভারতের মানুষ সেন্ট ফ্রান্সিসের মতো দারিদ্র্যকে আদর্শায়িত করতে পারে এবং আমার মতে, তার মধ্যেই আছে কাব্য ও নাটকের অফুরন্ত উৎস।"

এই চিঠিতে নিবেদিতা 'নল-দময়ন্তী' সম্পর্কেই বেশি উৎসাহ প্রকাশ করলেও আর একটি কাহিনীর নাটক সম্ভাবনার কথা জোরের সঙ্গে বলেছেন। তাঁর মতে গিলবার্ট মারেকে[১৪] দিয়ে লেখানো সম্ভব হলে গ্রীক ট্রাজেডি ধরনের নাটক লেখারও উপযুক্ত উপাদান ভারতীয় সাহিত্যে আছে। গ্রীক ট্রাজেডি 'ট্রোজান ওম্যান'[১৫]-এর অনুসরণে 'দি ওম্যান অব চিতোর' অবশ্যই সফল হবে। নিবেদিতা চিতোরের বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন: "পাহাড়-চূড়ায় অবস্থিত এক অপূর্ব সুন্দর দুর্গ-নগরী। ওয়াল্টার স্কটের মতো কারও পক্ষেই সে নগরীর সৌন্দর্য বর্ণনা সম্ভব। ট্রয়ের মতোই চিতোরের পতন হয়েছিল। সেখানকার অধিবাসীরা শপথ নিয়ে গৈরিক বসন পরে যুদ্ধে গিয়েছিল—নিয়ম ছিল, যুদ্ধ থেকে না ফেরার (যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান)। একে বলা হয় বীর সন্ন্যাস। আর নারীরা স্তম্ভে উঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল আগুনে (ঝাঁপ দিয়ে)।…পদ্মিনী ছিলেন প্রধানা সম্রাজ্ঞী—তাঁর রূপের খ্যাতিই—চিতোর অবরোধের কারণ। তাঁকে মাঝে মাঝে ভারতের হেলেন বলে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু হেলেনের সঙ্গে তার কতই না পার্থক্য!"

ভারতীয় ও গ্রীক জীবনদৃষ্টির পার্থক্য বোঝাতে নিবেদিতা লিখেছেন: "Even Andromache, wailing for Hector and giving

১২ 'Aucassin and Nicollete'—লেখক অজ্ঞাত। ফরাসী রোমান্স জাতীয় রচনা। যুবক অকেসিন তার পিতামাতার বিরোধিতা সত্ত্বেও সারাকান বালিকা নিকোলিটের প্রেমাসক্ত। নিকোলিটকে অবরুদ্ধ করা সত্ত্বেও সে গোপনে মুক্তি পেয়েও এক ডাকাত দলের হাতে পড়ে। অবশেষে জানা যায় সে কার্থেজ রাজের হারানো কন্যা। নিকোলিট ছদ্মবেশে ফ্রান্সে ফিরে আসে এবং অকেসিনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়।

১৩ নিবেদিতা 'minnesinger' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ একশ্রেণীর জার্মান লিরিক কবি এবং গায়ক (দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী)।

১৪ অধ্যাপক গিলবার্ট মারে গ্রীক নাটক-ব্যাখ্যাতা হিসাবে বিশেষ পরিচিত।

১৫ ইউরিপিদেস রচিত গ্রীক ট্রাজেডি।

her boy to be murdered, while foreseeing a different future, is—beautiful and attractive as She is—unthinkable and abhorrent to the Indian genius. The Greek seems to have been hampered by his belief in death. The Indian has always defied it."[১৬]

টডের 'রাজস্থান' পড়তে পড়তে নিবেদিতা বারবারই ভারতীয় শৌর্য, সৌন্দর্য ও মহত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে নাটকীয় সম্ভাবনার দিকটিও তাঁর কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখানেই পেয়েছেন মীরাবাঈকে, রাণা প্রতাপকে, কৃষ্ণকুমারীকে, যিনি নিবেদিতার দৃষ্টিতে "আধুনিক ইফিজেনিয়া।"[১৭]

নিবেদিতা বেনসনের কাছে লিখিত পত্র শেষ করেছেন ভারতীয় নাট্যকাহিনীর সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীর আস্থা প্রকাশ করে :

"জানি না, আমার এই Suggestion থেকে আপনি কিছু পাবেন কিনা, কিন্তু কামনা করি আপনি কিছু পান।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন না একদিন, এর তীব্র আকর্ষণ অনুভব করবেন এমন কেউ যিনি 'ওম্যান অব চিতোর' লিখবেনই।"

নিবেদিতার চিঠি হয়তো বেনসনের কাছে পৌঁছেছিল, কিন্তু তাঁর প্রেরিত উপহারের বইগুলি (যার মধ্যে ছিল 'শকুন্তলা' ও 'ক্র্যাডল টেলস্ অব হিন্দুইজম') তাঁর জীবিতকালে যে পৌঁছয়নি তার প্রমাণ পাই শ্রীমতী ম্যাকলাউডের ৩ নভেম্বর, ১৯১১-র চিঠিতে :

"বইয়ের প্যাকেটটি শ্রীবেনসনের কাছে মার্গট প্রেরিত উপহার। সুতরাং আর কিছুদিন এটি সতর্কতার সঙ্গে রেখে দিন। সে আমাকে ৭ সেপ্টেম্বর শেষ চিঠি লেখার আগে[১৮] শ্রীবেনসনকে তিন পৃষ্ঠা চিঠি দিয়েছে।

"আজ দার্জিলিঙ থেকে ডক্টর বোসের ১০ অক্টোবরের চিঠি পেলাম। তাতে বলা হয়েছে মার্গট গুরুতর অসুস্থ এবং তার জন্যে প্রার্থনা জানাতে। তারপর তিনদিনের মধ্যেই সে চলে গেছে।"

ভারতীয় নাটক সম্পর্কে নিবেদিতার অনুরাগলিপ্ত পত্রের সঙ্গে প্রেরিত উপহার হয়তো পরে একদিন বেনসনের কাছে পৌঁছেছিল, কিন্তু যিনি সমস্ত সত্তা দিয়ে ভারতের সংস্কৃতিকে ভালবেসেছিলেন, ভারতীয় নাটকের সমৃদ্ধি ছিল যাঁর ব্রত, তাঁর জীবননাট্যের সমাপ্তির পর শূন্য রঙ্গমঞ্চে আর কে প্রবেশ করবেন!

১৬ ট্রয় যুদ্ধের পর হেকটরের স্ত্রী আন্দ্রোমাখেকে নেওপতোলেমুসের দাসীরূপে প্রেরণ করা হয় এবং হেকটরের শিশুপুত্রকে হত্যা করা হয়। 'ট্রোজান ওম্যান' নাটকে এ কাহিনী বর্ণিত।

১৭ Iphigeneia—ইউরিপিদেস রচিত দুখানি নাটক Iphigeneia in Aulis এবং Iphigeneia in Tauris নাটকের নায়িকা চরিত্র। নিবেদিতা প্রথম নাটকটির নায়িকার কথাই উল্লেখ করেছেন।

১৮ বেনসনের চিঠির তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর। পত্রাবলীতে দেখছি নিবেদিতা ম্যাকলাউডের কাছে শেষ চিঠি লিখেছেন একই দিনে অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর।

সুফিদর্শন-প্রসঙ্গে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

[খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী, সাংবাদিক, চিন্তাশীল জনপ্রিয় লেখক—'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিযুক্ত।]

সুরা ও সাকি

ওমর খৈয়ামের সঙ্গে ইউরোপ এবং আমাদের পরিচয় উনিশ শতকে এডোয়ার্ড ফিটজিরাল্ড মারফত। কিন্তু ফিটজিরাল্ডের ওমর বেহেড মাতাল এবং দুর্দান্ত প্রেমিক এক কবি, যিনি ঘোর অদৃষ্টবাদী—তাই তাৎক্ষণিকতার অনুগামী, কতকটা চার্বাকপন্থীও। অসামান্য প্রতিভাধর এক পারসিক গণিতবিদ্, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও মরমী সাধক কবির মৃতদেহে ফিটজিরাল্ড নিজের ভূতটিকে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাঁর ক্ষমতাও অবশ্য কম নয়।

অনেকের মতে কবিতার ট্রান্সলেসন হয় না, ট্রান্সক্রিয়েশন হতে পারে এবং এতে আমার অন্তত দ্বিমত নেই। তাই শুদ্ধ কবিতার দিক থেকে হয়তো ফিটজিরাল্ড ক্ষমার্হ। কিন্তু ওমর-হত্যার পাতক থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাবেন কিনা সন্দেহ, মহাকালের কাছে। কারণ ওমরের কবিতা আসলে এক দার্শনিক মতবাদের সাকার বিগ্রহ।

ওমর খৈয়াম মানেই সুরা ও সাকি, এই ধারণার জন্য প্রাথমিকভাবে ওই ভিক্টোরীয় ভদ্রলোক দায়ী হলেও বাকি সবটাই আমাদের রোমান্টিক কল্পনাবৃত্তির তুখোড় কারচুপি। তাছাড়া রমণী সম্পর্কে মধ্যযুগীয় সংস্কারের জের অবচেতনায় ক্রিয়াশীল। পুরুষশাসিত সমাজে ভোগী পুরুষের চোখে প্রেমিকার বিমূর্ত সত্তা খৈয়ামী সাকিতে মূর্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল—যে প্রেমিকা তার মুখে সুরা ঢেলে দেবার জন্য সুরাহি নিয়ে সতত পার্শ্বচারিণী। সে যেন ক্রীতদাসী, ব্যক্তিত্ববিহীন নিছক রমণী।

বাংলায় আমরা এই সাকিকে সখিরূপেই দেখেছি। তন্বীশ্যামাশিখরদশনাপক্কবিম্বাধরোষ্ঠী পীনোন্নতপয়োধরা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা বলি-ব্যাকুলা দয়িতারূপিণী। কিন্তু হায়, কে জানত 'সাকি' সরাইখানার শরাবপরিবেশক বালকভৃত্য! 'বয়' ব্যাপারটা এই সাকি-ট্রাডিশান থেকেই উদ্ভূত। এ ট্রাডিশানের শেকড় খুঁজলে মিলবে সারা পশ্চিম এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের দেশে সুপ্রাচীন যুগে এবং ব্যাপারটা অশালীন। বাইবেল এবং কোরানে এই বিকৃত পচনশীল ট্রাডিশানের শহর সডোম ঐশ্বরিক শাপে ধ্বংস হওয়ার গল্প আছে।

ওমরের কবিতার শরাব ও সাকি নিছক রূপক এবং তাঁর এসব রুবাই (চতুর্দশপদী) সমগ্র রচনার খানিকটা অংশ মাত্র। আসলে ওমর তাঁর কবিতায় এক অধ্যাত্মচিন্তাকেই শরীর দিয়েছেন। শরাব পরমজ্ঞান এবং সাকি মানব-জীবন। ওমর বলেছেন, 'অন্তত যা কিছু কুড়োতে পার, কুড়িয়ে নাও। খালি হাতে গেলে লোকসান বই লাভ নেই।' অর্থাৎ জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা। ওমর পরমজ্ঞান সংগ্রহে মানবজীবনের সাহায্য ও সাহচর্য চেয়েছিলেন এবং তাঁর এই দার্শনিক প্রত্যয়টি সমকালীন এক জটিল ও বিশাল দর্শন-ভাবনার ঐতিহাসিক ভূমিতে জাত। সেই দর্শন-ভাবনার নাম সুফিবাদ।*

* ওমরের কবিতার মূলানুগ অনুবাদ রবার্ট গ্রেভস করেছেন ১৯৬৭ সালে ওমর আলি শাহের সহযোগিতায়। সুফিদর্শন বুঝতে বইটি সাহায্য করে। প্রকাশকের নাম মনে নেই।

সুফিবাদের উৎস

সুফিবাদ সম্পর্কে ইউরোপে প্রচণ্ড গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। পণ্ডিতরা বিশ্বের তাবৎ দেশের প্রাচীন দর্শনভাবনা, অকাল্ট বা গুপ্তবিদ্যা, ভারতীয় বেদান্ত, ভক্তিবাদ, যোগ, তন্ত্রসাধনার মধ্যেও সুফিবাদ আবিষ্কার করেছেন। এমন কী শেক্সপীয়ার, ফ্রয়েড, য়ুং, চসার, দান্তে, হানস অ্যাণ্ডারসন—সবেতেই সুফিতত্ত্বের নির্যাস খুঁজে পেয়েছেন। পাওয়ারই কথা। কারণ সুফিবাদের মূলে আছে মানুষের হাজার-হাজার বছরের পুরোনো একটা মৌলিক প্রশ্ন, যে প্রশ্নে মানুষ নিরন্তর জর্জরিত: আমি কে? সুফিবাদী ওমরের কবিতায় আছে: 'প্রতিটি চক্রান্ত আমাকে ঘিরে—আমি তো আমারই। আমি যা, আমি তাই।' এই মৌলিক প্রশ্নেরই আর একটি সাফ-সাফ জবাব রবীন্দ্রনাথে পাই: 'আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ।' আমি আছি, তাই বিশ্বজগৎ আছে। যা কিছু ঘটছে, তা আমাকে কেন্দ্র করে। অদ্বৈতবাদী দর্শনে তারই এক চরম উচ্চারণ: সোঽহম্। এবং সুফি মনসুর হাল্লাজের মৃত্যুকালীন উক্তিতে তারই অবিকল প্রতিধ্বনি: 'আনাল হক্।' আমিই সত্য, আমিই ঈশ্বর। সুফি দার্শনিক ইবনে-আল-ফরিদ বলেছিলেন, 'দ্রাক্ষালতা সৃষ্টিরও আগে আমি দ্রাক্ষারস পান করেছি।' আমি—এই সত্তাকে শাশ্বত সত্যের প্রতীক করে তোলাই সুফিবাদের লক্ষ্য। কখনও সুফিদের দর্শনচিন্তায় 'আমি' উপনিষদের সেই পরমাত্মা। জীবাত্মা এই মানবজীবন—দেশকালে বিধৃত এবং ঐতিহাসিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ওমর খৈয়ামের সাকি সে।

সুফি শব্দের উৎস বা ব্যুৎপত্তি নিয়ে পাণ্ডতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ। কেউ বলেন, সুফিবাদের জন্ম ইসলামপ্রবর্তক হজরত মোহাম্মদের সমকালেই। ইসলামী অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যে তার বীজ ছিল নিহিত। তাঁদের মতে 'আসহাব-উস-সাফা' (Companions of the Bench বা সোজা কথায় সভাসদ্বর্গ) থেকে সুফি শব্দের জন্ম। হজরতের প্রায় সমকালীন সাধক হাসান বসরির অদ্বৈতবাদী ভাবনায় এর পরোক্ষপ্রমাণ মেলে। আবার কেউ বলেছেন, সুফ অর্থাৎ পশম থেকে সুফি। খ্রীস্টান সাধুরা মোটা পশমের আলখেল্লা পরতেন। মুসলিম সাধুরাও দেখাদেখি সুফের আলখেল্লা পরেন এবং তার ফলে সুফি আখ্যা পান।

আধুনিক পণ্ডিতরা কিন্তু 'সুফি'র উৎস সম্পর্কে অত্যন্ত যুক্তিবাদী অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন দুটি দিকে। একটি হল সুপ্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সফিস্টরা—Sophia বা Sophos (ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা) থেকে যে সফিজমের উদ্ভব, তার প্রবক্তা ছিলেন তাঁরা। ঠাট্টা করে এদের বলা হয় তর্কবিলাসী। দ্বিতীয় উৎসটি হল হিব্রু কাব্বালীয় তন্ত্রের Ain Sof—অর্থাৎ পরম অসীম। কাব্বালা-তন্ত্রের অনুগামীরা মনে করতেন, বাইবেলের বাক্যসমূহের অন্তর্নিহিত অন্য গোপন অর্থ আছে এবং সাধনায় সে অর্থ লভ্য। আশ্চর্য ব্যাপার, সুফিদেরও ধারণা, কোরানের বাক্যসমূহেরও গভীরতর গোপন অর্থ আছে, যা সাধকদেরই লব্ধ।

সুফিবাদ সম্পর্কে গবেষকদের অনেকে আরও পিছিয়ে গিয়ে প্রাচীন মিশরের পৌরাণিক সাধু (এবং দেবতাও) হার্মিস-সংক্রান্ত চিন্তাধারায়*

* মিশরীয় কিংবদন্তীর সাধু হার্মিস ছিলেন রাখালদের গুরু। চোরেরাও তাঁকে গুরু বলে মানত। গ্রীসে ইনি হন দেবাদিদেব। তবে মিশরেও পরবর্তী সময়ে তিনি দেবতা 'Thoth' হয়ে ওঠেন। রোমানরা হার্মিসকে বুধগ্রহ মনে করত হার্মিস থেকে হার্মিট শব্দ এসেছে। নির্জনে তপস্যারত সাধু বোঝায়।

এবং কেউ কেউ পিথাগোরাসের উক্তিতেও সুফিবাদের মূল আবিষ্কার করেছেন। তবে গ্রীক Sophos—যা থেকে থিওসফি কথাটার উদ্ভব, 'সুফি' শব্দের জনক হওয়ার মধ্যে যুক্তি আছে। সফিস্টদের আচার-আচরণ এবং চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে প্রথম যুগের সুফিদের অসামান্য মিল দেখা যাবে। (ফিলসফার শব্দের উৎসেও ওই Sophos) তাঁরা গ্রীক দার্শনিকদের মতোই পথে-ঘাটে তত্ত্ব প্রচার করতেন। সুফিদের চিন্তাধারায় যে বিশ্বব্যাপী উপাদান সংগ্রহের নজির ছড়িয়ে আছে, তাতে ভুল নেই। সুফিরাই কেউ কেউ গ্রীক পিথাগোরাস এবং কিংবদন্তী-খ্যাত সম্রাট সলোমন বা সোলেমান (বাইবেল ও কোরানে যাঁর কথা আছে)-কে গুরু বলেছেন। মোগল যুগে দারা শিকোহ্‌কে দেখা যাবে হিন্দু-গুরুর কাছে বেদান্ত শিখতে। কারণ সুফিবাদে বেদান্তের প্রতিধ্বনি আছে এবং দারা ছিলেন সুফি মতবাদের অনুগামী। আবার সুফিগুরুদের অ-মুসলিম শিষ্যও কম ছিলেন না। রুমীর শিষ্যরা কেউ ছিলেন খ্রীস্টান, কেউ জোরাস্ট্রিয়ান (জরু-থুস্টব্রবাদী), কেউ ইহুদি। কিংবদন্তীখ্যাত খিজির, সুফিদের এক গুরু, ইহুদি ছিলেন বলে শোনা যায়। সুফি 'সোহং'-বাদের প্রবক্তা মনসুর হাল্লাজ নিজেকে অনেক সময় খ্রীস্টান বলতেন। সুফিদের একটি গোষ্ঠীকে বলা হয় Spanish School এবং তাঁরা সবাই মুসলিম ছিলেন না। যেমন জুডা হালেভি, মোজেস বেন এজরা, যোশেফ বেন যাদিক, স্তামুয়েল বেন টিব্বন, সিমটব বেন ফালাকেরা। এঁরা ইহুদি এবং সুফিবাদী চিন্তাধারায় প্রবক্তা ছিলেন। কাব্বালীয় ত্ব থেকে সুফিবাদে ঝুঁকেছিলেন।

'-গব্বালীয় চিন্তাধারায় পণ্ডিতরা য় ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি আবিষ্কার গুস্তাফ য়ুংয়ের 'আদিপ্রতিমা' (Archetype)-তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিও সুফিবাদে দেখা গেছে। ইহুদি কাব্বালীয় তন্ত্র এবং ইহুদী মরমিয়া-বাদের প্রতি ফ্রয়েড কতটা ঋণী, তা অধ্যাপক ডেভিড বাকান 'Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition' (New York, 1958) বইয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে সুফিবাদী মনোবিশ্লেষণপদ্ধতি প্রতি-ধ্বনিত দেখে অবাক লাগে। অর্থাৎ সুফিরা চারদিক থেকে তত্ত্ব সংগ্রহ করে নিজেদের মূল দার্শনিক প্রশ্নটিকে বর্ণাঢ্য করে সাজিয়ে তুলেছেন।

সুফিদের একটি গোষ্ঠী গুপ্তবিদ্যা বা অকাল্টের প্রবক্তা। এঁদের সঙ্গে চীনা তাও ধর্ম, বৌদ্ধ এবং হিন্দু তন্ত্রবাদীদের অসামান্য মিল। মানুষের শরীরে এঁরা ব্রহ্মাণ্ড এবং পরমব্রহ্মকে খুঁজে পান। বাংলায় বাউল-ফকিরদের দেহতত্ত্বের গানে এই মতবাদ স্পষ্ট। বাংলার বাউলদর্শনে বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদর্শনের সঙ্গে তন্ত্রবাদ এবং রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব মিলেমিশে গেছে। কিন্তু সব ছাপিয়ে সুফিবাদকেই প্রকট হতে দেখা যাবে। বাউলগুরু লালন সুফিবাদী ছিলেন। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা, বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সুফিবাদেরই সারাৎসার যেন। কেউ কেউ সুফিবাদকেই রাধাকৃষ্ণ প্রেম-তত্ত্বের উৎসে স্থাপন করেছেন। সুফিদের একটি গোষ্ঠীর ইশ্‌ক্ (প্রেমজ সংরাগ) এবং মাশুক (প্রেমিক)-তত্ত্ব একই। তার চেয়ে আশ্চর্য, হিন্দু সাধিকা মীরাবাঈয়ের মতো এক মুসলিম সাধিকা রাবেয়া-আল-আদাউইয়া (মৃত্যু ৭১৭ খ্রীঃ) ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদজ্ঞানে উন্মাদিনী হয়ে ওঠেন।

প্রাচীন সুফিদের কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করলে বোঝা যাবে, সুফিবাদ ইসলামের অভ্যুদয়ের শুরু থেকেই অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং একাদশ শতাব্দী থেকে বিশাল বৃক্ষটি দেখা গিয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে বাদশাহী মদতে সুফিবাদ অভিজাত শ্রেণীর ধর্মবিলাসে পরিণত

হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত সুফিবাদ সহজিয়া। হাসান বসরী (বসরানিবাসী) হজরতের জামাতা আলির শিষ্য ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমি আছি। কিন্তু আমার থাকা ঝড়ের সমুদ্রে একটুকরো কাঠ আঁকড়ে ভেসে থাকার মতো।'

মিশরের জুন্নুন (মৃত্যু ৮৬০ খ্রী:) বলতেন, 'নীরবতাই সুফির অবস্থা বর্ণনা করতে পারে। পার্থিব যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্নতা তার কাম্য বলে সে পার্থিব বস্তুর সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত।'

রাবেয়া বলতেন, 'সুফির নরককে ভয় নেই, স্বর্গের প্রতিও লোভ নেই।'

জুনায়েদ (মৃত্যু ৯১০ খ্রী:) বলতেন, 'মানুষের সারাৎসারেই সুফির বসতি।'

পারস্যের সুফিকবি ওমর খৈয়ামে (মৃত্যু ১১২৩ খ্রী:) এইসব চিন্তারই বিরাট এক পরিণামকে প্রত্যক্ষ করা যাবে। 'এই ব্রহ্মাণ্ডবৃত্ত এক যেন অঙ্গুরীয় এবং আমরা সেই বৃত্তের গায়ে কারুকার্য মাত্র।'...

সুফি গোষ্ঠীসমূহ

সুফিরা মরমী সাধক। পরমসত্তার রহস্য-সন্ধানী। তাঁদের দর্শন মুখ্যত তিনটি School-এ বিভক্ত। ওয়াজুদিয়া, শহুদিয়া এবং ইজাদিয়া।

ওয়াজুদিয়া মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি সত্তাই অস্তিত্ববান এবং এই সত্তা ঈশ্বর। তাঁর বহুমুখী বিকাশ ঘটেছে। (এক থেকে বহু: উপনিষদ উল্লেখ্য) অরূপ নানারূপে ব্যক্ত।

শহুদিয়া মতে, বিশ্ব একটি দর্পণ এবং তাতে পরমসত্তার গুণাবলী প্রতিফলিত নানারূপে। এটি সর্বেশ্বরবাদী দর্শন। (এও উপনিষদে পাওয়া যাবে) জড়-অজড় সর্বভূতে স্থানকালব্যাপী ব্রহ্মের অস্তিত্বের স্বীকৃতিই শহুদিয়া স্কুলের সারকথা। কিন্তু ব্রহ্মের সেই অস্তিত্ব বিশ্বদর্পণের প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ শংকরাচার্যের (এমন কী প্লেটোরও) মায়াবাদ শহুদিয়া মতে প্রচ্ছন্ন।

ইজাদিয়া মতে, পরমসত্তা ও বিশ্ব পৃথক। অনস্তিত্ব থেকে পরমসত্তা অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব-অস্তিত্বকে। নেতি থেকে ইতির সৃষ্টি। কিন্তু স্রষ্টা ও সৃষ্টি আলাদা। হিন্দু দ্বৈতবাদী দর্শন তুলনীয়। পিথাগোরাস আত্মার বিচ্ছিন্নতা ও নিত্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ইজাদিয়াদর্শনও তাই বলে।

আদিখ্রীস্টানদের নাইসিনীয় গোষ্ঠীর Homoousian-তত্ত্বে পিতা (ঈশ্বর) এবং পুত্র (যিশু) অভিন্ন সত্তা। এঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী ছিলেন ইজাদিয়া স্কুলের অনুরূপ তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁরা পিতা ও পুত্রকে পৃথক সত্তা (Substance) মনে করতেন।

কিন্তু এতো গেল শুদ্ধ সুফিদর্শনের কথা। সুফিদর্শনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে চারজন সুফিগুরু চারটি সাধনপন্থা নির্দেশ করে গেছেন। এই গোষ্ঠী চারটির নাম: চিশতী, কাদিরী, নাখ্‌শ্‌বান্দী এবং সুহ্‌রাওয়ার্দী।

এছাড়া অপ্রধান কিছু গোষ্ঠী আছেন। তাঁরা পুরোপুরি সুফি নন। যেমন কালান্দরী, কুবরাভী, মেভলেভী। এঁরা শুধু দরবেশ নামেই খ্যাত। মাদারিয়া গোষ্ঠীও তাই।

চিশতীদের গুরু ছিলেন দশম শতকের সিরীয় সুফী খাজা আবু ইশহাক চিশতী। তাঁর মতবাদ থেকে সম্প্রদায় গড়ে ওঠে পারস্যের খোরাশান প্রদেশের চিশ্‌ত্‌ শহরে। তাই চিশতী পদবি। এঁরা বাঁশি এবং ঢোল বাজিয়ে লোক জড় করে মত প্রচার করতেন গাথা গেয়ে। (উল্লেখ্য, স্প্যানিশ শব্দ Chistu গানবাজনাসহযোগে কৌতুক বোঝায়। ইংরেজী Jester শব্দের সঙ্গে এর সম্পর্কও লক্ষণীয়। অবশ্য Jester-এর ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে ল্যাটিন Gerere-তে পৌঁছানো হয়েছে। কিন্তু সে নেহাত পণ্ডিতী কচকচি।)

কাদিরীদের গুরু আবদুল কাদির জিলানী

(মৃত্যু ১১৬৬ খ্রী:)। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে জিলান অঞ্চলের নিফ শহরের লোক ছিলেন। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের গল্প প্রচলিত আছে। ইনি গুপ্তবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন তান্ত্রিকদের মতো।

নাখ্‌শ্‌বান্দীদের (কারুকার্য বা নকশার মানুষ) গুরু ছিলেন খাজা বাহাউদ্দিন নাখ্‌শ্‌বান্দী (মৃত্যু ১৩৮৯ খ্রী:)। চিশতীদেরই একটি শাখা থেকে এই স্কুলের উদ্ভব।

সুহ্‌রাওয়ার্দীদের গুরু ছিলেন বারো শতকের সুফি দার্শনিক শেখ জিয়াউদ্দিন জাহির সুহরাওয়ার্দী।

সুফিদের আরও একটি সম্প্রদায়ের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ইংরেজী Asaassin শব্দটি ঘাতক অর্থে প্রচলিত। এর মূলে আছেন ক্রুসেডের যুগের সনাতনপন্থী মুসলিম 'আসাসিন'রা। মূল শব্দটির অর্থ সনাতনপন্থী। দশম শতকে হাসান বিন-সাবাহ্‌ নামে এক মুসলিম নেতা সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করে খ্রীস্টানদের সঙ্গে লড়াই করেন। এঁর পদবি ছিল শেখ আল-জাবাল অর্থাৎ পর্বতসমূহের নেতা। ইংরেজীতে তাঁকে বলা হত Old man of the mountain. এবং ভারতের ইসমাইলী খোজা সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু আগা খান তাঁরই বংশধর।

আসাসিনরা সনাতনপন্থী হলেও সুফি মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আমার সন্দেহ শব্দটির সঙ্গে হিব্রু হাসিদিন (ধর্মভীরু) শব্দের সম্পর্ক আছে। আরবি এবং হিব্রু ভাষাগোষ্ঠীতে ভাইবোন সম্পর্ক। খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধারা মনে করতেন, হাসানশিষ্যদের সাংঘাতিক মাদক খাইয়ে হত্যা-লীলায় প্রবৃত্ত করা হচ্ছে। আসাসিনদের সেই কল্পিত মাদক বহু পরবর্তীযুগে 'হাশিশ্‌' হয়ে গেছে। আসাসিন থেকেই হাশিশ্‌ শব্দ ইউরোপীয় অভিধানে ঢুকে গেছে। কিন্তু আরবি হাশিশ্‌ মানে গবাদিপশুর খাদ্য জলাভূমির ঘাস।...

সুফিদর্শনের সারাৎসার

আফগানিস্তানের জালালুদ্দিন রুমী (মৃত্যু ১২৭৩ খ্রী:), খোরাসানের হাকিম সানাই (চতুর্দশ শতক) এবং আল-গাজ্জালী (মৃত্যু ১১১১ খ্রী:), স্পেনের আল আরাবি (মৃত্যু ১২৪০ খ্রী:) প্রমুখ সুফি দার্শনিকরা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির অনুগামী ছিলেন। মনের বিভিন্ন স্তর এবং অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা বর্ণনা দিয়েছেন সাংকেতিক ভাষায়। এ পদ্ধতিকে আধুনিক Psychotherapeatic বলা যায়। বিভিন্ন মানসিক স্তরের অবস্থা ব্যাখ্যায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের (চতুর্মাত্রিক বিশ্ব) প্রয়োগ যেমন স্পষ্ট, তেমনি মহাকাশ ভ্রমণ এবং একালের Para-psychology-এর বিবিধ ঘটনা প্রকট। আধুনিক বিজ্ঞানের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়সমূহ (কিংবা অপবিজ্ঞানেরও) কীভাবে সুফিদের মাথায় এল? এ প্রশ্নের জবাব খুব সোজা। মানুষ যখন থেকে নিজের অবস্থা ও পরিবেশকে ছাড়িয়ে চিন্তা করতে শিখেছে, তখন থেকেই তার ভবিষ্যৎ বাস্তব সুনির্দিষ্টভাবে তৈরি হয়ে গেছে। সুপ্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় এভাবেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশাল ব্যাপ্তির ধারণা (ব্রহ্মার প্রতি রোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড), কালসম্পর্কে বোধ, মহাকাশ-যান, বিধ্বংসী ও ভয়ংকর অস্ত্রসমূহ—একালে যা বিজ্ঞানের এক্তিয়ারভুক্ত, প্রায় সবই দেখা গেছে। প্রাচীন মানুষ সম্পর্কে আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত আছে। অবশ্য একথা সত্য নয় যে, প্রাচীনযুগে মহাকাশযান বা পরমাণুবোমা বাস্তবত ছিল। সেটা অসম্ভব সবদিক থেকেই। কিন্তু মানুষের চিন্তায় তা ছিল। তা থেকেই কল্পনার বিস্তার ঘটেছে। সুফি দার্শনিক আল আরাবির উক্তি প্রণিধানযোগ্য: 'চিন্তাশীল মানুষের অস্তিত্ব চল্লিশহাজার বৎসর যাবৎ।' এ উক্তিতে সংখ্যা মানুষের চিন্তার কালগত ব্যাপ্তিকেই প্রকাশ করছে।

সুফি চিন্তাধারার অনুপ্রেরণা ও উপাদান ইসলামধর্ম এবং বহুলাংশে বাইরের উৎস থেকে সংগৃহীত হলেও সামগ্রিক সুফি-ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এর কেন্দ্রে আছে গোঁড়া ইসলামী শরিয়তপন্থী চিন্তার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। তার মানে, সুফিরা প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামের বিরোধী। সব দেশের মরমী সাধকরাই তাই। স্বয়ং হজরতের যুগে হাসান বসরী বলেছিলেন, 'ইসলাম কী এবং মুসলিম কারা? আমি বলব ইসলাম আছে কেতাবে এবং মুসলিমরা আছে কবরে।' এ একটা ক্ষুব্ধ জবাব নিঃসন্দেহে। হাসান শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ একরকম জিনিস; কিন্তু মানুষের বিরুদ্ধে পাপ জঘন্যতম।' শরিয়তকেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামে ঈশ্বর এবং মানুষের সংজ্ঞা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মানুষকে শয়তান-তাড়িত আত্মরক্ষা-তৎপর সত্তাহিসেবে সীমিত করা হয়েছে। কিন্তু সুফি দার্শনিক আবু-হাসান আল শাধিলি বলেছেন, "জ্ঞানের যাত্রা 'কে আমি' এই প্রশ্ন থেকে 'আমি জানি না কে আমি' এইদিকে।" আমি ঈশ্বরসৃষ্ট একজন মানুষ এবং বান্দা বা সেবক, একথা বললেই মানুষের কিছু বলা হয় না। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ইসলাম মানুষকে বান্দাতে সীমাবদ্ধ রাখে।

সুফিদের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধিতা কী ধরনের, তা বাঙালী সুফি লালন শাহের গানে প্রকাশিত হয়েছে স্পষ্ট করেই। 'তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজেদে।'

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্চলের বাউল চমৎকার শেখের একটা গান শুনেছিলাম। 'মরা মানুষ পড়ল ধরা শ্রীমতী ভাগীরথীতে।' বহতা মহাজীবনস্রোতে খণ্ডিত সীমাবদ্ধ ব্যক্তি-মানুষ মৃতের মতো ভাসমান। মানুষ সম্পর্কে এই ধারণা ইসলামবিরোধী।

ভারতে যে সুফি সন্তরা বাইরে থেকে এসেছিলেন, তাঁদের জীবনযাত্রা ধর্মাচরণ সবই ছিল প্রতিষ্ঠানবিরোধী। মুখ্যত এদেশে চিশতীদেরই প্রাধান্য বরাবর। চিশতী সুফিরা কেউ কেউ বাদশাহ-আমিরদের গুরু হয়ে ওঠেন। এখন তাঁদের সমাধি ঘিরে বিশাল ব্যাপার ঘটে। কিন্তু অসংখ্য সুফি সাধক সাধারণ মানুষের মধ্যে কাটিয়ে গেছেন। বহু জায়গায় তাঁদের নিরাভরণ সাদাসিদে সমাধি চোখে পড়বে। কোথাও সাঁজবাতি জ্বলে, কোথাও জ্বলে না। বহু সমাধি বা আস্তানা ধানক্ষেত বা জঙ্গলের তলায় নিশ্চিহ্ন। ভারতের মতো এত বেশি সুফির কবর কোন মুসলিম দেশেও দেখা যায় না। এর একটিই কারণ। ভারতে তাঁদের ওপর জুলুম হয়নি। ভারতের সহিষ্ণুতা, অপরকে আত্মসাতের শক্তি তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু মুসলিম দেশে তাঁদের প্রতি অত্যাচার এবং কঠোরতম শাস্তির দৃষ্টান্ত খুব সামান্য নয়। 'কখনও আমি মরুহরিণের রাখাল, কখনও খ্রীস্টান সাধু, কখনও জরুথুস্ট্রীয়। আমার পরম ভালবাসার পাত্র তিনজন। কিন্তু তারা একজনই। তিনের মধ্যে এক।' (ইব্‌ন্ আল আরাবি) এমন কথা বললে সনাতনপন্থী ইসলাম তা বরদাস্ত করতেই পারে না। এ-যুগের ঠাকুর পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের 'যত মত তত পথে'র প্রতিধ্বনি। আরাবির আরেকটি উক্তিতেও রামকৃষ্ণদেবের প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। "সুফি তিনটি 'আমি'কে ত্যাগ করেছে। 'আমার জন্য' বললে যে-আমি বোঝায় তাকে, 'আমার সঙ্গে' বললে যে-আমি বোঝায় তাকে এবং 'আমার সম্পত্তি' বললে যে-আমি বোঝায় তাকে।" নাখ্‌শ্‌বান্দীগোষ্ঠীর সুফিগুরু বাহাউদ্দিন বলেছেন, 'যা বহু ভাবছ, তা এক। যা ভাবছ সহজ, তা জটিল। যাকে জটিল ভাবছ, তা সহজ।' আবার রামকৃষ্ণদেবকে মনে পড়ে যায়।

বাংলার বাউলের এই গানটিতে স্বফিচিন্তার সর্বধর্মসমন্বয়কারী দিকটি লক্ষ্য করা যাবে।

'রাম কী রহিম করিম কালুল্লা কালা।
যারে মা ফাতেমা বলি
তিনিই হলেন দুর্গা কালী
তাঁর পুত্র কার্তিক গণেশ গো।
যেন হাসান-হোসেন মদিনায় করেন খেলা॥'

বোঝাই যায়, নিরক্ষর বাউলের রচনা। কিন্তু এই গানে আরাবি এবং বাহাউদ্দিনের তত্ত্ব ছাপ ফেলেছে। তবে নিরক্ষরতা-সাক্ষরতার প্রশ্নে মনে পড়ে যায় রুমীর এই প্রখ্যাত উক্তি:

'স্বফির কেতাব সাক্ষরতা নয় কিংবা অক্ষরও নয়। তা হল প্রকৃত বোধ বা আকল্ (আকল্ থেকে "আক্কেল" এসেছে)।' বৈষ্ণব সহজিয়া-সাধনার মধ্যেও এই সহজতার স্বর শোনা যাবে। তাঁদের মতো স্বফিরাও তাঁদের তত্ত্ব প্রচার করেছেন কখনও কবিতায়, কখনও গল্পে, কখনও নৃত্যগীতের মাধ্যমে। এসম্পর্কে গাজ্জালীর একটি গল্প বেশ মজার। 'এক শিষ্য স্বফিগুরুর কাছে স্বফিনৃত্যে যোগ দেবার অনুমতি চেয়েছিল। গুরু বললেন, তিনদিন নির্জলা উপবাস কর। তারপর উৎকৃষ্ট আহার্য প্রস্তুত কর। তারপর সেই আহার্য এবং নৃত্যের মধ্যে নৃত্যকে যদি বেছে নিতে পার, তবে তুমি অনুমতি পাবে।'

স্বফির আহার সম্পর্কে হারিস মুহাসিবি নামে স্বফি দার্শনিক বলেছেন, 'যদি কোন স্বফি দরবেশকে আপ্যায়িত করতে চাও, মনে রেখো, শুকনো রুটিই তাঁর জন্য যথেষ্ট।'

হাসান বসরী বলেছেন, "একদিন তাপসী রাবেয়াকে দেখতে গেলাম। দেখলাম, একদল জন্তু পরিবৃতা হয়ে তিনি বসে আছেন। কাছে যেতেই জন্তুরা পালিয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এ কী রাবেয়া! তোমায় ওরা ভয় করছিল না। অথচ আমাকে দেখেই যে পালিয়ে গেল।' রাবেয়া বললেন, 'মূর্খ হাসান! তুমি যে মাংস খাও। কিন্তু শুকনো রুটি ছাড়া আমি কিছু খাই না।'"

দার্শনিক আবু সাইদ বলেছেন, 'স্বফি হওয়া সহজ নয়। স্বফি হতে গেলে তোমার মাথার ভেতর যা আছে ফেলে এস। ফেলে এস কল্পিত সত্যকে। পরিত্যাগ কর পূর্বসংস্কার এবং শর্তাবলী। স্বফি হতে গেলে যা সব ঘটবে, তার মোকাবিলায় জন্য তৈরি হও আগে।'

তাপসী রাবেয়ার প্রার্থনা: 'হে প্রভু! যদি আমি নরকের ভয়ে তোমাকে চাই, আমাকে নরকে নিক্ষেপ কর। যদি স্বর্গলাভের বাসনা থেকে তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করি, তাহলে স্বর্গ আমাকে দিও না।' কারণ তাঁর কামনার বস্তু মীরার মতোই—ঈশ্বর

রাবেয়া ছিলেন এক ক্রীতদাসী নিগ্রো যুবতী। কাজুইনবাসী ধর্মগুরু সালিহ্-এর কাছে একদিন উপদেশ নিতে গেছেন। সালিহ্ বললেন, তাঁর দরজায় ক্রমাগত করাঘাত কর, দরজা খুলে যাবে। রাবেয়া বললেন, কী আশ্চর্য! দরজা তো তাঁর সতত উন্মুক্ত।…

স্বফি হাকিম জামী বলেছেন, 'বুদ্ধি এবং শিক্ষা-দীক্ষার পেছনে হন্যে হয়ো না। বুদ্ধি এক হয়রানি, শিক্ষাদীক্ষা নির্বুদ্ধিতা। শুধু বল, আমি কে?' আত্মানং বিদ্ধি

মনস্বর হাল্লাজ, যিনি স্বফিকুলশ্রেষ্ঠ এবং পরম-তত্ত্বের নির্ভীক প্রবক্তা, যখন শূলবিদ্ধ অবস্থায় শাস্তি ভোগ করছেন, তখনও তিনি বলছেন, 'আমাল হক্।' আমিই ঈশ্বর। সোঽহম্! যখন তাঁর ওষ্ঠ ছেদন করা হল, তখন কণ্ঠমূলে তিনি উচ্চারণ করছেন, সোঽহম। যখন তাঁর কণ্ঠমূল বিদ্ধ হল, তখন তাঁর চেতনায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আমাল হক্। সোঽহম্।

ই. জি. ব্রাউনি 'A Literary History of Persia' (London, 1909, P—442) গ্রন্থে বলেছেন, 'স্বফিচরিত্র কী প্রবল ভাবাবেগদীপ্ত! …So different from the cold and bloodless theories of the Indian Philosophies!' স্বফিরা নিশ্চয় ভাবাবেগদীপ্ত ছিলেন। তবে ভারতীয় দর্শনের আপাতশীতলতাও রক্ত-শূন্যতার আবরণ ভেদ করতে পারলে ব্রাউনি সাহেব দেখতেন স্বফিদর্শনও ভারতীয় দর্শন—বিশেষ করে ভক্তিবাদ এবং বেদান্তে কী অসামান্য মিল এবং বেদান্তদর্শন এক অত্যুজ্জ্বল অগ্নিশিখা—যার উত্তাপ সকলের সহনীয় নয়।

সৌরকোষ

ডক্টর অনাদিনাথ দাঁ

[বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্-বিজ্ঞানী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের অধ্যাপক। বাঙলা ভাষায় 'ইলেকট্রনিক্স' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রস্মৃতি-পুরস্কারে সম্মানিত। 'Science and Culture' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক এবং সম্প্রতি সৌরকোষ বিষয়ে গবেষণারত। খ্যাতনামা বিজ্ঞান-সাহিত্যিক যিনি বিজ্ঞানকে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টায় অনলস উদ্যমী।]

আজকের পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির মূলে রয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ, একথা আজ আমরা অনেকেই জানি। পৃথিবী-পৃষ্ঠের উপর এক মহাদেশে যা ঘটছে, কৃত্রিম উপগ্রহের দৌলতে অন্য মহাদেশের অধিবাসীদের টেলিভিশনের পর্দায় তা নিমেষে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত বৈদেশিক যোগাযোগ বার্তার দুই-তৃতীয়াংশই কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত বহন করা হচ্ছে।

একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যাতে তার নির্দিষ্ট কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে, তার জন্য স্বভাবতই বহু ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিগুলি ব্যাটারীর সাহায্যে চালু রাখা হয়। কিন্তু ব্যাটারীকে নিয়মিত 'চার্জ' না করলে তার কর্মক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পায় এবং সেটি আর তখন প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করতে পারে না। কৃত্রিম উপগ্রহের পক্ষে এই ব্যাটারী চার্জ করা কাজটি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর জন্য যে বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োজন, কৃত্রিম উপগ্রহে তা বর্তমানে সোলার সেল (solar cell) বা সৌরকোষের সাহায্যেই সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সৌরকোষের সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির মূল উৎস হল সৌরশক্তি। শক্তির উৎস হিসাবে বাস্তবিকই সূর্যের তুলনা হয় না। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সকলকেই সূর্য সমানভাবে শক্তি দিয়ে চলেছে। তবে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পরিমাণ গড় সূর্যকিরণ পায়। যেমন আমাদের দেশের মতো গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলগুলি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের তুলনায় দ্বিগুণ বা তিনগুণ বেশি সৌরশক্তি পেয়ে থাকে। আজকের এই শক্তিসমস্যার যুগে তাই সৌরশক্তিকে শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সৌরশক্তি থেকে তাপ গ্রহণ করে তার সাহায্যে জল বা বাড়িঘর গরম করা বা কোন কিছুর আর্দ্রতা কমানোর কাজ অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। সম্প্রতি এই তাপের সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত করে ঐ বাষ্পকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কাজে লাগানো হচ্ছে—তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে যে পদ্ধতিতে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হয়, অনেকটা সেইভাবে। কিন্তু সৌরকোষের ব্যবহারবিধি সম্পূর্ণ অন্য রকমের। সৌরকোষের সাহায্যে সৌরশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়—তাপশক্তি এই কাজে প্রয়োজন হয় না, বরং উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সৌরকোষের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের দক্ষতা হ্রাস পায়।

এখন যে সৌরকোষগুলি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রস্তুত হচ্ছে, সেগুলি সবই সিলিকন নামক একটি অর্ধ-পরিবাহী পদার্থের দুটি পাতলা স্তর দিয়ে তৈরি। অর্ধ-পরিবাহী পদার্থ বলতে এমন এক ধরনের পদার্থ বোঝায় যাদের বিদ্যুৎপরিবাহিতা তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর পরিবাহিতার

চেয়ে অনেক কম, আবার কাঠ, কাচ, রবার প্রভৃতি তাপপরিবাহী পদার্থের পরিবাহিতার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। অর্ধ-পরিবাহী পদার্থ দু রকমের হয়—'এন্' শ্রেণী ও 'পি' শ্রেণী। 'এন্' শ্রেণীর পদার্থে ইলেকট্রন ও 'পি' শ্রেণীর পদার্থে 'হোল' নামক বিদ্যুৎ-আধানযুক্ত কণার সাহায্যে তড়িৎ পরিবাহিত হয়।

উপরে সৌরকোষের যে দুটি স্তরের কথা বলা হয়েছে, তার একটি 'পি' শ্রেণীর সিলিকন ও অপরটি 'এন্' শ্রেণীর সিলিকন দিয়ে তৈরি। স্তর দুটির সংযোগস্থলে যখন আলোকরশ্মি এসে পড়ে, তখন ঐ আলোকরশ্মির অন্তর্ভুক্ত ফোটন কণিকাগুলি সিলিকনের পরমাণুগুলিকে শক্তি সরবরাহ করে যার ফলে ঐ 'পি' ও 'এন্' সিলিকন স্তরদুটিতে অতিরিক্ত ইলেকট্রন ও 'হোল' কণিকার সৃষ্টি হয়। এই অতিরিক্ত সংখ্যক ইলেকট্রন ও 'হোল' সিলিকনের একটি স্তর থেকে অপর স্তরে চালিত হয়ে কোষের দুই প্রান্তের মধ্যে এক বিভব-প্রভেদের সৃষ্টি করে এবং প্রান্তদুটি তড়িৎপরিবাহী তারের সাহায্যে সংযুক্ত করলে ঐ তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহের সূচনা হয়। সৌরকোষের কার্যপ্রণালীর এই হল মূল কথা।

সৌরকোষের মস্ত সুবিধা এই যে, কোন বড় রকমের যন্ত্রপাতি ছাড়াই এর সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায়। এটি কাজ করে একেবারে নিঃশব্দে এবং এর দ্বারা পরিবেশ কোন রকমেই দূষিত হয় না। শক্তির উৎস হিসাবে এটি বেশ নির্ভরযোগ্য এবং কোন রকম তদারকী বা মেরামতি ছাড়াই এটি দীর্ঘদিন কাজ করে যেতে পারে। এর আর একটি সুবিধা এই যে, যে কোন দুরতিগম্য জায়গায়, যেমন সমুদ্রবক্ষে অথবা পাহাড়ের চূড়ায় এটি স্বচ্ছন্দে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে, তবে স্বভাবতই সেই সব জায়গায় সূর্যকিরণ থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া, এর আকার বা ওজনের তুলনায় উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ যথেষ্ট বেশি বলে কৃত্রিম উপগ্রহ বা অন্য মহাকাশযানগুলিতে এর ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য বলা চলে।

পৃথিবীপৃষ্ঠে সৌরকোষের প্রচলন এখনও ব্যাপক না হবার কয়েকটি কারণ আছে। তার মধ্যে প্রধান কারণটি হল এর ব্যয়বহুলতা। সৌরকোষের দাম গত কয়েক বৎসরে অত্যন্ত দ্রুতহারে কমলেও এখনও মাত্র এক ওয়াট বিদ্যুৎ-ক্ষমতা উৎপন্নকারী সৌরকোষসমন্বয়ের দাম প্রায় ছয় ডলারের মতো। বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এই দাম এক ডলারের নিচে নামিয়ে আনতে, কেননা ঐ দামে এটি শক্তি-সৃষ্টির অন্যান্য বিকল্প উৎসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। তখন স্বভাবতই এর প্রয়োগ ব্যাপকতর হবে এবং ফলে এর দামও আরো কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সৌরকোষের আর একটি অসুবিধা এই যে, এর উপর যতক্ষণ সূর্যকিরণ পড়বে, মাত্র ততক্ষণই এটি বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করবে। অতএব, রাত্রে বা মেঘাচ্ছন্ন দিনে এটি কোন কাজে আসে না। তাই দিনের বেলায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ যাতে সঞ্চয় করে রাখা যায়, সে নিয়ে গবেষণা চলছে। বিদ্যুতের পরিমাণ অল্প হলে তা ব্যাটারীকে চার্জ করে ব্যাটারীর মধ্যে সঞ্চয় করে রাখা যায় এবং রাত্রে এই ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎশক্তি নেওয়া যেতে পারে। সৌরকোষের সাহায্যে বিদ্যুৎ-বিহীন গ্রামে টেলিভিশন যন্ত্র এইভাবেই চালু রাখা হয়। কিন্তু অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ এইভাবে সঞ্চয় করে রাখা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং অবাস্তব।

সৌরকোষগুলি সচরাচর কয়েক সেন্টিমিটার ব্যাসের গোল চাকতির আকারে হয়ে থাকে। অতএব এই চাকতির উপর যে পরিমাণ সৌরশক্তি আপতিত হয়, সৌরকোষ কেবল তাকেই বিদ্যুৎ-

শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। এখন যদিও সূর্য মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি গুণ শক্তি দিয়ে চলেছে, পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর আপতিত সেই শক্তির ঘনত্ব কিন্তু খুব বেশি নয়— বর্গমিটার প্রতি আপতিত সৌরক্ষমতার পরিমাণ ১০০০ ওয়াটের মতো। অতএব একটি সৌর-কোষের ক্ষেত্রফল যদি ১০ বর্গ সেন্টিমিটারের (১ বর্গমিটার=১০,০০০ বর্গ সে. মি.) মতো হয়, তবে স্পষ্টতই ঐ কোষটির উপর আপতিত সৌরক্ষমতার পরিমাণ হবে মাত্র ১ ওয়াট!

এই সৌরক্ষমতা আবার যখন সৌরকোষের সাহায্যে বিদ্যুৎ-ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়, তখন তার পরিমাণ কিন্তু এক ওয়াটের চেয়েও কম হয়ে যায়। যে কোন রূপ শক্তিকে অন্য রূপে পরিবর্তিত করার সময় বেশ কিছু পরিমাণ শক্তির অপচয় হয় এবং মূল শক্তির ভগ্নাংশ মাত্র শক্তি রূপান্তরিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ভগ্নাংশকে শক্তি-রূপান্তরকারী ব্যবস্থার দক্ষতা বলে। সৌরকোষের ক্ষেত্রে এই দক্ষতার পরিমাণ এখন শতকরা ১০-১২-এর মতো। অর্থাৎ আপতিত সৌরক্ষমতার পরিমাণ এক ওয়াট হলে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-ক্ষমতার পরিমাণ হবে তার দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র!

অভিসারী আয়নার সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে ঘনীভূত করে বর্গমিটার প্রতি আপতিত শক্তির পরিমাণ বাড়ানো যায় বটে, কিন্তু এই ব্যবস্থায় ঘনীভূত সূর্যরশ্মি সিলিকন সৌরকোষকে উত্তপ্ত করে তোলে এবং তার ফলে ঐ কোষের দক্ষতা কমে যায়। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন, এই উত্তাপকে অন্য কাজে ব্যবহার করে সৌরকোষটিকে কেবল বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য যাতে ব্যবহার করা চলে। সিলিকন ছাড়া অন্য যে সব অর্ধ-পরিবাহী পদার্থ অধিক তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, তাদের নিয়েও গবেষণা চলছে।

সৌরকোষের দাম যদি আরো কমিয়ে ফেলা যায়, তবে ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে বিদ্যুৎ-শক্তির আশীর্বাদ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। বর্তমানের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে উৎপন্ন বিদ্যুতের ব্যয় কমানোর জন্য আজকাল এই কেন্দ্রগুলিকে আকারে ক্রমশই বড় করা হচ্ছে। এর ফলে প্রারম্ভিক ব্যয় যাচ্ছে বেড়ে এবং উৎপন্ন বিদ্যুৎ দেশের বিভিন্ন অংশে বিতরণ করার জন্য ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ-সরবরাহকারী লাইনেরও প্রয়োজন হচ্ছে। কিন্তু সৌরকোষের সাহায্যে ছোট ছোট শহর বা গ্রামে প্রয়োজনমতো আকারের ও সংখ্যার সৌরকোষ ব্যবহার করে প্রয়োজনমতো বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায়। এমন কি, গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে নিজস্ব সৌরকোষ বসিয়ে গৃহস্থের নিজস্ব বিদ্যুৎ-চাহিদা যেমন মেটানো যায়, তেমনি চাহিদা-অতিরিক্ত কিছু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হলে তা গ্রামের কেন্দ্রীয় উৎপাদন ও বণ্টন-কেন্দ্রের মাধ্যমে অন্য গৃহস্থকেও সরবরাহ করা যেতে পারে। ঠিক এখনই এসব কথা কল্পনাপ্রসূত বলে মনে হলেও ভবিষ্যতে যে তা বাস্তব রূপ ধারণ করবে না, আজকের এই প্রযুক্তি-বিদ্যার যুগে তা মনে করার কোন কারণ নেই।

সাগর-পারের এক দেবী-তীর্থ

স্বামী চেতনানন্দ

[লেখক বেলুড়মঠের শাখাকেন্দ্র আমেরিকাস্থ সেন্ট লুইস্ বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ ।]

একটি দেবী-তীর্থের অপরূপ কাহিনী—যেন রূপকথা!

রূপকথাকে আমরা মনে করি কল্পনায় রাঙানো কাহিনী। কিন্তু এই অপরূপকথায় কল্পনার রং নেই। মা মেরীর অপরূপ দৈবী প্রকাশ মানুষের মনোরাজ্যে অবিশ্বাস-দৈত্যকে মাথা তুলতে দেয়নি। মেক্সিকোর মহাতীর্থে মেরী-মাতা দেখা দিলেন এক আদিবাসী ইণ্ডিয়ানের কাছে। গুয়াডালুপের ভার্জিন মেরীর আবির্ভাব খ্রীস্ট জগতের এক বিস্ময়কর ইতিকথা।

বহু বছর আগে যখন এই দেবীর আবির্ভাবের কথা শুনেছিলাম, তখন রূপকথা বলেই মনে হয়েছিল। ছবিতে দেখেছিলাম তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ। সাধ হয়েছিল একবার স্বচক্ষে দেখবার। মা সে সাধ মিটিয়ে দিলেন। গত ২৫ জুলাই ১৯৮১ তারিখে দেখে এলাম মেরী-মাতার সেই অম্লান রূপ। বিশ্বাস হল—অঘটন আজও ঘটে।

মেক্সিকোর ইতিহাসে আছে, উত্তর আমেরিকার আদিবাসীরা (যাদের বলা হয় 'ইণ্ডিয়ান') আসে এশিয়া থেকে বেরিং প্রণালী পেরিয়ে। হাজার হাজার বছর আগে অতীতের কোন্ বরফযুগে এই নতুন মহাদেশে পড়েছিল মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। তারপর চলল বিভিন্ন জাতির উত্থান ও পতন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বস নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করলেন। তারপর ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্পানিয়ার্ডরা মেক্সিকো জয় করে এবং ক্রমে ইণ্ডিয়ানদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করে। তারপর স্পানিয়ার্ড ও ইণ্ডিয়ানদের সংমিশ্রণে মেক্সিকান জাতির সৃষ্টি হল। মেক্সিকানদের সঙ্গে ভারতীয়দের অনেক সাদৃশ্য আছে।

দিনটি ছিল শনিবার ৯ ডিসেম্বর ১৫৩১। হুয়ান ডিয়াগো (Juan Diego; স্পানিশে j-র উচ্চারণ h-এর মতো) সকালে চার্চে যাচ্ছিল। লোকটি ছিল আদিবাসী ইণ্ডিয়ান। টেপিয়াক পাহাড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে পেল নানা জাতের পাখির মধুর কাকলি। সেই সুমিষ্ট ধ্বনি তার মনটাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলল। সে ভাবতে লাগল: "এ কি শুনছি? এ কি স্বপ্ন না আমি সবেমাত্র সুপ্তোত্থিত? আমি কোথায়? এ পৃথিবীতে কী স্বর্গ নেমে এল?" প্রাচী তখন রক্তরাগে রঞ্জিত। হুয়ান মুখ তুলে পাহাড়ের চূড়ায় দেখতে চেষ্টা করল স্বর্গীয় স্বর-লহরীর উৎস। হঠাৎ সুরতান থেমে গেল। সে শুনল, নিস্তব্ধতা ভেদ করে পর্বত-চূড়া থেকে কে যেন ডাকছে, "ওগো বাছা হুয়ান, হুয়ান ডিয়াগো!"

হুয়ান সাহস ভরে হেঁটে চলল কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে। আশঙ্কার পরিবর্তে আনন্দের হিল্লোল বইতে লাগল তার মনে। আহ্বানকারীকে দেখবার জন্য সে তর তর করে উঠতে লাগল পাহাড়-চূড়ায়। হুয়ান সেখানে পৌঁছে দেখল এক দণ্ডায়মানা মাতৃ-মূর্তি। তিনি ইঙ্গিত করলেন কাছে যেতে। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হুয়ান অপলক দৃষ্টিতে দেখল সেই অতিমানবিক নারীর সৌন্দর্য। তাঁর পোশাক দিবাকরের দ্যুতির মতো উজ্জ্বল। যে প্রস্তর খণ্ডের উপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তা হীরকের মতো ঝকমক করছিল। তাঁর আশে-পাশের ঝোপঝাড়-লতাগুল্ম সোনালী নন্দন-

কাননের মতো উদ্ভাসিত। আহা কী স্বর্গীয় সে মুখখানি! করুণা-মমতা-মৃদুতা-সরলতা-পবিত্রতার প্রতিমূর্তি তিনি। চোখ দুটি দিয়ে যেন ঝরে পড়ছে বিন্দু বিন্দু স্নেহধারা।

হুয়ান হাঁটুগেড়ে বসল ঐ দেবীর সম্মুখে। তিনি মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাছা হুয়ান, কোথায় চলেছ তুমি?"

"মা, আমি চলেছি মেক্সিকোর ট্লাটিলোলকোর চার্চে বিদ্যাচর্চা করতে। সেখানে যাজকেরা খ্রীস্টের বাণী শেখায়।"

"বাছা, শোন। আমি ভার্জিন মেরী—ঈশ্বর-পুত্র যীশুখ্রীস্টের মাতা। আমার বড় ইচ্ছা এই পাহাড়ের চূড়ায় আমার একটি মন্দির হোক, যাতে আমি এখান থেকে তোমাদের উদ্দেশে স্নেহ-করুণা-মমতা বিলাতে পারি, তোমাদের সাহায্য ও রক্ষা করতে পারি। আমি তোমাদের করুণাময়ী মা। তোমাদের দুঃখকষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা মেটাবার জন্যই আমি আবির্ভূতা। তুমি মেক্সিকোর বিশপের কাছে গিয়ে আমার এই বার্তা শুনাও। তাঁকে বল যে, আমিই তোমাকে পাঠিয়েছি এবং এখানে মন্দির তৈরি করতে আদেশ দিয়েছি। তুমি যা দেখলে ও শুনলে তাঁকে হুবহু গিয়ে বল। আশীর্বাদ করি, সুখী হও।"

হুয়ান নতশিরে বলল, "তুমি নিশ্চিন্ত হও মা। আমি এখনই যাচ্ছি বিশপের কাছে তোমার বাণী বহন করে।"

হুয়ান ডিয়াগো নেমে এল পাহাড়ের সানুদেশে এবং সোজা সড়ক ধরে চলল মেক্সিকোর অভিমুখে। শহরে পৌঁছে সে সরাসরি বিশপের বাসভবনে উপস্থিত হল। এই বিশপ ছিলেন একজন ফ্রান্সিস্‌ক্যান সন্ন্যাসী; নাম ফ্রায়ার ডন্ হুয়ান ডি জুমারাগা (Friar don Juan de Zumarraga)। হুয়ান কাতরভাবে বিশপের কর্মচারীদের জানাল সে জরুরী একটা ব্যাপারে বিশপের সঙ্গে দেখা করতে চায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অনুমতি মিলল।

হুয়ান নতজানু হয়ে বসে বিশপের কাছে মেরীমাতার বার্তা জানাল। সে আরও নিবেদন করল তার নিজের প্রত্যক্ষ দর্শন, শ্রবণ এবং অভিজ্ঞতার কথা। হুয়ান ডিয়াগো দরিদ্র, অশিক্ষিত, গ্রাম্য ইণ্ডিয়ান আর বিশপ শিক্ষিত সন্ন্যাসী অভিজাত স্পানিয়ার্ড। বিশপের প্রথমে বিশ্বাস হল না। সব শুনে তিনি বললেন, "বৎস, তুমি আবার এস। আমি এখন ব্যস্ত। পরে তোমার কথা ভালভাবে শুনব। ব্যাপারটা আমাকে ভালভাবে ভেবেচিন্তে দেখতে হবে।"

হুয়ান হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

সেই দিনই সে ফিরে এল টেপিয়াক পাহাড়ে। আবার সেখানে দর্শন মিলল মেরীমাতার। তিনি অপেক্ষা করছিলেন সেই একই জায়গায়। নতজানু হয়ে হুয়ান বললে, "মা, তোমার আদেশ মতো আমি বিশপের কাছে গিয়েছিলাম, তাঁকে বললামও সব। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার মনে হল তিনি বিশ্বাস করেননি। তিনি বললেন যে, ব্যাপারটা ভালভাবে ভেবেচিন্তে দেখবেন এবং পরে আমাকে দেখা করতে বলেছেন।

"মা, আমি একজন সামান্য দরিদ্র, সাধারণ মানুষ। তুমি যদি কোন গণ্যমান্য লোককে তোমার বার্তাবহ করে বিশপের কাছে পাঠাও, তবে হয়তো তিনি বিশ্বাস করতে পারেন। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমার অক্ষমতার জন্য আমার প্রতি বিরূপ হয়ো না।"

প্রত্যুত্তরে মেরীমা বললেন, "শোন বৎস, আমার অনেক দূত আছে এবং সবাই আমার আজ্ঞাপালনে তৎপর। কিন্তু এ কাজে আমি তোমাকেই মনোনীত করেছি। তুমি কাল আবার

বিশপের কাছে গিয়ে আমার নাম করে বল যে, আমি পুনরায় আদেশ করেছি—তাঁকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে।"

হুয়ান ডিয়াগো বলল, "মা, তুমি ভেব না। আমি খুশি মনে তোমার বার্তা বহন করে কাল আবার যাব। পথশ্রম আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু আমার আশঙ্কা, বিশপ আমাকে বিশ্বাস করবেন না। যাই ঘটুক, আগামী কাল সূর্যাস্তের আগে তোমাকে আমি বিশপের উত্তর এনে দেব।" এই বলে হুয়ান ঘরে ফিরে গেল।

পরদিন রবিবার। সকালেই হুয়ান চলল ট্লাটিলোলকোর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এবং ঐ সঙ্গে সে বিশপের সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করল। উপাসনার পর জনতা চলে গেলে, সে উপস্থিত হল বিশপের ভবনে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর দেখা মিলল বিশপের। হুয়ান হাঁটু পেতে বসে অশ্রুপূর্ণ নয়নে মেরীমাতার আদেশের কথা আবার বিশপকে নিবেদন করল। বিশপ তখন হুয়ানকে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন: "তুমি কোথায় তাঁকে দেখেছ? তাঁকে দেখতে কেমন?" হুয়ান সব খুলে বলল। তবুও কিন্তু বিশপের বিশ্বাস হল না। তিনি বললেন যে, তিনি নিজে চাক্ষুষ প্রমাণ না পেলে এ কাজে এগুবেন না।"

হুয়ান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। এদিকে বিশপ তাঁর কয়েকজন কর্মচারীকে গোপনে পাঠালেন ব্যাপারটা দেখে আসবার জন্য। হুয়ানকে না জানিয়ে তারা সোজা সড়ক ধরে তার পিছু নিল। টেপিয়াক সেতুর কাছে গিরিখাতের রাস্তায় হুয়ান বিশপের প্রতিনিধিদের দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে গেল। তারা চারিদিকে খুঁজল, কিন্তু হুয়ানকে দেখতে পেল না। বিরক্ত হয়ে তারা বিশপের কাছে ফিরে এসে সব জানাল। বলল যে, লোকটাকে আদৌ বিশ্বাস করা চলে না। এই হয়রানি ও মিথ্যার জন্য লোকটা শাস্তি পাবার যোগ্য!

ইতিমধ্যে হুয়ান ডিয়াগো মেরীমাতার কাছে বিশপের সংবাদ নিবেদন করল। তিনি সব শুনে বললেন, "বেশ হয়েছে, বাছা। তুমি কাল সকালে এখানে এস। আমি নিদর্শনের ব্যবস্থা করব। বিশপ তখন তোমাকে বিশ্বাস করবে, আর কখন সন্দেহ করবে না।"

পরদিন সোমবার। হুয়ানের মেরীমাতার নিদর্শন নিয়ে বিশপের কাছে যাওয়ার কথা। কিন্তু পূর্বের রাত্রে সে বাড়ি ফিরে দেখে তার বৃদ্ধ খুড়ো বারনারডিনো মুমূর্ষু। প্লেগে আক্রান্ত। সারাদিন সে খুড়োর সেবা করল। ডাক্তার কিছুই করতে পারল না। বারনারডিনো রাতে হুয়ানকে ডেকে বলল সে যেন সকালে একজন ধর্মযাজক ডেকে এনে পাপস্বীকারের ব্যবস্থা করে। তার শেষ সময় সন্নিকট।

১২ ডিসেম্বর ১৫৩১, মঙ্গলবার। সকালে উঠেই হুয়ান ট্লাটিলোলকোতে ধর্মযাজক আনতে তৈরি হল। শহরের সোজা পথ গেছে টেপিয়াক পাহাড়ের পশ্চিম গা দিয়ে। হুয়ান পথে নেমে ভাবল: আমি যদি সোজা পথ দিয়ে যাই তা হলে মেরীমাতার দৃষ্টিগোচর হব এবং তিনি আমাকে নিদর্শনের ব্যাপারে দেরী করিয়ে দেবেন। আমি বরং সোজা যাজকের কাছেই যাই, কারণ আমার খুড়ো অধীরভাবে তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

হুয়ান তাই পাহাড়ের পূর্বদিকের চড়াই উৎরাই-এর পথ ধরল। কিছু দূর এগিয়ে সে দেখে মেরীমাতা পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছেন এবং এগিয়ে এসে বললেন, "বৎস, ব্যাপার কি? কোথায় চলেছ তুমি? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি শোকার্ত, উদ্বিগ্ন ও ভীত।" হুয়ান নতশিরে বলল, "মা, আশা করি তোমার কুশল। আমার দুঃখের কথা শুনলে তুমি কষ্ট পাবে। আমার

খুড়ো মরমর। প্লেগে আক্রান্ত। আমি মেক্সিকোতে চলেছি একজন ধর্মযাজক আনতে, যাতে তাঁর কাছে পাপস্বীকার করে আমার খুড়ো ত্রাণকর্তার কাছে যেতে পারেন। যাহোক, কাজ সেরে আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। মা, দয়া করে একটু ধৈর্য ধর। কথা দিচ্ছি কালকে আমি অবশ্যই তোমার কাছে আসব।"

হুয়ান ডিয়াগোর দুঃখের কাহিনী শুনে করুণাময়ী মা বললেন, "শোন। তুমি ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়ো না। আমি মা কাছে থাকতে তোমার ভয় কি? তুমি আমার আশ্রিত। আমিই তোমায় রক্ষা করব। তোমার খুড়োর ব্যাধির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ো না। সে এখন মরবে না। জেনে রাখ— এই মুহূর্তে সে সুস্থ হয়ে গেছে।"

মেরীমাতার এই আশ্বাসবাণী শুনে হুয়ানের মন শান্ত হল। সে প্রার্থনা করল, "মা, তবে এখুনি তুমি তোমার নিদর্শন আমাকে দাও, যা নিয়ে আমি বিশপের কাছে যেতে পারি।"

ভার্জিন মেরী হুয়ানকে আদেশ করলেন পাহাড়ের চূড়ায় যেতে যেখানে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, "পাহাড়-চূড়ায় তুমি দেখবে বিস্তর ফুল ফুটে রয়েছে। ফুলগুলি সযত্নে তুলে আমার কাছে নিয়ে এস।"

হুয়ান খুশি মনে দ্রুতপদে পাহাড়-চূড়ায় উঠে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে সেখানে দেখল অসময়ে প্রস্ফুটিত বহু রকমের ক্যাস্টিলিয়ন গোলাপ (Castilian roses)। তাছাড়া তখন শীতকাল চতুর্দিক তুষারাবৃত। ঐ কঠিন পাথুরে জায়গায় কণ্টকগুল্ম ও ক্যাকটাস ছাড়া কখনও ফুল জন্মায় না। ফুলগুলি গন্ধেভরা এবং মুক্তার মতো শিশিরে সিক্ত।

হুয়ান ফুলগুলি তুলে নিজের আলখাল্লায় জড়িয়ে তাড়াতাড়ি মেরীমাতার কাছে নিয়ে এল। মা ফুলগুলি নিজ হাতে গ্রহণ করে হুয়ানকে দিয়ে বললেন, "বাছা, এই ফুলগুলিই নিদর্শন। তুমি এগুলি বিশপের কাছে নিয়ে যাও। আমার নাম করে তাকে বোলো সে যেন আমার ইচ্ছা পূরণ করে। তুমি আমার বিশ্বস্ত দূত। আমার আদেশ,—বিশপ ছাড়া আর কারো কাছে এ ফুলগুলি খুলে দেখিও না। তুমি তাঁকে তোমার দর্শন, অভিজ্ঞতা ও ফুল সংগ্রহের ইতিকথা খুলে বোলো।"

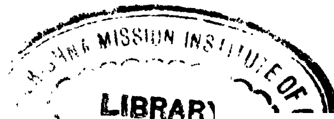
মেরীমাতার উপদেশ ও নিদর্শন নিয়ে হুয়ান খুশি মনে মেক্সিকোর সোজা সড়ক ধরল।

বিশপের বাসভবনে পৌঁছানোমাত্র রক্ষী ও কর্মচারীরা হুয়ানকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দিল। সে সানুনয়ে জানাল বিশপকে সংবাদ দিতে। কিন্তু তারা তার কথায় কর্ণপাত করল না। হুয়ান মাথা নিচু করে অসহায় হয়ে ভাবতে লাগল— এখন কী করণীয়! এমন সময় কর্মচারীরা লক্ষ্য করল হুয়ান কাপড়ে জড়িয়ে যেন বিশপের জন্য কোন উপঢৌকন নিয়ে এসেছে। তাই তারা কৌতুহল ভরে এগিয়ে এল।

হুয়ান কাপড় দিয়ে ফুলগুলি জড়িয়ে আনলেও সবটা ঢাকতে পারেনি। বিশপের কর্মচারীরা দেখল তাজা, শিশিরস্নাত নানাবর্ণের ক্যাস্টিলিয়ন গোলাপ। তারা তিনবার ফুলগুলি নিতে চেষ্টা করল হুয়ানের হাত থেকে। কিন্তু প্রতিবারেই দেখল ফুলগুলি আসল নয়। কাপড়ের উপর আঁকা এবং সূচীশিল্পের দ্বারা পরিশোভিত।

কর্মচারীরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বিশপের কাছে গিয়ে হুয়ানের আগমনবার্তা ও গোলাপের তাজ্জব ব্যাপার জানাল। শুনে বিশপ বুঝতে পারলেন যে, লোকটি এবার মেরীমাতার নিদর্শন নিয়ে এসেছে যাতে তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়।

বিশপ হুয়ানকে ভিতরে ঢুকতে আদেশ দিলেন। সে নতজানু হয়ে বিশপের সামনে বসে সমস্ত কাহিনী বলল। হুবহু জানাল—তার খুড়োর



অসুখের সংবাদ, মেরীমাতার দর্শন, পুষ্পচয়ন, এবং পরিশেষে মেরীমাতার মন্দিরনির্মাণের আদেশ। তারপর হুয়ান সাদা আলখাল্লায় জড়ানো বিভিন্ন রংএর গোলাপ ফুলগুলি বিশপের সামনে ঢেলে দিল। কী আশ্চর্য! সেই আলখাল্লার উপর ভেসে উঠল ভার্জিন মেরীর অপূর্ব উজ্জ্বল ছবি। এই ৪৫০ বছরের পুরানো ছবি গুয়াডালুপের মন্দিরে অম্লান হয়ে রয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে ইনি গুয়াডালুপের ভার্জিন মেরী নামে খ্যাত।

যাহোক ঐ পট দেখা মাত্র বিশপ ও উপস্থিত সকলে নতজানু হয়ে মেরীমাতাকে সম্মান জানালেন। বিশপ সাশ্রুনয়নে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন তাঁর আদেশ না মানার জন্য। তারপর বিশপ উঠে হুয়ানের কাঁধে জড়ানো আলখাল্লার বন্ধন খুলে দিলেন এবং ঐ পটাঙ্কিত আলখাল্লা সযত্নে নিজ ভজনালয়ে নিয়ে গেলেন।

হুয়ান ডিয়াগোকে নিজের ভবনে পরম সমাদরে একদিন রেখে বললেন, "বেশ, চল এবার আমাদের সঙ্গে। আমাদের দেখিয়ে দাও ভার্জিন মেরী কোথায় মন্দিরনির্মাণের আদেশ দিয়েছেন।" সবাই চলল হুয়ানের সঙ্গে সেই দিব্যভূমির উদ্দেশে।

হুয়ান বিশপকে দেখিয়ে দিল সেই পবিত্র পাহাড়-চূড়া, যা মেরীমাতার পাদস্পর্শে ধন্য।

হুয়ান বিশপের কাছ থেকে বিদায় চাইল। সে কিন্তু তার খুড়োকে দেখবার জন্য ব্যাকুল তখন। বিশপ তাকে কিছুতেই ছাড়লেন না। তিনি সঙ্গীদের হুয়ানের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন এবং তারা হুয়ানের বাড়িতে গিয়ে দেখল তার খুড়ো সুস্থ ও সুখী। খুড়ো বারনারডিনো হুয়ানের মুখে সব কাহিনী শুনে খুবই খুশি হলেন। বারনারডিনো বিশপের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে বললেন যে, ভার্জিন মেরী তার কাছেও আবির্ভূতা হয়ে তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। মেরীমাতা তাকে বলেছেন, তিনি হুয়ানকে মেক্সিকোর বিশপের কাছে পাঠিয়েছেন এবং একথাও বলেছেন যে, বিশপ যেন ঐ প্রতিচ্ছবির নাম রাখে "ভার্জিন সেণ্ট মেরী অব গুয়াডালুপে"। অবশ্য ঐ নামে স্পেনে একটি মন্দিরও আছে।

ভার্জিন মেরীর মন্দির তৈরি হল টেপিয়াক পাহাড়ে। সেই থেকেই স্থানটি পরিণত হল এক মহাতীর্থে। এখনও সেখানে আধ্যাত্মিক আবহাওয়া বিশেষভাবে অনুভূত হয়। "তীর্থী কুর্বন্তি তীর্থানি"—অগণিত তীর্থযাত্রী স্থানটিকে করে তুলেছে ভাববন্যার মন্দাকিনী।

নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে ১৫০০০ ভক্ত একসঙ্গে প্রার্থনা করতে পারে। বেদীর বাঁদিকে রয়েছে গায়কমণ্ডলীর স্থান এবং উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশের জাতীয় পতাকা। গুয়াডালুপের ভার্জিন মেরী কেবল মেক্সিকোর সম্রাজ্ঞী নন, তিনি সকল দেশের রানী —সকল মানুষের জননী। বেদীর বাঁদিকে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম অর্গান যা তৈরি হয়েছে কানাডাতে। পোপ হুয়ান পাওলো ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরিতে এই মহাতীর্থ দর্শনে আসেন। ২৫ জুলাই ১৯৮১—আমরা যখন মন্দির দর্শনে গিয়েছিলাম, তখন সেখানে ম্যাসের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে মধুর গ্রেগরিয়ান সঙ্গীত হল। মনে পড়ল, "রমণীয় বস্তু দর্শন করলে অথবা মধুর শব্দ শ্রবণে যে সুখানুভূতি জন্মে, সেই সুখানুভূতির মধ্য দিয়েই অরূপ আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়।"

বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত'—ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক এবং সুলেখক।]

স্বামী বিবেকানন্দ রচিত বাংলা মৌলিক রচনাবলীর মধ্যে চারটি বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি হচ্ছে 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত'। অন্য তিনটি বই-এর মতো 'বর্তমান ভারত'-ও প্রথম পাক্ষিক 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল; পরে এটি জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ খ্রীঃ) স্বামী সারদানন্দের ভূমিকা-সম্বলিত হয়ে পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করে। বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' শীর্ষক গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে চারটি বই-ই স্থান লাভ করেছে।

সারদানন্দজী সত্যই বলেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী প্রতিভা-প্রসূত 'বর্তমান ভারত' বঙ্গ-সাহিত্যে এক অমূল্য রত্ন।" বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই বইটির গুরুত্ব বিচার করব। 'বর্তমান ভারত' বইটিতে স্বামীজী ঐতিহাসিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, তবে এই ভূমিকা সাধারণ ঐতিহাসিকের নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের একটি দিক ছিল পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের ইতিহাস রচনা। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) রচনা থেকে এই ধারার সূত্রপাত ধরা যেতে পারে, যদিও এই বইটি ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার নিদর্শন নয়। বিদ্যাসাগর-ও 'বাংলার ইতিহাস' রচনা করেছিলেন (১৮৪৮), তবে খুব পরিশ্রম স্বীকার করে নয়, কারণ তিনি মার্শম্যান (Marshman) সাহেবের 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' (History of Bengal) বইটিরই বাংলা অনুবাদ করেছিলেন। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বইটি সমাদৃতও হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলার ইতিহাস রচনার উপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ তাঁর মতে বাঙালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি, এবং আত্মবিস্মৃত জাতির কোন ভবিষ্যৎ থাকতে পারে না। সম্ভবতঃ তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে আরম্ভ করে বহু ঐতিহাসিক বাঙালীর লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হন। বিবেকানন্দ ইতিহাসের নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। তাঁর নানা রচনায় প্রগাঢ় ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর বিভিন্ন বইয়ে স্বামীজীর ইতিহাস-সচেতনতার কথা উল্লেখ করেছেন। শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়, সারা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে ছিল। কিন্তু 'বর্তমান ভারত' বইটিতে তিনি সাধারণ ভাবে তাঁর দেশের ইতিহাস রচনা করতে বসেননি, এখানে তিনি ইতিহাসের দর্শন রচনা করেছেন সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে। এই দৃষ্টিভঙ্গিও আবার সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর নিজস্ব। পাশ্চাত্য ইতিহাস-দর্শনের রচয়িতা স্পেঙ্গলার (Spengler) বা মার্ক্স (Marx)-এর বিশেষ কোন প্রভাব তাঁর এই রচনায় পড়েছে বলে মনে হয় না।

'বর্তমান ভারত' বইটিতে স্বামীজী সারা পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণ সনাতন কাল থেকেই পৃথিবীর সমস্ত সভ্য সমাজে রয়েছে, এবং যদিও দেশ-কাল ভেদে ঐ চার বর্ণের কোন কোনটির সংখ্যা বা প্রতাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে, তবু সামগ্রিক ভাবে বিচার করলে মনে হয় যে

"প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।" ('বাণী ও রচনা', ৬।২২৯)। চীন, সুমের, ব্যাবিলন, মিশর, ইরাণ, আরব প্রভৃতি দেশে এবং ইহুদী, আর্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে সমাজ-নেতৃত্ব প্রথম যুগে ছিল ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতে। এর পর, দ্বিতীয় যুগে হল ক্ষত্রিয়কুল অর্থাৎ রাজন্যবর্গ বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী রাজাদের অভ্যুদয়। বৈশ্য বা বাণিজ্যের দ্বারা ধনশালী সম্প্রদায়ের সমাজ-নেতৃত্ব কেবল ইংলণ্ড প্রভৃতি আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দেশগুলিতেই দেখা দিয়েছিল স্বামীজীর জীবদ্দশায়। সব শেষে যে সারা পৃথিবীতে শূদ্র-জাগরণ ঘটবে এবং "শূদ্রধর্ম-কর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে", একথাও স্বামীজী জোর গলায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ('বাণী ও রচনা', ৬।২৪১)।

স্বামীজীর বিচারে "প্রত্যেক বর্ণেরই রাজত্বকালে কতকগুলি লোকহিতকর এবং অপর কতকগুলি অহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান হয়।" ('বাণী ও রচনা', ৬।২৩১)। ব্রাহ্মণ-আধিপত্যের যুগে বিদ্যাচর্চার, বিশেষতঃ অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চার প্রাধান্য দেখা যায়। সেই সময় পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয় হয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার-বিস্তার ঘটে, এবং অন্ততঃ কিছুকাল বিদ্যানুরাগী, ত্যাগী, ইন্দ্রিয়-সংযমী পুরুষেরা সমাজের নেতা ও পরিচালক হন। আবার এই পুরোহিতকুলের মধ্যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে তাদের পতনের সূত্রপাত হয়। পুরোহিতদের লোভ, সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা ও অপরের প্রতি অসহিষ্ণুতার ভাব প্রবল হয়ে উঠলে, অন্যান্য বর্ণের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আপন বৃত্তিপালনে অসমর্থ, বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন ব্রাহ্মণেরা তখন ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয় জাতির প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। বিবেকানন্দের মতে ভারতে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী) সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের শক্তির ক্ষয় এবং রাজন্যবর্গের শক্তির বিকাশ দেখা যায়। পরবর্তী কালে মৌর্যোত্তর যুগে হিন্দুধর্মের বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় হলে ব্রাহ্মণ্যশক্তি ক্ষত্রিয়শক্তির সহকারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু ক্রমশঃ উভয় শক্তিই নানা কারণে হৃতবীর্য হয়ে পড়লে ভারতে এক নতুন ক্ষত্রিয়শক্তির, অর্থাৎ মুসলমান রাজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রাহ্মণাধিকারের পরে আসে ক্ষত্রিয়শক্তির বিকাশের যুগ। ক্ষত্রিয়শক্তি বলতে বিবেকানন্দ রাজার, বিশেষতঃ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-ভোগী রাজার শক্তির কথাই বুঝিয়েছেন। ব্রাহ্মণাধিকারে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রথম সূত্রপাত ও পরিপুষ্টি লাভ, তেমনি ক্ষত্রিয়াধিকারে "ভোগেচ্ছার পুষ্টি এবং তৎ-সহায়ক বিদ্যা-নিচয়ের সৃষ্টি ও উন্নতি।" ('বাণী ও রচনা', ৬।২৩৫)। ক্ষাত্রশক্তির বিকাশের ফলে মানুষ নানা প্রকার ভোগের বা আরামের উপাদান সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে, এবং গ্রামীণ সভ্যতার গৌরব লুপ্ত হয়ে নগর-সভ্যতার আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটে। ক্ষত্রিয়শক্তির বিকাশের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ্যশক্তির সঙ্গে ক্ষত্রিয়শক্তির প্রচণ্ড সংঘষ উপস্থিত হয়, এবং ব্রাহ্মণ্যশক্তি ধীরে ধীরে পরাভব স্বীকার করে। আবার, রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার পর স্বেচ্ছাচারী প্রজা-পীড়ক রাজার সঙ্গে তাঁর প্রজাবর্গের সংঘর্ষ ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে ও কালক্রমে রাজার হাত থেকে ক্ষমতা প্রজাদের হাতে চলে যায়। অবশ্য সমাজ যদি বীর্যহীন হয়, তাহলে প্রজারা নীরবে রাজার অত্যাচার সহ্য করে, এবং কালক্রমে রাজা ও প্রজা উভয়েই হীন হতে হীনতর হয়ে অবশেষে অন্য কোন বলবান শত্রুর অধীনতা স্বীকার করে। রাজনৈতিক শক্তির অতিমাত্রায়

কেন্দ্রীকরণ, এবং পরিণামে বলবানের দ্বারা দুর্বলের উপর অত্যাচার ও দুর্বলের শোষণ ক্ষত্রিয়াধিকারের প্রধান কুফল। কোন সমাজই যৌবনদশায় উপনীত হলে এই ধরনের অত্যাচার বা শোষণ সহ্য করতে পারে না, যদি অবশ্য সেই সমাজ প্রাণবন্ত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগের সূচনা থেকে মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যন্ত আমরা ক্ষত্রিয়-আধিপত্যের যুগ বলে চিহ্নিত করতে পারি। মধ্যযুগে শুধু তুর্ক-আফগান বা মুঘল রাজারা নন, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি জাতিরাও এই ক্ষাত্রশক্তির প্রতিভূ ছিল। মুসলমান রাজারা আপন সমাজে নিজেরাই ধর্মগুরু বা প্রধান পুরোহিতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, সুতরাং তাঁদের ক্ষমতা আরো নিরঙ্কুশ ছিল। চীনেও কনফুশিয়াসের প্রভাবে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর রাজশক্তি পৌরোহিত্যশক্তি বা ব্রাহ্মণ্যশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিব্বতের দালাই লামা চীনের রাজার ধর্মগুরু হয়েও সর্বপ্রকারে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করতেন। একমাত্র ইহুদী জাতির মধ্যে রাজশক্তি কখনো পুরোহিতশক্তির উপর সম্পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি।

বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয় প্রথমে ইউরোপের ইতিহাসেই দেখা যায়, এবং ইংরেজ জাতিই এ ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণাধিকারে যেমন বিদ্যা বা জ্ঞানের অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ হয়েছিল, এবং ক্ষত্রিয়-অধিকারে রাজনৈতিক ক্ষমতার, তেমনি বৈশ্যশক্তির অধিকারে সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে ধনের কেন্দ্রীকরণ হয়েছে এবং এই মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা উৎপাদিত ধন নিজেদের ভোগের জন্য আত্মসাৎ করে চলেছে। রাজশক্তি এখন এই বৈশ্যশক্তির দ্বারা ও তাদের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। বৈশ্যশক্তির প্রাদুর্ভাব কালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সভ্যতার প্রসার হয়েছে, এবং এক দেশের পণ্যদ্রব্য ও বিলাস-ব্যসনের উপাদান অপর দেশে বাণিজ্যের স্বার্থে আনীত হচ্ছে। কিন্তু যাদের শারীরিক পরিশ্রমের ফলে এই ঐশ্বর্যের সৃষ্টি হচ্ছে, তাদের ঐশ্বর্যের ভাগ দিতে বৈশ্যশক্তির আদৌ কোন ইচ্ছা নেই। ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ক্ষত্রিয়শক্তির উপর বৈশ্যশক্তির এই জয়ের সূচনা করেছে। মুসলমানদের ভারত-বিজয়ের সঙ্গে ইংরেজশক্তির ভারতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে, তা বিবেকানন্দের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি লিখেছেন, "অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল পুস্তকের ভারত-জয়ও নহে, পাঠান-মোগলাদি সম্রাড়্‌গণের ভারত-বিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তূরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর —এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা—কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্য-পোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী —স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।" ('বাণী ও রচনা,' ৬।২৩১)। ভারতে এই বৈশ্যশক্তির প্রতিষ্ঠার ফলে যে সুদূর-প্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন হবে, স্বামীজী সে সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। "এ নূতন মহাশক্তির সংঘর্ষে ভারতে কি নূতন বিপ্লব উপস্থিত হইবে ও তাহার পরিণামে ভারতের কি পরিবর্তন প্রসাধিত হইবে, তাহা ভারতেতিহাসের গত কাল হইতে অনুমিত হইবার নহে।" ('বাণী ও রচনা,' ৬।২৩১)।

বৈশ্যশক্তির অভ্যুদয়ের পরে অনিবার্যভাবে যে শূদ্র-জাগরণ আসবে ও শূদ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, স্বামীজী ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ তাঁর আগে আর কোন মনীষী বা সমাজ-সংস্কারক বা ঐতিহাসিক এমন সুস্পষ্ট ভাষায় শূদ্র-জাগরণের

অবশ্যম্ভাবিতার কথা বলেননি। ইউরোপে সোস্যালিজম, অ্যানার্কিজম, নাইহিলিজম প্রভৃতি আন্দোলন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে এক সময় সারা পৃথিবীতে শূদ্রাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং ভারতবর্ষও এর প্রভাব থেকে বাদ যাবে না। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী রচিত 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' বইটিতে স্বামীজীর এই বিষয়ে আরো কিছু বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, যাকে আমরা তাঁর 'বর্তমান ভারত' বই-এর বক্তব্যের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী বলেছিলেন, "এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা ছোটজাতদের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতরজাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ।" তথাকথিত ভদ্রলোকেদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন, "এই mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের (ভদ্রলোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে—তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর civilization (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙে দেবে।…এই জন্য বলি, এই সব নীচ-জাতদের ভেতর বিদ্যাদান, জ্ঞানদান ক'রে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ।" ('বাণী ও রচনা', ৯।১০৮-১০৯)। স্বামীজীর শেষ কথাটি থেকে মনে হয়, তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষিত, আদর্শবাদী ভদ্রলোকেরা এই শূদ্র-জাগরণের নেতৃত্ব গ্রহণ করে একে সুপথে পরিচালিত করুক, যাতে করে এর ক্ষতিকর দিকগুলি প্রাধান্য না পায়।

'বর্তমান ভারত' বইটিতে স্বামীজী ইতিহাসের যে যুগ-বিভাগ করেছেন, তা থেকে আপাত-দৃষ্টিতে তাঁর সঙ্গে কার্ল মার্ক্স-এর দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ক্ষত্রিয়াধিকারের সঙ্গে সামন্ততন্ত্র (Feudalism), বৈশ্য-অধিকারের সঙ্গে ধনতন্ত্র (Capitalism) ও শূদ্রাধিপত্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র (Socialism) সহজেই তুলনীয়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বামীজী অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থাকেই সমাজের প্রধান নিয়ামক বলে কোথাও বর্ণনা করেননি। তিনি বিদ্যা বা জ্ঞান, রাজনৈতিক ক্ষমতা, আর্থিক সম্পদ সব কিছুকেই সমাজে শক্তির বিভিন্ন রূপ হিসাবে দেখেছেন, এবং ঐতিহাসিক কালের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের শক্তির অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণ এবং তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া রূপে সমাজ-বিপ্লবের আবির্ভাবের কথা বলেছেন। সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবল, বাহুবল বা ধনবল যার দ্বারাই অধিকৃত হোক না কেন, আসল শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ বা জনসাধারণ। যে নেতৃত্ব যত পরিমাণে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, সে তত পরিমাণে দুর্বল হয়ে যাবে। দেশ ও কালের প্রয়োজনে শক্তির কেন্দ্রীকরণ কখনো কখনো আবশ্যক হয়, কিন্তু শক্তির কেন্দ্রীকরণের চেয়েও তার বিকিরণ বেশি প্রয়োজন। অতি সুন্দর উপমা দিয়ে স্বামীজী বলেছেন, "হৃৎপিণ্ডে রুধির-সঞ্চয় অত্যাবশ্যক, তাহার শরীরময় সঞ্চালন না হইলেই মৃত্যু।" ('বাণী ও রচনা', ৬।২৩৫)।

এ ছাড়াও মার্ক্সের ইতিহাস-বিশ্লেষণের সঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্যের বহু পার্থক্য রয়েছে। মার্ক্স কোথাও ব্রাহ্মণাধিকারের কথা বলেননি, এবং স্বামীজী ব্রাহ্মণাধিকারের যে সব সুফলের কথা বলেছেন কোন মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক আজ তা স্বীকার করবেন না। শূদ্র-জাগরণের অবশ্যম্ভাবিতার কথা স্বীকার করে নিয়েও স্বামীজী এই জাগরণের ফলে সমাজের সব অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান হয়ে যাবে এবং পরিণামে শ্রেণীবিহীন সমাজে রাষ্ট্রশক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী কোথাও

করেননি। তা ছাড়া স্বামীজী শূদ্রাধিকারকে ত্রুটিমুক্ত বলেও মনে করতেন না। অন্যান্য বর্ণের আধিপত্যের মতো শূদ্রাধিপত্যের কুফল সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। ১৮৯৬খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর মিস মেরী হেলকে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, শূদ্রযুগের সুবিধা হবে এই যে, "এ সময়ে শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সংস্কৃতির [সভ্যতার] অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশই কমে যাবে।" তাই স্বামীজী বলেছেন, "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তা হ'লে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু এ কি সম্ভব ?" ('বাণী ও রচনা', ৭।৩৪৯-৫০)।

'বর্তমান ভারত' বইটিতে স্বামীজী আধুনিক ভারতের ইতিহাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের মধ্যে সংঘাতের কথাও বলেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের একটি বড় ব্যাপারই ছিল এই আদর্শের সংঘাত। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের সমাজ-সংস্কারকেরা মুখ্যত পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণেই সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই অনুকরণ বা অনুসরণের স্পৃহা অনেকটা কমে আসে, এবং স্বাদেশিকতার ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আমাদের দেশের সব কিছুই ভাল, পশ্চিমের সভ্যতার কাছ থেকে আমাদের গ্রহণযোগ্য বিশেষ কিছু নেই, এই রকম একটি মনোভাব ধীরে ধীরে জাগতে থাকে। স্বামীজীকে কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক হিন্দু নবজাগরণের প্রধান প্রবক্তা ও রক্ষণশীল ভাবের পরিপোষক বলে বর্ণনা করেছেন। 'বর্তমান ভারত' বইটিতে স্বামীজী কিন্তু সুস্পষ্ট ও অদ্ব্যর্থক ভাষায় বলেছেন, "তবে কি আমাদের পাশ্চাত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টা-যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই? আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।' যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।" ('বাণী ও রচনা', ৬।২৪৭)। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শের মধ্যে এই ভাবগত সংঘর্ষ থেকেই যে ভারতে নবজাগরণ ঘটছে, এ বিষয়ে স্বামীজী খুবই সচেতন ছিলেন। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফলে আমাদের কোন কোন ব্যাপারে ভুল-ভ্রান্তি ঘটলেও আমরা যে মোটের উপর সামনের দিকে এগিয়ে যাব, একথাও তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে 'বর্তমান ভারত' বইটিতে বলেছেন। "এই বিজাতীয় ও প্রাচীন স্বজাতীয় ভাব-সংঘর্ষে অল্পে অল্পে দীর্ঘসুপ্ত জাতি বিনিদ্র হইতেছে। ভুল করুক ক্ষতি নাই, সকল কার্যেই ভ্রম-প্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক।...বৃক্ষ ভুল করে না, প্রস্তরখণ্ড ভ্রমে পতিত হয় না, পশুকুলে নিয়মের বিপরীতাচরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূদেবের উৎপত্তি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ নরকুলেই।" ('বাণী ও রচনা', ৬।২৪৪)। এর পরও স্বামীজীকে চূড়ান্ত রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল বলা একমাত্র এক-দেশদর্শী তথাকথিত রাজনীতিজ্ঞদের পক্ষেই সম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাব-ধারার বিস্তারের ফলে আমাদের সমাজে শিক্ষিত উচ্চ বা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এবং অশিক্ষিত জন-সাধারণের মধ্যে যে বিরাট ভাবগত ব্যবধান ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে, 'বর্তমান

ভারত' বইটিতে স্বামীজী তার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এর বিষময় পরিণাম সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, "যখন ভারতবাসীকে ইউরোপী বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত !!" ('বাণী ও রচনা', ৬।২৪৮)। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভারতের নিম্নজাতীয় লোকেদের অনার্যবংশসম্ভূত বলে গণ্য করতেন। তাঁদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে স্বামীজী বলেছেন, "আর পাশ্চাত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি, উহারা অনার্যজাতি !! উহারা আর আমাদের [ভারতীয় আর্যদের] নহে !!!" এই শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে স্বামীজী বলেন, "হে ভারত…ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই !" ('বাণী ও রচনা', ৬।২৪৯)। একথা আজ অস্বীকার করা চলে না, স্বামীজী আমাদের যে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ আমাদের জাতীয় জাগরণকে অনেক দুর্বল ও খণ্ডিত করে দিয়েছে এবং স্বাধীনতা লাভের প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে আজও আমরা এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি। জাত-পাতের লড়াই ভারতীয় হিন্দু সমাজে এখনো এক নির্মম সত্য। ঐতিহাসিক বিবেকানন্দের সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করার এইটাই মর্মান্তিক পরিণাম।

সব শেষে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, স্বামীজী তাঁর 'বর্তমান ভারত' বইটিতেই আমাদের বিখ্যাত 'স্বদেশমন্ত্র' উপহার দিয়েছেন, যার তুলনা একমাত্র ঋষি বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের সঙ্গে হতে পারে। সমস্ত বাংলা গদ্যসাহিত্যে এ রকম প্রাণস্পর্শী, তেজোদ্দীপক দেশপ্রেমের বাণী আর আছে কিনা সন্দেহ। গ্রন্থাকারে 'বর্তমান ভারত' প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সূচনায়। এই আন্দোলনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, বিশেষতঃ যাঁরা বিপ্লবপন্থী ছিলেন, তাঁরা যে স্বামীজীর 'স্বদেশমন্ত্রের' দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। তাঁরা কখনোই স্বামীজীর সেই উদাত্ত আহ্বান ভুলতে পারেননি : "ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত…।" বিপ্লববাদীরা ব্যক্তিগত জীবনে কোন লাভের প্রত্যাশা না রেখেই দেশমাতৃকার উদ্ধারের জন্য আত্মবলিদান দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। স্বামীজীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁরাও দিবারাত্র প্রার্থনা করতেন, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" ('বাণী ও রচনা', ৬।২৪৯)। ভারতের বিপ্লবপন্থীদের উপর স্বামীজীর বিশেষ প্রভাব আজ প্রায় সর্বজন স্বীকৃত সত্য। এই প্রভাব-বিস্তারের ব্যাপারে তাঁর 'বর্তমান ভারত' বইটি বিশেষ সহায়ক হয়েছিল বলে মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-শিল্পী নন্দলাল

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী

[প্রধান মন্ত্রীর স্বর্ণপদকে সম্মানিত বিশিষ্ট শিল্পী এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি-শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা।]

"নন্দলাল যে প্রথম যৌবনে শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য-সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন একথা আর গবেষণার বিষয় নয়। এই প্রভাবের কারণে নন্দলাল ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার অবদান জীবনে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন"—শিল্পাচার্য নন্দলাল সম্বন্ধে একথা লিখেছেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, যিনি নিজে একাধারে শিল্পী, শিল্প-সমালোচক এবং নন্দলালকে দেখেছিলেন অত্যন্ত কাছ থেকে। নন্দলালের নিজের কথায়: "পুণ্য-দর্শন মহেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রদ্ধেয় ভূপেনবাবু এবং অপরাপর ঠাকুরের ভক্তদের কাছে যা শুনেছি, তাঁদের সেই উপদেশগুলি হজম করবার চেষ্টা করেছি মাত্র এবং শিল্পকাজে তাহার প্রয়োগ করবার আজীবন প্রচেষ্টা করেছি, তথাপি তাহা শেষ হয় নাই।"

নন্দলালের চেতনাকে সদা আলোকিত করে রেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় স্নাত নন্দলাল রচনা করেছেন রেখাচিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের চিত্র-মালা। এঁকেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবনালেখ্য, যার সঠিক চিত্রসংখ্যা আমরা আজও জানি না। তাঁর রেখাচিত্রে ধরা রয়েছে সেই আশ্চর্য রমণী গোপাল-মা—সর্ব অবস্থায় সর্বকর্মে শিশু গোপাল যাঁর নিত্য সঙ্গী। বেলুড়মঠের নানাকিছু রূপ-কল্পনার কাজে তাঁর শিল্প প্রতিভাকে নিয়োজিত করেছেন। কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের পৈত্রিকভিটায় তাঁর জন্মস্থানের উপর যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে তার রূপকার নন্দলাল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা নামে যিনি স্বাক্ষর করতেন সেই মহিয়সী সন্ন্যাসিনীর স্মৃতিপূত 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে'র রূপকল্পনা নন্দলালের। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রকাশিত বহু গ্রন্থের প্রচ্ছদ, পত্রিকাদির অলঙ্করণ নন্দলালকৃত।

রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত-মণ্ডলীর বাইরে বৃহত্তর জনসমাজের কাছে নন্দলাল কি অমেয় বিশ্বাসবলে বহন করে নিয়ে গিয়েছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা—তেমন একটি ঘটনা নন্দলাল জন্ম-শতবর্ষে আমাদের স্মর্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ও গান্ধীজি তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে আত্ম-নিয়োগ করেন একই সময়ে। নন্দলাল এই সময়ে গান্ধীজির জাতীয়তাবাদের আদর্শের প্রতি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হন। গান্ধীজি তাঁর জীবনে একটি শক্তিশালী প্রভাব, গান্ধীজির সংস্পর্শে নন্দলালের জীবনের ও শিল্পকর্মের একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়। নন্দলালের জীবনে ও জাতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে তা স্বল্প আলোচিত।

শিল্প বিষয়ে গান্ধীজির মতবাদ সম্বন্ধে তাঁর মনে ছিল বহু প্রশ্ন এবং সন্দেহ। শিল্পীরূপে গান্ধীজিকে অনুসরণ করার কোন পথ তিনি খুঁজে পাননি প্রথমদিকে। কিন্তু গান্ধীজির কাছ থেকে আহ্বান এল অকস্মাৎ, গান্ধীজি কংগ্রেসমণ্ডপের রূপকল্পনা ও মণ্ডপসমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করার অনুরোধ করলেন নন্দলালকে।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস উপলক্ষে আদিযুগ থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন নন্দলাল এবং যামিনী রায়কে মণ্ডপসজ্জার জন্য চিত্ররচনার ভার দেন। যামিনী রায়ের আঁকা বড় বড় পট দিয়ে

প্রদর্শনীর বাইরের দেওয়াল অলংকৃত করা হয়েছিল। এগুলি লোকশিল্পের রীতিতে আঁকা ভারতবর্ষের গ্রামীণ জীবনের ছবি, ভারতীয় শিল্প-কলার বিবর্তনকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করাই ছিল এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও বিভিন্ন মিউজিয়াম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল বহু শিল্পকর্মের নিদর্শন। অজন্তা ও বাগ গুহার ভিত্তি চিত্রের রঙীন প্রতিলিপি থেকে শুরু করে ভাস্কর্য স্থাপত্যের বহু আলোকচিত্র কালানুক্রমে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।

পরের বছর থেকে গান্ধীজি গ্রামে কংগ্রেস অধিবেশনের সিদ্ধান্ত করেন। ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনের পরিকল্পনা রচিত হয়। এবারও গান্ধীজি ফৈজপুর কংগ্রেসে মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব দেন নন্দলালের উপর এবং নন্দলালের কাছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও দাবি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। গান্ধীজি অর্থের অনটনের কথা জানান এবং সেই সঙ্গে মণ্ডপসজ্জায় গ্রামের উৎপন্ন ও সহজলভ্য দেশী উপকরণ ব্যবহার করার অনুরোধ জানান নন্দলালকে।

এ পর্যন্ত ঠিকাদাররাই কংগ্রেসের মণ্ডপ তোরণ ইত্যাদি নির্মাণ করে এসেছে। সেই প্রথম একজন শিল্পীকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। নন্দলাল কয়েকজন ছাত্রের সহায়তায় বাঁশ খড় দরমা চাটাই প্রভৃতি ব্যবহার করে বিরাট আকারের তোরণ ইত্যাদি তৈরি করেন ফৈজপুর কংগ্রেসে। শান্তিনিকেতনে এই ধরনের কাজ তিনি অবশ্যই করেছিলেন, কিন্তু শান্তিনিকেতনের বাইরে বাঁশের খুঁটির উপর খড়ের চালের তোরণ তৈরি করা তাঁর এই প্রথম। ফৈজপুর কংগ্রেসে একটি গ্রাম্য শিল্পেরও প্রদর্শনী করেন নন্দলাল। ফৈজপুর কংগ্রেসের মঞ্চসজ্জার প্রসঙ্গে বিনোদ-বিহারী লিখেছেন, "দেশের মাটির সঙ্গে নন্দলালের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ, গ্রামের পরিবেশ অথবা গ্রাম্য কারিগরদের অবদান সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এই কারণে ফৈজপুর কংগ্রেস সজ্জার পরিকল্পনা স্থানীয় উৎপন্ন জিনিসের সাহায্যে অনায়াসে সজ্জিত করতে তিনি সক্ষম হন। তাঁর শিল্পবোধের বিশেষ পরিচয় এই সময় তিনি বৃহত্তর সমাজের সামনে উপস্থিত করতে সক্ষম হলেন। অপরদিকে গান্ধীজি ও বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূচনা হয় এই সময় থেকে।"

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে মণ্ডপের রূপ কল্পনার জন্য আবার নন্দলালের ডাক পড়ে। ভারতবর্ষের নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার সঙ্গে নিজের চেতনাকে যুক্ত করা এবং শিল্পকে শৌখিন প্রদর্শনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বৈঠকখানার বাইরে এনে ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করার কাজে হরিপুরা কংগ্রেসের মণ্ডপসজ্জা নন্দলালের একটি সফল ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। নানা দিক থেকে হরিপুরা কংগ্রেস নন্দলালের একটি নতুন আত্ম-প্রকাশ। হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য তিনি তাঁর ছাত্রদের সহায়তায় সর্বসমেত ৮৩টি বড় মাপের প্যানেল আঁকেন। এই প্যানেলগুলির বিষয়বস্তু হল ভারতবর্ষের গৃহজীবনের ছবি, ভারতীয় জীবনে ক্রীড়াকৌশলী মল্লযোদ্ধা ও সৈনিক বৃত্তির মানুষ, ভারতের বিভিন্ন ধরনের বাদ্যকর ও লোকসঙ্গীত-শিল্পী, ভারতবর্ষের বিশাল বৃত্তিজীবী মানবসমাজ, পশুপাখি ও মঙ্গল চিহ্ন ইত্যাদি। ঐতিহাসিক বা বিখ্যাত চরিত্রের মানুষের চিত্রের পরিবর্তে ভারতবর্ষের দরিদ্র, অবজ্ঞাত ও অতি সাধারণ বৃত্তিজীবী মানুষ যাদের প্রতিদিনের শ্রমের বনিয়াদের উপর সভ্যসমাজের বিশাল প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চিত্ররূপ এই ধরনের জাতীয় সমাবেশে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা ইতিহাসে অবশ্যই অভূতপূর্ব। হরিপুরা কংগ্রেসে ভারতবর্ষের বৃত্তিজীবী শ্রমজীবী মানুষের



শান্তিনিকেতনের শ্রীপল্লীতে বাসভবনের কক্ষে শিল্পাচার্য নন্দলাল

শ্রীবিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে





উপরে ঃ আলমোড়ার পথ ।
(১৪ জানুআরি, ১৯৪২)

নীচে ঃ বারাণসীর কেদার ঘাট ।
(৪ ফেব্রুআরি, ১৯৪১)

পত্রে অঙ্কিত নন্দলালের অপ্রকাশিত স্কেচ্ ।

শ্রীবিশ্বরূপ বসুর … সৌজন্যে

প্রতিনিধিত্ব করেছিল নন্দলালের এই চিত্রমালা। এই অসামান্য চিত্রমালা আমাদের মনে করিয়ে দেয় ঊনবিংশ শতকের সেই আশ্চর্য দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দৃপ্ত উক্তি: "তুমিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই,···মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ···।" প্রসঙ্গতঃ অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের জীবন ও শিল্পের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার বিনোদবিহারীর উক্তি উল্লেখ্য: "হরিপুরা কংগ্রেস নন্দলালের অন্যতম কীর্তি। হরিপুরা কংগ্রেসের বিরাট পরিকল্পনা নন্দলাল তাঁর ছাত্রদের সাহায্যে সম্পন্ন করেন। এই মণ্ডপসজ্জার আদর্শ পরবর্তী কালের কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানের সজ্জার আদর্শরূপে গৃহীত হয়। নন্দলাল ও তাঁর সহকারীদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা অপরদিকে সর্বসাধারণের সঙ্গে অনায়াসে মিলবার শক্তি এবং নন্দলালের কর্মক্ষমতা যুগপৎ তৎকালীন নেতাদের মনে শিল্পীদের সম্বন্ধে নতুন চেতনা জাগিয়েছিল। তাঁরা অনুভব করলেন যে শিল্পীরা সৌখিন সমাজের প্রতিনিধি নয়, তাঁরা কর্মী। জাতীয় জীবনে তাঁদের অবদান উপেক্ষা করা চলে না। গান্ধীজি নন্দলালের মতো প্রতিভাবান শিল্পীকে দড়ি-দড়া বাঁধবার কাজে নিযুক্ত করেছেন—এই ধারণায় কোন কোন শিল্পরসিক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু নন্দলালের মনে এবিষয়ে কোন ক্ষোভ ছিল না। শিল্পীরা দেশের কাজে হাত লাগাতে পারল এবং বৃহৎ জনতার সামনে শিল্পের সম্ভার উপস্থিত করা গেল—এই দিক দিয়ে নন্দলাল গান্ধীজির দাবী পূরণ করেছিলেন।" কিন্তু গান্ধীজির দাবী পূরণ ছাড়াও নন্দলালের এই প্রচেষ্টার পিছনে অবশ্যই ছিল মহত্তর প্রেরণা এবং তা চিনে নিতে আমাদের ভুল হয় না।

যে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী), তারা nature (প্রকৃতি)-টাকেই ideal (আদর্শ) ব'লে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression (বিকাশ) শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই ideal (আদর্শ) ব'লে ধরে, সেটা ঐ ভাবই nature-এর (প্রকৃতিগত) শক্তিসহায়ে শিল্পে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের nature (প্রকৃতি)-ই হচ্ছে Primary basis of art (শিল্পের মূল ভিত্তি); আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর Ideality (প্রকৃতির অতীত একটা ভাব) হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ। ঐরূপে দুই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধ'রে শিল্পচর্চায় অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই নিজ নিজ ভাবে শিল্পোন্নতি করছে। ও-সব দেশের এক-একটা ছবি দেখে আপনার সত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ব'লে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিদ্যার যখন খুব বিকাশ হয়েছিল, তখনকার এক-একটি মূর্তি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভুলিয়ে একটা নূতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে। ওদেশে এখন যেমন আগেকার মতো ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নূতন নূতন ভাববিকাশ-কল্পে ভাস্করগণের আর চেষ্টা দেখা যায় না। এই দেখুন না, আপনাদের আর্ট স্কুলের ছবিগুলোতে যেন কোন expression (ভাবের বিকাশ) নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্য-ধ্যেয় মূর্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক expression (বহিঃপ্রকাশ) দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করলে ভাল হয়।

—স্বামী বিবেকানন্দ



কামারপুকুর থেকে লেখা

নন্দলালের দুটি অপ্রকাশিত পত্র

[শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু 'উদ্বোধন' তথা সমগ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রবাহের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ-সূত্রে জড়িত। বেলুড়মঠস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের অলঙ্করণ ছাড়াও কামারপুকুরে শ্রীমন্দিরের রূপকল্পনাও নন্দলালেরই অনন্য শিল্প-কীর্তি। তাঁর অজস্র শিল্পকর্ম ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদির মধ্যে উল্লিখিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রটিকে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। এযাবৎ অপ্রকাশিত কয়েকখানি চিঠি এবং স্কেচ্ সহ বর্তমান পত্র দুইটিও নিতান্তই পারিবারিক; কিন্তু শিল্পাচার্যকে তাঁর একান্ত ঘরোয়া পরিচয়ে ও এক বিশেষ পরিবেশে খুব নিকট থেকে অবলোকনের পক্ষে সহায়ক। শিল্পী-পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীবিশ্বরূপ বসু ও তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী মাননীয়া শ্রীমতী নিবেদিতা বসুর সহৃদয় আনুকূল্য এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়।]

॥ ১ ॥

বিশু, আমরা এখানে ভালয় ২ এসেছি। সব ভাল আছি। ফিরবার বেলা খুব সম্ভব আরামবাগ বর্দ্ধমান হয়ে যাব—দেখি কি হয়। মন্দির আরম্ভ হয়ে গেছে। ১লা ভিত্তিস্থাপন হবে। বিষ্ণুপুর থেকে প্রায় রোজই পাথর নিয়ে ট্রাক আসে, তাতেও ইচ্ছা করলে যেতে পারি।

আমাদের জন্য একটা ঘর দিয়েছেন। সকলে আছি।

২৭।২।৪৯

১।২রা নাগাৎ ফিরব। আঃ নন্দলাল বসু

॥ ২ ॥

বাবাকে

আমি, পিরুমল, দিদা, ইটা দিদা সব ঠাকুরের বাড়ীতে আছি। আজ সকালে দিদা ও ইটা দিদা জয়রামবাটীতে মার বাড়ী গেলেন। আমি ও পিরুমল এখানেই থাকলাম। এখানে বেশ ঠাণ্ডা। ইতি—

আঃ নন্দলাল বসু।



কামারপুকুর মঠের তদানীন্তন চিত্ররূপ সহ নন্দলালের পত্র।

পৃঃ ৫৭৮

POST CARD

ADDRESS ONLY

INDIA POSTAGE

S. Biswarup Basu

Santiniketan

Birbhum

W. Bengal

নন্দলাল বসু-অঙ্কিত

কামারপুকুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃগৃহের রেখা-চিত্র সহ পত্র।

পৃঃ ৫৭১

শ্রীবিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে

জীবনশিল্পী আচার্য নন্দলাল—১৮৮২-১৯৬৬

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন

[রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রতিভায় ত্রিবেণীধারায় প্রত্যক্ষতঃ অভিস্নাত বর্ষীয়ান্ শিল্পী,—শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিল্পাচার্য নন্দলালের প্রথম ছাত্রচতুষ্টয়ের অন্যতম—অবনীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত।]

দিনটি ছিল ১৫ অগস্ট, ১৯৮৩। স্বামী অজজানন্দ মহারাজকে কথাপ্রসঙ্গে জানালাম যে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে যে চারজন ছাত্রকে নিয়ে শিল্পাচার্য নন্দলাল শান্তিনিকেতনে প্রথম কলা-ভবনের কাজ শুরু করেছিলেন আমি তাদেরই একজন,—দীর্ঘকাল শিল্পাচার্যের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। এইসব কথা শুনে স্বামীজী বললেন, নন্দলাল জন্ম-শতবার্ষিকী পালন এখনও চলছে, রামকৃষ্ণ মিশনের পত্রিকা উদ্বোধনের জন্য নন্দলালের স্মৃতিচারণ বিষয়ে একটি লেখা দেবার জন্য। সহাস্যে উক্তি করলেন: "সাধুদর্শনে কিছু হাতে করে নিয়ে আসতে হয়, আপনার লেখাটা পেলেই আমি কিছু পেয়েছি বলে মনে করব।" লেখা দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে হল। পূর্ব নির্ধারিত কাজের জন্য তিনি অন্যত্র চলে গেলেন।

শিল্পাচার্য নন্দলালকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খোলা প্রান্তরে যে দুটি ছাতিম গাছের ছায়াতে বসে উপাসনা করেছিলেন সেই গাছ দুইটি তখনও বেঁচে ছিল। গাছ দুটিকে আশ্রয় করে ওঠা মালতী ফুলের পুরানো গাছের বড় বড় লম্বা মোটা কয়েকটি লতা ঝুলে পড়েছিল। অপরাহ্ণ বেলায় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের আমরা দু-তিনজন বালক লতায় বসে দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম একজন মধ্যবয়সী সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক ধীরে ধীরে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। পরনে তাঁর ছিল ভায়েলার গরম চুড়িদার পাঞ্জাবী। হাতে একটি সাদা পোস্টকার্ড নিয়ে লাল নীল মোটা পেন্সিল দিয়ে লতায় বসা আমাদের ছবি আঁকতে লাগলেন। আঁকা শেষ হলে ধীরে ধীরে যেমনি ভাবে এসেছিলেন তেমনি ভাবেই চলে গেলেন। খোঁজ করে জানলাম তিনিই নন্দলাল বসু। প্রবাসী পত্রিকাতে ছাপানো তাঁর অনেক ছবি দেখেছি, তাই তাঁর নামটা জানা ছিল।

ঐ দিনের সকালের দিকে আশ্রম-গুরু রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে উচ্চপ্রশংসা সহ নন্দলালকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। তখন শিল্পীর বয়স বত্রিশ বছর। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই নবীন শিল্পীকে সেদিন যেভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন, তাতেই বুঝা যায় নন্দলালের প্রতিভার উপলব্ধি তিনি তখনই করতে পেরে-ছিলেন। তার কারণ ইতিমধ্যেই এই নবীন শিল্পী তাঁর কতকগুলি শ্রেষ্ঠ শৈব চিত্র এঁকে শিল্পী-মহলে যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেছেন। চিরসুন্দর শিবের রূপকে তিনি আবার নতুন করে তাঁর চিত্রে এঁকে দিয়েছিলেন। যাত্রাদলের শিব দেখে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা সেদিন নন্দলালের শিবকে দেখে খুবই বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। সমালোচকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুরেশ সমাজপতি। শিল্পীর তখনকার বিখ্যাত ছবির মধ্যে শিব-সতী, উমার তপস্যা, সতীর অগ্নিপরীক্ষা, অগ্নিদেবতা, পার্বতী ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আচার্য নন্দলাল বসু ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র বসুর কর্মস্থল বিহারের মুঙ্গের জেলা অন্তর্গত খড়্গপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ যখন কলকাতা

সরকারী আর্ট স্কুলে উপাধ্যক্ষের পদে কাজ করছিলেন তখন নন্দলাল তাঁর কাছে চারুকলা বিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই শিক্ষাকাল ছিল পাঁচ বছরের জন্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পাচার্য নন্দলালকে বেশ কয়েকবার একটি কথা বলতে শুনেছি, কথাটি হল: "যখনই আমরা কোন সুন্দর জিনিস দেখে মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বলি বাঃ ভারি সুন্দর তো তখনই আমরা তার কাছে ঋণী হয়ে যাই। এই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে আমরা কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, শিল্প সৃষ্টি করে থাকি, ঋণ শোধ না করে উপায় নেই।" এই সুন্দর জগৎকে দু-চোখ ভরে দেখে যে আনন্দ একদিন পেয়েছিলেন, তারই ঋণ শোধ করতে গিয়ে শিল্পাচার্য নন্দলালকে রঙ, তুলি ধরতে হয়েছিল এবং তারই সঙ্গে নিজেকে জানাও শুরু হয়েছিল। এই জানার মধ্যে কি মহৎ আনন্দ ও রস আছে শিল্পী মাত্রই সেকথা উপলব্ধি করে থাকেন। শিল্পী-গুরু নন্দলাল তাঁর দীর্ঘ জীবন ধরে সেই আনন্দ ও রসেরই সাধনা করে গেছেন।

একথা খুবই সত্য যে, শিল্পীর সত্তার যথার্থ রূপের আভাস তার আঁকা ছবিতে প্রতিফলিত হবেই, এর থেকে সে নিজেকে কখনও লুকিয়ে রাখতে পারে না। তাই একজন শিল্পীর আঁকা ছবি দেখে তাঁর চরিত্র ও মানসিকতার ইঙ্গিত পাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। ভাল করে বিচার করলে দেখতে পাব নন্দলালের রূপ-সৃষ্টি-গুলি একটা বলিষ্ঠ, দৃঢ়, সংযত, শিল্প নৈপুণ্যের গুণে উজ্জ্বল হয়ে আছে। চিত্রে আদর্শ, ভাব ও রস সৃষ্টির প্রয়োজনে ভাব-প্রবণতাকে সংযত করা হয়েছে। ভারতীয় শিল্পের প্রাচীন-ধারাকে অস্বীকার না করে তাকে বর্তমানের উপযুক্ত করে তাতেই নন্দলাল রূপসৃষ্টি করে গেছেন। সেই ধারাকে তাঁর কাজের দ্বারা আরো সমৃদ্ধ করে গেছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পীদের কাজ বিশেষ যত্ন সহকারে দেখেছেন, তার থেকে আনন্দ পেয়েছেন, কিন্তু প্রভাবিত হওয়া অথবা নিজেকে কখনও বিকিয়ে দেননি। তিনি বলতেন, ভারতীয় শিল্পী হয়েছি তার জন্য আনন্দ ও গর্ব বোধ করি। ভারতীয় শিল্পের যদি পুনরাবৃত্তি কখনও করে থাকি তাও ভাল, কিন্তু বিদেশী শিল্পীদের কাছ থেকে ধার করে গৌরব বোধ করবার মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। প্রসাদ গ্রহণে সম্মান আছে, আনন্দ আছে, কিন্তু উচ্ছিষ্ট গ্রহণে অপমান ও হীনতা আছে। এই উক্তির মধ্যে নন্দলালের সংকীর্ণতার পরিচয় পাই না, কিন্তু দেশের শিল্পধারার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় আমরা উপলব্ধি করতে পারি। যার প্রধান কারণ নন্দলাল ভারতীয় শিল্পকে গভীরভাবে দেখবার, বুঝবার চেষ্টা করেছেন। যার জন্য ভারতের সর্বত্র তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, দেখেছেন অজন্তা, ইলোরা, বগি-গুহা, মহাবলিপুরম্, এলিফেন্টা, দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি, উড়িষ্যার মন্দির সকল, কোনারক, সারনাথ, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ ইত্যাদি। রাজপুত, মুঘল, কাংড়া, বাসঁলী চিত্রাদি এবং দক্ষিণ ভারতের সুন্দর ব্রঞ্জের মূর্তিগুলি দেখে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, পৃথিবীর যে কোন দেশের শিল্প বা আর্টের অবদানের তুলনায় ভারতের আর্টের অবদান কিছুমাত্র কম নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি উন্নত। শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের আত্মার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি যেমনি নিষ্ঠাবান ছিলেন আবার তেমনি বর্তমান চিন্তাধারার প্রতিও সচেতন ছিলেন। তাঁর শিল্পসৃষ্টির গোড়ার দিকে ভারতীয় অতীত ও বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির কাজ ভাল করে দেখেছেন, অনুশীলন করেছেন যার জন্য তাঁর শিল্পসৃষ্টির বুনিয়াদ দৃঢ় ও বলিষ্ঠ এবং

সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। শিল্পাচার্য নন্দলাল একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, তেমনি আবার মানব-মহত্ত্বের অধিকারী ও মানব-দরদী ছিলেন।

শিল্পাচার্য নন্দলাল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শান্তিনিকেতন, কলাভবনে আসা শুরু করলেও স্থায়ীভাবে কলাভবনের কাজে এসে যোগদান করেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ, এখানকার বিদ্যালয় ও কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য, তাঁর সংগীত শোনা, এখানকার প্রকৃতি এবং গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথে চলা সাধারণ মানুষ, সাঁওতাল, এই সকলের সঙ্গে মিলে, তাদের সুখ-দুঃখের পরিচয় পেয়ে তিনি যেমনি আনন্দিত হয়েছিলেন তেমনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন এই সকলকে নিয়ে শিল্পসৃষ্টি করবার অনেক সুযোগ আছে। এরাও শিল্পীকে প্রেরণা যোগাতে পারে। তাই শান্তিনিকেতনকেই তাঁর শিল্পসাধনার উপযুক্ত স্থান বলে বেছে নিয়েছিলেন।

তাঁর শিল্পশিক্ষাদানের ধরনটা ছিল একটু নতুন রকম। স্টুডিয়োতে বসে ঘড়ি ঘণ্টা ধরে কিছু ড্রইং, কিছু রঙ লাগানোর শিক্ষা দিলেই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। ছাত্রছাত্রীদের মনকে যথার্থভাবে শিল্পী-মনা করে তোলার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। তার জন্য প্রকৃতির সৌন্দর্যকে নানা বৈচিত্র্য প্রকাশের মধ্যে দেখবার জন্য তাদের নিয়ে যেতেন। কতবার তাঁর সঙ্গে কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যে খোয়াই আর খোলা প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি। নক্ষত্রখচিত অন্ধকার রাত্রিতে খোলা প্রান্তরে চুপটি করে আমাদের বসিয়ে দিয়েছেন, কোন কথা নয়, কোন উপদেশ নয়। বসন্ত কালে পলাশ, শিমূল ফুলের শোভা দেখাবার জন্য কোপাই নদীর পাড়ে পিক্‌নিকের আয়োজন করিয়েছেন। তিনি ভালভাবে জানতেন, ছাত্রছাত্রীদের মনে যদি একবার সৌন্দর্য চেতনাবোধ জাগিয়ে দিতে পারেন, শিল্পসৃষ্টির উৎসের সন্ধান পাইয়ে দিতে পারেন, তাদের মন ভাবতে ও কল্পনা করতে শেখে তবে হাত আপনি ঠিকমতে চলতে পারবে। তাই শিল্পী ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্প-মনা করবার প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। ভাল কবিতা, ভাল গান, বিশেষ করে রবীন্দ্রসংগীত শোনবার জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি দুঃখ করে বলতেন: "আমি তো গান গাইতে পারি না, কিন্তু গান শুনতে বড় ভাল-বাসি।" কলাভবনের স্টুডিয়োতে পরপর সারিবদ্ধ হয়ে বসে আমরা ছবি আঁকতাম। আমার আঁকার জায়গায় রঙ-তুলির সঙ্গে থাকতো বাঁশী ও এস্রাজ বাজনা। ছবি আঁকার মাঝে মাঝে খেয়াল মতো বাঁশী বা এস্রাজে পরপর রবীন্দ্র সংগীত বাজাতাম। একবার কিছুকালের জন্য কলাভবনের বাইরে ছিলাম, তখন মাস্টার মশায় নন্দলাল আমাকে চিঠি লিখেছিলেন: "ধীরেন, তুমি চলে যাওয়াতে কলাভবনে ছবি আঁকার সঙ্গে আর গান শুনতে পাই না। এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি ছবি আঁকায় গানের কত প্রয়োজন, গান আর ছবি আঁকা এক সঙ্গে কত সুন্দরভাবে চলতে পারে।" প্রতি সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই দিনকার নতুন রচিত গান আমাদের শেখাতেন। তখন সেখানে উপস্থিত থাকতেন রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ, সংগীত ভবনের অধ্যক্ষ ভীমরাও শাস্ত্রী, গানের ছাত্রছাত্রীগণ, তাছাড়াও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন, এবং কলা-ভবনের অধ্যক্ষ নন্দলাল বসু। নন্দলালবাবু রবীন্দ্র সংগীত শুনতে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়ে একবার তিনি বলেছিলেন, উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকা চাই। শ্রদ্ধাবান ছাত্র গুরুর বিদ্যা সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারে।

গুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে নন্দলালের যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বন্ধ দেখেছি বর্তমানকালে তা একেবারে দুর্লভ বলা চলে। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে পুত্রাধিক ভালবাসতেন তেমনি নন্দলালও অবনীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন। আজকাল কিছু লোকের মুখে বলতে শোনা যায় যে, নন্দলাল তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথকে শিল্পী হিসাবে অতিক্রম করেছেন বলে। এই বিষয়ে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। শান্তিনিকেতনে একটি সভায় একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে মন্তব্য করেন যে, মাস্টার মশায় নন্দলাল শিল্পী হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়। একথা শুনেই মাস্টার মশায় নীরবে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। পরে তিনি মন্তব্য করেন: "যেদিন আমি জানব আমার গুরু অবনীন্দ্রনাথকে আমি শিল্পী হিসাবে অতিক্রম করেছি, সেদিন যেন আমার মৃত্যু হয়।" এতে গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রমাণিত হয়। কলাভবনের সকল ছাত্রছাত্রী তাঁদের গুরু নন্দলালকে মনেপ্রাণে ভালবেসে ভক্তি, শ্রদ্ধা করে থাকেন।

গুরু নন্দলাল উপলব্ধি করেছিলেন, যে-সব ছাত্রছাত্রী নবমেঘে ঢাকা অন্ধকার কালো আকাশ দেখে রোমাঞ্চিত হয় না, বসন্তকালের পুষ্পরাজির বিচিত্র রঙের সমাবেশ দেখে পুলকিত হয় না ও তার আঘ্রাণ পায়নি, সমুদ্রের বিশালতা, পাহাড়ের উচ্চতা, মানব চরিত্রের মাহাত্ম্য দেখেনি তাদের কেমন করে শিল্পী করা যায়। দেশভ্রমণ, প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পপ্রধান স্থানগুলি দর্শন শিল্পশিক্ষার বিশেষ অঙ্গ বলে তিনি মনে করতেন। তাই তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বছরে একবার শিক্ষা-ভ্রমণে বের হতেন। তাছাড়া শিল্পের ইতিহাস, শাস্ত্র, দর্শন, সৌন্দর্যতত্ত্ব বিষয়ে ছাত্রদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন একথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। এই দিক থেকে ভেবেই উক্ত বিষয়ে পড়া ও আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী থেকে স্টেলা ক্রামরিশ শান্তিনিকেতনে এলেন। তিনিও এই অধ্যাপনায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই আমরা ইউরোপের মডার্ণ-আর্টের প্রথম আলোড়নের কথা জানতে পেরেছিলাম। কলাভবনের গোড়ার দিকে শিল্পের ইতিহাস, কিংবা শাস্ত্র শিক্ষাদানের কোন ক্লাশের ব্যবস্থা ছিল না। গুরু নন্দলাল ছাত্রদের ছবি আঁকা শিক্ষা সংক্রান্তে প্রয়োজনমতো শিল্পের ইতিহাস, শাস্ত্র, সৌন্দর্যতত্ত্বের বিষয়ে সুন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। এইভাবে তাঁর কাছ থেকে শিল্প বিষয়ে অনেক কথা আমরা শিখতে পেরেছি। সৌন্দর্য সৃষ্টির যে-কোন প্রয়াসকেই তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। শিল্পীর রূপসৃষ্টি কেবলমাত্র চিত্ররচনায় সীমিত থাকুক নন্দলাল তা চাইতেন না। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনের সঙ্গেও শিল্পের সম্বন্ধ থাকা উচিত। তাই শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠান, উৎসবাদিতে আলপনা দেওয়ার রীতি প্রচলিত হল। রবীন্দ্রনাথের অভিনয়, ঋতু-উৎসব —তার মঞ্চসজ্জা, অভিনেতাদের বেশভূষা নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন। বর্তমানকালে দেশের কারুশিল্পের প্রগতিতে নন্দলালের অবদান উপেক্ষনীয় নয়। কলাভবনে তাই কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

কলাভবনের কাজে নন্দলাল নিজেকে সম্পূর্ণ-ভাবে নিয়োজিত করেছিলেন, একথা সত্য হলেও শান্তিনিকেতনে আশ্রমজীবন ও এখানকার সামাজিক জীবন থেকে নিজেকে কখনও বিচ্ছিন্ন রাখেননি। যেসব উৎসব-স্থানে অলঙ্করণের প্রয়োজন হত—কলাভবনের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আলপনা ইত্যাদি দিয়ে শ্রীমণ্ডিত করে দিতেন। মনের দৃঢ়তা, সেবাপরায়ণতা, বন্ধু-বাৎসল্য ও উদারতা এইসব চারিত্রিক গুণের জন্য আশ্রমবাসী ছোট বড় সকলেই এই মাস্টার মশায়কে

ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁর চারিত্রিক গুণের বিষয়ে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মহাত্মা গান্ধী তাঁর ফিনিক্‌স্ আশ্রমের ছাত্রদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে উঠেছিলেন। সেই পুণ্যস্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিবছর ১০ মার্চ গান্ধীপুণ্যাহ দিবস এখানে পালিত হয়ে থাকে। এই দিনটিতে রান্নাঘরের ঠাকুর, চাকর, আশ্রমের সকল ভৃত্যদেরই ছুটি হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীরা মিলে রান্নাকরা, বাসন-মাজা, কুয়ো থেকে জলতোলা আশ্রমের প্রাঙ্গণগুলি পরিষ্কার করা এসব কাজই নিজেরা করেন। এক সময়ে শান্তিনিকেতনে খাটা পায়খানার ব্যবস্থা ছিল। এই দিনে মেথরদেরও ছুটি থাকায় নন্দলাল প্রতিবৎসর গান্ধীপুণ্যাহ দিবসে পায়খানার ময়লা টিনগুলি পরিষ্কার করবার দায়িত্ব নিজে নিতেন। অন্য সব কাজের তুলনায় এই কাজটি খুবই কঠিন। এইকাজে তাঁর সঙ্গী হতেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হরিদাস মিত্র আর কলাভবনের কিছু ছাত্র।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রতি বুধবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়ে থাকে। মন্দিরের প্রবেশ পথের ধারে একটি কাঁঠাল গাছে একটি মৌচাকের বাসা ছিল। উপাসনার শেষে সকলে যখন মন্দির ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল তখন কোন একটি ছেলে মৌচাকে ঢিল ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। অন্য একটি ছেলে যখন ঐ গাছের ধার দিয়ে পথে চলেছিল তখন মৌমাছির দল তাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে কামড়াতে শুরু করে দেয়। চীৎকার দিয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে ছেলেটি মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। আত্মরক্ষার জন্য ছোট, বড় সকলেই চারদিকে হৈ চৈ করে যখন পালাতে থাকে তখন শিল্পাচার্য নন্দলাল সকল বিপদ তুচ্ছ করে পিছন থেকে ছুটে এসে ছেলেটিকে মাটি থেকে উঠিয়ে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরে একটি কাপড়ে ঢেকে নিকটে শান্তিনিকেতন নামক বড় বাড়িতে গিয়ে ঢুকলেন। দুজনেই মৌমাছির কামড়ে জর্জরিত হয়েছিলেন। এই ধরনের সাহসিকতা তাঁর চরিত্রের স্নেহ ও দৃঢ়তার পরিচায়ক। মানব মহত্বের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি নিজে "আচরি ধর্ম পরেরে শেখায়"। নিজে কাজটি করে তবেই অন্যদের সেইকাজ করতে বলতেন। অন্য আরেকটি ঘটনা হল: একবার জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনে এসেছি বেশ কিছুদিন পরে। মাস্টার মশায়কে প্রণাম করতে গেলে তিনি আমাকে দেখে ভারি খুশি হয়ে বলেন: "চল একটা পিক্‌নিকের ব্যবস্থা করা যাক।" তারপর দিন সকালের দিকে খোয়াই পার হয়ে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে গোয়ালপাড়া গ্রামের দিকে চলেছি। পিক্‌নিকের স্থান নির্বাচন গোয়ালপাড়ার কোপাই নদীর ধারে বড় বড় বট, অর্জুন, আমগাছের ছায়াতে করা হয়েছে। কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা আনন্দ সহকারে পাচক ও ভৃত্যদের সহায়তায় রান্নার কাজে ব্যস্ত। তাদের কেউ কেউ স্কেচ করছে, আবার কেউ কেউ সতরঞ্চি পেতে একত্রে বসে রবীন্দ্র সংগীত গাইছে।

আমরা কয়েকজন মাস্টার মশায়ের সঙ্গে বসে গল্প করছিলাম। এমন সময় লক্ষ্য করলাম রিক্সা করে একজন লোক এসে উপস্থিত হল। রিক্সা থামার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি অজ্ঞান হয়ে রিক্সার গায়ে ঢলে পড়ল, তার মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরিয়ে আসতে লাগল। আমি এই দৃশ্য দেখে একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম। মাস্টার মশায় তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে লোকটির মাথা সস্নেহে নিজের হাতে তুলে ধরলেন, অন্য হাতে নিজের জামার পকেট থেকে রুমাল বের করে তার মুখটি পরিষ্কার করে মুছে দিলেন। পরে মাস্টার মশায়ের কাছ থেকে

লোকটির পরিচয়ে জেনেছিলাম নিয়মাধীন অন্ধ কালু মিঞা গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করবার জন্য শান্তিনিকেতনে প্রথমে আসে। মাস্টার মশায় ও শান্তিদেব ঘোষের চেষ্টায় সংগীতভবনে ভর্তি হয়ে রবীন্দ্র সংগীতে ও সেতারে ডিপ্লোমা কোর্স পাশ করে। ওর মৃগীর রোগ ছিল। কলাভবনের ছাত্রাবাসে থাকার ও রান্নাঘরে খাবার ব্যবস্থা মাস্টার মশায় করে দেন। পরে বিশ্বভারতী থেকে প্রতিমাসে একটা আর্থিক সাহায্য পেত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দিরে রবীন্দ্র ধর্ম সংগীত গাওয়া তার কাজ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছিলেন সুরদাস। মাস্টার মশায় ছিলেন যথার্থ বড় মানুষ। আর্থিক সম্পদে নয় কিন্তু অন্তরের ঔদার্যে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে দেশী ও বিদেশী বহু শিল্প ও শিল্পীদের বিষয়ে কত আলাপ আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে তাঁকে কখনও ভুলক্রমেও কোন শিল্পীর বিষয়ে হীন মন্তব্য করতে শুনিনি। শিল্পের যে-কোনও কাজ যেমন চিত্র, ভাস্কর্য, কারুশিল্প সবকেই তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন! তাই বলতেন, শিল্পীর হাত যেখানেই স্পর্শ করে সেটাই সোনা হয়ে যায়, যেন স্পর্শমণি। তুচ্ছ জিনিসও শিল্পীর হাতের ছোঁয়া পেলে অমূল্য হয়ে দেবতার অর্ঘের সম্মান লাভ করে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দেশ জুড়ে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন চলেছে। মহাত্মা মন্তব্য করলেন, দেশে এখন আর্টের প্রয়োজন নেই। এই মন্তব্যকে নিয়ে শিল্পীমহলে বেশ আলোচনা হয়েছিল। সেই বছরেই মহাত্মা শান্তিনিকেতনে আসেন। উত্তরায়ণ প্রান্তরে তখনও বড় বড় বাড়িঘর তৈরি হয়নি। গোড়ার দিকের খড়ো-চালা মাটির ঘর যা পরবর্তীকালে পাকা বাড়িতে রূপান্তর হয়ে কোনার্ক নামে পরিচিত সেই মাটির ঘরে মহাত্মা সস্ত্রীক এসে উঠেছিলেন। বিকেলের দিকে একদিন গুরু নন্দলাল আমাদের কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে কোনার্ক বাড়িতে মহাত্মার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। যাবার পূর্বে আমাদের বললেন, দেশে এখন আর্টের প্রয়োজন নেই একথায় মহাত্মা কী বলতে চেয়েছেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করব। কোনার্কের মাঝের ঘরে ঘর জুড়ে একটি বড় সতরঞ্চি পাতা, তার উপরে তোষক পাতা, পরিষ্কার খদ্দরের চাদরে ঢাকা, মহাত্মা উত্তরের দরজার দিকে মুখ করে মাঝখানে বসে পায়েসের মতো কিছু খাবার খাচ্ছিলেন, সামনে একটি বড় বাটি রাখা আছে, একপাশে মহাত্মার স্ত্রী কস্তুরবাই দেবী বসে মহাত্মাকে খাওয়াতে সাহায্য করছিলেন। সশিষ্য নন্দলালবাবুকে দেখে মহাত্মা সাদরে আহ্বান করলেন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে আমরা মহাত্মা ও তাঁর স্ত্রীকে পায়ে ধরে প্রণাম করে সতরঞ্চিতে বসে পড়লাম। মাস্টার মশায়ও সামনের দিকে গিয়ে একপাশে বসলেন। মহাত্মা খেতে খেতেই মাস্টার মশায়ের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। সুযোগ মতো মাস্টার মশায় আমাদের যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সেই কথাটি উত্থাপন করলেন। মহাত্মাকে বললেন কি কারণে দেশে এখন আর্টের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন সেকথার অর্থ জানতে চান। মহাত্মা এই কথা শুনে বাঁ পাশের পশ্চিমের জানালার বাইরে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তখনও ঐ সব প্রান্তরে লোকের ঘন বসতি হয়নি, সবই খোলা মাঠ। দূরে পিয়ার্সন পল্লী সাঁওতাল গ্রামের ঠিক মাথার উপরে অস্তগামী সূর্য পশ্চিমের আকাশকে রক্তরাগে রাঙিয়ে দিয়েছে। এক অপূর্ব দৃশ্য! মহাত্মা ধীরে ধীরে সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মাস্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন: "আমি এখানে বসে যদি এমন



শান্তিনিকেতন শ্রীপল্লীতে শিল্পাচার্য নন্দলাল নিজের ঘরে।

আলোকচিত্রী : শ্রীধীরেন দেববর্মন

১৯৩৩



শান্তিনিকেতনে কলাভবন আরম্ভ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে

বামদিক হইতেঃ অসিত কুমার হালদার, সুরেন্দ্র নাথ কর, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন, হীরাচাঁদ দুগার, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ, অর্ধেন্দু প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোকচিত্রীঃ গৌরগোপাল ঘোষ

সুন্দর সূর্য অস্ত যাবার দৃশ্য দেখতে পাই তবে অস্তগামী সূর্যের ছবি এঁকে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখার মধ্যে কি কোন সার্থকতা আছে?" মাস্টার মশায় মহাত্মার সঙ্গে এবিষয়ে কোন প্রকার যুক্তি-তর্ক করলেন না। তারপরে মহাত্মাকে ত্যাগ করে যখন রাস্তা ধরে কলাভবনের দিকে চলেছিলাম তখন মাস্টার মশায় বললেন, শিল্পীরাও শুধু অস্তগামী সূর্য আঁকে না, তার সঙ্গে শিল্পী তার মনের ভাব, রসসৃষ্টির একটা চেষ্টা থাকে। প্রকৃতির দৃশ্যের নকল মাত্র শিল্পীরা করে না, কিন্তু কাব্যিক মন নিয়ে একটা ভাবকে ও রসকে প্রকাশ করবার চেষ্টাও করে তাদের চিত্রে।

কলকাতায় বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, গানের দলের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়ে উঠেছি। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, নন্দলালবাবু, সুরেনবাবুও কলকাতায় দলের সঙ্গে এসেছেন। দিনের বেলায় দলের সকলের সঙ্গে বসে গুরুদেবের বাড়িতে ভাত খাওয়া হত। রাত্রে নন্দলাল-বাবু ও আমি অবনবাবুর সঙ্গে রোজ আহার করতাম। খাবার টেবিলে বসে আহারের সময়ে নানা রকম গল্প হত। খাওয়ার শেষে অবনবাবুদের দোতলায় বসবার হল ঘরটিতে গিয়ে পাশাপাশি রাখা দুইটি জাজিমের উপরে তাকিয়া নিয়ে শুয়ে পড়তাম। ঘরের মধ্যে ভারতীয় ধরনের নূতন নকশায় তৈরি অনেক সুন্দর সুন্দর কাঠের আসবাবপত্র সাজানো থাকতো। ঘরের দেয়ালে রাজপুত, মুঘল, কাংড়া ও সমসাময়িক শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ইত্যাদির আঁকা ভাল ভাল ছবি সব টাঙানো ছিল। ঘরের আলো নিবানো, তাই অন্ধকার, বড় বড় কাচের জানালা দিয়ে আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে দেখা যায়, অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে, জল পড়ার শব্দ কানে আসে। ঘুম আসার আগ পর্যন্ত মাস্টার মশায় দু-চার কথা বলছেন তাই চুপটি করে শুনে যাচ্ছি। তিনি বলে উঠলেন, ধীরেন এই নাও। অবাক হলাম তাঁর কথা শুনে, ভাবলাম এই রাত্রে কি দিচ্ছেন বলে। অন্ধকারে হাত পাতলাম। তিনি কি যেন হাতে দিলেন। কাছে হাত আনতেই রসুনের তীব্র গন্ধ পেলাম। এ জিনিসটাকে আমি একেবারেই পছন্দ করি না। তিন-চারটি রসুনের কোয়া আমার হাতে দিয়ে বললেন, খেয়ে নাও, এই বর্ষায় ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি হবে না। গুরুর আদেশ ফেলা তো যায় না, মুখে দিয়ে সামান্য চিবিয়েই গিলে ফেললাম। বিপদ হল যে কটা রাত তাঁর পাশে শুয়ে কাটাতে হয়েছে, প্রতিরাত্রেই রসুন প্রদানে ইনফ্লুয়েঞ্জার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলেন।

কলকাতায় এম্পায়ার থিয়েটার মঞ্চে বিসর্জন নাটক অভিনয় হবে। স্টেজ সাজাবার উদ্দেশ্যে দুপুরের খাওয়ার একটু পরেই সুরেনবাবু ও আমাকে নিয়ে নন্দলালবাবু এম্পায়ার থিয়েটারের স্টেজে গেছেন। অনেকগুলি একই মাপের প্যাকিং কাঠের বাক্স স্টেজে পরপর ভাবে সাজিয়ে রাখা হল। বাক্সের যে দিকটা দেখা যাবে সেই দিকে ব্রাউন রঙের পেস্ট বোর্ড পেরেক দিয়ে আটকে দেওয়া হল। তারপরে yellow ochre ও light red রঙ মিশিয়ে তুলির সাহায্যে পেস্ট বোর্ডের উপর এমনিভাবে আঁচড় ও টান টোন দেওয়া হল যাতে পাথরের মতো দেখায়। স্টেজের সজ্জা খুবই সাদাসিদা ধরনের করা হল। যেদিন অভিনয় হবে তার বিকেলের দিকে নন্দলালবাবু, সুরেনবাবু বিসর্জনের অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে তরুণ জয়সিংহ করে সাজানো যায় একথা নিয়ে ভাবছেন। প্রথমে তাঁরা ভাবলেন, গুরুদেবের পাকা সাদা চুল-গোঁফ-দাড়িতে কালো রঙ লাগাবেন কালো করবার জন্য। অভিনয়ের শেষে কালো রঙ উঠাতে জল দিয়ে চুল-দাড়ি-গোঁফ ধোয়ার সময় ঠাণ্ডা লাগবার

সম্ভাবনার কথাও ভাবা হল, তখন শীতকাল ছিল। তাঁরা দুজনেই মহাসমস্যায় পড়েছেন গুরুদেবের সাদা চুল-গোঁফ-দাড়িকে কালো করবার বিষয়ে। এমন সময় অবনীন্দ্রনাথ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নন্দলালবাবুদের সমস্যার কথা জানতে পেরে বললেন এর জন্য এত ভাবছ তোমরা! এক কাজ কর, বাজার থেকে কালো রঙের ক্রেপ্ কাপড় আনাও—গোঁফ-দাড়ি-চুল কালো করবার কায়দা বাতলে দিচ্ছি। ক্রেপ্ কাপড় আনা হলে তার কিছু অংশ দিয়ে পাঞ্জাবীদের যেমন গালপাট্টা দাড়ি-গোঁফ থাকে তেমনিভাবে পাকাদাড়ি-গোঁফকে মুড়ে দেওয়া হল। বাকী ক্রেপ্ কাপড় দিয়ে সাদা চুলকে ঢেকে পিছনে বাবরি চুলের মতো করে দেওয়া হল। অভিনয়ের রাত্রে রবীন্দ্রনাথের সাদা চুল-দাড়ি-গোঁফ কালোই দেখাচ্ছিল, কোন প্রকার বেমানান হয়নি।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মাস্টার মশায় নন্দলাল কলা-ভবনের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তিনি প্রায়ই কলাভবনে এসে আমাদের কাজকর্মের খোঁজ খবর করতেন। আমি প্রায়ই তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম, বিকালে বাগানে বসে আর্টের সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলাপ, গল্প করা হত। তাঁকে একবার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়ে-ছিলাম। তিনি এবিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের কি মত তাই বলে শুনালেন। অবনীন্দ্রনাথ নাকি রবীন্দ্র-চিত্র সম্বন্ধে বলেছেন যে, "ভলকানিক ইরাপশন" এত অল্প সময়ে এত বেশি সংখ্যায় ছবি আঁকা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে মানুষের হাত-পা আঁকা দেখতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ এক-বার নন্দলালবাবুকে বলেছিলেন: "আমি তোমাদের মতো হাত-পা আঁকতে পারি না।" নন্দলাল-বাবু ভাল বাঁধানো খাতায় লিউনার্দোদ্যাভিঞ্চি, রামব্রাণ্ট ইত্যাদি ইউরোপীয় বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির থেকে হাত-পায়ের ছবির ড্রইং এবং অজন্তা গুহাচিত্রের থেকে সুন্দর সুন্দর হাত-পায়ের ড্রইং ঐ বাঁধানো খাতায় এঁকে গুরুদেবের ঘরে রেখে দিয়ে এলেন। ভেবেছিলেন, গুরুদেব হয়তো এই সব ড্রইং দেখে হাত-পা আঁকতে শিখে নিতে পারবেন। কিছুদিন বাদে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে খাতাটা ফেরত দিয়ে বললেন, এই বৃদ্ধ বয়সে আর হাত-পায়ের ড্রইং শেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বাঁধানো খাতাটি মাস্টার মশায় ফেরত নিয়ে নিলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয়ে নন্দলালের উচ্চ ধারণা ছিল, তাই তিনি বলতেন গুরুদেবকে না মেনে উপায় নেই। তিনি অনেক বিশ্লেষণ করেছেন আর্টের সম্বন্ধে। তাঁকে Standard ধরে তবে পার যদি এগোও। তিনি বলতেন, গুরু অবনীন্দ্রনাথ আমাকে শিল্পশিক্ষা দিয়েছেন এবং গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমার জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন উন্মেষ করে দিয়েছেন। তাঁর সংস্পর্শ আমার জীবনের পরম সম্পদ।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ কলকাতা শাখার উদ্যোগে ২৮ মার্চ ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজে শিল্পাচার্য নন্দলালের আঁকা বহু চিত্র সংগ্রহ করে একটি চিত্রপ্রদর্শনী করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করে-ছিলেন তখনকার ভারতের রাষ্ট্রপতি স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং বৈদিকমন্ত্র পাঠ করেছিলেন অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী। প্রদর্শনীটি দেখে দর্শক সকলেই উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। প্রদর্শনী দেখে তার পরদিন প্রাতে মাস্টার মশায়ের বাড়িতে তাঁর স্টুডিয়ো ঘরেতে গিয়ে দেখা করলাম এবং প্রদর্শনীর বিষয়ে মোটামুটিভাবে বিবরণ তাঁকে দিলাম। বললাম, লোকে ছবিগুলি দেখে যেমন মুগ্ধ তেমনি উচ্চ প্রশংসায় পঞ্চমুখ। খুব ভাল লেগেছে বলাতে তিনি কতক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন: "তুমি যে প্রশংসার

কথা বলছ তার জন্য গর্ব করবার আমার কিছু নেই, এর পিছনে আছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আর আছ তোমরা—আমার শিষ্যের দল। যদি আমি একাই করতে পারতাম, তাহলে এখন আর পারছি না কেন। এখন আমার অবস্থা মহাভারতের অর্জুনের শেষ অবস্থার মতো। গাণ্ডিব আছে, কিন্তু প্রয়োগ করবার ক্ষমতা হারিয়েছি।"

যথার্থ জীবনশিল্পী ছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল, চারু বা কারুশিল্প, উভয় বিষয়েই তিনি সমদক্ষ। ছোটখাট ফেলে দেওয়া বাঁশের টুকরো বা তালের আঁটি দিয়ে সুন্দর কারুশিল্প সৃষ্টি করতে তাঁকে দেখেছি। তিব্বতীয় ও প্রাচ্য বিষয়ে বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিলভাঁলেভি যখন শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার জন্য এলেন তখন আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মানপত্র দিতে মনস্থ করেন। মানপত্রের আধারটি সাধারণত রূপার দ্বারাই তৈরি করা হয়ে থাকে। শিল্পী নন্দলাল মানপত্রের আধারটি তখন তৈরি করেছিলেন পরিত্যক্ত এক টুকরো বাঁশ দিয়ে। আধারের ভেতরের অংশ জাপানীজ সোনালী রঙের কাগজ দিয়ে এঁটে দিয়েছিলেন। দেখতে ভারি সুন্দর হয়েছিল, শিল্পীর হাতের স্পর্শ পেয়ে সামান্য বাঁশ রূপার চাইতেও অনেক মূল্যবান আধারে পরিণত হয়েছিল। মাঠ থেকে কুড়িয়ে আনা শুকনো তালের আঁটিকে কেটে-কুটে সুন্দর জিনিস তৈরি করতেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে যে নবজাগরণ স্বদেশী নামে খ্যাতি লাভ করে এক সময় সমস্ত বাংলাদেশ তথা ভারতকে আলোড়িত করেছিল, নন্দলালের সঙ্গে সেইসব স্বদেশ-প্রেমিকদের যোগাযোগ ছিল। ভগিনী নিবেদিতা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের প্রখ্যাত কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গেও তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভগিনী নিবেদিতার নিকট তিনি এক সময়ে প্রায়ই যেতেন এবং ছবির বিষয়েও নানাভাবে প্রেরণা লাভ করতেন। তাঁর মুখে ভগিনী নিবেদিতার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল দেশের জনসাধারণের প্রতি সর্বদা দরদী ছিলেন। কলকাতায় প্রত্যেক শীতকালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েন্টাল আর্টসের চিত্রপ্রদর্শনীতে লাটসাহেব, বড় বড় উচ্চপদস্থ সাহেবরা, রাজা, মহারাজারাই ছবির ক্রেতা ছিলেন। তখনকার দিনে পঁচাত্তর থেকে দুইশত টাকার মধ্যে ছবির মূল্য থাকা সত্ত্বেও শিক্ষিত জনসাধারণ এই মূল্য দিয়ে ছবি কিনতে পারতেন না। তাঁদেরই কথা মনে রেখে একবার নন্দলাল দশ, পনের টাকা প্রতি ছবির মূল্য দিয়ে বেশ কয়েকটি ছবি সোসাইটির প্রদর্শনীতে দিয়েছিলেন। প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটনের প্রথম দিনেই চিত্রসমালোচক ও সমঝদার ধনী ব্যক্তিরা সমস্ত ছবিগুলি ক্রয় করে নিলে নন্দলাল বুঝতে পারলেন তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। পরে আরো মূল্য কমিয়ে এবার শহরের প্রদর্শনীতে নয়, কিছু গ্রাম্য মুদির দোকানে ছবি বিক্রির ব্যবস্থা করলেন। যাঁরা মুদির কাছ থেকে চাল, তেল, লবণ কিনতে আসেন তাঁরা ছবি ভালবেসে কিনে নিয়ে যান। এতে শিল্পী বেশ আনন্দ পেয়েছিলেন মনে এই ভেবে যে, জনসাধারণের মধ্যে নিজের ছবি পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

পরিণত বয়সে চীনাকালি দিয়ে প্রতিদিন একটি করে ছবি আঁকতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, রঙ দিয়ে আর ছবি আঁকছেন না কেন? উত্তরে বলেছিলেন, এখন নানা রঙ গোলার পরিশ্রম করবার ক্ষমতা নেই। তবে সাদাকার্ডে ছোট করে কিছু ছবি করেছিলেন এবং এইসব ছবিতে রঙ প্রয়োগ করেছিলেন।

শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্বে কলকাতায় হাতিবাগান অঞ্চলে বাস করতেন। এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত উমার তপস্যার ছবিখানি এঁকেছিলেন। ছবিটি আঁকা হয়ে গেলে তাঁর

গুরু অবনীন্দ্রনাথকে দেখাতে নিয়ে গেলেন। অবনবাবু ছবিটি দেখে মন্তব্য করলেন, ছবিটি ভাল হয়েছে তবে রঙের বড় অভাব, আরো কিছু রঙ লাগাও। পরের দিন প্রাতে আঁকার ঘরে রঙের প্যালেটে নানা রঙ গুলে তাই নিয়ে মেঝেতে আসন পেতে বসলেন,—সামনে উমার তপস্যার ছবিটিকে নিয়ে। গভীরভাবে চিন্তা করছেন কোথায় রঙ লাগাবেন। এমন সময় শুনতে পেলেন বাইরে মোটর গাড়ির থামবার শব্দ। নন্দলালবাবু অবাক হলেন, এত ভোরে কে ডাকাডাকি করছে বলে। ফটকের দরজা খুলতেই দেখেন অবনীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং বলে উঠলেন : "তোমার ছবিতে কি রঙ লাগিয়েছ?" উত্তরে নন্দলালবাবু বললেন : "রঙ নিয়ে বসেছি, ভাবছি কোথায় রঙ লাগাবো।"

অবনীন্দ্রনাথ বললেন : "গতকাল তোমাকে ছবিতে রঙ লাগাবার কথা বলার পরে যখন তুমি চলে গেলে তখন আমার খেয়াল হল এ ছবি তো তপস্বিনী উমার, উমার অন্তরে যে রঙ রয়েছে বাইরে তার উপরে আর কোন রঙের প্রয়োজন নেই। ছবিটির কথা ভেবে গত সারা রাত ঘুমতে পারিনি, ভয় হচ্ছিল পাছে যদি রঙ লাগিয়ে ফেল, তাই এই সাত সকালে ছুটে এসেছি বারণ করবার জন্য। রঙ লাগাওনি তো?" এই ছবিটি কলাভবনে একটি বিশেষ স্থানে সাজিয়ে রাখা হত। নন্দলালবাবু ছবিটির বিষয়ে গল্পটি বলে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ছবিটির সামনে। বললেন : "ছবিটির কোথাও রঙ দেখছ কি?" তার পরে বললেন : "গুরুর আদেশ হয়েছিল রঙ লাগাবার, তাই গুরুর বাক্য রক্ষা করতে গিয়ে উমার আঙুলে যে ঘাসের আংটি দেখছ সেখানে পাথরের সবুজ রঙ একটু লাগিয়ে দিয়েছি, কাছে গিয়ে দেখ।" দেখতে পেলাম উমার আঙুলের ঘাসের সরু আংটিতে সুন্দর সবুজ পাথরের রঙ লাগানো আছে। ছবিটিকে আবার ভাল করে দেখলাম, আনন্দে ও শ্রদ্ধায় মন ভরে উঠল।

প্রথম যে "নন্দন" বাড়িটি ছিল তার চারপাশে অনেকগুলি স্টুডিয়ো ঘর ছিল যেখানে ছাত্রছাত্রীরা বসে ছবি আঁকার কাজ করত। মাঝখানে জামগাছের নিকটে একটি স্টুডিয়ো ঘরে গুরু নন্দলাল বসে কাজ করতেন। মাস্টার মশায়ের স্টুডিয়ো নামে এই ঘরটি পরিচিত ছিল। এইখানে তাঁর নির্দিষ্ট পরিষ্কারভাবে গোছানো ছবি আঁকার স্থানটিতে একটি কাঠের ডেস্কসহ ধবধবে সাদা আসন পাতা থাকত। আসনের পাশে পরিষ্কার জলে পূর্ণ একটি পাত্রে রাখা থাকত একটি ফুল। ধূপকাঠির সুগন্ধ সমস্ত ঘরটিকে মোহিত করে রাখত, মনে হত এ যেন সাধনার মন্দির তুলি রঙ যথাযথভাবে সাজানো, তারই মাঝে বসে শিল্পী নন্দলাল নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকতেন।

রবীন্দ্র-সংস্পর্শ নন্দলালের জীবনে পরম লাভ বলে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। যার জন্য তাঁর জীবনে অনেক কিছুই পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। তার প্রতিক্রিয়া তাঁর সমগ্র শিল্পরচনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে আছে। শান্তিনিকেতনে আগমনের পূর্ববর্তী কালের অধিকাংশ তাঁর চিত্রের বিষয় ছিল হিন্দু দেব-দেবী, পৌরাণিক আখ্যান, ভারতীয় ইতিহাসের প্রখ্যাত ঘটনা বা ব্যক্তিরা। কিন্তু রবীন্দ্র-সংস্পর্শে আসার পরবর্তী কালের ছবিগুলির বিষয়ে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীর নিকট বিশ্ব প্রকৃতির রহস্যের দ্বার যেন খুলে গেল, রূপসাগরের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। কাব্যিক মনের ও ভাবের দৃষ্টিতে মানুষের সাধারণ জীবন, চলা ফেরা, আশেপাশের প্রাণী ও জীব জগৎ এবং প্রকৃতির বহু প্রকাশকে চিত্রে অঙ্কিত করে গেছেন। শিল্পীর এই অবস্থাকে বলা যায় পুরাণ-বেদ-আখ্যানের গণ্ডি থেকে মুক্তি লাভ করে শিল্পী প্রকৃতি ও

জীবনের যে রসময় ধারা প্রতিনিয়ত চলমান, তারই রসানুভূতি পেলেন।

ব্যক্তি হিসাবে তিনি সাদাসিদে ধরনের লোক ছিলেন। বন্ধুবৎসল ও আশ্রমের সকলকেই ভালবাসতেন। তাই আশ্রমবাসী সকলেই তাঁকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত। বেশভূষায় খুবই সাদাসিদে, মাথায় তাঁর নিজস্ব কায়দায় ছোট চাদর জড়ান, হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি এবং পায়ে থাকতো চামড়ার চপ্পল। তিনি গ্রীষ্মের প্রখর রোদে অবলীলাক্রমে ঘুরে বেড়াতেন। বলতেন, যত গরম পড়তে থাকে ততই ছবি আঁকার প্রেরণা তাঁর মাথায় আসে। এই কারণেই হয়তো তাঁর বহু ভাল ও বিখ্যাত চিত্রগুলি গ্রীষ্মের সময়ে আঁকা। তিনি বাক্যে সংযত, তবে কৌতুকবোধের কোন অভাব ছিল না। এবিষয়ে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। পুরাতন লাইব্রেরির উপরতলায় তখন কলাভবন ছিল, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। খোয়াইয়ের মধ্যে তখনও বহু পুরাকালের শিলীভূত বড় বড় গাছের টুকরো কুড়িয়ে পাওয়া যেত। এইগুলি লোহার চেয়েও কঠিন। কলাভবনের ছাত্র কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ এমনি ধরনের একটি পাথরের টুকরো কুড়িয়ে এনে কলাভবনের দোতলার ঘরে লোহার ছেনি দিয়ে কাটবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ভেবেছিলেন কোন মূর্তি গড়বেন বলে। তারই ঠিক নিচের তলায় বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায় বসে লেখাপড়ার কাজ করতেন। মাথার উপরে সারাদিন পাথর কাটার খট্ খট্ শব্দে অধ্যয়নের কাজে বড় ব্যাঘাত অনুভব করলেন। শাস্ত্রী মশায় এবিষয়ে নন্দলালবাবুকে জানালে তিনি কেষ্টবাবুকে বললেন: "দেখ কেষ্ট, বড় বড় মূর্তি যারা গড়েছে তারা কখনও স্টুডিয়ো ঘরেতে বসে পাথর কাটেনি, উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসেই তারা পাথর কেটেছে।" কলাভবনের উত্তরে কিছুদূরে একটি বড় জামগাছ ছিল তারই ছায়াতে কেষ্টবাবুর পাথর কাটার ব্যবস্থা করে দিলেন। উপরতলার স্টুডিয়ো ঘরের উত্তরের জানালা দিয়ে আমরা দেখতাম, নিবিষ্ট মনে কেষ্টবাবু পাথর কেটে চলেছেন। তারই খট্ খট্ শব্দ আমাদের কানে আসত। এমনিভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে গেল! একদিন উত্তরের জানালার ধারে মাস্টার মশায় এসে দাঁড়ালেন এবং আমাদের কয়েকজনকে ডাকলেন। তাঁর নিকটে উপস্থিত হতেই তিনি হাত দিয়ে কেষ্টবাবুকে দেখিয়ে বললেন: "কেষ্ট, যদুবংশ ধ্বংসের মুষল পাথরটি কেটেই চলেছে।" তাঁর এইকথায় আমরা খুবই কৌতুকবোধ করেছিলাম।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন, দেশে এখন আর্টের প্রয়োজন নেই বলে। গান্ধীজী কয়েক বছর পরে তাঁর এই মত বদলেছিলেন এবং আর্টের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। লাক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের অধিবেশনে নন্দলালকে সাদরে ডেকে নিয়ে মণ্ডপ, তোরণ ইত্যাদির সজ্জার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেই সময়ে একটা শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করালেন। তারপর থেকে শিল্পী নন্দলালকে প্রত্যেক কংগ্রেস অধিবেশনে ডেকে নিয়ে মণ্ডপ, তোরণ ইত্যাদি সজ্জার দায়িত্ব অর্পণ করা হত। হরিপুরা কংগ্রেসের জন্য তিরাশিখানা পট চিত্র নন্দলালের এক অপূর্ব কীর্তি। মহাত্মা নন্দলালকে শুধু একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে মনে করতেন না, আরো বহু গুণের অধিকারী বলে মনে করতেন ও ভালবাসতেন। মহাত্মা নন্দলালের গুণের কথা বলতে গিয়ে একবার বলেছিলেন: Nandalal can produce something from nothing.

শিল্পাচার্য নন্দলাল আমাদের সঙ্গে খুব সহজ ভাবেই মিশতেন। তাঁর মনের কথা নিঃসংশয়ে আমাদের বলতেন। তাঁর সঙ্গ যেমন প্রীতিকর তেমনি শিক্ষণীয়। মার্চ মাস, ১৯৫৪

কলাভবনের প্রাঙ্গণে বসন্তকাল সমাগত বলে তার চিহ্ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পলাশ, শিমূল ফুলের ছড়াছড়ি, পাখিদের আনাগোনা চলেছে গাছেগাছে মধুর লোভে। অন্যান্য দু-একটি ফুলের গাছেও ফুল ফোটা আরম্ভ হয়েছে—যেমন বনপুলক, পিয়াল ইত্যাদি। ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভরপুর। শুকনো পাতা ঝড়া শুরু হয়েছে কিছুদিন পূর্বেই। শুকনো শিরীষ ফুলের বীজগুলি দমকা হাওয়ায় নড়ে বিচিত্র ধ্বনি তুলেছে। সকালের দিকে কলাভবনের স্টুডিয়োগুলিতে ক্লাশের কাজ চলেছে। জানালার বাইরে হঠাৎ এসে গুরু নন্দলাল ডেকে বললেন: "দেখ হে, শিগ্‌গির এসে দেখ কী চমৎকার!" ছুটে এসে দেখি, ঝড়ো হাওয়ায় শিরীষ ফুলের শুকনো বীজগুলি ও শিমূলগাছের শুকনো সোনালী রঙের পাতাগুলিকে পাখির ঝাঁকের মতো উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। মাস্টার মশায় মন্তব্য করলেন, এ সৌন্দর্য ছেলেমেয়েদের চোখে পড়া চাই। দৈনন্দিন জীবনের আশেপাশে ছোটখাট এমনি কত ঘটনা যা ঘটে যাচ্ছে, তারাও একদিন ছবির অঙ্কনবিষয় (Subject) হতে পারে, যদি শিল্পীর অন্তর্লোকের আনন্দ তাদের উপর পড়ে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যে অবনীন্দ্রপ্রবর্তিত চিত্রধারা দেশে ও বিদেশে বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। তারই স্বীকৃতি হিসাবে তখন জোড়াসাঁকোর অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে জাপানী বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ওকাকুরা, ঐ দেশের বিখ্যাত শিল্পী টাইকান, হিশিদা, আরাইসান, সিংহলী বিশ্ববিখ্যাত শিল্প সমালোচক ডাঃ আনন্দ কুমার স্বামী ইত্যাদির মতো ব্যক্তিরা এসে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তখন শিল্পাচার্য নন্দলাল তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর চারিত্রিক গুণে এই সব ব্যক্তিদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তিনি লাভবান হয়েছিলেন এইসব ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে।

বাইরে ধর্মের নামে তাঁর কোন প্রকার আতিশয্য বা আড়ম্বর ছিল না। তবে লক্ষ্য করেছি, তাঁর বাসগৃহের একটি কোঠায় কাঠের একটি কেবিনেটের মাথার ধারের দেয়ালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ও শ্রীমায়ের ছবি টাঙানো থাকত। পাশের দেয়ালে তাঁর গুরু শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের আঁকা উমার একটি সুন্দর ছবি টাঙানো থাকত। অবনীন্দ্রনাথ যখন ছবিটি নন্দলালবাবুকে উপহার দিয়েছিলেন তখন নাকি বলেছিলেন: "নন্দলাল, আমার উমাকে তোমায় দিলাম, দেখো, আমার উমার যেন কখনও অনাদর না হয়।" প্রতিদিন ভোরবেলাতে কেবিনেটের উপরে একটি রেকাবিতে কিছু ফুল এবং ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ছবিগুলির সামনে রেখে দিতেন।

শিল্পাচার্য নন্দলালের সমগ্র চারুকলা সৃষ্টি দেখে একথাই মনে উপলব্ধি করেছি প্রথমে তিনি বাংলার শিল্পী। বাংলার মাটি, বাংলার নদী, বাংলার গ্রামাঞ্চলের মাঠ-ঘাটের একটা বিশেষ রূপ আছে, তাই এই বাংলাতে রসময় সংগীত কীর্তন সুরসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। শুষ্কদেশ রাজপুতনায় বা উত্তর ভারতে এই কীর্তন সুরসৃষ্টি হতে পারে না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় বাংলামায়ের সুন্দর রূপটিকে যথার্থভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতাটি হল:

"নমোনমো নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব
পদধূলি—
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো
গ্রামগুলি

বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে
জল ভরে।”

তেমনি গুরু নন্দলাল তাঁর চিত্রে বাংলার ঘরের কথা, তার বার মাসে তের পার্বনের কথা, বাংলার গাছপালা, মানুষকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি আবার সমগ্রভাবে ভারতীয় শিল্পীও ছিলেন। ভারতীয় বেদ, পুরাণ, আখ্যান, সাংস্কৃতিক অনেক বিষয় তাঁর চিত্রে স্থান পেয়েছে। তারপরে দেখতে পাই মানুষের ভাবধারা, শ্রেষ্ঠ চিন্তার প্রকাশ তাঁর চিত্রে প্রকাশিত, সেখানে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম। একই নন্দলালের মধ্যে বাংলার, ভারতের ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের গুণাবলী আমরা দেখতে পাই।

সকল কথার শেষে শিল্পাচার্য নন্দলালকে সমগ্রভাবে একবার দেখার প্রয়োজনের কথা আমাদের ভাবতে হবে। অনেক সময় বিচ্ছিন্ন করে কাউকে দেখতে গিয়ে তাঁর বৃহত্তর রূপটিকে আমরা হারিয়ে ফেলি। তাতে করে তাঁর সম্পূর্ণ রূপটি আমাদের চোখে ধরা দেয় না। নন্দলাল ছিলেন একজন মহান শিল্পী। তাঁর রূপসৃষ্টির মধ্যে, শিষ্যদের শিক্ষাদানে, কথাবার্তায়, চালচলনে তিনি যে যথার্থ শিল্পী সে গুণের পরিচয় সর্বদা আপনি প্রকাশ পেত। বিশ্বের মধ্যে যা সুন্দর, আনন্দময় তার প্রতি তাঁর নজর সর্বদা জাগ্রত ছিল। সেগুলি দেখে নিজে যেমন আনন্দ পেতেন তেমনি আমাদের দৃষ্টিকেও তার প্রতি আকর্ষণ করতেন। তাঁর রূপসৃষ্টির আনন্দ শ্রেয় ও প্রেয়কে পাবার সাধনা, তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন “রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি” অরূপ রতন আশা করি।

কথন করুণা

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান,—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের গবেষক-লেখক।]

বেলুড় মঠের পূজনীয় প্রাচীন সন্ন্যাসী মহারাজদের একজনের সঙ্গে একদিন কথা হচ্ছিল—কখন আমরা ভগবান আছেন বলে বিশ্বাস করি! বলা বাহুল্য, শ্রোতা ও বক্তা দু'পক্ষই ভগবানের অস্তিত্বে আস্থাশীল। মহারাজ তাঁর নিজের জীবনে কী অনুভব করেছেন, তা জানা নেই। কিন্তু তিনিও প্রবীণতর সাধুদের কাছে শুনেছেন অনেক। সেই পরমশ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসিবৃন্দের অন্যতম—স্বামী ওঁকারানন্দ বা অনঙ্গ মহারাজ। মাত্র কিছুকাল আগেও কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে তাঁর দর্শন অনেকেই পেয়েছেন। প্রয়াত এই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বে জ্ঞান ও ভক্তির এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ অনেকেই লক্ষ্য করে ধন্য হয়েছেন। উত্তরজীবনে তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষপদে বৃত হয়েছিলেন। সেই পরম পূজনীয় অনঙ্গ মহারাজ যখন বেলুড় মঠেই থাকতেন, এ তখনকার কথা।

একদিন শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের সামনে কয়েকজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ঐ প্রসঙ্গই চলেছে—কখন আমাদের মনে ঈশ্বরবিশ্বাস নিশ্চিতভাবে আসে? এমন কোন অভয় আশ্বাস নিয়ে তিনি আমাদের হৃদয়ে তাঁর নিশ্চিত অস্তিত্বের আভাস দিয়ে যান?

পূজনীয় অনঙ্গ মহারাজ যা বলেছিলেন, তার সারমর্ম অনেকটা এই—ধরু, মাঝ সমুদ্রে জাহাজ-

ডুবি হয়ে গেছে। চারপাশে কেবল ঢেউ আর ঢেউ—কে কাকে বাঁচাবে? নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কে রক্ষা করবে? যারা অকূলে ভাসছে, তুই তাদেরই একজন! ব্যাকুল হয়ে ডাকছিস্—যদি ঈশ্বর থাকেন, তোকে রক্ষা করুন। ঠিক এমন সময় একটা বড়োসড়ো কাঠের গুঁড়ি তোর সামনে ভেসে এলো, আর সেইটি ধরে তুই সে-যাত্রা বেঁচে গেলি। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হতে পারে—নিশ্চয় তিনি আছেন, নইলে এমন বিপদে এই কাঠের গুঁড়ি কেমন করে ভেসে এলো? এমনি সব ঘটনায় মানুষের মনে ভগবানে বিশ্বাস আসে।

বলা বাহুল্য, স্বামী ওঁকারানন্দজীর বলিষ্ঠ দেহে দৃপ্ত কণ্ঠে যেভাবে এই কথাগুলি ধ্বনিত হয়েছিল, তার কণাটুকুও আমরা পাঠকহৃদয়ে সঞ্চার করতে পারবো না। তবু জীবনসমুদ্রে ভাসমান অনেকের কাছেই ঘটনাটির অমোঘ অনিবার্যতা এক গভীর আশ্বাস নিয়ে আসে। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক অনেক হতে পারে। কিন্তু এক সময় যে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হয়েছে, সেই পরম আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করে—আর, কেনা জানে, ব্যাকুলতা হলেই অরুণোদয়!

বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সেরা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিময় গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'—অনুলেখন সম্ভব হয়েছিল, এমনি এক ব্যাকুল হৃদয়ের অন্বেষণের ফলে। সংসারের অশান্তি, ভুল বোঝাবুঝি জ্বালা-যন্ত্রণা—এ সব কিছুতে মিলে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাস্টার মশায় অনেকের মতোই জীবন থেকে পালাবার সহজ উপায় আত্মহত্যার কথা ভাবছিলেন! এমন সময় ভাগিনেয় সিধুর প্রেরণায়—অনেকটা যন্ত্রচালিতভাবেই দক্ষিণেশ্বরের সাধুটিকে দেখতে যাওয়া! পরবর্তী কালে তিনি বলতেন, ভগবান না থাকলে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতাই থাকত না। আত্মহত্যা ছাড়া জীবনের আর কোন পরিণামই ভাবা যেতো না।

শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনের পর মহেন্দ্রনাথের আত্ম-নিবেদনের কাহিনী আজ 'কথামৃতে'র কল্যাণে বিশ্বহৃদয় অমৃতায়িত করে চলেছে! লক্ষ্যহারা মানব জীবনতরীর সত্যিকার সার্থকতা যে ভগবান লাভে—পরম সত্যের সঙ্গে একাত্ম হওয়ায়—সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জানালেন, 'তুমি আপনার লোক'! শুধু এ জন্মের নয়, জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ! যদি সাংসারিক অসামঞ্জস্যের ভয়ে মহেন্দ্রনাথ আত্মহননের পথ বেছে নিতেন, তাহলে লক্ষকোটি মানুষের আত্ম-দীপ কেমন করে জ্বলতো! কিন্তু এ পরমাশ্রয় লাভের পিছনে রয়েছে সংসার-অরণ্যে দাবানলভীত এক মানবপ্রাণের কাহিনী। আমরা প্রত্যেকেই তেমনি এক অশান্তির আগুন-ভীরু হরিণ—কে কেমন করে কোন্ মুহূর্তে আশ্রয় পাব জানি না, তবু ছুটে চলেছি—যদি কোথাও কোন শান্তিশীতল বর্ষণের করুণাধারা জীবনে নেমে আসে।

'কথামৃতে'র সেই পাখিটি—অকূল সমুদ্রে ভাসমান জাহাজের মাস্তুল থেকে পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে উড়ে উড়ে কোথাও কূল না পেয়ে এসে স্থির হয়ে মাস্তুলের উপর বসে রইলো। আর তার ঘুরে দেখার কিছু নেই। যা তার নিশ্চিত নির্ভর, তার সন্ধান সে পেয়েছে। জীবনের নানা ঘাটে ঘুরে ঘুরে একদিন আমরা সবাই দেখি মনের মানুষ মনের মধ্যেই বসে আছেন—বৃথা তাঁকে বাইরে খুঁজে ফিরেছি।

পথ-চলতি এক দুর্ঘটনার ফলে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছি। যদিও, নাক-কান-গলার রোগীদের জন্য বিশেষ-ভাবে নির্ধারিত কক্ষ—তবুও সেই কক্ষেই আমারও আশ্রয় হয়েছিল। বোধ হয়, আর

কোথাও শয্যা ছিল না। শুয়ে শুয়ে ছোট বড় নানা জনের সঙ্গে গল্পে গল্পে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। এমনি একজনের কাছে এক আশ্চর্য কাহিনী শুনেছিলাম। তিনি নিজে এসেছেন গলনালীর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে। গল্পটি তাঁর বাবার সম্বন্ধে। সত্য, কিন্তু পরমাশ্চর্য সত্য। কথন করুণার স্পর্শ কার জীবনে নেমে আসে, তারই কাহিনী।

আর সবার মতো দশটা-পাচটা অফিসজীবী ভদ্রলোক। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে এসেছে। ঘর-সংসার মোটের উপর চলে যায়। তবু কত রকমের ভাবনাচিন্তা মনের আড়ালে কাজ করতে থাকে। বয়সও বাড়ে, ঘুমও কমে আসে। শেষ-মেশ রাতের ঘুম একেবারে বন্ধ। ঘুমের ওষুধে আর কাজ হয় না। দিনের পর দিন ঠায় চোখ মেলে রাত কাটে। অবশেষে ডাক্তারবাবু ছেলেমেয়েদের বললেন, এভাবে চললে উনি পাগল হয়ে যাবেন। এক কাজ করুন—আপনারা সকলে মিলে পালা করে সারা রাত ওঁকে সঙ্গ দিন। কিছুক্ষণ গল্প গুজব, কিছুক্ষণ তাস খেলা, কিছুক্ষণ গানবাজনা—এইভাবে রাত কাটতে থাকুক!

তাই হতে লাগল। রাতের পর রাত বাবাকে জেগে থাকার যন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখার জন্য ছেলেমেয়েদের আন্তরিক প্রয়াস! সারা রাত কেটে গিয়ে ভোরের দিকে সামান্য ঘুম আসে। সে ঘুম ভাঙতেই নেয়ে খেয়ে অফিসযাত্রা। অফিসে যাওয়া চাই—সেখানে না গেলে বাড়িতেই বা কী নিয়ে থাকবেন! কাজের মধ্যে ডুবে থেকেই যা কিছু বিশ্রাম।

পাঁচ বছর এমনি প্রায়-বিনিদ্র কেটে গেল। অবশেষে আর যখন সহ্যের অতীত, তখনই পরম বিস্ময়ে একদিন সকালবেলা ছেলেমেয়েরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছেন! ৭টা—৮টা—৯টা—প্রায় দশটা! এমন সময় ঘুম ভেঙে ঘড়ির দিকে চেয়ে বাবা বললেন, 'ইস্, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এই নেয়ে আসছি, ভাত বেড়ে রাখো।' তারপর সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনেই নেয়ে খেয়ে অফিসযাত্রা!

সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর সকলের প্রশ্নের সামনে পড়তে হল। যে ঘুম পাঁচ বছর পলাতক, আজ সে এত বেলা অবধি বাবার চোখ জুড়ে রইল কেমন করে! বাবা একটু হাসলেন, দেয়ালে ঝোলানো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবির দিকে চাইলেন, উদ্দেশে প্রণাম করে বললেন, 'বলবো বলবো, আজ নয়, আর একদিন।'

দিনে দিনে সেকথা উন্মীলিত হল। এক বিনিদ্ররাতে ছেলেমেয়েরা পালা করে সঙ্গ দিয়ে ক্লান্ত হয়ে যখন শুতে গেছে, তখন একলা ঘরের নিঃসঙ্গতায় ব্যাকুল হয়ে গৃহস্বামী হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ছবিটির কাছে এগিয়ে গেলেন। অনেক মানুষের মতো তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহিমার কথা শুনেছেন! হয়তো তিনি মহাসাধক। হয়তো নররূপী নারায়ণ স্বয়ং! ঠিক করে কিছু জানেন না। তবু আজ তাঁর কাছেই তিনি প্রার্থনা করতে করতে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন—এমনি করে রাতের পর রাত জেগে থেকে আর তো তিনি পারেন না, শেষে কি সত্যিই পাগল হয়ে যাবেন! 'ঠাকুর! তুমি যদি দয়া করে আমায় এ অনিদ্রার হাত থেকে বাঁচাও!—তা না হলে জীবন যে ব্যর্থ হতে চললো!'

ডাকতে ডাকতে কখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে নেই। হঠাৎ চমকে মনে হল শিয়রে ঠাকুর সত্যি সত্যি দাঁড়িয়ে আছেন। একটু হেসে পরম স্নেহে তাঁর দিকে চেয়ে বলছেন, কিরে ঘুম হচ্ছে না?—এই বলে ডান পা দিয়ে তাঁর মাথাটি একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, যা।' তারপর আর কিছু মনে নেই। পরদিন ঘুম ভাঙতে প্রায় দশটা!

এর পরই আসলে গল্প শুরু! ওই স্বপ্ন তাঁর মনে গাঁথা হয়ে রইল। আর দিনে রাতে ওই ঘুমের আশীর্বাদ তাঁকে নবজাগরণের পরমসত্যে উত্তীর্ণ করতে থাকল। ভেবে ভেবে নিজেই একদিন বেলুড় মঠে গেলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন, তখন পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ মঠেই আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে মনের কথা সব বললেন। সব শুনে পরম পূজনীয় মহারাজ ভদ্রলোককে পড়তে বললেন 'কথামৃত'। তারপর 'কথামৃত' এসে গোটা পরিবারকে ঈশ্বরতন্ময়তায় ভরিয়ে দিল। একজনের অনিদ্রার সূত্র ধরে কখন করুণার পরমস্পর্শ তাদের সবার জীবনে সঞ্চারিত!

এ কাহিনী শুনতে শুনতে সেই মুহূর্তে সেবাপ্রতিষ্ঠানকে আমার মন্দির বলে মনে হয়েছিল—রোগীরূপে যে ভক্তটি এসেছেন, তাঁর চোখে অনন্ত করুণার দৃষ্টিপ্রদীপ আভাসিত!

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধুনিক বিজ্ঞান

ডক্টর অমিয়কুমার হাটি

[প্রফেসর অব মেডিকেল এন্ট্যামোলজি এবং চেয়ারম্যান, ডিভিসন অব প্যারাসিটলজি, কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন। বিগত ২ এপ্রিল ১৯৮৩, উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ।]

১

আধুনিক বিজ্ঞানের সব কটি শাখাই বিস্ময়, বৈচিত্র্য, রূপৈশ্বর্য ও দীপ্তি নিয়ে মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু কজন আমরা তা অনুভব করি? অনুসন্ধিৎসু মন, দেখার মতো দেখার চোখ, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতা থাকে কজনের? নানা শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি মালা গাঁথতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার, তাঁকে অনুসরণ ও অনুধাবন করারও ইচ্ছা জাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন এর নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ, তাতে আত্মীয়বোধ, এর নাম বিজ্ঞান।

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনায় অধ্যাত্মবাদের বদলে স্বভাবতই এগুতে হবে মূলতঃ বস্তুতান্ত্রিক বিচার-বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, আর আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গেও জীবনের যোগ বড় নিবিড় এবং শ্রীরামকৃষ্ণও চেয়েছিলেন জীবনে জীবন যোগ করতে।

আধুনিক বিজ্ঞানেরও সহজ, সুন্দর ও ব্যবহারিক সংজ্ঞা পেতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। বলছেন, জ্ঞানের পরই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কিনা বিশেষরূপে জানা। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। যে কেবল শুনেছে, সে অজ্ঞান। যে দেখেছে, সে জ্ঞানী। যে খেয়েছে, তারই বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষরূপে জ্ঞান হয়েছে। খেয়ে আনন্দ লাভ করেছে ও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। আরেকটা উদাহরণ দিয়ে বলছেন, কাষ্ঠে আছে অগ্নি, এই বোধ, এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। কিন্তু কাঠ জেলে রাঁধা, খাওয়া, হেউঢেউ হয়ে যাওয়া যার হয়, তার নাম বিজ্ঞানী।

এই সংজ্ঞার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানের প্রায়োগিক

দিক সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের ধারণা স্পষ্ট। দুধ খাওয়াই শুধু নয়, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়া, কাঠে আগুনের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, কাঠ জেলে রাঁধা, খাওয়া, হেউঢেউ হয়ে যাওয়া সেটাই বিজ্ঞান। যেখানে প্রত্যক্ষ যোগ, প্রয়োগ, প্রসার—সেখানেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। অঙ্গীভূত হওয়া দরকার। রামকে বুঝিয়েছিলেন—তুমি তো ডাক্তার, যখন রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে এক হয়ে যাবে তখনই তো কাজ হবে।

২

গিরিশের সঙ্গে একদিন যখন ডাক্তারের বিজ্ঞানসভার (Science Association) কথা হচ্ছিল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "আমায় একদিন সেখানে লয়ে যাবে?" তিনি মিউজিয়ামে গিয়েছিলেন, সেখানে ফসিল দেখেছিলেন। উপমা দিয়েছিলেন, পাথরের কাছে থেকে থেকে পাথর। নিজেই বলছেন—চিড়িয়াখানা দেখাতে লয়ে গিছলো। গিয়েছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটিতেও। গলার রোগের সময় তাঁর অমনি দপ করে মনে এল 'স্কুসাইট'। সেখানকার হাড় বা মানুষের কঙ্কালের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে গেছে। দেখেছেন গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস। বলছেন, টেলিগ্রাফের তারের ভিতর অন্য জিনিস মিশাল থাকলে বা ফুটো থাকলে তারের খবর পৌছাবে না। বিজ্ঞান সংক্রান্ত স্টীমবোট, ইঞ্জিনিয়ার, রেলের এঞ্জিন, গ্যাসকোম্পানি, রিফাইন, ডাইলিউট প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'সায়েন্স' শব্দটা কয়েকবারই বলেছেন—যেমন—তাঁকে দর্শনের পর বই শাস্ত্র সায়েন্স সব খড় কুটো বোধ হয়; বা ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, একথা যে ওঁর সায়েন্সে নাই; বা—আর তোমার সায়েন্স এটা মিশলে ওটা হয়; অথবা বঙ্কিমের প্রতি তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি—কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে আগে জগতের বিষয়, জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স পড়তে হয়। তাঁর গলা পরীক্ষার সময় ডাঃ ভগবান রুদ্রের হাতে ল্যারিঙ্গোস্কোপ দেখে হাসতে হাসতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, বুঝেছি, এতে ছায়া পড়বে। শ্রীরামকৃষ্ণ ক্যামেরাকে 'কল' বলতেন। সুরেন্দ্র তাঁকে বেঙ্গল ফটোগ্রাফের স্টুডিওতে 'কল' দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে 'স্টুডিওতে শ্রীরামকৃষ্ণ' ফটোটি নেওয়া হয়। পৃথিবীর ভূগোল সম্বন্ধে ধারণা যথেষ্টই ছিল, বলেছিলেন—শুনেছি খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে, এত ঠাণ্ডা যে জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।

৩

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা তোমার ইংরেজী জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে?" বলাবাহুল্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা। মণি উত্তর দিলেন,—"ইউরেনাস গ্রহের এলোমেলো চলন দেখে দূরবীন দিয়ে সন্ধান করে দেখলে যে নতুন একটি গ্রহ নেপচুন জ্বল জ্বল করছে। আবার গ্রহণ গণনা হতে পারে।" জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই দুরূহ তত্ত্ব তিনি শুনেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন, "তা হয় বটে।"

মহাবিশ্বে আকাশভরা সূর্য তারা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক কথাই এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামালার মধ্যে। বলছেন, সাগরের নিকট নদী যতই যায়, ততই জোয়ার-ভাটা দেখা যায়। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি—সীতা বলছে রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, আর রাবণ পূর্ণচন্দ্র। অর্থাৎ এইবার রাবণের ক্ষয় শুরু। আবার চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না। উল্লেখ করেছেন চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোকের

কথা। করেছেন স্বাতী নক্ষত্রের গল্প। বলছেন, ঠিক দুপুর বেলা সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠে। তখন মানুষটা চারিদিকে চেয়ে দেখে আর ছায়া নাই। আরও—মেঘ উঠলে আর সূর্য দেখা যায় না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না বলে কি সূর্য নাই? সূর্য ঠিক আছে। একবার হচ্ছিল জোয়ার-ভাটার কথা। সমুদ্রের কাছে নদীর ভিতর জোয়ার-ভাটা খেলে। সমুদ্র থেকে অনেক দূর জলে একটানা হয়ে যায়। এর মানে কি? প্রশ্ন করছেন আচ্ছা জোয়ার-ভাটা কেন হয়? তখন বোঝাচ্ছেন যে, সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে ঐরূপ হয়। তিনি মাটিতে অঙ্ক পেতে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের গতি দেখাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। একটু দেখেই কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, থাক ওতে আমার মাথা ঝন ঝন করে।

রথযাত্রার দিন বলরামের বাড়ি থেকে শ্রীম গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। পথে হঠাৎ ভূমিকম্প। তিনি তখনই শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ফিরে এলেন। অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈঠকখানায় দাঁড়িয়েছিলেন। ভূমিকম্পের কথা হয়েছিল সেদিন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ করেছিলেন আশ্বিনের ঝড়ের কথা। দক্ষিণেশ্বরে অনেক বেলায় তবে কি কি রান্না হয়েছিল।

আর একবার বান এসেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে চাইলেন—বান কি করে হয়। শ্রীম মাটিতে আঁক কেটে চন্দ্র-সূর্য মাধ্যাকর্ষণ জোয়ার-ভাটা পূর্ণিমা-অমাবস্যা-গ্রহণ ইত্যাদি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে।

৪

ভৌতবিজ্ঞান ও রসায়ন নিয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময় অনেক কথা বলেছেন। বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি তাতে বিধৃত। বলছেন, আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ—কাছে গেলে কোন রঙ নাই; বা দীঘির জল দূর থেকে সবুজ নীল বা কালো; কিংবা আকাশকে আমরা ঠিক দেখছি না, বোধ হয় যেন মাটিতে লোটাচ্ছে। উত্তাপের প্রভাব—যতক্ষণ কাঠ জলে, দুধ ফোঁস করে ফোলে; বা পাকা ঘিয়ে কাঁচালুচি ছ্যাক কলকল করে; বা ভিজে থাকলে হাজার ঘষলেও দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলবে না; বা স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ সব দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। পুকুরের ঘাটে যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ হয় ভকভক করে, পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না। এটির মধ্যেও শব্দ বিজ্ঞানের সূত্র। এইরকম—বাজ পড়লে ঘরের মোটা জিনিস তত নড়ে না, কিন্তু শার্সি খটখট করে। চুম্বকের গুণ বলতে গিয়ে বলছেন, দুটো চুম্বকের মধ্যে যেটা বড় সেটাই লোহাকে টানবে। আবার ছুঁচ কাদা দিয়ে ঢাকলে আর চুম্বকে টানে না। আলো নিয়ে—অন্ধকারের ভিতর দেশলাই ঘষতে ঘষতে দপ করে আলো হয়। এইরকম—মণির আলো খুব উজ্জ্বল কিন্তু স্নিগ্ধ শীতল। আবার তফাত বোঝাচ্ছেন—প্রদীপের আলো শুধু ঘরের ভিতরটা দেখা যায়; চাঁদের আলো ভিতরবার দেখা যায়, অনেক দূরের জিনিস, কি খুব ছোট জিনিস দেখা যায় না। সূর্যের আলো ভিতরবার ছোট বড় সব দেখতে পান। বাতাসের ধর্ম সম্পর্কে—বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ সবরকমই থাকে, কিন্তু বায়ু নিজে নির্লিপ্ত। প্রতিফলন প্রভৃতি নিয়ে—সূর্যের রশ্মি মাটিতে একরকম পড়ে, গাছে একরকম পড়ে আবার আর্শিতে একরকম। কিংবা আর্শির কাছে জিনিস রাখলে প্রতিবিম্ব হবে না? আরও—ঘরের ভিতর আতস কাচে কাগজ পুড়ে না—ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি কাচে পড়ে, তখন কাগজ পুড়ে যায়। জলের ধর্ম—জল স্থির থাকলেও জল, আবার হেললে দুললেও জল। এক জায়গায় বলছেন, পুকুরের জলে অনায়াসে খুব শীতে মাছ

থাকতে পারে। জলের উপরিভাগে সমস্ত বরফ হয়ে গেছে, কিন্তু নিচে যেমন জল তেমনি জল, যদি খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বয় সে হাওয়া বরফের উপর লাগে। নিচের জল গরম থাকে।

৫

উদ্ভিদ্‌বিদ্যার কয়েকটি বিষয়ও চোখে পড়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাল গাছ, বিষ গাছ আবার আগাছার কথা বলেছেন। গাছ ছিল তাঁর প্রিয়। বৃন্দাবন থেকে মাধবীলতা আনিয়ে নিজে পঞ্চবটীতে রোপণ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, কাল সকালে আবার ফেঁকড়ী বেরিয়েছে। এটাও জানা ছিল, নারকেলের জল না শুকুলে দা দিয়ে শাঁস আলাদা, মালা আলাদা করা কঠিন হয়। আবার পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে, কাঁচা বেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। বলছেন, ওল যদি ভাল হয়, তবে মুখিটিও ভাল হয়। আবার কী চমৎকার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা—ডাব অত উঁচুতে থাকে, রোদ পায় তবু ঠাণ্ডা শক্তি। পানিফল জলে থাকে—গরম গুণ। আরও শিশির পাবে বলে মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড়সুদ্ধ তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। আবার ফুল চুষতে চুষতে একটু মধু পাওয়া যায় বৈ কী! প্রাকৃতিক নিয়মেই যখন ফল হয় তখন ফুল ঝরে যায়। দেখেছেন, একডেলে গাছও আছে, আবার পাঁচডেলে গাছও আছে।

৬

সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির জন্য জীববিজ্ঞানের অনেক বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। সাপ এবং অন্যান্য সরীসৃপের উদাহরণ দিয়েছেন অনেকবার। বলছেন, সাপকে ছেড়ে তির্যকগতি ভাববার যো নাই, আবার সাপের তির্যকগতি ছেড়ে সাপকে ভাববার যো নাই। সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ আবার তির্যকগতি হয়ে এঁকেবেঁকে চললেও সাপ। সাপের ফোঁস করার গল্পটির কথা সবাই জানি। অন্যত্র বলেছেন সাপের ছুঁচো গেলা—গিলতেও পারে না, উগরাতেও পারে না। এইরকম ঢোঁড়ার ব্যাঙ ধরা—ব্যাঙ চিৎকার করেই চলে। জাতসাপে ধরলে তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ করে যেত। আবার কত যথার্থ কথা—সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপের কিছু হয় না। যাকে কামড়াবে তার পক্ষে বিষ। উত্তম শ্রেণীর সাধু বোঝাতে বলেছেন অজগর বৃত্তির কথা। বসে খাওয়া পাবে। অজগর নড়ে না। আবার সাপের ন্যাজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই। ন্যাজে যেন তার বেশি লাগে। একজায়গায় বলছেন, বেহুলার গানের কাছে জাতসাপ স্থির হয়ে শুনে। কিন্তু কেউটে নয়। আমরা অবশ্য জানি সাপের বহিঃকর্ণ নাই। জাতসাপ বলতে অনেকে কেউটেকেও বুঝিয়ে থাকে।

কুমীরের কথা বলছেন—জলে কুম্ভীর অনেকক্ষণ থাকে। এক একবার জলে ভাসে নিশ্বাস লবার জন্য। তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কার্যত তাই। আর কুমীর—তার গায়ে তরবারির কোপ লাগে না। বলেছিলেন, হলুদ মেখে জলে নামলে কুমীরে ধরে না। একথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাইনি।

এটিও বৈজ্ঞানিক তথ্য—কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায় মন আড়ায়—যেখানে ডিমগুলি। আবার, কচ্ছপ হাত-পা টেনে নিলে আর বাহির করে না। সেইরকম এক বিচিত্র বৈজ্ঞানিক হেঁয়ালী বহুরূপী গিরগিটির উদাহরণ দিয়েছেন তিনি।

পাখিরাও হাজির। বলছেন, ময়ূরকে আফিম দিলে রোজ ঠিক সময়ে আসে। আবার ময়ূর পাখা দেখায় কিন্তু পাগুলো বড় নোংরা। দেখেছেন, সব পাখির ঠোঁট বাঁকা নয়। জানেন, পাখি কিছু সঞ্চয় করে না, কিন্তু ছানা হলে সঞ্চয় করে। চিল

শকুনি অনেক উঁচে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। আবার শকুনি শকুনির সঙ্গে থাকে। মরা গরু একটা পেলে যত শকুনি সেখানে এসে পড়ে। পানকৌটি অনায়াসে গায়ের জল ঝেড়ে ফেলে। পাখি বড় হলে যখন সে আপনার ভার নিতে পারে তখন তাকে ধাড়ী ঠোকরায়, কাছে আসতে দেয় না। হোমাপাখির কথা বলেছেন, আকাশে থাকে, ডিম পড়তে পড়তে ডিম ফোটে। এটি বিস্ময়কর হলেও বৈজ্ঞানিক সত্য। চাতক পাখির বাসা নিচে, কিন্তু উঠে খুব উঁচুতে। কিন্তু চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না কি? স্বাতীনক্ষত্রের বৃষ্টির জন্যও হয়তো সে হাঁ করে থাকে না। বলেছেন, পায়রারা দেখনাই তফাতে থাকতে পারে না।

নানাপ্রসঙ্গে পোকা-মাকড়ের যে সব কথা এসেছে, সেগুলোও বিজ্ঞানভিত্তিক। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বের করে, নিজে জালের উপর থাকে। সত্যিই বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ, ঐতেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। ভাতের হাঁড়িতে ঐ পোকা রাখলে মরে যাবে। মাছির স্বভাব সঠিক বলেছেন—সাধারণ মাছি ফুলে বসে, সন্দেশে বসে, বিষ্ঠাতেও বসে, পচা ঘায়েও বসে। এবং একখুরি রস থাকলে মাছি কিনারায় বসে খায়, মাঝে গেলে ডুবে যেতে হয়। মৌমাছি—সে শুধু ফুলে বসে। আবার যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ ভনভন করে। ফুলে বসে মধু পান আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। কিন্তু অনেক কষ্টে অনেকদিন ধরে মধু সঞ্চয় করে মৌমাছি। অন্যে এসে চাক ভাঙে। আর গুটি পোকা সত্যি আপন নালে আপনি মরে। প্রদীপ জ্বাললে বাদুলে পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে, পুড়ে মরে। অবশ্য কুমুরেপোকা চিন্তা করে আরশুলা কুমুরেপোকা হয়ে যায় না।

মাছধরা সটকা কলের যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এমনকি মাঠে গর্তের মতো মাছ-কাঁকড়া ধরার ঘুনীও চোখ এড়ায়নি। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু ঠিকই তো, গা পরিষ্কার উজ্জ্বল। আর সিঙ্গি মাছের কাঁটা ফুটলে তার বিষে হাত ঝনঝন করে। জল নড়লে টের পাওয়া যায় বড় মাছ এসেছে। এবং জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে রুই কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনোপুঁটি, পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয়। ব্যাঙাচির ন্যাজ খসলে জলেও থাকতে পারে আবার ডাঙাতেও থাকতে পারে। ইঁদুর তাড়াবার একটা সোজা কৌশল বলেছেন—দোকানে চালের বড় বড় ঠেক···পাছে ইঁদুরে খায়, তাই দোকানদার কুলোয় করে খই মুড়কী রেখে দেয়। মিষ্ট লাগে আর সোঁদা গন্ধ—তাই যত ইঁদুর সেই কুলোতে গিয়ে পড়ে, বড় বড় ঠেকের সন্ধান পায় না। জোঁকের উপর চুণ দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যাবে। উট যত কাঁটা খায় মুখ দিয়ে তত রক্ত দরদর করে পড়ে। আবার, বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার উঠে দাঁড়ায়, তবে দাঁড়াতে ও চলতে শিখে। বলছেন, ল্যাজে হাত দিলে যে গরু তিড়িং বিড়িং লাফায়, সেই ভাল।

৭

পরিবেশও বাদ যায়নি। এক জায়গায় বলেছেন, ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারে না। আর মেছুনীর সেই গল্পটা—মেছুনীর মালীর বাড়িতে ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না। বলে আমার আঁশচুবড়ী আনিয়ে দিতে পার? তাহলে বোধ হয় ঘুম হতে পারে।

৮

এইবার চিকিৎসাবিজ্ঞান।

রোগীর সর্বাত্মক চিকিৎসা—আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এটি মূল সূত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনায়

এটি উপস্থিত। তিনি তিনরকম বৈদ্যের কথা বলেছেন; অধম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য ও উত্তম বৈদ্য। অধম বৈদ্য রোগীকে ওষুধ খাবে এই কথা বলেই খালাস, মধ্যম বৈদ্য ওষুধ খাবার জন্য রোগীকে বোঝান, বড় জোর ধমকধামক দেন, আর উত্তম বৈদ্য দরকার হলে রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে জোর করে ওষুধ খাওয়ান।

ভারতের স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৩৫ বছর কেটে গেছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি আজও ঠিক হয়নি। এ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া করে কেউ চিকিৎসা করে তবে সে মহৎ, কাজটিও মহৎ। কিন্তু টাকা লয়ে এসব কাজ করতে করতে মানুষ নির্দয় হয়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য এসব দেখা নিচের কাজ। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় চিকিৎসা একটি ব্যবসায়। প্রতিটি ভারতবাসীই কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সোচ্চারে যা বলেছেন তাই চান, চিকিৎসা যেন একটা বিক্রয়যোগ্য পণ্য না হয়।

কতকগুলি স্বাস্থ্যনীতিরও উল্লেখ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় এগুলি খুবই সহায়ক ভূমিকা নেয়। ইংরেজটোলায় পথে গাড়ি থেকে নেমে জল চাইলেন। কাচের গ্লাসে জল এল। জল খেতে গিয়ে প্রশ্ন—গ্লাসটি ধোয়া তো? অর্থ করতে পারি—বিশুদ্ধ খাবার জল যদি আমরা সবাই পাই, তাহলে জলবাহিত অধিকাংশ সংক্রামক অসুখ দূর হবে। এঁটো খাওয়া সম্পর্কে বলেছেন, যারা সৎ তারা উচ্ছিষ্ট কাহাকেও দেয় না। এমনকি উচ্ছিষ্ট কুকুরকেও দেওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, নমস্কার মানসেই ভাল। পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার কি দরকার? আর মানসে নমস্কার করলে কেউই কুণ্ঠিত হবে না। এটিও স্বাস্থ্যসম্মত। একবার তো শ্রীমকে নিয়ে পড়লেন। বললেন, তুমি জিহ্বা ছোল না! রোজ জিহ্বা ছুলবে। বলেছেন, খাবারের সঙ্গে চুল জিবে পড়লে সবসুদ্ধ ফেলে দিতে হয়। একবার তাকের উপর খাবার নিতে গিয়ে খাবারে হাত দিয়েছেন, এমন সময় টিকটিকি পড়েছে। অমনি খাবার ফেলে দিয়েছেন। কোন কোন সময় ধ্যানও তিনি মশারির মধ্যে করতেন। বলেছেন, একবার বড়বাজারের রং করা সন্দেশ খুব খেয়ে অসুখ! বলাবাহুল্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে এসবেরই যোগাযোগ রয়েছে। বলেছেন, যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ যত্ন করতে হয়।

পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তি তুলে ধরছি। বলেছেন, দুই একটি ছেলে হলে স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে ভাইবোনের মতো থাকবে।

চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা খুঁটিনাটি বিষয়ও আছে। একটি বাংলা শ্লোকে বলছেন—

মুখ হলসা ভেতর বুঁদে কান তুলসে দীঘল
ঘোমটা নারী।
পানা পুকুরের শীতল জল বড় মন্দাকারী।

আবার বলছেন, পানাপুকুরের জলে নাইলে সান্নিপাতিক হয়। সাবলীলভাবে বুঝিয়েছেন, মানুষের শরীর দেখ, মাথা যেটা মূল উপরে চলে গেল কত প্র্যাকটিক্যাল—জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করলে এদিকে হয়ে যায়। এখন ডি গুপ্ত। এমনি, যখন খুব জ্বর তখন কুইনাইন দিলে কি হবে? ফিভার মিকসচার দিয়ে বাহ্যে টাহ্যে হয়ে একটু কম পড়লে তখন কুইনাইন দিতে হয়। আবার কারু কারু অমনি সেরে যায়, কুইনাইন না দিলেও হয়। বলছেন, মিছরীর সরবৎ খাওয়া ভাল। অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে, কিন্তু মিছরীতে কফ দোষ করে না। আর হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়—পিত্ত দমন হয়। বিছে বা ডাকুর কামড়ে শুধু ওষুধে হয় না। ঘুঁটের ভাবড়া দিতে হয়। জানেন ফোঁড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়, আবার ঘায়ের মামুড়ী ঘা

শুকুতে না শুকুতে ছিঁড়লে রক্ত পড়ে, কষ্ট হয়, কিন্তু ঘা শুকিয়ে গেলে মামুড়ী আপনি খসে পড়ে যায়। মৃত্যুসময় জ্ঞান থাকলে যন্ত্রণা বোধ হয়, যেমন কলেরায়। বলছেন, পেটে ছেলে হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে খাটতে দেয় না। আরও—রোগের একটু বাকী থাকলে হাসপাতাল থেকে চলে আসতে দেয় না। তুমি নাম লিখালে কেন? যখন অনেক পিত্ত জমে তখন ন্যাবা লাগে। খুব ন্যাবা হলে তবেই চারিদিক হলদে দেখা যায়। যথার্থই বলছেন, যদি সাপে কামড়ায়, বিষ নাই জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়। এতে রোগী সাংঘাতিক সাহস ফিরে পায় তো ঠিকই।

শ্রীরামকৃষ্ণ কতকগুলো লক্ষণ বিচার করতেন। যেমন পুরু হাত, বেঁটে, ডোবকাটা গা, কটা বা ট্যারা চোখ প্রভৃতি। এগুলোর সঙ্গে খুব সম্ভবতঃ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই।

রোগ নিরাময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধাই-এ একেবারে বিশ্বাস করতেন না। নিজের ব্যাধির জন্ম কখনও দৈবের ভরসা করেননি। বলছেন, অসুখ ভাল হোক একথা আমি বলতে পারি না। এ ক্ষমতা আমি মার কাছ থেকে চাইও না। গিরিশ যখন কালী কালী বলে রোগ ঝাড়িয়ে দেবার নামে প্রায় অভিনয় শুরু করলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, যা বাপু আমি ওসব বলতে পারি না। মা সারদা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য দৈবশক্তির সাহায্য নিতে তারকেশ্বর গিয়েছিলেন ফিরে এলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে ওতে কিছু হবে না।

৯

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার একটি পার্শী হাফেজ বলেছিলেন: চামড়ার ভিতর মাংস, মাংসের ভিতর হাড়, হাড়ের ভিতর মজ্জা আরো কত কি। সকলের ভিতর প্রেম। এই প্রেমের প্রদীপই জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানসহ আধুনিক বিজ্ঞান এই মর্ম অনুধাবনের চেষ্টাই করছে—যেখানে প্রেম নেই, সেখানে কোন বিজ্ঞান নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও লোকসংস্কৃতি

ডক্টর সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক এবং কলা ও বাণিজ্য শাখার সচিব। বিশিষ্ট সাহিত্যিক।]

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ্ হারকোভিটস্ কালচারের কথা বলতে গিয়ে তাঁর "Man and his works" গ্রন্থে বলেছেন, 'A culture is a way of life of a people'—অর্থাৎ একটি সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন প্রণালী। সমাজ একটি সংগঠন, প্রত্যেক জনসংগঠন বা গোষ্ঠীর একটি বিশেষ জীবনযাপন রীতি বা জীবনাচরণের রীতি আছে। সেই জীবনযাপন রীতিই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। সুতরাং সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জীবজগতে মানুষই হচ্ছে সংস্কৃতির স্রষ্টা। সংস্কৃতি নির্মাণকারী জীবরূপে মানুষ অন্যান্য জীব থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয়, কেন মানুষ সংস্কৃতিকে সৃজন করছে? তার উত্তরে একটি কথাই বলা চলে, যে মানুষ সামাজিক জীবনযাপন করে, সেই মানুষই বেঁচে থাকার তাগিদে সংস্কৃতির সৃজন করে। সমস্ত জীবজগতের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় Law of natural struggle—প্রতিযোগিতার জৈব নিয়ম, আবার Law of mutual aid—সহযোগিতার জৈব নিয়ম। জীবজগতে এই প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা উভয়ই বিদ্যমান। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এ দুটি নিয়ম ছাড়া আর একটি নিয়ম বিদ্যমান, সেটি হচ্ছে Law of human exchange বা মানবিকতা বিনিময়ের বা মনন বিনিময়ের নিয়ম। এরই নাম সংস্কৃতি এবং মানুষই হচ্ছে এই সংস্কৃতির স্রষ্টা। আসলে

সমাজ হচ্ছে ব্যক্তিসমষ্টি আর সংস্কৃতি হচ্ছে Body of learned behaviour বা শিক্ষার্জিত আচরণের সমষ্টি। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে ব্যক্তি সমাজের অঙ্গীভূত হয় এবং অপর ব্যক্তির সঙ্গে মানিয়ে নেয় এবং প্রচলিত আচরণরীতি আয়ত্ত করে। এর নাম দেওয়া যেতে পারে শিক্ষণ অর্থাৎ আচরণকে বিশেষ রীতির মধ্যে আনয়ন বা Conditioning। এরই সাহায্যে ব্যক্তি গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়—যাকে বলা চলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তি-বিদ্যাগত। ধর্মীয় আচার-আচরণগত, শিল্প ও কলাবিদ্যাগত এবং ভাষা ও সাহিত্যগত, জন-শ্রুতিকে আত্মসাৎকরণ। এইগুলিই হচ্ছে সংস্কৃতির মৌল উপাদান যা জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি রচনা করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের জীবনযাত্রা-প্রণালীর একটি বিশিষ্টরূপই নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির রূপরেখা রচনা করেছে। তার মধ্যে ধর্মই হচ্ছে প্রধানতম মৌল উপাদান। পাশ্চাত্য মনীষিগণ ধর্মের যেমন সংজ্ঞাই দিন না কেন, ভারতীয় মতে যা ধারণ করে তাই ধর্ম। জীবনকে যা ধারণ করে আছে কিংবা জীবন যা ধারণ করে আছে তাই ধর্ম। ধর্ম এখানে একান্তভাবে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। পাশ্চাত্যের মতো ধর্ম কেবলমাত্র জীবনের একটি বহিরঙ্গ দিক মাত্র নয়। ভারতীয় সংজ্ঞা অনুসারে জীব মাত্রেরই ধর্ম আছে। পশুপক্ষী থেকে শুরু করে মনুষ্যের জীবনধারণের জন্য আহার-নিদ্রা-প্রজনন ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। একে বলা হয় জৈবধর্ম। এরই সঙ্গে সঙ্গে এই জৈবধর্মকে অতিক্রম করে মানুষ আধ্যাত্মিক চৈতন্যলোকে বা একটি বিশেষ দার্শনিক উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছে। তখনই ধর্ম একটি সম্পূর্ণতার পথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একদিকে মানুষের প্রতিযোগিতা আর সহযোগিতার জৈব নিয়ম আর তারই মাঝখানে মানবিকতা বা মনন বিনিময়ের দ্বারা যে ধর্মীয় দার্শনিকতার পরিমণ্ডলটি গড়ে ওঠে সেখানেই ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির সুষ্ঠু সমন্বয়। আদিম মানুষ গুহাযুগ থেকে সরে এসে যখন কৃষিকাজ শুরু করেছে। স্থায়িভাবে কুটির বেঁধে দলবদ্ধভাবে বাস করেছে কিংবা আরও পরে বেশ কিছু গোষ্ঠী সংহত হয়ে নিজস্ব আচার-আচরণ, বিধি-নিষেধ, উৎসব-অনুষ্ঠান, জীবনধারণের জন্য একই মাপের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ধারা গড়ে তুলেছে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ জীবনের বিবিধ পর্যায়কে একই বিশিষ্ট নিয়ম-নীতির মধ্যে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করেছে, সেদিন থেকেই আদিম মানুষ লোকায়ত গ্রাম্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। তারপরে গঠিত হয়েছে সমাজ। আরও পরে রাষ্ট্র ইত্যাদি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই দেখা গেছে, একটি গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালী বা জীবনাচরণের যে ধারা তৈরি হয়েছে বহু যুগ ধরে এবং ক্রমশঃ সমাজীকরণ প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে ব্যক্তি গোষ্ঠী বা সমাজের প্রচলিত আচরণ, রীতিনীতিকে আয়ত্ত করে শিক্ষণের মাধ্যমে সেই সমাজ বা গোষ্ঠীর একজন হয়ে ওঠে। এই প্রাথমিক স্তরের অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিবিদ্যাগত, ধর্মীয় আচার-আচরণগত, কলা-বিদ্যাগত এবং ভাষা ও সাহিত্যগত জনশ্রুতিকে আত্মসাৎ করে যে জীবন সম্পর্কীয় ধারা গড়ে ওঠে প্রাথমিক ক্ষেত্রে সেটিই হচ্ছে ধর্মের লোকাচারগত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা ধর্মকে ক্রমশঃ একটি দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চৈতন্যে উপনীত করে। তাই দেখা যায়, প্রত্যেকটি প্রধান ধর্মেরই বা ধর্ম-ধারণার মূল আধ্যাত্মিক চৈতন্যটি বা দার্শনিক অভিব্যক্তিটি একজন ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ে সর্বপ্রথম উদিত হয়। তারপর ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে এবং তাঁর বাণীকে অবলম্বন করে প্রচার ব্যাপ্তি



লাভ করে। যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য—এঁরা প্রত্যেকেই একান্ত আত্মিক সাধনার দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং আত্মপ্রত্যয়ের মাধ্যমে সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লক্ষ্য করা গেছে, এই সব ধর্মসাধকেরা অনেকেই এই লোকায়ত জীবন-ধারণার প্রাথমিক স্তর থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব্যাখ্যার প্রয়োজনে। দেখা গেছে যে, সাধক যত বেশি লোকায়ত জীবনের কাছাকাছি যেতে পেরেছেন, তাঁদের জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছেন এবং দার্শনিক ও আত্মিক উপলব্ধির ব্যাখ্যায় যত বেশি সেগুলিকে প্রয়োগ করেছেন, তিনি লোকজীবনের কাছে তত বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন। তাঁর দিব্যানুভূতি মানুষের কাছে তত বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্র বেদের চার গ্রন্থের মধ্যে প্রত্যেক ভাষার শেষ অংশ ছিল উপনিষদ্—সেখানে ছোট ছোট গল্প, কাহিনী, ইতিকথা ইত্যাদির মাধ্যমে বাকী তিনটি অংশের অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকের মন্ত্রগুলিকে বা দার্শনিক উপলব্ধিকে সহজতর ভাবে লোকায়ত জনগণের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। সেই একই জিনিসের প্রতিধ্বনি দেখা গেছে বাইবেলের গল্পাংশে, কোরানের কোন কোন অংশে, বৌদ্ধ-ধর্মের জাতকে। অপরদিকে পৃথিবীর ধর্মগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এদের মধ্যে একটি প্রবল নৈতিক আবেদন আছে। প্রত্যেক ধর্মই একটি উচ্চ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ জীবনকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে কতকগুলি নিয়ম-নীতির উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এই প্রতিষ্ঠার মূলেই আছে সেই নৈতিক শক্তি যা লোকায়ত জীবনের স্তর থেকে গৃহীত হয়েছে ধর্মের ভিত্তিমূলে। এছাড়া ধর্মেরও একটি প্রধান গুণ স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠা। এক একটি গোষ্ঠী বা সমাজজীবন কতকগুলি আচরণগত বিধি (Code of Conduct) এবং নৈতিক মানদণ্ড (Moral Standard) গড়ে তোলে বহু প্রজন্মের শিক্ষার্জিত আচরণের ফলস্বরূপ। প্রত্যেক ধর্ম লোকায়ত জীবন থেকে এই আচরণগত বিধি এবং নৈতিক মানদণ্ডকে একটি আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডলে সংস্থাপিত করে। এক্ষেত্রেও ধর্ম যখন লোকায়ত জীবনের স্তর থেকে উদাহরণ গ্রহণ করে পরবর্তী ক্ষেত্রে তার আধ্যাত্মিক মূল্য-বোধকে বিশ্লেষণ করে তখন তার পূর্ণরূপ আরও সহজতর ভাবে মানুষের কাছে উপস্থিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে এমন একজন মহামানব আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন যিনি ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনের মর্মবাণীকে লোকায়ত জীবনের অনুপ্রেরণায় সহজতর ব্যাখ্যায় মানুষের সামনে উপস্থিত করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব—যিনি একদিকে ভারতীয় জীবন-দর্শন, ভারতীয় ধর্মসাধনার সঙ্গে লোকায়ত জীবন-চর্চা, ধ্যানধারণা, রীতিনীতি, সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদিকে একত্রিত করেছিলেন। এবং নিজস্ব জীবনসাধনার মর্মকথার মধ্য দিয়ে সেটি প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ধর্মসাধনার প্রকাশভঙ্গীর প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উচ্চতর ভারতীয় দার্শনিক প্রত্যয়গুলি লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। ফলে একদিকে তা যেমন ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী হয়েছে, অপরদিকে তেমনি সেগুলি সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত আবেদনশীল হয়েছে। বাংলাদেশের একটি অখ্যাত গণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করে যে লোকায়ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর নিজস্ব মানসিক পরিমণ্ডলটি গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে পরবর্তী যুগে আধ্যাত্মিক চৈতন্যের সংমিশ্রণে এক নবতর চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। তাঁর জীবনসাধনায়

ও মর্মবাণীতে যা বিধৃত হয়ে আছে তাঁর বিভিন্ন কার্যপ্রণালীর মধ্যে ও আলোচিত বাণীর মধ্যে তার সন্ধান পাওয়া যায় শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র মধ্যে। 'কথামৃতে'র সূচনাতেই মাস্টার মশায়ের সঙ্গে সাকার-নিরাকার, চিন্ময়ী-মৃন্ময়ীর স্বরূপ বোঝাতে একেবারে লোকায়ত উপমামূলক গল্পে উপনীত হয়ে ঈশ্বরস্বরূপ উপলব্ধি এবং ঈশ্বরে মন কিভাবে হবে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন যে মাস্টার মাটির প্রতিমার পূজার কথা বলেছিল—যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ তিনিই এসব করেছেন—অধিকারী ভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন। "এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন—যার যা পেটে সয়। কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়্চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব করেছেন। যেটি যার ভালো লাগে। যেটি যার পেটে সয় বুঝ্‌লে ?" আবার যখন মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন ঈশ্বরে কি করে মন হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছেন যে, ঈশ্বরের নাম গুণগান সব সময় করতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়, সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

এ পর্যন্ত হচ্ছে উচ্চ তত্ত্বচিন্তার দার্শনিক ব্যাখ্যা। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সাধারণ মানুষের কাছে এই তত্ত্বচিন্তাটিকে সহজতর ভাষায়, সরলতর ভাবে উপস্থিত করতে চান তখন তিনি কিন্তু আশ্রয় নেন লোকায়ত ভাষা, লৌকিক উপমা আর লোকায়ত জীবনবোধের মধ্যে এবং তার মধ্য থেকেই সংগ্রহ করে নেন ভারতীয় জীবন-ধারণার সঙ্গে একজন সাধারণ মানুষের নিজস্ব বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ধারাটিকে। আর তখনই তিনি লোকায়ত উপমায় বলেন: "যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে।" লোকায়ত ভাষা ব্যবহার করেন, দেশজ অনুপ্রাসে ভরিয়ে তোলেন তাঁর বাণীকে; বলেন: "ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে।" গৃহস্থ কিভাবে ঈশ্বর উপাসনা করবে, কিভাবে সাধনভজন করবে এরই তত্ত্বব্যাখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: "সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে, যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউ নয়"—কিন্তু এই তত্ত্বব্যাখ্যায় সহজিয়া প্রকাশের জন্য তিনি যখন তদানীন্তন সমাজের আচার-আচরণ, জীবনযাপন প্রণালীর মধ্য থেকে গল্প, কাহিনী, বিশ্বাস, সংস্কারকে একের পর এক উপস্থিত করেন তখন তাঁর লোকায়ত মানসিকতাটিকে চিনে নিতে খুব বেশি দেরী হয় না। উপরি-উক্ত তত্ত্বকথার লোকায়ত ব্যাখ্যায় তিনি পরপর কতকগুলি লোকায়ত উপমা, লোকবিশ্বাস, লৌকিক সংস্কারকে পর পর উপস্থিত করেছেন:

(ক) "বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে, বলে 'আমার রাম' 'আমার হরি' কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।"

(খ) "কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায় কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জান?—আড়ায় পড়ে আছে। যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারের সব কর্ম করবে কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে।"

(গ) "তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়। তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়।

ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।"

(ঘ) "কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জন হওয়া চাই। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়।"

(ঙ) "সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তাহলে দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায় তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে।"

(চ) "সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার; বুঝেছ?"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিকে যেমন ভারতীয় সাধনার মর্মবাণীকে আত্মস্থ করেছিলেন আত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে, ঠিক তেমনি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল লোকায়ত জীবনবোধ এবং লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি। ফলে ঈশ্বরভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কচ্ছপের ডিম পাড়া, দাসীর দেশের দিকে মন থাকা, তেল হাতে কাঁঠাল ভাঙা যেমন এসেছে ঠিক তেমনি বেশি নাড়াচাড়া করলে যে দই বসে না ইত্যাদির উদাহরণও এর সঙ্গে যোগ হয়েছে। সুতরাং যে জীবনাচরণে মানুষ যুগ যুগ ধরে অভ্যস্ত তার মধ্যেই কতকগুলি নিয়ম-নীতি ও আদর্শ গড়ে ওঠে—পরবর্তী ক্ষেত্রে যেগুলি ধর্মীয়—নীতিবিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক দার্শনিক অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়। তাই আমরা দেখি, প্রত্যেক দেশের ধর্ম ও দর্শনচিন্তার মূল ভিত্তিভূমিতে থাকে সে দেশের ঐতিহ্যগত সংস্কার, বিশ্বাস ও আচার-আচরণের ধারা যাকে এককথায় লোকসংস্কৃতির ভিত্তিমূল বলা চলে। ভারতীয় ও বাঙালী জীবনবোধে লোকায়ত বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার সঙ্গে উচ্চতর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তা এবং অনুভূতিগুলির খুব বিশেষ একটা পার্থক্য নেই। তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় মেয়েলী ব্রতকথায়, প্রবাদে, প্রবচনে, কথায়, কথকতায়, ইতিকথায়, পুরাকথায়, কৃষকের-মাঝির গীতে, লৌকিক আলাপ-আলোচনায়—সব কিছুর মধ্যেই এক অভূতপূর্ব স্বচ্ছ জীবনবোধভিত্তিক দার্শনিক চিন্তা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর জীবনসাধনা, ঈশ্বরানুভূতির প্রকাশে, কথা ও বাণীর রূপরেখায় একেই বারবার ব্যক্ত করেছেন। কারণ তিনিই তো বলতে পারেন ঈশ্বরদর্শন কিভাবে সম্ভব। তাঁর সংলাপে তাই বেরিয়ে আসে, "খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়।" "মাগ ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।" "তিন টান একত্র হলে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের সন্তানের উপর, আর সতীর পতির উপর টান।" এই মাগ ছেলে, এক ঘটি কাঁদা, বিষয়-বিষয়ী, মা-সন্তান, সতী-পতি ইত্যাদি দেশজ শব্দ ব্যবহার ও লৌকিক উপমা প্রয়োগ 'কথামৃত'কে একদিকে যেমন উচ্চাঙ্গের ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্মবাদের সার্থক রূপায়ণ হিসাবে উপস্থিত করেছে, অপর দিকে তাঁর লোকায়ত জীবনদৃষ্টির স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে লোক-সংস্কৃতির মহান ধারকরূপেও চিহ্নিত করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যধারা ও বাংলাসাহিত্য

ডক্টর চিত্রা দেব

[গবেষণামূলক বহু গ্রন্থ-রচয়িত্রী, ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা—আধুনিক বাংলাসাহিত্যে যশস্বতী। প্রাচীন পুরাণ ও পুঁথি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য ও সঙ্গীত তাঁর গবেষণার মুখ্য পরিধি। অনুবাদ সাহিত্যেও সুখ্যাতা। সম্প্রতি বাংলা নারীজাগরণের বৃহত্তর ইতিহাস-গবেষণায় নিরতা। বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্টা।]

বাংলাদেশে আধ্যাত্মিক জীবনসাধনার প্রেরণা-স্বরূপ দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা শুধু ধর্মচেতনা ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে নয় সমগ্র বাঙালীর জীবনে ও মননে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বাঙালীর চিত্তলোকে যে দুটি নবজাগরণের আলোকোদ্ভাস ঘটেছিল, হৃদয়-মন্থন করে যে অমৃতের উৎসারণ হয়েছিল তারই ঘনীভূত রসরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন এই দুই দেবকল্প মহামানব, শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এই দুজনের যুগান্তকারী আবির্ভাব বাঙালী মানসকে বিকশিত করেছে। আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে এই দুই দেব-মানবের প্রভাব কম নয়। ভারতবর্ষীয় ধ্যান-ধারণায় পূর্বে অবতাররূপে যে মহাপুরুষেরা এসেছিলেন তাঁরাই ছিলেন ভারতীয় মহাকাব্যের নায়ক। কিন্তু দশাননজয়ী অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র ও কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধনিয়ন্তা দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই নরদেব মহাপুরুষদ্বয়ের পার্থক্য আছে, বরং পীত চীবরধারী মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের সঙ্গেই এঁদের সাদৃশ্য বেশি। ত্যাগ-তিতিক্ষার মূর্ত-প্রতীক বুদ্ধদেবের আবির্ভাব যেমন আলোড়ন জাগিয়েছিল উত্তর ভারতে; জাতক ও পালি-সাহিত্যে পড়েছিল তাঁর প্রভাব, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবও সেই আলোড়ন জাগিয়েছিল বাঙালীর জীবনে। গীতোক্ত 'সম্ভবামি যুগে যুগে' বাণীও সার্থক হয়েছে তাঁদের আবির্ভাবে। তাই, বাঙালীর জীবনসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাবের কথা বলতে গেলে বারংবার শ্রীচৈতন্য-দেবের কথাও এসে পড়ে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে একদিকে যেমন বাঙালীর অন্তরঙ্গ জীবনে ঘটেছিল ভাবের উন্মেষ, অপরদিকে বৃহৎ মানবতার আদর্শ ও বিস্তার ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁর আবির্ভাবকে নব-জাগরণ বলতে আমাদের দ্বিধা নেই। ভাবের আদান-প্রদানেই নবজাগরণের সূচনা হয়। সে সময়ে বহিঃশক্তিরূপে বাংলাদেশে এসেছিল মধ্য-প্রাচ্যের মুসলমানী প্রভাব, আর বাঙালী জীবনের অকুণ্ঠ প্রেমধর্ম শ্রীচৈতন্যদেব দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সমগ্র ভারতভূমিতে। উনিশ শতকের নবজাগরণ আমাদের বিশেষ পরিচিত। ইউরোপীয় প্রভাবের সঙ্গে প্রাচ্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটল এই শতাব্দীতে। এই সময়েই আমরা পেলাম শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে। প্রাচ্য বাণী ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা বহির্বিশ্বে নিয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাপার্ষদমণ্ডলী।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য গতানুগতিক তুচ্ছতা থেকে মুক্তিলাভ করে উদারতার পরিমণ্ডলে সম্প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর অলোকসামান্য প্রভাব দীপবর্তিকার মতোই ধর্মান্ধ সীমাবদ্ধতার কুসংস্কারকে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে দূর করতে সক্ষম হল। তাঁর মানবলীলার অপূর্ব বৃত্তান্ত চৈতন্য-জীবনীগুলিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে। জীবিত বা অল্পকাল পূর্বে লোকান্তরিত কোন মহাপুরুষকে অবলম্বন করে এত জীবনী-

সাহিত্য রচনা ও তার দার্শনিক ব্যাখ্যা আগে হয়নি। এর প্রতিফলন দেখা যাবে উনিশ ও বিশ শতকের সাহিত্যেও।

কামারপুকুর গ্রামের নিষ্ঠাবান ভক্ত ও ব্রাহ্মণ বংশের পুত্র গদাধর যেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভবতারিণীমূর্তির মধ্যে জগজ্জননীর চিন্ময়ী রূপ দর্শন করে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবে রূপান্তরিত হলেন সেদিন তাঁর পুণ্যপাদস্পর্শ বক্ষে ধারণ করে কলকাতা শহর নবদ্বীপের মতোই পবিত্র তীর্থে পরিণত হল। তাঁর অলোকসামান্য জীবনসাধনা ও অলৌকিক লীলামাহাত্ম্য চিরন্তন সাহিত্যরস-পিপাসু বাঙালীর ভক্তিনত চিত্তে পুনরায় মহা-মানবের জীবনলীলা প্রকাশের বাসনা নিয়ে দেখা দিল। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখা দিল বিস্ময়কর পরিবর্তন। 'ভাগবতী তনু' চৈতন্যদেবের জীবন তাঁর ভক্তদের কাছে 'ভাবের মূরতি'। তিনি ছিলেন 'মধুরবৃন্দাবিপিনমাধুরীপ্রবেশ-চাতুরীসার' কিছু বাস্তব ও কিছু কল্পনায় মেশা। তাঁর জীবনচরিতগুলিও তাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিত রচনার সময় এই বিপর্যয় ঘটেনি। কারণ জীবনী রচনার একাধিক আদর্শ তাঁর ভক্ত-মণ্ডলীর সামনে ছিল। সর্বোপরি তাঁরাও ছিলেন উচ্চশিক্ষিত আধুনিক মনন-সম্পন্ন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁরা নিয়মরাহিত্যের ব্রতধারী। প্রচণ্ড সম্ভাবনা ও প্রবল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কেউ সুকুমার রস-সাহিত্যের ললিত-লোভন শাখার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত করেননি। শুধু মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং তাঁর শিক্ষা ও সাধনাকে পূর্ণমাত্রায় সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করার জন্যই তাঁরা লেখনী ধারণ করে-ছিলেন। সেই সঙ্গে ঔপনিষদিক চেতনাযুক্ত সনাতন হিন্দুধর্মের সংস্কারমুক্ত পুনরুজ্জীবনও তাঁদের লক্ষ্য ছিল।

পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মপ্রবর্তক কোন লিখিত শাস্ত্র রেখে যাননি। তাঁদের শিষ্য ও অনুসরণ-কারীরাই তাঁদের কথা জানিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জীবনসাধনাও সর্বসমক্ষে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধর্মান্দোলন' নামে পরিচিত। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ নতুন কোন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেননি, বরং ব্রাহ্মধর্ম প্লাবিত তৎকালীন বাংলা-দেশে পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন বলা চলে। তবে তাঁর ধর্মচেতনায় কোন গোঁড়ামি, প্রচারধর্মিতা বা সাম্প্রদায়িক 'স্কুল' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ছিল না। তিনি সর্ব মত ও পথের সমন্বয়বাদী। সর্বধর্মের নিয়মনিষ্ঠ আচারগুলি পালন করে তিনি দেখিয়েছিলেন 'যত মত তত পথ', আসলে সব ধর্মই সমান। সবারই লক্ষ্য এক, পথ শুধু ভিন্ন। যে পথেই যাওয়া যাক না কেন, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিক ভক্তি অটুট থাকলে ঈশ্বরোপলব্ধি হবেই। সুতরাং বিরোধের প্রয়োজন কি? তাঁর এই উদার মতবাদ আকৃষ্ট করেছিল আপামর জনসাধারণকে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মনেও ছিল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পাবার জন্যে দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হতেন। ঠাকুর স্বয়ং কিছু রচনা করেননি, কিন্তু তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত অমৃতোপম বাণী ও উপদেশই সমস্ত সাহিত্যের সার। স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরুভ্রাতারা শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনসাধনার কথা সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তাঁদের সমবেত চেষ্টার ফলেই প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বাণী প্রতীচ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্ত্যলীলাবসানের পর তাঁর জীবন-বাণীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতকে যিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথাই সর্বাগ্রে স্মরণ করছি। অবশ্য শ্রীম-র কথামৃত সংকলনের বহু

পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবৎকালেই তাঁর উপদেশ-বচনামৃত সংকলনের কথা কারো কারো মনে জাগ্রত হয়। একাজে সর্বপ্রথম আগ্রহ প্রকাশ করেন সম্ভবত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ১৮৭৫-এর ১৫ মার্চ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় এই বাণী সংকলন করেন গিরিশচন্দ্র সেন। এই সংকলনটি ১৮৭৮-এ 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় ছিল ১৮৪টি প্রশ্ন ও তার উত্তর। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসম্বরণের অব্যবহিত পরে এই পুস্তিকায় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীও সংযোজিত হয়েছিল। এছাড়া আরও একটি উপদেশ-সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। সংকলক সুরেশচন্দ্র দত্ত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' নামে গ্রন্থটি প্রথমে প্রকাশ করেন। পরে এই গ্রন্থটিই সম্ভবত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' নামে পরিচিত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে উপস্থিত হন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় থেকে ঠাকুরের দেহত্যাগের সময় পর্যন্ত শ্রীম অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে তাঁকে দর্শন করেন ও প্রতিদিনকার দিনলিপিতে এই সাক্ষাতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। উদ্বোধন পত্রিকায় (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রকাশের সময় থেকেই গ্রন্থটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীম পাঁচ খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ জীবনের অনুপুঙ্খ ঘটনা তথা অজস্র মূল্যবান উপদেশ সংকলন করেছেন। তাঁর অসামান্য স্মৃতিশক্তি ও সহজ-সরল বর্ণনা-শক্তির গুণে আমরা 'কথামৃত' পাঠকালে দৃশ্যমান ছায়াচিত্রের মতো ঠাকুরের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী মানস নয়নে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হই। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি'তে আছে :

'প্রশ্ন—নির্ভরের ও প্রার্থনার কিরূপ ভাব ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বানরের ছানা মার বুক জড়িয়া ধরিয়া থাকে। বিড়ালের ছানা ম্যাও ম্যাও করিয়া থাকে। প্রথমটি নির্ভরের ভাব দ্বিতীয়টি প্রার্থনার ভাব।' প্রায় একই প্রসঙ্গ 'কথামৃতে' পাওয়া যাবে ভিন্ন রূপে : 'শ্রীরামকৃষ্ণ—দু রকম ভক্ত আছে। এক থাকের বিল্লীর ছার স্বভাব। সব নির্ভর—মা মা করে। বিল্লীর ছা কেবল মিউ মিউ করে। কোথায় যাবে, কি করবে—কিছুই জানে না। মা কখন হেঁশালে রাখ্ছে—কখনবা বিছানার উপরে রাখছে। এরূপ ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি (বকলমা) দেয়।···

'আর এক থাক ভক্ত আছে, তাদের বানরের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো সো গুণে মাকে আঁকড়ে ধরে। এদের একটু কর্তৃত্ববোধ আছে। আমায় তীর্থ করতে হবে, জপ তপ করতে হবে, যোড়শোপচারে পূজা করতে হবে, তবে আমি ঈশ্বরকে ধরতে পারবো—এদের এই ভাব।'

বলাবাহুল্য 'কথামৃতে'র বর্ণনা পড়তে বেশি ভাল লাগে। প্রথম গ্রন্থে প্রশ্নোত্তর আছে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের স্পর্শ আছে দ্বিতীয় গ্রন্থে। শ্রীম 'কথামৃত' গ্রন্থে শুধু ঠাকুরের কথা নয় পারিপার্শ্বিক ঘটনা-গুলিকেও যথাযথভাবে উপস্থিত করেছেন। তাঁর হাস্য, বিরক্তি, আনমনাভাবগুলিও বাদ পড়েনি। রামকৃষ্ণদেব তাঁর সমগ্র জীবনসাধনালব্ধ হিন্দুধর্মের বেদবেদান্ত আশ্রয়ী কঠোর ঈশ্বরোপাসনাকে অপূর্ব প্রেমার্তির দ্বারা সহজ সুন্দর করে বইয়ে দিয়ে-ছিলেন বাঙালীর প্রাণগঙ্গায়, ভক্তিধর্মের মানস-জোয়ারে। শ্রীম সেই অমৃতধারাকে রেখে গিয়েছেন পরবর্তীকালের পিপাসিত ভক্তদের জন্যে। ভাষা ও বর্ণনার দিক থেকেও 'কথামৃত' বাংলাসাহিত্যের জগতে এনেছে নতুন জোয়ার। 'শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি'তেও অবশ্য ভাষার রূপান্তর লক্ষণীয়। এই পুস্তিকা যখন প্রকাশিত হয় তখন বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে

'আলালী ভাষা' ও 'হুতোমী ভাষা' এসে গেলেও গুরুগম্ভীর বিষয়ে কোন কিছু প্রকাশ করবার প্রয়োজন হলে সকলেই সাধুভাষার সাহায্য নিতেন। হুতোমী ভাষা গভীর ভাব প্রকাশের পক্ষে অযোগ্য, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখের ভাষা সাধুভাষা না হলেও যথেষ্ট উপযোগী। গিরিশচন্দ্র যখন প্রশ্ন করেছিলেন,

'ঈশ্বর কি ভাবে দেখা দেন?' তখন শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সহজ ও পরিচিত উপমা দিয়ে বলেছিলেন, 'বড় মাছ গভীর জলে থাকে, সচরাচর সেই মাছের দেখা পাওয়া যায় না। ভাল চার দিতে দিতে হঠাৎ তুই একবার সেই মাছের ঘাই দেখা যায়, পরে বড়শি বিদ্ধ হয়। তদ্রূপ ভগবান ঘনসচ্চিদানন্দ গূঢ়ভাবে থাকেন, যোগ ধ্যান প্রেম ভক্তির চার দিতে দিতে কখন দৈবাৎ তিনি আসিয়া দেখা দেন। তৎপর ধরা দিয়া থাকেন।'

এ ভাষা গুরুগম্ভীর নয়, সরস। অথচ গভীর ভাবও সহজে ব্যক্ত করা চলে। 'কথামৃতে'র ভাষা আরও সহজ আরও মৌখিক। যেমন,

"প্রথমে 'নেতি', 'নেতি' করতে হয়। তিনি পঞ্চভূত নন; ইন্দ্রিয় নন; মন, বুদ্ধি, অহংকার নন; তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠতে হবে, সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে। সিঁড়ি কিছু ছাদ নয়। কিন্তু ছাদের উপর পৌঁছে দেখা যায় যে, যে জিনিসে ছাদ তৈয়ারী, ইঁট, চুন, সুরকি—সেই জিনিসে সিঁড়িও তৈয়ারী। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই এই জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যিনি আত্মা, তিনিই পঞ্চভূত হয়েছেন।"

কথ্য গদ্যরীতির এই উদাহরণই পরবর্তীকালের বাংলাসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি। দৈনন্দিন জীবন থেকে প্রচলিত উপমার ব্যবহারও লক্ষ্য করার মতো।

'ঈশ্বরকে কি প্রকারে লাভ করা যায়?

রাঙা মুড়ো রুই মাছ ধরতে যেমন ছিপ ফেলে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হয়, তদ্রূপ ধৈর্যের সাধন চাই।'

কিংবা,

'এক একবার বসে বসে আমি খতাই। তা দেখি অন্য পদ্ম কারুর দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল, কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্র দল।'

কিংবা,

'কি জানো, রুচি ভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম নানা মত করেছেন—অধিকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই আবার তিনি সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। মা ছেলেদের জন্য বাড়িতে মাছ এনেছে। সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা, আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিন্তু পোলাও সয় না; তাই কারু কারু জন্য মাছের ঝোল করেছেন,—তারা পেটরোগা। আবার কারু সাধ অম্বল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা—আবার অধিকারী ভেদ।'

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' গ্রন্থেও বহু গল্প ও উপদেশ আছে। মানব মনস্তত্ত্ব ও ধর্ম-জিজ্ঞাসার এক সূক্ষ্ম যোগসূত্র রচনা করে রামকৃষ্ণদেব গল্পগুলি শোনাতেন। এ গ্রন্থের অনেক গল্পই 'কথামৃতে' নেই। যেমন ধরা যাক 'যকের ধনে'র গল্পটি:

এক নাপিত পথে চলতে হঠাৎ শুনতে পেল, কে যেন বলছে, 'সাত ঘড়া টাকা নিবি?' নাপিত আশ্চর্য হয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে, কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। সাত ঘড়া টাকার নাম শুনে সে কিঞ্চিৎ লুব্ধ হয়ে ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে বললো, 'নেবো'। অমনি সে আবার শুনতে পেলে কে যেন বলল, 'আচ্ছা, তোর বাড়িতে দিয়ে এলুম, নিগে যা।' নাপিত বাড়ি গিয়ে দেখে যথার্থই তার বাড়িতে ঘড়া রয়েছে।

নাপিত ভাল করে নেড়ে চেড়ে দেখতে পেলে ছটি ঘড়া মোহরে ভরা আর একটি ঘড়া খালি রয়েছে। খালি ঘড়াটি পূর্ণ করবার জন্যে তার একান্ত ইচ্ছা হল এবং তার ঘরে সোনা-রূপা যা কিছু ছিল, সব এনে সেই খালি ঘড়ার ভিতর পুরলে, কিন্তু তাতে সে ঘড়া পুরবে কেন? নাপিত সংসারের খরচ কমিয়ে রোজ রোজ সেই ঘড়ায় পুরতে লাগল। এবং অবশেষে কাকুতি-মিনতি করে রাজা মশাইকে জানালে যে তার সংসারে এখন ভারী কষ্ট হচ্ছে, সে যে ক' টাকা পায়, তাতে তার চলে না। রাজা তার মাইনে বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু নাপিতের যে দশা সেই দশা। সে এখন লোকের কাছে মেগে পেতে খায় এবং যা কিছু টাকা পায় তা ঐ ঘড়ার ভিতর পোরে। পরে রাজা একদিন তার দুর্দশা দেখে বললেন, 'হ্যাঁরে, আগে তুই কম মাইনে পেতিস তাতে তো বেশ চলতো, আর এখন তুই দ্বিগুণ পাচ্ছিস, তবু তোর চলে না কেন রে? তুই কি সাত ঘড়া মোহর এনেছিস নাকি?' নাপিত থতমত খেয়ে বললে, 'আজ্ঞে, আপনাকে কে বললে?' রাজা বললেন, 'আরে সে যে যকের ধন, সেই যক্ষটা আমার কাছে এসে বলেছিল, 'সাত ঘড়া ধন নেবে? আমি বললাম, 'জমার টাকা না খরচের টাকা? যক্ষটা অমনিই পালিয়ে গেল, আর কোন কথা কইলো না। ও টাকা কি নিতে আছে, ও টাকা খরচ করবার জো নেই, ও কেবলই জমার টাকা, ভাল চাস তো ফিরিয়ে দিয়ে আয়।' নাপিত ঐ কথা শুনে তাড়াতাড়ি আগের সেই জায়গায় গিয়ে বললে, 'তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও, আমার কাজ নেই। যক্ষ বলল, 'আচ্ছা'। বাড়িতে এসে নাপিত দেখে ঘড়াগুলো কে নিয়ে গেছে। লাভের মধ্যে সেই সঙ্গে সে এতকাল ধরে সেই খালি ঘড়াটার ভিতর যা রেছিল, সেগুলিও নিয়ে গেছে। গল্প শেষ করে ঠাকুর মন্তব্য করেছেন, 'ধর্ম রাজ্যেও ঐ রূপ, জমা খরচ বোধ না থাকলে শেষে সর্বস্ব হারাতে হয়।' ঠিক কি উপলক্ষে এবং কাকে ঠাকুর এই গল্প বলেছিলেন তা জানার উপায় নেই। তবু আমাদের অন্তরবাসী যক্ষের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যখন চরম সর্বনাশের মোহানায় নিয়ে আসে তখনই পরিপূর্ণ অনাসক্তির মূর্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ'কে বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলা চলে। ভাব ও ভাষার সারল্য ও অনায়াস লাবণ্য পাঠককে মুগ্ধ করে। তবে বাংলাসাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব শুধুমাত্র তাঁর উপদেশ ও বাণী সংকলনের সঙ্গে শেষ হয়নি, তাঁর অনুগামী শিষ্যদের অবিরল সাহিত্যচর্চার মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। এই সাহিত্যধারাকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবিত সাহিত্য নামে অভিহিত করতে পারি।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের আলোকে যুক্তিসিদ্ধ দৃঢ়তা ও ঔপনিষদিক চেতনায় ভাস্বর সনাতন হিন্দুধর্মের ও রামকৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে তার অভিন্নতা প্রতিপাদন করে বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতাসংকলনের অনুবাদের মূল্য অপরিসীম। অন্যান্য রচনায় তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন চোখে পড়ে। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, মনুষ্যত্ব, দর্শন সর্বোপরি বেদান্ত-আশ্রয়ী অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভক্তিধর্মের যুক্তিনিষ্ঠ একীকরণের ভিত্তিভূমি নির্মাণে তাঁর মতো শক্তিশালী লেখক সর্বদেশে বিরল। বেদান্তকে তিনি দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজন, চরিত্র বিকাশ প্রভৃতি বাস্তব ব্যাপারে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। শুধু বেদান্ত আলোচনা নয়, জ্ঞানযোগ কর্মযোগ প্রভৃতি গীতা উপদেশকে কীভাবে জীবনে কার্যকরী করা যায় তার

বৈজ্ঞানিক যুক্তিনির্ভর প্রমাণ তিনি রেখে গিয়েছেন উত্তরসূরী সাধকদের জন্য। সাধু ও চলিত বাংলা ভাষায় তাঁর যেমন অনায়াস দক্ষতা ছিল তেমনি দখল ছিল ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায়। মঠের আরাত্রিক ভজন ও রামকৃষ্ণস্তোত্রগুলি ছাড়াও তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতার সংখ্যা কম নয়। তাঁর চারটি বাংলা গ্রন্থে দেখা যাবে বাংলা গদ্যরীতির বিবর্তন। 'বর্তমান ভারতে'র গুরুগম্ভীর সংস্কৃতগন্ধী ভাষা ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র স্বচ্ছন্দ দেশজ শব্দে সমৃদ্ধ চলিত ভাষা যে এক ব্যক্তির লেখা তা মনেই হয় না। 'ভাববার কথা' ও 'পরিব্রাজকে'র ভাষাও সহজ সরল চলিত গদ্যে লেখা। বাংলা ভাষা নিয়েও তিনি চিন্তা করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, 'আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুণ বিদ্বান এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে।' কিন্তু তিনি দেখেছিলেন "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।" স্বামীজীও গ্রহণ করলেন লোকশিক্ষার ভাষা। 'ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে সেই, একচোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।' আধুনিক বাংলা ভাষাও তো এই ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। উদ্বোধন কার্যালয়-প্রকাশিত দশখণ্ডে 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' আমাদের জাতীয় সম্পদ,—ভাবের সমুদ্র—জাতির গর্ব।

অসংখ্য সঙ্গীত, স্তোত্র, প্রার্থনামন্ত্র, বন্দনাগীতি রচনা করে রামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক ধ্যানমূর্তির বাণীরূপ দান করেছিলেন তাঁর আর এক শিষ্য, স্বামী অভেদানন্দ। একদিকে তিনি গবেষণা, ভাষণ ও রচনার মধ্য দিয়ে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যটিকে তুলে ধরেছেন, অপরদিকে 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে সহজ সরস ভাষায় তিনি ঐকান্তিক গুরুভক্তি ও ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের কথা বিবৃত করেছেন। অভেদানন্দ আর একটি জটিল জীবন জিজ্ঞাসাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর 'মরণের পারে', 'আত্মজ্ঞান', 'পুনর্জন্মবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থে। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা এ প্রশ্ন সকলেরই। সেই প্রশ্নকেই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন নানাভাবে। তাঁর বিভিন্ন রচনার অনুবাদও হয়েছে। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদরূপে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলাসাহিত্য-ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবিত একটি নতুন সাহিত্য-ধারার সন্ধান দিয়েছেন।

স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে পরমহংসদেবের সমগ্র জীবনকথা বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর রচনা যুক্তিনিষ্ঠ, বাস্তব, বৈজ্ঞানিক সত্যনির্ভর অথচ ঐকান্তিক ভক্তিনম্রতায় সমুজ্জ্বল। রামকৃষ্ণদেবের ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক জীবনসংক্রান্ত সমস্ত কিছু জ্ঞাতব্য বস্তুর আকর গ্রন্থরূপে আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঁচটি খণ্ডকে গ্রহণ করতে পারি। মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করে যে দুরূহ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, এযুগে স্বামী সারদানন্দ সেই দুরূহ কার্য সম্পাদন করলেন 'লীলাপ্রসঙ্গ' রচনা করে। বরং তাঁর মনস্বিতার সঙ্গে লীলাপার্ষদের ভূমিকা যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থটি আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের জীবনী রচনার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন না করে অনেকে মনে করতেন তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তি যাঁর সাম্প্রদায়িক মত সৃষ্টি করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই ধারণা দূর করবার জন্যেই স্বামী সারদানন্দ রামকৃষ্ণদেবের জীবনচরিত রচনায় মনোযোগী হন। কারণ তাঁর মতে ঐ 'অলোকসামান্য জীবনের

সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই উহার অনুশীলন করেন নাই।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠ পরিচালনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য কার্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি বিশেষ কিছু লেখেননি। কিন্তু তাঁর লেখা পত্রগুলি ভক্তিসিক্ত আত্মনিবেদনের অপূর্ব নিদর্শন। সন্ন্যাসীর গৈরিক কাষায়-বসনের অন্তরালে তাঁর যে কুসুমকোমল অন্তর লুকিয়েছিল তার পরিচয় মেলে তাঁর শিষ্যদের প্রতি উদ্বেগাকুল উপদেশাবলীর মধ্যে। 'মহারাজ অমিত বজ্রতেজ-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার বহুমুখী শক্তি বর্ষার বারিধারার ন্যায় শতমুখে প্রবাহিত হইত। কিন্তু এত তেজ এত শক্তি কিরূপে যে মৃন্ময় আধারে এত শান্ত হইয়া থাকিত, তাহার সন্ধান কেহ জানিত না।' দেবেন্দ্রনাথ বসুর এই উক্তির আলোকেই স্বামী ব্রহ্মানন্দের প্রকৃত স্বরূপ চেনা যায়। এই আপ্তকাম সাধকের পত্রগুলি শিষ্যমণ্ডলীর হতাশ চিত্তে উৎসাহ ও আশার উদ্দীপনা সঞ্চার করত। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলীরও উল্লেখ করা চলে। তিনিও অজস্র পত্র লিখেছিলেন তাঁর গুরুভ্রাতা, শিষ্য ও অনুরাগীদের কাছে। সেইসব পত্রে চেষ্টাকৃত অলংকরণের পরিবর্তে ছিল আন্তরিকতা, রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে তোলার আত্যন্তিক প্রয়াসের কথা। চলিত ভাষার অপূর্ব উদাহরণরূপে সে চিঠিগুলিকে এখন সকলেই গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা চলে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-পার্ষদদের মধ্যে অন্তঃসারশূন্য প্রচারধর্মী সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন প্রকাশ ছিল না কোন সময়েই। সহজ সরল আন্তরিকতা, ঐকান্তিক ধর্মবিশ্বাসজনিত সত্যোপলব্ধি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশগুলি আপনা আপনিই সাহিত্যিকরূপ লাভ করত, চেষ্টাকৃতভাবে সাহিত্যিক সৌন্দর্যবৃদ্ধির প্রয়াস না থাকা সত্ত্বেও। স্বামী প্রেমানন্দের সম্পর্কেও একথা বলা চলে। তাঁর চিঠির ভাষা বড় সুন্দর কিন্তু বিচিত্র। যেমন, 'চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হইল, আসমানেতে বানায় ঘর। প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর। ও ভাই, থাকে না তার আত্মপর।...ভালবাসায় যে অনন্ত জীবন—অমরত্ব লাভ হয়। একবার দ্বাপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের লীলা দেখিয়ে অমর হয়ে গেছেন। এই ভালবাসা, এই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা অমূল্য ধন, পরম নিধি। এস এই ধন লুটে নিয়ে আণ্ডিল হয়ে যাই। এই জিনিষ লড়াই করে কেড়ে নিবার জো নেই—অবশ্য পশুবলের কথা বলছি জানবে। বিশ্বাস-বল শ্রদ্ধা-বল চাই এ ধন লাভ করতে হলে।' পড়তে পড়তে মনে হয় এ যেন চিঠি নয় নিজস্ব উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ।

স্বামী তুরীয়ানন্দ কোন গ্রন্থ রচনা করেননি, কিন্তু তিনি কাব্যরসের রসিক ছিলেন। তাঁর লেখা চিঠিগুলির সাহিত্যমূল্য কম নয় অথচ কোথাও চেষ্টাকৃত অলংকরণ নেই 'প্রকৃত সহানুভূতি ও ভালবাসার দ্বারাই চরিত্র সংশোধন হয়, পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধিমত্তায় বিশেষ কিছুই হয় না—এই কথা নিশ্চিত জানিও। অপরের প্রতি যদি তোমার সত্যই সমবেদনা থাকে এবং নিজের জীবন পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও স্বার্থগন্ধ শূন্য হয় তবে মা তোমার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব করাইবেন। নতুবা মুখের কথা যত গম্ভীর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হউক না কেন, শুধু উহাতে কোন ফল হইবে না। ইহাই রহস্য।'

স্বামী শিবানন্দ তাঁর সমগ্র জীবনের অসামান্য ত্যাগ তিতিক্ষার সাধনায় বারাণসীতে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উপদেশগুলি 'শিবানন্দবাণী' নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বাণীও উপমার তুলনায় অনবদ্য। যেমন, 'খাঁটি সন্ন্যাসী হওয়া খুবই কঠিন, তাছাড়া খালি বিরজা-হোম করে গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হল না। যে কায়মনোবাক্যে সব এষণা ত্যাগ করতে পেরেছে

সেই হল ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী। যত পারিস ত্যাগ করে যা। দেখবি সময়ে দরকার হলে মা এত দেবেন যে সামলাতে পারবিনি। ঠিক সাঁকোর জলের মতো একধার দিয়ে আসবে আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে; কিন্তু সঞ্চয় করেছিস তো আর আসবে না তখন ময়লা জমতে শুরু করবে।··· ঠাকুরের কথায় আছে যে, মৌমাছি ফুলেই বসে, মধুই পান করে। তেমনি তোমরাও শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বাবস্থায় ভগবানকে নিয়েই বিলাস করবে।···ঠাকুর যেমন বলতেন কৃপা বাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না। ঐ পাল তোলাই হল নিজের চেষ্টা।' সহজ সরল ভাষা দিয়ে প্রাণের গভীর বাণীকে ব্যক্ত করবার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা বাংলাসাহিত্যে শুরু হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য-মণ্ডলী তাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও তাঁদের ভূমিকা কম নয়। প্রাত্যহিক সমাজ-সংসার থেকে দূরে, প্রচলিত জীবনযাত্রা থেকে সরে গিয়েও তাঁরা স্বীয় জীবনসাধনা দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তার বাণীরূপ দান করার সময় কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষার জন্য অপেক্ষা না করে মৌখিক ভাষাকেই গ্রহণ করেছিলেন।

অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' আবার বিপরীত ভঙ্গিতে লেখা। বাংলা পয়ারের সহজ ছন্দে মধ্যযুগীয় ছাঁচে রচিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-চরিতখানি উনিশ শতকে মধ্যযুগীয় ধারায় রচিত জীবনীগ্রন্থরূপে উল্লেখযোগ্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যধারার আর একজন ভগীরথ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচারের জন্য ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরিতে 'উদ্বোধন' পত্র প্রকাশের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়—ঐ পত্রের প্রথম সম্পাদক মনোনীত হন স্বামী ত্রিগুণাতীত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথাপ্রসঙ্গে তাঁর সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর জীবনী গ্রন্থের কথাও বলতে হবে। রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণা জগজ্জননী দেবী সারদামণিকে ঘিরে একটি শিষ্যামণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তাঁর অলৌকিক ভাবমূর্তি ও দিব্য চৈতন্যময় সত্তা নারীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের কাছে তিনি ছিলেন শক্তিরূপা মাতা, 'আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার মা নয়—সত্য জননী।' স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী সারদেশানন্দ, স্বামী অরূপানন্দ, স্বামী ঈশানানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ শ্রীমায়ের জীবনী রচনা করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দ বিরচিত 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থখানি 'লীলাপ্রসঙ্গে'র মতোই গুরুত্বপূর্ণ আকর গ্রন্থ। স্বামী সারদেশানন্দের 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা' গ্রন্থখানি শ্রীমায়ের সর্বভাবের সর্বরূপের লীলার অগণিত চিত্রের একখানি সুন্দর 'অ্যালব্যাম' যেন। স্বামী অরূপানন্দের লেখা শ্রীমায়ের জীবনী গ্রন্থ আকারে বৃহৎ না হলেও প্রামাণিক তথ্য সঞ্চয়নে অতি মূল্যবান,—প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থও বটে। স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃ-সান্নিধ্যে' করুণাময়ী শ্রীমায়ের অপূর্ব জীবনালেখ্য। স্বামী অরূপানন্দ, স্বামী সারদেশানন্দ ও স্বামী ঈশানানন্দ শ্রীশ্রীমাতৃ-কৃপাধন্য সাক্ষাৎ সন্তান। শ্রীমার আরও কয়েকজন সন্তানের স্মৃতিকথা আছে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র মতো 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'ও শ্রীমার লীলাচিত্র ও বাণী সংকলন। সন্ন্যাসী, গৃহী মায়ের বহু সন্তানের স্মৃতিকথার সমাহারে রচিত এই দুই খণ্ড 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'। শ্রীমার কথাগুলি যেন সৌন্দর্য সুধায় নিষিক্ত, 'ছ্যাখো, কথায় আছে যে, পুকুরে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাই দেখে ছোট ছোট মাছেরা আনন্দে সেইখানে লাফালাফি করে খেলা করছে—ভাবছে আমাদেরই একজন। কিন্তু যখন চাঁদ অস্ত গেল তখন তাদের সেই পূর্ব অবস্থা। লাফালাফির পর অবসাদ এল—কিছুই

বুঝতে পারলে না।' মহাপুরুষদের সেবায় রত ভক্তদের দুর্বুদ্ধি প্রসঙ্গে তাঁর এই উক্তিটির সাহিত্যিক মূল্য কি কম? অপরদিকে পতিতোদ্ধারিণী শ্রীমা নিজের পবিত্র জীবনসাধনার কথাও ব্যক্ত করেছেন, 'যখন নবতে থাকতুম, রাতে যখন চাঁদ উঠতো গঙ্গার ভিতর স্থির জলে চাঁদ দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে কত প্রার্থনা করতুম—চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।' ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী'-তেও বহু তথ্য আছে। আছে স্বামী তেজসানন্দের 'শ্রীমা ও সপ্তসাধিকা' এবং স্বামী নিরাময়ানন্দের 'শ্রীশ্রীমা সারদা' গ্রন্থেও। এসব গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়, আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হল মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যদের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। শুদ্ধানন্দ দীর্ঘদিন 'উদ্বোধন' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব স্বামীজীর ইংরেজী রচনার অনুবাদ। তাঁকে 'রাজযোগ' অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বয়ং স্বামীজী। শুদ্ধানন্দও অতি আশ্চর্য নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে 'রাজযোগ', 'জ্ঞানযোগ', 'কর্মযোগ', 'ভক্তিযোগ' ও অন্যান্য অধিকাংশ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। স্বামীজীর ভাব, ভাষা ও ভাবনাকে তিনি তাঁর অনুবাদের মধ্যে এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে পড়বার সময় মনেই হয় না রচনাটি স্বামীজীর মূল রচনা নয়। স্বামীজীর নির্দেশে শুদ্ধানন্দ দিনপঞ্জী রাখতেন। তাঁর লিখিত দিনপঞ্জীতে মঠের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাওয়া যাবে। তাঁর বহু পত্র এখনও প্রকাশিত হয়নি। স্বামী বিবেকানন্দের মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত 'সন্ন্যাসীর গীতি' বাংলা কবিতা শুদ্ধানন্দেরই কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন।

স্বামী বিরজানন্দ অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসুদের বিভিন্ন জটিল সমস্যাবলীর সমাধান করে দিতেন অতি সহজে। তাঁর 'পরমার্থ-প্রসঙ্গ' বা উপদেশ সংকলন বহু ধর্মপিপাসুকে পরমার্থ পথের প্রেরণা দিয়েছে। তাঁর লেখা পত্রের মধ্যেও ছিল স্বামীজীর অপূর্ব বাচনভঙ্গি।

'বীর হওয়া চাই—সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করা চাই। আমি বড় দুর্বল, আমি কিছু করতে পারবো না, তুমি করে দাও, এ-সব ভাব ত্যাগ করতে না পারলে কোন কালেই কিছু হবে না। উপদেশ তো তোমায় যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। সে-সব যদি পালন করতে না পার তো কেউ তোমায় কিছু করিয়ে দিতে পারবে না। তোমায় যে-সব পত্র দিয়েছি, তা বার বার পড়বে ও সেইমতো চলতে চেষ্টা করবে ঠিক ঠিক ধর্মলাভ বড় কঠিন কথা—সকলের হয় না। ভিজে অসার কাঠ হলে ঠাকুরও তার দিকে ফিরে চাইতেন না।'

অপর একটি পত্রে পাওয়া যায় ভিন্ন সুর, গাঙ্গেয় স্নিগ্ধতা মণ্ডিত 'তুমি নিয়মিত জপধ্যান করছো জেনে প্রীত হলুম। তাঁর জন্যে যে কাঁদতে পারে সে তো মা ধন্য—সে পুরুষই হোক আর স্ত্রীলোকই হোক। প্রাণের আবেগই আসল কথা। প্রেমাশ্রু গঙ্গাজলের চেয়েও পবিত্র।'

উদাহরণ বৃদ্ধি করে লাভ নেই, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রত্যেক সন্ন্যাসীর পত্রে এক অত্যাশ্চর্য সাবলীল ভঙ্গি ও মাধুর্য মিশ্রিত দৃঢ়তা দৃষ্টিগোচর হবে। কঠোরের সঙ্গে কোমলের সমন্বয়, ত্যাগ ও তিতিক্ষার সঙ্গে মানবপ্রেম ও মানবসেবার সমন্বয় ঘটেছিল জীবনে। তারই প্রভাব পড়েছে তাঁদের লেখা পত্রসম্ভারে কিংবা বাণী-উপদেশে।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা লিখেছেন আরো অনেকেই। স্বামী অভেদানন্দের 'স্বামী বিবেকানন্দ', স্বামী শ্রদ্ধানন্দের 'আচার্য বিবেকানন্দ', স্বামী প্রেমঘনানন্দের 'বিবেকানন্দের

কথা ও গল্প', স্বামী অপূর্বানন্দের 'যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ', স্বামী বুধানন্দের 'স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা' উল্লেখযোগ্য। স্বামী গম্ভীরানন্দের তিন খণ্ডে সমাপ্ত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থরূপে অত্যন্ত মূল্যবান। ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' স্বামী মাধবানন্দের অনুবাদের সাহায্যে বাংলা-ভাষাভাষীদের নিকটে পৌঁছেচে। স্বামীজীর জীবনকথা রচনা করেছেন তাঁর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত বা মহিমবাবু। তিন খণ্ডে 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী' ছাড়াও তিনি রচনা করেছেন 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' (তিন খণ্ড), 'স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী' ও 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ'। স্বামী শংকরানন্দ তিনটি অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থ তিনটিতে তাঁর গভীর জ্ঞান ও নৃতত্ত্ববিষয়ক মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এই তিনটি গ্রন্থের নাম 'বঙ্গে মহেঞ্জোডারো সভ্যতার বিস্তার', 'মনসা চরিত' ও 'নব বৃহত্তর ভারতের জন্ম'।

মঠবাসী স্বামীজীদের অনেকেই রচনা করেছেন স্মৃতিকথা ও ভ্রমণসাহিত্য। স্বামী অখণ্ডানন্দের অনুপম ভ্রমণকাহিনী 'তিব্বতের পথে হিমালয়ে'। অপর গ্রন্থটি 'স্মৃতি-কথা'। তাঁর ভাষার সারল্য ও মাধুর্য তুলনাহীন। পুনরায় 'স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়' রচনা করেছেন স্বামী নিরাময়ানন্দ আর জীবনীগ্রন্থ 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' লিখেছেন স্বামী অন্নদানন্দ। স্বামী নিরাময়ানন্দ রচিত ভক্তিভাব-মিশ্রিত কবিতাগুলি আধ্যাত্মিক বৈভবে পরিপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা এভাবেই সাহিত্যচর্চার ধারাটি অব্যাহত রেখেছেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ রচনা করেছেন 'অতীতের স্মৃতি', 'ঘরে চলো', 'বন্দি তোমায়' প্রভৃতি তিনি দীর্ঘদিন 'উদ্বোধন' পত্রও সম্পাদনা করেছেন। 'ঘরে চলো'তে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বেদান্ততত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দরচিত কবিতাগুলি উচ্চ বেদান্তভাবোদ্দীপক—অথচ প্রেম-ভক্তির স্বচ্ছ নির্ঝরিণীস্বরূপ ভাষ্যসহ 'বেদান্তদর্শন' অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন স্বামী বিশ্বরূপানন্দ। শিশুদের জন্যে 'গল্পে বেদান্ত' রচনা করেছেন স্বামী বিশ্বা-শ্রয়ানন্দ। তিনি শিশুদের জন্যে আরো কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ভগবদ্গীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুবাদ করেছেন।—যা আদ্যোপান্ত সংশোধিত ও সম্পাদিত হয়েছে স্বামী জগদানন্দের দ্বারা। তাঁর অন্যান্য অনুবাদের মধ্যে 'চৈনিক ঋষি লাউৎজে' উল্লেখযোগ্য। তিনি লাউৎজের জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করার পর উপদেশগুলির সরল বঙ্গানুবাদ করেছেন।

'আমরা অজ্ঞান—ইহা উত্তমরূপে জানা (হৃদয়ঙ্গম করা) একটি উচ্চ সাধনা, অজ্ঞানকে জ্ঞান মনে করা একটি মস্ত বড় দোষ। এই দোষের ব্যথা অনুভব করাই ইহা দূরীকরণের প্রথম সোপান।

'অপ্রশমিত বাসনার চেয়ে অধিক পাপ আর নাই। অসন্তোষ অপেক্ষা অধিকতর মন্দ আর নাই। লাভের লোভ অপেক্ষা অধিকতর দোষ আর নাই। সন্তোষের প্রাচুর্যে প্রত্যেক বাসনা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দের উদারতা বিস্ময়কর। যে কোন ধর্মের আচার্যকে এবং তাঁর উপদেশকে তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কথা আলোচনা করেছেন। স্বামী প্রভবানন্দের 'বেদান্তের আলোকে খ্রীস্টের শৈলোপদেশ' এই ধারায় অভিনবত্ব এনেছে। 'আচার্য শঙ্করে'র জীবনী রচনা করেছেন স্বামী প্রেমেশানন্দ, স্বামী অপূর্বানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ। রামানুজের বৃহৎ প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের, স্বামী প্রেমেশানন্দ-রচিত ছোট আকারের জীবনীটিও উপাদেয়। 'সাধক

রামপ্রসাদ' লিখেছেন স্বামী বামদেবানন্দ।

স্বামী প্রেমেশানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যধারায় সঙ্গীত শাখাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর রচিত কবিতাগুলিও ভাবসম্পদে অসাধারণ —'চারিধাম' স্মরণীয়। তাঁর 'পরমহংসদেব' প্রেম ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়। স্বামী প্রেমেশানন্দ-প্রণীত আরও কয়েকখানি পুস্তক আছে। তাঁর প্রাক্-সন্ন্যাস জীবনে রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' সম্ভবত উদ্বোধন কার্যালয়-প্রকাশিত সর্বপ্রথম স্বামীজীর জীবনী। স্বামী প্রেমেশানন্দের 'গীতাসার-সংগ্রহ' ও 'আত্মবিকাশ' কিশোর সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত দুইখণ্ডে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার ইতিহাস জানতে ইচ্ছুক পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অবশ্য পাঠ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণের সুললিত জীবনী বর্ণিত হয়েছে ঐ গ্রন্থদ্বয়ে।

স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'পাঞ্চজন্য' পাঁচশত ভক্তি সঙ্গীতের সংকলন। স্বামীজীর সন্ন্যাসী-শিষ্যদের জীবনকথা প্রণয়ন করেছেন স্বামী অজজানন্দ। তাঁর রচিত 'স্বামিজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থটিতে স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী সদানন্দ, স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামী নিশ্চয়ানন্দ, স্বামী অচলানন্দ, স্বামী শুভানন্দ ও স্বামী পরমানন্দের জীবনকথা আলোচনা করেছেন। এঁদের জীবনী অনেকেরই অজানা অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবপ্রচারের ইতিহাসে এঁদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

স্বামী প্রভানন্দ রচনা করেছেন 'ব্রহ্মানন্দ চরিত'। ঈষৎ ভিন্ন ধরনের গ্রন্থ স্বামী সিদ্ধানন্দ সংগৃহীত 'সৎকথা', স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের 'পুণ্যস্মৃতি', স্বামী পরমানন্দের 'প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা' ও স্বামী বীরেশ্বরানন্দের 'ভগবান লাভের পথ' শুধু অধ্যাত্মচিন্তা নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও অভিনবত্ব এনেছে। স্বামী অপূর্বানন্দের অপূর্ব ভ্রমণকাহিনী 'কৈলাস ও মানসতীর্থ' ভ্রমণসাহিত্য হিসেবে সুখপাঠ্য। স্বামী প্রজ্ঞানন্দের, 'ভারতের সাধনা' বাংলাসাহিত্যের একখানি আলোড়নকারী গ্রন্থ। স্বামী সারদেশানন্দের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব' বাংলা জীবনীসাহিত্যে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ।

এভাবে দেখা যাবে, সাধিকা সন্ন্যাসিনীদের জীবনচরিতও লেখা হয়েছে। অধিকাংশ গ্রন্থই শ্রীমায়ের স্মৃতিকেন্দ্রিক। গৌরী মা, গোপালের মা-র কথা ছাড়াও ভগিনী নিবেদিতার রচনার অনুবাদ ও তাঁর জীবনী রচনাতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নিষ্ঠা চোখে পড়ার মতো। এ প্রসঙ্গে 'উদ্বোধন' ও 'বিশ্ববাণী' পত্রিকাদুটির নিরলস প্রয়াস কম নয়, অধুনালুপ্ত 'তত্ত্বমঞ্জরী' (১৮৮৫-৮৭) পত্রিকাও অতীতে এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

আপাতদৃষ্টিতে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর লীলা-পার্ষদমণ্ডলীর ভূমিকা বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে বোঝা যায় না। মনে হয়, বাংলাসাহিত্য যখন বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-মধুসূদন--রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের অকুণ্ঠিত দানে পরিপূর্ণ, তখন সংসারবিমুখ গৈরিক বস্ত্রধারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আর কিভাবে সাহিত্যের রস-ভাণ্ডার পূর্ণ করবেন? কিন্তু ভালভাবে পর্যালোচনা করলেই তাঁদের দানের অপরিসীম মূল্য হৃদয়ঙ্গম হয়। অবশ্য বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দ স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। তবে অন্যান্যদের রচনার তাৎপর্য বা সাহিত্যমূল্য বিচারের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়, সঙ্গীতশাস্ত্রকে তিনি সহজবোধ্য পরিবেশনার মাধ্যমে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করে তুলেছেন কি না তা নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। শ্রীচৈতন্যের জীবনীসাহিত্য মধ্যযুগের

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে যে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথমদিকের ইতিহাসেও কি এই গ্রন্থগুলি সেরূপ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি ?

বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রভাব অনুভূত হয়। তাঁর আবির্ভাব ক্রমক্ষীয়মান সাধকজীবনী রচনার ধারাটিকে পুনর্জীবিত করেছে। ধর্মীয় জীবনালোচনার ধারাটি প্রায় হারিয়ে যেত যদি না শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যমণ্ডলী অব্যাহতভাবে ঐ ধারায় রস-সিঞ্চন না করতেন। তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো অনেকেই এই ধারায় গ্রন্থ রচনা করেছেন। শুধু তাই নয় গবেষণার মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতকের নবজাগরণের সমসাময়িক তথ্যাদি আবিষ্কারেও মনোযোগী হয়েছেন অনেকে। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় গভীর তত্ত্বাদি আলোচনায় এবং সংস্কৃতসাহিত্যের ব্যাপক অনুবাদের মধ্যে বিশুদ্ধ সাধুভাষার ব্যবহারে উক্ত সন্ন্যাসিবৃন্দ বাংলাসাহিত্যে প্রচলিত দুটি লেখ্যরীতিকেই পুষ্ট করেছেন। অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমার বাণী ও উপদেশের মধ্যে মৌখিক চলিত ভাষার ঢংটি সমৃদ্ধ হয়েছে। আমাদের সাহিত্যিক চলিত ভাষা সব সময় মৌখিক চলিত ভাষা নয় বরং অনেক সময় সাজানো গোছানো কৃত্রিমতায় পূর্ণ। কিন্তু 'কথামৃত', 'মায়ের কথা', কিংবা স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্যদের লেখা চিঠিপত্রের ভাষা এই ধরনের কৃত্রিমতা থেকে সম্পূর্ণভাবে এবং স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত। প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেওয়া অজস্র উপমা-রূপক-প্রবাদ-প্রবচন মণিমুক্তার মতো এই গ্রন্থগুলিতে দীপ্যমান রয়েছে, আমরা অনেক সময়েই সেগুলির সন্ধান রাখি না বলেই তাদের সদ্ব্যবহার করতে পারি না, সাহিত্য হিসেবেও তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিই না। দ্বিতীয়ত, এই মহাপুরুষদের জীবনচর্চা, দর্শনালোচনা, হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ও প্রাচীন শাস্ত্রাদির নির্ভুল অনুবাদ, বুদ্ধ-শঙ্কর প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম গুরুর জীবনালোচনা একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যাদর্শ ও পাঠকমণ্ডলী গড়ে তুলেছে। পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও সাহিত্য-চর্চাতেও তাঁদের যে অবাধ অধিকার ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু মাত্র 'ধর্মালোচনা' বলে এই সাহিত্যসৃষ্টিকে আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি কি ? ব্রতকথা-পাঁচালীর মতো ফুল-বেলপাতা দিয়ে লক্ষ্মীর পটের অন্তরালে চাপা দিয়েও কি রাখতে পারি ? পালিসাহিত্যে যেমন বৌদ্ধ বিহারগুলির নিজস্ব বস্তু হয়েও সর্ব-সাধারণের আস্বাদ্য হয়ে উঠেছিল, গোস্বামীদের রচিত চৈতন্য জীবনী গ্রন্থগুলি যেমন সর্বসাধারণের পাঠ্য হতে পেরেছিল, মঠবাসী সন্ন্যাসীদের রচিত ও আলোচিত গ্রন্থগুলিও সেভাবে সকলের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, রসসাহিত্য না হলেও এই রচনাগুলি নীরস ও তত্ত্ব-উপদেশের ভারে ভারাক্রান্ত নয় বরং অভিনব জীবনরসের সন্ধান দান করে পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের 'কমল বনে' বিচরণশীল পাঠকের 'মত্তমধুপচিত্ত' এগুলির মধ্যে স্বর্গীয় পারিজাতের সুধা লাভ করতে পারবেন। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সেবার মহৎ আদর্শ আমাদের মুগ্ধ করে, অভিভূত করে। স্বার্থ বিরহিত নিষ্কাম মানবপ্রেমে মহিমান গ্রন্থগুলি জীবনের তাৎপর্য সন্ধানে সাহায্য করে। বিদগ্ধ সমাজে এই ধরনের গ্রন্থাদির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকের অবক্ষয়ী সমাজের চারিত্রিক মেরুদণ্ড পুনর্নির্মাণের যদি চেষ্টা করা হয়, তাহলে সে পথে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রভাবিত বাংলা-সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

[হাওড়া নরসিংহ দত্ত মহাবিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক—কবি ও সুপ্রাবন্ধিক।]

আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যে নিদারুণ অবক্ষয় লক্ষ্যগোচর তা থেকে মুক্তি পেয়ে আস্তিক্যবাদের শুভ বুদ্ধিতে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের উত্তরণ ঘটতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হলে; শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের চেতনায় উদ্বোধিত হওয়াতেই বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মুক্তির মন্ত্র নিহিত। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব আলোচনার আগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের সমকালীন বাংলাদেশকে একবার স্মরণ করা উচিত। সমগ্র বাংলাদেশ তখন একদিকে পরানুকরণ, পরমোহে বিভ্রান্ত; জাতীয় জীবনে অমানিশার ঘনান্ধকার; আর অন্যদিকে তারই মধ্যে জাতিকে আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত করার মানসে, সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণীতে মহামিলনের মহাতীর্থ রচনার উদ্দেশ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এবং স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। ইতিহাসের যাত্রাপথে শোনা গিয়েছিল নবজাগরণের তূর্যধ্বনি; বাঙালীর আত্মসংবিদ উদ্বোধনের পরমপুণ্যলগ্ন সমাগত হয়েছিল। ইতিহাসে ব্যক্তি যখন ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন, তখনই তাঁর প্রভাব ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় জীবনে অনুভূত হয়। সেই ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করেই তখন কাব্য-কবিতা রচিত হতে থাকে।

একালের বাংলা কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি-ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার প্রোজ্জ্বল প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায়। 'ভারততীর্থ' কবিতায় মহামানবধর্মসমন্বয়ের যে বক্তব্য প্রকাশিত, তাকে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব বলা যেতে পারে। তিনি যখন উচ্চারণ করেন—'এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার'—অথবা, তিনি যখন আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, ইংরাজ, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলকে আহ্বান জানান তখন সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণীই তো উদ্গীত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত 'পরমহংস রামকৃষ্ণ' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলশ্রুতি রূপে পরিগণিত হতে পারে—

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নতুন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত সেইকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রসরাজ অমৃতলাল বসু, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য (উত্তরকালে স্বামী প্রেমেশানন্দ), নজরুল ইসলাম প্রভৃতি কবি ও সঙ্গীতরচয়িতারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যভাবমণ্ডিত যুগাবতার মূর্তিতে উদ্বোধিত হয়ে কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত গিরিশচন্দ্রের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' কবিতাটির কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করা চলে—

সকল মঙ্গলালয়, পূর্ণ বিরাজিত,
প্রেমের আধার!
নির্বিকার, হর্ষ-শোক-বাসনা-বর্জিত,
জ্ঞানদীপ্ত মূর্তি মহিমার!

পদরেণু বাঞ্ছিত গঙ্গার,
নির্মল-অনিল স্পর্শে যাঁর ;
উজ্জ্বল বিমল কান্তি, তাপিত জনের শান্তি,
চরণে হরণ ধরা-ভার,
শরণ্য বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার !

রসরাজ অমৃতলালবসুও তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ' কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রেমের মূর্তিতে উদ্ভাসিত দেখেছেন—

জীবভাবে হৃষীকেশ
দেখালেন কৃপাশেষ
কাঙালের বেশে আসি
তাপীতে তরিতে।

কাজী নজরুল ইসলামের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ক কবিতাটি অবশ্য মুখ্যতঃ সঙ্গীত রূপেই পরিচিত। নজরুলের আলোচ্য কবিতাটিতে একদিকে যেমন ঠাকুরের ভাবরূপ বিকশিত অন্যদিকে তেমনি সর্ব-ধর্মসমন্বয়ের ভাবনাও প্রকাশিত—

পরম গুরু সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার।
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার ॥
জাগালে ভারত শ্মশান তীরে,
অশিব-নাশিনী মহাকালীরে ;
মাতৃনামের অমৃতনীরে ভাসালে নিজ ভারত
আবার ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বয়ং বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-কণ্ঠে উচ্চারিত যুগচিত্তের বাণী 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শে উদ্বোধিত হয়ে লিখেছিলেন—

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

বিবেকানন্দের এই বাণী জগৎ ও ব্রহ্মের অমৃতসেতু রচনা করে পরবর্তীযুগে যেন অমরশ্লোকে রূপান্তরিত। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যানুভূতিলব্ধ কালিকামূর্তিও স্বামীজীর অদ্বৈতচিন্তার পটভূমিতে —'নাচুক তাহাতে শ্যামা'। স্বামী বিবেকানন্দের কবিতায় রামকৃষ্ণ-তন্ময়তার উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর বিখ্যাত O'er hill and dale and mountain range' ('In Search of God') শীর্ষক ইংরেজী কবিতায় এবং বাংলা 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায়।

[ইংরেজী কবিতাটি অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু 'সন্ধান ও প্রাপ্তি' নামে। চিকাগো ধর্ম-মহাসভার মাত্র এক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক রাইটকে কবিতাটি লেখেন স্বামীজী। দ্বিতীয় কবিতাটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এক গুরুভ্রাতাকে লেখেন।] 'সন্ধান ও প্রাপ্তি' কবিতাটিতে ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বিশ্বচেতনায় ব্যাপ্ত।—

'জ্বলে উঠলো আত্মা পরম জ্যোতিতে
খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার
আনন্দ ! আনন্দ ! একি অপরূপ
প্রিয় মোর প্রাণ মোর সর্বস্ব আমার
তুমি এখানে এত কাছে আমারি হৃদয়ে,
আমার হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল রাজার
গৌরবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-চেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ যে অনন্য, তাঁর সমস্ত সংগ্রামের সখা ও সারথি, তাঁর অন্তরতম ধ্যানের নিভৃত ইষ্টদেবতা তার পরিচয় আছে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতায়।-

প্রভু তুমি, প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি আমি তুমি, তুমি আমি।
বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।

আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অন্যতম উল্লেখ্য কবি শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে একটি সংহত ভাবঘন কবিতা রচনা করেছেন—

জীবন যখন তৃষ্ণাকাতর
যখন বীততৃষ্ণ
স্মরণ কোরো

শরণালয়
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'পরমহংস' কবিতাটিও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও ভাবসাধনার এক অপরূপ রূপায়ণ—

তুমি এলে মেঠোপথে অশিক্ষিত পূজারী ব্রাহ্মণ
তন্ত্রহীন, গ্রন্থহীন, অকপট শিশুর মতন
শঙ্খপূত পুষ্পগন্ধি হস্তে শুধু অঙ্গুলি সম্বল
নিঃসংশয় দৃষ্টিনেত্রে বিগলিত হাস্যে শ্রীমঙ্গল।

আরো বহু কবির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব মুদ্রিত আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত কবিতা-গুচ্ছের সংকলন হলে সে সম্পর্কে আমরা আরো সচেতন হতে পারবো।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ-কেন্দ্রিক আলোচনার পূর্বশর্ত রূপে তাঁর কবিতা-বলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে যে, স্বামী বিবেকানন্দের কবিতাবলী ইংরেজী এবং বাংলা দুই ভাষাতেই রচিত এবং তাঁর সংস্কৃত-ভাষায় রচিত স্তোত্র জাতীয় কবিতাও বেশ কিছু আছে। স্বামী বিবেকানন্দের কবিতাগুলি উদ্বোধন-প্রকাশিত 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (ষষ্ঠ খণ্ড) গ্রন্থে 'বীর বাণী' পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে। এই অংশে স্তোত্র জাতীয় সংস্কৃত-ভাষায় রচিত এবং বাংলাভাষায় রচিত মৌলিক কবিতাগুলি আছে। ঐ গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে আছে স্বামীজীর ইংরেজী কবিতার বাংলা অনুবাদ; আর দশম খণ্ডে আছে পত্র-কাব্যমালার অনুবাদ। কবি বিবেকানন্দ একটি পৃথক আলোচ্য বিষয় এবং তা পৃথকভাবেই আলোচিতব্য।

উনিশ শতকের নবজাগরণের মূর্তিমান ফলভাক্, যুক্তিশ্রদ্ধ, মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা ভারত-ইতিহাসে এক মহা সংগঠকের ভূমিকা। ১৮৮৬—১৮৯৩ পর্যন্ত দীর্ঘ-কাল সন্ন্যাসিবেশে ভারত ভ্রমণে রত; ১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বরে চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা—বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের জয় ঘোষণা —বৈদান্তিক ধর্মকে বিশ্বজনীনতার পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখা। ভারত-ইতিহাসের এই পর্বটি 'বিবেকানন্দ অধ্যায়' নামে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য; কেননা আলোচ্য পর্বে বিবেকানন্দ শুধু ধর্ম-সমাজ-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মুখ্য পুরোধাই নন, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব গহন অন্তরতল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথও উপনিষদ্-বেদান্তের ভাবধারায় ভারতের শাশ্বত জীবনাদর্শের প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। 'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যগ্রন্থের কবিতায় বিবেকানন্দ-ভাবধারার স্পন্দন শোনা যায়—

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

স্বামী বিবেকানন্দের 'Is Vedanta the future religion', 'My plan of campaign', 'Man is the maker of his destiny', 'Indian religious thought' প্রভৃতি বক্তৃতায় অন্ধ-বিশ্বাস, অর্থহীন মন্ত্র, বিচারহীন আচার, অস্পৃশ্যতা, বিকৃত পৌরোহিত্য, স্বার্থবোধ, স্বেচ্ছাচার, ধর্মের নামে সামাজিক প্রতারণা প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে তীব্র শাসন লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কাব্যেও তার প্রকাশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। প্রমাণস্বরূপ 'দেউল' (সোনার তরী), 'ভারততীর্থ', 'দুর্ভাগা দেশ' (গীতাঞ্জলি) প্রভৃতি কবিতা উল্লেখ্য।

রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'ধর্মমোহ' কবিতায় সংস্কারের প্রাকারের উপর, সম্প্রদায়গত ধর্মমোহের উপর, সংকীর্ণ আচারের উপর পরম পুরুষের অভিসম্পাতের কথা ব্যক্ত হয়েছে—

যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো, ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে

ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন—'অন্যায় কোরো না, অত্যাচার কোরো না, যথাসাধ্য পরোপকার করো, কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ।' এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের 'ন্যায়দণ্ড' কবিতার—

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

'The work before us'-এ বিবেকানন্দ বলেছেন— '...if superstition enters, the brain is gone, the brain is softening, degradation has seized upon the life. ...Avoid all mystery.'

'Practical Vedanta'-তে স্বামীজী আবার বলছেন—'We should, therefore, follow reason and also sympathise with those who do not come to any sort of belief, following reason.…than blindly believe in two hundred millions of gods on the authority of anybody.'

রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত কাব্যগ্রন্থের 'ধর্মমোহ' কবিতায় অনুরূপ ধারণাই ব্যক্ত করলেন—

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।

প্রেম-ভক্তি মার্গের সুউচ্চ ভাবকে বিবেকানন্দ বড় বলে স্বীকার করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ভক্তির বিকৃতির কুফল সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন; আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই জাতীয় চিন্তার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের 'অপ্রমত্ত' কবিতায়—

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে
ভাবোন্মাদ মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল যেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি, নাথ।...

বিবেকানন্দ একদিন মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠে সকলকে আহ্বান করে যা বলেছিলেন দীর্ঘযুগ অতিক্রম করে সেই সুপরিচিত পঙ্‌ক্তিগুলি দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ সুরে যেন বেজে ওঠে—

বিবেকানন্দ—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? / জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও বার বার সেই একই সুর ধ্বনিত। আর এ বিষয়ে 'গীতাঞ্জলি' সর্বোত্তম উদাহরণ—

১. যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।

২. তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ খাটছে বারোমাস।

৩. মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।

'মানসী' কাব্যগ্রন্থের 'কবির প্রতি নিবেদন' কবিতাতে নরনারায়ণের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। লক্ষণীয়—রবীন্দ্রনাথেরও ধর্মসাধনার মূল ধারাটি মানবতাবাদ ও বোধের দিকেই প্রসারিত—যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবরাশি অতল গম্ভীর—'অচলপ্রতিষ্ঠং'।

স্বামীজী বিরোধ ও সংকীর্ণতামুক্ত এক গতিময়তার উপর ভারতকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়ে যৌবনশক্তির বন্দনা করেছেন।—ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'তপোভঙ্গ' কবিতায় যৌবন অভ্যর্থনার মন্ত্রোচ্চারণ করেছেন—

বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের-শাসন নাশন
…আমি রচি তারি সিংহাসন, তারি সম্ভাষণ।

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের 'সবুজের অভিযান' কবিতাতেও সেই একই সুর ধ্বনিত।

সামাজিক-অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত প্রকার অসাম্যের বিরুদ্ধেও রবীন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দের অনুগামী। তাঁদের অগ্নিবাণী কৃপাণের মতো ঝলসে উঠেছে। যে সমাজে সমষ্টির দৈন্যের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় লোক স্ফীত হয়ে ওঠে সেই অভিশপ্ত সমাজ-ব্যবস্থার অবসান স্বামী বিবেকানন্দ যেমন কামনা করেছেন, তেমনি রবীন্দ্রনাথ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় উচ্চারণ করেছেন—

'এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা'…ইত্যাদি।

স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখছেন—'Liberty of thought and action is the only condition of life, of growth and well being?' রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রায় সমভাবে উচ্চারিত—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,

জ্ঞান যেথা মুক্ত…' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে বিবেকানন্দ-চিন্তা যেমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, অন্যত্র তেমন বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়নি। বিবেকানন্দ উচ্চারণ করলেন—'মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর…।' রবীন্দ্রনাথও বললেন—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

রবীন্দ্রনাথের 'কোরো না কোরো না লজ্জা হে ভারতবাসী' কবিতাতে যেন স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রগর্ভ কণ্ঠধ্বনির প্রতিধ্বনি—'হে ভারত এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে।'

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনসাধনায় সার্বজনীন প্রেম, সহানুভূতি ও সর্বজীবে দয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজীর ন্যায় রবীন্দ্রনাথেরও উদগ্র জাতীয়তাবাদ কাম্য ছিল না। 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে তাই রবীন্দ্রনাথের প্রদীপ্ত উচ্চারণ—'জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায় / ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।' এইভাবে আরও বিস্তারিত আলোচনার সাহায্যে রবীন্দ্র-কাব্যে স্বামী বিবেকানন্দের পরোক্ষ প্রভাব নির্ণীত হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনসাধনায় স্বামী বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি' কবিতাটি যেন গায়ত্রীমন্ত্রের মতো নিত্য অনুরণিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'মরণমিলন' কবিতাটির উল্লেখ করা চলে। 'মরণমিলন' কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্রমাসের বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। এই কবিতাটির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের লোকান্তর প্রাপ্তির পরোক্ষ যোগ থাকা বোধ হয় অসম্ভব নয়। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ হয় ১৩০৯ বঙ্গাব্দের ২০ আষাঢ় শুক্রবার (ইং ১৯০২ / জুলাই ৪)। রবীন্দ্রনাথ তার কিছুকাল পরেই 'মরণমিলন' কবিতাটি লেখেন—রচনাকাল ভাদ্র ১৩০৯ বঙ্গাব্দ। স্বামী বিবেকানন্দের অকালমৃত্যুর মধ্যে যে বিজয়শঙ্খ ধ্বনিত হয়েছিল এবং যে গৌরবমহিমা প্রকাশিত হয়েছিল আলোচ্য কবিতাটিতে তারই প্রতিফলন থাকতে পারে। নতুবা কবির মনে অকস্মাৎ জীবনের কাজ অসমাপ্ত রেখে গৌরবময় মৃত্যু-বরণের আকাঙ্ক্ষা কেন অমনভাবে দেখা দিল তার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই

কবিতায় তিনি লিখেছেন—

তুমি উৎসব করো সারারাত / তব বিজয়শঙ্খ বাজায়ে, /মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত / নব রক্তবসনে সাজায়ে / তুমি কারে করিও না দৃক্‌পাত, / আমি নিজে লব তব শরণ, / যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও / ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥

স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক মহাপ্রয়াণ দেশ-ব্যাপী শোকোচ্ছ্বাসের পটভূমিকায় রেখে বিচার করলেই এ ভাবটির যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

[সূত্র: কথাসাহিত্য / স্বামী বিবেকানন্দ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৮০ / রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ / প্রবোধচন্দ্র সেন]। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

শ্রীশ্রীহরিভক্তি কীর্তনাবলী (মূল আখর-সমন্বিত কীর্তন): সঙ্কলক—ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা, শ্রীশ্রীহরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, ২৫নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭। প্রকাশক: শ্রীদেবপ্রসাদ সাহা, দত্তবাগান হাউসিং এস্টেট, ব্লক-এন, ফ্ল্যাট-৪, কলিকাতা-৩৭। (১৩৯০), পৃঃ ৩১৫, মূল্য : ৫০·০০ টাকা।

কীর্তন বলতে পদাবলী কীর্তন ভারতীয় সঙ্গীত-সম্পদেরই অন্যতম উপাদান। যে কোন দেবতা, বরেণ্য-পুরুষ ও মহামানবের প্রশংসাসূচক-কীর্তিগাথা গান করার নাম 'কীর্তন'। অবশ্য খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকের পরবর্তী সমাজে শ্রদ্ধাস্পদ গোপাল ভট্ট মহাশয় ঐ কীর্তিগাথা গানকে উচ্চৈঃস্বরে গান করার নির্দেশ দিয়েছেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩০০—খ্রীঃ ২০০ শতকের নাট্যগ্রন্থ মুনি-ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ২২ অধ্যায়ে (কাশী সং) গান ও সংকীর্তন (তথা কীর্তন) শব্দ দুটির উল্লেখ আছে সঙ্গীতের পরিচায়করূপে: (১) "ছন্দঃ-প্রমাণসংযুক্তং দিব্যানাং গানমিষ্যতে" (২২।৪১৩) এবং (২) "স্তুত্যাশ্রয়েণ তৎকার্যং কর্মং সকীর্তনা-দপি" (২২।৪১৩)। সংকীর্তনও কীর্তন পর্যায়ভুক্ত, কেননা সম্যক্‌রূপে যশোগাথা গান করার নামই সংকীর্তন। এই অর্থে সুপ্রাচীন জাতিগান (তথা জাতিরাগগান) 'ধ্রুবা' প্রভৃতিও দেবস্তুতিমূলক ('দেবস্তুত্যাশ্রয়ানি চ') বলে কীর্তন বা সংকীর্তনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকের পরে শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীহরির গুণগাথা-সূচক গান কীর্তন (বেড়াকীর্তন, নামকীর্তন ও নগরকীর্তন প্রভৃতি) উচ্চৈঃস্বরে ও সমবেতভাবে গান করার রীতি ছিল এবং শ্রদ্ধাস্পদ গোপাল ভট্ট এজন্য উচ্চৈঃস্বরে স্তুতিমূলক গানকে 'কীর্তন' নামাঙ্কিত করেছিলেন। কীর্তনেও রাগ, তাল, ছন্দ ও গায়কীরীতির নিয়ম ছিল, এজন্যই কীর্তন তথা পদকীর্তন বা পদাবলীকীর্তন ভারতীয়-অভিজাত-সঙ্গীতের শ্রেণীভুক্ত। এই কীর্তনগান ভারতীয়-ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের অন্তর্গত এবং অভিজাত-শ্রেণীর।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নামকীর্তন করতেন প্রথমে ও পরে শ্রীভগবানের শাশ্বত ও অমৃতময় সর্বসাধারণ্যে প্রচারের জন্য নগরকীর্তন বা বেড়া-কীর্তন করতেন। খ্রীঃ ১৭শ শতকের শেষার্ধে কিংবা ১৮শ শতকে ঠাকুর নরোত্তম দাস ক্ল্যাসিক্যাল তথা অভিজাত-পর্যায়ের পদকীর্তন বা পদাবলীকীর্তন প্রচার করেন। খেতরীর মহাধিবেশনে ঐ বিলম্বিত লয়ে পদকীর্তন তিনি প্রচার করেন এবং ঐ বৈষ্ণব মহাধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন প্রভু নিত্যানন্দের সহচারিণী বিদুষী জাহ্নবীদেবী। কীর্তনের অপরাপর শৈলীর

সৃষ্টি বা উদ্ভব হয় পরে ক্রমে-ক্রমে।

এই পদকীর্তনের মহিমা বা মাধুর্য আরও রসান্বিত ও সমৃদ্ধ হয় কেশব দাস, পীতাম্বর দাস প্রভৃতি বিদগ্ধ বৈষ্ণব-সাধকগণের 'রসিক প্রিয়া', 'রসমঞ্জরী' প্রভৃতি রস-ভাব-গ্রন্থের অনুপ্রেরণায়। একমাত্র বাংলাদেশই বলতে বৃহত্তর বাংলারই কীর্তন-পদগানের কীর্তনের সৃষ্টিক্ষেত্র রূপে পরিগণিত। বড়ু-চণ্ডীদাস ও বিশেষ করে বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাজনদের ব্যবহৃত 'ব্রজবুলি' তথা ব্রজভাষার সঙ্গে নবরস প্রভৃতির সংমিশ্রণে পদাবলী-কীর্তনের সম্ভব হয়েছিল। 'ব্রজবুলি' বলতে ব্রজের তথা বৃন্দাবন প্রভৃতি অঞ্চলের কথ্য বা প্রচলিত ভাষা নয়। কীর্তনে ব্যবহৃত ব্রজবুলি বা ব্রজভাষার সৃষ্টি হয়েছিল প্রাকৃত, বাংলা, সংস্কৃত, অবহট্ট প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণে। এজন্যই পদকীর্তনের ভাষা, ভাব, রসমাধুর্য ও রসসৌন্দর্য এত মধুর, সরস ও প্রাণস্পর্শী! বড়ু-চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি থেকে আরম্ভ করে খ্রীঃ ১৮শ-১৯শ শতক পর্যন্ত পদকীর্তনের বিচিত্র রচনা, ছন্দমাধুর্য ও রসান্বিত-গীতি পদ্ধতি (গায়নশৈলী) বাংলাদেশের আকাশ-বাতাসকে মুখরিত করে রেখেছে। কীর্তনগানও প্রবন্ধগীতি—ভারতের গৌরবময় সম্পদ।

সংক্ষিপ্ত এই গৌরচন্দ্রিকার পর শ্রদ্ধেয় ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা কর্তৃক সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীহরিভক্তি-কীর্তনাবলী'—অপূর্ব গ্রন্থটির সম্পর্কে দু-চার কথা বলি। পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস, সাহিত্য-সম্পদ, ছন্দমাধুর্য, বিচিত্র তাল, আঁখর, রস-লালিত্যের আলোচনাক্ষেত্র সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত। এই কীর্তনগীতির আশ্রয় ও আধার শ্রীমদ্ভাগবত থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পর বৃহত্তর বাংলায় ও পরে বিভক্ত বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে দর্শন-চিন্তায়, ভাবে, রসে ও অপ্রাকৃত-নায়ক-নায়িকা-ভাবনায় আরও সমৃদ্ধ করেছিল এবং সেই সমৃদ্ধির আলোকে বাংলার পদকীর্তন আজ মহিমময় ও রসোচ্ছল।

বর্তমান পদাবলী-পরিচায়ক অপূর্ব ও উপাদেয় গ্রন্থের আলোচিত-বস্তু বিস্তৃত। আমরা সঙ্কলক ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা মহাশয়-লিখিত 'প্রস্তাবনা'র আলোকেই বলি: "হরিভক্তি কীর্ত্তনাবলীর ১ম খণ্ডের প্রথম বিভাগে রয়েছে কীর্ত্তনাবলী ও দ্বিতীয় বিভাগে ভক্তিগীতাবলী। প্রথম কীর্ত্তন বিভাগে আছে শ্রীগুরুভজন ও কীর্ত্তনাবলী, ত্রিসন্ধ্যা কীর্তনাবলী (কুঞ্জভঙ্গ, প্রভাতী, মধ্যাহ্ন, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি, অভিসার ও স্বপ্নবিলাস-কীর্ত্তন)। মহিমা কীর্ত্তনাবলী (শ্রীশ্রীনাম মহিমা, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমা ও রাধা-দামোদর-কীর্ত্তন), সমাপ্তি-কীর্ত্তনাবলী, শ্রীশ্রীনরোত্তম প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, প্রেমানন্দ দাসের মনঃশিক্ষা ভজনাবলী, শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের কীর্ত্তনাবলী (অধিবাস, নগর সংকীর্ত্তন ইত্যাদি) ও শ্রীশ্রীহরিবাসর কীর্ত্তন। এই কীর্ত্তনেরই প্রথমে রয়েছে মূল কীর্ত্তন ও পরে আঁখর সমন্বিত কীর্ত্তন। দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ ভক্তিগীতাবলীতে ২০১টি ছোট ছোট ভজনগান…।" তাছাড়া ডাঃ ক্ষিতীশবাবু তাঁর পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীশীতলচরণ দাস-বাবাজী মহারাজের শেখানো-ভজনাবলী, শ্রীশ্রীহরিনাম-ভজনাবলী, আক্ষেপ ও মনঃশিক্ষা-ভজনাবলী, পরমেশ্বর-ভজনাবলী ও ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনাবলী, নিত্যানন্দ-ভজনাবলী, সাধু-বৈষ্ণব-ভজনাবলী ও বৈষ্ণবীয়-বিবিধ-ভজনাবলী। মোট কথা পরম-মহাজন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব, কৃষ্ণদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর…দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী প্রভৃতি বিংশ শতকের বিদগ্ধ রচয়িতাগণের গান।

কীর্তনগানসমুদ্র এই গ্রন্থ। ডবল-ক্রাউন সাইজের ৩১৫ পৃষ্ঠার এটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। কতকগুলি আর্টপ্লেটও এই গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। সঙ্কলক ডাঃ ক্ষিতীশচন্দ্র সাহা মহাশয়ের এক অসাধ্যসাধন এই গ্রন্থ। বহুদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক এই গ্রন্থ। প্রতিটি কীর্তন-রসিকজন এবং ভারতীয়-সঙ্গীত-সাধকের পক্ষে অমূল্য এই গ্রন্থ—অকপটেই তা স্বীকার করি। মাননীয় ডাঃ ক্ষিতীশবাবু একজন স্বনামধন্য চিকিৎসাবিদ্যাপারদর্শী। অথচ ভক্তিসাধনক্ষেত্রের তিনি একজন অভিজাত-পথিক। তাঁর প্রদত্ত এই সম্পদের নিকট সকলেই আমরা এজন্য ঋণী থাকব। আমরা নিজেরাও তাঁকে জানাই আমাদের অন্তরের ধন্যবাদ।

—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

Swami Adbhutananda : Teaching and Reminiscences—Edited, Translated, and with a Biography by Swami Chetanananda. Published by Vedanta Society of St. Louis, 205 South Skinker Boulevard, St. Louis, Missouri 63105, U. S. A. (1980), p. 175, Price : $6.95.

প্রাপ্তিস্থান : অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডেহি এণ্টালি রোড, কলিকাতা-৭০০০১৪।

ত্যাগী বা গৃহী যাঁরাই শান্তি পেতে চান, তাঁদের অবশ্যই সৎসঙ্গ করা দরকার। সৎসঙ্গ ছাড়া সংসার-বন্ধন ছিন্ন করা অসম্ভব। সৎসঙ্গের ফলে বিষয়-বাসনা ক্ষীণ হয়ে ঈশ্বরে অনুরাগ ও তাঁর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই সৎসঙ্গের যোগাযোগ জীবনে ঘটে এই জন্যই তুলসীদাস গোস্বামীজী বলছেন :

বিনু সতসঙ্গা বিবেক ন হোই।
রামকিরপা বিনু সুলভ ন সোই॥

—সৎসঙ্গ ছাড়া চিত্তে বিবেক জাগ্রত হয় না—অর্থাৎ চিত্তে সদসদ্‌বিচার উদিত হয় না। আর এই সৎসঙ্গলাভও শ্রীরামজীর কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। বিবেক থেকে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তখন বৈরাগ্যযুক্ত পরম শুদ্ধচিত্তে পরম তত্ত্ব প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাই আমাদের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থে সৎসঙ্গ ভূয়সী প্রশংশিত।

সৎসঙ্গ পাওয়া বড়ই দুর্লভ। ভগবৎকৃপা না হলে পাওয়া যায় না। তবে মহাজনরা বলে থাকেন, সাধুসঙ্গ যদি সহজলভ্য না হয়, তবে সৎগ্রন্থাদি পড়লেও সাধুসঙ্গেরই ফল পাওয়া যেতে পারে।

সমালোচ্য গ্রন্থটি এমনই একটি গ্রন্থ যা পাঠ করলে অনায়াসে সাধুসঙ্গ হয়ে যায়। এতে যে মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী আছে তিনি হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী—পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ।

বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এমন এক ব্যক্তির জীবন নিদর্শনস্বরূপ রেখে গেলেন, যাঁকে দেখে বর্তমান শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিদের চোখ খুলে যাবে যে, সংসারে শান্তি পেতে হলে ভূরি ভূরি বক্তৃতা শ্রবণ ও শাস্ত্রগ্রন্থ না পড়লেও চলে—ঐকান্তিকী নিষ্ঠা ও শুদ্ধা ভক্তি থাকলে মানবের চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভ মোটেই অসম্ভব নয়।

স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের পূর্ব নাম ছিল লাটু। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে লাটু মহারাজ নামেই পরিচিত। তাঁর জন্ম বিহারের ছাপরা জেলার কোন পল্লীগ্রামে এক মেষপালকের গৃহে। দারিদ্র্যের জন্য ছোটবেলায় তিনি কলিকাতায় চলে আসেন সামান্য গৃহভৃত্য রূপে। সেই দিনের সেই বালক ভৃত্যই ধীরে ধীরে কিভাবে 'ভগবানের চাকর' হন—তারই অনুপম একটি চিত্র এই গ্রন্থে পরিস্ফুট।

গ্রন্থে তিনটি বিভাগ আছে। প্রথম ভাগে—

লাটু মহারাজের জীবনী—লিখেছেন স্বামী চেতনানন্দ; দ্বিতীয় ভাগে—লাটু মহারাজের মূল্যবান কিছু উপদেশের সঞ্চয়ন এবং নির্বাচিত কথোপকথন। এগুলিও অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন চেতনানন্দজী। আর তৃতীয় ভাগে আছে—লাটু মহারাজকে যাঁরা অতি নিকট থেকে দেখেছেন এবং ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন তাঁদের মধ্যে এইরকম ছজনের স্মৃতিচারণ। তাঁরা হলেন—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার 'শ্রীম', ভগিনী দেবমাতা, কুমুদবন্ধু সেন, স্বামী সিদ্ধানন্দ ও স্বামী বাসুদেবানন্দ। ভগিনী দেবমাতার স্মৃতিকথাটি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। আর বাকী পাঁচজনের স্মৃতিকথা 'উদ্বোধন' পত্রিকা থেকে সংকলন করে চেতনানন্দজী ইংরেজীতে তর্জমা করে নিয়েছেন।

এই গ্রন্থ রচনা করতে চেতনানন্দজী বাঙলায় লিখিত শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা', স্বামী সিদ্ধানন্দের 'সৎকথা' ও 'অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ' প্রধানতঃ এই তিনটি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন

জীবনীকার, অনুবাদক ও সম্পাদক স্বামী চেতনানন্দজী তাঁর ভক্তিপূত মনন ও সুনিপুণ লেখনী সহায়ে আত্মারাম মহাপুরুষ লাটু মহারাজের জীবনীটি অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। যাঁরা বাঙলা জানেন না, তাঁরা এই একটি মাত্র গ্রন্থের দ্বারা স্বামী অদ্ভুতানন্দের দেবোপম চরিত্রের সব দিকগুলির সঙ্গেই পরিচিত হতে পারবেন। নিঃসন্দেহে তাঁর ত্যাগদীপ্ত সেবাপরায়ণ ঈশ্বরার্পিত সাধনজীবন অধ্যাত্মপথের পথিক সকলকেই অনুপ্রাণিত করবে।

গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না—অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

সুদূর আমেরিকা সেণ্ট লুইতে থেকেও শ্রদ্ধেয় চেতনানন্দজী এমন একখানি সুন্দর গ্রন্থ আমাদের উপহার দিয়েছেন, তাতে আমরা সৎসঙ্গেরই সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

—ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর—ডঃ সুবোধ চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক: ভারতী বুক স্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। (১৩৮৯), পৃঃ ১৩৫, মূল্য: আঠারো টাকা।

আজ হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে কলিকাতা শহরে একবার দুই অসামান্য মহৎ চরিত্রের মানুষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহাদের একজন শ্রীরামকৃষ্ণ, অপরজন বিদ্যাসাগর। আপন কালকে বিস্ময়কররূপে প্রভাবিত করিয়াছিলেন এই দুই বিরাট পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উলিয়াম হেস্টি প্রমুখ সেকালের মনীষিগণ। আর পণ্ডিত-মূর্খ-নির্বিশেষে সেকালের অগণিত মানুষের গভীর শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। দুইজনে কিন্তু জীবনের দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করিতেন। বিদ্যাসাগর বিখ্যাত ছিলেন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও পরদুঃখকাতর হৃদয়ের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বস্তরের মানুষকে আকর্ষণ করিতেন তাঁহার অপূর্ব ভগবৎপ্রেম, অলৌকিক ধর্মসাধনা এবং হৃদয়ের অনুপম উদারতার মহিমায়। শ্রীরামকৃষ্ণের অবিরাম ধর্মপ্রসঙ্গ সেকালের কলিকাতায় অমৃতস্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের ন্যায় সদর্পে ধর্মবিরোধিতায় অবতীর্ণ না হইলেও তাঁহার ধর্মে অনাস্থা বহু খ্যাত ছিল। সেই বিদ্যাসাগরকে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। কেবল একবার মাত্র এই সাক্ষাৎকার

ঘটিয়াছিল এই সাক্ষাৎকার কি তাঁহাদের পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছিল? প্রভাবিত করিয়া থাকিলে তাহা কি রূপ ধারণ করিয়াছিল— এই প্রশ্ন বহু লোকের মনে দীর্ঘকাল ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকটিতে এবিষয়ে লেখকের সন্ধানী চিন্তা-ভাবনা প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের চরিত্র এবং জীবন-দৃষ্টির পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হইলেও লেখক তাঁহাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যও লক্ষ্য করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের অগাধ মাতৃভক্তির সহিত শ্রীরাম-কৃষ্ণের মাতৃভক্তির তুলনা লেখক বিশদভাবেই করিয়াছেন। (পুস্তকের ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিদ্যাসাগরের পার্থক্যের সম্পর্কে এই উক্তি লেখক করিয়াছেন—"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সত্ত্ব প্রাধান্য। বিদ্যাসাগরের এখনো সেই অবস্থা আসেনি। বিদ্যাসাগরের দয়াধর্ম ও সেবাব্রত সত্ত্ব ধর্ম বটে; শ্রীরামকৃষ্ণ সত্ত্ব ধর্মে তার অনেক উর্ধ্বে।" (পৃঃ ১২৬)। এই প্রসঙ্গে লেখক ও পাঠকের কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, বিদ্যাসাগর সর্বস্ব দান করিয়াও কোন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সেবাধর্মে নিয়োজিত করিতে পারেন নাই, আর শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাণীরূপ নব ধর্ম প্রচার করিয়া মানব ভ্রাতৃত্বের নবযুগ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা আমেরিকা হইতে জাপান পর্যন্ত বিভিন্ন দেশকে অপূর্ব মৈত্রীবন্ধনে যুক্ত করিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের অকৃপণ সদুক্তিগুলি লেখক নানা স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর প্রায় নীরব। কিন্তু একটি তাৎপর্যমূলক উক্তি বিদ্যাসাগর করিয়াছিলেন যাহা লেখক উদ্ধৃত করিতে বিস্মৃত হন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বিদ্যাসাগরকে বলিলেন যে, ব্রহ্ম কি তাহা কেহ বলিতে পারে নাই, তাই ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হন নাই, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন—"বাঃ। এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।" (পৃঃ ৩২)। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বেদান্ত ব্যাখ্যা যে বিদ্যাসাগরের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল ইহা ভাবিলে ভুল হইবে না। তবে লেখক রামজয় তর্কভূষণ, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কারের পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে যে বিদ্যাসাগরের শেষ গুরুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। (পৃঃ ১৩২-১৩৫ দ্রষ্টব্য) তাহা অনুমানমূলক। বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনে তাঁহার কর্মের বোঝা কমিয়া গিয়াছিল। তাহা হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপের পরোক্ষ ফল হইতে পারে, সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ প্রভাবের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হইবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত বিদ্যাসাগরের একটি মাত্র সাক্ষাৎকারের বিবরণে তথ্যের যে অপ্রাচুর্য আছে তাহা হইতে কোন সুস্পষ্ট প্রভাবের সিদ্ধান্ত বোধ হয় সম্ভব নয়। তথাপি লেখক যে সুচিন্তিত বিশ্লেষণ ও অভিনিবেশ সহযোগে বিভিন্ন সূত্রের পর্যালোচনার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের পরস্পর সম্পর্কের বিষয়ে মননশীলতার আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহা পুস্তকটির প্রশংসা ও সযত্ন অধ্যয়নের দাবি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

—অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

ভারতে :

ত্রিপুরা বন্যাত্রাণ : বেলুড় মঠ হইতে ত্রাণকারীর দল ১০ অগস্ট ১৯৮৩, আগরতলা পৌঁছাইয়াছেন। তাঁহারা উদয়পুরে শিবির স্থাপন করিয়া বন্যাগ্রস্ত মানুষের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ১৩ হইতে ২২ অগস্টের মধ্যে ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার ১০টি অঞ্চলের ১৯৮৪টি পরিবারের মধ্যে ৬৫৬টি ধুতি, ৯৭০টি শাড়ি, ৭৫১টি শার্ট, ৭২৩টি প্যান্ট, ৪৩৯টি ফ্রক, ২৫০টি ইজার, ৬৯৬টি নানা রকমের পরিচ্ছদ এবং ৪০৯৪টি পুরাতন বস্ত্র-পোশাক ইত্যাদি বিতরণ করিয়াছেন।

মহারাষ্ট্রে বন্যাত্রাণ : প্রাথমিক ত্রাণ-কার্যের পর বোম্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ৯ অগস্ট ১৯৮৩ এর মধ্যে সঙ্গমেশ্বর তালুকের ৩২টি গ্রাম এবং রত্নাগিরি তালুকের ৫টি গ্রামে দেওরুখ শিবিরের মাধ্যমে রত্নাগিরি জেলার কোন্‌কান অঞ্চলের ৪৮৫টি পরিবারের মধ্যে ৪৯৭টি শাড়ি, ৪৬৬টি ধুতি, ৪৮৯টি কম্বল, ৪৭৭ সেট বাসনপত্র ও ২৮৮টি পুরাতন জামা বিতরণ করিয়াছেন।

সৌরাষ্ট্রে বন্যাত্রাণ : রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম ২১ জুলাই হইতে ২০ অগস্টের মধ্যে বন্যাবিধ্বস্ত ক্ষতিগ্রস্ত জুনাগড় জেলার ৫২টি গ্রামের ৩,২২০টি পরিবারের মধ্যে শাড়ি, ব্লাউজ, থান কাপড়, জামা, সতরঞ্চি, চাদর, বাসনপত্র, প্লাস্টিকের বালতি, খাদ্যশস্য, সাগু, চা, মোমবাতি, দেশলাই এবং ২০০০ টাকার ওষুধ বিতরণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে গাইঘাটা ঘূর্ণিবাত্যা : ২৪ পরগনা গাইঘাটা থানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঘূর্ণিবাত্যায় আশ্রয়চ্যুত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনকল্পে বাড়ি তৈরি করিবার জন্য 'নিজের বাড়ি নিজে কর' প্রকল্পটি গ্রহণ করা হইয়াছিল। ৪৫০টি বাড়ির মধ্যে ৩৮৮টির কাজ সম্পূর্ণ।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ : মাদ্রাজের ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে রামেশ্বরমে শ্রীলঙ্কা হইতে আগত শরণার্থীদের জন্য সেবাকার্য আরম্ভ হইয়াছে।

আক্রান্ত শ্রীলঙ্কা মিশন

গত জুলাই-এর শেষ সপ্তাহে শ্রীলঙ্কায় হাঙ্গামার সময় সমাজবিরোধীদের দ্বারা রামকৃষ্ণ মিশনের কলম্বো কেন্দ্র সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হয়। খবর পাওয়া গিয়াছে যে অতিথিনিবাস, লাইব্রেরি সহ কয়েকটি বাড়ি এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টিনারি মেমোরিয়াল হল'টি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বাড়িগুলির কাচ চূর্ণবিচূর্ণ, আসবাবপত্র ভাঙচুর এবং বাড়ির কিছু কিছু অংশে পেট্রোল ঢালিয়া অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও মিশনের ভ্যান ও গাড়ি নষ্ট হইয়াছে। সবসুদ্ধ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭ হইতে ৮ লক্ষ টাকার মতো।

ছাত্র-কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের টেকনিক্যাল স্কুলের একটি ছাত্র ১৯৮৩-র পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উচ্চমাধ্যমিক (বৃত্তিগত) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

আলঙ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র ১৯৮৩-র নিউদিল্লীস্থ কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১৮শ স্থান লাভ করিয়াছে। অরুণাচলপ্রদেশের মধ্যে সে প্রথম স্থানাধিকারী। ইউনেসকো (UNESCO)-র পরিচালনায় অখিল-

ভারত ১৯৮২-র 'সাধারণ জ্ঞান' পরীক্ষায় উক্ত বিদ্যালয়ের আর একটি ছাত্র তৃতীয় স্থান লাভ করিয়াছে।

দ্বারোদ্‌ঘাটন

৩১ অগস্ট, ১৯৮৩, জন্মাষ্টমীর দিনে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট্যুট অব কালচারের দক্ষিণ ব্লকের নবনির্মিত ঠাকুরঘর ও তিনতলাটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ।

বলরাম-মন্দিরে রথযাত্রা

বলরাম-মন্দিরে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবছরও ১১ জুলাই, মঙ্গলবার, ১৯৮৩, রথযাত্রা উপলক্ষে মহাড়ম্বরের সঙ্গে রথ টানা হয়। একশত বৎসর পূর্বে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই বলরাম বসুর বাড়িতে সপার্ষদ রথের রশি টানিয়া ছিলেন এবং কীর্তনানন্দে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। তাহা স্মরণ করিয়া মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও ভক্তসঙ্গে রথ টানিয়াছেন ও ভজন-কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা হইয়াছেন। রথের রশি প্রথম টানেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। তাঁহার সঙ্গে রথ টানেন বেলুড় মঠের ও পার্শ্ববর্তী আশ্রমসমূহের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ। অগণিত ভক্ত রথরজ্জু স্পর্শ করিবার সুযোগ লাভ করেন। কীর্তনানন্দে বলরাম-মন্দির ঐদিন আনন্দমুখরিত হইয়া ওঠে।

উদ্বোধন-সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার গীতা অথবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে যথারীতি পূজাদির পরে, 'সারদানন্দ হলে' শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ। শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দের আবির্ভাব যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

যদু মল্লিক-ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ
(শতবর্ষ-স্মরণে)

২১ জুলাই ১৮৮৩, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব **যদুলাল মল্লিকের** ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীটের ভবনস্থ ঠাকুরদালানে সিংহবাহিনী দেবীর সন্ধ্যারতি দর্শনকালে ভাবসমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন। ২১ জুলাই, বৃহস্পতিবার, ১৯৮৩, উহারই শতবর্ষ-পূর্তি স্মরণ করিয়া উক্ত ঠাকুরদালানে বিশেষ তিনটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। 'বোধন' গীতি-বিচিত্রার মাধ্যমে প্রথম 'মাতৃ-সমাবেশ' শুরু হয় মধ্যাহ্ন দেড় ঘটিকায় প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণার সভাপতিত্বে। বিকাল সাড়ে তিন ঘটিকায় দ্বিতীয় 'বিশ্বধর্ম সমাবেশ'-এ স্বামী যুক্তানন্দের সভাপতিত্বে বিভিন্ন ধর্মমতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করেন। সন্ধ্যা ছয়টায় তৃতীয় 'মহা-সমাবেশ'-এর আলোচ্য বিষয় ছিল 'শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি'। এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, বক্তা, গায়ক অনেকেই উপরি-উক্ত তিনটি সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। এই শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিকের সংকলিত ও সম্পাদিত 'ভাবসমাহিত শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

বিবেকানন্দ সোসাইটির ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস

গত ২৩ অগস্ট ১৯৮৩, মঙ্গলবার, **বিবেকানন্দ সোসাইটির** (কলিকাতা) ৮২তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতির ভাষণে স্বামী নিরাময়ানন্দ সোসাইটির সহিত তাঁহার বহুদিনের সংযোগের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, সোসাইটি ৮২ বৎসর ধরিয়া স্বামীজীর ভাব যেভাবে বহন করিয়া আসিয়াছে তাহা আরও ব্যাপক হউক। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। সোসাইটির সম্পাদক ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সোসাইটির পূর্বকথা আলোচনা করিয়া পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। শ্রীআশিস্ মজুমদার সঙ্গীত পরিবেশন করেন।



৮৫তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা কার্তিক, ১৩৯০



বিজয়া

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

[প্রথম বর্ষ (১৩০৬) 'উদ্বোধন'-এর ২৮ আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম সম্পাদক-লিখিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ।]

মায়ের পূজা শেষ হইল ; মা স্বস্থানে যাত্রা করিবেন।—"গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। মম চানুগ্রহার্থায় পুনরাগমনায় চ" ॥ মা! মহাদেব যেখানে আছেন এমন শ্রেষ্ঠস্থানে গমন করুন। আমাকে কৃপা করিতে কিন্তু ভুলিবেন না ; শীঘ্রই আবার আসিবেন।

মা বাড়ী আলো ক'রে ছিলেন। কত গম্‌গমে ছিল, কত জাঁকজমক ছিল, কতই আনন্দোৎসব হতেছিল। আজ ঘর আঁধার ক'রে, মন আঁধার ক'রে চলে গেলেন! মাকে পাঠাইয়া, মাকে পৌছিয়া দিয়া আসিয়া, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি—চারিদিক ফাঁকা ; সকলেই বিমর্ষ ; কেহ কেহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছেন ; কেহ কেহ ব'সে কাঁদিতেছেন, শোকে সকলেই কাতর ; কেবল বাটীর লোক নয়,—আত্মীয়-বন্ধুগণ, পাড়াপড়শীগণ, অতিথিঅভ্যাগতগণ, অপরাপর লোকজন—সকলেই শোকতপ্ত। মা! আবার কবে আস্‌বে ? মা, অন্তরের সহিত ভক্তিভরে যেন তোমায় ডাক্‌তে পারি।

ভক্তির কথা দূরে থাকুক, সেই ছেলেবেলাকার 'মা' বলাও ভুলে গেছি!—মা! "কুপুত্র যদিও হয়, কু-মাতা কখন নয়" ; ছেলেবেলায় যেমন গর্ভধারিণীর বেশে আমায় কোলে নিতে, সেইরূপ আবার একবার কোলে নাও মা। আবার একবার সেইরূপ স্নেহভরে ছেলের পানে চাও মা। 'মা' ব'লে ডাক্‌তে যে একেবারে ভুলে গেছি!! সেইরূপ স্নেহময়ী মা'র বেশে সুমুখে দাঁড়াও—আবার 'মা' বল্‌তে শিখাও মা। মা, তুমি না দয়া কর্‌লে, কে ক'র্‌বে ? তুমি না শিখালে কে শিখাবে মা ? আহা! 'মা' কি মধুমাখা নাম। এ নাম সাধ মিটিয়ে নিতে পারলুম না! ছেলেবেলায় যেমন গর্ভধারিণীকে অন্তরের সহিত 'মা' ব'লে ডাক্‌তে পারতুম, তেমনি প্রাণের সহিত যেন তোমায় ডাক্‌তে পারি।





মা! তোমায় যেমন ভক্তি ক'রব মনে করছি তেমনি ক'রে যেন সকলকেই ভক্তি করতে পারি। তেমনি নির্ম্মল চোখে যেন সকলকেই দেখতে পারি। মনের মালিন্য হ'তে যেন রক্ষা পাই।

মা আসতে গেছেন ; আর ভেবে কি হবে বলুন ? মা মঙ্গল করবেন ; সকলে একত্রিত হউন ; শান্তিজল গ্রহণ করুন,—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি"।

"ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তি ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা। কীর্ত্তির্লক্ষ্মীধৃ‌র্তির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তিস্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ।…এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থ-সিদ্ধয়ে"।—

ইন্দ্রাদি দেবগণ মঙ্গল করুন। বৃহস্পতি প্রভৃতি শুভ হউন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যম, বরুণ, পবন, ধনরাজকুবের প্রভৃতি সকলে এই মন্ত্রপূত বারি প্রক্ষেপ করিতেছেন। কীর্ত্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, মেধা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, বুদ্ধি, লজ্জা, তুষ্টি, শান্তি প্রভৃতি মাতৃকাগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁরাও আমাদিগের ধর্ম্মাদিচতুর্ব্বর্গ-সিদ্ধির জন্য, শিরোপরি শান্তিবারি সেচন করিতেছেন। সর্ব্বতো-ভাবে মঙ্গল হউক। ওঁ স্বস্ত, ওঁ স্বস্ত, ওঁ স্বস্ত।

মা ব্রহ্মময়ী এসেছিলেন,—বাটী পবিত্র ক'রে গেছেন, দেশ পবিত্র ক'রে গেছেন, আমাদিগের সকলকেই পবিত্র ক'রে গেছেন। তাঁহার স্পৃষ্ট বারি আমাদিগের গাত্রে পড়িয়াছে। সকলে ধন্য হইয়া গিয়াছি। আমাদিগের আত্মীয়-বন্ধুবর্গ, পাঠক ও গ্রাহকবর্গ, দেশের যাবতীয় লোক, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ, সকলকারই মঙ্গল হউক ; শ্রীবৃদ্ধি হউক ; বুদ্ধিবৃত্তি সৎ হউক ; সকলে সর্ব্বতোভাবে শান্তিলাভ করুন ; ধরা স্বর্গধাম হউক ; বলিতে যেন পারি—আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান।

মা এসেছিলেন।—মা'র পাদপদ্ম স্পর্শ ক'রে সকলকার মন পবিত্র হ'য়ে গেছে। হৃদয়ে স্নেহময়ীর ছায়া প'ড়ে আজ আমাদের কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়েছে। মা আবার আসতে গেছেন ; তাই আজ বিজয়া। বি-বিশেষ, জি ধাতু জয় করা। হৃদয় দিয়া হৃদয় জয় করা। আজ আমাদের বিজয়োৎসব! মন দিয়া মন হরণ কর, প্রাণ দিয়া প্রাণ ক্রয় কর। দাও ; উপযাচক হইয়া দাও।—যাও লোকের বাড়ী বাড়ী ; ঘরে ঘরে ফেরো ; বন্ধু ব'লে, ভাই ব'লে—সহোদর ভাই ব'লে—আলিঙ্গন কর। আমাদের মা এসেছিলেন,—জেনেছি সকলকারই সেই একই মা, আমরা সেই একই মা'র সন্তান। যে সে মা নয়,—ব্রহ্মময়ী। আমরা ব্রহ্মময়ীর সন্তান। খোলো—চোখ খুলে দেখ ; স্পষ্ট ক'রে দেখ ;—অন্তরে কে সজল নয়নে ব'সে আছেন।—আমাদের আনন্দময়ী মা—স্নেহময়ী জননী। দৃষ্টি বিস্তার কর ; আর একটু বিস্তার কর ; দেখ—সেই মা'ই সকলকারই ভিতর বিরাজ করছেন। মা'র কাছে ছোট বড় নাই ; ভাল মন্দ নাই ; কাওরা হাড়ি





নাই; হিন্দু মুসলমান নাই। মা যে আমাদের ব্রহ্মময়ী—মা'র কাছে সব ছেলেই সমান। ছাড়ো —লজ্জা ঘৃণা ভয়; ছাড়ো দ্বেষ-বুদ্ধি; আত্মাভিমান—বৃথা অহঙ্কার; "ছাড়ো মোহ মায়া।"—নির্ম্মল চোখে দেখ; "নয়ন মিলিয়ে দেখ"—হাড়ি ডোম চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান, ছোট বড়, সকলকারই ভিতরে সেই একই মা। বাহিরে দেখিতে ভিন্ন ভিন্ন পিষ্টক—"ভিতরে সেই একই পুর"। যাও "উদ্বোধন",—গ্রাহক পাঠক, আত্মীয় অনাত্মীয়, পরিচিত অপরিচিত, ছোট বড়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, গৃহস্থ সন্ন্যাসী, হিন্দু মুসলমান—সকলকার নিকট নত মস্তকে যাও; নির্ম্মল অন্তঃকরণে যাও। যাও, সকলে যাও।—পূজনীয় ব্যক্তির পূজা কর; স্নেহের যিনি—স্নেহ কর; ভালবাসার—ভালবাস। বন্ধন ছিন্ন কর; অর্গল খুলিয়া দাও, হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন কর। তোমার হৃদয়ের প্রেম, লোকের চরণে দাও; লোকের হস্তে দাও, লোকের হৃদয়ে দাও। দাও,—দাও ও গ্রহণ কর; আজ আমাদের আনন্দোৎসব—হৃদয়ের উৎসব।—হৃদয় হৃদয়ে মিলাও; প্রাণ ভ'রে মিলাও; নির্ম্মল অন্তঃকরণে মিলাও; সহৃদয়তার পরম শান্তি উপভোগ কর।

সকলকার সঙ্গে, ডেকে, অন্তরের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ কর। আমরা সবে সেই ব্রহ্মময়ীর সন্তান; সকলকার সহিত মিষ্টিমুখ কর; অমৃত পান কর; আমাদের মা ব্রহ্মময়ী নিজ বক্ষঃস্থল হ'তে যে অমৃত নিঃসরণ করছেন, সেই অমৃত পান কর। অন্তরে আর কোন রকম মলিন ভাব পোষণ ক'রো না। মা'র ছায়া আর তা হ'লে হৃদয়ে পড়বে না—মাকে আর দেখতে পাবে না। অমর হ'তে পারবে না; ব্রহ্মময়ীর অমৃত ধনে আর অধিকারী হ'তে পারবে না। আসুন সকলে; দিগ্‌দিগন্তর হ'তে আসুন; আজ আমাদের বিজয়া; আজ ভারতে সম্মিলনের দিন। ভারতবাসী যে যেখানে থাকুন, আজ সকলে এক হৃদয় এক আত্মা হউন; এমন সুযোগ আর হবে না। শত্রু মিত্র, আত্মীয় পর, নীচ উচ্চ, ভেদাভেদ, যেন আজ কাহারও ভিতর না থাকে; কোন প্রকার রাগ দ্বেষ যেন কেহ পোষণ না করেন, হৃদয় নির্ম্মল হউক; আজ ভারতবাসী সকলে, হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরে অন্তরে, এক হউন; এমন সুদিন আর পাব না।

আজ বিজয়া। এই দিনে ভারতের রাজগণ যুদ্ধযাত্রা করে থাকেন। আসুন ভারতবাসিগণ! সকলে মিলে আজ আমরা যুদ্ধযাত্রা করি। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে রিপু। ঘরে বাইরে শত্রু। অন্তরেন্দ্রিয় বহিরিন্দ্রিয়—সকলেই বিপক্ষ। সমগ্র ভারত দুর্গা-নাম জপ ক'রে এই মহৎ যুদ্ধে কৃতসঙ্কল্প হউন। আজ বিজয়ার দিন, দুর্গা-নাম লইয়া রণযাত্রা করুন; আমরা নিশ্চয়ই সিদ্ধমনোরথ হইব। বালক যুবা বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, ব্রহ্মচারী গৃহস্থ সন্ন্যাসী, জ্ঞানী বা কর্ম্মী, সকলেই নিজ নিজ শত্রু-দমনে তৎপর হউন।

মহাশক্তির উপাসনা করিয়াছি। অনন্ত শক্তিমতী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন; নিশ্চয়ই আমরা রিপুজয়ী হইব। প্রাণ ভ'রে শক্তির পূজা যদি ক'রে থাকি, নিশ্চয়ই আমরা শক্তিমান্ হইব, সংসারক্ষেত্রে জয়ী হইব। মাকে যদি সত্য হৃদয়ের সহিত আরাধনা ক'রে থাকি, চতুর্ব্বর্গ অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ 'পরমার্থ', তাহাও লাভ করিব সন্দেহ নাই।





কথাপ্রসঙ্গে

বিজয়া-সম্ভাষণ

শারদোৎসব অন্তে এখন বিজয়া। জগজ্জননীকে কেন্দ্র করিয়া কয়টি দিন উৎসবে মাতিয়াছিলাম—আমরা সকলেই। সকলে মিলিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে গিয়া, বুঝিয়া বা না বুঝিয়া, সুকৃত বা বিকৃত নানা উপায়ে, নানা উপলক্ষে, সকল ভেদাভেদ তৎকালে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—নিতান্ত সাময়িক হইলেও সমাজে যেন একতা ও সাম্যের একটা চমক লাগিয়াছিল। ঈশ্বর-বিমুখ ভোগ সংসারে যাবতীয় অশান্তির কারণ। ঈশ্বরবিমুখতার নামই অসুরভাব। মা দুর্গাকে আমাদের সকল ভোগ, উৎসাহ ও আনন্দ-স্ফূর্তির কেন্দ্রে স্থাপনা করিয়া—তাঁহারই পূজার নামে সকলে সর্বপ্রকার অসুরভাবকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও জয় করিতে পারিয়াছিলাম যেন,—তাই তো পূজা শেষে আমরা পরস্পর পরস্পরকে বিজয়ালিঙ্গন না করিয়া পারি নাই।

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও অনুরাগী সকলকেই আমরা এই বিজয়ার আনন্দ-স্মৃতি লইয়া প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভ কামনাদি জানাইতেছি। যে দেবী সকলের মঙ্গলদাত্রী, যিনি সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতু, যিনি সর্বজীবের মধ্যে চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, শ্রী ইত্যাদি রূপে বিরাজিতা—যিনি মাতৃরূপে আমাদিগকে সদাই পালন করিতেছেন, সেই জগদম্বিকা আমাদের সতত রক্ষা করুন—সকলকে কল্যাণ-কর্মে ও ভাবনায় অনুপ্রেরণা দিন ইহাই প্রার্থনা।

'ত্বং শক্তিরেব জগতাম্'

যে আদ্যাশক্তি মহামায়াকে অসুরদলনী দুর্গারূপে পূজা করিয়াছি, তাঁহাকেই এখন দেখিব কালীমূর্তিতে। রূপের ভিন্নতা থাকিলেও ভাবের কী অপরূপ সামঞ্জস্য! সকল রূপেরই অভিব্যক্তি সেই এক মা।

মায়া তথা কাল ত্রিগুণময়ী। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—তিন গুণেরই খেলা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয় কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—ইহাদের কেহই কখন একাকী থাকিতে পারে না। তাই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—ইহারাও পরস্পর-সাপেক্ষ। কালেরই মূর্তি—ধ্যান-প্রতিমা কালীও তাই ত্রিগুণময়ী—একাই সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের দ্যোতনাময়ী। দেবী-ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে এই তত্ত্বটিকে অতি সুন্দর ব্যক্ত দেখিতে পাই (শ্লোক ৪২):

'ত্বং শক্তিরেব জগতাম্ অখিল প্রভাবা
ত্বন্নির্মিতং চ সকলং খলু ভাবমাত্রম্।
ত্বং ক্রীড়সে নিজ-নির্মিত-মোহজালে
নাট্যে যথা বিহরতে স্বকৃতে নটো বৈ॥'

হে জননী, তুমিই নিখিল জগতের শক্তিরূপা—অখিল প্রভাবময়ী। এই অনন্ত সৃষ্টি তোমা হইতেই প্রসূত। একই নট যেমন স্বরচিত নাট্যে বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হইয়া মঞ্চের নানা ভূমিকায় অভিনয় করে, তুমিও মা তেমনই একরূপা হইয়াও স্ব-বিরচিত মোহময়ী এই সংসার-রঙ্গালয়ে সততই বিবিধরূপে ক্রীড়া করিয়া চলিয়াছ।

কালী মহামায়া—শিবশক্তি। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তিনি জগৎ সৃজন করিয়াও, কদাপি অদ্বৈত-শিবদৃষ্টি বর্জিতা নহেন। কালীমূর্তিতে তাই তো দেখি, তিনি সদা চঞ্চলা নৃত্যপরায়ণা হইয়াও পদতলে শান্ত-শায়িত শিবের প্রতিই দৃষ্টি-নিবদ্ধা। অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ শিবকে, এই মাতৃশক্তিই তো দেশ-কালের ধারণার মধ্যে—আমাদের গণনা ও পরিমাপের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন। অনন্তকে সান্তরূপে, অখণ্ডকে খণ্ডের মধ্যে ধরিয়া দিয়াছেন তো তিনিই। ইহাই বুঝি দুর্বল সন্তানের প্রতি করুণাময়ী জননীর স্বাভাবিক অনুকম্পা—মায়ের সন্তান-বাৎসল্য। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী মা—মহা-ব্যস্ততা ও চাঞ্চল্যের মধ্যেও কিন্তু এক নিমেষের জন্যও শিবের নয়ন হইতে নিজ দৃষ্টিকে অন্যত্র সরাইতেছেন না। ইহা দ্বারা কি তিনি তাঁহার প্রিয় সন্তানদের দৃষ্টিকেও সংসারের অজস্র কর্ম-চঞ্চলতার মধ্যে একমাত্র শিবেই স্থির রাখিতে ইঙ্গিত করিতেছেন? হয়তো বা তাহাই। মাতৃভক্ত পুত্র-কন্যা তো মাকেই অনুকরণ করিয়া থাকে সর্ব-ব্যাপারে। কিন্তু অহংকার-মত্ত অসুরভাবাপন্ন জীব, মায়ের এই সস্নেহ ইঙ্গিত ধরিতে পারে না,—মাতৃতত্ত্ব না বুঝিয়া মাতৃবিমুখ হইয়া সংসারে দিবানিশি শুধুই অশিবের তোষণে মগ্ন থাকে,—সাংসারিক শোকে-দুঃখে-তাপে জ্বলিয়া পুড়িয়া কষ্ট পায়।

মা কালী ভক্ত-সন্তানের নিকট মহাবিদ্যা। অভক্ত ছেলেমেয়েরা কিন্তু মাকে পাইয়া থাকে অবিদ্যারূপে। অসুরদের নিকট যিনি ভীষণা—ভক্তজনের পক্ষে সেই তিনিই আবার করুণাপাথার। আশ্চর্যরূপিণী মায়া। একই মা—বিদ্যা ও অবিদ্যা। অবিদ্যা প্রভাবে সৃষ্টির সব কিছুই যেন কেন্দ্র হইতে—অদ্বৈত তত্ত্ববস্তু শান্ত-শিব হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চাহিতেছে। মহামায়ার বিদ্যাশক্তি কিন্তু সততই সকলকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন—নিয়ত শিবমুখী করিয়া রাখিতেই উন্মুখ। কৌতুকাবহ কাণ্ডই বটে!

একটি লোষ্ট্রখণ্ডকে সুতায় বাঁধিয়া সবেগে ঘুরাইলে, সূত্রে আবদ্ধ থাকায় উহা কোন মতেই হাত হইতে ছিটকাইয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না,—অগত্যা উহাকে চক্রাকারে আবর্তিত হইতেই হয়। অবিকল যেন তেমনই, বহির্মুখে ধাবমান এই সংসার-সৃষ্টিটাও কেবলই চাহিতেছে শিব হইতে দূরে সরিয়া গিয়া অশিবে মত্ত হইতে,—কেন্দ্রচ্যুতির উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতিয়া উঠিতে। কিন্তু বিদ্যাশক্তির নিরন্তর আকর্ষণে সে একেবারে কেন্দ্রচ্যুত হইতে পারে না। কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অসম্ভব বলিয়াই তো এই সংসার-সৃষ্টিকেও চক্রাকারে আবর্তিত দেখিতেছি আমরা। বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষের পরে পুনরায় বীজ। জন্মের পরিণাম মৃত্যু, মৃত্যুর পরে আবার জন্ম। সুখের অন্তে দুঃখ, দুঃখের শেষে আবার সুখ। চক্রাবর্ত ইহাই। ইহাই ঘূর্ণায়মান সংসার। এইভাবেই অবিরাম ঘুরিয়া চলিয়াছে—পল, দণ্ড, মুহূর্ত, দিন, মাস, ঋতু, বর্ষ! এই আবর্তন সর্বত্র—সূর্যে, চন্দ্রে, গ্রহে, উপগ্রহে, নক্ষত্রে, নীহারিকায়। এই চক্রাবর্তেই সাগর, পর্বত, নদী, প্রান্তর, জল, স্থল, সব কিছু। আবর্তনশীল সুবিশাল এই সৃষ্টি-চক্রের মূলে রহিয়াছেন কালী, যাঁহার বিদ্যাশক্তির প্রভাবে সংসারের সকল গতি ও ছন্দ, আবেগ ও যতি—আঘূর্ণন এবং আকর্ষণ।

*

কালী কালো। কালীর বর্ণ কেন কালো, তাহা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত হইতে জানিয়াছি—দূরে বলিয়া। কালো বর্ণ দুরধি-গম্যতার প্রতীক। কালীর বাহিরের বর্ণ কালোই বটে, কিন্তু নিকট-দৃষ্টিতে, ভক্তের অন্তরে তিনিই চিৎ-প্রভাময়ী—জ্ঞান-ভাস্বরতায় উজ্জ্বলা। আবার তাঁহার কালো রঙের আরও একটি রূপক

ব্যাখ্যা প্রাচীন পুরাণের সাহায্যে পাইতে পারি : অসুরদের প্রতি ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল মসীবর্ণ অর্থাৎ কালো রঙ্ ধারণ করিয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ভাষায়—'কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণং অভূৎ তদা।' কিন্তু এই 'কোপ'ও অতি সন্তর্পণে অবধান করিতে হইবে,—নিজ সন্তানের প্রতি জননীর 'কোপ' তো আর সাধারণ কোপ অবশ্যই নহে। ছেলের উপর মায়ের কোপ—সন্তানের প্রতি জননীর ক্রোধ, সর্বাংশেই সন্তানের মঙ্গল-হেতু। জ্ঞান-খড়্গ দিয়া অসুরদের মুণ্ড ছেদন করিয়া, অর্থাৎ তাহাদের অসুরত্বকে বিনাশ করিয়া মা কালীও তাঁহার নিজ দুরন্ত সন্তানদের কল্যাণগতিই প্রদান করিয়াছিলেন এবং করিয়া থাকেন। বাহিরে তাঁহার ক্রোধ-দৃপ্ত ভয়ঙ্করী রূপ, সমর-নিষ্ঠুরতা,—কিন্তু অন্যদিকে দেখি তাঁহার বর-অভয়-করুণা। মায়ের দুই হস্তে তাই খড়্গ ও নরমুণ্ড, কিন্তু অপর দুই করকমলে সন্তানের প্রতি বরাভয়।

মুণ্ডমালিনী কালী। অসুর-সন্তানদের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছেন মা নিজেই। অথচ ছিন্ন সন্তান-মুণ্ডগুলিকে স্ব-কণ্ঠেই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে—মা সন্তানকে শাসন করেন, কিন্তু বর্জন করেন না,—চরম শাস্তি প্রদান করিয়াও তাই আপন কণ্ঠলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন—নিজের বক্ষ-শোভা করিয়া সঙ্গে লইয়াই ফিরিতেছেন। মুণ্ডমালিনী তাই দয়াময়ীও বটে,—ভীষণা হইয়াও তাই স্নেহ-পাগলিনী।

কালী জগৎ-জননী—বিশ্বপ্রসবিনী। পলে পলে যিনি জনন-নিরতা, প্রতিক্ষণেই যিনি অসংখ্য সৃজন-ব্যাপৃতা, সেই ব্রহ্মাণ্ডোদরী জগদম্বার অঙ্গে দিগ্‌বাস ব্যতীত অন্য আবরণ বা পরিচ্ছদ ধারণের অবসর কোথায়? কালী তাই উলঙ্গিনী—বিবসনা। মাত্র ত্রিগুণই যাঁহার উপাধি—অপর উপাধি-আবরণ-বসন-ভূষণের লেশও যাঁহাতে নাই, তিনি তো দিগম্বরীই হইবেন। যিনি বিশ্বোদরা অনাবৃতা, তাঁহার অঙ্গে বস্ত্রাচ্ছাদনের কল্পনা হইবে কিরূপে? 'বিশ্বোদরস্য বস্ত্রং কুতঃ!··· রম্যস্য আভরণং কুতঃ!!' পরাপূজা-স্তোত্রে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডই যাঁহার উদরে, তাঁহার আবার বসনাবরণ কি! স্বয়ং যিনি সৌন্দর্যস্বরূপা, তাঁহার কোন্ আভরণের সজ্জা প্রয়োজন!!

অনন্ত শান্তি-সমাধির বুকের উপরেই এমন সৃষ্টি-চাঞ্চল্য! অগুণ-অক্রিয় প্রশান্তির বক্ষেই এই ত্রিগুণ-নর্তন! মা বুঝি এই কারণেই কিঞ্চিৎ লজ্জমানা। শুভ্র দশনে তাই জিহ্বা কাটিয়াছেন—যেন ব্রীড়াময়ী। নিস্তরঙ্গ-নির্বিশেষ সমুদ্রে সৃষ্টির তরঙ্গ-ভঙ্গ ও ক্ষোভ সঞ্চারের জন্যই কি তাঁহার এই লজ্জা? যেন সেইরূপই বোধ হয়! অথবা, ঐ লোহিত লোল রসনা বুঝি রজোগুণের প্রতীক,—আর সিত দন্তরাজি যেন সত্ত্বগুণের সঙ্কেত। সত্ত্বের দ্বারা রজোকে দমন বা সংযত করাই যেন চিত্রায়িত হইয়াছে লম্বিত লোল জিহ্বাকে দশন দ্বারা পেষণের মাঝে। কালীরূপের তত্ত্বাবধারণ যে দুরূহ সাধনসাপেক্ষ, ইহাও কি ব্যক্ত হইতেছে ঐ মূর্তিতে?

কালী শ্মশানবাসিনী। সর্বপ্রকার কামনা, বাসনা, স্বার্থ, সাধ, অভিমান, আসক্তি—এক কথায় অজ্ঞান ও অজ্ঞান-জনিত 'আমি-আমার', 'অহং-মম' যখন জ্ঞানাগ্নিতে পুড়িয়া চিতাদগ্ধ শবাকার প্রাপ্ত হইবে, তখনই সেই শ্মশান-হৃদয়ে মা কালীর আবির্ভাব সুনিশ্চিত হইয়া থাকে। আচার্য বিবেকানন্দ তাই তো অমন অমোঘ সাধন-নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন : 'চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'

*

কে বুঝিবে এই কালীর মর্ম! বিশ্ব-সংসারকে যিনি সৃজন করেন, পালন করেন—সেই তিনিই

আবার স্ব-সৃষ্টিকে সংহার করিতেছেন, গ্রাস করিয়া ফেলিতেছেন। একদিকে বর ও অভয়, অন্যদিকে অসি ও মুণ্ড—প্রসারিত চারি হস্তে বিরুদ্ধ সঙ্কেত। রক্তচক্ষু, লকলক জিহ্বা, বিকশিত দশন যে আননে, তাহাতেই আবার সন্তান-স্নেহের বিশ্বপ্লাবী করুণা-মাধুরী বিচ্ছুরিত। মুণ্ডমালিনী ভয়ঙ্করীর পীনোন্নত দুই স্তন হইতে তাঁহার অগণিত সন্তানের জন্য সঞ্চিত স্নেহ-সুধা ক্ষরিত হইতে চাহিতেছে। ভীষণা উন্মাদিনীরূপে শিবের বক্ষে নৃত্যপরা,—অথচ যেন সহসা-স্তব্ধ, স্নিগ্ধ-গম্ভীরা লজ্জা-কাতরা!

দুর্জ্ঞেয়া জগদ্বিধাত্রী কালী। আমাদের সীমিত মনন-পরিধিতে তাঁহাকে আমরা আনিতে পারিব না, তাহা ভালই জানি,—তথাপি আমাদের এই মননের উদ্দেশ্য তাঁহাকে প্রণতি নিবেদন,—তাঁহার তত্ত্ব-নিরূপণ নহে। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দই অবশেষে গাহিয়াছেন :

'কাম্বা শিবা ক্ব গৃণনং মম হীনবুদ্ধেঃ
দোর্ভ্যাং বিধর্তুমিব যামি জগদ্বিধাত্রীম্।
চিন্ত্যং শ্রিয়া সুচরণং ত্বভয়প্রতিষ্ঠং
সেবাপরৈরভিনুতং শরণং প্রপদ্যে॥'

'বিশ্বপ্রসবিনী তুমি, ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব আমি,
করিব তোমার স্তুতি বৃথা এই কল্পনা।
সীমাহীন দেশকালে, ধরে আছ বিশ্বজালে,
তোমায় ধরিতে হাতে উন্মাদের বাসনা,
অকিঞ্চন ভক্তিধন, রমাভাব্য যে চরণ,
সে পদে শরণ পাই, এই মাত্র কামনা।'
(—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-কৃত পদ্যানুবাদ)

কালীপূজার গভীর ভাব-দ্যোতনা স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজেদের অনধিকার ও অক্ষমতাকেই উপলব্ধি করি আমরা,—আর সেই জগদম্বিকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি নিজেদের বাচালতার দ্বারা অবর্ণনীয়াকে বর্ণনার এই বৃথা প্রয়াসের জন্য।

চাওয়া ও পাওয়া

শ্রীপ্রভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন ভরে চেয়ে চেয়ে মা,
শেষ হল না তবু চাওয়া,
অনেক কিছু পেলাম ভবে,
হল নাকো তোমায় পাওয়া
ও সব তো মা খেলনা দিয়ে
শিশু-মন ভুলিয়ে দেওয়া,
সহজ কথা বুঝতে দিলে
মহামায়া হয় না হওয়া।
নিজের দোষে মরীচিকার
পিছে হল অনেক ধাওয়া,

কামনারই হাতছানিতে
ভুল পথে এগিয়ে যাওয়া।
বাসনা-নদী উছল ভারী,
হল অনেক নৌকা বাওয়া,
কূল হারানো যার কপালে
তার কি মেলে ভালো হাওয়া?
তাই করুণা কর মা দীনে
শেষ করে দে সব চাওয়া,
সহজ করে দে গো মা তোর
রাঙা দুটি চরণ পাওয়া।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মসহায়

Madras
Dated 19/3/1907

My dear Chandra,

অনেক দিন পরে তোমার পত্র পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। তুমি যে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছ ইহা বড় সুখের বিষয়। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজে ভক্তি থাকিলে আর কিসের ভাবনা? তুমি তোমার নিজগুণেই শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতে স্বপ্নে মন্ত্র লাভ করিয়াছ। ইহা বড় কম ভাগ্যে হয় না। আমি যখন শ্রীশ্রীমহারাজকে চিঠি লিখিব তখন দুলালের বিষয় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিব। শুনিতেছি তিনি শীঘ্র ৺পুরিধামে গমন করিবেন। কারণ তাঁহার শরীর তত সুস্থ নয়।

তোমার প্রেরিত নূতন পঞ্জিকা প্রাপ্ত হইলাম। আমি মনে করিতেছিলাম যে তোমায় তজ্জন্য লিখিব, কিন্তু তুমি পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিয়াছ। যদি শ্রীযুক্ত উপেন মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এখানকার মঠের জন্য এক সেট্ শব্দকল্পদ্রুম পাঠাইতে পার তো বড় ভাল হয়। উপেন আমায় এক সেট্ দিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। তাহাকে এই বিষয় স্মরণ করাইয়া দিও। আমি আজকাল এখানে একা থাকায় তোমায় পত্রোত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে তজ্জন্য অপরাধ লইও না। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের কৃপায় এখানকার সকলই মঙ্গল। আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। তুমি ও দুলাল আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে। গিরিশবাবু প্রভৃতি ভক্তগণকে আমার অসংখ্য প্রণাম ও ভালবাসা জানাইবে। মঠের মহাত্মাগণকে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ ও ভালবাসা। ইতি

Yours affly.
রামকৃষ্ণানন্দ

উপেনকে আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানাইও। লাটুমহারাজকে পাও লাগে।

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ই. টি. স্টার্ডি

ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য

[ভাদ্র, ১৩৯০ সংখ্যার পর]

স্বামীজীর নির্দেশ অনুসারে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সমস্ত হিসাব আমেরিকায় স্বামীজীর কাছে পাঠিয়ে দেন। হিসাব পেয়ে স্বামীজী ২১ নভেম্বর[৩৭] স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখেন: 'হিসাব ঠিক আছে। আমি সে-সব মিসেস বুলের হাতে সঁপে দিয়েছি এবং তিনি বিভিন্ন দাতাকে হিসাবের [সংশ্লিষ্ট] বিভিন্ন অংশ জানানোর ভার নিয়েছেন।' অবশ্য স্বামীজীর উইম্বলডন থেকে লেখা চিঠি পেয়েই মিসেস বুল নিশ্চয়ই স্টার্ডিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, স্টার্ডির ধারণা ঠিক নয়। মিসেস বুলকে লেখা স্বামীজীর উত্তর থেকে একটা জিনিস বোঝা যায় যে, স্টার্ডি মিস মূলারের অভিযোগের অন্য অংশটি অর্থাৎ স্বামীজীর এবং তাঁর গুরুভাইদের মঠে বিলাসিতার প্রসঙ্গটি মিসেস বুলের কাছে তোলেননি। কারণ স্টার্ডি জানতেন, ঐ প্রসঙ্গ তুললেই মিসেস বুল তাঁর পুরো অভিযোগটিকেই বাতিল করে দেবেন। কারণ কয়েকমাস আগেই মিসেস বুল ভারত থেকে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন স্বামীজীরা কত বিলাসিতায় মঠে রয়েছেন! তিনি দেখেছেন, বাস্তবিক স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইদের কত কষ্ট, অসুবিধা এবং আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে মঠে থাকতে হয় এবং তাতে তাঁরা শুধু যে অভ্যস্ত তাই নয়, তাতে স্বেচ্ছায় তাঁরা সানন্দে অভ্যস্ত হতেই চেয়েছেন। যাই হোক, ইতিমধ্যে স্বামীজী ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় চলে এসেছেন। এবং স্বামীজী ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় পৌছনোর পর স্টার্ডি স্বামীজীর কাছে সরাসরি মুখ খুললেন।

স্বামীজী উইম্বলডন ছাড়ার পরেই নিবেদিতার সঙ্গে স্টার্ডির কিছু পত্রবিনিময় হয়। তাতে স্টার্ডির বক্তব্য ছিল স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে সন্ন্যাসিসুলভ কোন কৃচ্ছ্রতা ও বৈরাগ্যের কিছু-মাত্রও তিনি দেখেননি এবং স্টার্ডিসহ ইংলণ্ডের বন্ধুরা যে-টাকা স্বামীজীকে দিয়েছিলেন স্বামীজী সে-টাকা যথাযথভাবে খরচ করেননি। নিবেদিতা তার উত্তরে স্টার্ডিকে বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যে, স্টার্ডির সমস্ত ধারণা ভুল এবং তাঁকে ভুল বোঝানো হয়েছে। স্টার্ডি তখন স্বামীজীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের জন্য ব্যস্ত। সুতরাং নিবেদিতার সমস্ত যুক্তি ও ব্যাখ্যাকে তিনি অন্ধ ও অর্থহীন আবেগ বলে উড়িয়ে দিলেন।[৩৮] স্টার্ডির সঙ্গে এই পর্বে যে-সব পত্রবিনিময় হয়েছিল নিবেদিতা সেগুলি ম্যাকলাউড এবং মিসেস বুলকে পাঠিয়ে দিলেন। স্বামীজী তখন আমেরিকায় মিসেস লেগেটদের পল্লী-আবাস রিজলি ম্যানর-এ। ম্যাকলাউড পত্রগুলি স্বামীজীকে দেখতে দিলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর স্বামীজী স্টার্ডিকে একটি চিঠি দিলেন।[৩৯] তাতে লিখলেন: '...তোমার এবং মিস নোবলের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়েছে তার

৩৭ দেখা যাচ্ছে, ১০ অগস্ট থেকে ২১ নভেম্বর—মোটামুটি তিন মাসের কিছু বেশি সময় লেগেছিল মঠ থেকে হিসাব আমেরিকায় আসতে। সে-সময় ভারত থেকে ওদেশে জাহাজে ডাক যাতায়াতে মাস দেড়েকের মতো সময় লাগত। সুতরাং স্বামীজীর চিঠি আসার পর মঠ থেকে পাঠানো হিসাব আমেরিকায় পৌছতে কম-বেশি তিন মাস সময় লাগা ছিল স্বাভাবিক।

৩৮ 'Second Visit', pp. 71-75; Letters of Sister Nivedita, pp. 203-205, 291-292 ৩৯ 'Second Visit', pp. 78-80.

কিছু আমাকে সেদিন দেখতে দেওয়া হয়েছিল। আমি দুঃখিত যে, আমরা তোমার আদর্শের যোগ্য হতে পারিনি।…

'মিসেস [অ্যাস্টন] জনসনের মতে ধার্মিক ব্যক্তির অসুখ হওয়া উচিত নয়। এখন আবার তাঁর মনে হচ্ছে, আমার ধূমপানাদিও পাপ। মিস মূলারেরও আমায় ছেড়ে যাওয়ার কারণ ঐ—আমার অসুস্থতা। হয়তো তাঁরাই ঠিক। তুমিও জানো, আমিও জানি, আমি যা আমি তাই। ভারতে অনেকে এই দোষের জন্য এবং ইওরোপীয়-দের সঙ্গে আহার করার জন্য আপত্তি জানিয়েছেন, ইওরোপীয়দের সঙ্গে খাই বলে আমায় একটি পারিবারিক দেবালয় থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। আমার তো ইচ্ছা হয়, আমি এমন নমনীয় হই যে, প্রত্যেকের ইচ্ছানুরূপ আকারে গঠিত হতে পারি; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এমন লোক তো আজও দেখলাম না, যে সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। বিশেষতঃ যাকে বহু জায়গায় যেতে হয়, তার পক্ষে সকলকে তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

'আমি যখন প্রথম আমেরিকায় আসি, তখন ট্রাউজার না পরলে লোকে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করত; তারপর আমাকে কাফ এবং কলার পরতে বাধ্য করা হল—তা না হলে তারা আমাকে ছুঁতই না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তারা আমাকে যা খেতে দিত তা না খেলে আমাকে একটা আজব জীব মনে করত। এমনি আরো সব।'

এরপর তাঁকে কাজের জন্য যে-অর্থ দেওয়া হয়েছিল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বামীজী তারও পূর্ণাঙ্গ হিসাব দিলেন স্টার্ডিকে। লিখলেন: 'আমি শুনছি, তোমরা আমাকে যে-টাকা দিয়েছিলে সে-সম্পর্কেও কথা উঠেছে। মিস মুটারের কাছ থেকে আমি ৫০০ পাউণ্ড=৭৫০০ টাকা+৫০০ পাউণ্ড=৭৫০০ টাকা পেয়েছি। গুডউইনের মাধ্যমে মিস মূলার দিয়েছিল ৩০,০০০ টাকা। সর্বমোট ৪৫,০০০ টাকা। [এছাড়া] মিস মূলার আমাদের [মঠের] একখণ্ড জমি কিনতে সাহায্য করেছেন যার দাম পড়েছে ৪০,০০০ টাকা। নৌকা মেরামতের জন্য ব্যবহৃত হত বলে জমিটি ছিল অসমতল এবং ওখানে ছিল বড় বড় গর্ত—সে-সব ভরাট করার জন্য লেগেছে ৪,০০০ টাকা। জমিটির উপরে আমাদের একটি বাড়ি আছে—বড় কিছু নয়। আর আছে উপাসনা কক্ষ, লাইব্রেরী, ইত্যাদি। এসবের খরচ যুগিয়েছেন আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা এবং আমেরিকার মিসেস বুল। জমি সংগ্রহ এবং বাড়িঘর নির্মাণ প্রভৃতিতে যে টাকা খরচ হয়েছে তা ইংরেজ বন্ধুদের দেওয়া টাকার চেয়ে বেশি। হাওড়া জেলার রেজিস্ট্রারের কাগজপত্র দেখলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা জানা যাবে। কাজের জন্য আমাকে যেখান থেকে যা টাকা দেওয়া হয়েছে তার একটা পাই-ও আমি নিজের জন্য খরচ করিনি। আমেরিকায় আমার ব্যক্তিগত খরচাপাতির টাকা আমার বক্তৃতা অথবা পত্রিকায় লেখা থেকে সংগ্রহ করেছি। মিসেস সেভিয়ার এবং খেতড়ির রাজা কিছু কিছু অর্থ দিতেন যাতে ভারতে আমার নিজের খরচ চলে যেত। ইংরেজ বন্ধুগণ আমাকে যে-টাকা দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি পাই-এর হিসাব রাখা আছে। যখনই প্রয়োজন মনে করবে, তখনই তোমাকে তা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমাকে কাশ্মীরের মহারাজার দেওয়া টাকা, মাদ্রাজে প্রকাশিত আমার বই-এর টাকা এবং বেশির ভাগটা তার নিজেরই টাকা থেকে মিস নোবল স্কুল আরম্ভ করেছিল।…

'তোমাকে কি কখনও আমাকে টাকা দেওয়ার জন্য আমি লিখেছি? কোথাও কারও কাছে অর্থসাহায্য চেয়েছি বলে তো আমার মনে পড়ে না। [এই 'কারও কাছে'র বিরল ব্যতিক্রম শুধু

শিষ্য হরিপদ মিত্র এবং খেতড়ির রাজা অজিত সিংহ—যাঁদের কাছে স্বামীজী নিজের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন না] স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কেউ আমাকে [অর্থ] সাহায্য করলে আমি তা নিয়েছি, যখন তা আমার নিজের প্রয়োজনে খরচ করার জন্য দেওয়া হয়েছে তা আমি খরচ করেছি—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যের জন্য ; কাজের জন্য অর্থ দিলে তা কাজের জন্যই ব্যয়িত হয়েছে।...

'অবশ্য এ আমার কর্মফল—আর এতে আমি খুশিই। কারণ এতে সেই সময়ের জন্য যন্ত্রণা হলেও এ জীবনের আর এক ধরনের অভিজ্ঞতা যা এ-জীবনে অথবা পরজীবনে কাজে আসবে।

'যদি তোমার অথবা মিস মূলারের অথবা মিস স্টারের আমাকে আমার কাজের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে অনুশোচনা হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে শুধু [কিছুদিন] সময় দাও, আমি তা পরিশোধ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।...

'আমি সর্বদা জানি এবং সর্বদা প্রচার করে এসেছি, প্রত্যেক আনন্দের পশ্চাতে আসে দুঃখ—চক্রবৃদ্ধি সুদ সমেত না হলেও আসলটা তো আসবেই। আমি জগতের কাছে প্রচুর ভালবাসা পেয়েছি, সুতরাং প্রচুর ঘৃণার জন্যও আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর এতে আমি খুশিই—কারণ আমার নিজের জীবনেই আমার এই মতবাদ প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক চড়াইয়ের সঙ্গেই থাকে তার অনুরূপ উৎরাই।

'আমার দিক থেকে আমি আমার স্বভাব ও নীতিতে সব সময় অবিচল থাকি—একবার যাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি সে সব সময়েই আমার বন্ধু এবং ভারতীয় নীতি অনুসারে আমি বাইরের ঘটনাবলীর কারণ আবিষ্কারের জন্য অন্তরেই দৃষ্টিপাত করি। আমি জানি যে, আমার উপর এত বিদ্বেষ ও ঘৃণার তরঙ্গ এসে পড়ে, তার জন্য দায়ী আমি এবং শুধু আমিই। এছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। তুমি এবং মিসেস জনসন যে আরেকবার আমাকে অন্তর্মুখী হবার জন্য অবহিত করেছ, সেজন্য তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সতত স্নেহবদ্ধ এবং শুভাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ'

আমরা লক্ষ্য করে এসেছি স্টার্ডি এতদিন স্বামীজীকে সরাসরি কিছু বলতে পারেননি। তবে বলার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছিল না। নিবেদিতাকে তিনি লিখেছিলেন: 'আমি রোজই ভাবছি কিভাবে আমি স্বামীজী সম্পর্কে আমার আশাভঙ্গের কথা তাঁর গোচরে আনি।'[৪০] অবশেষে আমরা দেখলাম, নিবেদিতার পাঠানো চিঠিপত্র ম্যাকলাউড স্বামীজীর হাতে তুলে দেওয়ায় স্বামীজী নিজে থেকেই স্টার্ডিকে তাঁর সমস্ত অভিযোগের সুনির্দিষ্ট উত্তর দিলেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁর চিঠিতে স্টার্ডিকে দোষারোপ না করে মহান ঔদার্যের সঙ্গে লিখলেন: এই দুর্নাম তাঁরই ললাটলিপি। স্টার্ডি স্বামীজীর ঐ চিঠির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ধরেই নিলেন এর আগে নিবেদিতা স্বামীজীর সমর্থনে তাঁকে [স্টার্ডিকে] যা লিখেছিলেন তা লিখেছিলেন স্বামীজীর পরামর্শক্রমেই। স্টার্ডি দেখলেন, তাঁর সমস্ত অভিযোগের উত্তর স্বামীজী দিয়েছেন। তিনি যখন দেখলেন, ইংলণ্ড থেকে যে-টাকা স্বামীজীকে কাজের জন্য দেওয়া হয়েছিল তা যথাযথভাবেই খরচ করা হয়েছে এবং 'কাজের জন্য দেওয়া' টাকার কোন অংশই কাজের জন্য ছাড়া

৪০ Ibid. p. 71.

অন্য কোনভাবে খরচ করা হয়নি, তখন স্টার্ডি একটু মুশকিলেই পড়লেন। কিন্তু তখন তিনি কোমর বেঁধে ঝগড়া করার জন্য বদ্ধপরিকর। তাই বললেন, তাহলে হিসাব কেন দাতাদের কাছে পাঠানো হয়নি। স্বামীজী যে ঔদার্য দেখিয়েছিলেন তার কোন মূল্য না দিয়ে স্টার্ডি অত্যন্ত রূঢ়ভাষায় স্বামীজীকে আক্রমণ করলেন। তাঁর ১ অক্টোবরের চিঠিতে স্টার্ডি বললেন, স্বামীজী নিজে প্রচার করেছেন বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রতার কথা। কিন্তু তিনি নিজে এবং লণ্ডনে তাঁর গুরুভাইরা (স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ) যাপন করেছেন চরম বিলাসীর জীবন। এককথায়, স্টার্ডি বললেন, স্বামীজী এবং গুরুভাইরা যথার্থ সন্ন্যাসী নন, সন্ন্যাসের ভেকধারী। স্বামীজী উত্তর দিলেন। স্টার্ডির স্পর্ধায় তিনি আহত ও বিস্মিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই

স্বামীজী বুঝলেন যে, স্টার্ডি আসলে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের যবনিকা টানতে চাইছেন। সম্পর্ক যখন শেষ করবেনই স্টার্ডি তখন তা যতটা শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় তার চেষ্টা করলেন স্বামীজী। স্টার্ডি ভুল করছেন, স্টার্ডি উন্মাদ হয়েছেন, কিন্তু স্বামীজী তাঁর স্বভাবজাত মহিমা ও ক্ষমাকে তো বিসর্জন দিতে পারেন না। তিনি যে একসময় স্টার্ডিকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর প্রশস্ত উদার বক্ষে। তাই স্টার্ডির আক্রমণকে উপেক্ষা করে এবং আর তিক্ততা বৃদ্ধি না করে ঐ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাইলেন স্বামীজী। ভাবলেন, এতে হয়তো স্টার্ডি শান্ত হবেন। পরম ক্ষমায় স্বামীজী স্টার্ডিকে লিখলেন (অক্টোবর ১৮৯৯):

'হয়তো তোমার সমালোচনার অনেকখানি অংশ সঙ্গত ও সত্য। আবার এও সম্ভব, একদিন তুমি দেখবে এ-সকলই কারো কারো সম্পর্কে [নিবেদিতা প্রভৃতি] তোমার বিরাগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, আর আমি হয়েছি তার শিকার।

'যাই হোক, এসব নিয়ে তিক্ততার প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমি যা নই, তার ভান কখনও করেছি বলে মনে পড়ে না। আর তা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমার ধূমপান, বদমেজাজ ইত্যাদি, আমার সঙ্গে যে-কেউ ঘণ্টা খানেক কাটালেই জানতে পারবে। "মিলন-মাত্রেরই বিচ্ছেদ আছে"—এই হল প্রকৃতির নিয়ম ; আশাভঙ্গের কোন মনোভাব আমি বয়ে নিয়ে বেড়াই না। কর্মই আমাদের মিলিয়ে দেয়, আবার কর্মই বিচ্ছিন্ন করে।'

হিসাব কেন পাঠানো হয়নি তার উত্তরে স্বামীজী লিখলেন: 'হিসাবপত্র আগে পাঠানো হয়নি—তার কারণ কাজ তো এখনও শেষ হয়নি। সমস্ত ব্যাপারটা হয়ে গেলে দাতার কাছে সম্পূর্ণ হিসাব পেশ করব, ভেবেছিলাম। টাকার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার ফলে কাজ মাত্র গত বছর শুরু হতে পেরেছে।' স্বামীজীর জন্য স্টার্ডিকে মানসিক অশান্তি ও যন্ত্রণাভোগ করতে হয়েছে বলে স্বামীজী নিজেকেই দোষী বললেন। আর সব শেষে আশীর্বাদ করলেন শিষ্যকে যেমন করতেন আগে, না তার চেয়েও বেশি: 'সমস্ত আশীর্বাদ তোমাকে এবং তোমাদের সকলকে চিরকাল ঘিরে থাকুক—এই বিবেকানন্দের নিরন্তর প্রার্থনা।'[৪১]

বিবেকানন্দ শিষ্যের প্রগলভতাকে হজম করতে চেয়েছিলেন। যদিও শিষ্যের বিশ্বাসঘাতকতার সেই আঘাত তাঁর হৃদয়কে রক্তাক্ত করেছিল। কিন্তু স্বামীজীর সেই উদার ক্ষমাকে স্টার্ডি কোনও মূল্য না দিয়ে, আরও আক্রোশ নিয়ে, আরও অপমানকর ভাষায়, স্বামীজীকে

৪১ Ibid pp. 84-85

পুনরায় আক্রমণ করলেন (৩ নভেম্বর, ১৮৯৯)। স্বামীজী দেখলেন স্টার্ডি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। যদি স্বামীজী তাকে আর প্রশ্রয় দেন তাহলে অসত্যের সঙ্গে আপস করা হবে। কারণ মরিয়া হয়ে স্টার্ডি এবার যে-সব অভিযোগ এনেছিলেন সেগুলি ছিল তাঁর উদ্ভট কল্পনা-প্রসূত। স্টার্ডি লিখলেন, ইংলণ্ডে স্বামীজীর কাজ যে নষ্ট হয়ে গেছে তার জন্য দায়ী স্বামীজীর নিজেরই আচরণ—স্টার্ডির ব্যাখ্যায়, স্বামীজীর ধূমপান, বিলাসিতা প্রভৃতি। নিজের ব্যর্থতা এবং অপদার্থতার গ্লানি গোপন করে স্বামীজীর উপরে তা চাপিয়ে দিয়ে স্টার্ডি নিজেকে নির্লজ্জ-ভাবে দায়মুক্ত করতে চাইছিলেন। স্টার্ডি লিখলেন যে, স্বামীজী লণ্ডনে থাকতে তাঁর এবং তাঁর গুরুভাইদের বিলাসিতা নিয়ে তীব্র সমালোচনা হত—এমন কি সমালোচনা এসেছে স্বামীজীর বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছ থেকেও। এবং সমালোচকদের কাছে স্বামীজীর আচরণের পক্ষে ওকালতি করার জন্য স্টার্ডিকে তখন সর্বদাই অনেক মিথ্যা সাফাই গাইতে হত। স্টার্ডির এই অভিযোগগুলি নির্ভেজাল মিথ্যা। কারণ স্বামীজী লণ্ডনে যখন ছিলেন তখন স্টার্ডি যা বলেছিলেন আমরা তা আগে দেখেছি (উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৮৯, পৃঃ ৪৫)। 'বিলাসী' বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আছেন তখন একটি চিঠিতে ইংলণ্ড স্বামীজীকে কিভাবে গ্রহণ করেছিল সে-সম্পর্কে স্টার্ডি লিখেছিলেন (২২ অক্টোবর, ১৮৯৬): 'এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বামী বিবেকানন্দের মতো বেদান্ত-প্রবক্তার প্রভাব যদি বজায় রাখা এবং বিস্তারিত করা যায়, তাহলে তা পাশ্চাত্য-জগতের চিন্তাধারাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করবে—সম্পদ এবং বিলাসের প্রতি দারুণ লালসায় আত্মবিস্মৃত তাদের মনের গতি পরিবর্তনে সহায়তা করবে।' আর ইংলণ্ড থেকে স্বামীজীর ভারতে ফেরার প্রাক্‌কালে ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬ লণ্ডনে স্বামীজীকে যে বিরাট বিদায়-সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল (যে সভায় স্টার্ডি ছিলেন সভাপতি) তার বর্ণনা দিয়ে তিন-দিন পর ১৬ ডিসেম্বর স্টার্ডি তাঁর এক আমেরিকান বন্ধুকে লেখেন: 'তোমার ধারণা ঠিকই। আমার জীবনের মহত্তম বন্ধু ও পবিত্রতম শিক্ষককে বিদায় দিয়ে আজ আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। আমি নিশ্চয়ই গত জীবনে অসাধারণ কোন শুভ কর্ম করেছি যার জন্য এমন পুণ্য-সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি সারাজীবন ধরে যা চেয়েছি—সে-সমস্তরই পরিপূর্তি দেখেছি স্বামীজীর মধ্যে।' এবং স্বামীজী যখন লণ্ডন থেকে সত্যিই বিদায় নিচ্ছেন (১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৬) তখন কি করেছিলেন স্টার্ডি? স্টার্ডি সরলভাবে নিঃসঙ্কোচে মিস্ ম্যাকলাউডকে লিখেছিলেন: 'আমি স্বামীজীর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম।' [ক্রমশঃ]

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিবেকানন্দ-চিন্তায় উদ্বোধিত হয়ে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ একাই যে বিভিন্ন কবিতায় তাঁকে প্রতিফলিত করেছেন তা নয়। রবীন্দ্র-সমকালীন কবিগোষ্ঠীর অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনা করেছেন এবং এর আলোচনায় বাংলা কবিতার একটা স্বতন্ত্র রূপ ধরা পড়ে। রবীন্দ্র-সমকালীন কবিগোষ্ঠীর অনেকেই, যেমন যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫), নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬৫) প্রভৃতি, কবিতা রচনা করেছেন। তাছাড়া নরেন্দ্রদেব, দিলীপ রায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বনফুল' প্রভৃতির কবিতা তো আছেই।

গিরিশচন্দ্র বিবেকানন্দ সম্পর্কে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে দুটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। দুটির মধ্যে একটি অর্থাৎ দ্বিতীয়টি কবিতার নিজস্ব প্রাণধর্মে উদ্দীপিত।—

কে রে এ নরেন্দ্রবর বীরেশ্বর দেহধারী।
সিদ্ধ মহাবিদ্যাবলে অবিদ্যাবিনাশকারী॥
তমসাচ্ছন্ন বসুমতী, হেরি কি ব্যথিত যতি,
বিলাইতে জ্ঞান-জ্যোতি, কে এনেছে সহাকারী॥

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'বিবেকানন্দ' কবিতায় বিবেকানন্দের দীপ্ত ব্যক্তিত্ব, প্রেমময় স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে—

কণ্ঠে যাঁহার বাণীর বিকাশ বিদ্যুৎময়ী বজ্র ধরা,
মহাভারতের নূতন বেদের সৃষ্টি যাঁহার মন্ত্র ভরা;
বক্ষে যাঁহার প্রেমসাধনার অমৃত উৎস উৎসারিত,
চক্ষে দীপ্ত আত্মার জ্যোতি পৌরুষময়ী অতন্দ্রিত।

যতীন্দ্রমোহন বা:চীর ভাষায়—তিনি একাধারে গৃহী-সন্ন্যাসী, কর্মে অধীর, ধর্মে ধীর; তাঁর দিশাহারা চোখে একালের ভারতের দিগ্‌দর্শন— বিবেকানন্দের চিন্তাই পীড়িত ভারতের মুক্তির পথ—এই 'চিন্তা' কবিতাটিতে ব্যক্ত হয়ে মানব-মহিমার চিরন্তন মর্যাদার জয়গান করেছে।

তবে এই পর্বে কবিরা প্রধানতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উদ্বোধিত; স্বামীজীর চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কবিতায় মানবিক আদর্শের স্বরূপই প্রকাশিত। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র পরমাদর্শ কুমুদরঞ্জনের 'স্বামীজী বিবেকানন্দ' কবিতায় ব্যক্ত—'সেবাই যে পূজা, সেবাই ধর্ম / দরিদ্র ভগবান / সকল মানুষ অমৃত পুত্র / সকলে সমান জ্ঞান / লাঞ্ছিত যারা ধিক্কৃত যারা সম্বলহীন যারা সবহারা / তুচ্ছ তো নহে, তারা দয়ালের / সব প্রিয় সন্তান।'

বিবেকানন্দ-চেতনায় উদ্বোধিত হয়েই কবি লেখেন—'এই দেশ হায় সামান্য নয় / প্রতি ধূলি-কণা অমৃতময় / প্রতি শিলা এর প্রতি কঙ্কর / শঙ্কর পরমেশ।' এর পটভূমিকায় স্বামীজীর সেই অমোঘ-বাণীর সমুদ্রস্পন্দন—'বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, / ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।'

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অমর হয়ে থাকবেন স্বামী বিবেকানন্দের 'Kali the mother' কবিতাটির অনুবাদের জন্য। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এর অনুবাদ করেছেন—'মৃত্যুরূপা মাতা' নামে।—

নিঃশেষে নিভেছে তারাদল,
মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,
স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার,
গরজিছে ঘূর্ণবায়ুবেগ।...

অনুবাদের নিজস্ব কাব্য সার্থকতার এমন উদাহরণ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে দুর্লভ বললে অত্যুক্তি হয় না। সত্যেন্দ্রনাথের 'আমরা' কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাবের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়—

১. শ্মশানের বুকে আমরা রোপন
করেছি পঞ্চবটী
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব
জগতের শতকোটি।

২. বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী
ছুটেছে জগৎময়।

সত্যেন্দ্রনাথের 'মেথর' কবিতাটি বিবেকানন্দের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র আদর্শে উদ্বোধিত কবিতা।

মোহিতলাল মজুমদারের 'স্মরণ' কবিতাতে বিবেকানন্দের ভাব-সাধনার রূপই প্রকট।—

জ্ঞান-ভক্তি-কর্মবীর উদাসীন প্রেমিক উদার,
ইহ-পরত্রের বন্ধু, রথিশ্রেষ্ঠ সংকট সমরে—
হে সংযমী, যমভয় ভীত জনে অন্তিম প্রহরে,
দানিলে অভয়-দীক্ষা, ব্রহ্মবিদ! চরিত্রে তোমার।

কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁর 'বিবেকানন্দ' কবিতায় বিবেকানন্দের কর্ম ও জীবনসাধনার উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন—

যে অনল তুমি জ্বালিয়া গিয়াছ উদীয়ণ
করি শ্রুতি।
আহিতাগ্নিক, সে অনলে তুমি দিয়াছ
আত্মাহুতি।

নিভেনি আজিও যে যাগানল
লভিছে নিত্য সমিধের ফল
জড়তা শৈত্যে প্রাণে পাই তার সে অনুভূতি।

নজরুল ইসলাম তাঁর 'শ্রীবিবেকানন্দ বন্দনা' কবিতায় যেমন প্রত্যক্ষ বন্দনাকেন্দ্রিক বক্তব্য উচ্চারণ করেছেন, তেমনি তাঁর সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, বারাঙ্গনা, নারী, কুলি-মজুর প্রভৃতি কবিতায় বিবেকানন্দের সাম্যবাদী চিন্তার আশ্চর্য প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ধর্মের নামে ভণ্ডামি, মানুষের প্রতি অপমান বিবেকানন্দ যেমন সহ্য করতে পারতেন না, নজরুল ইসলামের কবিতাতেও সেই সুর প্রতিধ্বনিত—

১. গাহি সাম্যের গান / মানুষের চেয়ে
বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

২. শোনো মর্তের জীব / অন্যেরে যত
করিবে পীড়ন নিজে হবে তত ক্লীব।

৩. সকল কালের সকল দেশের সকল
মানুষ আসি
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো এক
মিলনের বাঁশী।

—প্রভৃতি অজস্র উদ্ধৃতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় স্বামীজীর সাম্যবাদী চিন্তা, অন্যায়ের বিরোধিতা আর সর্বধর্মমহাসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, দিলীপকুমার রায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বনফুল' বিবেকানন্দ-আদর্শে উদ্বোধিত হয়ে কবিতা রচনায় ব্রতী হয়েছেন। সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ 'মানুষের ঠাকুরালি' রূপে প্রকাশিত—

এপারে দাঁড়ায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমগ্ন মন
বিবেকানন্দ ওপারে দাঁড়ায়ে করিছে নিরীক্ষণ
নরদেহে আজ নারায়ণ যেন হলেন আবির্ভূত
সকল সাধনা সব আরাধনার আধারে মন্ত্রপূত।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিবেকানন্দ' কবিতাতে মৃত্যুভীত মানুষের আর্তকোলাহলে নরনারায়ণের চির জাগরূক মূর্তি—

ক্লিষ্ট মানুষের বক্ষোমাঝে
সম্মুখে সে দেখালো ঈশ্বর॥
আজি তাঁর বাণী ভেসে আসে
শতবর্ষ অতীতের পার

হতে, অন্ধকারে নিদ্রাঘোরে। প্রশ্ন করি
কণ্ঠস্বর কার?
দিগন্ত উত্তর দেয়, ভারতের তপস্যায়
জাগরণ ছন্দ
সঞ্জীবনী হোম, ঋষি রামকৃষ্ণ—হোতা
যে বিবেকানন্দ।

'বনফুল' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) বিবেকানন্দের উদ্দেশে ও তাঁর ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে বহু কবিতা রচনা করেছেন। তার মধ্যে দুটি কবিতা স্মরণীয়—'হে বিবেকানন্দ' এবং 'এখন একমাত্র সাধনা হোক্'। 'হে বিবেকানন্দ' কবিতাটিতে আমরা বর্তমানে বিবেকানন্দ-আদর্শ থেকে যে ভ্রষ্ট হয়েছি তারই বেদনা তীব্র বিদ্যুৎ রেখায় যেন প্রকাশিত। বনফুলের কাছে স্বামীজী 'ভারতবর্ষের আত্মার অভিব্যক্তি।' কিন্তু সেই ভারতাত্মার অভিব্যক্তিকে প্রণাম জানাবার যোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি কিনা—এ বিষয়ে সংশয় আছে। তাই তিনি 'এখন একমাত্র সাধনা হোক্' কবিতায় উচ্চারণ করেন—

আজ তাঁকে প্রণাম করি
প্রণাম করি দক্ষিণে-বামে সম্মুখে-পশ্চাতে,
প্রণাম করি সর্বান্তঃকরণ দিয়ে।
মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—
তাঁকে প্রণাম করবার যোগ্যতা অর্জন
করেছি কি?

শুধু যে রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-সমকালীন কাব্যে বিবেকানন্দ তাঁর ভাবাদর্শে দীপ্ত ব্যক্তিত্বে প্রোজ্জ্বল তাই নয়; রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার যুগও, যাকে আধুনিক যুগ অভিধায় চিহ্নিত করা যায়, স্বামী বিবেকানন্দের সর্বাতিশায়ী প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তি-বিবেকানন্দ বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অন্যতম ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

যে জীবনানন্দকে রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার অগ্রজ কবিরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই জীবনানন্দের অন্যতম কবিতা 'বিবেকানন্দ'। কবিতাটি দীর্ঘ; 'ঝরাপালক' কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে আবির্ভূত স্বামীজীর জীবনসাধনায় সমগ্র ভারত বা এশিয়ার বোধ হয় সমগ্র পৃথিবীর মুক্তির মন্ত্র নিহিত আছে—

জয়—তরুণের জয়।
আত্মাহুতির রক্ত কখনো আঁধারে হয় না লয়।
তাপসের হাড় বজ্রের মতো বেজে ওঠে
বার বার
নাহিরে মরণে বিনাশ—শ্মশানে নাহি তার
সংহার,
দেশে দেশে তার বীণা বাজে—বাজে কালে
কালে ঝংকার।

১৯০২ থেকে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে কবিরা জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অনুপ্রেরিত হয়ে কবিতা রচনা করেছেন। মনীশ ঘটক, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বন্দে আলী মিঞা, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুশীল রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নচিকেতা ভরদ্বাজ, আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সামসুল হক, শান্তনু দাস প্রভৃতি আধুনিক কবিগোষ্ঠীর কেউই বিবেকানন্দ প্রভাব অতিক্রম করতে পারেননি আসলে সূর্যপ্রভ দীপ্তিতে মানবপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হৃদয়াসনে আসীন বলে তাঁকে অতিক্রম করার চেষ্টা মূঢ়তামাত্র। হয় অচেতন বা সচেতন ভাবে কবিদের তাঁকে কবিতার রাজ্যে বরণ করে নিতে হয়। এই পর্বের কবিদের লেখনীতে স্বামী বিবেকানন্দের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব নানা রূপছবি

উদ্ভাসিত। মনীশ ঘটকের 'বিবেকানন্দ' কবিতায় পৌরুষদীপ্ত মানবপ্রেমিকের রূপ প্রকাশিত—

শৌর্যে সেবায় অসি ও অশ্রু ঝলেছিল একাধারে
শতাব্দী শেষে ফিরে চায় দেশ সেই নরদেবতারে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্বামীজীর মানবসেবার আদর্শে উদ্বোধিত—

সে ঈশ্বর আশে পাশে সর্বকালে মানুষের মুখে,
অনন্তই অবিভক্ত অভিব্যক্ত রাজা ও ভিক্ষুকে।
দাও সিদ্ধি জীবপ্রেম, প্রত্যেকেরে প্রত্যক্ষীকরণ
সে ঈশ্বর আমি তুমি আপামর জনসাধারণ।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ—

মহাকালের ত্রিনয়নে তমোবিদার বহ্নি ছিল
মৃত্যুমলিন মৃত্তিকাতে সেই পাবক-ই জন্ম নিল।

বিমলচন্দ্র ঘোষের 'বীরসন্ন্যাসী' কবিতার দীপ্তরৌদ্র-রসে ভরা বিবেকানন্দ-জীবনসাধনার এক আশ্চর্য ছন্দোরূপায়ণ—

পূর্বাশার তমসার অন্ধকার ফুঁড়ে
হে জ্বলন্ত সূর্যসিংহ শাণিত নখরে
মোহজাল বিদারণে রক্ত মেঘচূড়ে
দাঁড়ালে গর্বিত শির হিমাদ্রি শিখরে।

একালের আর এক কবি হরপ্রসাদ মিত্র যখন উচ্চারণ করেন—'এ মাটি মধুর হোলো, এই দেশ অনন্তের দিশা'—তখনই মনে হয় বিবেকানন্দের সেই বাণী যুগযুগান্তর পেরিয়ে এখনও মন্দ্রিত হয়—'বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ।' কিভাবে পরমচৈতন্যসত্তা শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্পর্শে নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ হলেন তারই এক অনুভূতিলব্ধ বাণীমূর্তি হরপ্রসাদ মিত্রের 'বিবেকানন্দ' কবিতাটি—

নরেন্দ্র-নিহিত দীপ্তি পরিণত বিবেক-জ্যোতিতে
কী হলো, কীভাবে হোলো—জানি না কী
অজানা বিধিতে
জানি না মর্ত্যের মাটি কোন তাপে সূর্য
হয়ে জ্বলে,
জানি না বুদ্ধির বাঁধ কী রহস্যে গঙ্গা হয়ে গলে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'মাটি ও মানুষে' কবিতাতে যেন স্বামী বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি' কবিতার প্রতিধ্বনি করেছেন—

যার জন্যে এত আর্তি যার জন্যে
এত হাহাকার,
মাটি ও মানুষে মূর্ত—তাই রয়েছে সম্মুখে
আকার।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে 'অগ্নি এবং শান্তিজল'।—

তুচ্ছ উপবীত যজ্ঞ, পূজাপাঠ স্তুতি মন্ত্রধ্বনি
সমস্ত গৌরব এসে মানুষের মন্দিরে লেগেছে
তীরে যেন নৌকা, যেন স্নেহপাশ, বন্ধন মাটির
তুমি হৃদয়ের কাছে মেধা ও মর্যাদা দীর্ঘ করে
রেখেছিলে, হে ভারতী অগ্নি তুমি,
শান্তিজল তুমি।

অমিতাভ দাশগুপ্তের কাছে বিবেকানন্দই আনন্দ। জীবন যখন ক্ষতবিক্ষত, বিবর্ণ তখনই স্মৃতির পাতা হাতড়ে কবির চোখে ভেসে ওঠে 'বিবেক' নামটি; কবি তাঁর 'আনন্দ কার নাম' কবিতায় সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবেকানন্দের কাছেই শেষ আশ্রয় অন্বেষণ করেন—

তোমার চিবুক, ক্ষিপ্র চোখের দ্যুতি
দুহাত দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে
এখন কেমন অবলীলায়
নষ্ট, বিশাল মানুষ, সেরা গোলাম হলাম,
স্বপ্নে বিপুল তৃষ্ণা এলে
হঠাৎ তবু হাতড়ে ফিরি—
আনন্দ কে? আনন্দ কার নাম?

গুরু নানক

অধ্যাপক রেজাউল করীম

পাঞ্জাবের পথ দিয়ে একদিন ভারতবর্ষে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাঞ্জাব প্রদেশ মুসলিম শাসনাধীনে ছিল। পাঞ্জাবের নগরে গঞ্জে গ্রামে বহু মুসলিম সাধুসন্ত, ফকির ও দরবেশ বসবাস করতেন ঐকালে। পানিপথ, মুলতান, সিরহিন্দ, পাক পাটান—এই সমস্ত অঞ্চলে বহু শেখ ও সুফী তাঁদের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন কাটিয়েছিলেন। এই সুফীদের কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যথা—বাবা পীর ফরীদ, আলাউল হক, জয়নুদ্দিন বোখারী, মখদুম জাহালিয়ান, ইসমাইল বোখারী। এই সব সাধক ও ফকিরগণ তাঁদের ধর্ম ও নিষ্ঠার জন্য সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তাঁরা সাধারণ মানুষের মনে এমন একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেন, যার প্রভাবে বিভিন্ন আদর্শ ও কর্মের মধ্যে একটা মৈত্রী এবং বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়-সাধন সম্ভব হয়েছিল। এই প্রকার উদারতা ও সমন্বয়ের পরিবেশে মহাত্মা গুরু নানকের আবির্ভাব হয়েছিল।

পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার শারাকপুর তহসিলের অন্তর্গত তালওয়ান্দ গ্রামে গুরু নানকের জন্ম হয়। এই গ্রামটি ইরাবতী (Ravi) নদীর তীরে অবস্থিত। নানক ছিলেন ভাটি রাজপুত বংশসম্ভূত। রায় বুলার ছিলেন এই গ্রামের জমিদার। এই জমিদারের একজন হিসাব-পরীক্ষক ছিলেন, তিনি ছিলেন বেদীক্ষত্রি-বংশের লোক। তাঁর নাম ছিল মেহতা কালুচাঁদ। গ্রামের সকল শ্রেণীর লোক এই হিসাব-পরীক্ষককে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। জমিদার রায় বুলারের তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন কর্মচারী। খৃষ্টীয় ১৪৬৯ সালে এই মেহতা কালুচাঁদের ঘর উজ্জ্বল করে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর বংশের পুরোহিতগণ এই নবজাত শিশুটির নাম রাখলেন "নানক"। তখনকার যুগে অনেক হিন্দু ও মুসলমানের সাধারণ নাম "নানক"। বাল্যকালেই ছেলেটি তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগল। সাত বছর বয়সের সময় তাঁকে হিন্দী শিক্ষার জন্য একটি হিন্দী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। এবং আরও তিনবছর পরে তাঁর সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। কিছুদিন পরে ফারসী ভাষা শিক্ষার জন্যও একটি ফারসী স্কুলে তাঁকে প্রেরণ করা হল। হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলিম মৌলবীর নিকট শিক্ষালাভের ফলে তাঁর কতটা লাভ হয়েছিল, তা বলা কঠিন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর পিতা চেয়েছিলেন যে, ছেলেকে এমন শিক্ষা দেবেন যেন সে সরকারী চাকরী বা কাজকর্ম করতে পারে। যাহোক নানক হিন্দী ও ফারসী ভাষায় কাজ চলার মতো শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি ভাল লেখাপড়া শিখতে পারবেন না মনে করে, তাঁর পিতা চেষ্টা করতে থাকলেন, বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের বাইরে অন্যান্য নানা বিভাগে তাঁকে শিক্ষিত করে তুলতে। প্রথমে কৃষিকাজ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হল তারপর গোপালন, তারপর দোকানদারীর এই ধরনের আরও নানা কাজে তাঁকে নিযুক্ত করা হতে থাকল। কিন্তু কোন ফল হল না। যে মহান ব্যক্তিকে একটি বিরাট জাতি গঠনের কাজ করতে হবে, তিনি কি ঐ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন? নানক অন্য কাজের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি কি দোকানদারী আর মাল বিক্রয়ের কাজে আপন প্রতিভাকে নিয়োগ করতে পারেন?

জগতের অনেক মহাপুরুষের মতো তিনিও বাল্যকাল থেকেই গভীর চিন্তাশীল ছিলেন। এই চিন্তার মধ্যে সব যেন ভুলে যেতেন। কখন কখন একপ্রকার দিব্যস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন। সাংসারিক কোনপ্রকার কর্মের দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল না। এমন কি নিজের প্রয়োজনের দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল না। আপনার ধ্যানে তিনি এমনি বিভোর হয়ে থাকতেন যে, সংসারের নির্ধারিত কাজকর্ম সম্বন্ধে তিনি ক্রমেই অত্যন্ত অমনোযোগী হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর এই প্রকার ভাবভঙ্গী দেখে কেউ কেউ মনে করত যে, তিনি বাস্তব বিষয়ে যেন বোধশক্তি রহিত হয়ে পড়েছেন। সুতরাং তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখনকার দিনে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। দেশ-প্রচলিত হাতুড়ে চিকিৎসক অথবা ওঝা শ্রেণীর দৈবজ্ঞ চিকিৎসকগণের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু এই শ্রেণীর চিকিৎসকগণ তাঁর রোগ সারাতে পারলেন না। এই ধরনের চিকিৎসার ফলে কেউ তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারলেন না, অথবা কোন উপকারও করতে পারলেন না। তাঁর পিতৃদেব তাঁকে মোটেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর ভগ্নী ছিলেন একজন তীব্র সহানুভূতিশীলা মহিলা। তিনি তাঁর নারীসুলভ স্বাভাবিক বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর ভ্রাতার ব্যাধির স্বরূপটা উপলব্ধি করতে পারলেন। নানকের এই ভগ্নীর বিবাহ হয়েছিল জয়রাম নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে। ইনি নবাব দৌলত খাঁ লোদীর দেওয়ান ছিলেন। দৌলত খাঁ লোদী ছিলেন তৎকালীন দিল্লীর সম্রাট বহলুল লোদীর আত্মীয়। কপুরতলার নিকট সুলতানপুরে নবাব দৌলত খাঁ লোদীর একটি বিস্তীর্ণ জায়গীর ছিল। নানকের ভগ্নী তাঁর ভ্রাতাকে নিজের নিকট ডেকে পাঠালেন। এবং তাঁর জন্য নবাবের অধীনে একটি চাকরী যোগাড় করে দিলেন নবাবের সাহায্য-ভাণ্ডারের হিসাবরক্ষকের পদে। নানক এই চাকরীতে ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাজ করেছিলেন।

মাত্র আঠার বছর বয়সে নানকের বিবাহ হয়। তাঁর স্ত্রীর নাম সুলাখিন। সুলাখিনের গর্ভে নানকের দুটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। তাঁদের নাম শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীদাস। এই শ্রীচাঁদ পরে উদাসী সন্ন্যাসী দল স্থাপন করেন। যখন নানকের বয়স ত্রিশ বছর তখন তিনি সেই ভাণ্ডার-রক্ষকের চাকরীটা ছেড়ে দেন। শুধু চাকরী নয়, সেই সঙ্গে গৃহত্যাগ করে বিরাট জগতে নেমে পড়লেন। নানক এখন নিঃস্ব ফকির। তারপর তিনি মারদানা নামক একজন মুসলিম ফকিরের সাহচর্য লাভ করেন। এই শ্রেণীর আর একজন উদাসী ফকির তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন—তাঁর নাম ভাইবালা। সে যুগের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো তাঁরা বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করলেন এবং বহু সাধুসন্তদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হল। তাঁদের সঙ্গে বহু আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময় হতে থাকে। এই ভাবে বিভিন্ন সাধক ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে নানক বহুপ্রকার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকেন। মহাপুরুষগণ চিরকাল এই ভাবেই জগতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন।

ক্রমে ক্রমে মহাত্মা নানকের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই সময় থেকে নানকের জীবনের ঘটনাবলীকে নিয়ে নানাপ্রকার কথা, উপকথা, কাহিনী ও জনশ্রুতি রচিত হয়েছিল। সেগুলি যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে বলব যে, তিনি দেশের প্রায় সমস্ত পবিত্র তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন—ভারতের, সিংহলের, পারস্য, আরব দেশের নানা তীর্থস্থান দর্শন করেন। পরিব্রাজকের বেশে তিনি বহু সন্তসাধুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁর জীবনের অবশিষ্ট চল্লিশ বছর ধরে তিনি বহু উল্লেখযোগ্য সাধুসন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করেন। পানিপথের শেখ শরাফতের সঙ্গে অনেকদিন ধরে তিনি ধর্মালোচনা করেছিলেন। মুলতানের পীর দরবেশদের সঙ্গে তিনি ধর্মচর্চা করেছিলেন। পাকপত্তনের ধর্মগুরু বাবা ফরীদের উত্তরাধিকারী শেখ ইব্রাহীমের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে ধর্ম নিয়ে গভীর আলোচনা করেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যেখানেই যেতেন সেইখানেই তিনি নিজের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের কথা প্রচার করতেন। আর যা তিনি মুখে বলতেন ও প্রচার করতেন, সে আদর্শকে বাস্তব কাজে পরিণত করতে কখনই ইতস্ততঃ বোধ করতেন না। এইভাবে তাঁর পরিব্রাজকের কাজ শেষ হল। তিনি বহু উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে তাঁর বাণী ও আদর্শগুলি ব্যাখ্যা করতেন। তারপর সেই মহা দিন আগত হল যখন তিনি পৃথিবীর বক্ষ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। বিদায় নেবার পূর্বে তিনি নিজের দেহকে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। এবং "ওয়াহ গুরু" এই কথাটি উচ্চারণ করলেন। এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে শেষ প্রণিপাত করলেন এবং নিজের বাতির সঙ্গে গুরু অঙ্গদের বাতি একীভূত করে দিলেন। এক গুরু চলে গেলেন এবং সেই একই গুরু অন্য মূর্তিতে থেকে গেলেন। অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে কেবল-মাত্র দেহেরই পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটল।

পাঠান ও মোগল আমলে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বহু অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় মুসলিম বসতি স্থাপিত হয়ে গেছে। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করতে আরম্ভ করেছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব মহান সাধকগণ সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবীর ও নানক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাঁদের দুজনেই ছিলেন সমন্বয়-সাধনের অগ্রদূত। সমন্বয়মিলন ও ঐক্যসাধনে তাঁদের দান অবিস্মরণীয়। এই সব মহাপুরুষগণের চেষ্টার ফলে সেযুগে সাম্প্রদায়িক কলহ ভীষণাকার ধারণ করেনি। বরং উভয় সম্প্রদায় সৌহার্দ্যের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করতে থাকে। নানকের জীবন থেকে জানা যায় যে, তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে গ্রথিত করা। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, সমাজের ব্যাধি ও ক্ষয়ক্ষতিকে দূর করতে হলে বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিরোধ-গুলিকে বিনাশ করতে হবে। এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে। *The History and Philosophy of Sikhism* গ্রন্থে নানকের আদর্শ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান উক্তির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় তাঁর উক্তিটি উল্লিখিত আছে। নানক বলেছেন, "যখন একজনই থাকে এবং অপরজন অপসারিত হয়, কেবলমাত্র তখনই আরামের সঙ্গে বসবাস করা সম্ভব হয়। কিন্তু যতদিন দুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবে তত দিনই সংগ্রাম, কলহ ও বিবাদ লেগেই থাকবে। যখন দুটি ব্যর্থ হয়ে গেছে, তখন ঈশ্বর আদেশ দিলেন। কারণ অনেকেই চলে গেল। ফোরকান (অর্থাৎ কোরআন আছে)—যেন তারা তাই নিয়েই একত্র হতে পারে। কিন্তু তারা তাই নিয়েই একত্র থাকতে পারেনি। তুমি, আমার পুত্র যাও জগতের মাঝে। দেখবে প্রায় সকলেই সত্যপথ থেকে সরে গেছে। তাদের সকলকে একই নাম বার বার উচ্চারণ করাও। 'হে নানক, তুমি যাও তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে, তুমি যাও হিন্দু-মুসলমানের নিকট, তাদের দু দলের নেতা হিসাবে। সত্য ধর্ম হল প্রেম ও প্রীতির ধর্ম—এই প্রীতির ধর্ম প্রতিষ্ঠিত কর। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কেউ তোমার নিকট আসবে তাকেই গ্রহণ কর, অপ্রয়োজনে কারুর জীবন নষ্ট করো না। দরিদ্রকে রক্ষা কর। মনে রেখো ঈশ্বর সকলের উপর বিরাজিত আছেন।'" নানক নিজেকে

একজন ঈশ্বর প্রেরিত মানুষ বলে মনে করতেন। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের দরবার থেকে মর্ত্যভূমিতে এসেছেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট বাণী লাভ করেছেন। তাঁর শিক্ষার প্রধান বিষয় হল যে, পৃথিবীতে একজনই ঈশ্বর আছেন। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। আর নানক সেই ঈশ্বরের খলিফা বা প্রতিনিধি। তিনি ঈশ্বরের নিকট যে সত্যলাভ করেছেন মানুষের মধ্যে তিনি সে-সব কথা প্রচার করেছেন। একথা বেশ বোঝা যায় যে, নানক বাইবেল-বর্ণিত প্রফেটগণকে তাঁর 'মডেল' (Model) বা আদর্শ মনে করতেন। সেই সব প্রফেটগণের শিক্ষাকে প্রচার করে তাদের মাধ্যমে তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার ব্যাখ্যা করেছেন। একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে, তিনি ছিলেন মিস্টিক (Mystic)। তিনি এই অর্থে মিস্টিক মরমী ছিলেন যে, ঈশ্বরের সদা উপস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর একটা জাগ্রত চেতনা ছিল। তবে কবীরের মতো Visionary ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি আত্মসমাহিত স্বপ্নদর্শী ছিলেন না। তাঁর আত্মা মাঝে মাঝে সীমাতীত লোকে চলে গেলেও, বাস্তবকে তিনি ভোলেননি। যেখানে ঈশ্বরের প্রাসাদ হাজার আলোকে আলোকিত আছে, সেখানেও তিনি যেতেন এবং দিব্যদৃষ্টি লাভ করতেন। নানক ইন্দ্রিয়াতীত লোকের কথা ভাবতেন। সেই সঙ্গে তিনি বিরাট মানব সমাজের কথাও চিন্তা করতেন। নানক ছিলেন বাস্তববাদী ধর্মনেতা। তাই তিনি অতীন্দ্রিয় লোকে বেশিক্ষণ থাকতেন না।

এবার ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে নানকের জীবনদর্শন কি ছিল, সেই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। নানক ছিলেন একজন ধর্মসংস্থাপক। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে নৈতিক আদর্শের উপর গুরুত্ব দান করতেন। তাঁর প্রচারিত নীতির মর্মমূলে আছে মহান ঈশ্বরের আসন। ঈশ্বর অগম্য, ও সীমাহীন। সমস্ত সৃষ্ট বস্তু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর পাদপীঠে লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষ উপবেশন করে তাঁরই স্তুতিগান গাইছেন। তাঁরা লক্ষ লক্ষ পন্থা ও পদ্ধতিতে তাঁরই ভজন-গান গাইছেন। তিনি ধারণার অতীত, স্পর্শের অতীত, তিনি সীমাহীন, গণনার অতীত। তিনি স্বতন্ত্র,অমর,অক্ষয়, অব্যয়। তিনি সর্বব্যাপী, তাঁর কোন জাতি নেই। তিনি কারও দ্বারা জ্ঞাত নন। তিনি স্বয়ম্ভূ। তিনি নিজের শক্তিতে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান। তাঁর কোন ভয় নেই। কোন সন্দেহ নেই। তাঁর কোন পরিবার নেই। কোন ভ্রান্তি নেই। তিনি সকল সীমার অতীত—দূরে আরও দূরে। "সমস্ত আলো তোমারই হে প্রভু।" নানক স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর Immanent অর্থাৎ তিনি সর্ব বস্তুতে ব্যাপ্ত। প্রত্যেক দেহের মধ্যে পরম ব্রহ্মরূপে লুকায়িত আছেন। যেখানে যত আলো আছে তা সবই তাঁরই আলো। তিনি মানুষের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে সম্পর্কিত হয়ে আছেন। সব সময় মনে করতেন যে, ঈশ্বর সকলের প্রভু। তিনি চালক, হাকিম। তাঁর পূর্ব নির্ধারিত ইচ্ছা অনুসারে প্রত্যেক মানুষের চলা উচিত। কারণ তাঁকেই মেনে চললে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও নিরাপত্তা আসবে, মুক্তি ও পরিত্রাণ পাওয়া যাবে।

তিনি ঈশ্বরের মধ্যে মানবীয় অথবা ব্যক্তির গুণাদি আরোপ করতেন না। তিনিই আসল সদ্‌গুরু ও অপ্রতিরোধ্য। নানক ইচ্ছাশক্তির উপর বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এসব কথা অত্যন্ত দুরূহ। সেজন্যই তিনি ঈশ্বরের তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করতেন না।

সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বর অন্ধকার থেকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বাস্তব অস্তিত্বদান করেছেন। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে প্রভু ঈশ্বরের মহান সাম্রাজ্য, সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্যহীন কর্ম—তাঁর অপার

লীলা। তিনি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মহান প্রভু।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিত্রতা ও সদ্ভাব স্থাপন করতে হবে—এই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা। "হিন্দু মুসলমান ও অপর ধর্ম সম্প্রদায়কে ঈশ্বরের দরবারে সভাসদ্ ও সভ্যগণকে তাঁর হুকুম ও আদেশের অপেক্ষায় উপস্থিত হয়ে থাকতে হবে। পৃথিবীর বড় বড় পীর ও গুরু হচ্ছেন তাঁর নিয়োজিত কর্মচারীর মতো। এনজেল বা দেবদূতগণও হচ্ছেন তাঁর কর্মচারীর মতো। কেউ কেউ তাঁর কোষাধ্যক্ষ মাত্র। তাঁর মতে, 'আজরাইল' বা যমদূত মূর্খ ও পশুস্বভাব বিশিষ্ট মানুষকে গ্রেপ্তার করেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এইসব ধারণা মানুষের পশুশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি ও অনুভূতির উপর ততটা প্রভাব বিস্তার করে না।" নানকের শিষ্যগণ দাবী করেন যে, তাঁর শিক্ষার প্রভাবে তাঁরা ঈশ্বরের নিকট আত্ম সমর্পণ করেছেন। নিজের সম্বন্ধে নানক বলেন, "এই নানক একটি আবেদন করেন যে, আমার আত্মা ও দেহ সমস্তই তোমার শক্তির দান। প্রভু! তুমি নিকটে আছ। তুমি দূরেও আছ। তুমি মধ্য পথে আছ, তুমি দেখতে পাও, তুমি শুনতে পাও। তুমি তোমার শক্তি দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছ।" নানক বলেন যে, হে প্রভু! যখন কোন আদেশ করতে তোমার ইচ্ছা হয়, তখন তাই তুমি গ্রহণযোগ্যরূপে কর। নানক অন্যত্র বলেছেন, প্রভু যা করবেন তা মঙ্গলের জন্য। তিনি রাজা, তিনি যা আদেশ করেন, সমস্ত দেহ মন দিয়ে তাই পালন কর। তাঁর প্রতি আমাদের ভক্তি এই প্রকার। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি এরূপ হবে যে, তাঁর মধ্যে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে লোপ করে দিতে হবে। তারপর তুমি তাঁকে প্রাপ্ত হবে। অন্য কোন জ্ঞান কোন কাজেই আসবে না। মানুষের দীনতার কোন অন্ত নেই। তাই নানক বলেন যে, সমুদ্রের জলের মতো মানুষের পাপরাজিও অনেক। "হে ঈশ্বর, তুমি আমার উপর দয়া বিতরণ কর। একটু দয়ার হস্ত প্রসারিত কর। আমি একটা নিমজ্জমান প্রস্তরের মতো আমাকে রক্ষা কর।" মুক্তিলাভের জন্য মানুষ কি করতে পারে? আপন আত্মার আলোর সঙ্গে ঈশ্বরের আলো কিভাবে যুক্ত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে নানক বলেন যে, এজন্য চারটি বস্তুর দরকার: (১) ঈশ্বরকে ভয় কর (২) তাঁর দয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর (৩) যে পথ তোমাকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে সেই পথের সন্ধান কর (৪) একজন চালকের দরকার, তার পথ-নির্দেশ গ্রহণ কর। পৃথিবীর সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আছে একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়। নানক বলেন, যেদিন ঈশ্বর তোমার বিচার করবেন সেদিনের কথা ভুলে যেয়ো না। সেদিনকে ভয় কর। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর-ভীতি রেখ। মৃত্যুর ভয়ে নিজের কর্তব্যকর্ম থেকে পলায়ন কর না। সব সময় ঠিক কাজ করে যেতে হবে। Right Action বা ঠিক কাজ সম্বন্ধে নানকের উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—তিনি দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন, পুণ্যের প্রশংসা ও পাপের নিন্দা। নানক বলেন যে, কেবলমাত্র আদেশাত্মক ও নিষেধাত্মক বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করাই যথেষ্ট নয়। অন্তরের বা আত্মার আচরণই হল খাঁটি নৈতিকতা। তিনি জানতেন যে, কোটি কোটি নরনারীকে এই জগতে বাস করতে হবে। তাদেরকে তাদের বৃত্তি অনুসারে কাজ করে যেতে হবে। যে ধর্মাচরণ কেবলমাত্র ফকির ও সাধুর জন্য নির্ধারিত সে-ধর্ম একটা সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল সমাজের জন্য নয়। সমাজের যে বিরাট অংশ নানাবিধ সামাজিক ও জাগতিক কাজে নিযুক্ত আছে সে-ধর্ম তাদের জন্য নয়। সেজন্য মধ্যপন্থা অবলম্বনের উপর তিনি জোর দিলেন। চরম

বৈরাগ্যের পন্থাকে একমাত্র পথ বললেন না। নানক এই দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে উপদেশ দিলেন। নানক আরও বলেন যে, জগতের প্রয়োজনে যেমন দেহ-মনকে দেখতে হবে, তেমনি হৃদয়ের বৈরাগ্য ও তপস্যারও প্রয়োজন আছে। কয়েকটি গুণের কথা তিনি বলেছেন। তিনি বলেন, সদ্ব্যবহার, সৎ আচরণ, বিনয়-অভ্যাস দ্বারা অহঙ্কার ত্যাগ কর, মনকে সংহত করে রাখ, ঈর্ষাকে সংযত কর, সকল সময় সৎ হয়ে চল, প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক হয়ে চল। পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংযত কর, সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে থাক। হিন্দুসমাজের মতো নানক জন্মান্তর মতবাদ বিশ্বাস করতেন। যারা অসৎ ও কুকার্য করে তারা বার বার বিভিন্নভাবে জন্মগ্রহণ করে অশেষবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করবে এবং এইভাবে তাদের পাপ ক্ষালন হলে তবেই তারা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। নানক আরও বলেন যে, যারা পাপকার্য করবে তাদের জন্য কঠোর দণ্ড নির্ধারিত আছে। কেবল ঈশ্বরের অপার দয়া মানুষকে এই দণ্ড থেকে রক্ষা করতে পারে। পাপীর জন্য এত কঠোর দণ্ডের কথা বলেও, নানক মানুষের সামনে ঈশ্বরের নম্র কোমল রূপটাও তুলে ধরেছেন। তাই তিনি বলেন, "মানুষ, তুমি যদি মুহূর্তের জন্য তোমার মনকে সংযত কর তবে ঈশ্বর তোমার সম্মুখে উপস্থিত হবেন। যার উপর তিনি দয়া ও অনুগ্রহের দৃষ্টিপাত করেন তাকেই তিনি পুনরুদ্ধার করেন ও অনুগ্রহ দান করেন। কেবল তাঁর নাম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করলে তাতেও মুক্তি আছে। তাঁর দয়ার দান সীমাহীন। তাঁর দয়া অপার। তাঁর আদেশ শিরোধার্য। সৎ কর্ম, দান, অনুশোচনা, যোগ, শাস্ত্রপাঠ এসবেরও প্রয়োজন আছে। তবে এসব কাজ কোন কাজেই লাগবে না যদি তাঁর দয়া না পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর প্রমুখ মহান সাধকগণ নিজেদের জীবনের আদর্শ দ্বারা এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, এই জীবনেই ঈশ্বরলাভ করা যায়। সেজন্য চাই অকৃত্রিম সাধনা, ধ্যান ও ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। নানককে অনেক সাধনা করতে হয়েছিল। তারই ফলে তাঁর ঈশ্বর-উপলব্ধি হয়েছিল। অতীতের মহান সাধুসন্ত ও সুফীদের মতো নানক শিক্ষা দিলেন যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সত্যের পথে চলতে হবে। সেজন্য একজন উপযুক্ত গুরুর দ্বারা পরিচালিত হওয়া দরকার। কবীরের পদ্ধতির মতো তিনিও মনে করতেন যে, একজন গুরু গ্রহণ করা দরকার। নানক সুফীদের জ্ঞানগর্ভ শিক্ষার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। নানক নানাভাবে যে ধর্মালোচনা আরম্ভ করলেন তা তাঁর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা আরও গতিশীল ও বেগবান হয়ে উঠল। এবং চতুর্দিকে তীব্রভাবে প্রবাহিত হতে লাগল।

এই সেই ভূমি—যাহা পবিত্র আর্যাবর্তের মধ্যে পবিত্রতম বলিয়া পরিগণিত ; এই সেই ব্রহ্মাবর্ত—যাহার বিষয় আমাদের মনু মহারাজ উল্লেখ করিয়াছেন।...এই সেই বীরভূমি—যাহা যতবার এই দেশ অসভ্য বহিঃ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ততবারই বুক পাতিয়া প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করিয়াছে। এই সেই ভূমি—এত দুঃখ-নির্যাতনেও যাহার গৌরব ও তেজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। এখানেই অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে দয়াল নানক তাঁহার অপূর্ব বিশ্বপ্রেম প্রচার করেন। এইখানেই সেই মহাত্মা তাঁহার প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া এবং বাহু প্রসারিত করিয়া সমগ্র জগৎকে শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া ছিলেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভিটামিনের অপব্যবহার

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

'ভিটামিন' (Vitamin) শব্দটি এতই প্রচলিত যে, এর বাংলা প্রতিশব্দ 'খাদ্যপ্রাণ' কথাটির প্রচলন নেই বললেই চলে। অনেকের প্রচলিত ধারণা যে, ভিটামিন নামক ওষুধ নানা অসুখে কাজ করে এবং এ যতই খাওয়া যায় ততই হিতকর। এই সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে জানা গিয়েছিল যে, নানা খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সামান্য পরিমাণে এমন এক ধরনের জৈব (organic) পদার্থ আছে, যা আমাদের শরীরের পুষ্টির জন্য অল্প পরিমাণে হলেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বেরিবেরি রোগের কারণ খুঁজতে গিয়ে ডাঃ কেসিমির ফাঙ্ক এই পদার্থের আবিষ্কার করেন এবং 'ভিটামিন' নামকরণ করেন, কারণ তখন মনে করা হয়েছিল যে, এটি একটি 'অ্যামাইন' (amine)। পরে ভিটামিনের গুরুত্ব বুঝতে পেরে এর উপর অনেক গবেষণা হয়েছে ও এর নানা প্রকারভেদ পাওয়া গেছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিনের ভিন্ন ভিন্ন কার্যাবলী জানা গেছে। শুধু তাই নয়, ভিটামিনগুলির গঠনপ্রণালী (chemical structure) জানা যাওয়ায় অনেকগুলিকে ল্যাবরেটরিতেই তৈরি (synthetic) করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণভাবে ভিটামিনগুলিকে জলে দ্রবণীয় (soluble) অথবা চর্বি জাতীয় জিনিসে দ্রবণীয়, এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সংখ্যায় আরও বেশি থাকলেও এখনও পর্যন্ত ১২ রকমের ভিটামিন পাওয়া গেছে, যাদের অভাবে মানুষের অসুখ হতে পারে। এর মধ্যে চারটি জলে গলে না, চর্বি জাতীয় পদার্থে গলে—ভিটামিন 'এ' (A), ভিটামিন 'ডি' (D), ভিটামিন 'ই' (E) ও ভিটামিন 'কে' (K)। বাকি আটটি জলে গলে—ভিটামিন 'সি' (C) বা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড (Ascorbic Acid), এবং সাতটি যাদের একত্রে 'ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স' (B-Complex) বলে—থিয়ামিন (Thiamin), নিয়াসিন (Niacin), রাইবোফ্লেবিন (Riboflavin), পাইরিডক্সিন (Pyridoxin), বায়োটিন (Biotin), কোবালামিন্‌স অথবা বি-টুয়েল্‌ভ (Cobalamins or B_{12}) ও ফোলেট (Folate)। এ ছাড়া দুই একটি ভিটামিন আছে (যেমন—প্যানটোথেনিক অ্যাসিড —Pantothenic acid) যারা এত অধিক পরিমাণে খাদ্যে থাকে যে, এদের অভাবে কখনই রোগ সৃষ্টি হয় না। মজার ব্যাপার যে, খাদ্যের মধ্যেই কোন কোন দ্রব্য আছে (অ্যান্টিভিটামিন —Antivitamin) যেগুলি ভিটামিনকে নষ্ট করতে পারে, আবার এরকমও দ্রব্য আছে (প্রোভিটামিন—Provitamin) যেগুলি শরীরে গিয়ে ভিটামিনে রূপান্তরিত হয়। আমাদের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুগুলির সঙ্গেও ভিটামিনের সম্পর্ক আছে। তারা কিছু কিছু ভিটামিন তৈরি করে, যেমন—'কে' ভিটামিন এবং বায়োটিন। তবে অন্ত্রের অসুখে (যেমন—পেটের অসুখে) যখন জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন তারা ভিটামিনের দিক হতে শরীরের ক্ষতিই করে। বিশেষ করে খাদ্য হতে তারা বি-টুয়েল্‌ভ বার করে নিয়ে মলের সঙ্গে নির্গত করে দেয়, যার ফলে রক্তাল্পতার সৃষ্টি হতে পারে। এই সব তথ্য হতে বোঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় ভিটামিনের হিসাব করতে গেলে কেবলমাত্র খাদ্যের মধ্যে ভিটামিনের পরিমাণ জানলেই যথেষ্ট হয় না।

আমাদের আসল বক্তব্যে আসবার আগে ভিটামিনগুলির সাধারণ গুণাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ভিটামিন 'এ'—দুধ, মাখন, ডিম, চর্বিযুক্ত মাছ, মেটে, সবুজ সবজি, হলদে ও লাল ফলে থাকে। প্রতিদিনের প্রয়োজন ৭৫০ মাইক্রোগ্রাম (১ মাইক্রোগ্রাম=এক-সহস্রাংশ মিলিগ্রাম) এবং শিশুদের প্রয়োজন ৩০০ মাইক্রোগ্রাম। এর অভাবে শরীরের সর্বাংশের বাইরের আবরণী (যেমন—ত্বক, চোখের পরদা প্রভৃতি) শুষ্ক হয়ে যায় এবং রাতকানা, অন্ধত্ব প্রভৃতি রোগ হয়।

ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স—থিয়ামিন বা বি-ওয়ান (B_1) প্রতিদিনের প্রয়োজন ১.২ মিলিগ্রাম। কলাই, ঈস্ট্ (yeast), মেটেতে পাওয়া যায়। এর অভাবে 'বেরিবেরি' রোগ হয়।

(*i*) নিয়াসিন বা নিকোটিনিক অ্যাসিড (Nicotinic acid)—মাছ, মাংস, কফিতে আছে। প্রতিদিনের প্রয়োজন ১.৫ মিলিগ্রাম। এর অভাবে পেলাগ্রা (Pellagra) নামক রোগ হয়।

(*ii*) রাইবোফ্লেবিন—মাংস, ডিম, পনির এবং সামান্য পরিমাণে দুধ ও শাকসবজিতে আছে। প্রতিদিনের প্রয়োজন ১.৮ মিলিগ্রাম। এর অভাবে মুখে ঘা হয়

(*iii*) পাইরিডক্সিন বা বি-সিক্স (B_6)—শাকসবজি, মাছ, মাংসে প্রচুর আছে। প্রতিদিনের প্রয়োজন, ২ মিলিগ্রাম। এর অভাবে মুখে ও চামড়ায় ঘা হয়।

(*iv*) বায়োটিন—অনেক খাদ্যদ্রব্যে আছে, অন্ত্রেও তৈরি হয়। প্রতিদিনের প্রয়োজন ১০০ মাইক্রোগ্রাম। এর অভাবে 'সেবোরিয়া' (Seborrhoea) নামক চর্মরোগ হয়।

(*v*) ভিটামিন বি-টুয়েলভ (B_{12})—মাছ-মাংসে আছে। প্রতিদিনের প্রয়োজন ২ মাইক্রোগ্রাম। এর অভাবে পাকস্থলীর রস নির্গম ভাল হয় না, যার ফলে রক্তাল্পতা হতে পারে।

(*vi*) ফোলেট—টাটকা শাকসবজি ও মাংসে আছে। প্রতিদিনের প্রয়োজন ০.৮ মিলিগ্রাম। এর অভাবে রক্তাল্পতা ও স্নায়ুরোগ হয়।

ভিটামিন 'সি'—অনেক জন্তু-জানোয়ার শর্করা (Glucose) হতে তৈরি করতে পারে, কিন্তু মানুষ পারে না। অম্ল ফলে এবং টাটকা সবুজ শাকসবজিতে প্রচুর আছে। প্রতিদিনের প্রয়োজন ৭৫ মিলিগ্রাম। এর অভাবে স্কার্ভি (Scurvy) নামক রোগ হয়, যাতে দাঁতের মাড়ি ফোলে, ঘা সারতে চায় না এবং গায়ের ত্বক হতে রক্ত বার হয়। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামা উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of good hope) হয়ে যখন মালাবারে আসেন, তাঁর নাবিকেরা কেবলমাত্র শুষ্ক খাবারের উপর নির্ভরশীল থাকায় ১৬০ জনের মধ্যে ১০০ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল।

ভিটামিন 'ডি'—মাছের যকৃতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাছাড়া ডিম ও মাখনে, ও সামান্য মাত্রায় দুধে ও মাংসে আছে। অল্প-বয়স্ক শিশু ও অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের প্রতিদিনের প্রয়োজন ১০ মাইক্রোগ্রাম (৪০০০ ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিট)। অন্যদের পক্ষে আড়াই মাইক্রোগ্রামই যথেষ্ট। সূর্যরশ্মির আলট্রা-ভায়োলেট (Ultra-violet) আলো, মানুষের ত্বকের ডাই-হাইড্রোকোলেস্টিরল (Dihydrocholesterol)-কে ভিটামিন 'ডি'তে রূপান্তরিত করে। সেজন্য গায়ে রোদ লাগলে প্রয়োজনীয় 'ডি' ভিটামিন আপনাতেই তৈরি হয়ে যায়। এর অভাবে অস্থির ক্ষতি হয়ে ছোটদের রিকেট্স (Rickets) ও বড়দের অস্টিওম্যালেসিয়া (Osteomalacia) এবং অস্টিওপোরোসিস (Osteoporosis) রোগ হয়।

ভিটামিন 'ই'—ভেজিটেবল তেল, ডিম, মাখনে আছে। মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজন-মাত্রা জানা নেই, তবে শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলে আলাদা করে খাবার দরকার নেই। বেশি খেলে যে উৎসাহ, ক্ষমতা ও যৌনক্ষমতা বাড়ে—এ ধারণা বোধ হয় ঠিক নয়।

ভিটামিন 'কে'—প্রয়োজন মতো রক্তের জমে যাওয়ার (Coagulation) ক্ষমতার জন্য দরকার। শাকসবজির পাতায় আছে, মাছ-মাংসে নেই। বৃহদন্ত্রেও খানিকটা তৈরি হয়। মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজন-মাত্রা ঠিক জানা নেই, তবে, সেটা কয়েক মিলিগ্রাম মাত্র।

উপরের আলোচনা হতে সহজেই বুঝা যায় যে, ভিটামিনযুক্ত খাদ্য আমাদের প্রাণধারণের জন্য অতীব প্রয়োজন, এবং এর অভাবজনিত রোগের আরোগ্যের জন্য আলাদা করে সেই ভিটামিন দেওয়া আবশ্যক। তার অর্থ এই নয় যে, অধিক পরিমাণে ভিটামিন খেলে শরীর অধিক পরিমাণে সুস্থ থাকবে। শরীর যেমন অধিক পরিমাণে খাদ্য খেলে প্রয়োজনাধিক গ্রহণ করে না, মলমূত্রের সঙ্গে নির্গত করে দেয়, ভিটামিনের ব্যাপারেও তাই করে। শরীর কেবলমাত্র অল্প পরিমাণেই কয়েকটি ভিটামিন সঞ্চয় করতে পারে ('এ', 'ডি', বি-টুয়েলভ, ও বায়োটিন যকৃতের মধ্যে এবং 'ই' চর্বিতে)। যারা প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, মাছ, মাংস ও টাটকা শাকসবজি খায়—তাদের আলাদা করে ভিটামিন খাবার কোন দরকারই নেই।

কিন্তু বর্তমানে খানিকটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য অধিক পরিমাণে ভিটামিন খাবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ভিটামিনের কার্য সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা থাকায় 'ভিটামিন খেলেই শরীর ভাল হবে' এই মত চালু হয়ে গেছে। এরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার পিছনে ওষুধ তৈরি করার কোম্পানিগুলির চোখ ঝলসানো বিজ্ঞাপনও অনেকাংশে দায়ী। তারা লোককে বোঝায় যে, ভিটামিন টনিকের কাজ করে, শরীরে শক্তি যোগায় ইত্যাদি এবং জনসাধারণ স্বাস্থ্যকর খাদ্যের বিকল্পে 'ভিটামিনই যথেষ্ট' এরূপ মনোভাব পোষণ করেন। অনেকে ইচ্ছামতো এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন খেতে আরম্ভ করেন। প্রতিযোগিতার বশবর্তী হয়ে, এবং রোগী ও ডাক্তারদের আকর্ষণ করার জন্য কোম্পানিগুলি ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলে ভিটামিনের মাত্রা অধিক হতে অধিকতর করে চলে—যার ফলে ওষুধের দামও বেড়ে যায়। প্রয়োজনাধিক ভিটামিন শরীরের কাজে না লেগে প্রস্রাব বা মলের সঙ্গে নির্গত হয়ে যায় (এবং হয়তো ড্রেনের জীবাণুগুলির স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে!)। বিজ্ঞাপনের ভাষায় এবং ওষুধ কোম্পানিগুলির প্রতিনিধিদের মুখস্থ-করা তথ্যের আড়ম্বরে কোন কোন ডাক্তারেরও বিভ্রান্ত হওয়া আশ্চর্য নয়। একসঙ্গে অনেকগুলি ভিটামিন (multi vitamin) খাওয়ার রেওয়াজ বেড়েই চলেছে, কারণ ধারণা যে এদের মধ্যে যদি কোন ভিটামিন কাজে লেগে যায়। মজার ব্যাপার এই যে, যে সব অর্ধ-উপবাসী দরিদ্র জনসাধারণের ভিটামিনের বেশি দরকার, সেটি তাদের নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে। উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে শুধু যে অনর্থক অর্থব্যয় হয় তা নয়, দেখা যাচ্ছে যে, অধিক পরিমাণে ভিটামিন খাওয়ায় উপকার না হয়ে অপকারই হয় এবং নানা উপসর্গের সৃষ্টি হয়, যেগুলিকে বর্তমানে 'হাইপারভিটামিনোসিস' (hypervitaminosis) নামক রোগের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। আজ পর্যন্ত যে সব ভিটামিনের অতিমাত্রায় খাওয়ার ফলে কুফল প্রমাণিত হয়েছে সেগুলি এবং তাদের কুফলগুলি হল :

ভিটামিন 'এ'—বড়দের মাথাধরা, মাথা-ঘোরা, পাতলা দাস্ত হয়—পরে চামড়া খসখসে হয়ে

যায়। বারে বারে প্রস্রাব হয় ও প্রস্রাবের ধারণ-ক্ষমতা কমে যায়। অস্থির নানা অসুখ হয়, (অস্টিওস্ক্লেরোসিস—osteosclerosis), গাঁটের অসুখ (আরথ্রালজিয়া—arthralgia) হতে পারে। ছোটদের চুল উঠে যায়, ক্ষুধা কমে যায় এবং হাড়ের বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়। সম্প্রতি চিকিৎসা-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকায় এই ভিটামিনের অভাবে রোগ হওয়ার চেয়ে, অধিক খাওয়ার ফলে রোগ হওয়ার বিবরণ বেশি প্রকাশিত হচ্ছে।

ভিটামিন 'সি'—সর্দি বা ইনফ্লুয়েঞ্জাতে অনেকে ভিটামিন 'সি' খান। কিন্তু এর উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বেশিমাত্রায় অনেকদিন খেলে মূত্রাশয়ে পাথুরি হতে পারে বলে অনেকের ধারণা। তাছাড়া বহুদিন ধরে বেশিমাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পরে মাত্রা কমলে স্কার্ভি রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

ভিটামিন 'ডি'—প্রথমে হজমের গোলমাল ও পাতলা দাস্ত হয়। বহুদিন ধরে বেশি খেলে মাংসপেশীতে, এবং অন্যান্য শরীরাংশে ক্যালসিয়াম জমে গিয়ে নানা অসুখ হয়। বৃক্কের অসুখ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে এবং পাকস্থলীতে ঘা হতে পারে। হাড় হতে ক্যালসিয়াম সরে যাওয়ার জন্য অস্টিওপোরোসিস (osteoporosis) এবং অস্টিওস্ক্লেরোসিস হতে পারে। ইংলণ্ডে আগে শিশু-খাদ্যে বেশি করে এই ভিটামিন দেওয়া থাকত, বর্তমানে আইন করে এর পরিমাণ সীমিত করে দেওয়া হয়েছে।

ভিটামিন 'ই'—সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে জাতীয় গবেষণাগারে প্রমাণিত হয়েছে যে, অত্যধিক পরিমাণে ভিটামিন 'ই' রক্তের লিম্ফোসাইট নামক জীবকোষকে নষ্ট করে।

ভিটামিন 'কে'—গা বমি এবং অন্যান্য রোগের সৃষ্টি করে। কখন কখন, শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

থিয়ামিন—বুক ধড়ফড় করা, ভয় পাওয়া, কাঁপুনি—এমন কি অজ্ঞান পর্যন্ত হতে পারে।

ফোলেট—ক্যানসার রোগকে বাড়িয়ে তুলতে পারে অথবা ক্যানসার-সম্ভাবনাময় জীবকোষকে ক্যানসারে পরিবর্তিত করতে পারে।

অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য ভিটামিনের অত্যধিক ব্যবহারের কুফল ধরা পড়া আশ্চর্য নয়।

উপরি-উক্ত আলোচনা হতে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, ভিটামিনকে যেন 'সর্বজ্বরহরি' বলে ধরে নেওয়া না হয়, ভিটামিনের অভাবে যত বেশি রোগ হচ্ছে বলে ভাবা যায়, অতটা নয় এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত ভিটামিন খেলে শুধু যে অর্থনাশ হয়, তা নয়, বরং নূতন নূতন রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

সৌভাগ্যের কথা যে, বিষয়টি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং ওষুধ প্রস্তুত-কারক কোম্পানিগুলিকে ভিটামিনের পরিমাণ অনর্থক বাড়িয়ে দাম বৃদ্ধি না করতে বলা হয়েছে। তবে জনসাধারণকেও এবিষয়ে সজাগ হতে হবে।*

* যে সব বই হতে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে: (১) Davidson's Principles and Practice of Medicine, 12th edition, 1977, (২) Drug Induced Diseases, Vol. 4, 1972, (৩) The Physiological Basis of Medical Practice, 8th edition, 1967

সপ্তপদী

শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল

[এ কবিতার তাৎপর্য—উদ্বোধন। বোধনও বলতে পারা যায়। নব-পূঢ়া নারায়ণীর বোধন।

উচ্চারিত এবং লিখিত সাধারণ ভাষা বা জাগ্রৎ-ভূমির বাক্ হল বৈখরী। বৈখরী বাক্ গতানুগতিক, চিরাচরিত, চর্বিতচর্বণ। উপলব্ধির ঝলক নেই। দাগা বুলনো। মুখস্থ করা আর ঝাড়া। উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ।

তার গভীরে বাকের তিনটি ক্রমগভীর স্তর হল—স্বপ্নভূমির মধ্যমা, সুষুপ্তি-ভূমির পশ্যন্তী আর তুরীয় ভূমির পরা বা ব্রহ্মী—নিখিলপ্লাবিনী সর্বব্যাপিনী বাক্।

মধ্যমায় কথা বলেন বেশির ভাগ কবি। তাঁদের অন্তর্জগৎ বহির্জগতের চেয়ে বেশি জীবন্ত। তাঁরা অন্তরীক্ষচারী। তাঁদের ভাষা আবেগমথিত বাত্যাবিক্ষুব্ধ মেঘবিস্ফূর্জিত দামিনীদমকিত বজ্রগর্জিত।

পশ্যন্তীতে কথা বলেন অল্প-সংখ্যক কোটিকে গুটিক কবি, যাঁদের বলি ঋষি। তাঁদের ভাষা উজ্জ্বল আলোর বাঁশি। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে 'তখন তাঁরি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়'।

এসব বাকের বকাবকি তো চলছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু কই, পরাৎপরের টনক নড়ে কই? তাঁর নেমে আসার কথা ছিল, পৃথিবী স্বর্গ হবার কথা ছিল, কই সেসব? তিনি কি নড়তে-চড়তে পারেন না, অ-গ? চ ক নেই, ক্ষ্যামোতা নেই? না, সব থেকেও ঘুমচ্ছেন?

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গর্দভের মতো শুধু বইছি আর সইছি তন্ত্রের পর তন্ত্র—system-এর পর system. রাজনীতির দিকটা ধরা যাক। রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর-তন্ত্র এইরকম সব ক্ষেত্রে। এবার গোঁজা ঘাড় সোজা করে চতুর্দিকে তাকিয়ে নতুন সাধনা শুরু করা যাক। তান্ত্রিকের শব-সাধনা নয়, বিশ্ব-স্ব-তান্ত্রিকের সব-সাধনা। কিছু বাদ দিয়ে নয়, সবটা নিয়ে সাধনা। চাই পরস্পরের হাত-ধরাধরি এক নিখিল, যেখানে সবাই স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, উপনিষদ্ যাকে বললেন স্বরাট্। বেদ বললেন স্বরাজ্য। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'—।

মৃত এ সভ্যতা। শবীভূত সব। তাতে স্পন্দিত হও হে প্রাণ, হে ভগবান। তুমিই তো এ মহাগৃহের গৃহী, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-বাড়ির কর্তা। তুমিই যদি ঘুমিয়ে থাক, তাহলে বাড়ির ছেলেমেয়েরা তো ঘুমবেই। জাগো হে কুণ্ডলিত শীতঘুমকাতুরে অনন্ত hibernating serpentine eternity, অমিতবিক্রমে পরাভূত কর সমস্ত বাধা (বি-সাসহি সর্বাভিভাবী)। আর বিষ ঢেলো না হে সাপ, অমৃত ঢালো হে বিশাং পতি, মানুষের পতি, Lord of Men.

নাঃ, উনি শেষশয্যায় শুয়ে আছেন, জাগলেন না। আচ্ছা তাহলে মাকে ধরি, যা দেবী সর্বভূতেষু—সেই নবে নবে নিগূঢ়া নারায়ণীকে। অথবা—ওঁর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও জাগো। বিষ্ণুর পদে (ষষ্ঠীতৎপুরুষ) পদসেবানিরতা আর নয়, জাগো মা নবীনা সৃষ্টির স্রোতস্বিনী গঙ্গা-স্বরূপিণী বিষ্ণুপদা (সম্বোধন-পদে, শুদ্ধ শব্দটি অবশ্য বিষ্ণুপদী), আসীন হও মা বিষ্ণুপদে, আকাশে (অধিকরণে সপ্তমী), বিষ্ণুপদপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে (কর্মে সপ্তমী) মোক্ষবাসনাকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে আমাদের দাও সেই দিব্য-পার্থিব বসু, স্বর্গ পৃথিবী একাকার করা মহাধন, মহাচেতনা, সেই পঞ্চম পুরুষার্থ। নইলে তোমার এ সৃষ্টি যে হয় বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

সপ্ত ভুবন কাঁদছে পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়া ব্রহ্মের, বামন বিষ্ণুর, সভ্যতা-সংস্কৃতি-অপশাস্ত্র-অপধর্ম-রাজনীতি -ism-ক্লান্ত সুস্থ-জীবনপিয়াসী বহু-সাধ-কিন্তু-সাধ্য নেই dwarf মানুষের আর্তনাদে।

যারা বলী (বলি-বামনের গল্পটি পিছন থেকে উঁকি মারছে), বলবান, তারা ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। প্রতিকার আছে শুধু তোমার হাতে। বিষ্ণুর ত্রিপদ ভূমির অথবা বিষ্ণুর বামনাবতার তিন-ঠেঙে মানুষের দশম দশা—মৃত্যু ঘটেছে। তুমি ধেয়ে এস হে ত্রিপদী—বৈখরী-মধ্যমা-পশ্যন্তি তোমারই তিনটি চরণ মাত্র—এস তুমি স্বয়ং হে পূর্ণাপূর্ণা ব্যক্তাব্যক্তা সর্বপ্লাবিনী সব একাকার ব্রহ্মী করা বাক্। জীবনযন্ত্রণায় জ্বলে জ্বলে জোলো সভ্যতায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছি আমরা। সেই আগুন থেকে সূর্য হয়ে উঠতে চাই, তাই এগোব সপ্তপদী। অগ্নী উষা সবিতা ভগ পূষা সূর্য বিষ্ণু—অন্ধকার থেকে বিশ্বহিৎ জ্যোতিতে এই ক্রম উত্তরণই বৈদিক পরিভাষায় সপ্তপদী। 'নূতন করিয়া লহ আরবার নবীন জীবনভোর', সপ্তপদীতে এই প্রার্থনাই আছে। — লেখিকা]

পশ্যন্তী মধ্যমা
বাক্ বোঝে কার সাধ্য মা।
বই খুঁড়ি আর যাই খুঁড়ি
বৈখরী সেই বৈখরী।
তাই তো এবার তিনের মাথায় পাক দিয়েছি বাক্—
ঢক থাকে তো পরাৎপরের টনক নড়ে যাক।
রাজতন্ত্র গণতন্ত্র
খরতন্ত্র পরতন্ত্র
ঢের করেছি ঢের সয়েছি ঢের বয়েছি তন্ত্রসাধন এবার তাকাই দিক
সব সাধনায় জমিয়ে বসি বিশ্বস্বতান্ত্রিক
সবে প্রাণ সব-শবে প্রাণ
জাগো হে অগ-ভগবান
জাগৃহি মহাগৃহী
জাগো অহি বিষাসহি
আর নয় বিষ নয় বিষ
জাগো হে বিশ্‌পতি বিশ্‌
জাগো বৈশম্পায়নী
নরগূঢ়া নারায়ণী
আর নয় বিষ্ণু-পদে
জাগো মা-বিষ্ণুপদে
বোসো, মা, বিষ্ণুপদে
হেসে ওড়াও বিষ্ণুপদে
বামনের আর্তনাদে কাঁদে মা সপ্ত ভুবন
ভোগবতীর ঘূর্ণিপাকে বলী ঘোরে বন্ বন্ বন্
ত্রিপদের দশম দশা। ধেয়ে আয় মা ত্রিপদী
জলে জলে জালিয়েছি আগ এগোব সপ্তপদী
(জ্বলে জ্বলে······)

বাহন আখ্যান

শ্রীমতী জয়ন্তী সিংহ

মূষিক

সর্বাগ্রে বন্দনা করি দেব গজানন-
সিদ্ধি-দাতা কেন হন "মূষিক" বাহন ?
কর্মফল যতদিন থাকে বিদ্যমান,
জীবাত্মার সিদ্ধিলাভ হয় না তখন।
সিদ্ধির প্রতিবন্ধী যেই কর্মফল,
ভোগ ত্যাজি কর লয়, ইচ্ছা সে সকল।
মানবজীবনে যদি চাও ব্রহ্মজ্ঞান,
কর্মফল কেটে ফেলো "মূষিক" সমান।
হইলে মূষিকধর্মী হবে সিদ্ধিলাভ,
গণেশের বাহন তাই মূষিকের ভাব।

পেচক

লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা হল কি কারণ ?
সু-গভীর গুপ্ত তত্ত্ব তাহার আখ্যান।
জগতের জীব থাকে, পেচকের ন্যায়,
অকারণে সূর্যোদয়ে শুধুই ঘুমায়।
আত্মজ্ঞানহীন নর অন্ধের সমান
পেচকের অনুরূপ রহে বিদ্যমান।
করে লক্ষ্মী আরাধনা ভোগ ইচ্ছা করি,
তাই মাতা ধনেশ্বরী পেচক উপরি।
থাকিও না অন্ধ হয়ে পেচক সমান,
অন্তরে উদিত হোক্ ভক্তি, শ্রদ্ধা জ্ঞান।

বৃষ

শ্বেত-শুভ্র চতুষ্পদ শিবের বাহন,
বৃষ নামে পরিচিত জানে সর্বজন।
'সত্য-সুন্দর-শিব-মঙ্গলময়'
স্মরিলে চরণ তাঁর যায় পাপ ভয়।
শুভ্রবর্ণ ধর্মরূপ বৃষের সম্পদ,
"তপ" "শৌচ" "দয়া" "দান" এই চতুষ্পদ।
বৃষধর্মী হও এই প্রতীক স্মরিয়া,
তুষ্ট হবেন মহেশ্বর যেও না ভুলিয়া।
পুষ্প-বিল্ব-গঙ্গাজলে পূজা অকারণ,
অন্তরেতে বৃষধর্মী হও নরগণ।

হংস

হংস-পৃষ্ঠে সরস্বতী দেবী অধিষ্ঠিতা—
সাধকের ব্রহ্মবিদ্যা রূপে যে পূজিতা।
অজপা মন্ত্রে যে সিদ্ধ হংসধর্মী তিনি
একুশ হাজার ছয় শত হংস নাম গণি।
শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে স্বাভাবিক জপে
লভে পূর্ণব্রহ্ম বিদ্যা হংসধর্মী রূপে।
হংস পক্ষী মানবেরে দেয় সার জ্ঞান—
অসার ত্যাজিয়া কর অমৃত সন্ধান।
হংস যথা নীর ত্যাজি ক্ষীর পান করে,
মোহ ত্যাজি জ্ঞানলাভ কর চরাচরে।
প্রসন্না হবেন তবে দেবী সরস্বতী,
প্রতীক বাহন তাই হংসের আকৃতি।

সিংহ

সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা দশভূজা
চরণে প্রণত হয়ে করি তাঁর পূজা।
কিন্তু কেন হল তাঁর সিংহ বাহন
কারণ খুঁজিয়া হৃদি ফেরে অনুক্ষণ।
হিংস্র প্রতাপশালী সিংহ পশুরাজ
অধীনস্থ পশু সব ধ্বংস তার কাজ।
মানব জনমই ভবে জীব শ্রেষ্ঠ জানি,
জীবত্বের নাশ করি হও ব্রহ্মজ্ঞানী।
সিংহধর্মী হয়ে কর দেবী আরাধন,
তাঁহার প্রতীক তাই "সিংহ" বাহন।

ময়ূর

কার্তিকেয় বীর যোদ্ধা পার্বতী-নন্দন,
রাজবেশ তবু কেন ময়ূর বাহন ?
জীবের মাঝারে দেখ শ্রেষ্ঠ তার গুণ,
বরষার আগমনে নাচে সু-নিপুণ।
বিচিত্র পেখম তার দেহের 'পরে,
অরি তার সর্পকুল এই চরাচরে।
সেরূপ মানব জন্মি বিচিত্র জগতে,
সর্পরূপী কর্মপাশ কাটিবে ধরাতে।
প্রেম ভক্তি বরিষণে নাচুক অন্তর
হরি নাম গানে পূর্ণ হোক্ কণ্ঠস্বর।
ধর্ম-কর্ম দুই পথে ময়ূরের গতি,
বাহনে প্রতীক করে দেব সেনাপতি।

হস্তী

কমলে কামিনী মাতা হস্তীর উপর
অমৃত কলস কক্ষে দিব্য মনোহর।
শান্তি সুধা প্রদায়িনী জননী আমার
দীর্ঘবপু শ্বেত হস্তী বাহন তাঁহার।
প্রতীক ইহার বুঝ মনেতে ভাবিয়া,
হস্তী খাদ্য টানি লয় শুঁড়েতে ধরিয়া।
বৃহৎ দুইটি দন্ত থাকে কর্মহীন,
নিরাসক্ত উদাসীন কামনা বিহীন।
সেরূপ মনুষ্যকুল থাক ধরা মাঝে
দুঃখ শোক টানি লও আপনার মাঝে।
হস্তীদন্ত নির্বিকার তবু মূল্যবান
অনাসক্ত নর লভে সু-বৃহৎ প্রাণ।

গরুড়

জ্ঞান-চৈতন্যরূপী দেব নারায়ণ,
ভ্রমণে তাঁহার সঙ্গী গরুড় বাহন।
গূঢ় তত্ত্ব এর মাঝে করহ সন্ধান,
প্রতীক বুঝিয়া জীব লভ মহাজ্ঞান।
গরুড়ের দুটি পাখা "ধর্ম" "কর্ম" রূপী,
জ্ঞানে কর্মে সিদ্ধ হও মন প্রাণ সঁপি।
গরুড় ভক্ষণ করে কুটিল সর্পেরে,
সেরূপ কুটিল গতি নাশিবে সংসারে।
হইয়া গরুড়ধর্মী ভজ নারায়ণ,
সর্বজীবে হরিময় হবে দরশন।
লভিবে পরম পদ অন্তিমের কালে,
বিষ্ণুলোকে পাবে স্থান চরণ কমলে।

'রামচরিতমানসে' নামমহিমা

স্বামী পুরাণানন্দ

সৎগুরু-উপদিষ্ট শ্রীভগবানের পুণ্যনাম সশ্রদ্ধ-চিত্তে ও একাগ্রমনে জপ করিয়া সাধক ক্রমে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন—এই কথা বহুজনবিদিত। বিশেষ করিয়া কলিকালের মন্দাধিকারীর পক্ষে ভগবন্নাম কীর্তন-রূপ সাধনই অপেক্ষাকৃত সুকর অথচ পরম ফলপ্রসূ বলিয়া আচার্যগণ নির্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিলোপাখ্যানে দেখি, ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব, সদাচারসম্পন্ন অজামিল দুর্দৈব-ক্রমে সহসা এক শূদ্রা দাসীর প্রতি মোহগ্রস্ত হওয়ায় স্বীয় কুলোচিত সদাচার বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং নানা অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া উক্ত দাসীর সন্তোষবিধানে সতত তৎপর থাকিতেন। এই নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বৃত্তিসহায়ে সুদীর্ঘকাল বিষয়সেবান্তে অষ্টাশীতি বৎসর বয়সে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, অজামিল দেখিলেন ভয়ংকরদর্শন তিনজন যমদূত তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছে। অত্যন্ত ভীত ও বিহ্বল হইয়া অজামিল তখন উক্ত দাসীর গর্ভজাত 'নারায়ণ' নামক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে নাম ধরিয়া ডাকিতেই, সুদর্শন, চতুর্ভুজ বিষ্ণুদূতগণ তথায় সহসা উপস্থিত হইলেন। যমদূতেরা অজামিলকে

যমালয়ে লইয়া যাইতে চাহিলে, বিষ্ণুদূতগণ তাহার বিরোধিতা করিলেন। উভয়পক্ষে তখন যে বাদানুবাদ হইল, ভগবন্নাম-মহিমা আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা স্মরণীয়।

বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন—

অয়ং হি কৃতনির্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥
(৬।২।৭)

—বিবশ হইয়াও অন্তিমকালে হরিনাম উচ্চারণ করায় অজামিল শুধু এই জন্মেরই নহে, বরং কোটিজন্মকৃত দুষ্কৃতরাশির প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে এবং হরিনাম কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্তকরই নহে পরন্তু মোক্ষপ্রদও বটে। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুদূতগণ আরও বলিলেন যে, পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুসারে গুরু বা লঘু প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যথাবিধি অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্ত কেবল দুষ্কৃতি নাশেই পর্যবসিত হয়, কিন্তু হরিনাম, পাপ তো নাশ করেই, অধিকন্তু কর্মাধিকারীর পাপ প্রবৃত্তিরও নাশক হয়। ইহাই হরিনামের বৈশিষ্ট্য (ভাগবত, ৬।২।১৬-১৭)। বিষ্ণুদূতগণ এইভাবে যমদূতদিগকে নিরস্ত করিয়া অজামিলকে যমপাশ হইতে রক্ষা করিলেন। বিষ্ণুদূতগণের যুক্তি শ্রবণে স্তম্ভিত অজামিলের হৃদয়ে তখন নির্বেদ উপস্থিত হইল এবং তিনি তখন পুত্রাদিতে আসক্তিরহিত হইয়া গঙ্গাদ্বারে গমনান্তে শ্রীহরির ধ্যানে কালাতিপাত করিতে করিতে যথাসময়ে দেহত্যাগান্তে বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিলেন।

ভগবন্নাম-মহিমা সূচক এই উপাখ্যান বর্ণনান্তে শ্রীমদ্ভাগবতপ্রবক্তা শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে বলিলেন—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥
(ভাগবত, ৬।২।৪৯)

—মুমূর্ষু অজামিল পুত্রের উদ্দেশে 'নারায়ণ' —এই নাম উচ্চারণ করিয়া পরমধাম লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবন্নাম গ্রহণ যে অশেষ কল্যাণকর তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে সন্ত তুলসীদাসের অমর কাব্য 'রামচরিতমানস' অবলম্বনে, ভগবন্নাম মহিমা প্রচারে তাঁহার অবদানের কথা আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

'রামচরিতমানসে'র সূচনায় তুলসীদাস বিবেকের প্রেরণায় স্বীয় মনকে 'রাম' নামের অশেষ কল্যাণ-কারী শক্তির কথা এইভাবে স্মরণ করাইয়াছেন—

রাম নাম মনি দীপ ধরু জীহ দেহরীদ্বার।
তুলসী ভীতর বাহরহুঁ জৌ চাহসি উঁজিআর॥
(বালকাণ্ড-৩৭ *)

—দেহলী অর্থাৎ চৌকাঠের নিচের কাঠের সমীপে স্থাপিত প্রদীপ যেমন ঘরের ভিতর-বাহির উভয় স্থানই আলোকিত করে, তদ্রূপ জিহ্বারূপ দেহলীতে স্থাপিত রামনামরূপ বহুমূল্য প্রদীপ জাপকের ভিতর ও বাহির (চৈতন্যদীপ্তির) আভায় উদ্ভাসিত করে। অতএব হে তুলসীদাস, জিহ্বায় রামনাম-রূপ প্রদীপ ধারণ কর।

বিষয়বৈরাগ্য সহকারে শ্রীভগবানের নাম আশ্রয় করিলে কি ফললাভ হয়, সে সম্বন্ধে তুলসীদাস বলিতেছেন—

নাম জীহ জপি জাগহিঁ জোগী।**
বিরতি বিরঞ্চি প্রপঞ্চ বিয়োগী॥
ব্রহ্মসুখহি অনুভবহিঁ অনূপা।
অকথ অনাময় নাম ন রূপা॥ (বালকাণ্ড-৩৮)

* উদ্ধৃতিগুলি ৺সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত এবং খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামচরিতমানসের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত।

** 'য', 'শ' এবং 'ণ'-স্থলে তুলসীদাস প্রায়ই 'জ', 'স' এবং 'ন'-এর ব্যবহার করিয়াছেন।

—ব্রহ্মার সৃষ্ট এই জগৎ প্রপঞ্চে বৈরাগ্যবান যোগী-গণ জিহ্বায় নাম গ্রহণ করিয়া (সদা) জাগ্রত থাকেন, অর্থাৎ নামগুণে তাঁহারা অবিদ্যারূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হন। যে অনুপম ব্রহ্মসুখ তখন তাঁহারা অনুভব করেন তাহা নামরূপের অতীত, অবর্ণনীয় এবং সর্বপ্রকার উপদ্রবরহিত। তুলসীদাস আরও বলিতেছেন—

জানা চহহিঁ গূঢ় গতি জেউ।
নাম জীহজপি জানহিঁ তেউ॥
সাধক নাম জপহিঁ লউ লায়ে।
হোহিঁ সিদ্ধ অনিমাদিক পায়ে॥ (ঐ)

—যদি কেহ গূঢ়গতি (আত্মা ও পরমাত্মার গূঢ় রহস্য) জানিতে চায়, তবে নাম জপের দ্বারা তাহা জানিতে পারে। তন্ময় হইয়া নামজপ করিলে সাধক সিদ্ধ হন ও অণিমাদি সিদ্ধি লাভ করেন।

কিন্তু ভগবন্নাম কি কেবল সংসারবিরাগী, তত্ত্বা-ন্বেষী বিরল কিছু সুকৃতিবান সাধকেরই অবলম্বনীয়, অপর কাহারও নহে? না, তাহা নহে। নানা-প্রকার সাংসারিক বিপদাপদ মানবজীবনের যেন চিরসঙ্গী; এমন কি কখনও কখনও আমাদের জীবনতরণী সংসারজলধির ভয়ংকর তরঙ্গাঘাতে যেন নিমজ্জিতপ্রায় হয়—এমন সঙ্কটকালেও ধৈর্য-সহকারে, ভরসা করিয়া হরিনাম লইলে আমরা বিপন্মুক্ত হইতে পারি। সন্ত তুলসী বলেন—

জপহিঁ নামু জন আরত ভারী।
মিটহিঁ কুসঙ্কট হোহিঁ সুখারী॥ (ঐ)

—নিদারুণ সঙ্কটে পড়িয়া কেহ যদি ভগবন্নাম জপ করেন, তবে (নামের গুণে) তাঁহার সঙ্কট কাটিয়া যায়, তিনি সুখী হন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুকৃতিবান চার প্রকার (আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, এবং জ্ঞানী) ভক্তের কথা বলিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ইহাদের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তই তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়। (৭/১৬, ১৭) গীতার এই কথা তুলসীদাস অতি সরলভাবে প্রচার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন উক্ত চার প্রকার ভক্তবৃন্দের সকলেই ভগবন্নাম আশ্রয়ী।—

রাম ভগত জগ চারি প্রকারা।
সুকৃতী চারিউ অনঘ উদারা॥
চহূঁ চতুর কহুঁ নাম অধারা।
জ্ঞানী প্রভুহি বিসেষি পিয়ারা॥
চহুঁ জুগ চহুঁ শ্রুতি নাম প্রভাউ।
কলি বিসেষি নহিঁ আন উপাউ॥ (ঐ)

—সুকৃতিবান্, নিষ্পাপ এবং উদার চার প্রকার রাম-ভক্ত জগতে আছেন। ইঁহারা সকলেই নামাশ্রয়ী, তবে জ্ঞানীভক্ত শ্রীপ্রভুর বিশেষ প্রিয়। চার যুগে ও চার বেদে নামের প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে, তবে কলিকালে নাম ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

নিষ্কাম ভক্তের চিত্তে যে বিষয়নিরপেক্ষ, অলৌকিক এবং অপরিসীম আনন্দমাধুর্যের অভি-ব্যক্তি হয়, সেই সম্বন্ধে তুলসীদাস বলিতেছেন—

সকল কামনা হীন জে রাম ভগতি রস লীন।
নাম সুপ্রেম পিযষ হ্রদ তিনহুঁ কিয়ে মন মীন॥ (ঐ)

—(ভোগ, এমন কি মোক্ষ বিষয়েও) যিনি সম্পূর্ণ বাসনারহিত হইয়াছেন—রামভক্তি-রসে যিনি লীন হইয়া থাকেন, ভগবন্নামের প্রেমামৃত হ্রদে তাঁহার মনরূপ মীন সানন্দে বিহার করে।

নাম ও নামী অভেদ—তথাপি নামী অপেক্ষা নামের মহিমা অধিকতর, ইহাই তুলসীদাসের বিশ্বাস—

কহেউ নামু বড় রাম তেঁ নিজ বিচার অনুসার।
(বালকাণ্ড—৩৯)

—আমি তুলসীদাস বলি, শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার নাম অধিকতর মহিমময়। এই প্রসঙ্গে তুলসীদাস শ্রীরামচন্দ্রের জীবনলীলা হইতে যেসব ঘটনাবলীর প্রতি 'রামচরিতমানসে' পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং স্বীয় ধারণার

সমর্থনে যে দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে ঐ সকল ঘটনাবলীর উপর মন্তব্য করিয়াছেন তাহা যেমন যুক্তিপূর্ণ, তেমনই সরস ও ভক্তিরসস্নিগ্ধ।—

রাম ভগতহিত নরতনু ধারী।
সহি সঙ্কট কিয় সাধু সুখারী॥
নাম সপ্রেম জপত অনয়াসা।
ভগত হোহিঁ মুদ মঙ্গল বাসা॥ (ঐ, ৪০)

—ভক্ত হিতার্থে নরতনুধারী শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বিপত্তি স্বীকার করিয়া সাধুগণকে সুখী করিয়াছেন, কিন্তু ভক্ত, প্রেমের সহিত তাঁহার নাম করিয়া অনায়াসে আনন্দময় ও মঙ্গলময় হইয়া উঠেন।

রাম এক তাপস তিয় তারী।
নাম কোটি খল কুমতি সুধারী॥
রিষি হিত রাম সুকেতুসুতা কী।
সহিত সেন সুত কীন্হ বিবাকী॥ (ঐ)

—শ্রীরামচন্দ্র এক তপস্বীর পত্নীকে (অহল্যা) উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু 'রাম' নাম কোটি কোটি দুষ্টের দুর্মতি শোধন করে। বিশ্বামিত্রের হিতার্থে রাম সুকেতু নামক যক্ষের কন্যা তাড়কাকে, তাহার পুত্র ও অনুচরবৃন্দ সহ বধ করিয়াছিলেন।

সহিত দোষ দুখ দাস দুরাসা।
দলই নামু জিমি রবি নিসি নাসা॥
ভঞ্জেউ রাম আপু ভব চাপূ।
ভব ভয় ভঞ্জন নাম প্রতাপূ॥ (ঐ)

—(কিন্তু) তাঁহার নাম ভক্তের দোষ, দুঃখ এবং দুর্বাসনা নাশ করে—সূর্য যেমন অন্ধকার নাশ করে। (হ্যাঁ, একথা সত্য যে) শ্রীরামচন্দ্র হরধনু ভাঙ্গিয়াছিলেন কিন্তু 'রাম' নামের এমনই প্রতাপ যে, তাহা সংসারভীতি নাশ করে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ হইতে ভক্তকে রক্ষা করে।

দণ্ডকবন প্রভু কীন্হ সোহাবন।
জনমন অমিত নাম কিয় পাবন॥
নিসিচর নিকর দলে রঘুনন্দন।
নামু সকল কলি কলুষ নিকন্দন॥ (ঐ)

—প্রভু (শ্রীরামচন্দ্র) এক দণ্ডকারণ্যই পবিত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু 'নাম' অগণিত মানুষের (ভক্তের) মনরূপ বনকে বিশুদ্ধ করে। শ্রীরাম স্বয়ং রাক্ষসকুল দলন করিয়াছিলেন, কিন্তু নাম সমুদয় কলিমলনাশী।

সবরী গীধ সুসেবকনি যুবতি দীন্হি রঘুনাথ।
নাম উধারে অমিত খল বেদ বিদিত গুণ গাথ॥ (ঐ)

—শ্রীরামচন্দ্র (কেবল) শবরী, জটায়ু এবং স্বীয় ভক্ত সেবকগণকে সদ্গতি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, তাঁহার নাম অগণিত দুষ্টকে উদ্ধার করিয়াছে।

রাম ভালু কপি কটকু বটোরা।
সেতু হেতু শ্রমু কীন্হ ন থোরা॥
নাম লেত ভব সিন্ধু সুখাহীঁ।
করহু বিচারু সুজন মন মাহীঁ॥ (ঐ, ৪১)

—ভালুক ও বানরসেনার সাহায্যে, যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার 'নাম' লইতেই ভয়ংকর ও অপার ভবসাগর শুষ্ক হইয়া যায়। কাজেই সুধীবৃন্দ বিচার করিয়া দেখিবেন (রাম বড় কি 'নাম' বড়!)।

নাম প্রসাদ সম্ভু অবিনাসী।
সাজ অমঙ্গল মঙ্গল রাসী॥
সুক সনকাদি সিদ্ধ মুনি জোগী।
নাম প্রসাদ ব্রহ্ম সুখ ভোগী॥ (ঐ)

—নামের প্রসাদেই (নামাশ্রয়ী হইয়াই) শিব অবিনশ্বর, (চিতাভস্ম, সাপ প্রভৃতি) অমঙ্গল সাজে সজ্জিত হইয়াও (নামের প্রসাদে) শ্রীমহাদেব মঙ্গলধাম। শুকদেব, সনকাদি সিদ্ধ মুনি ও যোগীগণ নাম-প্রসাদেই (বিষয়-নিরপেক্ষ) ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করেন।

নারদ জানেউ নাম প্রতাপূ।
জগ প্রিয় হরি হরি হর প্রিয় আপূ॥
নাম জপত প্রভু কীন্হ প্রসাদূ।
ভগত সিরোমনি ভে প্রহ্লাদূ॥ (ঐ)

—নামের শক্তি কত দেবর্ষি নারদ তাহা জানেন, শ্রীহরি জগতের প্রিয় আর নারদ (নামভক্ত বলিয়া) হরি ও হর—উভয়েরই প্রিয়। নাম-জপের ফলে শ্রীহরির প্রসন্নতা লাভ করিয়াই প্রহ্লাদ ভক্তশিরোমণি হন।

ধ্রুব সগলানি জপেউ হরি নাউ।
পায়েউ অচল অনূপম ঠাউঁ॥
সুমিরি পবনসুত পাবন নামূ।
অপনে বস করি রাখে রামূ॥ (ঐ)

—বিমাতার কঠোর বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে ধ্রুব হরিনাম জপ করেন এবং তাহার ফলে অতুলনীয় অচল ধাম লাভ করেন। পবিত্র 'রাম' নাম জপ করিয়া পবনপুত্র হনুমান শ্রীরঘুনাথকে স্ববশে রাখিয়াছেন অর্থাৎ হনুমানের প্রতি রামের স্নেহবাৎসল্য সর্বদাই উন্মুখ হইয়া আছে।

সত্য, ত্রেতাদি যুগভেদে পরমার্থ লাভের সাধনা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সন্ত তুলসী এই সত্য অতি সরলভাবে নিম্নোক্ত প্রকারে প্রচার করিয়াছেন—

ধ্যানু প্রথম জুগ মখ বিধি দূজে।
দ্বাপর পরিতোষন প্রভু পূজে॥
কলি কেবল মল মূল মলীনা।
পাপ পয়োনিধি জনমন মীনা॥ (ঐ, ৪৩)

—সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় যাগযজ্ঞের দ্বারা এবং দ্বাপরে পূজার দ্বারা শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ করা যায়। কিন্তু কলিকাল অনর্থ মূল, মলিন এবং যেন পাপের সমুদ্র স্বরূপ, আর মানবমন এই পাপসমুদ্রেই মৎস্যতুল্য হইয়া আছে অর্থাৎ মাছ যেমন সোল্লাসে ও স্বচ্ছন্দে জলে বিহার করে, কলিকালের মানুষও তেমনই কামকলুষিত হৃদয়ের প্রেরণায় রূপ-রসাদি বিষয়-সাগরেই মগ্ন হইয়া থাকিতে ভালবাসে।

কলিকালের নানা দোষরাশি বর্ণনান্তে শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৩।৫১) কলিকালের যে প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্তন করিয়াছেন তাহাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

—কলিকাল সর্বদোষাকর হইলেও তাহার একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, কলিকালে মানুষ একমাত্র কৃষ্ণনাম কীর্তনের ফলে সর্বাসক্তি মুক্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ করিতে পারে।

তুলসীদাসও বলিতেছেন—

নাম কামতরু কাল করালা।
সুমিরত সমন সকল জগজালা॥
রামনাম কলি অভিমত দাতা।
হিত পরলোক লোক পিতুমাতা॥
(বালকাণ্ড, ৪৩)

—করাল কলিকালে নামই কল্পবৃক্ষ-সদৃশ, যাহার স্মরণে ত্রিতাপজ্বালা বিদূরিত হয় ও বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। নামাশ্রয়ী পরলোকে পরম কল্যাণ লাভ করেন এবং ইহকালে 'নাম' মাতাপিতার ন্যায় নামাশ্রয়ীকে রক্ষা করে।

রামনাম নরকেসরী কনক কসিপু কলিকালু।
জাপক জন প্রহ্লাদ জিমি পালিহি দলি সুরসালু॥
(ঐ)

—রামনাম যেন নৃসিংহ অবতার আর কলিকাল হিরণ্যকশিপু এবং জাপক হইলেন প্রহ্লাদ; দেব-শত্রু হিরণ্যকশিপুতুল্য কলিকালের সকল অনর্থকর প্রভাব হইতে নামজাপক ভক্তকে রক্ষা করেন।

ভগবন্নামে যে মাধুর্য নিহিত আছে সেই সম্বন্ধে নামামৃতপান-রসিক তুলসীদাস যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারি।—

সংসারাময়ভেষজং সুখকরং শ্রীজানকীজীবনং।
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং
শ্রীরামনামামৃতম্॥ (কিঃ কাণ্ড)

—সংসার-ব্যাধির পক্ষে মহৌষধ, সুখকর, সীতার জীবনসদৃশ, রামনামের অমৃতরস যাঁহারা সতত পান করেন তাঁহারাই ধন্য।

ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় শিল্প-আন্দোলন

ডক্টর বন্দিতা ভট্টাচার্য

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৫ মার্চ ভারতবর্ষের কয়েক সহস্র বৎসরের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এক বিপ্লব ঘটে গেল—অত্যন্ত নীরবে; মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানুষের সম্মুখে জড়বাদী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ পাদপীঠ ইংল্যাণ্ড তথা প্রতীচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—প্রতিভা, তেজস্বিতা ও পবিত্রতায় দ্যুতিমতী এক নারী—প্রাচ্যের সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসীর পাদমূলে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন—

"দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র
দাও গো জীবন নব।
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব,
মৃত্যু-তরণ, শংকাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব।"

প্রাথমিক পরীক্ষান্তে পূর্ণ হল প্রার্থনা। যুগযুগ-ব্যাপী বন্দিত প্রাচ্যের সর্বোত্তম ব্রত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিতা হয়ে মিস্ মার্গারেট নোবল্ জন্মান্তরিতা হলেন 'নিবেদিতা'য়, গ্রহণ করলেন সেই মন্ত্র যার সিদ্ধি প্রজ্বলন্ত ত্যাগে ও বৈরাগ্যে, অভিষিক্তা হলেন বুদ্ধের আদর্শে যিনি 'বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায়' বারংবার মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হয়ে 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'কে অপার্থিব প্রেম ও করুণায় পরিপ্লাবিত করেছিলেন, আর তাঁর গুরু-প্রদত্ত জপমালার প্রতিটি অক্ষে জ্যোতির্ময় হয়ে ফুটে উঠল মাত্র দুটি শব্দ—'ভারতকে ভালবাস।' যে মহান্ নাটকের সূচনা ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরের একটি ছোট ঘরে, যার ক্রমবিস্তার ১৮৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দ থেকে, তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য অভিনীত হয়ে গেল এইভাবে! স্বামী বিবেকানন্দ মানব ইতিহাসে সর্বার্থেই প্রথম বিশ্ববিজয়ীর গৌরব-তিলকে ভূষিত হয়ে তদীয় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ-ন্যস্ত কঠিন ব্রতের পারণ করে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন! কিন্তু স্বামীজীর কাজ কি এখানেই শেষ হয়ে গেল? না,—বরং বলতে হবে, একদা তিনি যেমন তাঁর শ্রীগুরুকে 'বিড়ে' নিয়েছিলেন প্রতিটি ক্ষেত্রে, এবার তাঁকেও প্রতিপদে পরীক্ষা দিতে হল এই নবদীক্ষিতা শিষ্যার কাছে—কারণ এঁকে যে গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যৎ ভারতের 'বান্ধবী, সেবিকা, মাতা'রূপে, পরিপূর্ণ শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের শিক্ষা দিতে হবে বিবেকানন্দের 'মানসকন্যা'-র ভূমিকা পালন করার, 'বীরের দৃঢ়তা আর মাতার হৃদয়' সমন্বিত হয়ে ভবিষ্যৎ ভারতের 'ভগিনী' ও 'লোকমাতা'-রূপে চিহ্নিত হবার শাশ্বত গৌরবটি যে এঁকেই বরণ করার জন্য পরমাগ্রহে অপেক্ষমাণ! তাই, বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য বিবেকানন্দ কালবিলম্ব না করে শিষ্যার নবপ্রদত্ত নামের সার্থক রূপায়ণে ব্রতী হলেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরের মাঝামাঝি লণ্ডনের এক বিদুষী, অভিজাত মহিলার ড্রয়িং-রুমে যাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করে নিবেদিতা প্রথম আলোড়িতপ্রাণা হয়ে উঠেছিলেন, দীর্ঘ তিন বৎসর প্রস্তুতির অন্তে তাঁরই শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে বললেন—'শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।' গুরুও যাঁকে *'the fairest flower of my work in England'* বলে স্বদেশবাসীর কাছে পরিচিত করেছিলেন, এইবার তাঁকেই, আমাদের ভাষায় *'a Lady of Indian and Western Energy'*—কোমলে-কঠিনে—ত্যাগে-বীর্যে গড়ে তোলবার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন, 'অভীঃ' মন্ত্রে দীক্ষিতা করে

ঘোষণা করলেন—'আমার জগদ্ধিতায় কর্মের আরম্ভ তোমাকে লইয়াই—ইহা মনে রাখিয়া কায়মনোবাক্যে ভারতের সেবায় নিজেকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া—সম্পূর্ণ করিয়া তোল' কিন্তু, কেমন করে এই দুরূহ কর্ম সম্ভবপর হল ?

অলৌকিক প্রজ্ঞাবান শিক্ষক বিবেকানন্দ জড়বাদী পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আবাল্য লালিতা ও পুষ্টা শিষ্যার মনোদর্পণে ধীরে ধীরে ভারতের সুপ্রাচীন মহিমময় ঐতিহ্য ও আদর্শের অনবদ্য রূপগুলি প্রস্ফুটিত করে তুলতে লাগলেন। বেলুড়মঠের শান্ত, গম্ভীর পরিবেশে শিষ্যার সম্মুখে স্বামীজী যখন প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল মূর্তির পাশাপাশি বর্তমান ভারতের ম্লান, হতশ্রী অবস্থার করুণ দৃশ্য উপস্থাপিত করতেন, তখন মুহূর্তের মধ্যে তাঁর দৃঢ়স্বর, তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠ বেদনার অশ্রুতে আবেগরুদ্ধ হয়ে যেত। স্বামীজী বুঝিয়ে দিলেন, ভারতকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে গেলে তার জাতীয় জীবনের মর্মমূলে প্রবেশ করতে হবে—পরিচিত হতে হবে তার সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির সঙ্গে। কিন্তু সর্বদাই মনে রাখতে হবে—ধর্মই ভারতের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি আর প্রকৃত ভারতবর্ষ নিহিত আছে তার সাধারণ মানুষদের জীর্ণ কুটীরে। শিষ্যা মুগ্ধ, বিহ্বল হয়ে ভাবলেন—এ কি অদ্ভুত বৈপরীত্য! একদিকে প্রখর ইতিহাস সচেতনতা, সমাজবিজ্ঞানে ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য, অপূর্ব যুক্তিকুশলতা, অন্যদিকে জ্বলন্ত দেশপ্রেম, সংসারত্যাগী হয়েও বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের ব্যথায় মুহ্যমান—কে এই সন্ন্যাসী ? ইনিই কি বর্তমানে বুদ্ধ ও শংকরের মিলিত প্রতিরূপ ?

বিবেকানন্দ বললেন—এ জাতের দুর্ভাগ্যের মূল কারণ আত্মপ্রত্যয়হীনতা, উত্তরাধিকারের গৌরব-বিস্মৃতি, তমোগুণাচ্ছন্নতা। বললেন—এ জাতকে জাগাতে হলে আশু প্রয়োজন 'আপাদ-মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ প্রবাহ' ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটাতে হবে পাশ্চাত্যের কর্মকুশলতা, অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি। নির্দেশ দিলেন—'আগামী পঞ্চাশ বৎসর দেশমাতৃকা তোমাদের একমাত্র উপাস্যা হউন।' ঘোষণা করলেন—'ভারত মাতা সহস্র যুবক বলি চাহেন' এবং সর্বোপরি—'আমি স্বদেশবাসিগণের উন্নতিকল্পে এই যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য, প্রয়োজন হইলে, দুই শতবার জন্ম পরিগ্রহ করিব।' নিবেদিতা আরও দেখলেন—তাঁর গুরু ভারতে পদার্পণ করার পরই প্রচণ্ড উদ্যমে সেবামূলক কর্মে ঝাঁপ দিলেন, বুঝলেন—এঁর মন মুখ এক। অধিকন্তু, ভারত-মহিমার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বিবেকানন্দ শিষ্যাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতের বেশ কিছু প্রসিদ্ধ তীর্থ, জনপদ পরিক্রমা করে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপটিকে তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত করলেন। নিবেদিতার মানস উত্তরণও এই সঙ্গে চরিতার্থতা লাভ করল। শিষ্যার মন থেকে ভারত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যে আহরিত সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়েও বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্যবাসীদের মুক্ত মন, শ্রমশীলতা, বীরত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রশংসা করে ভারতবাসীর অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ধর্মের নামে ব্যভিচারের নিন্দা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলেন না, নিবেদিতা তখনই পরম শ্রদ্ধায় মাথা নত করে ভাবলেন—স্থূল জগতের মালিন্যের কত ঊর্ধ্বে এই মহান্ সন্ন্যাসী বিচরণ করছেন—যাঁর কাছে বিশ্বের সব ধর্ম, সব সম্প্রদায়ের মানুষ সমান আদরণীয়। তাঁর মনে পড়ে গেল, গুরু একবার তাঁকে চিঠিতে লিখেছিলেন—'প্রেমে আমি উন্মাদ, কিন্তু সে প্রেমে কোন বন্ধন নেই।' নিবেদিতা কায়মনোবাক্যে যে-ভারতবর্ষের সর্বতো সেবায় সমর্পিত-প্রাণা হতে কৃত-সংকল্পা হলেন, সে বিবেকানন্দেরই ভারতবর্ষ।

আধুনিক ভারতের নব জাগৃতির শ্রেষ্ঠ উদ্বোধক স্বামীজী, যাঁকে উত্তরকালের ভারতীয় নেতৃবৃন্দ একবাক্যে বলেছেন—'*The Maker of Modern India.*' স্বামীজীই সেযুগে একমাত্র পুরুষ, যিনি ভারত তথা ভারতবাসীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তাভাবনার রসদ দিয়ে গেছেন, কারণ স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণই ছিল তাঁর একমাত্র ব্রত। ধর্ম-প্রচার বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান বলতে স্বামীজী বুঝেছিলেন মানুষের পূর্ণতার বিকাশে সহায়তা করা। এই দৃষ্টিতে সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, কলা ও বিজ্ঞান ধর্মেরই এক এক অভিব্যক্তি। তিনি এসেছিলেন এই মৃতপ্রায় জাতকে সজীব করে তুলতে—'Man Making' ই ছিল তাঁর আসল লক্ষ্য। তাই সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন—সর্বক্ষেত্রেই তিনি নিজে এগিয়ে গিয়ে সহযাত্রীদের উৎসাহিত করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন প্রাচীন ও আধুনিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের সুষম সমন্বয় সাধনে। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর থেকে ৯ বছর তিন মাস (৪ জুলাই, ১৯০২—১৩ অক্টোবর, ১৯১১) নিবেদিতা স্বেচ্ছাতাড়িতা হয়ে কিছুই করেননি, গুরুর একমাত্র জ্বলন্ত নির্দেশ —'তোমার দ্বারা ভারতের অনেক কাজ হইবে' —নিজের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পালন করে গেছেন। দুটি কথা খুব জোর দিয়ে বলতেন নিবেদিতা—'আমি শিক্ষয়িত্রী' এবং 'আমার কাজ জাতিকে জাগিয়ে তোলা'। গুরু ভবিষ্যদ্দৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন বলেই তো নিবেদিতাকে সন্ন্যাস দিলেন না!

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক্। প্রশ্ন হল—নিবেদিতার শিল্প-সাধনা তথা ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে তাঁর উত্তরাধিকার কোথা থেকে জন্ম নিল? বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও স্বামীজীই তাঁর প্রথম ও শেষ গুরু ও পথপ্রদর্শক। আজীবন শিল্প-সৌন্দর্যের সাধক ও অসাধারণ শিল্প-বোদ্ধা স্বামীজীর সভাপতিত্বে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ১ মে বলরাম-ভবনে অনুষ্ঠিত এক ঐতিহাসিক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কর্মপদ্ধতিগুলির অন্যতম—'শিল্পকলাদির বিবর্ধন ও উৎসাহদান' (নন্দলাল-জন্ম-শতবার্ষিকী 'দেশ' বিনোদন সংখ্যা, ১৩৮৯-এ প্রকাশিত রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়ের 'নন্দলাল' সম্বন্ধে প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)। আর একটু পেছিয়ে গেলে দেখতে পাব স্বামীজীও এই গভীর শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পানুরাগের শক্তিলাভ করেছেন তাঁর শ্রীগুরু স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গে নন্দলাল বসুর স্মরণীয় মন্তব্য—'ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) মহাশিল্পী ছিলেন।··· ঠাকুর যখন যা হতে চাইতেন তখনই তাই হয়ে যেতে পারতেন' (পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)। '···আমার মনে হয়, স্বামীজী তাঁহার নিকট প্রথম শিল্পের গূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন।··· ঠাকুর প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু অতি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। একবার স্বামীজীর observation-এ চাতক পাখি ও চামচিকের মধ্যে তফাৎ সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তিনি রূপপতি ছিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁহার হৃদয়ের সব ভাবই রূপে পরিণত হত।' (শারদীয় 'যুগান্তর' ১৩৮৯—'নন্দলাল' সম্পর্কিত প্রবন্ধ—রঘুনাথ গোস্বামী)। উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্য দুটি অসাধারণ তাৎপর্যবাহী। অধ্যাত্ম-সাধনা ও শিল্প-সাধনা মূলে এক, পথ ভিন্ন। শুধুমাত্র দৃষ্টিসম্পাতেই মানুষের জীবনকে যিনি আমূল রূপান্তরিত করে দিতে পারতেন, সেই 'অবতারবরিষ্ঠ', শ্রীরামকৃষ্ণ যে শিল্পীবরিষ্ঠও হবেন, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে! বাল্যকাল থেকেই ঠাকুর দেবদেবীর মূর্তিগঠনে জীবন্ত নৈপুণ্য লাভ করেছিলেন। পুঁথি নকল করতে করতে অজান্তে সুন্দর

সুন্দর ছবি ফুটে উঠত তাঁর হাত দিয়ে। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর আঁকা 'জাহাজ' ও 'আতাগাছে তোতা পাখি' ছবি দুখানির কথা স্মরণ করতে হয়। শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-বিগ্রহের ভগ্ন পা জোড়া দেবার ঘটনা তো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু, এহো বাহ্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের এত সব করার কি দরকার ছিল? পূর্ব পূর্ব অবতারবৃন্দের জীবন-কাহিনীতে তো এ ধরনের তেমন কিছু পাই না। বস্তুতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবারে অবতীর্ণ হলেন পরিপূর্ণ সত্ত্বগুণ নিয়ে—কোন কিছুই অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত রেখে যাবেন না। গভীরতর অর্থে বলি—সর্ববিধ সাধনার শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধি নির্বিকল্প সমাধি যাঁর কাছে 'হস্তামলকবৎ' ছিল, তিনিই আবার বললেন—'নিত্য থেকে লীলা আবার লীলা থেকে নিত্য—যাঁর নিত্য, তাঁরই লীলা।' এই যে অবিরাম যাওয়া-আসা, এরই মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে শিল্প।

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ নানাভাবে শিল্প ও শিল্পীর স্বরূপ উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। 'চোখের দেখা ও মনের দেখা' মেলাতে পারলে শিল্প সার্থক—'মানুষ মনের মধ্যে ডুব দিয়ে অবিদ্যমানের মধ্যে বিদ্যমানকে ধরলে' হল শিল্পের জন্ম। 'ভক্ত, কবি এবং আর্টিস্ট, এদের কাছে সুন্দর অসুন্দর বলে দুটো জিনিস নেই। সব জিনিসের ও সব ভাবের মধ্যে যে নিত্য বস্তুটি, সেটিই সুন্দর বলে তাঁরা ধরেন।' শিল্পকার্যের মূল রহস্য—'ভেতরের তাগিদ'। ফলশ্রুতি—'আনন্দ'! অবনীন্দ্রনাথ পরিণতি টেনেছেন এই বলে—'যোগী ধ্যান করেন চোখ বুঁজে, আর শিল্পী ধ্যান করেন চোখ খুলে।' উপরি-উদ্ধৃত উক্তিগুলি একসূত্রে গ্রথিত করলে সার নির্যাস—ধর্ম, বিজ্ঞান ও শিল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে সংপৃক্ত, কারণ এ তিনেরই একমাত্র লক্ষ্য—সত্যান্বেষণ ও সত্যোপলব্ধি। স্বামীজী বলতেন—'*Religion is realisation.*' সেই প্রত্যক্ষানুভূতির স্পর্শ আসে নিত্য বস্তুর সন্ধান পেলে আর তখনই সৃষ্টি হয় সেই 'আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল'—যা হয় ঈশ্বরদর্শনে, সমাধিতে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, শিল্পীর তুলির টানে বা ভাস্করের ছেনীর স্পর্শে। কাজেই শিল্পে প্রকৃতি বা বিশেষ কোন বস্তু নিত্য বস্তু হতে পারে না, রসের আলম্বন বলা যায়। 'সৌন্দর্যলোকের সিংহদ্বারের ভিতর দিকে চাবি। নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুলল তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌছোল মন্দিরে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—'মনই সব। মনে বদ্ধ, মনে মুক্ত।' আর বলছেন—'চোখ বুঁজলেও তিনি, চোখ খুললেও তিনি।' সার কথাটি বলছেন—'তিনিই বস্তু, আর সব অবস্তু।' শেষে বলছেন—'হৃদয়ে ভক্তি থাকলে ভাল চিত্র আঁকা যায়।' [ক্রমশঃ]



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

দুর্গতিনাশিনী

কোশল রাজধানী থেকে বেরিয়ে রথে করে এক ভাগ্যহীনা রমণী তাঁর শিশুপুত্র, পরিচারিকা ও বিদল্ল নামে এক মন্ত্রীকে নিয়ে দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে ভাগীরথীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে আসতে না আসতেই তাঁর ধনসম্পদ ও রথখানি দস্যুরা কেড়ে নিল। নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি পুত্র, পরিচারিকা ও মন্ত্রীসহ ভাগীরথী নদী পার হয়ে চিত্রকূট পর্বতে ভারদ্বাজ ঋষির আশ্রমে উপনীত হলেন। রোরুদ্যমানা এক রমণীকে সহসা এমনভাবে উপস্থিত দেখে ভারদ্বাজ ঋষি জিজ্ঞাসা করলেন: হে দেবি! তুমি কে? কোথা থেকে তুমি এই নির্জন বনে এলে? তুমি এত ভয়ে সন্ত্রস্ত কেন? এই বিজন বনমধ্যে শিশুপুত্রকেই বা নিয়ে এসেছ কেন? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন রাজ্যহারা হয়েছ।

দুঃখে ও আবেগে সেই নারী কোন কথা বলতে পারলেন না। তিনি মন্ত্রী বিদল্লকে যথাযথ সংবাদ নিবেদন করতে ইঙ্গিত করলেন বিদল্ল ভারদ্বাজ ঋষির কাছে সব খুলে বললেন:

হে ঋষিবর! অভাগিনী এই রমণী কোশলাধিপতি ধ্রুবসন্ধির মহিষী। এঁর নাম মনোরমা। আর এই শিশু তাঁর পুত্র সুদর্শন। সূর্যবংশীয় মহাতেজা ধ্রুবসন্ধির আর এক পত্নীর নাম লীলাবতী। তাঁর শিশুপুত্রের নাম শত্রুজিৎ। একদিন রাজা ধ্রুবসন্ধি মৃগয়া করতে বনে গিয়েছেন। হঠাৎ সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুদর্শনের অযোধ্যার রাজা হওয়ার কথা, কিন্তু লীলাবতীর পিতা যুধাজিৎ তাতে বাধা দিলেন। তিনি চাইলেন তাঁর দৌহিত্র শত্রুজিৎ রাজা হোক। সুদর্শন রাজসিংহাসন হতে বঞ্চিত হচ্ছে—এই খবর জানতে পেরে মনোরমার পিতা বীরসেন সেখানে ছুটে এলেন। ফলে যুধাজিৎ ও বীরসেনের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল। যুদ্ধে বীরসেন নিহত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শিশুপুত্র সুদর্শনের নিধনের ভয়ে রাজমহিষী আমাকে নিয়ে এই বিজন বনে আপনার আশ্রমে আশ্রয় পাওয়ার আশায় এসেছেন।

ঋষি ভারদ্বাজ সব শুনে মনোরমাকে সান্ত্বনা দিয়ে পুত্রকে নিয়ে নির্ভয়ে আশ্রমে বাস করতে বললেন। মনোরমাও ঋষির আশ্বাসবাণী শুনে প্রকৃতিস্থ হলেন এবং নির্ভয়ে আশ্রমে বাস করে পুত্রকে সৎশিক্ষা দিয়ে মানুষ করতে লাগলেন।

এদিকে যুধাজিৎ রণক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে সুদর্শনকে হত্যার জন্য খুঁজতে লাগলেন। রাজপুরীতে কোথাও না পেয়ে তিনি প্রহরিগণকে চারিদিকে খুঁজতে পাঠালেন। আর বিচিত্র আড়ম্বরের সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক শুভদিনে শত্রুজিৎকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

যুধাজিৎ একদিন শুনতে পেলেন মনোরমা

পুত্র সুদর্শনকে নিয়ে চিত্রকূট পর্বতে ভারদ্বাজ ঋষির আশ্রমে বাস করছেন। তিনি সৈন্যসহ আবার রওনা হয়েছেন সুদর্শনকে বিনাশের জন্য। এই সংবাদ পেয়ে মনোরমা ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি ভারদ্বাজকে কম্পিতকণ্ঠে নিবেদন জানালেন: হে ঋষিবর! যুধাজিৎ এখানে আসছেন আমার পুত্রকে হত্যা করার জন্য। আমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে আপনি তাঁকে বাধা দিন, যাতে এখানে না আসতে পারেন। তা না হলে আমার এখানে থাকা কোনমতে সম্ভব নয়। তিনি আমার পিতাকে হত্যা করে নিজ দৌহিত্রকে সিংহাসনে বসিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না আমার পুত্রকে বধ না করা পর্যন্ত।

ভারদ্বাজ ঋষি জননীর করুণ আর্তিতে এগিয়ে গিয়ে যুধাজিৎকে পথে বাধা দিয়ে তাঁকে নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে বললেন। যুধাজিৎ উত্তর দিলেন: হে সৌম্য! আপনি হঠকারিতা পরিত্যাগ করে মনোরমাকে তার পুত্রসহ আমার কাছে অর্পণ করুন। আর যদি না করেন আমি জোর করে তাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। ঋষিও দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন: তোমার যদি ক্ষমতা থাকে নিয়ে যাও। তবে মনে রেখ, বশিষ্ঠমুনির আশ্রম থেকে বিশ্বামিত্র তাঁর কামধেনু হরণ করতে গিয়ে তার যে-অবস্থা হয়েছিল তোমারও তবে তাই হবে—তার জন্যও প্রস্তুত থেক।

ভারদ্বাজ ঋষির কথা শুনে যুধাজিৎ তাঁর মন্ত্রীকে ডেকে তাঁর পরামর্শ চাইলেন। মন্ত্রী তাঁকে বললেন: মহারাজ! আপনি সৈন্যসহ রাজ্যে ফিরে চলুন। ঋষির কথার অবাধ্য হবেন না, তার ফল সমূহ ক্ষতিকারক হতে পারে। তখন যুধাজিৎ ভারদ্বাজকে প্রণাম করে সৈন্যসহ স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন।

রাজমহিষী মনোরমাও আবার নিশ্চিন্তে একমাত্র পুত্র সুদর্শনকে ঋষি-আশ্রমে প্রতিপালন করতে লাগলেন। সুদর্শনও ঋষি বালকদের সঙ্গে মনের আনন্দে খেলাধূলা করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ক্রমে সুদর্শনের বয়স পঞ্চম বর্ষ হল। একদিন মন্ত্রী বিদল্লকে দেখে ঋষি বালকরা সুদর্শনের সামনে আমোদ করে 'ক্লীব' 'ক্লীব' বলে খেপাতে লাগল। ক্লীব-এর 'ক্লী' শোনামাত্র পঞ্চম বর্ষের বালক সুদর্শনের ভাবান্তর উপস্থিত হল। অনুস্বার বর্জিত এই একাক্ষর বীজমন্ত্রটি সে বার বার উচ্চারণ করতে লাগল। খেতে-শুতে-বসতে বালকের মুখে সব সময় এই বীজমন্ত্র জপ চলতে থাকে। একদিন সহসা জগজ্জননী তাকে দর্শন দিলেন।

রাজনন্দন সুদর্শনের বয়স এগার বছর হলে তার উপনয়ন সংস্কার হয় এবং বালক ক্রমে বেদ-পাঠের অধিকারী হয়ে ওঠে। ঐ বীজমন্ত্র জপের শক্তিতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে বেদবেদান্ত এবং বহুবিধ শাস্ত্রে পারঙ্গমতা অর্জন করে। এক-দিন মহাদেবী আবার তাকে দর্শন দিয়ে শরাসন, শিলাশানিত শর, তূণীর ও কবচ প্রদান করলেন। তাঁর কৃপায় সুদর্শনের খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে কাশীরাজ সুবাহুর কন্যা পরমা রূপ-লাবণ্যবতী শশিকলা সুদর্শনের খ্যাতির কথা শুনে মনে মনে তাকেই পতিরূপে বরণ করে নিয়েছিল। অকস্মাৎ একরাত্রি শেষে শশিকলাও স্বপ্নে মহাদেবীর দর্শন পেল। দেবী তাকে দর্শন দিয়ে, আশ্বাস দিয়ে বললেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, সুদর্শন আমার পরম ভক্ত। অতঃপর রাজনন্দিনী শশিকলা সুদর্শনকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য আরও ব্যাকুল হয়ে উঠল।

অমোঘশক্তিযুক্ত সেই আশ্চর্য বীজমন্ত্র অনুক্ষণ জপ করতে করতে সুদর্শন এখন বিশ্বমাতা অম্বিকা দেবীর দর্শনলাভে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ। এই সময়

নিষাদরাজ তাকে সুসজ্জিত একটি রথ উপহার দিলেন। মুনিগণ ও তাপসগণ তখন সবাই বলতে লাগলেন যে, জগজ্জননী অম্বার প্রসাদে রাজপুত্র শীঘ্রই হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করবে। সুদর্শন এই রথে চড়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। মন্ত্রজপের প্রভাবে সে যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই সম্মানিত হচ্ছে।

ইতিমধ্যে কাশীরাজ সুবাহু কন্যা শশিকলার বিবাহের জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। কিন্তু কন্যা তো সুদর্শনকে ছাড়া অপর কারো গলায় বরমাল্য দেবে না বলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। রাজমহিষী এবং রাজা তাকে অনেক বুঝালেন, কিন্তু রাজকন্যা তার প্রতিজ্ঞা থেকে এক চুলও নড়ল না। তবু স্বয়ংবর সভার আয়োজন চলতে লাগল দেখে শশিকলা এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে ভগবতীর স্বপ্নাদেশের কথা সুদর্শনের কাছে পৌঁছে দিল এবং জানাল যে, অচিরেই তাকে বিবাহ করে এখান থেকে যেন নিয়ে যায়।

এই সংবাদ পেয়ে সুদর্শন ভারদ্বাজ ঋষির অনুমতি নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময়ে মা মনোরমা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বলছেন: না না, পুত্র তুমি সেখানে যেও না। যুধাজিৎ সেখানে তোমাকে একা পেয়ে নিশ্চয়ই বিনাশ করবে। তুমি সেখানে যেও না। সুদর্শন উত্তরে বলল: মা, তুমি আমার জন্য ভেব না। জগন্মাতার ইচ্ছায় আমি সেখানে যাচ্ছি। তাঁর প্রসাদে আমি কাউকে ভয় করি না। পুত্রকে যখন কোন মতেই নিবৃত্ত করতে পারলেন না, তখন জননী মনোরমাও মহাদেবীকে স্মরণ করে, তার সঙ্গে সুবাহুর রাজধানীর দিকে রওনা হলেন।

স্বয়ংবর সভায় নানা দেশ থেকে কত জ্ঞানী-গুণী রাজপুত্ররা এসেছেন। যুধাজিৎও দৌহিত্র শত্রুজিৎকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সুদর্শন এই সভায় এসেছে জানতে পেরে যুধাজিৎ তাকে হত্যা করতে পুনরায় উদ্যত হলে অন্যান্য রাজারা তাঁকে প্রচণ্ড বাধা দিলেন। এই নিয়ে যুধাজিৎ ও রাজাদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হয়ে গেল। রাজাদের বাদ-প্রতিবাদ শুনে কাশীরাজ সুবাহু সেখানে উপস্থিত হলেন। যুধাজিৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে রাজন্! আপনি আপনার কন্যাকে কার হস্তে সমর্পণ করবেন বলে স্থির করেছেন? সুবাহু বললেন: হে মহীপালগণ! আমার কন্যা সুদর্শনকে পতিরূপে বরণ করতে চায় কন্যা আমার বশ নয়। তখন সমাগত নৃপতিগণ সুদর্শনকে সভায় আহ্বান করলেন। সুদর্শন নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে শান্তভাবে সভাগৃহে প্রবেশ করল। নৃপতিগণ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার সৈন্য নেই, লোকবল নেই, তুমি একাকী এখানে রাজাদের মধ্যে কেন এসেছ? এখানে মহীপালগণ রাজকন্যার জন্য যুদ্ধার্থী হয়ে রয়েছেন। এখানে তুমি কিসের জন্য এসেছ? এখানে তোমার ভ্রাতা বলশালী শত্রুজিৎ ঐ রাজকন্যার লালসায় মাতামহ যুধাজিতের সঙ্গে এখানে উপস্থিত আছে। এখন তোমার এখানে কি অভিলাষ? সুদর্শন উত্তরে বললেন: হে নৃপতিগণ! আপনারা আমার জন্য ভাববেন না। আমি এখানে এসেছি জগজ্জননীর ইচ্ছায়। তাঁর যেরূপ ইচ্ছা, তাই হবে। আমি চারিদিকে জগন্মাতা ছাড়া অন্য আর কাউকেই দেখছি না। আমার কোন শত্রু নেই, কেউ যদি আমার শত্রুতা করে তার ফল সে নিশ্চয়ই পাবে। অতএব হে নৃপতিগণ! ভবিতব্য যা আছে তা অবশ্যই হবে। আপনারা আমার জন্য অকারণ চিন্তা করবেন না। এই বলে সুদর্শন তার নির্দিষ্ট বাসস্থানে আবার ফিরে গেল। নৃপতিগণও আগামী কালের স্বয়ংবর সভার জন্য যে যাঁর শিবিরে ফিরে গেলেন।

পরদিন প্রভাতে রাজা ও রাজকুমাররা সকলে

স্বয়ংবর সভায় এসেছেন। সবাই অধীর প্রতীক্ষায় রইলেন কখন বরমাল্য হাতে নিয়ে রাজনন্দিনী সভায় প্রবেশ করবে। এমন সময় রাজা সুবাহু এসে হাতজোড় করে বিনীতভাবে বললেন: আমার কন্যা স্বয়ংবর সভায় আসবে না। সে সুদর্শন ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করতে চায় না। সে আমার অবাধ্য। অতএব হে রাজন্যবর্গ! আপনারা অনুগ্রহ করে বহু ধনরত্ন নিয়ে আমার এই দুর্বিনীত কন্যাকে ক্ষমা করে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করুন। সে নাবালিকা, তাকে আপনারা কন্যার ন্যায় ক্ষমা করুন।

তাঁর এই কথা শুনে সবাই নীরব রইলেন, কিন্তু যুধাজিৎ সক্রোধে বললেন: রাজন্! আপনি আমাদের স্বয়ংবর সভায় আহ্বান করেছেন তাই আমরা এসেছি। স্বয়ংবর সভা না করে আপনি লুকিয়ে আপনার কন্যাকে বিবাহ দিতে চাচ্ছেন। সুতরাং আমি আপনার কন্যাকে জোর করে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাব—দেখি কে আমার গতিরোধ করতে পারে! আপনার কন্যা যদি সুদর্শনকে বিবাহ করে, তাহলে জানবেন সুদর্শন-সহ আপনাকেও হত্যা করে আমি আপনার কন্যাকে আমার দৌহিত্র শত্রুজিৎকেই প্রদান করব। আমি বেঁচে থাকতে সুদর্শন শশিকলাকে বিবাহ করতে পারবে না। পূর্বে ভারদ্বাজ ঋষির অনুরোধে তাকে বিনাশ করিনি, কিন্তু এবার সে আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

রাজা সুবাহু শঙ্কিত হয়ে রাজ-অন্তঃপুরে গিয়ে কন্যা শশিকলাকে সমূহ বিপদের কথা বললেন এবং তাকে সভায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। পিতার কথা শুনে সে বিনীত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়, পিতা! সুদর্শন ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করে আমি দ্বিচারিণী হতে পারব না। পিতা, আপনি আমার ভবিতব্যের জন্য চিন্তা করবেন না। জগদম্বা আমাদের রক্ষা করবেন। আপনি আজ রাত্রেই বেদজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করুন এবং কাল সকালেই রথে করে নগরের বাইরে আমাদের পৌঁছিয়ে দিন। আমি নিশ্চিত—মহাদেবীর বলে বলীয়ান সুদর্শন। সে তাঁদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি তাতে তার হঠাৎ মৃত্যু হয়, জানবেন আমিও সেই সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করব। জগজ্জননীর উপর আপনি বিশ্বাস রাখুন, আস্থা রাখুন

কন্যার কথায় সুবাহুর বিশ্বাস হল। তিনি রাজন্যবর্গের কাছে গিয়ে বললেন: হে মহীপালগণ! আপনারা কাল সকালে আসুন—আমি কন্যার বিবাহ সম্পাদন করব। কাল তাকে বুঝিয়ে সভায় নিয়ে আসার চেষ্টা করব। রাজন্যবর্গ তারপর স্ব স্ব শিবিরে বিশ্রামের জন্য চলে গেলেন।

এদিকে রাত্রিতে যথাবিধি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সুদর্শন ও শশিকলার বিবাহ হয়ে গেল। এই উপলক্ষে উদারচেতা রাজা সুবাহু জামাতা সুদর্শনকে প্রচুর ধনসম্পদ, দাসদাসী, সৈন্য প্রভৃতি দিলেন। জননী মনোরমা পুত্রের সৌভাগ্যে দারুণ খুশি হলেন। কাশীরাজ সুবাহু সুদর্শন-জননীকেও এই রাজ্যে পুত্রসহ থেকে যেতে অনুরোধ করলেন। এমনকি কাশীরাজ্যের ভার সুদর্শনের হাতে দিয়ে তিনি সেনাপতির মতো থাকতে চাইলেন। কিন্তু মনোরমা তার উত্তরে বললেন: রাজন্! আপনি সহৃদয় ব্যক্তি। আপনার মঙ্গল হোক। আপনি আমাদের ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমাদের জন্য ভাববেন না। ভগবতী ভুবনেশ্বরী আমার পুত্রকে অযোধ্যার অধীশ্বর নিশ্চয় করবেন। আর আমি পরমা দেবী অম্বাকে ছাড়া আর কাউকেই চিন্তা করি না। তিনিই আমার একমাত্র সহায়। তিনিই আপনার মঙ্গল করবেন।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাগত রাজন্যবর্গ জানতে পারলেন যে, সুবাহু তাঁর কন্যাকে

সুদর্শনের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। তাঁরা তখন ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। যুধাজিৎ তাঁদের আরও উত্তেজিত করতে লাগলেন যে, সুবাহু আমাদের সকলকে প্রতারিত করেছে—এর সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে। এই সময় সুবাহু তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন: হে রাজন্যবর্গ! গতকাল রাত্রে আমার কন্যার বিবাহ হয়েছে। আমার কথা না শুনে সে সুদর্শনকেই বিবাহ করল। আপনারা তাকে ক্ষমা করুন। এই বিবাহোৎসবে আপনারা পানাহার করে, আনন্দ করে আমাকে কৃপা করুন।

রাজন্যবর্গ তাঁর কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁরা রাগে গরগর করতে লাগলেন। প্রচণ্ড বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে সুবাহু তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে ফিরে এলেন। আর রাজন্যবর্গও যুধাজিতের নেতৃত্বে অপেক্ষা করতে থাকলেন সুদর্শনের আগমনের পথ চেয়ে

সুবাহু দূত মারফতে খবর পেলেন সব। তিনি ভীত হলেন। তখন সুদর্শন দৃঢ়কণ্ঠে বলল: মহারাজ! আপনি বৃথা আমার জন্য ভয় পাচ্ছেন। আমাদের যাওয়ার ব্যবস্থা করুন। জগজ্জননী আমাদের রক্ষা করবেন শ্বশুর সুবাহুকে সান্ত্বনা দিয়ে মাতা, পত্নী ও রাজার দেওয়া ধনসম্পদ, দাসদাসী, সৈন্য প্রভৃতি নিয়ে সুদর্শন রওনা হল। পথে বিক্ষুব্ধ রাজারা শশিকলাকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে এগিয়ে আসছেন। সুদর্শনের কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। সে নির্ভয়ে মনের আনন্দে শক্তিমন্ত্র জপ করতে করতে চলেছে। দূর থেকে সুবাহু দেখেন যে, সুদর্শনকে আক্রমণ করার জন্য বিরাট বাহিনী ধেয়ে আসছে। যুদ্ধ তখন অবশ্যম্ভাবী। তাড়াতাড়ি তিনি সসৈন্যে ধাবমান হলেন কন্যা-জামাতাকে রক্ষার জন্য।

সুদর্শনের যাত্রাপথ অবরুদ্ধ। স্বয়ং যুধাজিৎ সুদর্শনের বিনাশের জন্য উপস্থিত। অনুজ শত্রুজিৎও এই বিনাশ-তাণ্ডবে সামিল হয়েছে—শশিকলাকে তার চাই-ই। তখন উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গেল তুমুল সংগ্রাম। সুদর্শন শ্রীশ্রীদুর্গা-দেবীকে স্মরণ করতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া দেবী যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূতা হলেন। তাঁর দিব্য জ্যোতিতে চারিদিক আলোকিত হয়ে উঠল। সুদর্শন পরম আহ্লাদে রাজা সুবাহুকে উদ্দেশ করে বলে উঠল: মহারাজ! দেখুন দেখুন, দেবীকে স্মরণ করা মাত্রই তিনি অসীম করুণায় আবির্ভূতা হয়েছেন। সুবাহু ও সুদর্শন উভয়েই প্রণত হলেন। অন্যান্য মহীপালগণও জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তি দেখে বিমোহিত হয়ে পড়লেন। সকলেই দেখলেন, সুদর্শন যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে।

যুধাজিৎ রাজন্যবর্গকে বিহ্বল হতে দেখে তাঁদের উত্তেজিত করার জন্য বলতে থাকেন: আপনারা এসেছেন যুদ্ধ করে সুবাহুর কন্যাকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে। আপনারা সামান্য ঐ সিংহারূঢ়া নারীরূপ দর্শন করেই এমন বিমূঢ় হয়ে গেলেন কেন? ঐ দেখুন, সুদর্শন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যাচ্ছে। আপনারা যুদ্ধের জন্য উত্থিত হন এবং সুদর্শনকে আক্রমণ করুন, তাকে হত্যা করুন। এই বলে যুধাজিৎ শত্রুজিৎকে নিয়ে সুদর্শনের দিকে ধাবিত হলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে তীর দ্বারা আক্রমণ করলেন। প্রত্যুত্তরে সুদর্শনও শর নিক্ষেপ করে সেই তীরকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। সন্তানকে আক্রান্ত হতে দেখে দেবী প্রচণ্ড রোষে গর্জন করতে করতে সেখানে আবির্ভূতা হলেন এবং স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করলেন। ক্ষণকালের মধ্যে যুধাজিৎ ও শত্রুজিৎ নিহত হলেন। সুবাহুর মাতুল ও ভাগিনেয় যুধাজিতের পক্ষে ছিলেন, দেবী তাঁদেরও বধ করলেন। অন্যান্য ভূপালগণ তাঁদের মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখে দারুণ বিস্ময়ে হতবাক হলেন। রাজা সুবাহু তখন কৃতাঞ্জলিপুটে

দুর্গতিনাশিনী জগজ্জননী দুর্গাদেবীর স্তুতি করতে লাগলেন :

'হে জগদ্ধাত্রী দেবি! আপনাকে বারংবার প্রণাম। হে বিশ্বজননি! দেবি! আপনি নির্গুণা—আমি সগুণ, অতএব বাক্যমনের অগোচর আপনার প্রভাব-পরাক্রমাদি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করেও জানতে সমর্থ নই। জননি! আপনি পরমাশক্তি, সততই ভক্তজনের কল্যাণের জন্য তৎপর থাকেন, আপনার প্রভাব সর্বত্রই প্রকটিত রয়েছে, আমি আপনার কি স্তুতি করব? মাতঃ! আমি আপনার দুরবগাহ চরিত্র বর্ণনে কস্মিন্ কালেও সমর্থ হব না। জননি! সৎসঙ্গে কেন না মনোরথ সিদ্ধি সম্পাদন করবে? আমার এই চিত্তশুদ্ধি প্রাসঙ্গিকক্রমেই সম্পাদিত হয়েছে। আমার এই জামাতা আপনার একান্ত ভক্ত, দৈবযোগে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে, তাতেই আমি আপনার দর্শনলাভ করে ধন্য হয়েছি। হে সুরপূজ্যে! আমি আপনার দর্শনলাভ করে জানতে পেরেছি যে, আপনি ভাবযুক্ত ভক্তগণের প্রতি নিয়তই অনুকম্পা প্রকাশ করে থাকেন। হে ভুবনেশ্বরি! আমি আপনার দর্শনলাভ করে সুকৃতী ও কৃতার্থ হলাম। মাতঃ! আমি সাধন-ভজন ও বীজমন্ত্রাদি কিছুই জানি না, অদ্য কেবল আপনার প্রকটিত প্রভাব মাত্র অবগত হলাম।'

দেবী তাঁর স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দান করতে চাইলেন। তখন সুবাহু কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীকে বললেন : 'হে দেবি! আপনার দর্শনলাভ করে আমার জীবন ধন্য, আমি আর কিছুই চাই না, মা। তবে একটি প্রার্থনা করছি, জননি! সততই আমার অচলা ভক্তি যেন থাকে আপনার প্রতি। আপনি নিয়ত যেন আমার এই নগরীর মধ্যে অবস্থিতি করেন, আপনি দুর্গাদেবী এই নামে বিখ্যাত হয়ে শক্তিরূপে এই স্থানে অবস্থান করুন—এই আমার আপনার কাছে প্রার্থনা।' দেবীও 'তথাস্তু' বলে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। সুদর্শনের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করে মহাদেবী বললেন : 'মহাভাগ! তুমি অযোধ্যায় গমন কর এবং কুলোচিত রাজ্য প্রতিপালন করতে থাক। নৃপনন্দন! তুমি সততই আমার স্মরণ ও যত্ন সহকারে পূজা করবে, আমি তোমার রাজ্যে সতত অধিষ্ঠিতা থেকে সকলের কল্যাণ বিধান করব।'

[শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্, তৃতীয় স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

'কমন্‌সেন্স্': বিবেকের জাগৃতি

উদ্বোধনের নিচের ঘরে ডাক্তার মহারাজ (স্বামী পূর্ণানন্দ) আমাকে ও গদাইকে খুব ধমকাচ্ছেন—"তোমাদের একটা 'কমন্‌সেন্স্' (Commonsense) নাই", ইত্যাদি। শরৎ মহারাজ উপর থেকে নামতে নামতে সব শুনেছেন। খানিক বাদে মহারাজ এসে সেই ছোট ঘরে বসলেন—ক্রমে আমরাও এসে কাছে বসলুম। ডাক্তার মহারাজও বসেছেন।

শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন : "হ্যাঁ ডাক্তার, 'কমন্‌সেন্স্' নিয়ে তোমাদের কি কথা হচ্ছিল?"

ডাক্তার মহারাজ ভারী উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করলেন, —"আর বলবেন না মহারাজ, এদের (আমাদের দিকে দেখিয়ে) বুদ্ধি গম্যি যদি কিছু থাকে! এগুলোর কোন 'কমন্‌সেন্স্'ই নেই। এদের বকে বকে হয়রাণ হই।"

শরৎ মহারাজ : "আচ্ছা ডাক্তার, 'কমন্‌সেন্স্' কাকে বলে বুঝিয়ে দিতে পার?"

ডাক্তার মহারাজ তো এবার মহা ফাঁপরে পড়লেন। তিনি একেবারেই চুপ।

তখন শরৎ মহারাজ বেশ উত্তেজিত স্বরে বলতে থাকেন : "ত্যাখো ওটা তো একটা

বিদেশী ভাষা। ওদের দেশের ছেলেমেয়েরা জন্ম থেকেই কতকগুলি ম্যানার (manner) কাস্টম্ (Custom) রীতি-নীতি আদব-কায়দা, ওদের সমাজের যা উপযোগী, তা শেখে। সে-সব কিছু ত্রুটি হলেই, ওরা অমনি বলে কমন্‌সেন্সের অভাব। আমাদের দেশের কিন্তু 'কমন্‌সেন্স্' হচ্ছে বিবেকের জাগৃতি। খালি ধমকালে ছেলেরা বিগড়ে যায়। তুমি তাদের নিয়ে ঐ যে কিছু পড় টড়—সেটাই ঠিক ঠিক কাজ। তাতেই ছেলেরা কিছু পায়—জানার ও শেখার সুযোগ পেয়ে থাকে। তা নইলে ছেলেগুলো পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে আড্ডা মেরে বেড়াতো।"

শরৎ মহারাজের ছিল কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি!

[স্বামী পরমেশানন্দ-কথিত]

জ্ঞান·

কোমোডো ড্রাগন

আর্থার কোনান ডয়েল শার্লক হোমসকে নিয়ে শুধু ডিটেকটিভ উপন্যাসই লেখেননি, লিখেছেন অনেক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীও, যার মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে 'দি লস্ট ওয়ার্ল্ড'। এই বইএ পাথুরে মহাদেশ দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অঞ্চলের কথা আছে, যেখানে অধ্যাপক চ্যালেঞ্জার পরিচালিত একটি বৈজ্ঞানিকদল প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় সরীসৃপ জীবন্ত নিরীহ ইগুয়ানোডন (ডাইনোসর), মাংসাশী ডাইনোসর গোষ্ঠীর কোন প্রাণী এলোসরাস বা মেগালোসরাস, স্টেগোসরাস, উড়ন্ত প্রাগৈতিহাসিক পাখি টেরোডেকটাইল প্রভৃতির সন্ধান পেয়েছিলেন। এরাই তো ড্রাগন! বলা বাহুল্য এটি কল্পকাহিনী, যদিও লেখার গুণে কখনও সে-কথা মনে হয় না।

কিন্তু সত্যি সত্যিই প্রাগৈতিহাসিক জীব এখনও পৃথিবীর কোথাও বেঁচে আছে কি বহাল তবিয়তে? থাকতে পারে কি তারা এখনকার পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে? কোন ড্রাগন?

৭০-৮০ বছর আগে একটা গুজব ছড়িয়েছিল—ইন্দোনেশিয়ার কোমোডো দ্বীপে এখনও বেঁচে আছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপ। এই দ্বীপের আয়তন ৬০০ বর্গ কিলোমিটার। প্রাণীবিদ্‌রা এ দ্বীপ ঘুরে বিশ্বাসই করলেন না যে, এরকম ছোট দ্বীপে সত্যি সত্যিই ওরা বেঁচে-বর্তে থাকতে পারে।

কিন্তু ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গুজব সত্যি হয়ে উঠল। তবে বিজ্ঞানীদের অভিমত, বাস্তবিকভাবে এরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের আসল সরীসৃপ নয়—এরা এক ধরনের গিরগিটি—পৃথিবীতে জানা যে-সব গিরগিটি আছে, তাদের মধ্যে এদের আকার সব থেকে বড়।

কোমোডো দ্বীপের দৈত্যাকার গিরগিটিগুলো তিন মিটার লম্বা। সব থেকে বড় যেটা পাওয়া গেছে, সেটা সাড়ে তিন মিটার। ওজন এক একটির ১০০ কিলোগ্রাম। এরা মনিটর নামে গিরগিটি বংশের জীব। ৬ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সব জায়গায় এদের দেখতে পাওয়া যেত।

এই কোমোডো ড্রাগনরা মাংস খেতে ভালবাসে। এদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল—কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে মড়া জন্তুর খোঁজ পায়। তারা শিকারেও বেরোয়—হরিণ বা বুনো শুয়োর শিকার করতে পারে। এমনকি গোরু শিকার করেছে, এমনও জানা গেছে। এরা চিবাতে পারে না, খাবারের বড় বড় টুকরোগুলো গিলে ফেলে।

অনেক প্রাণীবিদ্ ও ফটোগ্রাফার কোমোডো ড্রাগনকে কাছে থেকে দেখেছেন—এরা তাঁদের

কোন ক্ষতি কিন্তু করেনি। আর অনেক চিড়িয়াখানাতেও এরা ভালভাবেই পোষ মেনেছে। এখন মাত্র ১০০০-এর মতো কোমোডো ড্রাগন বেঁচে আছে। এরা যাতে আরও বেশিদিন থাকতে পারে, তার জন্ম সবরকম নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি সদয় হলে ঐ ছোট দ্বীপটায় তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেও পারে।

দেশ-বিদেশ

অরুণাচলের অধিবাসী : আপ তানি

অরুণাচলের উপজাতিদের মধ্যে আপ তানি উপজাতি বিশ্বের মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

প্রায় ১৫২৪ মিটার উচ্চ সুবনসিরি জেলার মধ্য-অঞ্চলের উপত্যকায় ২৬ বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে এই আপ তানি উপজাতিদের বসবাস। উপত্যকাটি অবস্থিত পানিওর ও কমলা নদীর মধ্যে। উপত্যকাটিকে ঘিরে রয়েছে প্রায় ২৪৩৮ মিটার উঁচু খাড়া পাহাড়। দেখলে মনে হবে যেন আপ তানিরা বাস করে অর্ধচন্দ্রাকারের একটা বড় গামলার মধ্যে।

আপ তানিদের লোকসংখ্যা দশ হাজারের কিছু বেশি। তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—অংকা, ঔক্‌, আপ তানাং এবং ঔকা মেরি ও তেনি। অবশ্য এই সব নামের মধ্যে আপ তানি নামটাই সর্বাধিক পরিচিত।

এই অঞ্চলের অন্যান্য উপজাতিদের থেকে আপ তানিদের বৈশিষ্ট্য হল : তাদের গড়ন লম্বা পাতলা ছিপছিপে, হাত দুটি দীর্ঘ, মুখ লম্বাটে, নাক ছোট ও কিঞ্চিৎ বাঁকা। অন্য উপজাতিদের থেকে এদের চোখ উজ্জ্বল ও বড়। গায়ের রঙ প্রায় ইউরোপীয়দের মতো ফর্সা।

আপ তানিদের পোশাকের বিশেষত্ব হচ্ছে পিছনের দিকে একটি লেজ থাকবে। তারা বেতের কাজ-করা লাল রঙের একরকম কোমরবন্ধ পরে—যেটা পিছনের দিকে ঝুলতে থাকে। আসলে এই লেজটি হচ্ছে বেতের পাকানো বেল্ট। এই বেল্টের সঙ্গে আবার তারা বেতেরই লাল রঙের অনেকগুলি আংটি পরে। এটা শুধু পরে আপ তানি পুরুষরা। এই লেজটির এক মজার ব্যবহার হচ্ছে, এটাকে গুটিয়ে যেখানে-সেখানে একটু উঁচু মতো জায়গায় বসা যায়।

তবে সাধারণভাবে এদের পোশাক প্রতিবেশী উপজাতি দফ্‌লাদের মতোই প্রায়। দফ্‌লাদের চেয়ে আপ তানিদের বেতের কাজ আরো সূক্ষ্ম। নকশা-করা বেতের টুপির চারপাশ দিয়ে মাথার চুল জড়িয়ে কপালের উপর ঝুঁটিমতো করে গিঁট দিয়ে বাঁধে। এই খোঁপাকে বা ঝুঁটিকে এরা 'পোতুম্‌' বলে। দফ্‌লারা হলুদ রঙের কাপড় জড়ায় পোতুমের উপর, আর আপ তানিরা জড়ায় কালো রঙের কাপড়। এর ভিতর দিয়ে আড়াআড়িভাবে পিতলের শিক ঢুকিয়ে দেয়। তারা ধূসর রঙের ঢিলে-ঢালা কোট পরে। বর্ষাকালে কালো আঁশের তৈরি বর্ষাতি ব্যবহার করে।

আপ তানি পুরুষদের পোশাকের বৈশিষ্ট্য যেমন পশ্চাতের লেজ, তেমনি মেয়েদের সাজের এক বিশেষত্ব নাকের ছিপি। সাধারণত মেয়েদের মধ্যে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় নাকে বড় বড় ছিপি লাগানোর দিকে। তারা মনে করে এতে তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

আপ তানি পুরুষ ও মেয়ে উভয়ের মধ্যে উল্‌কির ব্যবহার আছে। পুরুষরা মুখে লম্বা-

লম্বি রেখা টেনে তার উপর দিয়ে আবার আড়াআড়িভাবে রেখা আঁকে এবং চিবুকে এনে মিলিত করে। মেয়েরা কপাল থেকে নাকের উপর পর্যন্ত এবং নিচের ঠোঁট থেকে চিবুক পর্যন্ত নীল রেখা আঁকে।

আপ তানি মেয়েরা নীল রঙের বর্ডার দেওয়া ঘাগরা পরে এবং হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ধূসর রঙের সোয়েটার পরে পুরুষের মতো। নিজেদের হাতে তৈরি সোয়েটার পরে তারা। তারা মাথার চুল সব জড়ো করে মাথার উপর মাঝখানে বেঁধে রাখে। তারা রঙবেরঙের প্রচুর পুঁতির মালা পরে গলায়।

আপ তানি উপজাতিদের এমন কোন সজ্ঘবদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থা নেই, যার অনুশাসন সবাই মেনে চলবে। গ্রামবাসীরা নিজেদের গ্রামের মন্ত্রণা সভার ('বুলিয়াং'-এর) অনুশাসন মেনে চলে। এই 'বুলিয়াং'-এর সভ্য নির্বাচিত হয় চারিত্রিক গুণাবলী এবং কর্মক্ষমতার উপর। গ্রামের অবস্থাপন্ন ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বয়স্ক ব্যক্তিদের দু-একজনকে অবশ্যই সভ্য হিসাবে নির্বাচিত করা হয় 'বুলিয়াং'-এর জন্য।

'বুলিয়াং'-এর সভ্যরা তিন ভাগে বিভক্ত। যথা— 'অকা বুলিয়াং', 'অজাং বুলিয়াং' ও 'ইয়াপা বুলিয়াং'। 'অকা বুলিয়াং'-এর সভ্য হয় সমাজের বয়স্ক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা। অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বয়সের জন্য এই পদটি তারা লাভ করে। তাদের পদটি স্থায়ী। 'ইয়াপা বুলিয়াং'রা সাধারণত গ্রামের জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেইজন্য এরা সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। তবে 'অকা বুলিয়াং'দের সঙ্গে তারা সব সময় পরামর্শ করে কাজকর্ম করে। 'অজাং বুলিয়াং'রা গ্রামের যুবকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়। তারা যেন যুবকদের মুখপাত্র হয়ে আসে। তারা 'ইয়াপা বুলিয়াং'দের কাজে সাহায্য করে এবং তাদেরই বার্তাবাহক রূপে থাকে। তবে কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা অনুযায়ী 'ইয়াপা বুলিয়াং'-এর সভ্যপদে তারা উন্নীত হতে পারে। গ্রামের মধ্যে খোলা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কাঠের মঞ্চ ('লাপাং') তৈরি করে তার উপর তাদের সভা বসে।

আপ তানিরা উৎসবাদি সজ্ঘবদ্ধ হয়ে উদ্‌যাপন করে। তাদের উৎসব সাধারণত কৃষি-কাজের সঙ্গে যুক্ত। 'মোরোম্' ও 'ম্লোকো' এই দুটি উৎসব তাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'মোরোম্' উৎসব হয় ডিসেম্বর-জানুআরি বা ফেব্রুআরি-মার্চে যখন খেতের শস্য ঘরে ওঠে। 'মোরোম্'-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল: গ্রামের যুবক এবং বালকরা পুরোহিতদের নেতৃত্বে পথযাত্রা করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যায়। পুরোহিতরা একা একা চলে। তারা যখন চলে তাদের দু-পাশে দাঁড়িয়ে পাখার হাওয়া করা হয় এবং দু-পাশ থেকে ধানখেতে তুষ সমেত চাল মুঠো মুঠো ছড়ানো হয়। এই উৎসবে নৃত্য ও খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকে। গ্রামের মধ্যে যারা ধনী তারা এই উৎসবে গ্রাম-বাসীদের ভোজনের ব্যবস্থা করে। এইজন্য তাদের সমাজে খুব সম্মান। যদি কেউ সামাজিক মর্যাদা পেতে চায়, তাহলে তাকে উৎসবে ভোজের ব্যবস্থা করতেই হবে। এই ভোজ-অনুষ্ঠান দু-রকমের— 'উন্-পেদো' ও 'পাদু-লাটু'। এই দুটির মধ্যে যে-কোন একটি সে করতে পারে।

'উন্-পেদো' উৎসবটি খুবই ব্যয়বহুল। এতে অন্ততপক্ষে পাঁচ-ছটি মিথুন বলি দিতে হয়। এতে সমগ্র আপ তানি উপত্যকার অধিবাসীরা যোগদান করে মিথুনের মাংস ভোজন করে। আর যে ভোজে গ্রামবাসীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তার নাম 'পাদু-লাটু'। এতে অন্তত দু-তিনটি মিথুন বলি দিলেই চলে।

প্রত্যেক বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে চাষ-আবাদ আরম্ভের সময়ে ম্লোকো উৎসবও হয়ে থাকে।

গ্রামের শস্যখেতের মাঝখানে বেদীর উপরে পুরোহিতরা এই উৎসবের ক্রিয়া-অনুষ্ঠান করে। এই উৎসবে মিথন ও শূকর বলি দেওয়া হয়। দূর দূর গ্রামের বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হয়। আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এলে তাদের খুব আদর-আপ্যায়ন করার রীতি আছে। এই সব উৎসবের মধ্য দিয়ে আপ তানিরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। সামাজিক নিয়মকানুনের চেয়ে এই দুই উৎসবের মাধ্যমেই এরা সঙ্ঘবদ্ধ থাকার সুযোগ পায়। যদি এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের ঝগড়া-বিবাদ থাকে তবে এই উৎসবের সময় যৌতুকের আদান-প্রদানের মাধ্যমে তা মীমাংসার ব্যবস্থা হয়

এই 'ম্রোকো' উৎসবের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল 'বোবো' খেলা। লম্বা বাঁশ পোঁতা হয় গ্রামের খোলা জায়গায়—সাধারণত যেখানে গ্রামের বিচার-সভা বসে তার পাশে। লম্বা বাঁশের মাথায় আড়াআড়ি ছোট বাঁশ বাঁধা হয়। লম্বা বাঁশের মাথায় বেতের দড়ি খুব শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। এই দড়ি ধরে ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সবাই শূন্যে দোল খায়। এই বেতের দড়ি বেশ লম্বা থাকে। ফলে শূন্যে বহু দূর পর্যন্ত দোল খাওয়া চলে।

আপ তানি উপজাতিদের মধ্যে একটি রীতি প্রচলিত আছে যা প্রতিবেশী অন্য কোন উপজাতির মধ্যে নেই। এই রীতিকে বলে 'লিসুদু'। এটি একটি লড়াই—কার কত ঐশ্বর্য আছে তা দেখানোর। কেউ হয়তো তিনটি মিথন কেটে বাড়ির সামনে রেখে দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করল। এই মিথনের মাংস সে নিজে খাবে না, এটা রেখে দেয় অন্যান্য গ্রামবাসীদের জন্য। অন্য পক্ষ হয়তো সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পাঁচটি মিথন কেটে রেখে দিল গ্রামবাসীদের খাওয়ার জন্য। এই রকম চলতে থাকে। কারোর আত্মীয় যদি এই লড়াইয়ে হেরে যেতে থাকে তবে তাকে তারা সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। তবে উভয়কে নিঃশেষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে 'বুলিয়াং' (মন্ত্রণাসভা)। এই সভার মধ্যস্থতায় এটি শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসায় আসে।

আপ তানিদের বসতি খুব ঘন। তাদের সমাজ 'মিটে' ও 'মুরা' এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক হয় না। 'মিটে' গোষ্ঠীর সমাজে মর্যাদা বেশি। কারণ তারা জমি-জায়গার মালিক। 'মুরা' গোষ্ঠীর কোন জমি-জায়গা নেই। তারা অপরের বাড়িতে কাজ ও জমিতে চাষ করে। এই গোষ্ঠীকে শ্রমিক শ্রেণী বলা যেতে পারে। তাই অন্য গোষ্ঠীর থেকে তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা একটু কম। আপ তানি উপজাতির মধ্যে ধনতান্ত্রিক মনোভাব, আবার একই সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। তারা যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা করে, তেমনি আবার একে অপরের সাহায্য করার জন্যও এগিয়ে আসে।

আপ তানিরা একটু জমিও খালি রাখে না। সমস্ত জমি তারা চাষ করে। কারণ চারিদিকে উঁচু পর্বতের জন্য তাদের কিছু করার নেই। তারা তাদের সীমিত জমি খুব ভালভাবে চাষ করে। তারা চাষ করে ধান, জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদি। তারা কাঠের হাতলওয়ালা বাঁকানো লোহার শিক দিয়ে জমি চাষ করে। তারা এখনও পর্যন্ত লাঙলে চাষ করতে জানে না।

আপ তানির মধ্যে বহুবিবাহ-প্রথার তেমন প্রচলন নেই। তবে যদি স্ত্রীর সন্তানাদি না হয়, সেক্ষেত্রে স্বামী আবার বিবাহ করতে পারে।

আপ তানি যুবক-যুবতী বিবাহের পর মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে নিজেরা ঘর বাঁধে। বাবা ছেলের ঘরের ও চাষের জন্য জমি কিনে দেয়। অবস্থাপন্ন বাবা ছেলেকে নিজের জমি থেকে একটা অংশ তার জীবিতকালের মধ্যেই দিয়ে দেয়।

আপ তানি উপজাতিদের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে আছে পৃথিবী, মহাকাশ, সূর্য, চন্দ্র কিভাবে সৃষ্টি হল, প্রথম মানুষের আবির্ভাব এবং মৃত্যু কিভাবে হল এই সব। তারা আত্মাকে 'ইয়ালো' বলে। মৃত্যুর পর এই 'ইয়ালো' দেহ ছেড়ে মাটির নিচে 'নেলি' নামে একটা জায়গায় চলে যায়। মৃত্যুভূমি 'নেলি'তে যখন নতুন কোন 'ইয়ালো' আসে তখন সেখানকার অধিকর্তা 'নেল্থিরি' তাকে জিজ্ঞাসা করে, পৃথিবীতে সে কারো ক্ষতি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেছে কিনা। পৃথিবীতে সে যেরকম কাজকর্ম করেছে এবং যেরকম ধনসম্পদ রেখে এসেছে সেই অনুযায়ী তার এখানে থাকার ব্যবস্থা হবে। সে যে-সব গৃহপালিত পশু অনুষ্ঠানাদিতে বলি দিয়েছিল সেগুলি আবার তাকে এখানে দেওয়া হয় এবং যেগুলি পৃথিবীতে রেখে এসেছে তাও তাকে দেওয়া হয়। যদি ক্রীতদাস পৃথিবীর বাড়িতে রেখে এসে থাকে সেগুলিও তাকে দেওয়া হয়।

এদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর 'নেলি'তে গিয়ে স্ত্রী আবার তার স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়। অবিবাহিত অবস্থায় মেয়ের মৃত্যু হলে ইচ্ছা করলে সে এখানে এসে বিবাহ করে সন্তানাদির জননী হয়ে সুখে থাকতে পারে।

এই 'নেলি'তে দেবতা ও অপদেবতাদেরও অধিবাস। অপদেবতারা পৃথিবীর মানুষের দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখে যদি কেউ অসুস্থ বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে তাহলে তারা তাদের আত্মাকে ('ইয়ালো'কে) নিজেদের আবাসভূমি 'নেলিতে' নিয়ে আসে। 'নাইউবু' নামে দেবতা তিনি শুধু এই অপদেবতার হাত থেকে 'ইয়ালো'কে রক্ষা করতে পারেন। তবে তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে সে যেন তাঁর নামে উপযুক্ত গৃহপালিত পশু বলি দেয়। তাহলে সে আবার পৃথিবীতে ছেড়ে আসা শরীরে ফিরে যেতে পারবে এবং সুস্থ হয়ে উঠবে।

আপ তানিরা বিশ্বাস করে, দুর্ঘটনায় কেউ মারা গেলে তার আত্মা ('ইয়ালো') আকাশে অবস্থিত 'তালিমোকো' নামে একটা জায়গায় চলে যায়।

অরুণাচলের নবগঠিত রাজধানী নিউ ইটানগর নিম্ন সুবনসিরি জেলার মধ্যে পড়ে। এই শহরটি গড়ে উঠেছে নানা উপজাতি নিয়ে। তবে এখানে বিশেষ প্রাধান্য নিশি ও আপ তানি উপজাতির। এই সব উপজাতি রোগব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা অপদেবতার পূজা করে। এই শহরে সরকারি হাসপাতাল আছে, কিন্তু সেখানে শুধু সাধারণ রোগের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা আছে। দুরারোগ্য ও দুরূহ ব্যাধির কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। চিকিৎসার জন্য রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয় দূরে আসামের ডিব্রুগড়ে। এতে রোগী মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। এই সব দরিদ্র অনুন্নত উপজাতিদের সুচিকিৎসার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন নিউ ইটানগরে আধুনিক বৈজ্ঞানিক নানা সরঞ্জাম ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে একটি হাসপাতাল খুলেছেন ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে আন্তর ও বাহির দুটি বিভাগ আছে। আন্তর বিভাগে ৯০টি শয্যা আছে এবং বহির্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে ২০০ জন রোগী চিকিৎসিত হয়। এছাড়া এখানে উপজাতি মেয়েদের 'সেবিকা'র শিক্ষা (nursing) দেওয়া হচ্ছে। তারা শিক্ষা শেষ করে নিজের নিজের গ্রামে ফিরে যাবে। সেখানে যে-সব অনুন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে তাতে তারা যোগদান করে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী গ্রামের মানুষদের সেবা করবে—এটাই এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

সমালোচনা

দুঃখ-জরা—বসন্ত ঘোষাল। প্রকাশক: শ্রীশকুমার কুণ্ড, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশনস্ (প্রাঃ) লিঃ, ১-এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। (১৯৮২), পৃঃ ৮২, মূল্য: ৭.০০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে দুটি বিভাগ আছে। প্রথম বিভাগে দুঃখের বিবরণ, বিশ্লেষণ ও সমাধান এবং দ্বিতীয় বিভাগে জরার বিবরণ আছে। দুঃখের বিবরণে ও বিশ্লেষণে লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও বর্তমান সাহিত্য থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। 'দুঃখ-সমাধান' পরিচ্ছেদে লেখক নানা যুক্তির অবতারণা করে যে অনেক সমাধানের সূত্র দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে '…মনটাকে বশ করতে না পারলে, দুঃখ-প্রতিরোধক করতে না পারলে দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।' (পৃঃ ২২) —সুপ্রাচীন এই শাস্ত্রসিদ্ধান্তই দুঃখ-সমাধানের একমাত্র উপায় বলে আমরাও জানি। মন বশ না হলে কিছুতেই দুঃখের হাত থেকে রেহাই নেই। কিন্তু এই মনটিকে যে কি করে বশ করা যাবে, তার উপায় লেখক খুলে বলেননি অথবা কোন শাস্ত্র-উপদেশও উল্লেখ করেননি। মনই সর্ব-দুঃখের কারণ, কিন্তু লেখক সেই কারণের মূলে না গিয়ে কেবলমাত্র দেশ-বিদেশের বিদ্বজ্জনের প্রচুর উদ্ধৃতির সমাবেশ করে গ্রন্থটিকে ভারাক্রান্ত করেছেন। এর দ্বারা লেখকের বহুগ্রন্থপাঠজনিত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও, জীবনের দুঃখ নিরসনের উপায় কিছু নির্দিষ্ট হয়নি।

গল্প-উপন্যাস '…মনের খোরাক যোগাতে পারে এবং পারে আমাদের দুঃখ-সমাকীর্ণ পথের সাথী ও সকল ব্যথার ব্যথী হতে।' (পৃঃ ৩৫) —এই কথাগুলি সাহিত্য-রসব্যঞ্জক কিন্তু এর দ্বারা দুঃখের সমাধান কি করে হতে পারে তা বোঝা গেল না। তবে কি এখানে ধরে নিতে হবে যে, লেখকের অভিমত দুঃখপথের সাথী ও ব্যথী হলেই দুঃখ লাঘব হবে? যদি তাই হয়, তবে মনে প্রশ্ন জাগে—গল্প-উপন্যাসের মধ্যে যে-সব চরিত্র আছে তাদের দুঃখকষ্টের দৃশ্যগুলি পড়তে পড়তে কি পাঠকেরও সেই সব চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দুঃখের অনুভূতি হয় না? চরিত্রের মধ্যে যে হাসি-কান্না ফুটে উঠেছে, তা কি পাঠকের মনকেও স্পর্শ করে দুঃখ দেয় না? যদি দেয়, তাহলে আমরা ঐ-সব পাঠে দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পাব কি করে?

লেখকের উক্তি: 'ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে (শুধু সদাচার ও নৈতিক মূল্যবোধকে ধারণ করেও) যে ধর্ম হয় তার প্রমাণ তো বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম।' (পৃঃ ২৩) বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে ঈশ্বরের কথা প্রকাশ নেই বটে, তা বলে এই দুটি ধর্মমত নিছক 'সদাচার ও নৈতিক মূল্যবোধে'র উপরেই দাঁড়িয়ে আছে তা ঠিক নয়। বৌদ্ধধর্ম দাঁড়িয়ে আছে ভগবান বুদ্ধের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও তাঁর উপদিষ্ট বাণীর উপর। বুদ্ধ-বাণীর মধ্যে আছে একটি স্থির লক্ষ্য ও তাতে পৌছবার স্পষ্ট উপায়। লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ ও উপায় 'অষ্টাঙ্গিক-মার্গ'। জৈনধর্মও দাঁড়িয়ে আছে জৈনধর্মের প্রবক্তা জিনদের উপলব্ধ সত্য ও তাঁদের বাণীর উপর। সেখানেও আছে লক্ষ্য ও তাতে পৌছবার উপায়। জৈনমতের লক্ষ্য হচ্ছে মোক্ষ ও উপায় 'সম্যক্-চারিত্র' যা পঞ্চ-মহাব্রত নামে পরিচিত।

'জরা-বিবরণে'র পরিচ্ছেদের মধ্যে লেখক কোন নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার মধ্যে মানুষ জরাগ্রস্ত হয় না তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা মনীষীর মত উদাহরণ সহ উপস্থাপিত করেছেন। এই পরিচ্ছেদটি সবচেয়ে উপকারে লাগবে অবহেলিত বৃদ্ধদের যাঁরা অনেকেই নিজেদের জরাগ্রস্ত ভাবতে চান না, তাঁরা উল্লিখিত মহাজনদের উক্তিগুলিতে

উৎসাহ পাবেন নিঃসন্দেহে।

গ্রন্থশেষে লেখক বৃদ্ধদের জন্য একটি পরামর্শ দিয়েছেন, আন্দোলন করে সরকারের কাছ থেকে দাবী আদায় করার জন্য। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি চান বৃদ্ধদের 'অর্থকষ্ট, আধি-ব্যাধি, চিকিৎসা ও সেবাযত্নের অভাব, মর্যাদাহানি, নিঃসঙ্গতা, অক্ষমতাবোধ ইত্যাদি বার্ধক্যের মৌল সমস্যাগুলির সুরাহা' করতে। আন্দোলনমুখর সমাজের এক পণ্ডিত ব্যক্তির উপযুক্ত হিতোপদেশই বটে! প্রস্তাবের অভিনবত্ব স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু মাননীয় লেখকের কাছে আমাদের সুবিনীত জিজ্ঞাসা এই যে, আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার বৃদ্ধদের দাবীগুলিকে সর্বাংশে মেনে নিলেও, এই আন্দোলনের দ্বারা মানুষের অবশ্যম্ভাবী বার্ধক্যকে ঠেকাতে পারা যাবে তো? প্রত্যেক মানুষের একদিন বার্ধক্য আসবে এবং মহাকালের কবলেও ঢলে পড়তেই হবে। পারের কড়ি সঞ্চয় করার আর অবসর তখন থাকবে কি? শুধু আন্দোলন আর আন্দোলন করে ইহজগতের জন্য পার্থিব জিনিস কিছু আদায় করা হবে। লেখক 'নিবেদনে' লিখেছেন, এই গ্রন্থটি 'দুঃখ-জরা জয়ের এ এক নববৌদ্ধ অন্বেষণা।' পাঠক-পাঠিকারাই বিচার করে দেখবেন এই 'নববৌদ্ধ অন্বেষণা' কতদূর সার্থক হয়েছে। এটি তাঁদের উপরই ছেড়ে দেওয়া ভাল। সমালোচকের মন্তব্য এখানে নিষ্প্রয়োজন।

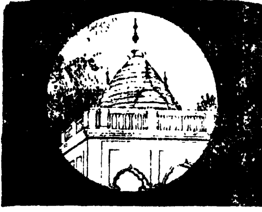
লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল ও গতিশীল। পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে থাকা যায় না। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য পড়ার গতি মাঝে মাঝে ব্যাহত হয়েছে, তা কিন্তু বড়ই পীড়াদায়ক। ৮২ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য আরও কিছু কম হলে ভাল হত বলে মনে হয়।

—অর্যমা

মহর্ষি নগেন্দ্র-স্মারক গ্রন্থ। প্রকাশক: যুগাচার্য মহর্ষি নগেন্দ্র মেমোরিয়াল কমিটি। ২বি, রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা-৯, মূল্য: ৪০৲।

এই সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে মহর্ষির তিরোভাবের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে। গ্রন্থটি মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মহর্ষি নগেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব, তাঁর অলৌকিক প্রতিভা, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মানসলোকের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে সুবিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা—যাঁদের মধ্যে আছেন ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রভৃতি। দ্বিতীয় 'বিবিধ' অংশে আছে ভারতের ধর্ম ও অধ্যাত্মচিন্তা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ, যে-সব প্রবন্ধের রচয়িতারা তাঁদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ বিশেষজ্ঞ। গুণিজনের রচনাসমৃদ্ধ গ্রন্থটি আনন্দলোকের বার্তাবহ মহাপুরুষের পরিচয়ে যথার্থ মহার্ঘ গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নব ধর্ম আন্দোলনের দ্বারা চিহ্নিত। বহু মনীষী ও মহাপুরুষের আবির্ভাবে এই শতাব্দী ধন্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমসাময়িক নগেন্দ্রনাথ তাঁরই ভাবে ভাবিত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের যুগান্তকারী বাণী 'যত মত তত পথে'র অনুসরণ করে তিনিও বলেছেন, 'যে যা ব'লে ডাকে তখন সে যে সেই রূপধারী হয়।' শ্রীদীপেন রাহা লিখিত 'যুগাচার্য নগেন্দ্রনাথ ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধটিতে উভয়ের সাক্ষাতের বিবরণ আছে, কিন্তু এই তথ্যের উপযুক্ত উপাদান বা সূত্রের উল্লেখ নেই। প্রামাণিকতার উল্লেখ থাকলে প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান হত। গ্রন্থটির ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় উপাচার্য রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'লোককল্যাণে'র অভীষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। এইরূপ মহৎ গ্রন্থে যে যথার্থ 'লোককল্যাণ' সাধিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

—অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ : শ্রীলঙ্কা হইতে আগত শরণার্থীরা রামেশ্বরের নিকট মন্দাপম্ শিবিরে আশ্রয় লইয়াছে। মাদ্রাজের ত্যাগরাজ-নগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে ৬ হইতে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ পর্যন্ত ২,১৮৩ জন শরণার্থীকে দিনে একবার রন্ধিত খাদ্য খাওয়ানো হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে বিছানার চাদর, ধুতি, চিরুনি, বিস্কুট, আচার প্রভৃতি জিনিস। কোইম্বাটোরের একজন সহৃদয় চিকিৎসক বন্ধু শরণার্থী রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা-কার্যে সহায়তা করিতেছেন। ইহা ছাড়া শিবিরে চারিটি সেলাইয়ের কল বসানো হইয়াছে। যে-সব বদান্য ব্যক্তি কাপড় দিয়াছেন তাহা হইতে জামা করানো হইতেছে শরণার্থীদের জন্য।

সৌরাষ্ট্রে বন্যাত্রাণ : বন্যাবিধ্বস্ত ক্ষতিগ্রস্ত জুনাগড় জেলায় রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রাথমিক ত্রাণকার্য এখনও চালাইতেছেন। যে-সব দরিদ্র গ্রামবাসীর গরু-বাছুর বন্যায় হারাইয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে ১,০০০টি গরু, ভেড়া ও ছাগল বিতরণ করার ব্যবস্থা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে খরাত্রাণ : পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের মাধ্যমে ৬টি গ্রামে স্থানীয় গ্রামবাসীদের দ্বারা ১টি পুকুর ও ২টি পাতকুয়া খোঁড়া হইয়াছে এবং ৪টি পুকুরও পুনঃসংস্করণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ২২৬টি পরিবারের মধ্যে ২,৫১০ কিলোগ্রাম বীজ ধান বিতরণ করা হইয়াছে। ফলের চারা বিতরণ এবং পুষ্করিণী হইতে জমিতে জল আনিবার ব্যবস্থাও হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে গাইঘাটা ঘূর্ণিবাত্যা : ২৪ পরগনা গাইঘাটা থানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে ঘূর্ণিবাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনকল্পে 'নিজের বাড়ি নিজে কর' ২৩টি গ্রামের ৪৮২টি বাড়ি-নির্মাণের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাহা ৯০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ সেখানকার শিবির বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরপুকুরে মেয়েদের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশের দুইটি অংশ তৈয়ারি করিবার একটি প্রস্তাব বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর মাধ্যমে মিশনের নিকট আসিয়াছে। প্রস্তাবটি মিশনের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা এই বৎসরও যথোচিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূজার কয়দিনই বেশ সুন্দর আবহাওয়া থাকায় প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল। পূজার তিনদিনই সমাগত ভক্তগণকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত শাখাকেন্দ্রগুলিতেও প্রতিমায় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

আসানসোল, বালিয়াটি, বরিশাল, বোম্বাই, কাঁথি, ঢাকা, গৌহাটি, হবিগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লখনৌ, মালদহ, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণ-গঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জী), শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

গত ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যারতির পর বাংলাদেশের

মুখ্য সামরিক প্রশাসক লে. জেন্. এইচ. এম্. এরশাদ দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ পরিদর্শন করেন।

দ্বারোদ্‌ঘাটন

ঢাকা (বাংলাদেশ) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় ভবনের নবনির্মিত একতলা ও দোতলার অংশ-বিশেষের উদ্বোধন করেন গত ১১ জুলাই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ।

ছাত্র-কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুলের পাঁচটি ছাত্র 'জুনিয়র ডিপ্লোমা' পাঠক্রম ১৯৮২-র পরীক্ষায় ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছে।

যুবসম্মেলন

পোনাম্‌পেট আশ্রমের পরিচালনায় গত ১৮ সেপ্টেম্বর যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দুইটি অধিবেশনে ১০৭ জন যুবক উপস্থিত ছিল।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশনে ১৮ হইতে ২০ অক্টোবর, তিনদিনব্যাপী দ্বিতীয় পর্যায়ে যে যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা হইতে প্রতিনিধিরূপে ১৮০ জন যুবক-যুবতীর সমাবেশ হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সচিব স্বামী গহনানন্দ এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী শিবেশ্বরানন্দ, শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য, শ্রী এস্. এস্. পাড়ি, শ্রীশত্রুঘ্ন নাথ, শ্রীহৃদানন্দ রায়, শ্রীরাজকিশোর রায়, শ্রী এ. পি. গুরু, শ্রীপ্রশান্তকুমার পট্টনায়ক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি যুবসম্মেলনে ভাষণ দেন। তরুণ-তরুণী প্রতিনিধিমণ্ডলী স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে কৃতসঙ্কল্প হন।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কার্যবিবরণী

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথক্ষেত্র পুরীধামে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শুভসূচনা হয়। অনাড়ম্বরভাবে শুরু হইলেও এই আশ্রম এখন ওড়িষ্যা রাজ্যের একটি বিশিষ্ট সেবামূলক ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে পরিণত। সম্প্রতি আমরা এই কেন্দ্রের বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৮২-৮৩) হইতে যাহা অবগত হইয়াছি তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :

আপাততঃ দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া আশ্রমের কর্মসূচী নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিতেছে—(১) পূজা-অর্চনা, নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া লোককল্যাণকর অসাম্প্রদায়িক শাশ্বত ধর্মের প্রচার এবং (২) বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সেবা ও ত্রাণকার্য এবং সুপরিচালিত ছাত্রা-বাসের মাধ্যমে সমাজের সর্বশ্রেণীর বিশেষতঃ দরিদ্র ও অনুন্নত মানুষের কল্যাণ-চেষ্টা।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মানুষ্ঠান: আশ্রমের সুপরিসর মন্দিরে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা, প্রতি একাদশী তিথির সন্ধ্যায় রামনাম-সঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের এবং শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও শঙ্করের আবির্ভাব-তিথি উৎসব পালিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে নিয়মিত-ভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা হয়।

গ্রন্থাগার: আশ্রমের জনসেবামূলক কর্ম-সূচীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হইল এই গ্রন্থাগার। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের শেষে এখানকার পুস্তক-সংখ্যা ছিল ১৬,৪৭৪। পাঠকক্ষে প্রতিদিন গড়ে ১৮০ জন পড়াশোনা করেন। পাঠকদের জন্য ১০ খানি দৈনিক এবং ৭০ খানি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়।

ছাত্রাবাস: ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রমে একটি ছাত্রাবাস খোলা হয়। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে থাকা, খাওয়া এবং পরিধেয় বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে এখানে ৬৫ জন ছাত্র

আছে। ছাত্রাবাসে একটি পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগার আছে—যাহার পুস্তকসংখ্যা ৩,২৩০। উদ্যান-চর্চা, বেকারি (রুটি তৈয়ারির কাজ), গো-পালন ইত্যাদি শিক্ষাও আবাসিক ছাত্রদের দেওয়া হইয়া থাকে। 'কেশরী' নামে একটি দেওয়াল-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

ত্রাণকার্য: আলোচ্য বৎসরে এই কেন্দ্র পুরী জেলার কাকতপুর, অষ্টরঙ্গ এবং গোপ অঞ্চলের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে দীর্ঘমেয়াদী ত্রাণকার্য চালান। বন্যাপীড়িত ২১,২০০ জন নরনারী এই ত্রাণকার্যে সুবিধা পাইয়াছেন। এই বাবদে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মোট ব্যয় হইয়াছে আনুমানিক দুই লক্ষ টাকা।

উদ্বোধন-সংবাদ

১ অক্টোবর শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ এবং ৬ অক্টোবর শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি যথাযথভাবে পালিত হয়।

২ অক্টোবর রবিবার 'সারদানন্দ হলে' শক্তি-তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত অথবা গীতা এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি।

স্বামী রঘুবরানন্দ (রামপ্রসাদ মহারাজ) গত ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, সকাল ১১-৪৫ মিনিটে শ্বাসকার্য বন্ধ হওয়ার ফলে বারাণসী সেবাশ্রমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৮ বৎসর। গত ৯ অগস্ট তিনি সেবাশ্রমে ভর্তি হন ম্যালেরিয়া জ্বর লইয়া। ক্রমে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন, কিন্তু পরে অসুখের অন্য জটিলতা সৃষ্টির ফলে দেহের দুই দিকে পক্ষাঘাত হয়। হয়তো মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হওয়ার জন্যই এইরূপ হইয়াছিল। প্রশান্তির মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তিম সময়টি ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন তিনি। বারাণসী সেবাশ্রমে তিনি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে যোগদান করেন এবং তাঁহার গুরুর নিকট হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কনখল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ব্যতীত তিনি বেলুড়মঠ, কালিম্পং, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান এবং লখনৌ সেবাশ্রমে বিভিন্ন সময়ে কর্মীরূপে কাজ করেন। সঙ্ঘে যোগদানের পর হইতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করেন এবং ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শেষদিন পর্যন্ত তিনি সেবাশ্রমে অবসরজীবন যাপন করিতে-ছিলেন। সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দ (দেবেশ মহারাজ) গত ১৫ অক্টোবর প্রত্যূষে সাড়ে চারি ঘটিকায় মস্তিষ্কে রক্তচলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় ৮৮ বৎসর বয়সে আসামের ডিগ্‌বয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১২ অক্টোবর তাঁহাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে উত্তমরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত দেবেশ মহারাজ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশনের শ্রীহট্ট আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। উক্ত কেন্দ্র ব্যতীত তিনি মিশন ও মঠের ঢাকা ও করিমগঞ্জ কেন্দ্রের বিভিন্ন দায়িত্বে সমাসীন ছিলেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ আসামের ডিগ্‌বয়স্থ অননুমোদিত কেন্দ্র রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন। এই আশ্রমটি মুখ্যতঃ তাঁহারই প্রেরণাধীনে মিশনের আদর্শে গড়িয়া উঠিতেছিল। সমাগত নরনারীদের মধ্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচার ও নিয়মিত শাস্ত্রচর্চা ছিল তাঁহার কর্মপ্রণালী। তাঁহার উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন, সরল ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তৎকৃত ব্রহ্মসূত্রের সরল বঙ্গানুবাদ এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে বিলীন তাঁহাদের আত্মা অনন্ত শান্তিলাভ করিয়াছে—আমাদের অন্তরের বিশ্বাস।

বিবিধ সংবাদ

দ্বারোদ্ঘাটন

শ্রীনগর (কাশ্মীর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২ জুন ১৯৮৩, নবনির্মিত ঠাকুরঘর, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠগৃহসহ গ্রন্থাগার ও একটি বক্তৃতাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে ১ হইতে ৬ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। উৎসবের বিভিন্ন সূচীতে অংশগ্রহণ করেন স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী জিতাত্মানন্দ, স্বামী নিখিলাত্মানন্দ প্রভৃতি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিগণ। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল বি. কে. নেহরু, ডঃ করণ সিং প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি উৎসবকে গৌরবমণ্ডিত করে।

চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ভাষণের ৯০ বছর পূর্তি উৎসব

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা)-র উদ্যোগে গত ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, রবিবার চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ঐতিহাসিক ভাষণের ৯০ বছর পূর্তিকে শ্রদ্ধাসহ স্মরণ করা হয়। ঐ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অজজানন্দ। বহু ভক্ত ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হইয়াছিল। ছাত্ররা ভক্তিগীতি, আবৃত্তি এবং স্বামীজীর রচনা পাঠ ইত্যাদি পরিবেশন করেন। অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। সভার প্রারম্ভে সোসাইটির সেক্রেটারি ডক্টর শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করেন।

হুগলী ঘুঁটিয়াবাজার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শিবিরের (অশোক পাঠচক্র) উদ্যোগে চিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর ভাষণের ৯০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, রবিবার সকাল ৭-৩০ টায় স্বামীজীর বিভিন্ন ছবি ও বাণী এবং ব্যাণ্ডসহ পথপরিক্রমা ও সকাল ৮-৩০ টায় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনটি বিভাগে ভাষণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ৩৩ জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতি বিভাগে প্রথম তিনজনকে পুরস্কার দেওয়া হয়। সকল প্রতিযোগীকে উৎসাহ-পুরস্কার হিসাবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের পুস্তকাদি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কৃপাধন্যা **সরযূবালা সেন** গত ৩১ অগস্ট ১৯৮৩, রাত্রি ১০ ৪৫ মিনিটে ১১ নং লেক ইস্ট থার্ড রোড সন্তোষপুর কলিকাতাস্থিত বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইঁহাদের আদিবাসস্থান ছিল ফরিদপুর জেলার পালং-এ। তাঁহার স্বামী ৺নলিনী রঞ্জন সেন। অমায়িক ও সরল ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের কৃপাধন্যা **শ্রীমতী সুনীতিবালা সেন** ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহাদের কলিকাতাস্থিত ফার্ণ রোডের বাসভবনে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্বামী প্রয়াত বঙ্কুবিহারী সেন শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিত সন্তান।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত অধ্যাপক ৺ভবানীচরণ গুহ মহাশয়ের স্ত্রী **শান্তিসুধা গুহ** গত ২ অক্টোবর ১৯৮৩, বিকাল ৫-১০ মিনিটে কলিকাতাস্থ ভবনে দেহত্যাগ করেন। স্বামী ও স্ত্রী দুইজনই শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শান্তিসুধা দেবী আজীবন ধর্মনিষ্ঠ ও নিপুণ শিল্পী ছিলেন।

উপরি-উক্ত তিনজনের দেহনির্মুক্ত আত্মা শান্তিলাভ করুক—ইহাই আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রার্থনা।



৮৫তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

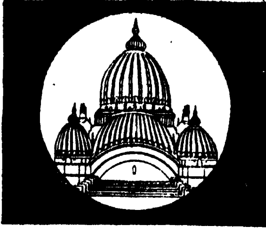
অগ্রহায়ণ, ১৩৯০

দিব্য বাণী

·· সেই একই ঈশ্বর সকলের ডাকে সাড়া দেন ; অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মারও রক্ষা এবং উদ্ধারের জন্য তুমি, আমি বা অপর দায়ী নয়, সেই এক সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সকলের জন্য দায়ী। আমি বুঝিতে পারি না, লোকে কিরূপে একদিকে নিজদিগকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করে, আবার ইহাও ভাবে যে, ঈশ্বর একটি ক্ষুদ্র জনসমাজের ভিতর সমুদয় সত্য দিয়াছেন, আর তাহারাই অবশিষ্ট মানব-সমাজের রক্ষক। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না। যদি পারো তবে তাহাকে কিছু ভাল জিনিস দাও। যদি পারো তবে মানুষ যেখানে আছে, সেখান হইতে তাহাকে একটু উপরে তুলিয়া দাও। ইহাই কর, কিন্তু মানুষের যাহা আছে, তাহা নষ্ট করিও না। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্যনামের যোগ্য, যিনি আপনাকে এক মুহূর্তে যেন সহস্র সহস্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন ; কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য, যিনি অল্পায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন—যিনি নিজের শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন।···যাঁহারা কেবল অপরের ভাব নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনই কোন উপকার করিতে পারেন না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৪০৪-৫]



কথাপ্রসঙ্গে

একটি স্মৃতি ঃ একটি আদর্শ

না, আমরা কোন রূপকথার অবতারণা করিতেছি না। চোখে-দেখা একটি বাস্তব ঘটনার বিবৃতি দিতেছি। মনে হইবে নিছক গল্প,—কিন্তু আসলে ইহা সাম্প্রতিক কালের একটি অভিজ্ঞতা মাত্র। গিয়াছিলাম দূর পল্লীপ্রান্তে একটি স্মৃতি-স্থানের অনুসন্ধানে। খুব ধারে কাছে নহে—উত্তরপ্রদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, শহর-নগর ছাড়াইয়া জনবিরল এক শান্ত গ্রামের মাঝে। আধুনিকতার পারিপাট্য কোথাও কিছু নাই। আমরাও যেমন সম্পূর্ণ অপরিচিত, লোকজন পরিবেশ পথঘাটও তেমনই সব অজানা।

যাহা হউক, খুঁজিয়া পাতিয়া আমরা দুপুর নাগাদ গিয়া, সেখানে পৌঁছিতে পারিয়াছিলাম। গভীর তৃপ্তি ও স্বস্তি বোধ হইতেছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই পুরাতন জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখবর্তী বাগানে ততোধিক স্থবির এক অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম,—এখনও মাঠ ভাঙিয়া আরও কিছু দূরে গেলে তবে গঙ্গা দর্শন হইবে। তারপর চেষ্টা করিতে হইবে গঙ্গার তটে তটে চলিয়া আরও কোথাও যাইতে। ভিক্ষা কোথায় মিলিবে এখানে, এ-চিন্তাও যে একেবারে ছিল না এরূপ নহে। দোকানপাটও এদিকে নাই। অবশ্য পাঁচ-ছয় কিলোমিটার পথ পিছাইয়া গেলে জনবসতি ও দোকান ইত্যাদি পাওয়া যাইবে।

চলার আনন্দে চলিতেছি বটে, কিন্তু শরীরের শ্রান্তিও যে বাড়িতেছে, তাহাও ক্রমে স্পষ্ট হইতেছিল। দুপুর গড়াইয়া যাইতেছে, মাথার উপর প্রখর সূর্য। গলা শুকাইতেছে—কাছে-পিঠে পানীয় জল কোথায় তাহাও জানা নাই। দেবালয়ের ঐ সেবক একজন ব্যতীত, এতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন লোকজনের মুখ বিশেষ চোখে পড়ে নাই। সৌম্যদর্শন ঐ তরুণ সেবকের কাছে জলতৃষ্ণার কথা জানাইলে, তিনি বাগানের এক কোণে গাছের ছায়া-ঢাকা একটি এঁদো কুয়া হইতে তুলিয়া ঘটি ভরিয়া জল আনিয়া দিলেন! আকণ্ঠ পান করিয়া পিপাসার নিবৃত্তি হইল—ঘটির জলে যেন স্বর্গীয় সৌরভ অনুভূত হইয়াছিল।

বাগানের অপর দিক হইতে দুই জন অচেনা ব্যক্তি আসিয়া স্বেচ্ছায় আলাপ পরিচয় করিলেন, —জোড়হাতে অনুনয় করিলেন যেন আমরা ঐ বনস্থলীর শেষপ্রান্তে দুই কিলোমিটার দূরে, তাঁহাদের আশ্রমে একবার পদার্পণ করি এবং আরও জানাইলেন যে, আমরা যখনই যাই না কেন, আমাদের জন্য ভিক্ষাদি প্রস্তুত থাকিবে। অবাক হইয়াছিলাম তাঁহাদের অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণে। শ্রীভগবানের প্রেরিত দূত বলিয়া মনে হইয়াছিল উঁহাদের দুই জনকেই। তাঁহাদের শুভ্র বসনে ও সাত্ত্বিক মুখশ্রীতে ধারণা হইতেছিল—উঁহারা একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত বা ব্রহ্মচারী সাধক। নিশ্চিন্ত আনন্দে ভিক্ষাগ্রহণে স্বীকৃত হইতে যাইতেছি, সহসা সেই দেবালয়ের তরুণ সেবক-ঠাকুর মিনতির সুরে জানাইলেন,—না, আমাদের ভিক্ষা-ব্যবস্থা তিনিই করিবেন, অন্যথায় শ্রীভগবান তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইবেন। দেবালয় হইতে অতিথি অভুক্ত ফিরিয়া যাওয়া, সেবকের অমঙ্গলই

সূচিত করে। অগত্যা আমরাও উভয় প্রস্তাবের সম্মান রক্ষার্থে স্থির করিলাম—আমাদের পর্যটন শেষে এই দেবালয়ে ঘুরিয়া আসিয়া এখানেই ভিক্ষা লইব, আর ফিরিবার পথে সেই দূরের আশ্রমটিও একবার দেখিয়া যাইব।

আমাদের পশ্চাতে বলিষ্ঠদেহ নগ্নগাত্র এক প্রৌঢ় ব্যক্তি অদূরে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আমাদের সকল কথাই বেশ মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিল। তাহার হাতের বিশাল লাঠিটি জানাইয়া দিতেছিল যে, সে তখন মাঠে গোরু-মহিষাদি চারণের কর্মে নিযুক্ত এবং দূর হইতে আগন্তুক আমাদিগকে দেখিয়াই এখানে আসিয়া হাজির হইয়াছে। আমরা তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই পলকের মধ্যে হাতের দণ্ডটিসহ সে নিজেও ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রসন্নোজ্জ্বল মুখে ও আয়ত দুই চক্ষুতে সরল হাসি লইয়া করজোড়ে নিবেদন করিল যে, আমাদের এই পর্যটনে সেও সঙ্গী হইতে ইচ্ছুক। পরিচয়ে জানিয়াছিলাম দরিদ্র গ্রামবাসী—কিছুদিন সেনাবিভাগের কর্ম করিয়াছিল, কিন্তু ভাল না লাগায় ঘরে চলিয়া আসিয়াছে,—নাম গুলাব সিং। এমন অযাচিত বন্ধুলাভ করিয়া, আমরাও পরমানন্দে তাহার সাহচর্যকে সাথী করিয়া পুনরায় পথে নামিলাম।

টিলার উপর হইতে ঢালপথে নামিতেছি। গুলাব সিং তাহার হাতের লাঠিগাছা আগাইয়া দিল,—বলিল, লাঠিতে ভর করিয়া চলিতে। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে তবে নিজে কেমন করিয়া চলিবে। সহাস্যে জবাব দিয়াছিল, সে লাঠি ছাড়াও চলিতে অভ্যস্ত। মাঠের আলপথ ধরিয়া হাঁটিতেছিলাম—গঙ্গার উদ্দেশ্যে। মা গঙ্গা সেখানে উত্তরবাহিনী—তাই পরম তীর্থ। মাঠের দুই দিকে সবুজের সমারোহ—সম্মুখে কোথাও কোথাও গম ও বজরার ক্ষেত। ফসলভরা ক্ষেতের উপর দিয়া বাতাসের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে। যত দূর দৃষ্টি যায়—ঐ এক মায়াময়ী রূপ। মাঝে মাঝে বাতাসের শীতল স্পর্শ আভাসে জানাইয়া দিতেছিল, আমরা ক্রমেই গঙ্গার নিকটবর্তী হইতেছি। বেশ একটা আবেশে ও উৎসাহে মাঠ ভাঙিয়া আগাইয়া চলিয়াছি। আর পথপ্রদর্শক গুলাব সিং নানা গল্প, বিচিত্র উপাখ্যান, আশ্চর্য সব তাহার অনুভূতির কাহিনী আমাদিগকে শুনাইতেছিল,—বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দুইটি কখন উজ্জ্বলতর, কখনও বা সজল হইয়া উঠিতেছিল। তাহার কথাগুলি ছিল এমনই সপ্রাণ যে, আমাদের পথ চলাতে উহা বারে বারেই নূতন গতিবেগ জুড়িতেছিল যেন। কিন্তু সঙ্গীতের শমের মতো আমাদের চলার ছন্দেও এক একবার যতি পড়িতেছিল। তথাপি তাল ভঙ্গ হয় নাই, ইহাও সত্য। আমাদের দৃষ্টিকে টানিয়া লইতেছিল,—মাথায় কাঠের বোঝাবাহী এক কাঠুরে বনের পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া আসিতেছে তীরবেগে,—বোঝাটিকে ফেলিয়া রাখিয়া যেন আমাদের দিকেই ছুটিতেছে জোড়-হস্তে! পাচন হাতে রাখাল বালকও আমাদেরই অনুসরণ করিতে শুরু করিয়াছিল কখন কে জানে! আমাদের পিছনে পিছনে তাহারাও চলিতেছে! ঐ দূরে কে একজন ক্ষেতের ফসল কাটিতেছিল,—অকস্মাৎ দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পড়িল! কাহারা যেন দল বাঁধিয়া এদিক পানেই আগাইয়া আসিতেছে। ভারী মজার মজার দৃশ্য! সঙ্গী গুলাব সিং বিজ্ঞের মতো বুঝাইয়া দিতেছিল—ঐ অঞ্চলের মানুষগুলি সাধু-ফকির দেখিলে ঐরূপই চঞ্চল অধীর হইয়া পড়ে। ওদিকের জল বাতাসের উহাই নাকি এক বিশেষত্ব। গুলাব সিং তাহার বলিষ্ঠ কিন্তু মধুর দেহাতী হিন্দীতে অনর্গল বলিয়া চলিতেছিল, ওখানকার গ্রামবাসীদের প্রতি সাধুমহাত্মাদের প্রভাব কীরূপ অপরিসীম,—কত

পবিত্র সন্ত-জীবন সে নিজের চক্ষেও দেখিয়াছে,—আর ঐ পল্লীর মৃত্তিকা কীভাবে তাহাদের পদ-ধূলিতে বার বার পবিত্র হইয়াছে। শতাধিক বর্ষ আগে জগদ্বিখ্যাত এক মহাপুরুষ ঐ গরীব গ্রামের মাটিতেই তাঁহার সাধন ও সিদ্ধি সমাপন করিয়া সেখানেই আত্মাহুতি দিয়াছেন। তাঁহারই অলক্ষ্য মহিমা এখনও নাকি ক্রিয়াশীল রহিয়াছে ঐ গাঁয়ের আকাশে-বাতাসে। মহিমান্বিত সেই মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিতে অদ্যাবধি গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ আবালবৃদ্ধ সকলেই গৌরবে রোমাঞ্চিত হয়, সংসারের ঝগড়া-বিবাদ সব ভুলিয়া যায়। ঐ পবনাহারী মহাযোগীর সঙ্গে 'ভেট্' করিতে এই যুগের 'সব-সে মহান্ পুরুষ', যিনি সারা দুনিয়াতে আজ পূজিত, তিনিও নাকি আগমন করিয়া-ছিলেন,—গুলাব সিং সগর্বে এ-সংবাদও আমাদিগকে জানাইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলাম, ঐ 'সব-সে মহান্ পুরুষ' কি স্বামী বিবেকানন্দ? গুলাব সিং সাহ্লাদে ও উত্তেজনায় সায় দিয়াছিল। তখন তাহার দুই নেত্র হইতে যেন জ্যোতিঃ ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছিল। তাহার ললাট যেন আরও উন্নত বোধ হইল—বক্ষ আরও স্ফীত ও প্রশস্ত। তাহার পদক্ষেপকেও মনে হইতেছিল দৃঢ়তর এবং সুনিশ্চিত।

একটা ক্ষীণ জলধারা বা শুষ্কনদী পার হইতে-ছিলাম, বাঁশের তৈরি দুর্বল সাঁকোর উপর দিয়া। গুলাব সিং ক্ষিপ্রবেগে আগাইয়া গিয়া তাহার ডানহাতখানি বাড়াইয়া দিল, অবলম্বনরূপে ধরিবার জন্য। বলিলাম,—না, না, আমরা নিজেরাই পার হইতে পারিব। তবুও লক্ষ্য করিয়াছিলাম, গুলাব সিং-এর কপালে উদ্বেগের রেখা সহসা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, আমাদের যাত্রাপথে এই ব্যক্তি কোন্ স্বার্থে এমনভাবে সঙ্গ লইয়াছে,—আর পথে-প্রান্তরে দেখা হওয়া ঐ ভক্তিমান্ ক্ষেত-মজুর, কাঠুরে, শ্রমজীবী, চাষী উহারাই বা কাহারা? গুলাব সিংকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা উত্তর পাইয়াছিলাম তাহার সার নিষ্কর্ষ এই:

সংসারে কিছুই থাকে না। থাকে কেবল সৎকর্ম ও সৎসঙ্গের ফল। দুঃখের সংসারে ঐটুকুই একমাত্র সুখ। মানুষের সেবা, বিশেষ করিয়া সাধু-ফকির-অতিথির পরিচর্যা অপেক্ষা সৎকর্ম আর কি হইতে পারে? আর দুর্লভ সৎসঙ্গও তো এই সুযোগেই হইয়া যায়।

*

মা গঙ্গা এতক্ষণে দৃষ্টিগোচরা হইলেন। আর নিকটেই বড় বড় গাছের ছায়ায় থান তিনেক কুটিরও দেখা গেল। গুলাব সিং প্রমুখাৎ জানিতে পারিলাম, ঐ তিনখানি কুঠিয়া মহাত্মাদের বাসের জন্য, নিকটস্থ গ্রামবাসীরাই নির্মাণ করিয়া দিয়াছে, তাহাদেরই নিজস্ব জমিতে। উপস্থিত মাত্র একজন মহাত্মা রহিয়াছেন একটিতে, বাকী ভজন-কুটির দুইটি শূন্য পড়িয়া আছে। সে আমাদিগকে আরও বলিল—প্রয়োজন বোধ করিলে যতদিন ইচ্ছা ওখানে থাকিয়া ভজন-সাধন করা চলিতে পারে। ভগবদ্ ইচ্ছায় ভজনরত মহাত্মার ভিক্ষাদি কুটির-দ্বারেই পৌঁছিয়া যাইবে,—এমন কথাও বেশ স্পষ্ট ভাষায় সগৌরবে জানাইয়া দিল। শুনিতে খুব ভাল লাগিতেছিল সহসা কোন্ সময়ে আসিয়া আমরা এক মহাত্মার কুঠিয়ার প্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম, খেয়াল করিতে পারি নাই। তন্ময়তা বুঝি ইহাকেই বলে। শুভ্রবেশধারী সৌম্য শান্তদর্শন জনৈক মহাত্মাকে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমাদের পথের শ্রান্তি নিমেষে জুড়াইয়া গিয়াছিল। বলিলাম,—গঙ্গা-স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া এই কুটির-সন্নিহিত বৃক্ষমূলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইব। তখন সন্তজীর সঙ্গে আরও কথা হইবে।

গঙ্গার বালুকাস্তীর্ণ তীর ধরিয়া দ্রুতপদে

চলিতেছি। সহচর গুলাব সিং কিন্তু এক তিলও চোখের আড়াল হয় নাই। এবার তাহার হাতে একটি পিতলের ঝকঝকে ঘটি! আমাদের চোখের বিস্ময় কিন্তু তাহারও দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই জিজ্ঞাসা না করিতেই জবাব মিলিয়াছিল—'দিশাজঙ্গল', স্নান ইত্যাদি কোন প্রয়োজনে আমাদের যদি কাজে লাগে, তাই সে গ্রামের কাহারও নিকট হইতে ইতিমধ্যেই ইশারায় ঐ লোটাটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

*

গঙ্গাস্নানান্তে আসিয়া সেই কুটির-সংলগ্ন বৃক্ষতলে বসিয়াছি কিন্তু সেখানেও বিস্ময়কর দৃশ্য! দূরাগত পথিক—সকল বয়সের মানুষ আসিয়া ক্রমে জুটিতে শুরু করিয়াছিল। কেহই শূন্য হাতে আসে নাই। থালায় করিয়া চাল-ভাজা, কেহ বা লোটায় ভরিয়া দুধ বা চা, আবার কাহারও হাতে ছিল বিস্কুটের মোড়ক। আর কুঠিয়াবাসী সহাস্য মহাত্মার মুখে মধুর আপ্যায়ন-বাক্য তো ছিলই। আগন্তুক গ্রামবাসীদের মধ্যে বালক-যুবকও ছিল। তাহাদের কৌতূহলী সরল চাহনিতে শ্রদ্ধার কিরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। গুলাব সিং এখানেও নিষ্ক্রিয় নির্বাক ছিল না। বরং মনে হইতেছিল, সে-ই যেন গ্রামবাসীর মুখপাত্র। অর্জন সিং, হরভজন, দেওদাস, গিরিধারীলাল, শিওপূজন, রাখতরাম প্রভৃতি আরও কতজন যে তাহার গ্রাম্য সাঙাত সেখানে মিলিয়াছিল তাহা আমরা ঐ অল্প সময়ের মধ্যে হিসাব লইয়া উঠিতে পারি নাই। গুলাব সিং সকলের হইয়া আবেদনের সুরে বলিতেছিল :

গ্রামবাসীরা বড় দরিদ্র, তাই উপযুক্ত আতিথেয়তার দ্বারা সেবা করিতে পারিতেছে না। তাহাদের গরিবানা উপহার—শুষ্ক চাল-ভাজা ইত্যাদি আমরা কষ্ট করিয়া দুই মুষ্টি গ্রহণ করিলে গ্রামগুলির মঙ্গল হইবে, গ্রামবাসীদের মনে সন্তুষ্টি আসিবে,—সর্বোপরি শ্রীরামজী প্রসন্ন হইবেন।

গুলাব সিং-এর এই উক্তির সঙ্গে উহাদের সকলেরই আন্তরিক সম্মতি আমাদের উপলব্ধি করিতে অসুবিধা হয় নাই,—খুব সহজেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

গুলাব সিং এবং তাহার সহযোগী সেই পল্লীবাসীরা আমাদের সেদিন বিচিত্র সব কথা শুনাইয়াছিল। উপাখ্যানের মতো তাহারা বলিয়াই চলিয়াছিল :

একদা এতদঞ্চলের গ্রামগুলি ছিল হতশ্রী—বড় তমসাচ্ছন্ন। এদিকের সাধারণ লোক হিংসা-পরায়ণ ছিল—চুরি-ডাকাতি, পারস্পরিক ঈর্ষা-কলহে তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছিল,—কবে কোন্ মহামারীতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হইবার উপক্রম হইয়াছিল—কিন্তু কীভাবে, কোন্ কালে কোন্ সাধু-সন্তের কৃপাদৃষ্টিতে এই দরিদ্র অঞ্চলে আজ স্বর্গের শান্তি ও সৌভাগ্য ফিরিয়া আসিয়াছে,—মানুষে মানুষে প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, এক-একখানি গ্রাম যেন আজ এক-একটি বৃহৎ পরিবারে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহারা বাপ-ঠাকুরদার মুখে শুনিয়াছে—একশত বৎসর আগে যে প্রসিদ্ধ 'বাবা' শুধুমাত্র বায়ু আহার করিয়াই অদূরে এক মাটির গর্তে পড়িয়া থাকিতেন, তিনি হিংস্র জন্তু-জানোয়ার, দস্যু-তস্করকেও 'পাহন দেওতা' বলিয়া 'বহুৎ পেয়ার' করিতেন—রামজীর দূতরূপে সকলকেই 'সাওগত' জানাইতেন! ঐ 'বাবা'র তপঃপ্রভাব এদিকের দুষ্ট লোকদের দুষ্টত্বকে অপহরণ করিয়া লইয়াছে,—'পত্থর কা কোয়লা' এখন হীরা হইয়া গিয়াছে! এই কারণেই এদিকের গ্রামবাসীরা তথাকথিত অর্থে 'আধুনিক' বা 'সুশিক্ষিত' হইতে না পারিলেও বড় শান্তিপ্রিয়, সরল, সত্যাশ্রয়ী, ভগবদ্‌বিশ্বাসী এবং সাধু-বৈষ্ণবদের প্রতি অনুরক্ত। তাহাদের প্রত্যেকের ঘরে মোটা ভাত, শুখা রুটির

সংস্থান আছে,—শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা হইতে বাঁচিবার উপযোগী আচ্ছাদনও সকলেরই রহিয়াছে। শ্রম ইহাদের জীবন,—আর জীবন তাহাদের পূজা। পূজা বলিতে ইহারা বুঝে পরস্পরের সেবা, মানুষের উপকার-সাধন, সন্ত-ফকির ও অতিথির পরিচর্যা এবং সকল কাজের অন্তে ভগবানের নাম-গান ও তাহারই গুণকথা আলাপন।

গুলাব সিং-দের মুখে শ্রুত কথাগুলি মুগ্ধ বিস্ময়ে অন্তরে গাঁথিয়া লইতেছিলাম আমরা। প্রকৃতই অনুভব করিতেছিলাম যেন কোন্ অমর্ত্য-লোকের অধিবাসীদের পবিত্র সাহচর্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

আমরা ভাবিয়াছিলাম, ইহারা গরীব—তাই স্বাভাবিক কারণেই কিঞ্চিৎ অর্থার্থীও বটে। বিদায়কালে উহাদের হাতে সামান্য কিছু দিবার চেষ্টাতে যখন ব্যর্থ হইলাম, তখনই আমাদের সেই মারাত্মক ভুলটি ভাঙিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম, উহারা ইহ-সম্পদে গরীব হইলেও হৃদয়-সম্পদে মস্ত ধনী—অতুল ঐশ্বর্যশালী! অর্থ দূরের কথা এক টুকরা বিস্কুটও কাহারও হাতে দিতে পারি নাই। পরন্তু, আমাদিগের জন্য তাহারা কিছুই যে করিতে পারিল না, এই কারণেই ইহারা পুনঃ পুনঃ কুণ্ঠা প্রকাশ করিয়া আমাদের ঐ ভ্রান্তির মূল বিদীর্ণ করিতেছিল! আমরা যুগপৎ শিক্ষালাভ ও ধর্মের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য মানিয়াছি।

*

পূর্বোল্লিখিত সেই দেবালয়ের সম্মুখস্থ চত্বর। পিছনে ফিরিয়া গুলাব সিংকে আর দেখিতে পাইলাম না। দিগন্তব্যাপী মাঠ পাড়ি দিয়া, সাঁকো পার হইয়া উচ্চ টিলা-জমির উপরে আমরা কখন্ উঠিয়া আসিয়াছি! গুলাব সিং কথায় কথায় ভুলাইয়া আমাদিগকে পৌছাইয়া দিয়া পুনরায় তাহার স্বকর্মে চলিয়া গিয়াছে! যাইবার কালে তাহার লাঠিগাছা ফিরাইয়া লইতে চাহে নাই—কিন্তু জোর করিয়াই তাহার হাতে উহা গছাইয়া দিয়াছিলাম, অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা-সহ। নিষ্কাম কর্মের তথা সেবার জীবন্ত এক উদাহরণ দেখিয়াছিলাম—ঐ গুলাব সিং-এর মধ্যে।

অপরাহ্ণ তখন। মন্দির-সংলগ্ন উদ্যানটি বড় শান্ত গম্ভীর। বাতাসে এক অপূর্ব সুগন্ধ—প্রস্ফুটিত নানা কুসুমের সম্মিলিত সুবাসের সহিত যজ্ঞধূমের সুরভি আমাদের দেহ-মনকে পবিত্রতায় ভরিয়া দিতেছিল। কোথাও কোন জন-মনুষ্য না দেখিয়া বৃক্ষতলে বাঁধানো একখণ্ড বেদিকার উপর চুপচাপ বসিয়াছিলাম কিছুক্ষণ। অনুমানে বিলক্ষণ বুঝিতেছিলাম, সমীপবর্তী দেবগৃহের রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে কেহ হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন,—মন্ত্রোচ্চারণ কর্ণগোচর না হইলেও, যজ্ঞ-ঘৃতের পুণ্য গন্ধ বাতাসে ভাসিতেছিল। প্রাচীন যুগের তপোবন-পরিমণ্ডলের স্মৃতিতে আমরা অভিভূত ও উদ্দীপিত বোধ করিতেছিলাম। অকস্মাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আমাদের পূর্ব-পরিচিত সেবক-ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটিল,—তিনি সহাস্যে ও সবিনয়ে আহ্বান জানাইলেন: ভিক্ষা প্রস্তুত। তাঁহার আহ্বানে কোন ভূমিকা ছিল না, —ভাষায় বাহুল্য শুনি নাই, প্রকাশেও আড়ম্বর দেখি নাই। কিন্তু ছিল প্রচুর প্রাণের টান,—অঢেল আন্তরিকতা।

সেবক-ঠাকুর স্বহস্তে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া পরম যত্ন সহকারে আমাদিগকে দেবালয়ের অলিন্দে বসাইয়া ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধান্বিত তাঁহার দুই চক্ষু আবেগে ছল ছল করিতেছিল। ঐ দিন একাদশী থাকায় উপাস্য শ্রীরঘুনাথকে অন্নভোগ দেওয়া যায় নাই,—সেবকও উপবাসী ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার দৃষ্ট অতিথিরূপী 'রঘুনাথ'কে তিনি উপবাসী রাখেন নাই! ইহাই ছিল আমাদের কাছে পরম বিস্ময়াম্বিত ও শিক্ষণীয় ঘটনা। যখন তিনি নিজ

হাতে সুপরিচ্ছন্ন পাত্র হইতে ঘৃতমণ্ডিত রুটি ও উষ্ণ আতপান্ন পরিবেশন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার উজ্জ্বল নেত্রদ্বয় হইতে বিচ্ছুরিত ভক্তি-দ্যুতি আমাদেরও মনকে শ্রদ্ধায় আবিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। মানসে তাঁহার উদ্দেশে প্রণতি না জানাইয়া পারি নাই। পরে এই ব্রাহ্মণ তরুণের নাম জানিয়াছিলাম—শ্রীহরিপ্রকাশ ত্রিপাঠী। অবশ্য আরও অনেক মহৎ পরিচয় তাঁহার নামের পশ্চাতে রহিয়াছে যাহা তাঁহাকে অতিশয় শ্লাঘনীয় উত্তরাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে,—কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা সে-সকল ব্যক্ত করিতেছি না, করিবার অবকাশও নাই।

বেলা পড়িয়া গিয়াছে। আকাশব্যাপী সূর্যালোক ক্রমেই স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। এবার আমাদেরও ফিরিবার পালা। আলোয় আলোয় বিদায় লওয়াই ভাল। তাই আর বিলম্ব না করিয়া, যাঁহার প্রসাদে এই অজানা অচেনা সুদূরে আসিয়াও এমন কল্পনাতীত নৈকট্যের স্পর্শ পাইলাম—এত সংখ্যক আত্মজনের সমাদর লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম, হৃদয়ের সকল আবেগ নিঃশেষ করিয়া তাঁহাকেই প্রণাম জানাইয়া আমরা প্রত্যাবর্তনের পথে পা বাড়াইলাম। সঙ্গে লইয়া চলিলাম এক পবিত্র স্মৃতি, অথবা এক অননুভূতপূর্ব দিব্য অভিজ্ঞতা।

*

ভাবিতেছিলাম, ধর্মীয় ভারত বুঝি এখনও তবে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই,—ধার্মিক জনসাধারণের নমুনা অদ্যাবধি খুঁজিলে মিলিতে পারে! ব্রাহ্মণ হরিপ্রকাশ, আর গোপালক গুলাব সিং, কিংবা ক্ষেতমজুর রাম ভরসা; সন্ত-মহাত্মা, আর শিক্ষা-দীক্ষা হীন পল্লীজন; —নামে-রূপে বর্ণে-আশ্রমে ইহাদের মাঝে যত বৈচিত্র্যই থাকুক, তাহাদের অন্তরাত্মা এক। ইহাদের প্রত্যেকেরই সাধন স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু সাধ্য ঈশ্বর এক বই দুই নহেন। সর্বভূতান্তরাত্মা সেই ঈশ্বরের সেবা কেবল মন্দিরেই করে না ইহারা,—ঈশ্বরের চলমান বিগ্রহ মানুষের পূজাও করিয়া থাকে তাহারা। ধর্ম ইহাদের প্রাণ—বাঁচিবার ও বাড়িয়া উঠিবার উপায়,—যাহা ক্রমে মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করিয়া দেয়—পূর্ণত্বে উন্নীত করে। 'যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম?' —স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তি স্মরণ করিতে করিতেই যুগপৎ গুলাব সিং-হরিপ্রকাশদের দেবমূর্তিগুলি মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠিতে থাকিল। ধর্ম, ধার্মিক ও ঈশ্বরের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা স্বামীজীর এক পত্রে পড়িয়াছিলাম, তাহাই এখন হৃদয়ে অনুরণন তুলিতেছিল:

'যিনি সনাতন, অসীম, সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ, তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নন—তত্ত্বমাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশি কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তত মহৎ; শেষে সকলকেই তার পূর্ণ প্রতিমূর্তি হতে হবে; এরূপে এখনও যদিও সকলেই স্বরূপতঃ এক, তথাপি তখনই প্রকৃতপক্ষে সব এক হয়ে যাবে। ধর্ম এ ছাড়া আর কিছুই নয়; এই একত্ব অনুভব বা প্রেমই এর সাধন।'

উল্লিখিত এই আদর্শের কথা এতকাল অবধি একটা ধারণামাত্র থাকিলেও, এই মাটির সংসারে যে এমনটি কোথাও প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে, তাহা কিন্তু ঐ গুলাব সিং-হরিপ্রকাশদের চোখে না দেখিলে অজানাই থাকিয়া যাইত। প্রথম যে গ্রামখানিতে উপস্থিত হইয়া তাজ্জব বনিয়াছিলাম, —স্থানীয় লোকদের ভাষায় উহার নাম 'আদরাশ'। জানি না 'আদর্শ'-ই দেহাতী উচ্চারণের পরিচ্ছদ অঙ্গে চাপাইয়া 'আদরাশ' সাজিয়াছে কিনা। সে যাহাই হউক, আমাদের নিকট উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর জেলার নিভৃত

পল্লী আদরাশের অভিজ্ঞতা নিছক একখণ্ড স্মৃতিই নহে,—একটি অতি উজ্জ্বল আদর্শ বা 'মডেল' (model), যাহা জীবনে কখনও ম্লান হইবার নহে। পওহারী বাবা ও স্বামী বিবেকানন্দের যুগ্ম স্মৃতি-তীর্থ ঐতিহাসিক গাজিপুর আমাদের নিকট চির আকর্ষণের তো বটেই,—কিন্তু জানিতাম না ঐ ক্ষুদ্র আদরাশ গ্রামখানির আকাশে-বাতাসে পথে-প্রান্তরে আজও পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার অণু-পরমাণু এইভাবে বিকীর্ণ রহিয়াছে।

*

মহানগরীর কর্মমুখর সুসভ্য জীবনধারায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই দৈনিক সংবাদপত্রে দেখিলাম,—কোন ধর্মনেতার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সমারোহে আয়োজিত এক ধর্মসভায় উপস্থিত ধর্মপ্রাণগণের গৃহীত কিছু পবিত্র সঙ্কল্প! প্রকাশিত ধর্মীয় সঙ্কল্পগুলির মধ্যে ইহাও চোখে পড়িল, রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়িবার প্রস্তাব। আবার উল্লেখ করা হইয়াছে, এই সকল আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদের পোষক নহে, জাতীয়তাবাদের বিরোধীও নহে। আরও কিছু অনুরূপ ওজস্বী প্রস্তাব! সর্বশেষে ঐ ধর্মনেতার নামে জয়ধ্বনি উচ্চারণ সহকারে বলা হইয়াছে, তিনি ছিলেন শান্তি, প্রেম ও ঐক্যের প্রতীক।

ইহাই বুঝি ধর্মের আধুনিকতম রূপ! যদি তাহাই হয়, তবে অবশ্যই চিন্তা করিতে হইবে এই 'ধর্মে'র নামে আমরা কোন্ দিকে চলিতেছি। আদর্শ হইতে কী বিপুল ব্যবধানে,—কত দূরে সরিয়া গিয়াছে এই 'ধর্মে'র লক্ষ্য-পথ?

মাঠের মাঝে দেখা হওয়া সেই গুলাব সিং, আর ভগ্ন দেউল-দ্বারে সাক্ষাৎ পাওয়া ঐ হরিপ্রকাশের স্মৃতি আমাদিগকে নূতন করিয়া এই ভাবনাতেই উদ্রিক্ত করিতেছে। হইতে পারে সমাজের চেহারা পরিবর্তনশীল,—কিন্তু যে মানুষগুলি লইয়া সমাজ, উহাদের আন্তররূপ চিরবর্তমান। মানুষের ধর্মও তাই দেশকালাতীত সত্য। উহাতে জোয়ার-ভাটা চলিতেছে,—তথাপি প্রবাহ ঠিকই আছে ও থাকিবে চিরকাল,—যেন গঙ্গার স্রোত। এই ভাবগঙ্গা নিত্য অবিনাশী।

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীঅমূল্য মুখোপাধ্যায়কে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণং

Sri Ramakrishna Ashram
Khar, Bombay
6.1.27

শ্রীমান অমূল্য,

তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে [।] প্রার্থনা করি প্রভু তোমায় বিশ্বাস, ভক্তি প্রীতিতে পূর্ণ করিয়া দিন। তোমার পূজনীয়া মা ৺কাশীতে ভাল আছেন ত? তুমি কেমন আছ? আমার শরীর মন্দ নাই তাঁর ইচ্ছায়। আমরা গত ২২ ডিসেম্বর এখানে আসিয়াছি মাদ্রাজ হইতে। এখানে নূতন আশ্রমে উপরতলায় নূতন ঠাকুরঘরে নূতন সিংহাসনে শ্রীশ্রীমার জন্মতিথির দিন ঠাকুর বসিলেন। এখানকার বহু লোকের খুব আনন্দ। ভক্ত সংখ্যা এখানে ধীরে ২ বেশ বাড়িতেছে তাঁর কৃপায়। আশ্রমের স্বামীরা খুব পরিশ্রম করেন। তাঁরা অনেকের প্রিয় হইয়াছেন ও হইতেছেন তাঁর কৃপায়। ইতি—

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

পুঃ ললিত ও যোগেশ বাবু কেমন আছে? আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তাদের দিও [।]

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ই. টি. স্টার্ডি

ব্রহ্মচারী অপূর্বচৈতন্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্টার্ডি স্বামীজীকে লিখেছিলেন তাঁর গুরুভাইদেরও বিলাসিতার কথা। অথচ ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৬ স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে স্টার্ডি কি লিখেছিলেন তা আর একবার স্মরণ করা যাক। স্টার্ডি লিখেছিলেন: 'তাঁর [স্বামীজীর] কাজ নিয়ে সরাসরি এগিয়ে চলেছি। তাঁর গুরুভাই [অর্থাৎ স্বামী অভেদানন্দ যিনি ইতিমধ্যে স্বামীজীর কাজের ভার নেবার জন্য স্বামীজীর আহ্বানে ইংলণ্ডে এসেছেন এবং স্টার্ডিরই বাড়িতে তাঁর অতিথি হয়ে রয়েছেন] অতি চমৎকার, আকর্ষক, এবং তপস্যাপ্রবণ বৈরাগ্যবান যুবক—তিনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন।' প্রত্যক্ষদর্শী মহেন্দ্রনাথ দত্তের 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থ থেকে জানতে পারি, স্বামীজীর আর এক গুরুভাই স্বামী সারদানন্দকে ইংলণ্ডে মিস মূলারের বাড়িতে কত কষ্টে থাকতে হয়েছে এবং কত সাধারণ খাবার তাঁর ভাগ্যে সেখানে জুটেছে। শুধু তাঁরই নয়, স্বামীজীরও। অথচ স্টার্ডি বেমালুম মিথ্যা অভিযোগ করে চলেছেন স্বামীজীদের বিলাসিতা নিয়ে। স্বামীজীকে তাই তুলে ধরতে হল প্রকৃত চিত্রটি। স্বামীজী লিখলেন (নভেম্বর, ১৮৯৯):

'প্রিয় স্টার্ডি,

আমার আচরণ সমর্থনের জন্য এই চিঠি নয়। যদি আমি অন্যায় কিছু করে থাকি, কথা দিয়ে তাকে মোছা যাবে না; আর যদি কোন সৎকাজ করে থাকি, কোন বিরূপ সমালোচনা বা নিন্দা করে আমাকে তা থেকে বিরত করাও যাবে না।

'বিলাসিতা! গত কয়েক মাস ধরে কথাটা বড় বেশি শুনতে পাচ্ছি—পাশ্চাত্যবাসীরা নাকি তার উপকরণ যুগিয়েছে! আর সর্বক্ষণ বৈরাগ্যের মহিমাকীর্তন করে ভণ্ড আমি নিজে নাকি সেই বিলাসিতা ভোগ করে আসছি।...আশা করি প্রয়োজন মনে করলে এই চিঠি [ইংলণ্ডে আমার সমালোচক এবং আমার প্রতি সহানুভূতিশীল সকল] বন্ধুদের কাছে একে একে পাঠিয়ে দিও এবং কোথাও যদি আমি ভুল লিখে থাকি সংশোধন করে দিও।

'রেডিং-এ তোমার বাড়ির কথা মনে পড়ে—যেখানে দিনে তিনবার আমাকে খেতে দেওয়া হত—বাঁধাকপি-সেদ্ধ, আলু-সেদ্ধ, ভাত আর মসুরডাল-সেদ্ধ—আর একটু আচার দেওয়ার জন্য তোমার স্ত্রীর অবিরাম অভিশাপ। বেশি কি কম দামের, কোন প্রকার সিগার ধূমপানের জন্য কখনও আমাকে [কিনে] দিয়েছ বলে মনে পড়ে না। এবং [ঐ ধরনের] খাবার এবং তোমার স্ত্রীর দিনরাত অভিশাপ সম্পর্কে আমি কখনও [তোমার বা অন্য কারো কাছে] অভিযোগ করেছি বলেও মনে পড়ে না—যদিও আমি বাস্তবিক চোরের মতো থাকতাম আর সব সময় ভয়ে কাঁপতাম [পাছে তোমার স্ত্রীর অথবা তোমার কোন বাড়তি অসুবিধার সৃষ্টি করে ফেলি]—কিন্তু খেটে যেতাম তোমাদের [কল্যাণের] জন্যেই।

'দ্বিতীয় স্মৃতি সেণ্ট জর্জেস রোডের বাড়ির—যেখানে ছিলাম তোমার এবং মিস মূলারের তত্ত্বাবধানে। আমার হতভাগ্য ভাই [মহেন্দ্রনাথ] অসুস্থ হয়ে পড়ল আর মিস মূলার তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। ওখানেও মনে করতে পারছি না কোন বিলাসের মধ্যে ছিলাম—

আহার, পানীয়, শয্যা কিংবা যে-ঘরে আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল—তার দিক দিয়েও।

'পরবর্তী স্মৃতি মিস মূলারের বাড়ির। তিনি অবশ্যই দয়াবতী, কিন্তু আমাকে বাদাম ও ফল খেয়ে জীবনধারণ করতে হয়েছিল। তার পরের স্মৃতি লণ্ডনের একটি অন্ধকূপের [১৪ গ্রে কোর্ট গার্ডেন্স] যেখানে দিনরাত আমাকে খাটতে হয়েছে, কাজের ফাঁকে পাঁচ-ছ'জনের জন্যে রান্না করতে হয়েছে এবং অধিকাংশ রাত কাটাতে হয়েছে দু-এক কামড় রুটি-মাখন খেয়ে।...

'ক্যাপটেন ও মিসেস সেভিয়ারকে বাদ দিলে ইংলণ্ডে রুমাল মাপের একটুকরো কাপড়ও কেউ আমাকে দিয়েছে বলে মনে পড়ে না। অথচ অপরপক্ষে ইংলণ্ডে আমার শরীর ও মনের উপর যে প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল, তাতে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তোমরা—ইংরেজরা আমাকে এই তো দিয়েছ—আর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছ খাটিয়ে খাটিয়ে—আর এখন আমাকে দিচ্ছ বিলাসিতার অপবাদ !!!!!! তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে একটা কোট দিয়েছ, বলতে পারো? কেউ একটা সিগার? এক-টুকরো মাছ বা মাংস? তোমাদের মধ্যে একথা কার বলবার সাহস আছে যে, তোমাদের কাছে আমি খাবার, পানীয়, সিগার, পোশাক অথবা টাকাকড়ি চেয়েছি? জিজ্ঞাসা করো, স্টার্ডি, ঈশ্বরের দোহাই, জিজ্ঞাসা করো সেকথা—জিজ্ঞাসা করো তোমার বন্ধুদের এবং সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করো তোমার "অন্তর্যামী ঈশ্বরকে যিনি কখনও ঘুমান না"।

'আমার কাজের জন্য তোমরা যে টাকা দিয়েছ তার প্রত্যেকটি পাই [শুধু কাজের জন্যই] রাখা [অথবা কাজের জন্যই খরচ করা] হয়েছে। তোমাদের চোখের সামনে আমি আমার [অসুস্থ] ভাইকে [অন্যত্র] সরিয়ে দিয়েছিলাম—মৃত্যুর দিকেই বোধ হয়; কিন্তু যা আমার ব্যক্তিগত টাকা নয়, তার থেকে একটা পয়সাও [তাকে] দিইনি। আর অন্যদিকে ক্যাপটেন ও মিসেস সেভিয়ারের কথা মনে পড়ে—শীতের সময়ে তাঁরা আমাকে পোশাক দিয়েছেন, অসুস্থ হলে নিজের মায়ের থেকেও স্নেহে-যত্নে আমার সেবা করেছেন, ক্লান্তি ও দুঃখের দিনে আমার সমব্যথী হয়েছেন; এবং তাঁদের কাছ থেকে কিন্তু আমি শুধু আশীর্বাদই পেয়েছি।...তাঁরা কখনও আমাকে বিলাসিতার জন্য নিন্দা করেননি, যদিও আমার ইচ্ছা ও প্রয়োজন হলে বিলাসিতার উপকরণ যোগাতেও তাঁরা সব সময় প্রস্তুত।

'মিসেস বুল, মিস ম্যাকলাউড, মিঃ ও মিসেস লেগেট সম্বন্ধে তোমাকে বলা নিষ্প্রয়োজন।... মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউড আমাদের দেশে গিয়েছেন এবং জীবনের সাধারণ সুখসুবিধাগুলি ত্যাগ করে আমাদের মধ্যে এমনভাবে বসবাস ও চলাফেরা করেছেন, যা কোনও বিদেশী কখনও করেনি এবং তাঁরা আমার বা আমার বিলাসিতা নিয়ে সমালোচনা করেননি। আমাকে ভাল খাওয়াতে পারলে অথবা আমি চাইলে দামী সিগার খাইয়ে তাঁদের আনন্দের সীমা থাকে না। আর আমি যখন তোমাদের দেশের মানুষদের জন্য প্রাণপাত করছিলাম, যখন তোমরা নোংরা গর্তে অনাহারের মধ্যে রেখে আমার গায়ের মাংস কেটে কেটে তুলে নিচ্ছিলে এবং সঞ্চয় করে রাখছিলে আমার জন্য বিলাসিতার এই অপবাদ—তখন ঐ লেগেট ও বুলদের দেওয়া রুটিই আমি খেয়েছি, তাঁদের দেওয়া পোশাকেই গা ঢেকেছি, তাঁদের টাকাতেই ধূমপান করেছি এবং কয়েকবার আমার বাড়িভাড়ার টাকা তাঁরাই মিটিয়েছেন।...

'দেখ স্টার্ডি, যাঁরা সত্যিই আমাকে সাহায্য করেছেন বা এখনও করে চলেছেন, তাঁদের কাছ থেকে কিন্তু কোন সমালোচনা বা নিন্দা আসেনি,

আজও আসছে না। যারা কিছুই করে না, বরং শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধির পথ খোঁজে, তারাই কেবল নিন্দা ও সমালোচনা বর্ষণ করে।...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আগেই হোক বা পরেই হোক, তাদের স্বরূপ বেরিয়ে পড়ছে। আর এইসব হৃদয়হীন, স্বার্থসর্বস্ব লোকের অভিপ্রায় অনুসারে তুমি আমার আচরণ, আমার কর্মধারা পরিবর্তন করতে উপদেশ দিচ্ছ, আর যেহেতু আমি তা করছি না, তাই তুমি রাগে উন্মাদ হয়ে গেছ!...

'আর একটা কথা [তুমি বলেছ, তগু আমি নাকি সর্বক্ষণ কঠোরতা ও বৈরাগ্যের মহিমা-কীর্তন করে নিজে বিলাসিতা ভোগ করেছি, তার উত্তরে বলি,] যদি তুমি দেখাতে পারো—কোথাও আমি দেহের উপর নির্যাতনের কথা প্রচার করেছি, তাহলে খুব খুশি হব। শাস্ত্রের কথা তুললে আমি বলি, সন্ন্যাসী এবং পরমহংসদের জীবন যাপনের যে নিয়মবিধি হিন্দুশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তা আমরা পালন করিনি, এই অভিযোগের সত্যতা যদি কোন শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত আমাদের দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে সত্যিই আমি খুব খুশি হব।

'হ্যাঁ স্টার্ডি—বেদনায় আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হচ্ছে। এর সবই আমি বুঝি। তুমি কোন্ পরিস্থিতিতে পড়েছ আমি বুঝতে পারছি—তুমি এমন কিছু লোকের কবলে পড়েছ যারা [তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য] তোমাকে ব্যবহার করতে চায়। তোমার স্ত্রীর কথা বলছি না; সে সরলপ্রাণ—ক্ষতিকর সে কিছু করতে পারে না। কিন্তু বৎস, তুমি মাংসের গন্ধ পেয়েছ—সামান্য কিছু অর্থ—আর শকুনিরা তাই তার চারপাশে। এই হল জীবন।

'প্রাচীন ভারত [এবং তার আদর্শ] সম্পর্কে তুমি অনেক কথা বলেছ। সেই ভারত আজও কারও কারও মধ্যে বেঁচে আছে—এখনও সে মরেনি। আজও সেই জীবন্ত ভারত ধনীর অনুগ্রহের তোয়াক্কা না রেখে নির্ভয়ে নিজ বাণী উচ্চারণ করার ক্ষমতা রাখে। কারও মতামতের পরোয়া সে করে না, না এদেশে—যেখানে তার চরণ শৃঙ্খলাবদ্ধ, কিংবা ওদেশে—যেখানে ঐ শৃঙ্খলের প্রান্তভাগ ধরে রয়েছে তার শাসকবর্গ, তাদের মুখের সামনেও না। সেই ভারত এখনও বেঁচে আছে স্টার্ডি—অমর প্রেমের ভারতবর্ষ, চিরন্তন বিশ্বস্ততার ভারতবর্ষ—যে ভারতবর্ষ অপরিবর্তনীয়, কেবল রীতিনীতিতে নয়, প্রেমে, বিশ্বাসে, বন্ধুত্বে। সেই ভারতের অতি নগণ্য এক সন্তান আমি—তোমাকে ভালবাসি স্টার্ডি, ভারতীয় প্রেমের ধর্মে—এবং তোমাকে তোমার ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবার জন্য সাহায্য করতে আমি সহস্রবার দেহপাত করতে প্রস্তুত।'[৪২]

স্টার্ডির ভিত্তিহীন নির্মম সমালোচনা এবং নিন্দাবর্ষণের পরও এই আশীর্বাদ ও ক্ষমার মন্ত্র উচ্চারণ শুধু বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্ভব। তাই তিনি অনন্য। এটা ঠিক যে, প্রিয়তম এক শিষ্যের চূড়ান্ত বিশ্বাসহীনতায় গভীর ব্যথায় ভরে গিয়েছিল তাঁর অন্তর। আর সেখান থেকে 'ঝলসে উঠল উন্মুক্ত তরবারি-ফলার মতো কতকগুলি কথা। তাতে শোণিতের চিহ্ন ছিল—হায়, সে তাঁরই হৃদয়শোণিত!'[৪৩]

বিবেকানন্দের মহিমা শুধু তাঁর বাণীতে নয়, তাঁর চরিত্রে, তাঁর প্রত্যেক সাধারণ আচরণেও। কিন্তু বিবেকানন্দও মানুষ ছিলেন—বিশ্বাসঘাতকতা তাঁরও হৃদয়ে আঘাত করত। তবুও তিনি ছিলেন বিবেকানন্দ। তাই দেখি স্টার্ডি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেও তিনি স্টার্ডিকে কোনদিনও মন থেকে সরিয়ে দিতে পারেননি। পারেননি মিস

৪২ Second Visit pp. 87-91

৪৩ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ,—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮

মুলারকেও। ৬ জানুআরি ১৯০১ তারিখে মিসেস ওলি বুলকে স্বামীজী লিখছেন: 'মিস মুলার এবং স্টার্ডির সঙ্গে যখন আপনার দেখা হবে তখন অনুগ্রহ করে তাঁদের আমার অফুরন্ত ভালবাসা জানিয়ে দেবেন।'

স্বামীজী স্থূলদেহে থাকতে স্টার্ডির সঙ্গে আরও দু-একবার চিঠিপত্রে যোগাযোগ হয়েছিল। একবার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে, স্বামীজী তখন প্যারিসে। মিসেস স্টার্ডির মৃত্যুসংবাদ স্বামীজীর কাছে কোনভাবে এসে পৌছলে স্বামীজী স্টার্ডিকে সান্ত্বনা দিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিটি হয়তো স্টার্ডি পাননি। আর একটি চিঠি স্বামীজী স্টার্ডিকে লিখেছিলেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জানুআরি। এই চিঠি থেকে অনুমান করা যায় যে, স্বামীজীর ঐ শেষ দীর্ঘ চিঠিটি (নভেম্বর, ১৮৯৯) পেয়ে স্টার্ডি স্বামীজীকে আরও একটি পত্রাঘাত করেছিলেন হয়তো অধিকতর কঠোর ভাষায়। স্বামীজী অবশ্য আর উত্তর দেননি। কেন দেননি সে-সম্পর্কে তিনি স্টার্ডিকে ১৫ জানুআরি, ১৯০১ তারিখের চিঠিতে লিখেছিলেন: 'আগের চিঠিতে খোলাখুলিভাবে তোমার মনোভাব প্রকাশ করেছ বলে যে আমি চিঠি লেখা বন্ধ করেছি—তা নয়। আমি শুধু ঢেউটা চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলাম, এই হচ্ছে আমার রীতি। [তখন] চিঠি লিখলে তিলকে তাল করে তোলা হত।' এই চিঠির শেষে দেখি, স্বামীজী মিসেস জনসনকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়েছেন -সেই মিসেস জনসন যিনি স্টার্ডির সঙ্গে যোগ দিয়ে স্বামীজীর উপর নিন্দাবর্ষণ করেছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল তারিখে নিবেদিতাকে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, তিনি স্টার্ডির আর একটি চিঠি সবেমাত্র পেয়েছেন যাতে সংখ্যানুস থেকে স্বামীজীর রাজযোগের পরবর্তী প্রকাশ সম্পর্কে স্টার্ডি স্বামীজীর মতামত জানতে চেয়েছেন। স্বামীজী স্টার্ডিকে সে-বিষয়ে মিসেস বুলের সঙ্গে পরামর্শ করতে বলেছিলেন।[৪৪] সম্ভবত স্টার্ডিকে স্বামীজীর এবং স্বামীজীকে স্টার্ডির সেই শেষ চিঠি।

কিন্তু এখানেই সব শেষ হয়নি। এর পর অপেক্ষা করে ছিল আরও একটি অধ্যায়। সে-অধ্যায় স্টার্ডির পরিবর্তনের। স্বামীজীর দেহান্তের (৪ জুলাই, ১৯০২) পরেও স্টার্ডি বহু বছর বেঁচে ছিলেন। সুদীর্ঘকাল পরে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের 'বেদান্তকেশরী'তে ফেব্রুআরি-মার্চ সংখ্যায় 'তখন আর এখন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন স্টার্ডি—বোধ হয় 'তখন' যে অপরাধ করেছিলেন 'এখন' তার প্রায়শ্চিত্ত করার বাসনাতেই। লক্ষ্য করার বিষয় যে, স্টার্ডি তাঁর তখনকার 'আমি'কে দিব্বি 'অপরদের' মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। স্টার্ডি সেখানে লিখেছেন: 'সাধারণ অর্থে যোগী বলতে যা আমরা বুঝি স্বামীজী তা ছিলেন না। কারণ, সাধারণ যোগীরা যার স্পর্শ বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন, সেই পাশ্চাত্য-জীবনের [বিলাসময়] যে স্বাভাবিক ধারা তাঁর চারিদিকে বয়ে যেত তা তাঁর উপরে কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারত না। তিনি তাঁর সহজাত স্বভাবেই অবিচল থাকতেন। যারা তাঁর হৃদয় ও মনের বিশালতা বুঝতে অসমর্থ ছিল, তারা তাঁকে বিলাসী বলে সমালোচনা করত; কিন্তু তিনি কখনই তা ছিলেন না। দেহ ও মনের উপর ছিল তাঁর চূড়ান্ত প্রশ্নাতীত সংযম।'[৪৫] ঠিক একবছর পরে স্টার্ডি আবার 'বেদান্ত-কেশরী'তে লিখলেন: 'স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে ছিল চৌম্বকীয় আকর্ষণী-শক্তি—সেইসঙ্গে ছিল সুগভীর ধ্যান-প্রশান্তি। তিনি পথেই হাঁটুন বা ঘরেই

৪৪ Prabuddha Bharata, 1977, p. 357

৪৫ Vedanta Kesari, 1936, p. 417

দাঁড়িয়ে থাকুন—সর্বত্রই ছিল তাঁর সেই একই মহিমা।' আরও অনেক প্রশস্তি স্টার্ডি সেখানে করেছেন। তার মধ্যে দু-একটি: 'সর্বশ্রেণীর মানুষ—শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত, যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, সকলেই এই পুরুষপ্রবরের সহজাত মহত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছে। সকল সময়ে অনুভব করা যেত, আধুনিক পরিভাষায় বলতে গেলে, "তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পরম সান্নিধ্যের বিষয়ে সদাসচেতন।" পথে হাঁটছেন, ভ্রমণ করছেন, অবসর যাপন করছেন—অবিরাম তাঁর ভিতর থেকে আসত পরমের আহ্বান, ভক্তির নিবেদন।' আবার বলছেন: 'যথার্থ জ্ঞানলাভ করলে আমরা সর্বত্র ঈশ্বরদর্শন করব নিশ্চয়ই। কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য ঘটে যখন আমরা সেই দিব্য পরমকে মূর্ত দেখতে পাই মহান ও পুণ্য পুরুষদের মধ্যে। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তেমনি একজন পুরুষ।'[৪৬]

স্বামীজী স্টার্ডির বিরূপতার 'ঢেউটা' চলে যাবার 'অপেক্ষায়' ছিলেন বলেছিলেন: স্থূল-শরীরে না হলেও সূক্ষ্মশরীরে স্বামীজী নিশ্চয় দেখেছিলেন প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর পরে কীর্তিনাশা স্টার্ডির আত্মসমর্পণের তরঙ্গ আবার ফিরে এসে প্রণাম হয়ে আছড়ে পড়েছিল তাঁর পায়ের তলায়।

৪৬ Ibid., 1937, 376-77

অদৃশ্য রশ্মিলোক

ডক্টর ধ্রুব মার্জিত

আমাদের সামনের যে দৃশ্যময় বর্ণময় জগৎ রয়েছে তাকে আমরা দেখতে পাই দৃশ্যমান আলোকরশ্মির (Visible ray) সাহায্যে। জগৎ জুড়ে যে সুবিশাল আলোকরশ্মি পর্যায়ক্রমে ছড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে এক অতি ক্ষুদ্র অংশ হল এই দৃশ্যমান আলোক। যাবতীয় ধরনের আলোকের রশ্মিগুলি হল এক বিশেষ ধরনের তরঙ্গ যাকে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ (Electro-magnetic wave) বলে। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ সদাসর্বদা সরল রেখা বরাবর চলাচল করে এবং একটি নির্দিষ্ট গতিতে (গতির মান হল প্রতি সেকেণ্ডে 3×10^{10} সেন্টিমিটার)। এই তরঙ্গের চলাচলের জন্য কোন-প্রকার মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। এই শ্রেণীর তরঙ্গে একটি অতি বিশিষ্ট ধর্ম হল, এর চলার পথে যদি একটি তড়িৎক্ষেত্র এবং চৌম্বকক্ষেত্রকে রাখা হয় তবে তরঙ্গটি ঐ ক্ষেত্র দুটির প্রভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তরঙ্গের এইভাবে দুটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়াতেই এটা স্বভাবতই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এই শ্রেণীর তরঙ্গের মধ্যে দুটি বিভাগ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে যার একটি তড়িৎ অপরটি চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বিশ্লেষিত হতে পারে এবং এজন্যই এই ধরনের তরঙ্গকে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বলা হয়ে থাকে।

তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ—এই নামটি আমাদের কাছে কিছুটা অপরিচিত মনে হলেও ব্যবহারিক জীবনে আমরা সবাই এর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-ভাবেই পরিচিত। আর দৈনন্দিন জীবনে আমরা এর সঙ্গে পরিচিত বলেই তার সম্পর্কে কিছুটা

বৈজ্ঞানিক তথ্য জেনে রাখা আমাদের দরকার। এই শ্রেণীর তরঙ্গকে একটি বিশাল পরিবার রূপে আমরা কল্পনা করতে পারি—যার সভ্যগণ হল: ১। বেতারতরঙ্গ (Radio wave), ২। মাইক্রোতরঙ্গ (Micro wave), ৩। অবলোহিত-তরঙ্গ (Infra red rays), ৪। দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ (Visible rays), ৫। অতিবেগুনী রশ্মি (Ultraviolet rays), ৬। রঞ্জনরশ্মি (X-rays), ৭। গামারশ্মি (γ-rays) এবং ৮। মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays)। এগুলি সবাই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ, তবে তার এক একটি অংশের ধর্ম এক এক রকম বলে স্বভাবতই তাদের নামগুলিও আলাদা আলাদা। ধরা যাক্ আমরা চিৎপুর হতে রাস্তা বরাবর উত্তর হতে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চলেছি, তাহলে প্রথমে আমরা পাবো রবীন্দ্র সরণী, তারপর বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, ধর্মতলা, জওহরলাল নেহেরু রোড, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড, দেশপ্রিয় শাসমল রোড, তারপর কুঁদঘাট যাবার রাস্তা। চিৎপুর রোডের শুরু হতে দেশ-প্রিয় শাসমল রোডের শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ এই রাস্তাটি প্রকৃত পক্ষে একটি টানা রাস্তা যা উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বালম্বি ভাবে প্রসারিত। এই রাস্তাটির এক একটি অংশের নামকরণ করা হয়েছে আলাদা আলাদা এই যা—রাস্তাটিকে কেটে কেটে টুকরো টুকরো কিন্তু করা হয়নি। সেটা নিরবচ্ছিন্ন-ভাবেই রয়েছে। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গও তেমনি নিরবচ্ছিন্নভাবে বেতারতরঙ্গ হতে শুরু হয়ে গামারশ্মি পর্যন্ত ব্যাপ্ত—তবে তার এক একটি অংশের নাম আলাদা আলাদা এই যা। এই সুবিশাল আলোকমালার ব্যাপ্তির মধ্যে আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তরঙ্গ হল কেবলমাত্র দৃশ্যমান আলোকতরঙ্গ। দৃশ্যমান আলোক ভাগটি আলোকতরঙ্গের অন্যান্য বিভাগগুলির তুলনায় ব্যাপ্তিতে ছোট। যেমন "বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট"—এই অংশটি ঐ রাস্তার "রবীন্দ্র সরণী" সহ অন্যান্য অংশগুলির তুলনায় লম্বায় ছোট। আর দৃশ্যমান আলোকের এধারে এবং ওধারে যে সকল বিচিত্র ও বিস্ময়কর আলোকতরঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে তাদের সম্পর্কে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণা করার সুযোগ নেই বললেই চলে। সেই সকল অদৃশ্য রশ্মিকুল নিয়েই আমাদের এখনকার আলোচনা।

১। বেতারতরঙ্গ: বেতারতরঙ্গ হল তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গকুলের সবচেয়ে দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Wave-length)-সম্পন্ন। এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক মিলিমিটার হতে কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। একে আবার কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়, যেমন—(ক) লম্বা তরঙ্গ (Long wave), (খ) মাঝারি তরঙ্গ (Medium wave) এবং (গ) ক্ষুদ্র তরঙ্গ (Short wave)। মিডিয়াম ওয়েভ, শর্ট ওয়েভ কথাগুলি আমরা বেতারযন্ত্র খুললেই শুনতে পাই। বেতার যোগাযোগের জন্য এই তরঙ্গের ব্যবহার হয়ে থাকে। আবহমণ্ডলের উচ্চতম স্তর দিয়ে সাধারণত এই তরঙ্গ চলাচল করে। সেই সকল আবহমণ্ডলস্তরে এর প্রতিফলন (Reflection) এবং প্রতিসরণ (Refraction) হয় যার ফলে তরঙ্গের গতিমুখ পরিবর্তন হয়।

২। মাইক্রোতরঙ্গ: এই তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক মিলিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। মাইক্রো (Micro) কথাটির অর্থ হল অতি ক্ষুদ্র এবং এর গাণিতিক পরিমাপ 10^{-6}। এই শ্রেণীর তরঙ্গের ব্যাপক প্রয়োগ দূর দূরান্তে সংকেত বহনের জন্য করা হচ্ছে। রেল লাইন কিংবা বড় বড় রাস্তা ধরে চলাচল করার সময় ইদানীং গ্রামে-গঞ্জে অনেক সময় উচু উচু লোহার টাওয়ার যা আমাদের চোখে মাঝে মাঝেই আজকাল পড়ে সেগুলিই হল মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার।

প্রশাসনিক সহ নানান ধরনের কাজের সুবিধার জন্য এগুলিকে বসানো হয়েছে। দূর দূরান্ত হতে রাজধানীর সদরদপ্তরে সেখানকার খবরাখবর (বন্যা, খরা ইত্যাদির পূর্বাভাষ, জনস্বার্থ সম্পর্কীয় তথ্য সহ প্রশাসনিক সমস্যাবলী) দেওয়া-নেওয়া করার ক্ষেত্রে এই সংকেতবাহী তরঙ্গের প্রয়োগ বিশ্ব জুড়ে আজ জনপ্রিয়। মাইক্রোতরঙ্গ-বিষয়ক গবেষণাও দেশ-বিদেশে অনেক দিন ধরেই চলছে, আমাদের দেশে ৺ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত যাদবপুরের 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সে'র 'অপটিক্স' বিভাগে মাইক্রোতরঙ্গ নিয়ে ঐতিহ্যময় গবেষণা হয়েছে, এখনও কিছু কিছু হচ্ছে

। অবলোহিত আলোক : মাইক্রোতরঙ্গের ঠিক পরেই অবলোহিত আলোক। এই তরঙ্গকে তাপতরঙ্গও বলা যেতে পারে। কারণ অবলোহিত চক্ষুতে কোনপ্রকার অনুভূতির সৃষ্টি না করতে পারলেও আমাদের ত্বকে তা উষ্ণতার অনুভূতি এনে দেয়। দেহের ব্যথা-বেদনা এবং দেহে অস্ত্রোপচারের পর নিরাময়ের দ্রুততার জন্য হাসপাতালে অবলোহিত আলোক-উৎস ব্যবহার করা হয়। অবলোহিত আলোক যেখানে শেষ হচ্ছে ঠিক সেখানেই শুরু হচ্ছে দৃশ্যমান আলোকের লাল বর্ণটি।

৪। দৃশ্যমান আলোক : চক্ষু-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই আলোকতরঙ্গ সম্পর্কে কিছু কিছু কথা আমরা স্কুলের পাঠ্যে ইতিমধ্যেই জেনে এসেছি। এই আলোকতরঙ্গের মধ্যে সাতটি পৃথক পৃথক শুদ্ধ বর্ণ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে এবং ঐ মিশ্র বর্ণগুলির সম্মিলিত রঙ সাদা। সাতটি বর্ণের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যসম্পন্ন আলোটি হল লাল; আর সবচেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হল বেগুনীর, এরই মধ্যে অপর পাঁচটি বর্ণ অবস্থিত। বর্ণগুলির পর্যায়ক্রম হল লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, আসমানী, নীল ও বেগুনী।

৫। অতিবেগুনী রশ্মি : দৃশ্যমান আলোকের বেগুনী বর্ণের যেখানে শেষ ঠিক সেখান হতেই শুরু অতিবেগুনী রশ্মির। অতিবেগুনী রশ্মিকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা হয় : (ক) নিকট অতিবেগুনী (Near ultraviolet), (খ) দূরবর্তী অতিবেগুনী (Far ultraviolet) এবং (গ) ভ্যাকুয়াম অতিবেগুনী (Vacuum ultraviolet)। অতিবেগুনী রশ্মি খুব তীক্ষ্ণ এবং চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই রশ্মির কাছে কাচ অস্বচ্ছ—অর্থাৎ কাচ ভেদ করে এ আলো চলাচল করতে পারে না। লোহার সঙ্গে লোহা জুড়বার জন্য ঝালাই (welding) করবার সময় যে তীব্র আলোক নির্গত হয় তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অতিবেগুনী রশ্মি মিশে থাকে। এই আলো চোখে লেগে যাতে চোখের ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য যারা এ ধরনের কাজ করেন তাঁরা চোখের সামনে একটি কালো কাচের আড়াল রাখেন, আমরা তা দেখেছি। যেহেতু এই আলো কাচ ভেদ করতে পারে না—তার ফলে চোখেও অতিবেগুনী আলো লাগবার ভয় থাকে না। বিভিন্ন প্রকার বর্ণালী হতে বিভিন্ন প্রকার মৌলিক পদার্থের ধর্ম, পরিমাণ এবং অন্যান্য গুণাবলী সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব—সেজন্য অতিবেগুনী রশ্মির ব্যবহার গবেষণাগারে ব্যাপক।

৬। রঞ্জনরশ্মি : অতিবেগুনীর ঠিক পরে পরেই রঞ্জনরশ্মির (X-ray) শুরু। কোন কোন কঠিন ধাতুর পাতের উপর তড়িৎপ্রবাহের ঋণাত্মকস্রোতকে আড়াআড়িভাবে ফেলা হলে ঐ ধাতব পাত হতে এক ধরনের অদৃশ্য আলোকরশ্মি; নির্গত হয়। প্রখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী রঞ্জন (রন্‌ৎগেন—উচ্চারণটিই তাঁর নামের সঠিক উচ্চারণ কিন্তু প্রচলিত হল—রঞ্জন) এই রশ্মির ধর্মাবলী এবং মানবকল্যাণে এর বিস্ময়কর প্রয়োগ করে

দেখান। কিন্তু যেহেতু দীর্ঘদিন এই বিচিত্র রশ্মি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অন্ধকারে ছিলেন—তাই এই অপরিচিত রশ্মিকে তাঁরা ইংরেজীর 'X' অক্ষরের নামে, নামকরণ করেছিলেন। কারণ বীজগণিতের নিয়ম অনুযায়ী যে কোন অজানা রাশির নামকরণ করা হয় ঐ 'X' অক্ষর দিয়েই। যাহোক রঞ্জন-রশ্মির আবার দুটি ভাগ আছে: (ক) নরম রশ্মি (Soft X-ray) এবং (খ) কঠিন রশ্মি (Hard X-ray)। এর মধ্যে নরম রশ্মির সাহায্যে জৈব (Organic) পদার্থের এবং কঠিন রশ্মির সাহায্যে বিভিন্ন ধাতু সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। দেহের হাড় এবং অন্যান্য যন্ত্রের ফটো যা চিকিৎসকগণ তুলে থাকেন স্বভাবতই তা নরম শ্রেণীর। এই রশ্মি অনেক কিছুকেই অবলীলাক্রমে ভেদ করে চলতে পারে—তাই তার এই অতি বিশিষ্ট ধর্মকে মানুষ কাজে লাগিয়ে দেহের অভ্যন্তরের ফটো অতি সহজেই তুলে—সুচিকিৎসার সহায়তা লাভ করে।

৭। গামারশ্মি: আগে আগে আলোচিত সকল রশ্মিই ছিল পরমাণুর কেন্দ্রকের (Nucleus) বাইরে ঘূর্ণায়মান ঋণাত্মক কণিকা ইলেকট্রনগুলির উত্তেজিত অবস্থা হতে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের ফলে সৃষ্ট। কিন্তু গামারশ্মি চারিত্রিক দিক হতে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ হলেও এর সৃষ্টি কিন্তু ইলেকট্রনের কোন কার্যকারণে নয়—এর উৎপত্তিস্থল হল পরমাণুর কেন্দ্রক। কেন্দ্রক হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শ্রেণীর রশ্মি নিরবচ্ছিন্নভাবে বের হচ্ছে এবং অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সেই সঙ্গে অতি শক্তিশালী এই রশ্মিলোক ছড়িয়ে পড়ছে। তবে প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রক হতে এই শ্রেণীর রশ্মি নির্গত হয় না এইটা রক্ষা। কেবলমাত্র কয়েকটি বিশেষ বিশেষ মৌল পদার্থের কেন্দ্রক হতে এই রশ্মি নির্গত হয়—সেই সকল মৌল পদার্থকে তেজস্ক্রিয় মৌল (Radioactive element) বলা হয়। গামারশ্মি ক্যানসার সহ অন্যান্য কতকগুলি অসুখের নিরাময়ের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। কৃষিকার্যেও গামারশ্মির প্রয়োগ নিয়ে 'ভাবা পরমাণু কেন্দ্রে' গবেষণা চলছে।

৮। মহাজাগতিক রশ্মি: একে রশ্মি বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে মহাজাগতিক রশ্মি কোন রশ্মি নয়—মহাকাশ হতে আসা নানান ধরনের কণিকার সমষ্টি বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে। এরা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ যদিও নয় তবু যেহেতু এদের গতি এবং এদের উপর তড়িৎ ও চুম্বকের প্রভাব ঐ তরঙ্গের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই প্রবন্ধে এদের কথা উল্লেখ করা হল। আমাদের মাথার উপরে যে বিশাল আবহমণ্ডল বিস্তৃত রয়েছে বস্তুতঃ সেটাই এই বিচিত্র মহাকাশ আগন্তুকদের কাছ হতে আমাদের রক্ষা করে। চন্দ্রে আবহমণ্ডল নেই, তাই সেখানে নভশ্চরদের মহাজাগতিক রশ্মির হাত হতে রক্ষা পাবার জন্য বিশেষ ধরনের পোশাকের প্রয়োজন হয়।

তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের বিশাল ব্যাপ্তি এবং তাদের গুণাগুণ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আমাদের সকলের প্রয়োজন। কারণ বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের বিশাল প্রয়োগক্ষেত্রের একটা বড় অংশ অধিকার করে রয়েছে এই অদৃশ্য রশ্মিলোক।

ভারতীয় চিত্র-শিল্পকলায় যামিনী রায়

শ্রীকৃষ্ণেন্দু চৌধুরী

ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে একটা নূতন দিগন্তকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে আমাদের সাংস্কৃতিক গৌরবকে যিনি উজ্জ্বলতর করতে সাহায্য করলেন, সেই স্মরণীয় শিল্পী হলেন বাঁকুড়ার যামিনী রায়।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'বাঁকুড়া জেলা' ঘোষিত হওয়ার সাত বছর পরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল, বাঁকুড়া শহরের অন্তর্গত বেলিয়াতোড় গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। যামিনী রায় প্রধানতঃ তাঁর সমগ্র প্রতিভা ও কর্মশক্তিকে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেই নিয়োজিত করেছিলেন। তেল ও জলরঙের দ্বারা তিনি বহু সুন্দর ছবি তৎকালে তৈরি করেছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে একাডেমি অব্ ফাইন আর্টস্-এর গ্যালারীতে সর্বভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর পৌরাণিক 'উত্তরা-অভিমন্যু' চিত্রমালা 'ভাইসরয়' স্বর্ণপদকে সম্মানিত হয়েছিল। আর তখন থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর জয়যাত্রা।

অসাধারণ প্রতিভাধর চিত্রশিল্পী যামিনী রায় সারা জীবনে 'প্রায় দশ হাজারের মতন ছবি অঙ্কন করেছেন'। একথা শিল্পী-পুত্র অমিয় রায়ই বলেছেন। তাঁর আঁকা ছবিগুলির মধ্যে যেগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, সেগুলির মধ্যে আছে 'যশোদা', 'কৃষ্ণ গোয়িং টু দ্বারকা', ('Krishna going to Dwaraka') 'কৃষ্ণ উইথ গোপিনীজ' ('Krishna with Gopinis'), 'কৃষ্ণ-বলরাম', 'রামায়ণ-মহাভারতের চিত্র-কাহিনী', 'চাষীর দল', 'ঘোমটা মাথায় গ্রাম্য-বধূ', 'একতারা হাতে বাউল', 'মা ও শিশু' প্রভৃতি। নৃত্যরত সাঁওতালী মেয়ের দল, ভিখারি-ভিখারিনী, বৈষ্ণব ভক্ত ছাড়াও বুদ্ধ ও যিশুর অজস্র ছবিও তিনি এঁকেছেন—শুধু এঁকেই তিনি ক্ষান্ত হননি, সেগুলিতে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করে দিয়েছেন। বিভূতিভূষণ যেমন করে সরল ও নিরীহ গ্রাম্য জীবনকথাকে তাঁর ইছামতী উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন, অনুরূপ যামিনী রায়েরও শিল্পজীবনের একটা বৃহত্তম অংশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গ্রাম্য প্রকৃতি পরিবেশ, গ্রাম্য লোককথা-উপকথা এবং গ্রাম্য দেবতারা। তাঁকে ভারতীয় শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ ও পুরোধা বললে একটুও অতিরঞ্জিত করা হবে না।

কীর্তিমান শিল্পী যামিনী রায়ের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আঁকা প্রচ্ছদের দিকে তাকিয়ে যেন চোখ ফেরানো যায় না, যতই দেখি ততই মনে হয় বৈষ্ণব কবির ভাষায় 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।' ১৬ বৎসর বয়সে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ছাত্র হওয়ার পর থেকে মৃত্যুর আগে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অজস্র ছবি তিনি এঁকেছেন। তৎকালীন অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথিতযশা প্রায় সমস্ত কবি ও লেখক তাঁদের বইয়ে যামিনী রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ ব্যবহার করেছেন। শুধু কাগজের উপরেই যে ছবি এঁকেছেন তা নয়, পট, কাপড়, তালপাতা, চাটাই, পেপার বোর্ড, এমন কি মাটির হাঁড়ির উপরেও তিনি অসাধারণ সুন্দর সুন্দর ছবি অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে; সেখানে একটি কবিতায় তিনি প্রশ্ন করেছেন—'তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা ?' কবিতার একেবারে শেষের দিকে তিনি নিজেই আবার তার উত্তর দিচ্ছেন—

"নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।

তার পরে অন্ধকারে অগোচরে
তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।"

প্লেন অর্থাৎ সাদা কাগজের উপর কালো কালো রেখা টেনেও তিনি অনেক চিত্র এঁকেছেন। চিত্র নির্মাণকল্পে যামিনী রায় সাধারণতঃ বাঁকুড়ার গেরি মাটি (এই মাটিকে অনেকে গিরিমাটিও বলে থাকেন), হরিতাল, ভুসো কালি, নীলবড়ি, সিঁদুর প্রভৃতি বেশি ব্যবহার করতেন।

এবার যামিনী রায়ের দেশ বাঁকুড়া জেলার শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিকে একটু আলোকপাত করা যাক্; তাহলেই বুঝতে পারা যাবে যামিনী রায়ের ন্যায় মহৎ শিল্পীর আবির্ভাব হল কিভাবে? শুশুনিয়া পাহাড়ে আবিষ্কৃত রাজা চন্দ্রবর্মার শিলালিপি থেকে জানতে পারা যায় যে, মধ্য রাঢ়ের সভ্যতা অর্থাৎ শিল্প ও সংস্কৃতি ১৫০০ বছরেরও অধিক পুরাতন। কাজেই এথেকে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় যে, মধ্য রাঢ়ের আর্য ও অনার্য সভ্যতা এবং শিল্প-সংস্কৃতি কত প্রাচীন কাল থেকেই এ অঞ্চলকে উন্নত করে তুলেছে! আর যেহেতু যামিনী রায়ের জন্ম বাঁকুড়া জেলায়, সেহেতু তাঁর শিল্পের মধ্যেও যে এ অঞ্চলের মানুষের আচার-আচরণ, করণ-কারণ এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ছাপ ফুটে উঠবে তা তো স্বাভাবিক প্রত্যাশা। বাস্তবে ঘটেছেও তাই। যামিনী রায়ের শিল্পচর্চার বেশির ভাগ অংশ জুড়েই আছে বাঁকুড়ার জনমানস তথা জনজীবনের প্রভাব। তাছাড়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যাহীন ভ্যান্‌গগের 'পট্যাটো ইটার্স' নামক দুঃখের ছবির কথা যাঁরা জানেন, রুমানীয় ভাস্কর ক্যাজনোভস্কি সৃষ্ট 'শ্রমবীর' ('Heroes of labour') ছবির কথা যাঁরা জানেন, যাঁরা বুলগেরীয় ভাস্কর ড্যাসকালোতের দ্বারা অঙ্কিত সেই ঐতিহাসিক অতি পরিচিত ভয়ার্ত বালিকা এবং যুদ্ধে আহত বালকের ছবি 'কোরিয়ান ছেলেমেয়ে' দেখেছেন, সেই তাঁরাই যামিনী রায়কে তাঁদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, তাঁদের কেউই বাঁকুড়ার শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যামিনী রায়ের অন্তরের যোগের কথাটি উল্লেখ করেননি। তাঁরা প্রতীচ্যকে টেনে এনেছেন, কিন্তু প্রাচ্যের কথা স্মরণ করেননি! অথচ শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"লতার সহিত ফুলের যেরূপ সম্বন্ধ, তপোবনের সহিত শকুন্তলার সেইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ।" আমাদের দেশের অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু এদেরও চিত্রকলার মধ্যে দেশীয় প্রভাবই বেশি পরিমাণে বর্তমান। দেশের শিল্পের প্রতি তাঁদের গভীর ভালবাসা ও অকৃত্রিম দরদের কথা ভুলে গেলে চলবে না।

এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত তাঁর 'যামিনী রায়ের বাঁকুড়া' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন —"শুধু বাংলা নয়, শুধু বাঁকুড়া নয়, বেলেতোড়ের রায় পরিবারের ঐতিহ্য ইতিহাস অনুধাবন করারও একান্ত প্রয়োজন আছে। সাহিত্যে ও শিল্পে যেমন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি পরিবার, শিল্পে মনীষায় রাজকার্যে তেমনি বেলেতোড়ের রায় পরিবার বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় স্থান অধিকার করে আছে। এই রায় বংশেরই বিখ্যাত পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ আবিষ্কার ও সম্পাদনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অটুট গ্রামীণ জীবনচিত্র, ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর অধিকৃত মৌখিক ভাষাবিন্যাস, রাধাকৃষ্ণ চরিত্র গঠনের অদ্বিতীয় বাস্তব বৈশিষ্ট্য—এই সব কি যামিনী রায়ের চোখে পড়েনি এবং তাঁকে আপন শিল্পভাষা ও শিল্পাঙ্গিককে অটুট অনবদ্য রাখার সাহস দেয়নি? দিয়েছিল, নিশ্চয় দিয়েছিল। বসন্তরঞ্জন ছিলেন যামিনী রায়ের

আপন জ্যেঠতুতো দাদা—।"

সে যাই হোক্, রঙ, রেখা ও তুলির দ্বারাই প্রধানতঃ বাংলার একান্ত ঘরের শিল্পী যামিনী রায় তাঁর শিল্পকর্মকে ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা। কখনও পাশ্চাত্য রীতি, আবার কখনও বা জল ও তেল রঙের দ্বারা দেশীয় রীতিতে নিজের স্বকীয়তাটুকুকে তুলে ধরেছেন সকলের সামনে। পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী এবং পূর্ণেন্দু পত্রী এঁরা দুজনেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, চৌত্রিশ বছর বয়স থেকে যামিনী রায় পাশ্চাত্য অঙ্কন পদ্ধতি পরিত্যাগ করে বাংলার সুপ্রাচীন লোকশিল্পকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে—তার সাথে নিজ ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এক অভিনব শিল্পৈষণার পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নির্লোভ এই মানুষটি যশ ও অর্থের পিছনে ছোটাছুটি না করে, জীবনের বাকী দিনগুলি কাটাতে চলে এসেছিলেন পল্লীবাংলার নিভৃত কুটির-কাননে। শাল, মহুয়া, পলাশ, শিমুল, বাবলা, বট, আম, জাম আর কাঁঠাল গাছের সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরের যোগ। একমাত্র সেই কারণেই নৈসর্গিক দৃশ্য আঁকতে গিয়ে ওগুলিকেও টেনে এনেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিভা থাকলে ঘরে বসে থেকেও বড় হওয়া যায়, তার জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াবার কোন প্রয়োজন নেই।

দীর্ঘ দিন ধরে তিনি ভারতীয় শিল্পের সাধনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয়' করে তুলেছেন তিনি তাঁর শিল্পরচনাকে। তাঁর জীবন থেকে শিল্পকে পৃথক করা যাবে না—যেন 'একই বৃন্তে ফোটা দুইটি কুসুম'। তাঁর সৃষ্ট চিত্রশিল্পগুলির মধ্যে মোটামুটি তিনটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়: ১। অতীত অর্থাৎ ঐতিহ্যচেতনা ২। বর্তমান অর্থাৎ সমসাময়িকতা ৩। ভবিষ্যৎ অর্থাৎ প্রগতিশীলতা। তাই তাঁর সমগ্র কর্মময় শিল্পজীবন সীমাবদ্ধ হয়েও অসীমে প্রবেশ করেছে। যামিনী রায় নিজেই তাঁর অবিচ্ছিন্ন শিল্পীজীবনের কথা বলতে গিয়ে একস্থানে বলেছেন—"দরিদ্র অবস্থায় চিমনির কালো ভুসো কালি দিয়ে ছবি এঁকেছি। এক কথায় আমার অঙ্কন রীতিকে বলা হয় 'সেকেলে', আমি ছবি আঁকতাম flat জমিতে, এইজন্যই বোধ হয় এগুলিকে 'সেকেলে' বলা হয়। কিন্তু আমি জানি, যথার্থই আমার চিত্ররেখায় 'flat-ness' ছিল স্পষ্ট—কারণ, প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই সেই আদিমতার অনুরণন অবশ্য প্রাপ্য। ক্লান্ত মানব-মনের উপর কৃত্রিম নগরসভ্যতা তার প্রভাব বিস্তার করে, তখনই সে অনুকরণ করতে শুরু করে। বিদেশী চিত্রকররা খুব কমই তিব্বতী বা চীনা চিত্ররীতি অনুকরণ করে; অন্ততঃ প্রাচ্যশিল্পী যতখানি পাশ্চাত্ত্য রীতি অনুকরণ করে তার চেয়ে অনেক কম। আমি যা করেছি তা ভাল কি মন্দ তা আমি জানি না। শুধু জানি, আমি চিনেছি আমার গ্রাম, আমার জেলা—আমার বাংলাকে। নিজ ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খুব বেশী দূরে কেউ যেতে পারে না। খুব বেশী বই পড়লে, যত বড় পণ্ডিতই সে হোক না কেন, নিজস্ব সহজাত স্বতঃস্ফূর্ত বোধ হারিয়ে ফেলে।"

১৯৭২-এর ২৪ এপ্রিল ব্রঙ্কনিউমোনিয়া রোগে ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁর নিজ বাড়ি ও গ্যালারী ১৮নং বালিগঞ্জ প্লেস ইস্টে এই মহান শিল্পী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে—

"এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতীয় শিল্প-আন্দোলন

ডক্টর বন্দিতা ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণের 'Direct instrument' স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম-সাধনা আর শিল্প-সাধনাকে একাত্মীভূত করলেন। তারই ফলশ্রুতি— রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মপদ্ধতির মধ্যে শিল্পকলার অন্তর্ভুক্তি এবং এর শ্রেষ্ঠ পরিণতি তাঁরই নির্দেশিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী কালে বেলুড় মঠ নির্মাণ—যা ভারত ও বহির্ভারতের বিভিন্ন শিল্পধারার অভিনব সংমিশ্রণে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন হিসেবে চিরপ্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। ঐতিহাসিকের বিচারে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব বাংলার নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটালেও, প্রকৃতপক্ষে পালে ভরা জোয়ার এল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে যেদিন ভারতের এক রিক্ত সন্ন্যাসী মদগর্বিত পাশ্চাত্যকে শোনালেন প্রাচ্যের নতুন বাণী। তার প্রবল ঢেউ ভারতবর্ষের দুকূল প্লাবিত করে বাংলা তথা ভারতের সুপ্ত অন্তর্গূঢ় মনীষাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের মতোই শতদলে উৎসারিত করল। আর এই জাগরণ-জোয়ারের পুরোভাগে নিঃসংশয়ে স্বামী বিবেকানন্দ। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের প্রায় এক দশকেরও কিছু আগে মহিমাচ্যুত, শিখরভ্রষ্ট ভারতীয় প্রাণ ধীরে ধীরে স্পন্দিত হতে শুরু হল, অঙ্কুরিত হল জাতীয়তাবাদের বীজ, যা মহীরুহে পরিণত হয়ে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশমাতৃকাকে বৈদেশিক পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে। বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদ কোন স্বকপোলকল্পিত মতবাদ বা তত্ত্ব নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখিয়েছিলেন—প্রতিটি জীবসত্তায় পরম শিব বিরাজিত, আব্রহ্মস্তম্ব সবই সেই অখণ্ড জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। অতএব, 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-ই শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম। স্বামীজী এই ব্রতের বাস্তব রূপায়ণ করতে গিয়ে স্বল্পস্থায়ী স্থূল জীবনের প্রতিটি রক্তবিন্দু উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলেন। নিবেদিতাকে লেখা সেই মহান্ পত্রের প্রারম্ভেই লিখছেন—"আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতে পারে —মানুষের নিকট তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের প্রচার এবং জীবনের প্রতি কার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থানির্ধারণ।" বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনব্যাপী প্রচার ও শিক্ষাদানের সারমর্ম—সর্বভূতে অকপট, নিঃস্বার্থপর প্রেমের কর্মময় প্রকাশের মাধ্যমে প্রকৃত অদ্বৈতানুভূতি অর্জন করে প্রতিটি মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতির স্তরে উত্তীর্ণ করানো। সমষ্টির মুক্তিতেই ব্যষ্টির মুক্তি—অভিনব 'ফলিত বেদান্ত' তুলে ধরলেন বিবেকানন্দ মোহাচ্ছন্ন ভারতবাসীর কাছে, বললেন—'মানুষ চাই, মানুষ।'

গুরুগতপ্রাণা নিবেদিতা গুরুর মহাপ্রয়াণের পরই এই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপ দিলেন বাংলা তথা ভারতের জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেমন একদিন বিবেকানন্দকে আত্মসুখ ত্যাগ করে 'জীবসেবা'র দুরূহ কর্মে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হতে বাধ্য হতে হয়েছিল তাঁরই শ্রীগুরুর নির্দেশে। তার অন্যতম ফলশ্রুতি—বাংলা তথা ভারত-শিল্পে নিবেদিতার প্রেরণাদায়িনী শক্তি, যা আজও শিল্পবোদ্ধাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি অর্জন করে চলেছে। স্বামীজী প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টিবলে তাঁর শিষ্যাকে অনুভব করিয়েছিলেন—সুগভীর অধ্যাত্ম-চেতনা ব্যতীত মহৎ শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব। ভারতীয় শিল্প-স্থাপত্য—ভাস্কর্যের আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজী বারংবার বলেছেন—প্রাচীন ভারতীয় কলাশিল্পীদের সুগভীর ধর্মবোধ, প্রগাঢ় ঐতিহ্য-

নিষ্ঠা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, ধ্যানময়তা—এ সব সমন্বিত হয়েই ভারত-শিল্পকে অসামান্য মহিমায় বিভূষিত করেছে। আরও বোঝালেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ সাধারণ নরনারীর লৌকিক জীবনযাত্রা, পূজা-পার্বণ, ব্রত-উৎসব, ইতিহাস, পুরাণ, উপকথা—সব কিছুই ভারতীয় শিল্পে ধর্মচেতনায় অন্বিত হয়েছে।

ভারতীয় চিত্রকলার রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সবই এক অখণ্ড চৈতন্যের রূপময় প্রকাশ। একটি শ্রীহীন মাটির পুতুলেও তারই প্রকাশ। নিবেদিতাকে উত্তর-ভারত পরিক্রমাকালে পাটনা, কাশী, সারনাথ, আগ্রা, বুদ্ধগয়া, কাশ্মীর, লক্ষ্ণৌ—প্রতিটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দেখিয়ে তিনি শিষ্যার মনে 'এক অখণ্ড ভারত'-এর ছাপ ফেললেন, যার প্রভাবে পরবর্তী সময়ে ভারতবাসী তাদের 'ভগিনী'কে স্বল্পকালের মধ্যেই পরমাদরে বরণ করে নিতে পেরেছিল। গুরুর অমোঘ বাণী যে যোগ্য আধারেই বর্ষিত হয়েছিল তার প্রমাণ নিবেদিতার 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' এবং 'The web of Indian life'—যার ছত্রে ছত্রে বিধৃত হয়ে আছে ভারতের প্রতি, ভারতবাসীর জন্য—হৃদয়প্লাবী প্রেম, অনুরাগ, শ্রদ্ধা, বেদনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দৃঢ়বদ্ধ আশা। 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—গুরুর এই মহাবাক্য নিবেদিতার অন্তরের অন্তস্তলকে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে আলোড়িত করে তুলল।

ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনে নিবেদিতার অসামান্য ভূমিকা একটি বিশেষ ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-যাত্রায় অন্যতমা সঙ্গিনী নিবেদিতা 'বালিকা বিদ্যালয়'-এর জন্য অর্থসংগ্রহ মানসে শিকাগোয় উপস্থিত হন। নিবেদিতার প্রথম যে বক্তৃতাটির মাধ্যমে কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল তার বিষয়বস্তু—'ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা'; স্থান—হাল্ হাউসের আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট্ অ্যাসোসিয়েশন, তারিখ—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১ ডিসেম্বর। শিল্প-ভাবনায় অনভিজ্ঞা নিবেদিতা নিরুপায় হয়ে তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা স্বামীজীর শরণাপন্ন হলেন। ভারতীয় শিল্প-আলোচনায় তাঁর হাতেখড়ি হল। ঐ উপলক্ষে স্বামীজীর আলোচনার সারাংশই বক্তৃতার উপজীব্য করে নিবেদিতা ১৫ ডলার পান এবং এটাই বিদেশে তাঁর প্রথম অর্থ প্রাপ্তি। সব মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে করে—'Coming events cast their shadows before'. পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাচ্ছি—ঐ বছরই (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে) প্যারিসে প্রদর্শনী উপলক্ষে গুরু ও শিষ্যা পরস্পর মিলিত হয়েছেন। ঐখানেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামীজী দৃঢ়ভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ মৌলিক। গ্রীক বা অপর কোন দেশের সভ্যতা বা শিল্পরীতির দ্বারা ভারত কখনই প্রভাবিত হয়নি। সভায় উপস্থিত নিবেদিতা গুরুমুখে ভারতীয় শিল্পের অনন্য মহিমা উপলব্ধি করেই অভিভূতা হলেন। এইবারের শিল্পতীর্থ পরিক্রমায় গুরু-শিষ্যা অস্ট্রিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া থেকে শুরু করে কায়রো ও ইস্তাম্বুলের শিল্প-নিদর্শন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এশিয়া মহাদেশে স্বামীজীই প্রথম শিল্পসমালোচক। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর তিরোধানের পর নিবেদিতা যখন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে ভারতীয় জীবনের বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে নিজেকে অংশভাগিনী করে শিল্প-আন্দোলনেও পরোক্ষ নেতৃত্ব দান করতে এগিয়ে এলেন, তার মাত্র কয়েক বছর আগে থেকেই ভারত-কলালক্ষ্মীর পুনর্জাগরণ ঘটতে শুরু করেছে—অনেক দ্বিধা, সংকোচ, ভীতি আর জড়তার গ্লানিজাল ধীরে, অতি ধীরে ছিন্ন করতে করতে।

হিন্দুযুগে যে শিল্পকলার সূচনা ও ক্রম-বিস্তার, মুঘল ও রাজপুত যুগে যার চরম সমুন্নতি, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ব্রিটিশের অপশাসন, উগ্র ভারতবিরোধিতা, উৎকট পাশ্চাত্য আদর্শ ও সংস্কৃতি সবলে এদেশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে ভারতীয় চিত্রকলার ক্রমাবনতি, ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী চিত্রকরদের বৃত্তিচ্যুতি, বিদেশী শিল্পীদের ভারতে আগমনে প্রাচীন শিল্পধারা ও রুচির পরিবর্তন এবং সর্বোপরি জাতির আত্মবিস্মৃতি ও জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রের মতো শিল্পকলা ও শিল্প-ভাবনা এবং অধঃপতিত হয়ে অন্ধ ইওরোপীয় আদর্শ অনুকরণে ব্যাপৃত হয়ে স্বধর্মভ্রষ্টতার চূড়ান্ত সর্বনাশ ডেকে আনল। এমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে তৎকালীন সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হয়ে যে মানুষটি এলেন, তাঁর নাম ই. বি. হ্যাভেল। 'ভারতপ্রেমী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্' এই ইংরেজ পুরুষই সেদিন নতুন করে আশার আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে তুললেন, পথ দেখালেন দিগ্‌ভ্রষ্ট ভারতীয় শিল্পীদের শিল্প-আন্দোলনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলেন, ভারত-শিল্পের নবজাগরণের প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে ঘোষণা করলেন—'ভারতীয় শিল্পকলার মূলে রয়েছে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির শক্তি'—এর মৌলিকতা এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে কাজে লাগাতে হবে, তবেই ভারতীয় শিল্প আবার বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়—সেদিন হ্যাভেলের যথার্থ মূল্যায়ন ভারতবাসী করতে পারেনি। কিন্তু জন্মসূত্রে অ-ভারতীয় এক নারী যিনি অকুতোভয়ে পরম আগ্রহে এগিয়ে এসেছিলেন হ্যাভেলের সহায়িকা প্রেরণাদাত্রী ও প্রচারিকারূপে—তিনি ভগিনী নিবেদিতা। আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন পাশ্চাত্য আদর্শেই ছবি আঁকার experiment করছিলেন, তখন তাঁর শিক্ষাগুরু হ্যাভেল এবং পরবর্তী কালে নিবেদিতা তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করলেন প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার মহিমময় আদর্শানুসারী চিত্রাংকন-কর্মে। অবনীন্দ্রনাথ যেদিন থেকে ভারতীয় ধারায় ফিরে এলেন, সেইদিন থেকেই শিল্পের নবজাগরণ যথার্থতঃ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল 'Indian Society of Oriental Art', যার অন্যতমা প্রেরণাদাত্রী স্বয়ং নিবেদিতা এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সূচনা হল 'Bengal School' শিল্পীগোষ্ঠীর, যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পরবর্তী কালে স্বনামধন্য হয়ে ভারতমাতাকে বিভূষিতা করেছিলেন অজস্র অনবদ্য শিল্পমালায়। তাঁদের কথায় আসার আগে নিবেদিতার ভূমিকাটি আর একটু আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে নিবেদিতার প্রথম শিক্ষা স্বামীজীর কাছ থেকে, যার Nucleus হল আত্মোপলব্ধি। বস্তুতঃ আত্মানুভূতি ব্যতীত শিল্পসৃষ্টি নিছক বিলাসিতা বা অবসর-বিনোদন। প্রাচ্য শিল্প-দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শের মৌল পার্থক্য এখানেই। কিন্তু নিবেদিতা গুরুপ্রদত্ত সমন্বয় মন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন—তাঁর ব্রত ছিল পাশ্চাত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট উপাদানগুলিকে প্রাচ্যের ঐতিহ্যানুসারী করে ফুটিয়ে তোলা। হ্যাভেল রচিত 'Indian Sculpture and Painting'-এর Review শুরু করেছেন নিবেদিতা এই বলে—'এই সর্বপ্রথম একজন ইউরোপীয় ভারতীয় আর্ট সম্বন্ধে এক পুস্তক লিখিয়াছেন।...মিঃ হ্যাভেলের নিকট ভারতীয় আর্ট আর পণ্যদ্রব্য মাত্র নহে।...তাঁহার দৃষ্টিতে ভারতের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক হইয়া গিয়াছে।' নিবেদিতার প্রথম কর্তব্য তখন ক্রমাগত লেখার মাধ্যমে বাঙালী ও ভারতীয় শিল্পীদের জনমানসে ব্যাপক প্রচার। এই কাজে প্রধান সুহৃদ ও গুণগ্রাহীরূপে পেলেন 'প্রবাসী' ও

'Modern Review'-এর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে। দিনের পর দিন অসংখ্য মূল্যবান চিত্র-সমালোচনার মাধ্যমে ব্যক্তিত করলেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিত হালদার প্রমুখ খ্যাতনামা ভারত-প্রসিদ্ধ শিল্পীদের চিত্রাবলী। অবনীন্দ্রনাথের 'সুজাতা', 'বজ্রমুকুট', 'ভারতমাতা' রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠল নিবেদিতার লেখনী ধারণে।

আধুনিক ভারত-শিল্পের রেনেশাঁস শুরু হল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে প্রথম দিকে কেবল রবি বর্মার ছবি ছাপানোর জন্য নিবেদিতা তীব্র ভৎর্সনা করে বলেন যে, ঐ ছবিগুলি না ভারতীয়, না পাশ্চাত্যরীতিসম্মত। প্যারিসের কিছু শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম নিবেদিতার আগ্রহেই 'Modern Review'-তে ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হয়েছিল। গ্রীক, গান্ধার ও ভারতীয় মূর্তিশিল্পের তুলনামূলক বিচার করে নিবেদিতা দেখিয়েছেন—ভারতীয় ভাস্কর্য সর্বার্থেই উৎকৃষ্ট। আর্ট সম্বন্ধে নিবেদিতার অজস্র মূল্যবান বক্তৃতা অ-লিপিবদ্ধ রয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে নিঃসন্দেহে বিরাট দুর্ভাগ্য। 'জাতীয়তা গঠনে আর্টের কাজ','আর্টের বাণী' প্রভৃতি প্রবন্ধ নিবেদিতার গভীর শিল্পবোধ, সৌন্দর্য-চেতনা ও পরিণত রুচির পরিচয়বাহী। হ্যাভেল, নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথ—এই ত্রিবেণী সংগমে অবগাহন করে ভারতীয় শিল্প নবজন্ম লাভ করল।

অবনীন্দ্রনাথের আদর্শানুগ ছাত্রদের মধ্যে সর্বাগ্রণী নন্দলাল বসু। এঁর ওপর ভগিনী নিবেদিতার প্রভাব এত বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে, এ সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাচ্ছে।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন প্রতিভাবান শিল্পী ও নিবেদিতার প্রিয় পাত্র। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু নিবেদিতাকে গভীরভাবে ব্যথিত করে। তাঁর আঁকা 'Flight of Lakshman Sen' ছবিটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে নিবেদিতা 'Modern Review'-এ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

অসিতকুমার হালদার লিখছেন—'আমাদের ছিল তখন দেশী-শিল্পের গবেষণাকাল।...ভগিনী নিবেদিতা সর্বদা আমাদের এই জাতীয় জাগৃতি প্রীতির চক্ষে দেখতেন।...আমি এবং নন্দলাল প্রায়ই তাঁর নিকট বাগবাজারে যেতাম।...আমাদের হাতে দেশের অবলুপ্ত আর্টের নবজাগরণ নির্ভর করছে।...সেই কথাই ভগিনী নিবেদিতা আমাদের বোঝাতেন। জাপানের বিখ্যাত শিল্পীদ্বয়—ওকাকুরা ও টাইকান্ স্বামীজীর জীবৎকালেই কলকাতায় আসেন। স্বামীজীর সঙ্গে ভারতীয় ও জাপানী শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁদের গভীর আলোচনা হয়। স্বামীজীর নির্দেশে নিবেদিতা ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়া ও অন্যান্য তীর্থস্থান দর্শন করে মুগ্ধ হন। ওকাকুরার নির্বন্ধাতিশয্যে স্বামীজী জাপান যেতে সম্মত হন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলবতী হয়নি। বাংলা তথা ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণে এঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। জাতীয় ঐতিহ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল ওকাকুরার স্বপ্ন। তাঁর লিখিত 'Ideals of the East' পুস্তকের ভূমিকায় নিবেদিতা লিখলেন—'ভারতবর্ষই এশিয়ান সভ্যতার জন্মভূমি।...পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা হইতে ইহা যেমন পৃথক, তেমনি উন্নত।' নিবেদিতার এই মতবাদই ভারতীয় শিল্পজগতে রূপান্তর ঘটাল। অবনীন্দ্রনাথই প্রথম এই মতবাদে দীক্ষিত হলেন আর শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করল শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর অর্ধশতাব্দীব্যাপী চিত্রকর্মে।

ভারতীয় শিল্পের নবজাগৃতির শ্রেষ্ঠ ফসল নন্দলাল বসু আধুনিক ভারতীয় শিল্পের প্রাণপুরুষও বটেন। অবনীন্দ্রনাথ যদি তাঁর শিক্ষাগুরু হন, তবে নিবেদিতা তাঁর দীক্ষাগুরু। বস্তুতঃ নন্দলালের

ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তার পূর্ণ বিকাশ হয় ভগিনী নিবেদিতার পুণ্য স্পর্শ ও প্রভাবে। নন্দলালের প্রথম জীবন ত্রিধারায় পরিস্নাত—শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। বলা বাহুল্য প্রথম দুটি ধারা তৃতীয়টির মাধ্যমে নন্দলালের শিল্পীজীবনকে নব নব সৃষ্টি সম্ভারে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। নন্দলাল ও নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎকার আজ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। গণেন মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে আর্ট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নিবেদিতা যুবক নন্দলালকে অংকনরত অবস্থায় দেখতে পান। দেখামাত্রই নিবেদিতা বুঝে-ছিলেন—এঁর মধ্যে অসাধারণ সম্ভাবনা লুক্কায়িত রয়েছে। তাই কৌতূহলী হয়ে নন্দলালের আঁকা কয়েকটি ছবি দেখলেন এবং তীক্ষ্ণ, তীব্র সমালোচনার দ্বারা ভারতীয় শিল্পের প্রকৃত আদর্শ এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্য তাঁর সামনে তুলে ধরলেন। 'মানভঞ্জন' ছবিতে সত্যভামার পদানত শ্রীকৃষ্ণকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পৌরুষহীনতা প্রদর্শন করায় ভর্ৎসনা করে বললেন—'তোমাদের Ideal হবে রামায়ণ-মহাভারতের বীর পুরুষের।' ভারত-আত্মার মর্মবাণী—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' যেন নতুন করে জেগে উঠল। 'কালী' ছবিতে বস্ত্রাবৃতা দেবীকে দেখে নিবেদিতা বললেন—কালী যে উলঙ্গিনী, বন্ধনমোচনকারিণী এবং স্বামীজীর 'Kali the Mother' কবিতাটি পড়তে বললেন। 'দশরথ ও কৌশল্যা' ছবিতে রানীর হাতে তালপাতার পাখা দেখে অবাস্তবতার অভিযোগ তুলে বললেন—রানীর হাতে আইভরির পাখা থাকবে। তবে, শান্ত নির্জন পরিবেশের প্রশংসা করে বললেন—শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের পরিবেশটি যেন ফুটে উঠেছে। বিদায় নেবার সময় নন্দলালকে তাঁর বোস পাড়া লেনের বাড়িতে যাবার আহ্বান জানালেন। সেইদিন থেকেই আধুনিক ভারতীয় শিল্পের জয়যাত্রা শুরু হল। পরবর্তী কালে বোস পাড়া লেনের বাড়িতে নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গেলে নিবেদিতার নির্দেশে তাঁদের সোফা থেকে নেমে মাটিতে পা মুড়ে বসতে হল এবং সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে নিবেদিতাই বললেন—তোমরা বুদ্ধের দেশের লোক। তোমাদের এইভাবে দেখতে কত ভাল লাগে! ঐ দিনই বুদ্ধের ব্রোঞ্জমূর্তি দেখে বললেন—এটি স্বামীজীরই মূর্তি এবং নন্দলালকে নির্দেশ দিলেন—গঙ্গাবেষ্টিত হিমালয়ের শিখরে ধ্যানরত স্বামীজীর মূর্তি এঁকে দিতে যা নন্দলাল এঁকে দিয়েছিলেন। 'জগাই মাধাই' ছবিতে উভয়ের মুখাবয়ব এত নিখুঁত হয়েছিল যে, নিবেদিতা নন্দলালকে তাঁর প্রেরণার উৎস জিজ্ঞাসা করে যখন জানতে পারলেন যে, গিরিশচন্দ্র ঘোষই তাঁর Model, তখন খুবই খুশি হয়েছিলেন।

দিনের পর দিন ভারত-শিল্পের মহিমা ব্যাখ্যা করে নন্দলালকে নবতর জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত করলেন নিবেদিতা। গুরু-প্রচারিত ভবিষ্যৎ ভারতের পূর্ণ রূপটি প্রকাশিত করলেন নিবেদিতা নন্দলালের দৃষ্টির সম্মুখে, নির্দেশ দিলেন—'জাতিকে আত্মসচেতন করে তোল, বীর্যবত্তায় অনুপ্রাণিত কর, শ্রদ্ধা সঞ্চারিত কর তাদের মনে, ইতিহাস পড়, জান আর ছবি আঁকার আগে ধ্যান কর, তবেই সে-ছবি আত্মোপলব্ধির সহায়ক হবে। ভারতের শিল্পচেতনা লুকিয়ে আছে তীর্থে, জনপদে, মঠে, মন্দিরে, মসজিদে, গুহায়, পর্বতে, তার লৌকিক জীবনের প্রতিটি স্তরে—পুরাণে, ইতিহাসে, ব্রতকথায়, যাত্রায়, কথকতায়, দেব-দেবীর মাহাত্ম্যে, মহাকাব্যে, পূজা-পার্বণে, তার কুটিরশিল্পে।' জাতীয় জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে উপদেশ দিলেন নিবেদিতা। শুরু হল শিল্পী নন্দলালের ভারত-আবিষ্কার। তাই নন্দলাল বলছেন—'সিস্টার নিবেদিতা শিল্প বিষয়ে যা

আলোচনা করতেন তার Ideal তিনি স্বামীজীর কাছ থেকে নিঃসন্দেহে পেয়েছিলেন। স্বামীজীর ব্যক্তিগত নিজস্ব একটি পুরুষজনোচিত bold ideal ছিল যা সিস্টার নিবেদিতা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন।'

নন্দলালের শিল্পী-জীবনের সর্বাধিক স্মরণীয় ঘটনা—নিবেদিতার নির্বন্ধে ও অর্থানুকূল্যে লেডি হ্যারিংহামের সহকারী রূপে নন্দলাল ও অসিত হালদারের অজন্তা গুহার ভিত্তিচিত্র নকল করতে যাওয়া। নন্দলালের প্রাথমিক আপত্তি সত্বেও গুরু অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত যেতে হয়। নিবেদিতার এই অবদানের কথা নন্দলাল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শ্রদ্ধায় ভক্তিতে স্বীকার করে গেছেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল রূপটি তুলে ধরাই ছিল নিবেদিতার প্রাণের বাসনা।

নিবেদিতা কিছুদিন পরে সদলবলে ওখানে গিয়ে স্বচক্ষে তাঁদের কাজকর্ম পরিদর্শন করেন। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এর পর থেকেই অজন্তার চিত্রশৈলী নন্দলালের শিল্প-কৃতিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ বলছেন—'নিবেদিতা নইলে নন্দলালদের যাওয়া হত না অজন্তায়। কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি।…"সুন্দরী সুন্দরী" কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা…নিবেদিতা যেন সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা।…নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল…। দুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।' সত্যই শিল্পবিকাশে তদ্গতপ্রাণা নিবেদিতা নিজেই শিল্পীতে পরিণত হয়েছিলেন।

নিবেদিতার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ নন্দলালের উল্লেখ-যোগ্য কয়েকটি ছবির মধ্যে সর্বপ্রথম (১) 'সতী' —শিল্পবিচারে পুরস্কৃত এই ছবিটির অনবদ্য আলোচনা করেন নিবেদিতা 'Modern Review'-তে। এই সূত্রেই নিবেদিতা গর্বভরে বিশ্বকে জানালেন—অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যরা নতুন যুগের সূচনা করেছেন। জাপানের সর্ব-প্রধান শিল্প-পত্রিকা 'কোক্কা'-তে প্রকাশিত হয় এই ছবি। নিবেদিতার অতুলনীয় ভারত-প্রেম অখ্যাত নন্দলালকে একেবারে বিশ্বের মাঝখানে অধিষ্ঠিত করল। (২) 'সতীর দেহত্যাগ' (৩) 'নকল বুঁদি' (৪) 'কর্ণ' (৫) 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' (৬) 'প্রলয় নৃত্য' (৭) 'পার্থসারথি' (৮) 'মহিষাসুরমর্দিনী' (৯) 'কালীর নৃত্য' (১০) 'দুর্গা' (১১) 'অগ্নি' (১২) 'শিবের মুখমণ্ডল' প্রভৃতি ছবিগুলির শিরোনাম ও ভাব-ব্যঞ্জনা দেখলেই উপলব্ধি করা যায়—প্রাচীন ভারতের ত্যাগ, বৈরাগ্য, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা, সতীত্ব, প্রভুভক্তি, বীরত্ব, অধর্মের ধ্বংস ও ধর্মের চিরন্তন জয় ইত্যাদি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নন্দলাল পরবর্তী কালে বলেছিলেন—'শিল্পের সত্য তার রসে।' আর রসস্বরূপ যিনি, তিনিই তো সেই আনন্দময় নিত্যবস্তু। নিবেদিতার প্রভাবে নন্দলাল সেই অন্তর্গূঢ় সৌন্দর্যলোকের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছিলেন, অবশ্য এর জন্য তাঁকে ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট সাধনাও করতে হয়েছে যা শেষে তাঁর 'জীবনপাত্র উছলিয়া মাধুরী করেছে দান'। রবীন্দ্রনাথ একটি মাত্র বাক্যে নন্দলাল সম্বন্ধে সব কথা বলে দিয়ে গেছেন—'অমন লোক হয় না। অমন মানুষ হয় না! অমন আর্টিষ্ট হয় না।' বস্তুতঃ, নন্দলালের সমগ্র জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার ভাবধারায় আপ্লুত ছিল, যার প্রমাণ কামারপুকুর, বেলুড় মঠ আর 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'-এ বিরাজিত তাঁর বহু বিচিত্র শিল্পকর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'একঘেয়ে হোস্ না।' নন্দলালও বারবার প্রথা-

প্রকরণের গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু সবার উপরে একথা সত্য যে, সেযুগে একমাত্র নন্দলালের সৃষ্টিতেই ধ্রুপদী ও লোকায়ত শিল্পের অভিনব মেলবন্ধন ঘটেছিল—আর তা সম্ভবপর হয়েছিল নিবেদিতা-প্রবর্তিত নবজাতীয়তাবাদ-দর্শনের পরিণতিরূপে। নন্দলাল লিখছেন—'নিবেদিতার মুখে এমন একটা তেজস্বিতা, দীপ্তি ও পবিত্র মুখশ্রী আমি দেখেছি যা সচরাচর চোখে পড়ে না এবং একবার দেখলে কখন যা জীবনে ভুলতে পারা যায় না।...তিনি যে আমাদের কি ছিলেন, আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করতাম, কিন্তু প্রকাশ করে বলা কঠিন।...তিনি ছিলেন একজন যথার্থ শিল্পপ্রেমিক।'

নিবেদিতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ অসাধারণ মনস্বী ও শিল্পবোদ্ধা আনন্দ কুমারস্বামী ভারতীয় শিল্প-প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। কুমারস্বামী নিবেদিতার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন এই বলে—'তাঁহার দ্বিতীয় মাতৃভূমি ভারতের আদর্শ বিষয়ে ও ইহার নরনারীদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও আন্তরিকতা সত্যই অতুলনীয়।... তিনি অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এক অভিনব ভারতীয় ছাত্রগোষ্ঠীকে, যাহারা ভারতের শাশ্বত ধর্ম ও শিল্পের ভিতর দিয়া জাতীয় আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিল

স্বামীজীর দেহত্যাগের পর এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে নিবেদিতা তৎকালীন ভারতের নবজাগরণের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বকীয় প্রতিভা ও তেজস্বিতার দ্যুতিতে দীপ্তিমান করে গুরুর অমোঘ আশীর্বাদ—'ভারতের পুনরুদ্ধার কর্মে তোমার সেবা যেন সার্থক হয়'—সত্যে পরিণত করেছিলেন। বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ অর্ঘ্য নিবেদন করলেন—'নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই।... প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ; আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন।...বস্তুতঃ তিনি ছিলেন লোকমাতা। ...ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্য পদার্থ, তাহা মোহ নহে।' আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখলেন—'নিবেদিতা ছিলেন বিবেকানন্দের উপসংহার।'

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবরের সকালে হিমালয়চুম্বিত দার্জিলিং-এ জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতে অন্তিম শয্যায় শায়িতা রণক্লান্তা নিবেদিতা যখন বলে উঠলেন—'The boat is sinking, but I shall see the sunrise' তখন আমরাও নতমস্তকে বলি -'Go thou, the Daughter of light, brighter than thousand suns.'

উত্তরণ

শ্রীবিমলকুমার মিশ্র

এ সংকীর্ণ চিত্ত হতে হে আলোকময়,
জড়ত্বের গ্রন্থি যত নিত্য দুঃখময়—
ভেদ কর, মুক্ত কর কঠিন আঘাতে।
প্রবল শাসনে নিত্য ঘাত প্রতিঘাতে,
এই আবর্তের স্রোতে, তরঙ্গভঙ্গিমা,
এই চির ভবনদী, নাহি তার সীমা
এই নিত্য হলাহল, জীবন ব্যাপিয়া
এই কামনার ফেনা, লক্ষ তৃষ্ণা নিয়া
দেবাসুর সংগ্রামের বিষাক্ত নিশ্বাস
আবরিছে চৈতন্যের সুরভি নির্যাস—
এ কলুষ গ্লানিপুঞ্জ তোমার প্রভায়
ভস্মীভূত হয়ে যাক্। জীবনবীণায়
নব সুরে, নব ছন্দে, মূর্ত রাগিণীতে
তব বাণী ভরে দাও রামকৃষ্ণগীতে॥

বিবেকানন্দের দর্শনে মানবসত্তা ও মানবতাবাদ

ডক্টর শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়

[বিগত ১ এপ্রিল ১৯৮৩, উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত চতুর্থবার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত মূল প্রবন্ধ।]

১

সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিক বিবেকানন্দের দর্শনে ভারতবর্ষের দর্শন আলোচনার ধারাটি নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ কোন দর্শনতত্ত্ব বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি দর্শন আলোচনার অবতারণা করেননি। এক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেছেন ভারতীয় দর্শনের মূল ভাবটি যেটি এসেছে 'দৃশ্' ধাতু থেকে। এটির সরল অর্থ হল দেখা।[১] জগৎকে, জীবনকে সাধারণভাবে দেখে, নানা তথ্য পর্যালোচনা করে এ সম্পর্কে পরম সত্য বা তত্ত্বে উপনীত হওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য। এই আলোচনা একদিকে পাশ্চাত্য 'ফিলজফি'র তত্ত্বনিষ্ঠ বিশ্লেষণ থেকে বিশেষ স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে এখানে চর্চা ও চর্যা, তত্ত্ব ও তথ্য এবং জীবন ও সত্যের মধ্যে ঘটেছে এক অপূর্ব সমন্বয়—যা মূলত জীবনকেন্দ্রিক। এই সমন্বয়মুখী ভারতীয় জীবনচেতনার প্রতিফলনে বিবেকানন্দের দর্শন তাই হয়ে উঠেছে যথার্থভাবেই মানবকেন্দ্রিক।

এই অর্থে বিবেকানন্দের মানবদর্শন আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হল—একদিকে জাগতিক বা সামাজিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পার্থিব সত্তাটিকে বিশ্লেষণ করা, অন্যদিকে এই সব জাগতিক, সাধারণ সমস্যাগুলি অতিক্রমণের মধ্যে মানব অস্তিত্বে পরম সত্য বা বিশ্বসত্তাটির মূল্যায়ন। সুতরাং সাধারণভাবে এবং পরম অর্থে মানবসত্তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানবদর্শন বা মানবতাবাদে উপনীত হওয়াই বিবেকানন্দের দর্শন আলোচনার মূলভিত্তি।

দর্শন যে জীবননিষ্ঠ অর্থাৎ মানবসত্তা ও মানবতত্ত্ব যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ভারতীয় দর্শনাদর্শের এই প্রতিফলন দেখি বিবেকানন্দের জীবনচর্যায়। তাই মানবদর্শনের মূল সূত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর ব্যক্তিসত্তার নানা বিবর্তনের মধ্যে পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের অধীন কলিকাতার দত্ত বংশে ১৮৬৩-র ১২ জানুআরি বিবেকানন্দের জন্ম। মানবিক গুণসমৃদ্ধ তাঁর বাবা-মার সান্নিধ্য, বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির নানা মানবিক আদর্শের প্রভাব তাঁকে মানবসত্তার স্বরূপটি বিশ্লেষণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই বিশ্লেষণের অর্থ হল—মানব-ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান প্রধান মূল্য বা আদর্শগুলির যথার্থ মূল্যায়ন এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সাম্য ও ঐক্যের[২] আদর্শ প্রতিষ্ঠা।

মানবিক ঐক্য ও সাম্যের আদর্শ পর্যালোচনার পথে গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্কার ও রক্ষণশীলতা-মুক্ত উদার, গণতান্ত্রিক,

---

১ Dr. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. I, (2nd Edn), p. 92

২ 'He lived to root out all distinctions between man and woman, the rich and the poor, the literate and the illiterate, Brahmans and the Chandals.··· He came to bring about the synthesis of the Eastern and Western Civilizations.' Swami Saradananda, 'Sri Ramakrishna—The Great Master', E. T. by Swami Jagadananda, Sri Ramakrishna Math, Mylapur, Madras, p. XI., 2nd Edn, 1952.

বিবেকানন্দকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁরই প্রেরণায় জীবনধর্ম, ধর্মতত্ত্ব বা দর্শন এবং পরম সত্য বা ঈশ্বর সম্পর্কে এক অখণ্ড বা ঐক্য-ভাবের জাগরণ ঘটল বিবেকানন্দের অন্তরে। গুরুর সান্নিধ্যে জীবনের পরম অর্থটি উপলব্ধি করলেন স্বামীজী।[৩] তাঁর জীবনে শুরু হল মানবিক আদর্শের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। গ্রহণ করলেন 'সন্ন্যাস' তথা 'পরিব্রাজকে'র জীবন। এই 'সন্ন্যাস' গ্রহণের অর্থ জগৎকে উপেক্ষা নয়, জগতে নানা ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থ প্রসূত অহং সংঘাতটিকে অতিক্রম করে জীবনের স্বরূপটি উদ্ঘাটন করা। এজন্যই প্রয়োজন দ্বিতীয় পথটির,—যেটির উদ্দেশ্য হল—'জীবনে জীবন যোগ করা…'[৪] অর্থাৎ মানুষের দুঃখ, দৈন্য, আনন্দ, বেদনার সম্মুখীন হয়ে জীবনের যথার্থ উপলব্ধি।

এইভাবে তিনি অনুভব করলেন ধর্ম বা দর্শনতত্ত্ব জীবননিরপেক্ষ কোন অভিমত নয়। এটি হল জীবনের প্রকাশমাত্র, যা মানবসত্তার বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যে জগতে ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিবেকানন্দ তাই লিখেছেন, 'সমাজের বিভিন্ন, উচ্চ-নীচ অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত দেখা যায়।'[৫] কিন্তু এ বিভিন্নতা মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার নানা পরিবর্তিত অবস্থামাত্র। বিবেকানন্দের মতে, 'প্রত্যেক সামাজিক পরিবর্তন উক্ত জীবনের এক এক অবস্থা-স্বরূপ।'[৬] প্রতিটি অবস্থাই যেহেতু জীবনের এক একটি মূল্যবোধকে প্রকাশ করে তাই মানবসত্তার সকল অবস্থাগুলি মানবিক মূল্যসমন্বয়ের প্রকাশে মানবসত্যের অখণ্ড ও পূর্ণরূপটিকে প্রকাশ করে। মানবসত্তায় এই অখণ্ডতা বা পূর্ণতা প্রকাশের অর্থ হল—বিবেকানন্দের মতে, মানব অস্তিত্বে পরম সত্য বা ঈশ্বরত্বের প্রতিষ্ঠা। বিবেকানন্দ তাই মানবপ্রকৃতি বা মানবধর্মের এই পূর্ণরূপটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে সূত্রটির উল্লেখ করেছেন, সেটি হল, '…সকল ধর্মমতের সমষ্টিস্বরূপ সত্য ধর্ম, এবং এই সকল ঈশ্বরভাবের সমষ্টিই ঈশ্বর।'[৭]

সুতরাং ঈশ্বর মানবসত্তা নিরপেক্ষ নয়,—মানব অস্তিত্বে সমন্বয়, সামঞ্জস্য ও ঐক্যবোধের জাগরণই হল ঈশ্বরভাব বা ঈশ্বরত্বের উদ্বোধন। বিবেকানন্দ মনে করেন, মানবজীবনের প্রতিটি অবস্থাই যেমন একদিকে এই পূর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে, ঠিক অন্যদিকে প্রতিটি অবস্থার মধ্যেই ঘটছে এই পূর্ণ বা পরম সত্যের প্রকাশ। তাঁর মতে, এটিই হল মানবজীবনের আধ্যাত্মিকতা—যা পৃথক বা স্বতন্ত্র নয়। এটি হল ধারাবাহিক, পারম্পরিক এবং এক সামঞ্জস্যপূর্ণ অগ্রগতি। এই অর্থে মানুষের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সত্তাগুলি পরস্পর পৃথক, স্বতন্ত্র বা একটি সৎ এবং অন্যটি অসৎ নয়। বিবেকানন্দের মতে, এগুলি হল 'এক সত্য থেকে সত্যান্তরে গমন।'[৮] অর্থাৎ মানবজীবনের প্রতিটি অবস্থাই পূর্ণতর অবস্থার মধ্য দিয়ে ক্রমে অখণ্ড ও পূর্ণতম অবস্থায় এক আধ্যাত্মিক পরিণতি লাভ করে।

বিবেকানন্দের মানবদর্শনের এই আধ্যাত্মিকতা

---

৩ 'Sri Ramakrishna···moulded him according to the ideal he had in mind, the ideal which became living and incarnate as the Swami Vivekananda'.—'Life of Swami Vivekananda'—His Eastern and Western Disciples, 1974, p. 115.

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঐকতান', 'জন্মদিনে', ১৩৪৭, আশ্বিন-মাঘ।

৫ স্বামী বিবেকানন্দ, 'অর্থ ধর্ম মীমাংসা'—'ধর্ম মীমাংসা ও রামকৃষ্ণ দর্শন', পরিশিষ্ট-১, বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য—শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ, ২য় সং, আশ্বিন—১৩৭৭, কলিকাতা। পৃঃ ৪৪১।

৬-৭-৮ ঐ

বিশ্লেষণের অর্থ হল—মানব অস্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। সাধারণভাবে দেখা যায়, মানুষের প্রতিটি জড় অবস্থায় ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের আকর্ষণ সৃষ্টি করে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত। কিন্তু মানবজীবন এই ক্ষুদ্রতর সংঘাতেই কেবলমাত্র আবদ্ধ থাকে না। বৃহত্তর ঐক্য বা সামঞ্জস্যবোধের প্রেরণায় সে অতিক্রম করে ক্ষুদ্র সংঘাতগুলিকে, ফলে প্রতিটি অবস্থায় প্রকাশিত হয় সাম্য বা ঐক্যভাবের এক একটি রূপ, এবং এইভাবে উন্মোচিত হয় স্বাধীনতার এক একটি অধ্যায়;—যা কখনও অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক, কখনও বা সামাজিক।

এই স্বাধীনতা অর্জনই মানবজীবন বা মানবদর্শনের মূল আদর্শ। বিবেকানন্দের মতে, স্বাধীনতাই তাই মানবাত্মার মূল সুর।[৯] বিবেকানন্দের দর্শনে তাই দেখা যায়, ব্যক্তি-স্বাধীনতার যথার্থ পরিণতি হচ্ছে—পূর্ণ সামাজিক স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবিক ঐক্যের পথে অগ্রগতি। এর অর্থ হচ্ছে মানব অস্তিত্বে বিশ্ব-মানবতার যথার্থ উপলব্ধি। বিবেকানন্দের মতে, ব্যক্তিসত্তায় বিশ্বসত্তার এই উপলব্ধি বা রহস্য উদ্ঘাটনই হল মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

২

এই বৃহত্তম উদ্দেশ্যের আলোকে মানুষ নিজ অস্তিত্বের রহস্যটিকে জানবার চেষ্টা করেছে যুগে যুগে। বিশাল বিশ্বে তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টাটিও তাই চিরন্তন! রবীন্দ্রকণ্ঠে তাইতো ধ্বনিত হয়েছে, 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।'[১০] বিবেকানন্দের মতে, 'যে অসংখ্য রহস্য ইতিহাসের উষাকাল থেকে সমাধানের জন্য শক্তিকে আহ্বান জানিয়েছে, তার চেয়ে সবচেয়ে বেশী রহস্যপূর্ণ হল মানুষের নিজের স্বরূপ। এটি হচ্ছে আমাদের সর্বপ্রকার জ্ঞানের, অনুভূতির ও কর্মের সূচনা ও শেষ আধার।'[১১] বহির্জগতে এই মানবরহস্যটি উদ্ঘাটিত হয়েছে নানাভাবে। ফলে জড়জগতে ঘটেছে তার জড়সত্তার নানা বিবর্তন। এই বিবর্তনের বিভিন্ন অধ্যায়কে বিশ্লেষণ করেছে বিজ্ঞান ও দর্শন। কিন্তু জড়নির্ভর, জাগতিক সত্তার বিশ্লেষণ, মানবপ্রকৃতির আলোচনাটিকে সম্পূর্ণ করতে পারে না। তাই তার অন্তর্জগতে শুরু হয়েছে 'বিশ্ব আমি'র অন্বেষণ। বিবেকানন্দের মতে, এটি হল জাগতিক বিশ্বে মানুষের ব্যক্তিসত্তায় বিশ্বমানবাত্মা বা বিশ্বমানব-সত্যকে আবিষ্কার করার নিত্য প্রচেষ্টা।

এই প্রচেষ্টার ফলে যুগে যুগে মানুষ তার অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থাগুলিকে বিশ্লেষণ করেছে নানাভাবে। এর উদ্দেশ্য হল—ক্ষুদ্রতর অবস্থা থেকে বৃহত্তর অবস্থার বিবর্তনটিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা। আবার অন্যদিকে বৃহত্তর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্রতর অবস্থাটির যথার্থ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সে অস্তিত্বের পরম অবস্থাটি অর্থাৎ বিশ্বসত্তাটিকে সন্ধান করার চেষ্টা করে। ফলে নিজ অস্তিত্বে ঘটে 'বিশ্বমানবাত্মা'র উপলব্ধি। বিবেকানন্দের মতে, এটিই হল পরিপূর্ণরূপে মানুষের বিশ্বসত্তা অর্থাৎ মানবসত্তায় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপলব্ধি।[১২] নিজ

৯ '"Freedom, O Freedom! Freedom, O Freedom!" is the song of the soul. Bondage, alas, to be bound in nature, seems its fate.' 'What is Religion?' —Complete Works of Vivekananda, Vol. I, p. 335. (Cent Edn., Cal.)

১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, 'পূজা', স্বদেশ বিশ্বভারতী—১৯৬৫, পৃঃ ৩৬

১১ 'পুনর্জন্ম', বিবেকানন্দ রচনা সংগ্রহ। ৩য় খণ্ড, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, পৃঃ ৩-৪

১২ 'The greatest name man ever gave to God is Truth. Truth is the fruit of realisation, therefore seek it within the soul'. 'Religion is Realisation' —Complete Works of Vivekananda, Vol. VI, p. 82, (Cent Edn., Cal.)

অস্তিত্বে এই বিশ্বসত্তার ধারণা তাকে জগতে তার জড়সত্তার সীমা বা ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এই সচেতনতা তাকে তার জড়গত অহং বা ক্ষুদ্রস্বার্থপ্রসূত সংঘাতটিকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম করে তুলেছে। এর অর্থ হল—ক্ষুদ্র সংঘাতগুলি অতিক্রমণের মাধ্যমে মানবস্বাধীনতার পরিপূর্ণ রূপটি প্রকাশ বা প্রতিষ্ঠা করা। এই ভাবেই মানব অস্তিত্বের তাৎপর্য মূল্যায়িত হয়েছে একদিকে তার জড়সত্তার সীমা বা বন্ধনের ধারণা এবং অন্যদিকে ব্যক্তিসত্তায় সৃষ্টিশীল বিশ্বসত্তাটির স্ফুরণের মাধ্যমে মানবমুক্তির আদর্শ বিশ্লেষণের মধ্যে। এই বিশ্লেষণ হল—মানব অস্তিত্বের যথার্থ রহস্য উদ্ঘাটন।

এখানে সে কেবল একজন নিছক দ্রষ্টা, জড়-বিষয় বা জড়সত্তা নয়। সীমা-অসীম, অহং-আত্মা, বন্ধন-মুক্তির আদর্শ সমন্বয়ে সে নিজেকে প্রকাশ করছে এক সৃষ্টিশীল সত্তারূপে। আধুনিক বিজ্ঞান আলোচনাতেও এই সৃষ্টিশীল মানবসত্তার নানা বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। পদার্থবিদ্ নেলস্ বোর তাই মানুষকে দেখেছেন একদিকে দ্রষ্টা এবং অন্যদিকে স্রষ্টা হিসেবে। লিঙ্কন বার্নেটও তাই মনে করেছেন, স্রষ্টামানব এইভাবেই তার নিজের কাছে হয়ে উঠেছে এক পরম বিস্ময়, চরম রহস্যময়।[১৩] বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সংস্কৃতি, এককথায় মানব-সভ্যতার নানা স্তরে উদ্ঘাটিত হচ্ছে এই স্রষ্টা-মানবের গোপন রহস্য। বিবেকানন্দ মনে করেন, এভাবেই ঘটছে মানুষের যথার্থ বন্ধনমুক্তি। মানুষ তার সৃষ্টিশীল সত্তাটির স্ফুরণের মধ্যে অতিক্রম করে তার জড় বা জীবপ্রকৃতির সীমাকে। ফলে এইভাবে তার ব্যক্তি ও সমাজজীবনের জড়গত ও ব্যক্তিগত সংঘাতগুলিকে অতিক্রম বা জয় করে সে প্রতিষ্ঠা করে নিত্য ও মুক্ত জীবনের আদর্শ।[১৪]

এই 'অতিক্রমণ' অর্থাৎ মুক্ত জীবনাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে মানব অস্তিত্বের প্রতিটি অবস্থার পরিবর্তন, বিবেকানন্দের মতে আধ্যাত্মিক। কারণ মানব অস্তিত্বের এই অবস্থাগুলি নিছক জড়ীয় বা কেবল ভাবগত নয়। এগুলি হল—মানবিক আদর্শ ও মানবিক কর্মের মধ্যে সৃষ্টিশীল মানবসত্তার বিবর্তন। এই বিবর্তনকে বলা যায় মানবিক আদর্শ, সত্তা ও অবস্থার বিবর্তন, যেগুলি পরস্পর যুক্ত এবং সত্য। বিবেকানন্দের মতে, এটি হল এক অবস্থা বা সত্য থেকে বৃহত্তর অবস্থায় বা বৃহত্তর সত্যে গমন অর্থাৎ বৃহত্তর আদর্শের সঙ্গে সংযুক্তি। এই পদ্ধতি ও আদর্শের যথার্থ অর্থটি হল 'যোগ' অর্থাৎ অবস্থা থেকে অবস্থান্তরের, সত্য থেকে সত্যান্তরের সংযুক্তি। এই সংযোগের উদ্দেশ্য হল—মানবিক প্রেম ও কল্যাণকর কর্মের মধ্যে বিশ্বের সকল মানুষের মিলনসাধন। এই মিলন বিবেকানন্দের মতে, প্রেম ও কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি এবং ঐশ্বরিক বা বিশ্বমানবিক আদর্শের সমন্বয় যেটি প্রকাশিত হয় জীবনে ও সমাজে এক অখণ্ড 'ঐক্যে'র আদর্শ প্রতিষ্ঠার মধ্যে। এই ঐক্য বিবেকানন্দের মতে আধ্যাত্মিক। কারণ এটি একদিকে মানব, জগৎ ও ঈশ্বর এই ধারণাগুলির মধ্যে এক সুষ্ঠু সমন্বয় স্থাপন করে, আবার অন্যদিকে এই 'সমন্বয়ে'র অর্থ হল—মানব অস্তিত্বে সংঘাতের মধ্যে সামঞ্জস্য, অসাম্যের মধ্যে সাম্য এবং অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের জাগরণ ঘটানো। বিবেকানন্দ চেতনার এই হল আধ্যাত্মিক মুক্তি ধারণা—যেটি মানব নিরপেক্ষ বা অতিমানবীয় বিষয় নয়। এটি সম্পূর্ণভাবেই মানবিক।

সুতরাং এইভাবে দেখা যায়, বিবেকানন্দ-দর্শনে মানবসত্তা, মানবিক আদর্শ ও পদ্ধতি বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিশ্বমানবিক 'ঐক্য' ও আধ্যাত্মিক মুক্তিতত্ত্ব মূল্যায়নের যথার্থ পরিণতিটি হল তাঁর আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ। [ক্রমশঃ

১৩ '…The Physicist Niels Bohr puts it, "we are both spectators and actors in the great drama of existence,". Man is thus his own greatest mystery' 'The universe and Dr. Einstein', —Mr. L. Barnett, 1950, p. 103

১৪ 'Man says to himself, "I am born slave, I am bound, nevertheless, there is a Being who is not bound by nature. He is free and Master of nature".—Complete Works of Vivekananda, Vol. I, p. 335, (Cent End, Cal)

দেবযান

(মুণ্ডকোপনিষদের ভাবাবলম্বনে)

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

যাহা সত্য হয় তার জয়,
মিথ্যা সে কুহক রচে—
সর্ব কর্ম ব্যর্থতার ভ্রান্তি পূর্ণ রয়।
সর্বোত্তম পুরুষার্থ যেথায় নিহিত,
সেথায় সাধনা-পথে
আপ্তকাম ঋষিগণ হন উপনীত।
সে পথেরে কহে দেবযান,
সে পথে করিতে হবে সত্যের সন্ধান।
সে পথ আস্তীর্ণ সদা সত্যের দ্যুতিতে,
সে পথ বাছিয়া লও সমুদ্গ্রীব সমুৎসুক চিতে।
সতত সত্যেতে কর জীবন-নির্ভর,
মিথ্যার কুহক যত,
হবে সব অপগত,
দেখা দিবে সত্য-বোধ পূর্ণ করি সমগ্র অন্তর।

বিধাতার দান

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ সরকার

ঈশ্বরের হাতে যবে সৃষ্টি হল প্রথম মানব
পূর্ণপাত্রে ছিল যত আশীর্বাদের বৈভব
মানুষের করপুটে একে একে দিলেন ঈশ্বর
জাগতিক যে সম্পদ ব্যাপ্ত হয়ে ছিল চরাচর।
প্রথমে শক্তি পরে রূপ, প্রজ্ঞা খ্যাতি আর সুখ
একে একে সব দিয়ে ঈশ্বরের অন্তরে কৌতুক
এখনো রয়েছে বাকী যে সম্পদ তার শুদ্ধ নাম
মানবের আরাধ্য শান্তিময় নিশ্চিন্ত বিশ্রাম।
বিধাতা ভাবেন, এই অনুভব উপহার দিলে
মানুষ আমায় ভুলে নিত্যদিন আমারই নিখিলে
মগ্ন হবে দৃশ্যে, গন্ধে, বর্ণে, মোহে—স্রষ্টা যাবে দূরে—
সে বড় ক্ষতির ছায়া উভয়ের আত্মার মুকুরে
অর্থ, যশ হোক তবু সন্তানের শান্তি থাক বাকী
সুখে সম্ভোগে নয়, বিষাদের প্রহরে একাকী
মানব স্মরণ নেবে বিধাতারই বক্ষের কাছে
সব বেদনার শান্তি শুধু তাঁরই করুণায় আছে।



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

রাজধর্ম : দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন

পুরাকালে খনীনেত্র নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের বরে বলাশ্ব নামে এক বীর সন্তান লাভ করেন। লোকসমাজে এই পুত্র করন্ধম নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পরাক্রমে মুগ্ধ হয়ে বীর্যচন্দ্রের কন্যা বীরা স্বয়ংবরসভায় তাঁকে পতিরূপে বরণ করেন। তাঁর গর্ভে অবীক্ষিতের জন্ম। এই পুত্র রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, বুদ্ধিতে বাচস্পতিকে, কান্তিতে চন্দ্রকে, তেজে সূর্যকে, ধৈর্যে সাগরকে এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীকে অতিক্রম করেন।

একবার অবীক্ষিত বৈশালরাজার কন্যার স্বয়ংবরসভায় তাঁকে জোর করে বিবাহ করতে গেলে অন্যায় যুদ্ধে অন্যান্য রাজাদের কাছে তিনি পরাজিত হন। এরপর থেকে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, কোন কন্যাকে আর বিবাহ করবেন না। কিন্তু জননী বীরা কিমিচ্ছক ব্রতপালন করতে চাইলে,—যে যা চাইবে তিনি নিজের শরীর দিয়ে তাঁর যা কিছু করা সম্ভব তা করবেন বলে ঘোষণা করলেন। তাঁর পিতা করন্ধম এই সুযোগ হাত-ছাড়া করলেন না। তিনি পুত্রের কাছে প্রার্থী হলেন—পৌত্রের মুখ দেখানোর জন্য। তখন তিনি বাধ্য হয়ে—তাঁর রূপে ও পরাক্রমে মুগ্ধ, তাঁর জন্য বনে তপস্যারতা বৈশাল-রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে মরুত্ত নামে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রকে তিনি পিতার কোলে দিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করেন। পৌত্রকে পেয়ে করন্ধম খুব খুশি হলেন। রাজ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।

বালক মরুত্ত ক্রমে বড় হতে থাকলেন। আচার্যের কাছে বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র এবং ভার্গবের কাছে অস্ত্র শিক্ষা করলেন। একদিন রাজা করন্ধম পুত্র অবীক্ষিতকে ডেকে বললেন: 'পুত্র! বৃদ্ধ হয়েছি, এবার আমি বানপ্রস্থ গ্রহণ করে বনে যেতে চাই। তুমি রাজ্য চালাও।' অবীক্ষিত বিনীত হয়ে বললেন: 'পিতা! রাজা বৈশালের কন্যাকে স্বয়ংবরসভায় জোর করে বিবাহ করতে গিয়ে আমি পরাজিত হয়েছিলাম। সে লজ্জা এখনও আমার যায়নি। নিজের শক্তিতে আমি রক্ষা পাইনি, আপনিই তখন আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। এই হীনবীর্য সম্বল করে আমি রাজ্য পালন করতে পারব না। আপনি অন্য কাউকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন। পিতার উপার্জিত অর্থ ভোগ করে, পিতা যাদের বন্ধন-মুক্ত করেন অথবা যারা পিতার নামে লোক-সমাজে পরিচিত হয়, আমাদের বংশে এই রকম যেন কেউ না জন্মায়।' করন্ধম অনেক করে বুঝিয়েও যখন তাঁকে রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত করাতে পারলেন না তখন পৌত্র মরুত্তের উপর রাজ্যের ভার সমর্পণ করে তিনি সস্ত্রীক বনে তপস্যা করতে গেলেন। রাজা তপস্যা করে ইন্দ্রলোকে গেলেন। রানীও ভার্গব-ঔর্বের আশ্রমে থেকে তপস্যায় রত হলেন।

পিতা অবীক্ষিতের আজ্ঞায় মরুত্ত পিতামহের

রাজ্য যথাশক্তি ধর্মানুসারে শাসন করতে থাকেন। প্রজাপালনের অঙ্গস্বরূপ বহু যাগযজ্ঞাদিও অনুষ্ঠিত হতে থাকল। যজ্ঞে তাঁর সমান কেউ নেই বলে তাঁর সম্বন্ধে গাথা রচিত হল।

একদিন এক মুনিকুমার এসে রাজা মরুত্তকে বললেন: 'হে রাজন্! নাগেরা তপস্বীদের দংশন করে সাতজনকে মেরে ফেলেছে। আর সমস্ত জলাশয় দূষিত করেছে। আপনার পিতামহী আমাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন যে, আপনি রাজ্যশাসনে সমর্থ নন, তা এই সব ঘটনায় প্রত্যক্ষগোচর হচ্ছে। কেননা আপনার পিতামহ ও পূর্বপুরুষের আমলে এইরকম কখনও হয়নি। রাজা হওয়ার আগে পর্যন্ত ভোগে মত্ত হওয়া চলে, কিন্তু রাজা হওয়ার পর রাজার শরীর ভোগের জন্য নয়, ক্লেশ স্বীকার করে রাজ্যপালন করতে হয়।'

রাজা মরুত্ত এই ঘটনায় লজ্জিত হলেন। তিনি নিজেকে ধিক্কার দিলেন। তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ভার্গব-ঔর্বের আশ্রমে গিয়ে পিতামহীকে প্রণাম ও তাপসদের বন্দনা করে বললেন: 'নাগেরা আমার শক্তির অবমাননা করেছে। এর ফল তাদের পেতেই হবে। এবার এদের আমি কি দশা করি তা দেবতাসুর ও মানুষ দেখে অবাক হয়ে যাবে।' এই বলে তিনি পাতাল ও পৃথিবীর সমস্ত নাগের বিনাশের জন্য অস্ত্রগ্রহণ করলেন। সেই মহাস্ত্রের তেজে চারিদিক জ্বলে উঠল, নাগেরা ভয়ে হাহাকার করে উঠল। তারা পাতাল ছেড়ে মরুত্তজননী বৈশালিনীর শরণাপন্ন হল। তারা বলল: 'আপনি অনুগ্রহ করে আপনার পুত্রকে নিবারণ করুন। তা না হলে আমরা সবাই মারা পড়ব।' বৈশালিনী স্বামী অবীক্ষিতকে পূর্ব ঘটনা স্মরণ করিয়ে বললেন: ওদের কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—আমার পুত্র যখন ওদের বিনাশ করতে উদ্যত হবে তখন আমি ওদের উদ্ধার করব বলে অবীক্ষিত বললেন: 'নিশ্চয়ই নাগেরা প্রচণ্ড অন্যায় করেছে, তাই মরুত্ত ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছে। তার ক্রোধ শান্ত করা যাবে বলে মনে হয় না।' তখন নাগেরা তাঁকে বলল: 'আমরা আপনার শরণ নিয়েছি। শরণার্থীকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আপনি আমাদের পরিত্রাণ করুন।' অবীক্ষিত স্ত্রীকে বললেন: 'তোমার পুত্র যদি আমার কথা না শোনে, তবে সর্পধ্বংস নিবারণ করতে অস্ত্রের দ্বারা তাকে নিবৃত্ত করতে হবে।' এই বলে তিনি স্ত্রী বৈশালিনীকে নিয়ে ভার্গব-ঔর্বের আশ্রমে গেলেন।

সেখানে গিয়ে অবীক্ষিত দেখলেন, পুত্রের অস্ত্রের শিখা দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে অগ্নি উদ্গীরণ করছে এবং তা পাতালে প্রবেশ করছে। তিনি পুত্রকে বললেন: 'তোমার অস্ত্র সংবরণ কর। তুমি ক্রোধবশে নাগেদের বিনাশ করছ।' মরুত্ত পিতাকে প্রণাম করে বললেন: 'পিতা! এরা ভীষণ অন্যায় করেছে, তাই আমি এদের প্রচণ্ড শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছি। আপনি আমাকে অস্ত্র সংবরণ করতে আদেশ করবেন না। এরা ব্রহ্মহত্যা করেছে, এদের আমি বধ করবই।' অবীক্ষিত দৃঢ়কণ্ঠে বললেন: 'ব্রাহ্মণরা নিহত হয়ে নরকে গেলেও তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে। তুমি অস্ত্র সংবরণ কর।' মরুত্ত তবু বিনীত হয়ে বললেন: 'পিতা! এই পাপীদের বধ না করলে আমাকেই নরকে যেতে হবে। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে অস্ত্র সংবরণ করতে বলবেন না।' অবীক্ষিত আবার বললেন: 'তারা আমার শরণাগত হয়েছে, আর ক্রোধ কর না, আমার কথা শোন।' মরুত্ত তবুও দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন: 'এই পাপিষ্ঠদের ক্ষমা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাজধর্ম বিসর্জন দিয়ে আমি আপনার কথা রাখতে পারব না, পিতা! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

অবীক্ষিত বার বার বলা সত্ত্বেও যখন মরুত্ত তাঁর কথা শুনলেন না, তখন তিনি গম্ভীর হয়ে

বললেন: 'এই পৃথিবীতে তুমিই একমাত্র অস্ত্রজ্ঞ নও। আমিও অস্ত্র পেয়েছি।' এই বলে তিনি কালাস্ত্র গ্রহণ করে ধনুকে যোজনা করলেন। তা থেকে যে-শিখা উদ্‌গত হল, তাতে সমুদ্র ও পর্বত ক্ষুভিত হল। মরুত্ত উচ্চৈঃস্বরে বললেন: 'পিতা! আমি দুষ্টের দমনের জন্য অস্ত্রধারণ করেছি, আপনার বধের জন্য নয়। তবে কেন আপনি আমার বধের জন্য অস্ত্রধারণ করলেন?' উত্তরে অবীক্ষিত বললেন: 'তোমার মা ও আমি শরণাগতের পরিত্রাণের সংকল্প করেছি, তুমি তাতে ব্যাঘাত করছ। হয় তোমাকে বধ করে তাদের পরিত্রাণ করতে হবে, না হয় আমাকে বধ করে তোমাকে তাদের বিনাশ করতে হবে। শরণাগতের রক্ষা করা ক্ষত্রিয় ধর্ম।' মরুত্ত দৃঢ়-কণ্ঠে বললেন: 'পিতা! তবে মনে রাখবেন, আপনি পিতা বা গুরু যাই হোন, প্রজাপালনের বিঘ্ন করলে রাজা নীরব থাকতে পারে না। স্বধর্ম পালন করা আমারও কর্তব্য।'

ভার্গবাদি মুনিরা দেখলেন যে, পিতাপুত্র উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে বধ করতে উদ্যত হয়েছে। তখন তাঁরা পিতাপুত্রের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং মরুত্তকে বললেন: 'পিতার প্রতি অস্ত্রধারণ করা পুত্রের কর্তব্য নয়।' অবীক্ষিতকেও বললেন, 'এই বীর পুত্রকে বধ করা তোমারও কর্তব্য নয়।' মরুত্ত মুনিদের বললেন: 'আমি রাজা, আমার ধর্ম দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন।' অবীক্ষিতও বললেন: 'আমি ক্ষত্রিয়, শরণাগতকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।' তখন মুনিরা বললেন: 'সাপেরা বলছে, যে-সব মুনিকুমার মারা গেছে, তারা তাদের বাঁচিয়ে দেবে। অতএব আর পিতাপুত্র বিবাদ করো না। উভয়ের ধর্ম রক্ষা হয়েছে।' এই সময়ে অবীক্ষিতজননী বীরা এসে পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন: 'মরুত্ত আমার কথায় এদের বধ করতে উদ্যত হয়েছে। এখন যদি মৃত মুনিকুমাররা জীবিত হন, তাহলে আমার কথা থাকবে এবং তোমার শরণাপন্নরাও বাঁচবে।' মরুত্তজননী বৈশালিনীও এসে বললেন: 'আমার কথায় আমার স্বামী শরণাগতদের রক্ষা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।'

নাগেরা মৃত মুনিকুমারদের ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়ে দিল। মরুত্ত পিতাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন। অবীক্ষিতও পুত্রকে আলিঙ্গন দান করে, প্রচুর আশীর্বাদ জানিয়ে জননী বীরাকে প্রণত হয়ে তাঁকে আশ্রমে রেখে স্ত্রী ও পুত্র সহ আবার রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

[মার্কণ্ডেয় পুরাণ দ্রষ্টব্য।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

'কিছু ভেবো না—নিরাশ হয়ো না'

"ভগবানকে নিজের সংসারে নিয়ে এস। তিনি আমাদের পরম আত্মীয়। সুখে-দুঃখে তাঁরই দিকে চেয়ে থাকবে। আন্তরিক হলে তাঁর সাড়া পাবেই।"

এ-কথা বলতেন স্বামী মাধবানন্দজী—পূজ্যপাদ নির্মল মহারাজ। তদানীন্তন মঠাধীশ মহারাজের সমীপে কত রকম লোকই না আসতেন—ভক্ত, জিজ্ঞাসু, সংসার-তাপিত, শোকার্ত! লোককল্যাণ ভাবনায় সর্বত্যাগী তাপসও কীরূপ বিচলিত হতেন, তা প্রত্যক্ষ দেখার ভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরাই অনুভব করে থাকেন—স্বামী মাধবানন্দ ছিলেন যেন এক সুবিশাল বটবৃক্ষ-স্বরূপ, যার শীতল ছায়াতলে সকলেরই হৃদয় জুড়াত। অতি সহজ সরল দু-চারটি মাত্র বাক্যেই মনের সর্বপ্রকার দ্বন্দ্বকে নিরসন করে দিতে, মিতভাষী এই সন্ন্যাসী ছিলেন বাস্তবিকই তুলনাহীন। তাঁর মুখের নিতান্ত

সাধারণ কথাতেও থাকত অপরিমেয় শক্তি ও প্রেরণা। বার বারই তাঁর মুখে শোনা যেত— "ভগবানকে নিজের করে নাও—যেন তোমার আর পাঁচজন আত্মীয়ের মতো। এইভাবে চল। আন্তরিকতা থাকলে এই জীবনেই তাঁর দর্শন পাবে।" সমীপাগত জিজ্ঞাসুদের প্রতি পূজ্যপাদ মাধবানন্দ মহারাজের অনুরূপ আরও কিছু উক্তি এখানে সংগ্রথিত হচ্ছে, যাতে তাঁর অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের আভাস সুপরিস্ফুট। কথাগুলি সবই ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন দিনের স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত। স্থান—বেলুড় মঠ। অধ্যাত্মপথের পথিক—গৃহী বা ত্যাগী সকলের জন্যই মাধবানন্দজীর আশ্বাস-বাণী ছিল এইরূপ :

"গীতায় আছে চার রকম ভক্তের কথা। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। আমাকে কতজনে কতরকমের চিঠি দেয়, কেউ বলে, আমার অমুক মারা গেছে আপনি আশীর্বাদ করুন যেন এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারি। কেউ বলে আমার ছেলেকে আশীর্বাদ করুন যেন সে ভালভাবে পাশ করতে পারে। এরা হল আর্ত, অর্থার্থী। আরও একটু উঁচুতে জিজ্ঞাসু,—আরও উঁচুতে জ্ঞানী।

"যারা সংসারে থেকে ঈশ্বরের উপাসনা করে তাদের খুব সাবধানে চলতে হয়। আর দেখ, সাধুজীবন হল পাহাড়ের নিচ থেকে উপর দিকে ওঠা—খাড়া চড়াই, খুব সাবধানে বুঝে-শুনে পা ফেলতে হয়। তা না হলে যে কোন মুহূর্তে পা ফসকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পা ফসকালে আর উপায় নেই, একেবারে নিচে পড়তে হবে। আবার সংসারে থাকা—তাও কি আর সোজা? তা যেন পাহাড়ের উপর থেকে নিচের দিকে নামা হচ্ছে—নামবার ইচ্ছা না থাকলেও কে যেন জোর করে ধাক্কা দিয়ে নিচের দিকে ঠেলে নামিয়ে দিতে চায়। এক্ষেত্রে আরও সাবধানতা প্রয়োজন। বিচার করে চলতে হয়।

"তাঁর জন্য একটুখানি করলে, তিনি অনেক-খানি দেখেন। তিনি বিন্দুতে সিন্ধু দেখেন। কেউ যদি তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে যায় তো তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন। তাঁর নাম জপ করতে ছাড়বে না। যথাসাধ্য চেষ্টা করে সময় করে নিতে হয়। ঈশ্বরের মতো আপনার জন কেউ নেই। আত্মীয়-স্বজনদের উপর একটুখানি বিরূপভাব থাকলেই তারা সব সময় চেষ্টা করে প্রতিশোধ নেবার জন্য। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট সব ক্ষমা।…তাই সংসারে খুব সাবধানে থাকতে হয়।

"গুড় জ্বাল দিতে দেখেছ? গাদকাটা জান? গুড় তৈরি করতে হলে অনেকক্ষণ ধরে গাদ ফেলে ফেলে তবে গুড় পাওয়া যায়। তারপর সেই গুড় থেকে চিনি—আবার পরে মিছরি—আরও সব কত কি! ঠিক তেমনি মনের ময়লা দূর করবার জন্য নির্জনে বসে বসে গাদ কাটো। শুদ্ধ মনেই ঈশ্বরের কৃপা অনুভব করা যায়—এ-বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু নেই। তোমরা নিঃসংশয় হও। তবে দেখ, ভগবান তো আর তোমার আমার অর্ডারে চলেন না—আমরা যা বলব, ঠিক তাই তিনি করবেন না। তাঁর ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে এবং হবে, এ-কথা ঠিক জেনো। যা করবার তিনিই করবেন। আমি তো ঠাকুরের কাছে জানাচ্ছিই তোমাদের জন্য—তোমরাও খুব প্রার্থনা কর।

"দেখ নদীতে যখন অনুকূল হাওয়া থাকে, তখন পাল তুলে দিয়ে, একটু দাঁড় টানলেই নৌকোখানা বেশ জোরে চলে। আবার যখন হাওয়া থাকে না, স্রোতেরও বেগ থাকে না—তখন খুব জোরের সঙ্গেই দাঁড় টানতে হয়। আবার এমন কখনও হয় যে, হাওয়া বাতাস নেই, নদীতেও উজান, গায়ের শক্তিতেও আর

জুলোচ্ছে না—তখন খানিকক্ষণ নোঙর করে বসে একটু জিরোতেই হয়। কিন্তু কিছু পরেই আবার পুরোদমে দাঁড় টেনে যেতে হবে—নচেৎ দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেই থাকতে হবে। হাল কিন্তু কোন অবস্থাতেই ছাড়লে চলবে না। মন যখন নিজেই ভগবানের দিকে যাবে, তখন সাধন-ভজন একটু আধটু কম হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু মনের সে অবস্থা যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুতেই ছাড়বে না। তাঁর নাম জপ, স্মরণ-মনন-ধ্যান যথাসাধ্য করবেই।

"ধ্যান অভ্যাস করতে করতে মনে স্থিরতা আসবে। তবে প্রথম প্রথম মনে চঞ্চলতা তো থাকবেই, তার জন্য কিছু ভেবো না,—নিরাশ হয়ো না। নিরাশ হবার কিছু নেই। ঠাকুরের কথামৃত পড়তে থাক, তাতে খুব আশার কথা আছে। মাস্টার মশায়ের অর্থাৎ শ্রীম-এর সাথে মেশবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তা তিনি আমায় বলেছিলেন,—'আমি সত্যসত্যই বলছি—শ্রীশ্রীঠাকুরের যে বাণী তা খুবই আশাপ্রদ। এতে বিন্দুমাত্রও নিরাশ হবার কিছু নেই।'"

জ্ঞান-বিজ্ঞান

পরিবেশ দূষণ

প্রতি বছরের জুন মাসের ৫ তারিখ বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার তরফ থেকে প্রতিপালন করা হয় "বিশ্ব পরিবেশ দিবস" হিসাবে। কিন্তু ঐ একটি দিন প্রতিপালন করলেই কি পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে? এর জন্য চাই সরকার ও জনসাধারণের মিলিত নিরন্তর প্রয়াস।

পরিবেশ বলতে কী বুঝি? যা আছে মানুষের শরীরের বাইরে তাকে বাইরের পরিবেশ বলতে পারি—এর মধ্যে ভৌত (physical) পরিবেশকেও ধরা হয়। শরীরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে আন্তর পরিবেশ বলা যেতে পারে। মানসিক রোগও ভিতরের পরিবেশ। আরও আছে—সামাজিক পরিবেশ—পারিপার্শ্বিকতা—যার মধ্যে সংস্কৃতি ও রাজনীতিও সংযুক্ত।

তবে, মূলতঃ এ আলোচনা ভৌত পরিবেশ নিয়ে যা মানুষের স্বাস্থ্যকে আঘাত করে। এর মধ্যে তিনটি প্রধান—বাতাস, জল ও মাটি। সবই এখন দূষিত। সুপেয় জল আমাদের কতজনের ভাগ্যে জোটে? স্যানিটারী শৌচাগার কজনের বাড়িতে আছে? ৮০% শহরের ও ২০% গ্রামের লোককে ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্যানিটারী শৌচাগারের সুযোগ দিতে গেলে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই বিনিয়োগ করতে হবে ১৩৩৪ কোটি টাকা! সমস্যা কত গভীরে, সহজেই তা বোঝা যায়। গত পঁয়ত্রিশ বছরেও যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করার অভ্যাস আমাদের জাতি ছাড়তে পারেনি। কত পিছিয়ে আমরা!

আধুনিক কলকারখানা থেকে কতরকমের বর্জ্যপদার্থ মিশছে নদীনালায়,—ধোঁয়া, গ্যাস, অ্যাসিড ও নানাধরনের ক্ষতিকারক খনিজ পদার্থ সমূহ। কারখানা-ধোওয়া নোংরা তরল পদার্থে থাকে সায়ানাইড, তামা, দস্তা, সিসা, পারদ প্রভৃতি। সবগুলোই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। এসব পদার্থ মাছ, পাখি ও অন্যান্য জন্তুও খায়। তাদের কোষকলায় যায়। ঐ মাছ, পাখি, জন্তু খেলে মানুষের কোষকলাতেও সঞ্চিত হতে পারে ঐ পদার্থগুলি।

সিসা থাকে সামান্য পেট্রোলে,—এতে এঞ্জিনের ক্ষয় নাকি কম হয়। কিন্তু যে ধোঁয়া বেরোয় মটরগাড়ি থেকে, তার মধ্যে থাকে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও সিসা—যা মানুষের শরীরের ক্ষতি করে। বিশেষ করে ফুসফুসের নানা রোগ ডেকে আনে। তা ছাড়াও

বাতাসের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়ে এগুলো, ক্ষতি করে মাঠের ফসলের, ক্ষতি করে জীবজন্তুর। নষ্ট হয় প্রাণী, গাছপালা।

হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, হাসপাতালে ভর্তি প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের অসুখের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী পরিবেশ দূষণ।

আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানে নানা কীটনাশক দ্রব্য আকছাড় ছড়ানো হয়। DDT ও অন্যান্য কীটনাশক এইভাবে খাবারে মেশে, আবহাওয়া ও পরিবেশ দূষিত করে—মানুষের খাবারে মেশে বিষ। খাদ্যশৃঙ্খল (food chain)-এর ভিতর দিয়ে বিভিন্ন প্রাণীর অস্তিত্বের ভারসাম্য নষ্ট করে। অবশ্য ঠিকমতো ব্যবহার করলে ম্যালেরিয়ায় এখনও কোন কোন এলাকায় DDT কার্যকর। জনস্বাস্থ্যপ্রকল্পে DDT ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা কম।

বন কেটে বসত তৈরি হচ্ছে। ফলে বাড়ছে মরুভূমি। গাঙ্গেয় উপত্যকায় যে বিধ্বংসী বান আসছে ইদানীং, অনেকে তার কারণ হিসাবে বলছেন হিমালয়ের বন নিশ্চিহ্ন হওয়া।

আমাদের নিজেদেরও সজাগ হতে হবে। গাছ ভালবেসে গাছ লাগাতে পারি। সত্যিই একটি গাছ একটি জীবন। আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি—মশা মাছি কম হবে। সজাগ থাকতে পারি বন কাটার বিরুদ্ধে। কলকারখানা যাদের, তাদের বাধ্য করতে পারি বর্জ্যপদার্থ যাতে ঠিকমতো সরিয়ে ফেলা হয়, মানুষের স্বাস্থ্য বাঁচিয়ে। যেখানে সেখানে মলত্যাগের অভ্যাস ছাড়তে পারি। শব্দ দূষণের হাত থেকেও নিজেরাই অনেকটা বাঁচতে পারি গাড়ির হর্নের শব্দ কমিয়ে, লাউড্ স্পীকারের ব্যবহার সীমিত করে। জনস্বাস্থ্যশিক্ষার প্রসার ও প্রচার পরিবেশ দূষণ দূর করতে একটি বড় ভূমিকা নেয়।

জীবনকে ভালবাসলে পরিবেশ ভালবাসতে হবে। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন না থাকলে জীবনকে ভালবাসা যায় না।

দেশ-বিদেশ

অরুণাচলের অধিবাসী : তাগিং

সিয়াং জেলার একাংশ সুবনসিরি ও ডিহাং নদীর মধ্যে এবং অপর অংশ ডিহাং ও ডিবাং নদীর মধ্যে অবস্থিত। তাই এই জেলাটি দুভাগে বিভক্ত। ডিহাং বা সিয়াং নদীর নাম অনুসারে এই জেলার নামকরণ হয়েছে সিয়াং। সিয়াং-এর চারিপাশে সারি সারি খাড়া পর্বতচূড়া। ডিহাং নদীর উপত্যকার উচ্চতা ১২১৯ মিটার। অবশ্য মাঝে মাঝে এর থেকে কিছু নিচু উচ্চতার পাহাড়ও আছে। এই জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চল ৩০৪৮ থেকে ৪২৬৭ মিটার উচ্চ।

সিয়াং-এ বিভিন্ন উপজাতিদের বাস। তাদের মধ্যে তাগিং একটি উপজাতি। দাপোরিজো মহকুমাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে এই তাগিং উপজাতিরা বসবাস করে। দাপোরিজো কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সুবনসিরি জেলার মধ্যে ছিল, বর্তমানে এটি সিয়াং-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাগিং-এর লোকসংখ্যা ২৪,৫২৪, তার মধ্যে ২২৭ জন কামেঙ জেলায় এবং কিছু সুবনসিরি জেলায় বাস করে। সবথেকে বেশি বসবাস করে দাপোরিজোতে।

তাগিংরা বাড়ি তৈরি করে পাহাড়-আচ্ছাদিত ঢালু জায়গায়—প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পিছন থেকে হঠাৎ শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তাদের বাড়ি দেখতে প্রায় দফ্‌লা ও আপ তানি উপজাতিদের মতো। অবশ্য তাদের থেকে কিছু বৈশিষ্ট্যও চোখে পড়ে। তাগিংরা বাড়ি মাটি থেকে সোজা তোলে। শুহার দিকের

অংশ তিন ফুটের মতো উঁচু এবং গুহার বাইরের অংশটি মাটি থেকে সোজা কুড়ি ফুটের উপর উঁচু। বাড়ির এক দিকেই দু-তিনটি দরজা থাকে।

তাগিংরা দফ্‌লা উপজাতিদের মতো গ্রামের মধ্যে বিচ্ছিন্ন এবং নিঃসঙ্গ হয়ে বাস করে। আদি উপজাতিদের মতো তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতা নেই। তাদের মতো সুগঠিত মন্ত্রণাসভাও নেই তাগিংদের।

তাগিং উপজাতিদের একান্নবর্তী পরিবার বলা যেতে পারে। কারণ তারা অনেক পরিবার একসঙ্গে একটি বাড়িতে একই পরিবারের মতো থাকে। তারা বিশ্বাস করে, এক পূর্বপুরুষ থেকে তাদের উৎপত্তি। বাড়ির প্রবীণ ব্যক্তিই পরিবারের কর্তা হয়।

তাগিংরা পোশাক-পরিচ্ছদ বেশি পছন্দ করে না। মনে হয়, তারা বয়নশিল্প জানে না বলে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে পরতে পারে না। এই অঞ্চলে আপ তানি ও আদি উপজাতিরা শুধু বয়নশিল্প ভাল জানে, তাই তাদের পোশাকও ভাল। তাগিংরা 'এন্‌ডি' নামে এক টুকরো তিব্বতীয় কম্বল গায়ে জড়িয়ে রাখে—এতেই তাদের পোশাকের সমস্ত প্রয়োজন মিটে যায়। নিম্নাঙ্গের জন্য প্রায় কিছুই পরে না বলা যেতে পারে। শুধু একটুকরো কাঠ, বাঁশ অথবা ধাতব পদার্থ বেতের বেল্ট দিয়ে কোমরে বেঁধে রাখে। যে অংশ নিচের দিকে ঝুলতে থাকে তাতেই তাদের শরীরের গোপনীয় অংশ ঢেকে যায়।

পূর্বে এই জেলার উচ্চ-অঞ্চলের তাগিংরা বাইরে থেকে তিব্বতীয় কম্বল নিয়ে এসে ব্যবহার করত। তিন থেকে পাঁচটি শূকরের বিনিময়ে তারা টেকসই ও মজবুত সাদা, গাঢ় তাম্রবর্ণের ডোরা-কাটা কম্বল ক্রয় করত। নিম্ন-অঞ্চলের তাগিংরা সিয়াং থেকে এনে পরত হাত-কাটা কালো কোট। মাঝে মাঝে তারা একধরনের তুলার কম্বলও গায়ে জড়াতো যার দু-প্রান্ত রঙিন ডোরাকাটা।

মেয়েদের সাজপোশাকের জন্যও বিশেষ কিছু নেই। তারা ব্যবহার করে উলের কম্বল। কম দামের জন্য তারা দু-প্রান্তে রঙিন ডোরা-কাটা তুলার কম্বলও ব্যবহার করে। অবিবাহিত মেয়েরা তিব্বতীয় ধরনের গাঢ় তাম্রবর্ণের টুপি মাথায় দেয়। 'বেকার' নামে ঘাসের ঘাগরা পরে তারা। তবে বর্তমানে এই 'বেকারে'র পরিবর্তে তারা এখন প্রতিবেশী উপজাতিদের মতো মিলের তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদ পরছে। তাদের মধ্যে আবার কারো কারোকে রঙিন ফুল-কাটা শাড়ী প্রয়োজনমতো কেটে পরতেও দেখা যায়।

তাগিং-ছেলেরা মাথায় বেতের টুপি ('বোটুং') পরে। বেতের টুপি ছাড়া তারা মিথন বা হরিণের চামড়ার তৈরি টুপিও পরে। টুপির পিছনের অংশের সঙ্গে অতিরিক্ত চামড়া জুড়ে ঘাড় ঢেকে রাখে তারা। এর ফলে পিছন দিক থেকে শত্রু হঠাৎ ঘাড়ে অথবা মাথায় সহজে আঘাত করতে পারে না। তারা চুল মাথায় ঝুঁটি না বেঁধে পিছনের দিকে লম্বা ছেড়ে দিয়ে রাখে। চুল বাঁধার কৌশল ভাল না জানায় তারা এই রকম পিছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখে। মাথায় যখন প্রচণ্ড উকুন হয় তখন তারা সব চুল কেটে ফেলে। ছেলে-মেয়ে-শিশু সবাই তখন মাথা কামিয়ে ফেলে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে শুধু এক গুচ্ছ চুল ('দুমি-মুচুম') রেখে দেয় মাথার মাঝখানে।

তাগিং-ছেলেমেয়ে উভয়েই পুঁতির বিভিন্ন রঙবেরঙের মালা পরতে ভালবাসে। যুবকরা কানে হরিণের লোমের দুল পরে। মেয়েরা রূপা বা অন্য কোন ধাতুর তৈরি দুল পরে কানে। মেয়েদের দুল দেখলে মনে হয়, ছোট ফুলদানি পরেছে কানে। সব বয়সের মেয়েরা ধাতুর বালা পরে। 'কোটে' নামে তামার বালা তারা সাধারণত উৎসবাদিতে পরে। এটি তাদের কাছে

খুব মূল্যবান গহনা। তাগিং-ছেলেমেয়ে উভয়েই দফ্‌লা, মিরি ও আপ তানি উপজাতিদের মতো কোমরে বহু সরু সরু বেতের বেড় দিয়ে রাখে। এছাড়াও ছেলেরা কড়ি দিয়ে সজ্জিত বেল্ট ('তাইএন্') পরে। মেয়েরা ছোট ছোট ধাতুর চাকতি কোমরে পরে।

তাগিং-পুরুষরা কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত প্রায় একফুট বেত দিয়ে আবৃত রাখে। এটাকে জন্তু জানোয়ারের লোম দিয়ে সুন্দরভাবে সাজায়। এর নাম 'লাগ্‌বুইথ'। যোদ্ধাদের এটি একটি অপরিহার্য সজ্জা, কারণ শত্রুপক্ষের তরবারির আঘাত 'লাগ্‌বুইথ' দিয়ে প্রতিহত করে।

তাগিং-স্ত্রী-পুরুষ যখন মাঠে কাজ করে তখন তাদের অল্প পোশাকও খুলে ফেলে। মেয়েরা শুধু ঘাসের ঘাগরা পরে থাকে। পুরুষরা যখন মাঠে কাজ করতে যায়, তখন বেল্টের সঙ্গে একটি ছোট ঝুড়ি ('মাহ্‌') নিয়ে যায়। এই ছোট ঝুড়ির মধ্যে করে আগুন নিয়ে যায়। এই আগুন থেকে যে ধোঁয়া বের হয়, তাতে 'ডামডিম' নামে ছোট ছোট বিষাক্ত হুলযুক্ত পোকা তাদের কাছে আসতে পারে না। ফলে তাদের কামড়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায় তারা। তাদের পাইপে আগুন ধরাবার কাজেও এই আগুন ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আগুনের কাজ শেষ হয়ে গেলে এই ঝুড়িটি উলটিয়ে তার উপর বিশ্রামের জন্য তারা বসে।

তাগিংরা আপ তানি ও আদি উপজাতিদের মতো ভাল চাষবাস করতে পারে না। বছরের ছ-মাস তারা বন্য গাছের ছাল বা শিকড় খেয়ে বেঁচে থাকে। এতে তাদের শরীর খারাপ করে তবু বেঁচে থাকার তাগিদে তাদের এই অখাদ্য খেতে হয়। পাহাড়ী জমি দেখেশুনে তাদের চাষ করতে হয়। সব জমিতে সব রকম ফসল হয় না। তারা চাষ করে ধান, ভুট্টা, বীন, পেঁয়াজ, রসুন, শাক, লঙ্কা, আদা, তামাক প্রভৃতি। জমি চাষ করে তারা ছ-মাসের খাদ্য সংগ্রহ করে। তাই খাদ্যের জন্য তাগিংদের অনেকখানি নির্ভর করতে হয় শিকারের উপর।

তাগিং উপজাতিরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সমাজে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী এই শ্রেণী-বিভাগ হয়ে থাকে। সমাজের সবথেকে পদমর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণী হল পুরোহিত সম্প্রদায় ('নিবু')। তারপর 'নিতে' (ধনী সম্প্রদায়), 'ওপেন্' (দরিদ্র সম্প্রদায়) এবং সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর (ক্রীতদাস) মানুষ হল 'ন্যাইরা'। মধ্যবিত্তদের 'জেটোর' বলে। পুরোহিতরা সবার শ্রদ্ধার পাত্র। তারা অপদেবতাদের ('ওরাম্') সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে দেয়। তারা নানাবিধ অনুষ্ঠান করে সাধারণ মানুষের অসুখ-বিসুখ ভাল করে দেয়।

দরিদ্র মানুষ ধনীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। কারণ চাহিদা অনুযায়ী বিবাহের পণ দিতে তারা সক্ষম হয় না। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এখানে বেশি। যারা দক্ষ শিকারী তাদের 'নিগোম্' বলে। তারা সমাজে বিশেষ মর্যাদা পায়। তবে তাদের আলাদা শ্রেণী বলে পুরোহিতরা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে না।

'ন্যাইরা' (ক্রীতদাস) মনিবকে বাবা ('আবো') অথবা দাদা ('আচি') বলে সম্বোধন করে। মনিবের বাবাকে 'আতো' বলে। ক্রীতদাসরা ক্রীতদাসের মেয়ে বা ছেলে ছাড়া বিবাহ করতে পারে না। যদি কোন মনিব নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়, তাহলে ক্রীতদাস মনিবের সমস্ত সম্পত্তি পায় এবং তার স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। তবে এইরকম ঘটনা খুবই কম ঘটে।

তাগিংরা জমি বিক্রি করাকে অশুভ মনে করে। তারা বিশ্বাস করে, জমি বিক্রি করলে জমির অধিষ্ঠাতা অপদেবতা ('গিদা তারু') খুব অসন্তুষ্ট হয়। কারো কোন জমির দরকার হলে বাড়ি

তৈরি বা চাষ-আবাদ করার জন্য গ্রামবাসীরা বিনামূল্যে জমি দিয়ে দেয়।

তাগিং-ছেলেদের বিবাহ হয় সাধারণত ১৬/১৭ এবং মেয়েদের ১৪/১৫ বছর বয়সে। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা শুধু বহু বিবাহ করতে পারে।

তাগিংরা প্রধানত অপদেবতাদের পূজা করে। কারণ তারা বিশ্বাস করে, অপদেবতারা অসন্তুষ্ট হলে তাদের রোগব্যাধি এবং হঠাৎ বিপদাদি হয়। তাই তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তারা তাদের উদ্দেশে বলি দেয়। তাদের সর্বশক্তিমান দেবতারা হলেন সূর্য-চন্দ্র (ডেইনি পোল্)। এই দেবতা কল্যাণ ছাড়া কারোর কোন ক্ষতি করেন না। 'ডেইনি' মানে (সূর্য) স্ত্রী এবং 'পোল্' (চন্দ্র) পুরুষ-দেবতা। 'ঘুলো'র (বিবাহ-অনুষ্ঠানের) সময় তারা 'ডেইনি'র নামে শপথ গ্রহণ করে। তারা মনে করে, এই দেবী তাদের বিবাহের সম্পর্ক সুদৃঢ় এবং নবজাত শিশুর ভাগ্য নির্ধারণ করেন। অনেক অপদেবতা আছে তারা মঙ্গল করে, কিন্তু একবার যদি কারোর উপর অসন্তুষ্ট হয় তাহলে তার সাংঘাতিক ক্ষতি করে।

তাগিংরা মিরি প্রভৃতি প্রতিবেশী উপজাতিদের মতো মৃতদেহ মাটিতে কবর দেয়।

মেম্বাস্ ও খাম্বাস্ এই দুই উপজাতি বাস করে সিয়াং জেলার 'যাং সাং চু' ও 'গেলিং' উপত্যকায়। এই উপজাতিরা কামেঙ জেলার মোন্‌পাদের মতো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। মোন্‌পাদের থেকে সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা নিম্নমানের।

সিয়াং ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা শিখিয়ে উন্নত নাগরিক করে গড়ে তুলতে রামকৃষ্ণ মিশন এই জেলার আলঙে একটি শাখাকেন্দ্র ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে খুলেছেন।

মিশনের স্কুলটি ইংরেজী মাধ্যমের হাইস্কুল। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৮২৭ একটি ছাত্রাবাস আছে, তাতে ২০০ জন ছাত্র থাকে। আর বাকী সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে স্কুলের বাসে করে বিভিন্ন গ্রাম থেকে স্কুলে নিয়ে আসা হয়। ইংরেজী ছাড়া এখানে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা শেখানো হয়। পরীক্ষার ফল প্রতি বছরে ভাল হয়। এই বছরে সর্বভারতীয় মধ্যশিক্ষা পরিষদের পরীক্ষায় এই স্কুলের একটি ছাত্র অরুণাচলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম এবং সারা ভারতে ১৮শ স্থান অধিকার করেছে। ৯৫% ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। গত চার বছর ধরে প্রায় ১০০% প্রথম বিভাগে পাশ করে আসছে।

ছাত্রছাত্রীদের জীবিকানির্বাহের জন্য ছুতোর মিস্ত্রির কাজ, গো-পালন, টাইপ-রাইটিং, মুরগী-পালন, অঙ্কনশিল্প প্রভৃতি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে শেখানো হয়। শারীরিক উন্নতির জন্য জিম্‌ন্যাসটিক, ফুটবল, ক্রিকেট, টেবিল-টেনিস প্রভৃতি খেলাধূলার চর্চাও নিয়মিত হয় ঐ বিদ্যালয়ে।

মিশনের ছাত্রাবাসে নানা ধর্মাবলম্বী ছাত্ররা থাকে। তারা যাতে একে অপরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে এবং পরস্পর প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান করতে অভ্যস্ত হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। তাই ছাত্রাবাসের প্রার্থনাঘরের বেদীতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, যীশু, বুদ্ধ ও গুরু নানকের ছবি বসানো আছে। জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতির মূল্যবোধ ছাত্রছাত্রীদের মনে জাগ্রত করার উপযোগী নানা ধরনের ব্যবস্থাদি করা হয়েছে—চলচ্চিত্রাদিও দেখানো হয়ে থাকে এই উদ্দেশ্যে। আশপাশের অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যেও জাতীয় সংহতি ও সংস্কৃতিমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

আলঙ রামকৃষ্ণ মিশনের ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় দুঃস্থ গ্রামবাসীদের চিকিৎসাকার্যে নিরত। বিভিন্ন দুর্বিপাকের সময়ে তাদের মধ্যে ত্রাণকার্যও করা হয় মিশনের তরফ থেকে।

সিয়াং এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনুন্নত উপজাতিদের অর্থনৈতিক, মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সব সময় এইভাবে চেষ্টা করে চলেছেন।

সমালোচনা

দেশ কোন্ পথে ?—ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। প্রকাশক: সবিতা মিশন, শ্রীমন্তপুর, কলিকাতা-৫১। প্রাপ্তিস্থান: ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী, ৫৬ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা: ৮+৬৬; মূল্য: পাঁচ টাকা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে ভারতবর্ষের জনজীবনের সার্বিক ক্রমাবনতি এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছিয়েছে যা নিয়ে দেশের সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল মানুষ আজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'দেশ কোন্ পথে' পুস্তকে এই অবনতির কারণগুলি আলোচনা করেছেন। এই জাতীয় বেশির ভাগ আলোচনাই সাধারণত হয়ে পড়ে তাত্ত্বিক বা বিশেষ কোন মতবাদভিত্তিক। কিন্তু 'দেশ কোন্ পথে' পুস্তকটি একটি ব্যতিক্রম। দেশের ক্রমাবনতি ও অবক্ষয়ের বাস্তব ও যথার্থ কারণগুলিরই আলোচনা করা হয়েছে এই পুস্তকে—যা কোন বিশেষ মতবাদভিত্তিক বা তাত্ত্বিকতার ধোঁয়ায় আবৃত নয়। এ-ধরনের অন্যান্য রচনার সঙ্গে এই রচনার এটি মৌলিক পার্থক্য। এটা সম্ভব হয়েছে মূলতঃ দুটি কারণে: প্রবীণ লেখক ব্যক্তিগত জীবনে একজন দক্ষ প্রশাসকরূপে অতি উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনের সঙ্গে দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সেইসঙ্গে অনুসন্ধানী ও বিচারশীল মনের অধিকারী। প্রশাসনের অভিজ্ঞতা ও বিচারশীল চেতনা—এই দুইএর সংযোগের ফলে তিনি যা রচনা করেছেন তা আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্যাসংক্রান্ত একটি মূল্যবান দলিল।

পুস্তকটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি 'প্রশাসনের অধোগতি', দ্বিতীয় অংশটি 'মুদ্রাস্ফীতি এবং সর্বনাশা অর্থনীতি'। জাতীয় জীবনের সাম্প্রতিক সঙ্কটের আলোচনায় এই দুটি বিষয়ই অপরিহার্য।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী নেতাদের ভ্রান্তনীতি ও দেশের মানুষের স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাঁদের শোচনীয় ব্যর্থতা দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে নিরন্তর এর বিপরীত মেরুর দিকেই নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির উত্তেজনায় প্রারম্ভিকপর্বে তা ধরা পড়েনি। তা প্রকট হয়েছে কালক্রমে।

অবিবেচনাপ্রসূত আইন-প্রণয়ন থেকে শুরু করে, প্রশাসনিক কার্যে কুশলতার অভাব কুশাসনের মূল কারণ। সরকারী কর্মচারী ও ধর্মঘট, ব্যুরোক্রেসি, ভ্রান্তনীতি এবং সাধারণভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয়—লেখক তাঁর আলোচনায় কোন প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গই বাদ দেননি। দ্বিতীয় অংশে অর্থনৈতিক কারণগুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি, জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয়, সরকারের অনুসৃত অপব্যয়ী নীতি, কল্যাণরাষ্ট্র ও প্ল্যানিংএর প্রহেলিকা. রাজ্যসরকারগুলির অমিতব্যয়িতা, দেউলিয়া অর্থনীতি ও ট্যাক্সের শোষণ ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয় অত্যন্ত স্বল্পপরিসরের মধ্যে বিরল দক্ষতার সঙ্গে লেখক আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে দেশের সাধারণ মানুষের নানা জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। মুদ্রাস্ফীতির মতো জটিল বিষয়কেও তিনি যে কোন মানুষের পক্ষে সহজবোধ্য করে তুলেছেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক জটিল পরিভাষার পরিবর্তে সহজবোধ্য পরিভাষার ব্যবহার লেখকের আর একটি অসাধারণ কৃতিত্ব।

সমস্যার মূল উৎসগুলি নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখা এবং তা সাহসিকতার সঙ্গে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য শ্রদ্ধেয় লেখক দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন।

পুস্তকের প্রচ্ছদ ও ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও

শোভন। আয়তনে বড় না হলেও, বিষয়-গাম্ভীর্যে পুস্তকখানি নিঃসন্দেহে গুরুত্ব বহন করে। এর বহুল প্রচার বিশেষ প্রয়োজন।

—শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী

শিল্পায়তন পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ১৯৮৩। প্রকাশক : রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পায়তন, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃঃ ১৩৮+১২+ইংরেজী ১৪ পৃষ্ঠা।

'শিল্পায়তন পত্রিকা' রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পায়তন (জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুল)-এর প্রথম প্রকাশিত মুখপত্র। মনে হয় অতঃপর এটি বাৎসরিক পত্রিকা হিসাবেই প্রকাশিত হতে থাকবে। অষ্টম মানোত্তীর্ণ ছাত্রদের তিন বৎসর জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাদানের জন্য ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হয় এই শিল্পায়তনের। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের অন্তর্গত যে শিক্ষা সংস্থাগুলি আছে, যেমন বিদ্যামন্দির, শিক্ষণমন্দির, তত্ত্ব-মন্দির, শিল্পমন্দির, জনশিক্ষা মন্দির প্রভৃতি,—এই শিল্পায়তন তাদেরই অন্যতম।

এই শিল্পায়তন রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই পত্রিকাটিতেও মামুলী 'স্কুল ম্যাগাজিন' অপেক্ষা কিছু অসাধারণত্ব এবং অনেক বিশেষত্ব ফুটে উঠেছে। তাছাড়া, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর বাণীসম্বলিত এবং পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহারাজের আশীর্বাণীপূত হওয়াতে পত্রিকাখানি যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্নও হয়েছে।

পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধ ও কবিতা বেশ উচ্চমানের; স্থানাভাবের জন্য তাদের আলাদা করে উল্লেখ করা হল না। বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধের আধিক্য এবং তাদের কয়েকটির বিষয়-বস্তুর আধুনিকত্ব এই ধরনের পত্রিকার পক্ষে খুবই উপযোগী হয়েছে। কিশোর ছাত্রদের লেখাগুলি তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বহন করে। এরা টেক্‌নিক্যাল-ছাত্র হয়েও, সাহিত্যের চর্চাতেও উদাসীন নয়—এটা খুবই আশার কথা। ছাত্রদের মননপ্রিয়তা অভিনন্দনযোগ্য। 'বিবেকানন্দ প্রশস্তি'র উদ্ধৃতিগুলি সুনির্বাচিত। প্রতিষ্ঠানের পূর্বতন সেক্রেটারি বা কর্মসচিবগণ সম্বন্ধে আলোচনা এবং তাঁদের কারও কারও লেখা পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট করায় সম্পাদকের মানসিকতা প্রশংসনীয়। স্বামী অজজানন্দের 'কোথায় পাব তাঁরে' স্বামীজী-বিষয়ক উদ্দীপনাকর কাহিনী ও বর্ণনাভঙ্গি খুবই চিত্তাকর্ষক। স্বামী স্মরণানন্দের দেওয়া ছাত্রদের স্মরণীয় ও পালনীয় উপদেশগুলির মধ্যে একটি খবরের বহুল প্রচার আজ বিশেষ দরকার সেটি হচ্ছে, শিল্পায়তনে 'র‍্যাগিং'-এর বদলে নবাগতদের কি মনোরম পরিবেশে বরণ করে লওয়া হয়। শ্রীমৃণালকান্তি মজুমদারের প্রবন্ধের মন্তব্যগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার যোগ্য। স্বামী সর্বদেবানন্দ শিল্পায়তন সৃষ্টির যে সুন্দর নাতিদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, সেটি না থাকলে মঠ মিশনের বাইরের পাঠকদের এই শিল্পায়তন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা কঠিন হত। স্বামীজীর চিত্রসমন্বিত গৈরিক প্রচ্ছদ পত্রিকার ভাব ও আদর্শকে সহজেই ব্যক্ত করে। পত্রিকামধ্যে প্রকাশিত আলোকচিত্রগুলি শিল্পায়তনের ছাত্রদের দৈনন্দিন শিক্ষাচর্যাকে সম্যক্ বুঝতে সহায়তা করে। এমন সুন্দর একখানি পত্রিকা—কিন্তু এতেও মুদ্রণত্রুটি বেশ চোখে পীড়া দেয়। কয়েকটি ছাপার ভুল মারাত্মক ধরনের। উদাহরণ স্বরূপ ১৩৭ পৃষ্ঠায় "পরে দুই বৎসর (১৯৮৬-৮৭) সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই কোর্সে ভর্তি বন্ধ থাকে।"

আমরা এই পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

—ডক্টর জলধিকুমার সরকার

শ্রীশ্রীগুরুগীতা (বঙ্গানুবাদ)—গ্রন্থকার ও প্রকাশক : শুভেন্দু কিশোর সেন চৌধুরী, ৬৯৮/জি, ব্লক পি, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৭০০০৫৩। পৃঃ ৩৪, দাম : ১ টাকা।

সাধক নিশিকান্ত বসু (সংক্ষিপ্ত জীবনী) —শুভেন্দু কিশোর সেন চৌধুরী। প্রকাশক : শ্রীপ্রশান্তকুমার সেনগুপ্ত, ১০/৩৮/ডি, চারু এভেনিউ, কলিকাতা-৭০০০৩৩। পৃঃ ৬৪+৬, দাম : তিন টাকা।

প্রথম পুস্তিকাটি শ্রীশ্রীগুরুগীতার বাংলা অনুবাদ—কবিতার ছন্দে লেখা। গুরুগীতার মতো অবশ্যপাঠ্য একটি সংস্কৃত গ্রন্থের ছন্দোবদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশের প্রয়াস প্রশংসার্হ এবং নিঃসন্দেহে জনকল্যাণকর।

মায়াচ্ছন্ন জীবকে সংসার-মায়ার পারে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন মায়াতিগ কোন শক্তির। এই শক্তিই গুরু বা গুরুশক্তি। গুরুর কথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'গুরু যেন সেথো, হাত ধরে নিয়ে যান।' স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'গুরুর সহায়তা ব্যতীত কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়। ...গুরু ব্যতীত সাধন ভজন কিছু হতে পারে না।' বেদে আছে, গুরুপূজা সাধনার প্রাথমিক কর্তব্য।

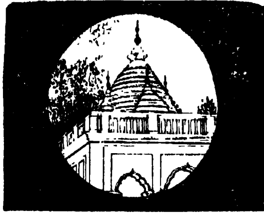
গুরুপূজার গুরুত্ব উপলব্ধির বিষয়। চিত্তে গুরুতত্ত্বের স্বতঃস্ফুরণের জন্য, গুরুর প্রতি অটল শ্রদ্ধা, গুরুবাক্যে অপার বিশ্বাস প্রভৃতি সদ্‌গুণের পূর্ণ বিকাশের জন্য গুরুগীতা পাঠের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। গুরুগীতায় দেবাদিদেব শঙ্কর ভগবতী পার্বতীকে বলছেন, 'গুরুগীতাক্ষরৈকৈকং মন্ত্ররাজমিদম্'—গুরুগীতার এক একটি অক্ষর এক একটি শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

বেশ কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ মূলানুগ বা যথাযথ না হলেও ছন্দে অনুবাদ করার মতো দুরূহ কাজ গ্রন্থকার প্রশংসনীয়ভাবেই সমাধা করেছেন। ছন্দের খাতিরে বা অপর কোন কারণে মূলগীতার ক্রমপর্যায় সবসময় রক্ষা করা হয়নি এবং দু-তিনটি শ্লোকের অংশমাত্র অনুবাদ করা হয়েছে। ফলে মন্ত্রগুলির গাম্ভীর্য কিছুটা ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয়। পুস্তিকার শেষাংশে কয়েকজন মহাপুরুষের গুরুতত্ত্ববিষয়ক উপদেশগুলির সংযোজন পুস্তিকাটির আকর্ষণ ও উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছে।

অপর গ্রন্থটিও একই গ্রন্থকারের রচনা। তিনি তাঁর গুরুদেব নিশিকান্ত বসুর জীবনালেখ্য গ্রন্থনে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। নিশিকান্ত বসুর ছোটবেলার স্বপ্ন 'বড় হব' কিভাবে বাস্তব রূপ নিল—বর্ণনাটি খুবই চিত্তাকর্ষক। তাঁর দীক্ষোত্তর জীবনের চিত্রটিও গ্রন্থকার বেশ নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। তবে উল্লেখ্য, অলৌকিক ঘটনার ভারে রচনাটি যেন একটু বেশিরকম ভারী হয়ে উঠেছে। 'কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই অণিমাদি সিদ্ধাই, একটিও থাকলে ঈশ্বর লাভ হয় না; একটু শক্তি বাড়তে পারে।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—৪র্থ ভাগ, ৭ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)।

উপরি-উক্ত দুটি গ্রন্থেই ত্রুটিপূর্ণ বানান, বিশেষ করে 'ন' ও 'ণ'-এর অপপ্রয়োগ খুবই অস্বস্তিকর। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

—শ্রীপ্রভাতকুমার বিশ্বাস



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণ ও পুনর্বাসন

অন্ধ্রপ্রদেশে বন্যাত্রাণ: গত ১০ অক্টোবর, ১৯৮৩ হইতে বিশাখাপট্টনম্ আশ্রম পূর্ব গোদাবরী জেলার পিথপুরম্ অঞ্চলে ত্রাণকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীরঙ্গপট্টনম্ গ্রামের ৪০০ পরিবারের মধ্যে ৪০০ কিলোগ্রাম চাল ছাড়াও উপ্পারাপাড়া, এমুকাপালম্ ও নাগুলাপল্লী গ্রামের ২৯৭টি পরিবারের মধ্যে ৩০০ খানা ধুতি ও ৩০০ খানা শাড়ি বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীলঙ্কা শরণার্থী ত্রাণ: শ্রীলঙ্কা হইতে আগত শরণার্থীরা রামেশ্বরের নিকট মন্দাপম্ শিবিরে আশ্রয় লইয়াছে। মাদ্রাজের ত্যাগরাজ-নগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মাধ্যমে ২,৮৫৪ জনের প্রাথমিক ত্রাণকার্য চলিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে খরাত্রাণ: (ক) রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বাঁকুড়া জেলার সারদাপল্লী, শঙ্করারা, বিরাহ, জেমুয়া ও চরাদিহি—এই পাঁচটি গ্রামে খরাত্রাণকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। বেশ কয়েকটি পুষ্করিণী ও পাতকূয়া খনন করা হইতেছে। ইহা ছাড়াও খরাপীড়িত গ্রামবাসীদের নূতন ধুতি ও শাড়ি এবং পুরানো জামা বিতরণ করা হইতেছে। (খ) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের মাধ্যমে পুরুলিয়া জেলার খরাত্রাণকার্য যথারীতি চলিতেছে।

সৌরাষ্ট্রে পুনর্বাসন: প্রাথমিক ত্রাণ-কার্যের অব্যবহিত পরেই রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রম জুনাগড় জেলার বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামগুলিতে ২২০টি বাড়ি, ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ২টি উচ্চ-বিদ্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ একটি পুনর্বাসন-শিবির নির্মিত হইয়াছে।

ভক্তসম্মেলন

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে গত ১৭ হইতে ২০ অক্টোবর ৬ষ্ঠ বর্ষ ভক্তসম্মেলন উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত ১৩৪ জন ভক্ত এই সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনদিনের বিশেষ কার্যসূচী অনুক্রমে সাধন, ভজন, ধর্মপ্রসঙ্গ, পাঠ, আলোচনা এবং বিদগ্ধ সন্ন্যাসিবৃন্দের সারগর্ভ ভাষণে ভক্তবৃন্দ প্রাণবন্ত হইয়া ওঠেন। বেলুড় মঠের কয়েকজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ধর্মপ্রসঙ্গ এবং ভাষণ দান করেন।

যুবসম্মেলন

জয়পুর (খেতড়ি) রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ-স্মৃতি-মন্দিরের উদ্যোগে ২৭ হইতে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০৬ জন ছাত্র এবং স্মৃতি-মন্দিরের ৩৮০ জন সভ্য এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সকালে প্রতিদিন দুইটি করিয়া অধিবেশন হইত। স্বামী রঙ্গনাথানন্দের সভা-পতিত্বে বিভিন্ন বিষয় লইয়া আলোচনা করেন স্বামী আত্মানন্দ। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ছাত্রগণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করে এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন সভাপতি স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। তাঁহার প্রতিটি ইংরেজী ভাষণ

হিন্দীতে রূপান্তরিত করিয়া স্বামী আত্মানন্দ উপস্থিত সকলকে শোনান। স্বামী স্মরণানন্দ, স্বামী পূজ্যানন্দ, স্বামী প্রত্যগানন্দ, স্বামী তত্ত্ববোধানন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপরি-উক্ত ছাত্র ও স্মৃতি-মন্দিরের সভ্য ছাড়াও স্থানীয় বহু জনসাধারণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ বিক্রয়কেন্দ্র হইতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের প্রচার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উদ্বোধন-সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা : সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার গীতা অথবা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অক্ষজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

১১ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী এবং ১৯ নভেম্বর শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

সমৃদ্ধ ইংরেজী ভাষা রক্ষার্থেও সংস্কৃত চর্চার প্রয়োজন

সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রেরণাপ্রদ সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সংবাদটি ছিল এই: সংস্কৃত ভাষায় বিশ্রুত পণ্ডিত ইংরেজ মনীষী স্টিভেন্‌ টম্‌সন্‌ জানাইয়াছেন যে, ইংরেজী ভাষার অবশ্যম্ভাবী অবনতি রক্ষা করিতে ব্রিটেনের কিছু কিছু স্কুলে ইদানীং সংস্কৃত পড়ানো হইতেছে। এক সাংবাদিক-সম্মেলনে আলোচনা কালে তিনি বলেন, সংস্কৃতরূপ ধ্রুপদী ভাষার অন্যান্য ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিবার শক্তি আছে। তিনি আরও বলেন, এই ভাষার দ্বারা ছেলেমেয়েদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করিতেও এই ভাষা সক্ষম। পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের প্রায় আট হাজার ছেলেমেয়েকে দক্ষিণ লণ্ডনের চারিটি সরকারী বিদ্যালয়ে এই সংস্কৃত ভাষা শেখানো হয়। বয়স্ক ব্যক্তিদেরও সেখানে এই ভাষা শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা আছে। ইংরেজ গৃহবধূরাও এখন এই ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার

ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানী কোলনস্থিত পূর্বএশীয় শিল্পকলা-সংগ্রহশালা হইতে সম্প্রতি চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য আবিষ্কার হইয়াছে। এই সংগ্রহশালার গুদামে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে একটি কাঠের বুদ্ধমূর্তি সকলের অগোচরে অযত্নে রক্ষিত ছিল। সম্প্রতি সংগ্রহশালার একজন কর্মচারী গুদাম হইতে এই কাঠের বুদ্ধমূর্তিটি মেরামত করিতে গিয়া অকস্মাৎ তাহার ভিতর হইতে ব্রোঞ্জের নির্মিত দুইটি ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্তি এবং মূল্যবান কিছু ধর্মীয় সম্পদ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার সহিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের হাজার হাজার ধর্মীয় পাণ্ডুলিপিও আবিষ্কৃত হয়।

একটি চিঠি হইতে ঐ বুদ্ধমূর্তি নির্মাতা ভাস্করের নাম জানা গিয়াছে 'কোন'। তিনি তাঁহার সমসাময়িক কালে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করদের অন্যতম ছিলেন। ইহা ছাড়া চীনা ভাষায় একটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের মুদ্রিত ছবিগুলি কাঠে খোদাই ব্লক হইতে তোলা। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইউরোপে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের অন্ততঃ ২৫০ বৎসর পূর্বে এই

গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল।

অসংখ্য পাণ্ডুলিপির মধ্য হইতে উপরি-উক্ত জিনিসগুলির যে তালিকা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, জাপানী কোন এক পুরোহিত কাঠের বুদ্ধমূর্তিটি কোন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ভাস্কর 'কোন'-এর প্রথম দিকের শিল্পকীর্তির মধ্যে এইটি একটি। পূর্বএশীয় সংগ্রহশালার প্রধান অধ্যাপক গ্যেপার পাণ্ডুলিপির দুরূহ সংস্কৃত শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়া এই রহস্যোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

স্মরণোৎসব

গত ৪ নভেম্বর, ১৯৮৩ (১৭ কার্তিক, ১৩৯০) শ্যামাপূজার রাত্রে শ্যামপুকুর স্ট্রীটস্থ 'দানাকালী'র (শ্রীকালীপদ ঘোষের) বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'বরাভয়-লীলা' স্মরণে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা-পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয়। সন্ধ্যায় স্বামী অব্জজানন্দ প্রাঞ্জল ভাষায় ঐ বিশেষ দিনেতে প্রকট শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

পূর্ব সিঁথি (দমদম) শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৩ নভেম্বর, ১৯৮৩ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মজয়ন্তী-স্মরণোৎসব প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, পাঠ হয়। প্রব্রাজিকা শুদ্ধাপ্রাণা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তিন শত ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে ধর্মসভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজী ও বর্তমান ভারত প্রসঙ্গে সারগর্ভ ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় আরাত্রিক, স্তোত্রপাঠ ও ভজন গানের মধ্য দিয়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

পরলোকে

কথামৃতকার শ্রীম'র জ্যেষ্ঠ পৌত্র প্রয়াত অরুণ-কুমার গুপ্তের সহধর্মিণী **শ্রীমতী শান্তি গুপ্ত**, ১৩/২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনস্থ শ্রীম'র 'ঠাকুরবাড়ি'তে গত ১৪ নভেম্বর, রাত্রি ২-২০ মিনিটে ৬৭ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে ভুগিয়া সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীম (মাস্টার মহাশয়) স্বয়ং তাঁহাকে আপন পরিবারে বধূরূপে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ প্রমুখ সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের চরণপ্রান্তে তিনিই সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। শ্রীমতী শান্তিদেবী পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের অশেষ কৃপা ও স্নেহের পাত্রী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রদীক্ষিতা এই ধর্মপ্রাণা মহিলার উত্তরজীবনে আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতা প্রভূত প্রকাশিত থাকায়, শ্রীম'র 'ঠাকুরবাড়ি'তে সমাগত ভক্ত নরনারী সকলেরই তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। উক্ত 'ঠাকুরবাড়ি'তে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর স্ব-করকমলে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবাদির তত্ত্বাবধান তিনি আজীবন অতি গভীর নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন। জীবনের অন্তিম ক্ষণ পর্যন্ত 'কথামৃত' তথা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গই ছিল তাঁহার একমাত্র আলোচ্য ও চিন্তনীয়। শেষ-কথাটিও মুহুর্মুহুঃ তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল—'জয় রামকৃষ্ণ'।

শ্রীরামকৃষ্ণপদে বিলীনা শান্তিদেবীর দেহনির্মুক্ত আত্মা অনন্ত শান্তিলাভ করিয়াছে,—ইহাই আমাদের গভীর বিশ্বাস।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

* অতঃপর বর্তমান পৃষ্ঠাসংখ্যা নিচে।

* পুনর্মুদ্রিত অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা উপরে।

উদ্বোধন

পুনর্মুদ্রণ

২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ● শ্রাবণ, ১৩০৭ (পৃষ্ঠা ৩২৬-৩৩৭)

যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্য শাসন নিজেদের মুটোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠ্‌ছে, শুষছে, তার পর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মর্‌তে পাঠাচ্ছে,—জিত হলে, তাঁদের ঘর ভরে ধন ধান্য আস্‌বে। আর প্রজাগুলো ত সেই খানেই মারা গেল,—হে রাম! চম্‌কে যেও না, ভাঁওতায় ভুল না।

একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ কর্‌তে পারে? মানুষে নাম যশ করে, না নাম যশে মানুষ করে?

মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে, ওসব বাকি আপনা আপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে, সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ, ত একটা দাগ রেখে যাও। "তুলসী ইয়া জগ্‌ আয়কে জগ হাঁসে তুম্‌ রোয়, অব এ্যায়সা কর্‌নি কর চলো যস্‌ তুম্‌ হঁসে জগ রোয়"। যখন তুমি জন্মেছিলে, তুলসি, সকলে হাঁসতে লাগলো, তুমি কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে এখন এমন কাজ করে চল যে, তুমি হাঁসতে হাঁসতে মর্‌বে, আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদ্‌বে। এ পার, তবে তুমি মানুষ, নইলে কিসের তুমি? [ক্রমশঃ।]

হীরক তত্ত্ব

হীরক সম্বন্ধে প্রবাদ ও কুসংস্কার।

বাবু অনুকূলচন্দ্র ঘোষ।] | ১৭৯ পৃষ্ঠার পর।

হীরকের বিষয়ে অনেক কুসংস্কার প্রচলিত। ইহার কল্পিতশক্তি বিষয়ীভূত করিবার অনেক অদ্ভুত গল্প রচিত হইয়াছে। শীলচাঁদ নামক এক বণিক কার্য্যোপলক্ষে লাহোর গিয়াছিল। তথাকার রাজার একটা বৃহৎ হীরক ছিল। বণিক রাজাজ্ঞায় যখন হীরকটী দেখিতে পাইল, তখন প্রণিপাত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিল। কথিত আছে, জনৈক সম্রাটের আদেশে এক হীরক দ্বিখণ্ড হওয়ায় ঐ সাম্রাজ্যের পতন হয়। টাভার্নিয়ের সুবিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিত আছে যে, তৎকালে জগন্নাথের মন্দিরে মণিকারদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল; কারণ, ঐ শ্রেণীর এক ব্যক্তি রাত্রিকালে দেবতার চক্ষু হইতে এক হীরক অপহরণ করিয়া, প্রত্যূষে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, মন্দিরের দ্বারদেশে প্রাণত্যাগ করিল।

হীরক যে জলে স্থাপিত হয়, তাহাতেও আশ্চর্য্য গুণের সঞ্চার হয়। কিন্তু হীরকের এরূপ কোন ক্ষমতা আছে কি না, তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। আবার শুনা যায়, হীরক বিষাক্ত পদার্থ ও উহা ভক্ষণ. করিলে মৃত্যু সংঘটিত হয়। ডাব্‌লিন মিউজিয়মের (Dublin Museum) তত্ত্বাবধায়ক বল্‌ সাহেব বলেন যে, এই বিশ্বাস কুসংস্কারাপন্ন ও অমূলক। টাভার্নিয়ে লিখিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্যের হীরক আকরের শ্রমজীবিগণ স্বল্প বেতনে অসন্তুষ্ট হইয়া হীরকখণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া, উহা লুকাইয়া রাখিত ও সুযোগ পাইলে বিক্রয় করিয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিত।

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ রবার্ট বয়েল তাঁহার হীরক সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে, যে স্থান হইতে প্রথম হীরক উদ্ধৃত হইয়াছে, দুই বৎসর পরে সেই স্থানে আবার হীরক দৃষ্ট হইবে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯০ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ (অগ্রহায়ণ, ১৩৯০, পৃঃ ৭৩৩)

বয়েলের ন্যায় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বিরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এক ধনী স্ত্রীলোকের দুইটী হীরক ছিল। কিছুকাল পরে দেখা গেল যে, তাঁহার বাক্সের দুইটীর স্থানে, চারিটী হীরক রহিয়াছে। অবশ্য এই সকল ঘটনা বত দূর সত্য, তাহা আর বলিতে হইবে না।

প্লিনি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, অগ্নির উত্তাপে হীরক পরিবর্ত্তিত হয় না। কেবল ছাগের উষ্ণ শোণিতে স্থাপিত করিলে, ইহাকে খণ্ডিত করা যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নিকলকন্টি নামক পরিব্রাজক ভারতবর্ষীয় হীরকের আকরের বর্ণনা কালে, এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, এক পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে হীরক পাওয়া যাইত। কিন্তু তথায় বহু সংখ্যক বিষধর সর্পের বাসস্থান থাকায়, হীরকান্বেষণকারিগণ ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিত এবং তাহাতে হীরক সংলগ্ন হইত। হিংস্র পক্ষীগণ ঐ সকল মাংসখণ্ড লইয়া যখন বৃক্ষশাখায় স্থাপন করিয়া ভক্ষণ করিত, তখন ঐ সকল হীরক সংগৃহীত হইত। মার্কোপোলোও তাঁহার পুস্তকে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তৎকালে আকর খননের পূর্ব্বে, ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই মেষাদি বধ করিত। পক্ষীগণ ঐ সকল মাংসখণ্ড লইয়া উড়িয়া যাইত। সম্ভবতঃ উপরোক্ত পরিব্রাজকেরা এই ঘটনার অতিরঞ্জিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। প্লিনি যে ছাগের শোণিতের কথা বলিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় এই প্রাচীন প্রথা হইতে গৃহীত।

হীরকের উৎপত্তি।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হীরকের উৎপত্তির বিষয়ে অনেক আলোচনা করেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা কোন স্থির সিদ্ধান্ত অবগত হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় কোন কোন নদীর তীরে হীরক পাওয়া যাইত। আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর তীরস্থ হীরকের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে আকর হইতে হীরক উদ্ধৃত হয়। কিম্বার্লির আকর সকল খননকালে এক প্রকার নীলবর্ণের মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই মৃত্তিকা হইতেই হীরকখণ্ড সমূহ সংগৃহীত হয়। যে প্রণালীতে হীরক মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকে তাহা হইতে কেহ কেহ ভূগর্ভস্থ অগ্নির প্রভাবে হীরক উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অনুমান করেন। অনেকে বলেন, চাপের প্রভাবে কয়লা হীরকে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এডেনবয়ার নামক পণ্ডিত বলেন যে, হীরক সকল আকাশ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার মতে হীরক সমন্বিত উল্কাপিণ্ড প্রবলবেগে ভূমির উপর পতনকালে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ সকল স্থান খনন করিয়া এখন হীরক উদ্ধৃত হইতেছে। কিম্বার্লির মৃত্তিকার সহিত উল্কাপিণ্ডের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আরিজোনা হইতে এক উল্কাপিণ্ড সংগৃহীত হয়; তাহা হইতে ডাক্তার ফুট, সোয়ার্স ও সার উইলিয়াম্ ক্রুক্স্ রাসায়নিক উপায়ে হীরক নিষ্কাসিত করিয়াছেন।

হীরকের কয়েকটী প্রসিদ্ধ আকর।

বহুকাল হইতে ভারতবর্ষ হীরকের জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে হীরকের আকর সকল দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। মুসলমানের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের অনেক স্থানে হীরক পাওয়া

গিয়াছিল। গোলকোণ্ডা হীরকের আকর বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। কিন্তু প্রফেসার নিকল্ বলেন যে, উহা এক প্রাচীন দুর্গ। উহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। গোলকোণ্ডাধিপতির রাজত্বের চতুর্দ্দিকে অনেক হীরকের আকর ছিল। তথা হইতে হীরক সকল আনীত হইয়া ঐ দুর্গে রক্ষিত হইত। গোলকোণ্ডাধিপতির ২৩টী ও বিজাপুররাজের ১৫টী হীরকের আকর ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কডাপা, বেলারি, কর্ণলে, কৃষ্ণা ও গোদাবরী ডিষ্ট্রিক্ট, মধ্যভারতের অন্তর্গত সম্বলপুর ও চাণ্ডা ডিষ্ট্রিক্ট ও বঙ্গদেশের লোহারডাগা ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত শাঙ্ক ও কেয়েল নদীর তীরস্থ আকর সকলও প্রসিদ্ধ ছিল। বুন্দেলখণ্ডে পান্না নামক স্থানে হীরকের আকর আছে।

কোন কোন পোর্টুগীজ ঐতিহাসিক, বোর্ণিয়ো দ্বীপের অন্তর্গত তানিয়াপুরা নামক স্থানের আকরের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমানকালে আফ্রিকার অন্তর্গত কিম্বার্লির হীরকের আকর সকল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আফ্রিকায় কিরূপে হীরক আবিষ্কৃত হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ব্রেজিলের অন্তর্গত সেরো-ডি ফ্রাইওর আকর হইতেও বহুসংখ্যক হীরক উদ্ধৃত হইয়াছে।

আফ্রিকায় হীরক আবিষ্কার।

দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল হইতে প্রায় এক শত মাইল দূরে, ড্রাকেন্সবার্গ নামক উন্নত পর্ব্বত-শ্রেণীর শিখর সমূহ ভারত মহাসাগর হইতে উত্থিত জলীয়বাষ্পসমন্বিত মেঘজালের গতিরোধ করে। ঐ সকল মেঘ হইতে বারিধারা বর্ষিত হইয়া প্রথমে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ও অবশেষে পরস্পর মিলিত হইয়া, সুদীর্ঘ অরেঞ্জ নদীতে পরিণত হইয়াছে। পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে ঐ বারিধারা পার্ব্বত্য প্রদেশ ও সমতল ভূমি বিদীর্ণ করিয়া যে, কেবল নদীগর্ভের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নহে; দ্রুতগতিতে পতনকালে ঐ বিশাল জলরাশি হীরকের আকর উদ্ঘাটিত করিয়া রত্ন সকল গমনপথে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

হোপ্‌টাউনের সন্নিকটে ভাল্ নামক স্রোতস্বিনী অরেঞ্জ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে নদীর তীরে এক বৃদ্ধা ওলন্দাজ স্ত্রীলোক তাহার অল্পবয়স্ক পৌত্রীকে লইয়া বাস করিত। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে একদিন যখন ঐ বৃদ্ধা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল ও তাহার পৌত্রী কুটীরের দ্বারদেশে কয়েক খণ্ড প্রস্তর লইয়া খেলা করিতেছিল, তখন শ্যাল্ক ভ্যান নিকার্ক নামক এক ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য তাহাদের কুটীরে প্রবেশ করিল। এই ব্যক্তি ঐ বালিকার খেলা দেখিতে দেখিতে তাহার নিকট হইতে এক প্রস্তরখণ্ড গ্রহণ করিল। শিলাখণ্ডে কোন বিশেষত্ব দর্শন করিয়া, সে গৃহস্বামিনীর নিকট হইতে উহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঐ বৃদ্ধা কহিল যে, সে অরেঞ্জ নদীর সামান্য প্রস্তরখণ্ড বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহে এবং নিকার্ককে উহা বিনামূল্যে লইতে বলিল। নিকার্ক কহিল যে, সে যদি প্রস্তরখণ্ড বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে সে প্রাপ্তমূল্যের অর্দ্ধেক বৃদ্ধাকে প্রদান করিবে।

কয়েকদিন পরে নিকার্ক হোপ্‌টাউনের কমিশনার সাহেবকে প্রস্তরখণ্ড দেখাইল। তিনি কাচের উপর ঘর্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে উহা কাচ কাটিতে পারে, এবং তাঁহার এক

খনিজতত্ত্ববিদ্বন্ধুর পরীক্ষার জন্য শিলাখণ্ড গ্রাহাম্‌সটাউনে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ বন্ধুটী লিখিয়া পাঠাইলেন যে, প্রস্তরখণ্ডটী একটী উৎকৃষ্ট হীরক। কেপ্‌টাউনের এক মণিকার হীরকটীর জন্য ৫০০ পাউণ্ড দিতে চাহিল।

অরেঞ্জ নদীর তীরে হীরক প্রাপ্তির সংবাদ কেপ্‌কলনির শাসনকর্ত্তা উড্‌হাউস সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল এবং তিনি এই হীরক ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই কথা শুনিয়া, হোপ্‌টাউনের কমিশনার সাহেব নিকার্ককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নিকার্ক এতদিন তাহার প্রস্তরখণ্ডের কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল। সে উপস্থিত হইলে কমিশনার সাহেব তাহাকে প্রস্তরখণ্ড বিক্রয় করিতে বলিলেন। সে, যে কোন মূল্যে, বিক্রয় করিতে চাহিল। কয়েকদিবস পরে সে কমিশনারের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি টেবিলের উপর পাঁচশত পাউণ্ড রাখিয়া তাহাকে লইতে বলিলেন। নিকার্ক অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কমিশনার সাহেবকে বলিল, "মহাশয়, আমি অত্যন্ত দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত, আমাকে এরূপ উপহাস করিবেন না।" কমিশনার সাহেব তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাহার প্রস্তরখণ্ড প্রকৃতই একটী হীরক ও তিনি উহা ৫০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। নিকার্ক অবশেষে অর্থরাশি লইয়া চলিয়া গেল এবং বৃদ্ধার কুটীরে গমন করিয়া তাহাকে ২৫০ পাউণ্ড প্রদান করিল ও আপনার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া, অবশেষে সে অরেঞ্জ নদীর তীর অন্বেষণ করিতে লাগিল। সে যে সকল হীরক প্রাপ্ত হইল, তাহা বিক্রয় করিয়া সহস্র সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া পরম সুখে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার হীরক আবিষ্কারের কথা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে দলে দলে হীরকান্বেষণকারিগণ অরেঞ্জ নদীর তীরে হীরকের অন্বেষণে আসিতে লাগিল। অবশেষে যখন নদীতীরে হীরক সকল নিঃশেষিত হইল, তখন ভাল্ নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশেও কিম্বার্লির জগদ্বিখ্যাত হীরকের আকর সকল আবিষ্কৃত হইল। ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসরে ঐ সকল স্থান হইতে ২৪৮৭৮০০০ পাউণ্ড মূল্যের হীরক ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছে। ট্রান্সভালের অন্তর্গত প্রিটোরিয়া ডিষ্ট্রিক্ট হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৯০০০ পাউণ্ড মূল্যের হীরক সংগৃহীত হয়।

কিম্বার্লির আকর ও সংগ্রহ প্রণালী।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মিসনারি সম্প্রদায়ভুক্ত একব্যক্তি আফ্রিকার একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করেন। তখন কিম্বার্লির হীরকের কথা কেহই জানিত না। কিন্তু ঐ মানচিত্রে যে স্থানে বর্ত্তমান কিম্বার্লি অবস্থিত, সেই স্থানে হীরক আছে ইহা লিখিত ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে হীরক আবিষ্কারের পর ঐ স্থান লোকে লোকারণ্য হয়।

বর্ত্তমান সময়ে কিম্বার্লির আকর ১১০০ ফিট্ গভীর। মৃত্তিকা খননকালে কখন কখন নীলাকার কঠিন মৃত্তিকার মধ্যে হীরক পাওয়া যায়। কিন্তু কলের সাহায্যে নীলবর্ণ মৃত্তিকা ধৌত করিয়া, তাহা হইতে অধিকাংশ হীরক সংগৃহীত হইয়া থাকে।

হীরকের শ্রেষ্ঠত্ব।

হীরকের মূল্যের কারণ অনেকেই অবগত আছেন। ইহার ন্যায় অসামান্য জ্যোতিঃসম্পন্ন পদার্থ আর নাই। ভারতবর্ষে ইহা বহুকাল হইতে সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে।

প্রায় খৃষ্টীয় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীষে ইহার আবির্ভাব হয়। গ্রীষদেশে হীরক কাঠিন্যের জন্য 'আডামস্' নামে পরিচিত ছিল। প্লিনি হীরকের এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী বস্তুর মধ্যে হীরকের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অতি অল্পসংখ্যক রাজা এই মূল্যবান রত্নের অধিকারী ছিলেন। প্লিনি ছয় প্রকার হীরকের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ও আরবদেশীয় হীরক বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই দুই দেশজাত হীরক এরূপ কঠিন যে, লৌহের উপর স্থাপিত করিয়া আর এক খণ্ড লৌহের আঘাতে হীরকের কিছুই হয় না। কিন্তু লৌহ খণ্ডদ্বয় ভগ্ন হইয়া যায়।

হীরকের বিকীরণ শক্তি।

হীরকের উপর আলোকরশ্মি পতিত হইলে, উহা অভ্যন্তর ভাগ হইতে প্রতিফলিত হইয়া হীরককে জ্যোতির্ম্ময় করে। এই জ্যোতিই হীরকের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। সূর্য্যের আলোকে কিয়ৎকাল রাখিয়া, হীরক অন্ধকারে স্থাপিত করিলে, উহা দীপ্তিশালী হয়। সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক সার্ উইলিয়াম্ ক্রুক্সের একটী হীরক আছে; ইহা বায়ুশূন্য কাচপাত্রের মধ্যে স্থাপিত হইলে, এরূপ আলোক বিতরণ করে, যাহা দ্বারা অনায়াসে পুস্তক পাঠ করা যায়।

কয়েকটী বিশেষত্ব।

হীরকের ন্যায় কঠিন পদার্থ আর নাই। হীরক, হীরক ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দ্বারা কর্ত্তিত হয় না। হীরক ও অন্যান্য মূল্যবান রত্ন পালিস করিবার জন্য সূক্ষ্ম হীরকচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। রোমাণ সাম্রাজ্যের প্রারম্ভ হইতে ইউরোপে হীরক প্রচলিত হয়। কিন্তু, ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে লাড্উক্ ভ্যান্ বারকেল কর্ত্তৃক যখন হীরক কর্ত্তনের উপায় উদ্ভাবিত হয়, তখন হইতে ইহা যাবতীয় রত্নের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করে।

আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হর্টেনসিও বর্জিও কর্ত্তৃক কোহিনুর কর্ত্তিত হয়। কিন্তু সম্রাট তাঁহার কার্য্যে এরূপ অসন্তুষ্ট হন যে, তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে হয়।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া গ্যারার্ড সাহেবকে কোহিনুর কর্ত্তনের ভার অর্পণ করেন। ভুর সাঙ্গার নামক সাহেব কর্ত্তৃক কোহিনুর কর্ত্তিত হয়। এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে, ৩৮ দিন লাগিয়াছিল ও কোহিনুরের ভার ১৮৬·০৬২৫ ক্যারাট অর্থাৎ ৪২৪·২৫ গ্রেণে পরিণত হইয়াছিল। এই কঠিন কার্য্যের জন্য ৮০০০ পাউণ্ড ব্যয় হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে হীরকের দ্বারা প্রথম কাচ কর্ত্তিত হয়। খনি, পর্ব্বত, ও আর্টিসিয়ান কূপ খননের জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট যন্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বহুমূল্য হীরকের পরিবর্ত্তে, এই সকল কার্য্যের জন্য কার্ব্বোনাডো নামক নিকৃষ্ট হীরকের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

হীরকের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক হওয়ায়, তৎসদৃশ পদার্থ হইতে ইহা সহজে বিভিন্ন করা যাইতে পারে। এই জন্য জনষ্টাড্ সলিউসন্ নামক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। ঐ পদার্থে হীরক ভিন্ন অন্যান্য পদার্থ ভাসিতে থাকে।

(অগ্রহায়ণ, ১৩৯০, পৃ: ৭৩৭)

আকর হইতে উত্তোলনের সময়, কোন কোন হীরক, সংগ্রহকারীদিগের হস্তের অল্প উত্তাপেই ফাটিয়া যায়। বৃহদাকার হীরক সকল এইরূপে প্রায়ই খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এইরূপ উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন কোন হীরক আলুর মধ্যে পুরিয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

এ পর্য্যন্ত যতগুলি হীরক পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ৭০ টীকে ঐতিহাসিক হীরক বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে ব্রাগাঞ্জা (Braganza) নামক হীরকের আকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; ইহার ওজন ১৬৮০ ক্যারাট অথবা ৬৭২০ গ্রেণ। এই হীরকটী ব্রেজিলের সুপ্রসিদ্ধ আকর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহা পোর্টুগিজ ঐশ্বর্য্যাগারে রক্ষিত হইতেছে। ইউরোপের মধ্যে অর্লফ্ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; ইহার ওজন ১৯৩ ক্যারাট বা ৭৭২ গ্রেণ। ষ্টার অফ্ দি সাউথ নামক উৎকৃষ্ট হীরকটী ব্রেজিল রাজ্যে এক কাফ্রি রমণী ভূমির উপর প্রাপ্ত হয়। ইহার ওজন ২৫৪ ক্যারাট বা ১০১৬ গ্রেণ। কোহিনুরের বর্ত্তমান ওজন ১০২.৫ ক্যারাট বা ৪১০ গ্রেণ। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে উহা কর্ত্তিত হয়; তখন উহার ওজন ১৮৬.০৬২৫ ক্যারাট ছিল। [ক্রমশঃ।]

কাঞ্চীপুর প্রাচ্য সাহিত্য-সভা।

১৮৯৬ সালের মার্চ্চ মাসে, "শ্রীকাঞ্চীকলাবতী পুস্তকালয়" নামে এক অবৈতনিক পুস্তকালয় সাধারণের উপকারার্থ কাঞ্চীপুর সহরে খোলা হয়।

১৮৯৭ সালের জানুয়ারি হইতে ইহা "কাঞ্চীপুর প্রাচ্য সাহিত্য-সভা" নামে পরিচিত হয়; কারণ, ইহার কার্য্যক্ষেত্র এক্ষণে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এই সভার উদ্দেশ্য :— (ক) সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের শিক্ষা ও আলোচনা বিস্তার। সভা তজ্জন্য এই উপায়গুলি অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক।

১।—একটি ইংরাজী-সংস্কৃত স্কুল বা কলেজ স্থাপনা ও উহার পরিচালনা।

২।—এখানে পূর্ব্বাবধিই যে দুইটি শুদ্ধ সংস্কৃত কলেজ রহিয়াছে, যাহাতে তর্ক ব্যাকরণ ও মীমাংসা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই দুইটির যথাসাধ্য উন্নতি করা।

৩।—বেদ, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে নিয়মিত শিক্ষাদান।

৪।—বার্ষিক পণ্ডিত সম্মিলনী।

(খ) শরীরপালন বিদ্যা (Hygiene), ইতিহাস, ভূগোল, শরীরবিধান (Physiology), সরল পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা, (Geology) ইত্যাদি সম্বন্ধীয় দেশীয় ভাষায় স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা, যাহাতে অল্পবয়স্ক বালকগণকে এই সকল বিষয়, বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা করিতে গিয়া অনর্থক পরিশ্রম ও সময় নষ্ট করিতে না হয়।

(গ) ভাল ভাল ভারতীয় বা ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ বা তাহার টীকা প্রকাশ করা।

(ঘ) মূল্যবান প্রাচীন সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার হস্তলিপি সংগ্রহ ও উহার প্রকাশ।

(ঙ) ভাল ভাল আবশ্যকীয় বিষয়ের নিয়মিত বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা।

(চ) যদি সম্ভব হয়, একটি আয়ুর্বেদ-ক্লাস খোলা।

(ছ) যথাসম্ভব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তার সম্মিলনের সহায়তা করা।

উপযুক্ত অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল উদ্দেশ্য ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

আজকাল চারিদিকে তত্ত্ববিদ্যার আলোচনা; সে দিন 'মহা ধর্ম্মসভা (Parliament of religions) হইয়া গেল। দীর্ঘকাল ব্যাপী নাস্তিকতা, অজ্ঞেয়বাদ, জড়বাদ প্রভৃতি অজ্ঞানের রজনী প্রভাতা হইয়া, আজ অধ্যাত্মসূর্য্যের বিমল জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য দেশ পর্য্যন্ত এক্ষণে প্রাচ্য গ্রন্থ সমূহের উপর গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন।

আজ আমাদের কি নিশ্চিন্ত থাকা শোভা পায়? কত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এখনও অমুদ্রিত, হয় ত তাহার হস্তলিপি কীটদষ্ট হইতেছে, কালের আক্রমণে তাহাদের অনেকগুলি লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে (যেমন কিছু দিন পূর্ব্বে মহীসুর প্রাসাদে অগ্নি লাগিয়াছিল) সমুদয় শাস্ত্রগ্রন্থ একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে,—কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ইহা সহ্য করিবেন?

কাঞ্চীপুরে এই সভার কার্য্যক্ষেত্র করা হইয়াছে; তাহার উদ্দেশ্য, এই স্থান ইতিহাসে ইহার রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও সমাজনৈতিক উদ্যমের জন্য বিখ্যাত। ইহা এক সময়ে প্রাচীন টোলরাজগণের রাজধানী ছিল; ইহা সংস্কৃত শিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল; এই স্থানেই জৈনগণ ও বৌদ্ধগণ হিন্দুগণের উপর প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন; এই স্থানই শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রচারক্ষেত্র ছিল; এই স্থানেই অনেক মঠ ও অন্যান্য মহাপুরুষের আশ্রম ছিল।

যদি কতকগুলি মহাত্মা স্বদেশের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হন, তাঁহাদিগের সাহায্যে এই সভা সমুদয় কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন।

আশা করা যায়, এই মহদ্ব্যাপারে সকল শিক্ষিত রাজা, মহারাজা, জমিদার ও অন্যান্য ভদ্রলোকগণ যোগদান করিবেন। যে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য এবং যে কোন ভাষার পুস্তক সাদরে গৃহীত হইবে এবং তৎপ্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। প্রাচ্য পুস্তকালয়ে এক্ষণে ১০০০ খানি ও ইংরাজী পুস্তকালয়ে ১৩০০ খানি পুস্তক আছে; সমুদয়গুলির মূল্য ৩৪০০ টাকা।

নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ এই বিষয়ের উদ্যোগী।

১। মান্যবর পি, আনন্দ চার্লু, সি, আই, ই, বিদ্যাবিনোদ, মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল, কলিকাতা গবর্ণর জেনেরালের সভার সদস্য।

২। রাজা সার এস, রামস্বামী মুদালিয়র, নাইট, সি, আই, ই।

৩। মান্যবর সি, শঙ্করনেয়ার, বি, এ, বি, এল, মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

৪। মান্যবর সি, বিজয়রাঘবাচার্য্য, বি, এ, সালেমের উকিল, ও মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য।

৫। সি, খুট্রকুমার স্বামী এভার্গাল, বি, এ, জমিদার, চুনাম্পেট, চিংলিপট জেলা।

৬। এম, বীররাঘবাচার্য্য এভার্গাল, বি, এ, ইংরাজী হিন্দু পত্রিকার সত্বাধিকারী।

(অগ্রহায়ণ, ১৩০০, পৃঃ ৭৩৯)

৭। এস, বিলিগিরি আয়াঙ্গার এভার্গাল, এটর্ণি-এট-ল, মাদ্রাজ।

৮। টি, টি, রঙ্গাচার্য্য এভার্গাল, বি, এ, বি, এল, জেলা মুন্সেফ, পুনামেলি।

৯। টি, এন্, কৃষ্ণমাচার্য্য এভার্গাল, এম, এ, অধ্যাপক, কোম্বুকোনাম কলেজ।

১০। সি, ভাস্যম্ আয়েনগার এভার্গাল, বি, এ, প্রধান শিক্ষক, চিতোর হাইস্কুল; প্রাচ্য সাহিত্য-সভার সম্পাদক, কাঞ্চীপুর।

আমাদিগের নিকট প্রেরিত অনুষ্ঠান পত্র হইতে উপরে অধিকাংশ অনুবাদিত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠকমহাশয় দেখিলেন, মাদ্রাজ প্রদেশের—অনেক গণ্য মান্য বরেণ্য শিক্ষিত মহোদয়, সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের উদ্ধারে কেমন বদ্ধপরিকর। অনেকে বলিতে পারেন, 'যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না।' আমরা বলি, 'খোস খবরের—ঝুটাও ভাল।' এতগুলি স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা যখন এই কার্য্যের জন্য প্রাণপণ হইয়াছেন, তখন এই উদ্যমে যে, কিছু না কিছু ফল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। 'এ মাদ্রাজ প্রদেশের ব্যাপার, আমরা বাঙ্গালী, আমাদের ইহাতে স্বার্থ কি?'—এই বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে আর এ প্রশ্ন করিবার অবসর নাই। জগৎ একসূত্রে গ্রথিত; আমার মঙ্গলে, তোমার মঙ্গল, তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল। 'থিয়োজফিষ্ট' পত্রিকার সম্পাদক বলেন, 'মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির যত গণ্য মান্য লোক ইহার পৃষ্ঠপোষক, আর গত দুই বর্ষে, এই সভা হইতে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে ৭৮টী বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতেই বোধ হইতেছে, এই সভা বেশ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কালে এই সভা মহৎ মহৎ কার্য্যসাধন করিবেন।' আমরা আশা করি, সকল বাঙ্গালী এই কার্য্যে সহানুভূতি ও যোগদান করিবেন এবং ইহার অনুকরণে আপনাদের দেশেও সংস্কৃত ও এতদ্দেশীয় ভাষার বিস্তার চেষ্টা করিবেন। আমরা দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম, এই সভা সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষার উপর অনুরাগী হইয়াও, পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে যেটুকু উপকার পাওয়া যাইতে পারে, তাহা গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক নহেন।

আমাদের দেশের 'সাহিত্য পরিষদে'র ও 'সাহিত্য সভা'র সহিত এই সভার কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই সভার কার্য্যক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে, তাহার কার্য্যও রীতিমত-প্রণালীবদ্ধ ভাবে না হইলে, রীতিমত ফলপ্রত্যাশা করা যায় না। আশা করি, সভা ইহার সমুদয় কার্য্যগুলিকে রীতিমত শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিশেষ বিশেষ বিভাগে দক্ষ লোক নিযুক্ত করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ-ক্লাস খুলিবার প্রস্তাব শুনিয়া আমাদের বড় আনন্দ হইল। অনেকের ধারণা, প্রাচীনকালে হিন্দুরা চিকিৎসাবিজ্ঞান ভাল জানিতেন না। এ ভ্রম ক্রমশঃ অপনীত হইতেছে। আর্য্যেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন, আয়ুর্ব্বেদপাঠেই তাহা জানা যায়। আর আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রকৃতরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে, যে বিলাতী ঔষধ অপেক্ষা অনেক স্থলে আমাদের দেশের বিশেষ উপযোগী হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, এই সভা দিন দিন উন্নতিলাভ করিয়া মহৎ মহৎ কার্য্যসমূহ দেশ হিতার্থে সম্পাদন করুন।



৮৫তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা পৌষ, ১৩৯০

দিব্য বাণী

দেখ, কথায় আছে যে, পুকুরে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাই দেখে ছোট ছোট মাছেরা আনন্দে সেইখানে খুব লাফালাফি করে খেলা করছে—ভাবছে আমাদেরই একজন। কিন্তু যখন চাঁদ অস্ত গেল তখন তাদের সেই পূর্ব অবস্থা। লাফালাফির পর অবসাদ এল—কিছুই বুঝতে পারলে না।

*

কতরকম ছেলেরা কত কি ইচ্ছা লিখেছে, দেখলে? কেউ বলছে, 'এত করে প্রার্থনা, জপধ্যান করছি, কিছুই হচ্ছে না'; কেউ বা সংসারে নানা অশান্তি, অনটন, রোগশোকের কথা লিখেছে। আর এ-সব শুনতে পারি নে। ঠাকুরকে বলি, 'ঠাকুর, এদের ইহকাল পরকাল তুমিই রক্ষা করো।' আমি মা হয়ে আর কি বলব? কজন তাঁকে ঠিক ঠিক চায়? সে ব্যাকুলতা কোথায়? এত তো ভক্তি, আগ্রহ—এদিকে সামান্য একটু ভোগ্যবস্তু পেলেই সন্তুষ্ট! বলে, 'আহা, তাঁর কি দয়া!' বলে, 'রাধু কেমন আছে?' আমার মন ভেজাবার জন্যে রাধুর খোঁজ আগে।

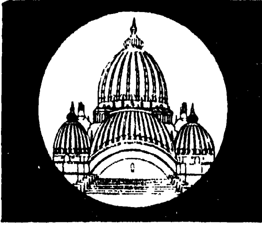
*

…তোরা বল দেখি কোন্ জিনিসটা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়?…

এক কথায় বলতে গেলে, নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেননা বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।

—শ্রীশ্রীমা

[শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, ৫ম সং, পৃষ্ঠা ২৩৬-৩৭]



কথাপ্রসঙ্গে

'আমায় ডাকিস্'

শ্রীরামকৃষ্ণের অতি প্রিয় একটি রামপ্রসাদী সঙ্গীতের কলি আমরা কথামৃতে পড়িয়াছি :

'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।/ সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে ॥/···সে-ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।/ হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে ॥'

শুষ্ক পণ্ডিতী বিচারের চাতুর্যকে স্তব্ধ করিয়া, হৃদয়-গহনের অভ্যন্তরে সেই গোপন কুঠরীতে প্রবেশ করিতে হয়,—কোন একটি ভাবকে আশ্রয় করিয়া ব্যাকুল হইয়া ডাকিলে মহামায়া স্থির থাকিতে পারেন না। ঐ ভাবের পাক তিনিই স্বয়ং করিয়া থাকেন,—তখন সেই পরিপক্ব ভাবই জমাট হইয়া রূপে ও রসে তত্ত্বোপলব্ধিকে সাকার করিয়া তোলে! 'হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে'—ঠিক সেই অবস্থাতেই।

শ্রীশ্রীমাকে প্রণতি নিবেদনেই বর্ষশেষের 'কথাপ্রসঙ্গে' শেষ হইবে, ইহাই আমাদের সঙ্কল্প। শুধু একটি প্রণাম। কিন্তু সে-প্রণামের নিবেদন-ক্রিয়াটিকে তেমন সহজ ও সংক্ষিপ্ত করা যাইতেছে না, কারণ বিষয়টিতে কিছু ভাবিবার আছে। যিনি ভাবের বিষয়, তাঁহাকে আমাদের অন্তরের শতধা অভাবের ডালি লইয়া কী নিবেদন করিব? আমাদের শূন্য হৃদয়ের প্রণতি তাঁহার পদপ্রান্তে পৌছিবে কি? যদি 'ভাবের উদয়'-ই না হইল তবে মাটি-মাখানো লোহাকে চুম্বক ধরিবে তো? 'উন্মত্ত আঁধার ঘরে' তাঁহার তত্ত্ব-সন্ধান মিলিবে কি? আমাদের বিশুষ্ক কণ্ঠের ডাক মা শুনিবেন তো? এই সকল অভাবমূলক ভাবনাই আমাদের মনকে আলোড়িত করিতেছে।

মনে পড়িতেছে একটি অনবদ্য ঘটনা : জনৈক যুবক কামারপুকুরে ছুটিয়া গিয়াছেন জগন্মাতাকে চাক্ষুষ দর্শন করিতে, তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে প্রাণের আর্তি জানাইতে। ভক্ত-সন্তানের আকুলতায় জননী সেদিন সত্যই বিচলিতা হইয়াছিলেন। মাতৃ-চরণে প্রণাম নিবেদন করিতেই, তিনি সস্নেহে সুস্পষ্ট আশ্বাস-বাক্য শুনাইয়াছিলেন—'আমায় ডাকিস্'। জননী-কণ্ঠের সেই আশীর্বাণী কেবল ঐ সন্তানের কর্ণেই প্রবেশ করে নাই,—উপস্থিত রামলালদাদা, লক্ষ্মীদিদি প্রমুখরাও তাহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য! 'আমায় ডাকিস্' এই শব্দ দুইটি বলিয়া ফেলিয়াই, মা যেন কেমন আত্মসংবরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। সংশোধনের সুরে তৎক্ষণাৎ বেশ মিষ্ট স্বরে উচ্চারণ করিলেন—'ঠাকুরকে ডেকো বাবা, ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে।' লক্ষ্মীদিদি সুযোগ ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না মোটেই—তাই সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—'না মা, এ তোমার কেমন কথা! এমন করে ভোলালে তারা কি করবে?' মা যেন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইলেন,—নিতান্ত অসহায়ভাবেই লক্ষ্মীদিদিকে ভুলাইয়া বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন,—'কেন রে! কি করলুম আমি?' দিদি কিন্তু তখন বেশ জোরের সঙ্গেই জবাব দিয়াছিলেন, 'মা এক্ষুণি তুমি ওকে বললে,

"আমায় ডাকিস্"—আবার পরমুহূর্তেই, তাকে বলছো, "ঠাকুরকে ডেকো—সব হবে।"' মা যেন এবারে কিছুটা সামঞ্জস্যের সুরে বলিতে থাকেন,—'হ্যাঁ রে, ঠিকই তো! ঠাকুরকে ডাকলেই তো সব হল।' শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীদিদি কিন্তু মায়ের এই ছলনায় দমিয়া যান নাই মোটেই,—বরং সাহ্লাদে ও সপ্রেরণায় ভাগ্যবান্ ঐ ভক্তটিকে বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীমায়ের নিজ মুখে আজ যাহা শুনা গেল, তাহা অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ এক পরম আশ্বাস। মা আজ স্ব-মুখেই স্বীকার করিলেন,—স্বরূপতঃ তিনি কে! তাঁহার আজিকার এই কথা বিশ্বময় ভক্ত-সন্তানদের উদ্দেশে এক মহতী অভয়বাণী, একটি স্বচ্ছ সরল সাধনোপদেশ। তিনি আরও বলিয়াছিলেন,—গভীর বিশ্বাসের সহিত মাকেই ডাকা উচিত—মা ও ঠাকুর কিছু আলাদা নহেন—সেই এক জগদম্বাই।

যাঁহার মায়া তিনি যদি কৃপা করিয়া উহাকে সরাইয়া না দেন, তবে আর কাহার সাধ্য তাঁহার সেই অভয়া রূপের দর্শনমাত্রেই তাঁহাকে চিনিতে পারিবে? একটি প্রাসঙ্গিক সংলাপ এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য।

'মা আপনি যে ভগবতী, তা আমরা বুঝতে পারি না কেন?' জনৈকা মেয়ে-ভক্ত একদিন সরলভাবে শ্রীশ্রীমাকে সোজাসুজি এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিয়াছিলেন। মা মৃদু হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন—'সকলেই কি আর চিনতে পারে মা? ঘাটে একখানা হীরা পড়ে ছিল। সবাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘ'ষে স্নান ক'রে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে, সেখানা এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা।'

বাস্তবিক অর্থে, অগণন ভক্তের মধ্যে কয়জন আছেন সেই 'জহুরী'? মাতৃ-স্বরূপ বিশ্বাসের বা ধারণার যোগ্যতা আছে কাহার? এই কারণেই তো শ্রীশ্রীমায়ের মুখে ব্যক্ত তাঁহার স্ব-ভাবকে অমন সহজ ভাষায় শুনিয়াও, আমাদের নিকট উহা ঘন কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন হইয়াই থাকিতেছে। মনে হইতেছে, উহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া মায়ের একটি আকস্মিক হৃদয়াবেগের প্রকাশ মাত্র।

আমরা কি পারিব কোন 'জহুরী'-কেও চিনিতে? বাহ্যিক নাম, গোত্র, পরিচয় বা পেশাই আমাদের কাছে বড় হইয়া দেখা দেয়—ঐ সকল আবরণে ঢাকা, খাঁটি মানুষটিকে কে-ই বা দেখিতে পাই আমরা। রত্নাকরকে সকলেই জানিত দস্যু বলিয়া, কিন্তু দেবর্ষি নারদ চিনিয়া লইয়াছিলেন মহাকাব্যের রচয়িতা ঋষি বাল্মীকিকে। নট গিরিশ ঘোষকে সবাই চিনিত, কিন্তু ভক্ত-ভৈরব গিরিশকে জানিত কয়জন? স্বৈরাচারী রাজপুরুষ জগন্নাথ ও মাধব ছিল সকলেরই সুপরিচিত, কিন্তু প্রেমিক জগাই-মাধাই ছিল লোকলোচনের আড়ালে। তাই জহুরী বিনা যেমন হীরা চিনিতে পারে না কেহ, তেমনই আবার হীরা ব্যতিরেকে জহুরীরই বা সার্থকতা কোথায়? হীরাই তো জহুরীর জহুরিত্বের প্রকাশক। জহুরী না থাকিলে হীরা আর কয়লা যেমন সমান মূল্য,—তেমনি হীরার অনুপস্থিতিতে জহুরীর ও বেগুন-ওয়ালার একই মহিমা। এখানেও সেই 'আশ্চর্যরূপিণী মায়া'!

শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকারও তাই মাতৃপ্রশস্তি করিতে গিয়া অবশেষে না বলিয়া পারেন নাই:

'মা তোমার ধর মায়া দাও সরাইয়ে।
দেখি মা অভয় পদ নয়ন ভরিয়ে॥
...
যে হও সে হও মাগো বিচারে কি কাজ।
অভয় চরণ যেন জাগে হৃদি মাঝ॥'

শ্রীসারদা-তত্ত্বরূপী 'হীরা'কে যে-সকল 'জহুরী'

পরখ করিয়া চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাও এক-একজন সারদা-মায়ারই অপূর্ব সৃষ্টি সন্দেহ নাই। বড় বড় 'জহুরী'র ঠিকানা সকলেরই বিদিত—তাঁহারা আজ জগদ্‌বন্দিত। কিন্তু অনাম-অগোত্র সেই সাগর সাঁতরা আর ভীম সর্দারের মতো অকীর্তিমান্‌ 'জহুরী'-দের সন্ধান কে করে? আমাদের এই প্রসঙ্গ-বেদিকায় অমন অখ্যাত দুই-একজন 'জহুরী'কে আসন দিতে ইচ্ছা হইতেছে—এই লীলা-নাটকের রহস্যকে গভীরতর উপলব্ধির প্রত্যাশায়। যাঁহার লীলা অবলোকনের এই চেষ্টা—তিনি নাকি শরতের যেমন মা, আমজেদেরও তেমনই মা। ব্রহ্মবিদ্‌ বরিষ্ঠ সারদানন্দের যিনি জননী, তিনিই তস্কর আমজেদেরও জনয়িত্রী! অতএব আমরা নির্ভয়,—এই নির্বিচার প্রসঙ্গালোচনায়। পুঁথিকারও হৃদয় উজাড় করিয়া ঐ অকীর্তিমান্‌ 'জহুরী'দের উদ্দেশে বলিয়াছেন :

'নাহি জানি কিবা নাম জুটে কোথা হতে।
নিজে মার মুখে শুনা বাগদী তারা জেতে॥
লক্ষ লক্ষ দণ্ডবৎ চরণে তাঁদের।
জাতির খাতির মম নহে বিচারের॥
মায়ে যারা বাসে, মার পদে যার মন।
হোক না চণ্ডাল সেই মুকুটি ব্রাহ্মণ॥'

সাগর সাঁতরা জাতিতে বাগদী, পেশায় ডাকাত। তবুও শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টিতে সে মস্ত 'জহুরী'! সারাজীবন ডাকাতি করিতে করিতে সাগর সাঁতরা অবশেষে কোন এক শুভক্ষণে সাচ্চা 'হীরা'ই উপার্জন করিয়াছিল,—বহু বহু ঋষি-মুনির পরম বাঞ্ছিত সেই 'হীরা'কে অন্ধকার নির্জন এক প্রান্তর হইতে অবলীলায় লুণ্ঠন করিয়া, ইহজীবন-পরজীবনের মহামূল্য সঞ্চয় এবং একমাত্র পাথেয় করিয়া সঙ্গে লইয়াছিল। সাগরের গিন্নীও বড় কম ছিল না—পতির এই লুণ্ঠন-সাধনে সহধর্মিণীর ভূমিকাও কিছু অল্প ছিল না। জানি না সেই ভীম সর্দার কে ছিল,—সংসারে আজও অবধি সে অজ্ঞাত-পরিচয়ই থাকিয়া গিয়াছে। ইহারও গভীর তাৎপর্য আছে হয়তো। লোক-প্রবাদ যে, কুখ্যাত ডাকাত সাগর সাঁতরার প্রধান সহযোগী ছিল ঐ ভীম সর্দার। আমরা এই সব 'জহুরী'—ছদ্মবেশী ঋষিদের চরণে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

আমরা ইঙ্গিত করিতেছি, সেই তেলোভেলোর জনপরিশূন্য প্রান্তরের মাঝে, ঘনায়মান এক সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁহার 'ডাকাত বাবা'র ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারের ঘটনাটিকে। লীলাপ্রসঙ্গে এবং জীবনী-গ্রন্থাদিতে বহু-বিবৃত সেই কাহিনী আজ আর কাহারও অজানা নহে। 'অজানা নহে' ঠিকই, তথাপি অনেক কারণেই ঘটনাটি বিশেষ রহস্যমণ্ডিত—যেমন রহস্যময়ী মা-সারদা স্বয়ং। শ্রীল অক্ষয়কুমার সেন তাঁহার পুঁথিতে ঐ আখ্যানকে বর্ণনা করিয়াছেন 'নূতন কথা'—'সুন্দর বারতা' বলিয়া :

'গাইলে শুনিলে উঠে আনন্দ অপার।
শুনহ নূতন কথা ডাকাত বাবার॥
সুন্দর বারতা যেই মন দিয়া শুনে।
নিশ্চয় পাইবে ভক্তি মায়ের চরণে॥
কথার ভিতরে আছে এতদূর বল।
শুনে উপজিবে হৃদে ভকতি অচল॥'

বাস্তবিকই 'নূতন কথা'—'সুন্দর বারতা'—New Gospel-ই বটে—যাহার কথনে, লিখনে, শ্রবণে ও মননে সুনিশ্চিত ফলশ্রুতি হইতেছে 'আনন্দ অপার', 'ভকতি অচল' এবং 'ভবের বন্ধন মোচন'। মাতৃ-অনুচিন্তনের সহায়িকা এই বহুবিদিত 'নূতন কথা'য় আমরাও কিছুক্ষণ অভিনিবেশ করিতে প্রয়াসী হইতেছি।

সেই দিব্য নাটিকার শেষাংশের সংলাপ স্মরণে আনিতেছি :

'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা ; ··· ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে!'

ডাকাত-বাগদিনীকে সম্মুখে পাইয়া অসহায়া বালিকা সারদা—এই উক্তিই করিয়াছিল। ভীষণাকৃতি সাগর ডাকাত উভয়ের মাঝে দণ্ডায়মান তখন। আদরের দুলালী তাহার বাবাকে-মাকে পাইয়াছে,—যেন ইহাতেই তাহার সকল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে!

আর হারাইয়া যাওয়া স্নেহের কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া বিরহী পিতার প্রস্তর-কঠিন হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, হতভাগিনী গর্ভধারিণীর শুষ্ক মাটির বক্ষে বাৎসল্যের ফল্গু বহিয়া চলিয়াছে!

মেয়ে সারদা জাদুকরীই বটে! পাথর গলাইবার এবং রুক্ষ মৃত্তিকায় ফুল ফুটাইবার জাদুমন্ত্র সে জানে!

আমরা জানিতাম, যে-রক্ষক কালে সে-ই ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়! ইহাই সংসার-রীতি। কিন্তু ঐ তেলোভেলোর প্রান্তর-দৃশ্যের যে নাটিকা, তাহাতে জানিলাম—হিংস্র ভক্ষকই রূপান্তরিত হইয়াছিল অতন্দ্র রক্ষকে। লুঠেরা ঠ্যাঙ্গাড়ে হইয়াছিল উন্নিদ্র অনলস প্রহরী।

বিশ্বজননীর এই জাদুকরী কন্যারূপখানি যতই চিন্তা করা যায়, ততই ভাব-রাজ্যের অতলান্ত গভীরতায় অভিভূত হইতে হয়। আমাদের অভাব-মলিন চিত্ত কেমন করিয়া ঐ ভাব-রূপের চিত্রকে ধারণ করিবে? আশ্চর্য কন্যা সারদা সেদিন কী অনন্যসাধারণ মন্ত্রই সেখানে প্রয়োগ করিয়াছিল, যাহাতে ঐ অজ্ঞাত-পরিচয় নরঘাতকও নিমেষে স্নেহকোমল পিতায় রূপান্তরিত হইয়াছিল, লৌহ-নির্মম দস্যুপত্নী পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্তানবৎসলা জননীতে? দেবী সারদাকে তবে কি আমরা একজন মানবীই বলিব—যিনি যুগপৎ মা ও কন্যার ভূমিকাভিনয়ে সমান নিপুণা? ঐ দস্যুদম্পতি কি সারদাকে নিছক একটি পথহারা মেয়ে বলিয়াই দেখিয়াছিল? মেয়ের মুখে 'বাবা' সম্বোধনে বা মা-ডাকেই কি তাহারা স্নেহে বাৎসল্যে বিগলিত হইয়াছিল? অথবা ঐ সম্বোধনের অন্তরালে ছিল অন্য কোন মন্ত্র? সেই মন্ত্রেই কি তবে দস্যুদম্পতি আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল,—না, কি মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী কোন দেবী বা দেবতাকে নিজেদের চক্ষে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আমাদেরও জানিতে ইচ্ছা হয় সেই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী বা দেব কে? কী তাঁহার রূপ? সেই রূপই বুঝি তবে সারদার স্বরূপ? বড় দুরূহ এই ভাব-বিচারণা! 'সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে'! উহারা নাকি কালীরূপেই সারদাকে দেখিয়াছিল!

তেলোভেলোর প্রান্তর-মাঝে কন্যা ও মাতা-পিতার মিলন-দৃশ্যটি বড়ই মধুর, কিন্তু ততোধিক ভাবদ্যোতক। অসংস্কৃত আকাট দুই গ্রাম্য 'জহুরী' মাঠের মাঝে পড়িয়া থাকা অমন সাচ্চা 'হীরা' বিনা আয়াসেই পরম ধন বলিয়া চিনিয়া লইতে পারিল! আমাদের তাই আরও দুঃসাহসিক জিজ্ঞাসা—'জহুরী'দ্বয় নিজেদের সামর্থ্যেই 'হীরা'-কে পরখ করিয়া লইয়াছিল, অথবা 'হীরা'ই স্বেচ্ছায় 'জহুরী' দুইজনের কাছে নিজেকে ধরা দিয়াছিল? মায়াময়ী দেবী সারদা!—তাঁহার বিচিত্র মায়া লীলারূপে আমাদের মনকে ভুলায়, কিন্তু স্বরূপে বুদ্ধিতে ধরা দেয় না।

চির আদরিণী কন্যা, তাহার বাবাকে ও মাকে কাছে পাইয়া পরম নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। পিতা-মাতাও তাহাদের জন্মজন্মান্তরের হারাইয়া যাওয়া কন্যারত্নকে ফিরিয়া পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়াছিল। পথশ্রান্তা কন্যাকে আর তাহারা অধিক দূর হাঁটিতে দেয় নাই। স্নেহ-সন্তর্পণ প্রহরায় মা-বাবা তাহাদের মেয়েকে অদূরে তেলোর চটিতে লইয়া গিয়া সেখানেই নিশ্চিন্ত রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। মা নিজ অঞ্চল বিছাইয়া কন্যার শয্যা রচনা করিয়া-

ছিল, পিতা মুড়ি-মুড়কি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ক্ষুধাতুরা কন্যার আহারের ব্যবস্থা করিয়া নিজের দগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি ডাকাত-বাবা লাঠি হাতে চটির দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। স্নেহের পুতলি সারদাও এইভাবে সেই তেলোর চটিতে জনক-জননীর সতর্ক প্রহরায় নিরুদ্বেগ রজনী যাপন করিয়া পরম সুখী হইয়াছিল। দস্যু-দম্পতি তাহাদের নিজ পেশা, ঘর-দ্বার সব ভুলিয়া হৃদয়ানন্দ-নন্দিনীকে ঘুম পাড়াইয়া, পাহারা দিয়া, সারা রাত্রি শান্তিতে, তৃপ্তিতে ও স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিয়াছিল। ভাবময়ী সারদার ইহাও এক অপূর্ব ভাব নহে কি? ঘটনার পরিসমাপ্তি কিন্তু এখানেই হয় নাই।

রাত্রির অবসানে শুরু হয় আবার পথ চলা। তারকেশ্বরের পথে মাঠ ভাঙিয়া চলিয়াছেন শ্রীশ্রীমা সারদা,—সঙ্গে চলিয়াছে তাঁহার ডাকাত-বাবা ও ডাকাত-মা। দস্যু-মাতা মাঠ হইতে কড়াইশুঁটি তুলিয়া নিজ হাতে ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া সোহাগিনী মেয়ের হাতে দিতেছে, বালিকা সারদাও উচ্ছল আনন্দে উহা খাইতে খাইতে পথ চলিতেছেন। ডাকাত সাগর সাঁতরা এখন কন্যা-স্নেহ-গর্বিত বাবা মাত্র, 'ডাকাত' উপাধিটি নিছকই শোভাবর্ধন ছাড়া কিছুই নহে! অদূরে তেলো-ভেলোর প্রান্তর-মধ্যবর্তী শ্মশানভূমিতে সেই মৃন্ময়ী 'ডাকাতে কালী'ও বুঝি আর ভয়ঙ্করী অচলা মূর্তি নহে,—যেন তখন স্নেহময়ী সচলা সারদা। ভীষণাই হইয়াছেন ভাবঘনা। জগতের মা এবার বাগদীর ঘরের মেয়ে সাজিয়া নূতন এক নাটিকার অভিনয় করিলেন।

কন্যা সারদা। কিন্তু যেমন তেমন কন্যা নহে, —'সর্বনাশী,' 'কুল-ভাঙানী' মেয়ে! 'সর্বনাশী' বলিয়াই তো বাগদী রমণীর বাগদিত্ব নাশ করিয়া তাহাকে দেবীত্বের ঐশ্বর্যে ভূষিতা করিয়া একেবারে আপন গর্ভধারিণী জননীর মহিমা প্রদান করিয়াছেন। আর মেয়ে 'কুলভাঙানী'-ও বটে,—কেননা পিতার ডাকাতি-পেশা ঘুচাইয়া তাহার দুর্ধর্ষ কুল-গর্বকে ভাঙিয়া ছাড়িয়াছেন। ডাকাতের ঘরে এমন ছল করিয়া ঢুকিয়া, উহাদের সকল কিছুকে তছনছ করিয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া, মুছিয়া-সরাইয়া দিয়াছেন,—তাই এমন দুরন্তাকে 'অন্তরঙ্গ' বলা চলে কি করিয়া? সারদা দুর্নিবারিণী ছলনাময়ীই বটে! ভাল মানুষের ঘরে ছলে-কৌশলে চোরই ঢুকিয়া থাকে। দোর্দণ্ড ডাকাতের ঘরেও সর্বস্বহারিণী সারদা! বিপুল আনন্দের মাঝেও তাই বুঝি ডাকাত-বাবার ছিল এক নিদারুণ দুঃখ,—অভিমান-আকুল প্রাণের ক্রন্দন।

মাঠের আল-পথে চলিতে চলিতে শ্রান্ত কন্যা সারদা একটি গাছের ছায়ায় বসিলে, ডাকাত-মা নিজের স্নেহাঞ্চল দুলাইয়া তাঁহাকে বীজন করিতেছিল। আর ডাকাত-বাবা ছল ছল নেত্রে আপন আদরিণী দুলালীকে দর্শন করিয়া কোন্ অপার্থিব সুখে বিভোর হইতেছিল তাহা কে জানে! অনিন্দ্যসুন্দর একখানি চিত্রপট! বৃক্ষতলে অধিষ্ঠিত একটি মাটির প্রতিমা যেন,—স্নিগ্ধ শোভায় পরিবেশ আলো করিয়াছে। বুঝি-বা পাষাণ-গৃহিণী মা মেনকার স্নেহাঞ্চলে একদা সমাসীনা সেই শিবানী উমা-ই ডাকাত-ঘরণীর কোমল বক্ষে বিরাজমানা কল্যাণী সারদা। ডাকাত-পিতা তাহার দরাজ কণ্ঠের সঙ্গীতে বহু যুগ বাদে ফিরিয়া পাওয়া কন্যার মন ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল,—তাহাও আমরা জানিয়াছি। ডাকাত-বাবার হৃদয়-নিঙড়ানো সেই সঙ্গীতের দুই-চারি কলি উত্তরকালে শ্রীশ্রীমায়ের মুখেও শুনা যাইত। উহার কয়েক চরণ এইরূপ:

'কেন কাঁদে প্রাণ তারই তরে।
সে যে নহে অন্তরঙ্গ, কুল করেছে ভঙ্গ,
সাধুর ঘরে যেন চোরে চুরি করে।'

ভাবে, অর্থে ও মাধুর্যে এ-সঙ্গীত বাস্তবিকই তুলনাহীন। বুঝিতে বিলম্ব হয় না—ঐ ডাকাতবেশী বাগদী-দম্পতি কন্যারূপিণী সারদাকে জগদম্বা-ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহারা সাধারণ মনুষ্য অবশ্যই নহে,—তাই ইহাদিগকে মামুলি অর্থের 'জহুরী' বলিবই বা কেমন করিয়া? স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার ইহাদের উদ্দেশে লিখিয়াছেন:

'জন্ম জন্ম মহাভক্ত মার এই দোঁহে।
ধরিয়াছে নরদেহ বাগদীর গৃহে॥'

ডাকাত বেশে কে ঐ 'মহাভক্ত,'—আর কে-ই বা সেই বাগদিনীরূপে মহাতাপসী,—এই জিজ্ঞাসাই আমাদের হৃদয়কে বার বার মথিত করে। পুরাণের গর্বোন্নত-শির, প্রস্তরকঠিন গিরিরাজই কি এবারের এই 'ডাকাত-বাবা'? উমা-স্নেহে পাগলিনী গিরি-গৃহিণী মেনকাই কি এই বাগদিনী? এ-জিজ্ঞাসার উত্তর কে দিবে? অথবা প্রশ্ন: মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত সেই মহিষাসুর, যিনি ভগবতী দুর্গার শ্রীপদভারে স্পৃষ্ট এবং দেবীর স্বহস্ত-নিক্ষিপ্ত খড়্গাঘাতে ছিন্নমুণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছিলেন, অতৃপ্ত সেই তিনিই মাতা চণ্ডিকার স্নেহ-লালসায় পুনরায় এই ডাকাতরূপে দেহ পরিগ্রহ করিয়া বাকী পাওনাটুকু কড়ায় গণ্ডায় উসুল করিয়া লইলেন? জননীর চণ্ডমূর্তিতে ত্রাসিত সন্তান বুঝি তৃষিতও ছিল, তাঁহার করুণাঘন মমতাময়ী রূপটির জন্য! এবারকার মাতা-পুত্রের লড়াইয়ের ধরনটিও তাই অভূতপূর্ব বৈচিত্র্যে ভরা! শূল-খড়্গ-কৃপাণ-বজ্র এবার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত,—এবারকার রণে মোক্ষম মহাস্ত্র সর্বাবগাহী সন্তান-স্নেহ।

ভাব-অভাবের নানা প্রশ্ন লইয়া মাতৃ-স্বরূপ চিন্তনে আমরা দিশাহারা বোধ করি। সত্য সত্যই 'উন্মত্ত আঁধার ঘরে' কেবলই হাতড়াইয়া মরিতেছি। আমাদের আর কী কথা! স্বয়ং স্বামী সারদানন্দও সখেদে গাহিতেন—'এতকাল রইলাম কাছে, ফিরিলাম পাছে পাছে। বুঝতে কিছুই না পেরে হার মেনেছি!' সারদা-তত্ত্বের ইতি হইবে না কোনখানেই। অশেষ অনন্তগামী এই মনন-ধারাকে নিরস্ত করিয়া, সেই ডানা-ব্যথা হওয়া শ্রান্ত পাখিটির মতোই তাঁহাকে শুধু স্মরণ করিতেই আজ ভাল লাগিতেছে,—কেবলই একটি অস্ফুট স্বর শুনিয়া প্রাণ-মন শান্ত হইতে চাহিতেছে,—শ্রীশ্রীমা ঐ যে সেই বালকটিকে স্নেহ-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'আমায় ডাকিস্'

পত্রিকা-বর্ষের শেষ-প্রান্তে আসিয়া নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই আমরা মাতৃচরণে প্রণতি জানাই,—বলিয়া থাকি, আমাদের বর্ষব্যাপী সকল চিন্তায়-কর্মে-প্রকাশে ও ব্যঞ্জনায়, ব্যক্ত বা অব্যক্ত অপূর্ণতারাশিকে মা যেন প্রসন্না হইয়া স্বয়ং পূর্ণাঙ্গ করিয়া গ্রহণ করেন। 'তৎ সর্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ।' আমাদের এই সরল প্রার্থনার উত্তরে, অন্তরের গভীরে যেন একটি সহজ উত্তরও শুনিতে পাওয়া যায়: 'আমায় ডাকিস্'। এই ডাকাই হইবে আমাদের আগামী বর্ষের সাধনা।

মা

স্বামী প্রেমেশানন্দ

দেহ ধরি বার বার এসেছি ধরায়,
প্রথম নয়ন মেলি,
হেরিয়াছি মা, তোমারই মুখ।
আমার প্রথম ভাষা 'মা' ডাকা তোমায়,
মা সেজে, মা, দিলে মোরে
অভয়-আশ্রয় তব বুক।

তোমা ভুলি, কোন মায়াবীর ছলনায়,
তুচ্ছ খেলনার মোহে,
জগতের খেলা-ঘরে পশি,'
জ্বলে মরি আপন-কল্পিত বেদনায়,
তৃপ্তিহীন, শান্তিহীন,
অসহায়, কাঁদি দিবানিশি।

সন্তানের আর্তনাদ সহিতে না পারি,
এক তুমি, দুই হলে,
জ্ঞানী যোগী-ভক্ত-মনোহর ;
মাতৃগত প্রাণ 'জ্ঞানী শিশু' রূপধারী,
সঙ্গে মাতৃমূর্তি তব,
শুদ্ধ স্নেহে গড়া কলেবর।

নিরায়াস সদানন্দ সে আদি-শৈশব,
তব স্নেহ-স্নিগ্ধ-চিত্ত
ফিরে পাব তোমার কৃপায়।
অতীতের সুখ-দুঃখ যত অনুভব
ভুলে যাব, যোগ দিব
রামকৃষ্ণ-মধুর লীলায়।

মা সারদে, তুমি সাধ্য, তুমি মা সাধন
তুমি আত্মা, তুমি মম দেহ-প্রাণ-মন।

শ্রীশ্রীমায়ের একটি কথা

স্বামী ধীরেশানন্দ

উদ্বোধন হইতে প্রকাশিত **"শ্রীশ্রীমায়ের কথা—২য় ভাগ"** পড়িতে পড়িতে একস্থানে আসিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলাম। কোন প্রশ্নের জবাবে শ্রীশ্রীমায়ের উত্তরদানের অভিনবত্ব ও তাহার গভীর তাৎপর্যদর্শনে। মায়ের বাণী স্বভাবতই প্রসন্ন কিন্তু অতি গম্ভীর। কথাটি এই : ৪ পৌষ। জয়রামবাটি। (দ্বিতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ৩২-৩৩)

"রাত্রে মায়ের ঘরে কথা হইতেছে। বেদান্তের কথা উঠিয়াছে।...আবার সৃষ্টির কথা উঠিল।

আমি* —আচ্ছা, এই যে সব অসংখ্য প্রাণী—ছোট, বড়, সব কি এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে নাকি?

মা—চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে চোখটি, মুখটি, নাকটি—এমনি একটু একটু করে পুতুলটি তয়ের করে, ভগবান কি অমনি একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন? না, তাঁর একটা শক্তি আছে। তাঁর 'হাঁ'তে জগতের সব হচ্ছে, 'না'তে লোপ পাচ্ছে। **যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয়নি।"**

পুনরায় ঐ মায়ের কথা, ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৬১-৬২।

"আমি—ভাব তো স্বপ্নবৎ, যেমন ভাবতে ভাবতে শেষে তাই স্বপ্ন দেখছে।

মা—স্বপ্ন বৈকি! জগৎই স্বপ্নবৎ। এটাও (এই জাগ্রৎ অবস্থা) একটা স্বপ্ন।

আমি—না, এতটা স্বপ্ন নয়। তা হলে পলকে ভাঙ্গত। এ যে অনেক জন্ম ধরে রয়েছে।

মা—**তা হোক। স্বপ্ন বই আর কিছু নয়।** এই যে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছ, এখন তা নাই। (বাস্তবিকই গত রাত্রে আমি একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছিলাম।) চাষা স্বপ্ন দেখেছিল—রাজা হয়েছে, আট ছেলের বাপ হয়েছে। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে বলেছিল, 'সেই আট ছেলের জন্য কাঁদব, না এই এক ছেলের জন্য কাঁদব?'"

জগতের সৃষ্টি বিষয়ে নানা মত দেখা যায়। **শ্রীশ্রীমা বলিলেন, এই জাগ্রৎকালীন জগৎটা একটা স্বপ্ন এবং সব সৃষ্টিই একই কালে উৎপন্ন হইয়াছে। 'একটি একটি করে হয়নি।'** এই বিষয়ে একটু প্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রয়োজন, কারণ বিষয়টি অতি গম্ভীর।

জগতের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল—এ বিষয়ে বেদ, দর্শন, পুরাণাদিতে নানা প্রকার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ তিন প্রকার মতবাদ বিভিন্ন দর্শনাদিতে প্রসিদ্ধ আছে। যথা **—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ।** —ন্যায় বৈশেষিক মতে পরমাণুরূপে ক্ষিতি আদি চারি ভূত, আকাশ, দিক্, কাল, মন, ও আত্মা, এই নয়টি নিত্যদ্রব্য মানা হয়। জীবাত্মাসমূহ হইতে ভিন্ন পরমাত্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে ঐ পরমাণুসমূহকে সংযোগ করেন। ঐ পরমাণুসংযোগেই বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হইতে থাকে। পরমাণুসংযোগ আরম্ভ হওয়াতেই সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহার নাম **আরম্ভবাদ।**

সেশ্বর সাংখ্য ও যোগদর্শন বিভিন্ন পরমাণুসমূহকে সৃষ্টির কারণ বলিয়া মানেন না। তাঁহারা বলেন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জগৎকারণ। ঈশ্বরেচ্ছায় ক্ষুব্ধ প্রকৃতিই জগদ্রূপে বিকশিত হয় বা পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ইহাই **পরিণামবাদ।**

পুনঃ শ্রীমৎ শংকরাচার্যপ্রমুখ অপর বেদান্তী

* সেবক স্বামী অরূপানন্দ (রাসবিহারী মহারাজ)

আচার্যগণ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পরমাণু, প্রকৃতি বা তাহার কার্যের কোন বাস্তব সত্তা মানেন না। তাঁহারা বিবর্তবাদ দ্বারাই সৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সত্যবস্তুর বাস্তব পরিবর্তন বা রূপান্তরকে পরিণাম বলে। আর সত্যবস্তুর ভ্রমবশতঃ রূপান্তরপরিণামকে বলে **বিবর্তবাদ**।

সৃষ্টিতে যাহাদের সত্যত্ববোধ দৃঢ় রহিয়াছে তাহাদিগকে জগদুৎপত্তির তত্ত্বকথন প্রসঙ্গে ক্রমশঃ কার্য হইতে কারণ, পুনঃ তাহার কারণ—এইরূপে মূল কারণ প্রকৃতি পর্যন্ত লইয়া গিয়া, এক অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপে ঐ মূল প্রকৃতিও একান্ত অসৎ, ইহা ঘোষণা করতঃ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। এ মতে সৃষ্টি আদির বর্ণন কেবল অধ্যারোপমাত্র। উহা অপবাদপূর্বক পরম জ্ঞানলাভে চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায়-রূপেই উক্ত বর্ণনের সার্থকতা। জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্তমাত্র। এই অধ্যস্ত জগদ্রূপ পরিণাম কি প্রকারে হয় সে বিষয়ের ধারাবাহিকতা যে রূপেই হউক না কেন তাহাতে বিবর্তবাদীদের কোন আপত্তি নাই। অধ্যস্তের অপবাদপূর্বক স্বরূপোপলব্ধিতেই যথার্থ তাৎপর্য। **সৃষ্টিবর্ণনে তাঁহারা কোন তাৎপর্য স্বীকার করেন না।**

এতদ্ভিন্ন সৃষ্টি বিষয়ে আরও বহু মত আছে। পূর্বমীমাংসা এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বেদান্তিগণও জীবের অদৃষ্টকে সৃষ্টির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। কেহ কেহ সৃষ্টি কালের ক্রীড়া, দৈব ইচ্ছা, ঈশ্বরের লীলা ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। ভক্তগণের দৃষ্টিতে এই চরাচর জগৎ শ্রীভগবানের লীলামাত্র। জীবকর্ম ও তাহার ফল—সবই শ্রীভগবানের লীলা। ভক্ত প্রতিক্ষণ, সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায় শ্রীভগবানের লীলাদর্শন করতঃ প্রিয়তমের স্মরণেই মগ্ন থাকেন। তাহার দৃষ্টিতে জাগতিক সুখ-দুঃখের আর অস্তিত্বই থাকে না। জীবের অদৃষ্টই জগৎ-সৃষ্টির হেতু এ মতেও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, জীবকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ প্রদান করিবার জন্যই করুণাময় পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

বেদান্তে দেখিতে পাই **সৃষ্টির ক্রমিক বর্ণনা।** (তৈঃ উপঃ, ২।১।৩) 'উক্ত এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী। পৃথিবী হইতে ওষধিসমূহ, ওষধি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল।'

সূক্ষ্ম পঞ্চভূতসমূহ পরস্পর একত্রীভূত (পঞ্চীকৃত) হইয়া স্থূল পঞ্চভূত ও তাহা হইতে এই ভৌতিক সৃষ্টি। এখানে সৃষ্টির একটা সুস্পষ্ট ক্রম লক্ষিত হয়। জড়বিজ্ঞানও বলেন, ঘূর্ণ্যমান সূক্ষ্ম নীহারিকামণ্ডলী ক্রমশঃ স্থূলীভূত হইয়া গ্রহ-উপগ্রহ নক্ষত্রাদি শোভিত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডাকার ধারণ করিয়াছে। সুদূর অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া ধরাবক্ষে প্রাণের বিকাশও একটা ক্রমিক পদ্ধতিতেই বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিজ্ঞানমতে ক্রমবিবর্তনবাদের ইহাই ঘোষণা।

আবার ক্রমসৃষ্টির অন্য প্রকার কথাও বেদান্তে পাওয়া যায়। যথা—(ছাঃ উপঃ, ৬।২।৩) 'তিনি সৎ, তেজ সৃষ্টি করিলেন।…উক্ত তেজ (তেজরূপী সৎ) জল সৃষ্টি করিলেন।… উক্ত জল (জলরূপী সৎ) অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।'—এই সকল শ্রুতিতে সৃষ্টির একটা সুস্পষ্ট ক্রম লক্ষিত হয়। অর্থাৎ একটির পর একটি সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীশ্রীমার কথা কিন্তু এই ক্রমিক সৃষ্টিকে সমর্থন করে না।

(মুণ্ডক উপঃ, ১।১।৮) 'ব্রহ্ম হইতে অব্যাকৃত প্রধান জাত হয়, প্রধান হইতে হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ হইতে মন, মন হইতে পঞ্চভূত, তাহা হইতে ক্রমে লোকসমূহ (তাহাতে কর্ম) ও কর্ম-সকল হইতে কর্মফল উৎপন্ন হয়।' ইহাও ক্রমসৃষ্টি-বিধায়ক শ্রুতি। এইরূপ বহু শ্রুতি সৃষ্টির একটা

ক্রম বর্ণনা করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমা কিন্তু এই সকল শ্রুতি হইতে ভিন্ন অন্য মত প্রকাশ করিলেন।

পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি শ্রুতি **অক্রম সৃষ্টির**—অর্থাৎ শ্রীশ্রীমা যেমন **এককালীন সৃষ্টির** কথা বলিয়াছেন তদ্রূপ সৃষ্টির—কথাও বলেন। যথা—(মুঃ উপঃ, ২।১।১) 'যেরূপ সম্যক্ প্রজ্বলিত অনল হইতে তাহার সজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, তদ্রূপ, হে সৌম্য, অক্ষর হইতে নানাবিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয়।'

(বৃহঃ উপঃ, ২।১।২০) 'মাকড়সা যেমন তন্তু অবলম্বনে বিচরণ করে, কিংবা অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়, ঠিক তেমনি এই আত্মা হইতে সকল ইন্দ্রিয়, সকল লোক, সকল দেবতা, সকল প্রাণী বিবিধরূপে উৎপন্ন হয়।'—এই সকল শ্রুতিবাক্য মা-র কথার সমর্থক।

যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থেও বশিষ্ঠজী বলিয়াছেন,—

'অবিদ্যাযোনয়ো ভাবাঃ সর্বেমী বুদ্বুদা ইব।
ক্ষণমুদ্ভূয় গচ্ছন্তি জ্ঞানৈকজলধৌ লয়ম্॥'

—সমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় অবিদ্যোৎপন্ন সর্ব পদার্থ জ্ঞানসমুদ্রে ক্ষণমধ্যে উৎপন্ন হইয়া পুনঃ তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়।—এইরূপে দেখা যায় শাস্ত্রে **ক্রমসৃষ্টি** এবং **অক্রমসৃষ্টি** অর্থাৎ **এককালীন সৃষ্টি**, উভয়বিধ বাক্যই বিদ্যমান। ইহার তাৎপর্য কি? সৃষ্টি যদি সত্য হয় তবে উহা নিশ্চয়ই কারণ হইতে একটা সুনির্দিষ্ট ক্রমেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে। কিন্তু শ্রুতি উভয়বিধ সৃষ্টির কথা বলিয়া বিষয়টি সন্দেহাকুল করিয়া দিয়াছেন।

এই সন্দেহের নিরসনে উত্তরস্বরূপে ইহাই বলিতে হয় যে, সৃষ্টি একান্ত মিথ্যা, মিথ্যাবস্তুর প্রতিপাদনে বা বর্ণনায় শ্রুতির বিশেষ আগ্রহ নাই। যথার্থ সত্যবস্তুর—ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই শ্রুতির তাৎপর্য। মিথ্যাবস্তুর সৃষ্টি যেরূপভাবে হয় হউক তাহাতে কোন সার্থকতা নাই। সুদীর্ঘকালীন দ্বৈতসত্যত্বসংস্কারপুষ্ট মানসে ক্রমসৃষ্টির কথা উপাদেয় হইয়া থাকে। কিন্তু **বিচারবানের শুদ্ধচিত্তে, স্বপ্নপদার্থের ন্যায়, দ্বৈতবস্তুর এককালীন সৃষ্টির কথাই অধিক রমণীয় বলিয়া প্রতিভাত হয়।**

শ্রীশ্রীমা আশ্রিত সেবকের প্রশ্নের উত্তরে ইহারই ইঙ্গিত করিতেছেন নাকি? মা বলিতেছেন—**'সব সৃষ্টি এককালেই হইয়াছে। একটি একটি করে হয়নি।'** আবার বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—'স্বপ্ন বইকি! **জগৎই স্বপ্নবৎ। এটাও (জাগ্রৎ অবস্থা) একটা স্বপ্ন।'**… 'স্বপ্ন বই আর কিছুই নয়।'

শ্রীশ্রীমা জগৎটাকে, জাগ্রদবস্থাকেও একটা স্বপ্ন বলিতেছেন। ঐতরেয় উপনিষদেও ঠিক এই ধ্বনিই শুনিতে পাই (১৷৩৷১২) 'এই জীবভূত আত্মার তিনটি বাসস্থান এবং (এই) তিনটিই স্বপ্ন (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—তিনই স্বপ্ন)।'

স্বপ্নে আমাদের কল্পনায় সর্ববস্তু, সর্বপ্রাণী একই কালে মানসপটে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। উহাতে কোন কার্যকারণপরম্পরা দৃষ্ট হয় না। পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র সবই একই সময়ে প্রতিভাসিত হয়। পুনঃ স্বপ্নভঙ্গে ঐ সমস্তই একই কালে বিলীন, অদৃশ্য হইয়া যায়। অবশেষে থাকেন এক চেতনসত্তা, যাঁহার উপর কিছুকালের জন্য বিচিত্র দৃশ্য প্রপঞ্চ প্রকটিত হইয়াছিল। উহা তৎকালে সত্য বলিয়াও মনে হইয়াছিল এবং উহা কত সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, হাসি-কান্নার খেলা দেখাইয়াছিল। জাগ্রতে ফিরিয়া আসিলে স্বপ্নের ঐ বিচিত্র খেলা যেমন নিঃশেষে বিলয় হইয়া যায়, জাগ্রৎ জগৎটাও ঠিক তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে কোথায় যেন মিলাইয়া যায়। উহার আর চিহ্নমাত্রও অবশেষ থাকে না।

এই নিয়ত পরিবর্তনশীল, বিকারী, দুঃখময়—অতএব মিথ্যাভূত জগৎটা স্বপ্নের ন্যায় একান্ত-

ভাবে আমাদের মনেরই একটা কল্পনামাত্র। ইহাই শ্রীশ্রীমা বলিলেন।

অদ্বৈত-বেদান্তেও এই অতি উত্তম সিদ্ধান্ত তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছে :

'ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে।
এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে॥'

—জীব বলিয়া কিছু বস্তুতঃ জাত হয় নাই, জগতেরও বাস্তব উৎপত্তি কোনকালে হয় নাই। এক নির্গুণ, নির্বিশেষ পরব্রহ্ম আপন মহিমায় সদা আপনি বিরাজিত, জন্ম-মৃত্যু এই সব আবিদ্যক মিথ্যা কল্পনামাত্র। ইহাই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত।

আমাদের শ্রীশ্রীমা গ্রাম্য পরিবেশে লালিতা, পালিতা, বর্ধিতা। স্থুলতঃ লেখাপড়াও বিশেষ জানিতেন না। তাঁহার পরমপ্রিয় আশ্রিত সন্তান সদা বালকস্বভাব, অধুনা বৃদ্ধ স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ-জীর মুখে শুনিয়াছি মার পুঁথিগত বিদ্যার পরিধি ছিল বাংলা বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের ঐক্য, বাক্য ইত্যাদি শব্দ পর্যন্ত। শংকা হয়, তাঁহার মুখ দিয়া বেদান্তের এই সব উচ্চ তত্ত্বকথা বাহির হইল কি করিয়া? বর্ণপরিচয়ের ঐ পর্যন্ত বিদ্যার পর তো আর তাঁহার অধিক বিদ্যাভ্যাসের কোন সুযোগ বা সুবিধাই হয় নাই। বেদবেদান্ত পড়া তো দূরের কথা। উত্তরে বলিতে হয়, শুদ্ধনির্মল দর্পণে আদিত্যের প্রকৃষ্ট প্রকাশের ন্যায় শ্রীশ্রীমার শুদ্ধ অন্তঃকরণে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষায় বেদান্তের অতি উচ্চ তত্ত্বসমূহও অপরোক্ষ অনুভবরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই অনুভবোজ্জ্বল বাণীই তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃ স্ফুরিত হইয়াছিল।

স্বপ্নসৃষ্ট মনঃসমকালীন সৃষ্টি। উহা স্বপ্ন-দর্শনের পূর্বেও থাকে না, স্বপ্নভঙ্গের পরেও থাকে না, কেবল স্বপ্নকালেই উহার প্রতীতি হইয়া থাকে মাত্র। জাগ্রদবস্থাকেও একটা স্বপ্ন বলিয়া ঘোষণাকরতঃ শ্রুতি ইহাই প্রকাশ করিলেন যে, স্বপ্নের ন্যায় জাগ্রদ্দৃশ্যপদার্থসমূহেরও কল্পনা অর্থাৎ প্রতীতিকালাতিরিক্ত কোন সত্তা নাই। শ্রীশ্রীমার কথায়ও শুনিতে পাইতেছি এই শ্রুতি সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি। বেদান্তোক্ত চরম অনুভূতিসম্পন্ন সকল ব্যক্তিগণের এই একই অনুভব।

সৃষ্টি প্রতীতিসমকালীন—ইহাই বেদান্তোক্ত **দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ**। ইহা শংকর-পরবর্তী যুগের আচার্যগণের স্বকপোলকল্পিত কোন মতবাদমাত্র নহে। ইহা অদ্বৈত-বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত।

আচার্য শংকর বলিয়াছেন :

'স্বপ্নের প্রভাবে যেমন নিজের অন্তঃস্থ (কল্পিত) বস্তুই বহির্ভাগে স্থিত বলিয়া মনে হয়, তেমনি মায়া দ্বারা বিশ্ব বহির্ভাগে বিরচিত হইলেও যিনি উহাকে দর্পণে দৃশ্যমান (প্রতিবিম্বিত) নগরের ন্যায় আপনার মধ্যেই অবস্থিত বলিয়া জানেন এবং সমাধি অবস্থায় আপনার অদ্বিতীয় স্বরূপমাত্রকেই প্রত্যক্ষ করেন, সেই গুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার।'—(দঃ মূঃ স্তোত্র, ১)

জগৎকে স্বপ্নবৎ মিথ্যা জানিয়াও আচার্য শংকর কত লোকহিতকর কার্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে বলা হয়, 'ষণ্মতস্থাপনাচার্য'—অদ্বৈত-বেদান্তের ভিত্তিতে শিব, বিষ্ণু, শক্তি, সূর্য, গণেশ ও কার্তিক—এই দেবদেবীগণের উপাসনা ও মন্দির নির্মাণ তিনি ভারতের সর্বত্র পর্যটনকালে প্রচার করিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিজের জন্য নহে। সবই পরোপকারার্থে। জগৎকে স্বপ্নবৎ মিথ্যা বলিলে জগতের প্রতি ঔদাসীন্য, নির্মমতা ও কর্মস্পৃহারাহিত্য হয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের উহা ভ্রান্ত ধারণা। সব স্বপ্ন জানিলেও হৃদয়ের কোমল বা কঠোর বৃত্তিগুলি ব্যবহার-কালে থাকেই। তাহারা তাহাদের কাজ করিয়া যায়। অপরের দুঃখে সমবেদনা ও সেই দুঃখ দূর করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টাই তাঁহারা করেন।

সুতরাং দৃষ্টিসৃষ্টিসিদ্ধান্ত অলসতার প্রশ্রয় দেয় না। মিথ্যা অবিদ্যা মোহমুগ্ধ মানবের অশেষ দুর্দশা দেখিয়া তাঁহাদের মন করুণায় ভরিয়া যায়। মিথ্যাবস্তুতে সত্যত্বাভিনিবেশ করিয়া লোকে কত কষ্টই না পাইতেছে, ইহা ভাবিয়া তাঁহাদের মন দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। জমি লইয়া ভাইদের ঝগড়া দেখিয়া শ্রীমার অট্টহাসি। মা বলিতেছেন—'কি মহামায়া মায়া গো! অনন্ত পৃথিবীটা পড়ে আছে, এও পড়ে থাকবে। জীব এইটুকু আর বুঝতে পারে না!' 'ওরা চায় টাকা, তাই দি।' করুণায় আক্ষেপ করে আশ্রিতা কন্যা রাধুকে বলছেন—'রাধি, আমার কাছ থেকে তুই কিছুই নিলি নি? তোর মার গুণই সব পেলি?' অসুস্থ সেবককে পীর বাবার প্রসাদ ধারণ করিতে দিয়া মা কাতর-স্বরে প্রার্থনা করিতেছেন—'পীর বাবা! আমার গো—কে ভাল করে দাও বাবা।' স্নেহময়ী মাতার সে কি আকুল প্রার্থনা! মনে রাখিতে হইবে যে, এই মা-ই আমাদের বলিয়াছেন যে জগৎটা একটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং জগৎ-স্বপ্ন জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি শুকাইয়া যায় না।

এ প্রসঙ্গে শ্রীস্বামীজীর বাণীও স্মরণ করি :

'উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর।
স্বপ্ন রচনা শুধু ভবে॥—···
···অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে
সত্যাগ্রহী, সত্যের আশ্রয়ে,
মিশে সত্যে যাও এক হ'য়ে,
মিথ্যা কর্ম-স্বপ্ন ঘুচে যাক্—
কিংবা থাকে স্বপ্নলীলা যদি,
হের সেই, সত্যে গতি যার,
থাক্ স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার
আর থাক্ প্রেম নিরবধি॥'

বিবেকানন্দের দর্শনে মানবসত্তা ও মানবতাবাদ

ডক্টর শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৩

অতএব বলা যায়, বিবেকানন্দের মানবতাবাদ হয়ে পড়েছে তাঁর মানবসত্তা বা মানবদর্শন বিশ্লেষণের এক সহজ ও অনিবার্য অভিপ্রকাশ। এই মতবাদ, বিবেকানন্দের মতে, আধ্যাত্মিক। কারণ এই মানবতত্ত্ব মানুষের নিছক জড়গত, সামাজিক বা ভাবগত আলোচনা নয়। সামগ্রিক-ভাবে এটি হল মানব অস্তিত্বে বিশ্বমানবিকতা বা ঈশ্বরত্বের মূল্যায়ন।

বিবেকানন্দ প্রবর্তিত এই আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের স্বরূপটি বিশ্লেষণ করলে তাই দেখা যায়, একদিকে এই দর্শন যথার্থভাবে মানবপ্রকৃতিটি ব্যাখ্যা করে তার অস্তিত্বের জড় দিক, সামাজিক এবং আরও বিভিন্ন অবস্থাগুলিতে এক সমন্বয়মুখী মানবিক মূল্য বা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। ফলে মানুষ হয়ে উঠেছে এক সৃষ্টিশীল বিশ্বমানবিক সত্তা। আবার অন্যদিকে মানবসত্তা ও মানবিক আদর্শের যথার্থ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তিনি প্রচলিত অধ্যাত্মবাদ ও মানবতাবাদ তত্ত্বের মধ্যেও এক অপূর্ব সমন্বয় স্থাপন করেছেন। এর অর্থ হল—ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির চিরন্তন আধ্যাত্মিকতার মধ্যে এক ব্যবহারিক মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ ঘটানো এবং মানুষের কেবল জড়ীয় ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সাধারণ মানবতা-বাদতত্ত্বের মধ্যে ঐশ্বরিক বা বিশ্বমানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা।

এই সমন্বয়মুখী মানবতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন কোন মতবাদ নিছক তত্ত্ব নয়। এটি হল জীবনের সহজতম প্রকাশ। এই অর্থে বিবেকানন্দের

মানবতাবাদ হল—তাঁর মানবসত্তা ও মানবিক আদর্শ বিশ্লেষণের পরিণতি। এর উদ্দেশ্য হল বিশ্বমানবিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে মানব অস্তিত্বের প্রতিটি অবস্থার পরিবর্তন। এই পরিবর্তন হল অতিক্রমণসাপেক্ষ। অর্থাৎ সাধারণ জীবনে মানবিক মূল্যবোধ জাগরণের মধ্য দিয়ে সাধারণ অনৈক্য ও সংঘাতগুলিকে অতিক্রম করা। এর তাৎপর্য হল—একদিকে সমাজের সাধারণ অবস্থার পরিবর্তন এবং অন্যদিকে জীবনে ও সমাজে ঐক্যবোধের উদ্বোধন ঘটানো।

এই মানবিক মূল্য বা ঐক্যবোধের সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ ভারতীয় সমাজের নানা অবস্থাগুলিকে পর্যালোচনা করেছেন নানাভাবে। ভারতের শাশ্বত, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনে ঐক্য, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার যথার্থতাও তিনি মূল্যায়ন করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল সমাজজীবনে যথার্থ সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা।

বিবেকানন্দ মনে করেন, সামাজিক অনৈক্যের মূল কারণ শোষণ ও বৈষম্য যা সাম্যবাদী দার্শনিক কার্ল মার্কসও বলেছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই শোষণ ও বৈষম্যের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্য তিনিও গ্রহণ করেছেন শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ পদ্ধতি, এর উদ্দেশ্য হল সমাজের সকল স্তরে অনৈক্য ও অসাম্যের মূল কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ এবং এর পিছনে নানা মানুষের বিশেষ সুযোগ আদায় ও স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টাগুলি যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা। 'বর্তমান ভারত' পুস্তকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণীর মানুষের শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ এবং ভারতের বিশাল সম্প্রদায় শূদ্রশ্রেণীর সাধারণ মানুষদের উপেক্ষা ও বঞ্চিত করে নিজেদের প্রাধান্য ও স্বার্থসিদ্ধির ইতিহাসটি ব্যাখ্যা করছেন তিনি। তাঁর মতে, এই বৈষম্যমূলক অবস্থায় মানুষের সহজতম আত্মপ্রকাশ বা মানববৃত্তি বিকাশের পরিবর্তে প্রতিটি অবস্থায় ঘটছে আত্মচ্যুতি বা alienation. তাই বিবেকানন্দ সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই পরিবর্তনের অর্থ শূদ্রজাগরণ, মার্কসীয় দৃষ্টিতে যেটি হল 'awakening of proletariat'.

কিন্তু বিবেকানন্দের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের যথার্থ পরিবর্তনের জন্য শূদ্রজাগরণের তাৎপর্য হল 'শূদ্রত্ব' সহ 'শূদ্রজাগরণ'। অর্থাৎ কোন মানুষের বিশেষ কোন গুণের অবলুপ্তি নয় বা ঐ বিশেষ গুণের ভিত্তিতে কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীরও বিনাশ নয়। এর অর্থ হল—শূদ্রের সহজাত গুণের সঙ্গে অন্যান্য মানবিক গুণের যথার্থ সমন্বয় ঘটানো।

অনৈক্য ও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যদি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং অন্যান্য মানবিক গুণগুলিকে উপেক্ষা করে কেবল এই ধরনের সমৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মানব অস্তিত্বকে সংগঠিত করা হয়, তাহলে বিবেকানন্দ মনে করেন, সভ্যতার সুসংহত বিকাশের পরিবর্তে ঘটবে অবক্ষয়। তাই বর্তমানে সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের সুযোগ বাড়ছে হয়তো বেশি, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবিক গুণবৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্রমেই যাচ্ছে কমে। বিবেকানন্দের ভাষায় তাই বলা যায়, 'সর্বশেষ শূদ্রশাসন যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়তো সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাবে।'[১৫]

এই কারণেই বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক

---

১৫ পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৬৩-৬৪

মানবতাবাদভিত্তিক সমাজবাদের লক্ষ্য হল—সমাজের সকল স্তরের মানুষের সকল সহজাত গুণের সমন্বয়ে অখণ্ড বিশ্বমানবিক গুণের বিকাশ সাধন। তবেই সাম্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে সার্থক ও যথাযথ। বিবেকানন্দ তাই মনে করেন, 'যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে, অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।'[১৬] এই ধরনের আদর্শ রাষ্ট্র হবে মানুষের পূর্ণতা বিকাশের যথার্থ আশ্রয়স্থল। অন্যদিকে এই ধারণার যথার্থ তাৎপর্য হল—বিভিন্ন মানবিক গুণ বিকাশের কেন্দ্র ও আশ্রয় হিসেবে বিভিন্ন আদর্শরাষ্ট্রের সমন্বয়, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও সংঘাতগুলিকে অতিক্রম করে নূতন করে গড়ে তুলবে এক বিশ্বসম্প্রদায় যেটি হবে বিশ্বমানবিকতা প্রকাশ ও প্রস্ফুরণের ভিত্তিভূমি। আধুনিক বহু সমাজতত্ত্ববিদের আলোচনায় দেখি এই ধরনের আদর্শ বিশ্লেষণ। বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক আর, এম, ম্যাকাইভার এবং চার্লস, এইচ, পেজও তাই মনে করেন নিজ স্বকীয়তা রক্ষা করে, বিশ্বমানবিক সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিশ্বসম্প্রদায় বা World Community-তে মিলিত হওয়াই হবে রাষ্ট্রীয় বা সম্প্রদায়গত জীবনের যথার্থ পরিণতি।[১৭]

বিশ্বমানবিক মূল্য বা আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে মানব অস্তিত্বের সামগ্রিক পরিণতিটি প্রকাশিত হয়েছে বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ তত্ত্বে।

এই মানবতাবাদী দর্শনের মূল উদ্দেশ্য হল—মানব অস্তিত্বের সকল অবস্থার যথার্থ বিশ্লেষণ এবং মানব ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশসাধন। এই সামগ্রিকতার অর্থ হল—জীবনে ও সমাজে মানবিক মূল্য প্রয়োগের যথার্থতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রেম ও কল্যাণকর কর্মের সমন্বয় ও পরিণতি হিসেবে বিশ্বমানবিক আদর্শের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন। সামগ্রিকভাবে এই আদর্শ হল—মানুষের ব্যক্তি বা সমাজজীবনে সাম্য, স্বাধীনতা বা ঐক্য প্রতিষ্ঠা। বিবেকানন্দের মানবতাবাদে এই ঐক্যের ধারণা একদিকে 'সমন্বয়' এবং অন্যদিকে 'পূর্ণতা'র ধারণাসাপেক্ষ যা আপেক্ষিক ধারাবাহিক ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

এই অবস্থার বিশ্লেষণ, বিবেকানন্দের মতে, নিছক জড়ীয় বা সামাজিক নয়, তিনি মনে করেন, এটি সম্পূর্ণভাবেই আধ্যাত্মিক। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে এই আধ্যাত্মিকতা আবার জড় ও সমাজনিরপেক্ষ ভাব বা আদর্শও নয়। কারণ মানব অস্তিত্বে আপেক্ষিকভাবে সত্য এবং পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অবস্থাগুলি পূর্ণতার ধারণাটিকে প্রকাশ করে থাকে। অর্থাৎ এর তাৎপর্য হল—নানাপথে নানাভাবে মানব অস্তিত্বে পূর্ণতার আদর্শটিকে ব্যক্ত করা। সুতরাং নানা মানবিক অবস্থার সমন্বয় তাই মানব সত্য অর্থাৎ পূর্ণতা বা বিশ্বমানবিকতার অভিপ্রকাশ মাত্র। এই প্রকাশের মূল অর্থ হল—মানবকল্যাণকর প্রেম ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টিশীল মানবসত্তার স্ফুরণ ঘটানো। সুতরাং এইভাবে দেখা যায়, বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ বা Spiritual Humanism আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক যথার্থ সৃষ্টিশীল মানবতাবাদ বা Creative Humanism রূপে।

১৬ ঐ, ১৩৪

১৭ 'Society'—R. M. Maciver & Charles H. Page, Macmillan & Co. Ltd., London, 1962

সৃষ্টিশীল ও সমন্বয়মুখী এই দর্শনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ বেদ, উপনিষদ্, ধর্ম, দর্শন প্রবর্তিত ভারতের শাশ্বত জীবনবোধের সঙ্গে বিজ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠ পাশ্চাত্য মানবাদর্শের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মানবাদর্শ সমন্বয়ের ইতিহাস পর্যালোচনাটি এ-ক্ষেত্রে তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বৈপ্লবিক জাগরণের কথা। দার্শনিক রাসেল এটিকে বলেছিলেন, 'Romantic movement'. তাঁর মতে, এই জাগরণের প্রভাবে মানুষের সৃষ্টিশীল সত্তার নবমূল্যায়ন শুরু হয়েছিল যা নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছিল রুশো প্রভৃতি দার্শনিকের মানবাদর্শটি; অর্থাৎ মানুষ সহজাতভাবেই 'শিব' বা 'সুন্দর', সমাজের নানা বন্ধন তাকে অসুন্দর করে তোলে।[১৮] নানা সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্যেই ঘটে মানুষের এই সহজাত সৌন্দর্যের প্রকাশ।

মানুষ সম্পর্কে এই বৈপ্লবিক চেতনার আলো এসে পড়ল ভারত তথা বাংলার মাটিতে। এর প্রতিফলনে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ প্রমুখ মহানায়কেরা মানুষের সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেন নানাভাবে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার সমাজজীবনে ঘটল এক নব-জাগরণ। বিবেকানন্দের মতে, এটি হল মানুষের জাগরণ। তিনি মনে করেন, এই মানব জাগরণের অর্থ হল—মানবসত্তায় বিশ্বমানবত্বের উদ্বোধন। অর্থাৎ সৃষ্টিশীল প্রেম ও কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের 'শিবত্ব' বা 'পূর্ণতা'র স্ফুরণ ঘটানো। এটির উদ্দেশ্য হল—তার ব্যক্তি ও সমাজজীবনে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা। বিবেকানন্দের দর্শনে এই ঐক্য হল সত্যস্বরূপ, যেটি হল একদিকে জড় ও ভাবের সমন্বয় আবার অন্যদিকে এক আধ্যাত্মিক গতিশীলতা। মানব-জীবন বিবর্তনের প্রতি অবস্থায় যেহেতু এই সমন্বয়ের আদর্শ প্রকাশিত হচ্ছে, তাই মানবসত্তার প্রতিটি অবস্থাই সৎ বা সত্য। আবার—কোন অবস্থাতেই যেহেতু এই 'ঐক্য' বা 'সত্য' স্বরূপের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়, তাই প্রতিটি অবস্থাই হল ধারাবাহিক এবং গতিময়,—যা পূর্ণতম ঐক্যমুখী। এই তাৎপর্যই হল—বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের মূল অর্থ। অর্থাৎ মানব অস্তিত্বের সকল অবস্থা, ভাব বা মূল্যের সমন্বয়ের মধ্যে মানবসত্তায় পূর্ণ সত্য বা ঐক্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা। এটিই হল বিবেকানন্দের মতে মানবসত্তায় 'Divinity' বা ঈশ্বরত্বের জাগরণ।

মানবসত্তা ও মানবতাবাদের এই বিশ্লেষণ বিবেকানন্দকে দর্শন আলোচনার জগতে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। মানব অস্তিত্বের দার্শনিক বিশ্লেষণের সমস্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দুটি চরম মতবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে,—একটি হল প্রকৃতিবাদ এবং অন্যটি হল ব্রহ্মবাদ। মানুষকে প্রকৃতির অধীন একটি সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করেছেন প্রকৃতিবাদীরা। প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক কোঁতে যদিও মানবতার পূজারী, কিন্তু তাঁর মতে, এই মানবতা হল একটি পার্থিব বা সামাজিক আদর্শমাত্র। অবশ্য এক্ষেত্রে ঈশ্বরের কথা তুলেছেন হাকস্‌লে, হারবার্ট স্পেনসার প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদীরা। তথাপি তাঁদের দর্শনে এই ঈশ্বর যেহেতু অজ্ঞেয়, তাই মানব অস্তিত্বে তাঁর প্রকাশের ব্যাখ্যাটিও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য জড়বাদ ও ভারতীয় চার্বাক দর্শনে মানুষ হয়ে পড়েছে একটি

১৮ '…man is naturally good, and only by institutions is he made bad'. —'History of Western Philosophy', B. Russell, p. 663

নিছক জড় ঘটনা বিশেষ। মার্কসীয় দর্শনেও মানুষ হল সমাজ-নিয়ন্ত্রণাধীন জড় ঘটনা মাত্র। অবশ্য এর উত্তরে আধুনিক অস্তিবাদী দর্শনে মানবসত্তা এবং তার স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্য আলোচিত হচ্ছে নানাভাবে। কিন্তু এই দর্শনতত্ত্বেও অস্বীকৃত হয়েছে মানব অস্তিত্বের ঐশ্বরিক বা পারমার্থিক মূল্যটি।

আবার অন্যদিকে ব্রহ্মবাদীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন পারমার্থিক সত্তা বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। তাই এঁদের মতে, সমগ্র মানবিক ধারণা ব্রহ্মধারণারই অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই হেগেল, ব্রাড্‌লে প্রমুখ ব্রহ্মবাদীরা মানব-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যটিকে উপেক্ষা করেছেন। এমনকি ভারতের অদ্বৈত-বেদান্ত বিশেষ করে শঙ্করাচার্যও প্রকাশ করেছেন,—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা। এর অর্থ হল—মানুষের জাগতিক ও সামাজিক সত্তাটিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা।

সুতরাং এই দুই বিরোধ এবং চরম মতবাদ 'প্রকৃতিবাদ' ও 'ব্রহ্মবাদ' মানবসত্তার স্বাতন্ত্র্য এবং মানব-ব্যক্তিত্বের স্বাধীন অগ্রগতিটিকে উপেক্ষা করেছে নানাভাবে। তাই মানবপ্রকৃতির যথার্থ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবতাবাদ তত্ত্ব। এই অর্থে এই মতবাদ, এফ্., সি, এস্, সিলারের মতে, প্রকৃতিবাদ ও ব্রহ্মবাদবিরোধী দর্শনতত্ত্ব। কিন্তু সাধারণ ও উদার মানবতাবাদে জড়ীয়, সসীম ও অহং-সর্বস্ব জাগতিক মানুষের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ম্যারিটেন মনে করেন, এটি হল 'অমানবিক মানবতাবাদ'। এই কারণেই পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য মানবতাবাদ অসীম সম্ভাবনাময় মানবজীবনটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য সৃষ্টিশীল মানবব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করেছে নানাভাবে। এই মানবতাই, ম্যারিটেন মনে করেন, যথার্থভাবে মানব অস্তিত্বের 'মহত্ত্ব'টিকে[১৯] প্রকাশ করে থাকে।

সুতরাং এই বৃহত্তর অর্থে পাশ্চাত্য মানবতাবাদতত্ত্ব বিবর্তনের পটভূমিকায় মানবপ্রকৃতির মহত্তর মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্যটির যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব। অর্থাৎ পাশ্চাত্যদর্শনে যথার্থ মানবতা বা মানুষের 'মহত্ত্ব' ধারণাটির যথার্থ পরিণতি যেন বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় সৃষ্টিশীল মানব অস্তিত্বে 'পূর্ণতা' বা 'ঈশ্বরত্বে'র প্রকাশরূপে ধরা পড়েছে।

বিবেকানন্দের মতে, মানবসত্তায় এই 'ঈশ্বরত্ব' হল—অসংখ্য মানবিক গুণ ও অবস্থার আধ্যাত্মিক সমন্বয় যা মানুষের জড় ও সামাজিক বিবর্তনের প্রতি অধ্যায়ে প্রকাশ করে অখণ্ড 'সত্য' বা 'ঐক্যে'র মানবিক মূল্যটি। এই বিশ্লেষণের যথার্থ পরিণতিটিই হল—বিবেকানন্দের মানবদর্শন বা আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ। তাঁর আলোচনায় এটি যেন তাই হয়ে উঠেছে মানব অস্তিত্বে অসংখ্য বিরোধ বা বিভেদের মধ্যে এক সৃষ্টিশীল সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের আদর্শ বিশেষ, যেটি হল এক শান্ত, সংযত ও সুসংহত সমাজজীবন প্রতিষ্ঠার সার্থক পরিকল্পনা।

এই মানবিক আকুতি এবং মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যই প্রকাশিত হয়েছে ভারতীয় দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণনের শান্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্যে। 'A Quest for Peace' প্রবন্ধে তাই তিনি প্রকাশ করেছেন, 'Peace is the harmonising of men in their differences….'[২০]

১৯ True Humanism, p. XII
২০ The Creative Life, 1975, p. 63

শিক্ষাবিদ্ বিবেকানন্দ

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

[বিগত ৩ এপ্রিল ১৯৮৩ উদ্বোধন কার্যালয়ের 'সারদানন্দ হলে' অনুষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত মূল প্রবন্ধ।]

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপুরের বাগানবাড়িতে রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কাগজে লিখে দিয়েছিলেন,—"নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে।"[১] বলা বাহুল্য, তিনি সেই সময় তাঁর প্রিয় শিষ্যের জগতের আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু হিসাবে আত্মপ্রকাশের ঘটনাই মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ শুধু আধ্যাত্মিক অর্থে নয়, লৌকিক অর্থেও তাঁর দেশবাসীর শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি যে শুধু সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে কিছুদিন বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন[২] এবং পরবর্তী কালে খ্যাতনামা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্ হার্বার্ট স্পেন্সারের রচিত শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন[৩] তাই নয়, তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর দেশবাসীর, অর্থাৎ ভারতের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার একমাত্র পথ হল তাদের অন্নদান ও শিক্ষাদান। এর মধ্যে আবার শিক্ষাদানের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক, কারণ শিক্ষাবিস্তার ছাড়া জনগণের অন্নসমস্যার স্থায়ী সমাধান করা কখনই সম্ভব নয়। স্বামীজী জানতেন যে, ভারতের সাধারণ লোকদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিশেষ অভাব নেই। যুগ যুগ ধরে পুরুষানুক্রমে তারা এই জ্ঞান পেয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের ঐহিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন ব্যাবহারিক জ্ঞান ও সেই সঙ্গে মানুষের মতো আচরণ করার শিক্ষা। স্বামীজী তাঁর নানা রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে কিভাবে এই শিক্ষা দেওয়া যায়, সে-কথা আলোচনা করেছেন। এই সব উপাদানের ভিত্তিতে স্বামীজীর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তার মূলসূত্রগুলি এখানে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য : স্বামীজীর মতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য "মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।"[৪] এ-কথার অর্থ, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ মানুষ গড়া, শুধু চাকুরীজীবী বা ব্যবসায়ী বা কোন বৃত্তি-আশ্রয়ী ব্যক্তি তৈরি করা নয়। মানুষ গড়ার অর্থ ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার উৎকর্ষসাধন। এই মানুষ গড়ার প্রয়োজন অবশ্যই সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য, কারণ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কারাগারে বন্দী অপরাধী বা উন্মাদ ব্যক্তি ভিন্ন সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। স্বামীজী তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে

---

১ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

২ স্বামী গম্ভীরানন্দ, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা' ১ম ভাগ (কলিকাতা, ১৩৮৪ সন) পৃঃ ১৯:

৩ স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত এই অনুবাদ উদ্বোধন কর্তৃক 'শিক্ষা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

[সম্পাদকীয় মন্তব্য : হার্বার্ট স্পেন্সারের দার্শনিক চিন্তাধারায় স্বামীজী শৈশবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং স্পেন্সারের সঙ্গে তাঁহার চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও ছিল। স্পেন্সারের 'Education' গ্রন্থে ব্যক্ত শিক্ষানীতির প্রতি স্বামীজীর সশ্রদ্ধ মনোভাব থাকিলেও, উহার সর্বাংশেই তিনি একমত ছিলেন না, ইহা তাঁহার জীবনী হইতে জানা যায়। উক্ত 'Education'-এর বঙ্গানুবাদ স্বামীজী করিয়াছেন, তাহা অনেকের অনুমান মাত্র। উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'শিক্ষা' পুস্তকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।]

৪ 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (কলিকাতা, ১৯৬৩) (পরে শুধু 'বাণী ও রচনা' নামে উল্লিখিত), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪০০

একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা ?"[৫] অপর একজন জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন, "খালি বই-পড়া শিক্ষা হলে হবে না। যাতে character form (চরিত্র তৈরি) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এইরকম শিক্ষা চাই।"[৬] স্বামীজীর এই দুটি উক্তি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে: (ক) চরিত্রগঠন (যার মধ্যে বড় কথা সাহসী হওয়া), (খ) মানসিক বিকাশ, (গ) জীবন-সংগ্রামে উত্তীর্ণ হবার পাথেয় সঞ্চয় ও (ঘ) সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের উপকারের জন্য আত্মনিয়োগ করবার প্রবৃত্তি অর্জন।

শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ: উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কী ধরনের শিক্ষা-ব্যবস্থা থাকা উচিত, ছাত্রদের কোন্ কোন্ বিষয়ের চর্চা অবশ্য-কর্তব্য সে-সম্বন্ধেও বিবেকানন্দ তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট-ভাবে রেখে গেছেন। শরীর গঠনের জন্য ব্যায়াম, মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিল্প, সঙ্গীত বা অন্য কোন চারুকলার চর্চা, জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর পরিচয়ের জন্য ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য পাঠ, জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অধ্যয়ন, এবং আত্মার উন্নতির জন্য ধর্মচর্চা,—স্বামীজীর মতে এইগুলিই হচ্ছে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ।

জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে হলে আমাদের লৌহকঠিন পেশী ও বজ্রদৃঢ় স্নায়ুর প্রয়োজন, স্বামীজী এ-কথা জানতেন।[৭] তাই তিনি শরীর-চর্চাকে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। একবার তিনি সম্ভবত কিছুটা লঘুভাবেই এদেশের দুর্বলদেহী তরুণদের গীতাপাঠ ছেড়ে ফুটবল খেলা ধরতে বলেছিলেন। তাঁর জীবন, রচনা ও বক্তৃতার এক প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল বীররস। গীতার শ্রীকৃষ্ণ, রামায়ণের রামচন্দ্র ও মহাবীর হনুমান, এবং ভারত-ইতিহাসের রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দ প্রভৃতি বীর চরিত্রগুলি ছিল তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। বহু-বার নানাভাবে তিনি তাঁর হীনবীর্য দেশবাসীকে শক্তিমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করেছেন। তাদের বোঝাতে চেয়েছেন উপনিষদের সেই মহামন্ত্র—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

স্বামীজী নিজে সঙ্গীতচর্চা করতেন, এবং স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীতে মুগ্ধ হতেন, এ-কথা বহুজন-বিদিত। ভারতীয় ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে এবং সাধারণভাবে শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' বইটিতে আমরা দেখি স্বামীজী কলকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা, শিল্পকলানিপুণ রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কাছে ভারতীয় শিল্প ও সঙ্গীতের আদর্শ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করছেন।[৮] ভারতীয় শিল্পের রীতি, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন স্বামীজীর কাছে, এবং পরবর্তী-কালে হ্যাভেল সাহেব (Havell) ভারতীয় কান্তিবিদ্যা ও শিল্পদর্শন শিক্ষা করেন নিবেদিতার কাছে।[৯] মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য শিল্প-চর্চার প্রয়োজনীয়তা স্বামীজী বারবার স্বীকার করেছেন। চারুকলার মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ছন্দ সৃষ্টি করা সম্ভব।[১০]

৫ 'বাণী ও রচনা,' ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১০৭
৬ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৬
৭ ঐ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১১৫
৮ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬-১৯২
৯ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' (কলিকাতা, ১৩৮৫ সন), পৃঃ ৪৩৮, ৪৮৮
১০ ঐ, পৃঃ ৩৫৯

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে বিবেকানন্দ দেখেছিলেন ভারতের মতো অনগ্রসর, দরিদ্র দেশে স্বয়ং-নিয়োগ বা আত্মনির্ভরতা অর্জনের প্রশস্ত পথ। প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা হলে দেশে শিল্পের প্রসার হবে এবং তার দ্বারা কেরানীগিরি না করেও, বহুলোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে, এই ছিল তাঁর সহজ হিসাব। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী বলেছিলেন, "আমাদের চাই কি জানিস? স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই technical education, (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।"[১১] অভাব থেকে মুক্তি না আসলে লোকে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার কথা বেশিদিন শুনবে না, আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বহুল প্রচার ছাড়া ভারতবর্ষের মতো বিশাল অনগ্রসর দেশের অভাব বা দারিদ্র্য দূর করা কখনই সম্ভব নয়। তাই স্বামীজী এদেশের সাধারণ গ্রামবাসীর মধ্যেও বিজ্ঞানের চর্চা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যাবহারিক প্রয়োজনের কথা বাদ দিলেও আমরা লক্ষ্য করি যে, স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আগাগোড়া বৈজ্ঞানিক। আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যা কিছু বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিপন্থী তা একদিন বিনষ্ট হবেই এ-কথা তিনি জানতেন। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম ও প্রকৃত বিজ্ঞান যে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরিপূরক, এ-কথাও তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। ধর্ম-বিষয়ে অনেক সমস্যার মীমাংসা তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে করবার চেষ্টা করতেন। বেলগাঁওয়ের Forest Officer হরিপদ মিত্র, যিনি স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, লিখেছেন, "আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার [স্বামীজীর] বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন।"[১২] স্বামীজী বিজ্ঞানের এতই ভক্ত ছিলেন যে, একবার তিনি তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেন, "আমার মতে কিন্তু একজন scientific চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল, layman (হাতুড়ে) যারা বর্তমান science (বিজ্ঞান)-এর কিছুই জানে না…তারা যদি দু-চারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্য-লাভ আশা করা কিছু নয়।"[১৩] এই ধরনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া বর্তমান যুগের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান প্রায় অসম্ভব বলা চলে।

চতুর্থত, স্বামীজী আমাদের দেশের প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্য (Classics) পাঠের উপরেও জোর দিতেন। প্রাচীন সাহিত্যপাঠের প্রধান উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। বিদ্যা শুধু অর্থকরী হলে তার মাধ্যমে বিদ্যার্থীর জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন হয়তো সম্ভব, কিন্তু জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে সমগ্র দেশ বা জাতির পক্ষে সেই বিদ্যা কল্যাণপ্রসূ নাও হতে পারে। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ হতে ছোট ছোট গল্প নিয়ে সেগুলির বাংলা অনুবাদ করে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়াবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।[১৪] আবার জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয়লাভের জন্য তিনি ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা

১১ 'বাণী ও রচনা,' ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩
১২ ঐ, পৃঃ ৩৭৩-৩৭৪
১৩ ঐ, পৃঃ ২০৮
১৪ ঐ, পৃঃ ৪০৫

বলতেন। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে তিনি বলেন, "যাদের দেশের ইতিহাস নেই, তাদের কিছুই নেই।...একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতটাকে টেনে রাখে, নীচু হতে দেয় না।"[১৫] এই ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিবেকানন্দের

সর্বোপরি স্বামীজী ধর্মশিক্ষাকে অন্য সব শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে গণ্য করতেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "গোড়ার কথা—ধর্ম। ধর্মটা যেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি।"[১৬] ধর্মশিক্ষার দ্বারা অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে না, এ-কথা সত্য। কিন্তু ধর্ম মানুষকে ত্যাগ ও সেবার প্রেরণা দেয়, এবং সর্ববিধ জাগতিক ভয় দূর করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে। এই রকম নির্ভীক মানুষই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সিংহবিক্রমে সমাজের সব রকম অনাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণ উপলব্ধি, ধর্মেরও তাই। সুতরাং ধর্মকে বাদ দিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকবে, এই ছিল স্বামীজীর ধারণা। অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে, ধর্ম বলতে স্বামীজী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মতবাদ বা বিশ্বাসকে বোঝাতেন না, ধর্মের অর্থ এই ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতা, যা পৃথিবীর সব ধর্মেরই মূল কথা।

স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পাঠক্রম: স্বামীজীর যুগে ভদ্রঘরের ভারতীয় মহিলাদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য চাকরি করার কথা কেউই চিন্তা করতে পারেননি। এ-ব্যাপারে অর্থনৈতিক তাগিদও তেমন ছিল না। তবে সে-যুগে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের নানা উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ হয়েছিল, এবং মূলত পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণে মেয়েদের স্কুল-কলেজও গড়ে উঠছিল, যদিও মুসলমান সমাজ এবং হিন্দু সমাজেরও বৃহত্তর রক্ষণশীল অংশ মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেবার বিরোধী ছিল। একান্নবর্তী পরিবার এবং মেয়েদের বাল্যবিবাহ প্রথাও তাদের উচ্চশিক্ষার পরিপন্থী ছিল। স্বামীজী মনে করতেন যে, ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবার জন্য সব চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ছিল দুটি জিনিস,—বাল্যবিবাহের অবসান ও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার। তবে স্বামীজী স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটি স্বতন্ত্র পাঠক্রম নির্দেশ করে-ছিলেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে তিনি বলেন, "ধর্মকে centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন...এজন্য শিক্ষার দরকার।"[১৭] বিবেকানন্দের মতে স্ত্রীশিক্ষার পাঠক্রমে থাকবে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য (বিশেষত আমাদের প্রাচীন চিরায়ত সাহিত্য), শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কিছুটা ইংরেজী। এ-ছাড়া মেয়েদের রন্ধনবিদ্যা, সূচীশিল্প, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সন্তান-সন্ততির পরিচর্যা ইত্যাদিও শিক্ষা করতে হবে। এর ফলে গৃহস্থালির উৎকর্ষ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, এবং প্রয়োজন হলে মেয়েরা কিছুটা আত্মনির্ভরও হতে পারবে। স্বামীজী মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র মঠ তৈরি করে সেখানকার শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছিলেন।[১৮] ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংযম ভারতীয় নারীর অলঙ্কার এবং সেবাধর্ম তাদের জীবনব্রত,—এ-কথা তিনি জানতেন ও মানতেন।[১৯] তাই তিনি তাদের আধুনিক পাশ্চাত্য নারীর আদর্শে গড়ে তোলবার পক্ষপাতী ছিলেন না। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর স্ত্রীশিক্ষার আদর্শকেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ে সার্থক রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

---

১৫ ঐ, পৃঃ ৪০১ ১৬ ঐ, পৃঃ ৪০২ ১৭ ঐ, পৃঃ ২০৫
১৮ ঐ, পৃঃ ৩৪, ৩৮, ২০২ ১৯ ঐ, পৃঃ ২০২-২০৩

শিক্ষার বাহন : মাতৃভাষাকেই স্বামীজী শিক্ষার বাহন হিসাবে চেয়েছিলেন, তবে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার চর্চা করাও প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই কিছুটা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রয়োজন, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার সার্থক অনুশীলন কোন একটি ইউরোপীয় ভাষার মাধ্যমেই সম্ভব।[২০] ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে ইংরেজী অবশ্যই একটি বিশেষ উন্নত ভাষা, এবং ভারতবর্ষে যেহেতু রাজনৈতিক কারণে এই ভাষার প্রচলন সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে, সেহেতু এটিকে বর্জন করে আর একটি ইউরোপীয় ভাষাকে সার্বজনীন শিক্ষার বিষয় করার পশ্চাতে বিশেষ কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তবে সমাজের সকলকেই ইংরেজী শিখতে হবে, এ-কথা স্বামীজী কোথাও বলেননি। তাঁর 'ত্রিভাষা সূত্র', শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা, সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে সংস্কৃত এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংরেজী,—আমাদের মতে আজও স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য আদর্শ ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা। শুধু মাতৃভাষাকে রেখে ইংরেজী এবং সংস্কৃত দুটোকেই যদি আমরা বর্জন করি এবং সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী বা কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে গ্রহণ না করি, তাহলে ভারতীয় সংস্কৃতির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

শিক্ষার পরিবেশ : যেহেতু শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন, তাই স্বামীজী শিক্ষালাভের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথাও বলেছেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষালাভের আদর্শ পরিবেশ পাওয়া যাবে প্রাচীন ভারতের গুরুকুল ব্যবস্থায়, যার মূল কথা হল গুরুর সান্নিধ্যে বসবাস।[২১] শিক্ষক শুধু কতকগুলি জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যাতা হবেন না, তাঁর আসল কাজ হবে নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়া, তাদের চরিত্র গড়ে তোলা। গুরুকুল পদ্ধতির উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন, "শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নয়।... বিশ্বাস, নম্রতা এবং শ্রদ্ধা ছাড়া আমাদের মধ্যে কোন রকম সম্প্রসারণই কল্পনা করা যায় না। যে-সব দেশ ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে ও বজায় রাখতে সমর্থ হয়নি, সেখানে শিক্ষক কথকেরই (lecturer) ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এবং সেখানে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষকের ভাষণ মস্তিষ্কে ভরে নিয়ে যেতে। তারপর অবশ্য আর কিছু করা হয় না।"[২২] বেদান্ত বলছে জ্ঞান মানুষের অন্তর্নিহিত। শিক্ষা সেই জ্ঞানের উপলব্ধি বা জাগরণ মাত্র। শিক্ষকের প্রধান কাজ হবে ছাত্রকে ঐ উপলব্ধির পথে সাহায্য করা, স্বামীজীর ভাষায়, "ছেলেগুলো যাতে নিজ নিজ হাত-পা, নাক-কান, মুখ-চোখ ব্যবহার করে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিতে শেখে, এইটুকু করে দিতে হবে। তাহলেই আখেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে।"[২৩] উপনিষদে বর্ণিত সত্যকামের গল্পের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলেও মানুষ তা থেকে প্রকৃত শিক্ষা পেতে পারে। শিক্ষক শুধু এই জ্ঞান-আহরণ কার্যটির তত্ত্বাবধান করবেন। স্বামীজীর কথিত এই পদ্ধতির সঙ্গে বর্তমান যুগের heuristic method of education-এর

২০ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ,' পৃঃ ৩৬০
২১ 'বাণী ও রচনা,' ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪০০-৪০১
২২ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ,' পৃঃ ৩৫৬-৩৫৭
২৩ 'বাণী ও রচনা,' ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪০২

বিশেষ সঙ্গতি আছে। প্রাচীন যুগে গ্রীকদের দৃষ্টিভঙ্গিও অনেকটা ঐ রকম ছিল।[২৪]

বিদ্যাচর্চার প্রেরণা লাভের জন্য স্বামীজী ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য পালনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। স্বামীজী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা হতেই বুঝেছিলেন যে, ব্রহ্মচর্যের মধ্যে যে আত্মসংযমের ব্যবস্থা আছে তা প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অভিনিবেশ সৃষ্টির বিশেষ অনুকূল। স্বামীজী একবার তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেন, "একমাত্র ব্রহ্মচর্য পালন ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—[মানুষ] শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়।"[২৫] তবে ছেলেমেয়েরা নির্দোষ আনন্দ করবে না, ফূর্তি করবে না, এও তিনি চাননি। গোমড়ামুখো লোক তিনি কখনই পছন্দ করতেন না। এই ব্যাপারে তিনি সদানন্দময় পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত অনুসারী ছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তা অনেকটা গুরুকুল ব্যবস্থারই অনুরূপ ছিল। পরে অবশ্য তাঁরই স্থাপিত বিশ্বভারতী সেই আদর্শ থেকে অনেকটা সরে এসেছে।

গণশিক্ষার ব্যবস্থা : পরিশেষে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, "যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—রাজশাসন ও দম্ভবলে দেশের সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া, অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।"[২৬] কিন্তু দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে গুরুকুলে বাস করে বিদ্যার্জন করা সব সময় সম্ভব না হতে পারে। তাদের অনেকের পক্ষে কলকারখানা বা খেত-খামারের কাজ ফেলে বিদ্যালয়ে দীর্ঘকালের জন্য যোগদান করাই সম্ভব নয়,—আবাসিক বিদ্যালয়ে বা গুরুগৃহে বাস করা তো দূরের কথা। তাই তিনি চেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা ভারতের বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে ঘুরে বেড়িয়ে একদিকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের উদার, বিশ্বজনীন ধর্মভাব প্রচার করবেন, তেমনি অপরদিকে দরিদ্র ও নিপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে অন্ন ও বিদ্যা বিতরণ করবেন এবং তাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করবার চেষ্টা করবেন। গরীবের ছেলেরা যদি স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখতে না পারে, তাহলে তাদের বাড়িতে গিয়েই শেখাতে হবে।[২৭] ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি সাধারণ গ্রামবাসীদের শেখানোর কথা তিনি বলেছিলেন,[২৮] কারণ তা না হলে তাদের বহুযুগসঞ্চিত কুসংস্কার দূর করা এবং পুরোহিত ও মৌলবীদের গ্রামীণ সমাজের উপর প্রভাব খর্ব করা কখনই সম্ভব হবে না। 'ম্যাপ,' 'গ্লোব,' 'ম্যাজিক-লণ্ঠন' প্রভৃতি ব্যবহার করে এই জনশিক্ষার ব্যবস্থাকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার কথাও স্বামীজী বলেছেন। এ থেকে মনে হয়, বর্তমান যুগের audio-visual methods of education সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকাকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী বলেছেন, "দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই।" তাদের শিক্ষাকেন্দ্রে "কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে, এবং

২৪ 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ,' পৃঃ ৩৫৬ ২৫ 'বাণী ও রচনা,' ৯ম খণ্ড, পৃঃ ২১০
২৬ 'বাণী ও রচনা,' ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৬ ২৭ ঐ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১২ ২৮ ঐ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮

শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা (Workshop) খোলা যাবে।"[২৯] বলা বাহুল্য, এইভাবে শিক্ষাবিস্তার করার জন্য কিছুটা অর্থের প্রয়োজন ছিল। স্বামীজী তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, এই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই তিনি আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন।[৩০]

উপসংহার : স্বামীজীর শিক্ষা-পরিকল্পনার অনেকখানিটাই আমরা আজও বাস্তবে রূপায়িত করতে পারিনি, অনেক জায়গায় আমরা তাঁর আদর্শের বিপরীত পথে চলেছি। পশ্চিমবঙ্গে আমরা আজ সংস্কৃত ভাষাকে প্রায় বর্জন করতে চলেছি, ভারতের অন্যত্রও এই ভাষার আদর ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। এর ফলে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি চর্চার পথ যে অদূর ভবিষ্যতে দুর্গম হয়ে উঠবে, এ-কথা আমরা বোধ হয় মনে রাখছি না। ধর্মশিক্ষাও আজ আমাদের পাঠক্রম থেকে নির্বাসিত। ধর্ম জিনিসটি যে আদৌ রক্ষণশীলতা বা সাম্প্রদায়িকতার সমার্থক নয়, এ-কথা বোঝাবার জন্য সম্ভবত আর একজন বিবেকানন্দের আবির্ভাব প্রয়োজন। নীতিশিক্ষার কথা বললেও আজ তা অনেকের হাসির খোরাক জোগাবে, কারণ পাঠ্যপুস্তকের বাইরে, সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি আজ ক্রমবর্ধমান। যে শিক্ষকরা নীতি-শিক্ষা দেবেন, তাঁদের আচরণ যদি সর্বতোভাবে সুনীতির পরিচায়ক না হয়, তাহলে তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষাও কার্যকরী হবে না। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি-বিদ্যার চর্চা আগের তুলনায় অনেক প্রসার লাভ করলেও স্বামীজীর ইচ্ছামতো আমরা আজও আমাদের দেশের অগণিত গ্রামবাসীর কাছে বিজ্ঞানের মূল বক্তব্যগুলি পৌছিয়ে দিতে পারিনি। স্থানে স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টায় গুরুকুলের অনুরূপ বৃহৎ আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের পক্ষে তা অপর্যাপ্ত। বর্তমানে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে তা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধাবী ছাত্রদের প্রতিভার স্ফুরণ হয়তো অসম্ভব নয়। অতীতের তুলনায় ভবিষ্যতের ভারতবর্ষে অনেক বেশি সংখ্যায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদের জন্ম হবে। কিন্তু সমগ্র সমাজের কল্যাণ বা উন্নতি এবং ব্যক্তির চরিত্রগঠনের পথ তার ফলে প্রশস্ততর হবে কিনা, তা খুবই সন্দেহের বিষয়। তা যদি না হয়, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আদর্শ বলা যাবে কি?

২৯ ঐ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৮

৩০ ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪১২-৪১৩

তোমরা এখন যে-শিক্ষা পাইতেছ, তাহার কতকগুলি গুণ আছে বটে, কিন্তু আবার কতকগুলি বিশেষ দোষও আছে, আর দোষগুলি এত বেশী যে, গুণভাগ নগণ্য হইয়া যায়। প্রথমতঃ ঐ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না—ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিভাবপূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় অথবা অন্য যে-কোন নেতিমূলক শিক্ষায় সব ভাঙিয়া-চুরিয়া যায়—মৃত্যু অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। বালক স্কুলে গিয়া প্রথমেই শিখিল—তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আচার্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই যে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'-এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, পঞ্চাশ বৎসরের এইরূপ শিক্ষায় ভারতের তিনটি প্রেসিডেন্সির ভিতরে মৌলিকচিন্তাযুক্ত একটি মানুষও পাওয়া যায় না। যিনি মৌলিকভাবপূর্ণ, তিনি অন্যত্র শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এদেশে নয়; অথবা তিনি নিজেকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। মাথায় কতকগুলি তথ্য ঢুকানো হইল, সারাজীবন হজম হইল না, অসম্বদ্ধভাবে সেগুলি মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণের ভূমিকা

ডক্টর অরুণকুমার দত্ত

ম্যালেরিয়া কীভাবে হয়—ম্যালেরিয়া একটি সংক্রামক রোগ। বিশেষ কয়েক প্রকার স্ত্রীজাতীয় এনোফিলিস মশার কামড়ে এই রোগ ছড়ায়।

একজন ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ানোর ফলে মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু (পরজীবী) ঢোকে। দশদিন পর ঐ জীবাণু মশার দেহে পরিপুষ্ট হলে মশা যখন একজন সুস্থ লোককে কামড়ায়, তখন ঐ লোকটির রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবেশ করে এবং তার ম্যালেরিয়া হবার সম্ভাবনা ঘটায়।

এই ম্যালেরিয়ার জীবাণু বা পরজীবী (Malaria parasites) চার প্রকারের হয়। তার মধ্যে আমাদের দেশে দুই প্রকার জীবাণু উল্লেখযোগ্য। যথা—(১) প্ল্যাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স (Plasmodium vivax) ও (২) প্ল্যাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম (Plasmodium falciparum)। এই দুই জীবাণুর মধ্যে P. falciparum-এর আক্রমণই সবচেয়ে মারাত্মক এবং তাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি।

ম্যালেরিয়া জ্বরের বৈশিষ্ট্য—হঠাৎ শীত করে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসা (Cold stage বা শীত অবস্থা)। তারপর গায়ের উত্তাপ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাওয়া (Hot stage বা জ্বর অবস্থা), শেষে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া (Sweating stage বা ঘর্ম অবস্থা)।

এই জ্বর প্রতিদিন, একদিন অন্তর বা চারদিন অন্তর হতে পারে। তবে ম্যালেরিয়ায় যে কোন ধরনের জ্বরই হতে পারে।

P. falciparum-এর আক্রমণে জ্বরের সঙ্গে মাথা ব্যথা, ঘাড় শক্ত হওয়া, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গও হতে পারে। একে Cerebral malaria বলে। একমাত্র রক্তপরীক্ষার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগ সঠিকভাবে ধরা যায়। ছুঁচ দিয়ে আঙুলে ফুটিয়ে সামান্য একটু রক্ত কাচের স্লাইডে নিতে হয় এর জন্য।

ওষুধ খাবার আগেই রক্তপরীক্ষা করতে হবে।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ আমাদের দেশের অধিকাংশ এলাকা থেকে ম্যালেরিয়া রোগ প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে বিভিন্ন কারণে ম্যালেরিয়া আবার বাড়তে আরম্ভ করে এবং এখন ম্যালেরিয়া রোগ সারা পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে বেশ ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও, যথা—আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেড়েছে।

ম্যালেরিয়া রোগবৃদ্ধির কারণ—একটি উল্লেখযোগ্য কারণ, বর্তমানে ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশক নিধনের জন্য যে কীটনাশক ওষুধ, যথা—ডি. ডি. টি., বি. এইচ. সি. (D.D.T., B. H. C.) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, তার বিরুদ্ধে কিছু কিছু এনোফিলিস জাতীয় মশার দেহে প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধি (Insecticide resistance)। তাছাড়া ম্যালেরিয়ার প্রধান ওষুধ যে ক্লোরোকুইন (Chloroquine), তার বিরুদ্ধেও কোন কোন এলাকায় ম্যালেরিয়া জীবাণুর প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধি (Drug resistance)। তবে এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ এলাকায় বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে অনেক জায়গায় কীটনাশক ওষুধ হিসাবে D. D. T. ও B. H. C. এবং জীবাণুনাশক ওষুধ হিসাবে Chloroquine বিশেষ কার্যকরী।

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণের ভূমিকা—ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শুধু সরকারী প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়, জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতাও বিশেষভাবে কাম্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমাদের দ্বিমুখী অভিযান চালাতে হবে :

(১) ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশককুল ধ্বংস করা, মশা যাতে না জন্মাতে পারে তার উপায় অবলম্বন, মশার কামড় হতে নিজেকে যথাসম্ভব রক্ষা করা।

(২) জ্বরের রোগীর রক্তপরীক্ষার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগী খুঁজে বের করা এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

যেখানেই জল জমে, মশা সেখানেই ডিম পাড়ে। এনোফিলিস মশা সাধারণতঃ পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে। এই ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ মশা হতে দশদিন সময় লাগে। অতএব আমরা যদি বাড়িতে বা বাড়ির চারপাশে সাতদিনের বেশি কোথাও জল জমতে না দিই, তবে মশার জন্ম অনেকাংশে রোধ করা যায়। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, বাড়ির চারপাশে নালা-নর্দমায় যাতে জল জমে না থাকে, বাড়িতে বা রাস্তার ধারে Water-tap leak করে যাতে জল না জমে, তার ব্যবস্থা করা। বাড়িতে Air-cooler বা Air-conditioner থাকলে জলাধার প্রতি সপ্তাহে খালি করে দেওয়া উচিত; চৌবাচ্চা বা জলাধারের ঢাকনা সবসময় বন্ধ রাখা উচিত। বৃষ্টির জল যাতে পরিত্যক্ত টিনের পাত্র, মাটির পাত্র, নারকেলের মালা, মোটরের টায়ার ইত্যাদিতে জমে না থাকে, সেদিকে নজর রাখা দরকার। জমা জলের উপর কয়েক ফোঁটা কেরোসিন ছিটিয়ে দিলেও মশার শূককীট মরে যায়।

বাগানের মধ্যে জলাশয় থাকলে, তাতে গাম্বুসিয়া বা গাপ্পি (Gambusia বা Guppy) মাছের চাষ করা যেতে পারে। এই জাতীয় মাছ মশার শূককীটকে খেয়ে ফেলে।

যাদের সঙ্গতি আছে, তারা অবশ্যই রাত্রে শোবার সময় মশারি ব্যবহার করবেন, যাতে মশা কামড়াতে না পারে। মনে রাখা দরকার, মশা শুধু ম্যালেরিয়া রোগই ছড়ায় না—ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গুজ্বর, জাপানী এন্‌কেফালাইটিস ইত্যাদি মারাত্মক রোগও অন্য কয়েক ধরনের মশার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

গ্রামের বাড়িতে ডি. ডি. টি. বা কীটনাশক ওযুধ ছড়াতে এলে প্রতি ঘরে, যথা—শোবার ঘর, বসবার ঘর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর ও বারান্দার ভিতরের দেওয়ালে, ছাদের অভ্যন্তর ভাগে, চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদির তলদেশে ভালভাবে ডি. ডি. টি. ছড়িয়ে নেওয়া উচিত। মশা এই ডি. ডি. টি.-র সংস্পর্শে এলে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। এই ওষুধের প্রতিক্রিয়া আড়াই থেকে তিনমাস কার্যকরী থাকে। কাজেই ডি. ডি. টি. ছড়ানোর পর অন্ততঃ তিনমাস বাড়ির ভেতরের দেওয়ালে চুনকাম করা বা গোবর, কাদামাটি ইত্যাদি লেপা উচিত নয়।

আপনার বা পরিবারের কারও জ্বর হলে জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি অবশ্যই রক্তপরীক্ষা করিয়ে নেবেন এবং রক্ত দেবার পরে বয়সের মাত্রা অনুযায়ী ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক হিসাবে ক্লোরোকুইন বড়ি খাবেন। এই বড়ি সম্পূর্ণ নিরাপদ। যে কোন প্রকার জ্বরেই এই বড়ি খাওয়া চলে। এই বড়ি যে কোন সরকারী হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিস্পেনসারী, পঞ্চায়েত অফিস ও জনস্বাস্থ্য-কর্মীর নিকট বিনামূল্যে পাওয়া যায়। ওষুধের দোকানেও নামমাত্র মূল্যে এই বড়ি কিনতে পাওয়া যায়।

এই বড়ি খালিপেটে খাওয়া উচিত নয়।

Chloroquine বা Amodiaquine বড়ির মাত্রা হল :

১ বছর বয়সের নিচে—৭৫ মিলিগ্রাম বা ½ খানা বড়ি
১ থেকে ৪ বছর বয়সে—১৫০ „ বা ১টি বড়ি
৪ থেকে ৮ বছর বয়সে—৩০০ „ বা ২টি বড়ি
৮ থেকে ১৪ বছর বয়সে—৪৫০ „ বা ৩টি বড়ি
এবং ১৪ বছর বয়সের উর্ধ্বে—৬০০ „ বা ৪টি বড়ি

এই বড়ি খেলে (একই মাত্রায়) কারও রক্তে যদি ম্যালেরিয়ার জীবাণু থাকে, তা নষ্ট হয়। তবে রক্তপরীক্ষার পর যদি রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ধরা পড়ে, তবে শরীর থেকে জীবাণু সম্পূর্ণ মুক্ত করার জন্য পাঁচদিনের বিশেষ চিকিৎসা নিতে হয়। যে কোন সরকারী হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও জনস্বাস্থ্য-কর্মীর নিকট বিনামূল্যে এই বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। ঐ ওষুধটির নাম প্রাইমাকুইন (Primaquine)।

এইভাবে আমাদের সমবেত চেষ্টায় আমরা দেশ থেকে ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করতে পারি।

মা'র কাছে যাওয়া

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

ছোট ছেলে বলেছিল,
'মা'র কাছে যাবো।'
সে-কথা দক্ষিণেশ্বরে
মায়ের মন্দিরে
কখন পৌঁছে দিলেন
স্বয়ং ঠাকুর।
'সব খেলা হয়ে গেছে,
আর না, আর না'—
শিশুর কান্না—
'যাবো মা'র কাছে যাবো।'
তারপর থেকে,
তার সব যাওয়া,
মা'র কাছে যাওয়া।

খেলনা পেয়েছি কত,
খেলনা ভেঙেছি,
খেলনা পাইনি কত,
পেয়েও ছেড়েছি।
এখন বিকেল বেলা
রোদ পড়ে আসে
বিচিত্র বাসনা-মেঘে
অস্তসূর্য হাসে।
মন শুধু কেঁদে বলে
'আর না, আর না'—
শুনতে পাও কি মাগো
শিশুর কান্না।

শ্রীশ্রীসারদাদেবীদশকম্

জীবানন্দস্বামিনা রচিতম্

অনুপমগুণযুক্তা রামকৃষ্ণস্য শক্তি-
র্নিখিলমনুজচিত্তে শান্তিদা স্নেহশীলা।
জনহৃদয়সরোজে চিন্তনীয়া সদা বৈ
জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বমাতা ॥১

চরণকমলযুগ্মং নিত্যসিক্তং কৃপাব্ধি-
র্দদিবিমলমতিং সা যচ্ছতি জ্ঞানভক্তিম্।
সততমসুখহন্ত্রী শাশ্বতী নিত্যমুক্তা
জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বমাতা ॥২

স্বগুরুপরমপত্ন্যা পূজিতা শুদ্ধরূপা
ভুবি বিমলযোগে সুস্থিতা চানবদ্যা।
ভুবনজনহিতার্থং সাবতীর্ণা কৃপার্দ্রা
জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বমাতা ॥৩

জননমরণহন্ত্রী চাদ্যশক্তিঃ সদাম্বা
সুরনরযতিপূজ্যা দিব্যকারুণ্যরূপা।
বিধৃতমনুজমূর্তিঃ পুণ্যলীলাসু পৃথ্ব্যাং
জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বমাতা ॥৪

কঠিনতপসি সক্তা সাধিকা শ্রেষ্ঠসিদ্ধা
মনসি বচসি কায়ে ত্যাগভাবো হি তস্যাঃ।
অনীশমমলভাবৈ-র্ব্রহ্মসংলগ্নচিত্তা
জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বমাতা ॥৫

দুরিতদমনশীলা শুদ্ধিদাত্রী জনানাং
সুকৃতদুরিতবদ্ভি-র্বন্দনীয়া সুদেবী।
অভিনবনরলীলা দর্শিতা বৈ তয়ৈবং
জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বমাতা ॥৬

প্রভৃতি হি শিশুকালাৎ সা সুসেবারতা বৈ
পতিগুরুসুখদাত্র্যাঃ স্বামিসেবা হ্যপূর্বা।
জনগণহিতমগ্না সুপ্রসন্না পরাত্মা
জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বমাতা ॥৭

মনসি পরমদিব্যো মাতৃভাবস্তদীয়ঃ
প্রচলতি সততং বৈ শ্বাসকার্যেঽপি তস্যাঃ।
স্বয়মপি চ মমাম্বা শাশ্বতী মাতৃরূপা
জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বমাতা ॥৮

অগণিত মহিলা বৈ ব্রহ্মসংস্থা বিদুষ্যঃ
সুবিপুলজগতীহায়ান্তি ভাবশ্রয়েঽস্যাঃ।
অতিশয়শুচিভাবৈ-র্ভবৈর্বৈ সুপূর্ণা
জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বমাতা ॥৯

নিখিলভয়নিহন্ত্রী নিত্যকালী সদা যা
দুরিতদমনদুর্গা বাসন্তী শারদীয়া।
হৃদি সুবিমলবিদ্যা-জ্ঞানদা ভারতী সা
জয়তু জয়তু দেবী সারদা বিশ্বমাতা ॥১০

ইতি শ্রীশ্রীসারদাদেবীদশকম্ ॥

অরূপের রূপ

শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়

একটা একটা রূপ অরূপ হয়ে যায়।
সমুদ্রের কাছে যত এগোতে থাকি
হাত বাড়িয়ে দিয়ে সমুদ্র বলে বুকে আয়।
অনেকদিন সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখেছি
সাদা, কালো, ধনী, গরীব—একই আহ্বান শুনছে।
সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে মায়ের কোলে।
কোলে দোল খেতে খেতে সবাই শিশু হয়ে যায়।
মানুষের দেবত্বের রূপ ফুটে ওঠে।
সমুদ্র যেখানে আকাশে গিয়ে মেশে
সেখানে মনে হয় তুমি হাত বাড়িয়ে সবাইকে ডাকছ ঃ

চলে আয়, চলে আয়।
মানুষের প্রতিদিনের প্রাণধারণের জন্যে যে যুদ্ধ
সে যুদ্ধে কত রক্তক্ষরণ হচ্ছে।
কেউ কেউ পাগলের মতো ছুটে চলেছে
কেউ বা শান্ত।
দুঃখে তাপিত বা সুখে বিগলিত
সবাইয়ের জন্যেই তোমার ব্যাকুলতা।
সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে তাই তোমার আহ্বান শুনতে পাই ঃ

কে কোথায় আছিস, ছুটে আয়,
ছুটে আয় আমার বুকে।
সব জ্বালার অবসান করতে
শান্তি পেতে
আমি তোদের সকলের মা
আমি যে সারদা।

স্মৃতি-কণা

শ্রীমতী উষারানী বসু

শ্রীশ্রীমায়ের মুখ ভারী কখনও দেখিনি। সেই একদিন দেখেছিলাম। কি একটা পার্বণ ছিল, শ্রীশ্রীমা ও নলিনী গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলেন। নলিনীর কাঁখে গঙ্গাজলের ঘড়া ছিল। স্নান করে দুজনে যখন ফিরছেন নলিনী বললে, "ও পিসিমা, নোংরা মাড়িয়ে ফেলেছি।" মা বললেন, "তাতে আর কি হয়েছে? মাথায় গঙ্গা আছে। ঐ তো কল রয়েছে, পা ধুয়ে ফেল।" নলিনী কিছু না বলে সোজা বাড়ি এসে একেবারে কলতলায় গিয়ে আবার স্নান করে গঙ্গাজলের ঘড়া ধুয়ে, ভিজে কাপড়ে শ্রীশ্রীমার সামনে আসতে মা বললেন, "একি! মাথায় গঙ্গা, আবার স্নান করলি?" আমরা বাড়ি থেকে সকলে গাড়ি করে পার্বণ বলে গঙ্গাস্নান করে শ্রীশ্রীমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। ঠিক সেই সময় নলিনীও এসেছে স্নান করে, আর শ্রীশ্রীমা বকছেন। সেই একদিন মার রাগের মুখ দেখেছিলাম। আর বুঝেছিলাম, শ্রীশ্রীমা শুচিবাই পছন্দ করতেন না।

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ১৩০৮ সাল হবে। আমরা মামার বাড়িতে। নিচে কলতলায় আমার মা স্নান করিয়ে দিয়ে গামছা হাতে দিয়ে আমাকে বললেন, "উপরে যা দিদিমার কাছে, গা মুছিয়ে দেবেন।" উপরে সিঁড়ির পাশের ঘরে (যেখানে ছোটমামাবাবু থাকতেন শেষে) শ্রীশ্রীমা থাকতেন তখন। আমি উপরে উঠতেই উনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি আমার গা মুছিয়ে, পা মুছিয়ে দিচ্ছেন। আর ঠিক সেই সময় দিদিমা ঠাকুরঘর থেকে দালানে আসতেই আমায় দেখতে পেয়েছেন। দিদিমা তাড়াতাড়ি এসে বললেন, "প্রণাম কর্, প্রণাম কর্। ছি ছি, মা পায়ে হাত দিচ্ছেন।" আমি তাড়াতাড়ি প্রণাম করলাম। শ্রীশ্রীমা দুহাতে আমায় কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "ও ছোট মানুষ, ওর কোন দোষ নেই।" মা ও মাগো, সেই রকম করে এই সময় তুলে নাও না মা!

মামার বাড়ি থাকতাম, দিদিমার সঙ্গে রোজই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যেতাম। একদিন (শনিবার ছিল) সকালে দিদিমার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করে আসার সময় দিদিমা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতেই রেখে এলেন আমায়। শ্রীশ্রীমা তখন ঠাকুরঘরে (মায়ের বাড়ীতে) পূজা করছেন। ঠাকুরের পূজা শ্রীশ্রীমা নিজেই করতেন। পূজা সারা হলে শ্রীশ্রীমা আমাদের সবাইকে অর্থাৎ আমাকে এবং মাকু, নলিনী ও রাধুকে প্রসাদ দিলেন। গোলাপ-মা আবার তখন একটি ছোট ধামা করে মুড়ি ও তেলেভাজা এনে মাকে দিলেন। শ্রীশ্রীমা প্রসাদ করে আমাদের দিলেন আর রাধুকে বললেন, "এই যা, শরৎকে দিয়ে আয়।" রাত্রে মামার বাড়ি ফিরে গেলাম। কি অপূর্ব মায়ের স্নেহ ভালবাসা! এখন সেই দিনের কথা মনে করেও শান্তি পাই।

আর একদিন বিকালে 'মায়ের বাড়ী' গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বসলাম। খানিকক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে ছাদে গেলাম। তারপর শ্রীশ্রীমা বললেন চুল আঁচড়ে দিতে। আমি তাই দিলাম। চিরুনিতে যে চুলগুলি ছিল সেগুলি আমার হাতে দিয়ে মা বললেন, "রেখে দাও।"

আর একদিন কি একটি পার্বণ ছিল মনে নেই। বাবা বললেন, "আজ তোমরা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যাও।" আমি তাড়াতাড়ি দুটি নারকেল কুরে বেটে ক্ষীর দিয়ে পাক করলাম। আমার

ঠাকুমাও আমায় সাহায্য করেছিলেন। আমার বয়স তখন বেশি নয়। সবে তখন আমার দীক্ষা হয়ে গেছে। সেই নারকেলের বরফি করে নিয়ে গেলাম, 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় গোলাপ-মার সঙ্গে দেখা। উনি বললেন, "কি এনেছিস, দেখি, দে।" আমি দিলাম। উনি দেখে বললেন, "একি কালো কেন? নিজে যেমন কান্টি, তেমন মিষ্টি!! এ মিষ্টি মা খাবেন না।" আমার মনে খুব দুঃখ হল যে, মা খাবেন না। যাই হোক ভোগ উঠল। তারপর আমরা সকলে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে প্রসাদ পেতে বসলাম। শ্রীশ্রীমা প্রসাদ করে একটি বাটি দিতেন আগে। গোলাপ-মা তা থেকে আমাদের সকলকে দিতেন। তারপর চন্দরকে দিতেন নিচে সাধুদের দেবার জন্য। শ্রীশ্রীমা ঐ নারিকেলের মিষ্টি একটু খেয়ে বলছেন, "হ্যাঁ গোলাপ, এই মিষ্টি কেউ দিয়েছে?" গোলাপ-মা আমায় দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ঐ যে কান্টি (আমি শ্রীশ্রীমায়ের সামনে বসেছি খেতে), ও করে এনেছে।" আমার চোখে জল এসে গেছে মিষ্টিটা ভাল হয়নি বলে। আমায় কালো বলায় নয়। শ্রীশ্রীমা গোলাপ-মাকে ঐ মিষ্টি দিয়ে বললেন, "একটু খেয়ে দেখ, কী সুন্দর হয়েছে খেতে! কালো একটু হলেও খেতে খুব ভাল হয়েছে।" শ্রীশ্রীমা তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের তিলকুট খাওয়ার ঘটনা বললেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। কি আশ্চর্য! শ্রীশ্রীমা মনের ব্যথা সব বুঝতে পারেন। কী সুন্দর সান্ত্বনা দিলেন!

যুক্ত হও মুক্ত হও

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

কালো কিংবা সাদা কিংবা যে কোনো রঙের মেঘ
ছায়া ফেলে ফেলে চলে যায়—যার যথারূপে,
সেই ছায়া কোথাও তো এতটুকু দাগ রাখে নাকো।
তুমি এই জীবনের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
যে কোনো রঙের মেঘ হও॥

যে কোনো প্রবাহ সূক্ষ্ম কি প্রশস্ত কি প্রচণ্ড
অবিরাম অবিচ্ছিন্ন ছুটে চলে সুদূর সঙ্গমে,
উন্মার্গ যদিই বা ফের ফিরে আসে যথাস্থানে।
তুমি উঁচুনিচু ছোটবড় সমস্ত তীরের বন্ধন
ছেড়ে ছেড়ে ক্রমাগত অগ্রসর হও॥

কত সাধে বৃক্ষলতা ঋতুমঞ্চে সাজে—
কতরূপ ডালপাতা ফুলফলে নানারঙে মাতে,
তারপর নির্বিকার নিজহাতে সকলি ঝরায়।
তুমি সকল কাজের মধ্যে বৃক্ষলতা হও॥

শ্রীশ্রীমায়ের অস্ফুট স্মৃতি

স্বামী জ্ঞানানন্দ

আমি পূর্ববঙ্গের লোক ছিলাম। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর প্রথম কলকাতায় আসি। কিছুই চিনি না জানি না, নতুন এসেছি—কলকাতায় হেঁটে হেঁটে শহর দেখে বেড়াচ্ছি; এমন পয়সা-কড়ি নেই যে, গাড়ি চড়ে বা ট্রামে বেড়াব। ছোটবেলা থেকেই আমি ভবঘুরের মতন—বাঁধাধরা সংসারী জীবন কোনদিনই আমার ভাল লাগত না। তবে সংসার ত্যাগ করে সাধু-সন্ন্যাসী হব এসব চিন্তা আদৌ তখন ছিল না বা স্বপ্নেও ভাবিনি। শরীরচর্চা, স্বদেশী আন্দোলন,—এই সবই ভাল লাগত এবং এই সব নিয়েই হৈ-চৈ করে বেড়াতাম।

কলকাতা এসে খোঁজ করতে করতে একদিন উদ্বোধনে এসে হাজির হলাম, উদ্দেশ্য—আমার অতি পরিচিত, আপনার মানুষ রাসবিহারী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। উদ্বোধন বাড়ির নিচের একটা ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। আমাকে দেখে তিনি খুবই খুশি হয়ে আলাপ করলেন। উঠে আসব আসব করছি মহারাজ বললেন, 'উপরে মা ঠাকরুন আছেন প্রণাম করে যা।' 'মা ঠাকরুন? তিনি আবার কে?' তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের নামটা শুনেছি এই পর্যন্ত। তিনি যেন কিছুটা জোর দিয়েই বললেন, তুই যা না, প্রণাম করে আয়। কি করি এভাবে বলছেন, অবাধ্য হতে পারলাম না। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম, কিন্তু প্রথমে কাউকেই দেখতে পেলাম না যে জিজ্ঞাসা করব 'মা ঠাকরুন কে'। সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম সামনের ঘরের ভিতর এক মহিলা, সর্বাঙ্গ প্রায় কাপড় দিয়ে ঢাকা, খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন, শুধু পায়ের আঙুলগুলো কিছুটা দেখা যাচ্ছে, স্থিরভাবে সামনের দিকে তাকিয়ে তিনি বসে আছেন। ইনিই 'মা ঠাকরুন' হবেন স্থির করে, বাইরে থেকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে দ্রুতপদে উদ্বোধন ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম।

বেশ কিছুদিন আর ওদিকে যাইনি; এর মাঝে কি খেয়াল হল পায় হেঁটে কাশী ঘুরে এলাম। কাশীতে গিয়ে এদিক ওদিক্ ঘুরলাম, কত সাধু-সন্ন্যাসীর আখড়া, এ-মন্দির ও-মন্দির ঘোরাঘুরি করলাম, কিন্তু কিছুই ভাল লাগল না। আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। ঠিক যেন ভবঘুরের জীবন। বাড়ি ফিরে যেতেও মন আর চায় না। কিন্তু কি করব তাও জানি না। ঘুরতে ঘুরতে আবার একদিন উদ্বোধনে গেলাম রাসবিহারী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। উনি তখন ওঁর ঘরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, আমি পাশে বসে ওঁদের কথা শুনছিলাম। 'কামারপুকুর', 'জয়রামবাটী' এইসব কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক চলে গেলে আমি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কামারপুকুর, জয়রামবাটী' কোথায়? তিনি বললেন, 'যাবি নাকি? যা না ঘুরে আয়, তুইতো খুব হাঁটতে পারিস, বলে পথের নিশানা বলে দিলেন আর বললেন, 'আমার পরিচয় দিস্, থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না।' কথাটা আমার মনঃপুত হল।

হাঁটাপথে কয়েকদিনের মধ্যেই কামারপুকুর এসে হাজির হলাম। দু-তিনখানা মাটির ঘর—এই শ্রীরামকৃষ্ণের পৈত্রিক বাড়ি। গ্রামটি ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম, পূর্ববঙ্গের গ্রামের তুলনায় গ্রামটি নেহাৎই ছোট—মাত্র কয়েক ঘর গৃহস্থের

বাস আর অধিকাংশই দরিদ্র। শীতের প্রারম্ভে আবহাওয়া খুবই মনোরম। কদিন এভাবে কাটল। একদিন একজন আমাকে বলল, 'মা ঠাকরুন এখন জয়রামবাটীতে আছেন। তাঁকে দর্শন করতে যাবেন না?' জয়রামবাটী? সে গ্রাম কতদূর জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, 'বেশি-দূর নয়, এই দু-তিন মাইল হবে।' এই দিক্—বলে হাত দিয়ে সেই দিক্ দেখিয়ে দিলেন। ঠিক করলাম, সেইদিনই খাওয়া-দাওয়ার পর যাব। দুপুরের পর মাঠের উপর দিয়ে সোজা রাস্তা ধরে হেঁটে এসে বাঁ দিকে পুকুরের পার দিয়ে ডান-দিক্ ঘুরে জয়রামবাটী গ্রামের ভিতর এগোতে লাগলাম। খুবই ছোট গ্রাম। একটা পাড়া বললেও চলে। সবই কুঁড়েঘর। রাস্তায় কাউকে দেখলাম না যে জিজ্ঞাসা করব। একটু সোজা হেঁটে যেতেই দেখলাম, রাস্তার বাঁ দিকে একটু ভিতরে একটা খোড়ো ঘরের বারান্দায় কে একজন মহিলা ঘরের দরজার চৌকাঠে হাত রেখে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অন্য হাতে একটা গামছা। সামনে জলের একটা ঘটী, রকের নিচে জল গড়িয়ে যাচ্ছে, হয়তো কিছুক্ষণ আগেই উনি হাত-মুখ ধুয়েছেন। তাঁকে দেখেই আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম। বারান্দার কাছে গিয়ে কি মনে করে আমি নিচে দাঁড়িয়েই বারান্দায় মাথা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। তিনি এগিয়ে এসে আমার চিবুক স্পর্শ করে চুমু খেয়ে বললেন, 'ভাল আছ বাবা, আমি তো তোমার কথাই ভাবছিলাম যে কখন তুমি আসবে।' অবাক লাগল কথাটা শুনে, বললাম, 'আপনি বোধ হয় আর কারোর সাথে আমায় ভুল করেছেন, আমাকে তো আগে আপনি কখনও দেখেননি—'

'কেন, তুমি সেদিন উদ্বোধনে গিয়ে আমায় প্রণাম করলে'—সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন। আমি বললাম, 'সে তো সামান্য একটু সময়, কোনও কথাবার্তাও হয়নি। আর আপনি যে আমাকে দেখতে পেয়েছেন তাও তো মনে হয়নি।' কথায় বাধা দিয়ে বললেন, 'না, আমি ঠিকই দেখেছি। ভুল করিনি।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তুমি ওদিকে যাওনা, ওরা সব আছে।'—বলে সেইদিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তখন আমি কি করে বুঝব, সে মুহূর্ত থেকেই তিনি করুণা করে তাঁর শ্রীচরণে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, আপনার করে নিয়েছেন।

এরপর মায়ের ইচ্ছানুসারে জয়রামবাটী এসেই বাস করতে লাগলাম। তখনও যে তাঁর উপর আমার কোন শ্রদ্ধাভক্তি হয়েছে বা আকর্ষণ হয়েছে তা বলব না; বরং পূর্বাভ্যাস মতো এইভাবে ঘোরাঘুরি করার দিকেই বেশি আকর্ষণ। এখানে আসার পর মায়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও বড় একটা করি না বা তার প্রয়োজনও বোধ করি না, কিন্তু তাহলেও তিনি যে এই অবোধ সন্তানের সব খবরই রাখছেন, সে-কথাটা আমি তখন বুঝিনি।

এভাবে দু-চারদিন কাটার পর কাছের এক গ্রাম থেকে মায়ের এক মন্ত্রশিষ্য মায়ের দর্শন, পূজা ইত্যাদির জন্য এলেন, সঙ্গে ফল-ফুল-মিষ্টি এই সব। সকালবেলা তাঁর দর্শনাদির পর আমরা যে ঘরে থাকতাম তার বারান্দায় এসে বসলেন, দুপুরে প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরবেন। আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় তাঁর বাড়ি, কতদূর সে গ্রাম, কখন ফিরবেন, আর সেই সঙ্গে বললাম, আমি তাঁর সঙ্গে তাঁদের গ্রাম দেখতে যেতে পারি কিনা। ভদ্রলোক যেন বেশ উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'চলুন না, আমাদের বাড়ি বেশ ভালই লাগবে। আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে, ঠাকুরঘরে কাজকর্ম করতে পারবেন।' আমাকে ওভাবে মায়ের বাড়িতে দেখে হয়তো তিনি অনুমান করেছিলেন, আমি

মায়ের ভক্ত আর এ-সব কাজে আমার অভিজ্ঞতা আছে। যাই হোক্, কাউকে কিছু না জানিয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে চললাম তাঁর সঙ্গে তাঁদের বাড়ি। সামর্থ্যবান গৃহস্থ, জমিজমা গরু গোয়াল সবই আছে, থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধেই নেই, বরং খুব সুবিধে। খুব যত্ন করেই ওঁরা আমাকে রেখেছেন। বেশ আনন্দেই কাটছে আমার ওঁদের সঙ্গে। ভদ্রলোক একদিন আমাকে বললেন, 'জ্ঞানবাবু, ঘরে কিছু পিঠে পায়েস হয়েছে, আপনিও খুব হাঁটতে পারেন। আজ খাওয়া-দাওয়ার পর কিছু মিষ্টি আর ঘরে তৈরি পিঠে মাকে দিয়ে আসতে পারবেন?' বললাম, 'এ আর এমন কি, যাব।' দুপুরের পর একটা ডালার ভিতর কিছু মিষ্টি, আর পিঠে সাজিয়ে বললেন, 'যান, তাড়াতাড়ি মাকে দিয়ে আসুন।' আমি বললাম, 'খাবার সময় যে খেজুর গুড়ের পায়েস খেলাম, খুবই ভাল লাগল, কৈ তাতো দেননি?' তিনি যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দূর মশাই, কি যে বলেন। আরে, পায়েস যে চাল দিয়ে রান্না, তা কি মাকে এখন দেওয়া যায়?' আমি বললাম, 'তাতে কি? অত ভাল জিনিসটা মাকে দেবেন না?' তিনি যেন আরও বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপনাদের বাঙাল দেশের বিধবারা বুঝি দিনে দুবার ভাত খান?'

অবাক বিস্ময়ে বললাম, 'বিধবা! বিধবা কে?'

'কেন, মা যে বিধবা তা জানেন না?' বললাম, 'আমি তা জানি না।' আমার মন সে-কথা মেনে নিল না। মন বলছে, ওঁর ওকথা ঠিক নয়। আমি পায়েস নেবই ভাবলাম, দেখব তিনি বিধবা কিনা। আমার দারুণ রোখ চেপে গেল। তাঁদের অমতে জোর করে ডালার মাঝখানে একটা পায়েস-এর বাটী বসিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে পড়লাম। ভদ্রলোক উত্তেজনায় চিৎকার করে বললেন, 'সব নষ্ট করে দিলেন, সব নষ্ট হয়ে গেল।' কিন্তু আমাকে থামাতে পারলেন না। আমি পদে জয়রামবাটীর দিকে এগোতে লাগলাম। একটা দারুণ উত্তেজনা নিয়ে এগিয়ে চলেছি, কোনদিকে আর দৃষ্টি নেই। এক চিন্তা—মা যদি এ-সব গ্রহণ না করেন, যদি সত্যসত্যই ভদ্রলোকের কথাই ঠিক হয়। আমি যেন জীবনের চরম মুহূর্তে এসে বিরাট এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। যদি তাই হয়, আর আমি মায়ের কাছে যাব না। আবার চলে যাব যেদিকে দুচোখ যায়।

সন্ধ্যার বেশ আগে পৌছালাম জয়রামবাটী, রাস্তার বাঁক্ ঘুরে চলছি মায়ের বাড়ির দিকে। পা যেন আর চলছে না উত্তেজনায়, বড় জেদ করে পায়েস এনেছি, যদি তিনি বিরক্ত হন। সত্যই কি মা বিধবা? বিরাট এই প্রশ্নের আলোড়ন আমার মনে তখন। দেখলাম, দুপুরে বিশ্রামের পর মুখ-হাত ধুয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন সেই বারান্দায়। তাঁর কাছে আসতেই আমায় দেখে বললেন, 'জ্ঞান কি এনেছ আমার জন্য?' আমি কিছু বলতে পারলাম না, শুধু ডালাটা নামিয়ে রাখলাম বারান্দায়। এগিয়ে এসে ডালার ঝাড়নটা তুলেই আনন্দে তাঁর মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, 'পায়েস এনেছ? তুমি কি করে জানলে আমি পায়েস ভালবাসি।' তৃপ্তির আনন্দে তখন আমার দুচোখ বেয়ে জল নেমে এল, সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ দিল। আমি আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাটাই মাকে বললাম। তিনি আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'ও আমাকে চেনে না, তুমি তো চেন।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ মা, চিনি বলেই জোর করে পায়েস এনেছি।' আমার দিকে আবার তাকিয়ে শুধু বললেন, 'দেখো কখনও যেন ভুল করো না।' কী অচিন্তনীয় ব্যাপার। আমি তো তখন তাঁর মন্ত্রশিষ্যও নই; আর কদিনইবা তাঁর সঙ্গে

আমার পরিচয়! কী অযাচিত করুণা তাঁর এই অবোধ সন্তানের উপর!

এরপর আবার আমি মায়ের বাড়ি ফিরে এসে আগের মতো থাকতে লাগলাম। তাঁর উপর যে পূর্ণ বিশ্বাস বা ভক্তি হয়েছে সেরকম তখনও কিছু অনুভব করি না। তবে নিজের জন, আপনার জনের উপর যেমন একটা আকর্ষণ বা টান হয় এই পর্যন্ত। এর দু-চার দিন পর একদিন বিকেলে মা আমাকে ডেকে বললেন, 'জ্ঞান, তুমি কি নদীতে চান করতে যাও?' 'আমি যাই' বলাতে বললেন, 'কাল সকাল সকাল চান করতে যেও। নদীর পাড়ে একটা হলুদ ফুলের গাছ আছে, আসবার সময় ঠাকুরের পূজার জন্য এক ডালা ফুল এনে আমাকে দিও।'

'আচ্ছা মা'—বলে ডালাটা নিয়ে আমি চলে এলাম। পরদিন সকালে সেই ফুল নিয়ে যখন মায়ের কাছে গেলাম, মা তখন পূজায় বসেছেন। সামনে ঠাকুরের পট। পাশে আসন পাতা। সেইদিকে ইশারা করে আমাকে বসতে বললেন। আমি চুপচাপ বসে তাঁর পূজা দেখছি। পূজা শেষ হলে আমাকে আরও কাছে আসতে বললেন। আমি এগিয়ে এলে আমাকে মন্ত্র দিলেন আর দু-চারটে সাধনের কথা বলে দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পটের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'তুমি ওঁকে প্রণাম কর।'

মনের দুর্দান্ত পূর্বসংস্কার আবার যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, মায়ের কথার অবাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে লাগলাম। বললাম, 'উনি কে? ওঁকে প্রণাম করব কেন? আমি তো ওঁকে চিনি না।' আমার দিকে তাকিয়ে একটু ধমকের সুরে বললেন, 'আমি বলছি, তুমি ওঁকে প্রণাম কর। ওঁকে তুমি চেন না? উনিই তো সব, উনি বিশ্বগুরু, উনিই জগৎগুরু।' আমি আবার তর্ক করতে লাগলাম, বললাম, 'গুরু। উনি কেন গুরু হবেন, আপনি তো মন্ত্র দিলেন, আপনিই আমার গুরু।'

কথায় বাধা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমি কারো গুরু নই, আমি সকলের মা। উনিই একমাত্র গুরু।' আমি বললাম, 'আপনি কেন আমার মা হবেন? আমার মা তো আমার বাড়িতে আছেন। এখনও জীবিত।' 'আমিই সেই মা',—বলে বললেন, 'তুমি ভাল করে তাকাও আমার দিকে। দেখ আমিই তোমার সেই মা কিনা!' অপার বিস্ময়ে দেখলাম, সাক্ষাৎ আমার সেই গর্ভধারিণীই আমার সম্মুখে বসে রয়েছেন। আমার সমস্ত শরীর স্থির হয়ে গেল, 'মা—মা' বলে লুটিয়ে পড়লাম ঐ চরণে, স্তব্ধ হয়ে গেল সব তর্ক যুক্তি, চিরদিনের মতো আত্মসমর্পণ করলাম ঐ শ্রীচরণে। আর এ জ্ঞান তিনিই দিলেন যে, উনি শুধু আমার মন্ত্রদাত্রী গুরু নন, উনিই আমার মা, সকলের মা, উনিই বিশ্বজননী, উনিই জগজ্জননী।*

* শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন কর্তৃক ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জয়রামবাটীতে শ্রুত-লিখিত। —সঃ

বাবা, সংসার মহা পঁক (পাঁক), পঁকে পড়লে ওঠা মুস্কিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু খাবি খান, মানুষ কোন ছার! তাঁর নাম করবে। নাম করতে করতে তিনিই একদিন কাটিয়ে দিবেন। তিনি না কাটালে কি উদ্ধার হওয়া যায়, বাবা? তাঁতে খুব বিশ্বাস রাখবে। সংসারে যেমন মা-বাপ ছেলেদের আশ্রয়স্থল, তেমনি ঠাকুরকে জ্ঞান করবে।

—শ্রীশ্রীমা



নানা প্রসঙ্গে

চিরন্তন কাহিনী

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'

প্রাচীনকালে ছাত্ররা গুরুগৃহে পড়াশুনা করতে যেত। সেখানে তারা বেদাধ্যয়ন ও স্বাধ্যায়াদির সঙ্গে সঙ্গে আচার্যের সেবাশুশ্রূষাদিও করত। আচার্য নানাভাবে তাদের পরীক্ষা করে নিয়ে জ্ঞানদান করতেন। ছাত্রদের শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের পরীক্ষাই সম্ভবত কঠিনতম ছিল। শ্রদ্ধাবান্ ছাত্ররাই জ্ঞানলাভের উপযুক্ত। শাস্ত্রে প্রশংসিত এইরকম শ্রদ্ধাবান্ তিনজন ছাত্রের প্রসঙ্গ এখানে আনা হচ্ছে।

পুরাকালে আপোদ ধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে তাঁর তিনজন শিষ্য ছিল। আচার্য ধৌম্য একদিন আরুণিকে ডেকে বললেন: 'আমার জমিতে আল ভেঙে গেছে। যাও, তুমি ঐ ক্ষেতের আল বাঁধ গে।' গুরুর আজ্ঞায় আরুণি তখনই ক্ষেতে চলে গেল।

বালক আরুণি অনেক চেষ্টা করেও ক্ষেতের ভাঙা আলে বাঁধ দিতে পারল না। সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। ভাবতে লাগল কি করা যায়। এমন সময় তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। তখনই সে মনস্থির করল তাই করবে বলে। ভাঙা আলের যেখান দিয়ে জল আসছিল, সেখানে সে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে জল ঢোকা বন্ধ হল।

এদিকে আরুণিকে বহুক্ষণ আশ্রমে না দেখতে পেয়ে আচার্য ধৌম্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অপর বালকরা তাঁকে জানাল, 'ভগবন্! আপনি তাকে ক্ষেতের আলে বাঁধ দিতে পাঠিয়েছেন।' আচার্য বললেন: 'সে তো অনেক সময় হয়ে গেছে! এতক্ষণ তার ফিরে আসা উচিত ছিল। চল, আমরা তার খোঁজ করি।'

ক্ষেতে এসে আচার্য কোথাও আরুণিকে দেখতে না পেয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন: 'বৎস আরুণি! তুমি কোথায়?' আরুণি গুরুদেবের ডাক শুনে তক্ষুণি আল থেকে উঠে এসে তাঁকে অভিবাদন করে বলল: 'ভগবন্! আদেশ করুন, এখন আমি কি করব।' গায়ে কাদামাটি দেখে আচার্য সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন: 'তুমি এত সময় কোথায় ছিলে?' উত্তরে আরুণি বলল: 'আপনার আদেশে ভাঙা আল বাঁধতে এসে জল আসা বন্ধ করতে না পেরে ঐ ভাঙা আলের মুখে শুয়ে পড়ে জলরোধ করছিলাম। ওখান থেকেই এখন উঠে আসছি।' আচার্য ধৌম্য তার শ্রদ্ধা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সস্নেহে আশীর্বাদ করে বললেন: 'বৎস আরুণি! তুমি ক্ষেতের আল বিদারণ করে উঠেছ বলে এখন থেকে তোমার নাম হবে উদ্দালক। আর আমার আদেশ পালন করেছ বলে তুমি অচিরেই শ্রেয়োলাভ করবে এবং সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার অন্তরে প্রকাশিত হবে।'

*

আর একদিন আচার্য ধৌম্য উপমন্যু নামে বালক শিষ্যকে বললেন: 'বৎস উপমন্যু! যাও,

তুমি আশ্রমের গরু রাখ গে।' আচার্যের আজ্ঞায় উপমন্যু গোপালনের দায়িত্ব বরণ করে নিল। দিনের বেলায় সে গরু নিয়ে মাঠে চরায়, আর রাত্রে গুরুগৃহে ফিরে এসে গুরুদেবকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানায়। এমনিভাবে চলতে লাগল।

একদিন আচার্য ধৌম্য দেখলেন, উপমন্যু বেশ স্থূলকায় হয়ে পড়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'বৎস উপমন্যু! তুমি কি দিয়ে জীবিকানির্বাহ করছ? তুমি তো বেশ মোটা হয়ে পড়েছ!' উত্তরে সে বলল: 'হে দেব! আমি ভিক্ষা করে জীবিকানির্বাহ করছি।' শুনে আচার্য বললেন: 'গুরুকে নিবেদন না করে তোমার ভিক্ষান্ন গ্রহণ করা উচিত নয় উপমন্যু শুনে লজ্জিত হল—এবার থেকে সে প্রতিদিন ভিক্ষা করে এনে আচার্য ধৌম্যকে নিবেদন করতে থাকল। আচার্যও ভিক্ষালব্ধ বস্তু সবটাই গ্রহণ করতে লাগলেন। এইভাবে চলছে। উপমন্যুও রোজ গরু নিয়ে মাঠে চরায় এবং গুরুদেবকে সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে প্রণাম করে।

কিছুদিন পর আচার্য ধৌম্য দেখলেন, উপমন্যু পূর্বের মতোই বেশ হৃষ্টপুষ্ট রয়েছে। তিনি শিষ্যকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন: 'বৎস উপমন্যু! আমি তোমার সব ভিক্ষালব্ধ বস্তু গ্রহণ করি, তোমার জন্য অবশিষ্ট কিছুই রাখি না। তবে তুমি কি খেয়ে জীবনধারণ করছ?' উত্তরে উপমন্যু বলল: 'হে দেব! প্রথম ভিক্ষা করে আমি তা আপনাকে সব দেই, পরে আবার ভিক্ষা করে আমি তাই আহার করে থাকি।' শুনে ধৌম্য বললেন: 'বৎস! এই অতিরিক্ত ভিক্ষা করে তুমি অন্য ভিক্ষাজীবীদের জীবিকার ব্যাঘাত করছ, আর তুমি এইভাবে জীবনধারণ করে লোভী হয়ে পড়ছ। দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করা তোমার উচিত নয়।' 'তাই হবে'—বলে উপমন্যু তারপর থেকে একবার মাত্র ভিক্ষা করে গুরুদেবকে দিতে লাগল। যথানিয়মে গরু চরিয়ে সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরে এসে গুরুপ্রণামাদিও যথারীতি করতে থাকল।

শিষ্য উপমন্যুর ভিক্ষাগ্রহণ করা বন্ধ করেও আচার্য তাকে বেশ প্রফুল্ল ও সুস্থ দেখে আবার একদিন জিজ্ঞাসা করলেন: 'বৎস! তোমাকে তো বেশ মোটাসোটা দেখছি, এখন তুমি কি খাও?' উত্তরে উপমন্যু বলল: 'হে দেব! এই গরুগুলির দুধ খাই।' 'বিনা অনুমতিতে এই গরুগুলির দুধ খাওয়া তোমার অন্যায়।'—আচার্য বললেন। 'হে দেব! তাই হবে। আমি আর কখনও এমন-ভাবে গরুর দুধ খাব না'—বলে উপমন্যু আচার্যের কাছে প্রতিজ্ঞা করল।

বেশ কিছুদিন পরে আচার্য ধৌম্য তখনও শিষ্যকে স্থূল দেখলেন। আবার তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: 'বৎস! তুমি এখন কি খাও?' শিষ্য বলল: 'হে দেব! এই বাছুররা স্তন্যপানের সময় মুখে যে ফেন উদ্‌গিরণ করে, তাই আহরণ করে আমি পান করি।' শুনে আচার্য বললেন, 'বাছুররা দয়া করে তোমার জন্য ফেন উদ্‌গিরণ করে, এতে তাদের পুষ্টির ব্যাঘাত হয়, দুধের ফেন খাওয়া তোমার উচিত নয়।' গুরুর উপর বিশ্বাস রেখে, তাঁর সকল নিষেধ মাথা পেতে নিয়ে উপমন্যু পূর্ববৎ গো-সেবাদি করে চলল, সেই সঙ্গে তার গুরুভক্তিও অবিচল রইল।

অনাহারক্লিষ্ট উপমন্যু গরু চরাতে চরাতে একদিন বনের মধ্যে ক্ষুধায় প্রচণ্ড কাতর হয়ে পড়ে। ক্ষুধার জ্বালা তীব্র বোধ হওয়ায়, অন্য কিছু না পেয়ে অগত্যা সে আকন্দপাতা চিবিয়ে খেয়ে ক্ষুধানিবৃত্তি করল। বিষাক্ত ঐ পাতা খেয়ে উপমন্যু অন্ধ হয়ে গেল। দৃষ্টিহীন উপমন্যু পথ চলতে চলতে এক কূয়ার মধ্যে পড়ে গেল।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু উপমন্যুকে আশ্রমে ফিরে আসতে না দেখে আচার্য ধৌম্য

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি শিষ্যদের বললেন: 'উপমন্যু এখনও এল না কেন? তার সকল খাওয়াই আমি নিষেধ করেছি। সে নিশ্চয়ই ক্ষুধায় কাতর হয়েছে এবং অভিমান করেছে। চল, তাকে আমরা খোঁজ করে নিয়ে আসি।'

আচার্য ধৌম্য অপরাপর বালক শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে উপমন্যুকে খুঁজতে খুঁজতে বনের মধ্যে এসে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন: 'বৎস উপমন্যু! তুমি কোথায় আছ, এস।' উপমন্যু কূপের মধ্যে থেকে সাড়া দিল: 'হে দেব! আমি আকন্দের পাতা খেয়ে অন্ধ হয়ে কুয়ার মধ্যে পড়ে গেছি।' শুনে আচার্য বললেন: 'তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর, তাঁরা তোমাকে চক্ষুষ্মান করে দেবেন।'

উপমন্যু করজোড়ে স্তব করলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় তার নিকট আবির্ভূত হয়ে বললেন: 'আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি এই পিষ্টক ভক্ষণ কর।' উপমন্যু বলল: 'গুরুদেবকে নিবেদন না করে আমি খেতে পারি না।' অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন: 'তোমার আচার্য স্তব করে পিষ্টক পেয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর গুরুদেবকে নিবেদন না করেই খেয়েছিলেন।' তবু গুরুর নিষেধ-বাক্য অমান্য করে উপমন্যু খেতে চাইল না। সে বিনীতভাবে জানাল: 'আমি আপনাদের কাছে অনুনয় করে বলছি, গুরুদেবকে নিবেদন না করে আমি খেতে পারব না।' তার গুরুভক্তিতে খুশি হয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় বললেন: 'তুমি চক্ষুষ্মান হবে এবং শ্রেয়োলাভ করবে।'

উপমন্যু চক্ষুলাভ করে আচার্য ধৌম্যের কাছে ফিরে এল এবং তাঁকে অভিবাদন করে সকল বৃত্তান্ত বলল। শুনে আচার্য সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন: 'অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বরে তোমার মঙ্গল হবে এবং সকল বেদ ও ধর্মশাস্ত্র তোমার অন্তরে প্রকাশিত হবে।' উপমন্যু গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, পরীক্ষায় এইভাবে উত্তীর্ণ হয়ে শ্রেয়োবস্তু লাভ করেছিল।

*

আচার্য ধৌম্য বেদ নামে আর এক তরুণ শিষ্যকে একদিন বললেন: 'বৎস বেদ! তুমি আমার বাড়িতে কিছুকাল থেকে আমার পরিচর্যা কর, এতেই তোমার মঙ্গল হবে।' গুরুদেবের আজ্ঞায় বেদ দীর্ঘকাল ধরে প্রাণমন ঢেলে গুরুসেবা করতে লাগল। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে বালক বেদ শীত-গ্রীষ্ম ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবকিছুই হাসিমুখে সহ্য করতে লাগল। সকল সময় গুরুর আদেশ-পালনে সে উন্মুখ থাকত। অবশেষে শিষ্য বেদ গুরুদেবের প্রসন্নতা অর্জনে সমর্থ হয়। গুরু ধৌম্য সন্তুষ্ট হয়ে তাকেও আশীর্বাদ করেন। গুরুর আশীর্বাদে শিষ্য বেদ এইভাবেই সর্বজ্ঞতা লাভ করে ধন্য হয়েছিল।

[মহাভারত, আদিপর্ব দ্রষ্টব্য।]

স্মৃতি-সঞ্চয়ন

একটি উদাহরণ—প্রেম ও সেবার

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাব-মহোৎসবের প্রস্তুতি চলছে। তখনকার দিনে ভক্ত-সংখ্যাও তো খুব অল্প ছিল। সুতরাং উৎসবাদির আয়োজন করতে ভক্তদের দ্বারে দ্বারে ছুটতে হত,—তাঁদেরই অর্থানুকূল্যে, বিশেষ করে কয়েকজনের অকুণ্ঠ বদান্যতায় ও সাহায্যে মঠ-মিশনের সব রকম সেবা-কর্ম ও উৎসব-অনুষ্ঠানাদি নির্বাহ হত। একদিন সকালে বেলুড় মঠ থেকে জনৈক সন্ন্যাসী আরও দুজন সঙ্গীকে নিয়ে কলকাতায় বলরাম মন্দিরে এসেছেন,—সেখান থেকে তাঁরা নানা জায়গায় যাবেন আসন্ন ঠাকুরের উৎসবের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করতে। তাঁরা পায়ে হেঁটে গ্রে স্ট্রীট পর্যন্ত গিয়ে, একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া

করলেন,—উদ্দেশ্য, বৌবাজারে ভক্তপ্রবর শ্রীউপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহেই সর্বাগ্রে যাবেন, তারপর ক্রমে অন্য অন্য ভক্ত-আলয়ে। কিন্তু সন্ন্যাসী মহারাজ গাড়িতে পা দিয়েই, কি কারণে সহসা রাস্তায় নেমে দাঁড়ালেন! উৎকণ্ঠিতভাবে গাড়োয়ানকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ গাড়িতে পূর্বে যে সওয়ারীকে সে নিয়েছিল, তাঁকে কোথায় নামানো হয়েছে। বেচারা গাড়োয়ান জানাল, সওয়ারীকে সে চেনে না, তবে তাঁকে যেখানে নামানো হয়েছে, সেখানটা তার মনে আছে, —এমন কি সেই বাড়িটিও সে আবার চিনতে পারবে। সন্ন্যাসী অত্যন্ত তৎপর হয়ে নির্দেশ দিলেন,—'তোমাকে আমরা বেশি ভাড়া দেব। তুমি আগে সেখানে সেই বাড়িতেই নিয়ে চল আমাদের।' সঙ্গীদ্বয় সহ সন্ন্যাসী গাড়িতে চড়ে বসলেন। গাড়োয়ান তার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

শ্যামবাজারে বলরাম ঘোষ স্ট্রীটস্থ একটি বাড়ির সম্মুখে এসে থেমে, গাড়োয়ান ভয়ে ভয়ে দেখিয়ে দিল—এই সেই বাড়ি, আর বৈঠকখানায় বসে ঐ বাবুটিই সওয়ারী। উদ্বিগ্ন সন্ন্যাসী অমনি গাড়ি থেকে নেমেই সটান বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করলেন,—তাঁর হাতে দেখা গেল একটি চামড়ার ব্যাগ। আকস্মিক এমন একজন সন্ন্যাসীকে দেখে, ঘরের লোকজন সকলেই উঠে দাঁড়ালেন,—কিন্তু অচেনা এই সাধুর এভাবে আগমনের হেতুও কেউ বুঝলেন না। সন্ন্যাসী মোটেই বিলম্ব না করে ঐ ভদ্রলোকের হাতে ব্যাগটি তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—'দেখুন তো মশাই, এটি কি আপনার?' ভদ্রলোক তো হতবাক্। সলজ্জ কৌতূহল নিয়ে সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল গৌরকান্তি দেখতে থাকেন—সহসা চমক ভেঙে, ব্যাগটিকে তাড়াতাড়ি খুলে ফেলেন এবং একে একে কাগজপত্র বের করে টেবিলের উপর রাখতে থাকেন। কারও মুখে কোন কথা সরছিল না। কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেল মুখখোলা, মোটা কাগজের একটা খাম—যার মধ্যে একরাশি নোট,—কত টাকার কে জানে! ভদ্রলোক নোটের তাড়া হাতে নিয়ে গুণতে থাকলেন,—একবার, দুবার, তিনবার গুণে ফেলার পরে তাঁর মুখমণ্ডল আহ্লাদে আরক্তিম হয়ে উঠল। একটা দীর্ঘ স্বস্তির শ্বাস ফেললেন তিনি। করজোড়ে দাঁড়িয়ে তিনি সন্ন্যাসীর দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি ফেরালেন,—মিনতির সুরে জিজ্ঞাসা করলেন,—'আপনার পরিচয় জানতে পারি কি? এই ব্যাগ আপনি কোথায় পেয়েছেন?' প্রসন্ন হাসি মুখে নিয়ে ঐ দিব্যদর্শন সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন: 'আমি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এক ক্ষুদ্রতম দাস। যে-গাড়িতে আপনি এখানে এসেছেন, আমিও সেই গাড়িটি ভাড়া করে চড়তে গিয়ে, গাড়ির মধ্যে আপনার ব্যাগটি পেয়েছি।'

ভদ্রলোকের এতক্ষণে সংবিদ্ হল। তিনি সন্ন্যাসীর চরণবন্দনা করে সাশ্রুনয়নে বললেন,—'আপনি পরমহংসদেবের সন্তান! তাই পাঁচ হাজার টাকা হাতে পেয়েও আপনি এমন অবিচল,—আমাকে খুঁজে বার করে, ফেরত দিয়ে তবে আপনি আনন্দ পাচ্ছেন!' ভদ্রলোকের দিকে শান্ত নেত্রে তাকিয়ে সন্ন্যাসী শুধু জবাব দিলেন,—'আপনার সব জিনিস বুঝে পেয়েছেন তো? এখন আমরা তবে যেতে পারি।' তড়িৎবেগে বাইরে এসে, গাড়িতে উঠে বসলেন,—গাড়োয়ানও তার গাড়ি চালিয়ে দিল বৌবাজারের দিকে।

কে এই সন্ন্যাসী? তিনি আর কেউই নন,—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাপরিকর শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ—পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ। কথামৃতকার শ্রীম যাঁর মহাসমাধির সংবাদ শোনামাত্রই বলে উঠেছিলেন: 'ঠাকুরের প্রেমের দিকটা চলে গেল।'

জ্ঞান-বিজ্ঞান

কুষ্ঠরোগ

কুষ্ঠরোগ একটি বীজাণুঘটিত অসুখ। বীজাণুটির নাম মাইকোব্যাকটিরিয়াম লেপ্রি (Mycobacterium Cepree)। সারা ভারতে এখন কুষ্ঠরোগীর মোট সংখ্যা মোটামুটি ৪০ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠরোগে ভোগেন প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ (পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা মোটামুটি ৫.৫ কোটি)। কলকাতায় অনুমান করা হয় ৩০—৪০ হাজার কুষ্ঠরোগী আছে। পশ্চিমবঙ্গে বলা যায়, প্রতি একহাজার লোকের মধ্যে ৫ জন কুষ্ঠরোগে ভোগেন। তবে এই হার সব জেলায় সমান নয়। কোন কোন জেলায় কুষ্ঠরোগাক্রান্তের সংখ্যা বেশি। জেলা হিসাবে পুরুলিয়াতে প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ৩০—৩৫ জন কুষ্ঠরোগী। বাঁকুড়াতে এই সংখ্যা ২৫, মেদিনীপুর, বীরভূম বা বর্ধমানে ১৫—২০, জলপাইগুড়িতে ১৫, অন্যান্য জেলায় ৫—১০। কলকাতায় ১০০০ জনের মধ্যে কুষ্ঠরোগী আছেন ৫—৭ জন।

কুষ্ঠরোগীর প্রতি সামাজিক প্রতিক্রিয়া এখনও তেমন সুখকর নয়। অথচ যত ভয়াবহ মনে করা হয়, রোগটা তত নয়। বেশির ভাগ কুষ্ঠ-রোগীই রোগটা ছড়াতে পারেন না। কলকাতার একটা এলাকায়, যেখানে ৪ লক্ষ লোক আছে, সেখানে ১ লক্ষ লোককে পরীক্ষা করা হয়েছে, কুষ্ঠরোগে আক্রান্তের সংখ্যা তার মধ্যে ৫,৬৩১ জন। এদের মধ্যে রোগ ছড়াতে পারেন মাত্র ৬২৯ জন অর্থাৎ ১১ শতাংশের মতো রোগী। সংখ্যাটা নগণ্য।

ভারতে জাতীয় কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে ১৯৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। যে-সব জায়গায় জনগণের মধ্যে কুষ্ঠরোগের হার বেশি, সেখানে আছে 'লেপ্রসী কণ্ট্রোল ইউনিট', আর যেখানে হার কম, সেখানে হয় 'সার্ভে এডুকেশন ট্রিটমেণ্ট' অর্থাৎ সমীক্ষা জনশিক্ষা ও চিকিৎসা। পশ্চিম বাংলায় দুটি বড় হাসপাতাল রয়েছে কুষ্ঠ রোগীর জন্য যার একটির শয্যাসংখ্যা ৫৮০ এবং অন্যটির ১২০। কুষ্ঠ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জায়গায়—এর মধ্যে দুটি অন্যতম কেন্দ্র হল কলকাতা 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন' ও বাঁকুড়া। প্রস্তাব আছে, কুষ্ঠরোগীদের জন্য দুটি পুনর্বাসনকেন্দ্র খোলার, আরও তিনটি হাসপাতাল তৈরি করার ও আরও তিনটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালু করার।

চিকিৎসায় কুষ্ঠরোগ ভাল হয়ে যায়। সরকারী খরচে চিকিৎসা হয়—কোন টাকা-পয়সা লাগে না। আর পাঁচটা রোগীকে কি আমরা হীন চোখে দেখি? কুষ্ঠরোগীকেই বা হীন চোখে দেখব কেন? এখন অনেক কার্যকর ওষুধ বেরিয়েছে। ভবিষ্যতে হয়তো টীকা বেরুতে পারে। এ নিয়ে গবেষণাও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এখন মানুষ অন্য স্বপ্ন দেখছে। মারীগুটিকাকে যেমন মানুষ গলাধাক্কা দিয়ে পৃথিবী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেইরকম একদিন হয়তো কুষ্ঠরোগকেও তাড়িয়ে দেবে, নির্মূল করবে। সামনে আসছে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ—জোরকদমে প্রচার চলছে—ওই সময়ের মধ্যে সবার জন্য চাই স্বাস্থ্য।

আমাদের সমাজ চলমান সমাজ। এখন আর পুরানো দিন, ভয়ঙ্কর অন্ধকার নেই। কুষ্ঠরোগ ঘৃণিত হতে পারে, কিন্তু কুষ্ঠরোগীকে সারিয়ে তুলবার সব দায়িত্ব আমাদের সমাজের—এ-কথা আমরা ভুলতে পারি না।

দেশ-বিদেশ

অরুণাচলের অধিবাসী : আদি

সিয়াং জেলায় অন্ত যে-সব উপজাতি আছে তাদের মধ্যে আদির প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি। তারা অরুণাচলপ্রদেশের অন্যান্য উপজাতিদের থেকে প্রগতিশীল ও স্বাধীনচেতা।

আদিরা বহু দলে বিভক্ত হয়ে বড় জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করে। এদের একত্রিত করে রেখেছে তাদের সার্বজনীন একটি ভাষা। প্রত্যেক দলের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠেনি তাদের একতাবদ্ধ হতে। তার কারণ, তাদের সবার একটি সাধারণ ভাষা আছে। একতাবদ্ধ হওয়ার আরও কারণ হল তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও স্বভাবের মধ্যে সাদৃশ্য।

আদি উপজাতির বিভিন্ন দলগুলি আবার আঞ্চলিকতা অনুযায়ী দুভাগে বিভক্ত। প্রথম দলে 'পদম্', 'মিনিযোং', 'পাসি', 'পাঙ্গি', 'শিমোং', 'বোরি', 'আশিং', 'তঙ্গাম্' এবং দ্বিতীয় দলে 'গাল্লোং', 'রামো', 'বোকার্', 'পেইলিবো' প্রভৃতি আছে।

আদিদের বেঁটে-খাটো চেহারা, ডিম্বাকার মুখমণ্ডল এবং মোটা ঠোঁট। আদি-পুরুষদের চোখ মঙ্গোলীয়ানদের মতো। আদি-মেয়েদের কিন্তু মঙ্গোলীয়ানদের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য আছে তা বলা যায় না। তাদের গায়ের রঙ ও চোখ গাঢ় বাদামী রঙের, মাথার চুল কালো কুচকুচে, নাক অতি ছোটও নয়, খুব মোটাও নয়। 'মিনিযোং', 'পদম্' ও 'শিমোং'রা চুল ছোট করে ছাঁটে। 'গাল্লোং'রা দু-ইঞ্চি লম্বা চুল রেখে মাথার চারপাশ দিয়ে গোল করে ছাঁটে। আদি-ছেলেমেয়ে কেউ লম্বা চুল রাখা পছন্দ করে না, দু-তিন ইঞ্চির বড় চুল তারা কখনই হতে দেয় না।

আদিদের সঙ্ঘবদ্ধ সমাজব্যবস্থা। তাদের গ্রাম্য মন্ত্রণাসভা ('কেবাং') আছে। এই 'কেবাং'-ই গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে। বনজঙ্গল কিভাবে কখন পরিষ্কার করতে হবে, শস্যের বীজ কখন রোপণ করতে হবে, শিকারে যাওয়ার সময় কখন এবং উৎসবাদি কখন হবে—এ-সবই ঐ সভা ঠিক করে দেয়। এ-ছাড়াও ঝগড়া-বিবাদাদির বিচারও তারা করে। দোষীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতাও এই সভার আছে।

'কেবাং'-এর সভ্য সাধারণত নির্বাচিত হয় গ্রামের পুরোহিত সম্প্রদায় থেকে। অন্য সম্প্রদায়ের লোককেও নির্বাচিত করা হয়, তবে পুরোহিতদের প্রভাব এই সভার উপর প্রবল।

অন্যান্য উপজাতিদের থেকে আদি-সমাজের বৈশিষ্ট্য বেশি চোখে পড়ে। 'মোশুপ্' নামে ছেলেদের একটি ক্লাবঘর আছে। এটি তরুণ ও যুবকদের দেখা-সাক্ষাৎ ও শোয়ার একটি জায়গা। দশ বছর থেকে যতদিন পর্যন্ত বিবাহাদি না হয় ততদিন ছেলেরা এই ক্লাবঘরে থাকে। এটি নানা শ্রেণীর কাছে বিভিন্ন নামে অভিহিত। যেমন 'মিনিযোং'রা 'দেরে', 'পদম্'রা 'মোশুপ্','মিলিয়াং' এবং আরো অনেকে 'ন্গাপ্‌টেক', 'বোরি' ও 'আশিং'রা 'বিয়াংগো' নামে অভিহিত করে।

তারা গ্রামের মাঝখানে এই ক্লাবঘরটি তৈরি করে—যাতে সবার সুবিধা হয়। এতে কোন থাকার আলাদা আলাদা ঘর নেই—ছাউনি দেওয়া বিরাট একটি হলঘর। তিনদিক খোলা এবং পিছনের দিকটি কাঠের তক্তা দিয়ে ঘেরা—যাতে ঠাণ্ডা হাওয়া না আসতে পারে। আবার কোন কোন গ্রামে দেখতে পাওয়া যায় চারদিক ঘেরা, তবে যাতায়াতের জন্য বহু দরজা থাকে। এই ক্লাবঘরে আগুন রাখার একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে—সেখান থেকে সবাই আগুন পোয়ানোর

সুযোগ পায়। আগুন রাখার জায়গাকে 'মেরুম্' বলে। এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকে বয়স্ক যুবকের উপর। যদি কোন ছোট ছেলে দুষ্টামি করে এবং এখানকার নিয়মকানুন যা আছে তা মেনে না চলে, তাহলে ঐ যুবক তাকে শাস্তি দেয়।

'মোশুপ্'-এ এ-ছাড়া 'কেবাং'-এর সভাও বসে। বিশেষ করে এই সভায় প্রতিবেশী উপজাতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আবার কখন কখন এখানে পিক্‌নিক্ এবং উৎসবাদিও হয়। এই উপলক্ষে মেয়েরা নৃত্যে অংশ-গ্রহণ করার জন্য ভিতরে ঢোকার অনুমতি পায়।

'মোশুপ্'-এর মতো মেয়েদেরও ক্লাবঘর আছে—যাকে তারা 'রাশেং' বলে। 'মোশুপ্' যেভাবে তৈরি 'রাশেং' সেই একই রীতিতে তৈরি, তবে তার থেকে আকারে ছোট। এই ক্লাবঘরে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থাও আছে। মেয়েরা সারাদিন কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকে। রাত্রে খাওয়ার পর বুননযন্ত্রটি হাতে নিয়ে আসে এবং যতক্ষণ ঘুম না পায় ততক্ষণ গল্প ও বোনার কাজ করে। বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সব মেয়ে একত্র থাকে। এখানে যারা বয়োজ্যেষ্ঠা তারা ছোটদের আচার-আচরণের শিক্ষা দেয়। ছেলেদের এখানে এসে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার স্বাধীনতা আছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ছেলেমেয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই সম্পর্ক গড়ার মধ্য দিয়ে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গীকে নির্বাচন করে। যখন কোন ছেলের কোন মেয়েকে পছন্দ হয় তখন সে সরাসরি নিজের বাবা-মাকে বলে অথবা তার কোন বন্ধুকে দিয়ে বলায়। তখন তার বাবা-মা মেয়ের বাড়িতে 'আপোং' (ভাত-মদ) নিয়ে যায় এবং সঙ্গে উপহারস্বরূপ নিয়ে যায় পোড়া কাঠবিড়াল ও আদা-বাটা। মেয়ের বাবা-মা যদি এই উপহার গ্রহণ করে তবে তারা ছেলের বাবা-মার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল যে, মেয়েকে তাদের ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেবে। বাগদত্তা হলে মেয়ে নিজেকে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্না মনে করে। তখন সে মর্যাদার চিহ্নস্বরূপ বেতের কাজ-করা কিছু পরে। যতদিন মেয়ে নিজের বাবা-মার কাছে থাকে ততদিন ছেলে মেয়ের বাড়িতে এবং মেয়ে ছেলের বাড়িতে মদ, মাংস, বিভিন্ন খাবার পাঠায়। মেয়ের প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ না হওয়া পর্যন্ত বাপের বাড়ি থাকে। ইতিমধ্যে ছেলে নিজের ঘর তৈরি করে নেয় এবং উপার্জনক্ষম হয়। তারপর নবজাত শিশু ও স্ত্রীকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে। তবে মেয়ে ইচ্ছা করলে আরও বেশিদিন বাপের বাড়ি থাকতে পারে। যতদিন না সমাজে সে সমালোচনার পাত্রী এবং বাবা-মার কাছে অবহেলিত হয় ততদিন থাকতে পারে।

স্ত্রী যখন নিজের বাপের বাড়িতে থাকে তখন স্বামী শ্বশুরবাড়িতে মাঝে মাঝে আসে। শ্বশুর-বাড়িতে এলে তাকে উৎসবের ('ইয়াগ্‌লিং'-এর) আয়োজন করতে হয়। উৎসবে শ্বশুর-শাশুড়ীকে শূকরের মাংস এবং স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনকে খুব ভাল করে খাওয়াতে হয়। বিবাহে খাওয়ানো ছাড়া আদিদের মধ্যে একসঙ্গে বহু টাকাকড়ি ও জিনিসপত্র দেওয়ার পণপ্রথা নেই। তবে দুটি পরিবার খুশি হয়ে নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করতে পারে।

স্ত্রীর বাবা-মা গরীব হলে স্বামী তাদের নানা ধরনের সাহায্য করে। কখন মাছ ধরে বা কখন শিকার করে স্ত্রীর বাবা-মাকে তার অংশ থেকে কিছু অংশ দিয়ে দেয়। আদি উপজাতির নানা শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে।

বাবার সম্পত্তি বড় ছেলে উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। তবে বড় ভাই ছোট ভাইকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে না। বিধবা মায়ের ভার সম্পূর্ণ

বড় ছেলের উপর পড়ে। তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, মা ছোট ছেলের কাছে থাকতে বাধ্য হয় এবং মৃত স্বামীর ঘরে তাকে থাকতে দেওয়া হয়।

আদিরা নদীর উপর দিয়ে যে সেতু নির্মাণ করে তা দেখবার মতো। নদীর এক পার থেকে অপর পার পর্যন্ত বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ করে তারা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন বেতের তৈরি বড় একটি টিউব নদীর উপর ঝুলছে। এই ধরনের সেতু ১৮৬ ফুট পর্যন্ত লম্বা দেখা যায়।

তারা শিল্পকলায় পারদর্শী। তারা পোশাক-পরিচ্ছদে, টুপি ও গায়ের গহনায় নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর নকশা কাটে। অন্যান্য উপজাতিদের থেকে সৌন্দর্যবোধ এদের একটু বেশি। রঙ মিলিয়ে তারা পোশাক পরে। আর মাথায় তারা যে টুপি পরে তা সত্যিই দেখতে সুন্দর। তারা বিভিন্ন ধরনের বেতের টুপি তৈরি করে। অতীতে তারা যুদ্ধের সময় মাথা বাঁচাবার জন্য তারা শিরস্ত্রাণ পরত। অধুনা তারা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটু হালকা ধরনের শিরস্ত্রাণ তৈরি করে পরছে যুদ্ধের সময়। বিভিন্ন উৎসবাদিতে তারা সুসজ্জিত শিরস্ত্রাণ পরে। শিঙ্‌ওয়ালা পাখির পালক, ঠোঁট ও শিঙ্‌ দিয়ে, ছাগলের লোমের গুচ্ছে লাল রঙ এবং তালগাছের আঁশে কালো রঙ করে মাথার শিরস্ত্রাণটি সুসজ্জিত করে তারা।

আদি উপজাতিদের ইতিহাসচেতনা প্রখর। বয়স্ক ব্যক্তিদের স্মৃতিশক্তি বিস্ময়কর। প্রথম পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত সব পুরুষের বংশ-বৃত্তান্ত ছন্দাকারে অবলীলায় বর্ণনা করতে পারে তারা। একে তাদের ভাষায় 'আবাং' বলে। উৎসব ও সামাজিক নাচের সময় এই 'আবাং' গান হয়। যিনি গায়কদের মধ্যে প্রধান থাকেন তিনি 'আবাং' গান। তারপর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরা সম্মিলিত কণ্ঠে গায়। আদিরা নাচ ('পোন্নুং') খুব ভালবাসে।

আদিরা খুব ভাল চাস-আবাদ করতে পারে না। তাদের প্রধান জীবিকা কামারের কাজ। দা, ছুরি, তরবারি, বল্লম, তীরের ধারাল ফলা, ধাতুর পাইপ প্রভৃতি তারা তৈরি করে।

আদিরা একে অপরের সাহায্য করার জন্য সব সময় এগিয়ে আসে। তাদের সমাজ যাতে উন্নত হয়, তার জন্য তারা সবাই খুব শারীরিক পরিশ্রম করে।

অরুণাচলপ্রদেশের অন্যান্য উপজাতিদের মতো আদিরাও বিভিন্ন অপদেবতা বিশ্বাস করে। তারা মনে করে, এইসব অপদেবতা অসন্তুষ্ট হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রোগব্যাধি হয়। তাই তারা তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য অনুষ্ঠান করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলি একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিস।

কৃষিকাজের সঙ্গে আদিদের উৎসবের সম্পর্ক। তাদের বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে প্রথম আরম্ভ হয় 'আরান্' অথবা 'পোম্বি'। এই উৎসব আরম্ভ হয় ফেব্রুআরি মাসে যখন জঙ্গল কেটে জমি তৈরির কাজ প্রায় শেষ হতে চলে। এই উপলক্ষে শূকর ও মুরগী বলি দেওয়া হয়। লক্ষণীয় বিষয় যে, তারা এই সময় আকাশ ও পৃথিবীর দেবতাদের ('সেদি' ও 'মেলো') সাক্ষী রেখে প্রার্থনা করে। তারা এই দেবতাদের প্রতিশ্রুতি দেয়—প্রতি বছর ভোজনোৎসব করবে, তবে তাঁরা যেন তাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন।

আদিদের মতে সৃষ্টিকর্তা দেবতা হলেন 'পেদোং আনে'। তাঁকে আবার 'পেদোং নানে'ও বলে। তবে আদিদের প্রধান দেবতারা হলেন 'দোন্যই' ও 'পোলো'—সূর্য ও চন্দ্র। তারা এই যুগ্ম দেবতাকে মনে করে পৃথিবীর দুটি চক্ষু। এঁদের চোখ এড়িয়ে কেউ কোন কাজ করতে পারে না। তাই এই যুগ্ম দেবতাকে তারা খুব সমীহ করে চলে।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী—শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত প্রকাশিকা : শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী বিজয়া দাশগুপ্ত, ব্লক এ, ফ্ল্যাট নং ২ গভর্নমেন্ট হাউসিং এস্টেট, এণ্টালী, কলিকাতা-১৪ অথবা W2A(R) 16/4 Phase (IV)B, Golf Green Urban Complex, Calcutta-45। মূল্য : ৩৫˙০০ ; পৃষ্ঠা : ৪৯৮+৮।

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা জগজ্জননী শ্রীশ্রীমা সারদামণি ছিলেন দেবী ও মানবীর সংমিশ্রণে নির্মিত এক অনির্বচনীয় মাধুর্যমণ্ডিত ব্যক্তিসত্তা—তাঁর সেই করুণাঘন অপূর্ব মাতৃমূর্তিকে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে একখানি প্রামাণ্য ও সুবিস্তৃত জীবনচরিত রচনা করা তাঁর কৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব নয়, মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত রচিত 'শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী' গ্রন্থটি পড়বার সময় সেই কথাই বারবার মনে হয়। লেখক ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদধন্য মন্ত্রশিষ্য। তিনি গবেষকের অবিচল নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। অতি সামান্য বিষয়েও ভুল-ভ্রান্তি এড়াবার জন্য তাঁর চেষ্টা ও যত্নের অন্ত ছিল না। তাই আলোচ্য গ্রন্থে আমরা শ্রীশ্রীমার অলোকসামান্য জীবনের কথা যথেষ্টই জানতে পেরেছি বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

শ্রীশ্রীমা কোন নিগূঢ় দর্শন বা জটিল মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে মর্ত্যধামে আসেননি, এসেছিলেন জীবমাত্রের কল্যাণবিধায়িনী জননীরূপে। এইরূপেই তিনি ঠাকুরের আরব্ধ কর্মের বৃদ্ধি ও বিস্তার সাধন করেছেন। তাঁর মানবজীবনবৃত্তের পরিসীমা সাতষট্টি বৎসর। সময়ের দিক থেকে বিচার করলে খুব অল্প না হলেও মায়ের জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তিনি আসলে একই শক্তিতরঙ্গের দুটি শাশ্বতধারা হলেও মা ছিলেন অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতোই নিভৃতচারিণী। সেজন্য পরবর্তী কালে তাঁর জীবনের বহু তথ্যই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যরা মাকে সাক্ষাৎ জগজ্জননীরূপে জানলেও তাঁর কথা কখনও প্রকাশ্যে প্রচার করেননি, কারণ তাঁরা জানতেন, 'ঠাকুরের প্রচারেই মায়ের প্রচার। যেখানে ঠাকুরের আসন, সেখানেই মায়ের আবির্ভাব।' ফলে, পরবর্তী কালে লেখা মায়ের জীবনী ও স্মৃতিকথাজাতীয় গ্রন্থগুলির যুক্তি-পারম্পর্য অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক সেজন্য প্রথম থেকেই অতি সতর্কভাবে অগ্রসর হয়েছেন। অসমর্থিত কোন ঘটনাই এখানে স্থান পায়নি। দাশগুপ্ত মহাশয় মায়ের জীবনকে তিনটি স্তরে ভাগ করে তাঁর চরিত্র-চিত্রণে মনোযোগী হয়েছেন। প্রথম দুটি স্তরে মার জীবনকথা ঈষৎ সংক্ষিপ্ত হলেও তৃতীয় স্তরে তিনি মায়ের আধ্যাত্মিক জীবন ও কর্মময় জীবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ ছবির মতো তুলে ধরেছেন এবং বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রতিটি ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সমস্ত তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে একটি সহজ সরল মাতৃমূর্তি—এমন পরিপূর্ণ মাতৃরূপের চিত্র আমরা ইতিপূর্বে বিশেষ পাইনি। লেখক নিজেও মনে করতেন, চিরকরুণাময়ী মাতৃরূপই তাঁর একমাত্র পরিচয়। 'শুধু জীব ও জগতের সেবায় আত্মোৎসর্গ—ইহাই তাঁহার জীবন, এক অনাবিল স্নিগ্ধধারায় প্রবাহিত।' তাই, 'তাঁহার নিকট গিয়া সকলেই অনুভব করিয়াছে তিনি তাহাদের চির পরিচিত—চির আপন আপনার মা।'

'শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী' গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টে যুক্ত হয়েছে দুটি প্রবন্ধ—'শ্রীশ্রীমা ও আধুনিক ভারতের নারীসমাজ' এবং

'ছেলেমেয়েদের লাভালাভ : একটি অনুধ্যান।' প্রথম প্রবন্ধটি অসামান্য রচনা। আধুনিকা নারীদের দেখে লেখকের মনে যে সন্দেহ জেগেছিল অতি সুনিপুণভাবে তিনি নিজেই শ্রীশ্রীমায়ের বাণী ও ব্যবহারের তাৎপর্য আলোচনা করে তা নিরসন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ পড়ে শ্রীশ্রীমার জীবনকথা ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে। চরিত-সাহিত্য-ধারায় এ গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ সত্ত্বেও এ গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়। মাতৃভক্ত পাঠকমাত্রেই গ্রন্থখানি পাঠ করে অপার সন্তোষ লাভ করবেন।

—ডক্টর চিত্রা দেব

The Four Yogas of Swami Vivekananda (*Condensed and Retold—Studies in Swami Vivekananda Series* 1) —Swami Tapasyananda. Published by Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Madras-600004. pp. 8+273, Price: Rs. 10·00.

গিরিশবাবু যখন স্বামীজীকে ঠাকুরের জীবনী লিখতে অনুরোধ করেন, তখন সভয়ে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন—"বল কি জি. সি., শেষে শিব গড়তে গিয়ে কি বানর গড়ে বসব?" কিন্তু সকলের অজান্তে কী কৌশলের সঙ্গেই না তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের ভাবচিত্রটি যোগ-চতুষ্টয়ের মাধ্যমে আমাদের দিয়ে গেছেন ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়! শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি তত্ত্বরূপে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম—এই সাধন চতুষ্টয়ের জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে চারটি যোগের সরল বর্ণনা দিয়ে স্বামীজী তত্ত্বরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবচিত্রই অঙ্কিত করেছেন।

বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈতভূমিকে ভিত্তি করে উপনিষদ্, গীতা, পাতঞ্জল যোগদর্শন, সাংখ্যদর্শন, নারদীয় ও শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র, রামানুজাচার্যের সাধনসপ্তক ও বিভিন্ন দর্শনের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা এই বইগুলিতে পাই। যাঁরা ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত নন সেই পাশ্চাত্যবাসীদের কাছেও বিষয়গুলি সহজবোধ্য হয়েছিল। অবশ্য তাঁর জীবনে শ্রুতি-যুক্তি-অনুভূতির ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছিল বলেই স্বামীজীর ব্যাখ্যা এত মর্মস্পর্শী। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে স্টার্ডিকে তিনি লিখেছিলেন—

"I want to give them dry hard reason, softened in the sweetest syrup of love and made spicy with intense work, and cooked in the kitchen of yoga, so that even a baby can digest it."

অর্থাৎ নীরস কঠিন জ্ঞান বিচারকে মিষ্ট ভক্তিরসে সিঞ্চিত করে, তীব্র কর্মের মসলা দিয়ে যোগের পাকশালায় এমনভাবে রান্না করে পরিবেশন করব যাতে একটি শিশু পর্যন্ত হজম করতে পারে। যখন শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলী তিনি অবতার ছিলেন কি মহাপুরুষ ছিলেন—এই গবেষণায় ব্যাপৃত, ঠিক সেই সময় স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্ব জগতের নিকট এইভাবেই পরিবেশন করেছিলেন।

স্বামী তপস্যানন্দজী স্বামীজীর এই দুরূহ পরিকল্পনাটি আরও সহজতর এবং সরলতর ভঙ্গীতে পরিবেশন করেছেন—বর্তমান আলোচ্য বইটিতে। যাঁরা স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক মতবাদ জানতে আগ্রহশীল অথচ কর্মব্যস্ততার জন্য মূল বইগুলি পড়তে পারেন না সেই সব পাঠকদের নিকট নিঃসন্দেহে এটি একটি বহু প্রত্যাশিত উপহার। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শের উপর বিতর্ক প্রতিযোগিতায় মূল দার্শনিক তথ্যগুলি না জেনেও স্বামীজীর বাণী উদ্ধৃত করে থাকে। তাদের জন্য এটি একটি সুগম্য ও সুপাঠ্য বই।

প্রচ্ছদপটে স্বামীজীর পরিকল্পিত মঠ মিশনের প্রতীক চিহ্নটি খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে। চিত্রের তরঙ্গায়িত জল কর্মের, পদ্ম ভক্তির এবং সূর্য জ্ঞানের প্রকাশক। সর্প কুলকুণ্ডলিনী শক্তির এবং হংস পরমাত্মার পরিচায়ক। পরমহংস গায়ত্রীর উদ্ধৃতি—'তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ'—'সেই পরমাত্মা আমাদের প্রবুদ্ধ করুন'—সংকল্প বাক্য নিচে রয়েছে। এর অর্থ কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানের সমন্বয়ে পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়। সর্বাঙ্গ-সুন্দর আধ্যাত্মিক জীবনগঠনের এই উপায়।

পাতঞ্জল যোগসূত্রগুলির শ্রেণীবদ্ধ ব্যাখ্যা দ্বারা রাজযোগের বিষয়টি খুব সরল ও সহজ হয়েছে। কিছু প্রধান সূত্র ও শ্লোক গীতা, উপনিষদ্ ও পাতঞ্জল যোগদর্শন থেকে তুলে দিলে ভাল হত। 'কর্মপরিণত বেদান্তের' সারাংশ পরিশিষ্ট রূপে দিলে যোগচতুষ্টয় সম্বন্ধে সামগ্রিক চিত্রটি আরও ফুটে উঠত

স্বামী বিবেকানন্দ-রচনাবলীর 'সংক্ষিপ্ত পুনঃ-কথন' প্রকল্পে এটি প্রথম প্রচেষ্টা। যদিও অত্যন্ত কঠিন তবুও সংক্ষিপ্তকরণের ক্ষেত্রে স্বামীজীর নিজমুখনিঃসৃত মূল ভাষা যথাযথভাবে রক্ষিত হলে গ্রন্থের গৌরব ও সৌষ্ঠব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত 'পেপারব্যাক' সংস্করণে কর্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞান-যোগের সম্মিলিত পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৩২ এবং দাম ১৮ টাকা ৫০ পয়সা। আলোচ্য গ্রন্থের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৭৩ এবং দাম ১০ টাকা। সংক্ষিপ্তকরণের ফলে আয়তন এক-তৃতীয়াংশে সংকুচিত হলেও দাম পড়েছে অর্ধেকেরও বেশি। ক্রমবর্ধমান কাগজের মূল্যবৃদ্ধির জন্যই আনুপাতিক মূল্য হ্রাস ঘটানো সম্ভব হয়নি।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে এটি একটি সহায়ক গ্রন্থ। কর্ম সকলকেই করতে হয়। কিন্তু কর্মের কৌশল না জানায় জীবন হতাশায় ভরে ওঠে। কর্মযোগের পরিবর্তে কর্মভোগ মাত্র সার হয়। যে কর্ম অশেষ দুঃখ ও বন্ধনের কারণ সেই কর্মই কর্মযোগের সহায়ে মানুষকে আনন্দ ও মুক্তির পথে নিয়ে যায়। তখন বোঝা যায়, কোন কর্মই হেয় নয়; স্ব স্ব ক্ষেত্রে সবাই প্রধান।

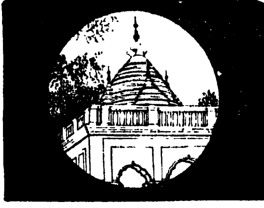
মনঃসংযম ব্যতিরেকে ধর্ম কর্ম কিছুই হয় না। একাগ্রতা হচ্ছে জ্ঞানলাভের চাবিকাঠি। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চঞ্চল মনকে বশে আনা যায়। রাজযোগের অষ্টাঙ্গমার্গ মনের চাঞ্চল্য দূর করে চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত করে।

কেননা জ্ঞানলাভই হচ্ছে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। স্বামীজী বলেছেন—'প্রত্যেক মানুষ যেন একখানা মেঘে ঢাকা সূর্য।' জ্ঞানযোগের সাধনা দ্বারা মায়ারূপ মেঘ সরিয়ে দিলে মানুষ নিজের স্বরূপকে জানতে পারে এবং বুঝতে পারে একই ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান।

সেই ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসার নাম ভক্তি। মানুষের অন্তর্নিহিত ভগবৎসত্তাকে উদ্ঘাটন করতে বর্তমান যুগে 'ভক্তিযোগ'ই সহজতম উপায়। এই ভক্তি থেকেই সর্বভূতে সমান ভালবাসা আসে এবং এই ভক্তিই মানুষকে প্রকৃত নির্ভয় করে; কেননা সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শনের ফলে হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা চলে গিয়ে বিশ্বপ্রেম আবির্ভূত হয়। অতএব যোগচতুষ্টয় অনুশীলনের দ্বারাই সর্বধর্মসমন্বয়, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সর্বজনীন ধর্মে আমরা পৌছাতে পারি।

স্বামীজীর দৃষ্টিতে আদর্শ মানুষ হচ্ছেন তিনি যাঁর চরিত্রে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের সমন্বয় ঘটেছে। আদর্শ মানুষ গঠনের উপায় হিসাবে যোগচতুষ্টয় অনুশীলন কর্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হলে বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি বহু দায়িত্বশীল আদর্শ নাগরিক গঠনে সক্ষম হবে সন্দেহ নেই।

—স্বামী জয়দেবানন্দ



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সমীক্ষা

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সম্যক্ পর্যালোচনা ও অনুশীলনের উদ্দেশ্যে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দকে সভাপতি এবং ডঃ নিমাইসাধন বসুকে কর্মসচিব করিয়া এক আন্তর্জাতিক পরিধিসম্পন্ন সমীক্ষা-পর্ষদ (Committee For Comprehensive Study of Ramakrishna-Vivekananda Movement) গঠন করিয়াছেন। বহু বিশিষ্ট সুধী, বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপক এবং মনস্বী ব্যক্তিদের লইয়া সংগঠিত এই পর্ষদে বেলুড় মঠের কয়েকজন সাধু, ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীও রহিয়াছেন। পর্ষদের কার্যক্রম অনুসরণে উপদেষ্টারূপে একটি উপদেশক সমিতিও নিয়োগ করা হইয়াছে—যাহাতে সভাপতির পদে আছেন ডঃ এ. এল্. ব্যাসম্ এবং সহ-সভাপতিরূপে রহিয়াছেন ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও, ডঃ উমাশঙ্কর যোশী, ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য, ও ডঃ ই. পি. চেলিশেও (রাশিয়া)।

চক্ষু-চিকিৎসা শিবির

১৯৮৩-র অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে মিশনের খেতড়ি কেন্দ্র পরিচালিত নিঃশুল্ক চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরে ১০৪ জন রোগীর চোখে ছানি অপারেশন এবং ৬৩০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুবসম্মেলন

চণ্ডীগড় আশ্রমের উদ্যোগে ২০ নভেম্বর ১৯৮৩-র দ্বিতীয় যুবসম্মেলন ১৯৬ জন যুবক-যুবতীর উপস্থিতিতে দুইটি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়।

উদ্বোধন-সংবাদ

সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা: সন্ধ্যারতির পর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রতি রবিবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং স্বামী অজজানন্দ প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

১৪ ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে তাঁহার জীবন আলোচনা করেন স্বামী অজজানন্দ।

দেহত্যাগ

গত ৩১ অক্টোবর ১৯৮৩, সকাল ৭ টায় স্বামী চিৎপ্রকাশানন্দের (তারিণী মহারাজ) বার্ধক্যজনিত নানা উপসর্গে কাশী সেবাশ্রমে দেহান্ত হয়। দেহত্যাগ কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৪ বৎসর। গত এক বৎসর ধরিয়া দুর্বলতার জন্য তিনি প্রায় শয্যাগত ছিলেন। শরীরত্যাগের দুইদিন পূর্ব হইতে তাঁহার হিক্কা বৃদ্ধি হওয়ায় খাদ্যগ্রহণে কষ্ট হইতেছিল।

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে। বেলুড় মঠ ছাড়া তিনি ঢাকা (বাংলাদেশ) আশ্রমে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি কাশীধামের বিভিন্ন স্থানে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তপস্যাদিতে অতিবাহিত করেন। শেষের দিকে কাশী সেবাশ্রমে অবসর জীবনযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যাপূত সাধুজীবন এবং সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে তাঁহার আত্মা অনন্ত শান্তি-লাভ করিয়াছে—আমাদের অন্তরের বিশ্বাস।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে ভগিনী নিবেদিতা জন্মজয়ন্তী

গত ২৮.১০.৮৩ তারিখে বিবেকানন্দ সোসাইটিতে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ভগিনী নিবেদিতার ১১৭তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। সভানেত্রী প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণা তাঁহার ভাষণে আইরিশ কন্যা ধর্মপ্রাণা মার্গারেট কিভাবে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া অন্তরের প্রশ্নের মীমাংসা পান এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শ্রীশ্রীমার মধ্যে বিশ্বমাতার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া নিবেদিতায় রূপান্তরিত হন ও ভারতের জন্য নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দেন তাহা বর্ণনা করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার নিবেদিতার বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা করেন। সোসাইটির কর্মসচিব ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিবেকানন্দ সোসাইটি গঠনে ভগিনী নিবেদিতার অনুপ্রেরণার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের দীক্ষিত **মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী** গত ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ রাত্রি ১২-১৫ মিনিটে ৮৮ বৎসর বয়সে হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর অন্তর্গত সারদাপল্লীতে তাঁহার নিজ বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি বেলুড় মঠের সহিত যুক্ত। আজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি পূজার্চনা, সাধুসন্ন্যাসীর সেবা ও দানধ্যানে জীবন অতিবাহিত করেন। মিশনের জনসেবামূলক কাজে প্রত্যক্ষভাবে তিনি সংযুক্ত থাকিতেন। অধুনা বাংলাদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে মঠের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসী তখন তাঁহার গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করিতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু সন্ন্যাসী পার্ষদ ও গৃহিভক্তের আশীর্বাদ ও সঙ্গলাভ তিনি করিয়াছেন। নিজের গুরু স্বামী শিবানন্দ ছাড়াও শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের মধ্যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ এবং স্বামী প্রেমানন্দজীর সঙ্গ ও আশীর্বাদলাভ তাঁর জীবনের অসাধারণ গৌরব। শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের পরম সৌভাগ্যও তাঁহার হইয়াছিল। অধুনা বাংলাদেশস্থ কিশোরগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। দেশবিভাগের পরে শেষজীবনে সারদাপল্লীতে রামকৃষ্ণ-সারদা সংঘের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।

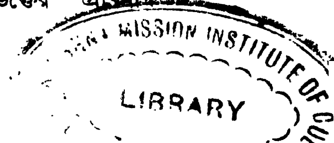
*

গত ১৬ অক্টোবর ১৯৮৩, শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **শচীন্দ্রনাথ গুহ** বেলা ১১-০৬ মিনিটে ৭৩ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। কিছুদিন পূর্ব হইতে তিনি পাণ্ডুরোগ ও যকৃতের গোলমালে ভুগিতেছিলেন। তিনি ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবানুযায়ী জীবনযাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন আজীবন। ফলে সরলতা, অমায়িকতা, নিষ্ঠা-পরায়ণতা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

*

গত ১৬ নভেম্বর ১৯৮৩, সকাল ৮-১৫ মিনিটে শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিতা সন্তান **সরলা বসু** তাঁহাদের কলিকাতাস্থ ভবনে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার স্বামী প্রয়াত ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বসুও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন।

উপরি-উক্ত তিনজনের দেহনির্মুক্ত আত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে শান্তিলাভ করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।



৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী নিরাময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ, ব্লক ও মুদ্রণ : রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৭০০০০৬

সম্পাদক—স্বামী নিরাময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী অজজানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১৮.০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা


IDEAL BINDERS